

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA  
18/M TAMEER LANE, KOLKATA-700009

Roll No. : KLMLGK 2000	Place of Publication
Collection : KLMLGK	Publisher
Title : <u>3hvj</u>	Size : <u>6.5" x 9"</u> <u>16.51 x 22.86 c.m.</u>
Vol. & Number : <u>1/1-6</u>	Year of Publication : <u>Janru, 1980 - Wrtm, 1980</u>
	Condition : <u>Brill</u> <u>Good</u>
Editor :	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK
------------------------



*Dilip Kumar Das*

১৯৩০

উদয়ন-টেশাখ, ১৯৪০



স্বামী বহ্নিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১০/এস, ট্যামার স্টেন, কলকাতা-৭০০০০১

বৈশাখ

১৩৪০



## বন্ধিন-তর্পণ

হে বাংলার সাহিত্যগুরু, আজ বৎসরের প্রথম দিনে সাহিত্য-পথে আমাদের এই প্রথম যাত্রায় আমাদের হর্ষ-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তোমার চিরজয়ী শক্তিময় মূর্তি ফুটিয়া উঠুক। বঙ্গভারতীর পবিত্র পূজাকার্যের গুরুভারে শ্রদ্ধাবনত আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদ পুষ্পের মত ঝরিয়া পড়ুক।

হে নিষ্ঠাক জাতিগঠক, যে অপার শক্তি ও মনীষার বলে তুমি বাঙ্গালীর পূর্ণ অভ্যুদয়ের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, সেই শক্তি ও মনীষার আবেগ আমাদের চিত্তকে উৎসাহিত করুক।

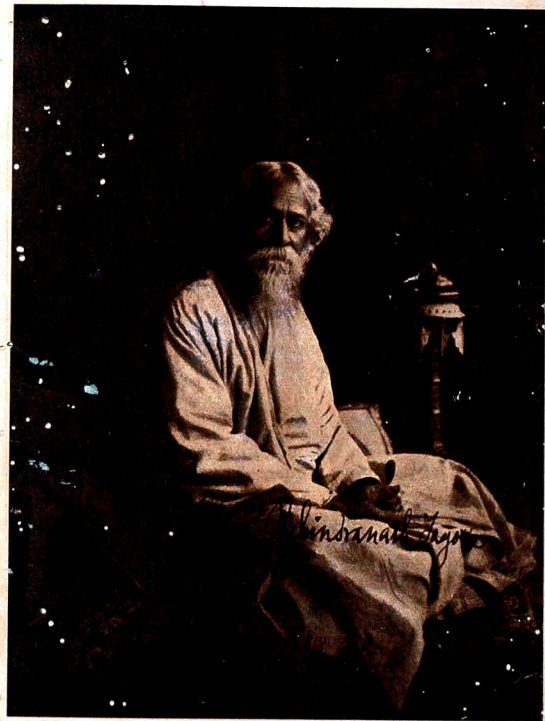
হে প্রবল কালবৈশাখীর প্রতিভু, তুমি সঙ্গে আনিয়াছিলে প্রভঞ্জন এবং প্রাণন,— প্রভঞ্জনের দ্বারা তুমি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বহু গুহাদল ও কলুষজঞ্জাল উড়াইয়া দিয়াছ এবং প্রাণনের দ্বারা সেই ক্ষেত্রে নবীন জীবনে নবশাস্ত্রসম্ভারে স্তম্ভামল করিয়া তুলিয়াছ। তোমার সেই সংহার ও সৃষ্ণনের লীলা আজ আমাদের দিক পথের সন্ধান দিক।

হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তোমারই নয়নে প্রথম অপরূপ গৌরবে সেই দেশজননী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যিনি একই কালে “স্বহাসিনী” এবং “বহুবলধারিণী”। তাঁহারই হস্তে ও বলে আজ অদম্য বঙ্গবিজয়ভের আকাশে সমুজ্জ্বল। তোমাকে প্রণাম।

হে মহান, তুমি আমাদের সেই সাহস দাও যাহাতে আমরা সত্যকে অচ্যায় বলিতে পারি; সেই শক্তি দাও যাহাতে আমরা কলুষকে অতিক্রম করিতে পারি; সেই প্রেরণা দাও যাহাতে আমরা আনন্দ-উৎসারিত সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকে লীবনে সাধনা করিয়া তুলিতে পারি।



উদয়ন — টেশাখ, ১৩৪০



শ্রী ব্রহ্মচারী

[ শ্রী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মঠাশ্রমের সৌজাত্য ]

"સરનાથ કુશિય"   
 >૧, મોરબી વાણી નો   
 સરનાથ   
 પાલિકા

આશીર્વાદ

૭

જામનું વિકાસ

એક સરનાથ ઉદ્યોગશાળા   
 ઉદ્યોગશાળામાં દિગ્ગજાળા ।

સરનાથ કુશિય જાળા મેલ રત સર   
 જાળાકર એક ના ઇશાન સરનાથ,   
 કુશિય એક કુશિય નાથિ રાં જાળા ॥

સરનાથકર

૪ ઇશ ૨૦૦૦



## সাহিত্য

ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এচ-ডি

কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা সেই শব্দের ভাষার প্রচলিত তাৎপর্যের নির্ণয় করা যায়, একথা বলা চলে না। গম্‌ ধাতু হইতে যো শব্দের উৎপত্তি; তাই বসিয়া বাহা চলে তাহাই যো এই ব্যুৎপত্তির অমূল্যমান করিয়া গম্‌ অর্থে ব্যবহৃত যো শব্দের তাৎপর্য বাহির করিতে গেল হাতাশ্পদ হইতে হয়। বাহা চলে বা গমন করে তাহাকেই গক্‌ বলা চলে না এবং ব্যুৎপত্তির অমূল্যশেষ অর্থ করিতে গেলে, 'দ্যোতিষ্ঠতি' বা গক্‌ বসিয়া আছে, ওজপ বলা চলে না, কারণ সচল বস্তুকেই যদি 'দ্যো' বলিতে হয় তবে বসিয়া থাকিলে তাহার সে নাম সম্ভব হয় না। কিন্তু অমিকাশ্বলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অমূল্যমান করিলে তাৎপর্যের যে বীজী পাওয়া যায় কাক্ষসে চিত্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জন্ম-পরিণতির ধারাতী দৃশ্য করিয়া চলিলে তাহার ভাষার প্রচলিত তাৎপর্যটির সার্থকতা হুমুটি হইয়া উঠে। ভাষার একটি শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। তাহারের সম্বন্ধিত হইলে অনেক সময়ই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাহায্য লইতে হয়। মাল্লবের চিত্তে জন্ম-পরিবর্তন ভাববারা হইতে রস সঙ্গর করিয়া একটা আদান অর্থ আপনাকে নানা শাখা-প্রশাখার ব্যাপ্ত করিয়া বিভিন্ন অর্থক্ষেপে প্রকাশ করে; আবার অনেক সময় ইয়াও দেখা যায় যে, ভাববারার পরিবর্তনে মূল অর্থটা ভাষা হইতে বিপুল ও বিস্তৃত হইয়া যায় এবং পুরাতন শব্দকে আশ্রয় লইয়া একেবারে নূতন অর্থের উৎপত্তি হয়, যথচ তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই অর্থ-পরিপূরার ইতিহাস গণ্যযোগ্যমান করিলে দেখা যায় যে, মানুষের চিত্ত কোনও একটি বীজ-ভাবে (concept) অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ প্রকটিত পারে না।

সে তাহার মধ্যে নূতন নূতন অর্থ নূতন নূতন তাৎপর্যের অমূল্যমান ও সঞ্চিত করিয়া আপনাকে সমুদ্রের গর্ভে ঢালিত করিতে থাকে এবং এইজন্ম একটি শব্দের বৃত্তে নানা দেশে নানা কালে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন তাৎপর্য ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য কোনও একটা বিশিষ্ট শব্দের কি তাৎপর্য তাহার কোনও একটা নিশ্চিহ্ন উত্তর দেওয়া যায় না। অর্থ ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা হইলেই প্রশ্ন উঠে এ অর্থ কোন কালের, কোন দেশের, কোন সমাজের? কোন ভাবকের চিত্তবৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? জন্ম-পরিবর্তন অর্থলব্ধকের মধ্য দিয়া কিসের অমূল্যমান চলিয়াছে তাহারের খোঁজ না করিলে এই শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় হুসাধা হয়। এইজন্য গায়ের জোরে বা গদার-জোরে মত স্থাপনের বে-বীতি দেখা যায়, তাহাতে বন্দ বাড়িয়া উঠে, কিন্তু নামাশো হয় না।

সাহিত্য শব্দটা সম্ভব হইতে বাস্তবের আসিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে অত কিছু আশোচনা করিবার পূর্বে সম্ভবতঃ ভাষার এই শব্দের কি অর্থ ও তাৎপর্য চলিয়া আসিয়াছে তাহাই প্রণয়ন তাই প্রবন্ধে আশোচনা করিব। 'সহ' বা 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দ নিঃসৃত হইয়াছে। শব্দটা সম্ভবতঃ ভাষার অপেক্ষাকৃত আনুগম্য। কারণ, অতি প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দটার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূল অর্থ, "একসাথে বা একত্রে থাকা।" ছাটী বিনিস একজ 'নাছে, এই তাৎপর্য বুঝাইতে একথা বলা চলে যে, তাহারের 'সাহিত্য' আছে। আবার কোনও যোকের সহিত সঙ্গ করাকে তাহার সাহিত্য করা দশা চলে। কামন্দকীর নীতিশাস্ত্রে ব্রীক্ষণ করিতে নিবেশ করিতে গিয়া লেখা হইয়াছে—“একার্থাভ্যাং সাহিত্যং সদর্পক বিবর্জকং”। আমরা বাংলায় 'সাহিত্য' শব্দ যে-অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থে খোঁজ প্রাচীন কালে কাব্য শব্দই ব্যবহৃত

হইত। মধ্যযুগ হইতে 'সাহিত্য' এই শব্দের প্রচলন দেখা যায়। কবিসাধুভোম রবীন্দ্রনাথ, সহিত শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্বিধা সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গিয়া “বাংলার জাতীয় সাহিত্য” এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ দ্বিধিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিগনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাবার-ভাবার, একে-এক্কে মিলন তাহা নহে,—মাছেরের সহিত মাছেরের, অতীতের সহিত বর্তমানের, হুয়ের সহিত নিকটের অতীত অন্তরঙ্গ যোগদান সাহিত্য বাহীত আর কিছু হইতেই সম্ভবপর নহে। যে-দেশে সাহিত্যের অভাব সে-দেশের লোক পরস্পর সমীচ বন্ধনে সম্বন্ধ নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূর্বপুরুষের সহিতও তাহারের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্ণাঙ্গের প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে বৈদ্য-সাধন হয় তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের দ্বারা বাহীত বাহীত পূর্বপুরুষদিগের সহিত প্রচেন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।” অর্থটির মধ্যে একটি হৃদয়তার অন্তর্ভুক্তি ও হৃদয়ঙ্গম আছে। কিন্তু এই অর্থে সাহিত্য শব্দ সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে শব্দের সহিত অর্থের যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে এই সম্রাট ভারতবর্ষীয় মনীষীদিগের মনকে নাড়া দিয়াছিল। কালিদাস লিখিয়াছিলেন যে, বাক্য ও অর্থের তাৎপর্য জুড়ে প্রতিভা না হইলে কাব্য লেখা চলে না। তাই তিনি রঘুবংশ কাব্যের প্রথমে হর-পার্বতীকে মমতার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, বাক্য ও অর্থের তাৎপর্য বৃদ্ধিবার জন্ম তিনি হর-পার্বতীকে মমতার করেন। কারণ, ব্যস্ত্র ও অর্থের-সম্বন্ধ বৈরুপ, নিতা, অর্জুনাদিহর হর-পার্বতীর সম্বন্ধ সেইরূপ নিতা। কালিদাসের সম-কালীন ভট্টহরি তাহার বাক্যপুণীয়ে লিখিয়াছেন যে, প্রশ্ন যেমন নিজে কুটম্ব থাকিয়াও আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করেন, শব্দও সেইরূপ শব্দের দ্বারা কুটম্ব

থাকিয়া নানা অর্থের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে।

“অনাদিনিধনং প্রশ্ন শব্দতত্ত্বং বদক্ষরম্।  
বিবর্জক-অর্থভাবেন প্রশ্টিয়া জগতো বৃত্তঃ।”  
জ্ঞান যেমন নানা জ্ঞের বস্তুর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, শব্দও সেইরূপ আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে।

“শাশ্বতগং যথা জ্ঞানে জ্ঞেররূপং চ দৃষ্টান্তে  
অর্থগতং তথা শব্দে স্বরূপং চ প্রকাশতে।”

এই সমস্ত দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে শব্দ ও অর্থের মনোহারী সংযোগ-বিশেষকে সাহিত্য বলা হইত। বজ্রজ্যোতিবিকার রাজানুকৃত্যক সাহিত্যের লক্ষণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

“শব্দার্থো সহিতো বজ্রকবিব্র্যাপ্যারশালিনি  
বজ্রে বায়বিত্তো কাব্যে তত্ত্বদিক্লাদ্যকারিনি।”

কবিশৌলভকল্পিত রচনাবৈচিত্র্যচমৎকারকারী শব্দ ও অর্থের ভ্রমদুর বিভ্রাসকে সাহিত্য বা কাব্য বলা হয়। কেবল শব্দকে কাব্য বলা যায় না, কিংবা কেবল অর্থকে কাব্য বলা যায় না। সেইজন্য শুধু যেখানে শব্দের স্বভাব আছে সেখানে কাব্য হয় নাই, যেমন—

“জিহুবা জিহুবা জিহোচনী জিহুলনী  
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী।  
ধকরে পাথর তুমি ধকরের মেয়ে  
ধির কর ধর ধর কাঁপি ভয় পেয়ে।  
দাফাংগি দয়ামণী দামব-দমনী  
হুং হুং কর হুগা হুগিভলনী।”

শুধু অর্থের পাণ্ডুরী বা মহৎ থাকিলেও সাহিত্য বা কাব্য হয় না—

“তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল,  
সেই ভুমি তুমি আমার হও অন্তরূপ।”



তুমি সন্ধ্যের শার অসার সকল,  
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঞ্চল।  
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে,  
সেই ধর্ম তুমি দয়া কর' সেই জনে।  
সব রক্ত তম গুণে প্রবেশিয়া তুমি,  
সৃষ্টি কৈলা স্বরকাল রসাতল তুমি।"

উৎস-বাণ-প্রচুর মানিনীদের দৃষ্টিপাতের ভয়ে চম্পু ধীরে  
ধীরে উঠিত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

"ক্রমাসেক্ষিকপ্রকৃতিপরিপাতি: একচরন  
কথা: শৈব: শৈব: নবকমলকন্দাচুর্নকত:।  
পূত্রজায়া: প্রিয়বিরহনন্দনাকীপিত্তশাং  
কট্যচেত্যাভিভাষিত ইব চক্রেয়াহ্মরতে।"

পদ্মকোরকের জার হ্রস্বকামল বলাগুলি ধীরে ধীরে  
একটা একটা করিয়া প্রকাশ করিয়া প্রিজ-বিরহিণী  
পুরনারীদিগের রোমকথারিত কট্যচের জয়ে চম্পু মনে  
অতি সঙ্গোপনে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই  
দ্বিতীয় কবিতার উৎস সহজেই বুঝা যায়। কাজেই  
বোঝা যাইতেছে যে, কেবল রমণীয় শব্দ প্রয়োগে বা  
কেবল অর্থের সজ্জকে কাব্য হয় না। কিন্তু শব্দার্থের  
একটা বিশেষ চাক সন্নিবেশ বা সাহিত্য 'সাহিত্য'র  
সৃষ্টি হয়। শব্দার্থের দার্শনিক সঙ্গের বিষয় উল্লেখ  
করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, শব্দের সৃষ্টি অর্থের  
নিমিত্ত সাহিত্য বা সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। এই হিসাবে  
শব্দ ও অর্থ সর্বদাই সম্মিলিত রহিয়াছে। সাহিত্য  
বসিতে আমরা সেই বিশেষ সন্নিবেশকেই বুঝি বাহা।  
ছন্দকে আলাদা ও চমৎকারিত্বে পূর্ণ করিয়া তুলে।  
এই চমৎকারিত্বে মূল একটিকে যেমন অর্থের চাক্সতা  
অপরদিকে তেমনি ব্যাক্য-বিজ্ঞান ও ছন্দই প্রধান।

একই জিনিষ বুঝাইতে হয়ত অনেকগুলি শব্দ থাকিতে  
পারে; কিন্তু তাহাদের সকলগুলি কাব্যে ব্যবহৃত হইতে  
পারে না। আবার একজাতীয় দশটা মূল থাকিতে পারে,  
দশটা মূল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সকলকে কাব্যে  
ব্যবহার করা যায় না। 'চুত-মুতল' বলা চলে, কিন্তু  
'আদের মুতল' বলা চলে না। আত্ম শব্দের কাব্যে বহু  
ব্যবহার আছে, ষাঁটাল শব্দের কাব্যে ব্যবহার চলে না।  
অথচ উভয়েই ভক্ষ্য বটে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন  
যে, ভক্ষ্য বলিয়া ও প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলিয়া কিম্বা বা  
বেগনের মূল লইয়া কাব্য চলে না, কিন্তু মল্লিকা বা  
টগর না হইলে কাব্য অচল, তাহার প্রধান কারণ এই

যে, তাহার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে না,  
সে-কথা নিঃসঙ্গিত বলিয়া মানা চলে না। শব্দের মধ্যেই  
এমন একটা বিশেষণ আছে যে, সেই শব্দ সাহিত্যে  
ব্যবহারের উপযোগী, কিন্তু তজ্জাতীয় অর্থ শব্দ নয়।  
শব্দের একটা বিশেষ ধর্ম বা সম্পদ আছে বাহা অমূল্য  
করিয়া কবি তাহার প্রতিভার বলে তাহাকে চরন  
করিয়া সাহিত্যের মালা সৃষ্টি করেন। সেই ধর্ম বা  
সম্পদ কেমন করিয়া উৎসার হয় সে-আলোচনা এখানে  
করিব না। কিন্তু এ-প্রণালী বলা যায় যে, তাহার মধ্য  
অতি নিগূঢ় এবং ব্যাপক, এবং সেইজন্য প্রয়োজন বা  
অপ্রয়োজনের হেতু নির্দেশ করিয়া সেখানে কাস্ত হইয়া  
যায় না।

সমসার বিষয়-বস্তুর অভাব নাই এবং আলোচনা  
ও বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায় অসীম ও অনন্ত, তাপসি সকল  
প্রকারের আলোচনা সাহিত্যে স্থান পায় না, এবং  
সদৃশ-বোদ্ধার দ্বারা আনন্দ-স্বপ্নে মগ্ন করিয়া তুলিতে  
পারে না। আজকাল প্রায়ই ছুই দলের মধ্যে তুমুল  
আন্দোলন দেখা যায়। একদল বলেন, সাহিত্যে  
প্রধানতঃ সেই জিনিসেরই স্থান, বাহা দেশের ও সমাজের  
কল্যাণ সাধন করিতে পারে। কিন্তু আমি জোর করিয়া  
বলিতে পারি যে, যত বড় কবিই হইবে না কেন তিনি  
'কুইনাইনে'র তোর লিখিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন  
না। কেহ কেহ আবার বলেন যে, বাহা কিছু আছে  
তাহারই উপর কাব্য লেখা চলে। 'কিনিয়াছি, কোনও  
কবি কিম্বা, পটল, আল, লম্বার উপর কবিতা লিখিতে  
হুক করিয়াছেন। আবার একদল তরুণ কবি মাছদের  
মধ্যে বা-কিছু মূল্য, বা-কিছু রানি আছে তাহাই কাব্যে  
প্রকাশ করিতে-চেষ্টা করিতেছেন। মাছদের রানি,  
মাছদের মলিনতা মাছদের দূর করিতে না পারিলেও  
মাছগন্ধে চাপিয়া রাখিতে হয়, অথচ তাহার আখ্যায়ের  
মধ্যে একটা মন্তব্য আছে। সেইজন্য কাব্যে সেই  
মলিনতার প্রতিমূর্তি সেখানে মাছগন্ধ তাহার সেই মন্তব্যের  
একটা আশ্রয় পাইয়া নাটিয়া উঠে। কিন্তু এ কথা  
নিশ্চিত বলা যায় যে, এ জাতীয় রচনা মাছদের অন্তরকে

চমৎকারিত্বে ও আশ্রয়দেয় পুষ্পিত করিয়া তুলিতে  
পারে না।

যে-কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া এবং যে-কোনও  
রূপ শব্দ-বিজ্ঞান করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, এ কথা  
গম্যার জোরে প্রচার করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু  
নিশ্চয় চিরন্তন কালের সাহিত্য ইহার বিরুদ্ধে লক্ষ্য করে  
এবং ক্রমবাহীন কাল আপন কুটিল কটাক্ষে এই মূল্য-  
সাহিত্যকে ভক্ষ্য করিয়া দেয়। বিশিষ্ট শব্দ-বিজ্ঞানের  
ও বিশিষ্ট অর্থের মূল্যাক ভঙ্গিতে কবি তাহার প্রতিভার  
বলে অক্ষয় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। Moralist, Realist বা  
Idealist তাহাদের নিজেদের আবৃত্তি বর্ণিত ধীরে ধীরে  
তলাইয়া যান। যে-কোনও ঘটনা-ঘটনা তাহারই  
স্বাভাবিক বর্ণনা যদি সাহিত্য হইত, তাহা হইলে পুষ্টি-  
মোটের সঙ্কল্পনার বিবরণে সাহিত্যের স্থান পাওয়া  
যাইত। অথচ সেই সমস্ত সঙ্কল্পনার ঘটনার কোনও  
বিশেষ অংশকে অবলম্বন করিয়া যদি কোনও প্রতিভাবান  
কবি যথোপযুক্ত শব্দ-বিজ্ঞান ও রচনা-বৈচিত্র্যে চমৎ-  
কারিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে সে-সাহিত্য  
হয়ত দৃশ্যকাল পর্য্যন্ত লোকের চিত্র হরণ করিবে।  
সাহিত্যে কুৎসিতের কোন স্থান নাই, পঙ্কজের কোন স্থান  
নাই—একথা আমি বলি না, কিন্তু তাহাদের স্থান দিতে  
হইলে চমৎকারিত্বের রম্যতার পরজন্ম তাহারিগে  
ছুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমাজের জমপরিবর্তন ও  
জমপরিবর্তিত ভাষা, কটি, নাড়ী, জ্ঞান, বিজ্ঞান  
প্রভৃতির পরিবর্তন ও পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মাছদের  
চিত্তভূমির পরিবর্তন হয়, একথা সত্য এবং সেই সঙ্গে-  
সঙ্গে চমৎকারিত্বের নূতন নূতন পদ্ধতি ও পদ্ধতিদেরও  
সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন কালের স্বাভাবিক  
গতিতে নিম্পন্ন হইয়া থাকে। যতই সাহিত্যিক হউন না  
কেন কোনও তরুণ কবির মূল থাকের জোরে বা গম্যার  
জোরে সাহিত্যের নূতন সম্ভার্য সৃষ্টি করিতে পারেন  
না। কোনও শব্দ যদি অশাশ্বতের শব্দ হইয়া-  
থাকে, তাহাকে সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার  
অধিকার রাজার নিয়ম-শাসনেরও আয়ত্ত নহে। জোর

"মানিনীশব্দবিষোচন পাঠা-  
হৃদ্বাপকরবানিগুণন  
মদমন্দমুখিত: প্রবেদী ধং  
ভাত ভাত ইব শীতমুখ:।"



করিয়া তাহা চালাইলে সে-মন্দিরে সাহিত্যের চিত্রখন  
পুষ্কারী প্রবেশ করিবেন না। সেইজন্যই কৃষ্ণক  
বলিয়াছেন—

“সাহিত্যমনমোঃ শোভাশালিতাঃ প্রতিকাপ্যাসৌ  
অনুমানঃরিব্রজমনোহারিণ্যাব্যাহতিঃ।”

শব্দ ও অর্থের যে অনির্গুণনীয় শোভার সন্নিধান হয়,  
তাহাকে সাহিত্য বলে। শব্দার্থের এই বিচিত্র বন্ধ বা  
বিচ্ছাদ তখনই সম্ভব হয় যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে  
যেখানে যে ভাবনী শব্দটী ঠিক উপযুক্ত হয় তাহাই  
স্বাভাবিক করিয়া এবং সমস্ত বাস্তব ও অসুখীতা  
বর্জন করিয়া তাঁহার রচনাকে মনোহারিণী করিয়া  
তুলেন। সেই শব্দার্থের সন্নিধানসেই সাহিত্য  
বলে যখন তাহাদের বিভাসের ফলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়  
এবং চিত্তের মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব উদ্ভিস  
হইয়া তাহাকে জানন্দে বিভোর করিয়া দেয়। এই  
জানন্দ বিষয়বস্তুসম্প্রদায়ের আনন্দ নয় বা শব্দ-স্বাক্ষরের  
আনন্দ নয় বা অর্থ-বাহ্যস্বাক্ষর গভীর অতত্ত্ব নয়,  
কিন্তু এই সমস্ত একত্র হইয়া তাহাদের সাহিত্যে,  
সম্মিলিত ফলে, যে চমৎকারিত্ব ও আনন্দের কিরণপ্রাণি  
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা একটা বিশিষ্ট পঞ্চদয়ের  
সম্ভোগ। গান্ধী শোকের ভোগপুষ্কার হইবে বা শব্দ-  
স্বাক্ষরের কর্ণপরিভূততায় তাহার প্রমাণ নহে,  
তাহার প্রমাণ সম্ভব সম্ভাব্যের দ্বয়ের স্রবীভাবে।  
অতএব কেবলমাত্র ভাল-শাপা সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ  
নহে। কাহার ভাল লাগিল এবং কেন ভাল লাগিল,  
অর্থাৎ সম্ভব বিচারক সম্ভাব্যের ভাল লাগিল কি না  
এবং সেই ভাল-লাগাটী শব্দার্থের বিচিত্র রমণীয় সন্নিবেশ-  
প্রসূক্ত কি না তাহাই বিচার করিতে হইবে।

অর্থ শব্দের নানা অর্থ ব্যবহার হইবে। অর্থ বলিতে  
ব্যাক্যার্থ বুঝায়, লক্ষ্যার্থ বুঝায় ও ব্যঙ্গার্থ বুঝায়। নানা  
অর্থের সন্নিবেশ ও মিলনে যে তাৎপর্য্যটা প্রকাশ পায়  
শব্দের তরীতে তরীতে স্বরগ ও সংহারের বীণা-বদনে  
যে লহরের পর লহর খেলিয়া যায় তাহা কোনও

ব্যাক্যার্থের একান্ত বহির্ভূত হইলেও তাহারই মধ্যে  
অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ শব্দার্থ বলিলে শুধু সেই  
অর্থটীকেই বুঝায় যাহা সকলের সুবিদিত। কিন্তু সেই  
সুবিদিত শব্দার্থ-পরম্পরাকে কবি এমন সুন্দর করিয়া  
এমন বিচিত্র ভাবে সাজাইয়া তুলেন যে, তাহাতে  
তাঁহার স্বদয়ের অত্যন্তরের অমৃত গভীর অহতুতী  
অতুলনীয় বর্ণজটায় ও রূপ-সম্পদে মূর্ত হইয়া উঠে।  
যখন কবি বলেন—

“অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া;

দেখি নাই কু দেখি নাই আমি  
এমন তরুণী-বাওয়া।”

আর যখন হাইই রূপায়ের বলা যায়, শাদা পালে বাতাস  
লাগছে, এরকম নৌকা-বাওয়া দেখি নাই—এই  
ছন্টা বাক্যের ব্যাক্যার্থ একত্র হইলেও কবির বাক্যটা  
পড়িলেই দ্বন্দ্বের মনে আনন্দে দোহা দিয়া উঠে। “যেন  
মনে হয়, দ্বন্দ্বের মধ্যে কোথায় কোন্ মীতলপর্শে  
আমাদের জীবন-তরীটা বহিয়া চলিয়াছে— তাহার  
প্রতি স্পন্দনটা যেন ছন্দের তালে তালে হুকের মধ্যে  
নাচিয়া উঠে, অতুচ্চ কাণ্ডারীর মোহন স্পর্শ যেন  
জীবনের গভীর মধ্যে স্পর্শ হইয়া উঠে। অনেক দেশ  
এমনও ঘটে যেখানে কোনও ব্যাক্যার্থ বুঝিয়া পাওয়া যায়  
না, অথবা যেন একটা অস্পষ্ট বেননা একটা অহতুতির  
ছায়াবহুল মন্থ স্পন্দনে চিত্তকে একটা অনির্গুণনীয়  
স্পর্শে বেননাবিধ্বল করিয়া দেয়।

“গগনে গরজে মেঘ যন বরষা,  
ফুলে একা বসে আছি, নাহি তরসা।  
রাশি রাশি ভায়া ভায়া ধান কাটা হল যারা,

ভরা নদী কুরধারা ধর-পরশা;  
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।”

অথবা যেমন Swinburne-এর—

“Their glowing ghosts of flowers  
Draw down, draw nigh;

And wings of swift spent hours  
Take flight and fly;  
She sees by formless glimpse  
She hears across cold streams  
Dead mouths of many dreams  
That sigh and sigh.”

কবিতার কোনও স্পষ্ট অর্থ নাই। অথচ  
শব্দের বিধ-প্রতিবিধের ~ধারা যেন একটা অস্পষ্ট  
ছায়া চিত্রে ভাসিয়া উঠে।

অর্থের মধ্যে ব্যাক্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ দ্বারা আর-একটা  
জোতনাম্বক বা ব্যঙ্গার্থ অর্থের কথা (বাহ্যকে  
ইংরাজিঃ Suggestion বলে) অবিকাশে সমালোচকই  
বীকার করিয়াছেন এবং এই জোতনাম্বক ব্যাপ্যের  
ফলে একদিকে যেমন মন আনন্দরসে বিহ্বল  
হইয়া উঠে অপরদিকে তেমনি হয়ত একটা কোনও  
বিশেষ তাৎপর্য্য কোনও গভীর সত্য বা কোনও গভীর  
অন্তত্ব বোঝা উঠে। অনেকের এই জোতনার মধ্যে  
যে-রসটি স্পষ্ট পায় তাহাকে কবির প্রাণ বলিয়াছেন।

কিন্তু এই রসের পশ্চাতে চিত্তহীনতে ব্যাপ্ত করিয়া  
সিদ্ধান্তবৃত্তের জায় যে একটা ভাবভূমি বা attitude  
আত্মপ্রকাশ করে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহার স্থান বড় কম  
নহে। এই ভাবভূমিই যেন স্থানে স্থানে আপনাকে  
বিদ্রুত করিয়া রসনিব্বরণে পরিণত হইয়া উঠে।  
অনেক সময় এমন ঘটে যে, কোনও রস বা বস্তু স্পষ্ট  
হইয়া ভাসিয়া উঠে না, শুধু চিত্তের কতকটা স্থান যেন  
কবিতার ছায়ায় বিদ্রুত, সুন্দর হইয়া উঠে। সেই  
বেদনকে রস বলা যায় কিনা জানি না, তাহা অস্পষ্ট  
অথচ অহতুতীতে লালগরন।

তরুলগাণ্ডয় শম্পরাঙ্গি নদী সমুদ্র তুধরের  
রূপচরিতে মন্যপবনের মৃদু স্পর্শে পুষ্পাঙ্কে কিংবা  
আগুন মনের নিভৃত আলোকিত করির জ্ঞানশব্দী চিত্ত-  
বৃত্তি যখন তলাইয়া যায় তখন প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষরিত  
অস্পষ্ট প্রতিভাসে অজ্ঞাততত্ত্ব সংহারের নিবিড়  
অন্ধগুর পথান্ত যে একটা স্পন্দনধারা কবিগুরুদের

সমগ্র সত্ত্বকে বিকল্পিত করিয়া তুলে তাহারই ফলে  
কবির চিত্তে যে একটা বিচিত্র ও বিশিষ্ট ভাবভূমি  
প্রতিফলিত হইয়া উঠে কবিপ্রতিভার বলে এই ভাবভূমি  
বিচিত্র শব্দার্থের বিভাসে সৃষ্টিতে রূপকলার সৃষ্টি করে।  
প্রমুগ্ন শব্দের অর্থ অপমত্ত বা লুপ্ত। তত্ত্ব শব্দের অর্থ  
সেই সেই বস্তু। প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষরিত বলিতে সেই বৃত্তিকে  
বুঝায় যেখানে স্বরগ আছে অথচ কি স্বরগ হইল তাহার  
বোধ নাই। কবি যখন তাহার বাতায়ন দিয়া উদার  
বিরাট মাঠের দিকে তাকাইয়া থাকেন তখন যদি আরও  
যে-সকল মাঠ তিনি পূর্বে দেখিয়াছেন তাহা তাহার  
মনে পড়ে, তবে তাহাকে স্বরগ বলা যায়। কিন্তু যখন  
কোনও পরিচিত মাঠের কথা মনে পড়ে না অথচ  
পূর্ণাহতুত একটা অতুলনীয় প্রপঞ্চতা মনে মনে ভাসিয়া  
উঠে তখন তাহাকে বলা যায় প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষরিত।  
এই প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষরিত পশ্চাতে থাকে সংহার। সংহার  
চিত্তের উপরে ভাসিয়া উঠে না, সে থাকে এক-  
পদ্বা নীচে। এই সংহারের মধ্যে ঐ রকম মাঠ  
দেখিয়া নানা বিচিত্র অবস্থায় নানা বিচিত্র ব্যবহার  
সুন্দর-সঙ্গে জোতনাম্বকে নদীর তীরে নানা ভাবে  
পূর্ণ হইয়া কিছু আনন্দ অহত্ব বহুইয়াছিল, তাহা  
স্মৃতি হইয়া একটা পিণ্ডীভূত হইয়া স্মৃতির ভূমিকে  
অব্যক্তভাবে রসভরিত করিয়া তুলে। এই  
প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষরিত ও সংহারের যৌথ নাম ‘বাসনা’।  
অর্থ বলিতে শুধু ব্যাক্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ বুঝায় না,  
তাহাতে একদিকের বুঝায় তাৎপর্য্য অপরদিকের বুঝায়  
জোতনাম্ব বা ইঙ্গিত-বাহ্য বস্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমুগ্ন-তত্ত্বাক্ষ-  
রিত ও সংহারের সহযোগে যে বাসনা-ক্ষেত্রটি সৃষ্টি  
হইয়া উঠে ও তাহার আত্মপ্রকাশে যে রসনিব্বৃত্তি  
হইতে থাকে তাহাকেও বুঝায়। কবির মনের ছবি  
যখন তাহার ভাবভূমির স্পন্দনের সাহায্যে নানা শব্দের  
ও অর্থের বিচিত্র বিভাসে স্ফুটিত হইয়া জোতনার  
ইঙ্গিতদ্বারা দিয়া তাহার বৃত্তিভূমিকে মণ্ডিত করিয়া তাহার  
অন্তর্নিবিষ্ট ভাবভূমিতে প্রাণি-হইয়া তাহার দ্বন্দ্বকে  
জোতনার ও রসে বিভাজিত ও মনোহর করিয়া তুলে তখনই



তাহার স্বভাবের অস্বাভূতিক হয় এবং তাহার মন-প্রাণ বলে সিক্ত হয়। এই যে কবির মনোভাব, মনের স্পন্দ, ছন্দের গভীর অস্বাভূতিক, দরদ, ছবি বাহা তাহার একান্ত আশ্রয়, একান্ত ব্যক্তিগত, বাহা ভাবের ব্যাক্যার্থের দ্বারা একান্ত অপ্রকাশ্য ও অনির্লভ্য, তাহাকে যে তিনি চিরন্তন কালের সন্ধান-সন্ধানের দ্বারা তুলিতে পারেন, এই যে একান্ত ব্যক্তিগতক সন্ধান সাধারণের গোচরীভূত করার ব্যাপার ইহাকেই বলে সাধারণীকৃত বা Universalisation of Art। যে বিশিষ্ট শব্দ ও অর্থবিভাগের কৌশলে এইটা সম্পন্ন করা যায় তাহার মূল্যবৃত্ত কারণকে বলা যায় প্রতিক্রিয়া।

বিশ্বনাথ রসায়ক বাক্যকে কাব্য বলিয়াছেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুণও ইহাতে আরম্ভ করিয়া রসই কাব্যের প্রাণ এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। আদিত্যে। ইহাও ইহাও রসকে সময় emotion বলা হয়। রস কাহাকে বলে তাহার বিশেষ পর্যালোচনা এ প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু ইহা সত্যকেই বুঝা যাইবে যে, আনন্দ বা সুখ মাত্রই রস নহে, কিংবা ভর প্রকৃতি কারণ উপর emotion মাত্রই রস নয়। কেহ পুত্রপোষক কীর্তিতে দেখিয়া যদি কৈশব বলে যে, কেহ কল্লর রসের উদ্রেক হয়, বা কেহ ভীত হইলে যদি কৈশব বলে উহার ভাবনাক রসের উদ্রেক হয়। তাহা হইলে হাজাপদ ইহা উচিত হয়। জৈব প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া যে emotion উপর emotion মাত্রই রস নয়। কেহ self-preservation বা race-preservation প্রকৃতি জৈব ব্যাপারের ইষ্টান্ধিত সংঘটন বা সন্তানবায় যে ভাব বা emotion উদ্ভিত হয় তাহাকে রস বলা যায় না। যদি একজনকে বলা যায় যে, আপনার পুত্র সর্পাঘাতে মরিয়াছে তাহা হইলে তাহার মনে যে শোক উপস্থিত হয় তাহা শব্দার্থের দ্বারা সাপাততঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাকে রস বলা যায় না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, পুরোচকে যে গুণ উৎপন্ন হয় তাহা একান্ত ভাবে জৈব প্রয়োজনের দ্বিতীয় ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, আপনার পুত্র মরিয়াছে। এই ব্যাক্যটির স্বভাব দ্বয়ের কোনও গভীর অনির্লভ্যতা

অস্বাভূতিক প্রকাশ করে না। মনের Logical faculty বা উদাহরণস্বরূপ দ্বারা যেটাকে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের সকল সময় ভাষায় প্রকাশ করি এবং সেই প্রকাশের দ্বারা চিন্তার আশ্রয়-প্রদান হয় কিন্তু সাহিত্যের অতিব্যক্তি হয় না। কবি বলিয়াছেন, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এইখানে হইতেই সাহিত্যের আরম্ভ, কিন্তু বৃষ্টি পড়িতেছে বা এই বৃষ্টির পাতা নড়িতেছে ইহাতে সাহিত্যের স্রষ্ট হইয়াছে ইহা বলা যায় না। ইহার কারণ কেবলমাত্র একটিই হল আছে অপরটি নাই, তাহাই নাই। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এই ব্যাক্যটি, শব্দের বিভাগে ও ছন্দে, বৃষ্টির সময়ের প্রাকৃতিক ব্যাপারের একটি অস্বাভূতিক বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে অস্বাভূতিকি হল পড়া ও পাতা নড়া অপেক্ষা অনেক অধিক। শুধু প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনাকে সাহিত্য-স্রষ্টী এইজন্যই বলা যায় না যে, সেখানে কোনও অপ্রকাশ্য গভীর অস্বাভূতিক প্রকাশ করা হইল না। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এখানে যে অস্বাভূতিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনও ভাবের গভীরতা নাই, কোনও দূর বাস্তবতা নাই। সেজন্য ইহা—কোনও শব্দ মাত্র বলিতে পারি না। শুধু ছন্দের সাহায্যে, শব্দের বিভাগে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের একটি অতি ক্ষুদ্র অস্বাভূতিক প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সেটা যদি কেবলমাত্র পাতা নড়া এবং জল পড়া হইত তাহা হইলে এখানে সাহিত্যের ঘটনাও পাওয়া যাইত না। শব্দের বিভাগে, রচনার বিভাগে, ছন্দে, স্বরূপে, ছবিতে, তাৎপর্যে, ইঙ্গিতে, সাধারণীকরণে, অস্বাভূতিক, রসের উদ্ভব, বাহা বস্তু 'জৈব সন্তোষ-ভূমি' হইয়া উঠে তাহাকে সেই পরমাণুই সাহিত্যের উদ্ভূত স্রষ্টী হইল বলিয়া বলা যায় না। সাহিত্যের মধ্যে যদি প্রকাশের কোনও বিশেষ কৌশল বা স্রষ্টী-উপযোগ থাকে তবে তাহা কেবলমাত্র Logical judgment বা প্রতিজ্ঞার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই ক্ষুণ্ণতা লাল, কি এই ক্ষুণ্ণতা লাল নয়, কি সঙ্গল মায়ের মত, বাস মায়ের, অতএব রাস মনকে—এখানে Logical judgment-এর

দ্বারা একটি বর্ণ বা অর্থ-পরম্পরা প্রকাশিত হইয়াছে, অতঃ সাহিত্য হয় না। তাহা প্রয়োজনের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের কৌশল আছে, কিন্তু সেটা Logical art বা উদাহরণের কৌশল, সাহিত্যের কৌশল নহে। একটি না একটি পরিমুখ যদি ছন্দপ্রকাশ্য অন্তরের দরদ বা অস্বাভূতিক প্রকাশ না করা যায় তবে সেটা সাহিত্য হয় না।

অন্তরের ভাববৃত্তির অস্বাভূতিক সাধারণ ব্যাকার বিভাগে প্রকাশ করা যায় না। সেই প্রকাশে বস্তু কৌশলের প্রয়োজন। সেই কৌশলটি কাব্যের কৌশল। কৌশলী বিভাগে কৌশলের শোক দেখিয়া কবিত্বের দরদটুকু রামায়ণের মোক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দরদের ভাববৃত্তি যদি হৃদয় না হইত তবে কেবলমাত্র রামায়ণের গল্পটি কাব্য হইত না। শব্দার্থের বিভাগে কোনও ঘটনার বর্ণনা করা যায়, এবং সেই ঘটনা-তিনিয়া জৈব প্রয়োজনের দ্বারা অস্বাভূতিক হৃদয় উৎপত্তির উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই হৃদয় ও হৃদয়ের উৎপত্তির জ্ঞান সেই ঘটনার বর্ণনাটিকে কাব্য বলা চলে না। সেইজন্য যদি কোনও কুসঙ্গ বর্ণনা তিনিয়া কাব্যের মনে স্থাপিত ভাবের উপর হইয়া তাহার মনে ইঙ্গিতস্বরের আশ্রয় জাগিয়া উঠে তবে তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না। কেবলমাত্র শব্দার্থের বিভিন্ন বিভাগের কৌশলে যেখানে কোনও non-logical অস্বাভূতিক দরদ ফুটিয়া উঠে শব্দার্থ-সম্বন্ধেই সেই জাতীয় কৌশলকেই সাহিত্য বলে।

রস না হইলে সাহিত্য হয় না, এবং রসই সাহিত্য-স্রষ্টী একমাত্র মাপকাঠি এই মজাট বোক-সমাজে একজন নিখিঁরোমে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। রস অর্থে যদি কেবলমাত্র আনন্দ বা আশ্রয় বুঝা এবং তাহা ছাড়া যদি সাহিত্যের অন্য কোনও মাপকাঠি না থাকে তবে রসের 'বৈশিষ্ট্য-কমের উপরেই বা রসবোধের প্রকৃতির বিশেষ বা অস্পষ্টতা নিবন্ধনেই কাব্যের ভাব-মনের পরিচয়। কারণ, রস যদি কেবল emotion বা ভাবমাত্র হয় তবে তাহার মধ্যে অন্য

কোনরূপ অধিরের কারণ আসিতে পারে না। একটি স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের তারতম্য কেবলমাত্র বাহ্যিক বা নানতার উপরই নির্ভর করে। কারণ, স্বরের মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাগ চলে না। শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলেই সেই উচ্চনিচ বিভাগের কোনও স্বর কারণ নির্দেশ করিতে হয়। একটি স্বরের সহিত অন্য স্বরের কেবলমাত্র কম বেশী বা গণ্যসাম্য দীর্ঘতাঘরের পার্থক্য মাত্রই স্বীকার করা যায়, একটি স্বরের সহিত অন্য স্বরের কোন শ্রেণীগত উচ্চনিচতা নাই। অন্য স্বরের মধ্যে এই শ্রেণীগত উচ্চনিচতার পার্থক্য এতই অস্বাভূতিক যে, দুইটা বিভিন্ন শ্রেণীর স্বরের মধ্যে অনেক সময়েই বেশী কমের তারতম্য নির্ণয় করা যায় না। দার্শনিক চিন্তার আনন্দ এবং তাসবেলার আনন্দ এতই বিভিন্ন জাতীয় যে, ইহাদের মধ্যে বেশী-কমের তুলনা করা চলে না। ইহা সত্য যে, এই দুই জাতীয় আনন্দই আমাদের চিন্তের বিভিন্ন তরীকে বিভিন্নরূপে আকর্ষণ করে এবং যে দিকটা যখন অস্বাভূতিক হয় আমরা সেই দিকেই আমাদের ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দার্শনিক চিন্তার আনন্দ বা সন্ধান-সন্ধানের আনন্দ তাসবেলা বা নিমজ্ঞ খাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর।

ইংরাজি ethics and hedonism (স্বধর্ম-এর আলোচনা) গ্রীক Cyrenaics ইহাতে আরম্ভ করিয়া Mill-এর হিতবাদ পর্যন্ত স্বধর্মবাদের খেপ-বিশিষ্ট দেখা যায় তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল স্বরের অস্বাভূতিক দ্বারা স্বরকেও পাওয়া যায় না। স্বরের মধ্যে স্বরের শ্রেণীগত বিভাগ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এবং এই শ্রেণীবিভাগ নির্ণয়ে বাহাদের উদ্ভব স্বরেরই জ্ঞান আছে তাহাদের বাক্যই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এতাকে ভাল-ভালার সঙ্গে-সঙ্গে না গ্রহণ হয় যে, সেই ভাল-ভালার দিক-সিঁ দি। সকল স্বধর্মবোধের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই স্বধর্মটি উদ্ভবের না নীচুদের তার একটি অস্পষ্ট বোধ থাকে, তুলনাকরিতে গেলেই তাহা অস্পষ্ট হইয়া উঠে। সাহিত্য



রসের মধ্যেও আনন্দ-রসের একটা উৎকর্ষাপকর্ষের বোধ আছে। একটা হাসির কবিতা পড়িয়া আমরা যখন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ি, আর রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বা 'মহা' পড়িয়া যখন অন্তরকে মিষ্ট করিয়া তুলি, রসের পরিণতির দিক্ দিয়া প্রচুরতার বিচার করিতে গেলে হাসির কবিতাতেই রসের আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অন্তরের মিষ্টতা ও পরিভ্রমের দিক্ দিয়া দেখিলে 'গীতাঞ্জলি' বা 'মহা'র কবিতার সহিত তাহার কোনও তুলনা হয় না। বাক্যবিভাগে, ছবি, ছন্দ, স্বর্যার, অর্থের তাৎপর্য্য স্রোতনার দিক্ দিয়া একটা কবিতার কাব্যরসের সহিত অন্য একটা কবিতার কাব্যরসের অনেক বৈধম্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন্ কবিতার রসিত হ্রস্বের কোন গুণার নিজস্ব হইতে খরিয় পড়িল, তাহার উপরে সেই রসের উচ্চতা বা নীচতা অন্ততঃ ধানিকটা নির্ভর করে; অর্থাৎ যে জাতীয় ভাবকে আমরা বড় বলি, উঁচু বলি, সেগুলিকে আমরা সমস্ত প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, যখন সেই ভাবগুলি রসজিহ্ন হইয়া শব্দার্থের সাহিত্যে অহরণনে, ধ্বনিত, স্রোতনার আমাদের চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া তুলে, তখন তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ না বলিয়া থাকিতে পারি না। নিছক্ কায়িক আকর্ষণ স্রাসারে আছে এবং তাহার বর্ণনাতেও হয়ত কোন জাতীয় রস কোনও কৌশলী শিল্পী সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু সে জাতীয় রস কবিতার সহিত 'মহা'র 'পথবর্তী' কবিতার আত্মহারা প্রেমের কোনও তুলনা হয় না —

"দূর মন্দিরে সিদ্ধকিনারে

পথে চলিয়াছ তুমি,

আমি তবু মোর ছায়া দিয়ে তারে

মৃত্তিকা তার চুমি।

হে সৌধামা, তব সাধনার

অংশ কিছু বা রহিল আমার,

পথপাশে আমি তব বাতায়

রহিব সাক্ষীরূপে।

তোমার পূজায় মোর কিছু যায়

কিসের গন্ধ-ধূপে ॥

তব আত্মানে বরণ করিয়া

নিষেধি হৃদ্যমে।

ক্রান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া

মোর অঙ্গল ঘিরে।

যা ছিল কষ্টের, যাহা নিষ্ঠুর,

তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,

যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর

আমি তারি মাঝে-থেকে।

দিখ পথ তারে শ্রাম অক্ষরে

জানার চিহ্ন একে ॥

বেলা চলে যাবে, একদা যখন

ছুরাবে বাতায় তব

শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন

হেথাই দাঁড়াবে রস।

এই পথখানি হবে মোর প্রিয়,

এই হবে মোর চির বরণীয়,

তোমারি দ্বন্দ্বের র'ব স্মরণীয়,

না মানির পরাভব।

তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে

যা-কিছু আমার সব।"

রস-বিচারের সহিত, ভাল-নাগার বিচারের সহিত,

এই যে আর-একটি অবাস্তব ভাল-মনর ইঙ্গিত আসিয়া

ভাল-নাগা মন-নাগার মধ্যে একটা জাতি-বিভাগ

আনিয়া দেয় ইহার কারণ কি, সে বিচার এ-প্রকারে

আমি করিব না; কিন্তু ইহা যে অস্বীকার করা যায় না

সেইটুকুর দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই যে, অর্থবোধ (Value-sense) ইহা একেবারে

চিত্তমন ভাবে অস্বীকারী না হইলেও মোটামুটিভাবে ইহার বাণী একরূপ অস্বীকৃতিই থাকে। মানবদলের ও মানব-স্বভাবের গভীর পরিবর্তন না হইলে এই অস্বীকৃতির বড় একটা পরিবর্তন হয় না। সকল রসাস্বাদের পিছনে সর্বদা সাক্ষীরূপে থাকিয়া সেই রসের চরিত্রস্বপ্নকে "Thus far and no further" এই মধ্যপন্থর কবি টানিয়া দেয়।

মাধবের মধে উচ্ছ্রীচের এই যে একটা শাব্যত বোধ (Value-sense) রহিয়াছে, ইহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়, কি মাধবের অজ্ঞাত রুচির সহিত ইহার সম্পর্ক কি, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির বা দেশ, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহার পরিবর্তন হয় কি না এ সমস্ত আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনও বর্ধ বা নীতি-প্রচার নয়, সেইজন্য রসের এই অর্থবোধ (Value-sense) বোধের কথাই কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে নীতি প্রচারের বা সেই প্রচেষ্টার মধ্যে সাহিত্য-রসের উচ্ছ্রীচের পরিচয়।

রূপরসবির বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, রাগ, ঘে, প্রীতি, অপ্রীতি, মত, প্রবৃত্তি, গুতি, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া যে অখণ্ড অস্বীকৃতিপূর্ণতা গড়িয়া উঠেন তাহারই রসবস্তুর আত্ম-প্রকাশ সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণে যেমন শব্দ ও অর্থের সাহিত্য প্রয়োজন তেমনি তাহার উপাদান কারণ হইতেছে মাধবের আভ্যন্তরীণ জীবনে জৈব অজৈব সর্ববিধ উপলব্ধির (Experience) অর্থও সাহিত্য বা মন্থিনে নির্ণীত অস্বীকৃতিপূর্ণতা (Personality)। যখন কোনও একটা বড়-উপলব্ধি এই সমগ্র অস্বীকৃতি-পূর্ণতাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়া সেই সমগ্রের রূপরূপায়ে রূপাণিত হইয়া ভাষার আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহা সাহিত্য হয়। এই অস্বীকৃতিপূর্ণতা কেবলমাত্র বুদ্ধি-পুরুষের (Conscious-person) নাপালের বাহিরে। সেইজন্য শুধু বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা কোনও

জিনিস বুঝাইলে তাহাকে সাহিত্য বলে না। অস্বীকৃতি-পূর্ণতার যে ছায়া, বেদনা, বেগ বুদ্ধি-পুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাহাই প্রাধান্যে সেই অস্বীকৃতিপূর্ণতার অজ্ঞাত শক্তিতে যখন বদ্যার্থের মধ্যে বিদ্যত হয় তখনই সেটা হয় সাহিত্য। এখানে বুদ্ধি-পূর্ণতা যন্ত্রমাত্র, অস্বীকৃতিপূর্ণতাই যন্ত্রী —

"একি কৌতুক নিত্য নুতন,

গুণা কোতুকময়ী,

আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই

বলিতে দিতেছ কই?

অন্তরমাঝে বসি' অহরহ

নুথ হ'তে তুমি ভাবা কাড়ি' লুথ,

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায় আপন হুরে।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,

তুমি যা বলাও আমি বলি তাই

সঙ্গীত-স্রোতে কুল নাহি পাই—

কোথা ভেসে যাই দূরে।

এবে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,

এবে লাগিয়া কোথা হ'তে ফুটে,

এবে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে

অন্তর-বিদারণ।

নুতন ছন্দ অন্দের প্রায়

ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,

নুতন বেদনা বেজে উঠে তার

নুতন রাগিণী-ভরে।"

এই অস্বীকৃতিপূর্ণতায় স্বরূপ ভাষার বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু কবি যদি অন্তরের অন্তঃপুরের মধ্যে হাত বাড়ান তবে এই অল্পরূপতমের স্পর্শ অহুভব করিতে পারেন। স্রুৎ-দ্রুৎ, ইচ্ছা, ঘে, প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ নাপালের বাহিরে। সেইজন্য শুধু বুদ্ধির দ্বারা অর্থবোধ (Value-sense) ইহার উপাদান।



সেইজন্য এই অমূল্য-পুস্তকের প্রজ্ঞাপক অভিযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে এই বোধটা ছায়াশোকে আপনাকে প্রকাশ করে। আশ্রয়-উপাদানের সাহিত্যে পরিপূর্ণ একটা অমূল্য-পুস্তক যখন কোনও উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার চলে সেই উপলব্ধিটার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া অপর একটা অমূল্য-পুস্তকের নিকট আপনাকে প্রকাশ করে, তখন এই উভয়ের পরিচয়ে যে আনন্দরস উজ্জ্বল হয় তাই তাহাই সাহিত্যরস। সেজন্য কবির কাব্যে তাহার অমূল্য-পুস্তকের নানা উপাদান যে বিচিত্র ভাবে মিশ্রিত হয় তাহাকে পাঠকের অমূল্য-পুস্তকটার মধ্যেও সেই জাতীয় ভাব, সজীবিত হয়। এই হিসাবে সাহিত্য একদিকে যেমন শব্দ ও অর্থের ভাষণা অপর দিকে তেমনি আশ্রয়-উপাদানের সাহিত্য স্বরূপ অমূল্য-পুস্তকের আত্মপ্রকাশ ও অমূল্য-পুস্তকের সহিত আত্ম-পরিচয়। সাহিত্যের দ্বারা দুইটা অমূল্য-পুস্তকের পরিচয়ে আনন্দ-রসের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাই বলিয়া আনন্দ-রসকেই সাহিত্যের স্বরূপ বলা যায় না; ইহা কেবল মাত্র সাহিত্যের 'অব্যক্তিদ্বারা উৎকলণ' অর্থাৎ

সাহিত্যের সৃষ্টি মাত্রের রসের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ তাহা নহে। সাহিত্যের স্বরূপ অমূল্য-পুস্তকের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। সেইজন্য এই আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যে রসের জাতিগত বৈচিত্র্য ও আত্মপ্রকাশ বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয় ও তজ্জনিত, রসের নানাবিধ তারতম্য অমূল্য হয়। রসের বেশী-কমের দ্বারা সাহিত্যের প্রভেদ তেমন দেখা যায় না যেমন দেখা যায় রসের বৈচিত্র্যে। বিভিন্ন কবীরসের সহিত অমূল্য-পুস্তকের বিভিন্ন স্বভাব বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। অমূল্য-পুস্তকের বিভিন্ন রকম আত্মপ্রকাশ ও পরিচয় সম্পাদন করে। বাহিরের দিক দিয়া শব্দার্থের সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াছি, অন্তরের দিক দিয়া তেমনি সাহিত্য বলিতে কবি ও স্রষ্টার সম্মিলনকেই সাহিত্য বলিতে হয়।

“অপূর্ণ বস্তু প্রথমে বিনা কারণ-কলাং

জগদুভয়প্রাথমিক নিরুপলব্ধং সারথি চ।

ক্রমাৎ প্রথোপাখ্যা-প্রসন্ন-সুভগং ভাসর্যতি তং

সরসভাসর্য কবিসদৃশপ্রাথমিক বিষয়তাং।”

(অভিনব গুপ্ত)

“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য; কাব্যের গোণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষণ, চিত্তগতি-জ্ঞান। কবিতা জগতের শিক্ষাব্যাপ্তি, কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহার শিক্ষা দেন না। কবিতা মনুষ্যের শিক্ষা দেন না। তাহার সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ স্বজনের দ্বারা জগতের চিত্তগতি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মূল্য উদ্দেশ্য।”

— বঙ্কিমচন্দ্র

## অভিমান

শ্রীআশালতা দেবী

যথেষ্ট, তবুও ভয় তাঁর একেবারে গুলু না। ভয়টা একেবারে নিশ্চিন্ত ক'রে ঘোচাতে এখন তিনি যা নিয়ে লেগেছেন, সেটা কিরণের বিয়ে। অবশ্য বিয়ে করতে কিরণের তেমন ঘোরালা আপত্তি কিছুই ছিল না। তবু বিয়ে না-করাটা, আশ্বত্থের আমোজের মত, শীতকালে লেগের ভাজের মত এমন আরামের সঙ্গে গুর মজাগত হ'য়ে গাড়িয়েছে যে, এই অভ্যাসটাকে ভাজতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। গুর সন্ধ্যার চেয়ে বড় খেয়াল এই যে, বিয়ে করার উপায় রয়েছে, যখন খুসী করতে পারি অথচ এখনো চুকিয়ে দিয়ে ক'রে ফেলিনি— এটার ভিতরে একটা ঠং উত্তেজক আনন্দ রয়েছে। যেমন ডুরারে একটা গুর বাসের চিঠি রয়েছে, তা যখন খুসী বের ক'রে পড়তে পারি অথচ কবর-কবর ক'রে বার করা হ'য়ে উঠছে না, কেউহলটা উত্তরোত্তর জমা হ'তে থাকল। এ আপত্তি তত জোরালো আপত্তি না। ও যদি বলত, আমি রামকৃষ্ণ নিশনে ভক্তি হ'ব, খবর প'রে সিঁড়িমাশু প্লাট দিয়ে জেলে বাব— তাহ'লে অবিচ্ছিন্ন গুর মায়ের অশ্রুধারা করার মার্কতা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েরা করণরসের বজা। তারা প্রস্তুত হ'য়েই আছে, একটা স্ত্রীবাগ পেলেই আশ্বত্থের খ'রে পড়বে। অতএব কিরণের এই সৌখিন আপত্তিও গুর মায়ের কাছে পাহাড়ের মত ঠেঁকল এবং তাতে ঠেঁকে গুর মনের অনেকখানি করণ মেঘ যখন-তখন এক পল্লবী বর্ষণ করতে শুরু করল। এখন সতীকল নিকটে গেলে তিনি যা বলবেন— তার মোট কথাটা এই যে— আপাততঃ একটা স্ত্রীকল মেয়ের সন্ধান তাঁর হাতে আছে। ‘আজ তাকে দেখতে যাবার কথা, কিন্তু কিরণ যেতে চাইছে না কিছুতেই। সতী যদি কিরণকে কোনো মতে রাখী করিয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে পারে—কল্যাণেশ্বর সঙ্গে কথা হচ্ছে— না

‘সতীশ, তোমার মত বন্ধ আর কিরণের কে আছে বলে! তুমি কি গুর ভায়ের মত হ'য়ে এই কাছটুকু ক'রে দেবে না?’

ভবানীপুর অঞ্চলের একটা ছোট স্ত্রীকল বাড়ীর একতলায় ব'লে নীরদাম্বরী একটা খাস ফেলে প্রলম্বলীপের পর ক'রে গেলেন।

চৈত্রমাসের বিকেলবেলা। সামনে কলের খুড়ি রয়েছে, পাথরের বাটিতে ক'রে তিনি বেগের সরবৎ তৈরী করছেন। আপেলের গুচ্ছ-ভিজাইন-করা বড় কাঁচের পেটে স্ত্রীকল বরফ সংযুক্ত দলিত খড় জা। এ তাঁর ছেলের বৈকালী। এখনো সে কলেজ থেকে লেখচার দিয়ে করেনি। ইতিমধ্যে আপন অন্তরের একটা গোপন অভিলাষ সতীশের কাছে টাকে এতগুলি প্রদ্র করিয়ে ছাড়ল। কলের খোলা ছাড়াতে ব্যস্ত গুর আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে সতীশ বললে, “বেশ তো, মাসীমা! আপনাকে এত ক'রে বলতে হবে কেন? আমার বা মাথা নিশ্চয়ই করব।”

আপেকার কথাটা হয়ত শোনা দরকার। কিন্তু গুর সাধারণ কথা। যা নিরানন্দই পাসে-কি ফেলে আনন্দকাল ঘটে থাকে। আজকালিকার ছেলেরা যে বলামাজই বিয়ে করতে চায় না, তা কে না জানে? কিরণের বেলান্তেও তাই হয়েছিল। কিরণের কোনো অভাব নেই। তার পৈতৃক বাড়ী এবং ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা রয়েছে। তার উপরে সে একটা ভাল কলেজে লেখচারার হ'য়ে ঢুকছে। মনে একটা উচ্চ আশা ছিল, বিশেষত থেকে একটা ‘ভাগমত ডিগ্রী আনবে। কিন্তু বাড়ীতে বিধবা মা সে খবর শুনে একান্ত করণ রসের যে-কর্ণা ছোটাসেনে তাকে বিপর্যস্ত করছে সেই



পেনে কি লজ্জার কথা! মেয়েটির রূপ আছে, একবার চারি চক্ষুর মিলন হ'লেই বোধ হয় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সতীশ এসেছিল কিরণের কাছে একখানা বই ধার নিতে। কিরণ বাংলা বই কিনে থাকে এবং তার চেয়েও যা বেশি কথা, বাংলা বই পড়ে। সতীশ একটু আগে এসে পড়েছে, কিরণের কলেজ থেকে আসার সময় প্রায় হ'য়ে এসেছে, কিন্তু এখনো আসেনি। মাঝখানে নীরদাম্বরীর এলাকায় আটক পড়ে এই সমুদ্র বিপদ। বা' হোক ঠিক খুব ভরসা দেওয়ার গোছের একটা কথা বলে সতীশ চট করে সঁরে পড়ল। কিরণের ঘরে চুক পাখাটা খুলে দিল।

আম কতী খানেক পরে, কিরণের সঙ্গে ব'সে সরবত চুক রিতে রিতে প্রতিশ্রুতি সতীশের মনে পড়ল। ব'লুলে, 'চলি না দেখে আসা যাক। বাংলা-কবিতা' বলে সেখান থেকে ব'সে পানের বদলে, তাই কি না একটা পান খেয়ে কেবার চাইতেও সোজা।' কিরণের কুঁচেরি আসছিল। তবুও উঠে সাজসাজ করে বেরল। একজন যদি ওকে কিছু বলে, পারত-পক্ষে সেটা না-শোনে ওর পক্ষে অসম্ভব—চক্ষুসম্মা নাশে একটা ছোট উপসর্গ ব'সে মুলে রয়েছে।

কিরণ পাখাটা পথ একটা নতুন পড়। বইএর কথা উত্তেজিত হ'য়ে আলোচনা করত করত এসেছে। সে যে ক'নে দেখতে যাচ্ছে, এমন কথা তার মনেও ছিল না; 'যেন দারে পড়ে একটা বাজে কিন্তু দেখতে বড় মশা লেগেছিল বলে ভালো দেখে একটা শখারি কিনতে বেরিয়েছে। কোনো অশরিতিকাকে ছ'চোখ মেলে দেখব, এবং হয়ত তাকে সম্ভাবিতা পরিচিতার পর্বে চেয়েও বেশি পদমর্যাদা। একদিন দেবে এটা মনে হওয়ার যে-উত্তেজনা, যে-বক্ষণশক্তির দুঃস্বপ্ন ভাব, তা কিরণের মনের অঙ্গিগলি খুঁজলেও পাওয়া যেত না। সব সোকাটাই বা কিরণের আলো স্বভাবের যা ওর শিখিল অমনোযোগিতার উপরে ক'রে দিই? বাংলা দেশের ক'নে দেখা কথাটাই এখন শাক, মাছ, আদার মতো মত হয়ে পড়েছে। নেন

এই কথাটা মনে হওয়া মাত্রই কারও মনে জোয়ার উঠবে না।

একবারে শ্রামবাজারে, বাড়ীটার দোর-পোড়ারি এসে পড়ে কিরণের চমক ভাঙল, তাইত কি বিস্তী ব্যাপারের মধ্যে দিয়েই না তাকে এখন যেতে হ'বে। বাবু, পালা-ক্রমে সমস্ত বস্ত্র ঠিকঠাক হ'ল এবং পঞ্চমায়ের শেষ মুহুর্তে পানের রূপার ডিবে হাতে ক'রে আখিভাব হ'লেন মায়াদেবী। কিরণ ভাবল, কি সম্ভ্রতিজ্ঞানের অভাব! আচ্ছা বাবা যাক মেয়েটা কিছু একটা উলঙ্গক্যের আড়ালে আসবেই। আমাকে দেখবে, ভাল ক'রে ছ'চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখবে, এক বড় শাদা সতীশ মনে মনে বড় বেশি ক'রে জানুলেও মুগ্ধ স্বীকার করতে বাধে। তাই আমি এগুণ তোমাকে দেখতে নয়, না হয় পান-ই দিতে। কিন্তু একটা ভাল সিগারেট কেনে ক'রে পানের বদলে, তাই কি সিগারেট তো গোচরিতকর আনতে পারতে। এটা কি এরা জানে না যে, এ যুগে পান খেতে ক'টা ছেলেই বা পছন্দ করে?

মেয়েটি সত্যিই মল্লারী। কিন্তু কিরণের তা মনে হ'ল না, ওর রুচি পুঁত পুঁত করত লাগল এ মায়ার এমন কি! ওর মনে অবিস্মরণ নদীর প্রোত্তের মত নারী-রূপের যে একটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল প্রবাহমান আদর্শ ছিল তাকে একসঙ্গে খামিয়ে দিয়ে, একটা ভাবী বাধার মত স্রোতের মধ্যে বেশ ক'রে বাধে বাধবে,—এত রূপ কি এ মেয়েটির কাছে? গালের পাশে আর-একটা ছিটা হ'লে নেন ভাল হ'ত। টোটাটা বড় বেশি পাতলা। গালের রঙ, গোলাপী বটে, কিন্তু মাঝেটা নয়, হয়ত আরও কিছু আদুর এবং বেদানার রস ঝাঙায়ে হ'তেও পারে, কিন্তু উপস্থিত তো নয়। কিরণ খুব হাসল, সিনারেট খেল ছ'চারটে, কালোপয়েণী অধির-সাজনা গোছের কথা-বাড়ী বলল, মোট কথা ও যে বয় একথা ওর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। কারণ ও মেয়েটি তার মনে ধরল না। কিন্তু সতীশের আচরণ এর বিপরীত। সে এই মেয়েকে

নিজের ক'নে ব'লে দেখতে আসেনি; এসেছে বন্ধ হ'য়ে। সে ঠুক মৃত্যু দৃষ্টিতে দেখছিল। মেয়েটির সলজ্জ স্বন্দর কিরণ যখন ডিবে গুলে একটা পাপ খাওয়া যায় কিনা ভাবল, তখন সতীশ আপন অতিভূত চোখের অপলক দৃষ্টি দিয়ে এই মেয়েটির বাদিকের সিঁথিতে যে আরক্ত আভা—এসে পড়েছে ওদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে, তাকে যেন মুগ্ধ সরনে ছুঁয়ে গেল।

পথে আসতে আসতে কিরণ যখন অজ্ঞত কথার আশঙ্কের সন্দেহাব্যাপনের হাতকর ব্যাপারগুলো বড় চড়িয়ে বলাবলি ক'রে হাসির স্রোতে ভেঙ্গে যেতে চাইল, সতীশ তাকে আমল দিল না। সে গম্ভীর হ'য়ে কতদূর আকাশের—সতী, চৌরঙ্গীর বড় বড় বাড়ীগুলার খোলাখোঁলের মাঝে আকাশকে কত ঘুরেই না মনে হয়—তারার দিকে চেয়ে রইল। যেন ওয়ালুকাডের এমন মৃদল গতিশীল বাসের দোতলার চড়ে ঝাঁকুনি খাওয়াটা, বা চারিদিকের বেকে ব'সে কত রকমই না মায়াদের বিবিধ বাজে গল্প শোনোটা একটা নেহায়েই অবাস্তব জিনিস। কিরণ ভেবে পেল না, সতীশের আশে বোজ সে এসেছিল, সেই বইখানা নিজে, ফুলে গেল।

ছুটিতে কিরণ মাকে নিয়ে বরাবরই কোথাও যায়। এবারও তার কলকাতায় থাকল না, দেওঘর গেল। ইতিমধ্যে মায়াদেবীর অভিভাবকবর্ণ কিরণের আশা ছেড়েছেন, অথচ অভাবিতরূপে আর একটা প্রতীক্ষা এসে জুটেছে। সতীশ মন্ড পার নয়। কিরণের চেয়ে ছ'চার বছর কম গেলোও সে-ও প্রথম শ্রেণীর পাস মার্ক রাখে। সে অনেকটা অস্বাভিত হ'য়েই এদেরকে আপন অভিপ্রায় জানিয়েছে। সতীশের আবার সাধারণ পঞ্জিকার

পরেও কিছু পারিবারিক পাঞ্জির অধ্যয়ন—ছিল, যেমন বৈশাখ মাসে এঁদের পরিবারে কোনো বিবাহের ফল অমূল্য হওয়ায় বৈশাখ মাসে বিয়ে হয় না, জ্যৈষ্ঠ মাসে, বড় ছেলের বিয়ের বাধা। যাক যত বাধাই আশঙ্ক, সতীশ মনে জানে ওর আশার আলো একদিন স্বতঃস্ফূর্ত লগ্নের দৃশ্য দেখবেই। সেই মেয়েটির সাথেই বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। এমন কি সতীশ এমনও মনে করল যে, ওর পায়ের মাড় পেলে পছন্দমত জুতো কিনে রাখে। কেমন রঙের শাড়ী সে পছন্দ করে জানতে পারলে দোকান খেঁটে আলনা ভর্তি ক'রে রাখে। বসন্তের পছন্দ করে না চপ্পক করে, গজের ইঙ্গিত পেলে সেই সাবান কিনে বাথরুমের সোপবল রাখার ড্রাকটগুলো পুরিয়ে রাখে। এক কথায় মায়াদেবীর ওর ঘরে আসাই হ'য়ে গেছে। কেবল একদিন বাজনা বাজিয়ে ধুম ক'রে লোককে জানানো চাই। যেন পরীক্ষা শেষ ক'রে দেওয়া হ'য়ে গেছে, কেবল যা গেজেটেড হ'তে বাকী। এমন ধরনের একটা নিশ্চিত বিধাহীন প্রতীক্ষার দিন কাটলে সতীশের কাছে মায়ার নামে সেই গোখলি-বেশাধ, দেখা মেয়েটি নেহায়ে ঘরের মেয়ে হ'য়ে উঠল। বাক্যে দেখে একদিন তার চোখে রঙ পেলেছিল, মনেও আবেশ এসেছিল, হাকে দেখে একদিন চৌরঙ্গীর প্রকাণ্ড বাড়ীগুলার ওপরের আকাশে যে-তারার আলো কাঁপছে সেই তারার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ইচ্ছে ক'রেছিল, সেই চম্পভতমা মেয়েটি নিতান্ত শাদা ও সাধারণ হ'য়ে এল। এখন, তাকে এমন করনা করা যায় যে সতীশ যে-সিঁফিট ভাল-বাসে সেই সিঁফিট প'রে শুকানো-উত্তনের আঁচে ব'সে সে ভিমের কচুর ডাঙা ছেঁবে। ওর খালি সিগারেট-কেসটা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বার ক'রে নিয়ে চুপচুপ ভাবে রাখছে।

ইতিমধ্যে সতীশ একদিন শ্রামবাজারে গিয়ে গুলতে পেল—মানে, মায়ার সঙ্গে রোজ



একবার ক'রে দেখা না হ'লেও, 'সে রোজই একবার ক'রে দে-বাড়ী যেত—মায়ার কাকাবাবু বেরিবেরির মত হ'য়েছে। কলকাতার শাদা চাণ এবং শাদা ময়দা তাঁর বঁরদাত হ'চ্ছে না। কি করা যায়? এলুচ্ছে তিনি সতীশের পরামর্শ চাইলেন। কি আর করা যায়? এর সবচেয়ে সোজা উত্তর বা। সকলেই জানা থাকে এবং সতীশেরও ছিল, তাই সে পুনরাবৃত্তি করল, "একবার জল-হাওয়াটা বদলিয়ে আনুন।" নীরদাহন্যরী সঙ্গে এপ্রিবাবরের বহুকাল থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার দেওঘরের প্রকাণ্ড বাড়ী কি-একটা কুটীর হবে, নামটা খ'রে সেগা বা 'সার্গের-কুটীর', তারই একতলাটা তিনি ছেড়ে দিতে চাইলেন আগ্রহ করে। চিঠিপত্র কথাবার্তা ঠিক হ'ল। তারপর একদিন এরা চলে গেলেন। ওর কাকীমা ছেলেমাছব এবং নিসঙ্গভীর ব'লে ময়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। সতীশের ইচ্ছে ছিল যেতে। কিন্তু এই সময়েই ঠিক কলকাতায় তার হাজার রকম কাজ প'ড়ে গেল, এখন যে কলকাতা তাকে ছুটি দেবে তা মনে হ'ল না।

নীরদাহন্যরী এসের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। সমস্ত বাড়ীতে তিনি একা। আজকালকার ছেলের সঙ্গে মা'র প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। তার ওপরে যে-সব নীচ-নীচ-মজাী দুহুহুয়ে সাঙ্কসজ্জা ক'রে সকাবিকেল বেড়ানে বেরোয় তাদেরও সাথে নানুক ক'রে ভাব জমাতো এবসেস তিনি আর পেঁরে গুঠেন না। মায়ার হৃদয়, প্রশান্ত প্রভা দেখে তার ঘন ঘন উত্তাপা নিশ্বাস পড়ল। মনে স্তব্ধ—'ছেলে, বিয়ে তো সেই করবে-ই, কিন্তু এমন জিনিসটি হাতছাড়া হ'য়ে অপরের হাতে পড়ল।'

এখানে, মায়ার কথা একটু বলা দরকার। মায়। আজকালকার মেয়ে হ'য়েও তার চেয়েও বেশী আর-একটু কিছু। তার শান্ত, আশ্রয় গাভীখোর মাঝে ভাবি একটা উজ্জল লাগনা ছিল। প্রেমের মাঝে কান্দনসঙ্গার অজস্র উজ্জলতার মত বেনাদকতা আছে—তার চেয়েও অধিক ক'রে তাকে স্পর্শ কর্ত ভাল-

বাসার একটি অচল মহিমা, যা প্রেমাপদকে সকল অবস্থাতেই সন্মের সঙ্গে রক্ষা করে। তাই কিরণ যেদিন ওকে দেখতে গিয়ে যা তা বাজ ব'কে, হাজার রকম ফাঙ্কলামি এবং লুচটল গল্প ক'রে এসে ওকে প্রত্যাখ্যান করল সেদিন ওর মনে খুব লেগেছিল। এবং তার ওপরে সেই প্রত্যাখ্যানকে, সতীশ যখন কুড়িয়ে নিয়েছিল তখন তার মন কষ্ট পাওয়ার চেয়েও বেশী ঠিগে হয়েছিল। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে এই সামান্য কারণে প্রথা-পথ থেকে সরে দাঁড়ায় কি ক'রে? এতে কি যায় আসে? একজন পছন্দ না করে আর একজন এসে করবে। এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটছে, এবং যে-বাথা শতকরা নিরাসফলই জন মেয়ে পরিপাক করছে, তা নিয়ে বাইরে একটা সহনাতীত দৃষ্ট দৈবাৎ করে বিতর্কতার অবধি ছিল না। তাই মায়ার অন্তরালকে যে একটা বিপদায় ঘট্ট পেগ, সেখানে ঘুগা, প্রত্যাখ্যান এবং তিতিক্ষার যে একটা মিশ্রিত ছায়ালোক ওর মনের গভীর ঐশ্বর্যের মাঝে নীলায়িত হ'য়ে উঠল সে-কথা কেউ টের পেল না। পাবেই বা কি ক'রে? মনের ভিতরে যাই হ'ক, সকল ক্ষোভ ও অশান্তির উপরে মনিকা-পতন ক'রে স্থির হ'য়ে থাকা মেয়েদের একটা বড় ক্ষমতা।

কিরণের এখানে একমুখে লাগছে না। কলকাতায় আর যাই হ'ক, সময় যে কাটছে না এমন কথা কখনো মনে পড়বার অবকাশ হয় না। মনটা একটু নিরিবিলা হ'বে, তবে তো সে ছ'দও ব'সে ভাবতে পারে, তার কি হচ্ছে বা কি চাই? কিন্তু যুদ্ধের জায়গায় ভয়ানক আহত অঙ্গ নিয়েও সৈনিক যেমন মরীয়া হ'য়ে যুদ্ধ ক'রে মায়, গতির উত্তেজনার, মল্লার মাদকতায় তার মনে পড়ে না কোন অঙ্গে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে, কলকাতার কিরণের অনেকটা তাই হ'য়েছিল। কলকাতায়, সে যে-ভিতরে ভিতরে পিপাসার হ'য়ে উঠেছে, তার মনের গহনবাগী নিঃশব্দ উপবাসে রোজ জীর্ণ হ'তে জীর্ণ হ'তে বসেছে, কলকাতায়

তার মনের যে-মাত্র তারার আলোয় চূপ ক'রে বসতে চায়, দিনরাত্তির প্রবহমান সঙ্গীতকে ছুই কান দিয়ে শুনে চায়, সে এমন অবসরও কোদিন পেল না যে, বৃথতে পারে, ভিড়ের ঠেলায় থাকে। খেয়ে আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, চলতে চলতে, তার জীবনের দিনগুলো একটা অস্বাভাবিক শূন্যতার ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। একপাশি তার ওখানে মনে পড়বার সময় ছিল না। এবং সময় বা থাকলে অনেক বড় বড় উপলব্ধিও মনের অন্তরকার কোণেটাতে কোণেটাতে হ'য়ে দাঁড়ায়, অনেক ভাল ভাল বইও শেফার ওপর উত্তরোত্তর জমতে থাকে। দেওঘরের ওই দিকের পাহাড়গুলোর পাদদেশে, সে তার মোটর নিয়ে রোজ বিকেলে যেত। একটা বটপাছের ঘন ছায়ায় মোটরটা রেখে পাহাড়ের ওপর একটা উঠে একটা পাথরের উপর বসত। এতদিনে তার চ'চোখ দর্শনীয়কে প্রাণ ভ'রে দেখবার সময় পেল। ছপরের রোদ শাদা প্রখর আলো থেকে ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে তিমিতাত হ'য়ে রঙীন হ'য়ে আসছে। পাহাড়ের চারিপাশের লতাগুস্ত এবং বড় বড় গাছের শাখাঘাটা ক্রমাগত রূপ ও রেখা বদলাচ্ছে। গুপ্ত থেকে বিকল হ'ল এবং তাঁরপর সঙ্গার বনায়মান ধূসরতার মাঝে ঐ পাছটার ওপরে প্রথম একটা তারা দেখা দিল, জগৎসমসারের এইসব ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনা, যা প্রতি দিনই অবলীলা-কেনে ঘটতে থাকে, তারই মাঝে কিরণের মন জুবে গেল। দ্রঘ্নে বিশ্বাসের পায় পেল না।

একদিন অভ্যাসমত সে গাভীখানা নীচে রেখে পাহাড়ের ওপরে উঠেছে। গাভী তার আসতে কিছু দেরী হ'য়ে গেছে, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। চারিপাশের ঘন সবুজের ওপর একটা গাঢ় লাল আভা এসে পড়ছে। ছোট রঙই সমান উজ্জ্বল, তারা পরস্পরে

মিলল, কিন্তু মিশল না। তাই এ ছোটো কটিন ধৃত্ত রঙের মিলন-চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা সত্যজ ভাব রয়েছে। যদিও এখনই তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, সঙ্গার সরম-সুজ্জিত ধূসর অবগুঠন তারার আলোয় দীপ জ্বলে তার একটু আগের উজ্জ্বল অভিমানের জগা ফনা চাইবে এবং বনশ্রীর গাঢ় সবুজের প্রাচ্যুগ্য সঙ্গার শান্তি এবং শুদ্ধতার মাঝে, মোহময় স্বপ্নের মত একটু একটু ক'রে আবিষ্ট হ'তে হ'তে শেখালে একেবারে জুবে যাবে। তা' হ'ক, কিন্তু এই মিনিটের এই অস্বাভাবিক সবুজ এবং অজস্র লাল আলো কিরণের বড় ভাল লাগছিল। ও, কিন্তু আজ যে সে একলা হ'ল না। সামনেই মায়ার কাকাবাবু তাঁর ছফ্টি পাশে রেখে একটা পাথরের ওপরে ব'সে হাঁপাচ্ছে। কিরণের মন মুহূর্তে বিধ্বিৎ গেল। উ, একটা ছোটো মাছের কি ক্ষমতা! ওই বেরিবেরি-আজ্ঞার, মোজা এবং ডার্লিং-সুপের ভঙ্গলোকটি এক নিমিষে এতবড় বিশাল পাহাড় এবং এতবড় সীমাহীন আকাশকে একেবারে সঙ্কুচিত ক'রে দিল। যাক, হতবিরকে অভিঙ্গপাত দিয়ে সে ছোটখাট একটা ভিত্তার মনমগ্ন করল। মোজাপরা ভঙ্গলোক যেন অস্বস্তিক্রমে আছাদে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভাগ্যিস কিরণের সঙ্গে দেখা, তা' না হ'লে এই কাঠখোটা পাহাড়ে ব'সে ব'সে তিনি কি করতেন? মাযার ওপরের দিশস্ত-বিলীন আকাশের দিকে চেয়ে কি মাছের সময় কাটে? তা কি ঘরের কড়িকাঠ যে ব'সে ব'সে একটা একটা ক'রে গুণেও কিছু সময় কাটতে পারে। না, সে আশাসও নেই। কাজেই 'কিরণ এখন ওর কাছে অমৃতা হ'য়ে দেখা দিল। শপশে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আরে মশাই, বেরিবেরির জলাতে সেলাম।" কি না করেছি? চালের ভূমো খেয়েছি, তরকারির খোসা চিড়িয়েছি, কাঁচা টমেটো আর কাঁচা ডিমের ছ'বেলা ক'রে শ্রাঙ্ক করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। বৃথলেন না, বেরিবেরি যাচ্ছে একবার ধরছে তার আর নিরুতি নেই। এই দেখুন



না, হুঁপা উঠেই হাঁপাচ্ছি। তবু বাজীর মেয়েদের সখ—  
আসতেই হ'ল।"

কিরণ তাঁর পাশে বসল। কিছুক্ষণ একথা  
সেকথা পর-পাশে, কলকাতার আলুর চেয়ে এখান-  
কার আলুর বাজার দর কত সুবিধে, এবং গরম সন্দেশও  
বেরি-বেরির দফন তাঁর পায়ের শোচনীয় অবস্থার জন্ত  
কেনই বা তাঁকে মোজা পরতে হয়েছে—এই ধরনের  
আলোচনা কিছুকাল চলার পরে হঠাৎ তিনি বললেন,  
"দাঁক' করে একটা কাঁজ বাকি করেন, শুনেছি কিছুটা  
পাছাড়ে সমস্যাটা আস্তানা। নিয়ে কোথাও কোথাও  
জুতার বৈদ্যেছেন এবং তাঁদের গৃহপালিত পোকগুলি  
বিশেষ চুল্লিনীত। সন্দের মেয়েরা একলাই ওপরে  
উঠছেন, কারণ আমার ক্ষমতায় কুশোনা না—যদি তাঁদের  
অহসরণ করেন। অন্ততঃ গোহতে তাড়া করলে তাঁরা  
যেন হিল-উঠি জুতা বন্ধ পাহাড় থেকে পড়ে না যান।"

কিরণ মনে মনে হেসে ভাবল—"মনে ভার নয়।"  
মুখে বলল, "কিন্তু তাঁরা আমাকে ভেদেন না, তাঁদের  
অহসরণ করলে হয়ত তাঁদের বেড়াটোটাই মাটি হবে।"

"সে সম্ভব করছেন না কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু  
অপরিসীম বা কিসের? আপনাকে বিশেষ বদ্ধ  
সতীশের সঙ্গে মায়ার যখন ওমাসে বিয়ে হবে, তখন  
কি আপনি বরর প্রাণে অপরিসীম মনে করবেন?"  
হাঙ্ক, কিরণ এর ব্যগত দেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু  
করল। কিছু দূরে অস্পষ্টপ্রায় ছাট নারীমূর্তি দেখা  
গেল। কিরণ প্রথমটা তাঁহর করত পারেনি। আরও  
কিছু দূর চড়ে দেখে, তাঁদের সঙ্গে তার দূরবর্তী ক'মে  
বাহে, তবে কি ওরা চলেছেন না? গোন্ধর উপভব  
আরম্ভ হয়েছে নাকি? না শ্রান্তি? কাছে  
গিয়ে সে দেখে—এ ছোট্ট একটা ও না, তবে এর চেয়েও  
গুপ্ততর আর-একটা ছুতায় কাপণ। একটি মেয়ের  
পায়ে পাখরের কুচি ফুটে বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে এবং  
আর-একজন ব্যাকুল হ'লে, আর কিছু না করলে পেরে  
ক্বেল আত্মল দিয়ে তার ক্ষত মুখের প্রবল রক্ত  
উৎসারনের মুখটা চেপে রয়েছে। মেয়েটি কে?—বার

মাথায় কাণড় নেই আর পায়ের নিরতিশ্রয় যতনা  
সম্বোধে যুগে একটা অলি শান্তি—কেবল অভ্যস্ত বাধা  
সহ করার ক্ষেপে মুখে একটা প্রবল শোণিতাঘাত  
ছাড়া ফেলে মুখখানা লাল টুকটুকে ক'রে তুলেছে। এ তো  
সেই মায়ী, যাকে একদিন সে বিকলবেলায় দেখতে  
গিয়ে পছন্দ করেনি। হ্যাঁ করেনি বটে। কিন্তু সে  
দোষ কি তার? অত বিদ্রি স্বাভাবিক "ব্যাঙ্ক-  
গাউন্ডে" রেখে আঁকল অনেক বড় বড় চিত্রকরের  
ছবিও তো আমল পেত না। যদি এই মেয়েটিকে এই  
নির্জন পার্শ্বতা প্রকৃতির একক আবেশনের মাঝে রেখে  
দেখা যেত; যদি তাকে ভাল ক'রে পরখ করতাই  
হবে এই ভাবটা মনকে নিরস্তুর খোঁচা দিয়ে নিয়ে  
তার দেহের রূপকে টুকুরা টুকুরা ক'রে তার মুখের  
লাবণ্যকে ছিন্ন-বিছিন্ন ক'রে বিশেষ করবার প্রকৃতিকে  
অতুল্য ক'রে না তুলত, তা' হ'লে কি সে এই মেয়েটিকে  
কেবল এই মেয়েটি ব'লেই নিত না? তা' হ'লে কি তার  
মনে হ'ত না যে, এই মেয়েটি সমস্ত জগৎ এবং জগৎকে  
ছাড়িয়েও তারারবা কোটি কোটি জগতের মাঝে  
একাকী এবং অস্বীকৃত? তার গালের-পাশে একটি  
ছোট্ট তিলের আঁচ থাকলেও সে-অস্বাভাব্য তখন মনে  
পড়ার অবসর পাবে না অপার বিশ্বদে, আমি যাকে  
দেখবল তাকে ঠিক ভেদিনি ক'রে দেখতে দ্বিতীয়বার  
কেউ পারবে না সেই বিশ্বদে। কিন্তু এসব কথা মনে  
গঠা এবং সেরসে মনকে সিক্ত ক'রে দেওয়ার চেয়েও  
জরুরী, মেয়েটির রক্তক্ষরণ কোন উপায়ে বন্ধ করতেই হবে।

মায়ার কাকীমা বললেন, "হিল-উঠি জুতা  
অস্ববিধে হওয়ায় সেইটে গুলে বাপি পায়ে ছাঁটতে  
যেতেই এই ব্যাপার ঘটেছে।"

মায়ার কাকীমা বুঝা সন্ধ্যা না ক'রে বললেন,  
"ভাগ্যিস আপনি এসেছেন। আপনি এর পাখের  
কাটাটা হাত দিয়ে চেপে। থেকে ততক্ষণ বন্ধ ক'রে  
রাখুন। আমি একটা সহজ গুণ্ডু জালি, তার উপায়  
দেখি।"

কিরণ হাঁট পেতে বসল, এবং গরু দুটু বলিষ্ঠ আত্মল

দিয়ে মায়ার পায়ের আহত স্থানটা ধ'রে রইল। মায়ী চোখ  
তুলে তাকা'ল। কিরণের ওপর অভিমান তার আঙ্গু  
যাঘনি। বারি ওপর এক অভিমান, তাকে দিয়ে পায়ে  
হাত দেওয়াতে হ'ল—এ লজ্জার পার কোথায়? কিন্তু  
সে কিছু বলল না, বা স্বনর্পক ব্রীড়াঙ্গুতি হ'য়ে  
পা নিয়ে টানটানি করল না। অভিমানকে যদি ঠিক  
জায়গায় পৌঁছে দিতে হয়, নিশাপ উপেক্ষা দিয়েই সে  
তা দেখে, এর চেয়ে শক্তিশালী তাঁর বার নেই। মায়ার  
কাকীমা জঙ্গল থেকে গাধাঘাঘের কিছু কচি পাতা  
নিয়ে এসে একটা পাথর দিয়ে তা হুঁচে গর পায়ে  
ব্যাঙেজ বেঁধে দিলেন। খানিকটা বিশ্রাম ক'রে ওদের  
হ'লেনেব, মাথাযো মায়ী নাচে নেমে এল।

ওরা হঠাৎ যাওয়ার পরেও অনৈক্যপন অবধি কিরণ  
নাচে নেমে যাওয়ার ওপর ব'সে রইল। মায়াকে আশে  
তার ভাল লেগেছে এবং তার চেয়েও বেশি শুকে দেখে  
তার হুঁচোখে বিশ্বদেয় বোর লেগেছে। যাকে হুঁচোখে  
মাফুর্ বিশ্বদু নিয়ে গেছে তাকে সে কত গভীর ক'রে দেখে  
তা ব'লে শেষ করা যায় না। কিরণ আজ মায়াকে আপন  
কাটা বন্ধ ব'লে দেখেনি, আজ দেখেছে সেই মায়াকে  
সে-মায়ী একটা মুহূর্ত পরে জীবনকে একটা বিন্দুতে ছুঁয়ে  
অগাধ শূন্যে মিশিয়ে যাবে; সে আবার তারই হ'তে  
পারত, কিন্তু সে এখন একটা নিমিষ আপন বৈদ্যনাট্য দৃষ্টি  
নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো ভাবেই  
কোনো দিন তার এক চুলও আপন হ'তে পারবে না।  
এই ধূরুতা এবং অপ্রাপ্যতার মাদকতা শুকে কি রকম  
ধেন ক'রে তুলল। মনে মনে ভাবল, 'আমার নর ব'লুকে  
দেখতে যাওয়ার নাম ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু  
যেমন ক'রে সেখান তাকে পাব সে-দেখা দৃষ্টিতে সম্ভার  
ক'রে নিতে পারে কে? অ কি মরমায়েদু দিয়ে কাজ যায়?  
এর পর বাঙতে এসে তার দিন রাত্রিগুলো অস্ত্র ভাবে  
কাটা। খুব যে একটা হতাশার ক্ষোভ, তা' ন।  
তবু একটা নতুন-স্বর মাঝে মাঝে শোনা যায়।  
ব'লে ভাবতে ইচ্ছে করে, একটা মেয়ে কেমন আছে এখন?  
তার শোয়ার ঘরের দীপান আঘনটার সামনে ব'লে

রাখিতে শোবার আগে সে দীর্ঘ চুলগুলি কি ক'রে ফিতে  
নিয়ে আটকে রাখে। হয়ত ফিতেটা একহাতে এবং  
চুলগুলি অঙ্গ হাতে ধ'রে ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে না,  
তাই ঠোঁটের আড়ালে ঝুঁকাকে দাঁতগুলির একটু ঝলক  
দেখা যায়, হয়ত দাঁত দিয়ে কাশো ফিতেটা সে চেপে  
ধরেছে। হয়ত বিকলবেলায় বেড়াতে যাবে ব'লে আল-  
মারীর পাঞ্জাটা গুলে রেখে শাড়ীর পাড় বাছতে বাছতে  
বাইরের রোদে-ভরা নীল আকাশের দিকে চেয়ে গ্লান-  
গুন ক'রে একটা গানের একটা লাইন গেয়ে গঠে, হয়ত  
চারির রিংঘর গোছাটা ভুলে কোনো কাপড়ের তলায়  
রেখে দেয়, তারপর খেয়াল হ'লে গান থেমে যায়।  
উৎসব, প্রত্যাশিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে খুঁজে বেখে।

মায়ী কেমন আছে, সে-খবরটা অবিশ্রি মায়ের  
কাছে অনাস্থ্যসেই নেওয়া যায়। কিন্তু তা নিতে  
ওর গরজ নেই। কল্লনার সে সে-মেয়েটির অহসরণ  
করে, মা কি তাকে দেখেছে? এবং নীরদাও এ  
মব কিছু খবর শুকে দিতে উৎসব ন'ন। হেলের  
ওপর একটা খুব-হালকা নর ক্ষোভ এখন তাঁর মনে  
রয়েছে। তা ছাড়া মায়াকে বৈ দেখেছেন, বৈ  
কাছে পাহেছেন, তাঁর এই ক্ষোভ ততই বেড়ে চলেছে।  
মায়ী বেশি কথা বলে না। প্রব্রের সক্ষিপ্ত জীবার  
দেওয়া ছাড়া সে প্রায়ই চুপ ক'রে থাকে। এখানে  
আসটা ওর পক্ষে কষ্টকর হয়েছে। বিশেষ ক'রে  
সেই স্নাপারের পর, আবার এসে কিরণ ও তার  
মায়ার সঙ্গে একবাড়িতে থাকটা যেন ওর ভাব  
হানে আবার আঘাত দিচ্ছে। সতীশকে সে  
মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে না—মায়ার ওপর  
প্রবল অভিমান রয়েছে তাকে একসময়ে অভিমানকে  
ভুলিয়ে দিয়ে বোধ করি গভীর ভালবাসা যায়।  
কারণ, অভিমানটা ভালবাসারই ওপঠি। কিন্তু ভাব-  
জ্ঞান বোধ প্রত্যাখান করেছে, আর-একজন সেই  
মুহূর্তে যদি সেই পরিত্যক্তা নারীর প্রসাদপ্রার্থী  
হ'লে আসে তবে তাকে সেই মেয়ে কি ক'রে নৈবে-  
তাকে আপন আহত হৃদয়ের আচ্ছাদন ক'রে নেবে,



তাকে নিজের অভিমানের ইন্ধন ব'লে নেবে, কিন্তু তাকে সতাই তারই মূল্যে নেওয়া—মানে তাকে শ্রদ্ধাহীন আত্মবঞ্চনার না নিয়ে শ্রদ্ধার আসনে নেওয়া—

এ কি সে পারবে? বোধ করি পারবে না। অন্ততঃ মায়ী তা পারেনি। তার ওপর সেদিন পাছড়ে ওর অসহ্য, আহত অঙ্গে কিরণ যখন হাত হেঁচোয়া, নতুনগে ওর হস্তাকৃতি পায়ের তায় ছাছ পেতে ব'লে আপন বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ওর রক্ত থামাবার চেষ্টা করল, তখন মায়ী ভেবে পেল না অভিমান কি ক'রে এত মিট হয়? যে অপমানিতা নারী নানা উপায়ে নানা ইন্ধন দিয়ে আপন অভিমানকে প্রবলতর করতে দীর্ঘ সাধনা করেছে, কেন তার সকল স্তম্ভক ছাপিয়ে, এমনি মধুর অভিমান মাথুনের রসে সমস্ত মনকে কানায় কানায় ভরে ফুল। এ অভিমান থেকে মুক্তি চায় কে? মায়ী কি চায়? সে যে অভিমানকে চূর্ণপ্রাণীর মত কেবলই হর্তেজ হৃদয়ে চেয়েছে, সে এই? তাই যদি হয় তবে এ অভিমানের আরোহণ মধুরতা থেকে তাকে বাঁচাবে কে? এতদিন ধ'রে সে কি এতই জ্ঞত সাধনা করেছে? বারিবেলায় নিজের বিছানার ওপর সে বাগিশে বৃথ রেখে মিট ক'রে ছোট ক'রে আঙুটে আঙুটে বলে, "তুমি তো আমাকে নিলে না, তুমি তো আমাকে চাওনি। আমি তোমার মনের মতন নই। কিন্তু তবু তুমি আমার কষ্ট সহ করতে পারলে না কেন? কেন সেদিন আমার পাদপর্শ ক'রে আমার রেশ কমাতে গিছলে?" তার ভিতরকার তীক্ষ্ণী মেয়েটি বলে, "এ আর বুঝতে পার না? এত ভ্রমভর একটা স্বপ্ন। কেউ অসহ্য অবস্থায় থাকলে 'বিপদে পড়লে, শিক্ষিত ভ্রমকে পেছনা হবে কেন?' কিন্তু অভিমানিনী মেয়েটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে স্থান দেয় না। তার কেন্দ্রন ক'রে কি জানি কেবলই মনে হ'তে থাকে, 'তুমি আমাকে নিলে না, কিন্তু তবু তুমি আমার রেশও সহ করতে পার না।'

সতীশ একটা-না-একটা কাজের ক্ষেত্রে পু'ড়ে কলকাতার স্থাপক থাকছিল। তার একটা চাকুরি হ'বার কথা ছিল। মানে সে গত বছর ডাক্তারী পাশ ক'রে ওয়ার-ওয়ার ছোট ছোট কাজ নিশেও, একটা ভাল মত চাকুরীর চেষ্টায় মেগে ছিল। কলকাতার ডাক্তারী করার তার ইচ্ছাও ছিল না, খেঁচাও ছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারী বিভাগে পোতাঁকতক পর বালি হওয়ায় স্থাপারিশের জোরে সে চাকুরী পেল। চাকুরী পেরে, অর্থের স্বল্পতায় তার মনের ছ'একটা ধারাও বলাতে শুরু করল। মনটা খালি পোতাঁ হলেসে মত পু'থু'থু করে। কেনেই বা সে তাড়াতাড়ি ক'রে মায়ার সঙ্গে বিয়েটা পাকা ক'রে ফেলল? কিরণের চেয়ে সে কোন অংশে কম? কিরণ যে-মেয়েকে 'কিছু না' ব'লে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সেধে মরে বয়ে আনতে তার এত কি গরজ ছিল? সতীশের আত্মদামনে একটা হল ফুটে লাগল। যেন কিরণের পুরানো, পরিত্যক্ত চাটটাকে অর্ধেক দামে পুরানো জুতার দোকান থেকে কিনতে গেছে। মাঝকে কিরণ নিজের স্ত্রী বলে পছন্দ করতে গিয়ে যদি ফিরে না আসত, তা'হ'লে হয়ত সতীশের মনের এই গোঁচরটা ওঁইবারই অবকাশ পেত না। কিন্তু এখন সে মাঝকে মায়ী ব'লে ভাবতে পারছে না। কিরণের না-পছন্দ-হওয়া একটি মেয়ে ব'লে মনের কাছে মায়ী এসে ঝাঁপল। তা'হ'ল এক চৈতন্যদায়ক যে-মেয়েকে সে আরক্ত অপরূপ লম্ফায়, বন্ধুর অধর ভবিষ্যতের স্ত্রী ব'লে দেখেছিল, যার চারিদিকে দ্রবীকৃতমুগীর আলোকমণ্ডল ছিল, যে-অন্তর্গত ধাঁধার তার চোখে রঙ পেয়েছিল, সে তো এখন সিলিয়ে গেছে যান হ'য়ে, করে কোন কালে। মায়ী তো এখন তার পাকাপাকি কথা দেওয়া বিয়ের বধু। তার কল্পনা-মণ্ডলের জ্যোতির্বিষয়ে

তারার দল সব এক এক ক'রে নিবে গেছে, এখন আছে কেবল ভোর হ'য়ে আবার নিমগ্ন পাখুরতা। সে যে একজনই, অন্যাতা নারী, তারই নিমগ্ন আত্ম। হ্যাঁ, সতীশের মনটা পু'থু'থু করছিল। তা'হ'ল কাল বাগবাগানে সিঁদুরার বাটী গিয়েছিল; তিনি হাসি-তামাদা ক'রে একটি মেয়েকে সেই চিরন্তন পাণ আনন্দ ছল ক'রে কাছের ডেকে নিয়ে এলেন তার সামনেই। মেয়েটি অশ্রুি মায়ার চেয়ে ভাল দেখতে কি খারাপ দেখতে অত তুলনা-মূলক সমালোচনা সে কদুবার অবকাশ পায়নি। কিন্তু দিদিমার কাছে কথাপ্রসঙ্গে শোনা গিয়েছিল, মেয়েটির বাবা কলকাতার পশারওড়ুয়া বুবা বড় একজন ডাক্তার, মেয়ের বিয়েতে টাকা চান্বে কার্পণ্য করবেন না। মায়ার যেন বাপ নেই, কাকা-ছোটার 'পরে ভার, তেমন নয়। এই কথাটা ক'রিন ধ'রেই তার মনে বেঁটা দিচ্ছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে মনে ক'রে, কাজে যোগ দেবার আগে একবার দেওবর যুয়ে আসা যাক। একা একা থেকে তার মনের খেদটা উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলছে।

তাই এক সকালে সতীশ কিরণের বাড়ীতে এসে হাজির। এবারে নীরদাহম্বরীর সঙ্গে তার জমল না। নীরদার বাবাহারে এবারে একটা প্রহর কাটিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি তিনি সেদিন সতীশকে অত ক'রে কিরণের ক'লে দেখতে যাওয়ার অহরোধ না করতেন তা'হ'লে বোধ করি তাঁকে মায়ীকে হারাতে হ'ত না; যদি তিনি অত ব্যস্ত না হ'তেন, যদি আরও অপেক্ষা করতেন; কিরণকে তাকু দিয়ে, ডামবাগায়ের বৈঠকখানা ঘরে পাখের ডিবে হাতে মোতি-মুক্তা আর বেনারসী দিয়ে সাজানো মায়ীকে দেখতে না পাঠাতেন। দেওবরের সেই অপরূপ 'আভাময় পাঁছড়ে নারীর বেনাহাত, শাশ, অটল হেঁদোয়ার মাঠের রক্তসিল্প পাদপর্শ ক'রে মায়ারকে দেখতে দিতেন তাকে; প্রথমেই—তা'হ'লে কিরণ কি বলত বলা যায় না।

কিন্তু সতীশ কথাটা বুঝতে পেরে এবং নীরদার

নারী বর্ণনায় আহত হ'য়ে মনে মনে আরও রেগে পেল; এবং নিজের নির্মূল্যতার 'পরে চোঁটপাট শুরু করল। মায়ার এমন কি দাম আছে যে, তার জ্ঞত বন্ধু-বন্ধুদে! বন্ধুর এমন মা, বলতে গেলে তার আপন মায়ের মত, তার সঙ্গে মনান্তর। ব্যাপারটা কোনো জমেই কি সোচ্ছা করা যায় না?

পরের দিন বিকালে সতীশ ও কিরণ পাছড়ে বেড়াতে গেল। সতীশের ভাবটা কিছু উন্নত, কি একটা কথা যেন বলি-বলি ক'রেও বলতে বাধ্যছে। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'ভারপার, কেন্দ্রন লাগছে জায়গাটা? নীচের তলার ওঁদের সঙ্গে কেন্দ্রন ভাব হ'ল?' কিরণ মনে করল সতীশের কি ঈর্ষা হয়েছে নাকি? তাই তাড়াতাড়ি দেওবর ছুটে এল এবং তাই এমন আভাময় আকাশ, এমন বনের দৃশ্য, এখানে এসেই এ প্রায়।

সে বলল, 'আমায় তো ভাল ক'রে একদিন' হবেই, এবং সেদিন বোধ করি প্রতিদিন এগিয়েই আসছে। কাজেই আগে থেকে আর বেশি চেষ্টা করিনি।'

সতীশ আমল পেল না। মায়ী যে এই সাময়ের মাসেই তার স্ত্রী হ'য়ে কিরণের বধূপটী হবে, এবং তখন ভাল ক'রেই আলাপ করবে, এই কথাটার আশ্রিত ক'রে সে যে-কথা ভুলে থাকতে চায়, কিরণ সেই কথাটার ওপরই বেশি জোর দিল। কেন কিরণ বারবার এই কথা মনে করিয়ে দেয়? ওর মনের অস্থির চাক্ষুণ্য ওকে চুপ ক'রে রাখতে নিল না, আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কিরণ, মায়ী কি দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয়? তোমার পছন্দ হ'ল না কেন?'

এবারে কিরণের হাসি পেল। বলল, 'মায়ী সুন্দরী নয় অথবা কে বলছে? ভাব নেই যে, তোমার বাস-রাত্রিতে আমায়িত হ'য়ে তোমার স্ত্রীর রূপের প্রদর্শন আমি এমনি মুগ্ধ হ'য়ে উঠে যে, বলবে, 'মু. জানি মুগ্ধ এখন রাতের' আরো কি-ক'রিত কথা?'

সতীশ অসহবরণীয় হ'য়ে উঠল। কিরণের আভ



হয়েছে কি? সে কি নিষ্ঠা কথায় তাকে অগম্য মন করল? যে-মেনেকে সে নিজে নিতে পারল না, তাকে আমার কাছে চাপিয়ে এখন স্তবির কনি আঁটিছে। মরীয়া হ'লে কেল্ল, "আমি সে মনে করে বলিনি; যে-মেনেকে তুমি বিয়ে করতে পারলে না, যাকে নিজের স্ত্রী মনে করতে তোমার পেল হালি, এখন বন্ধুর স্ত্রী মনে করে তার সম্বন্ধে যত খুসী মুখ হ'তে পার। কি আশ্চর্য্য তুমি! 'হার কি অস্তুত ব্যবহার তোমার।'

কিরণ এবার গভীর হ'য়ে বলল, "কি বলছ তুমি? মায়াকে আমি পছন্দ করেছি বা অপছন্দ করেছি তা'তে এখন কি বাধ-আসে?"

"বিশেষ যায়-আসে। আমি যে মায়াকে বিয়ে করবই, এক কথাটা কি আমার গায়ে লেখা আছে? পাকা কথা হয়েছে তো কি হয়েছে? তাতে আমার কি যায়-আসে? তখন একজন ভদ্রবরের মেয়েকে এবং তার অভিভাবকদের তোমার মত নিষ্ঠুরের নিদারুণ প্রত্যাখ্যান থেকে বাচাতে আমি যদি একটা কথা বললেই থাকি, তাতেই কি ধ'রে নিতে হবে যে, আমি সে-মেয়েকে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠছি? আমি মায়াকে বিয়ে করব না, করব না, করব না,—সোচ্ছা কথা বলি নিদুম।"

তারের অন্তিমের একটা গাড়ী এসে পাঁজাল এবং তার ভিতর থেকে কাকারাবু ও কাকীমার সঙ্গে মায়া নামল। তার পায়ের ফুটো সেরেছে বটে, কিন্তু পাছে কোনক্রমে সেপ্টিক হবার ভয় থাকে বলে ডাক্তারের পরামর্শ মত এখনো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। এই কদিন অভিমানিনী মায়া আপন অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাল ছেড়ে দিয়েছে; এই নিষ্ঠা অভিমানের সঙ্গে তার বোকাপড়া হ'য়ে গেছে। বাইরের জীবনকে তার হান ছেড়ে দিয়েও মনের নিস্তৃত একটি প্রহর কোণে সে এই অভিমানকে আশ্রয় দিয়েছে। তার ধ্যানের জীবন এই কদিনেই প্রশান্ত নিমীলিত একটি ছায়া তার মুখে ফেলছে। সে আভাষ তার অভিমানী মুখ একটি আপন রূপ পেয়েছে। তা ছাড়া পায়ের

আঘাতের পর ওর একটু সেপ্টিক জ্বরের মত হয়েছিল। অরতোপের পর ও আরও একটু রোগা হ'য়ে গেছে। চর্ম্মল নারীসেহ যেন নারীর কোন কোন রূপকে আরও ফুটিয়ে তুলে—বিশেষ করে অভিমানের রূপ। তাই গাড়ী থেকে মায়াকে যখন নামতে দেখল, তখন ওর রূপ, রান, এক অপকণ্ণ আভাষ নীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে কিরণ আত' হ'য়ে উঠল। ক্রোড়াভাঙীচোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "সতীশ, এক কথাটার মানে কি জান? একবার শুকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। তারপর আমার যদি তুমি শুকে প্রত্যাখ্যান কর, সেটা কতদূর অসমর্থবিক বর্ধরতা বলতে পার কি?"

সতীশ কটন স্বরে বলল, "তখন তা বুঝে বই কি। ভেবে দেখ তো তুমি নিজ খবন শুকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিলে। তখন তোমার নিজের বিবেককে কি বলেছিলে? আমার মত করে তিরস্কার করেছিলে কি?"

"হয়ত তখন কিছুই করিনি। করা দরকার বলে মনে করিনি। কারণ, তখন ওর জীবন সম্বন্ধে আমার কোন অন্তর্ভূতি ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য, কারণই হঠাৎ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'কারণ শুকে এখন আমি ভালবাসি।' সতীশ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল, বলল, "ও! তবে তো আর কথাই নেই। তবে একথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন? কাল ভোরের ট্রেনে আমি চলে যাব কলকাতা। যাবার আগে মায়ার কাকাকে জানিয়ে দিয়ে যাব কথাটা—যে এ বিয়ের বর বদল হ'য়ে গেছে।"

৫

পরের দিন সতীশ পাশ্চাৎ মেসের কামরার ব'লে ব'লে ভাবছিল কাকটা কি বোকার মত হ'ল? কিন্তু কিরণকে কি বলতে হয়। বোকাটা বন্ধুরের আশ্রয়ে কি ভদ্রবর সব জিনিস চাপা দিয়ে রেখেছে। বন্ধু কলকাতায় কাজে বাস; আর ইনি দিবা ব'লে ভাবী বন্ধুগতীর সঙ্গে প্রেম জমাচ্ছেন। যাক আর কিরণকে

আমল দেবো না। এমন কি ওর সঙ্গে আর বেশোমেশিও করা চলবে না। হয়ত কোনদিন আদার ক'রে ব'লে দেব; সতীশ, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিলা দাও, আমারটির সঙ্গে তো তোমার জানা-পোনা আছেই।' আর মায়াকেই বা কি বলতে হয়! মেয়েমাছের' এত অধঃপতন আমরা হিন্দুবাজীর ছেলে আমাদের মনে বাজে—যাক গে। এসব বাজে কথা। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কিন্তু, হ'ল কি ভাল? একটা বোঁটা থেকে আশ্রয়লা করতে গিয়ে সতীশ আর-একটার মধ্যেই বা পড়ে। বোধ করি ওটা ওর খুংখুংতে স্বভাবের দোষ।

কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারিনি, এত সহসা সতীশ এসে কি করে গেল। ও যে ক্ষেত্র থেকে সরে গেল তা কাল রাতে ও'র টাইমটেবিল নিয়ে অতি-ব্যস্ততা দেখেই বোকা গেছে। কিন্তু তখনো সমস্ত জিনিষটার চেহারা তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠেনি। অনেক রাজিতে, মারনের খোলা মাঠা থেকে পাইচারী ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে সে বাড়ী ফিরছে এমন সময় নীচের স্তা থেকে শেরি-বেরি-আক্রান্ত ভয়লোকটি ডাকলেন, "একবার শুধুন।" গিয়ে বসতে তিনি বড় রকম উল্লসিত একটা দীর্ঘ শিখাল দমন ক'রে বললেন, "পাশনারা! আজকালকারা হয়েছে তাও আমি এবং আপনারা সভাতার উন্নততর যুগের ভরণ একথাও অব্যাহার করব না। কিন্তু এইগুলো কি খুব ভাল কাজ?"

এত বড় দীর্ঘ ভূমিকাটা যে কেন, তা আশ্চর্য্য করতে পেয়ে কিরণ 'মার্ভাস' হ'য়ে উঠল। কাকামশাই ব'লে চললেন, "মারাকে একবার আপনি ঘটা ক'রে দেখতে গিয়ে পছন্দ করলেন না। তারপর আপনার বন্ধুর সঙ্গে—পাকাপাকি কথা হ'য়ে যাবার পরে, আমরা বনন কেবল ব'লে আছি ধ'রে ডাক্তার গমন দিয়ে যাবে ব'লে, তখন তিনি প্লাই ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বিয়ে করতে পারবেন না।"

কিরণ বলল, "আপনি কিছু ভাবলেন না, যা হওয়া

উচিত তা ভাবান ঘটাবেনই। আমি মা'কে জানিয়ে সব ঠিক করে দেবো।" ব'লেই কোনো ক্রমে সে পাগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে উঠে বৃত্তে পারল সতীশ বিয়ের বর বদল হওয়ার কথাটা জানারনি। বোধ করি জোহবশতঃ জানিয়েছে কেবল, যে সে এ-বিয়ে করবে না। সতীশটা যে কি, তা সে বিদ্-বিগ্ন বৃত্তে পারল না আজকে এই নির্মিত অবধি। কাকামশাই মনে করলেন তাকে একটা মোটা রকম ভগবানের আশ্বাস দিয়ে কিরণ বোকা মুন্সিয়ে চলে গেল। রাসের চোটে তার বেরি-বেরিকেও বৃষ্টি বা নিমিষের জড় ভুলে গেলো।

বারিতে নানা ভাবনার কিরণের ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। ভাবনার ঘুম হয়নি কি? না, তার সমস্ত মন ছাপিয়ে এমন একটা মধুরতার স্রোত বইছিল যে, এত ভাল মনের অবশ্যায় মাছের ঘুম আসে না। কেবলই ওর মনে পড়ে, মাঠা আজ রাতে কি কষ্ট পেয়েছে, কারণ, কাকামশাই যখন কিরণকে ডেকে কথা কইছিলেন তখন সে ঘরের আড়ালে শাড়ী খসল শুনেছিল এবং চ'লে যেতে যেতে নিমিষের জড় ব্যাণ্ডেজ আঁধার মায়ার পরপ্রান্ত দেখতে পেয়েছিল। কাজেই, ও কথাটা শুনেছে বই কি; এবং ওর মত তেজস্বী মেয়ের পক্ষে একথাটা কত কেশকর তা'ও সে বুঝতে পারেন। তাই যতবার ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়, বাবার বেদনার অশ্রু একটা গভীর আনন্দের উল্লেসায় ওর সমস্ত মন তারে অধীর হ'য়ে ওঠে। যেন ওর বা কিছু মনের কথা তা আর একজননের মাঝে বলীন হ'য়ে যেতে চাইছে, কিন্তু পারছে না কেন? আর একটা সময়েও থেকে থেকে ওর মনে উঁকি মারছে। সতীশকে কি মায়া চায়? তা যদি চায় তা হ'লে এ চাওয়া মোটাবার কোনো সমল তার হাতে নেই। বারি-বোয়া কিছুতেই ঘুম এল না ব'লে ভোরের দিকে বিছানায় পড়ে থাকতেও আর তার ভাল লাগল না। তখনো অন্ধকার রয়েছে। বিছানা থেকে উঠে ও পুর



শিশনের দিক্কার বাগানে বাধানে। চাপাগাছের জ্বালা  
বসতে গেল। কিন্তু এত ভোরেরও সেখানে মায়া ব'সে  
রয়েছে। গাছের ডাঁড়িতে চৈস দিয়ে ভোরের  
আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে অত্মমনঃ হ'য়ে। তার  
পীড়িত নারী-প্রকৃতির সমস্ত পুঞ্জীভূত বৈরাগ্য তার  
মুখে। প্রথমটায় সে কিরণের আসা টেরও পেল  
না। যখন পেল তখন খুব একটা আড়ম্বর ক'রে  
উঠে বাগাড়া বা সন্ধ্যাে ম'রে যাচ্ছে এমন ভাব কিছুই  
দেখাল না। নিঃশব্দে উঠে চ'লে বাচ্ছিল। তার দিকে  
চেয়ে কিরণের কিছু বলতে ইচ্ছে হ'ল না। এর দিকে  
চেয়ে কেউ কি কিছু বলতে পারে? মনে পড়ল তার  
গ্রামবাজারে - বাগ্গার কথা। তার লীলাচল  
হাতচট্টালা মনে পড়ল। তারপর দেখল সেইমাত্র  
বিনিস শয্যা থেকে উঠে আসা, বহু ক্রেশের পর শায়  
বৈরাগ্যে বেদনাজ্বর নারীর দৃষ্টি। মায়া ভিতরে চলে  
যাচ্ছিল। কিরণ অনেকটা আপন অজ্ঞাতেই অগুটপরে  
বলল, “তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?” বলতে  
বলতে তার কি বে হ'ল, কাছে গিয়ে মায়ার হাতচট্টা

আপন হাতে নিয়ে ছেলেমানুষের মত আকারের  
স্বরে বলল, “মায়া, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখত  
গেলাম আমাকে দেখা দিলে না কেন?” মায়া  
সম্মত ঘুমভাঙ্গা চোখের বিষয় নিয়ে ওর দিকে  
চাইল।

“হা জানি, তুমি আমার সামনে বেরিয়েছিলে, যখন  
তোমার কাকা বললেন, ‘মা লক্ষী পাব নিয়ে এস তো।’  
তখন তুমি সত্যিকারের লক্ষী মেয়ের মত স্বকণ্ঠকে  
পাণের ডিবে হাতে ক'রে আমার সামনে বেরলে।  
কিন্তু সে তো আদেশ পালন। সে কি আমাকে দেখা  
দেওয়া? বলতো? তখনই যদি দেখা দিতে তা'হলে কি  
আমি তোমাকে এত কষ্ট পেতে দিতুম? তোমার কষ্ট  
বে আমারও কষ্ট তা কি এখনো জান না? তোমার  
আদেশ পালনে বাস্তব লক্ষী মেয়েটির বদলে, তোমার  
মধ্যের অভিমানিনী মেয়েটিকে তখন কেন আমাকে  
ছ'চোখ ভ'রে দেখতে দিলে না?”

মায়ার চোখে জলের আভাস। বরফের মত, গাঢ়  
অত্মমনঃ বৈরাগ্যের ছায়া সে-মুখে আর নেই।

## রূপকথার দেশ

(গান)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হট্টোলায় হট্টোলের শেষে  
হাঁটা পথ সেই হারিয়ে গেছে রূপকথার দেশে।  
সেথা মন-মন্ত্রণা মিটি বুলি  
মনের বাটার জ্বালা গুলি  
কথা কও, কও না বলি ডাকছেছে এসে। (ধূম)

অফোটা ফুলের দেশটা,—ছুঁয়ে নীল আকাশের বেড়টা।  
নিরুদ্ধের মাসী-পিসি হ'লেন বনগাবাসী সেই দেশে।

দিন-ওপুরের খিড়কি পুকুর—  
কলতেছে ধূপ-ছায়া-মুকুর—  
মাছরাঙা তার বঁড়িশি ফেলায়;  
(ঘোরে) কাঁচপাশা টিপ খুঁজতে এসে।

মাঠে দেখানে ময়ূর-কজী রং,  
ঘটি সেখানে ইন্দ্রধর চং,  
গাছ সেখানে পারিজাত—  
কাক বুঁদে তার কাকডিমতে রং দিতেছে।

সকালে বৈকালে শুধু শুধু  
উলটো পড়ে কলসী-মধু;  
উড়িয়া চলে মধুমক্ষিকা,  
আটকা যেতেছে মথুরাতে শেষে।

(‘আছে’) বাবু বনে ভাবুক পাহা,  
সোনালি পাখা, স্বশীল অ'ধি,  
আছি তুমি আমি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী,—  
বাই চিনি' চিনি' ঘুমি' ঘুমি,—  
চলো সেই দেশে।

(কোরাব) সেই দেশে রে ভাই, দিনের শেষে  
পথহারা পথ-একতারা তার বাজার এসে।  
জলে চাঁদ আখর টানে  
ছলছল ছন্দে-গানে;  
সদ্যাকাশে কথা ভালে  
“বউ কথা কও” পাখীর বেশে।

## আমাদের দেশের সত্য পরিচয় দেশবাসীকে

### জানাইবার জন্য

বাঙ্গালা দেশের দেব-দেবীর যে-সব শ্রেষ্ঠ মন্দিরের পরিচয় পূর্বে প্রকাশিত হয়  
নাই, সন্দেহ বাঙ্গালীর নিকট হইতে উহাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিবরণ ও ফটো-চিত্রের  
জন্ম আমরা আবেদন করিতেছি। মূল মন্দিরাদির ও উহাদের বিভিন্ন অঙ্গের ফটো  
পাঠাইলেই বিশেষ সুবিধা হয়।

ইমানোনিট হইলে ফটো-চিত্র গ্রহণের ব্যয় ও সঙ্কলনের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।

## বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে কে রাখিবে?

জাতির নব উদ্বোধনের দিনে, জাতির পরিচয় ভালো করিয়া জানিতে  
হইবে। জাতির ইতিহাস গড়িতে হইবে—তার ঐতিহ্যের মন্দিরসম্মান করিতে  
হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করিতেছি—বাঙ্গালার সাধনার যে ধারা বড় বড়  
সাধক ও গুরুদ্বিগের মধ্যে আজও প্রবহমান রহিয়াছে, তাহার সকল তথ্য  
বাঙ্গালী জাতিকে, সকলে জানাইয়া দিন। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যে-সব সাধক  
মহাপুরুষ আজও বিত্তমান আছেন বা পূর্বে ছিলেন, তাহাদের সকল বিবরণ  
আমাদিগকে জানাইলে সাগ্রহে পত্র প্রেরণ করিব।

(ঐ বিষয়ে উত্তম প্রবন্ধের জন্ম পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।)



ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত-সংযম বৌদ্ধধর্মের প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় এই দুইটিকে 'শীলরক্ষা' এবং 'সমাধিবাননা' বলে। বুদ্ধদেবের 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গ'ের সাতটিই এই 'শীল' ও 'সমাধি'র অন্তর্ভুক্ত। কথাবার্তা, দৈনিক কর্মাদি এবং জীবিকা অর্জন সমাক্রমে নির্বাহ করাতে শীলরক্ষা বলে। কঠোর নৈতিক জীবন পালনে সমর্থ ব্যক্তিকে সঙ্গারতাগী হইয়া ভিক্ষু-ধর্ম ধারণ করিয়া মাখনাদির যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে 'সমাধি-ভাবনা' বলে। চিত্ত-সংযমের জন্ত ধ্যান-ধারণাদির যে বিধি-ব্যবস্থা তাহা দ্বিতীয় সোপান 'সমাধি'র অন্তর্ভুক্ত। এই ধ্যান-ধারণা বৌদ্ধদিগের কিছু নুসান উদ্ভাবিত নয়। যাহা বৈদিক বা বৈদিক-পূর্বে যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা তাহাই বা তাহারই রূপান্তর মাত্র। শীল ও সমাধির পর আর একটি সোপান আছে, তাহার নাম 'প্রজ্ঞা' বা 'জ্ঞান' অথবা অষ্টাঙ্গিক-মার্গের 'অষ্টম মার্গ'-'সম্যকদৃষ্টি'। ইহাতেই বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। শীলরক্ষা ও সমাধির নিয়মাদি প্রতিপাদনে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানভাবের উপায়, বৌদ্ধা-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, বৌদ্ধদর্শনের উপলব্ধি এবং অবশেষে বুদ্ধদেব বাহ্য 'পরমার্থ' সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষীভূত-করণ। এই পরমার্থ সত্যটি কি তাহা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বিভিন্ন হইলেও দৃষ্টিগোচর মধ্যে বৌদ্ধদর্শন সংক্ষেপে নিম্নলিখিত সার কথা কয়টি পাওয়া যায়, যথা—

- ১। সর্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন
- ২। সর্ব অনিত্য
- ৩। সর্ব অণুিক
- ৪। সর্ব দুঃখ

৫। সর্ব অনাস্বাদ্য বা শূন্য

৬। সর্ব শাস্ত্র বা নির্বাস্ত শাস্ত্র

নানা বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করিয়া দেখিতে পাই যে, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যকে সকলেই যুবচন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বচনগুলির ব্যাখ্যা ও বুদ্ধদেবের 'অজ্ঞাত বচনগুলির সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে খোঁজতর মতভেদ দেখা যায়।

প্রথমে 'স্ববিবর্তবাদী বৌদ্ধদের পালি সাহিত্যকেই গ্রহণ করা যাক।

'সর্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন' এই বাক্যটির অর্থ সকল সম্প্রদায়ই একই মর্মে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা এত বেশী প্রচলিত যে, প্রায় সব বৌদ্ধ গ্রন্থের শেষে এই বচনটি পজ্যাকারে দেওয়া থাকে। যেখানেই কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থ বা বিহারাদি পাওয়া গিয়াছে সেখানেই এই বাক্যের বহু প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধের উদ্ভাবিত যদি কোন দার্শনিক মত থাকে, তাহা হইলে ইহাকেই সেই মত বলিয়া গ্রেহণ করা যাইতে পারে।

'সর্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন' এই কথাটির অর্থ এই যে, জগতের যত কিছু বস্তু আছে, তাহা হেতু ও প্রত্যয়-বিধিতে। প্রত্যেক জীবের বা প্রত্যেক বস্তুর উপস্থিতির সমাবরি ও নিমিত্ত কারণ থাকে। সমাবরি কারণকে বৌদ্ধরা 'হেতু' বলে এবং নিমিত্ত কারণকে 'প্রত্যয়' বলে, যেমন 'অন্তরে' হেতু বীজ, এবং উহার প্রত্যয় জল, মাটি ইত্যাদি। সাধারণের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ এই যে, প্রথমতঃ প্রত্যেক বস্তু বা বীজ হেতু-প্রত্যয়সম্পন্ন কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; যদি দেখে উহা হেতু-প্রত্যয়সম্পন্ন তাহা হইলে জ্ঞানিবে যে উহা নখর, ক্ষণস্থায়ী অতএব ত্যাগ্য। সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, নির্বাস্তই একমাত্র অপ্রতীত্যসমুৎপন্ন, কালেক-কালেই উহাই একমাত্র অতিপ্রেরিত বিষয়।

'সর্ব অনিত্য' এবং 'সর্ব দুঃখ' এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। মোটের উপর, বুদ্ধদেবের এই তিন বাক্যের তাৎপর্থা এই যে, জগৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন, সেজন্ত উহা অনিত্য। যাহা অনিত্য, নখর ত্রাসা দুঃখময়। নির্বাস্তই একমাত্র পরমার্থ সত্য। উহা অপ্রতীত্যসমুৎপন্ন অতএব নিত্য এবং শাস্ত্র।

'সর্ব অনিত্য'—এই উপদেশই বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রাদর্শিক মতভেদের একটি প্রধান কারণ। 'স্ববিবর্তবাদী ও সর্বাধিবাদীরা এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিল যে, বুদ্ধদেব 'সর্ব অনিত্য' বাক্যটি কি 'ঐকান্তিক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? সকল বস্তুর বিশেষণ করিতে করিতে যে অণু-পরমাণুতে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই অণু-পরমাণুকে কি তিনি স্বীকার করিয়াছেন? না, তিনি অণু-পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন? তাহাদের সমষ্টিরূপে যে পদার্থ হয়, তাহাকে অনিত্য, নখর বলিয়া গিয়াছেন? 'স্ববিবর্তবাদীরা বলেন যে, তিনি 'সর্ব অনিত্য' ঐকান্তিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি অণু-পরমাণুরও নিত্যতা স্বীকার করেন নাই। অণুর সম্প্রদায় অর্থ করিলেন যে, বুদ্ধদেব অণু-পরমাণুর সমষ্টিভূত পদার্থের অনিত্যতা বলিয়াছেন; কিন্তু অণু-পরমাণুর নিত্যতা মানিয়া লইয়াছেন। শোভাক সম্প্রদায় এই বিশেষ জীব ও পদার্থাদি বিশেষণ করিয়া ৫টি ভূত (element) ধাৰ্য্য করে এবং এই ৫টি element-এর নিত্যতা মানিয়া লয়। ইহার সঙ্গে তাঁহাদের মত দাঁড়াইল—'সর্ব অতি', এবং তাঁহাদের নাম হইল 'স্বাধিবাদী'। ইহাদের ষটিক সংস্কৃত ভাষায় লেখা। 'স্বাধিবাদীদিগের এই মতবাদ বস্তুতঃ তাঁহার অভিজ্ঞতাকালে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহারা একপ্রকার 'স্ববিবর্তবাদী'। কিন্তু 'সর্ব ক্ষণিক' হেতু ও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 'স্ববিবর্তবাদী ইহার ব্যাখ্যা বলিল যে, অণু-পরমাণুর একভাবে অস্থির ক্ষণিক। সর্বাধিবাদী সেই স্থলে বলে যে, অণু-পরমাণু স্থায়ী কিন্তু তাহাদের

সমষ্টিগত স্বাধীন ক্ষণিক। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, সর্বাধিবাদীরা আমাদের বৈশেষিক দর্শন মতটাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বৈশেষিক দর্শনের মতে মূল্যবস্থা যে অসাড় নির্জীব পদার্থ তাহা এই বৌদ্ধসম্প্রদায় গ্রহণ করে নাই।

মহাবানী বৌদ্ধরা 'সর্ব অনিত্য' লইয়া এক বিশেষণ ঘটাইয়াছে। তাহারও উহা চরম 'ঐকান্তিক' অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বলে—জগতের বস্তুসমূহকে স্থায়ী ও অস্থায়ী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এবং সেই সঙ্গে বলে যে, যাহা স্থায়ী, তাহা নিত্য, পরিবর্তনহীন, চিরকাল তাহা একভাবে অবস্থান করে। সাধারণ মানব চক্ষু-স্বর্গকে যেমন স্থায়ী মনে করে, সেইরূপ। (বাস্তবিক পক্ষে মহাবানীরা চক্ষু-স্বর্গকেও নিত্য বলিয়া মনে না।) যাহা একভাবে স্থায়ী নহে, তাহা অনিত্য, পরিবর্তনশীল। অবস্থানবিশেষে তাহাদিগকে বিলুপ্ত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই জন্ত ইহারা বলে যে, যে-বস্তু অস্থায়ী, অনিত্য, তাহা কোনো কালেই স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাদের 'পারমাধিক' সম্ভাধিকিতে পারে না। জগতের জীব ও বস্তু আমাদের নিকট স্থায়ী প্রতীতমান হইলেও পারমাধিক অর্থে সেগুলি নিসঙ্গ বা নাশি। যাহা নিসঙ্গ বা নাশি, তাহা সত্ত্ব শোচনীয় বস্তুর জ্ঞান কল্পনা মাত্র। এইরূপ তর্কের দ্বারা তাহারা বুদ্ধ-মুখ-নিহত 'সর্ব অনিত্য' বচনের অর্থ এই স্থির করিল যে, জগতের জীব ও বস্তু সমগ্রই অনিত্য অর্থাৎ অবিদ্যমান এবং তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা-প্রসূত মাত্র। এই সঙ্গে 'সর্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন'—এর ব্যাখ্যা করিল যে, জগতের বস্তু যখন কল্পনা-প্রসূত তখন তাহাদের ভেদোভেদ 'পারমাধিক' (relative)। যেমন ত্বণ ও দীর্ঘ, পেষ ও কৃষ্ণ পারমাধিক শব্দ সেইরূপ জীব ও বস্তু, মাংস ও পাত পারমাধিক শব্দ মাত্র। ইহাদের 'বাস্তব সত্য' নাই। শুদ্ধরূপে 'পারমাধিক' ভাবে ইহার অবিদ্যমান। যাহা



‘পারমাথিক’ সত্য তাহার পরিবর্তন বা বিনাশ থাকিতে পারে না। ইহাদের মতে নির্লিপ্যই একমাত্র পারমাথিক সত্য এবং এই নির্লিপ্যকে সম্যকভাবে বুঝিতে না পারিয়া অবিজ্ঞান গুরুত্ব মানা করিয়া করে এবং সেই করনাজালে স্বয়ং জড়িত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম বাক্য ‘সর্বং অনাস্ব্যং বা শূন্যং’। ইহা বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ্য দর্শনমতে অহং-জ্ঞান দূর করিতে উপদেশ দিয়াও এক বা অসংখ্য চিরস্থায়ী অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। বুদ্ধের দেখিলেন যে, এই অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব করনাই অহং-জ্ঞানের মূল এবং মানবের জন্মের কারণ, সেজন্য তিনি অবিনশ্বর, পরিবর্তনরহিত আত্মার সত্তা মোটেই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধদের প্রায় সকল সম্ভার্যই অর্থাৎ সমসীয়ায় বা বাসীপূরীয়ায় বাতীত সকলেই স্বীকার করে যে, জীব পঞ্চদশের সমষ্টি বাতীত আর কিছু নহে। জীবকে সাধারণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বৌদ্ধরা দেখাইয়াছে যে, উহাতে দুই বস্তু পদার্থ দেখা যায়, এক ‘বস্তু’ বাহ্যকে বলে ‘রূপ’, অপরটি ‘মনোবাসী’ বাহ্যকে উহাদের ভাব্য বলে ‘নাম’; ‘নাম’কে ইহারা চার ভাগে বিভক্ত করে, যথা—বেরমান, সংজ্ঞা, সংসার এবং বিজ্ঞান।

এই পাঁচটি উপাদানে জীব গঠিত এবং এই পাঁচটি ছাড়া অল্প কয়েক পদার্থ বা শক্তি তাহারা বুঝিয়া পায় না। সেইজন্য তাহারা বলে যে, আত্মবাদী দার্শনিকগণ অহং-জ্ঞানের ভিত্তি নির্ধারণ করিতে গিয়া এই চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, পরিবর্তনরহিত আত্মার করন্য করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ‘অহং-জ্ঞান’ যেমন করন্য, সেইজন্য ইহার ভিত্তি ‘আত্মা’ও করন্যমাত্র। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পুনর্জন্মে কর্মের ফলাফল ভোগ করে কে?—আত্মা না থাকিলেই জন্মের মধ্যে লক্ষ্য কে করাইয়া দেয়? ইহার উত্তরে বৌদ্ধরা বলে যে, এই পঞ্চ-উপাদান-সমষ্টিগত

জীব কক্ষিক অর্থাৎ প্রতিমুহুর্তে জীবের পরিবর্তন হয়। উদাহরণ স্বরূপ তাহারা দেখায় যে, মাহুসের শরীর প্রতিদিনই পরিবর্তন হইতেছে। দৈনিক পরিচয়ে কিছু অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং দৈনিক আহার-গ্রহণে নতুন রক্ত-মাংসের সঞ্চয় হইতেছে। মনোবস্তুও মুহুর্ত পরিবর্তনের হো কথাই মাই। অল্প শব্দীয়, পুরুষের পাঁচটি উপাদান প্রতিমুহুর্তেই নব নব অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কাজে-কাজেই উহাদের প্রতিমুহুর্তেই জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, কিন্তু তাহা এত ক্ষণ ও সামান্য যে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; মাত্র যখনই পরিবর্তন নানা কারণবশত বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত হয় এবং মাহুসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখনই বলে তাহা পৃষ্ঠ হইল বা ক্রূশ হইল, বৃদ্ধা হইল বা জন্ম হইল।

ইহাতে না-হয় পুনর্জন্ম লক্ষ্যে যে প্রশ্ন উঠে তাহার সমাধান হইল। এখন কথঞ্চিৎ লইয়া বাইবার কথা কে? পাপ করিলে কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং পুণ্য করিলে সুখ ভোগ হয়—ইহা আত্মাকে স্বীকার না করিয়া কিরূপে ব্যাখ্যা করা বাইতে পারে? বৌদ্ধরা ইহার উত্তরে পঞ্চ-উপাদানের মধ্যে সংসার-উপাদানটিকে এই কথারের জন্য কথোখতি দান। তাহারা বলে যে, শিশু হুমিষ্ট হইয়া মাত্র আহার চায়, কে তাহাকে আহার করাইতে শিখাইল? তাহার মাতৃস্তন হইতে আহার সংগৃহীত হইবে ইহাও সে জানে। তাহাই বা কে শিখাইল? এই প্রশ্নের সমাধানে বৌদ্ধরা বলে যে, পঞ্চ-উপাদান কক্ষিক পরিবর্তনশীল হইলেও অসংহতমান চলিয়াছে। এই ক্ষণ-পরিবর্তনশীল ‘সংসার’ই যেমন জীবের মধ্যে সদাই বিরাজমান, সেইজন্য মৃত্যুর পর উহা তৎক্ষণেই অল্প অবস্থা গ্রহণ করে। এই সংসার মানবশতকে মাতৃস্তন পান করায়, এবং হৃদয়ের শিশু মাতৃস্তনের অশ্রুতে না করিয়া অজ্ঞান প্রাণের সন্ধান বরে। কর্ম-অনুযায়ী জীবের সংসার এবং জীব সংসারভিত্তিক।

মহাবানী বৌদ্ধরা জাগতিক জীব ও বস্তুকে যখন করন্য-গ্রহণত বলে, তখন তাহারা চিরস্থায়ী ও

পরিবর্তনরহিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেই পারে না। এমনকি উহার পঞ্চ-উপাদানের সত্তাও স্বীকার করে না অর্থাৎ উহাদের ‘পারমাথিক’ ভাবে নিত্যতা বা স্থায়িত্ব মানে না। বৌদ্ধ দার্শনিক-দিগের ভাব্য বস্তুতে গোল বসিত হয় যে, হীনবানী বৌদ্ধরা ‘পুণ্ড্রকশূন্যতা’ মানে, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; কিন্তু ‘ধর্মের’ অর্থাৎ বস্তুর অর্থাৎ পঞ্চ-উপাদানের সত্তা স্বীকার করে এবং মহাবানী বৌদ্ধরা ‘পুণ্ড্রক’ ও ধর্ম, ইহা স্বীকার করার subject ও object—দুইয়েরই শূন্যতা প্রতিপাদন করে। ইহাদের মতে জগতের সত্তা করন্যমাত্র, শব্দর বাহ্যকে মাত্র বলিয়াছেন। সেইজন্য তাহারা ‘সর্বং অনাস্ব্যং’ এবং ‘সর্বং শূন্যং’ এই দুইই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

হীনবানীরা কেবল জগতের ‘সর্বং অনাস্ব্যং বা আনন্দীয়েন শূন্য’ অর্থাৎ সত্তার ব্যক্তির অত্যা প্রতিপাদন করে।

এইবার আমরা শেব ব্যাকটির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ‘সর্বং শাস্ত্র বা নির্লিপ্য শাস্ত্র’ ইহার তাৎপর্য কি? হীনবানী বৌদ্ধগণ নির্লিপ্যকে শাস্ত্রময় অবস্থা প্রেমিত্ব বিষয় ইত্যাদি বিশেষ দিয়াছে। তাহারা বলে, এই জগৎ জন্মের, আমরা সাধন-ভজনের দ্বারা শাস্ত্রময় নির্লিপ্য অবস্থা পাইতে পারি। আকাশ যেমন চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র ও বিনাশরহিত সেইজন্য নির্লিপ্যও চিরস্থায়ী, শাস্ত্র এবং অসংসৃত অর্থাৎ সমসিদ্ধিত নয়। ঐ নির্লিপ্যে ব্যক্তিক থাকে না, সর্বজীব একীভূত হয়। কিন্তু মহাবানী বৌদ্ধরা এইজন্য নির্লিপ্যকে পারমাথিক নির্লিপ্য বলে না। তাহারা এই নির্লিপ্যকে উচ্চ শাস্ত্র অবস্থা বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু উহা স্বর্ণের মত বা বর্ণাণ্যগত উচ্চতার অবস্থা হইলেও, তাহারা বলে, উহা পরমার্থ সত্য না হওয়ায় চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহাদের নির্লিপ্য ‘পরমার্থ’ স্বত্বকেই বুঝায়, যে ‘পরমার্থ’ সত্য বা নির্লিপ্য সদাই বিজ্ঞান, নিগুণ ও অনিচ্ছানীয়।

জীব অবিজ্ঞান হইয়া নির্লিপ্যের পতাব কি প্রকার

তাহা বুঝিতে পারে না। না বুঝিয়া তাহারা নির্লিপ্যের উপর সমসারের আরোপ করিয়া থাকে। সঠিক দৃষ্টি-শক্তির অভাবে সাধারণ মানব যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ করে, এবং গুণ আরোপ করে না—ঐ আরোপ বা ভ্রম-গ্রহণত কার্যাদি (যেমন পদ্যমান ইত্যাদি) করিয়া থাকে, সেইরূপ অবিজ্ঞান জীব নির্লিপ্যকে সমসাররূপে দেখে। যে নির্লিপ্য শাস্ত্র, উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত তাহাতে জীবও বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি দেখে। যখন তাহাদের অবিজ্ঞান দৃষ্টিভূত হয়, তখন তাহারা নির্লিপ্য মাত্র দেখিতে পায়, উহার উপর আরোপিত জগৎ স্বপ্নাপলভ্য বিষয়ের ছায় আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বাহার এইজন্য জ্ঞানলাভ হয়, মহাবানীরা ঠাণ্ডাকেই নির্লিপ্যপ্রাপ্ত বলে।

এইজন্য নাপার্শ্বন নির্লিপ্যকে প্রপঞ্চের উপসম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নির্লিপ্যের পতাব এই বিখ্যাত শ্লোক দ্বারা জানাইয়াছেন,—

“অপ্রাথম্যপ্রাপ্তমুচ্ছিন্নদশাখং।”

অনিরুদ্ধমহুংসমেতদ্বিলাদ্যনুচ্যতে ॥”

যাহা তাহাদের বা প্রাণির বিষয় নহে, যাহার লক্ষ্যে শাস্ত্র বা অশাস্ত্রত বলা যায় না, যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাহাই নির্লিপ্য। এই মতকে অনেক শব্দের ওদ্ভাব বসিতে চান; কিন্তু শব্দর ও মহাবানী মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, শব্দর ওদ্ভাবকে নির্লিপ্য বলিয়া বিশেষিত করিলেও উহাকে গুণ-বিশিষ্ট না দিয়াছে, যথা—ওদ্ভাব সদ্ধিমান অর্থাৎ তিনি সব, চিত্ত এবং আনন্দময়। পঞ্চান্তরে মহাবানীরা ইঙ্গিতে ‘সর্বং’ বলিলেও পঞ্চরূপে ‘সর্বং’ও বলিতে চায় না, উহা ‘অব্যক্ত বা অনিচ্ছানীয় এই ছাড়া আর কিছু বিশেষ প্রয়োজ্য করিতে চায় না। তাহারা নির্লিপ্যের অপর নাম দিয়াছে ‘তথতা’ বা ‘শূন্যতা’। ‘শূন্যতা’ অর্থে নির্লিপ্য যে গুণশূন্য এবং ‘তথতা’ অর্থে নির্লিপ্য যে একতাবগত বা তথ্যতাবগত—ইহাই তাহারা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।





## বিমানপথে চলার ভবিষ্যৎ

শ্রী সুবিনয় রায় চৌধুরী

“পাখী যদি জানার সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে, মানুষই বা কেন কৃত্রিম জানার সাহায্যে আকাশে উড়িতে না?”—এ কথা মানুষের মনে বহুকাল পূর্বেই জাগিয়াছে এবং মানুষ জানার সাহায্যে উড়িবার চেষ্টাও করিতেছে বহুকাল হইতেই। সেন্টো ব্রুবার বিফল হওয়ার পর ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে অটো লিপিওহোল নামে এক জার্মান ভরস্কা প্রথমে ঐক্লপ জানার সাহায্যে উড়িয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করেন। বাল্টিক সমুদ্রে

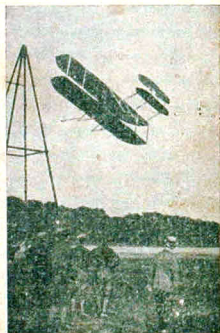


অটো জানার সাহায্যে শূন্য উড়া

লিপিওহোল

ধারে একটি পাহাড়ের উপরে উড়িয়া, জানার সাহায্যে মনে লাভ দিয়া, আশ্বে আস্তে বাতাসে ভাসিয়া পাখীর ভাব শূন্যপথে বহুদূর চলিয়া তিনি নীচে নামেন। হঠাৎ বিহর, পাঁচ বৎসর এক্সপেরীমেন্ট করার পর একদিন তিনি উড়িতে গিয়া মাটিতে পড়িয়া যান এবং সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া নানা পরীক্ষার ফলে এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে, আমেরিকার রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় একটি এরোপ্লেন তৈরী করিয়া আকাশপথে প্রথম এরোপ্লেন চালান। তখন প্রতি শত হাত উড়িতে পারিলেই যথেষ্ট



রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেন আকাশপথে প্রথম উড়ার দৃশ্য

মনে হইত। দেখিতে দেখিতে এরোপ্লেনের ক্রমোন্নতি হইয়া ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী এরোপ্লেন-চালক বেরিয়ো সাহেব এরোপ্লেনে ইংলিশ প্রণালী পার হ'ল। এরোপ্লেনে

৫০ মাইল ঘণ্টা তখনকার দিনে অভাবনীয় ব্যাপ্তার মনে হইয়াছিল এবং তিনি তৎক্ষণ ১০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান। তখনকার দিনের এরোপ্লেনও ছিল এখনকার এরোপ্লেনের তুলনায় নিতান্ত হেলেবেলা। রেষমী কাপড়ে ঢাকা জানা নিতান্ত হালকা, পদ্কা, জিনিষ; রুটি, ঝড়, কুয়াসা সহজেই তাহাকে কাবু করিত। তাহার এঞ্জিন ছিল বাম-খেয়াবী; কখন যে চুট হরিয়া বদ হইয়া যাইবে, বলা মুশিল। এক্সপ এরোপ্লেনে চড়িয়াই তখনকার দিনের চালকপণ প্রাণ হাতে করিয়া আকাশপথে চলাফেরা করিতেন, এবং তাহাদের সাহসের ফলেই এরোপ্লেন এত উন্নত হইয়া আজ আকাশ জয় করিতে চলিয়াছে।

বিমানযাত্রার ইতিহাসের কথা লিখিবার পান এখনে নাই; বিমানযাত্রার ও বিমানপোতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ‘চারটার’ কথা লিখিতে ইচ্ছা করি। এখনকার এরোপ্লেন মজবুত ধাতুর তৈয়ারী, জল-ঝড়ে তাহাকে সহজে কাবু করিতে পারে না; তাহার এঞ্জিন শত শত মাইল চলিবার ঠিক থাকে; এরোপ্লেনে বসিবার জায়গাটি পরিপাটি, বেশ আরামে বসা যায়; ভিড়ের যত্নপাতি আছে, তাহার সাহায্যে দিক, গতি প্রভৃতি সহজেই নির্ণয় করা যায়; চালাইবার যত্নপাতিও সহজ এবং মজবুত। ইহার বেগও কিছু কম নয়; ঘণ্টায় ৮০ হইতে ১৫০ মাইল নিরাপদে যাওয়া চলে। পথে চলাফেরার সময়ও পদে পদে সাহায্য পাওয়া যায়—জল-হাওয়ার খবর (Weather-report), স্থানে স্থানে নামিবার ব্যবস্থা (Landing ground), পোষ্টুলের ব্যবস্থা, কুয়াসার সময় সঙ্কেতিক চিহ্নের, আলোর বা শব্দের (Fog-signal), ভূমির সহিত টেলিফোন ও রেডিও-সাহায্যে কথা বলিবার সুবিধা প্রভৃতি চালককে সাহায্য করে।

এ সকল সুবিধা সত্ত্বেও বিমানপথে যাত্রায় যথেষ্ট অসুবিধা এবং বিশপ খটকের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে; ভবিষ্যতে কি করিয়া তাহা দূর করা যায় তৎক্ষণ এখন বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

এরোপ্লেনের একটি প্রধান অসুবিধা, হঠাৎ নামিবার প্রয়োজন হইলে বড় মরদান ছাড়া নামিতে পারে না। কোন কোন এরোপ্লেনে জলের উপর ছাড়া নামিতেই পারে না। এক্সপ ক্ষেত্রে, এমন কি ব্যবস্থা করা



আধুনিক ‘অটো-পাইরো’। ইহা বলে নামে। জানার থাকার সাহায্যে এরোপ্লেনের সঙ্গে অনেক প্রবেশ।

চলে যাওয়ায় এরোপ্লেন সহজেই অল্প পরিসরের মধ্যে মাটিতে নামিতে পারে? অটো-পাইরো নামক এরোপ্লেন এই সমস্যার সমাধান করিবার উপায় বলিয়া বিদ্যাছে। এই এরোপ্লেনের উপরে একটি

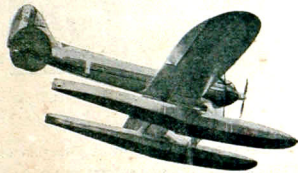


জানারী ‘অটো-পাইরো’। ইহাকে ‘উড্‌স্‌ মোটর’ বলা চলে। ভবিষ্যতে এই ধরনের এরোপ্লেনের চালন হওয়ার সম্ভাবনা।

বিরাট পাখা থাকে, উহা ছেলেদের খেলার “উড্‌স্‌ পাখী”র পাখার মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া এরোপ্লেনকে প্রায় সোজা আকাশপথে উড়তে টানিয়া তুলিয়া লয়; তাহার পর এরোপ্লেন যেদিকে ইচ্ছা চলিতে পারে। নামিবার সময়ও এই পাখা অল্প পরিসরের মধ্যে নামিতে সাহায্য করে।



ক্রতবেগে চলার সময় এরায়েন বাতাসে বাধা পায়, সেজন্য বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারগণ এরায়েনের গঠনের নানাক্রম পরিবর্তন করিতেছেন, বাধাঘারা যন্ত্রের ভিত্তি-চারি শত মাইল বেগে গেলেও বাতাসের বাধা বৃদ্ধি কমাই হইবে। ১৯৩১ সালে ইটুরোপের বিখ্যাত হাইডার কাপ্ প্রত্নিযোগিতার ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে যে এরায়েন পাঠান হইয়াছিল তাহা প্রত্নিযোগিতায় প্রথম হয়। উহা একবার যন্ত্রের ৪১২ মাইল বেগে



হাইডার প্রত্নিযোগিতার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী এই ইটুরোপেট যন্ত্রের ৪১২ মাইল বেগে প্রত্নিযোগিতা করা হইয়াছিল। বাতাসের বাধা অতিক্রম করিবার জন্য প্রকার ব্যবস্থা এই এরায়েনে করা হইয়াছে।

চলিয়াছিল। এক্ষণে ক্রতবেগে উড়িলে কলিকাতা হইতে বঙ্গবান বাইতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগিবে। অবশ্য এক্ষণে দ্রুত বেগ অতি অল্প সময়ের জন্যই রক্ষা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে বেসকল ক্রতগামী এরায়েন দৈনিক কালের জন্য ব্যবহার করা হইবে, তাহার গতি গড়ে যন্ত্রের ২৫০/৩০০ মাইল হইবে এক্ষণে আশা করা যায়। বাতাসের বাধা কমাইবার জন্য উহা অতি উচ্চে উড়িবে; নিম্নবাসের কষ্ট এবং গিমনের উপদ্রব দূর করার জন্য এই সকল এরায়েনে অগ্নিজ্বলের ব্যবস্থা থাকিবে; চালকের বসিবার ঘরে বাহিরের বাতাস দ্বারাতে প্রবেশ করিতে না পারে এক্ষণে ব্যবস্থা থাকিবে।

অজ্ঞাত পথে, পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়া সন্ধ্যায় বা রাতে একা এরায়েনে উড়িয়া যাত্রা যে কত বিপজ্জনক, সহজেই বুঝিতে পারেন। ডাক-বাঠী

এরায়েনের চালকগণকে প্রতিনিয়ম বা প্রতিরাতেই এক্ষণে কাজ করিতে হয়। উড়িতে উড়িতে ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াসা প্রভৃতি হো বাধা দিতে পারেই; আশ্রয়ের ভয়, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার ভয়ও রয়েছে। আভ্যকাল প্যারাসুটের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় দুইটনায় প্রাণ-নাশের ভয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে যায় নাই। আশ্রয় লাগিলে হঠাৎ নামিবার প্রয়োজন হয়; —সে সময় যদি দেখা যায়, প্যারাসুটে আশ্রয় লাগিয়াছে, তাহা হইলে চক্ৰবর্তী! হারি পিডেভার নামে এক যুবক যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A.) ডাক লাইন আকাশ-পথে রাতে উড়িয়া যাইতেছিল; হঠাৎ এরায়েনে



হারি পিডেভার যখন এরায়েন হইতে ডাকের বস্তা লইয়া লাফাইয়া পড়িতেন। পিচনে যখন প্যারাসুট দেখা যাইতেন।

আশ্রয় লাগে। তখনই ডাকের চিঠির বস্তা বদল দাড়া, ফিরিয়া প্যারাসুট লইয়া সে লাফ দিল। প্যারাসুটে আশ্রয় লাগায় শূন্যপথেই প্যারাসুট ছাড়িয়া দিয়া সে প্রাণ হাতে করিয়া অজ্ঞাত ক্ষেত্রে লাফ দিল। তাহার পরে যে কিসে ঘটিল সে জানে না। পরদিন পাহাড়ের উপর তাহাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেল। —কিন্তু, ডাকের বস্তাটি তখনও তাহার বগলে! হায়পাতাবে কিছুকাল চিকিৎসার পর তাহার চেতনা হয়। শ্রুই হওয়ার পর সে তাহার কাহিনী বর্ণনা করায় এক্ষণে বিপদের প্রতি সরকারী বিভাগের বিশেষ নজর পড়িল। এই দুইটনায় এবং এক্ষণে আরও কয়েকটি দুইটনায় ফলে, অদাতা পোষাক, প্যারাসুট ও এরায়েন লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিবে এবং আশা করা যায় শ্রুই আশ্রয়ের ভয় আর থাকিবে না।

মায়ায় উজ্জল থাকে; কিন্তু, যথা-তথা নামিতে হইলে সুগিল। এক্ষণে অবস্থায় "শূন্য-ঝোলা মশাল" ভিন্ন উপায় নাই। এক্ষণে মশাল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখাও হইয়াছে। একবার মশাল জালিয়া ছাড়িয়া দিলে শূন্যপথে ইহা বহুক্ষণ জলিতে থাকিবে এবং চারিদিকের জনকে উজ্জল আলোকে ভাসাইয়া দিবে।

কুয়াসা এরায়েন-চালকের শত্রু। কুয়াসা-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ আদোজে পথ চলিতে হইবে। কিন্তু, এই কুয়াসার মধ্যেও আভ্যকাল নানাক্রমের যন্ত্র ও আলোকের সাহায্যে এরায়েন-চালক পথের সন্ধান পাইতে পারেন। নীচের জমি হইতে শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার সাহায্যে চালক মাটির দূরত্ব বাহাতে নির্ণয় করিতে



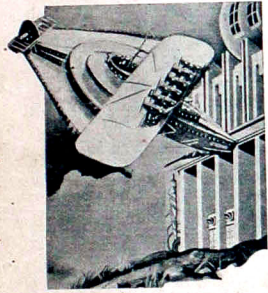
ম্যাবস্তার অন্ধকার রাতে এই ফটো তোলা হইয়াছে। ঐ দিকের এরায়েনটি "শূন্য-ঝোলা মশাল"ের সাহায্যে এই মাত্র মাটিতে নামিল। সেই মশালের আলোতেই ছবিটি তোলা হইয়াছে।

এঞ্জিনে শ্বেটালের পরিবর্তে বালতেল (Crude Oil) ব্যবহার করিলে আশ্রয় দরার ভয় থাকিবে না। জায়েবীর যন্ত্রাস (Junkers) কোম্পানী এক্ষণে এঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ইহার চল শীঘ্রই হইতে পারিবে।

অন্ধকার রাতে মাটিতে নামিবার প্রয়োজন হইলে এরায়েনকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। নীচে নামিবার জমি (Landing-ground) থাকিলে তাহা আলোক-

পারেন, এক্ষণে যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। লাল আলোর সাহায্যে কুয়াসা ভেদ করারও চেষ্টা হইতেছে। "অতি-লাল" (Infra-red) আলো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু, এই আলোর কুয়াসা-ভেদী ক্ষমতা অসাধারণ। এক্ষণে আলোর সঞ্চেতের সাহায্যে কুয়াসা ভেদ করার চেষ্টা হইতেছে। কুয়াসাকে আবশ্যকমত জ্বালাই দিয়া অল্প জায়গা জুড়িয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া ফেলার উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা হইতেছে।

ভবিষ্যতে আৱোহী লাইফ বাইবাৰ জন্মই অতিকায় এৰোপ্লেন চলাচল কৰিব। এক্সপ এৰোপ্লেন লাইফ পৰীক্ষাও হুইয়া গিয়াছে। জাৰ্মেনীৰ “Do X” নামক এৰোপ্লেন প্ৰায় ১৫০ জন আৱোহী লাইফ শূণ্যতে শত শত মাইল উড়িয়া প্ৰমাণ কৰিয়া দিয়াছে যে, অতিকায় এৰোপ্লেনেৰ চপ হওৱা অসম্ভৱ নহৈ। এই এৰোপ্লেনটোৰ নিৰ্মাণেৰ সময়ও নাকি অজ্ঞাত দেশেৰ বিশেষজ্ঞেৰা বলিয়াছিলে, “ইহা কোনদিন উড়িব



ভবিষ্যতেৰ অতিকায় এৰোপ্লেনেৰ পৰিকল্পনা। শত শত যাত্ৰী লইয়া যতাব ২০০ মাইলেৰও অধিক বেগে চলিতে পাৰিব। ইহাতে বেড়াইবাৰ ও খেদিবাৰ স্থান থাকিব—অজ্ঞাত স্থিতি তো থাকিবই।

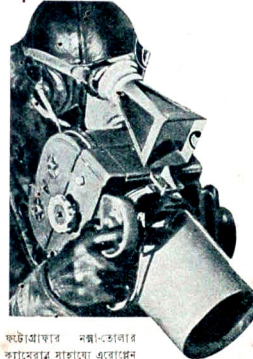
না।” ভবিষ্যতৰ অতিকায় এৰোপ্লেনে নাকি বেড়াইবাৰ স্থান, বলিবাৰ নৰ, খেদিবাৰ জাগুণ, সবই থাকিব। ভবিষ্যৎ সম্ভৱ নানা জন্মনা-কল্পনা চলিতেছে। অনেক বলন, ভবিষ্যতে যত্নেৰে ছাদে এৰোপ্লেনেৰ নামিবাৰ বাবজা থাকিব এবং মোটৰেৰে পৰিবৰ্তে এৰোপ্লেনেই এক-ভাড়া ও-বাড়া মাতায়াত চলিব। ছোট শহৰে বা গ্ৰামে এক্সপ বাবজা থাকিতে পাৰে, কিন্তু বড় শহৰে এক্সপ হওৱা অসম্ভৱবাহত। কাৰণ, শহৰে

বাড়ীঘৰ এত কাছাকাছি যে, দুখটোৱাৰ ভয় অতাহ বোধী থাকিব। “আনান্দি” চালক চিকালই থাকিব, কাজেই, দুখটোৱাৰ ভয়ও থাকিব।

আকাশ-জাহাজেৰে (Airship) ভবিষ্যৎ কিৰূপ হইবে এখনও ভাল কৰিয়া বহা যায় না; তে, এখনকাৰ প্ৰধান বিপদটো তখন থাকিব না। এতকাল হাইড্ৰোজেন গ্যাস দ্বাৰা আকাশ-জাহাজেৰে খেপা ভৰ্তি কৰা হইত। হাইড্ৰোজেনে আশুনি লাগিলে দাৰণ শৰে কাটিয়া জাহাজেৰে দক্ষা শেষ হইয়া যায়। এখন হিলিয়াম (Helium) গ্যাস দ্বিধা খেল ভৰ্তিৰ বাবজা হইতেছে। ইহা হাইড্ৰোজেনে অপেক্ষা গৰা এবং অদাহ। আকাশ-জাহাজেৰে খেপা বিৰাট আকাৰেৰে হয় বলিহা ইহাৰ বাবজাৰ পূৰ বোধী হইবে আশা কৰা যায় না। এৰোপ্লেনে অপেক্ষা আকাশ-জাহাজে বোধী আৱামে চলকোৱা কৰা যায় এবং দূৰদেশে যাওৱাৰ পক্ষে আকাশ-জাহাজ সুবিধাজনক।

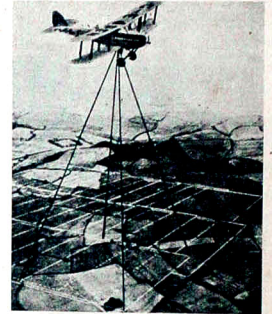
এৰোপ্লেনেৰ উন্নতিৰ সৰে সৰে ইহাৰ কাৰ্য্যকৰী শক্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাক ও আৱোহী লাইফ যাওৱা, মালপত্ৰ বহন কৰা, শূণ্যত্বে উড়িয়া জঙ্গল পাহাৰা সেৱা ইত্যাদি কাজ হৈ বহুদিন হইতে এৰোপ্লেনেৰ সাহায্যে কৰাই হৈছে। বৰ্তমানে এৰোপ্লেনেৰ সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে হাস্পাতালে লইয়া যাওৱা হইতেছে, দূৰস্থ ৰোগীৰ ঔষধ এৰোপ্লেনেৰ সাহায্যে অতি অল্প সময়েৰে মথো পৌহাইয়া দিয়া ৰোগীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা হইতেছে, দুৰ্গম স্থানে এৰোপ্লেন হইতে মাটিতে খাবাৰ কেলিয়া দিয়া আনহাৰাজিৰ ব্যক্তিকে ৰক্ষা কৰা হইতেছে, সমুদ্ৰে নিমজ্জমান জাহাজেৰে আৱোহীবিগকে এৰোপ্লেনেৰে সাহায্যে বাচান হইতেছে, এৰোপ্লেন হইতে বিখ-বাৰু প্ৰয়োগ কৰিয়া অনিষ্টকাৰী পতঙ্গৰে হাত হইতে কেতৰে কলত ৰক্ষা কৰা হইতেছে। ইহা ছাড়া, এৰোপ্লেন হইতে জমাট দ্ব্যনিকাস্তাৰ বায়ু (Solid Carbon Dioxide) হাৰা মেখেৰে উপৰ নিৰ্গমে কৰিয়া কৃত্ৰিম বৃষ্টি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা হইতেছে।

এৰোপ্লেনেৰ সাহায্যে দেশেৰ নক্সা (Map) প্ৰস্তুত কৰা, একটো অতি আবশ্যক কাজ। এই কাজ কৰিতে সমগ্ৰও অল্প লাখে, কাজটিও পৰিপাটি ও নিতুল



ফটোগ্ৰাফাৰ নক্সা-তেজাৰ কামেৰাৰ সাহায্যে এৰোপ্লেন হইতে ফটো তুলিতেহয়।

হয়। এ কাজেৰ যত্নপাতিৰ জন্মোপ্ত হইয়া আজকাল এত সুন্দৰ এবং সঠিক হইয়াছে যে, এই সকল আকাশ-ফটোৰ নক্সা দেশ-বিশেষে বাবজা কৰা হইতেছে। এই কাজেৰ জন্ত এৰোপ্লেনটিকে উড়িবাৰ, সময় জমি হইতে



কিৰ কিৰ ফটো তুলিয়া, সেগুলি কাটিয়া ছোড়া লাগাইহা কি ভাবে আকাশ হইতে জমিৰ নক্সা হৈহাৰী কৰা হয় তাহাই দেখান হইয়াছে।

একটি বিশেষ উচ্চতায় ৰাখিতে হয়। ফটোগ্ৰাফাৰ পৰ পৰ শত শত ছবি তুলিয়া বাইতে থাকেন; পৰে সেগুলিকে ছোড়া দিয়া একটো বড় নক্সা প্ৰস্তুত কৰা হয়। আবশ্যকমত নক্সাটি ছোট কৰিয়া লওৱা চলে। জলপ্ৰাবনেৰ সময় এৰোপ্লেন হইতে প্ৰাৰিত দেশেৰ ফটো লইহা অনেক আবশ্যক তথা সাগ্ৰেত কৰা যায়; প্ৰাৰিত দেশেৰ নক্সাও কৰা যায়। ভবিষ্যতে



সোভিয়েট ৰুশিয়াৰ বিৰাট ক্ষেত্ৰে এৰোপ্লেনেৰ সাহায্যে বীজ ছড়াই হইতেছে।



এই বিষয়ে আরও উল্লিখিত হইয়া শেষে হয়তো সব নম্মাই এরোগেন হইতে কটো তুলিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে।

বীজ বপনের কাজেও এরোগেনের সাহায্য লওয়া হইতেছে। রুশিয়ার “জাইগান্ট” (Gigant) নামে বিরাট শক্তির প্রস্তুত করা হইয়াছে। আকারে তাহা বেলজিয়ামের মতন বড়। একপ্রকার আরও ক্ষেত্র-স্থাপনের উদ্দেশ্যে হইতেছে। এই সকল বিরাট ক্ষেত্রে এরোগেন হইতে বীজ ছড়াইবার স্টো খুবই সফল

হইয়াছে। এক মিনিটে প্রায় তিন একর (Acre) জমিতে এই উপায়ে বীজ ছড়ান চলে। ভবিষ্যতে রুশিয়ার উন্নতির সঙ্গে বৃহত্তম ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া এবং এরোগেনের সাহায্যে সেখানে বীজ ছড়াইবার আরোগেন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরোগেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখা সম্ভব হইল না। বাহা লেখা হইল তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে এরোগেনের কার্যকারিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

“সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপ একবারে ভিতর হইতে বিগুপ্ত, বিলীন হইয়া বাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সসারের তাহার সহস্র বাহা ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্য সাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভাগকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে দ্বন্দ্বের ধন করিয়া তোলে। ফলাফল নির্ণয় ও বিভাবিকা দ্বারা আমাদেরকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্ম-নীতির আলোচ্য হইতে পারে—কিন্তু উচ্চ সাহিত্য অন্তরাবস্থার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়—তাহা স্বভাব-নিমিত্ত অশ্রদ্ধার দ্বারা কলঙ্ক স্ফালন করে, আন্তরিক দ্বন্দ্বের দ্বারা পাপকে দৃঢ় করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অত্যাধীন করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

## প্রবাস-মাতা

শ্রীকালিদাস রায়

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হইতে বাহিরিয়া সেদিন যখন সন্ধ্যার-পথে “আমি নবযাত্রী উদ্ভাসিত-নয়ন সহায়-সমর্থ-হীন, তুমি মোরে করিলে আত্মনা; মেহভরে তব শ্রাম অঙ্গ ‘পরে দিলে মোরে স্থান। তার পর হ’তে তুমি অন্ন দিয়া, দিয়া শিখিচ্ছায়া, দিয়া ফল, স্বচ্ছ জল পোষণ করিলে এই কায়া কত নূর যাতনা-যত্নে। তুমি মোর নব বধুটির সজিনা-ফলের লাজ ছড়াইয়া, দখিলা-ও-শিরে করিলে বরণ, মাগো! বনমাত্রী করিয়া চরন নিজ হাতে রচিচ্ছলে প্রবাসের বাসর-শরন। নিরুদ্বেগ শাস্ত্রিয় প্রীতিময় প্রকুল বিশ্রাম; জীবনের রসধন অংশটুকু স্থখে বাণিলায় তোমারি অঞ্চলছায়ে।

এল আজি বিদায়ের দিন; উদ্বেগি উঠিছে প্রাণ হেরি’ তব মুখশ্রী মলিন, এ পান্যবৎ ফাটি’ বর্ষাধন করে তপ্ত জল, ভিজায় তোমার শ্রাম দেবদারু-ভগ্নের অঞ্চল।

তোমার ভাগ্যের ভরা, নহ দীনা, নহ মা ক্লপা; তব বিদায়ের দিনে আজি মোর ব্যাকুল প্রার্থনা—অচলা থাকুন লক্ষ্মী তব গৃহে। তোমার সন্তান তেজস্বী যশস্বী হোক আরো স্বর্ষী আরো শুদ্ধিমান;

তব বিভাগীধানি দীক্ষা দিয়া তোমার সন্তানে পাঠ্যক মা দেশে দেশে নব নব জ্ঞান-অভিযানে অজিতে বিজয়-মালা।

গোবিন্দের মন্দিরে তোমার সন্ধ্যারত করক, মা, পাচতর ভঙ্কির সন্ধ্যার তোমার সন্তান-বক্ষে। রসপূর্ণ তোমার প্রাঙ্গণে দেখানে রজত ফলে দেখা যেন ফলে, থরে থরে কবিতা কাকন, মণি।

বেড়ে যাক চম্পার গৌরব, শেফালি-বকুল যেন দ্বন্দ্বতর হয়, মা, সৌরভ পবনে করিতে গন্ধ। আরো শিখি হোক তব ছায়া; লতা যেন হ’য়ে আরো পীনতরা যনলক্ষ্যকায়া সবল তরুরে তব বাঁধে আরো নিবিড় বন্ধনে।

তোমার অঙ্গন যেন ভ’রে যায় তুলসীর বনে। কেন তা তো জান তুমি। জানি যেহ তব পয়সিনী, পোকুলের গুচ্ছি তোমা দিক্ তারা হইয়া ‘নন্দিনী’।

তব সন্ধ্যাদীপালোক চিরদিন তোমার কুটীরে পড়ুক মমতা-ভরে আশ্রয়ার্থী পথিকের শিরে। বনের হরিণীমা ছহিতারা তোমার সরলা, সৌখিনী সিন্দুর-লেখা তাহাদের হউক অচলা। দূরে যায় আজি, মাগো, তব চিত্তপণ্ডের ভ্রমর, জুগিরে না, গুহ্যরঞ্জে করিলে সে তোমারে অমর।

## নব্য-সাহিত্যের নীতি

বব্ববু

আমাদের সাহিত্য-প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরু প্রশ্ন উঠেছে—তাদের উৎপত্তি সাহিত্যের সমীচীনতা প্রশ্ন নয়, বিবেচনা করি—সাহিত্য-সম্পর্কে “দ্রবণ কর শেখের সেদিন কি ভাবের” এমন-কোন-কিছু নিদর্শন শব্দায় যখনই নাই।

তথ্য-কবিতা নব্য-সাহিত্যের মোটামুটি এই কটি দিক নিয়ে বিতর্ক হইছে, যথা, (১) এ সাহিত্য কল্পিত অর্থাৎ নীতির হানি ঘটায়, আর এই মূল হ্রস্বেরই একটি শাখা আছে যে এর বিষয়বস্তু (Themes) অন্তর্ভুক্ত, (২) এ জাতীয় সাহিত্য নয়, বৈদেশিক এমন কোন কিছু আন দানী করা হইছে বা কিছুতেই এখানকার জনহৃদয়ের উপ-যোগী নয় (un-acclimatisable)।

(৩) সাহিত্যের যে সমাধি নিয়মের দাবি আছে, সে-কথা নব্য-সাহিত্যে বাধ্যগত গুরুত্ব পাচ্ছে না—হয়ত অস্বীকৃতিই হচ্ছে—এ কথাটিও ১ম এর অন্ত একটি দিক মাত্র। প্রসিদ্ধ নাম ও বচন উদ্ধৃত করার উপকারিতা নিশ্চয় করা একটি শব্দ, কেননা তেমনি বচনান্তরের অন্তর খটবার সত্তাবনা দেখি না। বীরের জন্ত লেখা,

তাদের সহজ বুদ্ধির বিচারই প্রার্থনা করি। তাদেরই কাছে মোটাকয়েক কথা মুখো-মুখী সহজ-সোজা ভাবে নিবেদন করতে চাই।

কোন কোন পণ্ডিত, মনে হয়, সাহিত্যের কোন কঠিন অনাড় আদর্শ ধরে নিয়েছেন। বৌদ্ধদর্শনে এই কথাটি নিয়ে খুব জোর দেওয়া হয়েছে—আইন

হাইনের “খিওরী অফ রিলেটিভিটি”র দার্শনিক ব্যাখ্যা ইওয়ার্ড চের আপের যুগে—জাগতিক সকল ব্যাপারই “সম্পৃক্ত” (Relative আপেক্ষিক) সত্য; যে-কোন আদর্শেরই তা’হলে প্রকৃতি ও ঘটনার পরিবর্তন ঘটা শুধু সত্ত্ব নয়, বাস্তবিক—সাহিত্য-দর্শও সে কোঠায় পড়ে।

কথাটা ঐতিহাসিক সত্য। কয়েকটি সং-জন-পরিচিত ঘটনার উদাহরণ দিলেই

কথাটা পরিষ্কার হয়। বিভাঙ্কশ্বরের, কি-পাটানার, হাক-আখতাযের ও যুগ ছিল—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরও কাল ছিল, মধু-হেম-নবীনচন্দ্রেরও সময় এসেছে। গিয়েছে—দরীদ্রনাথের যুগও গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-বিপ্লব ও শরৎচন্দ্রের নবযুগ সবই মনে

[ ইহার বাকী অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় ]

## আধুনিক কথাসাহিত্য

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও কথ্য-সাহিত্য—ছোটগল্প, উপজ্ঞাস—সাহিত্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানুষের মন গল্প ভালবাসে, কল্পনার চিত্র মনকে আকৃষ্ট, মুগ্ধ করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

কথ্য-সাহিত্যের প্রভাব ও অসামান্য। নরনারীর চিত্তে কথ্য-সাহিত্য ঐচ্ছজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সহস্র উপদেশ, কঠোর শাসন দেখানে ব্যর্থ হয়, কথ্য-সাহিত্য সেখানে অতি চমৎকার কার্য করিয়া থাকে; ইহার দৃষ্টান্ত মানব-সমাজে বিরল নহে। কথ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠের ইহাও একটা প্রধান কারণ, অনেক পণ্ডিত ও সমালোচক এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গল্প ও কাহিনী আদিম যুগ হইতে মানব-সমাজে প্রচলিত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহে গল্প ও কাহিনীর প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিরাজ্য কথ্য-সাহিত্য যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, প্রকাশ-ভঙ্গীর বিচিত্রতা, শব্দা মানব-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন যুগে যে-ভাবে কথ্য-সাহিত্য মানব-মনোরঞ্জন আত্মপ্রকাশ করিত, পরবর্তী আধুনিক যুগে তাহার মধ্যেই পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল।

বর্তমান যুগে আমাদের বাঙ্গালা দেশে কথ্য-সাহিত্য যে-আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রাচীন দেশের পরিবর্তিত ভঙ্গীর অমুসারী, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অতুলনীয় প্রতিভার প্রভাবে কথ্য-সাহিত্যকে নূতন আকার প্রদান করেন। বাঙ্গালার কথ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে, প্রাচীন দেশের কথ্য-সাহিত্যের গতি-পরিণতির কথা আলোচনার প্রয়োজন ঘটে।

প্রাচীন দেশের কথ্য-সাহিত্য বিরাট। তাহার সঠিক সমাচ্ ও সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ কল্পনের ভীষণ কুলাইয়া উঠে তাহা জানি না। হয়ত এমন লোক বাঙ্গালা দেশে থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া শুধু কথ্য-সাহিত্যের চর্চা করিয়াও মাদ্রু ক্ষুদ্রবাল্য সে অধ্যয়ন সমুদ্রের উপকূল-ভাগেই শুধু বিচরণ করিতেছে।

সামান্য বাহা কিছু ইংরাজী অমুবাদ সাহিত্যের সহায়তায় আদর্শের সৌভাগ্য লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যুরোপ মহাদেশে কথ্য-সাহিত্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ফ্রান্স, রুসিয়া, ও সমালোচক এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের রচিত কথ্য-সাহিত্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অমূল্য এবং প্রাণীপূর রত্ন সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না।

কথ্য-সাহিত্যের মধ্যে ছোটগল্প এবং বড়গল্প বা উপজ্ঞাস এই দুইটির কথাই এ ক্ষেত্রে বলা হইতেছে। নাটক, প্রহসনকে প্রকৃত প্রস্তাবে কথ্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ধরিলেও বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু ছোট গল্প এবং উপজ্ঞাস এই দুইটির কথাই বলিতে চাইয়াছি।

ছোটগল্প রচনায়া ফরাসীদিগের সমকক্ষ কেহ নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে বহু সমালোচকই স্বীকার করিয়া থাকেন। মোপাসাঁ, ব্যালজ্যাক, ভোডে প্রভৃতি ফরাসী ছোটগল্প-রচয়িতৃগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অননুসরণীয় প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রুসীয় ছোটগল্প-লেখকগণ—কাউট টলষ্টয়, মাক্সিম গোর্কী প্রভৃতির রচিত ছোটগল্পও অসাধারণ প্রতিভার চোড়াক। যুরোপ মহাদেশের অন্যান্য—হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, জার্মানী, রুসেনিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রতিভাশালী ছোট-



গল্প লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সত্য, কিন্তু কল্পনায় বা কল্পনায় হোটেল-গল্পলেখকের তুলনায় তাঁহার সমালোচকগণের নিকট ভেদন অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। ইলগুওর প্রসিদ্ধ হোটেল-লেখক টমাস হার্ডি প্রমুখ অল্প কয়েকজন এবং আমেরিকার রোট হাট প্রভৃতি অস্থলির পরে গণ্যনীয় কয়েকজন হোটেল-লেখকের নাম বাজারে সুপরিচিত হইলেও হোটেলগল্পে বিশিষ্ট সমালোচকগণ তাঁহাদিগকে ক্রান্ত বা কসিয়ার হোটেল-লেখকগণের তুল্যাসন প্রদান করিতে চাহেন না।

উপজ্ঞাস-রচনার ক্রান্ত, কসিয়া, ইলগুও, হাঙ্গেরী সমগ্র সভ্য দেশের, শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কসিয়ার কাউন্ট উলষ্টার, ম্যাক্সিম গোর্কী, ক্রাসের ভিক্টর হুগো, আলেক্সান্ডার ডুমা, হাঙ্গেরীর স্যারানিক্সেজ, ইলগুওর ডিকেন্স, ব্যাকারে, রুট, হলকেন প্রভৃতি উপজ্ঞাস-সমগ্রকে যে রসবাহি ছড়াইয়া গিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে নম্রগ জগৎ উজাসিত।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল কথা-সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিভার বিরাড্ভূতি সাহিত্যকে দেখাবে সমুদ্রলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পরবর্তী যুগে যুরোপ ও আমেরিকায় যে-সকল কথা-সাহিত্যিক আবিষ্কৃত হইয়া কথা-সাহিত্যের রচনা করিতেছেন, তাহাদের অনেকের প্রতিভার বিশেষ দীপ্তি থাকিলেও সকলের নিকট হইতে তাহাদের পূর্বজগৎয়ের অস্থলীর রচনা-সম্পদের সমুদ্রলুপ্ত সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ ও দীপ্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই, অনেক সমালোচকের ইহাই অভিমত।

শেক্সপী, বার্নার্ড শ, আনাচার ক্রান্ত, রোমা বৌখা, ডব্লু ডব্লু জোসেফ প্রভৃতির অসামান্য প্রতিভায় মাহুৎ বিমূঢ়, বিমূঢ়; কিন্তু ব্যতিক্রমের সভ্যতা, বস্তু-তাত্ত্বিক মনোবৃত্তির পরিচয় বিশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকের রচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে বলিয়া মনে করিলে তাহা অস্বীকার করা চলে কি?

তাঁহাদের পরবর্তী যে-সকল প্রতিভাবান কথা-

সাহিত্যিক অধুনা যুরোপ ও আমেরিকায় লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, তাঁহাদের রচনার জীবনের নানা রহস্যের নানা দৃষ্টি শুধু বস্তুতাত্ত্বিক মহাব্যাপিক সভ্যতার মাপকাঠিতে যে দেখা দিতেছে, ইহা কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপ ও আমেরিকা বীজতুল্য বিস্তৃত হয় নাই—তখন ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবাদ বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপের চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু মহাব্যাপিক সভ্যতার ভীম ঘর্ষরংগল যতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, বস্তুতত্ত্বের উপাসনায় নরনারী যতই উৎসাহভরে আত্মবিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততই যুরোপ ও আমেরিকা তাহাদের জ্ঞানকোষ্ঠী বীজতুল্য বিস্তৃত হইতেছে, ধর্মবিশ্বাস ততই একটা কুসংসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে। সমগ্র যুরোপ ও আমেরিকার দিকে চাহিয়া দেখিলে এই অমোঘ সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহার ফলে সাহিত্যেও শুধু বস্তুতত্ত্বের রসলেশহীন মূর্তি, মহাব্যবসের দানব-রূপ প্রতিকলিত হইতেছে। কথা-সাহিত্যও অজ্ঞাতসারে সেই রূপের বেসাদি করিতেছে, ইহার প্রতিবাদ করা চলে না।

হয়ত মানুষ ক্ষুদ্র মানবের ইহা ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু উপলব্ধি সত্যকে প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে—যদি না তাহাতে মানব-সমাজের অকল্যাণ ঘটে।

যুরোপীয় কথা-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করা বাউক। বাঙ্গাল দেশে বহুবিধ কথা-সাহিত্যের স্থপ। বহুবিধ ছোটগল্প বড় লেখেন নাই। ইন্দ্রিকা, যুগলাদ্বারী, রাজসিংহ, রাধারাণী এই চারিটি ছোট আকারে যে গল্প রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইন্দ্রিকা ও রাজসিংহ পরে বড় উপজ্ঞাসে পরিণত হইয়াছিল। আমি বহুবিধ রচনার বিমূঢ় ভক্ত, সুতরাং বহুবিধ রচনার পর অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর উপজ্ঞাস উপজ্ঞাস বস্তু-সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিলেও

তাঁহার মত কথা-সাহিত্যিক (— উপজ্ঞাসিক) বাঙ্গাল দেশে এখনও কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই; উপজ্ঞাসে তাঁহার অধিকার-সীমার কাছাকাছি কেহ যাইতে পারেন নাই, একথা মুক্তমনে পাঠক বা সমালোচক হিসাবে প্রকাশ করিলে নিশ্চয় অপরাধী হইবে না। তবে একথা বলিব যে, মোপাসাঁ, জোজে, ব্যাল্জাক প্রভৃতির ছোট-গল্পের, রসায়ান, কথিয়া রসপিপাহ পাঠকগণ যে পরম আনন্দ উপভোগ করেন, বহুবিধ চিত্র-শ্রেণীর ছোটগল্প রচনার পাতক বা রস পরিবেশন করেন নাই। সেনশ্রেণীর ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতি কয়েক জন উচ্চশ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকই রচনা করিয়াছেন।

যুরোপীয় সভ্যতার প্রবাহ এদেশের ভূতদেশে অনেক দিন হইতেই প্রবৃত্ত হইতেছে। বাঙ্গালার তট-ভূমি অতিক্রম করিয়া বঙ্গার প্রবাহ-ধারা একদিন ভীমবেগে বহিয়া গিয়াছিল, এখনও তাহার বেগ মন্দীভূত হয় নাই। প্রভাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হইলেও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে যুরোপীয় সভ্যতার যুগলকে উৎসর্গ করে নাই। ধর্মবিশ্বাস, নীতিজ্ঞান তখনও বাঙ্গালী সাহিত্যলোচনাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বরং সে-যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বহুবিধ, হুদেব, দানবদ্বয় মিরা, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি যুরোপীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেহের সংস্কারে আসিয়া বহু বাঙ্গালী আপনাদি জাতীয় ধর্মভাবকে দিরাইয়া পাইতেছিল। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের গভীর গর্জনে সাগর-পার হইতে নৃতন প্রেরণায় বাঙ্গালীকে আরও শক্তিদান করিল।

কিন্তু মহাব্যবসের দানব যখন সমগ্র যুরোপ ও আমেরিকায় তাহার ইন্দ্রজালের মায়ার কুহক রচনা করিতে লাগিল, বস্তুতত্ত্বের উপাসনায় পুণ্ডিত যুরোপ ও আমেরিকাবাসীরা মাতিয়া উঠিল, তখন ভারতবর্ষে—বাঙ্গালার তাহার প্রভাব অস্বহ্য হইবে না?

বাঙ্গালার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মের কোনও সংস্রব নাই। পোনে ছই শত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ধর্মশিক্ষা অস্তরিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে মহাব্যবস এবং বস্তুতত্ত্ব যতদূরপাল্লায় মানবমনকে জয় করিবে, ইহাতে বিতর্কের অবকাশ কোথায়? মহাব্যবসে বিজ্ঞানের সহান, বস্তুতত্ত্ব মহাব্যবসের সহোদর। উহার স্বন্দ ও উপহাসের মত স্বর্ণ ও মর্মে রাজ্য বিস্তার করিয়া যুগপক্ষে পাতালে প্রেরণ করিয়াছে। তাহাদের প্রবল প্রভাপে সমগ্র মেদিনী বাঙ্গলাদেশও অধুনা বস্তু-উপহাসের পদভরে টলমল করিতেছে।

অধুনা বাঙ্গালী সাহিত্যে যে কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটিতেছে, তরুণ দলের একশ্রেণীর লেখক তাহাতে রসপূর্ণ করিতে গিয়া বীভৎস রসের আমদানী করিতেছেন, অবিস্ময় সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী ভাষার তাঁহারা যে চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বাঙ্গালার নরনারীর মধ্যে চল্ভ, বাঙ্গালার আবহাওয়ায় সেরূপ ভাবে ঘটনা-সংস্থান গজাইয়া উঠিতে পারে না। যুরোপের একশ্রেণীর লেখক তাহাদের মহাব্যাপিক সভ্যতা-উদ্ভূত, বস্তু-তাত্ত্বিকতার মাদকতায় মত্ত দেহ-সকল নরনারীর চরিত্রে প্রথম বিশ্বের উদ্ভাবনা মুটাইয়া তুলিয়া ‘আর্ট’ বা রস সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাকেই প্রকৃত আদর্শ বলিয়া এদেশের উন্নিবিষ্ট শ্রেণীর তরুণ সাহিত্যিকগণ মানিয়া লইতেছেন; মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত সেই সকল সাহিত্য-স্রষ্টা নরনারীর বেশ-পরিবর্তন করাইয়া তাঁহারা ঐক্যগিকে বাঙ্গালী বলিয়া চালাইয়া সহজলভ্য বস্তু ও কিংকি অর্থ পাইবার প্রত্যাশা করেন, ইন্দ্রপ অনেকেরই অভিমত।

কিন্তু আমি ঠিক তাহা মনে করি না। আমার ধারণা, শুধু সহজলভ্য বস্তু ও অর্থের জন্তই উন্নিবিষ্ট তরুণ সাহিত্যিকগণ এই শ্রেণীর যুরোপীয় স্রষ্টাকে কথা-সাহিত্যের অস্বরূপ করিতেছেন না। সংস্রব ও ধর্ম-শিক্ষা বর্জিত এদেশে যে শিক্ষাপ্রণালী চলিতেছে, তাহার প্রভাবে মন ক্রমশঃ বস্তুতাত্ত্বিকতাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।



তাহার ফলে মানবের দেহে ও মনে আদিম যুগের যে পাশব প্রকৃতি সন্ধ্যম-সাধনার স্তূপ হইয়াছিল, ধর্ম ও সন্ধ্যমের অভাবে তাহা কাহারও কাহারও মনে ব্যাধির আকারে প্রবল হইয়া উঠিতেছে—মূরাগেণও বটে, এদেশেও বটে।

জার্মানির সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এবং মন-বৃত্তাবিৎ ডাঃ আর, ডি, ক্রাফ্ট-এবিং “সাইকোপ্যাথিয়া সেক্‌সুয়ালিস্” নামক যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে বৈদ্যমন্ডার অতি চমৎকার ও অল্প বয়সের ও দৃষ্টান্ত আছে। ডাঃ ক্রাফ্ট-এবিং প্রায় ২৬০টি ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক ও পরোক্ষ ভাবে এই সকল নর-নারীর দেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ক্রাফ্ট-এবিং অথবা অন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে-সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন বিশ্বব্যাপী, তেমনিই বীভৎস।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক কয়েকখানি উপন্যাসে ও কতকগুলি গল্পে যে-সকল নরনারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং প্রদত্ত ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর চিত্রের বর্ণিত ন্যায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধের সূত্র কয়েকের তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া দেখািবাব অবকাশ নাই। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই গ্রন্থখণ্ডে তাহার দৃষ্টির ঘূটাইতে পারেন।

ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং মার্কুইস সেজ নামক একজন বৌদ-ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কুইস সেজ অনেকগুলি কুংসিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত লেখক স্বয়ং যেমন প্রথম রিপূর প্রান্ত উপাসক ছিলেন, তাহার রচিত গ্রন্থে তাহারই উৎকট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমজ কৃতি ও আচরণের জ্ঞাত তাহাকে পাগলা গারদে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পলায়ন করেন।

কনস্টান্টিনোপোলিতে তিনি তাহার রচিত উপন্যাস-গুলি ভাল করিয়া বিধাইয়া উপহার প্রদান করেন।

বোনাপার্ট উহা পাঠ করিয়া, উহার বীভৎসতায় ক্রুদ্ধ হন এবং গ্রন্থগুলি উদ্বাস্য করেন। সেডুকে পুত্ররায় পাগলা গারদে পাঠান হয়। ৩৪ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার রচিত কোনও গ্রন্থ এখন চক্ষুপা। মার্কুইস সেডের ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তিকে এখন “জাভিজ্‌ম্” বলিয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ব্যাধি চিকিৎসকগণ বহু মানবে আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, সঙ্গল শ্রেণীর লোকই আছেন।

সুতরাং নর-নারীর সমগ্রায় যাহারা মৌনতরুকে প্রাধান্য দিয়া ইদানীং লেখনীচালনা করিতেছেন, প্রথম রিপূর জিন্মাকে নানাভাবে উপলব্ধি করিয়া দেখাইয়া পাঠক মহাইতেছেন, তাহাদের দেহ ও মন যে ব্যাধিগ্রস্ত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসকগণ তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

এ কথাও সত্য, অনেক আচরণে সন্ধ্যত কুইলেও তাহারা মানসিক ব্যাভিচারে অভ্যস্ত। ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং “জাভিজ্‌ম্” “ম্যাসোজিনিস্” রোগগ্রস্ত একজন বহু লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কাজেই শারীরিক ব্যাভিচারে সাহস না থাকিলে, রচনার সাহায্যে তাহারা মানসিক ব্যাভিচারকে লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন। ইহাও ব্যাধি।

আমেরিকা ও যুরোপে এই ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই অস্বরূপ দৃষ্টান্ত সেখানে দিন-দিনই বাড়িতেছে। ধর্মবিবাসদহীন, অসংবৃত্ত মৌল্য লেখকও সেই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালাদেশেও এই ব্যাধি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ অস্বপ্নমনোবৃত্তিসম্পন্ন লেখকগণের দেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সুতরাং বর্তমানে মৌনতরু-মূলক যে-সকল ছোটগল্প বা উপন্যাস বাঙ্গালার বাহির হইতেছে, তাহা বাঙ্গালার নরনারীর চিত্র নহে, তাহাতে বাঙ্গালী জীবনের পরিচয় নাই, বিরস-উদ্ভীপক যে-সকল চিত্র অঙ্কিত হইতেছে,

তাহার ফলে অপরিতবরণ তরুণ-তরুণীর চিত্র উহা পাঠ্য করুণিত হইয়া উঠে। উহাতে আর্চ বা রসের একান্ত অভাব।

মার্কুইস সেডকে সে-দেশের শাসক পাগলা গারদে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার রচিত গ্রন্থরাজিকে অধিষ্ঠান কল্পা হইয়াছিল; কিন্তু এখানে তেমন শাসন-বাসনা কোথায়? কুংসিত-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা যে প্রকল্পমণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই শ্রেণীর লেখকগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখা। যদি ডাক্তার ক্রাফ্ট-এবিং-এর কথিত কোন-না-কোন ব্যাধি ইহাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা দ্বারা সে-ব্যাধি দূর করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে ঐ শ্রেণীর লেখক-গণেরও উপকার এবং বাঙ্গালার অসংখ্য নরনারীরও প্রভুত কল্যাণ হইবে।

আধুনিক কথা-সাহিত্যের যে-অংশ দ্বন্দ্বীতি-ভ্রষ্ট তাহার সমুদ্রে উল্লিখিত করিবার হইলেও উপায় নাই। কারণ, বাঙ্গালী জাতিকে দেহ ও মনে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে, কুংসিত সাহিত্যের প্রভাব হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। সঙ্গ ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন আবশ্যক। যাহারা বলেন, কথা-সাহিত্যিক সুলভাষ্টার বা ধর্মোপদেশী হইবেন না, তাহাদের কথা সর্বাপেক্ষা সত্য নহে। কথা-সাহিত্যিক ধর্মোপদেশ বা নীতিশিক্ষা দিবেন না; কিন্তু দ্বন্দ্বীতির শিক্ষাও দিবেন না। এমন চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে মন প্রসাদগুণে পূর্ণ হইয়া উঠে। বেরচনা পাঠ করিয়া শরীর ও মন পুষ্যসিলা জালকী-ধারায় অবশ্যবৃনের জায় সিদ্ধতায় পূর্ণ হইয়া না উঠে, উপরন্তু প্রথম রিপূর তাড়নায় অধীর হইয়া পড়ে, সে-রচনা অল্প-বেশেই শোভা পাউক না কেন, বাঙ্গাল দেশে, তাহা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বলিবার কথা অনেক থাকিলেও সকলের ধৈর্য্যভ্রান্তির আশঙ্কায় এইখানেই বন্ধবাণ ঘেঁষে করাই সম্ভব। তাহার পূর্ণে এই কয়টি কথা বিশেষ প্রযোজ্য। “সাহিত্য” সম্পাদক পরলোকগত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি বলিয়া-ছিলেন—

(১) “বিলাতী শিক্ষা ও বিলাতী সাহিত্য বাঙ্গালী অক্ষরের পোষাক পরিয়া বদশেী হইতে পারে না, পারিবে না।”

(২) “জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় সংস্কৃতির ও জাতীয় ভাবের বিচারী বিদেশের আমদানী ‘বিশেষতঃ’ কোন সাহিত্যেরই স্বীকৃতিতে পারে না।”

(৩) “জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ ও স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানবজাতির আরাধ্য ভাব-সম্পদের উত্তর হইতে পারে, তাহাতে বিশ্বসাহিত্যের উত্তর হইতে পারে। বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যদি বিশ্ববহোণ্য ভাবসম্পদের উত্তর হয়, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিশ্চয় আপনার স্থান করিয়া লইবে।”

আমার পরম-শ্রদ্ধাপন্ন বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী তাহার রচিত “বাল্যলার রূপ” নামক গ্রন্থে “বাঙ্গালার প্রাণ ও আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্য” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যে বাঙ্গালার প্রাণিক গুণিলা পাই না।” কথাটি বিশেষ-ভাবে সত্য। কবীজ রবীন্দ্রনাথও একদিন লিখিয়া-ছিলেন, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাঙালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া একপ্রাণ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা-এমন একটা দেশের সাহিত্য, যে-দেশে কোনোও কালে বিজয়মান ছিল না।”



## নব্য-সাহিত্যের নীতি

[৪০ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত]

নেওয়া হয়েছে। টেনিসন্ হ'তে ইয়েটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ'তে ডি, এইচ. লারন্স, যুগ-যুগান্তর ঘটেছে। টেনিসন্ ভুলছেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভুলছেন—বিবিসিভ্যাকসের পাঠ্য-তালিকার বাইরে তাঁরা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন, একথা আমরা জানি। শেক্সপীয়ার-বিদ্যুৎ-সাহিত্য নিয়েও একটা লাইব্রেরী করা যায় এবং সেই সাহিত্য আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সাহিত্যিকের ঘারাও পুষ্ট হচ্ছে।

যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সাহিত্যিকের ঘারাও পুষ্ট হচ্ছে। যুগেরা অন্তর স্তোত্র এ কথাটা ধীমান ব্যক্তিত্বও মানতে পারেন—কচি শুধু বিভিন্নই নয়, রুচি বদলায়ও। এবং—বিপ্লুবা চ পৃষ্ঠা কালঃ চ নিরবধিঃ—শেষে এই বলে ছেড়ে না দিলেও কোনো সত্যিকার জবাব দেওয়া সম্ভব কি? অন্ততঃ সত্যিই কি সে অস্তিমান সম্ভব যে মানুষের ইচ্ছাস্বাসের শেষ কথাটি আজই আমরা বলে নিচ্ছি। আর তা যদি সত্যি হয়, মনে হয় না কি, যে, বিজ্ঞানত জ্ঞানেরও অবিলম্বে জৈনমতে প্রায়োপবেশনে কৈবলাভ করা ভিন্ন নাস্তাঃ পথঃ? আমাদের জীবনের গভীরতম অলঙ্কার সন্তানবান বিকশিত হবে—এই motive-power—এই, মানুষের ভাতকাপড়ের জীবনের উপরের অংশটি বেঁচে আছে—তারই বিভিন্ন উচ্ছ্বাসের রূপান্তর—সাহিত্য!

আট্টে এক রকম বাংলা হয়ত হয়, হুস্কের। দেশ-দেশে যুগে-যুগে ও একই যুগে হুস্কেরের কল্পনার বিভিন্নতা দেখা গেছে, আগেই সে-কথা হয়েছে। এই হুস্কের বা চলিত কথায় রস-হুস্কের বা আট্টের একটা রূপ—সাহিত্য। সাহিত্যের বেলায় কেমন করে আশা করা যায়, সৌন্দর্য্যাদর্শের রূপান্তর ঘটা অসম্ভব? হাজার বছর আগেকার—সে-হাজার বছরে আগেকার তুলনায় লক্ষ-লক্ষ বছরের পরিবর্তন ঘটেছে—সেবতাবার সাহিত্যের, জন্ত রচিত অলঙ্কার-শায়ে সাহিত্যাদর্শের বর্ত হুস্কের দেখা হয়েছিল, আজকের দিনের বাংলা সাহিত্য কি তারই মুখ চেয়ে লেখা সম্ভব? কথাটা

আরও পরিষ্কার হয় যদি দ্রুত করি যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা 'অশ্লীল' কথাটা জানতেন না—অশ্লীল অশ্লীলতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ও আমাদের ধারণা অনেকটা আলাদা, অশ্লীলতার ধারা তাঁরা বিশেষ করে বহুতেন—গ্রাম্যতা-দোষ (Vulgarity)—কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি একথাটা তুলতে পারেন—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা ঠাট্ট বা অশ্লীল হ'তে পারে, কিন্তু ভাষার বেলার সে-কথা চলে না। একেবারে স্বক 'হ'তেই বলছি—হুস্কের খাতির তরু করতে চাই না—তাই এ কথাটা ভেবে দেখবার জন্ত নিবেদন করতে চাই—সত্যি কি সেই ভাবই সর্বক্ষেত্রে নির্দোষ? আদিরসের যে সত্যরাস্তর অতি-বাড়াবাড়ি দেখি, যুগ নাশালতা-ই কি অনেক সময় দেখি না—তা' কি নিত্যস্থিতি চোখের দোষ! তবে একথাও দ্রুত রাখা উচিত যে, এসব প্রায়ই দেব-দেবী-সংক্রান্ত এবং অনেক সময় এর ওপর একটা আধ্যাত্মিকতার গাঢ় বা বহু আবরণ আছে। ঠিক মানুষ-মানুষীয় খয়ের কথা এ নয়।

যেমন ভাষা ও সাহিত্যের যুগ-পরিবর্তন অস্বীকার করার মানে নেই, সমাজেরও চেতন পরিবর্তন ঘটেছে। নিত্যন্ত চোখের সামনের দ্রুত-একটা ব্যাপার উল্লেখ করি। মেয়েদের বিয়ের বয়স প্রায় ভুল হ'লে গেছে, ভিন্ন বছরের মধ্যে কলেজে মেয়ে-ছাত্রের সংখ্যা তেরগুণের কাছাকাছি বেড়ে গেছে, ছাত্রদের ট্রামে-বাসে বিশৃঙ্খল মেয়ে দেখা যাচ্ছে (কারণ-গবেষণার স্থান এ নয়)। বহু-পত্নীত্ব উঠে যেতে একপুরুষেরও বেশী সময় লাগেনি; বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ হওয়া অনৈসর্গিক ব্যাপার বিবেচনা করা অসম্ভব হ'তেও তার চেয়ে বেশী সময় নেয়নি। আর বলতে গেলে এসবের রাজত্ব যুগ-যুগান্তর ছিল।

এসবের বহুবিশ্ব যুগবিত নীতি, এমন বিবেচনা কোনো কোনো প্রাজ্ঞজন কিছু পূর্বে আমাদের যুগেই প্রকাশ করেছেন—কিন্তু ইদানীং আর তেমন বেশীর প্রাজ্ঞতা দেখি না, যদিই বা করেন বেশী লোকে সে-সব কথা Serious বলে টিক গ্রহণ করবেন না। ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়, একপুরুষের তা হ'লে দেখি 'সামাজিক' নীতির standard, Median law তো নয়ই—পার্লামেন্টের আইনের চেয়েও তরলমতি, যদি কেউ বলেন, টুট করে তাকে নির্দোষ করে দেওয়াও সম্ভব নয়। সম্ভাব্য, বিধবা, কুমারী, অল্প-মধ্য-বেশী বয়সের মেয়েদের শোভনীয় পরিচ্ছদে পরিবর্তন চোখে ধাক্কা। বড়-ছোট কোনো কিছুকেই সনাতন বলে গর্ব সন্নিহিত করা একটু দুঃস্থ হ'লে উঠে না কি?

এ কথা অনেকবার শুনেছি, "এদের দেখার style" আছে, force আছে ইত্যাদি, কিন্তু——, নতুন চঙে আমাদের বেশী সত্যি কিছু আছে কি? সাহিত্যে একটা খুব বড় দল আছে, যাদের মুখ-পাঞ্জ হ'লে সমিতি-রয়ে বসেছিল, রীতিটাই বড় কথা, নীতিটা নয়।

"কিন্তু——" মানে, বলতে বলতে যয়সিদ্ধ করে নেবার যোগাড় হচ্ছে—'আধুনিক' সাহিত্যের themes unhappy; কথাটা বলা নিত্যস্থিতি সোজা, উদাহরণ সংগ্রহ ততোধিক। কিন্তু এসবকে একটু ভেবে দেখবার আবেদন করি। 'সাহিত্য-সমাজের' প্লোণ্ডি চোখের সামনে আনুন—লেখবার গুণে তাই সত্যি হয়েছিল, তাই না তিনি সাহিত্য-গুরু—কিন্তু খটনা-সংস্কার বড় queer কি না, ভেবে দেখলে তেমন কোন কিছু কি মনে হয় না? নবযুগের নবযুগে নাই কিন্তু সবুজ তার কপালে কপাল-কুণ্ডলাভ নিত্যস্থিতি নিষ্কলী Romance। নগেন্দ্রনাথ নিত্যস্থিতি আমাদের খয়ের লোক; নবীতে চলতে ঝড়-গুটি কে না ভোগ করে, কিন্তু হুস্কেরদর্শনকে বন্দিনী করা স্বয়ং বক্রিমাত্র বিনা কার সাধ্য? তারপর

তাকেও হ'তে হ'ল Historical Romance! কিন্তু এবার এটা Romance কি Somnambulance রচিত একথা কানে ওঠানো অসম্ভব কি? 'হুস্কেরদর্শন' এর রূপান্তর আর সাহিত্যের নন্দিনী কল্পনার আশ্রয়ে উদ্ভাস জ্বলনা। শরৎচন্দ্রের অল্পম style এর কথা বলার কিছু বাকী নেই। কিন্তু সাবিত্রী-রাজমহার গদ্য-উচ্ছ্বাসের গৌজামিলের সামিল স্বীকার না-করতে মন না চাটতে পারে। তাই, বক্রিমাত্র দেখেন তাঁর অস্বাভাবিক গল্প "মুচিরাম গুড়", তাই রবীন্দ্রনাথেরও theme হয় "নটরীড়ের", তাই তাঁরই লেখা হয় "খের-বাইরে" "শব্দনীরে", তাই তাঁরই লেখা হয় "গৃহ-দাহ" আর সেইটাই হচ্ছে শরৎ-সাহিত্যের একটা খুব বড় সত্যি কথা।—(আমি যাকে Romantic নীতি বলছি, তাই বড় বড় কবিত্বজনে মেনেই থাকেন, তাকে এভাবেও অর্থ করা সম্ভব যে, বাংলা-সাহিত্যের সব লেখক বক্রিমাত্র-রবীন্দ্রনাথের মত বিখ্যাত যুগস্থম দাম্পিত্যের জয়চিহ্ন নিয়ে প্রতিভার বরপুত্র হ'লে জন্মাননি!) তত্বেচ 'নব্য-সাহিত্যিকদের' এ নিবেদনও গ্রাহ্য হ'তে পারে যে, তাঁরা লিখছেন গল্প—তা আর-কিন্তু না হ'লে উঠলে বেন সত্যি গল্প হ'তে পারে। স্পষ্টতার কথা নয়, সকলের বিচারের জন্ত নিবেদন করছি—'নব্য-সাহিত্যিকদের' গল্পের themes আছে, এবং বিরুদ্ধবাদীদের এক যুগে সমষ্টিগত শুধু তারই অভাব। বিষয়ের গুণগুণের জন্ত গুনগুণি ঘটুচ্ছে—সকলে সাহিত্য-রসিক মন নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন কি, অসম্ভব বিষয়-বস্তুকে "happy themes" করে কোন মতে উদ্দেশ্যও সাহিত্য-কবিত্বের রূপ-শিল্পের পণ্যায় হ'তে নামান সাহিত্যের সত্যিকার নীতি হ'তে পারে কি?

আবার এটাও মনে রাখতে হবে, 'আধুনিক' কথাটি নিয়ে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ভালোমনে কিছুই হ'তই হয় না। 'আধুনিক' কথাটির ধারা বলা হয়—যুগান্তরের stamp আছে, কিন্তু Realism বা Romanticism—সে-সব কথা কিছু বিশেষ করে বলা হয় না। এসম্বন্ধে চিরন্তন মানবধর্মের যে প্রকৃতি বা নীতি আছে—তা' খুব বড় করে চরম ও পরম। ইবনেসি, ঈদু-বার্গ, শ,



কিঞ্জি সকলকেই সেই নিয়মের কঠিনাথের প্রথমে  
ক'রে দেখতে হবে।

অতিআধুনিক সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে দ্বন্দ্বীতির  
বে কখনা আয়োগ্য করা হয়েছে, তার মূল উৎস  
মনে করা হ'য়ছে প্রতীচোর সাহিত্য। আর এই  
স্বত্বই বলা হয়েছে, এই সাহিত্য বিজাতীয়—ইত্যাদি।

এখানে একটি কঠিন সত্য বিবৃত করতে হয়—  
আমাদের বাংলা সাহিত্য বলতে যা বৃষ্টি, তা তো  
নিঃসংশয় বিজাতীয় inspiration এ সৃষ্ট। সাহিত্য-  
সম্রাট, সাহিত্য-দিক্‌শাল সবাইয়ের বেলায়ই এ প্রশ্ন  
গঠে এবং আশ্চর্য্যবিরমার বতই আঘাত লাগে,  
এটা স্বীকার না করা কি সম্ভব—হাঁ, এ আমাদের  
অধের কারবার, সূত্রের কারবার। তবে Degree  
of assimilation ও সঙ্কটবৎ। নব্য-সাহিত্য সম্পর্কে  
তা হ'লে এই মাত্র বলা চলে, এখানে degreeর  
কিছু ফারাক থাকতে পারে। তা তো হ'বেই—না-  
ইওয়াটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক হ'ত। বাংলার  
একটি ইউরোপের গুণের সঙ্গে identified হলো কেমন  
ক'রে সম্ভব হবে? তবু বক্তৃতিমকে যদি বলি Scott,  
অতিআধুনিক সাহিত্যিক প্রয়াস পাবেন D. H.  
Lawrence হ'বার—এ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?  
Scottএর যুগ গত, বন্ধিমের যুগও বিগত, তা না  
হ'লে পূর্ববিক্রে হ'তে হয় হ'ত। Scottএর পরেও  
মাথের মন অধীর আকুলতার চির-অনাগত দিনে  
নিজের মনে মায়ী রচনা করবে এবং D. H.  
Lawrenceও আসবেন।

এই কথা-স্বত্ব সাহিত্যের সমাজ-নিয়ন্ত্রণের দারিদ্ৰ্যের  
কথা আন্দোলন এডিসের বাওয়া অসম্ভব ছিল  
না, কিন্তু এডিসের বাওয়াটা মড়িরে বাওয়ার মতই  
বাস-মত-তাই ব'লে আত্ম-সমোহন মাত্র। তথাকথিত  
নব্য-সাহিত্যিকদের জন্তে পুঙ্খই সাহিত্য-গুরু নিরুদ্বৈশ  
নির্দেশ দিয়েছেন—সাহিত্য নীতি-পুস্তক নয়,

সাহিত্যিক শুল-মাটির নন। কথাটির অর্থ মনে  
হয় যে—ভূবনের মাগীর কর্ণ-কর্তন-কীর্তনই সাহিত্য-  
নীতি হ'লে সাহিত্যের tragedy বিবেচিত হবে।  
কুনন্দিনীর আত্মহতা, তথা কিরণময়ীর উদ্ভাঙতা  
রসহানি ঘটবার লক্ষণ ব'লে গ্রহিত হ'য়েছে—  
পুনরুজ্জ্বল প্রয়োজন নেই।

বড় বড় বইয়ের বড় বড় উদ্ধৃতি নয়, সে-কথা  
আগেই বলেছি। অতুলন অপকল্প বৈকল্য-সাহিত্যকে  
ঐ বিচারে কে বিচার করতে চান! যে-দ্বন্দ্ব না  
পেরেছে—তা তো বিশেষ ক'রে রসের বিচারেই। অতি  
সাধারণে চান-করা শুটিকয়েক পদ, বি-এ, এম-এ,  
ক্লাসে পড়তে গিয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের (বিশেষ ক্লাসে  
যদি মেয়ে ও পুরুষ ছ'রকমের শোতা থাকে) কর্তব্য  
বক্তিত হ'য়ে গঠে, সংস্কৃত কোনো-কোনো কাব্য নাটক  
অধ্যাপনাতেও ঐ একই অবস্থা ঘটবে। তখন  
তো indignationএর স্বড় গঠে না—পঠিত কবর্যাদি  
ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পঠন-পাঠন সম্ভব নয়। Slave-  
mentality নিয়ে একটি বাজারে কথার প্রকারান্তর  
ভাবের সূচনা যদি এর মধ্যে কেউ দেখে তো তাকে  
নিরুত্তর করা একটি শুল্ক হয় না কি? যে বিশিষ্ট নালিশ  
বাস্তবের শোনা যাচ্ছে যে, তাই-বোনে ব'লে,  
মা-মেয়েতে ব'লে, বাপে-হেলতে ব'লে কারুর কারুর  
বই পড়া যায় না—সেটা যে সত্যই সাহিত্য-বিচারের  
একটা বড় নীতি, একথা 'বড় বড়' বইয়ের  
সম্পর্কে তো কেউ বলতে সাহস পান না। কতবিধ  
রস আছে তার প্রাচীন ও আধুনিক নাম বা  
মতের পরিচয় না দিয়েও এ কথা অদ্বিগল-সে-  
প্রায় অবিসংবাদী যে, সবার বড় রস আদরিল-সে-  
সংস্কৃতি সাহিত্য আমাদের আজকের সমাজ-সংস্কৃতিতে  
বাগে-হেলতে একসঙ্গে ব'লে পড়া যদি অসম্ভব হয়—  
'সমানত' নীতিবিবৃদের পক্ষ হ'তে এই তথ্যকে কি  
রকমে গুলট-পালট ক'রে তাদের স্বপক্ষে সাফাই-মুক্তি  
দাঁড় করান যেতে পারে, ঠিক বোধগম্য হয় কি?  
যে-কথা আগেই বলা হ'য়েছে যে, সাধারণ-পার

হ'তে আমাদের সাহিত্যের inspiration এসেছে, তার  
খেকে এটা সহজেই মনে নিতে হবে যে, এদাহিত্যে  
অধিকারী-ভেদ হবে। দেশের মাটিতে, কৃষিবাসের  
রামায়ণের মত এ যখন জন্মায়নি—এক মূলীর  
লোকানে, রাখা-বাগকের মুখে শোনা যাবে না।  
নানা কারণে—আমাদের দেশে, শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ  
যা মনে হয় তার বিপুলতার বিরাট অভাব, তাই শিক্ষিত  
জনের এই যে সাহিত্য—মোটামুটি ঐ শ্রেণীর জন্মই  
রচিত। দেশের সাময়িক অবস্থার অল্প কিছু হওয়া  
অসম্ভব। কথাটা সহজ হবে যদি স্বরাঙ্গ-আন্দোলনের

কথা মনে করি; এও বিদেশী আমদানী, তার জন্ম  
কেউ খুব লক্ষিত নয়; আন্দোলনটিও মোটামুটি ঐ  
শিক্ষায় শিক্ষিতজনের মধ্যেই বিশেষ স্থান পেয়েছে এবং  
এগুণে বর্ধমান অবস্থার উপায়ান্তর নেই, বোকা দ্রুত  
নয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ঠিক সেই দশা। আর, তাই  
এটাও বলা চলে, এই সাহিত্যের পাঠক যারা, মনে  
করাবর বেশী কারণ নেই যে, হ'খানা নভেল প'ড়ে  
তাদের মাথা সত্যি-সত্যি ঘুরে যাবে—তবে অনধিকার  
চর্চা তো সর্বক্ষেত্রেই ঘটবে থাকে, যেমন মহত্তম  
আবিষ্কারেরও দৃঢ়তাম ব্যবহার ঘট বিরল নয়।

## আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা

### নিয়মাবলী

১। প্রাকৃতিক দৃশ্য বাদে অল্প যে-কোন

প্রকার ভাল ছবি, যথা—আকৃতি (Portrait,  
Subject study), খেলা, কোন বিশিষ্ট ঘটনা,  
ভাল কারুকার্য বা ভাস্কর্য-শিল্প প্রভৃতি সকল  
প্রকার চিত্রই প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া চলিবে।

২। ছবি কোয়ার্টার প্লেটের ছোট বা ফুল  
প্লেটের বড় হইলে চলিবে না।

৩। বিচারের সময় ছবি তুলিবার কৌশল,  
'প্রিন্টের উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে  
লক্ষ্য রাখা হইবে।

৪। 'মাইকি' করিয়া অথবা মোটা বোর্ডের  
মধ্যে ভরিয়া ছবি পাঠাইতে হইবে।

৫। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ভাল ছবি  
ছাপিবার সম্পূর্ণ অধিকার 'উদয়ন'-সম্পাদকের  
থাকিবে।

৬। সঙ্গে যথোচিত ডাকটিকিট পাঠাইলে  
অনামোদিত ছবি ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। ডাকে ছবি পাঠাইবার সময় ভাল  
করিয়া মোটা বোর্ড দিয়া প্যাক করিয়া  
পাঠাইবেন। কভারের উপরে "আলোক-চিত্র  
প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৮। প্রেরিত চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার  
কুপন পাঠাইতে ভুলিবেন না। কুপনের উপরে  
নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৯। প্রেরিত ফোটো অথবা পুরস্কার পাইয়া  
থাকিলে সে-কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক।

১০। পুরস্কার বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই  
চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

১১। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছবি

উদয়ন-কার্যালয়ে পৌঁছান দরকার।

১ম পুরস্কার	...	৩৭ টাকা
২য়	...	২০
৩য়	...	১৫

ইহা ভিন্ন আরও ৫ খানি ভাল ছবির  
জন্ম Consolation পুরস্কার দেওয়া হইবে।



## মানসী ও প্রেমসী

শ্রীপারামোহন সেনগুপ্ত

এত দিন ব্যারে গোপনে বতনে

গুঁজেছি আমি ব্যারে ব্যার,  
সে আজি আপনি আসিয়া সহসা

চোখা দিল মম দলি-দ্বার।

সে আজি এসেছে সোমা নদানে,

শান্ত বহানে হরবে;

সে আজি এসেছে মধুর হাসনে,

স্বর ভাষণে, রতনে।

সে আজি এসেছে কনক-বরণে

জ'য়ে স্বকোমল চুটি কর;

সে আজি এসেছে ধীর-গভীর,

ঐবাসেনে বসে কুলশর।

সে আজি এসেছে গণ্ডে মাথারে

প্রেমের স্বপন-মহিমা;

সে আজি এসেছে সিঁড়ি নিঠিতে

ভরিয়া কদম পরিমা।

এস এস মোর চির-বাঙ্খিতা,

স্বপন-স্বধা প্রেমসী!

এস এস মোর বাসনার-গড়া

ধ্যানে চিন্তনে মানসী!

বালক বয়সে, কিশোর তোমার

নব যৌবনে কত দিন

এঁকেছি ধবরে, ধবরে রেখেছি,

দেখেছি গোপনে ঘূসে লীন।

বার বার শুধু উছাড়ি উঠেছে

তোমারে লজিতে কামনা;

বার-বার কত ছুটে ছুটে গুঁজি,—

কবে পাবে তোমা', পাবে না?

সে মোহিনী আজি সমুখে দাঁড়াবে

আশা-বাসনার 'সুহৃতি';

আত্মসে বা' দিল কলঙ্কগতে

আজি তারি এ যে মুরতি!

দ্বন্দ্ব-দ্ব্যবারে দাঁড়াবে না আর,

এস ব'সো ধ্বনি-আসনে;

হে দেবী, তোমার শিল্প চরণে

জুড়াবে জীবনে মরণে।

দ্বন্দ্ব-মাঝারে রাখি সব রূপ,

তব কর ধরি এ করে;—

মানসেতে রহ মানসী সমান,

প্রেমসী সমান এ ঘরে।

ভূমি হও মম অন্তর-স্থধা,

ভূমি হও মম নাশো গো;

বাহিরে ভিতরে সব জুড়ে ভূমি

হাসো আর মৃদু ভাষো গো;

কীৰ্তি 'পরে রহে মুরতি তোমার,

ছবি তব জাগে ধ্বননে;

লুটিয়া আমাদের লহ সব লহ,

মন প্রাণ লহ বিজয়ে।

অরি বিজয়িনী, অরি হৃদাসিনী,

সিঁড়ি-নয়না, মোহিনী,

আজ এসে ভূমি মম যৌবন

জাগাবে দ্বন্দ্ব-পেহিনী।

পেয়েছি তোমার, পেয়েছি তোমায়—

এই স্থখে দেহ কাঁপিয়ে।

এই স্থখে মোর শোভিত-ধারায়

প্রাণে নটন জাগিয়ে।

ওরে উল্লাসে জাগো আজি মন,

জাগো রে গভীর হরবে;—

এসেছে প্রেমসী, এসেছে মানসী

মানস হইতে দরশে।

## দেহের দাবি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চাকরি! চাকরি! দেহের পিল্লুজের উপরে

প্রাণের সলুতো কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখা।

জলতে চাইলে মাতাসের একটা বৈজ্ঞানিক বাধা চাই:

সে তো আছে এই কায়িক কল্ল-ক্লেশ, এই সাংসারিক

অশান্তি, সামাজিক ছন্দোহীনতা—কিন্তু আশুনের

দাহিকা শক্তি যদি না থাকে তো বাতি জ্বলবে কী

ক'রে? উদরে বাতাই যদি না থাকে তবে দেহ

ক'কে ব্রহ্মন করবে, মন রচনা করবে কোন্ ভাবী

দিনের স্বপ্ন, কী ক'রে করবে দেহের জগদ বিলাসিতা!

হা, সামাজ্য, মৃগীমেঘ খাজ চাই। কৃথা: স্থল,

জাম্জামান, প্রতীকৃত সত্য—হিংস্র, পাশব বজ্রতা।

আগে প্রাণী, পরে মানুষ। আগে প্রাণ, পরে জীবন।

যদি ভাষা না থাকে ভূমি চিন্তা করবে কাকে

সিয়ে? কদাচলের কাঠামো না থাকলে ভূমি কার

ওপর রূপের ইন্দ্রজাল ফেলবে, পাকস্থলী সক্রিয় না

থাকলে কী ক'রে চামড়ায় আসবে গুঁজ্বা—আর

রূপ বসো, লাভ্যা বসো—সব এই চামড়ারই

আপাভ্রমাদভ্যন্তা। ব্যাধি—ব্যাধি হচ্ছে স্বাস্থ্যের অভাব।

চিন্তা—চিন্তা হচ্ছে মনের নিরপেক্ষতার অবনমন।

দারিদ্র্য—দারিদ্র্য হচ্ছে মাজ 'ওকটো' সামাজিক

সামঞ্জস্যের স্বার্থপর ব্যতিক্রম। বিরহের শূন্যতা বসো—

তা হচ্ছে প্রেমের বিবৃদ্ধ ভিরোধান, পাণের অপবিত্রতা

বসো,—তা হচ্ছে সবল আত্মবিধ্বাসের অপসারণ। যে

কোনো জ্বলন্ত কথায় ভূমি ভাবে, সব জ্বলই হচ্ছে

বিশেষ কোনো অবস্থার সাময়িক অস্থায়ীস্থিতি: সব

জ্বলই নেতিমূলক। কিন্তু কৃথা: কৃথা হচ্ছে বর্ষের,

ভয়ঙ্কর সত্য ঘটনা—নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ, নিদারুণ।

সে আপনাকে আপনি 'সম্পূর্ণ', কাহার নেমিত্তিকতার

অপেক্ষা সে রাখে না। সে তৃষ্ণার অভাব নয়,

পানের অভাব নয়, খাবার অভাব নয়—কোনো

কিছুই সে অনতিব্রহ্মের প্রমাণ করে না: সে একটা

সহজ সরল প্রাণল উপলব্ধি। সে সর্বল আকাজ্জর

মাঝে আদম, সকল যন্ত্রণার মাঝে অবিনয়ন।

আগে কৃথা, তারপর তোমার মনুষ্যত্ব। আগে

ছ'মুঠো স্বপ্ন, তারপর তোমার অজ চিন্তা: বেঁধে

তোমার প্রেম, মেলাও তোমার কবিতা, মরো ভূমি

স্বদেশ-স্বাধীনতায়। আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক করছ,

কৃথা মিটিয়ে নাও, করো সেই শোকের কোমল

বিলাসিতা, তোমার উদার কল্পনার আকাশ থেকে

প্রেম বিদ্যায় নিরেছে, কৃথা মিটিয়ে নাও, কানো সেই

বিশাল শূন্যতা বিরহের মদিরতর স্বপ্ন! বৈরাগী,

তোমার কৃথার ক্ষুদ্রাঙ্গকে ভুলো না: মনুষ্য,

তোমার তৃণাভ্যন্ত গুণ্ডায়ের নাও এই এক ফোঁটা

গদাঙ্গল। কৃথা! কৃথা! জলের চেয়েও প্রাজ্ঞল,

একটি রেখার চেয়েও সরল, মৃত্যুর চেয়েও

অনিবাহ্য।

আজ সমানে তিন দিন ধ'রে জ্বলছ এই কৃথার

যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর-সব যন্ত্রণাকে একে-কটা

বিশেষণ দিয়ে শব্দিত, সীমাবদ্ধ করা ব্যর্থ,—এ যন্ত্রণার

যেমন সংজ্ঞা নেই, তেমনি নেই কোনো সীমা। ব্যাভাসের

প্রকাশ যেমন কল্পনায়, তেমনি এর ক্ষেত্রে, ক্ষীণায়-

মান্যতায়, নিঃশব্দ দেহ-দাহনে। ভবেশের কলঙ্কানার

চেহারা—যেন মুহূর্তমান 'দ্যানাতির্মি': প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন

তাদের বিভিন্ন স্থানে ও সংস্থানে পৃথক ও স্পষ্ট, নির্দিষ্ট

ও নিরীকরণ। চুলে জটিল কলঙ্কতা, কাপড় না তো

মূল্যের পদা, পায়ে জুতো না কতকগুলি টুকরো-টুকরো,

চামড়ার তালি—এসব অত্যন্ত মান্ত্বী কাহিনী: তার

অভিনব পরিচয় হচ্ছে সে ক্ষুধিত, কোনো মহন্তর অর্থ

নষ্ট, শব্দগত, আদম, বিশদীকৃত অর্থ। কারো বেটন

প্রেম, কারো যেমন সন্তান, কারো যেমন গৌরব—



সেই অধিকারের অর্থে নয়। কারো যেমন ব্যাধি, কারো যেমন লজ্জা, কারো যেমন কলঙ্ক সেই অপচরের অর্থে। এই ক্ষুধাই তার ব্যাধি, এই ক্ষুধাই তার লজ্জা, এই ক্ষুধাই তার কলঙ্ক।

পরে এক বছর ধরে ভেবে দেখেনো একটা চাকির জন্তে আকাশ-পাতাল করছে। কোথায় না গেছে তার বেজে—ট্রাম-কন্ডাক্টর, প্রেস-কম্পোজিটার, রজি, দপ্তর, এমন কি কনস্টেবল ও সব ভ্রম করে হাত লাগাতে না পেরে পরে বুঝেছে কলে-কারখানা, এখানে-ওখানে, হাটে-বাড়িতে—কোথায় যাবিণি ও? মোট বইতে পারব, কিন্তু শরীরে দিত না। সম্মানের সম্ভার বাই বাধ, শিক্ষার অভ্যাচারে শরীরেই হয়েছিল অপই—কায়িক পরিশ্রমে কাজ কবে দিয়ে অনশ্বর। নারা বহিরে একশত কোটি টাকা দিয়ে অনশ্বর। না—বা নিয়ে চলতে পারে গ্রামাঞ্চাদানের অশ্বত্থ শরীর প্রকিষ্কাত, বা নিয়ে অন্ততঃ সে এই শরীরের জুর্জব বোঝাটা পারতে হালকা করবে। তু এতদিন এখানে-ওখানে ডেরে-চিড়ে তার ছুটিখনি শাও ও আশ্রয়, আজ কিছু দিন ধরে সমানে সে উপোস করে আছে।

তলিঙ্গ-পটিন বছরের ছেলে—ধারখোর ক'রে  
 অনেক ক'রে বছর আড়াই কালজেও সে পড়েছিল—  
 ঢাক্রি ক'রে মায়ের হাং ম্যোচানে এই প্রবে  
 নিয়ে কলকাতায় সে টো-টো-করছে এই এ  
 বছর। প্রথম বেবোনে সে ছিল 'স্বাক্ত তার'  
 অনেক নীচে এসে পড়েছে—স্বাক্ত তার স্বাক্ত  
 দুই বাঘি, দারিদ্রের বীভৎস পল্লিতা—আকা  
 নেই অবরিত আশা পেছে করে খেঁয়ায় মিলিয়ে  
 চারদিকে কেবল এখন চাপ-চাপ মাটি, বৃষ্টিভীত ম  
 আর করত। এতদিনেও সে একটা চা  
 পেল না; সরসে পারুল না নিজেই বাঁচ  
 ক্ষুধার সঙ্গে প্রব্র। প্রতিটা রিত-ওই কি  
 কলকাতা টকরা টকরা করে ফেলেছে। আকা

নীচে উল্লিখিত জীবনের এই অজস্র প্রশ্ন—তার  
মাঝে ভবেশেরই স্থান নেই, পরিসর নেই : যে-ই  
একমাত্র এতবড় পৃথিবীতে একটুখানি জায়গা  
ক'রে নিতে পারল না।

আর সকল ছুন্দের মধ্যেই একটা সৌখীন  
আভিজাত্য আছে, কেবল এই ক্ষুধাই হচ্ছে অসত্য,  
এই ক্ষুধাই হচ্ছে কুংসিত। আর সব ছুন্দের তুমি  
সম্মানেরাও ছাড়া, এখানে পারে কক্ষণ—বিভূষণের  
একটা ভদ্র ভদ্রী—এই ছুন্দের বোলাই তুমি  
আর-আর সকলের অসমান। তুমি পান লুকাতে  
পার, কিন্তু ক্ষুধা লুকাতে পার না: আর,  
সকল পানের মধ্যে দরিদ্রাই হচ্ছে জয়ন্ত, এর  
ক্ষমা নেই, এর প্রতি কৃপা দেখানও লজ্জাকর।  
তুমি খেতে পাছোনা, তাও তুমি মনে। পরের  
কাছে সাহায্য চেষ্টে পরকে আবার কতকটা দরিদ্র  
করার কোনো অর্থ নেই। ভরসের একটা গাল মনে  
পড়ল: কেন দেশে হঠাৎ এক দরিদ্রব্রহ্ম বিখ-  
প্রেমিকের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর যেমন অগাধ বিদ্-  
বেশ্যতা, তেমনই দরজা তাঁর হাত। গরিবের জন্ত  
হুঁচাতে সঙ্গতি বিলাসোদাই ছিল তাঁর বিলাসিতা।  
দেশে-দেশে নাম পাড়ে গেল, বরবের কাপড়ের  
পূজার পূজার উঠলো ঝাঁকালো শিরোনাম। ভরসােক  
তত্ত্বিত হ'লে দেশে লেগে—অক্ষৌহিণী-বারিনীর আর শেষ  
নেই, কাতারে-কাতারে পঞ্চপালে মতো হুঁচু আদুছে।  
করেকবিরের মধ্যেই তাঁর সেই অগাধ সঙ্গতি স্বাভাব্য।  
এক গেল—গেল—ইল শুধু বৃহৎ একটা নিঃশব্দ।  
লাভের মধ্যে হ'ল এই, সেই গরিবদের ছাখ তো  
ঘুচুই নি, মাঝখান থেকে পৃথিবীতে আরেকটি  
নতুন দরিদ্রের সৃষ্টি হ'ল। ভরসােক তখন  
নিষ্কৃতি আবার হাত পাগেতে স্বপ্ন কলসে।

না, পরের কাছে সাহায্য চাওয়া মানে পরকে  
এই পাপের প্রতি প্রশ্রয়দায়ী ক'রে তোলা। আর,  
কত সাহায্যই বা তুমি পাবে? মুহুর্তে মুহুর্তে  
তোমার সাহায্য আসবে না। এ পাপ তোমার

যেপাঞ্জিত পাণ, এর ফালনও হ'বে তোমারই হাতে।  
জীবা-বুদ্ধে হেরে গিয়ে থাক তো পালানোর  
কোনো লজ্জা নেই, বরং লজ্জা এই দুর্বলতার দৃষ্টে,  
এই অক্ষমতার প্রশংসে। কৃপা যদি সধ করার নীমা  
ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে তো স্বচ্ছন্দে তুমি মরো। সেই  
মৃত্যু সংসারের পক্ষে একটা মঙ্গলকর মৃত্যু।

ভবেশ খাভ হুগুরে মববে ব'লেই- রাত্তার  
বেরিরেছে। বহু কঠে, স্নানেক চেটা ক'রে এক বজুর  
কাছ থেকে একটি টাকা সে ধার করতে পেরেছিল।  
ইদানী কেউই আর তাকে ধার দিত না, সেনেনা  
কোনো ধারেরই সে মর্যাদা রাখেনি, কিন্তু এবার  
সে সন্তোষের কাছে গিয়ে স্টান, খানিকটা জোর  
গলায়, তখন হুকুম দিয়ে এসনি ভদ্রীতে বললে :  
শিগগির একটা টাকা দাও, গুণ।

সন্তোষ আদ্রনার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার  
আগে ● গালে ব্রাশ ঘষছিল, বললে : ক'টা টাকা  
তোমার কাছে জমেছে তা'র কিছু হিসেব রাখ ?

— সে-হিসেব পরে করা যাবে, এখনি দাও দেখি  
একটা টুকর।

ব্রাশটা উল্টে-পাল্টে গালময় সাবানের ফেনা  
তুলতে তুলতে সমস্তায় বললে : টাকা কি এই সাবানের  
ফেনা ?

— তোমার সঙ্গে আমার বসিকতা করবার সময়  
নেই। যদি দাও তো দাও, নইলে তোমার সামনে  
এই এখুনি মর্যাম। ব'লে ভবেশ দ্বিপ্রহাতে টেবুলের  
গুপার থেকে খোলা বকলকে ছুরটা তুলে নিল।

ঘেটাকা শ। পেলে সে তথুনি আশ্বহতা করত,  
সেই টাকা দিয়েই সে বিধ কিত্তে বেরিয়েছে। গলায়  
ফুর চালিয়ে দেয়াটাও আশ্বহতার একটা অন্ততম রীতি  
ব'লে তার জানা ছিল—কিন্তু সে বড় ভয়ানক

—সেই মৃত্যুকে সে কণ্ঠখনে 'অমন কদর্যা, দুষ্টিকটু' করে  
তুলতে পারত না। রক্ত—সকল রক্তপাতের মাধ্যমেই  
একটা বীভৎস নিষ্ঠুরতা আছে : তেমন মৃত্যুর কথা  
মনে করে এখন ভবেশ শিউরে উঠছে।

এমনিতে সে মরত, মরবার এই প্রবেল উত্তরানারই  
সে কোনো বকমে এখানে টিকবে আছে, নইলে  
উপবাসের তীব্রতা এমনি সে ফুটপাতের ওপর ভেঙে  
পড়ত হয়ত। সে কী লজ্জাকর মৃত্যু, শেবাকো  
না খেতে না-পান্যার কষ্টে তাকে মরতে হবে—যে-  
বাখ সামান্য একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত সংগ্রহ করে। না,  
তার মৃত্যুকে সে সেই কুস্মিত কলঙ্কের হাত থেকে  
রক্ষা করবে, জীবনকে না পাকক, অমৃত্যু, মৃত্যুকে সে  
একটি বাঘা নিয়ে যাবে। এমনি মরতে তার মৃত্যু  
হবে নিতান্তই একটা শারীরিক ঘটনা, কিন্তু আত্মহতা  
ক'র মরলে তাতে অনেক কল্পনার অনেক সত্তাবনা  
ধাক্কে। তবু তার মৃত্যু তখন সকলের চোখে পড়বে,  
সে হবে সবাদের কথোপকথনের বিরাটত্ব—জোয়াবে  
অনেকেরই অনেক রকম অন্তরের কল্পনার যোঝাক।  
শিয়রে থাকবে বিধের শিশি, বেঁচেবের ওপর থাকবে

একছুর শোখ : I am bloody fed up with life.  
Good-bye. অর্থাৎ, জীবনটা আমার কাছে একেবারে  
বিষাদ, একেবারে তেতা হ'য়ে গেছে। বিদায়। বেশ কিছু  
হযবসর সে পিথ-বে না,—মাত্র এই একটি লাইন :  
I am bloody fed up with life. তার মুল্যকে  
সে রহস্তমণ্ডিত করে তুলবে : কেউ ভাববে প্রেম,  
কেউ ভাববে জীবনবিজ্ঞান, কেউ-না অজ কিছু।  
এই নিদার স্থল গজের পপ্ততা থেকে মুক্তি দিচ্ছে মিষ্টি  
একটা কবিতা যে তার কল্পাশ্রিত করবে। জীবন  
না পারলেও সে তা'র আপন ইচ্ছা-মানসে নতুন রচনা  
করুক—সমসারে কেবল এইটুকু তার বাধীনতা।

টামের অজ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভবেশ এই কথাই  
অনবরত ভাবছিল। অজ-সব আত্মহাচক 'একটা  
হালগামপ মুঠার'র ততো দেখায়; সে-বে অবশ্যই সে  
হাল'আত্মহা' প্রেরাচিত হয়, সব গুলিরই সামগ্রিক



টাকাটা দিয়ে সে আর্থিক কিন্তে বো  
 আর কোনো বিবই তার হাতের কাছে নে  
 কোনো বিষ কিন্ত বা জোপাড় করতে  
 অকারণে সে মনেই উদ্বেগ করত, এবং  
 নিরাকরণে তাকে তখন এতটা আবার সা

কণ্ডাক্টর এল টিকিট চাইতে। টাকাটা তার  
তে দিয়ে ভবেশ অন্তমনস্কের মতো বললে : এই চার  
বৎসর গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে সে খানিক

হেঁটে বেতে হ'বে নাকি? এই কড়া রোদে?  
ব'টার দড়িতে সজোরে একটা টান দিলে কণ্ডাক্টার

কুকে পড়ে নামূল সহানুভূতি দেখাচ্ছে, কিন্তু বলতে  
কি, ভবেশের শরীরে তখন মুক্তির আনন্দের স্পর্শ  
লাগছে।

না, এহবার টাকাটা তার ভাঙতে হয়। আফিডের  
চেয়েও পৃথিবীতে স্বাস্থ্যের ঋণ আছে—সারা শরীরে



মেন এখন কেবল এই সঙ্কেত। খুধা—আত্ম-হত্যারও  
আগে এই খুধা। টাকাটা যখন হাতে এসেই পড়েছে  
তখন আগে থেকে চারটি খেয়ে নিলে ক্ষতি কী—  
আত্মহত্যার জন্তে ঢের সময়, ঢের সুযোগ পড়ে আছে।  
টাকাটা তো আগেই ভাঙিয়ে নেওয়া দরকার।

ছ'পা এগোতেই রাস্তার ওপরে একটা খাবারের  
দোকান। চৌগায় ক'রে ছ'আনার খাবার নিয়ে  
ভবেশ দোকানীর হাতে টাকাটা ফেলে দিলে। দোকানী  
টাকাটা একবার চুঁকিয়ে, ধারগুলিতে একবার গোল  
ক'রে আঙুল বুলালে, তারপর তার পয়সার ভাবের  
মধ্যে ছুঁড়ে দিলে কিরিত পয়সাগুলি গুলতে বসল।

তারপর, খাবার যখন একবার পেটে পড়েছে তখন  
ভবেশের দেহ বসল একেবারে বেকে—মরতে তাকে  
কিছুইই আর রাকি করানো গেল না। আর  
জলজাত্য এই চৌক আনা পয়সা—অজ্ঞান অপব্যয় থেকে  
ভবেশ তাকে রক্ষা করবে।

তখন শরীরের আবার রক্তধারায় নতুন জোয়ার  
এসেছে; মুখের রক্তাকার উপর এসেছে চুপ্তির বাষ্প।  
সামান্য খুধা মিটেছে তাই না। পৃথিবীকে আবার সাময়িক  
ভালো লাগছে, সামান্য অভাব মিটেছে তাই চার-  
সিকের মসকুমির উপর এসেছে আকাশের সজল  
বদ্বত—ভাঙা পায়েই ভবেশ হাঁটতে লাগল। আত্ম  
আর এই ভাঙানো পয়সার আকি না কিনলেও কোনো  
ক্ষতি নেই, কেননা খুধার ভীতভাবোদের সঙ্গে-সঙ্গে  
মৃত্যুর দাপিণ্ডও অনেক ক'মে এসেছে—আবার এপয়সা  
যখন হুরিয়ে বাবে তখন ফের নতুন চেষ্টা ক'রে দেখা  
যাবেই না।

কিন্তু গকেটে পয়সা রাখার মধ্যে জুসহ একটা  
অশুভি আছে বোধ হয়—এর উপর ভর ক'রে কোনো  
একটা বিঘন সাহসিক কাজের জন্তে ভবেশের সারা  
শরীর উদ্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু কী ক'রে একে  
বায় করা যায় প্রথমটা ভবেশ সাত-পাত কিছু স্থির  
করতে পারলে না—কিন্তু ওরিকে তাকাতেই দেখা  
গেল চোখের সামনে প্রকাণ্ড একটা পোষ্টাপিস্ট।

ভবেশ কী ভাবলে তা সেই জানে—সেই পয়সার সটান  
সে চোদখানা খাম কিনে বসল। খাম কিনে গোজা  
সে মেসে ফিফল—মদিগ সেখানে তাঁর আর ভাঙ্গনা  
নেই। সস্তামের ঘর—সেই ঘরেই কাগি পাবে, কাগজ  
পাবে। গত সপ্তাহের দৈনিক কাগজগুলি তারই ঘরে  
জমা হয়ে আছে। শরীরে তখন আবার মেন আশার  
শিখা জ্বলছে, সেই আলোয় সে এই চিঠিগুলির উত্তর  
পাবার মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি। তারপর  
আবার না-হয় সে সেই বক, সলীদ অক্ষকুপ গিয়ে  
চুঁকবে: তাকে বাঁচবার অধিকার না দিলেও তার  
মৃত্যুর অধিকার সঙ্গার কাছতে পারেনি। সে তার  
আদিম, অস্বিম অধিকার—এই অধিকারেই সে সকলের  
সমকক্ষ সকলের সম্মুখীন। তার জীবনের সেই  
একটিনাজ মূল্যন—এত সহজে তাকে উড়িয়ে দিতে  
তার এখন মাদা করতে লাগল।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বেছে-বেছে একসঙ্গে  
সে চোদখানা দরখাত পাঠালে।

এক দিন, ছ' দিন, তিন দিন—রোজ ভবেশ  
পিণ্ডনের অপেক্ষা করে। যতবার ডাক আসবার  
কথা ততবার সে বাইরে এসে রাস্তার হাফিরা দেয়।  
জবাব যে কিছু এখনো আসছে না এবং কখনো যে  
আসবে না সে-সঙ্গে ভবেশ আবার বেছে-মানে নিশ্চিত  
হতে পারল।

দূরত-দূরত আবার সে সেই বিরাট গছরের  
কাছে এসে পৌঁছেছে—যার শূন্যতার অন্তর গ্রাস আবার  
তাকে ডাক দিল, তাকে তার খুধার উপকরণ  
বলে করল চিহ্নিত। ভবেশ মনকে কোনোদিককমে  
প্রায় রাকি করিয়েছে, কিন্তু শরীরের প্রতিভদ্রত  
এখনো তার বিশেষ কাকুতি, প্রতি পা-ফেলায় এখনো  
তার করণ প্রতিবাদ। দূর তারার আলোয় এখন  
আর পৃথিবীর পথ গুলতে চার না, কিন্তু আশ্চর্য

—শরীরে আছে এই পথাতিবাহনের স্মৃতি। তাই  
ব'লে শরীরকে আর প্রশয় দেওয়া চলে না—এই  
শরীরের জন্তেই তার যত মানি আর যত গরল।  
এবার তাকে কটিন হয়ে শাসন করতে হবে,  
দৃঢ়ত হ'বে তার মুকল নির্গন্ধ প্রবোজন, এবার আর  
তাকে আকিও নিরুদ ক'রে নয়, অতুত্বিত্বীন গাঢ়  
জ্ঞানয় যুম পাড়িয়ে নয়—এবার সে তাকে চলন্ত ট্রামের  
তলার ফেলে দেবে, ছাত্ত থেকে মাটির উপর তাকে  
ছুড়ে মাইবে, কিংবা কোনো পুরুরের ধারে গিয়ে  
ঠেলে দেবে তাকে গভীর জলের মধ্যে। আতঙ্কে শরীর  
কোঁপে উঠছে বটে, কিন্তু তার আবদার সে আর  
কানে ভুলছে না। তার অত্যাচারের শোধ এবার না  
নিলেই আর নয়।

মুখ-চোখ কটিন ক'রে ভবেশ ছপু-বেলাতেই বেরিয়ে

পড়ছিল, কিন্তু ভাগা তার সঙ্গে অমন একটা মোটা,  
খেলো রসিকতা করত বসেনি। তার ছুঁদেই সব  
হুগ অর ক'ব'ব' করছে। দরজার চৌকাঠ পেরতেই  
ভবেশের সঙ্গে পিণ্ডনের দেখা হয়ে গেল। তার হাতে  
লগা একটা খাম—এবং উপরে একেবারে তারই নাম  
লেখা। সতি-সতি, তারই নাম লেখা। সতি-সতিই।  
তৈশ টাকার সেই কেরানির কাজটি তার  
হয়েছে। এবং ভাগা যখন সদর, তখন সেই স্কেরানির  
কাছে যে সামান্য একটা জামিনেরও দরকার হবে  
না তা বলাই বাহুল্য। ভাগা সদর হ'লে বরাদ্দ  
মাইনের থেকে কিছু আগাম টাকা পাওয়াতে কিছু দোষ  
নেই।

তারপরে আর গল কী! তারপর সাদা, সহজ,  
সরল সজা কথা।

### মানুষের আত্ম

যুবোই মানুষের গড়ে আত্ম	...	৫৬	বৎসর
ইংগণে	"	৫১	"
জাপানে	"	৪৪	"
ভারতবর্ষে	"	২৩	"

### এ'দেশে শিশু-মৃত্যু

শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা	...	১৫০০০০
১ বৎসরের কম বয়স	...	২৫০০০০
হাজার-করা পুষ্ক-শিশুর মৃত্যু	...	১৮৫
হাজার-করা স্ত্রী-শিশুর মৃত্যু	...	১৭৪৩



মাহুসের স্থলীয় জীবনধারা আজ বে-পর্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেটাকে তৃতীয় পাদ বা স্তর বলিতে চাই। বহু দিন আগে বিবর্তনধারার কোন বিশেষ পাদে যে আকর্ষিতবিশিষ্ট জীবের পায়ে মাহুস বলিয়া প্রথম 'সেবেব' মাঝা হয়, তাহার জীবনের মূলধন ছিল কেবল চিকিৎসা থাকি। সে-মুখে মাহুস অত্যন্ত মোটা ও সহজ মরুপাতির কারিকর; তার পরিচয় পাই স্থল বকমের কয়েকটি নিরতিশয় শাধা-সিধা অঙ্গে বা যন্ত্রে। কিন্তু সেদিনও লজ্জা করিলে দেখিতে পাই—প্রাণিজগতে মাহুসই একমাত্র জীব যে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট সহায়কূতি তিকা করে নাই, উদ্যাবনী বা প্রাণজন্তিকে একান্ত করিয়া সে মহিমাযিত প্রকৃতিকে নিজের কাজে খাটাইয়াছে। সে প্রকৃতির বশে না চলিয়া প্রকৃতিকে তার বশে আনিতে চাহিয়াছে। তার জন্মদিনের ইতিহাসেই দেখি—বিস্তারের ধ্বজা উড়িয়াছে বীর্ঘবলে পৃথিবীকে জয় করিয়া একান্ত অস্থায়িত করিবার চেষ্টায়। মাহুসই একমাত্র বয়স্কষ্ট।

মুগ্ধশাস্ত্রের কাটিল, পাখদের ও হাড়ের ময় ধাতুর হেলন—কুলা না চলে না এতই দৃষ্টান্ত হইল। ইহাতে আনবার দিনে দিনে আশ্চর্য্য প্রতিভার অপূর্ণ রচনার পরিচয় পাইতে থাকি। সেই দ্বিতীয় স্তরে শাধা-সিধা ভাবে চিকিৎসা-ধাকার প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মাহুসের মনে এক নব ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহাকে 'আনন্দ' বা এক আনন্দোচ্ছারার আধ্যাত্মিক রস বলা যায়। মাটির মাহুসের সেদিন রচনার পাখা মিলিল। তার রচনায় কোনো অপূর্ণ রস-সঞ্চার হইল; নবাগত এক প্রতিভার দীপ্তি লাগিল। মায়-অনন্দ-চিহ্নিত চক্ষু, রূপ-রস-গন্ধ-ভরা পৃথিবী মায়-অনন্দের মত দেখা দিল—এই পৃথিবীতেই এক নবপৃথিবী আবির্ভাব দেখা গেল, এবং তাহা তার নবলজ দৃষ্টিতে

এক অপরূপ রেখায় প্রতিভাত হইল। সেদিন হইতে এই রেখাকে রূপ দেওয়াই মাহুসের কাজ হইল। মাহুস এতদিন ছিল কণ্ঠধার—এবার হইল রূপধার। আনন্দ হইতে যে গড়িত দেবতা, রচনা করিয়া তাহার অপরূপ স্ততি; নৃত্য-গীত-জিজ্ঞাসার্থ্য সে তাহার নবাগত ভাবের ছন্দে নাচিয়া চলিল। সেদিন শুরু হইল কলাবস্তুর আত্ম-বিস্তার পূজা। আজও বিশেষ করিয়া আদিনি জাতিদের মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিরূপ দেখি।

আবার মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিবার দিন আসিল। মাহুস বলা প্রকৃতির মহিমাযিতা দেবীর পদে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে নাই। নিজের বিরাট জয়ের কঠোর ভাবে সে দ্বিষ্ট হইল; নিরতিশয় গর্ভম আত্ম-তত্ত্বের পক্ষে অতি দৃষ্টান্ত। তার জন্মদিনের আত্ম-জয়ের দীক্ষা লইল। সে আর মনুষ্যের সাক্ষাতে চিত্তোন্মাদে অস্থির-বিচলন হয় না। সে মনুষ্যের বিশ্বাসের সমাহিত রূপের সন্ধান চাহিল, সে নিজ অন্তরতমের দর্শন-ব্যাকুলতার কঠোর তপস্বী আরাধন করিল। সেই তৃতীয় স্তরে 'দর্শন'র আবির্ভাব। সেদিন বিচার শুরু হয় আত্ম-দায়িত্বের, আর তারই নাম দর্শনতত্ত্ব। সেদিন কলা-শিপের নবজন্ম হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

প্রথম স্তরের কথাটা বোঝা একটুও শুল্ক নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের স্বরূপ আর-একটি পরিচায় করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই দুই স্তরের যদি উচ্চাট মূলধন দিতে পারি, তাহা হইলে স্থল সুবিধার পথ কিছু বন্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের স্বরূপ দিতেছি—অখাতো প্রকৃতি-জিজ্ঞাসা। মন প্রকৃতিস্থান; বাহ্য প্রকৃতিতেই মাহুসের মন আবদ্ধ ছিল, আর বেধে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ের প্রথম ও শেষ প্রশ্ন এই স্তরে মিলে—অখাতো রূপ-জিজ্ঞাসা। উভয়

ফেরেই অখাতো কথাটি পূর্ণবস্ত্রী স্তরের স্তরে চানিত্তেছে। মাহুসের মূগ্ধসন্ধিগণ আছে, তাহাও স্বরণ রাখিতে হইবে।

পশ্চিমে যে অপূর্ণ সভ্যতা গত ছই এক শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এই দুগ্ধ নবাগতের প্রকাশের রূপ, তাহার শিল্পবিজ্ঞান-মাহিত্যের প্রকাশের ধারা, আমাদের উল্লিখিত মানব-সম্ভবিত্তির বিবর্তন-ধারার সহিত মিলে কিনা, ঠিক বলিতে পারি না; মনে একটা সন্দেহ জাগে—সে-সম্প্রদায় তৃতীয়ের মাঝখানে দ্বিতীয়ের পুনরাগমন ঘটাইয়াছে কি না। বিশ্বেষের মধ্য দিয়া দেখিলে সহজ বস্তু সহজভাবে প্রতিভাত হয় না—এ সম্বন্ধে ভ্রমপ্রচলিত একটি প্রবাদে সেকথা পরিচায় করিয়া বলা হয়। পূর্ণ ও পশ্চিমের মধ্যে যে বৈরানল অলিয়াছে, তাহাতে পুড়িতে পুড়িতে কাহার কতর পুড়িলে, কেমন করিয়া তাহা নিশ্চয় করা যায়? আশ্চর্য্যের হৃদয় সে-মুখে স্বল্প দিক্ 'আজ্ঞার' কঠোর মাঝ দিয়া জটিলের সহজ স্ততির দেখা পাওয়া কঠিন। পশ্চিম আমাদের পক্ষে দেখিতে পাইতেছে না—বিশেষ ভিন্নও জয়ের, লুপ্তের, রূপার, অবজ্ঞার আর স্বার্থের—কঠিন কেশাভে, প্রচৌর স্বরূপ আজ তাহার চক্ষে পড়িতেছে না। আবার অপমান, ক্ষোভে, হৃদয় ইতিহাসিক সভ্যতার গৌরবভিমনে, ত্রণায় ও ক্রোধে, প্রতীচীর অতি অপূর্ণ সভ্যতা, প্রচৌর চক্ষে আবরিত রহিতেছে। বিচারের পক্ষে যে সহজ Impersonal মনোভাবের প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটিতেছে। পশ্চিমের কোনো মনগ্ন ভাগ্যসাধনো ও লজ্জা আমাদের সন্মুখে ছ'কথা বলেন, আমরা তাহার রক্ত বাহবার ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছি এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে 'অভিষ্ট' করিয়া তুলিতেছি। এই সাময়িক কৃত্রিম মনোভাবের একপ্রকারের স্বরূপ পরিচয় মিলে যখন ইংরেজদের গালামুলি দিবার রাজা বার্নার্ড শ'র ইংলওয়ান্সি বাহিরের সহিত এদেশে রবীন্দ্রনাথের স্থানের তুলনা করি।

এই পশ্চিমের সভ্যতার গোড়ার ও মাহুসের কথায় অবশ্য আমাদের স্বস্তি বাটে। তাহা তৃতীয় স্তরের

অনুবর্তন। মাত্র গত ছই এক শতাব্দী হইতে ইহার যে রূপ রূপের পরিচয় আমরা পাই, নশ্বর উচ্চা ভাহারই বিষয় সম্বন্ধে। বর্তমণ কোনো সভ্যতা বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহা যে প্রাণবন্ত তাহা শুধু স্বীকার নয়, বিশেষ করিয়া মনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। ইউরোপের স্বর্ণপিণ্ডে যে বিরাট প্রাণ-পন্দন আছে তাহা অশ্বত্বব করিতে যেন কোনো কারণেই আমরা বিবর্তন না হই—তবু এই কাগবিশেষের নাম যদি বার্ষিক সভ্যতার কাগ দিই, বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

যশপ্রতি বাপারটা তত বার্ষিক নয়—তাই বার্ষিক সভ্যতা ইউরোপ ডিঙ্গাইয়া, সাগর পাড়ি দিয়া যে নবজন্ম দেখা দিতেছে, তাহার নাম দেওয়া ইয়াছে 'ইম্যোনে পেরিল'। 'ইম্যোনে পেরিল'র ধর্মপাতি তো 'হোয়াইট পেরিল'। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই 'হোয়াইট পেরিল'র যুগটি ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিন কি না। এমুখে তাহার মানিও প্রচুর। গত মহাযুদ্ধে সর্বজন করিবার মত নীতি মিলিতেছে না। কিন্তু মাত্র ইহাতেই সে সভ্যতার প্রাণশক্তির পরিচয় মিলে না। ইউরোপের সভ্যতার যদি মূল্যের সন্ধান করিতে চাই, তবে তাহার নতী প্রাণশক্তির হৃদয়পরিচয় দিতে হয়। সভ্যতার কোনো এক অংশের যদি স্বৈর গভীরভাবের ও আত্মচান করি, তো বৃষ্টিতে একটুও বিলম্ব হইবে না, কত বড় এক পরিপূর্ণ আত্মিক-শক্তিই ইহা বিলুপ্ত, কত বড় তপস্বীর ধন ইহা। আবার বিরাট ধনের যে কঠিন পাণ ইহাও ইতিহাসিক সভ্যতা; ধনের মাহাত্ম্য-শাস্ত্র যখন লেখা হয়, পাগের মাহাত্ম্য-শাস্ত্রও তখন রচিত হইতে থাকে। ধন আর লোভ পরস্পর পরিপূরক কথা, আর অস্বাধের হইতেই সৃষ্টি স্বার্থ, সেই স্বার্থেরই মাত্র নামাত্মর অসাময়িকতা। বাহিরের ধনের জোয়ারে অন্তরের পানির ভাটা পড়ে, ইহা মাত্র শাস্ত্রবচন বলিয়াই অবজ্ঞের ন্যে। প্রতি-সভ্যতার ইতিহাসেই তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সম্প্রদায় হইতেও সম্প্রদায়, ইতিহাসে বসিলেও এককথা করি প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধারণতঃ শিল্পকার্য্য বিবর্তন সভ্যতার বিবর্তনের অঙ্গরূপ, তাই শিল্পের



ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, সভ্যতার ইতিহাসের কথা ভুলিতে হয়।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা বহিঃ তৃতীয় স্তরেরই, তবুও তাহার দ্বারা যে দ্বিতীয় পাদের একটি বিশেষ প্রভাব আছে, এই কথা বারংবার মনে আঘাত করিতে থাকে। তাহার সভ্যতার সহিত জড়িয়া আছে—অথাতা একটি-জিজ্ঞাসা।

বার্ণার বলিতেছেন, মানুষের মধ্যে দুইটা দ্বারা বহিঃভেদে, মনের মধ্যে বৃত্তি বা জ্ঞানের, প্রাণের ভিতর অহুত্ব বা রসের। এই কথা মানিলে সমুদ্র শিল্প-কল্পনা পড়ে দ্বিতীয়ের কোঠায়। আর দর্শনাবি, বিশেষ করিয়া বুদ্ধিত বাহ্য-বিশিষ্ট, সব পড়ে প্রথমের কোঠায়। ইউরোপের মন এই দুইটির মিলন-রচনার জন্ত ব্যস্ত ও নর, ব্যাকুল ও নর। হৃদয়ের কণিধাধর সেদেশে অহুত্ব। এই দেশে যে তাহা নয়,—এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এই দেশ সম্বন্ধে এইটুকু যোগ করিতে হয়, সেখানে কল্যাণ একান্তভাবে হৃদয়ের পরিপূরক বা স্নাতক নয়। শিবু ও হৃদয় এই দুইয়ের বিচ্ছেদ তাহা হইলে কষ্ট-কল্পনা হয় না। এইখানেই ভারতীয় শিল্প-কলার সহিত ইউরোপীয় শিল্পের জাগ্রিত পার্থক্য।

হৃদয়কে ইউরোপ কি ভাবে বুঝে সেখানকার দুই একজন বড় দার্শনিকের কথা তাহা পরিষ্কার হইতে পারে। Kant বলিতেছেন—“Beauty in its subjective meaning is that which, in general and necessarily, without reasonings and without practical advantage, pleases. In its objective meaning it is the form of a suitable object in so far as the object is perceived without any conception of its utility.” তিনি আবার বলিয়াছেন, “The capacity of forming judgments without desire is the basis of aesthetic feeling.” সৌন্দর্য্য বস্তুতাবলিরপক্ষে অর্থে, সাধারণতঃ ও বিশেষ করিয়াই, অকারণেই ও বিনা বিচারেই এবং কোনো বাহ্যিক সার্থকতা ভিন্নই মনোরঞ্জন করে। আর সৌন্দর্য্য বস্তুসাপেক্ষ অর্থে কোন বস্তু রূপ-স্বাভাবিক

কিন্তু স্বে-রূপকরণে বাহ্যিক প্রয়োজনের কোনো প্রবন্ধ উঠিতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের অহুত্বের মূলত্বই হইতেছে—কোন প্রকার বাসনার বা প্রয়োজনের উপর বিনা নির্ভরে বিচারের শক্তি। এমন কথা হইতেই রূপ পায়; প্রচলিত অর্থে গ্রাহ্য হইতে—আট দৃষ্টি আট দৃষ্টি—বহিঃ প্রায় উঠা অর্থেই ইহার স্রষ্টা কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

Hegel স্বাধীনচিত্তাক্রমে যে-তর উপনীত হইয়াছিলেন তাহা ভারতীয় নীতির বড় পরিপন্থী—“Beauty is the shining of the Idea through matter. Only the soul and what pertains it is only beautiful... But the spiritual must appear in the sensuous form, only appearance and this appearance is the reality of the beautiful. Art is thus the production of this appearance of an idea and is a means together with religion and philosophy, of bringing to consciousness and of expressing the deepest problems of humanity and the highest truth of the spirit. Truth and beauty are one and the same thing, the difference being only that truth is the idea itself as it exists itself and is thinkable. The idea manifests itself and is thinkable. The idea manifested externally becomes to the apprehension not only true but beautiful. The beautiful is the manifestation of the idea.” বস্তু রূপ-সৌন্দর্য্য মাত্র পরম পদার্থের (Idea) ঐশ্বর্য্যভাস। মাত্র আত্মা ও তদবলম্বী বাহ্য কিছু তাহাই সভ্যতাই হৃদয় ..... কিন্তু বাহ্য হৃদয় তাহা প্রকাশ পাইবে মূল বস্তুতে—মাত্র এই প্রত্যক্ষ বা প্রকাশ হওয়ারই হৃদয়ের যোগ্যতা। তাই আট হইতেছে, আইজিয়া প্রত্যক্ষতা-মায়ন, আর তাই ধর্ম ও দর্শনের সহিত আট মানুষের গভীরতম সমস্যা-এক এবং চরম আধ্যাত্মিক সত্যকে মানুষের চেতনাবলম্বী করে; তাহাকে বস্তু প্রকাশ করে। সত্য এবং হৃদয় একই; পার্থক্য মাত্র এই যে, সত্য হইতেছে মাত্র আইজিয়া, আর সেই আইজিয়াকে বস্তু রূপ দেওয়া হয়, তখনই সে হয় হৃদয়। আইজিয়া বস্তু বাহ্যরূপ

পাশে আর তখন মাত্র সত্য বলিয়াই গৃহীত হয় না, সে তখন হৃদয়। হৃদয় হইতেছে—ইন্দ্রিয়গাম্যের নিকট সত্যের মূর্ত্য আবির্ভাব। একথা আর কিছুই বলা চলে না, সৌন্দর্য্য একাধ দার্শনিকী অহুত্বের মূল-কল্পনা, বাহ্যিক জগতের সহিত তাহার কোনোই সংঘর্ষ নাই। সত্য হইল, বাহ্য ভঙ্গ, বাহ্য কল্যাণ তাহাই হৃদয়, বাহ্য হৃদয় তাহাই ভঙ্গ, তাহাই কল্যাণ। কল্যাণের বহন তাগ করিয়া অহুত্বের প্রাবল্যে সৌন্দর্য্য-রচনা একেশ ও অজ্ঞাত নয়। সাহিত্যে ইহার উদাহরণ ও বাহ্য ভাগ মিলিবে। অতি প্রাচীন সাহিত্যে ঠিক এমন কিছু বড় দেখি না। কিছু পরের যুগে, তবুও দেখিতে থাকি, রামদ্রো মনে কোনো ভাবের প্রতীক। অহুত্বের স্থান যে সেখানে নাই তাহা নয়, ভীষণ কোন-কিছু দেখাইতে হইলেই সে অহুত্বের প্রাচুর্য্য চাই; কিন্তু অহুত্বের একজগতাই যে শুধু নাই তাহা নয়, অহুত্বের অপ্রাবল্যও দৃষ্ট আশ্চর্য্য না করে, একরূপ নয়। আঙ্গিকার সাহিত্যে অহুত্বের সেই প্রাবল্য আশ্বিনেই বলিয়া সীতার নিকারসনে মনে অভিমানে জাগে।

অজ একজন ইউরোপীয় মনীষীর কথা এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করিতে পারি। Schelling বলিতেছেন—Art is the production or result of that conception of things by which the subject becomes its own object or the object becomes its own subject. Beauty is the perception of the infinite in the finite. And the chief characteristics of works of art is unconscious infinity. Art is the uniting of the subjective with the objective of nature with reason, the unconscious with the conscious and therefore art is the highest form of knowledge. Beauty is the contemplation of things in themselves as they exist in the prototype. It is not the artist who by his knowledge or skill produces the beautiful but the idea of beauty in him itself produces it. শেলিং বলিতেছেন—সৌন্দর্য্য হইতেছে সীমার মধ্যে অসীমের উদ্ভাস। তাই

শিল্পরচনার বড় লক্ষণ হইতেছে অজ্ঞাত ও অসীমের স্পর্শাত্মক।

শেলিংয়ের কথার চেয়ে ভারতীয় ভাবের আশ্চর্য্য প্রতিপত্তি শুনি। ভারতীয় কলা-শিল্পের যে-স্বরের কথা পরে বলি সেই স্বর—জগতের মধ্যে অরূপের মায়াবলি কলা-কল্পনা—শেলিংই তাঁহা তাহার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিতে চান, আমরা চক্ষু চাফি়া বাহ্যকে হৃদয় বলিয়া দেখি না, শিল্পীর প্রাণের স্পর্শে তাহাই হইয়া উঠে পরম হৃদয়—কিন্তু শিল্পীর হাতে তাহা এই নবরূপমায়াই নাই—তাহার অস্তর তাহা আছে; শিল্পীর অস্তরের স্পর্শেই বাহ্য সাধারণ, বাহ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার মত বলিয়া কখনও মনে হয় নাই—তাহাই হইয়া উঠে অনবদ্য হৃদয়।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পকলার ভাবের একতার ছবি একটা উদাহরণ সেকালের শিল্পরচনা হইতে নিতেছি। De Vinci'র ছবিতে মানুষের হৃদয়ের ভাব একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে, ভারতীয় চিত্রের মানুষের সহিত তাহার বিভিন্ন সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। দার্শনিক যুগের মধ্যে তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—বিভিন্নপন্থে ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল; এবং তাহার অন্ধিত চিত্র দেখিলে এই কথা মনে উঠে যে, তাহার দরপটা ঠিক ইউরোপীয় ছিল না। সারা ইউরোপ ধরিয়া যে Gothic Architecture-এর প্রভাব অসামান্য, সে-ভাষ্যার্থের সহিত ভারতীয় ভাষ্যার্থের মনের মানিকটা একসময় লক্ষ্য করা শক্ত নয়। মুসলিম রচনার সহিত তুলনা করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। গথিক Saint-এ আর ভারতীয় বৌদ্ধ-মন্দিরে যে আধ্যাত্মিক বা আশ্রিত রূপ-প্রকাশের প্রয়াস দেখি, তাহাতে সভ্যতা-ধর্মের পরিচয় পাই বলিয়া মনে হয়। মাজোনা মুক্তিও তাহারই প্রভাব দেখি। Renaissance-এর পূর্বের দিকের ইউরোপের শিল্পকলা এক অপূর্ণ আধ্যাত্মিক রসে রঞ্জিত দেখি। এমনটা ইউরোপে আর কখনও ঘটাইছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে



ভারতীয় ভাবের খেলা লক্ষিত না হইয়াই বেনে পারে না। বুড়ীর সন্ধ্যাসিন্ধুর রচনার কল্পনা দেয় বোদ্ধার। আর Church-সম্ভাষণ শিল্পে ভারতীয় শিল্প-নিদর্শনের হুবহু প্রতিরূপ বিরল নয়। বোদ্ধাশিল্পের প্রথম মুগ্ধে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি দেখি না; পৃষ্ঠপাশের আদিত্যেও খুঁটের প্রতিমূর্তি কল্পিত হয় নাই। নানা প্রত্যেকে সেই মহাপুরুষকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে মাত্র ভাবের একাই লক্ষ্য করি না, অনেকটা প্রত্যেকের একাই চোখে পড়ে। অপর পক্ষে, মহৎপদের ধর্ম্য মহাপুরুষের প্রতিরূপ-কল্পনার কঠিন মানা বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অল্পশ্রু-চিত্রাবলীর বহু চিত্রের সহিত ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রাবলীর নিকট-একা পড়িতে। লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। এমন-কি, ভারতীয় শিল্পকলার স্বাধীন সত্তার তুর্লব প্রতিবাদী ফাওঁস, ভিনসেন্টে দিখ প্রভৃতিও ঐ ভাবগত একা লক্ষ্য করিয়াছেন, আর, কোন মতেই বলিতে পারেন নাই, ভারত এই ক্ষেত্রে দৃষ্টি। National Galleryর চতুর্দশ শতকের Ambrogio Lorenzettiর অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্রের সহিত অল্পশ্রু প্রাচীর-চিত্রের মিল আচ্ছাদ্য। ঐ সময়কার Giovanni Belliniর Madonnaও আমাদের দৃষ্টি বড় আকর্ষণ করে।

শেলিঙের কথাগুলোই আবার বলিতেছি; বিদ্যরসও স্বাধীন নয়, শিল্পীও স্বাধীন নন। প্রকৃতির অন্তর বহন শিল্পীর অন্তর স্পর্শ করে, সেই মিলনের স্বয়ং রূপ পায় তাহার শিল্প-কলা। টিক এমন কথাই আর-একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, Fichte'র কথা—That perception of the beautiful proceeds from this; the world, i.e., nature—has two sides: it is the sum of our limitation and it is the sum of our idealistic activity. In the first aspect every object is limited, in the second aspect, it is free. In the first aspect every object is limited, distorted, compressed, confined—and we see deformity, in the second we perceive the inner completeness, vitality, regeneration—and we see beauty. So that the deformity or

beauty of an object depends on the point of view of the observer, beauty therefore exists not in the world but in the beautiful soul.”

হৃদয়ের বোধ এমন করিয়া ঘটে; পৃথিবী অর্থাৎ প্রকৃতির চুটি দিক আছে; সে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সমষ্টি এবং আমাদের মাতাঙ্গের বিচিত্র কল্পনা। প্রথম দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ এবং বিতীয় দিক দিয়া দেখিলে প্রত্যেকই মুক্ত। এক দিক হইতে দৃষ্টপাতে প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ, বিকৃত, ঝিকি, সঙ্কুচিত—চোখে পড়ে ঐশীনতা, বিকলভাঙ্গ—অপরদিকে দৃষ্টপাতে আমরা দেখি প্রত্যেকের অন্তর্মুখীন পরিপূর্ণতা, সম্ভাব্যতা, অপূর্ণ জীবন—আমরা স্পর্শ পাই সৌন্দর্যের। সুতরাং বস্তুর ঐশীনতা বা ঐ নিষ্ঠুর করে দর্শকের দর্শনবিশিষ্টতায়। সৌন্দর্যের বাসস্থান পৃথিবীতে নয়, তাহার বাস হৃদয়ের আশ্রয়। পূর্ণাপর যে-কথা বলিয়া আসিতেছি এখানে তাহারই একটি বিশিষ্ট দ্বারার মত-বাদের পরিচয় পাই।

এই যে মনীষীদের উক্তি উল্লেখ করিতে হইল, মাত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিতে যে, যে শিল্প-নীতি বিশেষ করিয়া ভারতীয় বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের উচ্চতম; তাবুক শ্রেণীর অনেকেও স্বাধীনভাবে বিশেষ করিয়া ঐ একই তত্ত্ব উপনীত হইয়াছেন—শিল্প-শক্তি যে একটা খেলায় নয়, তার দায়িত্ব যে স্বয়ংভার, ব্যবহারিক জগৎ সঞ্চকে যে শিল্পী পরম উদাসীন হইতে পারেন না—এমন কথা তাহারাও বলিয়াছেন।

ইহার উপরও একথা মানিয়া লইতে হইবে বেনে ইউরোপের মনের অভিব্যক্তি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে কাণ্ডেই। আটটি বহননের বাহিরে ভাবের রসে নয়, এক কথাটাই ইউরোপের শিল্পতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য উচ্চ সংস্কৃতি, প্রকাশের রূপের সত্যকার স্ফূর্ততা কাহাকেও নষ্ট করিতে দিবে না। Realism, Impressionism সকলকেই আটের কোঠায় উঠিতে হইলে এই স্ফূর্ততার প্রাথমিক পরীক্ষার দাশ করিতে হইবে। স্থলতা, রূপবিকৃতি, মলিনতা লোপ পাইবেই। শব্দগুলি

আপেক্ষিক, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবুও মিনিই যাহা ধরনই ইহার আটের লক্ষ্য এমন কথা কি কেহ বলিবে না? আবার ইউরোপীয় বলিয়া বিশেষ পরিচিত ঐ কথাটি এদেশে বেকিছু অপরচিত তাহা নহে। অপরূপ বৈদ্যব সাহিত্য হইতে বিচিত্র রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্য পদ্যান্ত সকল সাহিত্যিক ভাবের বহুয় ভাসিয়া চটিয়াছে। বাংলায় জগৎ-ব্যপ্তিগত সর্বপ্রকারের বহুয় আমরণ-ময় আছে। তবুও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রচার করেন, সত্যকার শিল্প-সঙ্গীতে কল্যায়ের মায়ের কতই থাকে। তাহাতে বস্তু-বাচনের কি একান্ত প্রয়োজন,

তিনিই অপূর্ণ সমালোচকরূপে শব্দগুলাতে সেই কল্যাণময়ের অপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভারতীয়, তথা সর্বকল্যাণশিল্প-সঞ্চকে এই কথাটি স্বরণ রাখিতে হইবে, তাহা মনের ভাব-প্রকাশের সাধারণ বাহন মাত্র নয়—ইহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে অনির্ণয়নীয়কে, ইহা দিতে চাহিয়াছে বাণী। কল্যাণ-শিল্পের প্রকৃতি হইতেছে—বিশেষ বিশ্বদর্শকের রহস্যোন্মাদন, Revelation।\*

(ক্রমশঃ)

\* দীর্ঘ রচনার বহুভিত্তিকভাবে পত্রাঙ্কের প্রকাশিত আশঙ্ক প্রকাশ্যেও করা হইল।—লেখক।

## গল্প-প্রতিযোগিতা

### নিয়মাবলী

- ১। গল্প ফুলস্বপ্ন কাগজের ৯।১০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। বাঁয়ে এক ইঞ্চি পরিমাপ 'মার্জিন'-(margin) রাখিতে হইবে।
- ২। গল্পের আখ্যানভাগ, লিখন-প্রণালী এবং ভাষা—সকল দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিচার করা হইবে।
- ৩। গল্পের সঙ্গে ভাল ছবি দিতে পারিলে তাহার জন্ম বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ছবি Drawing Paper বা Bristol Board এ আঁকা যাইতে পারে। তুলি বা কলম ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলমে আঁকিতে হইলে লাইনগুলি গাঢ় কালো রঙের এবং পরিষ্কার হওয়া দরকার।
- ৪। প্রেরিত গল্পের আবারের (cover) উপরে “গল্প-প্রতিযোগিতা” লিখিয়া দিবেন।
- ৫। মনোনীত গল্প-প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার “উদয়ন” সম্পাদকের থাকিবে।
- ৬। অমনোনীত গল্প ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ন্যূনের ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।
- ৭। গল্প পাঠাইবার সময় “গল্প-প্রতিযোগিতা”র কুপন পাঠাইতে ভুলিবেন না। নিজের নাম ও ঠিকানা কুপনের উপর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।
- ৮। এ সম্পর্কে অন্যান্য জাতব্য বিষয় সাধারণ নিয়মাবলীতে দেখিবেন।
- ৯। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল।
- ১০। প্রতিযোগিতা সঞ্চকে সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রথম পুরস্কার	...	৫০ টাকা
দ্বিতীয়	...	২৫
তৃতীয়	...	১৫
চতুর্থ	...	১০





প্রশ্ন

(১)

হিন্দু শব্দের অর্থ কি? হিন্দু বলতে যদি Indian বা ভারতবাসী বোঝায় তাহলে ভারতবর্ষ যাদের মাতৃভূমি তাদের সকলকেই হিন্দু বলা যায় না কি? যদি তাই হয়, তবে ভারতীয় মুসলমান, পুঠান ও পার্শ্বরাও হিন্দু নয় কি? পক্ষান্তরে, হিন্দু বলতে যদি শুধু ভারতীয় ধর্মাবলম্বী বোঝায় (হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা তাই), তাহলে চীন, জাপান, শ্রাম ও রক্তের বোঝদের হিন্দু বলতে পারি কি? বালিশীপের অধিবাসীরা হিন্দু কি অর্থে?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

(২)

মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে ৩ চিহ্ন দেওয়া হয় কেন?

শ্রীবাণী দেবী

(৩)

সংস্কৃত-সাহিত্যে “মৃণাল” শব্দটির “নাল” অর্থে প্রয়োগ অস্বাভাবিক কিনা। থাকিলে কোথায় কোথায় আছে?

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

(৪)

ভারতীয় হিন্দু সমাজে অবরোধ ও অবগুণ্ডন প্রণয় উৎপত্তি হইল কখন ও কিরূপে? অস্থগোপ্তা কথাটির অর্থ কি এবং এই শব্দটি কত প্রাচীন? দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের মধ্যে অবরোধ ও অবগুণ্ডন প্রথা নাই কেন?

শ্রীকচিত্রা দেবী

(৫)

ব্রহ্ম বৈশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রণায় স্বরূপ কি?

শ্রীরেণু দেবী

উত্তর

(২)

৩ এই চিহ্ন তত্ত্বমতে নাদ ও বিন্দু জ্ঞাপন করে:— নাদ ও বিন্দুতে মিলিয়া বিখণ্ডিত বা পরম ব্রহ্ম বুঝায়। সেই পরম-ব্রহ্মে মৃত্যুর পর লোকের মিলিত হয় বলিয়া তাহার নামের আগে ৩ চিহ্ন দেওয়া হয়।

শ্রীমূলেনাথ রায়

(৫)

বার্মিজ স্বামী-স্ত্রীর যখন বিচ্ছেদ হয় জন্মের মতো—তখন তারা ছুটো টিক একরকমের মোমবাতি কিনে আনে। ছুটো বাতি ছ’জনের নামের টিক এক সময়ে জালিয়ে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকে। একটা গুণ একটা তার। যার বাতি আগে নিবে যাবে, তাকে সেই বৈশেষী তখনই বেরিয়ে যেতে হবে। কোনো দাবী কোনো বিবাদ চলবে না। সমসারের কোনো জিনিসের উপর তার অধিকার থাকবে না। যার বাতি জলবে বেশি—এক নিমেষের জ্বলে হ’লেও—তারই থাকবে ষাটকিছু তার।

বিবরণটি অনেকটা উপজাতির মতো; জানি না এর কতখানি সত্য। অপরে হয়ত বেশী খবর দিতে পারবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসি

শ্রীহরিনারায়ণচৌধুরী

আমাদের সম্বন্ধে, অপরূপ আছে, আমরা হাসিতে ও হাসাইতে জানি না। প্রাণ-খোলা হাসি আমাদের মধ্যে নাকি দূর? কমই দেখা যায়। আমাদের সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যেও হাস্যরসের বিশেষ অভাব। ব্রহ্মমানে বাঙা ভাষার হাস্যরসের কাগজ বোধ হয় একখানিও নাই—থাকিলেও তাহা অপরিসীম নহে। “কেন আমরা হাসি না?”—এ কথাটা উদ্ভবে কেহ বলিবেন, “আমাদের স্বভাব”; কেহ বলিবেন, “সংসারের চাপে ও নানা চিন্তায় হাসি চাপা পড়ে।” প্রথম উত্তরটি ঠিক হইলেও, সম্পূর্ণ ঠিক নহে। “অভাবের স্বভাব বদলায়” সত্য বটে, কিন্তু অভাব এবং হাসি কি পাশাপাশি থাকিতে পারে না? “অভাব হইলেই চিন্তিত্য আসিবে; চিন্তিত্য আসিলেই হাসি দূরে থাকিবে,”—কিন্তু চিন্তিত্য কি আমাদের জীবনকে এমনই জুড়িয়া বসিবে যে, দীর্ঘনিরাশ্রি কেবলই তাহার শেখণে আমরা বিভ্রম ও নিরীহ হইয়া থাকিব? একগু চিন্তিত্য শরীর ও মনের পক্ষে যে কি পরিমাণ ক্ষতিকর তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। হাসি—প্রাণ-খোলা হাসি—চিন্তিত্যের পরম শত্রু, শরীর এবং মনের অন্তরঙ্গ বন্ধ। হাস্যরসিক ব্যক্তি বিমর্ষতা ও চিন্তিত্য-জরাগ্রস্ত ব্যক্তির ডাক্তার; হাসি চিন্তিত্যরোগের প্রধান ঔষধ।

“রত হাসি তত কাদা, বলে গেছে রামশঙ্ক”—এই মিথ্যা প্রবাদটি আমাদের কাছে যেন ভূতগুণের ছায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাদার ভয়ে আমরা যেন হাসিতেও নারাজ।  
কথায় বলে—“Laugh, and the world laughs with you. Weep, and you weep alone.”  
“হাস্য যদি, দুনিয়াও সাথে সাথে হাসে;  
কাদিলে, কাদিতে কেহ পাড়াবে না পাশে।”

কথাটি বুঝি সত্য। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাচ্ছলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, “সেখি, কে আগে হাসে।” হাসি চাপিয়া অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার কালে একজনের মুখে আপনা হইতেই হাসি আসিয়া পড়ে। কিন্তু, একগু কাদার বেলা কোন দিনই দেখি নাই। “শুধু অকারণ পুলকে” হাসা চলে, “শুধু অকারণ দুখে” কাদা কখনই চলে না।

বর্ধার রসিক তিনিই, যাঁহার রসিকতা কখনও বার্থ হয় না, বা অহানে, অপায়ে ও অসময়ে কদাচ অশ্রুত হয় না। রসিকের হাসির কথা অস্ত্রের বিরক্তি বা কষ্টের কারণ হইলেই তাহা বার্থ হইল বলা যাইতে পারে। কোনো কাল্পনিক মূল্যবান ব্যক্তির সম্বন্ধে হাসির ছবি আঁকিয়া বা গল্প রচনা করিয়া হাসির উদ্দেশ্য করিলে তাহা বাস্তবিক রসিকতা হইতে পারে; কিন্তু, আমাদের পরিচিত রামবাঁহ বা শামবাঁহ বা অন্ত কোনো ভজলোকের ছবি আঁকিয়া বা গল্প লিখিয়া হাস্যরসের চোঁকে বার্থ রসিকতা বলিতে হইবে।

অনেকের ধারণা, হাসি বা রসিকতা আমাদের গুরু-লগ্ন ভেদজ্ঞান দূর বা হ্রাস করিয়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে, বর্ধার রসিক ব্যক্তির গুরু-লগ্ন ভেদজ্ঞানও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তিনি গুরু বিষয়ে লজ্জাবোধ বা লগ্ন বিষয়ে গুরুত্ববোধের অবতারণা করিবার চেষ্টা করেন না। গাভীরা মানে “হাড়িমুখ” নহে; রসিকতা নহে “ছায়াবাসী” নহে;—এ কথা সন্দেহই মনে রাখিতে হইবে। রসিকের মনে আনন্দ, উদারতা, সহ্যবৃত্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে তাহার রসিকতার পূর্ণ বিকাশ হয়।

জীবনসংগ্রামে হাসির বিশেষ প্রয়োজন—সংগ্রামকে ভুলিবার জ্ঞান নহে, সংগ্রাম করিবার শক্তি মনে জাগাইবার জ্ঞান। হাসি জীবনের ‘ভার’ লাঘব করিয়া, আরো ভার বহিবার শক্তি দেয়।



## হাসে কাহানা P



শেও-ভদ্র—  
দরাশিষের হাসি

সিংহ-শাবক—  
প্রাণখোঁচা হাসি

বেড়াল-হানি—  
সামান্য হাসি

কুকুর-ভায়া—  
পালঙ্করা হাসি



কুমীর-ভায়া—  
চোখটি বুজা মুচকি হাসি

বাঘ-ভায়া—  
পাখীরা বেধে হাসি

গরুর—  
জিহ্বা কেটে বিজ্ঞপের হাসি

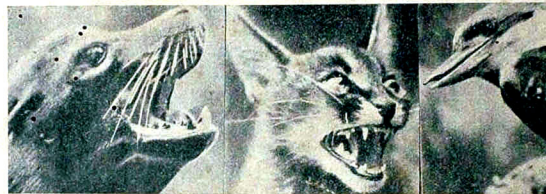


বন-মাছ—  
চোখ বুজা হাঁটার হাসি

শেওাল-হানি—  
আত্মবোধের হাসি

কোলা-বায়া—  
মুণ্ডি চেপে মুচকি হাসি

## হাসে কাহানা P



নীল—  
পালঙ্করা হাসি

বন-বেড়াল—  
হাসিলে হাসুরে না কেন ?

কার-চোখা—  
মুচকি হাসি

- হাসি কি মানুষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ? জীব-  
জন্তু ইহঁদের প্রাণী কি হাসিতে জানে না ? এবিষয়ে  
নাহার যেকণ সন্দেহ থাকুক, জীবজন্তুর মুখে যে  
হাসির ভাব অতি স্পষ্টভাবে  
দেখা যায়, এটি ছবিগুলি  
দেখিলে সন্দেহে কোন  
সন্দেহ থাকিতে পারে না।  
বনমাছ যে বাস্তবিকই  
হাসে, তাহার প্রমাণ কিছু  
কিছু পাওয়া যায়। হাসি  
কায় প্রভৃতি মানের ভাব  
হাসাদের মুখে বেশ  
স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়।  
যে বনমাছটির ছবি  
এখানে দেওয়া হইয়াছে  
তাহার মুখে যে বিজ্ঞপের  
হাসি দেখা দিয়াছে, বুদ্ধিমান  
জীব ছাড়া সে-হাসি  
হাসিতে কেহই পারে না।
- কিন্তু, আরো যে-হাসি হাসিতেছে, তাহা নাকি  
হাসিই নহে ! পণ্ডিতেরা নানাকণ পূরণ করিয়া  
বিস্ময়ছেন, সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, শূশাল, কুমীর,  
গণ্ডার, পাখী, বাঘ ইহঁরা  
হাসিতে জানে না। যে  
যাহাই বলুক, ছবিতে যখন  
উঠিয়াছে তাহার 'হাসি'  
ছাড়া আর কিছু বলা  
চলে না।  
ছবিতে যাহা উঠিয়াছে,  
তাহা যতই হাসির মত হউক,  
আমলে নাকি বেচারাদের  
'বাস্তবিক' মুখ-ভঙ্গির  
প্রতিকৃতি কেহ স্বাক্ষর  
হইয়াছে, কেহ ঘুম পাইয়াছে  
বলিয়া হাই তুলিতেছে,  
কোলা-বায়া—একবারে হেসে পড়াগড়ি



কোলা-বায়া—একবারে হেসে পড়াগড়ি



বাড়ীখানি রেললাইন হইতে দেখা যায়। গুব জমকালো পল-কাটা ধামওয়ালা একরকম বাড়ী ভিত্তিরিয়ার কিছু পূর্ববর্তী দিনে যব বেশী রকমেই এগুলিত ছিল, অল্পশ্রম ধনী বাড়িদের মধ্যেই; এখনও সখ করিয়া কেহ কেহ কদাচিৎ এর অধুকাণ করে; কিন্তু সেটা খুবই কম লোককেই করে; এ সেই গভনের একখানি বড় বাড়ী। এ বাড়ীর জন্ম-তারিখ বাড়ীর গায়ে লেখা নাই; লেখা থাকার কোন প্রত্যাশাও করা যায় না, কিন্তু তার শুধু পল-কাটা মোটা মোটা ধামজুলাই নয়, বাহিরের আকার-প্রকারের অবস্থা হইতেও তার না-লেখা জন্মতারিখ আন্দাজ পাওয়া যায়; সে-তারিখ অস্বস্ত: শতাব্দী সূর্যসই, এদিক-ওদিক হ'দশ বছর আগেরও হইতে পারে, গয়ের কিছু নয়।

বাড়ীটার গায়ে তার শৈশবে কৈশোরে কোন কোন রঙের ছোপ রঙিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন নিশানা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের এবিধের গবেষণার যদিই কোন প্রয়োজন থাকে তাহাতে বাধ্যও পড়ে না। এর গায়ে এখন ঘুরিও অনেক দিনের পুরাতন রঙ-জলের কাগো কাগো ডোরা-টান আশ-পাশে রং-জলা হৃদয়ে রঙে জড়িত বৌবনের বস্তুত্বসংবের লাফানো করিতেছিল, কিন্তু এর এখানে-ওখানে নানা স্থানে যে চূর্ণবালি খসিয়া পড়িতেছে, তার ভিতর দিয়া তবুও তবুও সাদা সাদা প্রান্তিত মূল সখ বর্ণের কয়েকটাবর্ণই উজ্জ্বলি করিয়া বলিতেছিল, "আমরাও একদিন ছিলাম।" বাড়ীর খরগুলি মনে হই লগাচোড়ায় বেশ বাড়ী, ওদিক-ওদিক তা' নেহাৎ কম নয়; উপর

নীচের জানলা যা সামনের দিক হইতে দেখা যায়, তার সংখ্যা, —এটা অবশ্য আন্দাজীতেই বলা যেল, অস্বস্ত: বজ্রিশ-ষাটটির কম নহে। দরজা-জানালাগুলি বেশ বড় বড়, সমজাই খড়খড়ওয়ালা, রং তাদের এক সময়ে গাঢ় সবুজ ছিল, এখন কিছ তা নাই; সবুজের আমেজ দেওয়া যে রংকে কলাপাতা রং বলা হয়, এখন এদের সেই ধরণেরই একটা রং। কোথাও কোথাও একটু তা' কিকোও হইয়া গিয়াছে, কীকে কীকে কোনখান দিয়া একটা ছোটো, লাইন গাঢ় রঙেরও দেখা যায়; কিন্তু সেটা যে আর আসল রং নয়, তা' বুঝিতে দেহি লাগে না। উপরে সেই জোড়া জোড়া মোটা থামের উপর দিয়া যে চার-চৌকা বারান্দাটি দেখা যায় তার দিন-দিকের ঘোহার রেলিং একদিন নীল কিংবা সাদা রং মাখান ছিল, আজ তার রং সেখানেও কিছু বা বাকি আছে, ধূলা-ময়গার সঙ্গে তা এক হইয়াই মিশিয়া গিয়াছে; ঘোহার গায়ে গা লালচে রঙের মরিচা ধরা। রুটির জলে জলে ছাড়ের মেজেক্টার একপুঙ্খ শেখোটা পড়িয়া রহিয়াছে; রোদের তাতে থানিক থানিক উঠিয়া আশেপাশ মূর্ধির একটুখানি আদল দেখা বাইতেছে, আসল চেহারা আর নাই।

এই ঘনিলে সেই বাড়ীখানিতে একদিন বয়সে এই বাড়ীর মাগের অত্থপাতেই বেশ একটা বড় রকম পরিবার তাদের জীবনের অসংখ্য ছোট বড় দুঃখ, সুখ এবং কান্দায়াসির ডালি, সাজাইয়া লইয়া বাস করিত; তাদের মধ্য দিয়া এই বাড়ীতেই যেখানে কত জন্মমৃত্যুর লীলা, কত উত্থানের বাঁশি, কত বিয়োগের

হাজার, কতই না মিলন-বিবাদের আনন্দ-বিষাদের চেউ উঠিত-পড়িত, যেতের মতই প্রবাহিত হইত, বছার মতই প্রাবিত করিয়া দিয়া আবার বর্ষাশেষের প্রান্তবেণ জলরাশির মতই প্রবাহ বহিয়া চলিয়া বাইত; আজ সেখানে রক্তশোত পুঞ্জি জলের সামাজ্য একটুখানি জবার মতই ক্ষুদ্র একটা পরিবার বাস করিতেছিল। বাড়ীর সামনের অত্থ-সরস্কিত একদিনকার সমব-স্বরচিত উজানটির এদিক, ওদিক যেমন হুচারিটা নাম-জালা ছুঁলেই গাছ সেদিনে হয়ত তাদের কৈশোরও আরম্ভ হয় নাই; আবার কাহারও বা জন্মপটিকা এইখানেই; চারিদিকের মরণোৎসব এবং ধ্বংসের মারুখান হইতেও নিজেদের প্রবর্তিত পূর্ণাবস্থায়ের ফলে বাচিয়া-বহিয়া থাকিয়া নিজের নিজের গুপ্ত-মুকুতে অজ্ঞ গুপ্ত-সম্মারে তরিয়া উঠে, সেই মতই কাগোতোতের সঙ্গে লুপ্ত করিয়া যারা রূপত হইয়া বিদায় লইয়াছে, বিরাম লভিয়াছে, তাদের ভিতরকার একজন মাত্র বোক তার সমস্ত বয়সটাকেই অতিক্রম করিয়া আসিয়া আজও এই অতিক্রান্ত-প্রায় বাক্যের শ্রেণে সীমানায় পৌছিয়াও যেন এই বাড়ীর বাগানের বাস পাশেতে ঐ পরম্পরা শাখা-বিরল পরিণতবয়স সজিনা গাছটার মতই শ্রেণে বিনতির অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিল। দিন তিনি ঠিক একটির পর একটি করিয়া গথিতেছিলেন কিনা জানি না, জগের মাঝার তার ঈর্ষময়ের নিষ্কণ্ট অক্ষর কয়টি কিছু অনেক সংখ্যাতেই নিতা গোণা-বাঁধা হইতেছিল, সে খবরইহু আবারও পাই।

ইনিই এই পুরাতন বড় বাড়ীটির বর্তমান কালের মালিক, নাম তার ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়, এর পিতার নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পিতামহ ছিলেন চিত্ররঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়; এই বাড়ীটি তার ইচ্ছাতেই পড়িয়া উঠে। অজ কোন এক পয়াপায়ের দেশ ছাড়িয়া কোন কিছুই ব্যবসা অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দায়িত্বে, জানা যায় না, এই অশেষ আসিয়া পছন্দ করিয়া এই বাড়ী ও বাগান তৈরী

করাইয়াছিলেন। শুধু বাড়ী বাগানই নয়; বাগানের ভিতর বাড়ীর ঠিক সামনেই একটা দৌরিকা; অবশ্য সেটি 'গোবিন্দলাল'দের বাড়ীর বাগানের সেই সাহিত্য-জগৎ-বিখ্যাত 'বারুদী' পুস্তকের সঙ্গে সমতুলিত হয় না; কিন্তু একদিন এরও কাচবুজ সলিল-সমুদ্র বক্ষের উপরে চক্ষ-তারকার সহস্র বক্রিকা তেমনি করিয়াই নব্বিত হইত, এর মস্তর-মস্তিত সোপান-শ্রেণীর উপর 'জমদে'র মত অলঙ্করণ-মাখা কোমল চরণের এবং 'বোরহিণী'র মত শেখপাশ্রত সাম্যপায়ের সলিলালু চিহ্ন অ'কিছা দিবারও সোকার কোন জন্মাব হইত না। এখন কিছ এই ভাঙ্গা কাট-ধরা এবং খসিয়া গিয়া যাওয়া প্রবৃত্তত সোপান-শ্রেণীর উপর হ'খানি পায়েরই চিহ্ন অঙ্কিত হয়; সে হ'খানি পায়ের দাপে যে বালিতা, যে সৌকর্য্য-চুটিয়া উঠে তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে পড়িয়া যায় সকল হিন্দু-গৃহস্থের তাকুর-বরণের লক্ষ্যসূত্রার দিনে পিঠালি দিয়া অ'কা' মা-লক্ষীর চরণ-কলহটা। বে-চরণের আশা-মোরব-মাজ-লালসার পুরাকালের রাজোদানের অশোক-বাঁধিকায় লুপ্ত অশোকতরু তার কাল-সম্ভাবিত পুষ্পোৎসবের সঘন-নিরুদ্ধ রাষিত, যেন 'বাসবদত্তা'-র 'বতাবলী'র সেই রক্তোৎপাদ-পারগত-মুখের-মজীর-বস-জীবিত সেই হ'খানি চরণগায়।

বাটের উপর চান্দ-নেওয়া সিঁড়ির মতই সাদা-কালো পাথরের মিলান করা বসিয়া হাওয়া খাইবার জায়গা। আগনের ছানিকে কাড়-করা পাথরের ছোট খিলানের মত, রেহান দিবার কাজে বোধ করি এক সময় লাগিত, এখন কোনেই কাজে লাগে না। মনে মধ্যে পড়ল বাড়ীর কমবয়সী মেয়ের মান করিতে আসিয়া থাক বা মুংকলসে ভরা জল এরই উপর নামাইয়া সোপান-আরোহণের প্রান্তিটুকু দূর করে, তারপর বিগতমহ হইয়া ঘরের দিকে চলিয়া যায়। বাড়ীটার দক্ষিণদিকে বাগানের সোপানের পাঁচিলের গা বে'খিয়া কতকগুলি পাকা ঘর; ছাদ তাদের পাক-নয়, করোগেটেই। দরজা এখন সব ওলায় নাই, হয়ত



কজা খসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তারপর আর মিলি ডাকিয়া বনান হয় নাই; হয়ত মালী প্রভৃতিরই ভ্রমের ভাতখী। উনানের ইন্দ্রন রূপেই তার সদ্যবহার করিয়াছে। না হয়ত কোন হুযোগ-প্রাপ্ত প্রভিবংশ সেগুলোকে অশ্লিষ্টে সরাইয়া লইয়া নিজের বাড়ীর একটা পান্নাভাগ দরজার পরিবর্তে বসাইয়া দিয়া অকাজ হইতে কাজে লাগাইয়াছে,—কথায় বলে, 'বড়লোকের আত্মকুড়ো সোনা কলে'। তা' সব ঘরগুলারই যে দরজা ছিল না, তা'ও নয়, ওইই মধ্যে হু'খানা ঘরের অবস্থা বেশ ভালই, শিকল দিয়া তাতে তাল লাগানোও থাকে। ভিতরে থাকে বাগান তৈরী করার জন্ত মাটির কাজে উপযোগী মাঝ-শরভাম, কোদাল, বুল্লশ নিড়ানী বর, গাছ-কাটা কাঁচি, ফুটা-কাটা লম্বা-শরনারের ঝরি এবং আরও সব কি কি, ঘোড়ার মাছ, গাড়ির সৰসাম, ভাঙ্গাচোরা অনেক দিনের অনেক কিছু, এমন কি হুহু দুদিনের বাড়ী হং করার শেষে নিদর্শন চূড়চুড়ানোর মতবড় বোকাই জালাত। আর একটা ঘরের মালিক একজন খোষ্টাই ভরায়ান। সে তার মেজের খোয়া-বাহির-করা ঘরের একপাশে চুলার চাপাইয়া রহড়ার দাল আর মোটা মোটা পুরু পুরু চাপাটী বনায়, এদিক সেদিক কাজে-কাজে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আলম-অলসিত মন্যকো সদায় দিচ্ছাওয়া চার-পাইয়ার উপর হাতপা ছড়াইয়া দিয়া কখন মুচ গুড়নে কখন গলা ছাড়িয়া তুলনীদাসের অথবা কবীরজীর বোহা গাহিয়া নিঃশব্দ জীবনের বিজ্ঞতা এবং তিক্ততার পরিহা করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে হুব বেশ মধুর ও সুগন্ধ হইয়া অদূরবর্তী ঘন-বিরল গৃহ-বাগানে আনমনা কোন নিঃসঙ্গী তরুণীর কানের তীরে করণ মূৰ্ছনায় বাজিয়া উঠে, গভীর অজমনস্ততা হইতে সদা তাদারকৈ সচকিত করিয়া ঈষৎ উৎকর্ণও হয়ত ব্রাহ্মণী করায়, 'পানের ফুটা-একটা কলি পড়ে নোনা' পিয়াছে তারপর হয়ত বা আর শোনো যায়

নাই, হয়ত বা ইতিমধ্যেই গান আপনা-আপনি গামিয়া গিয়াছে। কোন সময় বা গায়ক অস্তরের বিবেক-বুদ্ধির গভীরতর প্রত্যোচনার গভীর ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে—

"বাহা লোটা রসি অউর কুঁয়া নাহি,  
উঁহা পিয়াসন হোয়াগান করকে চাছি।"

স্বরটা কানের মধ্যে তত না হ'ক, ভাষাটাই হয়ত বা শোজীর মনের মধ্যে মিঠা লাগিয়াছে, যেন এর পরের কথাগুলি শোনার জন্ত মনে তার আগ্রহের অস্ত নাই; কিন্তু নিশেদ এই উজ্জ্বলতার নীরব আবেদন বোধ করি বা বখাত্তানে পৌছাইয়া দিতে সে পারে নাই। গান হয়ত গামিয়া গিয়াছে, মনের তার মত মূঢ় রংনে কিছুকণ ধরিয়াই যেন আপনা-আপনি বাজাইতে থাকে—

"বাহা লোটা রসি অউর কুঁয়া নাহি,  
উঁহা পিয়াসন হোয়াগান করকে চাছি।"

ঠিক কথা, ঠিক ঠিক। যেখানে পিপাসা মিটাইবার কিছু মাত্র উপায় বা উপকরণ নাই, সেখানে পিপাসাকেই পরিতাপ না করিয়া আর উপায় কি? করাই ভাল, ঠ্যা করাই ভাল। বৃকের ভিতর একটা ব্রহ্মগভীর দীর্ঘশ্বাস ব্রত-প্রস্তুতকালেই যেন জমিয়া উঠে এবং বৃকটকে গভীর ভাবেই তারাজ্ঞায় করে; খানিক ক্ষণের জন্ত মনটাকেও সেইসঙ্গে ঈষৎ বাগারিল্পিত করিয়া রাখে। কেন? জানি না।

বড় বড় ছায়াছয় বড় ঘরগুলার চুকলে মনে হয় যেন সেগুলো ঠা করিয়া গিলিতে আসে। এই সব ঘরের মধ্যে কয়েকটাই ছিল পূৰ্ণসম অভিবাসীদের শয়নাগার। এখনও সে-সব ঘরে ভাল ভাল কাঠের বড় বড় খাট পাতা আছে। লাল খেয়ের গদীর উপর বিজ্ঞানের স্বান অধিকার করিয়া আছে বাগানের মধ্য হইতে উড়িয়া আসা শান্তপুর্ণ ধূলা। প্রায় সকল ঘরেই একটা করিয়া মেহাথ কাঠের বড় আলমারি, চুল

বাধিবার টেবিল, আয়নাগুলি যদিও বিবেল করা নয়; মাথোবেশ বড়ই,—একটা করিয়া আনুণা, ভগ্নার দিকে জুতা রাখার বাক্স, জপটোঁকি—কোন্টা মার্বেল-বসান, কোন্টা শুণ্ড কাঠের, আর এছাড়া খানকতক করিয়া ছবি। তা' ছবিগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক কণ্ঠি-নিবন্ধনের খবর পাওয়া যায়। যে-সময়ে বাজারের ছাপা ছবি প্রস্তুত হয় নাই, ধনী লোকেরা পটোঁদের পুঁজিপাশকতা কুরিয়া ভাল ভাল তৈলচিত্র অঙ্কিত করাইতেন, সেদিনের অতি স্বন্দররূপে চিত্রিত ব্রহ্মাযতনের থণা, মহিমমাদিনী, কালী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে প্রশস্ত স্রেম-স্রীটা সজীববৎ পরিপূর্ণমুহূর্তি এতদীর নন্দনাবীরেও কতকগুলি ছি, আবার আট ফুলের কল্যাণে সস্তায় ছাপা দশাবতার, দশমহাবিষ্টা, রুক্ম-কালী, কালীদয়নম; আবার উৎকট সভা পরিচ্ছদ এবং পরিচ্ছদে সম্পূর্ণরূপেই অনতিক্রান্ত বা বিরাগ মণ্ডুলতা সন্দরী মেমদের ছবিরও কোথাও কিছু অপ্রস্তুততা দেখা যায়ত না। ঘরে দালানে এমনকি উপরে উঠার সিঁড়িতেও ইতার প্রাচুর্য আভ ও বহিরা গিয়াছে, নাই শুণ্ড এসব দেখিয়া দৃষ্ট সার্থক করার লোক। কিন্তু তাই বলিয়াই দেখা-শোনা কদম্বার লোকও যে নাই এমন নহে। কালের ধরে কিছু পোকায় কাটে, ফুলের গিলটা ময়লা হইয়া যায়, প্রাণীর বসিয়া পড়ে তথাপি ঝাড়ানোছা আব্দারক করা একেবারেই যে বন্ধ থাকে তা'ও নয়, বড়টা পারে আগেকার ঐ সব দশজনের অধিকার-করা ঘরগুলার তদ্বির এখনও এই একজনই করে। কাজে তার কাপ্তি নাই, কুণ্ডলো অবদান আসে না, ভাল হয়ত

কোনদিন লাগে, কোন সময় হয়ত অশুদ্ধন ধরে কিন্তু কাজ সে ছাড়ে না, একই ভাবে করিয়া যায়।

হু'খানি ঘর দক্ষিণদ্বারী, বেশ বড় বড় জানালা প্রায় খোলাই থাকে, বাতাস অনেক দূর হইতে যেখানে যেটা ভাল তাছা ফুলের গন্ধটু, প্রথম বর্ষের আত স্রবাসটা, দীঘিজলের সুমিষ্ট স্রিধ্বতা এর ভিতর দিয়া বহন করিয়া আনে, সদ্য-তারার টিপ জানালার ওপারে আকাশের কপালে ঝিকি-ঝিকি করিয়া ফুটিয়া-ওঠে; ঘরের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা এবং চারিপাটা যেন নিত্য প্রত্যাক হইয়া দেখা দেয়। ঘর ছা'খানির মধ্যে অতীতের প্রহতব গভীররূপেই আত্মগোপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইতার সঙ্গর ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা মানুষ-মাথা পরম রমণীয় বস্তুমানতা।

খাট এঘরেও পাতা আছে, টাইল পুরাতন কিন্তু অতীতের ঝড়ে ধাঁড়াইয়া সে নুতনের দিকে তার বাহ প্রসারিত রাখিয়াছে। নুতন টিকনের গদী, গু-দল সম্বন্ধ-রচিত শব্দা, 'আনুণ্য আধুনিক ফুলের কাপড় জামা, দেওয়ালে অয়েল পেইন্টিং-এর বদলে ওয়াটার-কলারের প্রতিকৃতি, তাতে পুরুদের গায়ে শালের জোলা আর মাথায় পাগ নাই, মেয়েদের গায়ে আছে নুতন বর্ণের পরিমিত অলঙ্কার-বস্ত্র, আর আট-ফুলের গল্পী-সরস্বতীর ছবির পরিবর্তে কাপড়ের উপর দেশনী পশনী হুতায় তোলা এগুলের মেয়েলা হাতের ত্রিাবলী। ছবিগুলির তলায় তলায় এগুলির রচয়িতার নামটীও নানা রকমের হুতা দিয়া গলাপাতার ভিতর হইতে স্তব্ধ করিয়া দেখা আছে—

(জয়শ:)

"যে গৃহিণী সর্বদা গৃহকার্যে বাপুত থাকেন, বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন ও ব্রহ্মজ্ঞ থাকিতে চাহেন না, অস্তরের একটা গুচ অত্ৰিমান আছে—সেটি ভাল নয়।—যে গৃহিণী বানী দেবত বিধি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

ভূদেব





## ইতিহাস —

উড়িষ্যা বণীর প্রতিরোধ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

নামের আগে শ্রী লিখিবার নিয়ম—  
শ্রীস্বাক্ষর ভট্টাচার্য  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

প্রাচ্যদেশ ও অপরাধ—শ্রীবিমলচরণ লাহা  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা—  
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

মুহলমানের বর্ণবিচার—মোহাম্মদ আকরম খাঁ  
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩৯)

‘হাড়মার’ দমন—আবদুল কাদের  
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩৯)

মারাঠা সৌভাগ্য-দুর্গের অবসান—শ্রীহরনাথ  
সরকার (বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৯)

বুদ্ধকথা—শ্রীঅম্বলাচন্দ্র সেন  
(বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৯)

ঐতিহাসিকদীন মুহম্মদ বিন-বক্তিত্বের তিপ্ত-  
অভিমান—শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশাী  
(বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৯)

## চাপাখানা —

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস—শ্রীজয়রত্ন সরকার  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

## কলাশিল্প —

বহু প্রাচীরের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র—  
শ্রীকালিদাস দত্ত (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য—শ্রীগুরুদাস রায়  
(প্রবৃত্তক—চৈত্র, ১৩৩৯)

বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ ও অজ্ঞতা গুহা—  
শ্রীঅজিত ঘোষ  
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩৯)

## বেকার-সমস্যা —

Qualified Indians and Unemployment  
—S. K. Sircar  
(Modern Review—April, 1933)

## ধর্মতত্ত্ব —

ঈশা—শ্রীশ্রীজ্ঞানেশ্বর বসু  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

অমৃতত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনা—  
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

জাতিগঠনে বৈধবধর্ম  
(প্রবৃত্তক—চৈত্র, ১৩৩৯)

## বর্তমান জগৎ —

রক্তদেহ ও ভারতবর্ষ—শ্রীহরচিবালা রায়  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

তরুণ জাপান—শ্রীপটুগোপাল মুখোপাধ্যায়  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

এস্তোনিয়া—শ্রীলক্ষীধর সিংহ  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

## অর্থনীতি —

ব্যান্ধিঙের কয়েকটি মূলতত্ত্ব—  
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

Economic Aspects of Gold Exodus  
—U. N. Ghosal  
(Modern Review—April, 1933)

Gold or Sterling—  
Sir John Wardlaw Milne  
(Nineteenth Century and After  
—March, 1933)

## কৃষি —

World Agriculture—  
C. S. Orwin  
(Nineteenth Century and After  
—March, 1933)

## জগৎ —

পারস্ত-জগৎ—শ্রীকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়  
(প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯)

মহাপ্রবাহনের পথে—শ্রীপ্রবোধকুমার সাঙ্গাল  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

পারস্ত-জগৎ—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

Impressions of Peru—Rosita Forbes  
(Nineteenth Century and After  
—March, 1933)

## সাহিত্য —

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—  
শ্রীজগৎমোহন সেন  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

মুসলমানের বাঙালা চক্কা—  
মহম্মদ মনুহরউদ্দীন  
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩৯)

বাঙালা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের কঠি-  
বিপর্যয়—মোহাম্মদ আবজল্লাহেল কাফী  
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩৯)

সাহিত্যে অমীলতা—শ্রীসত্যেন্দ্র দাস  
(বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৯)

গোবর্ধনবিজয় বা মীনচেনন ও বৌদ্ধপ্রভাব—  
শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্তী  
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩৯)

নূতন ধরনের পয়ার—শ্রীরমেশ বসু  
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩৯)

অখ্যোদিত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ—  
শ্রীঅম্বলাচরণ ভট্টাচার্য  
(পঞ্চপুষ্প—চৈত্র, ১৩৩৯)

## ব্যায়াম —

যুগ্ম-কৌশল—শ্রীবারেন্দ্রনাথ বসু  
(ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৩৯)

## দর্শন —

লজিক ও সত্যাসম্বন্ধ—শ্রীপ্রদীপকুমার দেব  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

ঈশ্বরবর্ণে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব—  
রামী জগদীশনাথ  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

## সমাজতত্ত্ব —

বিবাহ-সম্বন্ধ—শ্রীবারেন্দ্রনাথ মজুমদার  
(বিচিত্রা—চৈত্র, ১৩৩৯)

মন্দির প্রবেশ সমস্যার ‘সমানত হিন্দু’ পদ্ধতির  
আলোচনা—শ্রীশ্রীধর ভারতীর্থ  
(প্রবৃত্তক—চৈত্র, ১৩৩৯)

The Woman's Movement in India  
—Raj Kumari Amrit Kaur Sahiba  
(Modern Review—April, 1933)

## বিজ্ঞান —

কৃষি ও শিল্প বিজ্ঞানের স্থান—এ. নাসীর  
(মাসিক মোহাম্মদী—চৈত্র, ১৩৩৯)

## জীবনচরিত —

Radhanath Sikdar—Jogesh C. Bagal  
(Modern Review—April, 1933)

Karl Marx : Fifty Years After—  
John Hallett  
(Fortnightly Review—  
March, 1933)

## রঙ্গালয় —

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়—  
শ্রীরঞ্জেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
(বঙ্গশ্রী—চৈত্র, ১৩৩৯)

## ব্যবসা-বাণিজ্য —

The Trade Depression—Its Causes  
and Remedies—J. C. Sihba  
(Modern Review—April, 1933)





## ২১ আশার সন্ধান

হাজার ভাটিয়ার চাই! 'ভোট ফল'  
বলত পালেই চাকরি-ভূরিভোজন তো  
উপরি আছেই!



## ২২ এনার সন্ধান!

বছরে এরকমের পোটারককে 'ইলেকশন' হ'লে বেকার-সমাজ একরম গুচে যাবে

আমাদের সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্ব সন্দেহে আমরা  
সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন। প্রাচীন ইতিহাস  
বিশেষ ভাবে চর্চা করেন নি কিন্তু সাধারণ শিক্ষা  
পেয়েছেন এমন হিন্দুস্থান প্রায় সকলেই এই কথাটিকে  
বর্তমানিক সভ্যতা ব'লে যেমন নিতে অভ্যস্ত, তে পৃথিবীতে  
সভ্যতার প্রথম উদয় হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে,  
আর এই প্রাচীনতম সভ্যতার পত্তন ব'টেছিল আমাদের  
আর্য্য পুরু-পুরুদেরই মধ্যে। জগতে সভ্যতার উদয়  
আর্য্যদেরই মনীষার ফল; এর জন্ম রুত্বিত তাদেরই;  
আর তাদের বংশধর ব'লে আমরাও এই রুত্বিতের  
উত্তরাধিকারী। আমাদের হিন্দুজাতির অতি-প্রাচীনত্ব  
সন্দেহে একটা সংস্কার ছেলেবেলা থেকেই আমাদের  
মস্তিষ্কার ভিতরে পর্যাপ্ত গিয়ে পৌঁছায়। পুরাণ-কাহিনীতে  
সত্য, য়োতা, স্বাপন, কলি—এই চার যুগের কথা আমরা  
পড়ি, সে কত লক্ষ বছরের কথা! "লক্ষ"-টাকে না  
হয় একটু অতিজ্ঞান ব'লেই মানলুম, কিন্তু অনেক  
হাজার বছরের কথা, এটা তো বটে।

আমাদের মধ্যে বীরা আধুনিক শিক্ষা একটু-আধটু  
পেয়েছেন তারা, ভারতবর্ষের বাইরের কোন এক দেশ  
থেকে বড় সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য্যেরা যে এদেশে এসে  
হিন্দু সভ্যতার পত্তন করেন, এ কথাটা সাধারণতঃ  
এক রকম রোমেনেই নিয়েছেন। বীরা প্রাচীন শিক্ষা  
পেয়েছেন, কেবল সংস্কৃতই প'ড়েছেন, তারা এ কথা  
নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতাই উপলব্ধি করেন না,  
বা স্বীকার করেন না,—তাদের কাছে ভারতবর্ষই  
আর্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি, ভারতের বাইরের  
কোনও দেশ থেকে কোনোও কালে আর্য্যেরা যে এসে  
থাকতে পারে, এ কথা মনে করাই তাদের কাছে একটা  
অসম্ভব কল্পনা। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আর্য্যেরা

এবেছিল কিনা, একথা নিয়ে আলোচনা এখন ক'রবে  
না; তবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই যে আর্য্যেরা  
এসেছিল, এই মতবাদই আমি গ্রহণ করি,—খালি  
এইটুকুই উপস্থিত ক্ষেত্রে ব'লে রাখছি। বাইরে থেকে  
আর্য্যদের ভারতে আগমন হয়,—এই মত বিপত  
উনিশের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে কতক-  
গুলি ভাষাতাত্ত্বিকের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে, এবং  
পণ্ডিত মাজমুল্ল এই মতটা বিশেষ ভাবে তার  
প্রবন্ধাদিতে প্রচার করেন। তিনি ও তার মতন আরও  
কতকগুলি পণ্ডিত অল্পমান ক'রেছিলেন যে মধ্য-এশিয়ার  
এখন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে আদি-আর্য্যজাতি  
বাস ক'রত, সেখানে প্রাকৃতিক বিপ্লবীয় বা অস্ত্র কারণে  
আর্য্যদের বাস অসম্ভব হ'য়ে পড়ায়, তারা পশ্চিমে আর  
দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের-কয় দল  
ইউরোপে যায়, সেখানে রথ, গ্রীষ্ম, ইটালী, জার্মানি—  
জান প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হয়; এই সব দেশের স্লাভ,  
গ্রীক, ইটালীয়, ডিউটন, কেল্ট জাতির লোকেরা এই  
প্রাচীন আর্য্যদেরই বংশধর। একদল মধ্য-এশিয়া থেকে  
দক্ষিণে আসে, তারা পারস্তদেশে উপনিবিষ্ট হয়; আবার  
পারস্ত থেকেই তাদের একদল আসে ভারতবর্ষে, এরাই  
হ'চ্ছে বেদরচক ভারতীয় আর্য্য, এরাই ভারতীয়  
সভ্যতার মূল। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের অল্প ইচ্ছা  
বিচার আর মতের সঙ্গে এই মতবাদটাও যথাকালে  
ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল, আর ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত  
ভারতীয়গণ বিশেষ প্রতিবাদ না ক'রে এই মতটা গ্রহণ  
ক'রলে। ইউরোপে ইংরেজ আর অল্প ইউরোপীয়  
জাতির লেখা-পড়া-জানা লোকদের মধ্যে এক মতের  
প্রতিষ্ঠা সংজ্ঞেই হ'য়েছিল। সংস্কৃত, প্রাচীন পারসীক  
আর্য্যাবী—এশিয়া-খণ্ডের তিনটা মহত্ব জাতি—এই



তিনটী প্রাচীন ভাষা; আর ইউরোপের প্রায় তাৎক্ষণিক ভাষা—গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন স্লাভ, আন্দালুসীয়, কেল্টীয়, ডিউটনিয়—এ সব গুলি এক অধুনা-মূল মূল বা আদি আধ্যাত্মা থেকে উৎপন্ন;—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্য এই তথ্যটী নিদ্বন্দ্বিত্ব করে দেয়, বিপত উনিশের শতকের প্রথমার্ধে। “আদি আধ্যাত্মা” যদি মনে নেওয়া যেন, তা হলে এই আদি আধ্যাত্মা বলতে এমন এক “আদি আধ্যাত্মিক”কেও মনে হয়, আর বহুতল হলে যে প্রাচীনকালে কোথাও না কোথাও এই জাতি বাস করত। যারা এখন বিভিন্ন আধ্যাত্মা বলে, সেই আদি আধ্যাত্মাদের বংশধরেরা আত্মকাল পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সজা জাতি বলে পরিগণিত; আর হিন্দু, পারসীক, গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন আধ্যাত্মা জাতিও সভ্যতার গুরু উঠত ছিল। স্বতরাং আদি আধ্যাত্মাতির লোকেরাও যে হস্তা ছিল, এরূপ অনুমান কর্তব্যে আধুনিক আধ্যাত্মাদের বা আধ্যাত্মদের আটকান না। এই “আধ্যাত্মিক” ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই গড়ে তুলেন। তাঁরা দেখলেন, ইউরোপের আধুনিক আধ্যাত্মা জাতির লোকেরা পৃথিবীরময় ছড়িয়ে পড়েছে—পোর্চুগীস, স্পেনীয়, গলান্ডা, ইংরেজ, ফরাসী, জাফান প্রভৃতি জাতির লোকেরা আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সর্বত্র ইউরোপের সভ্যতা নিয়ে গিয়েছে; সহজেই তারা ঐ সব দেশে নিজদের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন “নৈতিক-জাতিদের উপর আধিপত্য করছে, তাদের হস্তা করে তুলছে (এটা অবশ্য ইউরোপীয় ভরফের কথা), এবং নিজদের অস্তিত্ব বলে বা দরকার বোধ করলে তাদের সমলে উজ্জ্বল করে রেখে আর করছে। History repeats itself—একই ইতিহাস বিভিন্নকালে পুনরাবৃত্ত হয়,—এই অর্ধসভ্য বচন কাজে লেগে গেল; এখন আধ্যাত্মাদের দ্বারা বা হচ্ছে, প্রাচীনকালে আধ্যাত্মাদের পূর্বসূরীদের হাতে তাই হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা হ'ল। আত্মকালকার আধ্যাত্মদেরই মত হস্তা প্লেটোর প্রবন্ধ-কিচ্চিৎ প্রাচীন আধ্যাত্মা তাদের পিতৃহীন থেকে ছাড়িয়ে

পড়ে, নানা অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির দেশে গিয়ে অবলীলাক্রমে তাদের জয় করে, সভ্যতার আলোক দিয়ে তাদের মাথায় ধরে তোলে,—যার প্রাকৃতিক আর অত্ কারণে গ্রীস, ইটালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এরা নব নব সভ্যতার সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে এই ব্যাপার বিশেষভাবে ঘটেছিল। এদেশে কৃষ্ণকায় অসভ্য জঙ্গলী অনাধ্যাত্মিক বাস করত; আর্থোরা-এরা, তারা এদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত জাতি, তারা যে অনাধ্যাত্মদের জয় করে তাদের উপরে রাজ্য স্থাপন করে ও তা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, এরূপটী তো হওয়াই উচিত; কতকগুলি অনাধ্যাত্মিক আধ্যাত্মাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তারা আধ্যাত্মদের দাস হ'ল, আধ্যাত্মদের সমাজে তাদের স্থান বেওয়া হ'ল, তাদের নাম দেওয়া হ'ল “মূর্খ”। বাকী সব জাতি আধ্যাত্মদের হাতে মরণ, না পাণ্ডে ছাড়াই পালিয়ে গেল—এদেরই বংশধর আত্মকালকার কোল-ভীল-মাতাল-মুত্তা, পৌন্ড-বন্দ-ওরাও-মালের, যারা বোজা-তুক-নাগা। ভারতবর্ষে বহু শত বঙ্গের পূর্বে বেসক আর্থোরা এসেছিল, তারা ইউরোপীয় আধ্যাত্মদের পূর্ব-পুরুষদেরই জাতি; স্বতরাং ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু, যারা নিজদের বিত্তক আধ্যাত্মিকের বলে মনে একটু দরদ করে থাকে, তারা হ'ল ইংরেজ আর অন্ত ইউরোপীয়দেরই স্বগোষ্ঠীয়—দূর সম্পর্কের জাতি। কথাটা ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকেরই কাছে মন্দ লাগল না; (আর এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই তো প্রথমটা ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেছিল)—রাজার জাতি ইংরেজ, তাদের সঙ্গে এক গোষ্ঠীর, একথা মনের নিভৃত কোণে উভবর্ণের হিন্দুর মনে একটু পুলাকে খিলিক এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়,—তবে এ মনোভাবটী বাইরে পল্লি করে স্বীকার করে জাতীয় আত্মদাসত্বের আঘাত দিতে কেউ রাজী ছিলেন না। ইংরেজও এই সম্পর্ক এক রকম মেনে নিয়েই, ভারতের রাজ্য আর উচ্চবর্ণের হিন্দুকে (আর তাদের অধ্যাত্মা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে) our Aryan brother, the mild Hindu বলে পিচ চাপড়াত লাগল; ইংরেজের কুলভাবোমিশ্র

এই উদারতার আমাদের অনেকে আল্লাদে আটকান হয়ে গেল।

নানা জাতির সংমিশ্রণের ফলে আমাদের হিন্দু জাতি; এই সংমিশ্রণ প্রাচীনকালে অতি সহজেই অহলোম-প্রতিভামানবাহ দ্বারা ঘটেছিল। তারপরে, তুর্কী-বিজয়ের পূর্ব থেকেই জাতিত্বের কড়া কড়ি এসে গেল, পুরোপুরি মিশাল আর হয়ে উঠল না। এর ফলে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈধ ঘটে গেল, কোথাও বা আবার নোহুন করে এই স্বাভাবিক বৈধ ঘটে উঠল; বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা অবাধ অহুস্পার সভ্য নোহুন করে ঘটিল—এই অবাধ অহুস্পার সভ্যবটুই আধুনিক হিন্দু-সমাজের সব চেয়ে বড়ো অসুখ। এই স্বাভাবিক বা পার্থক্য-বোধের ফলে, নিজেরা আধ্যাত্মিক বলে দাবী করেন এমন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মনে একটা আভিজাত্য-বোধও সৃষ্টি হয়; তাতে ইউরোপ থেকে আমদানী করা অনাধ্যাত্মিক জাতির কলন আরও সহায়তা করে।

হিন্দু সভ্যতার পত্তনের ইতিহাসটী এইরূপে বেশ মনোমত করে তৈরী হ'ল। কৃষ্ণকায় কুসংস্কৃত-বর্ণ অসভ্য বর্ণের অনাধ্যাত্মিক জাতি স্বরাধাতীত যুগ থেকে এদেশে বাস করত; তাদের ধর্ম ছিল অতি নিম্ন গুণের, রীতি-নীতি ছিল জুর। যৌবর্ষ হস্তা আর্থোরা এসে তাদের জয় করলেন। আর্থোদের হাতেই হিন্দু সভ্যতার পত্তন হ'ল; প্রথম যুগের আর্থোদের দেবতারের আরামদায়ক নিয়ে বেদমহিতা, পরের যুগের রচিত তাঁদেরই দেবতারের কথা নিয়ে পুরাণ; আর্থোদের রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। অনাধ্যাত্মদের ধর্ম আর রীতিনীতি একটা-আধটা গ্রামা অহুস্পার বা আধ্যাত্মদের মধ্যে হস্তা কোথাও একটু খানি টিকে রইল, কিন্তু মোটের উপরে তার সমস্ত নিশানা আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রাধান্যের মুখে ধুয়ে মুছে গেল।

অনাধ্যাত্মদের স্বদেশে এখন ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উত্তর ভারতে যে একটা জুড়োয়ার ভাব এসে

গিয়েছে, “অনাধ্যাত্ম” শব্দটী তার জগৎ কতকটা দারী। “অনাধ্যাত্ম” শব্দ যদি খালি “অন-আধ্যাত্ম” অর্থাৎ “না আধ্যাত্ম” নহ, বা আধ্যাত্মিক-সম্পূর্ণ নহ এই অর্থেই প্রযুক্ত হ'ত, তা হ'লে কথা ছিল না; কিন্তু “অনাধ্যাত্ম” অর্থে “স্থান, নীতি” এই অর্থ সম্ভবতঃ যুগ থেকেই এসে যাওয়ায়, শব্দটী জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে, মানসিক ও নৈতিক অসুখ-বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেশময় সব জাতিই আধ্যাত্মিকের দাবী উপস্থিত করছেন—তাঁরা বিজ্ঞ—হয় জ্ঞান, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈজ্ঞ, তাঁরা অনাধ্যাত্ম শূন্য নন। এটা আর কিছুই নয়, আধুনিক জাতিত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রতিজ্ঞা মাত্র। সকলেই বিজ্ঞ হোন, “অনাধ্যাত্ম” হোন অর্থাৎ noble হোন, নিজদের উচ্চ মনে করে অধ্যাত্ম উচ্চ হয়ে থাকবার শক্তি লাভ করুন—অনাধ্যাত্মা সকলেরই জগৎ আমি এ কামনা করি।

আর্থোদের শ্রেষ্ঠতার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করাই আত্মকাল heresy বা পাণ্ডোচিত মনোভাবপ্রবৃত্ত বলে অনেকে গণ্য করবেন। আর্থোরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতি ছিলেন না—এ কথা বলা, বা এ কথা আর ইঙ্গিত করা যেন পিতৃপুরুষের নিন্দা করার মত অধব, স্বজাতিদোষীতারূপে মহাপাতক, এই রকমের একটা অবস্থা-আবস্থা দ্বারা অনেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে আছে। তবে হিন্দুর মনে সভ্যতাসংক্রিয়া সদা-প্রাগত। তিনটা মনোভাবকে আমি আমাদের হিন্দু সম্ভ্রতির মূল মনোভাব বলে মনে করি—সমগ্রতা, সভ্যতাসংক্রিয়া, আর অহিন্সা; সভ্যতাসংক্রিয়াই আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসে বা কিছু আধ্যাত্মিক আর আধুনিক উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, এখনও এই সভ্যতাসংক্রিয়া আমাদের একবারে যায় নি। স্বতরাং এসব কথা শিক্ত হিন্দুর কাছে বললে, প্রথমটা প্রচলিত সম্ভ্রারে একটা আঘাত লাগলেও, সাধারণ হিন্দু জিনিসটিকে তলিয়ে বুঝতে চায়—নোহুন আর সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত মত বলে শেষ পর্যন্ত যুগ জিরিয়ে বসে থাকতে পারে না।



ভারতবর্ষে আখ্যায়ের একাধিপত্যের সপক্ষে প্রবলতম যুক্তি হচ্ছে আখ্যায়ীভাষা সংস্কৃতের স্থান, —যমগা হিন্দু শাস্ত্র এই আখ্যায়ীভাষা সংস্কৃত ভাষাতেই নিবন্ধ হয়ে থাকে। রূপ-বাপাঠনী; আর তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতে আখ্যায়ীভাষার প্রসার। সংস্কৃত শাস্ত্রের—বৈদের না হোক, পুরাণের—মত অনুসারে আবার আমাদের ইতিহাসে অনানুষ্ঠানিক থেকে ধারাবাহিক রূপে চল এসেছে—অস্ত্যতা, অতি প্রাচীনকাল থেকে। এই ভাষাগত ও সাহিত্যগত যুক্তি হুঁতী সবচেয়ে বেশী করে আমাদের “আখ্যায়ী-বাদ” গ্রহণ করে রেখেছে।

এর প্রতিপক্ষে কয়টি যুক্তি আছে, সে কয়টি এই— দাক্ষিণাত্যে আর দক্ষিণ ভারতে হুস্ততা ভাষার অস্তিত্ব; সংস্কৃত-সমত উত্তর-ভারতের আখ্যায়ীভাষাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিভ্রমণ অনাখ্যায়ী ভাষার প্রভাব; খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বস্কার যুগের আখ্যায়ী হিন্দুর সভ্যতার নির্দশনের একান্ত অভাব; ভারতের বাইরে আখ্যায়ীভাষার ইতিহাস; জগতের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ।

তামিল ভাষা তার বিরূপ সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বিস্তারিত, —এই ভাষা দ্রাবিড়দের স্বতন্ত্র সভ্যতার এক অনন্যসম নিদর্শন, যে সভ্যতা পুরাপুরি আখ্যায়ীভাষার কাছে আত্ম-বলিহান দেয় নি। বৈদিক ভাষা ভারতের আখ্যায়ীভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন—এই ভাষাতে প্রাচীন আখ্যায়ী-ভাব অনেকটা বিস্তারিত; কিন্তু এই বৈদিক ভাষাতেও অনাখ্যায়ী ভাষার ছাপ কিছু পরিমাণে আছে; আর তা ছাড়া বহুই এদিকে আসি, ততই অনাখ্যায়ী ভাষার প্রভাব আখ্যায়ী ভাষায় (অর্থাৎ অর্ধপ্রাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃত) বাড়ছে দেখতে পাই; আখ্যায়ী ভাষাকে যে ক্রমে ক্রমে অনাখ্যায়ী ভাষার, কোল-দ্রাবিড়ের ছাঁচে বেলে নেওয়া হয়েছে, আখ্যায়ী ভাষা ক্রমে যে অনাখ্যায়ীর যথেষ্ট জাত দিয়েছে, —তা বৃষ্ণতে দেবী হয় না। এ ছাড়া, রামায়ণ, মহাভারতের আর পুরাণের মধ্যে বড়ো বড়ো রাজা-রাজ্ঞার নাম ‘আমরা পাই, কিন্তু আমাদের অধুনিও রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের যুগের অর্থাৎ

তিন-চার হাজার বছর পূর্বস্কার হিন্দু যুগের পুরাতন যব-বাড়ী, হাতের কাজ, শিল্পের নিদর্শন—এসব কিছুই তো পাই না; মাত্র হাজার ছুই বছরের প্রাচীন এই “ইতিহাস” আর পুরাণ গ্রন্থগুলিই আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের একমাত্র অবশেষ—এই সাহিত্যিক অবশেষ ভিন্ন “পাথুরে” প্রমাণ” কিছুই নেই। মৌখিক যুগের আশঙ্কার হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন তা হলে কিছুই কি নেই? মিসর, বাবিলোনিয়, আসিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, ক্রীট-বীপ—এসব জায়গায় তো এখন থেকে ৩০০০ হাজার বছরেরও জিনিষ পাওয়া গিয়েছে; ভারতবর্ষে মোহেন-জো-দাড়ো আর হরপ্পায়া যে সব নগরের ধ্বংসাবশেষ আর অল্প জিনিষ মিলেছে, সেগুলি অল্প ৪৫০ হাজার বছর পূর্বস্কার, কিন্তু সেগুলি তো আখ্যায়ী জাতির লোকদের হাতের কাজ নয়—অস্ত্যতা ঐ বিষয় নিয়ে খাঁটা আলোচনা করেছেন এমন পণ্ডিতেরা এই কথাই বলছেন। এর উপর আছে ভারতের বাইরে আখ্যায়ী জাতির ইতিহাসের কথা। আখ্যায়ী তাদের আদি বাস-ভূমি থেকে আখ্যায়ীরা আসে। অর্থাৎ এক পাচ জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ বা মিলনে। কখন প্রথম দেখা দিয়ে, তারও একটা হৃদয় পাওয়া যাচ্ছে, —সেটা এখন থেকে মাত্র চার হাজার বছর পূর্বে; তখন গ্রীসে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে তাদের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়; এবং এর পরে তারা ভারতবর্ষে আসে—ভারতবর্ষ থেকে যে তারা বাইরে গিয়েছিল, একদা অহুমানের সপক্ষে বড়ো একটা যুক্তি নেই। শেব কথা—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অল্প বেশের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। প্রাচীনকালে পারস্ত-বাবিলোনিয়-এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের সহিত ভারত যমিত্রি ভাবে সংযুক্ত ছিল, যে বোগবহুত আমাদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-নিদানবের একটা প্রধান অবলম্বন। সেটাকে বাস দেওয়া কিছুই হতে পারে না। গ্রীস প্রকৃতি অজ্ঞাত নানা দেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি আর বিভিন্ন জাতির লোকের মিশ্রণে কি ভাবে নবীন এক একটা জাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল,—আমাদের হিন্দুজাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি

আলোচনা কালে সেরিকের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে হবে।

কি ভাবে হিন্দু সভ্যতার পতন ঘটেছিল, আর পূর্ণপ্রাণ-প্রাণ হিন্দুসভ্যতার বয়সই বা কত, এ সম্বন্ধে যে মতাবলি আমায় মনে হয় একটু একটু করে সাধারণের গৃহীত হচ্ছে এবং হবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই মতাবলির কিছু নিদর্শন কববার চেষ্টা করবো। বিখ্যাত ‘a posteriori’ দৃষ্টান্তে অর্থাৎ জ্ঞাত তথ্যের আধারের উপর অহুমান করে না বলে, ‘a priori’ অর্থাৎ ইতিহাসাত্মক করে, পৌরোপার্গ্য অনুসারে পূর্ণপরিচিতি রূপের বর্ণনা করে বলে যাবো। পরে ভবিষ্যতে এক একটা বিষয় অবলম্বন করে আলোচনা করা যেতে পারে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-এর দিকে মধ্য- বা পূর্ব-ইউরোপের কোনও অংশে আদি আখ্যায়ীজাতি উৎপত্তি হয়। নিজেদের দেশে সভ্যতায় এরা খুব উচ্চ স্তরে উঠতে পারে নি—বাস্তব সভ্যতায় এরা অনেকটা পেছিয়েই ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেক মানসিক আর নৈতিক গুণের উন্নয়ন হয়; এরা একাধারে কর্মী ও চিন্তাশীল, কল্পনামূলক ও দৃঢ়তা জ্ঞাতি ছিল, নিজেদের মধ্যে একটা সংযবদ্ধতার ভাবও যথেষ্ট ছিল; আর, অহুমান হয়, এদের মধ্যে দ্রাবিড়দের সঙ্গে যে কতগুলি ধারণা ছিল, সেগুলির আধারের উপরই দ্রাবিড়দের আধুনিক সভ্য মানোভাব প্রতিষ্ঠিত। আখ্যায়ীজাতির মধ্যে বহু গোত্র ছিল, আর এই সব গোত্রের মধ্যে এদের মূল ভাষারও কিছু কিছু পার্থক্য এসে যান। এই আদি আখ্যায়ী জাতি কোনও কারণে তাদের ‘পিতৃভূমি’ থেকে পূবে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। দেশে শীতের হঠাৎ আতিশয্য এর একটা কারণ হতে পারে; আবার পূর্ব আর উত্তর থেকে অনাখ্যায়ী উরাল-আলটাই জাতীয় লোকদের আক্রমণও একটা কারণ হতে পারে।

আখ্যায়ীরা যখন ৩০০০ খ্রীঃপূঃ-তে তাদের নিজেদের দেশে আদিম অবস্থায় আছে,—কিছু চানবাস, কিছু

গোমেক-চারণ এই তাদের প্রধান বৃত্তি—তখন কিছু জগতের অজ্ঞান-কতকগুলি বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছে; প্রথম—মিসরের সভ্যতা; খ্রীঃপূঃ ৪০০০ থেকে বার বছর টানতে হয়, আর বার মূল পতন আরও প্রাচীন; বাবিলোনিয় আর আসিরিয়ার সভ্যতা,—প্রায় মিসরের মতই প্রাচীন; আর এ ছাড়া এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বড় বড় ইমারত, দেবমন্দির, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞবাহী, জাগরণ, মৃত্তিশিল্প, শিল্পেত্ব, যুদ্ধসংলগ্ন প্রকৃতি অবলম্বন করে এই সব সভ্যতা; আদি আখ্যায়ীদের এসব কিছুই ছিল না। আখ্যায়ীরা নিজেদের দেশে থাকতে থাকতে একটা বড় অল্প সংগ্রহ করে—তারা। খোড়াকে পোষ মানায়। খোড়ার পিঠে সপ্তাহের হয়ে বা ছুই খোড়ায় টানা ছ’চাকার রথ চড়ে তারা দূরদূর অধিনে অতিক্রম করার একটা উপায় আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কারের ফলে যখন তারা ইতিহাসের ব্রহ্মক্ষেত্র প্রথম এসে অবতীর্ণ হ’ল, তখন স্বয়ংবদ্ধ, আত্মবোধযুক্ত, কর্মশক্তি ও ভাবনাসম্পন্ন এই আখ্যায়ীদের—এরা পার্শ্বিক সভ্যতার অধ্ব-বর্ষের হ’লেও—এদের দেখে করা হুস্ততা আশিরিয়া-বাবিলোনিয়, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের অধিবাসীদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-এর দিকে এই আখ্যায়ীজাতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পিতৃভূমির বাইরে অল্প জাতির দেশে প্রথম দেখা দিয়ে। এদের আগমনের সংবাদ আমরা প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন এশিয়া-মাইনরে ও আসিরিয়া-বাবিলোনিয়ায় পাই। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল জানি না; খুব সম্ভব তখন দ্রাবিড় জাতীয় আর কোল বা অস্ট্রিক (Austrie) জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতে গঙ্গা আর সিদ্ধ-অধ্বসিত দেশে, আর দক্ষিণ-ভারতে, তাদের সভ্যতা ক্রমে করে শাস্ত্রভাবে জীবন যাপন করছে। আখ্যায়ী ইতিমধ্যেই কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এতদ্বারা ভাষায় সামান্য সামান্য পার্থক্য এসে



গিয়েছে। গ্রীসে যে আর্গোরা যায়, আর গ্রীসের আর্গা-পূর্ণ যুগের হস্ততা জাতির সঙ্গে সম্বন্ধে বার। আসে, সেই পশ্চিমা আর্গাদের ভাষা—আর যে আর্গোরা ইষ্টপূর্ণ ২০০০-এর দিকে উত্তর-পূর্ণ এশিয়া-মাইনরে আর মেসোপোটামিয়ায় আসে, সেই পূর্বে আর্গাদের ভাষায় কতকগুলি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়।

নানা কারণে আর্গাদের প্রাচীন কথার ইতিহাস-সম্পর্কে মধ্য-এশিয়ায় আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষে আসবার পথে আর্গোরা উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় হ'য়ে আসে, এই রকম আভাস আমরা পাইছি; মধ্য-এশিয়ার কথা একটা নিছক কল্পনা মাত্র। হস্ততায় মেসোপোটামিয়া-সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়ায়, এই কল্পনা একেবারে বন্ধনীয়। উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় আর্গোরা প্রথম দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ স্থানের অধিবাসীরা তাদের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছে। এই সব লেখা পাওয়া গিয়েছে, বাচ্ছে। আর্গাদের সঙ্গে বারিলোনীয় আর এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা এই সব কথা হচ্ছে আর্গাদের বিষয়ে সব চাইতে প্রাচীন সামসময়িক উল্লেখ। এই সব লেখা দেখে এই

অধুনা হয় যে, হস্ততা আসিরীয়, বারিলোনীয় আর এশিয়া-মাইনরের জাতিগুলির মধ্যে, হয় উত্তর থেকে ককেসাস-পর্বত পেরিয়ে, নয় উত্তর-গ্রীসে মাসিন্ড ও ব্রেস প্রদেশ হ'য়ে, ককাসাসের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া-মাইনরের পথ ধরে এশিয়া-মাইনর আর মেসোপোটামিয়া অঞ্চলে এদের আগমন। এই নব্যাত আর্গোরা দলে, দলে আসে; এদের কতকগুলি গোত্র ঐ সব অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে, স্থানীয় জাতিগুলির মাঝে নিজেদের একটা গৌরবময় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়, কোথাও কোথাও বা স্থানীয় লোকদের জয় করে তাদের রাজ্য হ'য়ে বসে—এমন কি এদের একদল বারিলোনে দখল করে সেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব বা প্রভুত্ব করে। বারা ওরেশে হ'য়ে গেল, তারা ক্রমে ঐ দেশের লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের ভাষা নিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে

ফেলে। কিন্তু তাদের রাজাদের বা প্রধানদের নাম, তাদের দেবতাদের নাম, তাদের ভাষায়, হুই চারটে শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে; তা থেকে খ্রীষ্টপূর্ণ ১৮০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত মেসোপোটামিয়া-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এই সকল আর্গাদের, কথা কিছু কিছু জানতে পারা যায়। এই আর্গোরা এই অঞ্চলে প্রথম যোতা আসে। এরা যে ভাসা ব'লুত, সে ভাষা হ'চ্ছে বৈদিক সংস্কৃত আর প্রাচীন ইরাণীয়, এই হ'য়ের জন্যই; আর এদের যে ধর্ম ছিল। আর যে সব দেবতা এরা পূজা করত, তা থেকে বঝতে পারা যায় যে এদের ধর্ম আর দেবতাসকলই ভারতে গিয়ে বৈদিক ধর্ম আর বৈদিক দেবলোকে পরিণত হয়। এরা বেদ-পূর্ণ আর্গা; ভারতীয় বৈদিক ধর্মের ন্যূনতম এদের মধ্যে, আর এদের অত অল্প যে সব গোত্র পূর্ণের পারস্তের দিকে এসে তাদের মধ্যে হাটতে থাকে। আর এটাও খুব সম্ভব যে মেসোপোটামিয়ায় আর পারস্ত দেশে এই আর্গাদের মধ্যে, নিজেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সব স্তোত্র এরা রচনা করত থাকে সেই সব স্তোত্রের—কিছু কিছু ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌছে—খ্রীষ্টপূর্ণ ১৮০০ কি ১৫০০-তে রচিত এই সব স্তোত্র ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ণ ১৫০০ কি ২০০০-এর দিকে প্রথম লিখিত হ'য়ে, “ব্যাস” নামক ঋষির দ্বারা বেদ-সংহিতায় স্থীত হয়। বেদ-পূর্ণ যুগের এই সমস্ত আর্গাদের কতকগুলি নাম আর শব্দের নিদর্শন নীচে দেওয়া বাচ্ছে। নামগুলি বারিলোনীয় ও এশিয়া-মাইনরের ভাষায় গৃহীত, এগুলির উচ্চারণ যথায় বিদেশীয় বাবিল ও কাসিন্দা ভাষায় ট্রিকমত রক্ষিত হ'তে পারে নি—এগুলির হিন্দু-ইরাণীয় যুগের আর্গা-ভাষার তথা বৈদিক ভাষার অসম্মোদিত রূপ বা পাঠ অনেকটা বিচার আর অধ্যয়ন করে ঠিক করিতে হ'য়েছে। দেবতাদের নাম, যথা—

[১] Shuriash = বেদ-পূর্ণীয়, আর্গা ভাষায় Surias, বৈদিক “সুর্য্য”; [২] Maruttash = বেদ-পূর্ণীয় Marutas, বৈদিক “মরুত”; [৩] Shimalia, “উজ্জল (অর্থাৎ

তুবাব-শবল) পূর্ণতাধিষ্ঠাত্রী দেবী” = বেদ-পূর্ণীয় \*Zimiala বৈদিক “হিম + আল”; [৪] Shugamuna “মহামারীর দেবতা, জ্যোতির দেবতা” = বেদ-পূর্ণীয় \*Saulka-manas; বৈদিক “শোক + মনস্” [৫] ও [৬] সংখ্যক দেবতায়, ভারতবর্ষে বৈদিক জগতে আর প্রতিষ্ঠিত হইলেন না; [৭] Dakash “নক্ষত্রদের পিতা” = ভারতীয় Daksha “দক্ষ”, ২৭ নক্ষত্রের পিতা; [৮] Indara = বৈদিক “ইন্দ্র” (“ইন্দর”—স্বরভক্তিসুলভ রূপ); [৯] Mitra = বৈদিক “মিত্র”; [১০] Nashatiya = বৈদিক “নাসত্য”; [১১] Uruwina বা Aruna = বৈদিক “বরুণ”; রাজা বা প্রধানদের নাম, যথা—[১] Abirattash = বৈদিক রূপ “অভিরথ”; [২] Shuzigash = বৈদিক রূপ “স্বজিগ”; [৩] Artamanya = বেদ-পূর্ণ \*Ita-manyas, বৈদিক “স্বতমন্ত্য”; [৪] Arzawiya = বৈদিক “আজ্বা”; [৫] Biria maza = বৈদিক “বীরাবাজ”; [৬] Biridaswa = বৈদিক “বীরাধ্ব”; [৭] Dashru = সম্ভাব্য বৈদিক “দশ্রু” অথবা “দশ্র”; [৮] Aitagama = বেদ-পূর্ণ \*Aitagama, বৈদিক “ইত্যাম”; [৯] Indaruta = বেদ-পূর্ণ \*Indarauta, Indarauta, বৈদিক “ইন্দ্রোত”; [১০] Namyawaza = সম্ভাব্য বৈদিক “নাম্যাবাজ”; [১১] Rushimanya = সম্ভাব্য বৈদিক “রুশিমানা”; [১২] Shatiya = বৈদিক “শতা”; [১৩] Shubandu = বৈদিক “শ্রবন্দ”; [১৪] Shumitta, Shumittarash = বৈদিক “শ্রমিত্তা”; [১৫] Shutarna = সম্ভাব্য বৈদিক “শ্রতর্না” বা “স্বধর্ম”; [১৬] Shutatna = বৈদিক “শ্রত (শ্রুত) তন”; [১৭] Shuwardata = বৈদিক (সম্ভাব্য) “শ্রবদ্বাত, স্বধর্ম”; [১৮] Teuwatti = সম্ভাব্য বৈদিক “জ্বাত”; [১৯] Turbazu = সংস্কৃত “তুর্ভব”, বৈদিক “তুর্ভব”; [২০] Tushratta = বেদ-পূর্ণ \*Duzhratha, বৈদিক “দুর্ধ”; [২১] Artashumara = বৈদিক “রুশমন্ত”; [২২] Artatama = বৈদিক “রুশতাম”; [২৩] Dasharti = সম্ভাব্য বৈদিক “দাশার্টি”; [২৪] Mattiwaza = সম্ভাব্য

বৈদিক “মথিবাজ”; [২৫] Saushshatar = “সৌক্ষত”; ইত্যাদি। আর্গা শব্দ যথা—[১] Maria = বৈদিক “মর্য”; [২] Aika = প্রাণবৈদিক \*Aika, বৈদিক “এক”; [৩] Tera = “ত্রি, ত্রয়”; [৪] Panza = “পঞ্চ”; [৫] Satta = “সপ্ত”; [৬] Nava = “নব”; [৭] Tapashshash = “তপস্”; [৮] Wartanna = “বর্তন”; [৯] Vasanna = “বসন” (অবধান-অর্থে); ইত্যাদি। (এই নাম ও শব্দগুলি Acta Orientalia XI, i, ii, iii খণ্ডে প্রকাশিত N.D. Mironov কর্তৃক লিখিত Aryan Vestiges in the Near East of the 2nd Millenary B.C. নামক মূল্যবান প্রবন্ধ থেকে নেওয়া; Mironov-সংগৃহীত যে সকল নাম বা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে মর্দক আছে, সেগুলি এখানে দেওয়া হ'ল না।) এই রূপ বৈদিক ভাষার নাকান জননী-স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত এমন আর্গাদের আমরা আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ণ বৎসর ও তার পরেও মেসোপোটামিয়া ও এশিয়া-মাইনরে দেখতে পাই।

আর্গোরা এই দেশে অবস্থান কালে হস্ততা Ashur অস্তর বা অস্তর অর্থাৎ আসিরীয় এবং বারিলোনীয় জাতির প্রভাব পেড়ে। আসিরীয়-বারিলোনীয় জাতির বিরাট বিরাট ইমারত, এদের (বিশেষত আসিরীয়গণের) শৌর্য ও নিদ্রতা আর্গাদের অভিভূত করে। আর্গাদের মধ্যে আসিরীয় রীতিনীতিও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্র ও গৃহ-নির্মাণে দক্ষ; দেবতা-বিরাটী অস্তর বা শানবের কমনতম ভূত; আশ্চর্য্যের পরে আর্গা জাতির মনের মধ্যে নিহিত অস্তর-জাতির স্থতির পরিণতি ঘটে।

যে সকল আর্গা গোত্র মেসোপোটামিয়ায় বাস করলে না, পূর্বের দিকে এল, তারা হ'ল পারসীক ও ভারতীয় আর্গাগণের পূর্বপুরুষ। পর্ব বা পার্ব বা পার্স, মদ, শক, পার্শ্ব প্রভৃতি আর্গা গোত্রগণ পারস্ত দেশেই র'য়ে গেল; ভারত, দক্ষ, মন্ত, শিবি, জম্বা, জিঙ্গ, পুরু, তুণ প্রভৃতি নানা গোত্র ভারতে



প্রবেশ কর্ণে। মনে হয়, ভারত আর পারস্যে তখন একই অনাৰ্য্য জাতির লোকেরা বাস করত; আর্য্যেরা এদের "দাস" বা "দহ্ম" ব'লে উল্লেখ করে গিয়েছে।

"দাস" বা "দহ্ম"দের সঙ্গে ভারতের বাইরেই আৰ্য্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কথা কিছুকিছু বৈদিক সাহিত্যে—অথর্ববেদ—পাওয়া যায়। তার পরে ক্রমে এই অনাৰ্য্যদের সঙ্গে বহুবছর মিলনও ঘটতে থাকে। অহুমান হয়, ভারতবর্ষে আৰ্য্যদের আসবার সময়ে তিনটি জাতির অনাৰ্য্য বাস করত। [১] Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবই শ্রেণীর অনাৰ্য্য—খাটো চেহারা, বড় ঘোঁর কাশা, কাফুরি মত নাক আর ঠোঁট, চুল কৌকর—এরা বেশীর ভাগ সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে বাস করত, সভ্যতা ব'লে এদের কিছুই ছিল না, মাছ ধ'রে বা শিকার করে খেত—এই জাতি এখন প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, দক্ষিণ-বেলুজিস্তানে, দক্ষিণ-ভারতে, আসাম-অঞ্চলে কোথাও কোথাও এদের একটু আদৌ অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান; খুব সম্ভব এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। [২] Austric অস্ট্রিক জাতি—এরা উত্তর-পূর্ব পথ দিয়ে—আসাম-অঞ্চল দিয়ে—বর্মা আর ইন্দোচীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে; এদের চেহারা কি রকম ছিল তা ঠিক জানা যায় না—মনে হয়, আকারে এরা খাটো ছিল, নাক এদের চপেটা হ'ত—আর এরা যে ভাষা বলত, সেই ভাষা থেকে এখনকার কোল ভাষা আর বাগিয়া ভাষা হয়েছে, আর এদের অল্প শাখা ইন্দোচীনে, মালয় দেশে, দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গার উপত্যকায়, মধ্য-আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছিল, হিমালয়-অঞ্চলে যে এরা ছিল তার প্রমাণ আছে। পানের চাষ, কতকগুলি ফলের চাষ, পান-স্ফাপার ব্যবহার, ভারতীয় সভ্যতা এগুলি অস্ট্রিক জাতির দান বলে মনে হয়; আর তা ছাড়া, এদের

মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পুণ্যপদ্ধতিতেও বিবাহের আর শাহজের নানা অনুষ্ঠানে, আর হিন্দুর পূর্ণচন্দ্র-বাসের অশ্বত্থালে অবস্থান করছে বলে অনুমান হয়। অস্ট্রিক-ভাষী জনগণ উত্তর-ভারতের সমস্ত অংশে এখন, হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে, তাদের পূর্বক অস্ট্রিক অধির বর্জন করেছে। [৩] ডাবিড জাতি: এই ডাবিড জাতি দাঁড়িকায়, সরল-দাসিক ও দাঁড়িকোটো ছিল বলে অনুমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের লোকদের সঙ্গে এদের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটছিল, বলে অনুমান হয়। পশ্চিম ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল; তবে অহুমান হয়, এরা উত্তর-ভারত আর পূর্ব-ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে মিলে একত্ব বাস করত। অস্ট্রিক (কোয়) আর ডাবিড, এই দুই জাতির খুব মিলন আয়িশ মিশ্রণও ঘটছিল বলে বোধ হয়। ডাবিডেরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; হস্তে বড়ো বাণী ঘর নগর প্রভৃতি বানাত, হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই ডাবিডদেরই কাছ থেকে আদৃত; শিব, উমা ও বিষ্ণুর কল্পনা ভারতে ডাবিড জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল-তত্ত্বও ডাবিডদের মধ্যেই উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। মোহেন-জো-দাড়ো আর হরপ্পার বিরাট সভ্যতা ডাবিড জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ হয়। ডাবিডেরা আৰ্য্যদের মত গো-পালন করত—কোয় (অস্ট্রিক) জাতি তা করত না; আর ডাবিডেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল বলে মনে হয়।

আর্য্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল, দেশে স্বসভ্যতা (বা মোটামুটি সভ্যতা-প্রাপ্ত) এই ছুটী বড় অনাৰ্য্য জাতি বাস করত। নাগরিক সভ্যতার উদয় ডাবিডদের মধ্যেই হয়; অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল মূল্যত: গ্রামীণ সভ্যতা; আর নবাগত আৰ্য্যদের সভ্যতা

ছিল বারাবর ও গ্রামীণ সভ্যতা। আৰ্য্যদের আগমনে দেশের আদিম অনাৰ্য্য অধিবাসীদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হয় না। নবাগত আৰ্য্য আর পুরাতন অনাৰ্য্য পাশাপাশি বাস করতে লাগল। আৰ্য্য ডাবিড জাতি (অস্ট্রিক)—এই তিন জাতির মধ্যে তাদের আদান-প্রদান আর রক্তের সমিশ্রণ ঘটতে লাগল। আৰ্য্য ছিল বিজ্ঞতা—স্মরণ্যতা; পাশ্চাত্য-অঞ্চলে বিজ্ঞতরূপেই তার প্রবেশ হয়েছিল; তার ভাষা ছিল খুব জোরের ভাষা, আর তার সং-শক্তিও ছিল অসাধারণ। আৰ্য্যের ভাষা তাই সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে; হয়তো তখনকার দিনের ডাবিড আর কোয় গোষ্ঠীর পরস্পর-বিরোধী অনাৰ্য্য ভাষা আর উপভাষার যোগমালের মধ্যে, আৰ্য্যভাষা একটি সর্গজনগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে। আৰ্য্যের ধর্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান, আর আৰ্য্যদের কতকগুলি দেবতা, অনাৰ্য্যের মনে নেই। আবার ধীরে ধীরে অনাৰ্য্যের দেবতা, অনাৰ্য্যের ধর্মসম্প্রদায়, অনাৰ্য্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনাৰ্য্যের ভক্তিবাদ আৰ্য্যদেরও মনে ছাপ দিতে থাকে। অনাৰ্য্য রাজা বা পুরোহিতেরা আৰ্য্যভাষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আৰ্য্য-সমাজে গৃহীত হ'তে থাকে; একটা ক্রমবর্ধমান আৰ্য্য-ভাষী গোষ্ঠী বা সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। এইরূপে, সমস্ত-ভাষা যার বাহন এমন মিশ্র আৰ্য্যানাগা সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, আৰ্য্যদের ভারতে আগমনের পর থেকে ধীরে ধীরে তৈরী হ'তে থাকে।

এই ভাবে হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠতে প্রায় হাজার বছর লাগে। আৰ্য্যদের ভারতে আগমন তাদের মেসোপোটামিয়ায় একটি হওয়ার কিছু পরে ঘটে, এটা অহুমান করা অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ ঐষ্টপূর্ব ১৫০০০ পরে, কি ঐষ্টপূর্ব ১৫০০০ দিকে এই ঘটনা হয়েছিল। রক্তস্রবের কালে—ঐষ্টপূর্ব ৫০০০-৩০০০ দিকে, হিন্দু সভ্যতার কাঠামো তৈরী হয়ে ধাঁড়াল। অনাৰ্য্যদের অস্ট্রিক আর ডাবিড দেবতাদের লীলা-কথা, তাদের

রাজা-রাজকন্যাদের প্রাচীন কাহিনী, এসব ক্রমে সংকত ভাষায় নিবদ্ধ হ'লে, আৰ্য্যদের দেব-কাহিনী আর রাজ-কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য হ'তে সমুদ্র হ'লে, রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের মধ্যে স্থান পেলে। এইরূপ ব্যাপার গ্রীসেও ঘটছিল। সম্ভ্রুতি এই ধরনের একটা মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, দক্ষিণেরা মূল্যত: অনাৰ্য্য রাজত্ব-সম্প্রদায়ের লোক; দেশে আবহমান কাল থেকে যে অনাৰ্য্য রাজারা রাজত্ব করতেন, নব-গঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তাঁরাই তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে দক্ষিণ-রূপে গৃহীত হ'লেন। আবার এমতও প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতবর্ষে দলে দলে আৰ্য্যদের প্রবেশ ঘটে নি—কেবলমাত্র আৰ্য্যের ভাষা আর আৰ্য্যের কতকগুলি ধর্ম আর অনুষ্ঠান পারত থেকে ভারতবর্ষে প্রবৃত্ত হয়।

আৰ্য্যদের বিশেষ উপাসনা-রীতি হচ্ছে "হোম"। দেবতারা আকাশে থাকেন, অগ্নি তাঁদের দূত বা মধ্যস্থতা, বেদি তৈরী করে তাতে কাঠের আদান ভেলে সেই আঙনে ইন্দ্র, বরুণ, যম, পূষা, অগ্নি, অশ্বিন, উমা, মরুতগণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে হুগ, যী, মাংস, যবের পুরোভাগ রুটি, সোমরস এই সব বাস্তবসম্মত অর্ঘ্য তৈরী হ'ত, দেবতারা আঙনের মারক্‌সে সেই সব রসিন পেসে খুঁই হয়ে হোমকারীকে স্বর্গ, অম্ব, পুরুষগণ, প্রভুর শত্রু প্রভৃতি দান করতেন। "পূজা"র রীতি আৰ্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না—প্রতিমা বা অস্ত্ররূপ দেব-প্রতীকের গায়ে ফুল, পাতা, চন্দন, বিদুর প্রভৃতি দেওয়া, চাল-ফল-মূলের নৈবেদ্য, অথবা বলিদানের পশুর মূণ বা পাতে করে রক্ত নিবেদন করা, এসমত বৈদিক অর্ঘ্য অর্ঘ্য রীতি নয়। "পূজা"-শব্দটিও মূল্যে ডাবিড ভাষার শব্দ ব'লে অনুমান হয়। এই অনাৰ্য্য অহুমান অনাৰ্য্য দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হ'লে হিন্দু অহুমান পরিণত হ'ল।

আৰ্য্যদের প্রথম আগমনের সময়ে দেশের প্রাচীন-অধিবাসীরা যে ডাবিড, কোয় প্রভৃতি অনাৰ্য্য-ভাষা









মাপ্ হাড়াও আমাদের দেশ আছে, শুধু মাত্র আছে না, স্ত্রীধর্ম দিন ধরিয়া আছে; সপোরবে আছে, —দেশবাসীদের সেই কথা কেবল মাত্র উল্লেখ নয়, ব্যবহার স্বরণ করাইয়া সেই কথা চিত্র-কোঠায় খোদাই করাইয়া নিবার প্রয়োজন ঘটানো আছে।

আমাদের দেশের ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, প্রাকৃতিক বিবৃতি আছে; আজ যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষেপে, বাংলার ইতিহাসের নব পন্থায়, দেশ-স্বপ্ন কথা মনে করিবার বড় প্রয়োজন। বাংলার ধর্মের, সনাতনের, কুটির একেবারে নব পন্থায় আজ হইবে না। বিরাট স্বপ্ন-প্রসারিত তার পোড়া-পন্থায় আছে, তার সংসার গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই ইতিহাসের নব অধ্যায়, আজই প্রথম বার রচনা হওয়ার কারণ ঘটে নাই। পৃথিবীর অল্প সব দেশের সহস্র এখানেও নব নব যুগ আসিয়াছে, কিন্তু একথা কুলিলে চলিবে না যে, তাহা পুরাতন বনিয়াদের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। এক দিন বাহ্যিক বলা হয় বিপ্লব, তাহারও পোড়ার ববর বহুব্র বানিয়া; দীর্ঘ ঘটনাপন্থায়ের স্বাভাবিক পরিণতি নামই বিপ্লব, তাহা। আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রত্যেক পুষ্পটি ধ্বনিত হইতে দেখি, কুলি না বেন তাহার পশ্চাতে প্রয়াসের ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।

বাংলার ধর্মের, সমাজের, বাংলার কুটির সেই প্রাচীন ভিত্তির বিবরণ, তথা-কথিত শিক্ষিত জনেরা প্রথম মন্তব্য দিনে যদি অবহেলায় চক্ষু দেখিয়া থাকেন, আজিকার দিনে আর তাহা সম্ভব নয়। সহসা একদিন বাঙালী তার বাঙালী সম্পূর্ণ বিশ্বত হইয়া এক নব জাতির 'খোদায়' ধারণ করিবে, ইহা

অসম্ভব, অশোভনীয় ও অপৌরবেয়ই কথা। 'বাঙালী'র কথা বাঙালীকে জানিতে হইবে।

বাংলার ধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে; অনু-আর্য্য নিবাসের দিন হইতে মঙ্গলশ্রমের, বিশেষ করিয়া বেদান্তের, ধর্ম ও অধর্ম উভয় বিভাগেরই, সামান্য-আশ্রিত বৌদ্ধ ধর্ম, নাগার্জুন হইতে বজ্রযানী মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম, বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ তাত্ত্বিক-ধর্ম ও তৎসংক্রান্ত সংহিচ্ছা, বেড়া-সেউতি, অঙ্গল-বাউল গীত-পদ্যগানের ধর্ম ইত্যাদি এমন কত কিছু মিলিয়া-মিশিয়া বাঙালীর ধর্ম রচিত হইয়াছে—ঐচ্ছিক-তেমনি কোন-কিছুর সন্ধান ভারতবর্ষে আরও কোথাও মিলে না। বাঙালী বাংলার ইহার বিরাট বেদ রচনা করিয়াছে। অনেক 'অশিক্ষিত' সাধু চন্দ্রক আড়ালে লক্ষ পাখায় ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন। বাংলার নিজের অষ্টাদশ-শত পুরাণ উপ-পুরাণ আছে; হুতারবানি বড় বড় পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—'মঙ্গল-সাহিত্য', ধর্ম-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল, শ্রীভাষা-মঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদি। কবি-গান, দেহতত্ত্ব-শব্দ-গান, ভাসান-গান, বীর-গান, ধূম, বারোমাসী, জারী, শারি, জাগ-গান, রসের ধূম, চাপান-ধূম, বিবাহের সময় মেয়েলী গান, পাকীর গান ইত্যাদি 'ভাষা' করিয়া সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে বাংলার মনের সত্যকার পরিচয় পাইব। উহা গ্রামে গ্রামে, কুটারে কুটারে ছিন্ন কহার অন্তরালে, দীন-দুঃখীর শীর্ণ বক্ষোমাথের দরদী অশ্রুসিক্তের জল নিঃশেষে প্রতীক্ষা করিতেছে—শিক্ষিত বাঙালীকে আজ তাহার সন্ধান লইতে হইবে। খৃস্টীয় ১ম হইতে ১২শ শতক পর্য্যন্ত বৈশ্বাধ্য ক্রমের করিয়া বৌদ্ধধর্মকে হস্তম করিয়া ফেলি,

শৈব বাঙালী জাতি কেমন করিয়া বৈষ্ণব হইয়া উঠিল, ঐতিহাসিক কারণ বিনা সম-পরিমাণ 'টেপুট্ট' বিশ্ব ভাষার সব পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব ধর্ম কেমন করিয়া 'বোধিম' ধর্ম হইল, তাহার অনেক দিনের অনেক কথা আজও অজানা রহিয়াছে।

বনে-কাছারে লোকালীর চাকুরের দেউল গোপন রহণে দীন হইয়া যাইতেছে; কিন্তু বাংলার স্থাপত্য সভ্যই অবলোহিত নয়। বাংলার চিত্রশিল্পের সম্পূর্ণ বিশিষ্ট ধারা ও পদ্ধতি আছে, বাংলার এমন 'ম্যাডোনা' আছে, ভার্য্য-বোরেবর তাহা অতুলনীয়, একথা বলিলে বড় অযুক্তি হয় না। ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠকেই এসকলের উল্লেখ পাই না।

বাংলার বাণিজ্য-সম্পদ গিয়াছে, তাহার আশ্রয় বহু-শিল্প আর গল্প-কথা; তবুও আজও মঙ্গলিন তৈয়ারী হয়। সহস্র মুদ্রা মূল্যের বালাপোষ ও পাটী আজও বাংলায় পাওয়া যায়। প্রস্তর-ভাস্কর্য্য, কাঠ-তক্ষণ ও মৃৎশিল্প-শিল্পের এমন পরিচয় আজও পাই—যাহা বিশ্বের দরবারে গর্ব্বের প্রদর্শন করা চলে। বাঙালী জাতিকে বাচিত হইলে এসবের পরিচয় লইতে হইবে।

বাঙালীর দরবারী ধর্ম ভিন্নও যেমন তার 'আটপোরে' ঘরের ধর্ম আছে, তার রত-পূজা-পার্লগ আছে, তেমনি তার কুটার-সম্বন্ধ, শোভন গৃহশিল্প আছে। সে গৃহশিল্প যে কত বিভিন্ন, আটের নিকটে কলিলে মণিকোঠায় সে স্থান পায়, কয়লেনে তাহার সংসার বাসনে। 'প্রপতির সমাজে' 'কাঁথা'র স্থান নাই, কিন্তু সহস্রমুদ্রার মূল্যে কাঁথা বিক্রয় হয় এবং

ঐতিহাসিক কারণ বিনা সম-পরিমাণ 'টেপুট্ট' বিশ্ব

ভাষার একভাগ পরিমাণ মূল্যেও বিক্রয় না।

ইতিহাসের উপাদান-উপকরণে বাংলার মৃৎশিল্প

দৃষ্টিশালিনী। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার অগণ্য 'গড়ের'

ইতিহাস যদি কোন দিন লেখা হয়, সেই হইবে

'বাংলার রাজপুত্র'দের ইতিহাস। বাঙালী সমাজের

অনেক দামী মাল-মসলা জোগান হইবে, যদি বিভিন্ন

জেলার সোকের পদবী-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হয়।

বিভিন্ন জেলার রত-পূজা-পার্লগ, গাথা-গান-পালা, প্রবাদ-

জনশ্রুতি সংগ্রহ করিতে পারিলে, তবেই জাতির ইতিহাস

রচিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে ঘটক-কুলাচার্যদেরও

স্থান আছে। নৃত্য-বিংশ পণ্ডিতেরা তাহাদের

বিজ্ঞানমতে 'মহামানবের সাগরতীরে' জাতি-নির্দেশের

'খের' হারাইয়া ফেলিয়াছেন—দাঁড়াইতেছেন বিশেষ

করিয়া ভাষাতত্ত্বের উপরে। বিভিন্ন জেলার তাহার

বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে এসবকে অনেক নতুন

তথ্য সংগৃহীত হইবে। প্রত্যন্ত দেশের জেলাগুলির

ভাষায় কথাটা অবিশেষে প্রকটিত হইবে। রীতি-নীতি,

আচার-ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে সে-সকল কথা

আরও স্পষ্ট হয়।

বাঙালীর জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় এমনি করিয়া

লইতে হইবে। বাঙালী হইয়া বাঁচা নয়, শুধু বাঁচিয়া

থাকিতে হইলেই, 'কোণ-ঠোদা' হইয়া বিলুপ্ত হইতে

রক্ষা পাইতে হইলেই এমনি করিয়া জীবনের বিভিন্ন

বিভাগে পুনরুৎপাদন ঘটাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীপ্রেমানাথ রায়



মানুষ যে মানুষ—এই ভারী চক্রহ সত্য মানবার মুসন্ধিক্ষণ নাকি আজ এসেছে। এই সত্যকে পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করবার জট্টাই যুগে যুগে মহাপুরুষেরা প্রাণ দিয়েছেন—এর অস্বীকারে পৃথিবীর পাণের ভরা নিমেষ। মাথায় তুলে নিয়ে, মানুষকে মুক্তি দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষের ইতিহাসের প্রথম মহাপুরুষ ‘নাস্তিক’ শাফা-বুজের বা তাঁর স্যোদের কথা তিনি (১)—রাক্ষণদের জন্য তো অস্ত্রসবাকারই মত—তবে রাক্ষণেরা দেবোৎপত্তির অস্ত্রধারণ করেন কেন? যদি কোন বিশেষ একটা রাক্ষণের সেই দাবী থাকে—সুখ-স্বাস্থ্যের ধরে পৃথিবীতন্ত্র রাক্ষণের বেলায় সে-দাবী গ্রাহ্য হয় কেন? আবার হাজার বছর আগেই আমাদের দৃষ্টিশাসিত এই দেশেই অস্ত্রবজ্ঞ ওর প্রতিপত্তি করছেন (২)। বড় রাগ করে তিনি বলেছিলেন—রাক্ষণ নাকি এক্সার মুখ থেকে হ’লেছে, হেছেছিল তো হেছেছিল—এখন তার কি, এখন তো অস্ত্রেও যেমন হু, রাক্ষণও তেমনি হয়—তবে? এই ‘নাস্তিক’দের সুপ্রাচীন কাল হ’তে দীর্ঘনিম্ন ধরে এদেশে সুখ জয়জয়কার হ’য়েছে। তাই মনে করতে পারি প্রশ্রুতা শুধু তাদের নয়—আমাদের দেশের।

পৃথিবীতে যুগে-যুগে নানা রূপে এ প্রশ্র উঠেছে। আমাদের দেশের বাইরে এর একটা রূপের কটনি পরিচয় পাবার দিন অতীত বলে মনে হওয়া সুদূরত্ব নয়—তাকে কিছুকাল পূর্বে বলা হ’য়েছে white peril স্তার তারই প্রভাবিত পরিপূরককে এখন বলা হচ্ছে yellow peril। এখানে সমস্তার রূপ গভীর—গায়ের চামড়া, আকার-প্রকারের ভেদ তো চোখ বুজেও

চোখে পড়ে—আর শিক্ষা-নীতি, সভ্যতা-মস্তার এ-সবও কিছু পরিমাণে লাঠা-লাঠি না লাগার তাও নয়। যাক ওসর কথা। আমাদের স্থানীয় সমস্তা caste peril বাইরের লোকের চোখে ঠিক রূপ পেতে পারে না। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন shake the bottle process হ’য়ে গেছে যে, নৃত্য-বিদদেরও এ নর-তন্ত্র এসে ভাষা-ভয়ের গবেষণায়ই বেশী করে মন দিতে হচ্ছে (৩)। আমরা ছত্রিশ জাতক কোটী-পূজ দেখে খবর করার চেষ্টা করি। মাথো ঘটকেরা এ কাজ করতেন। এখন সে যুক্তি লোপ পেয়েছে। ইতিহাসের কথা নয়—সাত পুরুষের, ১০০০০ বছরের খবর মেলাই চক্রহ। আমাদের সত্যি জা’তের খবর গাঢ় অন্ধকার গুহায় নিহিত।

ক্ষেত্রের শেষ ও নবীনতম অংশের পুরুষ-বৃদ্ধে বর্ণোৎপত্তির যৌক নিয়ে রাক্ষণেরা নিজেদের জয়-জয়কার করেন। বোদোতর রাক্ষা-শায়েই বর্ণোৎপত্তির আরও উজ্জ্বলবানকে বিভিন্ন বিবরণ মেলে (৪)। বোদের কাল হ’তে পুরাতনের যুগ পদ্যস্ত বারংবার জাতি-উৎপত্তির নব নব ময়ন রচনা হ’ল, তা থেকে যুক্তি একান্ত রাক্ষণ-শাসিত জগতেরও পুরুষ-বৃদ্ধের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না। নতুন নতুন মুনি-ঋষিরা যেদিন যিনি ব্যাতি-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, নিজের গুণীমত বর্ণোৎপত্তির সম্পূর্ণ নব নব ময়ন রচনা করেছেন—আর তা’তে এ কথাটা বৃহৎ ভুল হয় না, যে, কোন মস্তই তদানীন্তন

[ ইহার বাকী অংশ ৩০ পৃষ্ঠায় ]

৩। ডি. আর. ভাভারকরের—Foreign Elements in Hindu Population-এ বিসদৃষ্ট একাংশ প্রদর্শন করে বলা হয়েছে।

৪। হৈট্রিয়ান রাক্ষণ—৩/২১৬১; শতপথ—২/১৪১০৬; বাজসনয় ১৪১০৬; রাক্ষসপুরাণ—১/১১৬—১৬০; হরিবংশ—২৩ ও ২২ অধ্যায় ১/কিপুপুরাণ ৪৮/১ ইত্যাদি।

১। অধ্যাপক সত্য-বোধ সঙ্কটচর্যাপুরাণ  
২। বৈদেহসংসারকোষ—পৃ-৬১—৬২; নারায়ণ (১) ওদ্যাপতি  
জাতিবিজ্ঞান-দীপ্য ভাষ্য পুস্তিকা রচনা করেন—সুহৃৎসংগে।

অব্যাপক শ্রীমাতোন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, বিদ্যাবাগীশ, এম্-এল-এ

বর্তমান ‘অস্পৃশ্যতানিবারণ’ ও ‘মন্দির-প্রবেশ’ আলোচনা সপক্ষে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। ব্যবস্থা পরিষদে এই দুই বিষয়ে দুইটা বিশেষ আলোচনার চেষ্টা চলিতেছে। দুইটা বিশেষই বিষয় এক বলিয়া মনে করি। কারণ ‘অস্পৃশ্যতানিবারণ’ বিজ্ঞান ব্যাপক, ‘মন্দির প্রবেশ’ বিল উদ্বার একটা প্রকল্পভেদ মাত্র। অতএব বস্তুতঃ উভা প্রথম বিশেষই অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমি দুইটা প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। এই প্রশ্নের তিনটি দিক—(১) ধর্ম-সম্বন্ধীয়, (২) আইন-সম্বন্ধীয় এবং (৩) রাজনীতি-সম্বন্ধীয়। তিন

দিকেই কিছু আলোচনা করিব।

(১) ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

মন্দির-সম্বন্ধীয় ব্যাপার অর্থাৎ দেবকর্পা, পূজা প্রভৃতি—যলৌকিক (super-natural) ও অতৃষ্ণার্থক অর্থাৎ ইহার উদ্দেশ্য (পুণ্যার্জন) সাধারণ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয় না। যোগাচার্য্যাদি কার্যাবিশেষদ্বারা সৃষ্টিত দেবদেবের সন্মার ক্রিয়াকে হয় তাহা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) অগোচর। বাহ্যার এইরূপ দেবদেব বিশ্বাস এই মতকে শায়ে বৈরূপ উপদেশ আছে। তাহাই প্রমাণ, অজ কোন কথা প্রমাণ নহে। এখানে common sense এর পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ common sense ব্যক্তি-কিশেষে বিভিন্ন, এবং একই ব্যক্তিতে, কালবিধায়ে ও অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন। কেহ বলেন, মূর্তিপূজা পাপ; কেহ বলেন, পাপ নহে, অপ্রশস্ত; কেহ বলেন, উহা আবশ্যক; ইত্যাদি। সকলেরই মত common sense-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রী হ্রির ধর্মব? বিষম সমস্তা ও গোলাযোগের কথা। অতএব কেহ কেহ বলেন, votingই একমাত্র চূড়ান্ত উপায়। কিন্তু বলা বাহুল্য voting-এর ফলাফল

অবস্থাবিশেষে ও সময়বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব সপক্ষেও vote লইলে আমরা এক এক সময়ে এক এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পড়িব। অতএব একই বিষয়ে দুইটা বিরুদ্ধ মতই তো সত্য হইতে পারে না, একটা নিশ্চয়ই সত্য। অতএব এ সকল স্বল্প বিধা voting-এর দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এজন্য মহর্ষি মহা বলিয়াছেন—

‘একোহপি বেদবিরুদ্ধঃ যঃ ব্যবজ্ঞঃ বিজ্ঞোত্তমঃ।’

স এব যথো বিজ্ঞো নান্যান্যাম্ অয্যুতাসিদ্ধাঃ।’

ধর্ম সপক্ষে বেদবিৎ পণ্ডিত একজন বাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম হইবে। অতঃ অজ লোকের কবার কোন মূল্য নাই। অজ্ঞাতসকল subtle ও technical বিষয়েও এই একই কথা।

এই মত যদি ঠিক হয় তবে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, মন্দির-অংশেদ্বায় সপক্ষে শায়ে কি মত? শায়ে কি এই মতকে সল জাতি-কই তুল্যাবিশেষদ্বারা নিষেধেন? না। পূণ্যক পূণ্যক জাতির পূণ্যক পূণ্যক অধিকার। রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অধিকার বিভিন্ন। ইহাতে এ যাবৎ কেহ কোনও আপত্তি করেন নাই। সনাতনীরা তো করেনই না, কারণ, তাহার বিশ্বাস করেন যে, শূদ্র শূদ্রের ধর্ম ও কর্ম পালন করিয়াই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক জাতির পক্ষেও এইরূপ। মনে রাখিতে হইবে, উন্নতির জন্ত অস্তির হইয়া আমরা এই জীবনেই ‘সকল উন্নতি আদায় করিতে-বাধ্য হইব’ না। কারণ, আমাদের মতে এই জীবনই শেষ নহে। জাত্যবস্কর্ষণ যে উন্নতি তাহা পাইতে হইলে এই অসকল-স্বাধী জীবন-নিজার পরেই উহা আমাদের প্রাপ্য হইবে, পূর্বে নহে। এইরূপ শিক্ষাভেই আবশ্য আমাদের স্থির থাকিরা আসিয়াছি। এই কর্মস্বাধী



জন্মস্রবাব বিবৃত হইলই পোমমালা। “য ইহ রামগীতরাণা: বে রমগীরাং বোনিম্ আপজেন্ন-ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়োনিং বা বৈশ্যোনিং বা; য ইহ কপুতভাবা: বে কপুয়াং বোনিম্ আপজেন্ন-থ্যোনিং বা শূকর্যোনিং বা চাণ্ডাল্যোনিং বা” — ছান্দোগ্য উপনিষৎ — অর্থাৎ রমগীরা (উৎকৃষ্ট) আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ্যই উৎকৃষ্ট বোনিতে জন্ম হয়। এবং নিকৃষ্ট আচরণ করিলে চাণ্ডাল্যই নিকৃষ্ট বোনিতে জন্ম হয়। বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে এই Laws of Karma কুলিয়া যাওয়াতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। অতীত যুগপ্রকারের উন্নতি এই জন্মেই হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু জাতি-পরিবর্তন এই জন্মে সম্ভবপর নহে। কারণ জাতিরা জন্মের সহিত অচির। জন্মের পরিবর্তন না হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। উভয় শব্দেরই মূল এক—জন্ম বাহু (‘to be born’) — বিধামিষের জাতি-পরিবর্তন হইয়াছিল—সে বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে। বাহা হউক এইরূপ একটি exception থাকে। general rule নষ্ট না হইয়া বরং সমর্থিতই হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন অল্প এক শ্রেণী আছে বাহারা ‘অস্ত্রাজ’। প্রথমে কটা চারি বর্ষ ধর্ম্য বিবাহেরে সন্ধান। অস্ত্রাজপন বিবাহেরে সন্ধান নহে, তাহারা প্রতি-ভোম-সমুত নিকৃষ্ট বর্ণসত্ত্ব। নিকৃষ্ট জাতীয় পুঙ্খ ও উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। এইরূপ সমস্যার নাম ‘প্রতিসোম’। এইরূপ সমস্যাকে উৎপন্ন সন্ধানকে ‘প্রতিসোম’ বলে। উহাদের মধ্যে বাহারা নিকৃষ্টতম (যথা শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণের গর্ভজাত) তাহারা ‘স্বস্ত্রাজ’। সমাজে তাহাদের বৃত্তিও নিকৃষ্ট। ভগবানের সন্ধান হইলেও তাহারা অধর্ম-প্রহৃত। জন্ম-স্ত্রীর পাপের ফলেই এরূপ দূষিত জন্ম হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ১০ শ্রীতে (৯০২) ভগবান্ ইহাঙ্গিকে ‘পাপ-য়োনি’ বলিয়াছেন, মহঃ (১০১৫) ইহাঙ্গিকে ‘কলুষ্যোনি’ বলিয়াছেন। স্পষ্ট দেখা বাইতেছে, এ বিষয়ে গীতার

ও মহাশক্তিয়ার একমত। যদি কোনও ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞায় আশ্বার ধরিয়। বসেন, যে, গীতাতো বাহা না থাকিলে তাহা মানিব না, ‘তাহারও এখানে নিরত হইতে হইবে। অস্পৃশ্যগণের সমুদয় শাপ বিলিয়াছেন সে, ইহার। গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। দাণ্ডিকগণ ইহাদের সহিত কোনও ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিবেন না। যথা—‘চণ্ডালপথচান্যং তু হিত্বীমাং প্রতিগ্রহঃ’ (মহঃ, ১০১২), ‘ন তৈঃ সমস্ময়িচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্’ (মহঃ, ১০১৩) ইত্যাদি। আমরা শাস্ত্রীয় আদেশের কারণ অস্বাস্থ্যসাধারণতঃ করিতে যাই না। তবে বর্তমান বিষয়ে কারণ যথেষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা—জন্মগত নীচতার সাধারণতঃ মনের নীচতা হয়, আহার-বিহারের জন্মের বশতঃ শরীরও মন উভয়ই দূষিত হয়। এই সকল দোষের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিত করিবার চেষ্টাই অস্পৃশ্যতার কারণ। কোনও ব্যক্তিবিশেষে এইরূপ নীচতা বা দোষের অভাব থাকে। অসম্ভব নহে। কিন্তু majority ধারাই সকল বিষয়ে বিধান হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অল্প উপায় হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে এই অস্পৃশ্যতার বৃদ্ধা অপেক্ষা সাহসবৃদ্ধিই অধিক। দূষিত রোগীর সন্ধানের সহিত আমরা যে কারণে মেলামেশা করি না, ইহাও অনেকটা তুল্য। এই সকল কারণে চণ্ডালদিগের স্পর্শ নিষিদ্ধ, এবং দেহ-গৃহাদিতে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

চাণ্ডাল্য পতিত স্পৃষ্ট। শব্দ অস্ত্রাজমো চ।  
উদক্যাং স্তূতিক্যাং নারীং সবায়াঃ মানমাচরেন ॥

—সংবদ্ধ, ১৭৮

—চণ্ডাল, পতিত, মূতদেহ, অস্ত্রাজ, রজঃশলা ও নব-প্রহৃত নারী স্পর্শ করিলে সর্বস্ব মান করিতে হয়।

চাণ্ডালৈরস্ত্রাজৈর্নৈব তথাজ-প্রতিসোমজৈঃ।  
সৌম্বেচ নীচ-চাণ্ডালৈঃ শুকনিমান্দী স্তূতিকৈঃ।  
এবমান্দিতঃ সস্পৃষ্টে দেবগণের বিসেসতঃ।  
স্পৃষ্টে প্রবেশনে বাধা পূজাকালে চ দর্শনে ॥

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইহাতে আশ্চর্যের বা আপত্তির কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অধিকার অল্প, ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা বৈশ্যের অধিকার অল্প, বৈশ্যের অপেক্ষা শূদ্রের অধিকার অল্প, শূদ্রের অপেক্ষা অস্ত্রাজের অধিকার অল্প। যৎকিঞ্চিৎ অধিকার শূদ্রেরও আছে, অস্ত্রাজেরও আছে। এই অধিকারটুকু ঠিক কতখানি তাহা শাস্ত্রে বাহা উল্লিখিত থাকিলে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, হঠাৎ আমি বা অজ্ঞ কেহ আন্দোলন করিয়া উহাকে ভাঙের দ্বারা বাড়াইয়া লইতে বাওয়া চলিবে না। শাপ একটি standard মাপকাঠি। উহা তাগ করিলেই বিপদ। ব্যক্তিগত মতভেদ বইয়া বিবাদ ও কলহের সৃষ্টিই তাহার ফল।

দেহপূজার, স্নেহচিহ্নের ও মোক্ষবিষয়ে অস্পৃশ্যের অধিকার নাই, এরূপ নহে। বরং ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ঐ জ্ঞ যে সকল কঠোর নিয়ম পালন বিহিত আছে, অস্পৃশ্যগণের পক্ষে ঐ সকল নিয়ম অতীব সরল।

বেদে যাগযজ্ঞাদির বিধি উল্লিখিত আছে, সদাচারের বিধি স্মৃতিতেই বেশী। অস্পৃশ্যতার বিষয় বেদেও পাওয়া যায় — ইহিতে। যজ্ঞে উদ্ভবল, মৃদল, দৃপ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ঐগুলি তদ্ব্য (স্বত্ববর) কাঠ কাটিয়া প্রস্তুত করে। যজুর্বেদে (ব্রাহ্মনঃ, ১১৩) একটা ময় আছে, তাহাতে এই উদ্ভবলদিকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে, যথা—

“তদ্ব্যং দেবযজ্ঞাদির যদ্ব্য: অস্ত্রাজ: পরাজয়:”  
অর্থাৎ তদ্ব্যপ্রতি অস্ত্রাজ ব্যক্তিগণ কাটিয়া তোমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে, তোমরা যজ্ঞের জ্ঞা এখন শুদ্ধ হও (অস্ত্রাজ: শুদ্ধপ্রভূতঃ)—উল্ল (৩ মৌহর)। ইহা হইতে বৃদ্ধা যায় যে, অস্পৃশ্যতা বেদেরও অনুমোদিত। বস্তুতঃ, স্মৃতিগুলি স্পষ্টতঃ বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বর্তমানে অনেকে অজ্ঞান প্রচার করিতেছেন। তাহা কতক অজ্ঞতা-সমুত ও কতক অসত্য-শব্দতঃ। সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জাতিভেদ পরাধর্ম্য।

আধুনিক অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের জিনিষ, বেদে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু একথা সত্য নহে। ধর্ম্মের বিধাত পুঙ্খমুখে চারি বর্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। “ব্রাহ্মণোহয়ং যুধামানীন্ বাহু রাজাজঃ কৃত:। উক্ত তদন্ত যদ্ বৈশ্য: পত্যাং স্নোহোজ্যতঃ”। যজুর্বেদে ৭০ অধ্যায়ে অশ্বিশ ও শিশ মোট ৩৪টা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন —

‘চাতুর্ধর্ম্মাণাং ময়: স্তম্ভ: শুকস্মবিশিভাশ:’।

অতএব শুণ্ড ও কর্ম্ম অনুসারেই তো জাতি হওয়া উচিত, অর্থাৎ তাহা আমরাই নির্দেশ করিব, এই মত অতি অসম্মত। ভাষার হিসাবে এবং সামাজিক হিসাবে—কোন হিসাবেই এরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করা যায় না। এই বাক্যের বক্তা কে? ভগবান্। ‘স্বষ্ট’ শব্দটা ‘জ’ প্রত্যয়-নিপ্পন্ন, ঐ ‘জ’ প্রত্যয় অতীতকাল বুঝায়। অতএব অর্থ এইরূপ হইল—ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ও অনাদি, তৎকৃত এই বে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চতুর্ধর্ম্মের সৃষ্টি তাহাও অনাদি। ভগবান্ সৃষ্ট অর্থাৎ আদিমান, পরান্ন নহে। তিনি অনাদি, তাহার দত্ত ধর্ম্ম (কর্ম্ম), তাহাও সকলই অনাদি। বর্ণ-বিভাগ যদি ভগবানের হাত হইতে কাড়িয়া আমাদের হাতে আনি তাহা হইলে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে। এক ব্যক্তি অজ্ঞ যে কার্য করিয়া তাহাতে সে ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত। হয়ত আগামী কলা একজন একটা কার্য করিয়া বসিবে বাহাতে সে চণ্ডালেরও অধম। অনবরত এই ভিত্তি ভিমিস্ত করিবে কে?

(৩) ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন, “বিভাবিনয়-সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী। জনৈ চৈব শ্রমণকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ” — অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী-পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী। অতএব ইহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ইহা অস্বতঃ-ব্যাখ্যা। কারণ—প্রথমতঃ, ইহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতের পক্ষে, সাধারণের পক্ষে নহে। দ্বিতীয়তঃ, ‘সমদর্শিনাঃ’ কোন বিষয়ের? না, ‘প্রকৃতপক্ষে তাহারা সকলে পরজ্ঞ



হইতে অভিন্ন এই বিষয়ে। অজ্ঞাত বিষয়ে অর্থাৎ ব্যবহারক: তাহার ভিন্নই বটে। তত্ত্বজ্ঞানীও এরূপ মনে করেন না যে, কুরুর বৈষ্ণব চতুস্পদ ব্রাহ্মণও এরূপ চতুস্পদ, অথবা পোহুৎ বৈষ্ণব পানযোগ্য, কুহুবহুৎও এরূপ আচরের সহিত পান করা যাইতে পারে, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে সংস্কারকগণের তর্ক এতই ছল বে, ইহা কেবল অজ্ঞতাসমূহ বসিয়া মনে হয় না।

(৪) "নারদ ঋষি দাসীপুত্র ছিলেন," একথা নিখা। তিনি দাসীপুত্র ছিলেন পূর্বজন্মে, এজন্মে নহে। (ভাগবত, ১।৬)।

(৫) "বসিষ্ঠ বৈষ্ণাপুত্র"। মিথ্যা কথা। বসিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মার (মিতাভূতের মম্বর) মানসপুত্র। নিমি ও বসিষ্ঠ পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পরকে অভিষাপ প্রদান করেন; ঐ অভিষাপবশতঃ বসিষ্ঠের একবার জন্মহার গ্রহণ করিয়া আসিতে হয়। ব্রহ্মার উপদেশাব্যবারে নিজ ও বকসের বীর্ঘ্যসমূহ কিন্তু "অমোনিজ" জন্মগ্রহণ করিয়া শাপমুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় পূর্বদেহ ধারণ করেন। উর্ধ্বলী অম্পরাকে দেখিয়া "বজ্রভূমিতে" নিজ ও বকসের যে রেতঃস্খলন হয় তাহা হইতে বসিষ্ঠের কিতীয় জন্ম। ইহা স্পষ্টই আলৌকিক ব্যাপার। ইহা হইতে বসিষ্ঠকে বৈষ্ণাব পুত্র বলা যায় না।

(৬) "বাসু শূরাপুত্র" ইহাও ঠিক নহে। তাহার মাতা সভাবতী কৈবর্তরাজ্য কর্তৃক পালিতা, কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত কন্যা নহেন। (মহাভারত, আদিপর্ক, ১০১৭৯)। বাসু ভূমিত হইবার পরকর্ণেই তপস্বী প্রাণন করিলেন, অতএব তাহার জন্মও আলৌকিক, একথাও মনে রাখিতে হইবে।

(৭) "ভবরান চৈতন্য দলক জাতির অগ্র গুরু করিয়াছেন," ইহাও মিথ্যা কথা। শ্রীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণপণ তাহাকে পাক করিয়া নিমগ্ন রাখা হইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহাকে নিমগ্ন করিয়া জগন্নাথের প্রদান ভোজন করাইতেন। (চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্তর্লীলা, ১০)।

বরন হরিদাস এবং বনরাজের বন্দী রূপ ও সনাতন নিজেদের মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য মনে করিয়া মন্দিরে

প্রবেশ করেন নাই জানিয়া চৈতন্যদেব অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কেবল দীনতাজ প্রকাশ্য নহে। রূপ ও সনাতনের পক্ষে আহার সখ্যার সদাচার ক্ষুদ্র হওয়াতেই তাহার মন্দির প্রবেশে বিরত হইয়াছিলেন ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(৮) ভগবান্ রামচন্দ্র নিবাদ জাতীয় বন্ধ গুণকের অগ্র ভোজন করিয়াছিলেন, ইহাও মিথ্যা। লক্ষণ কর্তৃক সানীত জন্মহার পান করিয়া তিনি ঐ রাত্রি মাপন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ, অমোধ্যাকাণ্ড, ৮৭)।

সংস্কারকগণ এতদিন বাহ্য বহু তরিতরকারের পর স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে অস্পৃশ্যতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার অস্ত্র এক নূতন তরু ধরিয়াছেন, আমরা বাহ্যগতিকে অস্পৃশ্য বলি তাহারাই যে শাস্ত্রোক্ত সেই সেই অস্পৃশ্যতাটি তাহার প্রমাণ কি? এইরূপ তর্ককে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি 'চ্যামি'। প্রতিষ্ঠিত লোকের মুখে এইরূপ তর্ক শোভা পায় না। রাম ব্রাহ্মণ, শ্রাম ক্ষত্রিয়, বহু বৈষ্ণ, দীর্ঘ শূদ্র, চেন্দু চামার, উদার মেথর—এই সর্বত্রই একই প্রমাণ—চিরন্তন ঐতিহ্য (tradition)। রামের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ একথা বৈষ্ণব সম্রাটরা হয়, উদারের পূর্বপুরুষ মেথর একথাও বৈষ্ণব সম্রাটরা হইবে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় ও শক্তি ক্ষয় করা শাস্ত্রে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সাধারণ বৃত্তিতেও আমরা এরূপই মনে করি। এই অজ্ঞার তর্ক, ক্ষেপ বা prestige ভাগ করিবার প্রকৃতি বা সাহসের অভাব হইলেই সমাজে সুশাস্তির অভাব হয়। গান্ধীজি সাধারণ লোকের তুলনার কোনও কোনও বিষয়ে মহাপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সকল বিষয়ে অজ্ঞাত এরূপ আশা বা কল্পনা করা অন্তরা। প্রাচীন পণ্ডিতদের তুলনায় তাহার শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানগুণ অতি সামান্য, সেজন্য শাস্ত্রীয় আলোচনা, অভিজ্ঞতা ও ব্রহ্মদর্শিতাও অতি কম। নতুবা, Himalayan blunder করিয়া তাহার পক্ষে পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত না। অতর্কতাই যদি কাহারও মতের অধিবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে বর্তমান কালোচিত রক্তসম-প্রধান যে

কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা সর্বপ্রধান নিখলবুদ্ধি প্রাচীন সন্থি মুদ্র, অথি, বাজবদ্য প্রভৃতির অধিবর্তন করাই সর্বশো শ্রেয়স্কর।

২। আইন-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

অস্পৃশ্যের জ্ঞান মন্দিরপ্রবেশ-সম্বন্ধীয় আইন পেশ করিয়া সংস্কারকগণ আইনের দিক্টা পরিহার করিয়া দিয়াছেন। এতদ্বিধা তাহার বলিতেছিলেন, মন্দিরের ঠাট্টিগণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে মন্দির অস্পৃশ্যের জ্ঞান উল্লুখ করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই। এইরূপ কল্পনা করিয়াই গভ বসর Zamorinকে তাহার পুনঃ পুনঃ অধিরোপ জানাইয়াছিলেন। স্বতঃ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা যে মধ্যে মন্দিরের পরিচালনা অভিজ্ঞতার কথা সিদ্ধাছেন তাহার ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা Trustee'র নাই, করিলে তাহার breach of trust অপরাধে অপরাধী হইবেন। বহুদিন পরে এই যুক্তির সার অধিবর্তন করিয়া সংস্কারকগণ এখন নূতন আইনের দ্বারা পূর্ব নিয়ম পরিবর্তন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু মত প্রতিষ্ঠাতার অভিজ্ঞতার স্কেচ করিবার ক্ষমতা কোনও নূতন আইনেরও হইতে পারে, এইরূপ কল্পনাও অমূলক। প্রতিষ্ঠাতার অভিজ্ঞতারে অবিরোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা Trustee'র আছে, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতারে বিবুদ্ধে কিছু পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই—ইহা অতি স্পষ্ট কথা। এই শব্দে বহু নকীর আছে, আমি এখানে মাত্র বাটী উক্ত কথা আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

1. "A Hindu Temple is not a public place in the sense in which a public road is a public place. It is open only to the persons belonging to the religious community for whose use and benefit it was dedicated."—I. L. R., 13, Madras, 293.

2. "Any extension or limitation of the scope of a trust so as to exclude those who were intended to be included, or to include

those who were intended to be excluded, is really a breach—and a very serious breach—of trust."—Justice Beaman, 33 Bombay 509.

3. "No amount of consent on the part of the public will justify a breach of trust by the Manager."—I. L. R., 20, Madras 398.

4. "In cases relating to Charity, a majority cannot control the minority."—Tudor on "Charitable Trust."

5. "A minority, however small, holding fast by the tenet would be entitled to prevail against the majority, however numerically large, which could be shown to have receded from or renounced them."—Justice Arnold, 12 B. H. C., 323.

৩। রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধীয় আলোচনা—

ধর্ম ও আইন ভিন্ন বর্তমান প্রবন্ধের আর একটা দিক আছে, সেটা রাষ্ট্রনীতি (politics)। কেহ কেহ বলেন যে, অস্পৃশ্যগণকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দিলে তাহার হিন্দুধর্ম ভাগ করিয়া অস্ত্র ধর্ম আশ্রয় করিয়া, তাহাতে হিন্দুসমাজ ভঙ্গল হইয়া পড়িবে। অতএব দেশ-কালপায় বিরোধনা করিয়া গান্ধীজির এই আন্দোলন বাধা না দেওয়াই উচিত। কিন্তু একই চিন্তা করিয়া দেখিলে এ মতের সমর্থন করা যায় না। অধুনা নেতা আবেদনকর প্রভৃতি এবং তথাকথিত হিন্দুগণের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা সমগ্র বর্গসমূহই উড়াইয়া দিতে চাহেন। গান্ধীজি বর্তমানে দিলে মোখিক বাধা দিয়া বলিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে তাহা পরে করা যাইবে। "If, Varnasram even then looks an ugly thing the whole Hindu society will fight it."—"Harijan," Feb. 11, 1933. Inter-dining ও Inter-marriage বর্তমান আন্দোলনের অঙ্গ নহে, কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চাভিলাষীরাও গান্ধীজি বলিয়াছেন। অতএব দেশকালপায়ের দোহাই-দিয়া 'হ'কার বোল ও ন'লুচে ছুইই বদলাইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত কি না তাহা চিন্তা



করা আবশ্যক। দেশকালপাত্র হিসাবে অবাস্তব বিশ্বের পরিবর্তন হইতে পারে, মূলনীতির (basic principle) পরিবর্তন হইতে পারে না। মূলনীতির পরিবর্তন হইলে তাকে 'পরিবর্তন' বলে না, 'বিশ্বাস' বলে। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাহা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। তাহাতে যদি কেহ ('নিজের নাক কাটিয়া অপরের রাজ্যভঙ্গ' করিবার জ্ঞা) অজ্ঞ ব্ৰহ্ম আশ্রয় করেন সেজ্জ আমরা জ্বাতি কিছ নিরপায়। সংস্কারবাহকের বলাবল প্রায়শঃ অস্বিকৃতিস্বর, তাহা জানি। চীন, জাপান, ইংলণ্ড, এবং হিন্দু মুসলমান কঠক অস্থায়িত ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতীত নিজে অস্থানি কাহারও অতিক্রমিত নহে। অশুভ্রমণের পূর্ণগুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষার গুণ এতদিন বিনা আপত্তিতে স্বহৃদচিন্তে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন তাঁহা বিপাকেও সেই শিক্ষার অম্ববর্তন করিতে অম্বরোধ করি। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্তববিবেচনার পরিচয়ও পাইয়াছি। Indian Franchise Committee'র রিপোর্টে অম্বর সমাজের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—

—We are Hindus and we desire to remain as Hindus. As a matter of fact it will be interesting to know that persons who become

converts to Christianity come back to the Hindu fold seeing that there is no solace and comfort and equality in that Christian religion. Did not my friend Dr. Solonki, M. L. C., of Bombay come back to Hinduism after having once been converted to Christianity? বস্তুতঃ বর্তমান আন্দোলনে অস্বাভাবিকের চাঁচকার অপেক্ষা তথাকথিত হিন্দুধর্মের চাঁচকারই বেশী।

যাহারা অশুভ্রমণের মন্দির প্রবেশ স্বর্গমন করেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্ম, অধ্যায়সমাজী বা হিন্দু নামধারী ঐক্য মতাবলম্বী। তাহারা নিজের মন্দিরের মতাবলম্বী কোনও পরার্থে বিশ্বাস করেন না। "আপনি না করে পূজা জগৎ করে মানা।" মন্দিরের পরিবর্তন রক্ষা করা দূরে থাকুক, উহার বিনাশ সাধনই তাহাদের বিজ্ঞককতম। মূল কোনও ধর্মভিত্তিক বর্তমান আছে কিনা জানি না, তবে পাশ্চাত্য ব্রীতিনীতির প্রতি অঙ্গ প্রসারই যে ইহার একটি প্রধান কারণ তবিশেষে বিদ্যমানও সন্দেহ নাই।

এবংকী সংক্ষেপে বিবর্তিত হইল। প্রয়োজন হইলে কোনও বিষয় সুবিপ্লবত করিয়া পরিহার করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।



## জাতির পাঁতি

[ ৮৮ পৃষ্ঠার অম্ববর্তিত ]

ভারতীয় সমাজকে কঠিন শাসনের নিগড় পুরাবার মত শক্তি সংগঠন করতে পারে নি। তা না হ'লে বেদের যুগেই নানা ব্রাহ্মবাদি সাহিত্যে কেন্দ্র করে বর্ণের বর্ণোৎপত্তির নতুন নতুন হিসাব দেওয়া হ'ল? আর এই সব নানা বিবরণের মধ্যে অনেক জিনিস খুবই আশ্চর্যজনক বোধ হ'তে পারে: বৈদিকীয় ব্রাহ্মণ যখন বর্ণোৎপত্তির কথা বলে, বর্ণগুলির নামের ক্রমোচ্চারণে প্রথমে পাই বৈশ্বদেবের নাম, আর সর্বশেষে আসে ব্রাহ্মণদের কথা (৫)। ব্রাহ্মণদের আবার বলেন, বৈশ্বদেবোৎপত্তির রকমটা একই (৬)। ঐরূপে ব্রাহ্মণে (৭) বলা হয়েছে—ব্রহ্মের নামা কাণ্ড ও বস্তুর ভার নামা বর্ণকে দেওয়া হ'ত; যদি এক বর্ণের লোক, নিজ-বর্ণে কর্তব্য না করে অন্য বর্ণের কর্তব্য করে, তবে সে নতুন বর্ণে ভিড়ে যেত। বর্ণের সনাতনত্ব নিয়ে যে একেবারে জিনিষনি খেলা হ'য়ে গেছে! আবার একবার পরিহার প্রমাণ বেদেই (৮) মেলে—ঐশ্বর্য ক্রিয়েরা নয়, বৈশ্বদেব পূর্ণ্য ব্রহ্মের পুরোহিতের পদে ব্রতী। আর পুরাণও তাই মেনে নিয়েছে (৯)। বৈশ্বদেব পূর্ণ্য ব্রহ্মই জ্বি ছিলেন। বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে বড় বড় ক্রিয়ের গুণের পরিচয় তো ঝুড়ি ঝুড়ি পাই—ঐজবাণি, অজাতশত্রু, শীলক, জলু, জনক (১০) প্রভৃতি; এদের আবার সবাইয়ের

ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। উপনিষদ-শাস্ত্র—যার চেয়ে বড় গুরু করবার জিনিস আর আমাদের নেই—তা-তা নিত্যন্তই ক্ষত্রিয়বিজ্ঞা বলা হ'য়েছে। এই বে জ্বিদের নাম করনু, এদের কৃষ্ণগোবর্ষই পরিচয়—উপনিষদ।

বৈদিক সাহিত্যে যারা পণ্ডিত তাঁরা বলেছেন, মোটামুটি বেদে বর্ণেরই উল্লেখ পাই, তা হ'তে জাতি-বাদের পরিচয় পাই না, তাও পাই বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ মাত্র (classes not castes), আর সেই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এক শ্রেণী হ'তে অন্য শ্রেণীতে গমন করা নিত্যন্তই সম্ভবসাধ্য। তাই পানে, আহায়ে, পশ্বে, আবার-বিবাহে, আজিকার জাতিবাদের কাঠির পরিচয় পাই না। বিবাহ হ'ত যুগ্মজনের (ঋক, ৮৭১১২), আর তাঁরা প্রাণীজনের মত হ'তে পছন্দ করে স্বামীবরণ করতেন (ঋক, ১০৭১১২)। নবীনতম কথা-সাহিত্যের অনেক নারিকার প্রাচীনতম বেদেতে সাক্ষ্য পাই। ক্ষত্রিয় এমন কি শূদ্র স্থল-বিশেষে পোরহিতা লাভ করতে সমর্থ হ'ত (Indo-Aryan Races—Chanda)। সে কথা পরে আবার উল্বে। বৈদিক যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর অম্বমরণ 'ব্রাহ্মণ' বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আধা-গৃহিণী তা অম্বমোদন করতেন না। কপাটা শুভেতে একটা আশ্চর্য লাগতে পারে, আজকালকার হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জন্মান্তরবাদ খুব বড় একটা জিনিস, আবার বৈদিক ধর্ম-ক্রিয়ার পমার-প্রতিপত্তি তাতেই অনেকটা লোপ পায়।

ব্রাহ্মণ শব্দটির আজকের অর্থ হিসেবে গৃহবাসে বাবদার হ'য়েছে, কিছুতেই মনে হয় না। ম্যাকডোনেল দেখিয়েছেন যে, মাত্র ৮ বার প্রথম বর্ষ হিসেবেই ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে, আর ৪৬ বার ব্যবহৃত হ'য়েছে পুরোহিত অর্থে। শূদ্র শব্দটি মাত্র একবারেই গৃহবাস-হাজেই ব্যবহৃত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণদের সাধারণ নাম ছিল—ক্ষত্রিয়, আর জনসাধারণকে বলা হ'ত বিশ।

৫। সর্গ বেদে ব্রহ্মণ্য বৈব স্বতঃ স্বভাৱে জাতি বৈবাস্য  
বর্ষাকাল যজুর্বেদে "ক্ষত্রিয়সামান্যনি সামান্যে ব্রাহ্মণ্যনা  
প্রসূতি"—বৈদিকীয়, ১০৭১১২  
৬। নবদশবিধব্রহ্মণ্য শূদ্রাণ্যাবপ্ত্যব্রাহ্মণ্যব্রাহ্মণ্যে  
আপ্রাণ্য—ব্রাহ্মণ্যম, ১৪১০  
৭। ঋক—১০৭১৮৮ বা ১০৭১৮৯ কপাটা একাত্তর  
৮। ঋক—১০৭১৮৯ পরিহার করে দিয়েছেন।  
৯। ঐতর্য ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনি বৈশ্বদেব প্রবর্তন মত। ইংল-  
বাক্সি প্রোক্তা মতঃ বৈদিক ব্রহ্মণ্য—মতঃ, ১১২ অধ্যায়  
১০। শতপথ (১০৭১১২) বলা হ'য়েছে—জনক ব্রাহ্মণ  
হ'য়েছিলেন।



বিশেষের অনেকবার বৃদ্ধ করতে দেখি। এরা সবাই বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করত। আর বারা তা করত না, মানুষ না, তাদেরই বলা হ'ত দহা ইত্যাদি—দৈনিক সব পূজা-আজ্ঞার পুরোহিতের সব কাজ এতোক গৃহস্থ নিজেই করতেন—আর বড় বড় ক্রিয়াকার্য্যে Expert হিসেবে পণ্ডিতবর, ব্রাহ্মণদের, গৃহস্থদের ডাক। হ'ত। বড় বড় গৃহস্থর বাপ হইত বৈদ্য বা ভূতোর—এমন পরিচয় পাই। কর্ম্মকারের কর্ম্ম কখনও ছোট চ'খে দেখা হয়নি। গৃহস্থি প্রার্থনা করতেন—বীর্ঘবান পুরুষের জন্ম—যারা শত্রুজয়ী হবে।

বৃদ্ধের আধিভাবের আগে হ'তই দেখি বিদ্রোহের লক্ষ্য উড়ছে। এবিদ্রোহ স্বাধীন চিন্তার বিদ্রোহ। একে বারংবার ব্রাহ্মণস্রোহী ক্ষত্রিয়-বিদ্রোহ বলা হ'য়েছে। কথাটা ঠিক ওজস্ব ভাবে সত্য নয়। কথাটা বস্তুত হ'লে মোটামুটি বলা যেতে পারে—ইহা চিন্তা-জগতে ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট আন্দোলন। নিছক ক্ষত্র-শক্তির একান্ত বা অবিচ্ছিন্ন প্রয়োজন বৈদিকযুগেই অনেকটা ক'মে এসেছিল। সেদিন বেঁচে থাকবার জন্য অন্তর্জগতিতে অস্ত্রোপাধারনা করতে হ'ত, নইলে অগাধ ক্ষত্র্য তাকে গ্রাস করত। অন্যায়-সমস্তা যখন কখন তখন তার মন অল্পকৈ অতিক্রম ক'রে গেল। অল্প-চান্দনাতেই শ্রেষ্ঠতা ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পটীতা নয়; শর তার মনকে ছেপে রাখতে পারেনি—তার মন তখন উঠেছে ভোগে—আর তাই বিশেষ পরিতাপ উপনিষদগুণে। বীর্ঘ্যাক্রমে পৃথিবী যিনি জয় করেন, সকলের রক্ষার ভার বীর—তিনি নিতান্ত জড়-পুত্রগণিকার মত নিজের পরম পরিচায়ের তার একান্ত-ভাবে পরের হাতে ছেড়ে দিতে চাইতেন না। ব্রাহ্মণেরাও জড়তে লাগলেন। তারই পরিচয় বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণের সাহিত্যে পাই। গণ-সাহিত্যে একটা একবারে নতুন জিনিস ঢোকে পড়ে—সমাজে বড় মর্যাদা ব্রাহ্মণের নয়, সে দাবী ক্ষত্রিয়ের। বৃদ্ধ তখন স্বর্গবাসী দেবতা, তিনি যখন মাধব-বৃদ্ধ হ'য়ে জন্মাবেন তো

মাত্র সর্গবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব তো ক্ষত্রিয়বর্গ আর তার শ্রেষ্ঠ বংশ তো ইক্ষ্বাকুবংশেই জন্ম নিতে পারেন। একটা প্রচলিত মতের পরিচয় পাই—শ্রেষ্ঠবর্গ বলতে সেদিনে বোঝাত ক্ষত্রিয়বর্গ। মহাবীরের জন্ম-কাহিনীতে একথা আরও পরিষ্কার হয়। তিনি দেবতাবংশ থেকে ব্রাহ্মণ জন্মভ্রমের দ্বী দেবানন্দার গর্ভে উদ্ভূত হ'লেন। স্বর্গাধিপ শত্রু এ কথা জানতে পেরে শিউরে উঠলেন; নাচবলে জগদগুরু জন্মগ্রহণ করবেন! ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ থেকে জন্ম, ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের দ্বী রিশনার গর্ভে স্থাপিত হ'ল। ক্ষত্রিয়ের ভুলনায় ব্রাহ্মণকে পরিকার নিম্নবর্ণ বলা হ'ল। পালি ভাষ্যকণ্ঠিতে গুণ্যুঃ ৭০০—৪০০ বৎসরের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে ভাল ববর পাই—পণ্ডিতজনেরা এমন কথা বলেন। সেখানে ব্রাহ্মণকে পরিষ্কার বলা হ'য়েছে—হীনজাতি (২১)। সে-সময়কার আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না—কত সহজেই এক বর্ণের লোক অজ্ঞ বর্ণের বৃত্তি আশ্রয় করত আর তাতে কোন টে প'ড়ে যেত না, সমাজের ভাষণ দুর্গতি ও শাস্ত্র মহার হুজ্জ ব'লে কেউ মোকদ্দম হ'তেন না। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন (২২) বিষ্ণু, বাধ্য-বাসবাসী (২৩), কৃষ্ণকার (২৪)। আচার-মহার প্রচলিত নাই, তাও দেখি (২৫)। আজকের দিনের পক্ষে ভারী আশ্চর্য্য একটি কাহিনী আছে—একটি প্রাচীন বৌদ্ধ গুরে (২৬); সেখানে কথা-প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে—ক্ষত্রিয় উত্তরবর্ণ ব'লে, সে নিম্নবর্ণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কন্যা)। বিয়ে ইত্যাদি সব করবে, যদি কোন কারণে সে নিম্ন সমাজভূতা হয়, ব্রাহ্মণ-সমাজে তার কখনও স্থানভাব ঘটেবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণ ব'লে এসব বিষয়ে কোন স্বাধীনতা নেই, নিম্ন সমাজভূতা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়

- ১১। জাতক, ৭২৫৭  
১২। " ৪১৫, ৭২২  
১৩। " ২১৭৭, ৩১৩২  
১৪। " ৪১৫৩  
১৫। " ২১৫৫  
১৬। অষ্টটীক-১-১৩—বীর্ণানিকায়

সমাজে কোন স্থান নেই। এ সকল কথায় কিছু নিতে চান। তার দিনে 'দ্বিতী' ব্রাহ্মণ-সন্তান মাত্রকেই উত্তরের প্রয়োজন হ'ল এ জন্তে—যে, যে 'সনাতন' কথাটিকে (অর্থাৎ ভাব নিয়ে) বীজময় ক'রে কেউ কেউ জপ করছেন এবং অজ্ঞকে সেই পথে দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা এ ভাবকে নানা কারণে বজায় রাখবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু এ ভাবকে যেন সনাতন ব'লে মনে না করে না।

আমার বিশ্বাস তারা সত্যাক্ষিত—সত্যকেই তাঁরা প্রকাশ করেন, তাই কয়েকটি তথ্যও তাঁদের কাছে নিবেদন করছি।

পৌরাণিক যুগ থেকে

আমরা বিশেষ ক'রে আমাদের আদর্শ সংগ্রহ করি। তার পেছনের কাহিনী বড় রহস্যের দৃষ্টিতে চালাই। পৌরাণিক যুগের আদিত —ম হা কা বা। মহা-ভারতকে তো বলাই হয়েছে পঞ্চম দেব। সেখানে সোম-স্বজি বলা হ'য়েছে —ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

সবাই মহ ত'তে জাত, আর তাই তারা সবাই হচ্ছে মানব (২৭)। থাকে বলা হয়েছে ধর্ম্মরাজ সেই বৃষ্ণিটরকে প্রশ্ন করায়, তিনি সবাইকে বৃষ্ণিয়ে বীর আছে, 'দ্বিতী' তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে (২৮)।

১৭। মহাভারত—আদিপর্বে, ৭৫ অধ্যায়।  
১৮। " সত্যাধা নাঃ শীলমদুশ্লবঃ তপো বৃণা।

## রঙীলা নায়ের মাঝি

(ভাটায়াল গান)

জর্জীম-উদ্দীন

ও রঙীলা নায়ের মাঝি,

এই বাটে লাগায় নাও  
লিখুক কথা করা বাও গুন।  
ভাইটাল বুরের সাথে সাথে কান্দে গাঠের পানি,  
ও তার টেট লাগিয়া যায় ভাগিয়া কাখের কলসখানি;  
রঙীলা নায়ের মাঝি।  
পুথালি বাতাসে জোয়ার নায়ের বাদাম গুড়,  
আমার শাড়ীর অঞ্চল পৈরম না ধরে,  
রঙীলা নায়ের মাঝি।  
তোমারনি পুথালি মাঝি হুরিয়াছে কেউ  
কলসী ভাসিয়ে জলে গ'লেছনি টেটে;  
রঙীলা নায়ের মাঝি।

[ এই গানের ধরণকাটি কোনো গ্রাম্য গান থেকে নেওয়া ]

গান্দে কেউ কখনও ব্রাহ্মণ ব'লে গৃহীত হ'বে না, আর এই সূত্রে ব'লে দিলেন সেই প্রাচীন

দুখসে নাগেল স ব্রাহ্মণ ইতি ক্ষত্রিঃ  
(বনপর্ব—১৮০ অধ্যায়)।  
১১। মহাভারত—বনপর্ব, ১৮০ অধ্যায়ে ই কথায় সব জামাভর একবারেই শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে এই বালু—  
শুভে চৈতন্যসেবকাং দ্বিজ ততঃ ন বিভজতঃ  
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো না চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো চ।







## কনকলেখা

## শ্রীনাথবা চৌদুরী

অনেক দিনের কথা। রাজরাজ পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল ও পাটলবৃক্ষ, শমী, অশি ও পানসলা এবং নানাবিধ গন্ধের নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া যে পথেরদ্বারা উন্নতানত ভূমির উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে সেই পথ অতিক্রম করিয়া নগরাত ব্যক্তি পশ্চাত্ বিনা পশ্চিমদিকে বেগানদীর তীরে উপস্থিত হইতে পারিবেন। অপ্রাপ্তমৌবনা কিশোরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, স্বচ্ছলিঙ্গা বোবার ভঙেদে নগরোপকণ্ঠস্থ হুবিলাহ উপবন; তাহার মাত্র এক দেশের প্রতিমূর্তি বোখা নিছের নিখিল বকে অঙ্কিত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। বোবার দ্বারপ্রাঙ্গণ হুবিলাহ উপবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, অন্ধরের অভিভাৱ বেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পদযাত্রকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, পথিক নিছের অজাসারোই দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইতে উপবনের অত্যন্তরে প্রবেশ করেন।

বসন্তলক্ষ্মী আজ উজানের সর্বত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রচুর সহকার-মঞ্জরীর মুহু সৌরত, পল্লবিত অশোক তরুর আমূল-বিস্তৃত প্রবালের ছায় রক্তিন পুষ্প ও শুক পক্ষীর চঞ্চুর ছায় রক্ত বিন্দুগণের বর্ণবিলাস এবং মলয়ানিলে মুহু আদোলিত গুঞ্জ গুঞ্জ ইকং-শব্দর পুষ্পভারে অবনত মাধবীলাতা আঁখ ভাবানু পুষ্পাধারে অর্কনাকালোর হনুনা করিতেছে। প্রবেশ-দ্বারের অন্তিমূর্তির উপরনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবনসংলগ্ন ন্যূনদ্রুমীস্থিরাধী অতিশয় সখ দৃষ্টের মতই একটি দীপিকা, তাহার উন্নত ভূত হইতে ক্ষুদ্রকণিক জল পর্বাৎ মনহ পথক প্রেক্ষমণ্ডিত সোপান-শ্রেণী,—অভিরাগত বসন্তোৎসবের সময়ে স্থলরী তরুণীগণের লাক্ষ্যরাগরঞ্জিত, নৃপদলভ্য চরণের স্পর্শ পাইয়া উঠা উৎসব-সমাগে উপস্থিত নাগরিকগণের উদ্বীভাজন হইবে।

দীপিকার উত্তর দিকে অবস্থিত সোপান-শ্রেণী হইতে যে চম্পকবীণা নয়নগোচর হয়, বিস্মিত হইয়া দৌট ভগবানু পুষ্পাধারে মনিক-প্রাণপ পর্বাৎ বিস্তৃত। এই সেই স্থান যেখানে নানাবিধ প্রাণদমরুজিতোতা উদ্ভা হবোবনা পৌরকজাগণ ব ব প্রাণ-বিষয়ক অভীষ্টসিদ্ধির কামনায় সর্বদা আগমন করিয়া থাকেন। এই সেই স্থান যেখানে বিবহকিষ্ঠা, এককোষীবর, বৈদায়নমপালিকা জনপদবৃথণ প্রবাসী প্রিয়ের সহিত আত্মসমাগম-কামনায় সর্বদা আগমন করিয়া থাকেন। এই সেই স্থান যেখানে বসন্তোৎসবকালে কথাকাবিদগণ দরিদ্র চারুভক্ত, হুমুভ, উদয়ন ও নল্লের প্রণয়কাহিনী বিবৃতির ও বিরহী যক্ষকর্তৃক সন্দর, বদ্বয়ংসল জলধারের দৌত্যবরণ বিষয়ক সমীচীর দ্বারা প্রণয়ী জ্ঞানের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। মন্দিরের তিন দিক্-বেষ্টন করিয়া রক্তশোকের বন, কুসুমাদ্বারের প্রভাববশতঃ দোহেদের অম্বষ্ঠান বাস্তবিকই পুষ্পাধারপুষ্পভবকে বিকসিত। রক্তশোক-বনের অদূরে প্রজলিত অগ্নিব পুষ্পভাববাহী পলাশরক্তের বিস্তৃত বন, দৃষ্টীয় মনে হয় সমগ্র উপবনভূমি নববধুর ছায় রক্তধারে বিভূষিত হইয়াছে। মন্দির-সন্ন্যাসিনে একটি নবীন চতুস্তম্ভ চতুঃপ্রদপ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তা হইতেই স্বপ্নকবিতারদ্বারা প্রিয় অতিথি মুকুরকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। চতুঃস্তম্ভকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া একটি নবযৌবনা মাধবী। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেহ না, “বসিয়া দিলেও মনে হয় যে, মমুসমা উপস্থিত ও বসন্তোৎসবের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে।

আজ ত্রিদি-পুষ্পা উপলক্ষে মন্দির-সদ্যার করিবার জন্ম মন্দির পরিচারিকা পল্লবিকা অতি প্রত্যুষেই বোধানীতে ধান্য গমন করিয়াছিল। প্রত্যাগমন-কালে উপবনপ্রান্তে শ্রেণী কুবেরভেদর প্রাণধরগণা কন্ডা কনকলেখার প্রিয়সখী নাগবল্লীর সঙ্গে তাহার নিত্য

অপ্রত্যাশিত ভাবেই সাক্ষ্য হইল। নাগবল্লীকে এইরূপ প্রত্যুষেই উপবনে সমাগতা দেখিয়া পল্লবিকা মনে মনে বিতর্ক করিল,—

—ইনি এখনও প্রিয়সমাগমরহিতা বটেন, কিন্তু পৌরবর্ণও অবগত আছেন যে, প্রিয়সখী কনকলেখার পরিণয় না হইলে ইনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন না। এদিকে কনকলেখার অনেকিক রূপরাঞ্জিই তাহার প্রিয়সমাগম বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। উত্তার যোগ্যপাত্র পাঁজা হুকটীন জানিয়া শ্রেণী কুবেরভেদর চেষ্টার ফলটি করিতেছেন না। কিন্তু কনকলেখার বিষয় পণ যে, রূপে তাহার যোগ্য পতি না পাইলে তিনি চিরকুমারী থাকিবেন। ভগবানু প্রজাপতি একরূপ রূপতী কন্ডার প্রতি এখনও অপ্রসন্ন কেন তাহা তিনিই জানেন। সে যাহাই হইক নাগবল্লী প্রিয়সখী-বিনীনা হইয়া একাকিনী উপবনে উপস্থিত কেন জানিতে,কৌতুহল হয়।

প্রকৃষ্টে যোগ্যপুরুষ কুশল-প্রসের পর পল্লবিকা জিজ্ঞাসা করিল,—পুঞ্জীনা কনকলেখার প্রিয়সখী কি বসন্ত-বিভব দর্শনার্থ উপবনে পদাণ্ণ করিয়াছেন?

নাগবল্লী দর্শনমাত্র তরুণীজনের আশ্রয়ল ভগবানু পুষ্পাধারে মন্দিরে প্রণয়-কথাবিৎ পরিচারিকা পল্লবিকাকে কুশল সম্ভার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখন পরিচারিক প্রসের উত্তরে বলিলেন,—

—বসন্ত-বিভব দর্শন করিবার উপলক্ষ সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে। এদিকে উৎসব-দিবসও আগত-প্রায়। কিন্তু ভগবানু অংগমালী এসে হাজিরে দ্বারা দিগ্ভ্রম উদ্ভাসিত করিবার পূর্বেই আজ আমি নিত্যন্ত স্বার্থপ্রাণবিত হইয়াই উপবনে উপস্থিত হইয়াছি। প্রিয়সখী কনকলেখা ‘শ্রমদ-পতিভাভ’ তেরে নিয়ম গ্রহণের জন্ম আর কিয়ংকাল মোহাই ভগবানু কুসুমাদ্বারের মন্দিরে আসিবেন। মন্দিরাধ্যক্ষক এবিধের অবগত করিবার জন্ম আমি প্রিয়সখীর আগমনের পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছি।

নাগবল্লীর উপবনে আগমনের কারণ অবগত

হইয়া পল্লবিকা বলিল,—এদিকে আশ্রম, আপনাকে মন্দিরাধ্যক্ষের সমীপে গমনের পথ প্রশ্রয় করি। নাগবল্লী পল্লবিকার প্রদর্শিত পথে তাহার পশ্চাত্ পশ্চাত্ অগ্রসর হইলেন। মন্দির-সন্ন্যাসিনে গিয়া ভগবানু পুষ্পাধারকে মাটায়ে প্রণিপাত করিলেন। তারপর মন্দিরাধ্যক্ষের নিকটে স্বীয় জাগমনের হেতু ব্যক্ত করিয়া কনকলেখার আগমনের অপেক্ষার দীক্ষিকার প্রস্তরসোপানমূলে অবস্থান করিবার বাসনায় চম্পকবীণাধিপতি দীর্ঘে দীর্ঘে হৌর হৌর হইলেন।

ইতাবসরে ভগবানু সহপ্রদর্শির সহস্রধারার মান করিয়া উপবনভূমি অপূর্ণ শ্রী দারণ করিয়াছে। শীতাপগমে স্বীয় কণ্ঠধর পুনঃপ্রাণ হইয়া উপলক্ষ সময় ব্যুত্থাই বেন পিকরাজও বেরদারক-সুন্দর নিবিড় পল্লব-গুণ মধ্যে আপনাকে লুকাইতে রাখিয়া উচ্চ কুণ্ডলনি দ্বারা বসন্তোৎসবের হচনা করিতেছে। কিয়ংকাল অপেক্ষা করিতে না করিতেই নাগবল্লী দেখিলেন, পরিচারিকা মানোহারিকার দ্বারা অম্বুহতা হইয়া মুর্তিমতী বসন্তলক্ষ্মীর ছায় প্রিয়সখী কনকলেখা মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতেছেন। কনকলেখা মন্দির-প্রাণে উপস্থিত হইতেই হইবেবী শমলরী উপবনভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন মনে করিয়াই বেন পিকরাজ সময়ে মৌনাবগমন করিল। এদিকে মলয়ানিলের সহায়তায় প্রথমলক্ষ্মীও অসম্ভা মাদ্যপুষ্পের উপলোভনে প্রদান করিয়া তাহার প্রতি বহুমান প্রশ্রয় করিলেন। তখন শুকপিঙ্করং নীল-গুপ্তবহ-পরিহিতা কনকলেখা চরণে মরকত-নুপুর, নিত্য পল্লবামণি, প্রকোচে মণির বলয়, কণ্ঠে পরিদৃষ্ট মুক্তার হার, শব্দে রত্নকুণ্ডল দারণ ও কুটিল অলকমানী মূল্যভালে অধিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে অচিরাবগত মল্লুচুতমঞ্জরী গ্রহণ করিয়া মন্দির-হারে উপস্থিত হইয়া পুঞ্জীনা মন্দিরাধ্যক্ষ কল্যাণীনা কনকলেখার ‘স্বখে আগমন হইয়াছে’ ইত্যাদি কুশল-প্রণয় করিলেন। কনকলেখা ভক্তিপূরক ভগবানু পুষ্পাধারে উল্লেখ্য প্রণাম করিয়া মন্দিরাধ্যক্ষকে প্রণাম করিলেন।



তপের চিত্রিত কন্দর্পের অর্জনার্ণ মন্দিরভাঙের প্রবেশ করিলেন।

শুদ্ধসেহে, শুদ্ধবাসে ও ভক্তিপূজিতের রক্তাশোক-গন্ধ, কুসুম, চন্দন, নীপ, অশুর ও ফৌম বস্ত্রের দ্বারা চিত্রিত কন্দর্পের বিবিধত অর্জনা করিয়া চুমকজরীর অঞ্জলি প্রদানপূর্বক কপোতহস্ত হইয়া “নমো ভগবতে মকরমুখার” বলিয়া প্রণাম করিলেন ও মনে মনে বলিলেন,

—ভগবান! দক্ষলগ্নে! দানীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রই তাহার বাসনাশূন্য রূপবান্ পাঠকে তোমার পাচটি কুম্ভবাসের যেকোন একটি দ্বারা আহত করিয়া সমুখে আনিয়া দাও।

তারপর প্রভের উপাস্য-পালন সধকে যথাবিধ উপদেশ গ্রহণ করিয়া লণ্ডনদিক্ষেপে মকরকৈতুর জগজ্জিহ্বিনী সন্ধ্যারিণী পতাকার মতই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্বর্বার সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে মধ্যাহ্নকাল সমাপ্তপ্রায়। হৃদয়দেবের প্রবর কিরণবর্ষণ হেতু চরাচর উজ্জ্বল হওয়ায় আতপশান্তি পক্ষিফুল, পশুসকল, ও পখিকজন বৃক্ষজারায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ম ইতরতঃ ধাবমান। এই সময় বৃক্ষকায়, কষ্টপরিহৃত পুরুষের পক্ষেই পথে গমন করা প্রশংসনীয়; কেমলাঙ্গী, সর্বস্বত্বসেবিতা, বেশমাত্রের অনভ্যাস। তরলীজনের তো কথাই নাই। মন্দির হইতে কিয়দূরে গমন করিবার পর কনক-সেখার মুখকান্তি ছিন্নবস্ত্র নবমন্দিরকার ছায় ম্রিয়মাণ অবলোকন করিয়া মনোহারিকা নিবেদন করিল,

—তাদুরাণি, মন্দিরে পূজার্কনার কাজে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়াতে এদিকে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, পথে চলিতে আপনার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। আমাদের নিবেদন, আপনি ও অর্ঘ্যা নাগবল্লী উপবন হইতে বহির্গমনের দ্বারের সন্নিবিষ্টত মাধবীমণ্ডলমধ্যে বিশ্রামস্থ উপভোগ করুন। ইতিবসরে আমি গৃহে গমন করিয়া হস্তিপককে সংবাদ দিতেছি, সে সন্ধ্যায় হইয়া ঠাকুরাণীর প্রিয়হস্তী বিতাড়ককে

আনয়ন করিলে তাহার পৃষ্ঠে স্বধাসীন হইয়া বিনামূল্যে গৃহে গমন করিবেন।

কনকলেখা শিরসকালনের দ্বারা মনোহারিকাকে এইরূপে করিতে আদেশ করিয়া নাগবল্লীর সহিত লতাগৃহের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অতি রমণীয় এই মাধবীমণ্ডল। লতামণ্ডলের চতুর্পার্শ্বে বহুসংখ্যক শোভাজন তরু মুহূর্ত্তে পুষ্প বিসর্জন করিয়া ভূমিতল আচ্ছন্ন করিতেছে ও অসংখ্য মধুমক্ষিকা অবিরাম শুল্কন করিয়া মধুধান করিবার জন্ম চঞ্চলভাবে একবার ভূমিতে ও একবার তরুশিরে উড়িতেছে। ছুইটি প্রিয়দুলতা লতামণ্ডলের দ্বার-সন্নিহিত ছুইটি তরুণ তম্বুল বৃক্ষকে শিখিল ভাবে বেষ্টিত করিয়া তাহাদের শিরোদেশ পর্যন্ত উঠিয়াছে, তারপর স্ব স্ব পুঞ্জিত অগ্রভাগকে শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া বিনা অবলম্বনে অস্বাভাবিক প্রসারিত করিয়া যেন মুখ বন্ধ করিয়া প্রণয়বতী ঋণ্ডিতা নারিকার মতই, তরুকে বলিতেছে,—“তোমার মত দাক্ষিণাহীন শঠ নায়কের মুখ আর দেখিব না”।

লতামণ্ডলের উপরিভাগ রক্ত ও নুসরবর্ণ অসংখ্য মাধবীপুষ্পগুচ্ছে আবৃত হওয়ায় প্রবালাদি বিভিন্ন মণিখচিত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত এক শিলাপাঠ। মরকত শিলাসদৃশ ঐ মানোহার শিলাপাঠে উপবিষ্ট হইয়া আতপশান্তির অভিজ্ঞানে কনকলেখা প্রিয়দ্বন্দ্বীর সমভিব্যাহারে মাধবীমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লতাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কনকলেখা শিলাপাঠের দিক দৃষ্টিপাত করিলেন। রানি দুল্লভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, মহত্ত্ব-সমাগম বশতই হউক বা মণিবস্ত্র ও মরকত-নুপুদের নুপুর শিঞ্জনর জন্মই হউক তাহার লতামণ্ডলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিলাপাঠে শায়িত এক অতি সুন্দর আকৃতির কুমার নিম্নোক্ত বাল্কির ছায়া শিলাপাঠ ভাগ করিয়া উথিত হইলেন। নাগবল্লী প্রিয়দ্বন্দ্বীর ব্রতগ্রহণের অন্তরালে মাধবী লতামণ্ডল মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব, কন্দর্পের

তুল্য রূপবান্ পুরুষকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে হয়। ইনি কি স্বয়ং ভগবান্ কুসুমায়ুধ বসন্তোৎসব এইরূপে উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিলেন, সমাগত দেখিয়া মানবদেহে ধারণ করিয়া ভূতলে—এই রূপবান্ কুমারকে নবাগত বলিয়াই মনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র যদুজ্ঞ।



মাধবীমণ্ডলে কনকলেখার সহিত কুমারের সাক্ষাৎ



ভ্রমণ করিতে করিতে রাস্তা হইয়া এই লতাঝিতানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা ইহাও কি সম্ভব যে, প্রিয়সখীর কাতরতা সন্দেহনৈ বাহিত্তিভিন্ন মনোভব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এই নবীন পুরুষ হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? কিংবা এত বিতর্কই বা কাজ কি? ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই তো সমস্ত রহস্য অগতঃ হওয়া যাইবে।

নাগবল্লী মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন এমন সময়ে—“অনিচ্ছাপূর্বক আপনাদের নিকট অপরাধী হইয়াছি, অপরাধী জন অপসৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়”—এই প্রকার বলিয়া পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবেই যেন অপরিচিত পুরুষ লতাঝিতান হইতে অপসৃত হইলেন, পরিচয় গ্রহণ জ্ঞ উদ্ভব-প্রবৃত্তি নাগবল্লী চিত্তাধিপতির জায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।

লতাগৃহে এইভাবে তৃতীয়-বাঙ্কি-জ্ঞ হইলে নাগবল্লী প্রিয়সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কনকলেখাও গহাবিষ্টার জায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন,—

—সখি, আমি কি স্বয়ং সেবিতেন্দ্ৰিয়ান অথবা এখানে সতাই কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন? আমার মনে হইল, রাস্তাভিনয়কন যেন ভ্রান্তজ্ঞা হইয়া লগ্নে আমি এক কর্মপরাক্রান্ত নবীন পুরুষের সাক্ষ্য লাভ করিলাম। তাঁহার দর্শনমাত্র আমার সর্বাঙ্গ অশাস্তিভরপূর্ণ এক মধুর রসে সিক্ত হইল। মনে হইল, ইনিই বৃষ্টি আমার জন্মান্তরের দয়িত। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পেলোম। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই দেখি তিনি অগুহিত হইয়াছেন। সুখি, আমার পদযাত্র এখনও কপিত, দেহ পান্যবস্তুপূর্ণের জায় গুরুভার বলিয়া মনে হইতেছে। সখি, আমি সতাই কোন দেহধারী ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, না এটি ভগবান? কুম্ভমায়াবের মামামাজ? এ ব্যাপার ভগবান কুম্ভমায়াবের মায়া হইলে তাহাকে অতি নিম্নরূপ বলিতে হইবে, কারণ—

এই পৃথগন্ত বলিয়াই বিচলিতচিত্তা কনকলেখার আর বাক্যানিসরণ হইল না, তাঁহার নয়নমুগ্ধ হইতে অবিরলধারা অক্ষ বিপ্লবিত হইতে লাগিল। নাগবল্লী প্রিয়সখীর এইরূপ বিষম ভাবাবহক দর্শনে অতিমাত্রা চিন্তিতা ও ব্যাকুলা হইলেন। অপরিচিত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমর্থক উত্তম কেন প্রকাশ করেন নাই, এই ভাবিয়া এখন আপনাকে দিক্কার দিতে লাগিলেন। একাক্ষে তাঁহার দৃষ্টিসার্থ্য বলিলেন,

—প্রিয়সখি, ক্ষমতাপূর্বক যে রূপবান পুরুষ এই লতাঝিতান হইতে অপসৃত হইলেন তিনি ভগবান কুম্ভমায়াবের শরীরী মায়া নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিমূঢ়াতাপ্রমুগ্ধই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা গটে নাই। প্রিয়সখি, আমার আশা হয় তোমার “হৃদয়-পতিভাষ্য তব” সঙ্গই ফলপ্রসব করিবে। কারণ, সেই রূপবান অপরিচিত নবীন পুরুষের ব্যবহার দৃষ্টে মনে হইল মদনশ্রব-প্রধারে অশিশয় কাতর হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাতেই তিনি এখানে হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষুধ্বংস ওৎস্রক-মুগ্ধ ও গমনভঙ্গী দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির জায় হইয়াছিল। রাস্যবচনিত ব্যক্তি ব্যতীত এইরূপ ব্যবহার আর কহাতে সম্ভব? আর কেনই বা না হইবে? একে রূপাতিশয়া, রূপাতিশয়ের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকৈতন, মকরকৈতনের সহায় মধুমা, মধুমাতে সহায় নিহত মাধবীমগুণ। তুমি যে ভাগ্যবান ব্যক্তির নয়নপথের অতিথি হইয়াছ, তিনি পদ্মবাসের লক্ষ্যভূত বিষয় হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নাগবল্লীর আশাসবাক্যেই হউক বা স্বীয় চিত্তের চাক্ষুয কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক কনকলেখা ক্রিয়ন্ত্রিতভাব ধারণ করিয়া নাগবল্লীকে বলিলেন,

—প্রিয়সখি, তুমি আমাকে তোমার প্রাণরক্ষণ জ্ঞান কর, তাবৎ লোকেও তাহাই জানে। যদি একসঙ্গে তোমার ও আমার প্রাণরক্ষা করিতে চাও

তবে শীঘ্র যে অপরিচিত যুবাধিকৃষ দর্শনমাত্র আমার দ্বন্দ্ব পূর্বক অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন তাহাকে ধৃত করিবার ব্যবস্থা কর।

নাগবল্লী মনে মনে চিন্তা করিলেন,  
—অহো, মকরকৈতন কি অদ্বুত প্রভাব! কোথায় ঐখণ্য ও রূপের যৌবনে অস্বস্ততা, প্রোত্ত্বলুপতি কুবেরদত্তের নয়নানুরাগিণী প্রণয়-বাণীপরে উদাসিনী কনকলেখা, আর কোথায় দর্শনমাত্র এক অদ্বুতপূর্ব, অজ্ঞাত-কুলশ্রী যুবাধিকৃষকে সামান্য রমণীর জায় প্রণয় নিবেদন করিতে সমুৎস্রক প্রিয়সখী!

একাক্ষে তিনি বলিলেন,  
—প্রিয়সখি, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে অবহিত হইব, কারণ, আশ্বপ্রাণ রক্ষণ কে না প্রবৃত্ত করে? কিন্তু কিরূপে এই দ্বন্দ্বের কার্য্য উদ্ধার করা যায়, তাহাই চিন্তা করিতেছি। পিতামাতার অজ্ঞাতসরে আমাদের পক্ষে একজন অপরিচিত পুরুষের অহমজ্ঞানের জ্ঞ প্রবৃত্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনোহারিকা এইরূপ গুরুতর ও গোপনীয় কার্যের ভার বহন করিতে সমর্থ কি না সন্দেহের বিষয়। মনোহারিকার হস্তপকের সহিত প্রজ্ঞাভগমনের সময় হইয়াছে, সে প্রজ্ঞাত হইলে এ বিষয় নিশ্চিতরূপে অবগতি হইবে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, মনোহারিকাকে এ কার্যের জ্ঞ নিযুক্ত না করিয়া আমাদের উভয়ের বিশেষ প্রণয়ধারী বিভ্রমসেনার উপরে এই কার্যের ভার অর্পণ করা সমর্থক উচিত। রূপে ও ঐর্ষ্যে বিভ্রমসেনা এ নগরীর শ্রেষ্ঠ বারবিগাসিনী। কতক বা অলৌকিক রূপের জ্ঞ, কতক বা চক্ষুধ্বংসকলায় অসাধারণ পারদর্শিতার জ্ঞ, কতক বা অজুলা ঐর্ষ্যের জ্ঞ, কতক বা মূল্যহত-দান-শীলতার জ্ঞ বিভ্রমসেনার খ্যাতি বহুবিস্তৃত। এ কার্যের একদিকে ধনী, বিলাসী নাগরিকগণ ও অপরদিকে বহু উচ্চপদাঙ্ক রাজপুরুষ তাহার অস্ত্রগ্রহপ্রার্থী, এবং রাজা স্বয়ং তাহাকে হেথ করেন। গুপ্তমৌলদক বহুসংখ্যক ধী ও পুরুষ তাহার অগ্রগ্রেহে জীবনব্যথা

নির্বাহ করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি সহায় হইলে সেই অপরিচিত পুরুষ পাতাকাগড়ে লুপ্ত হইলেও তাহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না।

প্রিয়সখীর এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কনকলেখা নিবিরক্তিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লতাগৃহের অনতিদূরে মধ্যরূপ-কণ্ঠস্বনি শ্রুত হইল। উভয় সখীই উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিলেন—  
“এই দিকে, এই দিকে, ঠাকুরাণী এই লতাকূটম মধ্যে প্রিয়সখীর সঙ্গে অবস্থিত রহিয়াছেন।” কিয়ৎকাল মধ্যেই মনোহারিকার অহমসরণ করিয়া হস্তপক লতাগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কনকলেখা ও নাগবল্লীকে অভিভাবন করিয়া, “ভট্টারিকার প্রিয় হস্তী তাহাকে বহন করিবার জ্ঞ প্রবৃত্ত হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে” এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিল। মনোহারিকা নিবেদন করিল,

—ঠাকুরাণী, আপনার ও আমাদের পূজনীয়্য মাতা ঠাকুরাণী বহুক্ষণ আপনার অদর্শনে চিন্তিতা হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জ্ঞ আদেশ করিয়াছেন। অতি শীঘ্র গৃহে যখন করিয়া আপনি তাহার দৃষ্টিস্তার নিযুক্তি করুন।

ইহা শ্রবণ করিয়া কনকলেখা প্রিয়সখীর প্রতি জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি নিষ্পেক্ষ করিলেন। নাগবল্লী বৃহৎ স্বরে বলিলেন,—গৃহে প্রভাগত হইয়া মাতার দৃষ্টিস্তার নিযুক্তি করা আমাদের আও কৰ্তব্য।

তখন মনোহারিকা ও হস্তিপদক পশ্চাদ্ধবতী করিয়া উভয় সখী মাধবীপুগ হইতে বির্ণিত হইলেন। লতাগৃহের শীতল ছায়া হইতে বাহিরে পদাৰ্পণ করা মাত্র মনে হইল, মাধবীপুগ ও চূত-মঞ্জরীর প্রতি শ্রুত করিয়াই যেন যুগ্মদেব প্রাণ্ড কিরণজাল বর্ণণ করিয়া চরাচরকে ধ্বং করিতে উত্তত হইয়াছেন। অদূরে কনকলেখার প্রিয় হস্তী বিটভাঙ্ক দ্বন্দ্ব গাভান্দোলন করিতে করিতে শোভাজন রুক্মের শাখা উপবিষ্ট একটি ছুই মর্কটকে তত্তের দ্বারা তাড়না করিতেছে। গাভান্দোলনের সঙ্গে তাহার নেকের ছুই



পার্শ্বে রক্ষণ সহিত আবদ্ধ ঘটায় হইতে প্রতিরক্ষক পলিন উৎপাদিত হইতেছে। পুরোবিত্তিনী কনকলেশাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ বৃহত্তরপলিন দ্বারা বিটাভাঙ্কক স্বামিনীকে সন্তান করিল, শোক-সমাগম দর্শনে ঐ চুই শাখাঘটিত ও একমুখে শাখাভূত প্রাধান্য করিল। হস্তিপকের ইঙ্গিতমাত্র বিটাভাঙ্কক সমুদয়ে চুই পদ সন্নিবিষ্ট ও পশ্চাত্তরে চুই পদ প্রসারিত করিয়া উপবিষ্ট হইল, মনোহারিকার সাহায্যে কনকলেশা ও নাগবল্লী তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হুকোমল আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর হস্তিপক বখানোয় আসন গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করা মাত্র বিটাভাঙ্কক সাবানে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুগতিতে উপনবহুনি অতিক্রম করিয়া হস্তিপকের নির্দেশক্রমে নগরভিত্তিকে গমন করিতে লাগিল।

নগরীর উপকণ্ঠস্থিত উপনবহুনি হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ ভগবান্ জ্যোৎস্নকের মনিরাভিমুখে গমন করিয়াছে সেই পথের দক্ষিণপার্শ্বে মন্দির পর্য্যন্ত গমন করিবার পূর্বেই একটি প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাসাদের সমুদয়ে বৃহৎ দ্বার ও তত্তপ্তর হস্তিচরনির্মিত উন্নত তোরণ, তোরণের উপরে বায়ুবেগে পলপত শব্দে উড়মান একটি সৌভাগ্য-পতাকা। একটি মল্লিকার মালা তোরণের শিরোদেশ হইতে বিলম্বিত। নগরীর অন্তরঙ্গ-রক্ষণা অতিপ্রসিদ্ধা বারবিলাসিনী বিভ্রমসেনার আবাস-ভবন এইট। ভগবান্ সহস্রবহিরি কিরণজাল ধরাগত পরিভাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কমগনন, অসীমশক্তি-সমুদয়ের শিখর, তদ্রূপিত ও বসন্তবে পল্লিত-শব্দে আরোহণ করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিত হইয়াই অস্ত্রাচলের গুহামধ্যে অস্থিত হইলে নগররক্ষী প্রহরী সৈন্যল শালগহবে রাজপথে বহির্গত হইবার পূর্বেই মনোহারিকাকে পার্শ্ববর্তিনী করিয়া নাগবল্লী হস্তিচর-নির্মিত তোরণ-বিশিষ্ট দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রিয়সখীর কার্যবাপদেস্তে বিভ্রমসেনার ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র একটি পরিচায়িকা পথ প্রশর্শন করিয়া নাগবল্লীকে স্বামিনীর সমীপে লইয়া

গেল। বিভ্রমসেনা তৎকালে সঙ্গীতশাখায় অবস্থান করিতেছিলেন, পরিচারিকার প্রদর্শিত পথে দগমগত তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটি বৃহৎ কচ্ছা, বেণু, বীণা, মুরঙ্গ ইত্যাদি নানাবিধ বায়নয় নইয়া চতুর্দিকে বেঠন করিয়া রহিয়াছেন, মধ্যস্থলে মণিময় মহার্ঘ আসনে বিভ্রমসেনা উপবিষ্ট। তাহার ও সহচরী-বর্গের উজ্জল অঙ্গরাগে ও নানা অলঙ্কারের দ্ব্যতিতে কক্ষটি অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। স্বতঃপ্রবাহিত মলয়ানিলকে শৈত্য-প্রদানার্থ সঙ্গীতশাখার শব্দ-নির্মিত গবাকগুলিতে জলপূর্ণ স্বর্ণবল্লস স্থাপিত রহিয়াছে ও একপার্শ্বে রক্ষিত স্বর্ণাধার হইতে উদ্গত পুষ্প ও কাব্যজর স্বর্ণকে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত। কক্ষটির ভিত্তিগারে বিভ্রমসেনার বহুতাপ্তিত কয়েকখানি চিত্র।

নাগবল্লী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করামাত্র তাহাকে সপ্রথম আগিল্লনের দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় গলদেশস্থিত কুবচক-মালা তাহার গলদেশে জড় করিয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বিভ্রমসেনা যথাবিহিত কুল-প্রদর্শিত করিলেন। তখন নাগবল্লীর নির্দেশ-ক্রমে মনোহারিকা স্বীয় বস্ত্রান্তরাল হইতে একটি স্বর্ণপটোকা গ্রহণ করিয়া নাগবল্লীর হস্তে অর্পণ করিল। কনকলেশার অস্বীয়-মুদ্রায় মুদ্রিত ঐ পটোকাটি নাগবল্লী, “প্রিয়সখী যে সামান্য প্রণয়োপহার প্রেরণ করিয়াছেন সেটী গ্রহণ কর” এই বলিয়া বিভ্রমসেনার প্রসারিত হস্তে স্থাপন করিলেন। কনকলেশার প্রেরিত প্রণয়োপহারের বহুগোবর করিয়া বিভ্রমসেনা পটোকা উন্মোচিত করিয়া তন্মধ্যস্থিত বসন্তবে প্রস্তুত স্তম্ভ কুল ও পাণ্ডদেশে প্রস্তুত কোমবস্ত্রবৃণ, তাম্বল-বীটিকা, চন্দন, কুহুস্ত, অলঙ্কৃত ইত্যাদি বিবিধ অল্পলেন-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া হরিতচিত্তে সহচরী-বর্গকে প্রদর্শন করিলেন। কিয়ৎকাল নানা বিষয়ক বিবিধ আলাপের পর স্বীয় আশ্রয়-প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে অন্তিমায়ী হইয়া নাগবল্লী ইঙ্গিতের দ্বারা বিভ্রমসেনাকে জ্ঞাপন করিলেন যে,

সহচরী-বর্গের সেই কক্ষ ত্যাগ কর। আবশ্রুক। বিভ্রমসেনা তাহার অভিপ্রায়ভূমিতে সহচরীগণকে বিশ্রাম গ্রহণের জ্ঞ আদেশ করিলেন; সহচরীগণ ও মনোহারিকাও কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। এইরূপে সঙ্গীতশাখা চতুর্দিক ব্যক্তি-বর্জিত হইলে নাগবল্লী প্রিয়সখী কব্জক “স্বকর-পতিলাভ ব্রত” গ্রহণ করা হইতে বিশ্রামার্থ লগ্নাতিতানে গমন, তথায় অপরিতিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাকে দর্শন করিয়া প্রিয়সখীর ভাবান্তর, অপরিতিত পুরুষের অন্তর্ধান ও প্রিয়সখীর কাতরতা ও ভাবান্বয়ক ও স্বয়ং তাহাকে আশ্বস্তকরণ পর্য্যন্ত তাবৎ বৃহত্তর বিভ্রমসেনার শ্রবণ-গোচর করিলেন। তারপর বলিলেন,

—প্রিয়সখীর কন্দর্পরোগের আরম্ভ হইতেই যেক্রপ কোপক দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় অবিলম্বে রোহ-শাস্তির বাবস্থা না করিলে তাহার জীবিতাশা থাকিবে না। তাহার জীবন গত হইলে এক সঙ্গে তাহার সেহময় পিতামাতা ও এই ব্যক্তির জীবনও গত হইবে। এতগুলি প্রাণিকে অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় একমাত্র তোমার হস্তে, এই বিবেচনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাদের প্রতি তোমার দ্বারস্থিত প্রণয় যে-পথে তোমাকে চালনা করে সেই পথ অবগমন কর।

নাগবল্লীর এই বিবরণ শ্রবণ ও কাতর ভাব অবলোকন করিয়া বিভ্রমসেনা, “অসীম প্রভাবশালী মকরকটুর জ্বর হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভগবান্ পুষ্পাধিপের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন ও তৎপরে মুহূর্ত্ত করিয়া বলিলেন,

—সখি, প্রথম-ব্যাপারে দৈর্ঘ্যহারা হওয়া যৌবনের পক্ষ, সুতরাং প্রিয়সখী কনকলেশা সহজেই ব্যাকুল হইয়াছেন। সেহ অন্তর্ভুক্তি প্রথমে চিন্তা করে, এজ্ঞ তোমরাও অহিত আশঙ্কা করিয়া কাতর হইয়াছ। সে বাহা হউক কনকলেশা আমার পরিষে প্রণয়ভাজন, তাহার প্রয়োজন সানধারণ আমি অবজ্ঞা আশ্রয়যোগ্য করিব, ভগবান্ মকরকটু আমার সহায় হউন।

কিয়ৎকাল এবিধে কি কব্জা তাহা আলোচনার পর বিভ্রমসেনা নাগবল্লীকে এই মন্ত্রে উপদেশ দিলেন, কনকলেশা চিত্রকক্ষে অসাধারণ পারদর্শিনী, এবিধে তাহার খ্যাতি বহুব্র পৃথগ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি, যে অপরিতিত পুরুষ বিনামুদ্রিত তাহার চন্দ্র অংশেরণ করিয়াছেন, তাহার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলে আমি আমার বাজীকতা, অতিমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী চতুরিকার নিকট উহা দিব। চতুরিকা নগরধাক্কের অধীন গোপ ও স্থানিকগণের নিকট নগরহ তাবৎ পার্থন্যবাসে একত্র কোন নাগপত আছে কি না ও মুদ্রাধাক্কের নিকট নগরে এক্ষণ আত্মবিশিষ্ট কেহ আমনন করিয়াছেন কি না অহুসমান করিয়া সে-ব্যক্তির পরিচয় ও বাসস্থান আবিষ্কারের জ্ঞ সচেত হইবে। কনকলেশা আমার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আশ্রয়িত হউন, আমার হইয়া এই কথা তাহাকে বলিবে।

নাগবল্লীকে এইরূপ পরামর্শ প্রদানান্তর বিভ্রমসেনা একটি রত্নচক্র স্বর্ণ-মুদ্রায় মহাঘ বস্ত্রগুণ, তাম্বল-বীটিকা ও চন্দনাদি অল্পলেন-সম্রা রক্ষা করিয়া স্বীয় অস্বীয়-মুদ্রায় স্বর্ণ-মুদ্রা মুদ্রিত করিয়া কনকলেশাকে প্রণয়োপহার স্বরূপ দিবার জ্ঞ বাজীকতা চতুরিকার হস্তে তাহা অর্পণ করিলেন; চতুরিকাও নাগবল্লী ও মনোহারিকার সমভিবাধারে বিভ্রমসেনার ভবন হইতে বহির্গত হইয়া শ্রেষ্ঠ কুবেরদন্তের গুহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

উপযুক্ত গুণের নিকট কনকলেশা বিশিষ্ট বংশের কস্তাগণের প্রয়োজনীয় নৃত্য, গীত, বাজ ও চিত্রকলা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকলের মধ্যে চিত্রকলায় তিনি অনন্তসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করায় তাহার, গুণের যশোরাশি বিশেষরূপে বর্ধিত হইয়াছিল। কারণ, মেঘের সলিল যেমন সাগরস্থিত তন্ত্রিত পতিত হইলে যুক্তরূপে পরিণত হয়, তক্রপ শিক্ষকের শিল্প সংগোষে অর্পিত হইলে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি, অপরিতিত নবীন পুরুষ



যে একবার মাত্র কনকলের জ্ঞাত হইবার দৃষ্টপথে পতিত হইয়া তাঁহার মনে কুমারীজন-বিক্ষুব্ধ ভাব সঞ্চারিত হইবার কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিক্রিয়া অক্লিত করিয়া স্বয়ং বিজয়সেনার হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু কনকলেখার এই আশ্চর্য্য বহিষ্কারণে নৈপুণ্যই বর্তমানে অভাবনীয় রূপে তাঁহার অতিমাত্র ধৈর্যের কারণ হইল; বাহ্যক্ষে একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন চিত্রপট হইয়া সেই ব্যক্তি বহু পরিচিতের ছায় অহুভাবিত হইলেন, একজু চিত্রপটট হ্রদয়ের আশাসকর না হইয়া অন্তরহিত বিরহ-বাবাকে অবিকৃতর সজীবিত করিয়া তুলিল।

২

উপনিবেশ, প্রভৃৎশলি। হৃদয়ী বেণা ও তাহার ভূতদেশস্থিত উপদন আজ বসন্তোৎসব উপলক্ষে অপরূপ দীপ্য ধারণ করিয়াছে।

ভগবান্ কুম্ভমাধ্যের আরাধনার নিমিত্ত কুম্ভস্থবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, কর্ণে কর্ণিকার ও অলকে অলোকশোভন অশোক ও নবমল্লিকা, পাশিথয়ে মৃণাল-বলর, কণ্ঠে মূল্যমান ও অলঙ্কর-রঞ্জিত চরণে কিতকর নুদ্র ধারণ করিয়া সহকার-মঞ্জরী হস্তে সূর্যমতী যৌবন-মঞ্জীরে গায় কুমারীসকল; কুম্ভমাধ্যের রঞ্জিত বস্ত্রে বক্স আচ্ছাদন করিয়া জ্বলনসেবে কাঞ্চীদাম, বক্ষে খেতন্দন-লিপ্তহাথ, বাহুতে মণিময় অঙ্গদ, প্রবণে তালগড় আভরণ, কেশকলাপে কুণ্ডলক ধারণ এবং মুখমণ্ডলে লোজরেণু বিলেপন ও তিলক রচনা করিয়া রক্তাশোকের গুচ্ছ হস্তে গলিতবর্ণনিভাগণ; মূল্যভাণ্ডার কবরী, নয়ন অজনে, অধর লাক্ষা ও মণ্ডুখে রঞ্জিত করিয়া মধুপানে মত্তা সুবর্ণ-মুগ্ধক-হস্তে বিলাসিনীসকল এবং মস্তাপানে অলম্বনময়, নৃত্যপারায়ণ, শ্রবণে কুণ্ডল, বাহ ও কটদেশে স্বর্ণালঙ্কার ও বক্ষে মণিময় হার ধারণ করিয়া, উদান হস্ততাল শব্দের দ্বারা চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তরুণ নাগরিকজন উপবনে আগমন করিয়াছেন।

ভগবান্ পুষ্পাধ্যের মন্দির-সমীপে মধুর উদক-বাণ হইতেছে। প্রথমে প্রাকৃত-কবিরচিত ও মধুর বিশদীক ও গাহিতে গাহিতে বিলাসিনীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আবির্ভাব ও কুম্ভমাধ্যের দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাধ্যের অর্চনা করিলেন। তৎপরে নগর-কবি-প্রথিত স্তম্ভমধুর ললিতপদাবলীকৃত গাহিতে গাহিতে বিভিন্নগণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গীতশযে করতল রক্তাশোকের পত্বেদের দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাধ্যের অর্চনা করিলেন। তদনন্তর কভাগণ রাজকবি-প্রথিত কামদেবের স্থলপিত্তে প্রোথ পঠিত করিতে করিতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও প্রোথ পাঠান্তে করতল সহকার-মঞ্জরীর দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাধ্যের অর্চনা করিলেন। এইরূপে অর্চনা সমাপনাতে, তৎকৃতমুখবিশিকারকুশলা কভাগণ পূর্বে দ্বারা নানাবিধ আলিঙ্গনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাবৎ স্ত্রী ও নাগরিকগণ সমবেত হইলেন। তখন রাজাভ্যুপরিধাণ-প্রেরিত অর্ঘ্যাদি বহন করিয়া উজ্জলবেশধারিণী চৌপাণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল এবং মন্দির-পরিচারিকা পল্লবিকার নির্দেশকম্বে মাল্যগ্রহণ ও শেরকাকটিভ-বোজন-বিভাগ্য পারদর্শিনী বেশবর্ণণ পূর্ণাঙ্গ পটীমায় ধ্বংসন ও আভরণাদি আমানন করিলে স্ত্রী ও পুংসগণ সকলেই তাহা গ্রহণ করিলেন। তখন, “দেব, এই দিকে, এই দিকে”—এইরূপ বাক্য সকলের কর্ণগোচর হওয়াতে উৎসব-সমাজ উৎকণ্ঠ হইলেন। অকস্মাৎ বেষাহারী প্রত্ধাহার-গণের সতর্কবাণী নিমজ্জিত করিয়া মূবজ, বেণু, বীণা ও করতাল-স্বনিতে চর্য্যার স্মৃতিত হইল ও বৈতালিকগণ তারস্থরে ভূপতিত স্বপ্নাভিত করিতে লাগিল। সপারিস্ব ভূপতি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সভক্তি অর্চনার দ্বারা ভগবান্ কুম্ভমাধ্যকে ভূষ্ট করিয়া উৎসব-সমাজে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন প্রতীক্ষমান জনমণ্ডলী ভূপতি ও দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পধ্বজে শর সন্ধান করত স্থলপিত্ত প্রোথের তাহাদের জঙ্ঘরিত করিতে লাগিলেন। নৃত্যপারায়ণ

জনমণ্ডলী তখন পরস্পরের প্রতি নিমিত্ত আবির্ভাব ও কুম্ভমের দ্বারা এবং বিলাসিনীসকলের হস্তস্থিত শূদ্র-কোণসারিত কুম্ভম ও চন্দনসেবিত স্তম্ভাদি জলসেকের দ্বারা এককালে পীত ও বোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন।

গৃহীত-বসন্তোৎসব-বেশা নাগবল্লী উৎসব-গোষ্ঠীতে বোণদান না করিয়া চিত্রাভূতিতে একাকিনী উপবনস্থিত জনমহারোহে মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন; বিশিষ্ট অঙ্গরগণ-সম্পন্ন স্থলিক নাগরিক-গণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইলেও তাঁহার বদন-মণ্ডল অশ্রুততা প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করায় মনে হইল হাতস্তর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বিগ্ৰহাত্মার গায় তিনি নিম্প্রভভাবে বসন্ত-ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন

সময়ে পশ্চাত্ত হইতে “প্রিয়সখী নাগবল্লীর কৃপণ ত,” এইরূপে সন্তোষিত হইয়া চমকিতার গায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চতুরীক কর্তৃক অহুততা বিমস্মন্যক অবলোকন করিলেন। শ্রেষ্ঠ অঙ্গরগণ ও উজ্জ্বল রূপের প্রভাব সকারিণী আলোকশিখার গায় প্রতীক্ষমান বিমস্মনে। উৎসব-সমাজভিত্তিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, নাগবল্লীর সাক্ষ্য হওয়াতে কনকলেখার সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিয়া বিমস্মনে। বিমস্মনে। কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নাগবল্লী মনে মনে বিতর্ক করিলেন,—“গত কয়েক

দিবসের মধ্যে এ ব্যক্তিও প্রিয়সখীর রোগশাস্তির বিষয়ে কোনরূপ উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। অতঃ কানরূপ প্রতিকার সম্ভব হয় নাই, তাহা এই সন্দেহ-জিজ্ঞাসা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বিমস্মনের উপর অভিমান নির্ভর করিয়াই আমি প্রিয়সখীকে এ কদম্বদল বৈধাযলধন করিতে উপদেশ দিয়াছি, আজ কি আশা দিয়া তাঁহার প্রারম্ভকার ব্যবস্থা করিব? একান্তে বিমস্মন্যক বলিলেন,—

—মধি, কনকলেখার কথা আর তোমাকে কি বলিব? নিতান্ত প্রাণের দায়েই তাহাকে পরিত্যাগ

করিয়া আমি উৎসব-সমাজে উপস্থিত হইয়াছি। চিত্রপটট স্বহস্তে তোমাকে প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাপন করিয়াই প্রিয়সখী অধীরা হইয়া পড়িলেন; পরদিন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে চতুরীক কভাগণের প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বিভ্রাণন করিল

কথা, নগরে কোন আশ্রম, মঠ বা পাহানিবাসেই চিত্রপটে আঁকিত ব্যক্তির সহিত বিক্ষিপ্তা। মাদুগ আছে একজন কোন পুরুষের সাক্ষ্য লাভ হয় নাই, তখন হইতে প্রিয়সখী শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন বিরহের গুণতর সত্তাপে প্রিয়সখীর দেহ শুক কেতকী পুষ্পের মত ধূসর হইয়াছে, তাঁহার প্রভাত-কালীন কলসের গায় স্বন্দর ও মহাশু বদনমণ্ডল রান হইয়া গিয়াছে। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি কভাগণ-পুত্রস্থিত চন্দনলতাকূলে অতিবাহিত করেন। পরিচারিকাগণ কভাগণের চন্দনমণিলাভলভিতে যে নবকল্লীপত্রের শয্যা রচনা করে, প্রিয়সখীর গাত্রসত্তাপে অলকাল মধ্যেই উহা শুষ্ক হইয়া বিবর্ততা প্রাপ্ত হয়। বিদ্বিত ও ভীত হইয়া তাহারা শব্দবস্ত্রে কর্পূর, চন্দনরস ও কদলীর দল আমান করে, পূর্ণপত্রের দ্বারা বাজন করে, কখন বা স্বদনের কষ্টগাথের জু অঙ্গলিনীদল তাঁহার বক্ষেপরি রক্ষা করে। কলতঃ অতিকটেই তাহার ও কভাগণ-পুত্রস্থিত পরিজনবর্গের কালায়ান হইতেছে।

নাগবল্লীর প্রমুখ্য কনকলেখার এই প্রকার বিধম অবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া বিমস্মনে—“হায়, বিবাহবস্থা কি কষ্টজনক!”—এইরূপ বলিলেন। তারপর নাগবল্লীকে সোধান করিয়া বলিলেন,

—মধি, এই বসন্তোৎসবের সন্ধানত রীতাহল্যার আমি উৎসব-সমাজাধিজিত ভূপতিকে অভিধানদূর্ন গমন করিতেছি, কিয়ংকাল মধ্যে প্রত্যাপন করিয়া তোমার সহিত পরামর্শ করতঃ এ বিষয়ে ভাবী কর্তব্য অবধারণ করিব, তুমি দীর্ঘিকার দলিকটে বাঁ মাঝী-মণ্ডল মধ্যে অবস্থান কর।

নাগবল্লীকে এইরূপে আশাসিত করিয়া বিমস্মনে।



তখনই পুষ্পাযুগের মন্দিরভিত্তি খসড়া হইলেন, তাৎপল-বীটিক, পুষ্পমালা, আবির্ভাব ও কুসুমভাও বহন করিয়া ধাত্রীকর্তা তাহার অঙ্গস্বরূপ করিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্বাত গমন করিবার পূর্বেই উদ্ভাস চতুরিকার্মনি, মস্তপানে মত্ত নৃত্যপারায়ণ স্ত্রী ও পুরুষদ্বয়ের দ্বারাবেশে নির্দয় পাদপ্রহার-শব্দ, স্রমবুর সঙ্গীত ও বাজ্যক্ষনি এবং অবিরাম নিক্ষিপ্ত আবির্ভাব ও কুসুম-চূর্ণের দ্বারা শূন্যমণ্ডলের রক্তিমভা এই সকলের দ্বারা উৎসব-সমাজ উদ্ভবরূপেই সৃষ্টিত হইল। বিভ্রমসেনা উৎসব-সমাজে উপস্থিত হইয়া প্রথমে মন্দির প্রদর্শন করিয়া মকরকেশনের উদ্দেশ্যে আবির্ভাব ও কুসুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, তারপর "দেবের বিজয় লাভ হউক" এই বসিয়া ভূপতিক প্রণাম করিয়া নবমন্ত্রিয়ার মালা, কুসুমক ও রক্তাকেশের শেখরক ও আশীষ্ট, আবির্ভাব ও কুসুমচূর্ণের দ্বারা তাহার ও দেবীর অভ্যঙ্গ করিলেন। ভূপতি সহায় বদনে পুষ্পনির্মিত শিরোভূষণ, কল্লপ, হার, কাঞ্চীমালা ও নুপুর উপহার প্রদান ও তাৎপল দান করিয়া তাহার প্রতি বহমান প্রদর্শন করিলেন।

তখন দৈব-প্রেরিত হইয়াই হউক বা কে-ব্যরণেই হউক তাহার দৃষ্টি ভূপতির দক্ষিণপার্শ্বে গৃহীতাসন সামাজিকগণের মধ্যে এক অপরিচিত পুরুষের উপর পতিত হইয়া সেই পানেই এককালে নিশ্চল হইল। ক্রমে তাহার জ্বর বিজয় ও সন্দেহের দ্বারা অভিভূত হইল। প্রয়োজন-হলে ভূপতির সন্নিধান হইতে কিয়দূরে গমন করিয়া চতুরিকাকে সন্ধান করিয়া তিনি বলিলেন—

—চতুরিকে, ভূপতির দক্ষিণ পার্শ্বে বিশিষ্ট সামাজিকগণের মধ্যে উপবিষ্ট এক মনোহর আকৃতির যুবাযুগ বহিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত বিবদ সশঙ্কসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে পূর্ণদ্রষ্টার জ্ঞান মনে হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে ইনি অসুস্থপুংগ। কিন্তু উপলব্ধ পুরুষগণের মধ্যে আমান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অপরিচিত স্ত্রীতরায় আমান গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে,

ইনিই বোধ হয় কনকলেখার চিত্রপটে ধৃত ব্যক্তি। তোমাদের কয়েকদিবসব্যাপী অতিশয় পরিশ্রমের দ্বারা বাহা সত্ত্বব হয় নাই, মকরকেশনের সঙ্গদয় নির্দেশ-ক্রমে আমি কোন ছলে নিকটে গমন করিয়া উদ্ভবরূপে নিরীক্ষণ কর, অথবা সেই চিত্রপটটি যদি তোমার নিকটে থাকে তবে সহজেই সকল সন্দেহের নিবাস হইতে পারে।

রামিনী এইরূপ নির্দেশ করিলে চতুরিকা কার্য-বাপ্রদেশে সামাজিকগণের মধ্যে গমন করিল ও সেই অপরিচিত পুরুষের সন্নিধান উপস্থিত হইয়া একবার অকস্মেৎ আছাদিত প্রতিক্রিয়া ও একবার অপরিচিত পুরুষের প্রতি দৃষ্টিনিষেপ করিয়া অতিশয় অশ্রুপূর্ণিত প্রজাগতা হইয়া নিবেদন করিল যে, অপরিচিত পুরুষ ও পুষ্পনীয়া কনকলেখা কর্তৃক ভিতপটে বিস্তৃত পুরুষ অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা একসঙ্গে নিঃসংশয়করূপেই প্রমাণ হইল। ধাত্রীকর্তার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিভ্রমসেনার চিত্ত বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল, তাহার মুখ-কান্তি অনির্বচনীয় স্ত্রী ধারণ করিল, চতুরিকাও রামিনীর সেই হৃদয় মুখজ্বলি চুড়ে বায়ু জীবন সার্থক মনে করিল।

তারপর স্বথক্ষিৎ আশ্ব-সংবরণ করিয়া বিভ্রমসেনা ধাত্রীকর্তাকে বলিলেন,

—চতুরিকে, তুমি সখী নাগবস্ত্রীর নিকট গমন কর, তাহাকে আমার বিশেষ নির্দল্ল বিজ্ঞাপন করিয়া বলিও যেন তিনি মুহূর্ত্তমাত্র কাগলেপন না করিয়া কুবেরদত্তের ভবনে গমন করেন ও সখী কনকলেখাকে উৎসব-বেশে সজ্জিত করিয়া এই সমাজে আমান করেন। তাহাকে আরও বলিও—মকরকেশু স্তুতি পরিগ্রহ করিয়া অজ্ঞ উৎসব-স্থানে সমাপান জ্ঞাত উপস্থিত হইয়াছেন।

রামিনীর আদেশক্রমে চতুরিকা নাগবস্ত্রীর অহুদল্লানার্থ প্রদান করিলে বিভ্রমসেনা পুনরায় ভূপতিক-সকাশে গমন করিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ তখন

বিবাসিনীগণের করত পুষ্ককোমসারিত বারিত্রে আর্দ্র ও ক্রান্তপারায়ণ নাগবস্ত্রগণের নিরন্তর পদমন্দনে কর্দমাল এবং মদনাহরুপ নৃত্যকারী স্ত্রী ও পুরুষদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত আবির্ভাব ও কুসুমচূর্ণ একেবারে আচ্ছন্ন। কতক বা মস্ততা-নিবন্ধন কতক বা অবিরাম নৃত্য বশত কোন জনের পুষ্ককোমসারিত অলিত হইয়াছে, কোন জনের সঘরগতিত তিলক ও পুষ্পাবলিরনাম অবিরমবারে নিশ্চয় বৈদ্যদ্বার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, কোন নারীর শিথিলবদন করী হইতে পুষ্পগুচ্ছ ভূমিতে আগতিত হইয়াছে, কোন পুরুষের আবির্ভাব যথেষ্ট বিরচিত কেশকলাপ একেবারে বদনমুখ হওয়াতে চূর্ণ কুস্তর্য্যাদি তাহার কুশলের জায় লোভনীয় মুখমণ্ডলকে অতিশয় সাহসী জনের দৃষ্টির অন্তরাল করিয়াছে।

বিভ্রমসেনা পুনরায় ভূপতিক-সকাশে উপস্থিত হইলে ভূপতি আদরপূর্ণক ভাহাকে আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভূপতির আজ্ঞাক্রমে নিষ্কিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া বিভ্রমসেনা কিয়ৎকাল পরে দণ্ডায়মান হইলেন ও বন্ধাজলি হইয়া ভূপতিক নিবেদন করিলেন,

—দেব, আপনাদেবী এই অশ্রুপূর্ণ প্রজার একট আবেদন আছে, উৎসব-সমাজ দৃশ্যবিধান নয়, এজ্ঞ অপরাধী হইব চিত্তা করিয়া মনে মনে ভীত হই।

ভূপতি সহায় বদনে উত্তর করিলেন যে, বিভ্রমসেনার আবেদন সর্বদা আদর-বোধ্য। তখন বিভ্রমসেনা নিবেদন করিলেন,

—দেব, জ্ঞাপনার প্রবল প্রতাপে প্রজাগণ তত্তর, দহা ও কর্তৃপক্ষগণের পীড়ন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছে। নিঃসন্দেহে আমার পূর্ণজন্মজন্মিত পাগরাশির ফলেই কয়েকদিবস পূর্বে এক উই বৈদেশিক তত্তর আমার একট প্রাণকুল্য প্রায়স্ব "অপহরণ করিয়া প্রদান করিয়াছে। দেব, এই উইকে সমুচিত শাস্তি প্রদানপূর্ণক অপদ্রত বস্ত্রত পুনঃস্থার করিয়া আপনাদেবী এই অশ্রুপূর্ণ প্রজাকে পালন করুন।

বিভ্রমসেনার এই বচনোপাস্ত্র্য শ্রবণ করিয়া উপবিষ্ট পারিষদ্বর্গ বিশ্বাসদ্বারের নিমজ্জিত হইলেন। নরপতি কিয়ৎকাল নির্দল্ল ভাবে অবস্থান করিয়া বলিলেন,

—বিভ্রমসেনা, আমার শাসনে বৈদেশিক তত্তর নিষ্কিষ্টে নগরে প্রবেশ করিয়া তোমার ভবনে এইরূপ কর্তৃপক্ষম্পাদনাত্তর কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংগৃহীত বস্ত্র আশ্বদাং করিয়া নিরাপদে প্রদান করিয়াছে ইহা আমার শাসনের ঘোরতর কলঙ্ক সন্দেহ নাই। আমার রাজ্য নিষ্কিষ্টতৎপদ, ও যোগ্যসচিব সমস্ত ভার গ্রহণ হইয়াছে— এইরূপ অথগত হইয়াই আমি বিষমাত্তরে চিত্তনিবেশ করিয়াছি। বাহা হউক, এই গুরুতর অপকারের বাহাতে উপযুক্ত প্রতিবিধান হয় তথ্যে আমি অবহিত হই। তোমার কোন প্রিয়বস্ত্র অপদ্রত হইয়াছে আমাধিককে বল।

স্বীয় শাসনের কলঙ্ক অপনোদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নরপতি এইরূপ বলিলে বিভ্রমসেনা ক্রান্তাজলিপুটে নিবেদন করিলেন,

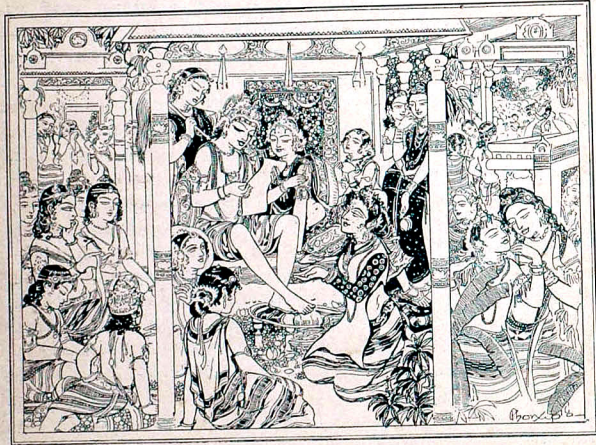
—দেব, আপনাদেবী এই ব্যোকার দ্বারাই আমি অতিশয় আশ্বদাং প্রাপ্ত হইলাম। অপদ্রত বস্ত্রের বিবরণ আমি যথাকালে নিবেদন করিব; এক্ষণে আমার এক বেৎহাজন ব্যক্তি, যিনি তত্তরকে উত্তররূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি উহার একট উদ্ভব প্রতিভূতি সজ্জিত করিয়াছেন—

এই পর্বাত বসিয়া বিভ্রমসেনা বস্ত্রান্তরাল হইতে চতুরিকার নিকটে প্রাপ্ত চিত্রপটটি ভূপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

তখন বিভ্রমসেনার কথিত বস্ত্রাত্তর শ্রবণে সকলের কোঁহুলা অতিমাত্র উদ্ভীপিত হওয়াতে সমস্ত উৎসব-সমাজ সেই চিত্রপটটি পরস্পরোপাধি অতান্ত উৎসুক হইলেন। নরপতি চিত্রপটটি দর্শনমাত্র স্বীয় দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই অপরিচিত পুরুষের প্রতি বিজ্ঞানস্বরূপে চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দারুণ বিষয়ে অভিভূতপ্রায় হইলেন; কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্তভাবে অবদান করিয়া বলিলেন,



—ভদ্রে, এটি বদন্ত্যংব উপদ্রবো করিত নরপতির এইরূপ উদ্ধারপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণগোচর প্রাণলিকামার কিংবা সত্য ঘটনা? যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই রহস্ত করিত হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ সখ্যে নাগরিকপণের অপরিচিত হইলেও বিদগ্ধগোষ্ঠিতে সুপরিচিত ব্যক্তি। ভদ্রে, এই চিত্রপটে বীহার প্রস্তুতি হইয়াছে তিনি কৌশাধীর প্রথিতবশ্য কবি প্রজ্ঞাত। এককালে আলৌকিক রূপ ও কবিত্ব



চরিত্রের চিত্রপট

শক্তির অধিকারী, এবং আমার প্রাণতুলা প্রিয়-সুহৃদ। আমার প্রতি মেহবশতঃ বদন্ত্যংব উপদ্রবো তিনি এই নগরীতে আগমন করিয়াছেন ও আমার দক্ষিপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রস্তুততা বা বাতুলতা এই দুইয়ের কোনটি এই প্রসিদ্ধ ও প্রায়-ভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চৌপাশবদ প্রদানের মূল তাতা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বহাঞ্জলি হইয়া বিমমসেনা নিবেদন করিলেন,—

—দেব, প্রজ্ঞাপণের প্রতি আপনার অতিশয় অগ্রহঃ অহমতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে অদূরে হর্ষধনি ও বর্ধদশী বিচারকরূপে আপনার খ্যাতি পবিত্র ও উচ্চৈশ্বরে উচ্চারিত “জীৱ” “জীৱ” শব্দে আকৃষ্ট

## শুভাগমনে

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক

‘আমার এ ভাগ্য বাড়ীর উঠানে  
আনন্দের বজা এল—

কাহার রূপায় কে জানে ?

অজ্ঞেতে উজান বাহি’

এল আবার গল্পা-মায়ী ;

শীতে শরৎ-লক্ষী এল

শিউলিকলি-ফুটানে ।

এল আবার কানাই-বলাই,

এল আবার পিনাকী ;

এল লক্ষী-সরস্বতী

আর রহিল কে বাকি ?

এল দুয়ের ভটী, ভাতা,

এল আবার কস্তা, মাতা,

হয় রে এমন মধুর মিলন

হরির রূপা বিনা কি ?

অজয় আমার ভাঙছে বাড়ী,

ঘরের দেওয়াল পড়ছে রে ;

নদী আমার হুড়ে বাহা,

বিধি যে তা গড়ছে রে ;

‘অন্নখালি যায় রে ভাসি,’

‘অন্নপূর্ণা’ আসছে হাসি,’

শুভ আমার মঙ্গল-ঘট

স্বপ্ন দিয়েই ভুড়ে রে ।

কবির প্রজ্ঞাত ঈশ্ব হস্তের দ্বারা বেন এবিধের প্রকারে উভয়কে উপদ্রব করিলেন।

—দেব, প্রজ্ঞাপণের প্রতি আপনার অতিশয় অগ্রহঃ অহমতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে অদূরে হর্ষধনি ও বর্ধদশী বিচারকরূপে আপনার খ্যাতি পবিত্র ও উচ্চৈশ্বরে উচ্চারিত “জীৱ” “জীৱ” শব্দে আকৃষ্ট হইয়া উৎসব-সমাজ সমুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলেন কু-বদন্তের প্রাণশরুপা নন্দিনী সিদ্ধ-বিদ্বাজের দ্বায় দীপ্তিমতী কনকলেখা প্রিয়দর্শী নাগ-বরীর সহিত আগমন করিতেছেন। বিমমসেনা নিবেদন করিলেন,

—দেব, এই অবিনীতা

ছঃসংসার প্রকাশ করিয়াছে,

কিন্তু আপনি তাহার প্রতি

অপ্রসন্ন হইলে তাহার

মরণাধিক রেশ হইবে। দেব,

এই সাগরমেখলা ভারতভূমির

সর্ব্বত্র আপনার প্রজ্ঞারঞ্জনের

ও গুণবোঝে কাহিনী বিদিত।

আর অল্পকাল মধ্যেই এই

ব্যাপারের রহস্ত উন্মোচিত

হইবে, আপনি দাসীর প্রতি

প্রসন্ন হউন।

ইতাবসরে প্রিয়দর্শী-

সহায়িনী কনকলেখা ভগবান

কুহুমায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ

পূর্ব্বক করত মঞ্জল বহুল-

মঞ্জরীর দ্বারা কুহুমায়ের

অর্চনা করিয়া যথাবিহিত

উপচার দেবার দ্বারা

নরপতি ও দেবীর পূজা

করিতে কনকলেখা

ও নাগবরীর কুশল প্রদান

করিয়া



বিভিন্নমেনা নৈপথ্যে কনকলেখা ও নাগবন্দীকে বলিলেন,

—সখি, ভূপতির দক্ষিণ পার্শ্বে একজন বৈদেশিক সামাজিক উপরিষ্ঠ; তাহাকে কি ইতিপূর্বে কখনও নয়নগোচর করিয়াছ?

কনকলেখা বিভিন্নমেনার নির্দিষ্ট অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, কবি প্রজ্ঞোত্তর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চারিচক্ষু মিলিত হইল। অকস্মাৎ নাগবন্দী উচ্চস্বরে 'হায়! হায়!' এরূপ বলিয়া ছুই বাহু প্রসারণ পূর্বক হঠাৎ চাপা, গভবনোচ্ছ্বসী কনকলেখাকে ধারণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাবৎ উৎসবসমাজ চঞ্চল ও কোলাহলমুগ্ধ হইল। 'কি চূর্ব্বব?' এইরূপ বলিয়া নরপতি আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিভিন্নমেনা বলিলেন,

—সেব, কোনরূপ গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিবেন না। এদিকে কবি প্রজ্ঞোত্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বিস্তৃত নরপতি কবি প্রজ্ঞোত্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, উল্লেখ্যনা ও আশঙ্কাত পূর্ণ হইয়া স্থান ও কালের সম্যক জ্ঞান বিস্মজন পূর্বক তিনি আসন ত্যাগ করিয়া গুপ্তায়মান, আকর্ণ-বিষ্কারিত লোচনদ্বয়ের দৃষ্টি সমুখে প্রসারিত; বায়ুবেগে প্রকম্পিত অঞ্চলদ্বয়ের ছায় তাহার সঙ্গীত কপিত এবং বজ্রাঙ্গি অপ্রকাশিত প্রাণোদার হইয়া উচ্ছ্বসে উজিত, এইরূপ অবস্থায় চিত্রে আরোপিত পুরুষের ছায় তিনি অবস্থান করিতেছেন। প্রিয়সখাকে এইরূপ বৈরূপ্যপ্রাপ্ত খলোকন করিয়া নরপতি প্রসঙ্গ গম্ভীরহাস্য-বিমুগ্ধিত আনন চিত্তাকুল ভাব ধারণ করিল। তখন অজলিভ হইয়া বিভিন্নমেনা নিবেদন করিল,

—সেব, এই ব্যাপারে আপনি কোনরূপ অত্যাহিত আশঙ্কা করিবেন না। কিয়ৎকাল পূর্বে এই ব্যক্তি কবি প্রজ্ঞোত্তর সম্পর্কে চৌধ্যাপ্যবাদ উপস্থিত করিয়াছিল, এই অপবাদ যে অস্বীকৃত কখনো প্রত্যত নহে, তাহার প্রমাণ প্রয়োগের কাল উপস্থিত। কিয়দ্বিবস

পূর্বে সখী কনকলেখা প্রিয়সখী নাগবন্দী ও পরিচারিকা মনোহারিকার সহিত কার্য্যচর্য্যে গভবন কুহমাণ্ডবের মন্দিরে অধমন করিয়াছিলেন। মন্দির হইতে প্রত্যাগমন-কালে বিশ্রামার্থ তিনি উপবনস্থিত মাধবীমণ্ডলে প্রবেশ করেন, কাঙ্ক্ষিতের প্রিয়শিষ্য কবি প্রজ্ঞোত্তর যে চৌর-কার্য্য সম্পাদনের হুযোগের প্রতীকাতেরি তথায় পূর্ণ হইতে অবস্থান করিতেছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্মরণহারা তিনটি অলংকার কল্যাণিতম্বোর দ্বারা বিমুগ্ধতার ছায় করিয়া, আশ্চর্য্যচরিত্র প্রদান না করিয়াই তিনি বলপূর্বক সখী কনকলেখার দ্বন্দ্ব অপরহণ করিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দেব, অশিশুত উপস্থিত, কনকলেখাও প্রিয়সখী-সমভিব্যাহারে উপস্থিত, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও উপস্থিত। এখানে তত্ত্বকে উপস্থাপ্ত শাস্তিপ্রদান করিয়া সখী কনকলেখার অপহৃত সামগ্রী বা তিনমিনিতে তুল্য মূল্যের দ্রব্য প্রত্যাগণের দ্বারা সম্যক বৈধ কতপের বাবস্থা কর্তব্য।

বিভিন্নমেনা এইরূপ বলিলে নরপতি তাহার ইতি-পূর্ব্বের কপটপ্রবন্ধের সম্যক মর্শ্বাধ্বানন করিয়া হাঙ্গ করিলেন; শরচ্ছত্রের আবরণকারী লম্বুমেখণ্ডও অপহৃত হইয়ায় দিয়মণ্ডল বেন পুনরায় তাহার শুভ বিমলবস্ত্রীতে উদ্ভাসিত হইল। নরপতি হাঙ্গ করিয়া হইগুণ-মুগ্ধর উৎসব-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিলেন,

—অহো, ভগবান মরকতেশ্বরের আশীর্ষ্য প্রভাব! তাহার পঞ্চপদের অদ্বুত লক্ষ্যবোধ-শক্তি! ঐ যে অশ্বেষ কবিশ্রুতি-আধার কৌশারীভূষণ কদম্বকাস্তি কবি প্রজ্ঞোত্তর ভগবান কৌল্যপতি-রুজ দৃষ্টিপাতে ভগ্নীভূত হইবার পূর্বে সম্মোহিত রূপিতের ছায় অবস্থান করিতেছেন, আর ঐ যে কল্যাণীয়া কনকলেখা, বাহ্যিক দর্শন করিয়া আমাদের নেত্রোৎসব সম্পন্ন হয়, তিনিও প্রণামনিশ্চল কুলধর ছায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন। যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোগ্যনাই ভগবান অজকেশ্বরের অভিশ্রায়। বিভিন্নমেনার স্বহৃদয় প্রার্থনায় মরকতেশ্ব সখ্য কর্ণপাত করিয়াছেন। এ

বিষয়ে আমাদের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা বাহ্যল। তথার্থী কুরুকুলোদ্ধৃত ভূপতি-সকাশে প্রতিকার-প্রার্থী প্রজ্ঞা অবদান করিয়াও বিফল হইয়াছেন, এইরূপ জনকত্রিত সন্তানবনা মাতের মলোচ্ছাদন করা কর্তব্য। নরপতি এইরূপ বলিয়া ঈশং হাঙ্গ করিয়া কিংকর্তব্য-বিমুগ্ধের ছায় অবস্থিত কবি প্রজ্ঞোত্তরকে বলিলেন,

—সখি, তোমার এরূপ বৈরূপ্যের কারণ কি? কয়েকদিবস পূর্বে হইতে তোমার চিত্তবিকলিত প্রকাশ পাইয়াছে; সন্তর চেষ্টা করিয়াও উগ্র শোষণ করিতে পার নাই। এতাদৃশ চিত্তবিকলিত হেতু অত্যাধিকার করিতে না পারিয়া আমাদের দেহকাতর মনে অনিশ্চিন্তা হইয়া প্রবল হইয়াছিল। এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তুমি হাঙ্গ করিয়া বিষয়ান্তরের

• অবতারণা করিয়াছ।

কিন্তু একবার সম্মুখের

বাণপাতের সমুদ্বন্দ্ব

হইলে আর ভজতা

থাকে না। তোমার

কৃত অপরাধ সম্পর্কে

আর কোনরূপ প্রমাণ

প্রদ্যায়ের আবশ্রুততা

নাই। বিভিন্নমেনা তোমার চৌধ্যাপ্যবাদের উল্লেখ

করিয়াছেন; আমাদেরও অহুমান, এই অপবাদের সঙ্গ

হেতু বর্তমান। কল্যাণীয়া কনকলেখা তোমার

বাবহারে তোমাকে অবিনীত ছদ্মন হির করিয়াছেন।

আমাদের আদেশ—এই উৎসব-সমাজ মধ্যে পাদপতনের

দ্বারা স্বীয় অধিনয়ের গুজ দ্বন্দ্বা প্রার্থনা করিয়া

তাহাকে প্রসঙ্গ ও আশাসিত করা, এবং বিনাহুমতিতে

তাহার দ্বন্দ্ব হরণ করিয়াছ, হতভার বস্তুদয় প্রদান

করিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হও। তৎপর কল্যাণপ্রাপ্ত

হইলে এই বিজিত 'ইন্দ্রজিৎ' হারের দ্বারা তাহার

অর্জন করা।

ভূপতির এই আদেশ শ্রবণ করিয়া 'আধ্যাপ্যপুত্রের শ্রাব্য আত্মা বিজয়ী হোক' দেবী এইরূপ বলিলেন ও উৎসবযোগী সমুদ্বিত্তে 'দত্ত', 'দত্ত' এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নাগবন্দী ও বিভিন্নমেনা নিরতিশর আনন্দগত করিলেন।

কনকলেখা সখী ও পরিচারিকার গুরুত্বায় পূর্বেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন এবং লোচনময়ী হইয়া তপতচিত্তে প্রিয়তমকে নিরীকণ করিতেছিলেন। এখন ভূপতির আদেশ কর্ণপাচর হওয়াতে লজ্জায় মুগ্ধচিত্তাঙ্গী হইয়া শ্বেদ-ধারায় সিক্ত হইলেন। কবি প্রজ্ঞোত্তর একাল পর্য্যন্ত উদ্ভাস পুরুষের দ্বারা নির্দীকৃতাবে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজাদেশ প্রবেশ কনকলেখার ভাবান্তর

নয়নগোচর করিয়া

তিনি মুগ্ধহাস্যকরে

প্রিয়সখার প্রতি দৃষ্টি

নিপেণ পূর্বক হতে ইন্দ্র-

জিৎ হার গ্রহণ করিয়া

কনকলেখার সন্নিধানে

গমন করিলেন। তৎপর

প্রথম-বিদ্রুত দৃষ্টিদ্বারা

প্রিয়তমকে 'অভিভিক্ত

করিয়া বলিলেন,

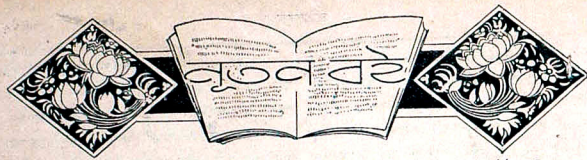
—প্রিয়সখা বলিয়াছেন, আমি বিনাহুমতিতে তোমার দ্বন্দ্ব হরণ করিয়া অধিনয় প্রকাশ করিয়াছি। ভজ! তবে আমিও জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার অহুমতিতে আমার দ্বন্দ্বটি হরণ করিয়াছ?

প্রিয়তমের এই কৌতুক-প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ কনকলেখার প্রজ্ঞাতকালীন কমলের ছায় হৃদয় বদনমণ্ডল জীভারশে পর্য্যাপ্ত পুষ্পতবকভার-অনন্য গভার ছায় তুমির দিকে অবনত হইলে কবি প্রজ্ঞোত্তর দৈবদকপিত হতে বৃত্ত আত্মজ্ঞান প্রভাময় ইন্দ্রজিৎ হার উভয় হস্তে ধারণপূর্বক সাদরে তাহার জীবাশে দ্রুত করিয়া কৃতান্তা লাভ করিলেন।



কনকলেখা ও প্রজ্ঞোত্তর মিলন





[ 'উত্তর' সমালোচনার গুপ্ত অঙ্করূপ অঙ্কিত করিয়া ঠাংবাবের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইলেন ]

**শতনরী**—শ্রীকৃষ্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক  
শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্চী। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়  
এও সঙ্গ, ২০৩১১, কংগ্রেস স্ট্রিট, কলিকাতা।  
দাম আড়াই টাকা।

কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান কালের কাব্যপরিচয় দিতে  
বসিলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়  
বিজ্ঞানলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন আর অক্ষরকুমার  
বড়ালকে। এই ত্রীণ কাব্যাদ্যনাথ বিজ্ঞানলালের  
বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বলতম। ছন্দে, বিষয়-বস্তুতে, প্রকাশ-ভঙ্গীতে,  
ও ভাববিভাগে বিজ্ঞানলালের যে-স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে তাহা  
একদিকে যেমনি কৌশলময় অপর দিকে তেমনি বিশ্বস-  
কর। দেবেন্দ্রনাথের আত্মভোলা সারনা পাঠকের মর্ম স্পর্শ  
করে। অক্ষরকুমারের রচনা সুমাজ্জিত, সুসূত্র ও গৌরবপূর্ণ।

এই প্রথম ত্রীণ পরের মধ্যে দ্বিতীয় ত্রীণ আসিলেন  
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকৃষ্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও  
শ্রীমতীসুন্দরীনাথ বাগ্চী। রবীন্দ্রনাথ ছন্দে, ভাবায় ও  
ভাবে যে অভিনব পথ গুলিয়া দিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাহার  
প্রথম ছুটীকেই অধিকতর নিতার সহিত অহুসরণ  
করিয়া আপনাব অসীম কালাচাতুর্যের পরিচয় দিলেন।  
সত্যেন্দ্রনাথের মতই ছন্দ-হিলোলা এবং তাহার সহিত  
ভাবমাধুর্য্যের সমাবেশ কল্পানিধানের রচনার বিশেষত্ব।  
হতীসুন্দরীনাথের রচনা প্রসাদগুণে ও গালিতো অপরূপ।

কল্পানিধানের 'শতনরী' তাহার 'প্রসাদী', 'স্বরাবলী',  
'শাহিঙ্গ' ইত্যাদি কাব্য-পুস্তকের স্লেট কবিতার আধরণী।  
এই চরম-গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—কানে কানে,  
বন্দনা, মুখ, মধুপ্রাপ্তি ও পথে। 'প্রায় প্রক্রি-বিভাগেই  
কবির ক্ষেত্রক নৃতন কবিতা' বেওয়া হয়রাছে।

গ্রন্থখানির কবিতার পর কবিতা পড়িয়া গেলে

মন যেমন ছন্দনুতো নাচিতে থাকে, তেমনি আবার  
নিবিড় স্বপ্নাবেশে বিভোর হয়রা উঠে। 'কাক্ষন-জগতা',  
'শ্রীকণ্ঠে', 'মন্দর-বর', 'দেওবরে' প্রভৃতি কবিতায়  
কবির তুলি যে অপরূপ চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছে  
তাহাতে কবিরই ভাবায় কবিকে বর্ণিত ইচ্ছা করে—

"নীল আকাশে ঘুরিয়ে তুলি  
তুবার-সাবা শেখরগুলি  
কে আঁকি মোঘ-মাগরের পারে?"

বালক-ভাষার আলোর কথা,  
রঙ-ফলান কি আলপনা

দিগ-বৃগের মাজায় মোতির হারে!"

শেখ ছুটটির সামন্ত পরিবর্তন করিয়া কবির লেখনী  
সম্মুখে বোধ হয় থালা চলে যে, তাহা—

"বালক-বৃগের মাজায় মোতির হারে।"

কবিতাগুলির মধ্যে যে বিদ্বততা, যে স্বপ্ন-বিলাস ও  
যে পরিমার্জিত রুচি পাওয়া যায় তাহা পাঠক মাজেই  
চিত্র স্পর্শ করে। চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিজ্ঞানলাল  
রায়—নামক কবিতাগুলি অপরূপ সুন্দর। কল্পনা-  
নিধানের আত্মভোলা ভাবাবেশ পাঠক-দ্বন্দ্বের অপরূপ  
আনন্দময় অহুস্রিত জাগাইয়া তোলে, এবং এইখানেই  
তাহার কবি-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গুপ্ত

**বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—**

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—চন্দ্রবর্তী  
চ্যাটার্জি এও কোং, ১৪নং কলেজ ঘোয়ারা, কলিকাতা।  
দাম বার আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে "জয়ন্তী-

উৎসর্গ' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধের  
পুনর্মুদ্রণ। রূপরক্ষা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল  
কাব্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়ে বাংলা ছন্দের  
কোন কোন মৌলিক নীতির সৃষ্টি ও বাবহার করেছেন,  
লেখক এই পুস্তিকায় দক্ষতার সহিত তার আলোচনা  
করেছেন।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ শিরপ্রতিভা কি  
বিশ্বকর যুগান্তর এনেছে, রবীন্দ্র-প্রতিভার সোনার  
কাঠির পর্শে বাংলা কাব্যসাহিত্য কত বিভিন্ন রূপে  
অলঙ্কৃত হয়েছে তাই দেখিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন  
—"বাংলা কাব্য-জগতে তিনি যে কত নোহুন  
নোহুন ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু  
এই বেচিরাবলুতাই তাঁর ছন্দের আসল কথা নয়;

আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার প্রকৃতপ্রসূতির  
সর্বপ্রথম ও মধ্যম আবিষ্কারক। \* \* \* তাঁর এ  
আবিষ্কার পৃথিবীর ভাষাগত কোন আবিষ্কারের চেয়ে  
কম নয়। বাংলা ভাষার আপাতপুণ্যমান ছিল  
আবরণের অন্তরালে আবৃত্তি যে ছন্দরাজ্য তিনি  
আবিষ্কার করেছেন তা আট্টাশটিকের পরপরই  
তরঙ্গপ্রবৃত্তি নোহুন মহাদেশ আবিষ্কারের চেয়ে  
কিম্বদন্তি কম বিশ্বকর নয়।"

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্যবৃত্ত,  
স্বরবৃত্ত ও বৈদিক (অক্ষরবৃত্ত) বাংলা ছন্দের এই তিনটি  
প্রধান ধারার প্রকৃতি নির্দেশ করে এবং এই তিন  
প্রকার ছন্দকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ কত বিভিন্ন  
পদ্ধতিতে ভাবপ্রকাশ করেছেন তা দেখিয়ে লেখক  
তাঁর স্বপ্ন প্রতিবাহের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন  
মাসিক পত্রে প্রকাশিত বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের  
মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ বাঙালী পাঠক মাজেই  
স্বপ্নপ্রতিভা। তাঁর বর্তমান পুস্তিকায় ছন্দের নিম্ন  
বিবেচনা রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকদের তৃপ্তি দেবে এবং  
উদীয়মান কবিদের সাহায্য করবে। বাংলা ছন্দ-  
সরস্বতী রবীন্দ্রনাথের হাতে কোন কখনিকের  
আবিষ্কারের ফলে চরম সার্থকতা লাভ করেছেন তাই

দেখিয়ে লেখক বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের পূর্বস্বতী  
বাঙালী কবিতা বহুশত বৎসর যাবৎ নানা প্রয়াস ও  
সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মধুর গতিতে বাংলা ছন্দের  
স্বরূপ সন্ধানের পথে অগ্রসর হইছিলেন, কিন্তু সে তত্ত্বের  
আবরণ কেউ উন্মোচন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের  
নিবিড় অন্তর্দৃষ্টির রশ্মিতে সেদিন সে তত্ত্ব  
উন্মোচিত হ'ল, সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের শক্তিও  
কাণ নয় এবং তার সত্ত্বাভাব তার ক্ষেত্র স্বরূপসিদ্ধ নয়;  
সেদিন দেখে বাংলা ছন্দ তাঁর শঙ্কুকানির অহুসরণ  
করে ত্রিধর্মণা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রবল  
ধারায় চলেছে।"

এই পুস্তিকায় একদিকে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের  
ছন্দের বিচারে লেখকের স্বপ্ন প্রতিবাহের পরিচয়,  
অন্যদিকে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আশ্রয় করে  
বাংলার একটি ছন্দশাস্ত্র গড়ে তুলবার নিম্ন প্রয়াস।  
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রতিভার পরিণতি অহুসরণ করে  
বাংলা ছন্দের বিভাগ ও তার ক্রমবিকাশের ধারাটিও  
চমৎকাররূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। বাংলার কবি, বাঙালীর  
কবি আজ বিশ্বের কবি। বাংলা কাব্যসাহিত্য আজ  
"জগৎকবিদ্যায়" বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছে।  
বাংলাকাব্যের ছন্দ-আলোচনার ক্ষেত্রে আজ স্ববিভূত  
ও তার উপকরণ প্রকৃত। বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র গড়ে  
তোলার এই শুভলয়ে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের এই নিম্ন  
বৈজ্ঞানিক আলোচনা লেখকের স্বীয় প্রতিভারই  
অন্ততম নিদর্শন।

শ্রীবিকাশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

**রক্তের টান**—উপজাগ—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

মূল্য এক টাকা বারো আনা। শ্রীসঞ্জীৱকান্ত দাস  
কলিকাতা ৩২৪১১, বিডন স্ট্রিট শনিরজন প্রেস হইতে মুদ্রিত  
ও প্রকাশিত।

বইখানি "ভারতবর্ষে" দ্বারা বাহিক ভাবে প্রকাশিত  
হ'য়েছিল। বইখানির প্রট একঘেয়ে প্রেমকাহিনী নয়।  
বাস্তবায়ী সংজ্ঞা সাধারণ গৃহস্থালীর আবেগের নানা



চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়েছে। বাঙ্গালীর মনের দৃঢ়তা, উচ্চতা, উদারতা, আবার দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা—সহোদর ভাইদের মধ্যে পরস্পরের চরিত্রে ছুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার বাঙ্গালীর মেয়ে যে সব সময় সঙ্গীতবাহার সমান ভাবে সংসারের ছোট, বড়, সরল, কুটিল সকলকে প্রেম ও ক্ষমার দ্বারা জয় করতে পারে, রাজস্বাধী থেকে ভিত্তিরিণী হ'লেও তারা মনের শক্তি সহজে হারায় না, তা 'কমলা' ও 'হরহৃন্দরী'র চরিত্রে বেশ স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। চঞ্চলকেও বেশ লাগল। তার স্বভাবের ছোট দিক—ভালো এবং মন্দ—র সঙ্গে তার মনের অনবরত ব্যস্ত-প্রতিবাস্ত এবং শেষে ভাগ্যেরই জয়। চঞ্চলা খুব ভালো মেয়ে হয়ে গেল। তবে তাকে কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগে। সরল-মনা 'হৃন্দরী'র ছেলে লোক বোধ হয় সবচেয়ে বড় করেই আঁকতে চেয়েছেন। হ'তে পারে, হৃন্দরীর প্রাণটা অত বড়ই ছিল, কিন্তু তার মুখে মাঝে মাঝে এত বেশী মার্জিত ও সারবান কথা শুনেছি যা কেবল উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ থেকেই শোনার আশা করা যায়। হৃন্দে-বাঈর মুখে সরল কথা শুনাগো বটে, তবে এতটা জ্ঞানের কথা পাওয়া যায় কি?

তা' ছাড়া কতকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনার জায়গায় জায়গায় ইতো নীতান্তই উপভাস ব'লেই মনে করিয়ে দেয়, —যেমন দু'বছর ওকালতী করে এই বাজারে হিরণের অগাধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয়, কমলাকাতার বাড়ী, ঘর, চাকর, দরওয়ান, গাড়ী, মোটর ইত্যাদি রূপকায়ত মত লাগে।

তা' হ'লেও বইটি আমাদের ভালো লাগেছে। কিন্তু নামটা একটু বেশী ব'লেই মনে হচ্ছে; আরো কিছু কম করা যেতে পারত। **শ্রীউদা দেবী**

**নূতন হিন্দু পঞ্জিকা (১৩৪০ সাল)**—কলিকাতা ট্রেজি কোম্পানী কর্তৃক ১৯২৯, গোয়ার সাহু'রার মোড়, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

পঞ্জিকা ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতির ধর্মকাব্য-সাধনের প্রধান উপায়। এই পঞ্জিকাবানি সেই কাব্য গ্রন্থের বিশেষ সহায় হইবে। ক্রিয়া-কাণ্ড প্রভৃতি সপক্ষে ব্যবহৃত জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে বিশদভাবে দেওয়া আছে। জ্যোতিষ-বচনার্থগুণি বাহাতে জ্ঞানসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারে, সেজন্ত ইহাতে সরল বাংলা ভাষায় ঐগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ব্যাচনামা জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইহা গণিত ও সংশোধিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হইরাছে।" "অমাবসিক শিক্তি তালিকা পথ্য এই পঞ্জিকার সাহায্যে উৎসাহিত নৈমিত্তিক ধর্মকাব্য নিভয়ে ও নিঃসন্দেহে পালন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এদেশল ছাড়াও যে বিশিষ্ট গুণে ইহা বাঙ্গার-প্রচলিত অজ্ঞাত পঞ্জিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়াছে, সে ইহার বহিঃসৌন্দর্য্য। এমন হৃন্দর মলাট আর কোন পঞ্জিকায় দেখি নাই। বেশ পূর্ব কাগজ, ভাল ছবি ও ছাপা—এই তিনের সমাবেশ ইহার মলাট হইয়াছে অপরূপ সুলভ। হৃন্দর মুদ্রণকার্যের জন্ত সবিশেষ রীমাত কলিকাতা ট্রেজি কোম্পানী কর্তৃক ইহা মুদ্রিত হওয়ার ইহার মূল্য-কাব্য যে অতিশয় মনোহর হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার মুদ্রণ-কার্যের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য চোখে পড়িবেই। ছবিগুলি পথ্য অতি সুলভ ছাপা হইয়াছে। ইহার বাঁধাইও বেশ সুলভ হইয়াছে। উপরন্তু, বাঙ্গারের অজ্ঞাত পঞ্জিকার সত ইহাতে বিজ্ঞাপনের বাহালা না থাকিতে ইহার কলের অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা এই পঞ্জিকার একটি বৈশিষ্ট্য।

মোট কথা, নিরুজ্জ্বল গণনা, মুদ্রণ-সৌন্দর্য্য, অনাবশ্যক বিঘ্ন বর্জন এবং গঠনসৌন্দর্য্য প্রভৃতির দ্বারা ইহা অজ্ঞাত পঞ্জিকা অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ অধিকার করিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

**শ্রীনাহাররঞ্জন মিত্র**

## অকুণোদয়

(উপভাস)

### শ্রীশৈলজনন মুখোপাধ্যায়

বুড়ীর না আছে ছেলেমেয়ে, না আছে আত্মীয়-বন্ধন; কালের যেতে কে যে কোথায় কেমন করিয়া ভাসিয়া গিয়াছে সেই-তিহাস বড় বিচিত্র। ঘাই হোক, এমন অনেকেই যায়, তাহার জন্ত দ্বাধ নাহি। বুড়ীও তাহার বন্ধনহীনতার দুঃখের কাহিনী আশ্চর্য্য আর কাহাকেও বলে না। বর্তমানে যে অনাচার্য্য পরিবার তাহার নীচের তলার ঘরকন্নাখানি ভাড়া লইয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদের লইয়াই বুড়ীর কারাবার।

বুড়ী অবশ্য ঠিক বুড়ী নয়। কত যে বয়স চেহারা দেখিয়া অস্বাভাবিক করা কঠিন। দাঁতও ভাঙে নাই, চুলও পাকে নাই, পাকা আমের মত গায়ের রং, অস্বস্ত-বিশুদ্ধ করিতে বড় একটা দেখা যায় না; লোক বলে, সকলেই নাকি চিরকাল তাহাকে ঠিক অমনই দেখিতেছে।

পায়ের লোকে তাহাকে মাসি বলিয়া ডাকে। আমরাও না হয় মাসিই বলিলাম।

কলিকাতা শহরে ওই বাড়ীখানি মাসির নিজের। নগদ টাকাকড়ি কিছু আছে কি না সে-কথা আমরা জানি না। হয়ত থাকিতেও পারে। এতদিন সে একাই ছিল। নীচের তলাটা সম্মতি ভাড়া দিয়াছে।

ভাড়া যাহারা লইয়াছে তাহার। দুই বামী-স্ট্রী। হ'লমেই ছেলোমহুয়। ছেলোমহুয়ই হলেও কমবয়সেই তাহাদের একটি ছেলে হইয়াছে। বছর-পাচেকের ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমার নাম—জেবেন্দ্র নাথ গাংগুলি।"

পাড়াটী বড়রাস্তার উপরে নয়। সন্ধ্যা পলি,—বড়রাস্তা হইতে বাহির হইয়া বুড়ীর বাড়ীতে নারায়ণী বলিল, "তা আমি কি করব, না, হুই ছেলে আসিয়াই শেষ হইয়াছে। গাড়ী-ঘোড়া ত' চলেই না, লোকজনের চাটালও একরকম নাই বলিলেই হয়।

ছেলেটি তাই সে নিরুজন গলির মধ্যে নিষিদ্ধাবে ইহার বাড়ী উহার বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। দিবা হৃন্দর ছুটছুটে ছেলে, সবাই তাহাকে আদর করে, খাইতে দেয়, কাছে ডাকিয়া বসায়, জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাবার নাম কি, দেবু?'

দেবু বলে, 'জেবেন্দ্র নাথ বাবা গাংগুলি।'

'আর মায়ের নাম?'

'জেবেন্দ্রের নাথ গাংগুলি মা।'

লোকে শোনে আর হো হো করিয়া হাসে।

ঘরে-বাহিরে দেবুর আদর-বস্ত্রের আর অশ্রু নাই। কিন্তু আমাদের বুড়ী-মাসির বোধহয় গুলব ভাল লাগে না, তাই সেদিন নলিনীদেবীর বাড়ী হইতে দেবুকে তাহার নিজের বাড়ীতে ডুলিয়া আনিলা। বলিল, 'মা গো মা, কি হাংসা ছেলে গো! চারটি খেতে দিয়ে ছেলেকে যা খুশী তাই বশাচ্ছে, আর ছেলেও তেমনি দিবা কেমন ব'লে ব'লে গান গাইছে! নলিনীকে

আজ আমি আছাটী ক'রে হনিতে দিয়ে এসেছি। ছেলের মা নারায়ণী ঘরের ভিতর বোধকরি কোন কাজ করিতেছিল, কথাটা তাহার শুনিতে পাইলেও ভাল বুঝিতে পারে নাই; বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে, মা?'

মাসি তাহার কোল হইতে দেবুকে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'কি আর হবে বাছা, যা আমি দেখতে পারি না তাই। ছেলে আবার পরের বাড়ীতে খেয়ে বেড়াবে কি গা। লোকে ভাববে, ছেলে বৃদ্ধি বাড়ীতে

খেতে পায় না—তা জানো?'

নারায়ণী বলিল, 'তা আমি কি করব, না, হুই ছেলে আসিয়াই শেষ হইয়াছে। গাড়ী-ঘোড়া ত' চলেই না, লোকজনের চাটালও একরকম নাই বলিলেই হয়।



ঘরে ঢলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ দেবুর কান্নার শব্দে সচকিত হইয়া সে তাহার বারান্দার রেঙ্গি-এর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুনীল, নারায়ণী তাহাকে গ্রহণ করিতেছে আর বলিতেছে, 'বলু আর কোথাও যাবিনে। বলু বন্দি নইলে আজ তোকে আমি মেরে খুন ক'রে ফেলব।'

মাসি আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ভয় ভয় করিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি বাহিয়া नीচে নামিয়া আসিয়া সরাসর ঘরে ঢুকিয়া দেবুকে তাহার কাছ হইতে একরকম ছিনাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, 'ছেলে মানুষ কর্তে তোমরা জানো না, মা, কেন যে ভগবান এমন রাক্ষসত্বের মতন ছেলে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন জানি না। এমন ক'রে মারে? ছি!'

বলিয়া ছেলেকে লইয়া সে আবার উপরে উঠিয়া গেল।

রেঙ্গি-এর কাছে বারান্দার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা তোমার মেয়েকে, দেবু?'

দেবুর কান্না তখন থামিয়াছিল। তবু সে ফুলিতে ফুলিতে খাড়া নাড়িয়া বলিল, 'হঁ!'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মাকে আজ মারব।'

দেবু বলিয়া উঠিল, 'মুখে জুটো মারব।'

মাসি হাসিতে লাগিল।—'জুতো মারব' কোথায় নিশ্চলি রে? ওই জুতাই তো পরের বাড়ী যেতে বারণ করি। ওলা ও তনেছি নারায়ণী, ছেলে কোথায় 'জুতো মারব' শিখে এসেছে।'

নারায়ণী বলিল, 'কোথাও শিখে আসেনি, মা, বাড়ীতেই শিখেছে। ওর বাপের কাছে শিখেছে।'

মাসি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হঁ। দাঁড়াও আজ আরেক বারেনে আপিস থেকে, আমি তাকে শাসন ক'রে দিচ্ছি।'

নারায়ণী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বাবেখরি সে ভাগ করে নাই।

তৎক্ষণাৎ সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া মাসির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিন্তু আমি বদেছি একথা

তুমি বোলো না, মা, তাহ'লে ও আর আমার বাকি কিছু রাখবে না।'

মাসি ঈশৎ হাসিল। বলিল, 'কেন রে, এত ভয় কেন? খুব বন্ধে বন্ধি?'

নারায়ণী তাহার আয়ত চক্ষু ছুটি তুলিয়া মাসির মুখের পানে চাহিতেই দেখা গেল, জলে তাহা ভরিয়া আসিয়াছে।

মাসি একটুখানি অবাক হইয়া তাহার সেই স্বন্দর মুখখানির দিকে কিয়ৎকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, তার পর তাহাকে তাহার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'বোন্সু।'

ঘরের মেশের উপরেই নারায়ণী তাহার পা ছুটি পিনের দিকে ছড়াইয়া একধনি হাত মেশের উপর সোজা করিয়া রাখিয়া সে এক পল্লব ভদ্রীতে বসিয়া পড়িল।

দেবুকে কোল হইতে নামাইয়া মাসি আসন পাতিয়া দ্বিত্য গেল, নারায়ণী হাত নাড়িয়া নিবেদন করিয়া বলিল, 'না, মা, এই আমি বেশ বদেছি।'

মাসিও তাহার কাছে গিয়া বসিল। ইহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর ঋগড়া-খাটি সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু উহা যে এত কতক তাহা সে কোনো দিনই ভুলিতে পারে নাই। ভাবিয়াছে স্বামী-স্ত্রীর ঋগড়া, সকলের যেমন হয়, ইহাদেরও তেমনি। হয়, আবার তৎক্ষণাৎ মিটিয়া যায়। কিন্তু স্বামীর তিরস্কারের ভয়ে চোখে বাহার জল আসিয়া পড়ে, মুখখানি শুকাইয়া একটুই হইয়া যায়, তাহাদের ভিতরের ব্যাপার যে তেমন স্বপ্নের মত, তাহা সে কতকটা অনুমান করিয়া লইল।

আহা, এমন সুন্দরী মেয়ে, মনে 'ব্রহ্ম' নাই বলিয়া হয়ত এমন রান হইয়া গিয়াছে।...মাসি তাহার কপালের চুলগুলি হাত দিয়া সরাইয়া সম্মুখে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ছোট মেয়ের মত আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌনে কি তোকে ভালবাসে না, মা, মা?'

নারায়ণী একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাসে।'

'কুব এত ভয় করিস কেন?'

নারায়ণী বলিল, 'সারাদিন খেটেখুটে আসে, মেজাজটা সব সময় ভাল থাকে না।'

মাসি তাহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোরা বাপের বাড়ীতে কে কে আছে, নারায়ণী?'

নারায়ণীর মুখখানি আবার কেমন বেন হইয়া গেল।

বলিল, 'মা, বাবা, ভাই, বোন্সু কেউ কোথাও নেই মা; আমার এক পিসি আমার মামার কাছেছিল।'

মাসি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আহা, বাছা আবার!'

সেদিন গল্পখান করিতে গিয়া দেবুর জ্ঞান মাসি একটা দম-সেওয়া তিনের মোটরগাড়ী আনিয়া বসিয়াছে।

ঘরের মধ্যে আপন মনে দেবু সেই গাড়ীটা চালাইতেছিল। মাসি ও নারায়ণী দুজনেই কিয়ৎকাল সেইদিকপানে তাকাইয়া রহিল। তার পর মাসিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোরা গুত্তরবাড়ী কোথায়, মা?—বীরেনের নিছের বাড়ী?'

নারায়ণী বলিল, 'সে একটা বাড়ী মান্তর ছিল, মা, কলকাতার কাছাকাছি কোন্ একটা গাঁয়ে। মালগেরিয়ায় সব ম'রে স্ব'রে গেছে, আমার গুত্তরবাড়ীরও কেউ কোথাও নেই, মা। সেদিক দিয়ে আমাদের মিলেছে ভাল।'

এই বলিয়া মাসির মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে আবার বলিল, 'এখানে-ওখানে এমনি বাসা ক'রে ক'রেই তুঁর বেড়াচ্ছি, মা, এতদিন ছেলপুলে হয়নি, বেশ ছিলাম, কোনও ভয়-ভাবনা ছিল না। উনি মাইনে বা পান ভাতে কোনো রকমে চ'লে যায়, কিন্তু এমনি ক'রে.....কি যে হবে ভগবান শ্রাবনে।'

নারায়ণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। মাসি বলিল, 'ভাবিন্দি, মা, বিনি জীব দিয়েছেন

তিনিই আমার জোপাবেন। তবে এইখানেই থাক, মা, আর কোথাও যাবেন যেন।'

নারায়ণী বলিল, 'না, মা, আপনাকে পেয়ে আমার মনে হয় যেন আমি আমার মা পেয়েছি।'

মাসি বলিল, 'আমিও ঠিক এমনি ভাড়াটেই চেয়েছিলাম, বাছা।'

তা উহাদের একরকম ভালই হইয়াছে। মাসিও এতদিন একা ছিল। ইহার-উহার বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিন বেন তাহার আর কাটিতে চাহিত না। আজকাল দেবু হইয়াছে তাহার দিব্যাক্ষির সর্দার। দেবুকে লইয়া সে সকালে উঠিয়াই গল্পখান করিতে যায়, ফিরিয়া আসিয়া দেবু ইষ্টমারের গর করে আর মাসি আমাদের রান্না করিতে বসে।

বাপ-মার সঙ্গে ছেলোটার সখ আজকাল একরকম ঘুটিয়াই গিয়াছে। সে মাসিকে 'মা', আর নারায়ণীকে বলে, 'বৌমা'।

এই লইয়া মাসি হাসাহাসি করে। বলে, 'কই, কেউ তো ওকে শিখিয়ে যেননি, মা, ও আপনাই বলেছে।'

নারায়ণী বলে, 'আপনি আমার বৌমা বলেন কিনা, তাই ওও শিখেছে।—বলি ওরে হাবা ছেলে, ওবে আমার মা হয় রে, তোরা মা কেন হব?'

দেবু বলে, 'বাবা!'

মাসির আনন্দ যেন আর ধরে না। বলে, 'কেমন মজা! ছেলেকে তোরা আমি নিয়ে নিলাম, নারায়ণী!'

নারায়ণী বলে, 'ভালই হ'ল। ছেলের ভাবনা আমাকে আর ভাবতে হবে না।'

মাসি বলে, 'কিন্তু পরের ছেলে, বাছা, সর্দাদাই আমার ভয় করে। এক গাছের ছাল কখনও অল্প গাছে লাগে না, মা।'

নারায়ণী বলে, 'না, মা, সে ভাবনা আপনি করবেন না। আমার ছেলে আর যাই হোক, নেমক-হারাম কখনও হবে না।'



‘তা বেশ, মা, পরে দেখা যাবে। তবে সেই একটা কথা আছে না—যার সরসে তার ফেল, কলু-মাণী পর। শেষে আবার তাই না হয়।’

এই বলিয়া দেবুকে কোলে তুলিয়া লইয়া মাসি বলে, ‘হাঁরে ছুটু ছেলে, গেলে আমার কুলে মাঝি না তো?’

দেবু পাড় নাড়িয়া বলে, ‘না।’

কিন্তু বীরেন ছোকরাটি কেমন যেন অজ-রকম। বাড়ীতে তাকে বড় একটা দেখাই যায় না। অতি প্রত্যবে শয্যাভাগ করিয়া নারায়ণী প্রতাহ রায় চড়ায়, বেলা আটটার মধ্যে শামীর আপিসের ভাত তাকে তৈরি করিয়া দিতে হয়। বেলা সাড়ে আটটা বাজিতে না বাজিতে আহাতিদি শেখ করিয়া সেই বে বীরেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, ফিরিয়া আসে কোনোনদিন রাত্রি আটটার পর, কোনোনদিন বা আসেই না।

নারায়ণীর এই কয়টি বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এমন দিনও গিয়াছে যে, তিন-চারদিন ধরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া জ্ঞানালার ধারে বসিয়া বসিয়া কান পাতিয়া সে প্রত্যেকটি পথযাত্রী পথিকের পায়ের শব্দ শুনিয়াছে, শামী তাহার চারদিন আগে সেই বে আপিস চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর আর কিরে নাই! কোথায় গিয়াছে, কি হইয়াছে, মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে,

কিছুই জানে না, ঘরে ফি নাই যে তাহাকে দিয়া কিছু খাবার আনাইয়া বাইবে, হাতে পরশী নাই যে জ্ঞানালার পথে ফিরি-ওয়ালার কাছে কিছু কিনিবে...প্রথম ছুটটা দিন এবং রাত্রি ঢুক ঢুক করিয়া শুধু জল খাইয়া অসহ উত্তেজ্ঞ এবং যন্ত্রণায় ছুটফুট করিয়াছে, তাহার পর তাহার ক্ষুধা গিয়াছে, তৃষ্ণা গিয়াছে, নিদ্রা গিয়াছে, কাদিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে, বন্দিনী বধু শুধু জ্ঞানালার পাশটিতে নিশপশে বসিয়া বসিয়া পরিত্রিত পদধ্বনির প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছে,—ঠাকুর, হয় তাহাকে ফিরাইয়া দাও, নয় আমার মৃত্যু দাও।

ভগবান মুঠাই হয়ত দিতেন, কিন্তু তাহার পূর্ণে শামী তাহার দয়া করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবু জন্মাইবার পর, আজকাল একাদিক্রমে তিন-চারদিন অশুপস্থিত আর সে হয় না। যদি হয় ত’ বড় ছোত্র একদিন। শনিবার সকালে বাড়ী হইতে বাহির হয়, ফিরিয়া আসে রবিবার রাতে।

ভালবাসিয়া, ভাল করিয়া বলিয়া বসিয়া নারায়ণী হায়রাণ হইয়া গিয়াছে। ছোত্র করিয়া বলিতে সে পারে না। বলিবার চেষ্টাও যে সে করে নাই তাহা নয়, কিন্তু, তাহাতে ফল কিছুই হয় নাই। কথাটাকে বীরেন হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে কিংবা হয়ত সে মার খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। (ক্ৰমশঃ)



বাঙ্গালার কাপড়ের কল

শ্রীনিহারঞ্জন মিত্র

• কিছুদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সারা ভারতে এ যাবৎ প্রায় ৪০০ কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর অহুপ্রেরণায় হাজার হাজার ঘরে লক্ষ লক্ষ চরকা ও তক্তালী চলিতেছে; তথাপি ভারত-বর্ষের চাহিদা মিটাইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৬৭ কোটি টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানী হয়। একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই ১৯৬২ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র বিক্রয় হয়, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত হয় মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় অর্থাৎ বাঙ্গালদেশের চাহিদা মিটাইতে যে-পরিমাণ কাপড়ের দরকার বাঙ্গালা দেশ তাহার ৩০ ভাগের এক ভাগও প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাভেই মনে হয় ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশে, কাপড়ের কল স্থাপনের আরও বহু প্রয়োজন আছে; তাহার এই বিরাট চাহিদা মিটাইতে কেবল মাত্র চরকা ও তক্তালীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আজ প্রায় ২৮ বৎসর হইতে দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ফলে স্বদেশী ব্রব্য ব্যবহার করিবার জ্ঞান দেশবাসীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ, বিদেশী বস্ত্রের সহিত অসম-প্রতিযোগিতা

হইতে স্বদেশী বস্ত্রকে রক্ষা করিবার জ্ঞান বিদেশী বস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক ধার্য হওয়ায় এবং বস্ত্র-শুল্ক উন্নীত হওয়ায় বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের স্বরূপ-স্বযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই আমদানী-শুল্ক আগামী ৩১-এ অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে; এবং তার পরেও বাহ্যতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিবার জ্ঞান এই ‘বিলটি’ অবধি দিন স্থায়ী হইতে পারে সেজ্জা ভারত গবর্নমেন্টের বাণিজ্য-সচিব স্তর জোসেফ ভোব বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টও গবর্নমেন্টের হস্তগত হইয়াছে; এবং যদিও গবর্নমেন্ট শেবেল্ট বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই তথাপি বাণিজ্য-সচিবের চেষ্টা যে ফলবতী হইবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে।

এই সকল নানা কারণে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে এই সময় বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক এবং কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করাই তাহার প্রধান উপায়। বাঙ্গালী যে একথা একেবারে না বুঝিয়াছে তাহা নয়। তাই আজ বাঙ্গালা দেশে তিন-চারটি কাপড়ের কল বিশেষভাবে কাজ করিতেছে



এবং আরও প্রায় লাভ-আটটা রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

সুন্দররূপে কাজ করিতে হইলে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কাপড়ের কল স্থাপন করিতে হয়। ঐ মূলধন কিরূপভাবে ব্যয়িত হইলে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা নিয়ে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।—

জমিদার ও গ্রহনির্মাণ	... ৩০০০০০
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি স্থাপন	... ২০০০০
কলকক্সা স্থাপনের ব্যয়	... ২৫০০০
২০০০ Spindle ও অজান্ত যন্ত্রাদি	... ৫০০০০
Engine, Boiler, Chimney ইত্যাদি	... ১৫০০০
Shafting, Gearing ইত্যাদি	... ৫০০০০
৬০০ তাঁত, যন্ত্রপাতি	... ৩৫২০০০
তুল, রঙ, প্রভৃতি কিনিবার জন্ত মূলধন	... ৫১০০০০
মোট	... ১২০০০০০

এই তো পেল মূলধন ব্যয়ের হিসাব। এইবার দৈনিক আর-ব্যয়ের হিসাব দেখা যাক।

নিয়মিত ভাবে মাল প্রস্তুত করিতে দৈনিক ব্যয়—	
২০০ মণ তুলার আনুমানিক মূল্য	... ৬৫০০০
হুতা প্রস্তুত করিবার ব্যয়	... ২৫০০০
বয়ন করিবার ব্যয়	... ৩০০০০
Establishment	... ২০০০
হুতা রঙ করিবার ব্যয়	... ৩০০০
অজান্ত ব্যয়	... ১৫০০
মোট	... ১২৬৫০০

আর দৈনিক প্রস্তুত মালের মূল্য—  
৬০০ তাঁতে ও ১৮০০০ পিণ্ডিলে ২০০০  
পাউণ্ড কাপড় হইতে পারে; প্রতি-  
পাউণ্ড ১৮০০ হিসাবে ঐ ২০০০ পাউণ্ড  
কাপড়ের মূল্য ... ১৫১৮০০  
১০০০ পিণ্ডিলে ১২০০০ পাউণ্ড মোট  
হুতা হইতে পারে;

উহার আনুমানিক মূল্য	... ২০০০
১০০০ পিণ্ডিলে ৪০০ পাউণ্ড রঙীন হুতা	
হইতে পারে; প্রতি-পাউণ্ড	১৮০
আনা হিসাবে উহার মূল্য	... ১০০০
মোট	... ১৬৭৮০০

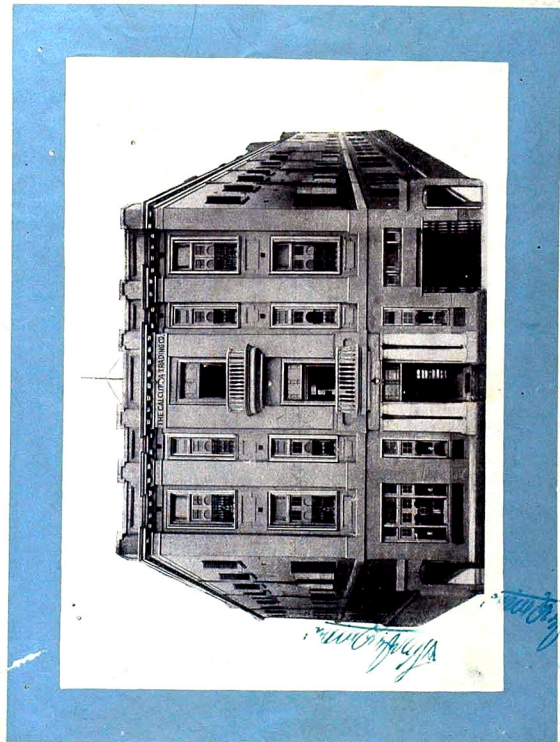
তাহা হইলে দেখা বাইজেন্দে যে, ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে দৈনিক আয় হইতে পারে ... ১৬৭৮০০ টাকা। আর, ব্যয় হইতে পারে ... ১২৬৫০০ "

দৈনিক লাভ ... মোট ৪১৩৩০০ টাকা

সুতরাং বৎসরে যদি ২৭৫ দিনও (রবিবার ও অজান্ত ছুটির দিন বাদ দিয়া) কাজ হয় তাপাতি বার্ষিক লাভ হইতে পারে ১১৩৭৮১২০০ টাকা অর্থাৎ গড়ে শতকরা ৫৫ টাকা লাভ।

যতদূর সম্ভব কম করিয়া লাভ দেখান হইল; কারণ বাজার উঠা-নামা এবং প্রস্তুত মালের কাটুতি করানর উপর লাভ নির্ভর করে। প্রস্তুত মাল কাটুতি হওয়া সম্ভবে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়; কারণ বাঙ্গালা দেশের এত বড় চাহিদা থাকিতে মাল কখনই আটকা থাকিতে পারে না। ইহার উপর বাজার যদি সমান ভাবে থাকে তবে লাভ যে আরও অধিক হইতে পারে সেকথা বলাই বাহুল্য।

কাপড়ের কল স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থান নির্বাচন করিতে হয়। নির্বাচিত স্থানের আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকা দরকার; রেল, নদী, রাজপথ প্রভৃতি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহাতে তুল ও অজান্ত যন্ত্রাদি আমদানী করা এবং উৎপন্ন করা দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। অধিকন্তু, বাহাতে নির্বাচিত স্থানে শ্রমিকের অভাবে বেগ পাইতে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকা দরকার।



উদয়ন-কাপড়ালয়  
৭৯, গোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা  
ফোন — কলিকাতা, ৩৩০১





বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” বাংলার সাহিত্য-জগতে নবযুগের প্রবর্তক। সেই পত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন —

“বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে ঝাঁসার কাফনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাহারা জানেন সেই অভভেদী শৈলসম্মাটের উদরবিরশিসমুচ্ছল তুষার-কিরীট চতুর্দিকের নিম্নে গিরিপারিধবর্ণের কত উজ্জ্বল সমুজিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে; একবার সেইটা নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রতীত বল সহজে অস্বাভাবিক করা বাইবে।”

এহেন “বঙ্গদর্শনের” প্রকাশমুখে পত্র-সূচনার মাসিক পত্র বাহির করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই —

“বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর অনাদর, বাড়িতেছে।……হ্রশিকিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিশ্ব বলিয়া, হ্রশিকিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনা বিশ্ব।

“আমরা এই পত্রকে হ্রশিকিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে বহু করিব। বহু করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সকলতা ক্ষমতাবান। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

“দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্র সম্ভাদাদের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বাস্তব স্বরূপ ব্যবহার করুন।……এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্পণ জ্ঞ বা কোন সম্ভাদার বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

“……বাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

“……তৃতীয়, বাহাতে নব্য সম্ভাদাদের সহিত আপামর সাধারণের সঙ্গদয়তা সঞ্চিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অস্বাভাবিক করিব।……”

এই “বঙ্গদর্শন” আবার ১৩৫৮ সালে যখন নব পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন —

“এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।……আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন … সকল সাময়িক কোলাহল হইতে নিজেদের স্বদূরে রাখা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

“……ভীষণতা, রুচিল্যপ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যানীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমাজনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদিগকে সেই ধ্রুবপথে স্থির রাখিবেন এবং সতর্ক লেখকগণ সেই দুর্গম পথে আমাদিগকে চালনা করিবেন।”







পাশ করেন। শেক্সপীয়ার-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপকম্বর “রো” এবং “টনি”র তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। “সুপ্রভাত” নামে বাংলা দৈনিক পত্রের এবং কয়েকখানি ইংরেজী পত্রেরও সম্পাদকীয় কার্যে অতীত্ৰবাধ কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে

অকালে ২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি বিশেষ সাহিত্যাহুবাগী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার শব্দ-কৌশলকানের মধ্যেই তিনি বহু কণ্ঠে নিযুক্ত ছিলেন। এই সাহিত্যসেবী কৃতী ব্যক্তির পুত্রই আজ তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া “উদয়ন” সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশে উজ্জোগী হইলেন।

## খেলাধুলা

### পরলোকে “রঞ্জি”

অগাধভাবে ক্রিকেট খেলোয়াড়, জামদগরের জামদাহেব রণজিৎসিংহী বিগত ২৪ এপ্রিল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মারা গিয়াছেন। রাজা হুগুয়ার পূর্ণে এবং বিলাতে অবস্থান কালে, তিনি সাধারণের নিকট “রঞ্জি” নামে পরিচিত ছিলেন। ক্রিকেট খেলার মাঠে “রঞ্জি”কে সেবিসে চারি-দিকে উৎসাহের সড়া পড়িয়া যাইত। তিনি ক্রিকেট খেলার যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এ মুগ্ধ কেহই সন্দেহ পাবেন নাই। ইংলণ্ডের হইয়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রতি-যোগিতার খেলা (Test Match) তিনি বহুবার নিজের খেলার গুণে ইংলণ্ডকে বাঁচাইয়াছেন। Sussex County ক্রিকেট

তাঁহার ব্যাট ধরার, পাড়াইবার এবং মারের সহজ ও সুন্দর ভঙ্গি, মারের দ্রুত বল ধরার (Fielding) এবং ধরকের আন্দোলন ও বিস্তারের কারণ ছিল। তাঁহার খেলা দেখিয়া সমুদায়রূপ বলিয়াছেন, তিনি উন্নতের ক্রিকেট খেলার “আর্টিস্ট” ছিলেন। তাঁহাকে “Idol of Cricket Grounds” অর্থাৎ “ক্রিকেট-ধরকের পূজিতজন” বলা হইত,—ব্যাপ্তিক তিনি ছিলেনও তাহাই। “রঞ্জি”র গুণে ভারতবর্ষ অর্থাৎ ভারতের প্রতিনিধি ক্রিকেট জগতে স্বর্গস্থান অধিকার করিয়া ছিল। “রঞ্জি” অবিবাহিত ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতৃমুখ প্রিন্স দিল্লিসিদ্ধীও ক্রিকেট



রঞ্জি

মঙ্গের কারণে হিঙ্গাবে বহু বৎসর তিনি অসাধারণ খেলার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গুরুত্বের পদাঙ্ক কৃতিত্ব দেখাইয়া ক্রিকেট জগতে চমৎকৃত করিয়াছেন। অঙ্গদয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আশীর্বাদ—সেউ অংলা বহু	১২৯
২। সংকৃত কবোবর অম্বাবাদ—শ্রীবীরজনাথ ঠাকুর	১৩১
৩। ছোটগল্প—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল	১৩২
৪। সর্গাণী (উপন্যাস)—শ্রীমতী অমৃতলা দেবী	১৩৭
৫। আদর্শ-স্বাধা—ডাঃ শ্রীবিজ্ঞাননাথ মৈত্র	১৪১
৬। অকপোদর (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৪৫
৭। অসময়ে (কবিতা)—শ্রীহাসিনী দেবী	১৪২
৮। বাংলায় অর্গাসভা-বিস্তার—অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ	১৪৩
৯। চাপা (গল্প)—শ্রীবীরজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	১৪৪
১০। জলাঙ্গী (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী	১৪৬
১১। সতী (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী, বি-এ	১৪৭
১২। শিল্প-বাণিজ্য—	
(ক) দেশীয় ফিল্মের ভবিষ্যৎ—শ্রীবিলাস	১৭৫
(খ) বেকারের ব্যবস্থা—বেকার-বান্ধব	১৭৮
(গ) চট্টের আসন বোনা—শ্রীকুমারমালা দেবী	১৮০
১৩। অনাগতা প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীরমেন্দ্র দত্ত	১৮২
১৪। চণ্ডীদাসের প্রেমশাসন—শ্রীভক্তচন্দ্রকুমার বসু, বি-এ	১৮৩
১৫। বাংলা ও বাঙালী শক্তির অভিব্যক্তি—শ্রীহরদাস পালিত	১৮৯
১৬। আকাশ ও ধরা (কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীপারীমোহন সেনগুপ্ত	১৯৬
১৭। পদগ্রন্থ ভারতবর্ষ—শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য	১৯৮
১৮। খেলাধুলায় বাঙ্গালী	২০৫
১৯। খুঁটিয়াটি	২০৭
২০। বৈশাখ-গুরু (কবিতা)—শ্রীজিতিকা দে	২০৮
২১। পশুরা—পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২০৯
২২। ভারবাহী (গল্প)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২১৮
২৩। রয়েল বেঙ্গল টাইগার (কবিতা)—শ্রীসুদর্শন মল্লিক, বি-এ	২৩২
২৪। কুলুগলিনী রহস্য (গল্প)—শ্রীবিমলচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ	২৩৩
২৫। প্রগতি—ভারতের গুরু অতিকায় সর্দার	২৪৪
২৬। নৃতন বই	২৪৬
২৭। ঘরে-বাইরে	২৪৭

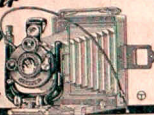






**Voigtlander**

**Die**  
**Kamera**



*der Anspruchs-vollen!*

জগতের আধুনিকতম

== ক্যামেরা ==

**Voigtlander Brilliant**

ইহার মত উৎকৃষ্ট ও বহু গুণ বিশিষ্ট ক্যামেরা করনাতীত অল্প মূল্যে (মাত্র ২২ টাকা) পূর্ণে কখনও বিরহ হয় নাই। অল্প কোন ক্যামেরা কিনিবার পূর্বে আমাদের দোকানে আসিয়া এই ক্যামেরা পরীক্ষা করিয়া যান বা বিবরণাদি চাহিয়া পাঠান, ইহা আমাদের একান্ত অহুরোহ। Voigtlander ১৭৭ বৎসর ধরিয়া ক্যামেরা প্রস্তুতকারকগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এই ক্যামেরার পরিচয় নিম্নয়োজন। যদি অল্পদামে একটি বাস্তবিক ভাল ক্যামেরা পাইতে চান, একটি Voigtlander Brilliant কিনুন।

**DWARKIN & SON**

The Best House for Music and Photo Goods  
11 & 12, Esplanade, CALCUTTA

হিমাংশু স্রো

“হৃদ গগনে পবন বহে  
সৌরভেতে মত্তরা।”

প্রসাদ্রনের  
অপূর্ণ সম্পদ

হৃদের সজীবতা রক্ষা  
করিয়া মুখশ্রী অটুট  
রাখিবে।

এডওয়ার্ডস  
টনিক

ম্যালেরিয়া  
ও অন্যান্য  
জ্বররোগে অব্যর্থ

বটক্রম পাল এণ্ড কোং  
বাহুবাক্সারিং কেমিস্ট্রি  
কলিকাতা



শ্রী অতনু সূ



## ଆସିନୀନୀନ

ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା  
 ଭାବନାରେ ଥିବାବେଳେ । ଆମା ଶ୍ରୀ  
 ଏହି ଭାବନାରେ ମାୟାରେ ଥିବା ଭାବନା  
 ଅନୁସାରେ ମାୟାରେ, ଏହା ଭାବନାରେ  
 ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଥିବା ଭାବନାରେ  
 ଭାବନାରେ ମାୟାରେ, ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା  
 ମାୟାରେ ଥିବା ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାତା

୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୦

୧୦୮୦



জ্যৈষ্ঠ

১৩৪০



## সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা পিন্টেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
গবেষণা কেন্দ্র  
৯৮/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

...সংস্কৃত কাব্য অথবা বর্ষে আমাদের মত এই  
• সে, কাব্যানুসার গড়ে ছাড়া বাংলা পড়লে তার  
গাভীরা ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। ছোট চারটি  
শ্লোক কোনো মতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ  
কাব্যের অথবা বর্ষে রূপপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা  
দুসসাধ্য। নিত্যন্ত সরল পথের তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল  
করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে ধ্বনিসঙ্গীত মারা  
যায়—অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসঙ্গীত অর্থদম্পদের  
চেহে বেশি বই কম নয়।

...বাঙালীর কান ব'লে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে  
ব'লে আমি মানিনি। মাহুদের স্বাভাবিক কানের  
দাবী অগ্রসরণ করলে দেখা যায়, মনোজ্ঞান্য ছন্দের  
চার পক্ষ, যথা—

মেঘালোকে ভবতি হুখিনো। পান্ডুখাত্ত্ব তি চেতঃ—  
মাত্রা হিসাবে ৮-৭-৭-৪। শেষের চারকে ঠিক  
চার বলা চলে না। কারণ, লাইনের শেষে একমাত্রা  
আন্দাজের মতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই  
ছন্দকে বাংলার আঁতে গেলে এই রকম দাঁড়ায় :—

দূরে ফেলে গেছ জানি,  
স্বতির বীণাখানি  
বাল্লার তব বাঁধি  
মধুরতম।  
অহুশমা, জেনো অগ্নি,  
বিরহ চিরজরী  
করেছে মধুময়ী  
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিতাক্ষর-রীতি অল্পবর্জন করা যেতে  
পারে, যথা—  
অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা কুণের তাই তারে  
দিলেন শাপ,  
নির্গাসনে সে রহি' প্রেরণী-বিচ্ছেদে বধ ভরি' শবে  
দাক্ষণ জালা।  
গেল চলি' রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারারে সহজাত  
মহিমা তার,  
সেখানে পাদপরাঙ্গি মিঙ ছায়াবৃত লীতার ধানে পুত  
সলিল-ধারা॥



## হোটগল্প

ঐ প্রমথ চৌধুরী

(১)

হোটগল্প, ভাষান্তরে উপকথা, হচ্ছে পৃথিবীর 'আদি গল্প'। এই উপকথাই বাঙালীর মুখে রূপকথা আকার ধারণ করেছে। আর রূপকথাই যে 'আদি হোটগল্প', তা' কে না জানে? এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই হচ্ছে উপকথার জন্মভূমি; অন্ততঃ এ কথা অবিসংবাদী যে, সম্ভ্রুত ও প্রাকৃত সাহিত্যে বহু উপকথা আছে, পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্যে তার শতাংশের এক অংশও নেই।

বৌদ্ধ-জাতক অসংখ্য। মহাভারত আর পুরাণেও অসংখ্য উপকথা আছে। সেগুলি যদি সব একত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহলে বৌদ্ধ-জাতকের চাইতেও পরিমাণে বেশি হবে। আর এই উপকথার ভিত্তির উপরেই সম্ভ্রুত কাব্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তারপর 'কথাসরিংসাগরে'র নামেই পরিচয় যে, তাকে কত কথা সংগৃহীত হয়েছে। আর পুতপক্ষীর চরিত্র ও ব্যবহার অবলম্বন করে যে কত উপকথার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চতন্ত্রে'।

এই অসংখ্য উপকথার সৃষ্টি করেছে নিরঙ্কর লোক-সমাজ, শিক্ষিত সাহিত্য-সমাজ নয়। দণ্ডী বলেছেন যে, "কথা হি সর্বভাষাভিঃ সম্ভ্রুতেন চ বধাতে।" এর থেকে অস্বাভাবিক নয় যে, দণ্ডীর কালে বেশির ভাগ উপকথাই মানুষের মুখে শুনে সেসবের কবিতা তা' লোক-ভাষায়, আর কোন কোন গল্প সম্ভ্রুত ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেন। এই বিপুল সাহিত্যের জন্ম লেবনী দেবনি, দিয়েছে রমনা।

বৌদ্ধ-জাতক মূলতঃ পালি ভাষাতেই লিখিত, পরে

তা' সম্ভ্রুত ভাষাতেও প্রমোদন পেয়েছে। 'বৃহৎ-কাণ্ড' পৈশাচী নামক কোনও অনিশ্চিত-প্রাকৃতক নাকি প্রথমে রচিত হয়েছিল, তারপর তা' 'কথাসরিংসাগরে' রূপান্তরিত হয়েছে। এর থেকে মনে হয় ভারতবর্ষই হচ্ছে বর্ণাখ্য হোটগল্পের দেশ।

(২)

সেকালের সাহিত্যিকগণ এসব উপকথা নিজের মাথা থেকে বার করেননি, কেবলমাত্র লোক-কথা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং অল্পবিত্ত রূপান্তরিত করেছিলেন। মহাভারত-পুরাণের উপাখ্যানাবলী, 'বৃহৎ-কাণ্ড' উপকথাসমূহ, জাতকর ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি, সবই লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণ মাত্র।

এই জনসমাজের সৃষ্টি উপকথাগুলি মানব-সমাজের যে চির 'আনন্দের সামগ্রী, সেকালের সাহিত্যিকগণ তা' বৃত্তে পেয়েছিলেন; আর ঐ সব উপকথা অবলম্বনে যে লোক-সমাজকে শিক্ষাদান করা যেতে পারে, তা' তাদের চোখ এড়িয়ে যাননি। তাই জাতকের গল্পগুলি বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত text-book; 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি রাজধর্মের text-book; এবং মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি হিন্দু ধর্ম ও আচারের প্রচারের কার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কিন্তু এসব দর্শন সম্বন্ধে উদাসীন, আজ পর্যন্ত এর অধিকাংশ গল্প তাদেরও আনন্দের সামগ্রী—কারণ "কথার অবিচ্ছিন্নতা" এ শিক্ষা দান করা হয়েছে।

এর পর আরবা ভাষার একটি অপূর্ণ গল্পসংগ্রহ

\* একাশোখ্য গল্পসংগ্রহের সুবিধাকরণ লিখিত।

## হোটগল্প

১৩৩

প্রকাশিত হয়। এবং এ আরবা-উপজ্ঞাস যে বিখ্যাত মানবের অতি প্রিয় বস্তু, তা' কে না জানে? অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, আরবা-উপজ্ঞাসের গল্পসমূহ ভারতীয় উপকথার ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত। এ অস্বাভাবিক আমি সহজেই গ্রাহ্য করি। কেননা, 'কথাসরিংসাগরে' এমন 'শুটকতক' গল্প আছে, যা' আরবা-উপজ্ঞাসে যেমতামু পূরে দেওয়া যায়। আর 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্প যে ইউরোপে অস্বাভাবিক মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রমাণ আছে। হুতরাং আমাদের জ্ঞাতিই যে হোটগল্পের প্রধান বর্গী ও ভোক্তা—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩)

এখন ইউরোপের দিকে তাকানো যাক্। গ্রীসের বিখ্যাত সাহিত্য এ-ক্ষেত্রে অস্বর্ণর। গ্রীক ভাষা 'আদি জানিনে, কিন্তু গ্রীক সাহিত্য যদি উপকথায় সমৃদ্ধ হ'ত, তবে সে সম্ভাব্য আমাদের কাছেও পৌঁছত। গ্রীসেও দেবদেবীর বহু উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলি হোটগল্পের পর্যায়ে বৃদ্ধ নয়। ও ভাষার 'পঞ্চতন্ত্রে'র অল্পগণ 'Aesop's Fables' আছে, যা' 'কথামালা'র প্রমাণ আমরা সকলেই জানি। এ 'কথামালা'র রূপ অতি চমৎকার। এত অল্প কথায় এমন সুখচিত্র এ-জাতীয় গল্প আর কেউ বস্তুত পেয়েছেন বলে জানিনে। এবং এই artistic গুণেই এ গল্পগুলি বিশ্বমানবের কাছে এত প্রিয় হয়েছে। এ গল্পগুলির স্রষ্টা লোক-সমাজই হ'ক আর যিনিই হ'ন, তিনি সাহিত্য-জগতের একটি প্রধান গুণী।

ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই, হুতরাং যে-সব গল্প-লেখকের নাম আমরা সকলেই শুনেছি, তাদেরই নাম কব্।

গ্রীকো-রোমান সভ্যতার অধ্যয়নের পর ইউরোপে কোণও অমর কথাসাহিত্য জন্মলাভ করেনি, সম্ভবতঃ 'এক রূপকথা ব্যতীত—সে-সব রূপকথা Grimm অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংগ্রহ করে, সাহিত্যের অস্বকুল করেন।

এর পূর্বে Renaissance-এর যুগে ইতালিতে 'আবার নব-উপকথা-সাহিত্য জন্মলাভ করে। ঐ যুগে ইতালির কথাসাহিত্যের মধ্যে Boccaccio সর্গশ্রেষ্ঠ। Boccaccio-র রচিত গল্পের ভিতর 'হুকটিও নেই, সুনীতিও নেই—এবং তিনি কোনরূপ ধর্ম-প্রচারের উপকরণস্বরূপ এসব গল্প লেখেননি। 'কিন্তু এসব গল্পের ভিতর ধর্ম ও নীতি না থাক, আট আছে। সর্গ-প্রকার idealty-র দিকে পিঠি ফিরিয়েও যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ নিয়ে চমৎকার গল্প লেখা যায়—এ সত্যের আবিষ্কার বোধহয় Boccaccio প্রথম করেন। এর ফলে ইউরোপের সকল ভাষায় এর গল্পগুলি অনূদিত হয়েছে, আর সেগুলি বহুলোকের নিকট পরিচিত।

মানুষের হাসি-কারার মূল যে তার অন্তর্নিহিত, এবং কোনও 'দৈবশক্তি'র অস্বগ্রহ বা নিগূহের উপর নির্ভর করে না—এই হচ্ছে বকাচিওর ফিলজফি। আর এই ফিলজফিই ইউরোপের নব-উপকথার অন্তরে রয়েছে।

(৪)

এর পর ইউরোপে নানা ভাষায় অসংখ্য Boccaccio-র অন্তরূপে নানা গল্প লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে-সব লেখকরা প্রতিভায় বঞ্চিত ছিলেন বলে তাঁরা কেউই সাহিত্য-সমাজে Boccaccio-র মত প্রকৃষ্ট লাভ করেননি; হুতরাং তাঁরা সাহিত্য-জগতে স্থপরিচিত নন।

তারপর ইউরোপে নতুন নামক নব-কথাসাহিত্য জন্মলাভ করলে—এবং দিন দিন এই নব সাহিত্য এমন বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, আজকের দিনে এ-জাতীয় সাহিত্যের তুল্য বিপুল সাহিত্য আর খিত্য নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালের চাম মাছলী হয়ে গেছে।

এর ফলে উপকথা আত্মীয় পড়ে গেল। লেখক ও পাঠক এ-জাতীয় সাহিত্যকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে হোটগল্প হোট-সাহিত্য বলে গণ্য হ'তে লাগল।

উনিশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রধান গল্প-লেখকেরা



প্রায় সকলেই নভেল-লেখক।" Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot, Balzac, Tolstoy-এর নাম কে না জানেন?

উপরোক্ত বড় ইংরাজ নভেলিষ্টরা কেউ ভাল ছোট-গল্প লেখেননি; কিংবা লিখতে পারেননি। অরশা নভেলের ভিতরও একটি গল্প থাকে; কিন্তু সে-গল্প নভেলের প্রাণ নয়। অপরপক্ষে গল্পই হচ্ছে ছোটগল্প ওরফে উপকথার প্রাণ। স্বতরাং যারা নভেল-লেখক, তারা ছোটগল্প লেখায় মনোনিবেশ করতে পারেন না।

আমরা এমন লেখকও আছেন, যারা এ উভয় জাতীয় সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত—যথা ফরাসী দেশে Balzac এবং রুশিয়ার Tolstoy। কিন্তু সত্যতঃ এ দুই শক্তি একই লেখকের হেঁদে থাকে না।

### (৫)

আমি পূর্বে বলেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ হচ্ছে উপকথার দেশ, আর বর্তমান ইউরোপ হচ্ছে উপকথার দেশ। অল্প তাই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উপকথা একরকম উপ-সাহিত্য হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ Maupassant নামক জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক ছোটগল্পকে আবার সাহিত্য-রাষ্ট্রের উভপদে প্রতিষ্ঠা করেন। এর কারণ, Maupassant-র গল্পের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য, তাঁর ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য, ইউরোপের পাঠক-সমাজকে যুগপৎ মুগ্ধ ও চমকিত করে। ইউরোপের সাধারণ পাঠক-সমাজ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা একবারেই Maupassant-কে একজন অসীম সাহিত্যিক বলে অবিধোষ স্বীকার করেন। বরং Tolstoy ত' তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন কথালীলা বলেন। এর ফলে তাঁর গল্পসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

আমি যখন কলকাতা পড়ি, তখন গল্প-সাহিত্যে Maupassant বাধা। এবং আমার বাঁ'রা সকলেই ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চা করতেন, অনেকেই তাঁর

গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলাম। ফলে, এ-মুগ্ধের বাঙালার ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হয়েছে। কি হিসেবে, তা' পরে বলছি। এখানে শুধু একটি কথা বলতে চাই। ইংলণ্ডের এ-মুগ্ধের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক Kipling-এর কোনরূপ প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নেই। এর কারণ, Kipling-এর কথা-সাহিত্য আমাদের কাছে প্রিয়ও নয়, অতএব পরিচিতও নয়। এক্ষেত্রে আমার ইংরাজী সাহিত্যের কাছে লজ্জা নাই।

### (৬)

তখনকার অনেক লেখক যে Maupassant-র কথাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর সে সাহিত্য যে তাঁদের মিয় ছিল—তার প্রমাণ Maupassant-র কতগুলি গল্প বাঙালা ভাষার বহুবীর অনূদিত হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর গল্পের অহরহরণ করেছেন কিংবা তাঁর গল্প ক্রমেই কয়েকন ব'লে ত' জানিনে। কারণ তাঁর গল্পের বিষয় চুরি করা যায়, কিন্তু তার রূপ চুরি করা যায় না। আর Maupassant-র অনেক কথার রূপ বাদ দিলে—তার বিষয় নিত্যকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রিয় হয়ে পড়ে।

তবে তাঁর গল্প-সাহিত্যের দ্বারা আমাদের গল্প-সাহিত্য যে অল্পপ্রাণিত, এ কথার যাকনি কি।

Maupassant-র উপকথা প্রাচীন উপকথার স্বভাব নয়। তাঁর কথা-রূপকথাও নয়, 'একাধিক সংস্করণবাহী' কথাও নয়, 'পঞ্চতয়ের' কথাও নয়। এসব কথা, লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণও নয়, অহরহরণও নয়। তাঁর সকল কথার প্রভাই তিনি নিজে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতি থেকেই এসব গল্পের মাল-মন্ডা সংগ্রহ করেছেন।

এর থেকে এই ভরসা পাওয়া যায় যে, এ-মুগ্ধে আমরা নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতির সাহায্যেই নব-কথা সৃষ্টি করতে পারি। উপরন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ছোটগল্পও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে গণ্য। গল্পের মর্যাদা, তার পরিমাণ নয়, তার গুণের

উপর নির্ভর করে। আমরা যদি যথার্থই শুধী হই 'ত' আমাদের গুণবানার পরিচয় ছোটগল্প রচনা করেও দিতে পারি। আর ছোটগল্পেরও কোন নির্দিষ্ট বিধায় নেই; কে-কোন বিষয় হ'ক না কেন, গুণীর হাতের সোনার কাটির স্পর্শে তা' জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'আটে' Content-এর মূল্যের চাইতে Form-এর মূল্য ঢের বেশি।

### (৭)

বাঙালার এ-মুগ্ধের গল্প-লেখকরা কেউই রূপকথা লেখেন না, আর বা-উপভাসও লেখেন না; সকলেই গল্প লেখবার নব পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ কাণ্ড বিবাস, এ-পথ প্রথমে আমিই দেখাই। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল।

আমি প্রথমে কলম ধ'রেই, "হুলাদানী" নামক একটি গল্প ফরাসী থেকে অহুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করিছি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হ'লেও, আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক Maupassant নন—Merimee নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক ব্যাতনামা সাহিত্যিক।

এর পর বাঙালী লেখকরা Maupassant-র বহু গল্প বাঙালায় অহুবাদ করেন। আমি যদি এক্ষেত্রে কোনও গুণ দেখিয়ে থাকি, তবে তা' অহুবাদের গুণ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ বলে গ্রাহ্য হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম "হিতবাদী" পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন; তারপর "সাধনা" তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনিই হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা; এবং এক্ষেত্রে তাঁর স্থিতি অদ্বুস্ত। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙালার

অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এর কারণ, কি ভাবে, কি ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া এ-মুগ্ধের বাঙালী লেখকদের পক্ষে একরকম অসম্ভব।

### (৮)

আমি পূর্বে যা' লিখেছি, তা' ছোটগল্পের ইভলিউশানের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস নয়; কারণ সে ইতিহাস লেখা আমার স্বল্প বিদ্যায় কুলোয় না। সেকলে ও এককলে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে একমাত্র পাঠক হিসেবে—ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। এই যুগে আমার এই জ্ঞান জন্মেছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে ছোটগল্পের 'আদি' জন্মভূমি। এবং সেকালে এ-দেশে গল্প জন্মেছে ঢের—অথচ সে-সব গল্প সকলে জ'য়ে বিকলে মরেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গল্প অমর। ভারতবর্ষের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের পরিবর্তন ইভলিউশানের কোঠায় ফেলা যায় না; কারণ, ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস মূল থেকে ফুল পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস নয়,—যুগে যুগে উত্থান-পতনের ইতিহাস।

আমরা আশ্রয় বেঁচে আছি, এবং মন নামক জিনিষটি আশ্রয় আমাদের দেহে আছে। আর মাগুনে বাঁকে সাহিত্য বলে,—তা এই মনেরই সৃষ্টি অথবা লীলা। আমার বিশ্বাস যে, এ-মুগ্ধে এই সাহিত্যিক মনের স্পষ্ট প্রকাশ বাঙালাদেশেই বিশেষ করে দেখা যায়।

ছোটগল্প যখন সাহিত্যের একটি সনাতন ও প্রধান অঙ্গ—তখন বর্তমান বাঙালায় যে তা' ফুটে উঠে, এতে আর আশ্চর্য কি?

আর একটি কথা বলেই ছোটগল্পের এই পরিচয় স্পষ্ট দেখা যায়। ছোটগল্প বহুবীরও একই আঁট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আঁট নভেল-লেখার আটের চাইতেও কঠিন। কারণ এ-জাতীয়



গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার করে নিতে হয়, পরে ভাষায় মুগ্ধ করতে হয়। নভেলের মত এতে নানা কথা বলবার অবসর নেই। তবে এ আট কেউ কটকটে শেখাতে পারে না। নিষেধ করনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা' লেখক স্বয়ংই আবিষ্কার করবেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেনম বিচিত্র, তার আর্টও তেনমি বিচিত্র।

৩০-৪-৩৩

### “উদয়ন” ‘পোস্টার’ (Poster) প্রতিযোগিতা

রাস্তার ধারের দেওয়ালে “উদয়ন”-এর বিজ্ঞাপন দিবার উপযুক্ত একটি ভাল রঙ্গীন চিত্রের (চার রঙে আঁকা) জ্ঞান উপরোক্ত প্রতিযোগিতায় ১৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার ছবি পাঠাইবার শেষ দিন ছিল ৩০শে এপ্রিল।

প্রতিযোগিতার বিচারকগণ (চিত্রকর ত্রীমূল দত্তজ্যোতীন্দ্র সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে) শ্রীমূল শতীন্দ্রনারায়ণ দাস মহাশয়ের অধিকৃত চিত্রটি পুরস্কারের ঘোষণা স্থির করিয়াছেন।

পুরস্কার সম্বন্ধে বিচারের সময় চিত্রের মৌলিকতা, আঁকার উৎকর্ষ এবং রঙের সমাবেশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ছবিটির একটি ছোট এক-রঙা রক এবার ছাপা হইল। বলা বাহুল্য, মূল রঙ্গীন চিত্রটির সৌন্দর্য্য এই ছবিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে। মূল চিত্রটি ২০×৩০ ইঞ্চি আকারে চার রঙে অঙ্কিত। শ্রীমূল ইহার পূর্ণাঙ্গার ছাপা ‘পোস্টার’ কলিকাতা এবং মধ্যপ্রদেশের রাস্তার দেওয়ালে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রতিযোগিতায় আরও কয়েকটি ভাল ছবি আসিয়াছিল; পুরস্কৃত না হইলেও সেগুলি উল্লেখযোগ্য। সম্ভব হইলে তাহাদেরও ছোট রক আমরা ভবিষ্যতে ছাপিব।



শিল্পী — শ্রীমূল শতীন্দ্রনারায়ণ দাস

[ এই চিত্রখানি উদয়নের প্রাচীর-চিত্র প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় ও শিল্পীকে দেড়শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় ]



# সর্বাণী

(উপজাতি)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ণাঙ্গবৃত্তি]

( ২ )

স্বপ্নের বয়স কত-তা' আমাদের ঠিক জানা নাই; রঙটি বেশ হরিতাল-ফলানো, চুলগুলি সাদা ধবধবে, এক সময় হয়ত চুলে কলপ পড়িত, এখন আর পড়ে না; দাড়ি-পোঁক কামানো, দোহারী গড়ন, উচু নাক, চোখেরও টান আছে, বয়সেও তার জ্যোতি হারায় নাই, দাঁতগুলি বেশ সাজানো ও স্বচ্ছক, যদিও সেগুলি এখন আর নিষের নয়—  
বাঁধানো। পরণে পরিষ্কার সাদা ধুতি-পিরাম, পায়ে বোধকরি মেয়েরই হাতে বোনা রেশমী কাজকরা স্লিপার; সকালবেলা যখন বাগানে বেড়াইতে যান, হাতে একগাছি রূপার মুখ-বাঁধানো সৌরীন ছড়ি থাকে, জুতাটাও বদলাইয়া পরেন, আর সবই ঠিক থাকে। পাকা চুলগুলি সকল সময়েই পরিপাটী করিয়া আঁচড়ানো। জন্মকাল হইতেই যে ভোগে, যুখে, সন্তোষে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহার সকল-কিছু চিহ্নই এই মাথার সমস্ত বেঁধে-মানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে দেখা যায়; চলিত ভাষায় যাকে বলে সৌরীন।

কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন হইতে তাঁহার একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। সাজপোষাক অবশ্য ঠিকই আছে, চেহারাও কিছুমাত্র বদলায় নাই; কিন্তু পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে যেন এই স্বন্দর এবং সুসজ্জ বুদ্ধ ব্যক্তিটির মন। অবশ্য চিরদিনকার অভ্যাসে অভ্যস্ত পাকা বিষয়ী মন সহজে যে বাগ মানিতে চাহে, তা নয়; কিন্তু সে বে আজ তার চিরভ্রান্ত পরে আর শান্তি পায় না, সামান্য খুঁজিয়া ফেরে, এ সত্য কথা। অভ্যাসমত তিনি করিয়া যান সবই,

এমনকি দানের জলে টয়লেট ভিনিগার দেওয়া আছে জানিয়াও তাঁতে আপত্তি করেন না, দানের পর নিত্যকার মতই ধরে-তোলা মাখম মাখিয়া পেশোয়ারি চাঁলের ভাত সমান পরিমাণেই মুখে তোলেন; ভাপা দই, আদুরের পাইস, বাদশাভোগ বা রাজভোগ যেমন বরাবর ঘরেই তৈরি হইত, আজও হয়; রূপার ঢাকাই কাজ-করা রেকারে তা' নামনে আসে, শেষও হয়, কিন্তু স্বাদ-গ্রহণ হয়ত বা আর ঠিক তেমনটি করিয়া হয় না। মন যেন উদাস উড়ন্ত হইয়া থাকে; সর-বসান ঘন ঘূর্ণের বাটতে তিনি মুড়কি কেলা আছে, ভাত যে তাঁতে পড়ে নাই অথচ আদুল দিয়া ভাত মাথার একটা মিথ্যা অভিনয় গভীর অস্ত-মনস্তায় চলিতেছে, একথাটা আবার আর-একজনকে ঈষৎ একটুখানি গম্ভীর রান হাসি হাসিয়া স্বরণ করাইয়া দিতে হয়; দিতে গিয়া যে দেখে তার জ্বর মথিত করিয়া একটা সময়ে চাপিয়া রাখা দীর্ঘশ্বাসের একটুখানি গলার কাছে ভাসিয়া আসে; সেটাকে সামলাইতে তাহাকে ঈষৎ নত হইয়া পাখার হাওয়ায় একটা কল্পিত মাছিকে তাড়াইবার জ্ঞ বাস্তবাপ্ত হইতে হয়। আবার নিজের অস্বনিহিত গভীর বিবাদাঙ্কর উদ্মনতা প্রটার নিকট উজ্জ্বল রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় কোনমতে একটুখানি সৈতে হাসি হাসিয়া তিন আঙ্গুলে চারটি ভাতের দানা তুলিয়া লইয়া উঠাকেও জবাব দিতে হয়, “ক্ষিখে নেই ব'লেই নিইনি রে; আজ্ঞা ছুটি নেওয়াই যাক।”

তিনিয়া পাখার বাতাস দিতে দিতে যে শোনে তার—



বৃক একটুখানি তারি হইয়া উঠে, দীর্ঘশ্বাস চাপিতে আরও একবার চেষ্টা করিতে হয়। এমনি করিয়াই তাদের হৃৎকানর মধ্যে লুকাচুরির প্রয়াস চণ্ডিতে থাকে, কলমে কে কতখানি যে সকল হইতে পারে বলা যায় না, কিন্তু এটুকু বলা যায়, সকল বিষয়ের মতই এক্ষেত্রেও সেই তরঙ্গীর বিস্তারলাভ হয়ত বা কথঞ্চিৎ ঘটে; প্রবীণটির আত্মস্থান রক্ষা বৃষ্টি আর হয় না, এমনই তাঁর অবস্থাটা হইয়া দাঁড়াইতেছিল। বে-কোন দীর্ঘশ্বাস-হুত্বী বাধ্য রোগেরই মত, যতই দিন যায় অখনতির নিকে ততই নামিয়া আসে; উত্ততির লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় না, লক্ষ্যও থাকে না। যে একজনই শুধু লক্ষ্য করে, এবং কে যে ইহার উপলক্ষ্য তাও জানে, তাঁরই প্রাণের ভিতরে শুধু পুঞ্জীকৃত হইয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসগুলি জন্মিয়া উঠে, বৃকখানা পাখরের মত ভারি হয়, চোখে জল পড়ে না, সমস্ত মনটা শুধু গুমোট-ভরা ব্যাণ্ডমেথ বিরহিত-বর্ণণ রিবসের মতই ধমধমে হইয়া থাকে, যে অবস্থায় আকাশকে বর্ণমুখর জলধারে অবনত সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, অথচ তার বিদ্যুতি পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিতে দেয় না,—সে সর্পাণী—সে এই স্বরজনই বলে।

বাপেন্দ্রের মতো রাসের যে রকম তাকা, তাতে পিতামহ-পৌত্রীর স্পর্শক মনে করাও বিচিত্র ছিল না, অনেকে হত করেনও। সর্পাণী এর অনেক বদলের মেয়ে; তার মা বোধ করি তার বাপের বিত্তীয় কি ভৃত্যীয় বারের বিবাহ-করা দ্বী, সেইজন্তই হয়ত পিতা-পুত্রীতে বদলের এতটা প্রভেদ। তার মা কোথায়? জীবিত কি মৃত—সে-কথা আমাদের জানা নাই; বাড়ীর বাহিরের যেকোন একদিকে কি বলে না বলে সে-সব কথা আমরা স্পষ্ট ভনিতো পাইই না, তবে কি বেন সব বলে। ভক্তঘরের মেয়েদের সখকে কোন অভদ্র কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না, নিদ্বেষের সংখ্যাও এদেশে একটু বেশী, তাই এ সম্পর্কে কোন কথা আমাদের না তোলাই ভাল; আমরা জানি সর্পাণীর মা নাই। কবে গিয়াছেন, কিসে গিয়াছেন—এই সব কুট প্রব্রের উত্তর দিতে পারিব না, নাই—এই

পর্য্যন্ত জানিনেই হইল; তবে এটুকুই বলিতে পারি—সে-ঘটনা ঘটয়াছিল অনেক কাল আগেই, এই সর্পাণী—বোড়শী সর্পাণী তখন প্রায় শিশু, আর সে-ঘটনা এদেশে থাকিয়াও ঘটে নাই। সে-ঘটনা ঘটয়াছিল স্বরজনের কর্মজমিতে হৃদয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটা স্থলপ্রসিদ্ধ সংঘে; সে-সংঘের এই নিতৃত বরণপন্ন-নিবাসী আজিকার দিনের এই দিন-যেহের নিীমান-রোখার সমুদ্বিহতপ্রায় বৃদ্ধ স্বরজন একদিন তাঁর সিবিল জজের কর্মস্থলস্থান কিছু-দিনের জন্তও বসবাস করিয়াছিলেন, যেখানকার স্থপ্রেমর জাহ্নবীতীরে তাঁর একটি উজান-বেষ্টিত স্থলর বাগো-বাড়ী ছিল, যে-বাড়ীখানি তিনি নিজের হাতে মনের মত করিয়া গাছাওয়া নাম দিয়াছিলেন “প্যারাডাইস”; বলা উচিত, তখন ইংরেজীভাষার দিলেই তাঁর মনটা কিছু বেশী রকম হুঁকিয়াছিল, এবং সেই বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই তিনি “প্যারাডাইস-লষ্ট” হন। তারপর তিনি আরজী পাঠাইয়া দেশেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে যান, তারপর আরও কত দেশ-দেশান্তরে ঘোরাঘুরি। আজ পাঁচ বৎসর হইল দেশেন্দ্র নইয়া নিজের পৈত্রিক বাসভূমে—নিজের পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁদের আরও কয়েকজন সখিক ছিল। স্বরজনের জ্যোতামহাশয়ের পাঁচ ছেলে, পাঁচ বউ, বৃহৎ গোষ্ঠী; এই বাড়ীতেই থাকিত; বাড়ীর অংশ এখন তারা সবাই মিলিয়া স্বরজনের কাছে বসিয়া দিয়াছে। পিতামহের উইলোই নাকি একথা বলা আছে যে, বাড়ী কোন দিন পাটিল ভুলিয়া ভাগ করা চলিবে না, একজনকে কিনিয়া এইতে হইবে, বরাবর এ নিয়ম না চলে তো বরং অপর শোককেও বেচারী আপত্তি নাই; কিন্তু এক বাড়ীতে বসিয়া খাওয়া-বাওই করিতে-করিতে এখানে-সেখানে পাটিল দিয়া বাড়ীর হাওয়া-বাতাস বন্ধ করা অসম্ভব। যিনি এই বাড়ী গাঁথাইয়াছিলেন, মরণের পরেকারও একদৃষ্ট তাঁর সখ হয় নাই।

তাই স্বরজনই আজ এই মত্তবড় বাড়ীটির একমাত্র উত্তরাধিকারী, আর তা' হওয়ার তাঁরই পক্ষে সুবিধা ছিল। এক ভো উহার পাচ জনে অর্ধেক, আর তিনি একাই অপর অর্ধেকের মালিক ছিলেনই, তার উপর মোটা মাহিনার চাকুরী তিনিই করিয়া আসিয়াছেন; এদিকে আবার পাণ্ডাও কম, হাতে যথেষ্ট নগদ টাকাও ছিল, এদের কারও টাকা দিয়া এ-বাড়ী রাখা সম্ভব নয়; বরঞ্চ নগদ টাকা হাতে পাইয়া ছোট-বাট বাড়ী কেনা, অথবা মেয়ের বিয়ের ধার শোধ দিয়া ভাড়া-বাড়ীতে বাস করা—এই রকম যার বৈদিক হইতে সুবিধা সেই মতন ব্যবস্থা করিয়া লওয়া—সে ভালই হইয়াছিল। স্বরজন অশ্রদ্ধ কাহাকেও উঠিয়া যাইতে বলেন নাই, এত বড় বাড়ীটিতে তারা থাকিয়া অনায়াসেই আরও অনেকই এর মধ্যে বসবাস করিতে পারিতেন, তবে যার যেমন মর্জী। লোকেরা তা নিজের দিকের সুবিধা-অসুবিধা খতাইয়া দেখিবে। কারও ছেলের পড়ার জন্ত সহরে থাকা দেহাৎ দরকার, কারও চাকুরীর বাতির নীতবর্ধা-নির্দিশেবে “ডেলি পোস্টমারী” করিতে করিতে প্রাণ যায়, বরের পোষেরও ভোর সকালে উঠিয়া নিতাই ভাত জ্বোণানোর হড়াভড়ি,—তার চাইতে সহরে গিয়া বসাই ভাল, মেয়ে ছাউণ্ড ভো ভাগর হইয়া উঠিতেছে, বরের বাজারও কিছু সস্তা হয় নাই, খোঁজ-তলাস ভো এখন হইতেই করিতে হইবে, এত দূরে বসিয়া সে-সব করে কে? একজন স্পষ্ট বলিলেন, “নিজের ঘরেই আর পরবাসী খঁতে পাব না, দাদা! তার চাইতে ভাড়া দিয়ে থাকব, সে তবু আপন ভাবুতে পাব। ভাড়া যদি নাও তো থাকি।”

স্বরজন এ-প্রস্তাবে রাজি হন নাই, হইলোই হইত—তা' হইলে সারা বাড়ীটা ভুতের বাড়ীর মত অমন করিয়া থা'ই করিত না; কিন্তু হাজার-হটক, হাকিরী মোজা, ছোট ভায়ের প্রণাবে থা' করিয়া রক্ত পরম হইয়া গেল। তার আত্মস্থান-বোধে তৃপ্ত না হইয়া বরং কষ্ট হাস্য উচ্চ স্বরে জবাব দিলেন,—

“বাপ-পিতামহর বাড়ীতে বসে তাঁদের রক্ত মাদের গায়ে ধয়েছে তাদের কাছ থেকে সেই বাড়ীরই ভাড়া শুণবো, এতটা ছোটলোক বোধ হয় এখনও হ'তে পারিনি। তার চাইতে ভূমি না থাক, সেও বরং হইবে।”

ছোট ভাইও সমান মুখে জবাব দিল, “বেশ।” তারপর একদিন শুভদিন দেখিয়া সে সপরিবারে চলিয়া গেল। তার দ্বীটি কিন্তু তার চাইতে হিঙ্গাবী, বলিল, “ভাঙ্গুরাঙ্কুরের তো ছেলে নেই, কাছ থেকে সেবা-স্বর করলে হয়ত এর পর এ বাড়ী-ঘর সবই আমাদের নেপালের হ'লেও হ'তে পারত; থাকতে বলছেন, থেকে গেলেই হ'ত না?”

কিন্তু কলিকাতায় নিজের মেজ ভাই-এর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাসা গহিলে তাদের নাকি যথেষ্ট সুবিধা হইবে; সেইজন্ত সৈমিক হইতে বিত্তর প্রয়োচনা আসিতেছিল। বুদ্ধি একটু মোটা বাদের তারা বড় ভবিষ্যতের পানে তাকাইতে চায় না, চোখে তাদের ‘স্টেট মাইট’, কবে কি হইবে বা হইতে পারে, তার জ্ঞান বর্তমানের মুননন্দের সোভ এবং লাভ সে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। কলিকাতার বাসা ছোট, ঘর সর্পাণী, তা হইলই বা! সেখানে রোজ বায়োথোপ দেখায় না? হুধ্যায় তিনটি দিন খিরেটার হয় যে। চেষ্টা-চরিত্র করিলে ডিরেক্টর অথবা অভিনেতাদের স্পর্শক বা নামচেনা স্পর্শক ধরিয়াও পাশ ঘোষাও তো হয়ই, আবার একলা গেলে পরমাই বা কত লাগে? বরঞ্চ, সেমেনেড, আইসক্রিম সোডা, কেক, চপ্প, ক্যান্টেল কত কি তার হিসাব আছে? দুঃভেরি বড় বাড়ী আর তার হাওয়া-খেলা বড় ঘর! ওর ইট কাম্‌ডাইয়া কি চকোলেটের খাদ মিলিবে? যার খুসী হয় সে থাকে যেন, তাহার খারা হইবে না। তা ছাড়া কথায় বলে, ‘পরভাতি হ'য়ো তবু পরভারি হ'য়ো না।’ এ-বাড়ী তো সেই পরের ছাড়া কিছুই নয়; এখান হইতে ‘দূর’ বলিলে, তো তখনই দূর হইয়া যাইতে হইবে, না? তা' না গেলেই পুণিহা হইয়া বাহির করিবার, ও'র ‘রাইট’ নাই নাকি? মনে ভাবে?



বৃষ্টিগুলি অবশ্য ভালই। বউট বাসর শুঁছাইয়া, বিছানা বাঁধিয়া, ছেলেরদের গায়ে বাহির হওয়ার মত করিয়া কাপড় পরাইল; তারপর নিজের সাজ-গোছ করিয়া লইয়া সর্দারীকে বলিল, “চল, তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসি।”

সর্দারী সমস্তক্ষণ হানসুখে ছোট-গুড়ির কাছে-কাছে গাধিয়া তার বাঙার সাহায্য করিতেছিল, অথচ তারা দু'জনেই জানে, এ চলিয়া-নাওয়ার তাদের দু'জনকারই মত নাই। মধ্যে-মধ্যে বখন ছুটিছাটার সর্দারীয়া বাড়ী আসিত, তা' ছাড়া নেপালের ম্যাসেরিয়ার স্থান-পরিবর্তনের জ্ঞান মাসকতক একবার সর্দারীদের পশ্চিমের বাসায় কাটাঁয়া আসাতে এই গুড়িমাটির সঙ্গে তার বেশ একটুখানি স্ফুটতা জন্মিয়াছিল। বয়সে দু'জনের তফাৎ ছিল, কিন্তু সে খুব বেশী নয়।

স্বপ্নরসকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “ধাক, ধাক মা, বখনই কিছু দরকার মনে করবে, সবুকে পর গিবে আমার জানিও।”

বউট ফিস্ফিস করিয়া সর্দারীকে উপলক্ষ্য রাখিয়া কহিল, “সে তো জানাচ্ছেই হবে; আমার খবর নেই, বাতুড়ী নেই; আপনাকেই তো জানি, আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে?”

বউট চলিয়া গেলে স্বপ্নরস একটি দীর্ঘনিশ্বাস কেঁদিয়া ধানিকপনে বসে বড়ই অজমনগ্ন হইয়া এক দিক্ পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর বখন পড়িতে পড়িতে নামাইয়া বাবা বইখানা তুলিয়া লইয়া আবার তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন, তখন আরও একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর নাসারন্ধ্র হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বাহিরের নুক্ত বায়ু-তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। এ-লোকটির সভাবই যেন এমন। উজ্জ্বল বড় একটা কোন বিষয়েই নাই, অথচ মনের মধ্যে সে বড়-রকমেরই একটা বাগা লাগে তা' ঐ উচ্চ বাম্পাচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসটুকু হইতেই ধরা পড়ে। সবাই অবশ্য এ'ও জানিতে পারে না, জানে শুধু সর্দারী। আর তা' জানে বলিয়াই টেটুকু বাঁচাইয়া চলিবার জ্ঞান চেঁচীও বৃষ্টি সে বড় কম

করে না; অথচ বিধিবিধি কি যে বলবৎ! সেই তাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি না চিরকোতুক-প্রিয় নির্মম বিখ্যাতা তাঁর জ্ঞান এমনই এক কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন যে, সেই ছুঁতে বাহুর মধ্যে পড়িয়া দু'জনকারই প্রাণায় হওয়ার উপক্রম হইলেও তার জটিলতার অস্ত হইল না, বৃষ্টি কোনদিনেই তা' হইবেও না। এমনই করিয়া দু'জনকার সঙ্গে দু'জনকে লুকাছুরি-খেলা করিয়াই বৃষ্টি জীবনান্ত করিতে হইবে, অথবা—না; এর কোন কুল-কিনারা খুঁজিয়া সেল না। গভীর মেঘাচ্ছকারে দিগ্ভ্রাস্ত নাবিকের মতই তাদের দু'খানি জীবন-তরণী আশ্চর্যের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোন প্রবৃত্তির পথে—কোন অনির্দেশের উদ্দেশ্যে যে তা' বহিয়া চলিয়াছে, তার কি কোন হিসাব আছে? না, না, নাই, নাই—মনে হয় যেন অসীম কালযোতে এমনই করিয়া তাদের চিরমুগ্ধ-মুগ্ধতা বাবাই ভাসিত হইবে, কূল হারাইলে কূলকে আর তারা যেন এই অকূলের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

কান্দন-সন্ধ্যায় আশ্রমকুল চারিদিকে গন্ধ বিলাস, কত মধুলুঙ্গ মধুকরকে সে তার বোজানবিসারী মন্দির স্বগন্ধে আনন্দিত করিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনে; কাল-বৈশাখীর প্রবল ঝড়ে উড়ুনির তমাল-পিয়ালের উচ্চ শাখা বসিয়া পড়ে, ভূটনীড় বিহঙ্গের মরণান্ত উচ্চ রব সন্ধ্যাকার ভৈরব গর্জনে ভূবিধা যায়; বর্ষার জলধারে শুক হ্রা পুনরুদ্রিত হয়; কিন্তু ছন্দোভট জীবনের হারানো স্বরটুকু সিরিয়া আসে না। ছিন্নশ্রী বীণার মত তাহা কি চির-বেসুয়াই রহিয়া গেল? এমনই করিয়া জীবনের দিন ক্ষয় হইতেছিল ঐ পিতা এবং পুত্রী, অর্থাৎ স্বপ্নরস এবং সর্দারী।

কিসের জন্ম? তার অনেকে অনেক রকম অহুমান করে, কোনটাকেই কিন্তু সমীচীন চেকে না। কেহ বলে রূপণ, কেহ বলে অস্বাভাৱী, আবার বেশী-ভাগ লোকেই বলে খেয়ালী। মনে হয় যেন এর একটাও না।

(ক্রমশঃ)

## আদর্শ-স্বাস্থ্য

ডাঃ ত্রিবিজ্ঞেন্দ্রনাথ মৈত্র



[ডাঃ ডি. এন্. মৈত্র মহাশয়ের 'নাম ভারতের বহুশ্রমে ও যুগোপের বহুলোকের মধ্যে গুণবিভিত। তিনি শুধু যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও শল্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক তাহা নহেন; 'বঙ্গীয় সমাজ সেবক সমিতি'র (Bengal Social Service League) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তৃপক্ষরূপে ছায়াচিহ্ন যোগে বঙ্গভা ও স্বাধাশ্রমণীর দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সমাজের মধ্যেই বিতরান করিতেছেন। সম্প্রতি রাশিয়া প্রভৃতি যুগোপের বহুশ্রমে লবণ করিয়া তিনি যে এন্ড্রু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, আলোক-জি ও চলচ্চিত্র যোগে বঙ্গভা এবং প্রবন্ধাদির দ্বারা তিনি দেশমধ্যে তাহা প্রচার করিতেছেন।

স্বাভাবিক সংক্ষেপে ডাঃ মৈত্র মহাশয় একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি আমাদের এই পত্রিকায় দ্বাৰাবাহিক ভাবে স্বাধা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বসিতে হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাগণে বদ্ধ করিয়াছেন। — উঃ মঃ ]

## প্রথম অধ্যায়

### নৃতন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

কোনও তথ্য বা তত্ত্বকে একাধীন বা আংশিক ভাবে দেখিলে তাহার পূর্ণ বা অর্থও সত্যাপত্তি আমাদের সমুখে প্রতিভাত হয় না। আর কোনও বিষয়কে যথাসম্ভব সর্দারীনা ভাবে দেখি বা বলিয়াই আমাদের মতে-মতে হয় বিরোধ, আর প্রচেষ্টাসমূহ হয় না তেমন সার্থক! “অন্ধের হস্তীদর্শন”এর গল্প এদেশে কাহারও নিকট প্রায় অবিরত নাই। যে ‘দেখিয়াছে’ কাণ, সে বলিয়াছে হাতী কুলোর মতন; যে ছুঁইয়াছে পা, তার কাছে হাতী গামের মতন, আর হাতী যে এক-গাছি দড়ির মতন সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না তার কাছে, যার হাতে পড়িয়াছে কেবল তার লেজ। আমরাও সেইরূপ নিজ-নিজ শিক্ষা

ও সংস্কারের ‘নল’ বা প্রণালীর ভিতর দিয়া যেটুকু দেখি বা দেখিতে পাই, সেইটুকুই আমাদের কাছে সত্য বোধ হয়, তাহার বাহিরে যেন আর কিছু নাই। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, কোনও বিশেষ সাধনার সময় আমরা অঙ্গ বা ক্ষেত্র বিশেষের উপর দৃষ্টি ও মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণেই প্রয়োগ করি; করিলেও সেই অংশের সহিত পূর্ণের যে যোগ বা সঞ্চ, তাহা যদি বিস্তৃত হই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি তেমন সমাক ও সমগ্র হয় না, সাধনাও তেমন দৃঢ় হইতে পারে না।

### আদর্শ জীবন

জ্ঞাতদারেই হোক, আর অজ্ঞাতদারেই হোক,



আমরা সকলেই বোধহয় চাই যে আমাদের জীবন-স্বন্দর হোক, নিশ্চয় হোক বা সকল দিক দিয়া পূর্ণ হোক। এইজন্য **সর্বাসঙ্গমের জীবন** কাহাকে বলি? না, যে জীবন—

**সুস্থ**—শরীরে ও মনে সমভাবে সুস্থ, পরিভা ও চরিত্রবান;

**স্বাধীন**—জ্ঞানের দ্বারা আত্মজয় ও প্রেমে স্বাধীনতার দ্বারা স্বত্বকে আত্মস্থাপন করিয়াছে;

**কর্মাশীল (ও কর্মঠ)**—সেবার ও দানের—যে সেবা মাছুষ ও সমাজকে গভিয়া ঢুকিতে চায়; যে দান কেবল অর্থের নয়—জ্ঞানের, ভাবের এবং চিত্তেরও;

**ও দীর্ঘায়ু**—জীবদ্দত্বে নয়—সজীব ও সক্রিয় অবস্থায়।

আদর্শ জীবনের ইহাই মরি সজ্ঞা হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই সকল সজ্ঞার মূলেই স্বাস্থ্য। শরীর ও মনে সুস্থ না হইলে মাছুষ স্বাধীন হইতে পারে না, কর্মঠ হইতে পারে না, দীর্ঘজীবীও হই না।

শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বারবার বলিতেছি এই জন্তই যে, দৈহিক স্বাস্থ্যের সহিত মনের স্বাস্থ্যের বোণ না হইলে স্বাস্থ্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এই মানসিক স্বাস্থ্যের কথা পরে আলোচনা করিব।

### স্বাস্থ্য ও জাতীয় প্রগতি

বহুলোকে বহুদেশে বহুকালে বহুবার এই কথাই বহুপ্রকারে বলিয়া আসিয়াছেন যে, **স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নহে।** আজ আমরা জাতীয় প্রগতির বিরাট অভিযানের পথে সকলে জাগ্রত ও প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ ও দুর্গম বাতাপথের জন্ত কি পাথের সমস্ত করিয়া সঙ্গে লইতেছি?

একটা ছোট গল্প মনে পড়িল। মাঘের শীত; ভোর বেলা; ঠাণ্ডা কন্দুকে হাওয়ার নদীর গা

শিহরিত; একখানি নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। গগার ধারে এক তিনতলা বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া বাবু বালাশেখ মুক্তি দিয়া হুঁ দিয়া-দিয়া গরম-গরম চা পান করিতেছেন। হালের মাখি বসিয়া-বসিয়া শীতে কাপিতে-কাপিতে পাড়ীকে বলিতেছে, “বড় মথ হয়, অমনি ক’রে ব’লে কোনও একদিন গরম-গরম চা হুঁ দিয়ে-দিয়ে খাই।” পাড়ী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কী সমস্যা আছে যে অমন কবল মুক্তি দিয়ে আরামে গরমে ব’সে চা খাবে?” উত্তরে মাখি বলিল, “কেন ভাই, আছে মথ আর হুঁ।”

এই দীর্ঘ সংগ্রামের পথে আমাদের পাথের হইবে কি কেবল মাত্র সুস্থতা ও উজ্জ্বল? না, স্বাস্থ্যকেই প্রধান পাথের করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী সকলকেই সমভাবে এই পাথের সংগ্রহে সচেষ্ট ও তৎপর হইতে হইবে; এই স্বাস্থ্য-ধর্ম সাধনে একান্ত ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

### আদর্শ-স্বাস্থ্যের লক্ষণ

#### (ক) শারীরিক

এখন, স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝি? স্বাস্থ্যের আদর্শ কি? স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ মানুষের লক্ষণ কি? আদর্শের দিক দিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ছয়টা।

১। **রোগহীনতা।** দেখিতে এমন কোনও রোগ নাই, শুধু তাহা নহে; উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা বহিঃ দেখিতে পাই যে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, ঐক্সির ঠিক আছে ও ঠিক চলিতেছে, তজ্জ্বই শরীরকে রোগহীন বলা হইতে পারে।

২। শুধু রোগহীনতাও নয়, **রোগপ্রতিবেদক ক্ষমতা** থাকা চাই। স্বাস্থ্যের ইহাই এক প্রধান লক্ষণ। একই স্থানে, একই আবহাওয়ার ও আবহেতনের মধ্যে একজন সহজেই রোগের **বীজ** দ্বারা আক্রান্ত হয়, আর একজন হয় না; কাহারও স্নেহকেই ‘ঠাণ্ডা লাগে’, কাহারও লাগে না।—এই সকলের মূলে দেহের **জমির** কথা। যেমন ভিন্ন

ভিন্ন গাছের বিভিন্ন বীজ আছে, সেইরূপ বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ও স্বভাব বীজাণু বা জীবাণু আছে। রোগের বীজ যেমন সকল জমিতে সমভাবে অধূরিত ও বর্জিত হয় না, সেইরূপ রোগবীজাণুসমূহ, বাহ্যার অসাম্যিক পরিমাণে প্রায় সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, তাহার্য সকল শরীরেই সহজে “দাঁত বসাইতে” বা “শিকড় গাড়িতে” পারে না। বাহার রোগ-প্রতিবেদক ক্ষমতা কম, তাহারই শরীর মধ্যে রোগবীজাণু সহজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; রোগ দ্রুতগতি উঠে।

৩। স্বাস্থ্যের তৃতীয় লক্ষণ, **শক্তি**। পেশীসমূহের শক্তি। শুধু হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গাদির নয়, সকল ভিতরের ও বহিরিজিরেরও। শক্তি বলিতে সাধারণতঃ কোনও পেশী বা পেশীসমূহের এককালীন বলপ্রয়োগেরই ক্ষমতা বুঝায়। একজন কত মণ ভারী বোঝা বহুগিতে পারে, বা, আর একজনকে কি পরিমাণে টানিয়া বা টেলিয়া পরাস্ত করিতে পারে, প্রধা-সক্রিয়সংকষ্ট পেশীসমূহের বা ‘হুঁ’-এর বা দ্রুতসূত্রে জোর কত বেশী, ইত্যাদি ক্রিয়ায় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির পেশীসমূহ খুব মাংসল ও শক্ত, বা যে তাহাদের খুব নাড়াইতে-খেলাইতে পারে, সে ব্যক্তি উন্মিত প্রথম দুই লক্ষণে হীন হইতে তো পারেই, এমন কি বহুদূর গরিয়া পরিশ্রম করিতেও হয়ত বা অসমর্থ। অতএব স্বাস্থ্যের আর একটা লক্ষণ হইতেছে—**সামর্থ্য** অর্থাৎ বহুদূরগরিয়া অস্বাভাবিক পেশীসমূহের কর্ম-ক্ষমতা (পরিশ্রম)। যথা, একজন কত মাইল একটানায় হাঁটিতে বা দৌড়াইতে বা কতদূর গাঁতার দিতে পারে; কত উঁচু পাহাড়ে উঠিতে বা কতদূর পাড় টানিতে পারে, ইত্যাদি।

৫। যে মাছুষ বা জাতি স্বাস্থ্যে আদর্শ হইবে, তাহার এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার সঙ্গেই আরও হওয়া চাই—**হুম্মী**, দীর্ঘায়তন, **অঙ্গাদির গঠনে সুপরিমিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন**। আমরা যেন

গৌরব করিয়া বলিতে পারি যে, রাঙ্গালী জাতি, দেহের আয়তন ও গঠনের সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্য, শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে কেন, পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতান লাভ করিবার অধিকারী।

৬। আদর্শ স্বাস্থ্যের আর একটা লক্ষণ—**স্বাস্থ্যক্ষতিবোধ**। ইংরাজীতে বাহাকে বলা যায় Vital surplus। যে ব্যক্তির ‘বড় আয় তত্ত্ব বার’, সমগ্র-অঙ্গময়ের জন্ত হাতে দুর্গমতাও থাকে না, তাহাকে যেমন টিক্ সন্দতিসম্পন্ন বা স্বচ্ছাবস্থাগর ব্যক্তি বলা যায় না, সেইরূপ প্রকৃত সুস্থ ও সামর্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের কিছু সুখদান থাকা আবশ্যক। যেরে আসিলে বা সাক্ষ্য হইলে যেন দেখিতে পাই, সে ব্যক্তি হইতে স্বাস্থ্যের ও শক্তির একটা আভা বা প্রভাব সূচিতে ও বিচার্য হইতেছে। সে-সম্পন্ন অথকেও সতেজ ও সক্রিয় করিয়া তোলে।

### (খ) মানসিক স্বাস্থ্য

আদর্শ শারীরিক স্বাস্থ্যের এই যে বড়বিধ গুণলক্ষণ, যথা, রোগহীনতা, শক্তি, সামর্থ্য, রোগ-প্রতিবেদক ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যক্ষতিবোধ—টিক্ এইগুলিকেই আবার মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

শরীর ও মন এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, একের প্রভাব অঙ্গের উপরে এতই বেশী যে, বর্তমান জটিল, চঞ্চল, কর্মবহুল, রাজনৈতিক ও তামসিক, বৃত্তিপ্রাণ জীবনব্যবহার দিনে, ভাবোচ্ছাসকে মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধিকে স্থির, বিচারকে চ্যায়সন্মত ও মনকে অপরের দিক্কাট ও বৃষ্টিবার ক্ষমতাপন্ন করিতে হইলে মানসিক স্বাস্থ্যের একাধি আবশ্যক; নিজে স্বাধীন হইতে এবং পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি লাভের জন্ত মানসিক স্বাস্থ্যের শারীরিক স্বাস্থ্যের অপেক্ষা কোনও অংশে কম প্রয়োজনীয় নহে।

—এখন ঐ বড়বিধ লক্ষণ মিলাইয়া দেখা যাক। যিনি আদর্শ সুস্থ ব্যক্তি হইবেন—(১) তাহার মধ্যে কাম,



ক্লেষ, লোভ, হিংসার আধিক্য থাকিবে না; তিনি নাচতা, সঙ্গীতা, মিথ্যাপরাম্পত্য প্রভৃতি মানসিক রোগ বর্জিত হইবেন।

(২) শুধু তাহা নহে, (৭ম) সাধনা দ্বারা তাহার মনকে এক্সপ সজীব ও দৃঢ় করিয়া রাখিতে হইবে যে, নানা প্রকার রিপূর বীজ তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তাহার রিপূ-প্রতিবেদক কমতা থাকিবে।

(৩) শোকে, বিপদে, লোভে, উত্তেজনা ও প্রলোভনে তাহার মনের শক্তি তাহাকে স্থির ও সংযত রাখিবে।

(৪) আবার সেই সঙ্গে কোনও একটা কাজ হাত দিলে তাহা ধরিয়া থাকা, তাহাকে সার্বক করিবার জ্ঞান সচেতন হওয়া, বত্বশন ধরিয়া মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা, বা হুং ও দারিদ্র্য, অপবাদ, অবহেলা অসহ্যহুতি, বিব্রতাকরণ প্রভৃতি প্রতিফুল্ল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার ঐশ্বর্য বা সামর্থ্য থাকা চাই।

(৫) দয়া-দান্ধিগো, সৌজন্মতায়, সহ্যহুতি ও ব্যবহারের নিষ্ঠাতা ও সংঘমে চরিত্র সুন্দর ও মধুর হইবে।

(৬) যতঃ তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা ও উৎসাহক্ষুণ্ণির মূলধন তাহাকে অসময়ে রক্ষা করিবে ও তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত ও উজ্জ্বলিত হইয়া সকলের মনকে উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করিবে।

এই হইল ব্যক্তিগত পূর্ণতা বাহ্যের রূপ।

### স্বাস্থ্যের ব্যাপক রূপ

এই বাহ্য দেখিতে চাই প্রতি ঘরে ও পরিবারে—শ্রদ্ধা ও প্রীতির বোণের নিষ্ঠাতা; ও নিঃস্বার্থতায়; সময় ও নিয়মের অহুতিতায়, পরিবার-পরিচ্ছন্নতায়

ও ঘরের জিনিষপত্রের সাজানো-সোহানয়; আনন্দের মধ্যে ও পরস্পরকে সর্দনা বৃষ্টিবার চেষ্টায়।

এই বাহ্য দেখিতে চাই সমাজে, একতা ও সম্বন্ধতায়, বিধাসংযোগতায়, চরিত্রে—অর্থাতঃ ঝাঁটা হওয়ায়, বা মনে, কথায় ও কার্যে এক হওয়ায়, সত্য ব্যবহারে ও বাক্য-ব্রহ্মায়; দুর্নীতি সকলের সংস্কার-চেষ্টায়; অপরের দিক্কাটা বৃষ্টিবার ক্ষমতায় ও অপরের কুসংস্কারের কু-প্রবৃত্তি হইতে আশ্বাসযমে; ও দেশহিত ও লোকহিতগত প্রভৃতি হওয়ায়।

রাষ্ট্রেও এই বাহ্যের প্রকাশ, নিন্দা-প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া যখন যাহা সত্য বলিয়া বৃষ্টি, তখন তাহাই ধরিয়া থাকায়, হুবিধা ও প্রলোভনের পাকে ও প্রভাবে আশ্ববিক্রম বা মতপরিবর্তনে নয়; নিঃস্বার্থতায়, ধর্মবৃত্তিতে ও বিপদে অপরের দিক্কাটা বৃষ্টিবার চেষ্টায় এবং দেশ ও লোকহিতগত প্রভৃতি।

### এক কথায়

যিনি আদর্শ হুং ব্যক্তি হইবেন, তিনি আদর্শ জীবনের রূপ সমুৎপন্ন রাখিয়া নিজ দেহ ও মনে সম্পূর্ণ ও সঙ্গীতবান ভাবে হুং হইতে সচেতন ও সক্রিয় হইবেন তো বটেই; তৎপরি ও তৎসঙ্গে, তাহার এই সাধনা ও প্রভাব পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দেশকে হুং, সমর্থ, হুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

ইহা যেন কি নারী, কি পুরুষ আমাদের প্রত্যেকের সাধনার বস্তু হয়।

“নায়মাস্তা বলহীনেন লভ্যত।”

[কি করিলে এই বাহ্য লাভ ও রক্ষা হয় ঘরের অস্বচ্ছাতিতে তাহার সচিতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

## অরুণোদয়

(উপসর্গ)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ণাহুতি]

সেদিন রবিবার।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। কলেজ ধরিত্রী সংসারের ছোট-খাটো কাজকর্ম সারিয়া দেওয়ালে-টাঙ্গানো আর্শাটির হুংয়ে ঝাঁড়াইয়া নারায়ণী তাহার চুল ঝাঁড়াইতেছিল। কালো কৌকড়ানো একশিট চুল। দেহের সৌন্দর্য্য তাহার রূপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু চুলের সৌন্দর্য্য যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একাকিনী ঘরের মধ্যে নারায়ণী তাহার নিজের চুল নিজেই দেখিতেছে, আর বহুকাল পূর্বে কবে একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী তাহার এই চুলেরই প্রশংসা করিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িতেছে। কাল হইতে বীরেন বাড়ী ফিরে নাই, আজ রাতে সে নিশ্চয়ই ফিরিবে। নারায়ণী তাই চুল ঝাঁড়াইয়া সজ্জিত বলিল।

এমন সময় মাসি ডাকিল, ‘বোমা।’

চিদ্রণী হাতে লইয়াই নারায়ণী দরজার কাছে আসিয়া পাড়াইল। বলিল, ‘আমায় ডাকছেন, মা?’ ‘হ্যাঁ, মা, ডাকছি। বীরেন কি এখনও আসেনি, বোমা?’

নারায়ণী একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, ‘না।’

মাসি বলিল, ‘প্রায়ই ত’ দেখি সে শনিবার রাত্তিরে আসে না, রবিবার আসে না, কোথায় থাকে সে?’

নারায়ণী মহাবিপদে পড়িল। কোথায় থাকে সে জানে না। এত চেষ্টা করিয়াও তাহা সে আজও জানিতে পারে নাই। কিন্তু যা বোঝে কিছু একটা তাহাকে বলিতেই হইবে। না বলিলে মাসি যাহা

ভাবিবে তাহা বিশেষ পৌরবের নয়, অথচ মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে গেলেই কষ্ট তাহার বস্তু হইয়া আসে। শেষ পর্যন্ত কি আর করে, জবাব তাহাকে দিতেই হয়।

নারায়ণী বলে, ‘হুংর মধ্যে ওই এক রবিবারটি ছাড়া ত’ আর ছুটি পায় না, মা, তাই ওয়া সব বন্ধুরাধব মিলে শনিবার রাত্তিরেটা খায়-দায় আমোদ-বাস্তান্দব করে, রবিবার দিনের বেলাটা সেইখানেই ঘুমিয়ে কাটায়। টাকা টাকা করে...আপিসের খাটুনি খেটে খেটে...আমি বলি...’

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মাসি আগাইয়া আসে। বলে, ‘না বাছা, তুমি ভুল বুঝছ। বীরেনের ভাবগতিক দেখে আমার ত’ ভাল বলে মনে হয় না।’

নারায়ণী হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করে। বলে, ‘না, মা, সে-সব কিছু নয় আমি জানি। স্বভাব-চরিত্রের খুব ভাল।’

মাসি বলে, ‘ভাল হ’লে তোমারই ভাল, মা, আমি তোমার জগেই বলছি।’

এই বলিয়া দেখেই সেইখানে নামাইয়া দিয়া মাসি চলিয়া বাইতেছিল, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনি ওকে কি জগে বুঝছিলেন, মা?’

‘কি জগে?’ বলিয়া ঈশ্বর হাসিয়া মাসি আবার ফিরিয়া পাড়াইল। বলিল, ‘এখনও বুঝতে পারিনি, বোকা মেয়ে? হুংমাস হুংয়ে গেল, ভাড়ার দরুন একটা পরমাণু আমি এখনও পাইনি। এইবার ছেলের কাছে কিছু চাইব, বাছা, আর আমি পারছিনি, বড় টানাটানি পড়ছে।’



নারায়ণী একটুখানি লজ্জিত হইয়া উঠিল। ছ'মাস কি তাহারও বেশি তাহারা এখানে আসিয়াছে, অথচ ভাঙার দরন্ মাসিকে কিছুই এখনও দেখা হয় নাই। লজ্জিত হইবারই কথা। বলিল, 'আজ এগেই আমি গুর কাছে চেয়ে রাখব, মা।'

মাসি বলিল, 'আমার হ'য়ে তুই কেন চাইবি, বাছা? বীরেন এসে আমার জানাস, আমি নিজেই চেয়ে নেবো।'

মাসি বলিল, 'আমি কি আর বাড়াভাড়া কখনও দিয়েছি, বাছা, যে জানব কত হয়েছে।' ছেলে আমার বা দেবে তাই আমি হাত পপতে নেবো।'

কলিকাতা শহরে একটর পর একট অনেক বাড়িতে তাহারা ভাড়া দিয়া বাস করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাড়ির মালিকের মুখে এমন কথা সে কখনও শোনে নাই। ভাড়াতে বাহা দিবে হাত পাতিয়া তাহাই লওয়া দূরে থাক্, পুরা ভাড়ার একটি পাই-পয়সা কম হইলে কিংবা ভাড়া দিতে ছ'চারদিন দেরি হইয়া গেলে অনেক বাড়ীওয়ালার অনেক অপমান স্বামীকে তাহার নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। যাই হোক, নারায়ণী ভালিল, এতদিন পরে ভাবমান বোধকরি তাহাদের দিকে একটুখানি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সেদিন তাহার আর ভাল করিয়া চুল বাঁধা হইল না। চুলগুলা কোনো রকমে এগো বোঁপা করিয়া পিন দিয়া আটকাইয়া, সিঁটিতে সিঁড়র লইয়া সে কলভালগা ধুইতে গেল। ভাড়াভাড়া কিরিয়া আসিয়া ভাল একখানি কাপড় পরিয়া জামা গুয়ে দিয়া আশীর স্বত্বমে ধাঁড়াইয়া মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া কি বেন একটা গান গাহিতে গাহিতে সে তাহার রূপালে সিঁড়র-কোটা লইতেছে, এমন সময় বাহিরে সদর দরজার কাছে বামীর কণ্ঠস্বর ভনিতো পাইল। বাচ্, আজ সে ঠিক সময়েই আসিয়াছে। সিঁড়রভক্তি ছোট হোমিওপ্যাথী ঔষধের শিশিট সে তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া

দরজার কাছে অগাইয়া গেল। সুনিল, স্বামী তাহার গান গাহিতে গাহিতে ঘরে ঢুকিতেছে—

'আজ ফাগুনের প্রথম দিনে—  
সেইখান হইতেই হাতের ইমারায় নারায়ণী তাহাকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিল।

কাছে আসিয়াই বীরেন তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কেন? চুপ করব কেন সুনী?'  
পা টলিতেছে, কথা জড়াইয়া বাইতেছে, সন্দেহনা!

মদ খাইয়া আসিয়াছে।  
ঘরে একটা সত্তা টিনের চেয়ার ছিল, তাহারই উপর নারায়ণী তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, 'ওগো চুপ করো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। মা একুনি ভাড়া চাইতে আসবে।'

'ভাড়া! অল্লাইট! মাইনে পেলে বীরেন গাল্গী লাট সাইরেবে বাড়ির করে না, তা জানো?' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার পকেট হইতে দশটাকার একখানি নোট বাহির করিয়া নারায়ণীর হাতে দিয়া বলিল, 'আজ এই দশ টাকা দাও, বাকিটা এর পর দেবো।' মাসে কত করে' দিতে হবে? পনেরো টাকা—না?'

নারায়ণী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল, 'মা গো না, দশটাকা করে' দিলেই হবে। তোমায় জিজ্ঞেস করলে বনো—এর বেশি আমি আর দিতে পারব না, মা, কোথায় পার বলুন!—কেমন? উনি বড় ভাল মানুষ, এমন মানুষ আর হয় না।'

এই বলিয়াই সে সোজা হইয়া ধাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি একটু চুপ করে' বোসো, আমি এই টাকাটা দিয়ে আসি আর খোকাকে নিয়ে আসি।—আর ঝাঝে, তুমি এই যে মদ-ট খাও, একখা উনি বেন না জানতে পারেন। বুঝলে?'

টাকা দিবার জ্ঞান নারায়ণী বাহির হইয়া বাইতেছিল, এমন সময় দেখিল, মাসি নিজেই দরজায় আসিয়া ধাঁড়াইয়াছে।—'একি বাবা বীরেন, আমার—'

নারায়ণী কথাটা তাহাকে শেব করিতে দিল না, ছুটয়া একেবারে দরজার কাছে আসিয়া দশটাকার নোটখানি মাসির হাতে একরকম জ্বলিয়া দিয়া বলিল, 'এই বে, মা, উনি ঠিক ক'রেই রেখেছিলেন।'

বীরেনের কিন্তু ওদিকে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। চলিল না। টলিতে টলিতে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ধাঁড়াইয়া এবং বোধকরি মাসির কাছেই অগাইয়া বাইতে বাইতে বলিল, 'মাসির চারটি পায়ের খুলো আজ আমি নেবো।'

কিন্তু মাসির কথা পর্য্যন্ত তাহাকে আর পৌঁছিতে হইল না। নারায়ণী তাহার পূর্ণেই ভরে লজ্জায় একেবারে স্তিরমাণ হইয়া গিয়া কি যে করিবে কিছুই বুঝিলে না পারিয়া একেবারে ঠিক হলেমামুহুরের মত ঘরের দরজাটা মাসির মুখের উপরেই হড়ম্ব করিয়া ছুঁহাত দিয়া বন্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিল।  
বাপ্যারটা মাসিও প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকি বা! দরজা বন্ধ করুণ কেন?'

কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই সে বুঝিল, কেন বন্ধ করিয়াছে; এবং বুঝিবারমাত্র মাসি আর সেখানে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বলিয়া উঠিল, 'বাই, বাবা, বাই!'

বলিয়াই সে ভাড়াভাড়া উপরে উঠিয়া গেল। এমন ভাব করিল বেনে দেবু তাহাকে ডাকিতেছে।

এদিকে ঘরের মধ্যে নারায়ণী তখন দরজার গায়ে পিঠ রাখিয়া লজ্জায় ঘামিয়া উঠিয়া রাগে ভাঙে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'তুমি মদ খাও, রাগে বাড়ী ফেরো না একখা কি তোমার না জানালেই চলছিল না? তোমারনা আমি চুপ করে' বসে' থাকতে বললো!'

বীরেন বলিল, 'ভাতে হয়েছে কি?'  
নারায়ণীর চোখ দুইটা ছলছল করিয়া আসিল।—'তোমার কিছু হয়নি, কিন্তু আমার—' বলিতে পিয়া নচেচরক টেঁটটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা সে গান শেব করিতে পারিল না।  
বীরেন হাসিতে লাগিল।—'ও কি তোমায় কিছু

দেবে ভেবেছ, না কী? ও কেউ কিছু সেরে না, বাবা, আমার জানতে কিছু বাকী নেই। এই বরসে অনেক দেখলাম।'

স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া নারায়ণী রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'হাসছ কোন্ লজ্জায়! হাসতে তোমার লজ্জা করে না?'

'ওরে বাবা! এ যে এখানে এসে কথা ফুটল দেখছি।'

নারায়ণী বলিল, 'তা মানুষ আর কতদিন চুপ করে' থাকবে সুনী!'

গভীর কণ্ঠে বীরেন কহিল, 'তাই বলে' তুমি কি আমার শাসন করবে নাকি?'

নারায়ণী বাহা কখনও বলে নাই তাহাই সে আজ বলিয়া ফেলিল। বলিল, 'হ্যাঁ করব এবার থেকে।'  
ঠাসু করিয়া বীরেন তাহার গালে উপর সজোরে এক চড় মারিয়া বলিল, 'বলিল, 'চোপ, রও!'

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গালে হাত দিয়া নারায়ণী সরিয়া ধাঁড়াইতেই দরজাটা খুলিবার জন্ত বীরেন হাত বাড়াইল। রাগ করিয়া বোধকরি সে পুনরায় বাহির হইয়া-বাহিবার ব্যবস্থাই করিতেছিল, কিন্তু পিছনে টান পড়িতেই ফিরিয়া দেখিল, নারায়ণী তাহার জামার একপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়াছে। মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু টপ, টপ, করিয়া জল ঝরিতেছে।

সেই একটা গল্প আছে—কোনও এক ভদ্রলোকের অরুণা খারাপ হইয়া বাইতেই একদিন সে তাহার এক বন্ধর বাড়ী চুরি করিতেছিল। বন্ধর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, ভদ্রলোক তাহার আলমারি খুলিয়া মনিবাপ্য বাহির করিয়াছে। চোর-বন্ধু পাছে লজ্জিত হয় ভাবিয়া নিরতিশয় লজ্জায় গৃহস্থ বন্ধ তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল।

যে ঘুরি করিতেছে তাহার লজ্জা হইল না, বাহার-চুরি করিতেছে লজ্জা হইল লজ্জা।



মাসির অবস্থা হইয়াছে ঠিক সেই রকম।

পরদিন হইতে মাসি আর লজ্জায় নারায়ণীর সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, এমন ভাবে দেবকে লইয়া চোরের মত পাশ কাটিয়া কাটিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—দেখিয়া মনে হয় যেন সে নারায়ণীর কাছে কতই না অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এক ঘরে ঘর করিতে গেলে এমন চুরি করিয়া বেশিশ লুকাইয়া থাকা চলে না। একসময় তাহাকে পলকিতেই হয়।

হইলও তাই।

ছেলেটা অনেকক্ষণ হইতে বায়না ধরিয়াছিল—  
বোমার কাছে বাইবে।

মাসি বলিতেছিল, ‘হা না, বাপু, কচি ছেলে ত’  
নেদা, বা না।’

কিন্তু দেবু জির ধরিয়া বলিয়াছে,—‘না তুমি দিয়ে  
আসবে চলে।’

মাসি তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম  
করিয়া বুঝাইল, বলিল, ‘এই ত বাপু তোকে আমার  
মাহব করার ভাত। আমার কাছে থাকতে ভাল  
লাগছে না, মা’র কাছে বাবার জন্তে বোঁদ করছি, তা  
বশে ত’ বা না, আমি ত’ আর ধরে’ রাখিনি তোকে।’

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ পরাণ  
দেবকে দিয়া আসিবার জন্ত মাসিকে নীচে নামিতে  
হইল। ভাবিয়াছিল, দিড়ির নীচে তাহাকে ছাড়িয়া  
দিয়া আসিবে, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নারায়ণী  
বাইভেছিল কলথরে বোধকরি জল আনিবার জন্ত,  
মাসির সঙ্গে তাহার চোখোচোখি দেখা হইতেই  
সে প্রমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাসিও একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া একটা  
ডোক গিলিয়া একবার ইতস্তত করিয়া দেবকে দেখাইয়া  
দিয়া বলিল, ‘এই নে, মা, তোর ছেলে নে। মা’র  
কাছে আবদার জন্তে বোঁদ ধরেছে সেই কখন থেকে  
তার ঠিক নেই। তাই ত’ বলি বাবা পরের ছেলে  
ভালবাসলেই কি আর আপন হয় কখনও!’

দেবু ছুটয়া মা’র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী  
বলিল, ‘কেন রে, থাকে মা গিয়ে মা’র কাছে। আমি  
ততক্ষণ আমার কাজগুলো সেয়ে নিই।’

কিন্তু ছেলে তাহার আচলের কাপড়টা টানিয়া  
ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মাসির কাছে কিছুতেই বাইতে  
চাহিল না। নারায়ণী লজ্জিত হইয়া উঠিল। এ যেন  
তাহার মত অপরাধ। তাই সে ছেলের হইয়া কৈফিয়ত  
দিবার জন্ত মাসির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,  
‘ও! বুকেছি ও কেন এমন করছে, মা। আজ সকালে  
ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম, সেই সময় কোথেকে  
ও ছুটতে ছুটতে এসে আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে  
পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ে’ এমন বিরক্ত করতে লাগিল  
যে, খুব জোরে একটা চড় মেরে দিলাম ওকে কঁদিয়ে  
বিসয়ে করে’। বললাম এমন যদি কবুবি ত’ আমার  
আর দেখতে পাবি না, বাব কোন্ দিক দিয়ে পাসিয়ে।  
সেই থেকে ও আপনার কাছেই ছিল। তারপর  
এতক্ষণ পরে হঠাৎ হয়ত আমার কথা ওর মনে পড়ছে।  
তা নইলে কেন থাকবে না, মা, আপনার কাছে ত’ ও  
বেশ থাকে।’

মাসি, দেবুর কল্যাণে লজ্জাটা তাহাদের কাটিয়া  
গেল। নারায়ণী ভাবিল তাহার স্বামীর মদ খাওয়ার  
ব্যাপারটা মাসি বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই, পারিলে  
নিশ্চয়ই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু এমন করিয়া  
কতদিন তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে কে জানে।

দিনকয়েক পরে, আপিস হইতে বীরেন সেদিন  
বাড়ী ফিরিয়াই বলিল, ‘ওগো গুণ্ডু?’

নারায়ণী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, ‘দেবু কোথায়?’

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘তাও ভাল। আজ  
এসেই যে ছেলের খোঁজ পড়ল, কেন?’

‘বাড়ীউদী বড়ী কাছে আছে বুঝি?’

‘হ্যাঁ, সেইখানেই ত থাকে।’

বীরেন বলিল, ‘থাকে ত’ বুঝলাম। কিন্তু বড়ীর  
মতলবটা কিরকম বুঝে বল দেখি? বাড়ীটা ত’ বড়ীর  
নিজের, এছাড়া টাকাকড়ি কিছু আছে বলতে পার?’

নারায়ণী বলিল, ‘তা আমি কেমন করে জানব?’

বীরেন বলিল, ‘একবারে নীরেট বোকা মেয়ে  
কিনা! ঢালাক মেয়ে হ’লে বড়ীর নাজী-নকর এতদিন  
সে মেয়ে নিতে পারত।’

নারায়ণী বলিল, ‘তা বাপু আমি পারি না। তাতে  
তুমি আমাকে বোকাই বল আর যাই বল।’

‘হ্যাঁ’ বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বীরেন কি  
বেন ভাবিতে লাগিল।

নারায়ণী বলিল, ‘কিন্তু বড় ভাল মাহব উনি।  
খোকাটাকে আমাদের সতিই ভালবাসেন।’

বীরেন বলিল, ‘জাখো ওরকম শুকনো ভালবাসার  
কোন দাম নেই। দেবুর নামে এই বাড়ীখানা লিখে  
দিতে পারে যদি ত’ বুঝি—হ্যাঁ ভালবাসে—বাড়াও,  
মুখ ফুটে একদিন ব’লেই ফেলব।’

নারায়ণী হাতজোড় করিয়া বলিল, ‘দোহাই  
তোমার, তা যেন কোনদিন বোলে না। ছি!’

‘বাবো! কুলীন বামুনের ছেলে, বড়ীর ধর্ম হবে  
কত!’

নারায়ণী বলিল, ‘তার ধর্ম তোমায় দেখতে হ’বে  
না। থাক, দেবকে ডান্ডু? খুঁছিলে যে? আচ্ছা  
বাপ হয়েছে কিন্ত। ছেকে একবার আদরও কর  
না! অথচ তোমার অমন ছেলে—দেশছন্নিকার লোক  
কত আদর করে’ যায়।’

এই বলিয়া বোধকরি সে দেবকে ডাকিবার জন্তই  
বাহির হইয়া বাইভেছিল, বীরেন বলিল, ‘দাঁড়াও,  
তোমায় আজ একটা সুখবর দেবো।’

সুখবরের নামে নারায়ণী খুশী হইয়া তাহার  
কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ‘কি বরবর গো?’

বীরেন বলিল, ‘দেবুর জন্তে কিছু করুন না করুন  
না বল, তাই আজ একটা ‘লাইক ইন্সিওর’ করে’  
এলাম।’

লাইক ইন্সিওর ব্যাপারটা কি নারায়ণী তাহা  
জানে না। বলিল, ‘সে আবার কি?’

‘তাও জানো না?’ বলিয়া বীরেন তাহাকে লাইক  
ইন্সিওরের মানে বুঝাতে বলিল। বলিল, ‘এখন  
মাসে মাসে কিছু কিছু করে’ টাকা আমি কোম্পানীকে  
দিয়ে যাব, তারপর আমি মারা গেলে দেবু এক হাজার  
টাকা পাবে। এই মাসের মধ্যে যদি মারা যাই  
তাহ’লেও পাবে।’

বীরেন ভাবিয়াছিল বরটা শুনিয়া নারায়ণী  
উল্লসিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া  
দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বীরেন তাহার মুখের পানে  
তাকাইয়া বলিল, ‘খুশী হ’লে না?’

নারায়ণী বলিল, ‘না বাপু, ওসব কেন তুমি করতে  
গেলে বরত? তোমার ওই মন্দ চেষ্টে বসে’ থাকতে  
হবে? না না না না, তুমিই যদি না থাকলে ত’ টাকা  
পেয়ে কি হবে?’

বীরেন বলিল, ‘আরে তবনই ত’ টাকার দরকার।  
এখন ত’ আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেমন  
করে’ হোক—’

কথাটা নারায়ণী তাহাকে শেষ করিতে দিল না।  
বলিল, ‘ধামো বাপু, চুপ কর। ওসব কথা আমার  
ভাল লাগে না। হে মা কালা, হে ভগবান!’

বলিয়া সে তাহার হাত ছুটি কপালে ঠেকাইয়া  
বলিল, ‘তার আগেই যেন আমি তোমার পায়ে মাখা  
রেখে চলে’ যেতে পারি।—বোলে, ডাকি দেবুকে।’

‘শোনো, শোনো।’

নারায়ণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘আজ আমি কার  
মুখ দেখে উঠেছি কে জানে। এত ভাল করে’ কথা ত’  
তুমি কোনদিনই বল না।’

বীরেন বলিল, ‘শোনো, আরও ভাল কথা আছে।  
আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—যদি আমি  
মারা যাই।’

এতক্ষণ পরে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল। বলিল, ‘সত্যি বলছ?’



ঘাড় নাড়িয়া বীরেন বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'  
'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এমনি তুমি  
ও-বাড়ীতে থাকতে আর-একবার বলেছিলে।'  
'এবার কিন্তু এই তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি।'  
বলিয়া হাত বাড়াইয়া বীরেন নারায়ণীর হাতখানা  
স্পর্শ করিল।

নারায়ণী বলিল, 'দেবুর গা ছুঁয়ে বলতে পার ?'  
'কেন পারব না ? আনো তাকে।'

দেবকে আনিবার জন্ত নারায়ণী অনেকক্ষণ হইতে  
প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এইবার বীরেনও তাকে আর  
বাধা দিল না।

কিন্তু উপরে উঠিবার জন্ত সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা  
দিয়াই নারায়ণীর মনে হইল, না, কাজ নাই তাহার  
ছেলের গায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া। কোঁকের  
মাথায় হয়ত আজ সে তাহাই করিবে, কিন্তু ছদ্ম  
যাইতে না যাইতেই আবার হয়ত সে তাহার শপথের  
কথা বোলায়। ভুলিয়া গিয়া যুব খানিকটা মদ গিলিয়া  
টলিতে টলিতে বাড়ী চুকিবে। তাহার চেয়ে মুখে  
বলিতেছে সেই ভাল, তাহার গায়ে হাত দিয়া শপথ  
করিয়াছে সেই ভাল, ইহার মধ্যে ছেলেকে আর টানিয়া  
আনিয়া লাভ নাই। গায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া  
সে-শপথ রাখিতে না পারিলে না জানি ছেলের হয়ত  
অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

স্বামী আজ তাহার অনেকদিন পরে এমন ভাল  
করিয়া কথা বলিতেছে, ছেলের জন্ত কিস-ব এক হাজার  
টাকার করিয়া আসিয়াছে, মদ খাইবে না বলিয়া  
প্রতিজ্ঞা করিতেছে—ব্যাপার কি !

ব্যাপার বাই হোক, নারায়ণীর মুখে আজ হাসি  
ফুটিয়াছে। সে-হাসির মধ্যে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাও সে  
নাই তাহা নয়, তবে হাসিতে বাহাকে বড় একটা  
দেখা যায় না, মুখ-ছত্রাবান লইয়াই বাহার জীবন কাটে,  
ওই একটুখানি হাসিতেও তাহাকে বড় সুন্দর দেখায়।

মাসি তাই তাহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া  
বসিল, 'কিবে, আজ যে বড় তোর হাসি-হাসি মুখ ?'

নারায়ণী বলিল, 'কেন, মা, আমায় কি হাসতে  
নেই ?'

মাসি বলিল, 'ছি বাছা, ও কি কথা ! কেন  
হাসিবিনি, মা, এই ত' তাদের হাসবার ব্যয়স। হেসে  
থেনে আনন্দ করে' উল্টিতে উল্টিতে কহিলেন, 'থাক্‌বি,—  
আমাদের দেখে কত সুখ হবে।'

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবু কোথায় মা, কই  
তাকে ত' দেখছিনি।'

মাসি একবার চোখ টিপিয়া ইসারায় খাটের  
নীচটা দেখাইয়া দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, 'কই, মা,  
অনেকক্ষণ তাকে দেখতে ত' পাছিনি। আমার  
পর্ব্বার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, বললে, দাও ছ'খানা  
পয়সা, বাজার থেকে নিয়ে আসি। তাই বোধ হয়  
বাজার থেকে সে কাপড় আনতে গেছে।'

বহুটা নারায়ণী ব্যস্ত। বুঝিও তাহা কঁাস  
না করিয়া সেও তেমনি গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল,  
'আমারও ত' কাপড় ছিঁড়েছে, মা, আমারও পর্ব্বার  
কাপড় নেই। কি বে করি তাই ভাবছি।'

দেবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।  
খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, 'আমি  
এনে দেবো।'

'এই যে আমার দেবু গো ! কোথায় গিয়েছিলে,  
বাবা ? কাপড় আনতে ?'

'না, বাহিনি এখনও, যাব।' বলিয়া সে তাহার  
হাতের মুঠা বুজিয়া সভ্য-সভাই একটু ছ'খানি দেখাইল।  
বলিল, 'ভূমিও দাও। তোমারও এনে দেবো।'

নারায়ণী সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দেবুকে তাহার  
কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'আমি পয়সা  
কোথায় পাব, বাবা, আমার ত' পয়সা নেই। আমার  
কাপড়ের দাম তোমাকেই দিতে হবে।'

দেবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দেবো।'

ঐ অশ্রুটুকু ছেলে তাহার কাপড় আনিয়া  
দিবে—পয়সা না দিলেও আনিয়া দিবে শুনিয়া আনন্দে  
নারায়ণীর হৃদয় ভরিয়া জল আনিয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাসির দিকে তাকাইয়া বলিল,  
'ভুলেন, মা ? দেবু নিজের পয়সা দিয়ে আমার কাপড়  
এনে দেবে।'

মাসি বলিল, 'আর আমার বেলা বুঝি নিজের  
পয়সা দিবিনি, হাঁ রে নিমক্‌হারাম !'

দেবু বলিল, 'বোমার পয়সা ত' নেই। আর  
তোমার অনেক পয়সা—সেই যে আমি দেখেছি।'

'নোঁ, নারায়ণী, ছেলের কথা শোনু।' বলিয়া  
মাসি হাসিতে লাগিল।

দেবু তখনও নারায়ণীর গলা জড়াইয়া বসিয়া  
ধাড়াইয়া ছিল; নারায়ণী তাহার কানে-কানে চুপি চুপি  
বলিল, 'বাবা যে তোর ডাকছে রে, যা শুনে আয় কি  
বলছে।'

দেবু তাহার চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা  
করিল, 'বাবারও কাপড় আনতে হবে ?'

নারায়ণী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার বাবারও  
কাপড় ছিঁড়ে গেছে।'

দেবু তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া বোধকরি তাহার  
বাবার কাছেই চলিয়া গেল। নারায়ণী একবার ভাবিল  
সেও যায়, কিন্তু সেখানেই হয়ত এখনই দেবুর মাথায় হাত  
দিয়া সে তাহার মদ বাগ্গার অভ্যাস ছাড়িবে বলিয়া  
মিথ্যা একটা শপথ করিয়া বলিবে, এই ভবে সে উল্টী-  
উল্টী করিয়াও আর উল্টিল না, মাসির কাছেই বসিয়া  
রহিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'বীরেন এসেছে বুঝি ?  
মাড়াশদ না করে' ত' সে আসে না ; আজ এমন চুপি-  
চুপি এল যে ?'

মাড়াশদ করিয়া আসিবার অর্থাৎ বেকি, নারায়ণী  
তাহা বেশ ভালই বুঝে। মাসিও ঠিক তাহারই ইঙ্গিত  
করিতেছেন কিনা তাই বা কে জানে ! তাই সে  
অশ্রুতরির প্রসঙ্গটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জগ্‌ই  
বোধকরি নারায়ণী অজ্ঞ কথা পাড়িয়া বসিল।

বলিল,—  
'দেবুর জন্তে ওর বাবা আজ সেই কি-একটা করে'

এসেছে, মা, মাসে মাসে কোম্পানীর ঘরে কত টাকা  
যেন দিতে হবে, তারপর—'

বলিয়া একটা চোক গিলিয়া নারায়ণী বলিল,  
'তারপর আমি মরে' গেলে দেবু একসঙ্গে অনেকগুলো  
টাকা পেয়ে যাবে। কত হাজার টাকা বললে, মা,  
দাঁড়াও আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।'

নারায়ণী মিছামিছি চোখ বুজিয়া টাকার অঙ্কটা  
ভাবিতে লাগিল।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'জীবন বীমা করেছে বুঝি ?  
ত' তুই ম'লে কেন পাবে ?'

স্বামীর মৃত্যুর কথাটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে  
পারে নাই, তাই সে নিজের মৃত্যুর কথাটা বলিয়াছে।

নারায়ণী বলিল, 'ঐ একই কথা, মা, মা-বাপ  
ম'লে পাবে আর-কি ! আমি কিন্তু মা আগেই মরব।'

মাসি বোধকরি তাহার নিজের কথাটা ভাবিয়াই  
একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'সেকথা কি আর  
বলবার জো আছে, মা ! মরা-বাঁচা ভগবানের হাত।  
উনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমি নিরাশ্রিত ঠাকুরদের  
কাছে জানাতাম, 'হে ঠাকুর, আমার যেন গুঁর পায়ে  
মাথা রেখে মরতে দিও।' কিন্তু কি হ'ল ? পার্লাম  
মরতে ? যিনি চ'লে যাবার তিনি চ'লে গেলেন, আর  
এই স্বথভোগ করবার জন্তে আমি রইলাম প'ড়ে।'

কথাটা নারায়ণীর ভাল লাগিল না। বাঁচা-মরা  
মাছদের হাত নয়, তাহা সে জানে, তবু ভগবানের বিচার  
বলিয়া কিছু একটা ত' আছে ! স্বামীর অবধমানে  
একেবারে নিঃসংসার নিরবধার অবস্থার নাবালক  
ছেলেটার হাত ধরিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া বাঁচিয়া  
থাকিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। ভাবিতে  
গিয়া নারায়ণী শিররিয়া উঠিল।—না না, জীবনে  
এমন কিছু পাপ সে করে নাই বাহার জন্ত এ শাস্তি  
তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। হে ভগবান, তাহার  
মৃত্যুই যেন আগে হয়।

নারায়ণী উঠিয়া দাঁড়াইল।—'বাই আবার রান্না  
চড়াতে হবে।'



এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া পা টিপিয়া-  
 টিপিয়া জানালার পাশটিতে থিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল  
 এবং জানালার একটু কপাট হাত দিয়া ঠেলিয়া দ্রুত  
 উল্লুর করিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে পিতাপুত্রের আলাপ  
 চলিতেছে।

## অসময়ে

### শ্রীহাসিরাশি দেবী

অতিথি আমার!

সাজাইয়া শত উপচার

বেদিন বসিয়াছি থলি' ঘর, হিয়া,  
 আরতি-প্রদীপ সম নয়ন জ্বলিয়া,  
 মধুরিত কুঞ্জে মোর মেলি' বাহাশাখা,—

তুলিয়া পতাকা

সেদিন আসনি তুমি রাজ-অধিরাজ,  
 আসিয়াছ আশ্রয়।

দিগন্তের ধ্বংসকালে রাসেরাখা ধীরে ফুটি' উঠি'  
 ধরার শ্রামল বক্ষে ছড়াইছে কাগ মুঠি মুঠি;  
 তারি সাপে তন্ত্রাদেশে বিভোর নয়ন।

সে কোন্ স্বপন,

তাহা নাহি জানি;

শুধু মেলি' শীর্ণ বাহাশাখা

তোমারে ধীরিতে চাই বাহু-কারা মাঝে;  
 কণ্ঠদ্বার দিবসের অবসান সাঝে

নবস্তরে ধীরিতে আবার

চাহি আশ্রয় জীবনের তার।

দেবতা আমার!

সাজাইতে চাহি আরবার

আরতির দীপ-দানি,—বরণের ডালা  
 নব উপচারে; গাঁথিবারে চাহি ফুলমালা  
 কাননে কুহুম পুঁথি' লতিকা-বিতান।

তব জয় গান

গাহিবারে চাহি পূন' ভয় কণ্ঠে আশ্রয়,  
 মনে মানি' লাজ।

শত বেদনায় জীর্ণ হৃদয়ের এ ব্যর্থ মন্দিরে,  
 তোমারে চেয়েছি কেনে, ডাকিয়াছি কত ক্ষিণে ফিরে,  
 কত রুদ্ধ ধারে ধারে; কত রুদ্ধ তোরণে তোরণে

তব অবেশে

তুলিয়াছি সব।

কণ্ঠের অশান্ত কলরব

শান্ত ঐ; নিভাতুর আমার হৃদয়  
 তাজ্জি' তার অবলাদভার নিঃশব্দ নির্ভয়

জাগরণ চাহিছে আবার;

দেবতা আমার!

## বাংলায় আর্য্যসভ্যতা-বিস্তার

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ও অজ্ঞাত প্রাচীন  
 সঙ্কত গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে,  
 ইতিহাসের আদিযুগে বাংলা দেশে কয়েকটি আদিম  
 জাতি বা 'জন' অর্থাৎ tribe বাস করিত এবং সমগ্র  
 দেশটি কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি  
 অধিবাসীজনের নামেই অভিহিত হইত। বাংলার  
 এই সমস্ত প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে সাত আটটির  
 নাম এখন উল্লেখযোগ্য। যথা—অঙ্গ (ভাগলপুর ও  
 সুন্দর জেলা), বঙ্গ (আধুনিক বাংলার দক্ষিণাংশ,  
 ভাগীরথীর পূর্ববর্তী ভূখণ্ড), কলিঙ্গ (আধুনিক  
 উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগ), উড় (উড়িষ্যার উত্তর-  
 পশ্চিমাংশ), পুণ্ড্র (বাংলাহাট বিভাগ, মতান্তরে  
 আধুনিক ছোটনাগপুর বিভাগ), বৃক্ষ (রাঢ় বা  
 বর্তমান বিভাগের দক্ষিণাংশ), ব্রহ্ম (উত্তর-রাঢ়) এবং  
 ককট (বর্তমান বিভাগেরই কোন অংশে ইহাদের  
 বাস ছিল; ইহার চেয়ে নিশ্চিততর নির্দেশ করিবার  
 উপায় নাই)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই জনগুলির  
 সমস্তই পশ্চিম, দক্ষিণ এবং হ্রদ উত্তর বঙ্গে ও বাস  
 করিত। সেই আদিযুগে পূর্ববঙ্গে কাহারো বাস করিত  
 বলা যায় না। তবে আমরা এইটুকু জানি যে,  
 অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পূর্ববঙ্গই (বর্তমান ঢাকা-  
 বিভাগ) বঙ্গ নামে অভিহিত হইত এবং ব্রহ্মপুত্রের  
 পূর্ববর্তী ভূখণ্ডের নাম ছিল সমতট। তা'ছাড়া,  
 আধুনিক চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাম ছিল হরিকেল, একথা  
 মনে করিবার কারণ আছে।

যাহা হোক, এখন দেখা যাক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি  
 বাংলায় এই প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তরভারতের  
 বৈদিক আর্য্যদের কি সম্বন্ধ ছিল। বৈদিক-সাহিত্যে  
 ইহাদের উল্লেখ আছে অতি সামান্যই। কিন্তু যে  
 কয়েকবার ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কয়বারই

ইহাদের প্রতি বৈদিক আর্য্যদের অপরিণীম দ্বারা  
 প্রকাশ পাইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৪২২১১৪) অঙ্গদিগকে  
 আর্য্যবাসভূমির বহির্ভুক্ত দ্বারা জাতিরূপেই গণ্য করা  
 হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭১৮) পুণ্ড্রদিগকে বলা  
 হইয়াছে দহা অর্থাৎ অনার্য্য। আর বঙ্গদিগকে ঐতরেয়  
 আরণ্যকে (২১১১৫) পানী (বরাণসি) বলিয়া নির্দেশ  
 করা আছে। বৌদায়নের ধর্ম্মশাস্ত্রে (১২১১৪) বিধান  
 আছে, পুণ্ড্র এবং বঙ্গ-কলিঙ্গদের দেশে গেলে আর্য্যদের  
 পক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনতাম বা সর্বপঠা নামক  
 প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। তা'ছাড়া, উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে  
 (১২১১৫) কলিঙ্গ দেশে যাওয়া-রূপ পাপের জন্য  
 বৈখানর নামক একটি অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা  
 আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২৪১১৮) কিরাত, হুণ, অঙ্গ,  
 পুন্ড্র প্রভৃতি জাতির লায় ব্রহ্মদিগকেও 'পান'-জাতি  
 বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অঙ্গ ও  
 পুন্ড্রদিগকে বলা হইয়াছে দহা। সুতরাং দেখিতেছি,  
 অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, বৃক্ষ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন  
 অধিবাসীরা বৈদিক আর্য্যদের নিকট দৃষ্টিত অনার্য্য বা  
 দহা বলিয়াই গণ্য হইত।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে জাগে, বাংলার এই  
 প্রাচীনতম অধিবাসীরা কোন্ অনার্য্য মহাজাতি বা  
 race-এর অন্তর্গত ছিল। বাংলা ও বিহারের  
 প্রাচীন জন বা tribeগুলিকে উত্তরভারতের বৈদিক  
 আর্য্যরা সমষ্টিগতভাবে 'প্রাচ্য' বলিয়া অভিহিত করিত।  
 আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১০৮১১৫) দেখিতে পাই,  
 আর্য্য প্রাচ্যদিগকে বলা হইয়াছে 'অসুত্র' (আত্মত্যা: প্রাচ্য:)।  
 এবং তাহাদের শ্মশান-নির্মাণপদ্ধতি ছিল আর্য্যদের  
 পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। আর্য্যদের শ্মশান ছিল চতুর্কোণ,  
 আর প্রাচ্য অসুত্রদের শ্মশান গোলাকৃতি (পরিমণ্ডল)।  
 শতপথ ব্রাহ্মণে আর্য্য ও অসুত্রদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী



সংগ্রামের আভাসও পাওয়া যায়। মহাভারতে (১১:৫৪) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ময়ূরকৈ গঙ্গাতীরবর্তী দেশের অধিপতি 'অঙ্গ'-রাজ বলীর মহিষী যুদ্ধোৎসব পূর্ণজাত কেরেজ সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, এই পাঁচ ভ্রাতার নাম অঙ্গসারৈ উল্ল পাচীত জন ও জনপদের উপস্থিতি হইয়াছে। বাহা হোক, মহাভারতের এই উপাখ্যানটি হইতেও মনে হয়, বাংলার প্রাচীন জনগণ, অঙ্গ-বংশজাত বলিয়াই গণ্য হইত। মহাশিবকল্প নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (প্রথমমণ্ড, পৃষ্ঠা ২০২) দেখিতে পাই পৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি জনপদের ভাবকে আঙ্গুরী ভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—“অঙ্গুরাণাং ভবৎ ব্রাহ্মণ্য পৌণ্ড্রা হুদ্রা সনা \* \* \* সর্বেষাং অঙ্গুরপক্ষাণাং বঙ্গ-সামন্তপ্রাণাং”। আধুনিক কালেও ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা কোলজাতির অধিবাসীদের কথিত ভাষা-মুন্ডের মধ্যে “আঙ্গুরী” নামে একটি উপভাষা বর্তমান আছে (Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Introduction, p. vi, by P. C. Bagchi)। সম্ভবত' প্রাচীনকালের সমগ্র প্রাচ্যদেশের কথিত ভাষাগুলির সাধারণ “আঙ্গুরী” নামটি এখন একটি ছোট উপভাষার নামে মাত্র পর্যাবসিত হইয়াছে।

অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জনগণকে সাধারণ ভাবে অঙ্গুর বলিয়া অভিহিত করার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু ইহা যে প্রাচীন ভারতের গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যা-সমূহের অঙ্গমত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আঙ্গুরের বিষয় এই যে, মহাভারতে (অন্থি, ৬১:১০-১৪) অশোককেও মহাঙ্গুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৬৮৫) দৌর্য্যদিককেই অঙ্গুর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। বাহা হোক, এখন দেখা যাক, আধুনিক ঐতিহাসিক বিচারে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জনগণকে কোন্ race বা মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা জানি, আঙ্গুরের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে ছইটি প্রাচীন অন্-আর্য্য বা প্রাক-আর্য্য

জাতি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একটিকে দ্রাবিড় ও অট্টককে মুণ্ডা বা কোল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা এখন নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। সম্ভবত' মুণ্ডা বা কোলরাই প্রাচীনতর। ইলানী সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মোহেন্দোদারো এবং দক্ষিণ পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিশ্বদকর নিদর্শন-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সভ্যতার সহিত প্রাক-আর্য্য-দ্রাবিড় এবং কোল বা মুণ্ডাদের কি সম্বন্ধ, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই আপাতত' এই সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই কাঁঠি। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, ঐ নিদর্শনগুলি আর্য়াদেরই স্থিতি। অপর মতে এই সভ্যতার সঙ্গে কোল-মুণ্ডাদের সম্পর্ক থাকারও বিচিত্র নয়। বাহা হোক, দ্রাবিড়, কোল-মুণ্ডা এবং সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা ভারতের এই প্রাচীনতম তিন জাতির সহিত প্রাচীন বাংলার অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জাতিগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল কি না এবং থাকিলে কাহার সহিত ছিল তাহা নির্ণয় করা বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধানতম সমস্যা। আমরা এখানে সে-সমস্যার আলোচনার প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক পণ্ডিত আজকাল মনে করেন, দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জাতি (race) নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাণ্ড, বহুকাণ্ডব্যাপী রক্তস্রবিশিষ্টের ফলে জাতিগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমনকি, আধুনিক ভারতীয় দ্রাবিড় ও কোল-মুণ্ডাদের স্বৈরগঠনগত কোনো প্রকার পার্থক্য নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা নির্দেশ করিতে পারেন না। তাই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যই জাতিনির্ণয়-কার্য্যে পণ্ডিতদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ভাষাগত হস্ত বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলার

আদি ভাষাগুলি ছিল Austic বা Austro-Asiatic ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অট্টিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞাত ভাষার মধ্যে আধুনিক কোল, মুণ্ডা, গাঁওভাষা, খাসিয়া প্রভৃতি জাতিগুলির কথিত ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালায় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনের কোনো কোনো স্থান এবং ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অনেক জাতির কথিত ভাষাও এই অট্টিক ভাষার অন্তর্গত। এই সব নানা বিধ বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে জলপথে এদেশে আগমন করিয়াছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচীন নামগুলিও অট্টিক ভাষারই শব্দ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—বঙ্গ প্রভৃতি দেশের ভাবকে ময়ূরীমুন্ডকল্প নামক গ্রন্থে আঙ্গুরী ভাষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আধুনিক ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে এখনও আঙ্গুরী নামে একটি উপভাষা বিদ্যমান আছে। প্রাচ্যদেশীর অঙ্গুরদের ভাষা যে আর্য্যভাষা হইতে বিভিন্ন ছিল তাহা শতপথ ব্রাহ্মণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানা যায়। ইহা হইতেও অস্বাভাবিক নয়, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন জনগণের কথিত আঙ্গুরী ভাষা মুণ্ডাদের ভাষা অর্থাৎ অট্টিক-জাতীয় ভাষার গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

বাহা হোক, আমরা দেখিলাম যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার অধিবাসীরা খুব সম্ভবত' অট্টিক-ভাষী আনর্য্য ছিল। তাহাদের ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতিনীতিও যে বৈদিক আর্য়াদের থেকে বিভিন্ন ছিল, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান কালে বাংলাদেশে আর্য়্য-ভাষা, আর্য়্য-ধর্ম্ম, আর্য়্য সামাজিক বিধান, এক কথায় আর্য়্যসভ্যতা, পূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; তাহা আমরা নিতাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী আর্য়্যসভ্যতাও যতখানি গ্রন্থণ করিয়াছে বাংলা-দেশ তাহার চেয়েও বেশী গ্রন্থণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্-আর্য্য বাংলাদেশে আর্য়্যসভ্যতা কোন

সময় এবং কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আর্য়্য-সভ্যতা বাংলাদেশে প্রথম কোন্ সময়ে প্রবেশ করিল তাহাই প্রথমে বিচার করা যাক। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং কালিদাসের রঘুবংশকে বাংলায় আর্য়্য-সভ্যতা বিস্তারের ছই নীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে বিদ্যে মাধব সম্বন্ধে যে-উপাখ্যানটি আছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি রচিত হইবার পূর্বে বিদেহ বা মিথিলায় আর্য়্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই শতপথ ব্রাহ্মণের প্রাচ্য অঙ্গুরজাতিদিগকে শাশান-নিশাপ-পদ্ধতি এবং ভাষা সম্বন্ধে আর্য়্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর্য়্য ও অঙ্গুরদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের কথাও এই গ্রন্থেই দেখা যায়। স্বতরাং বিদেহে আর্য়্য-আগমনের সময় এবং সম্ভবত' শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময়েও মণ্ডা, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য অঙ্গুরভূমিতে আর্য়্যপ্রভাব প্রসারিত হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় নিঃসংস্করণে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে জীউ-পূর্ব্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

পঞ্চাশতের, কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর নিবিষ্করণ-প্রসঙ্গে বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেহিতে পাই তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাসের সময়ে বাংলা দেশে এবং এমনকি কামরূপেও আর্য়্য-সভ্যতা পূর্ণপরিপূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালিদাস গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ৩৮০-৪১০) সময়ে বিজয়মান ছিলেন বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। ফা-হিয়ানের (৪০৫-৪১১) বিবরণ হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। ফা-হিয়ান খুব সম্ভবত' কালিদাসের সমসাময়িক। এই চৈনিক পরিভ্রাজক বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভারত-ভ্রমণের সময় বাংলার প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; তাম্রলিপ্তি হইতে বাণিজ্যপোতে সমুদ্রপথে সিংহল, দ্বীপকী প্রভৃতি স্থানে



যাত্রায় কবিত এবং সে সময়ে যবদীপেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুণ্ড্রপ্রভাব বিস্তারন ছিল (Legge's Fa-hien, p. 100, 113)। জীয়ায় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভেই যখন হুয়ান্ যবদীপেও ভারতীয় আর্ধ্য-সভ্যতার একটা প্রসার ছিল তখন বাংলা দেশ যে তার বহুপুর্বেই আর্ধ্য-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীয়ায় তৃতীয়-চতুর্থ শতকেও বাংলার আর্ধ্যসভ্যতা বিস্তারন ছিল, তার প্রমাণ পাই মল্লনাগ বাংলার প্রথম কামরূপে এবং মহাকবি ভাস্কর 'প্রতীজ্ঞাযৌদ্ধরায়' নামক নাটকে। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উজ্জয়িনী-রাজ প্রজ্ঞোত্তর একটি উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ভাস্কর কবির সময়ে বঙ্গের রাজবংশ মর্গ্যারায় কানী, হুয়ান্, নিমিগা, নুয়গ এবং অবন্তীর রাজবংশসমূহের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। চক্রবর্তীর উপাদক পুস্তকসমূহ চন্দ্রাবর্ধার গুণতীয়া (বীড়ুয়া) নিরিক্ষিপ হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। জীয়ায় চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলার শের প্রান্ত পর্যন্ত আর্ধ্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাই গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ-স্তম্ভলিপিতে। ঐ লিপি হইতে জানা যায়, সমস্ত (বর্তমান বিপুড়া ও ব্রীহত্তি জিলা), ডবাক (আসামের অন্তর্গত নগও জিলা) এবং কামরূপের প্রজাপ্ত নৃপতিরা কর এবং উপঢৌকনাদি দান করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সমস্তাধীন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে সহজেই অনুমান হয়, সমগ্র বাংলা দেশই তৎকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

মহাসম্রাটের দৈবিকত পাই—হিমালয়, বিদ্যাপুর্গত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র উত্তর ভারতকেই 'আর্ধ্যাধর্ম' সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। আর্ধ্যাবর্তের এই সজ্জা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মহাসম্রাটের সময়ে বাংলাদেশকেও আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু ঐহবের বিষয়, নিঃসন্দেহরূপে মহাসম্রাটের কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু জীয়ায় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেও যে

আর্ধ্যপ্রভাব বাংলাদেশকে অতিক্রম করিয়া হুয়ান্ যবদীপ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল তার প্রমাণ পাই গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে। টলেমি হুয়ান্ মিশর দেশে বসিয়া তাঁহার ভৌগোলিক গ্রন্থাবলি রচনা করিয়াছিলেন। অথচ তাহাতে বাংলাদেশ সম্বন্ধেও বিশদ জ্ঞানের পরিচয় পাই। তিনি গঙ্গানদীর পাটচি বিভিন্ন মোহনার নাম এবং ঐগুলির তীরে অবস্থিত শহরগুলির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই মোহনাগুলি যে-ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল সেই ভূখণ্ডকে তিনি Gangaridai নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই দেশের রাজা যে-নগরীতে বাস করিতেন তাহার নাম Gange বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে 'গঙ্গারিডাই' নামে কোনো রাজা বা দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, 'গঙ্গে' নামে কোনো নগরীরও পরিচয় জানা যায় না। খুব সম্ভবত ইহার সঙ্কট, সাহিত্যে অজ্ঞ নামে পরিচিত ছিল। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে 'নৌসান্যোন্মত্ত' বন্দ্রদিপকে 'গঙ্গাভোতোহস্তরত্ন' অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হুয়ান্ টলেমির গঙ্গারিডাই রাজা প্রটান বঙ্গরাজ্য হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে করিতে হয়। আমরা সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে এক বঙ্গরাজার উল্লেখ পাই। অনুমান হয়, মহাবংশের বঙ্গ-রাজ্য টলেমির গঙ্গারিডাই রাজ্য হইতে অভিন্ন এবং টলেমির 'গঙ্গে-নগর' মহাবংশের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর মাত্র। যদি তাই হয়, তবে বিগতে হইবে, মহাবংশের বঙ্গরাজ্য পূর্বোক্ত গঙ্গারিডাই রাজ্যেরই রাজ্য এবং ভাস্কর কবির উক্ত 'বঙ্গ' রাজবংশও এই গঙ্গারিডাই রাজ্যেরই রাজবংশ। দিল্লীর লৌহস্তম্ভলিপিতে (তৃতীয় শতাব্দী) উল্লিখিত আছে, চন্দ্রনাম কোনো নৃপতি এই বঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রবল সঙ্গ্রাম করিয়াছিলেন। যাহা হোক, টলেমির গ্রন্থ হইতে নিঃসংশয়রূপেই প্রমাণিত হয় যে, জীয়ায় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বঙ্গরাজ্য এবং বঙ্গনগরের নাম মিশর দেশ পর্যন্ত প্রসার

লাভ করিয়াছিল। হুয়ান্ ঐ সময়ে যে বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্তর্গত দেশের সভ্যতার আদান-প্রদান চলিতেছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, টলেমির সময়ে ভারতীয় সভ্যতা যবদীপেও প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তাহার, গ্রন্থে এই ধীপটিকে Iabadio নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শু্য তাই নয়, তিনি "island of barley" বলিয়া এই নামটির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। হুয়ান্ Iabadio যে সমস্ত যবদীপেরই রূপান্তর সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। হুয়ান্ দেখা যাইতেছে, জীয়ায় দ্বিতীয় শতকে ঐ ধীপটি শুধু যে ভারতীয় সভ্যতা লাভ করিয়াছিল তা' নয়, উহার নাম পর্যন্ত সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সেই সমস্ত নাম মিশরের গ্রীক ভৌগোলিকের নিকটও অবদিত ছিল না।

এবার দেখা যাক, জীয়ায় প্রথম শতকে বাংলা দেশ সম্বন্ধে কি-কি তথ্য জানা যায়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন গ্রীক নাবিক সমস্ত দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণ করিয়া নামবরণের বাণিজ্য বিষয়ক এবং প্রসঙ্গ-কমে অজ্ঞাত বিবরণও লিখিয়া গিয়াছেন। তুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার নাম জানা যায় নাই। এই অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক জল্পপথে বাংলা দেশও আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবরণ হইতেই জীয়ায় প্রথম শতাব্দীতে বাংলা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়; ভৌগোলিক টলেমির ভ্রায় এই গ্রীক নাবিকও বঙ্গকে 'গঙ্গা'-দেশ এবং ইহার প্রধান নগরীকে 'গঙ্গা'-নগরী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই গঙ্গা-রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে অভিন্ন এবং গঙ্গা-নগরী মহাবংশের বঙ্গ-নগরেরই নামান্তর। এখানে গঙ্গাদেশ ও বঙ্গদেশের অভিন্নতা সম্বন্ধে আরেকটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত গ্রীক নাবিক বলিয়াছেন, তৎকালে গঙ্গা-নগরী হইতে সেরোবাক্স মদলিন-বঙ্গ (muslins of the finest sort) বিদেশে রপ্তানী হইত এবং

এই মদলিনের নাম Gangetic অর্থাৎ গাঙ্গের (Periplus, p. 47), কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও (২১১) আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গের চকুল এবং কার্ণাসবর রত্নতুল্য মূল্যবান্ দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইত। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে "বাস্করং বেজঃ সিংহঃ চকুলম্"। অজ্ঞর আছে "মাধুর্যমপাতকং কালিঙ্গকং কালিঙ্গং বাঙ্গরং বাংকং মাধিকং চ কার্ণাসিকং শ্রেষ্ঠম্"। এই বাঙ্গর চকুল ও কার্ণাসবর Periplus-এর Gangetic muslin হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ, কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যখন জীয়ায় প্রথম শতাব্দী বা তৎসমীপবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে (Roy Chaudhuri's Political History, pp. 7-8), তখন Periplus-এর Gangetic এবং অর্থশাস্ত্রের বাঙ্গর-কে অভিন্ন মনে করাই সমস্ত বোধ হয়। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে গ্রীক লেখকদের গঙ্গারাজ্য ও গঙ্গানগরী যে বঙ্গরাজ্য ও বঙ্গনগর হইতে অভিন্ন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। যাহা হোক, উক্ত গ্রীক নাবিকের বর্ণনা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তৎকালে উৎকল মদলিন ছাড়া বাংলা দেশ হইতে প্রচুর মাল্য, তেজপাতা (malabathrum) এবং জটামাংসি (Gangetic spikenard) রপ্তানী হইত। এই সমস্ত দ্রব্য সাধারণতঃ, বাংলাদেশ হইতে জল্পপথে দক্ষিণ ভারতে যাইত এবং সেখান হইতে রোম-সাম্রাজ্যে বহুলো অভিহিত হইত। যে-সমস্ত বৃহৎ বাণিজ্যপাত কবিত সেগুলিকে উক্ত নাবিক Colandia নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তৎকালে বাংলাদেশে Callis নামে এক প্রকার স্বর্ণ-মুদ্রাও প্রচলিত ছিল এবং বাংলাদেশে কয়েকটা সোনার ধনিও অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে সহজেই মনে হয়, জীয়ায় প্রথম শতকেও বঙ্গের অধিবাসীরা নৌসাধনপটু ছিল। আর, এমন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও দেশেশাস্ত্রের সহিত বাণিজ্যপারায়ণ বঙ্গ যে



তখনও আৰ্য্য-সভ্যতার বহির্ভূতই ছিল, একথা কিছুতেই মনে করা যায় না।

জীৱণ প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরও দুইকটি তথ্য আলোচনা করিলে আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। আমরা জানি, এই শতাব্দীতেই কাশ্মীর মাতঙ্গ (খ্রীঃ ৬২) চীনদেশে গিয়া তথ্যাবলী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আর, ভৌগোলিক টলেমি যখন দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেই যবদ্বীপের সম্ভূত নাম অবগত ছিলেন তখন 'অন্তর্ভ' প্রথম শতাব্দী কিংবা তাহারও পূর্বেই এই দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা প্রভাব করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে-সময়ে ভারতীয় সভ্যতা একদিকে চীন ও অপর দিকে যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল সেসময় ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত বাংলা দেশ এই সভ্যতার বাহিরে থাকিতে পারে না, ইহা অতি সহজেই বোঝা যায়।

তাপরূপ দেখিতে পাই, এই শতাব্দীতেই কলিঙ্গ দেশের জৈন সম্রাট খারবেল উত্তরে মথুরা হইতে দক্ষিণে পাণ্ডাদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পূর্ণভারতের মগদের অন্তর্গত রাজ্যসমূহও সমরান্ধিন করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মহাভারতের উপাখ্যানে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গদিগকে অম্বর-রাজ বলির বংশভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা যে পরস্পর জাতিসমূহে আবদ্ধ ছিল, ইহা মনে করিবার অনেক কারণ আছে। শুধু তাই নয়। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অম্বমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হেতু আছে। এক্ষণে এক্ষণ দুইকটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতের সভাপর্বে (৪৪।১) অঙ্গ ও বঙ্গকে একই 'বিষয়' বা রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহাবীর কর্তৃক এই রাজ্যের অধিপতি (বঙ্গাধিবাসাধ্যক্ষ) মার হইয়াছে। আবার, বৌদ্যননের ধর্মসূত্রে (২।১১৪) বঙ্গ ও কলিঙ্গদিগকে (বঙ্গকলিঙ্গান্) এমন ভাবে একপক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে

হয় তাহারা তৎকালে একই রাজ্যভুক্ত ছিল। ল্যাটিন লেখক হরবিয়াত প্রিনি (Pliny the Elder, খ্রীঃ ২৩-৭৯) তাহার Historia Naturalis নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা-প্রসঙ্গে একস্থলে বলিয়াছেন, গঙ্গানদীর শেষ অংশ Gangarides-Calingae দের রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; এই দেশের রাজধানী Parthalis এবং সে দেশের অধিপতির সৈন্যদলে বাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্ব এবং সাত শত হস্তী ছিল (Monahan's Early History, pp. 4—5)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ণভারত হইতে জলপথে তাম্রপর্ণী (Taprobane) অর্থাৎ সিংহলদ্বীপে বাইতে সাত দিন লাগিত। এই বর্ণনা হইতে এই দেশের সাময়িক শক্তি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা, এই যে, প্লিনিও Gangarides এবং Calingae-দিগকে একই রাজ্যভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পাণ্ডাভ্য লেখকদের গঙ্গারাজ্য এবং সম্ভূত সাহিত্যের বঙ্গরাজ্য একই। স্বতরাং প্লিনির Gangarides-Calingae এবং বৌদ্যননের "বঙ্গ-কলিঙ্গা"-কে অভিন্ন বলিয়া মনে করাই সম্ভব বোধ হইতেছে। বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ থাকার তৃতীয় প্রমাণ পাই সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে (ধর্ম অধ্যায়)। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, কলিঙ্গ রাজবংশ এবং বঙ্গ রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও হইত। বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাছর মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গ-রাজকন্যা এবং সিংহবাছর পিতার (বঙ্গরাজের) রাজবংশকে 'কলিঙ্গ-রাজপৌত্র' (বঙ্গরাজের) গুলক-পুত্র ছিলেন বঙ্গীয় সেনাদলের সেনাপতি। শুধু তাই নয়, সিংহবাছর পিতার মৃত্যুর পর উক্ত কলিঙ্গ-রাজপৌত্রই বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপাখ্যানটির ঐতিহাসিক মূল্য বাহাই হোক না কেন, ইহা হইতেও বৌদ্যননের বঙ্গকলিঙ্গা এবং প্লিনির Gangarides-Calingae-দের

বৃত্তরাজ্যের অস্তিত্বের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্বতরাং সে-সময়ে কলিঙ্গের জৈন সম্রাট খারবেলের সাম্রাজ্য আৰ্য্যাবর্তে বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল সে-সময়ে বঙ্গরাজ্যেও যে আৰ্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অম্বমেয়। কলিঙ্গ-সম্রাট খারবেল ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশেও যে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

জীতপূর্ণ প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে-সময় বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঠান্বাবের একটি উক্তি হইতে মনে হয়, এই সময়েই গ্রীক নাবিকরা বাণিজ্য উপলক্ষে মিশর হইতে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহম্মদিতা গ্রন্থখানিও যে এই সময়েই বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল এক্ষণ মনে করিবার কিছু হেতু আছে। এই গ্রন্থে (২।২২) আৰ্য্যাবর্তকে পূর্ণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে বাংলাদেশেও আৰ্য্যাবর্তের মধ্যেই পড়ে। অথচ এই গ্রন্থেই অজ্ঞত্র (১।৪৩-৪৪) বলা হইয়াছে—পৌণ্ড্রক, উড়, দাবিড়, কাথোজ, যবন, শক, পারদ, পল্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতি ক্রিয় জাতিরা "ব্রাহ্মণান্দর্শন"-হেতু অর্থাৎ আৰ্য্য সমাজে অম্বহুতি উপদান প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়ালোপ হেতু বৃদ্ধার অর্থাৎ শূদ্রর প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাংলা, পৌণ্ড্র এবং উড়রা এটানি বাংলার অধিবাসী জন-সমূহের মধ্যে অন্তর্গত। মহম্মদিতার এই দুইটি উক্তি হইতে মনে হয়, পৌণ্ড্র ও উড়রা যবন, শক, পল্লব, চীন, কিরাত প্রভৃতির জায় আৰ্য্যসামাজ্য-বহির্ভূতই ছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে আৰ্য্য প্রভাব লাভ করিতেছিল। তাই তাহারা মহম্মদিতা গ্রন্থে পতিত ক্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, মহম্মদিতার পৌণ্ড্র, উড় প্রভৃতি পতিত ক্রিয়দের তালিকা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি জনগুলির উল্লেখ নাই। স্বতরাং মহম্মদিতার সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ আৰ্য্যসামাজ্য এবং আৰ্য্যাবর্তজমির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গুপ্তসম্রাট পুণ্ড্রমিত্রের রাজত্ব-কালে (খ্রীঃ পূঃ ১৮৫-১৪৯) বিখ্যাত বৈদ্যাকরনিক পতঞ্জলি তাহার 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। এই গ্রন্থে আৰ্য্যাবর্তে ভূখণ্ডকে 'কালকবন' নামক অরণ্যের পশ্চিমে (প্রত্যক্ কালকবনাং) অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কালকবনের অবস্থিতি সম্বন্ধে মশর আছে। তবে সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের নিম্নোক্ত সম্ভবত' ঝাড়বনে শতবোজনবাগী একটি গভীর অরণ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। খুব সম্ভবত' এই অরণ্য ও মহাভাষ্যের কালকবন অভিন্ন। বাহা হোক, বঙ্গদেশ যে এই কালকবনের পূর্বে অবস্থিত ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। স্বতরাং পতঞ্জলির মতে বাংলাদেশ আৰ্য্যাবর্তের বাহিরেই ছিল। কিন্তু তিনি অজ্ঞ অঙ্গের রাজা আপ, বঙ্গের রাজা বাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের বৈকল্প বৈকল্পিকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের রাজারা তৎকালে, ক্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন।

জীতপূর্ণ তৃতীয় শতকে প্রায় সমগ্র ভারতের একমুদ্র অধিপতি ছিলেন মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোক (২৭২-২৩২)। তাহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এক্ষণ অম্বমানের অম্বহুদ যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ হিউ-এন্স-মাতের ভারতবিবরণ ও মহাবংশ, দ্বিযাবদান ও প্লিনির Historia Naturalis প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া যে-সাম্রাজ্য দক্ষিণে চোল, পাণ্ডা প্রভৃতি দেশ এবং পশ্চিমে পারস্ত-রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বঙ্গদেশ মগদের অধিবাসিত সীমান্তবর্তী হইয়াও যে সে-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, একথা বিশদসঙ্গত করা কঠিন। তৃতীয়তঃ, যে কলিঙ্গদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশ অনেক সময়েই যুদ্ধ থাকিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই কলিঙ্গদেশ যখন বৌদ্ধতর সংগামে



পর মৌর্য সাম্রাজ্যজুজু হইয়া খেল তখনও বাংলাদেশের পক্ষে প্রাচ্যে রক্ষা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থত, আমরা জানি—অশোকের চোল, কের, পাণ্ডা, তাম্রপর্ণী (সিংহল) পর্যন্ত সমগ্র জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপে গ্রীস ও আফ্রিকায় শিশির পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। হুতরাং তাঁহার ধর্মপ্রচারকগণ বাংলাদেশেও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এরিয়ের কোনো সন্দেহ করা চলে না। অতএব তাঁহার রাজ্যকালে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় সভ্যতা যথেষ্ট হারিষ্ অর্জন করিয়াছিল, একথা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। এই সময়ের অপেক্ষাও পুঙ্খন প্রমাণ রহিয়াছে অশোকের প্রচারিত ও প্রস্তরথাকে খোদিত ধর্মাবলম্বন। তাঁহার একটি ধর্মাবলম্বন (Rock Edict, XIII) হইতে স্পষ্টই জানা যায়, ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে বহু প্রাণের ব্যতি ছিল। অতএব অশোকের রাজত্বের বেশ কিছুকাল পূর্বেই যে কলিঙ্গে আর্ধ্য-সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করার বিষয়, যাবতনের হাতিগুচ্ছা-লিপিতে সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ প্রভাব বিস্তারিত, অথচ ‘বারবেল’ নামটি যে সন্যাসাধ্য শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে-সময়ে কলিঙ্গ জনপদ আর্ধ্য-সভ্যতার গভীর মধ্যে আসিয়াছিল বঙ্গ-জনপদও প্রায় সেই সময়েই ঐ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা নিঃসংশয়েই মনে করা যাইতে পারে। ইহার চরমেও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে। পূর্বোক্ত ধর্মাবলম্বনই অশোক বসিতেছেন, একমাত্র যবনদের (অর্থাৎ গ্রীকদের) জনপদ ছাড়া ভারতবর্ষে এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষু) নাই। অশোকের এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষেই আর্ধ্য-সভ্যতা প্রচার লাভ করিয়াছিল। হুতরাং কলিঙ্গের জায় বঙ্গ জনপদেও ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের বসতি ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। পূর্বে দেখিয়াছি,

মহাসহিত্যের সময়েও যবন, শক, পল্লব, পৌণ্ড্র, উজ্জ প্রভৃতি শকতগুলি জনপদ ছাড়া আর সর্বত্রই ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণা ধর্ম ও সমাজের প্রভাব বিস্তারিত ছিল। হুতরাং দেখিতেছি, অশোকের অহুশাসন (Rock Edict, XIII) এবং মহাসহিত্যের উক্তি (১০৮০-৪৪) আর্ধ্যসভ্যতার প্রচার সংক্ষেপে একই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২২-২৯৮) বঙ্গদেশ মগধের অধীন ছিল মনে করিবার হেতু আছে। যে বীরের প্রচাপ মগধ হইতে গুজরাট এবং গুজরাট হইতে পারস্ত দেশের সীমান্ত পর্যন্ত অক্ষুর ছিল, যাহার শক্তির নিকট আলেকজান্ডারের পরাক্রান্ত সেনাপতি সেলিউসকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি যে মগধের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা মনে হয় না। প্রিন্সির একটি উক্তি হইতে মনে হয়, গঙ্গার শেষ অংশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগেই (the whole tract along the Ganges) মগধের আধিপত্য স্বীকৃত হইত। মহাবংশের একটি উপাখ্যান হইতে মনে হয়, অশোকের সময়ে মগধের রাজশক্তি সমুদ্রতীরবর্তী তাম্রলিপ্তিতেও অব্যাহত ছিল। তিপ্পের লামা তারনাথ লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিম্বদার “ভঙ্গল” (অর্থাৎ বাংলা) দেশের অর্ধাংশ গোড়দেশে জয়গ্ৰহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশতের, চন্দ্রগুপ্ত যে বঙ্গের দক্ষিণ বর্ধিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন জয় করিতে পারেন নাই সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তথ্যটি হইতেই চন্দ্রগুপ্ত বাংলাদেশেও রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়ে একই সন্দেহ হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে মগধের নন্দ-রাজ-বংশের প্রসিদ্ধা “সর্গক্ষাত্তক”, ‘একরাট’ মহাপ্রাণ নন্দ (আনুমানিক ৩৬২—৩৩৮) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্যকেই মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই ভারতের ইতিহাসে

সর্বপ্রথম সম্রাট এবং তাঁহার স্থাপিত মগধ সাম্রাজ্যই ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য। এইসময়ে পুরাণলিপিতে তাঁহাকে ‘সর্গক্ষাত্তক’ ও ‘একরাট’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহা হোক, তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যগুলির মধ্যে কলিঙ্গ অত্যন্ত। কলিঙ্গাধিপতি “বারবেল” হাতিগুচ্ছা-লিপিতেও নন্দরাজ কর্তৃক কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাপ্রাণ কর্তৃক বঙ্গদেশ-বিজয়ের কোনো প্রত্যক্ষ বা সংশয়হীন প্রমাণ নাই। নন্দরাজ-বংশের শেষ সময়ে রিঘিজয়ী আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (৩২৭—৩২৫)। তিনি যখন বিপাশা (Hyphasis) নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন তিনি ‘ভেগাস’ (Phegelas or Phegeus) নামক জনৈক স্থানীয় ক্ষত্রিয় রাজার নিকট Prasii এবং Gangaridaeদের সামরিক শক্তির বিষয় অবগত হইলেন। কুইন্টাস কাউজাসের লিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যায়, Prasii ও Gangaridae দুইটি স্বতন্ত্র জাতির নাম, কিন্তু তাহারা একই (নন্দবংশীয়) রাজ্যের অধীন ছিল। Prasii সংস্কৃত ‘প্রাচ্য’ শব্দের রূপান্তর মাত্র এবং এগুলো প্রাচ্য শব্দের দ্বারা মগধকেই বুঝায়; কারণ, পাশ্চাত্য লেখকরা Paliothra অর্থাৎ পাটলিপুত্রকে এই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর, প্রিন্সি ও টলেমির বর্ণনা হইতে দেখা যায়, গঙ্গার শাখাসমূহের দ্বারা বিখ্যাত বর্তমান বাংলার দক্ষিণ অংশকেই গঙ্গারাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ‘গঙ্গরিডি’ কথার সংস্কৃত প্রতিক্রিয়া কি তাহা এখনও পণ্ডিতরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অথচ গ্রীকরাই যে সর্গ-প্রাণে এই নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন তাও বলা যায় না। কারণ, ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজা ভগলই আলেকজান্ডারের নিকট ঐ নামে গঙ্গারিডোত রাজ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। হুতরাং আমরা মনে হয়, আরও অল্পদূর কলিঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঐ নামের আসল প্রতিক্রমের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ‘বৌধিদ্যাবানানকরনতা’ নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে

‘গঙ্গারিপিডোত’ রাজা মেকুর নাম পাওয়া যায় (Buddhist Literature of Nepal—by R. L. Mitra, p. 76)। এই গঙ্গারিপিডা বা গঙ্গারাজ্য যে গ্রীক ইতিহাসিকদের ‘গঙ্গরিডি’ হইতে ভিন্ন একথা মনে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বে যুগ্মবংশ, মহাবংশ, টলেমির ভূগোল, Periplus এবং অর্ধপ্রাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ‘গঙ্গরিডি’ বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝায়। আর, এখন দেখিলাম গঙ্গারিপিডা বা গঙ্গারাজ্য নাম সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। হুতরাং বুঝা যাইতেছে, বঙ্গ ও গঙ্গারাজ্য একই দেশের দুইটি নাম মাত্র। এক দেশের দুই নামে পরিচয় দিয়া বিচির নয়। একই পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, গ্রীকরা মগধকেই ‘প্রাচ্য’ নামে জানিতেন; গ্রীকরা যেমন মগধকে সর্গল্লাই Prasii বলিয়াছেন, মগধ নাম কখনও ব্যবহার করেন নাই, তেমনি বঙ্গকেও তাঁহারা সর্গল্লাই শুধু ‘গঙ্গরিডি’ নামেই অভিহিত করিয়াছেন। সুদূর বিপাশাতীরবর্তী ক্ষত্রিয় রাজা ভগল মগধ এবং বঙ্গকেই আলেকজান্ডারের নিকট প্রাচ্য ও গঙ্গারাজ্য নামে পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

যাহা হোক, আমরা দেখিয়াছি বঙ্গ বা গঙ্গারাজ্যকে কাউটাস মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞাত পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় ভিন্ন রকমের উক্তিও দেখা যায়। যথা, ডিওডোরাসের উক্তি হইতে মনে হয় মগধই গঙ্গারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আবাব, প্লুটার্ক গঙ্গারাজ্য ও মগধকে দুই জন স্বতন্ত্র রাজ্যর অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে এগুলো এই সমস্তর সীমানাগার প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু এইটুকু বলিবেই যথেষ্ট হইবে যে, আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গদেশ উত্তর-ভারতবাসী হবিস্বত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বলিয়া মনে করিবার পক্ষে অনেক হেতু আছে।



স্বতন্ত্রা ঐ সময় কিংবা তাহারও পূর্বে বাংলায় আর্থ প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ বা মিথিলায় আর্থসভ্যতা বিস্তারের সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আর ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৮২২) অঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালেই আর্থবর্ধন প্রবেশের প্রমাণ আছে। এই দুইটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ জৈতপূর্ণ অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মোটামুটি ভাবে ধরা যাইতে পারে। স্বতন্ত্রা শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময় হইতে মহাপঞ্চ নদের রাজবংশের (৩৬২-৩৪) মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে আর্থসভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

বৌদ্ধধর্মের ধর্মপুত্র হইতেও এই সিদ্ধান্তেই সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি জৈতপূর্ণ চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে ‘সকীর্ণ’ অর্থাৎ মিশ্র জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১১১৩)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সময়ে এই দুইটি জনপদে বৈদিক সভ্যতা কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু অঙ্গ ও কলিঙ্গ সৎকে বলা হইয়াছে, ঐ দুই জনপদে সেলে আর্থ্যবর্ধন প্রত্যাখ্যান করা পুনরায় বা সর্বপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্তম্ভ হইতে হইবে এবং কলিঙ্গ বাওয়ার জ্ঞত বৈশামন নামক অপর একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, ঐ সময়েও বঙ্গ এবং কলিঙ্গ আর্থ্যভূমির বহির্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত, অথচ বৈদিক আর্থ্যরা ঐ দুই জনপদে যাতায়াত করিত। নতুবা প্রায়শ্চিত্তের বিধানই দেওয়া হইত না। আর-একটি দৃষ্টির বিধান বলা হইয়াছে —

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গস্ব হুবাষ্ট্রে মগধের চ

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংসারমর্থিত।

এই শ্লোকটিতে বৌদ্ধধর্মের যুগের পরবর্তী অবস্থা

দৃষ্টি হইতেছে। কারণ, ইহাতেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বটে, কিন্তু ঐ সময়ে বৈদিক আর্থ্যরা অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে অধিক সংখ্যার বাইতে স্কন্ধ করিয়াছিল এবং ঐ সব জনপদে বৈদিক আর্থ্যদের তীর্থযাত্রা নির্বাহিত স্থাপিত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে পূর্ব-ভারতের কয়েকটি তীর্থের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে এ স্থলে কামাখ্যা, গোহিতা, করতোয়া, বৈতরণী এবং গঙ্গা-সাগর-সম্মত তীর্থের নাম কলিঙ্গেই যথেষ্ট। গঙ্গা-সাগর-সম্মত সৎকে বলা হইয়াছে, এই তীর্থে রান কলিঙ্গে অর্থমেঘ বজ্রের দশগুণ ফল পাওয়া যায়। আরও আছে জিরাড উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে গিয়া রান কলিঙ্গে সর্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এই ছটি স্থান বঙ্গদেশে অবস্থিত। আর বৈতরণী-তীর্থ কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাভারতে তীর্থযাত্রা ছাড়াও পূর্বভারতে বঙ্গের দুইটি আছে। যথা, পাণ্ডুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় আছে, তখন পুণ্ড্র, স্বল্প প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (আদি, ১১৩ অধ্যায়)। পাণ্ডুর পুত্র ভীমও দিগ্বিজয়-কালে পুণ্ড্র, স্বল্প, বঙ্গ, ভোমলিপ্ত প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন (সভা, ২২ অধ্যায়)। বৌদ্ধধর্মের বিধান অনুসারে পাণ্ডুর বা ভীমকে কোনো প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। শুধু তাই নয়, মহাভারতের বহু স্থানে আর্থ্য ও অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতির পারস্পরিক সংস্পর্শের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোথাও প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। তারপর হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তীর্থযাত্রা কিংবা দিগ্বিজয় ছাড়া আর-একটি তৃতীয় এবং প্রবলতর কারণও আর্থ্যরা অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি স্বেচ্ছ জনপদে গুপ্ত আগমন নয়, স্থায়ী ভাবে বাস করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। সে কারণটি হইতেছে—সুখা ও ভয়ের ভাঙনা। এই গ্রন্থে আছে, আর্থ্যরা কুন্তলের তাড়নার বিদেহের পূর্ণ সীমাস্থিত কৌশিকী নদী অতিক্রম করিয়া অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগ্রহ গ্রহণ করিবে এবং স্বেচ্ছাধর্মের সহিত বাস করিবে।—কৌশিকী প্রত্নবিদ্যা

নরা: কুন্তরীড়িতাঃ । অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্

\* \* \* সংশ্লিষ্টাশ্রিত মানবা: ॥ \* \* \* নিবৎজতি

নরা: স্বেচ্ছাধর্মৈ: সহ ॥ স্বতন্ত্রা মোঘী সমাতি অশোকের রাজবংশকালে কলিঙ্গে এবং অজ্ঞাত জনপদেও যে বহু ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা কিছুমাত্র বিচিরা নয়। আমরা এই প্রবন্ধে বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে গুপ্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদিক সমাজভুক্ত আর্থ্যদের প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। স্বতন্ত্রা এখানে ঐ সব জনপদে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিস্তারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না।

বৈদিক আর্থ্যরা যে বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে আগমন করিয়া অনার্য্য, অঙ্গর বা স্বেচ্ছাধর্মের সহিত বাস করিতে লাগিলেন শুধু তাহাই নয়, পরন্তু কালক্রমে ঐ সব স্বেচ্ছাধর্মকেও আর্থ্যভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। এই প্রক্রিয়াটিও শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্যদিগকে আত্মগা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সৎ-সৎ এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, তাহারা আর্থ্যগণের স্তায় একই প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তাহাদের ভাষা আর্থ্যভাষা হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহারা বিস্তৃতভাবে আর্থ্যভাষা উচ্চারণ করিতে পারিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দত্তা পুণ্ড্রদিগকে পতিত আর্থ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মহাভারতের মতে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি অঙ্গর-রাজ বলির বংশধর বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বৈদ্য-বোদ্য-পারগ মহর্ষি দীর্ঘতমার স্পর্শজাত সন্তান এবং অঙ্গররাজ বলিকেও গঙ্গাযানপারায়ণ পরম ধার্মিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে

অঙ্গররাজ বলির বংশধরদিগকে ‘বাল্যের ক্ষত্রিয়’ এবং ‘বাল্যের ব্রাহ্মণ’ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। যথা—

মহাবোধী স তু বলি বর্ত্তন নৃপতি: পুরা।

পুত্রাহংপদ্যাদ্যামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভূবি ॥

অঙ্গ: প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গ: স্বল্পভবো চ।

পুণ্ড্র: কলিঙ্গ: তথা বাল্যের দক্ষযুচ্যতে ॥

বাল্যেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তত্ৰ বংশকরা ভূবি।

(হরিবংশ, ৩১ অধ্যায়)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, যে-পুণ্ড্রদিগকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দত্তা বা অনার্য্য বলা হইয়াছে সেই পুণ্ড্রদিগকেই মহাবহিষ্ঠার ব্রাহ্মণবর্ধন হেতু পতিত ক্ষত্রিয় বা বৃষল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং মহাবহিষ্ঠার সময় অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি অজ্ঞ জনরা সম্ভবতঃ পূর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইত।

এইরূপ শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় হইতে তিন চার শত বৎসর ব্যাপী সময়ের মধ্যে বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য-ভারতীয় জনপদে একদিকে ক্রমে ক্রমে আর্থ্য-সমাগম হইতেছিল, অপরদিকে প্রাচ্য-ভারতীয় অনার্য্য কালক্রমে আর্থ্যভাবাপন্ন ও আর্থ্যসমাজভুক্ত হইয়া গেল এবং অনেক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। অবশেষে আত্মমানিক মহারাজ অশোকের সময়ে বাংলার জন-সম্প্রদায় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আর্থ্য-সভ্যতা লাভ করিল ও কালক্রমে সমগ্র বাংলা দেশটিই আর্থ্যভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।





এক দেশের এক রাজা—রূপে-গুণে সত্যি কান্তিক।  
রাজা এখনো বিয়ে করেননি।

তারি রাজ্যে এক বনে পাতার ঘরে থাকত মা  
আর মেয়ে চাঁপা। কে তার নাম বেধেছিল চাঁপা  
জানিনে। চাঁপার গায়ে রূপ আর ধরে না।

বুড়ী-মা ম'ব্বার আগে কৈদে খুন—“আমি ম'লে  
আমার চাঁপাকে কে দেখেবে?”

চন্দনের দিকে চাইতেই চন্দন বুক ফুলিয়ে বললে—  
“আমি দেখেব।” বুড়ী খুসী হয়ে চোখ বুজল।  
বছর কাটিল। চন্দন বললে, “চাঁপা, এবার আমার  
বিয়ে কর।”

চন্দন কাঠুরে; গরীব, কিন্তু গায়ে অশ্বরের জোড়।  
চাঁপাকে এক হাতে উচুতে তুলে পুতুলের মতো  
নাচার; গাছের নৃত মোটা ডাল একটানে মড়মড়  
ক'রে ভেঙে কেলে। বছর পঁচিশ বয়স চন্দনের।

চন্দনের কথা শুনে চাঁপা বললে—“দাঁড়াও, বসন্ত  
আসুক—”

চাঁপার সঙ্গারে অন্টন নেই কিছু। মালা গাঁবে,  
ময়ূরের পাখার মুকুট তৈরী করে, রঙীন কাপড়  
বোনে। চন্দন এসে বনের ফল, অরুণার জল তুলে  
দিয়ে যায়। সকলেই জানে চাঁপা-চন্দনের বিয়ে হবে।

চাঁপার ছুটি বন্ধু ছিল, মিনি আর চন্দন। মিনি  
খালি মিঠাও করত। আর চন্দন তাকে ভালবাসত।

দিন যায়—

শীতের-মরা গাছে আবার নতুন পাতা গছা'তে  
সুরু ক'রেছে। চন্দনের আর তরঙ্গ না।

চাঁপা বলে, “সবর-সবর; যাচ্ছে-যাচ্ছে ফুল ফুটুক—  
তবে তো হু?”

সেদিন চাঁপা গেল সরোবরে নাইতে। রাজা  
বেরিয়েছেন মৃগয়ায়। চাঁপার সঙ্গে দেখা। রাজার

চোখে আর পলক পড়ে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

“তুমি কে?”

চাঁপা বললে—“আমি চাঁপা।”

রাজা বললেন, “তুমি, রাণী হবে?”

“কেমন করে?”

রাজা হেসে বললেন, “আমায় বিয়ে ক'রে।”

চাঁপা মুখ লাল ক'রে পালিয়ে গেল। রাত্তিরে

খড়ের বিছানার ওরে চাঁপা স্বপ্ন দেখলে, সে সোনার  
পালকে ওরে আছে; কাছে দাঁড়িয়ে রাজপুত্র—  
লাল-পোষাক-পরা, মাথায় হীরার মুকুট, গলায় মুক্তার  
মালা। চাঁপা উঠে বসল।

ভোর হ'ল। লাল শাড়ীখানা প'রে—মাথায়  
ময়ূরের পালকের মুকুট প'রে চাঁপা জল আনতে-চলল  
সরোবরে। রাজার সঙ্গে দেখা—

যোড়ায় চড়ে চাঁপা রাণী হ'তে চলল।

চন্দন এসে দেখে মিনি বেড়াল বাঁধা; ঘরের ঝাঁপ  
বন্ধ; চাঁপা ঘরে নেই, বকুল-তলায় নেই, সরোবরে  
নেই—কোথায় তবে চাঁপা!

এদিকে চাঁপা হ'ল রাণী। কত দাস-দাসী লোক-  
লব্ধর হীরা-জহরত মাণিক-মুক্তা! চাঁপার গরব আর  
ধরে না। রাত্তিরে সোনার পালকে চাঁপা ঘুমিয়ে  
আছে; ঘুমের ঘোরে শুনে, রাজার বাগানে কে  
“চাঁপা” “চাঁপা” ক'রে কাঁছে। চাঁপা ঘুম ভেঙে উঠে  
বসল। জানুয়ার দাঁড়িয়ে শুনে, কে কৈদে কৈদে  
ডাকছে—“চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা”—চাঁপা চিনল চন্দনের  
গলা। পরদিন চাঁপা রাজাকে বললে—“সারারাত একটা  
লোকের কাদায় আমার চোখে ঘুম আসেনি;  
লোকটাকে তোমার রাজ্য থেকে দূর ক'রে দাও।”  
চন্দনকে দূর ক'রে দেওয়া হ'ল। দিন গেল।

রাত্তিরে চাঁপার চোখ ঘুমে ভারী হ'য়ে

উঠেছে—এমন সময় শুনে রাজার বাগানে মিনি  
বেড়াল ডাকছে—“চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা!” চাঁপা মুখে আঁচল  
জড়িয়ে ঘুমে চাইল, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না।  
পরদিন রাজার কাছে বললে, “একটা বেড়ালের জালার  
আমি ঘুমতে পারিনে; গুটাকে জলে ডুবিয়ে মারো।”

মিনিকে জলে ডুবিয়ে মারা হ'ল। কিন্তু তবু  
রাত্তিরে চাঁপা ঘুমতে পারলে না। বকুল-ফুল এসে  
বললে, “আমি এসছি, মালা পাঁশে।” ময়ূরের পালক  
এসে বললে, “কই মুকুট?” কল্লী এসে বললে, “কই  
নাইতে যাবে না?” চাঁপা উঠে বসল। কেউ কোথাও  
জোখে নেই। অন্ধকারে চুপি-চুপি গিয়ে চাঁপা পাতার  
ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল।

পাতার ঘর পুড়ে গেল; আর গেল চড়াই পাখীর  
স্বামী ছেলে-পুলে নিয়ে। চড়ায়ের বোঁ পুড়ল না,  
পালিয়ে গেল।

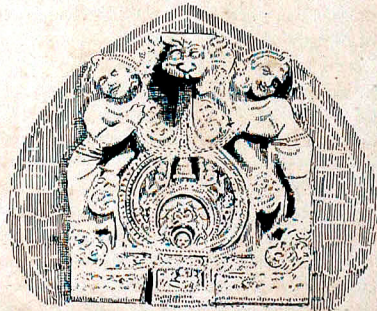
আর পুড়ল চাঁপার কপাল।  
পরের রাত্তিরে চাঁপা ঘুমের—কানের কাছে  
চড়াই-মা ডেকে উঠল—“চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা”—চাঁপা  
চমকে উঠে সোনার পালকে ব'সে রইল।

রাণী হ'য়েও চাঁপার স্বপ্ন নেই। না ঘুমিয়ে চাঁপার  
অমন সোনার বরণ কালি হ'য়ে গেল। পরদিন চড়াই-  
মাকে মারতে সৈন্য ছুটল, সেনাপতি ছুটল, স্বয়ং রাজা  
ছুটলেন। চাঁপা তার সর্ব্বের পণ করলে—যে মারবে  
চড়াইকে—

কিন্তু কেউ পারল না। চড়াই পাখী পালিয়ে  
পালিয়ে বেড়ায়। আর রাত্তিরে চাঁপা চোখ  
বুলেই বলে, “চাঁপা-চাঁপা-চাঁপা—আমার ছেলে কই,  
মেয়ে কই?”

চড়াই-মাও মরে না—চাঁপার চোখে ঘুমও আর  
জাদে না।

‘পালকে রংগো’র বেলজিগান্ প্রায় অবলম্বনে





দেখিলাম শ্রাম। মেয়ে প্রান্তরের বটকম্পুলে  
শিখিল কবরী-বন্ধ; গুহু দুই গুহু ভাঁট ফুলে  
রচিতা গীমন্ত-শোভা, তরঙ্গিত সুরীধী অক্ষয়  
প্রসারিত। চৈত্র-রৌদ্রে একাকিনী শাও অঙ্গল  
চেয়ে আছে দূর শূন্যপানে। মেঘ সম নদী শাড়া  
আনিসিয়া সর্গন্ত চ'লে গেছে দেহসীমা ছাড়ি'  
দিগন্ত স্বপ্নের মত—শতহীন ক্ষুধার দেশ,  
রাস্তাকর্ষে ডাকে যুগ, নেজে নামে তন্ময় আবেশ!  
তরুণ্যাত্মক আদি' মনে হ'ল তিনি যেন তা'রে,  
তাহার মুখের রেখা জন্ম-জন্মান্তের অন্ধকারে  
অন্ধ-বিশ্ববিরূপে দীপ্ত উজাসিয়া উঠিল দ্বারে—  
মেঘস্বপ্নে সন্তানিয়া কহিলাম, 'অরি অবিশ্বাসে,  
কুণ্ঠেছি তোমার নাম—বহুদূর আনিসিয়াছি চলি।' '  
'জলাঙ্গী—গঙ্গার সর্বা—বিশ্বহাতে কহিল শ্রামলী।

সহসা পড়িল মনে, পুরাতন পরিচয়-পথে  
একটি মালার মত দিনগুলি গাঁথা এর যোতে।  
এক জল-কম্পধ্বনি, শাবণের ঘন-সমারোহ,  
উদয়-অস্তের লীলা, দিনান্তের সন্ধ্যারদমোহ,  
আমার কাবোর মাঝে এর লবু গোপন সন্ধ্যার  
প্রথম করিছ অহুভব। ক্ষুদ্রের গুরুভার  
দূরে গেল, কহিলাম, 'চিনিয়াছি, হে শ্রামলী মেয়ে,  
কিশোর-স্বপ্নের সাথী, কতদিন মৃগপান পেয়ে  
কিরিছে তোমার পাশে। তুমি ছিলে অশ্রু-বস্ত্রিনী  
তটপ্রান্তরিনীদেহ। বহুদূর-দিগন্ত-সঙ্গিনী—  
মৃতুর বিদগ্ধমেধা স্তম্ভ শয়ন ছায়াময়ী;  
আজ দেখি নদী নহে, নারী তুমি কবি-চিত্তি মোহি'  
ব'লে আছ একাকিনী প্রান্তরের পথতরঙ্গলে।  
তুমিছ কি সেই বীণা বাজিত বা' তব কুলে কুলে?'

'বস্ত্রের মনুনা তুমি মেঘকল্পা অরি অপরূপে,—  
বৈষ্ণবী রসের ধারা স্রবিত্ত অমর্যাদ-ধূপে।  
তব ঘন কালো জলে পলে পলে লহরে লহরে  
আত্মবিশুদ্ধনী গান বাজিতেছে তবলিত স্বরে  
উদার বস্ত্রের বাটে। শুনি গোঁড়-সারথের হুসে  
অপূর্ণ সন্ধ্যা-কথা—সে কাহিনী আসে যুগে যুগে  
স্বপ্নাশ্রমে শতাব্দীর রূপ রৌদ্রে, অরি উমানিনি!  
তুমি ত' জানো না নিজে উঠিছে কি বিশ্বত রাগিণী  
অবিশ্রাম গতির ভঙ্গীতে।' 'জলাঙ্গী উঠিল হাসি—  
মরিকা-বকুল-কুল গুহু ফুল যেন রাশি রাশি  
নিঃশব্দে ঝরিয়া গেল—'সে কাহিনী পড়ে না ত' মনে,  
আমার নূতন জন্ম, মব স্রোত, নূতন প্রাবনে  
সে স্তম্ভ ফেলিছে দূরে; নারী নহি;—নিভাগতিশীলা  
কালস্রোতে ছুটে চলি—ফুলে যাই—এই বোরে গীলা।'

'হে নরি, দেখেছি আমি মানবীর বহুস্ত-বিলাস;  
সে-ও ত' ভোমরি মত ফুলে যার বিদ্বি অবকাশ!  
কত কাবা, কত গান বুঝা রচে চরণ-শৃঙ্খল!  
গতির গভীর বেগে বিচ্ছেদের ধ্বনি অবিরল  
বাজিছে গভীর মন্ড্রে। একরূপ—নদী আর নারী  
নিশিদিন চেয়ে আছি—সে রহস্ত বৃত্তিতে না পারি;  
বেগধ্বনি জগদেহ, তলহীন পরিণামহীন—  
অজ্ঞাত ইঙ্গিতে ছুটে, চেয়ে আছি মুগ্ধ নিশিদিন।'  
দিন শেষ হ'য়ে এল; শৈবালের ঘন গন্ধ সনে  
আসন্ন পৌর্ণমি-ছায়া;—মোহমগ্ন পশিল শ্রবণে  
কম্পমান পল্লবের প্রান্তচ্ছন্দে দেখিলাম চেয়ে  
অদৃষ্ট ছায়ার মত নেমে গেল শ্রামলী সে মেয়ে,—  
নিশে গেল নদী জলে; স্রোতোধেগে উঠিল উজ্জ্বলি—  
'আপনারে ভোগোবাসি—নদী আমি!—কহিল শ্রামলী।

সমস্ত বাড়ীটা কেমন বেন গুপ্তিত হইয়া আছে।  
যেন প্রলয়-ঝড়ের আগের আকাশ, যেন অগ্ন্যংগার  
পূর্ণের আঘের গিরি। মাঘের কয়টি পা টিপিয়া  
টিপিয়া হাটতেছে, কথা পারতপক্ষে কেহই বলিতেছে না।  
এমন কি ছেলে-মেয়ে তিনটাও গোলমাল করিতে বা  
কাদিতে ভরসা পাইতেছে না। পায়ার মাছন ছাই চারি  
জন সারাক্ষণই রহিয়াছে, কেহ ডাক্তারের বাড়ী  
যাইতেছে, কেহ পাশের বাড়ী গিয়া টেলিফোন করিতেছে,  
কেহ বা রোক্‌দামান্না ছোট থুকীকে সামলাইয়া  
রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাইবার মত অবস্থা বা উৎসাহ কাহারো নাই, তবু  
গৃহস্থের বাড়ী হাট্টি নাড়া অলক্ষণ, বামন ঠাকুরণ অতি  
বিশৃঙ্খলভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। সে এ  
বাড়ীতে আছে দশ বৎসর, পরিবারের একজনদেরই মত,  
ইহাদের বিপদ-আপদ যেন তাহার নিজের বিপদের  
মতই বোধ করে।

বছর বারোয় একটি মেয়ে অতি রান্না মুখে রান্না-  
ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বামন ঠাকুরণ জিজ্ঞাসা  
করিল, 'কি গো, বেলা দিদি? ডাক্তারবারু এলেন?'  
বেলা বলিল, 'না, তাঁর এখনও আনুতে ঘন্টা-  
বানেক দেরি হবে। 'কলে' বেয়ীয়ে গেছেন, তাঁকে  
বাড়ীতে মোটে পাওরায় গেল না। লুখ জাল হয়েছে?'  
'হয়েছে', বলিয়া পিতলের কড়া হইতে ঝঙ্কার  
একটা কীসার বাজিত বানিকটা ছপ সে চালিয়া দিল।  
বেলা আঁচলের গুঁটি হাতের উপর পাতিয়া তাহার  
উপর বাট বসাইয়া লুখ লইয়া চলিয়া গেল। বামন  
ঠাকুরণ, মাছের কড়াটা আবার উঠনের উপর চাপাইয়া  
দিয়া আপন মনেই যেন বলিল, 'কি গতি হবে, মা  
দুর্গাই জায়েনে। আছা কচি-কচা নিয়ে ঘর কবলি,  
তাও পোড়া দেবতার দইল না।'

বাড়ীতে মাছন নিতান্ত কম নয়। বুঝা মা আছে,  
বিধবা দিদিও খণ্ডরবাড়ীর উৎপাত বৈধী সহ করিতে  
পারেন না, নাবালক পুত্রটিকে লইয়া ভাইয়ের সংসারেই  
বছরের দশটা মাস কাটাইয়া বেন। তাহার পর ভবতোষ  
নিজে, পত্নী কল্যাণী, ছেলে-মেয়ে তিনটি; আরও একটির  
আগমনের সম্ভাবনা জানা গিয়াছে। বড় মেয়ে বেলা,  
বছর বারো বয়স, তাহার পর একটি সন্তান মারা গিয়াছে,  
খোকা কল্যাণের বয়স আট বৎসর হইবে, তাহার পরও  
শোকের ব্যবধান, ছোট থুকী রয়মালা তিন বৎসরের।

স্বপ্নে লুখে দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল।  
ভবতোষ চাকুরি মন্ড করে না—সওয়া গুণো টাকা  
মাহিলা। আজকালকার বাজারে কয়টা মাছন আনিতে  
পারে? তাহার উপর বাড়ীখানা তাহার নিজের।  
ছোট হইলে কি হয়, মাথা গুজিয়া থাক! ত' চলিতেছে?  
একমাস ভাড়া গুণিতে না পারিলেই পথের গিয়া  
দাঁড়াইতে হইবে না।

দিন দুশ বারো আগে হঠাৎ আকিস হইতে ফিরিয়া  
ভবতোষ কিছু খাইতে চাহিল না। কল্যাণীকে বলিল,  
'বেশ কড়া করে এক পেয়লা চা করে দাও ত';  
আর কিছু খাব না।'  
কল্যাণী উঠিয়া হইয়া বলিল, 'কেন গা, কি হ'ল?'

কিছু খাবে না কেন?'  
ভবতোষ বলিল, 'গা-টা কেমন যেন গুলজ্জ, এখন  
অর-জারি না হ'লেই বাঁচি। এই গেল-মায়ে খোকার  
অল্পবে তিন দিন কামাই করত হ'ল। রোজ  
এমন হ'লে সায়বই বা মনে কববে কি?'

কল্যাণী চা করিয়া আনিলা। কিন্তু চা ভবতোষের  
সহ হইল না। খাওয়া মাত্র সমস্তটা বমি করিয়া সে  
গুইয়া পড়িল। সপ্তম কল্যাণী গায়ে হাত দিয়া দেখিল,  
গা একেবারে পুঙ্খিয়া যাইতেছে।



সেই অর এখন অবধি সমানে চলিয়াছে; বরং বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ডাক্তার দেখিতেছেন, তিনি নিজেই গরুর করিয়া একজন বড় ডাক্তার শুকু আনিয়া দেখাইয়াছেন, সকলেরই এক অভিমত—টাইফয়েড। চৌদ্দ দিনের দিন অর ত ছাড়িল না, একুশ দিনের দিন যদি ছাড়ে, সেই আশায় সকলে পথ চাহিয়াছিল; ইতিমধ্যে কাল হইতে রোগের আর-এক উপসর্গ জুটয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন, নিউমোনিয়াতে পাড়ান বিক্রি নয়।

মাতা আহা—নিজা তাগ করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। তিনি সকল কাজের বাহির, তাহার কাছে কেহ কিছু কাজ অবশ্য প্রত্যাশাও করিতেছে না। সবাই আড়ালে বসাবলি করিতেছে, “বুড়ী কি কপাল গা! এই বৈধব্যের জন্যে এতকাল বসেছিল? হুঁটা নাহলে রোগ হয়ে সাহুতে নেই, সেবার গুরীতে এমন কঠিন রোগ হ’ল, সেসেই পাহুত? তা’ না এখন কাণ্ড দেখ! যমুত কখনও এমনি কিরবে না, কাউকে না কাউকে নিয়েই যাবে।”

দ্বিদি সঙ্গার দেখিতেছেন, ছেলেমেয়েদের খানিক খানিক সামলাইতেছেন, আবার প্রতিবেশীদের সঙ্গে জুটিয়া হাত-হাত করিতেছেন। কল্যাণিক ডাক্তার অন্তসহা অবস্থার রোগীর ঘরে গাওয়া-আসা করিতে বাধ করিয়াছিল, সে কথা শোনে নাই। স্বামীর সেবা সে দিনরাত অবিশ্রান্ত করিতেছে, ছোট মেয়েটাকে নন্দনের হাতে সপিয়া দিয়াছে, পাছে হুঁচকা লাগে বলিয়া তাহাকে আর পূর্ণও করে না। স্বানাহারের জন্ত কেহ খনন তাহাকে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, তখন নাওয়া-খাওয়ার বদলে সে ঠাকুর-ঘরে গিয়া মাথা কোটে। কপালের যা চেহারা হইয়াছে, মাথুখটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আজ সকাল হইতেই ভবতোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের লোক আনিয়া জুটিয়াছে, বাড়ীতে পুঙ্খ অভাবাক হইবার

মত কেহই নাই, তাই টেলিগ্রাম করিয়া কল্যাণিক খুঁজুত তাইকে আনান হইয়াছে। বিপদের উপর বিশপ, যে ডাক্তারবাসু এতদিন দেখিতেছিলেন, তাহাকে সকাল হইতে পাওয়াই বাইতেছে না, আর এক কোন্ মরণাপন্ন রোগীর বাড়ী গিয়া বসিয়া আছেন। অথচ এমন সময় দি, করিয়া ডাক্তার বদল করাও চলে না। টেলিফোন করিয়া, লোক পাঠাইয়া বিশেষ কোনই ফল হইতেছে না।

ভবতোষের কাছে এমন দ্বিদি বসিয়া আছেন। শুকিকে কখনও বেলা আশুলাইতেছে, কখনও পাশের বাড়ীর একটি বউ আনিয়া কোলে করিয়া লইয়া বাইতেছে। কল্যাণি ঠাকুর-ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি যে করিতেছে, তাহা সে-ই জানে। ছেলেমেয়েদের বাগা একরকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, বড়রা কেহই যায় নাই। বামন ঠাকুর-বেলা ছুটাই অবধি ঠেসেলে আশুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার পর সেও হাড়ি ভুলিয়া দিয়া, ছুটাই-মুখে গুজিয়া আঁচল পাতিয়া রাসাঘরে শুইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় সদর দরজার কাছে ডাক্তারের গাড়ী থামিবার শব্দ শোনা গেল। কল্যাণি আর থুকি বাদে সবাই প্রায় সোড়িয়া রোগীর ঘরের দরজায় দাঁড়াই হইল। ডাক্তার ভবতোষের অবস্থার কথা জানিয়াই আসিয়াছিলেন, কোনদিকে না তাকাইয়া গুট গুট করিয়া সোজা ভবতোষের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরিয়া পরীক্ষা করা, রোগীর অবস্থার বর্ণনা শোনা, জরের ‘চাট’ দেখা চলিতে লাগিল। তাহার পর ডাক্তার তেমনি গভীর মুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভবতোষের মা একেবারে তাহার সামনে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন, “ও বাবা, একটা কিছু ভরসা দিয়ে যাও। কেমন দেখলে আমার বাছাকে?”

ডাক্তার থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাহার পর

বলিলেন, “দেখুন, এটা মাছের ত’ হাত নয়, যথাসাধ্য চেষ্টা মাত্র আমরা কর্তে পারি। তা’ আপনারা এখনই এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন? এর চেয়ে কত খাৰাপ ‘কেস’ ভাল হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা হ’লে কি না হ’তে পারে?”

বুঝা আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাহার কড়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। বেলা বেচারীও কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরমার পিছন পিছন চলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কল্যাণিক ভাই সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম বুঝছেন? ‘কেস’ কি খুব ‘সিরিয়াস’?”

ডাক্তার বলিলেন, “সিরিয়াস বৈ কি? টাইফয়েডের উপর নিউমোনিয়া পাড়ান, সাংঘাতিক ব্যাপার।” সরোজের মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “একেবারে সাব্বার chance নেই?”

ডাক্তার জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “এই দেখুন, অত ভয় পেলে চলে কখনও? Chance থাকবে না কেন? তবে আপনারা ইচ্ছা করেন ত’ আবার কাউকে consultationএর জন্তে ডাকা কতে পারে।”

তাঁহারা দেখানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন সেটা দোতলা ও একতলার ঠিক মাঝামাঝি স্থান। এইখানে একটি ছোট নীচ ঘর, বাড়ীর লোকে বলে সেড়তলা। ইহাই ঠাকুরঘর।

ডাক্তারের কথা শেষ হইতে না হইতে ঠাকুর-ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। দেখা গেল, কল্যাণি সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। পরনে ময়লা লালপেড়ে শাড়ী, চুল রুক্ষ, অবিজ্ঞত, চোখ ছুটাই রক্ত-জ্বার মত লাল, তাহা হইতে দূর দূর করিয়া জল করিতেছে। কপালটা ঘুরিয়া উঠিয়াছে, রক্ত জমিয়া আখানা কপাল জুড়িয়া কালশিরা।

ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কল্যাণিকে সোধন করিয়া বলিলেন, “আপনি এ

করছেন কি? শেষে কি একটা প্রাণীহতা করবেন, না নিজে মারা যাবেন? ছেলেমেয়েদের কথা একবার ভাবুন। সমস্তের থাকতে গেলে শোক-দুখ ত’ আছেই, তাই ব’লে একেবারে হাল ছেড়ে দিতে হবে?”

কল্যাণি ভাঙা গলায় বলিল, “ঠাকুর দয়া ক’রে তাঁকে রাখেন ত’ সবাই থাকবে, নয়ত তিন জনেই যাবে।”

ডাক্তার সরোজকে বলিলেন, “আপনারা একে neglect করবেন না। এর অবস্থাও পূর্বে আশঙ্কাজনক। আমি আপনাদের সাবধান ক’রে দিই বাছি, এই ভাবে চলে ‘সিরিয়াস’ ব্যাপার ঘটবে।”

সরোজ বলিল, “কি যে করা যায়, আমরা যেন বেত্যা-আশ্রমের মধ্যে পড়ি। এক কে-ই বা দেখে, আর কে-ই বা বোঝায়? উটেও দিন নেই, রাত নেই, রোগীর সেবা করছে।”

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “আপনারা বরং নান্ন রেখে দিন, এই অবস্থায় ঠিক ও রকম ক’রে খাটতে দেওয়া criminal folly.”

ডাক্তারের গাড়ী চলিয়া গেল। সরোজ উপরে উঠিতে গিয়া দেখিল, কল্যাণি তখনও ঠাকুরঘরের ঢোকাঠের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, “তুই খেয়েছিলি কিছু?”

কল্যাণি বলিল, “সকালে দুখ খেয়েছিলাম।” সরোজ রাগ করিয়া বলিল, “কাণ্ডখানা কি বল দেখি? একে ত’ এই বিপদ, তা’র উপর তুই একটা অনর্থ বাখাতে চান? ছেলেমেয়েগুলো কোথায় দাঁড়াবে?”

কল্যাণি পাগলের মত চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল। বলিল, “ও দাদা, তোমাদের পারে পড়ি, তোমরা আমাকে আর জালিও না। আমার বেঁচে কি হবে? পেড়া। কপাল নিয়ে আমি বাঁচতে চাইনে। তার আগে এক কপাল আমি পাখর দিয়ে ছেঁতে ফেলব।”

ছেলেমেয়েদের যে পারে সে দেখেছে। সরোজ উঠিয়া চলিয়া গেল। এই অন্ধ-উদ্ভাসদীপকে



কি সে ব্যাধি? স্বামী ভিন্ন অগতঃস্ফার ইহার কাছে অর্থহীন। স্বামীকে হারাইবার অশেষ প্রার্থনা ইহার কাছে বিভীষিকাময় হয়। উঠিয়াছে, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। এমন কি সন্তান-সংগেও এই মহাভয়ের কাছে পরাভব মানিয়াছে।

কলাগী নিজে শৈশবে মাতৃহীন, তবু মাতৃহীন শিশুর দুর্ভাগ্যের কথা আজ সে ভাবিতে পারিতেছে না। দারুণ আশ্রয় তাহাকে গ্রাস করিতেছে, পায়ের তলার সমস্ত আশ্রয় তাহার হঠাৎ বসিয়া বাইবার উপক্রম করিয়াছে। অশিক্ষিতা, অবরোধবাসিনী, বাৎসার মেয়ে সে। তাহার স্বভাব কোনো অস্তিত্ব নাই, সে আর-এক জীবন-তরুর পরশালা নারী। সেই বুকগুলোই যদি আজ শমনের ফুটরাখাত বাজিয়া উঠে, তবে কলাগী ঐতিহ্য থাকিবার সাহস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে?

সমস্ত দিনটা একই ভাবে কাটিয়া গেল। কলাগী আবার স্বামীর ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার শাওল দরজার কাছে ঝাঁটল পাতিয়া শুইয়া আছে। সন্ধ্যা নার্স' আবার কথা বলিতে গিয়াছিল; কলাগী, তাহার নন্দন এবং শাওলী একসঙ্গে স্বপ্নের দিয়া উঠিলেন—তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে কোনো জীর্ণানীকে আসিয়া ভবভায়ে সেবা করিতে হইবে না।

নীচের তলায় বেলা রাত্রাঘরে বসিয়া চিঁচি ভিজান বাইতেছে। কলাগীর গলায় বাজে জিনিস পছন্দ না, সে নিজেই মোড়ের দোকান হইতে গিঁড়ের কচুরি কিনিয়া আনিয়াছে, দরজার আড়ালে লুকাইয়া তাহাই খাইতেছে। দু'দানর প্রয়োজন এইজন্মে, দেখিতে পাইলে মামাবাবু শুধু যে বলিবে তাহা নয়, কচুরি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিবে। ছোট পুতী সম্প্রতি একশাই খুঁজিতেছে, পিঁপীরা কাপড় কাচিতে চুকিয়াছেন, বেলোকে বসিয়া গিয়াছেন খুঁকীকে দেখিতে। বেলা খাইতে ব্যস্ত, কথাটা বিশেষ কানে নেন না। পুতী দাওয়া হইতে কয়েকটা মড়ির দানা ফুড়াইয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে।

বামুন ঠাকুরণ উপরে গিয়াছিল বাণীর জল পৌঁছাইয়া দিতে। কলাগীকে ডাকিয়া বলিল, “জ বোমা, এখানে একটু তখন যাও, বাছা।”

কলাগী বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি?”

বামুন ঠাকুরণ বলিল, “কাজী বলছিলেন কি সে, গলির মোড়ে শেগুদের বাড়ী ভারি একজন সাধু মহাশয় এসেছেন; এপাড়া-ওপাড়া ঘেঁটিয়ে সব তাঁর দর্শন আসছে। আমি বলি তুমি একবার যাও না, মা? তাঁদের দয়া হ'লে কি না হ'তে পারে?”

কলাগী অন্তরঙ্গ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, “মাছা, সন্ধ্যার সময় যাব।”

ডাক্তারবাবু সন্ধ্যার সময় আর একজন ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখিলেই কলাগী পলায়ন করিত। তাঁহার উপদেশ-গণি তাহার গায়ে যেন তপ্তজলের ছড়ার মত লাগিত। পুরুষের জাত, কি করিয়া বৃথিবে কলাগীর বুক কি চিতার আগুন জ্বলিতেছে? হুতরাং ডাক্তারের সাড়া পাইয়াই সে কবের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

ডাক্তারদের আদ্যবর্তী থাকিয়া, ঔষধ-পান্যদ্রি থাকি থাকি বদল করিয়া প্রস্থান করিলেন। কলাগী তখন বাহির হইল। গা খুঁইয়াছে বটে, তবে চুলের অবস্থা আগেরই মত, একখানা ময়লা শাওল বদলাইয়া আর একখানা পরিয়াছে।

কাজী-থিকে ডাকিয়া বলিল, “হুঁ হারিকেনটা নিয়ে আমাকে একটু ঠেঙের বাড়ী পৌঁছে দিবি চা।”

কাজী হারিকেন আনিতো তাঁড়ার-ঘরে গিয়া চুকিল। কলাগী বামুন ঠাকুরণকে ডাকিয়া বলিল, “মা কি ঠাকুরকি দিবে গোকে ব'লে নিও কোথা গেছি। দাদা এখন ওপরের ঘরে আছে, সেই দেখবে।” কাজী লগুন লইয়া আসিল, দুই জনে গলির পথে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু জগতে আজ কলাগীর জন্ম কোথাও সাধনা নাই। প্রেমামান স্বামীর কাণ্ডে সে কোনো আশা

পাইল না। শোকার্তকে, গুংবাকে পথ দেখাইবার কাজই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কোনো পরায়ণা না তাঁহারা লাভ করেন নাই। কলাগী অন্তরঙ্গ পরেই কানিতে কানিতে কিরিয়া আসিল। সন্ধ্যা তাহাকে বলিতে আসিয়াছিল, কান্না দেখিয়া কিরিয়া চলিয়া গেল।

ভোর হইতে না হইতে কলাগী নীচে নামিয়া আসিয়াছে। রাত্রে দুই এক ঘণ্টার বেশী সে ঘুমান না, যদিও সন্ধ্যা এবং পাড়ার একটু ছেলে পালা করিয়া বেশীর ভাগ রাত্রি জাগিয়া থাকে। বামুন ঠাকুরণ সবে তখন রাত্রাঘর খুঁটি দিতেছে। কলাগীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি বোমা, এত সকালে নেমে এসে যে? দাদাবাবু কেমন?”

কলাগী বলিল, “তেননি। আমি একবার কালীঘাটে যাব, বামুন-মা, আমার সঙ্গে যাবে কে?” বামুন-মা বলিল, “তাই ত' কে যায় এখন? সকাল-বেলাটা সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তা' তুমি না হয় লাটুর পিঁপীর সঙ্গে যাও, চল তাদের দরজা অবধি আমি পেঁচে দিয়ে আসি।”

কলাগী তেননি মলিন বস্ত্রে, মুখ-হাতে জল পর্যন্ত না দিয়া বামুন ঠাকুরণের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

খানিক বাদে রোগীর পোক্তানীতে সন্ধ্যার ঘুম জাগিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া ক্যাম্প বাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, “বাসু! কলি গেল কোথায়? এই না আমাকে খোর ক'রে শুয়ে দিল, যে এর পর সে দেখবে, বাতাস ক'বে। গুণ্ডুটাও খাওয়ায়নি বেশি। এদের সেবা কর্তে আসা মানে খালি নিজেকেই হিটরিয়াকে চরিতার্থ করা।” বিরক্তভাবে উঠিয়া-বসিয়া সে কলাগীর ক্রটিগুলি স্মরণে প্রবৃত্ত হইল।

কলাগী যখন ফিরিল, তখন প্রায় বেলা দশটা। ভবভায়ে অবস্থা ভাল ত' কিছু নয়ই, বরং হয়ত বা আরও একটু বাগাদ। কিন্তু কলাগীর মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় কি যেন অবলম্বন

সে পাইয়াছে। এই মহাবীড়ীকার অন্ধকারের ভিতর কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল?

স্বামীর ঘরে আর সে বলিতে চায় না। পঞ্চাশ বার খালি ঠাকুরঘরে গিয়াই দরজা বন্ধ করে। মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া অক্ষুটকণ্টে কি সব বলিতে থাকে, পাখানের দেবতা হয়ত বা শোনে, মাছের কর্ণপাতার কিছুই হয় না। কলাগী বেগীর ঘর ছাড়তে সন্ধ্যা বরং খুসিই হইয়াছে, সে কলাগীকে আর একবারও দেখে নাই। পাড়ার দুই একটু ছেলে-গোঁড়া আসিয়া ছুটয়াছে, তাহাদের সাহায্যে সে কাজ চালাইয়া লইতেছে। কাজ ভালই চলিতেছে, কারণ ইদানীং কলাগীর অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল তদ্রূপিত মত, সে কি যে করিত, আর কি যে না করিত, তাহার টিকানা ছিল না।

সন্ধ্যা একবার বাহিরে গিয়া কলাগীর খোঁজ করিল, সে ঠাকুরঘরেই আছে। কলাগীর নন্দনকে সামনে দেখিয়া সন্ধ্যা বলিল, “কিনিক একটু ঘুমিয়ে নিতে বসুন না, এখন বন্ধন এরিকে আসছেই না, একটু বিশ্রাম করক।”

ভবভায়ে দিদি বিরক্তভাবে বলিলেন, “হ্যাঁ, ঘুমাতেই তার এখন সময় বটে। তার বা হচ্ছে সেই জামে। আর আমি ডাকলেই সে শুতে আসবে কিনা; সে ত' এখন ঠাকুরঘরে।”

সন্ধ্যা চলিয়া আসিল। কলাগীরই বা বোঝ কি? বাৎসাল্যের ঘরের জীবনের মূল্য অজ্ঞ হারাইতে পারে যখন নাই, তখন তাহার নিজের কাছেই বা থাকিবে কেন? কলাগী সেই যে দশটার ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করিল, আর সে বাহির হইল না। এদিকে ভবভায়ে অবস্থা ক্রমেই যমের দিকে গড়াইয়া চলিল। বিকালে ডাক্তার আসিয়া মুখ একবারে গভীর করিয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করিয়া বলিলেন, “আপনারা আর যদি কাউকে দেখাতে চান, দেখাতে পারেন। আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি বিশেষ থাকেন ত' wire ক'রে দিন।”



মা আর দিদি ভক্তার আসিলেই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজও দাঁড়াইয়া ছিলেন। দরজাটা ছাড়িয়া ইকি-দুই পাশে সরিয়া আসিয়া ঠাঁহার এমন বুক-কাটা আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিলেন যে, মোহাবিষ্ট রোগী পর্যন্ত বাটের উপর নড়িয়া উঠিল। ভক্তার এবং সরোজ মিলিয়া তাড়াহুড়ো ত্যাগদ্রোণে টানিয়া অল্প দূরে গিয়া পেল। ভক্তার বলিলেন, “আশান্বিতের একটু খেঁচা ধ’রে থাকা উচিত। ঠুঁর এখনও জান রহেছে, আপনাদের এরকম কালাকাতী তুলে মনে কষ্ট পাবেন যে?”

মা ও দিদি সমানে কাঁপিতে লাগিলেন, নাচের থেকে বেলা এবং কল্যাণ উপরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সরোজ রোগীর ঘরে ছুটিয়া গিয়া দরজাটা ভাঙ করিয়া ছোঁড়াইয়া দিল। তাহার সংকীর্ণ ছেলেকোটে বিখ্যাত এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য টানিয়া করিয়া পাঠাইয়া দিল।

কালাকাটির মধ্যে ঠাকুরঘরের দরজা খুলিয়া কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল। একজন প্রতিবেশিনী বলিয়া মাকে সাধনা দিবার কথা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে বিবর্তকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ’ল গা? আমার কপাল পুড়েছে?”

প্রতিবেশিনী দাঁতে জিব কাটয়া বলিল, “এখনই ওকি কথা, বেগার না? বতরুণ খাস, তরুণ আশ। কত মাহুয় মরতে মরতে টাল সামলে যায়।”

কল্যাণী ক্রমপদে স্বামীর ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভেজান, ঠেলিয়া খুলিয়া কেবিল। সরোজ উঠিয়া আসিয়া বলিল, “তুই বা দেখি এখন থেকে। এখানে থেকে কোনো দরকার নেই। ছেলে মেয়েদের কাছে যা।”

কল্যাণী নাচে নামিয়া চলিল। ছেলেমেয়েরা কোথায়? বেলা ঠাকুরমার মাথার কাছে বসিয়া কাঁপিতেছে, কল্যাণ গলিতে দাঁড়াইয়া আছে। ছোট খুঁকী কলতায় বসিয়া জল-কাদা খাটতেছে। কল্যাণী

চাটিয়া দেবিল মাত্র, তাহার পর ঠাকুরঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

বামুন ঠাকুরদের চাঁৎকারে বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক একসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরঘরের দরজায় জড় হইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু বিকট গোড়া গন্ধে সিঁড়িতে পর্যন্ত ঝাঁপান যায় না।

চৌমামেটি হাঁকাহাঁকিতে কোনো কল হইল না, শেষে কুড়াল দিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলা হইল। সরোজ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করিল। পাড়া-প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সরাইয়া গইল। বাক্য-কল্যাণীর ভয়ের অবসান হইল, তাহার শাঁধা সিঁদুর অক্ষয় হইয়া রহিল।

তাহার পর কয়েক ঘণ্টার ইতিহাস উল্লেখ থাকাই ভাল। কল্যাণীর শশান-বাজার শব্দের লোক ভাঙিয়া পড়িল। বাটের উপর আপাদ-মস্তক চাদর ঢাকা দিয়া কল্যাণী শুইয়া আছে। দেহা ঘাইকেছে, আলতা-পরা ছোট ছুটি পা, আর চাদরের উপর রাশি রাশি সিঁদুর। কলি-ভূষণের ধন্য সতী! যমের মুখে বেন লাগি মারিয়া দিলেন এয়েতি বজ্রার বাখিয়া চলিয়া গেল। সরকার বাহাদুর সতীদাহ উঠাইয়া দিলে হইবে কি? বাঙ্গাল মেয়ের মন হইতে ত’ ইহা উঠে নাই? সেই সিঁদুরের এক কণার জ্বল শশান-বাটে বেন কাড়াকাড়ি বাখিয়া গেল। কল্যাণীর ববর বাহিরের লোকে এই প্রথম বড় বেশী করিয়া গুনিল এবং এই শেষ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভবভোবের বাঁচিয়াই রহিল! কল্যাণীর অপসৃত্যুর পরদিন হইতেই তাহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে সে সারিরাই উঠিল। কল্যাণীর স্বখ্যাতি প্রতিবেশিনী মহলে অক্ষয় হইয়া রহিল। ভবভোবের বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, বাঁচিল কেবল কল্যাণীর আত্ম পাইয়া। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া, আর-একটা অশুভ জীবনকলিকাকে ধ্বংস করিয়া কল্যাণী যমের থোরাক ছুটাইয়া দিয়া গিয়াছে—ভবভোবকে আর মৃত্যু-সেবতার প্রয়োজন নাই।

মাস আট পরের কথা। ছোট খুঁকীটা মেঝেতে শুইয়া আছে ছেঁড়া কাঁথার উপর। তাহার হাত-পা কাটির মত, মুখের রং ছাইএর মত, পেটটা ঝালি মস্ত বড়। বড় বেনে দুর্জল, হাত-পা নাড়িবারও ক্ষমতা নাই।

ভবভোব বিকালে অক্ষি হইতে ফিরিয়া আসিল। ঘর-দোর বিশৃঙ্খল, বিগলগত, ঐহীন। ঠিক সময় চা পাওয়া যায় না, জল-বাষ্প পাওয়া যায় না, ঘরের ঐ দেবিলে শেয়ার-হুকুর কাঁদিয়া যায়।

নিজের জুতা-জামা খুলিয়া রাখিয়া, চাদর বুঝাইয়া ভবভোব বাতাস খাইতে লাগিল। বাড়ীভক্ত সবাই বেন মরিয়াছে, কাহারও আর সড়া-শপ নাই। মালুঘটা সারানি বেন তাড়িয়া-পুড়িয়া ফিরাই আসিল, তাহাকে এক গেলগল জল পর্যন্ত দিবার লোক নাই। একখানা হাত-পাখাও কি রাখা যায় না? ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর বেলা আসিয়া হালির হইল। বলিল, “বামুন ঠাকুরণ চা আনছে, চা ছিল না কিনা, কাঁজী বাজারে গিয়ে আনল তবে—”

ভবভোব বিরক্ত হইয়া বলিল, “আরে ঘণ্টা দুই পরে আনুলেই হ’ত! চা নেই ত’ ছ’দিন থেকে তুন্নি, আনান হয় নি কেন?”

বেলা উত্তর দিবার আগেই বুদ্ধা মা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া বলিলেন, “বুড়ো মাহুয়, অত কথা কি মনে থাকে? তা’ রাখ কল্লে চায়ে কেন? এক ত’ তোমার মেয়ের জালায় সারারাত ঘুম নেই দেখে, টাটা টাটা লেগেই আছে। এমন মেয়েও আর কারো ঘরে নেই।”

খুঁকীর দিকে ভবভোবের চোখ পড়িল, বলিল, “ওটা আছে কোন?”

মা বলিলেন, “একই রকম। একটা লোকজন না রাখলে আর ত’ চলে না, বাছ। আমিই বাক্ত রাত জাগি, আর সহুই বা কত জগে? আর নাইতে নাইতে ত’ প্রাণ গেল, সর্দি আর হাজে না। তোমার মেয়ের নোংরা কাছ’বার আর বাঁট’বার ক্ষমতা কি এ বুড়ো হাজে আছে?”

বেলা খুঁকীর কাছে গিয়া খুঁকিয়া দেখিয়া বলিল, “আবার ভিজিয়েছে।”

ঠাকুর-মা হেঁটে উঠাইয়া বলিলেন, “কেতাপ করেছেন। আমি সব কাপড় কেচে এসেছি, এখনই নরক বাঁটতে বসতে পারব না”—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ভবভোব রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল।

সারানি খাটয়া সে এই কুঁড়ের পালের অন্ন জুটাইবে, আর তাহার তাহাকে বাবিত করবেন মিলিয়া? বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কতক্ষণ ও ভিন্নে পড়ে আছে তুনি? তোরা পিসীও কি ওকে একটু দেখতে পারে না?”

বেলা বলিল, “পিসী ত’ জগে বসেছে, এক ঘণ্টার আগে উঠবে না।”

ভবভোব নিজেই খুঁকীর কাঁধা বদলাইতে অগ্রসর হইল। বেলাকে বলিল, “একে এই অস্থল মেয়ে, তাকে মেঝেতে ফেলে রেখেছে কেন?”

তল্পপোষ ওর জায়গা হয় না?”

বেলা বলিল, “পিসী বলে, রোজ কি তল্পপোষ ধোব নাকি? তার চেয়ে মাটিতেই থাক।”

ভবভোব বলিল, “তা বেশ, একেবারে রাস্তায় ফেলে দিলেই হয়, আর পরিষ্কার করার হাশাম থাকে না। দে একখানা শুকনো কাঁধ; আর আমার গায়ে দেবার কথলটা নিয়ে আর।”

বেলা বলিল, “কাঁধাগুলো অবলায় কাটা হয়েছে, এখনও শুকায় নি।”

ভবভোব এক লাফে উঠিয়া গিয়া নিজের একটা শাখিপুরে ধুতি টানিয়া আনিল। গায়ে দিবার কথলটা দুই ভাঁজ করিয়া পাতিয়া, তাহার উপর ধুতি পাট করিয়া পাতিয়া খুঁকীকে শোয়াইল, বলিল, “এটাও যাবে, বা অঘর হচ্ছে।”

ভবভোবের দিদি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “একটা মাহুয় আর ক’দিক সামলাব তুনি?”



ওমা ওকি, ভাল কখনখানা দিলি কেন? এখনি মুণ্ডপাত হবে।”

ভবতোষ বলিল, “তা হোক, বা’ ক’রে প’ড়ে আছে, এ আর চোখে দেখা যায় না।”

দিনি বলিলেন, “বা’ খুসি কর, বাপু। একটা লোকটোক দেখ। আমিও ত’ আর চিরকাল তোমার সমসার আগলে ব’সে থাকব না, আমার নিজের ঘর-সমসার আছে ত’?”

অত্যন্ত কঠিন উত্তর একটা ভবতোষের মুখে আসিল; সেটা কোনোমতে চাপিয়া সে বলিল, “তাই দেখা যাবে। বেসা-বোদ্ ত’ খুঁকীর কাছে, আমি চাটা খেয়ে আসি।”

দিন কতক কাটিল। খুঁকী যেন মায়ের অভাব সহিতে পারে না। মায়ের কাছেই সে বাইতে চায়। তাহার নথর কচি দেহের সব লাবণ্য খরিয়া গিয়াছে, তাহাকে এখন শুকনো কাঠের পুতুলের মত দেখায়।

ভবতোষ একদিন রবিবার সারাটা গুপ্ত কোথায় কাটাইয়া আসিল। না জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় ছিলি সারাটা দিন? ছেলোটা প’ড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে এক কাণ্ডই করল! আমি বুড়ো মানুষ এত ভাল সামলাতে পারি?”

ভবতোষ বলিল, “ভাল সামলাবার লোকের ব্যবস্থাই কর্তে গিয়েছিল। খোকা কোথায়?”

না বলিলেন, “সদর ঘরে শুয়ে আছে। কি লোকের ব্যবস্থা করলি?”

ভবতোষ বলিল, “লোক আর কি? তোমার আর একটা বো’ এমন দেবো, শিখিয়ে পড়িয়ে চালিয়ে নিও, বাপু। বা’ অবস্থা হয়েছে সমসারের, এ আর চোখে দেখা যায় না”—বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেল।

আবার বো’ আসিল। পাড়া-প্রাচীরবশী ভাঁড় করিয়া বো’ দেখিতে দাঁড়াইল। কন্ডাখির লোহা-গাছি নতুন বোয়ের হাতে পরান হইল। এক প্রোটা প্রতিবেশিনী বলিলেন, “এ লোহার মান বেশ, নতুন বোমা। সতী-সাবিত্রীর লোহা এ। নিজের প্রাণ দিয়ে বমের মুখ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছে।”

আর সকলে সমসার বলিল, “আহা সতী-শশী ছিল গো! এমনটা এ থাপ কলিকালে দেখা যায় না।”

বোমটার ভিতর নতুন বদর মুখ ক্রকুট-কুটিল হইয়া উঠিল।

ঠাকুর-না নৃতিনাতিনীদের কাছে বোকে লইয়া গিয়া বলিলেন, “ওরে, তাদের নতুন মা দেখ; ভাব ক’রে নে।”

কিন্তু ছোট খুঁকী ভাব করিল না। কয়েক দিন বাদে সে রোগজীর্ণ যরণ-কাতর ক্ষুদ্র দেহ কেগিয়া দিয়া নিজের মায়ের কাছে চলিয়া গেল।



দেশীয়া ফিল্মের ভবিষ্যৎ

শ্রীবিলাস

দেশীয় ফিল্ম-শিল্পের শৈশব অবস্থা এখনও পার হয়নি, তবে সুভিকাগার থেকে বার হয়েছে। কিন্তু এই অগ্রদূতের দেশী ফিল্মগুলি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এগুলাে আলোচনা করা চলে। একথা সত্য যে, এগুলি জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করেছে। কেবল এই প্রীতির কতখানি স্ব স্ব স্বভাবের জোরে অর্জন করা, আর কতখানি জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতাই উৎসাহিত হয়ে এসেছে তাই নিয়ে সন্দেহ করা চলে।

প্রথম দেশী ছবি যখন রেখি তখন সুখীও হ’তে পারিনি, তার মধ্যে কোন আশার আলোও দেখতে পাইনি। তখন শুধু এই দেবে বিখিত হয়েছিলাম যে, এমন ‘অপকৃত’ ছবি দেখবার জগেও দর্শকের ভিড়ের আর শেষ নেই। তার পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি ছবি বেরল। তাতে কিছু উন্নতির আভাস দেখা গেলেও সে এমন বিশেষ কিছু নয়। তবু যতবারই গেছি, দেখেছি দর্শকের ভাঁড় ক্রমে বেড়েই বাড়ে। স্মরণ্য ছবি যেমনই হোক ছবি গীরা কুলোছেন

তাদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল। দেখা গেল, ফিল্ম-শিল্প লাভজনক। তখন ধনিকদের দৃষ্টি এলিক পড়ল, এবং একটর পর একট ক’রে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ফিল্ম গতিতে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বেড়েছে একটা হিসাব নিলেই বোঝা যাবে—১৯২১ সালে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা ছিল ১৪৮; ১৯২২-এ ১৭১; ১৯২৩-এ ১৮৮; ১৯২৪-এ ২১৯; ১৯২৫-এ ২৮৬; ১৯২৬-এ ৩০৯; ১৯২৭-এ ৩৪৬ আর ১৯৩১-এ প্রায় ৫০০। যে সংখ্যা বিলাম তা’ সমস্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ মিলিয়ে। এবং এর পরে আরও বেড়েছে।

এই জনপ্রীতির কারণ কি? প্রথম প্রথম যে-সব ছবি তোলা হয়েছে সেগুলোর কথা ছেড়েই দিলাম। এখন যে-সমস্ত ছবি দেখান হচ্ছে, বিদেশী ছবির কুলোয় সেগুলোও কিছুই নয়। আমাদের দেশে বিদেশী ছবি কম দেখান হয় না, এবং ভাল ভাল ছবিই দেখান হয়। এগুলো দেখলে দেশী ছবির সামনে ব’লে

“ফুল আপনার জন্ম ফুটে না। পরের জন্ম তোমার সদয়-কুশ্রমকে প্রসুচিত করিও।”

—বঙ্গিমচন্দ্র



ধাকাও কষ্টকর মনে হয়। তবু দেশী ছবির ঘরে যে ভীড় জমে, তেমন ভীড় বিদেশী প্রথম শ্রেণীর ছবি দেখতেও জমে না। এক-একটা দেশী ছবি একাদিক্রমে বতরিন দেখান হয় কোন বিদেশী ছবিই ততদিন দেখান সম্ভব হয় না। কতকগুলি সিনেমা-গৃহে নিছক দেশী ছবি দেখান হয়। যখন দেশী ছবি পাওয়া যায় না, মাত্র তখনই তারা বিদেশী ছবি দেখাতে বাধ্য হয়। ১৯২৭-২৮ সালে সিনেমাটোগ্রাফ কমিটির রিপোর্টে আছে—

“There are some cinemas which show Indian films almost exclusively, and only resort to Western films when they cannot obtain Indian. The fact is that the supply of Indian films is not equal to the demand.”

এবং “Exhibitors cannot always obtain Indian films, as the demand is greater than the supply. In particular, there is some difficulty in obtaining the better products, which command relatively high prices as compared with the ordinary Western film.”

এর থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, দেশী ছবির গুরু যে চাহিদা আছে তাই নয়, যে পরিমাণ চাহিদা সে পরিমাণ তৈরী হয় না। এবং “As regards the relative popularity of Indian and Western films, there is no doubt that the great majority of the Indian audience prefer Indian films. Generally, an Indian film draws much larger audience than a Western film.”—Report of The Indian Cinematograph Committee, 1927-28.

যদিও দেশী ফিল্ম-কোম্পানীর কল্যাণে বেকার-সমগ্র সমাধানের একটা পথ খুলেছে, এই শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে দেশের হাজার হাজার লোক অল্প-সংস্থানের উপায় খুঁজে পেয়েছে, এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকছে, তবু এই জনপ্রিয়তার মূলে যে একমাত্র দেশাধ্ববোধ তাও সত্য নয়; বিদেশী শিল্পের সহস্র দেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় সাধারণতঃ

জনসাধারণের দেশপ্রীতিই কাজ করে। এবং দেশী ছবির দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্তে সাধারণের দেশাধ্ববোধ কাগর করার প্রয়োজনও হয়নি। ভীড় এমনি জুটেছে। দেশীর গল্প-কথা দেশীর ভাষায় সহজই, লোকের ভাল লাগে।

এর কারণ এই যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এমনিতেই অতি সামান্য। ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যা আরও কম, এবং ইংরেজীতে সবাঁক ছবি বোঝবার লোকের সংখ্যা তার চেয়েও কম। স্বতরাং ছবি দেখার আনন্দ পেতে হ’লে দেশী ছবি-প্রদর্শনীরে বাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, ইংরেজী বারো জানে না, অথবা ইংরেজী জানলেও সবাঁক ছবির কথা বৃহৎ বাকের কষ্ট হয় তারা সর্বোচ্চই বিদেশী ছবির চেয়ে যে-কোনও দেশী ছবি দেখে আনন্দ পাবে বেশী। দেশী সবাঁক ছবির একটা মত বড় সুবিধা এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্কর লোকের পক্ষেও তা বৃহৎ কোন কষ্ট হয় না। এর একটি সুবিধা এই যে, শুধু জনসাধারণের দেশাধ্ববোধের উপর নির্ভর করে কোন ব্যরসা লাই দিন চলে না। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্তে মাছুর কিছুদিন তাগ স্বীকার করতে পারে। কিন্তু তারও একটা লীমা আছে। মাহুর বেশীদিন ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না, এবং ভাবপ্রবণতাও কোন চিরস্থায়ী হয় না। সেই-জন্তে যে-সমস্ত শিল্প শুধু মাহুরের স্বদেশিকতাকে অবলম্বন করে দাঁড়ায়, ভাবপ্রবণতা করে এলে বিদেশী প্রতিযোগিতার সংঘাতে সেগুলি দুসিয়া হ’তে দেবী হয় না। ফিল্ম-শিল্পের সেই ভয় নেই।

সেদিকে ভয় নেই বটে, কিন্তু অজদিকে রয়েছে। পুঙ্খই দেখিয়েছি, দেশী ছবিবিক্রয়ের সংখ্যা বেশ ক্রমশঃ হ্রাসই হেঁড়ে বাচ্ছে। কিন্তু অতীবাদেণে তুলনা বসে কিছু কিছু নয়। মাস্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫৭৬০ লোকের জন্তে একটি করে ছবিঘর আছে। গ্রেট ব্রিটেনও প্রতি ১২৫০০ জন লোকের জন্তে একটি করে ছবিঘর আছে। বার ভারতবর্ষে আছে

প্রতি দশলক্ষ লোকের জন্তে একটি। স্বতরাং এখনও অনেক ছবিঘরই এদেশে বাড়বে। এবং নিজস্বের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দেশী ছবির প্রযোজক-গণকে এখন থেকেই সেজন্তে সতর্ক হ’তে হবে।

এখন পর্যন্ত যে সমস্ত দেশী ছবি দেখান হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশেরই উপাখ্যান পৌরাণিক ঘটনা থেকে নেওয়া। আর কতকগুলি, প্রথিত-বশ্যঃ সাহিত্যিকের সর্বজনপরিচিত উপজ্ঞান অবলম্বন করে। আধুনিক কালের রস-রচনা ছবিতে পুর কমেই পান পেরেছে। এই ব্যাপারে প্রযোজকদের অসুদৃষ্টির আমরা প্রশংসা করি। আমাদের দেশের ফোটাগাফিক এখনও অপরিণত। বিদেশী অভিনেত্রীদের অর্ধেক দক্ষতাও এখানে হলভ। সেই কথা উপলব্ধি করে তারা সহজ পথে পা বাড়িয়েছেন। পৌরাণিক ঘটনার প্রতি আমাদের সহজাত শ্রদ্ধা আছে। অভিনয় ও কথার্বাচই হ’ল, ছবি যতই বিস্ত্রী উঠুক, পৌরাণিক ছবি আমরা দিনের পর দিন সশ্রদ্ধ ভাবে দেখে যেতে পারি—একদিনও স্নান্য আসবে না। এই স্বভাব আমার জন্মের থেকে অর্জন করেছে। দেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ীপণ সাধারণের এই ধর্মনিষ্ঠাকে মূলধন করে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ফোটাগাফিকের ক্রটি তারা গান দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছে। বিদেশী ছবির যত গুণই থাক বিদেশী গান দেশী গানের মত মিষ্ট নয়, মানে আমাদের কাছে নয়। স্বতরাং এইদিক দিয়ে দেশী কোম্পানীর সুবিধা আছে। এই সভা প্রথম বার উপলব্ধি করলেন তাঁদের ছবি হৈ-হৈ করে লোক টানতে লাগল। কিন্তু তাঁদের দেখাদেখি আরও গীরা সবাঁক চিত্রে গান জুড়ে দিলেন, বিপর ঘটালেন টাওয়ার। তার ভাল জিনিষ, এবং ছবির সঙ্গে ছুচরতার গান মন্দও লাগে না। কিন্তু যদি রাজ্য থেকে আরম্ভ করে রখাল বালক পর্যন্ত সকলেই ছবিতে সঙ্গীত-চর্চা আরম্ভ করে, অক্ষ সঙ্গর্য করা কঠিন হয়।

ফোটাগাফিকের ক্রটি দেখে আমরা ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু

লজ্জিত হই না। আধুনিকতম ফোটা-যন্ত্র ব্যবহার সামর্থ্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের যদি না থাকে তো সে অর্ধের অভাবে। বস্তুতপক্ষে ওদেশে একধানি ছবি তুলতে যে অর্থব্যয় করা হয় এদেশে তা কোনদিন ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে কল্পনাও করতে পারি না। এই দারিদ্র্য আমাদের পক্ষে কোভের বিষয়, লজ্জার নয়। লজ্জিত হই তখনই, যখন প্রযোজকদের প্রয়োজনা আমাদের রুচি-বোধে আঘাত করে। অর্ধের অভাব আমাদের কাছে। অল্প ভবিষ্যতে এই অভাব যে দূর করতে পারা যায়, এমন সম্ভাবনাও আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এককল কথা জানার পর কেউই বহুব্যয়-সাপেক্ষ দেশী ছবি দেখার প্রত্যাশা করি না। কিন্তু অর্ধের অভাব আছে বলে রূপবাদের দারিদ্র্য থাকবে কেন? তাই প্রযোজকদের রূপবাদের অভাব বহু কঠোর দৈজ্ঞ দেখে আমরা লজ্জিত হই। এখন পর্যন্ত ভাল ছবি তোলার চেয়ে সাধারণ দর্শকের মন হোণাবার চেষ্টাই হচ্ছে বেশী। এবং এই কাকি যদি আরও কিছুকাল চলে তা হ’লে দেশীর ফিল্ম-শিল্প যেমন তাড়াহুড়ি উঠেছে অল্প ভবিষ্যতে তেমনি তাড়াহুড়ি নেমে পড়বে, এ আশা করা অমূলক হবে না।

শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধাবন-লীলা, বৈষ্ণব কবিত্বের উপাখ্যান অথবা পৌরাণিক কাহিনীগুলি যে আমাদের মনকে পূর্ণ করে তার কারণ, এই সমস্ত কাহিনীর মূলে আছে একটি অমূল্যপূর্ণ রস-সাধুতা। বিশেষ করে প্রথমতঃ ছোট কাহিনীর মধ্যে এমন একটি মাধুর্য আছে বা গীতিক-কবিতার মত সুন্দর। তাই বহুবার শুনেও এগুলি কিছুতে যেন পুরোনো হ’তে চায় না—‘নব রে নব নিরুই নব, যখনই শুনি তখনই নব’। দেশী ছবিতে এই মাধুর্যের চিহ্নমাণও আমরা পেলাম না—না কাব্যায়, না অভিনয়ে। শুধু কতকগুলি ঘটনার কল্পনাকে অত্যন্ত বিপুলত্ব ভাবে একত্র করা হয়েছে। এর চেয়ে এর নিম্নশ্রেণীর গুট, বিদেশী প্রযোজকদের হাতে বহুগুণে হৃদয় হ’তে দ্রুত ওঠে। এই রস-সম্পন্ন



জ্ঞে অর্থের প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলি না। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কবি-মনের। আমাদের প্রবোধকদের অভাব ঘটেছে বোধ করি সেই কবি-মনের।

তবু যে এই সব ছবি দেখার জ্ঞে দর্শকের ভীড় হয় কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। বিদেশী ছবি বৃহৎ মাসের কষ্ট হয়, ছবি দেখতে গেলে তাদের পক্ষে বেশী ছবি দেখা ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু এইটাই শুধু একমাত্র কারণ নয়। এই সমস্ত ছবি দেখতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি মাঝে মাঝে দর্শকদের চোখ অন্ধুতে ভরাভাঙ হয়ে পড়ে। তার কারণ এই যে, ছবি দর্শকদের মনকে স্পর্শ করেছে, তার ভাবকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু সে গুণ ছবির নয়। আখ্যান-বস্তুর এমন একটি নিজস্ব রস আছে, যা বহুদিন আগে থেকেই আমাদের স্বপ্নের মধ্যে মাতুর্য্য বহুরূপে করেছিল। আমাদের চোখ যা দেখে, মন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখে। আমাদের কল্পনা ছুটে চলে স্বপ্ন-লোকে।

এতে কিছু-ব্যবসায়ীদের আপাততঃ কাজ চলে পাবে বটে, কিন্তু বৈধীন চলে না। কিছু-শিল্প গুণ্ডাই একটা বাবসা নয়, এতে জাতির রস-বোনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রস-বোনের অভাব ঘটেছে সর্বত্র—প্রবোধকদের মধ্যেও বটে, অভিনেতাদের মধ্যেও বটে। সকলের কথা বলছি না; আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিনেতাই চটান খুব, লাকান আরও বেশী, এবং অধ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কলনেও জট করেন না। সবই করেন, কেবল অভিনয় করতে পারেন না। চোখের চাওয়ায়, মূখের ভঙ্গিতে কি ক'রে বিনাবাক্য-বয়ে কথা বলা যেতে পারে, সে কৌশল এখনও তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন না। এদের দিয়ে দেশীয় শিল্পের কতখানি উন্নতি হতে পারে সে-বিষয়ে আজ অনেকের মনে সন্দেহ নেই।

দেশীয় শিল্প-শিল্পের এই হ'ল সত্যকার অবস্থা। এর চাহিদা আছে যথেষ্ট। যত ছবি বসন্তের তোলা হয়

তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ছবি তুললে তবু এই চাহিদা মেটে। ব্যবসা হিসাবে এর চেয়ে বড় আশায় কথা আর কিছুই হ'তে পারে না। বিদেশী ছবির সঙ্গেও এর কোন প্রতিযোগিতা নেই—এমন নিরুৎসাহ এর গতি। কিছু-শিল্প যদি বহু-শিল্প কিংবা অল্প কোন শিল্পের মত শুধুই একটা ব্যবসা হ'ত, যদি অজ্ঞাত ব্যবসার মত Demand and Supply এবং Competition নীতির গুণের এর ভাণ্ডা এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর কত তা হ'লে নিঃসন্দেহে বলা যে'ত, শুধু ব্যবসার মার নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এটা শুধু একটা ব্যবসা নয়। রস-ছটির দিক দিয়ে এই শিল্প আজ এতই পিছনে পড়ে রয়েছে যে, আশা কন্ডার ফুটুহুও পাওয়া কঠিন বোধ হচ্ছে।

## বেকারের বান্ধবা

বেকার-বান্ধব

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই আজকাল বেকার-সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশেও বেকার-সমস্যা বহুফল হইতেই আছে; কিন্তু, অজ্ঞাত বেকার সমস্যা ও আমাদের সমস্যার মধ্যে প্রভেদ এই যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্যা চক্ষের সমুখে দেখিয়াও আমরা তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভালরূপ চেষ্টা করি নাই। চাকুরি জটিলতার আশায় বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া সহস্র সহস্র যুবক বেকার বন্দিয়া থাকা সম্বন্ধে এতকাল আমাদের চক্ষু ফুটে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতিকে সাবধান করিয়া আগিতেছেন। বহুকাল হইতে তিনি আমাদের চাকুরির মোহ হইতে ঝটাকার জ্ঞান নানারূপ সংস্কারময় দিয়াছেন, প্রচাণ সমায় বহুতা দিয়াছেন, পত্রিকায়া লিখিয়াছেন, এবিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছেন। এতকাল আমরা সে-পরামর্শ শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ বেকার-সমস্যা যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আর স্থির থাকা চলে না। চাকুরির বাজার যতদূর ব্যাপক হইতে পারে এমন তাহাই হইয়াছে। ব্যবসায়ের অবস্থা ব্যাপক, কাজেই আকির্ষের চাকুরির অবস্থাও শোচনীয়। ব্যবসায়ের অবস্থা ব্যাপক হইলে সরকারী আয়েরও অবস্থা ব্যাপক হয়; কাজেই, সরকারী চাকুরির অবস্থাও ব্যাপক। চাকুরী-প্রিয় বাঙ্গালী যার কোথায়? উকিলের বোজগার মন্দা;—তিনি কোপানোয় প্রজেক্টারীসিগরি করিয়া, দালালী করিয়া, প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কাজেগেগে সমস্যা চালান; বি-এ, এম-এ পাশ বেকার যুবক ২৫,০০০ টাকা। মানিয়ার চাকুরির জ্ঞান আজ লালামিত;—অজ্ঞে পরে ক'থা? এই সময়ে বাহাদের চাকুরি যিয়াছে, তাহাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। যে সকল নবীন যুবক চাকুরি খুঁজিতে তাহাদের অধিকাংশের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। বাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া চাকুরির ভীষণ অবস্থার কথা ভাবিয়া ভাঙোম হইতেছে, তাহাদের ক'থাই একবার ভাবিয়া দেখুন। সকলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

কিন্তু, এই সমস্যা এখন এত গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে যে, এখন আর চাখ করিয়া কাণ্ড হইলে চলে না। বেকার যুবক কি করিতে পারে এবং কি ভাবে তাহা করিতে পারে সে-বিষয়ে এখন স্থির ভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। 'বেকার বান্ধব সমিতি', 'Unemployed Youth's Association' প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে—এরূপ আরও অনেক সমিতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল সমিতি কি ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

বেকারের টাকা কোথায়? সমিতির কাজ চালাইতে হইলে কিছু টাকার প্রয়োজন। স্বল্পর ব্যতির দ্বারা উপর নির্ভর করিয়া থাকা অত্যন্ত অনিশ্চিত ব্যাপার। উৎসাহী বেকারগণ ইচ্ছা করিলে নানারূপ আশ্রয়-প্রদানের (Charity Entertainment বা Performance) আয়োজন করিয়া সাধারণের

নিকট কিছু টাকা পাইতে পারেন। বড় বড় দু'একটা ফুটবল বা হকি মাঠের 'দর্শনী'র টাকা (Gate-money) পাইলে তেো বিস্তর টাকা সংগ্রহ হইয়া যায়। এ প্রণালীতে টাকা পাওয়াও সহজ। আরো অনেক প্রকারে—ভিক্ষার স্তুপি না ধরিয়াও—টাকা পাওয়া যায়তে পারে।

কিছু টাকা সংগ্রহ হইলে সমিতির কাজ রীতিমত চলিতে পারে। সমিতি একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া নানারূপ শিল্পদ্রব্য ও আবশ্যক জিনিস প্রস্তুতের প্রণালী যাহাতে আছে একরূপ পুস্তক বা পত্রিকাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন। যে বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাহার দ্বারা মাঝে মাঝে উপদেশ দেওয়াইতও পারেন। সমিতির একটি ঘর থাকি আবশ্যক এবং সেখানে বেকারের কাজে লাগিতে পারে একরূপ স্বল্প সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে; যেমন—

(১) গুরু জায়গায় গুরু জিনিস পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতায় বা অল্প কোন জায়গায় আনিয়া বেচিতে পারিলে যথেষ্ট লাভে বেটা যায় (যেমন ফল, তরকারি, মসলা, বেত, ডিম ইত্যাদি)।

(২) গুরু জায়গায় গুরু জিনিস পাওয়া যায়; তাহা দিয়া সহজেই গুরু জিনিস প্রস্তুত করিয়া বাজারে যথেষ্ট লাভে বিক্রয় করা যায়।

(৩) কলিকাতার বাজারে গুরু গুরু জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। তাহার সবই বিদেশ হইতে আমদানী। ইহার কোন কোন মেসারিৎ এখানে অল্প মূল্যে বানান হইতে পারে (যেমন বোর্ডের, কাঠের ও কাপড়ের খেলনা, বেতের ছোট ছোট জিনিস; মোজার Suspender, রবর-ট্যাম্পের Self-inking pad, স্কিটা ও Twine, Safety-razor blades, ইত্যাদি)।

(৪) গুরু জায়গায় গুরু ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। ভাল করিয়া পাকা করিয়া চালান দেওয়া হয় না বলিয়া অনেক ফল পাঠাইবার সময় রাস্তাতেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল ফল ভাল করিয়া



আধুনিক প্রণালী অনুযায়ী প্যাক্ করিয়া পাঠাইতে পারিলে, প্যাকিং খরচ উঠিয়াও কল বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে (বগা, কমলা লেবু, আনারস প্রভৃতি)।

(৪) গুরু জায়গায় গুরু ফলের দলল প্রতি বৎসর পোকার অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার একটা বিহিত করিতে পারিলে দলল রক্ষা পায় এবং সেই দলল বেচিয়া যথেষ্ট লাভ করা যায় (বগা, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় আম)।

(৬) দৌধ-কৃষ্ণিকেশ, হাঁস-মুগ্ধী পালনের ব্যবসায়, ডোয়ারি-দাঁধ, ফলের ও ফুলের চাষ, তরকারীর চাষ, এ সকল উন্নত প্রণালীতে ও অল্প মূলধনে করিতে হইলে কি ভাবে, কত মূলধনে, কিরূপ স্থানে আরম্ভ করা যায়, সে-বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধা কি ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করা বাইতে পারে। কো-অপারেটিভ দৌধ-কারবারার সম্বন্ধে সকল প্রকার খবরও সংগ্রহ করিয়া রাখা বাইতে পারে।

এই সকল খবর সংগ্রহ করিয়া বাহাতে কাজে লাগান বাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা সমিতি করিতে পারেন। খবর সংগ্রহের জন্ত ঘাঁহারা খাটিবেন তাঁহাদের জন্ত কিছু কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। খবরগুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে, যাতে আবশ্যক-মত বাহির করা যায়। একজন সম্পাদকের হাতে ইহার ভার দেওয়া বাইতে পারে।

কে কোন কাজটি করিতে ইচ্ছুক জানিতে পারিলে সমিতি তাহাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়া, বা বিশেষজ্ঞের মত জ্ঞানাইয়া সাহায্য করিতে পারেন। একজনে যাঁহা করা সম্ভব নয়, তাহার জন্ত ছোট কো-অপারেটিভ দৌধ কারবার স্থাপনের ব্যবস্থা সমিতি করিতে বা করাইতে পারেন। ছোট ছোট জিনিস (বেগুন) প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রথম পরীক্ষা সমিতির গৃহেই হইতে পারে এবং এই 'পরীক্ষার' খরচ সমিতি বহন করিতে পারেন। সমিতির ঢাকায় কুলাইলে একটা ছোটখাট পরীক্ষাগার (Experimental Laboratory) স্থাপন করিতেও পারেন।

সমিতির সভারা সামান্য কিছু চাঁদা দিতে পারিলে সমিতির মাসিক খরচ চালান কিছু কঠিন হয় না। মাসিক ৭০ আনা দিবেন এরূপ ৫০০ সভ্য হইলেও মাসিক ৬২১০ টাকা চাঁদা আদায় হয়। অনেকে বলিবেন, "বেকার চাঁদা দিবে কেমন করিয়া?" উহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মাসিক ৭০ আনা দিতে পারিবেন; ঘাঁহারা না পারিবেন তাঁহাদের নিকট চাঁদা লওয়া হইবে না। সমিতি এরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে, "শতকরা ১০, বা ১৫, বা ২০ জনের নিকট চাঁদা লওয়া হইবে না।" সমিতির ছাড়া অজ্ঞেও সভ্য হইতে পারেন, তাহাতে বেকারেরই উপকার।

মাসিকগুলির সভাদের জন্ত সমিতি হইতে মাসিক বা ঐমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আবশ্যক খবর সকল জানান বাইতে পারে। সম্পাদকের নিকট ঘাঁহারা অজ্ঞাত সকল খবরও জানিতে পারেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল বিষয় বিপদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেকারেরা একত্র হইলে কাজ করার সুবিধা কিরূপে হইতে পারে তাহার সামান্য আভাস মাত্র দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে নানারূপ আবশ্যক খবর প্রকাশ করা বাইতে পারিবে। বেকারের বক্তব্যও কিছু কিছু প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়। সর্বদাই বেন আমরা মনে রাখি —

"অজ্ঞানমপি বতুন্যং সংহতিঃ কাৰ্য্যাসাধিকা।

তৃণৈশ্চ গণ্যমানসৈঃ বধ্যন্তে মহদন্তিনঃ।"

## চট্টের আসন বোনা

শ্রীচুবারমালা দেবী

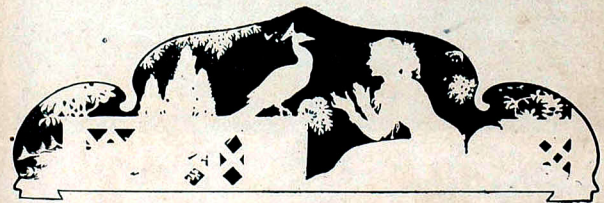
তৈয়ারী চট্টের আসন ও কার্পেটের আসন দেখিতে প্রায় একরকম। এমন ভাল ভাল চট্টের আসন দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহা কার্পেটের আসন হইতেও সুন্দর। বাজারে আসনের চট বা ভাল ক্যান্ডি কাপড় পাওয়া

যায়। এই কাপড় খুব খেঁসু খেঁসু বোনা ও পুরু অথচ মিহি হওয়া চাই। পাঠালা জালুতি চট্টের আসন ভাল হয় না। প্রথমে একখানি আসনের উপযুক্ত চরিকোণ করিয়া চট কাটিয়া লইবে। পরে বড়ি অথবা পেন্সিল দিয়া তাহার উপর স্থাপনের সোজা ও বাকা লাইন এবং ফুল অথবা গোখুপি ঘর আঁকিয়া লইবে। এ সাধাবনতা খালি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য। দুই একবার করিয়া হাত অভ্যস্ত হইলে পরে দাগ দিয়া না করিলেও চলে। কার্পেটের আসনে যেমন বঁাকা ভাবে একটার পর একটা করিয়া কোঁড় তুলিয়া ঘর ভর্তি করিয়া বাইতে হয় (যাহাকে কার্পেটিং বলাে চট্টের তেমন নহে। চট্টের আসনে প্রথমে বাঁদিকের একটা ঘরে হুঁচ ডুবাইয়া তাহার দুই ঘর দূরে (সেই লাইনেই) হুঁচ উঠাইবে। পরে এই হুঁচ বাঁদিকের লাইনের পোড়াতে ডুবাইয়া মধ্য দিয়া উঠাইবে। এইরূপে বাঁদিকে দুই ঘর ও ডানদিকে দুই ঘর তুলিতে তুলিতে বাঁদিক হইতে ডানদিকে আসিবে। ফুল বা অক্ষর, লতা-পাতা প্রভৃতি যাহাই তোলা না কেন, কোঁড় এই একরূপেই তুলিতে হইবে। তবে পূর্বে কাপড়ের উপর যে ড্রয়িং করিয়াছ, সেই অনুসারে কোঁড় তুলিতে হইবে। সূতা বা রঙের পশম যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করা বাইতে পারে, তবে চট্টের আসনের সূতা খুব মোটা অর্থাৎ তিন চার 'বি' সূতা একসঙ্গে লইবে। পশম হইলে, তাহা না

চিরিয়া পোটা লইলেই ভাল হয়। অনেকে আবার কাপড়ের লাল বা কাল পাড়ের সূতা ব্যবহার করেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে pattern দেখিয়া করাই উচিত।

আসনে বা কার্পেটে ইংরেজীতে নাম বা অক্ষর তোলাই সহজ। তবে বাংলা অক্ষর তুলিতে chain stitch বিশেষ দেখিতে সুন্দর হয়। অক্ষর-তোলা উল বা পশম দিয়া কার্পেটের হুঁচ কার্পেটের উপর করিলেই ভাল হইবে। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, বঁাকাভাবে একটার পর একটা কোঁড় দিয়া সেলাই করিতে হইবে। বড় বড় করিয়া অক্ষর তুলিতে হইলে পাট সূতা লইয়া এক একটা ঘরের মাথানান হইতে একবার লগ্না ভাবে, একবার এড়োভাবে আবার একবার ষ্টিচ দিবে; তাহা হইলেই দেখিতে সুন্দর হইবে। কাপড়ের নাম তুলিতে গেলে নামের অক্ষর খুব ছোট করিয়া লিখিবে। চট্টের আসন বুনিতে বা অক্ষর তুলিতে কার্পেটের হুঁচই ব্যবহার করা উচিত।

আসনের ভিতর অর্থাৎ জমিটা তৈয়ার হইয়া গেলে চট্টের ধারগুলি সাদা বা রঙ্গিন ফিতাযারা মুড়িয়া দিবে এবং তাহাটা একখানা সাদা কাপড়ের উপর লাগাইয়া দিবে। পূর্বে আসন সংঘর্দে একটা কবার বলিতে তুলিয়াছি; চট্টের আসনের ভিতরের ফুল, লতা, পাতা ভিন্ন স্থানটা পশম বা সূতাযারা ভরাট করিয়া দিবে, বেন কোন স্থান বাহির হইয়া না থাকে।





# অনাগতা প্রিয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কার তরে ওঠে বৃক্  
ওঠে নিখসিয়া,  
কোথা গো সে প্রিয়া মোর  
বাতায়নে বসিয়া !

কোন্ আলো-কলমল  
উজ্জল কক্ষে  
আছে প্রিয়া ঢল ঢল  
জল-ভরা চক্ষে !

রেশমের গেছে রাঙা  
আঁড়রাখা গুলিয়া—  
উদাস নরনে ব'সে  
মিতুবন ভুলিয়া !

বুটদার বেনারসী  
নানিয়াছে কোমরে,  
কোটা ফুল ব'লে ফুল  
ক'রে ফেলে ভোমরে ।

এলানো চুলের হাওয়া  
অতুলন গন্ধে,  
মধুময় গান গায়  
যাহ্নময় ছন্দে !

তারি মাঝে ফুটে আছে  
রাঙা হেঁট রসিয়া,  
হিয়া ওঠে তারি তরে  
ওঠে নিখসিয়া !

সোনার বরণ তার,  
নিটোল সে অঙ্গে  
কাকন করিছে খেলা  
কণ কণ রঙ্গে ।

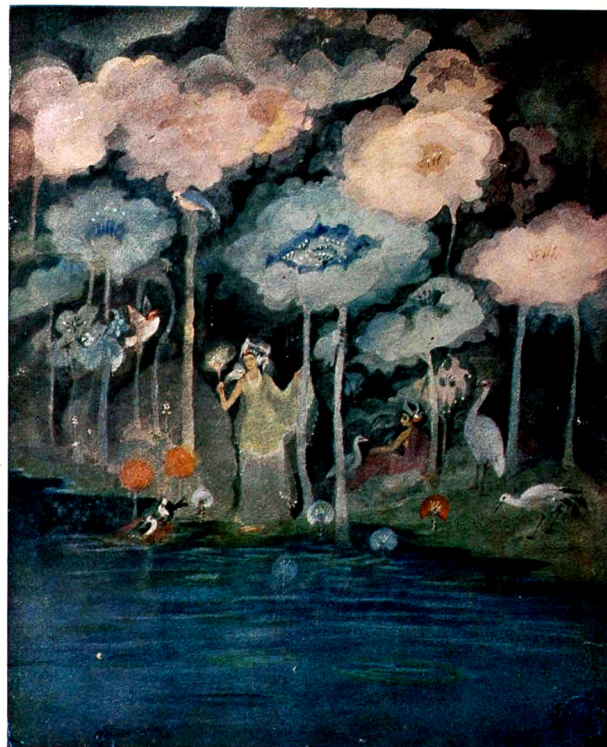
দোলে তার বৃক্ দোলে  
মেঘ দেখে গগনে,  
উদাস করিল আঁহা  
কে তারে এ লগনে !

বাতায়নে ব'সে প্রিয়া  
কার কথা ভাবে গো,  
অর্থোর ডালি নিয়া  
কা'র কাছে যাবে গো ।

এস এস এইখানে,  
এস হেথা প্রিয়া হে,  
বিরহের মসীময়  
দীপশিখা নিভায়ে !

কেন মিছা আনমনে  
বাতায়নে বসিয়া,  
আমিও যে রহি' রহি'  
উঠি নিখসিয়া !

উদয়ন, — ডিসেম্বর, ১৩৪০



মায়া কানন

[শিল্পী: শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঠাকুরের দৌলভায়ে]



## চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চণ্ডীদাস বাঙ্গালার খাটা বাঙ্গালী কবি—তিনি বাঙ্গালার দারুণতরুণের কোকিল—তাঁহার মত মধুর কণ্ঠে আর কোনও কবি বাঙ্গালীর প্রেমের গান—বাঙ্গালীর প্রাণের গান গাহিয়াছেন কিনা, জানি না। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি—প্রেমের গানে তাঁহার সমতুল জগতের আর কোনও জাতির আর কোনও কবি আছেন কিনা, জানি না। যে প্রেম পার্থিব প্রেমের বহু উর্দ্ধে—যাহা আপনাকে রিক্ত করিয়া, সর্বস্বহার্য্য করিয়া প্রেমের সিদ্ধিতে বিন্দুকে মিলাইয়া দেয়, যে প্রেমের এক বাতীত ছুই-এর সভা থাকে না,—চণ্ডীদাস সেই প্রেমের কবি।

“সা পরাম্বরজিরীখরে”—এই পরাম্বরজির স্বরূপ যদি কোনও কবির কাব্য-সাধনার মধ্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে তিনি চণ্ডীদাস। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, The Sublime and the Beautiful. গমের বা রূপকথার রাফসীর প্রাণ যেমন সম্পূর্ণের অভ্যন্তর ভ্রমরের মধ্যে নিহিত, গীতিকবিতার প্রাণ তেমনই এই Sublime and the Beautiful-এর ভিতরে গমের সংযোগে সন্নিবিষ্ট। চিত্রকলা-কৌশলী ভিতরে গমের সংযোগে সন্নিবিষ্ট। চিত্রকলা-কৌশলী চিত্রশিল্পীর ছই একটি Brushes বা আঁচড়ের মত মহাকবি ছই একটি শব্দস্বোচ্ছন্নায় বা পদসমাবেশে আপনাকে Sublime and the Beautifulকে রূপ দিয়া থাকেন। চণ্ডীদাস এবিধে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্যরচনার অপার অপরিমিত অনন্ত ভাণ্ডারে সেই অমূল্য রত্নরাজি ধরে ধরে সজ্জিত আছে। কাব্যরস-পিপাসুর অন্তরে আগ্রহ থাকিলে—সাধনা ও ভক্তি থাকিলে তাহা আদৃত হইতে পারে। কাব্যরস-রসিক ভক্ত সাধকের অন্তরের অন্তস্তলে তিনি সেই গাঢ় রস কি অদ্ভুত রচনাকৌশলে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিশ্বের পূজকে আশ্চর্য্য

হইতে হয়। সেই কৌশল অমূল্যগণের আশ্রয় হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ। যাহা স্বন্দর, যাহা মহান,—কাব্যরস-সমাবেশে তাহা একই আধারে মিশ্রিত করিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার মানস পুরস্কার অপরূপ পূর্ণরূপ, অভিনব, মান, বিরহ, মাধুর ও মিলনের গান গাহিয়া গিয়াছেন। সেই অপরূপ রসসমাবেশে পাঠকের মনে অতীতপূর্ণ, অনাবাদিতপূর্ণ, অনন্ততপূর্ণ ঘন আনন্দের স্ফার হয়, প্রগাঢ় হৃদয়বিষয়ে ও ভক্তিপ্রজ্ঞার হৃদয় ভরিয়া উঠে, রসপ্রপীড়ার সহিত মন কোন এক অজানা অচেনা উচ্চস্তরের কল্পনা-লোকে চলিয়া যায়।

চণ্ডীদাসের “তড়িতবরণী হরিগননরী” নায়িকা যখন আসিনা মাঝে দেখা দেন, তখন রসপ্রাণী ভাবুক “চাহিতে চাহিতে পশিলেক চিতে” অবস্থায় আপনাতে আর আপনি থাকেন না, সেই রূপ-সামুরে ভুবিনা তাহার সহিত এক হইয়া যান। তাঁহার নায়িকা “চাহে যাহা পানে, বধরে পরাণে, দারুণ চাহনি তার”! সে চাহনি “হিয়ার ভিতরে পাজর কাঁজা” বলে, সে চাহনি শুধু চোখের নেশা নহে! তাঁহার নায়িকা যখন “ধূম-মিনান” অস্ত্রে ঘরে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহার “চলে নীল শাড়ী, নিষাড়ি নিষাড়ি, পরাণ সহিত মোর।” সে কি যে-সে রূপ, সে কি যে-সে প্রেম? তাহার তুলনা কোথায় বুজিয়া পাওয়া যাইবে?

চণ্ডীদাসের প্রেম—সে অতি অদ্ভুত—সে যেন এ জগতের নয়—সে প্রেম,—

“কাহুর পিরিতি, চন্দনের রীতি,  
ঘষিতে সৌরভময়।  
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ার লইতে,  
দহন বিগুণ হয়।”

আচর্য্য এই প্রেম! চন্দন ঘষিতে সৌরভময়,—শীতল,



স্বদর জুড়াইয়া দেয়। কিন্তু এই প্রেম বখিরা আনিয়া  
ছদরে ধারণ করিলে দহনের জালা বিগুণ বাড়িয়া যায়।  
সে এমন প্রেম বে, নারিকা কানিয়া বলেন—

“জাতি কুল শীল, সকলি ভুবিল,  
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা।”

এ প্রেমে যেমন স্বপ্ন, তেমনই দুঃখ। এ প্রেমে,—  
“ছুত কোরে ছুত কাঁদে  
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।”

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইয়াছে, উভয়ে উভয়কে  
পাইয়াছেন, তথাপি পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ তৃপ্তি নাই, তখনও  
উভয়ে ভাবিতেছেন, বসি বিচ্ছেদ হয়!

তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

“তন বিনোদিনী, স্বপ্ন দুঃখ ছুট ভাই,  
স্বপ্নের গাশিয়া যে করে পীরিত  
দুঃখ তার তার ঠাক্রি।”

এত দুঃখ, তথাপি এই পীরিতর এমনই রীতি যে,—

“পরায় ছাড়িলে, পীরিত না ছাড়ে  
পীরিত গল্ল কে?”

এত জালা, এত দুঃখ, তবুও চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

“পীরিতর রসের রসিক নহিলে  
কি ছার পরায় তার?”

কারণ, চণ্ডীদাস জানান,—

“পীরিত নাগিয়া, পরায় ছাড়িলে,  
পীরিত মিলয়ে তথা।”

এ পীরিত এমন সর্গনাশা যে,—

“হায়ে সেই গুনি ববে বীণার নিশান  
গৃহকাঙ তুলি প্রাণ করে আনচান।  
সতী কুলে নিজ পতি, মুনি কুলে মৌন  
গুনি গুলকিত হয় তরুণতাপণ।”

এমনই সেই বীণার ডাকের আকর্ষণ। হাবর  
জগৎ বিখচরাচরের কাহারও নিস্তার নাই সেই  
আকর্ষণ হইতে! ইহাই এই পীরিতের চরম। এই  
প্রেমে সুখের মাঝেও দুঃখের আশঙ্কা, মিলনের মাঝেও  
বিরহের ভয়। অথচ এই পীরিতের রীতিও অদ্ভুত—

“নিতিই নূতন, পীরিত ছজন,  
তিলে তিলে বাড়ি যায়।”

ইহা,—

“ঠাক্রি নাহি পায়, তথাপি বাড়য়,  
পরিণামে নাহি যায়।  
সখি! অদভূত হুঁই প্রেম।”

অদ্ভুতই বটে! কেবল অদ্ভুত কেন, অতুলনীয়,  
অনির্গচনীয়। সে প্রেমের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ব  
বে ভাগ্যবান জন্মের ধারণ করিতে পারে, সে বহু হয়।  
সে ভক্তসাধক কবিকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের চরণে মাথা  
লুটাইয়া বলে,—প্রভু! তুমি যাহা দিয়া গিয়াছ, তাহা  
বাস্তবায়ী নিজস্ব প্রাণের জিনিস,—তাহার তর্জমা  
কোন ভাষায় হয় না, কোন বিদেশী তাহার বসাবাদ  
করিত পারে না, তাহা মনে অধঃভব করিতে  
পারে না।

চণ্ডীদাসের নারিকা সেই প্রেমের আবাদ কি  
ভাবে পাইয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছেন,—

“আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়  
আমার আঙ্গিনা দিয়া।  
সে বঁধু কানিয়া, না চায় কিরিয়া,  
এমত করিল কে?”

এ দুঃখ, এ জালা বুঝিবে কে? কিন্তু নারিকা  
ইহার শান্তি বিধান করিতে চাহেন, কিন্তু কি স্বন্দর, কি  
দয়স্রাবী ভাষায়,—

“আমার অন্তর যেমন করিছে,  
তেমতি হউক সে।”

কত মহান! কত গভীর! রসজ পাঠক ইহা  
হইতেই বুঝিয়া দেখুন, রাধার অন্তরে কি হইতেছে।  
ইহার অধিক দহনের শান্তি ঐরাধা দিতে  
জানেন না।

ঐশ্রীতী তাহার নামককেও এই শান্তি হইতে  
অবাহতি দেন নাই,—

“বঁধু! কি আর বলিব তোরে!

অগণ বহসে, পীরিত করিয়া  
রহিতে না দিলি ঘরে ॥  
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব  
সাধিব মনের সাধ।

মরিয়া হইব, ঐশ্রীনের নন্দন  
তোমারে করিব রাধা ॥

পীরিত করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,  
রহিব কদম্বতলে।

রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,  
যখন যাইবে জলে ॥

মুরলী তনিয়া, মোহিত হইয়া,  
সহজ কুলের বালা।

চণ্ডীদাস কয়, তখন জানিবে,  
পীরিত কেমন দাখা।”

কত বড় অভিমান, কত বড় অভিশাপ! আমি  
ঐশ্রীনের নন্দন হইয়া নন্দের বাধা বধিব, আর  
তোমারে করিব রাধা। শতর ভুলাল পোরা-কপে  
পরজন্মে তুমি রাধাভাবে আমার জন্ম ‘হা কুল!’  
‘হা কুল!’ করিয়া কাদিবে, তখন বুঝিবে পীরিত  
কেমন দাখা!

এই বে আপনার অন্তর দিয়া পরের স্বপ্নদুঃখের  
সমান অহভূতি, ইহাই মহান, ইহাই প্রেমের  
পরাকাষ্ঠা। রাধার প্রেম সেই সর্বোচ্চ স্তরের, বাহ্যে  
দুঃখ, জালা, অভিমান, অভিশাপ অন্তরে গুমরিয়া উঠে  
অথচ নারিকা বলিতে পারেন,—

“প্রাণপতি তুমি, কি বলিব আমি,  
আনের অনেক আছে।  
আমার কেবল, তুমি সে নয়ন,  
দাঁড়াই কাহার কাছে।”

যে প্রেমিক দুঃখ-জালা সহিয়াও অন্তরে তুমামান  
লাভ করেন, আর সেই পরম বসাবাদ করিয়া  
বলিতে পারেন,—

“গহ! পীরিত না জানে যারা।  
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,  
কি সুখ জানয়ে তারা।”

তাই রাধার—  
“বাইতে পীরিত, তইতে পীরিত,  
পীরিত স্বপনে দেখি।”

পীরিতর জালা কি সামান্য? রাধার মুখেই  
তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে—

“কেবা নিবমিল, প্রেম-সেরোবয়,  
নিরমল তার জল।

দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর  
প্রাণ করে টলমল ॥

গুরুজন জালা, জলের শিহালা,  
পড়শী জীল মাছে।

কুল পানিসফল, কাটা বে সকল,  
সলিল বেড়িয়া আছে ॥

কলক পানায়, সধা সাগে পায়,  
হাঁকিয়া যাইল যদি।

অন্তরে বাহিরে, কুট কুট করে,  
সুখে দুঃখ দিন বিধি।”

কিন্তু তথাপি রাধা এই দুঃখকেই ভালবাসেন।  
কেন? যদি এহি দুঃখ, এহি জালা, জব ও নাম  
ত’ মুখে না আনিগেই হয়, ওরূপ ত’ নয়নে না  
দেখিলেই হয়। রাধা কি সে চেষ্টা করেন নাই?  
বিলম্ব করিয়াছেন,—



“কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,  
বয়ানে না বলি কালা।  
তথাপি যে কালা, অন্তরে জাগরে,  
কালা হইল জপমালা ॥

বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,  
কুণ্ডল পরিব কাণে।

সবার আগে, বিদায় হইয়া  
মাইব গহন বনে ॥

গুরু পরিজন, বলে কুবচন  
না যাব লোকের পাড়া।

চণ্ডীদাস কহে, কাহুর পীরিত,  
জাতি কুল শীল ছাড়া।”

এ সবই সত্য। রাধা সবই যুগ্মেন, সবই জানেন,  
গহন বনে যাইতেও প্রস্তুত হন, লোকের পাড়ার  
বাইতেও সম্মত নহেন, তথাপি তিনি শ্রামহন্যরকে  
বলেন,—

“তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম,  
জন বিনোদ রায়।

তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥  
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।

ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি।  
গুরুজন মাঝে যদি থাকি হে বিনিয়া।

পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয় হিয়া ॥  
পুলকে পুরসে অঙ্গ কাঁপে ঝরে জল।

তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল ॥  
নিশি নিশি বঁধু! তোমায় পাসরিতে নারি।

চণ্ডীদাস কহে হিয়ার রাখ স্থির করি ॥”

রাধা নিশিনি শ্রামহন্যরকে পাসরিতে পারিতেছেন  
না। চণ্ডীদাসও উপদেশ দিতেছেন,—“মনের মন্দিরে  
তাহাকে স্থির করিয়া রাখ ॥” এ প্রেমের স্বরূপ কি,  
মস্তকের মানব আমরা, ইহার রসাস্বাদন করিবার শক্তি  
কোথায়? “স্থির করিয়া” রাখিতে পারিলে ত’ আর  
ভেদাভেদ দৈত্যদৈত্য নাই, তখন অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, পূর্ণ

আনন্দ, ভূমানন্দ! অবাধ্যনসোপচার সচ্চিদানন্দরূপ  
শিবোহংগ সোহংগ! সে পরমানন্দের অদ্বুত্বিত ময় ও  
তাহাতেই লীন ভক্ত সাধক বৈষ্ণব কবি ভির কে  
হইতে পারে?—

সেই সাধনার পথ বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য।  
সেই সাধনায় বসিয়া রাধার,—

“হাসিতে হাসিতে পীরিত করিয়া  
কাদিতে জনম গেল।”

তথাপি রাধা বলেন,—

“পীরিত নগরে বসতি করিব,  
পীরিতে বাধিব ঘর।

পীরিত দেবিয়া পড়শী করিব,  
তা বিহু সকলি পর ॥

পীরিত ঝারের কবাট করিব,  
পীরিতে বাধিব ঢাল।

পীরিত আসকে সদাই থাকিব,  
পীরিতে গোভাব কাল ॥

পীরিত পাগকে শয়ন করিব,  
পীরিত শিখান মাখে।

পীরিত বাসিনে আলিস তাকিব,  
থাকিব পীরিত মাখে ॥

পীরিত সরসে সিনান করিব,  
পীরিত অখন লব।

পীরিত ধরম, পীরিত করম,  
পীরিতে পরাণ দিব ॥”

পীরিত ধর্ম কথ্য সবই,—পীরিতের মধ্যেই  
ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভূত্বিয়া যাইবে, পীরিত অস্তরে,  
পীরিত মধ্যে, সকল অবস্থাতেই যান ধারণা জপমালা  
হইবে,—এমন পীরিতের যে কি রীতি, তাহা  
চণ্ডীদাসও ধারণা করিতে সাহস করিতেছেন না।  
কি মহান, কি হৃদয়, কি গভীর সেই প্রেম!  
সে প্রেমসরসে রসিকই বলিতে পারেন,—

“সাগরে পশিব, নীরে না তিতিব,  
নাহি স্থখ দুখ কেশ।”  
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,  
কত না পাসরি তোমা।

সেই প্রেম-সমাদির অবস্থায় সাধক স্থখ দুখ  
কেশ, শকলের অতীত,—তিনি তখন বলিবার  
অধিকারী,—  
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,  
সকলি করিবে ক্ষমা ॥”

বিন্দু সিজতে, জীবাশ্ম পরমাশ্মাতে এমনই  
মিশামিশি বটে! ইহার রসাস্বাদন করিয়া মহাকবি  
চণ্ডীদাস ঈশ্বরধাকে বলিতেছেন,—

“একজ থাকিব, নাহি পরশিব  
ভাবিনী ভাবের দেখা।”

বজ্র স্মারার, বজ্র বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী জাতি  
যে, আমাদেরই বাঙ্গালী সাধক কবির অমর লেখনী  
হইতে এই চরম আদর্শ প্রেমের অভিব্যক্তি  
হইয়াছে। এই প্রেমসাধনার বলেই চণ্ডীদাস বলিতে  
পারিয়াছেন,—

“শুন রজনিকী রামি!  
ও ছুটি চরণ, শীতল জানিয়া  
শরণ লইহু আমি।

তুমি বেদবাগিনী, হরের ঘরগী  
তুমি সে নয়নের তার।  
তোমার ভক্তনে, মিসকায় যাজনে,  
তুমি সে গলার হারা ॥

রজকিনী রূপ, কিশোরী বরূপ  
কাম-গন্ধ নাহি তার।  
রজকিনী প্রেম, নিকবিত হেম  
বজ্র চণ্ডীদাস গায় ॥”

এ প্রেম কোথায় গিয়া কাহার চরণে পৌছিতেছে?  
প্রেমিকার এই সর্ব্বথ বিবাহিয়া দেওয়া চরম প্রেমের  
প্রতিদানে প্রেমিক জগৎস্বামী বলিতেছেন,—

“উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,  
কিশোরী নয়ন তারা।

কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,  
কিশোরী গলার হারা ॥

রাধে! ভিন না ভাবি তুমি।  
সব ভোগ্যগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে  
শরণ লইহু আমি ॥

চণ্ডীদাস এই মহাপ্রেমের কবি, তাহার সাধনা  
সার্বক। এমন প্রেম-পাগল কবি আর কোন দেশে  
আছে? তাহার প্রেম কি যে-কো প্রেম? সে প্রেম  
কিরূপ?—

“পীরিত পীরিত, সব জন কহে,  
পীরিত সহজ কথা?  
বিরিখের ফল, নহে ত পীরিত,  
নাহি মিলে যথা তথা ॥

পীরিত অস্তরে, পীরিত মস্তরে,  
পীরিত সাধিল যে।  
পীরিত রতন, লভিল যে জন,  
বড় ভাগ্যবান সে ॥”

বাঙ্গালীর কত বড় সৌভাগ্যে, কত মহাপুণ্যে  
এই পীরিত-পাগল মহাকবিকে সে বক্ষে ধারণ  
করিতে পারিয়াছে? সেই কবির চরণে-থুপ্পদে  
কি আর একবার বাঙ্গালার মাটা, বাঙ্গালার জল  
পবিত্র হইবে না?

কত বড় আনন্দের ও গর্ব্বের কথা যে,  
বাঙ্গালীর প্রাণের এই প্রেম-পাগল সাধক কবির  
মুখেই বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইয়াছিল,—



“পীরিতি নাগিয়া,  
পরেতে মিশিতে পারে।  
পরকে আপন,

আপনা কুলিয়া  
করিতে পারিলে  
পীরিতি মিশরে তারে।”

কে বলে, বাঙ্গালী কুলল অথম জাতি? বাঙ্গালীর আর কিছুও যদি না থাকে, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর চণ্ডীদাস আছে। সে চণ্ডীদাসের কুলনা চণ্ডীদাস, তাহার কুলনা জগতে নাই। গভীর অস্তবৃষ্টি, উদার বিজ্ঞানোন্মুখতা, মহান আদর্শ—এসকল ত’ চণ্ডীদাসের রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ, কিন্তু তাহারও উপরে তাহার বহু পদাবলীর অন্তর্নিহিত গভীর আধ্যাত্মিক স্বর্ণ আমাদের মত সাধারণ মানুষের বৃষ্টিবার দাখ্য নাই, নকি নাই, অধিকারও বৃষ্টি নাই। যে কয়জন ভাষাবান

বাঙ্গালী সাধনা করিয়া সাধনামার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, জনিয়াছি, তাহারাই সে রসাত্মক করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মাত্রের মাঝে চণ্ডীদাস-ভক্ত বাঙ্গালী আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন বাঙ্গালী তাহার জাতীয় মহাকবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে পারে,—

“ঐছন পীরিতি জগতে আর কি হয়?  
এমত পীরিতি না দেখি কখন, কখন হবার নয়।”

আর সেই গান তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, যেন সেই অমর সঙ্গীত জনিয়া যুগে যুগ তাহার নয়নে ধারা নামিয়া আসে!

“যিনি (বহির্মুখ) আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাষা দরিদ্র দেশকে একটা অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি হারী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট বর্ষাধ শোকের মধ্যে সাহস, অবনতির মধ্যে আশা, শাস্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের খুজতার মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষর আকার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে বাহা কিছু অমর এবং আমাদের মধ্যে বাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।”

—রবীন্দ্রনাথ

## বাংলা ও বাংলালী শক্তির অভিব্যক্তি

শ্রীহরদাস পালিত

উপক্রম

বৈদিক-সাহিত্য পাঠে ‘অবগত হওয়া যায়, ভারতবর্ষে কেবলমাত্র দুইপ্রকার জাতি বিজ্ঞান ছিল বা আছে। তথাকথিত জাতির মধ্যে,—একটি অ-আর্য (অন্যভাবে) এবং অজট আর্থা-জাতি। আর্থাগণ, অ-আর্থা-দিগকে—নিদা এবং তথা করিতেন এবং বর্তমানেও সভা জাতির, অসভা, বর্গের বলেন যে গণ-জাতিকে, তাহারাই নীচজাতি—ছোটগোত্র।

বৈদিক-সাহিত্যে, জাতিগত বিভেদ ধরা যায় না। কেননা উপনিষদের মূল একই। এক আদি পিতামাতা হইতে,—জন্মজাতীয় মানব-বংশের বিকাশ হইয়াছে। একই বংশ,—একই পিতামাতার সন্তান। একই বংশের বিস্তার বা প্রবাহ। আর্থা-অন্যভাবে জাতির হিসাবে—মাতা-ভগিনী সম্বন্ধ বিজ্ঞান।

সম্বন্ধ পিতা-মাতা

সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্যে যে উপাখ্যান রহিয়াছে, ইহাতে চূড় হয় যে,—আদিপুরুষ-দেহে প্রকৃতি লীন ছিলেন। একই—বিধা বিভক্ত হইয়া, দুটি পৃথক হইলেন। বিধা বিভক্তের পুংস, তথাকথিত পুরুষটি, ঐক্য এক আদিপুরুষ হইতে,—অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন,—আত্মজ, অসোনিজ রূপে,—তাঁহার মাতা ছিলেন না। ভারতের ভগবান একা—তথাকথিত পুরুষ। সেই পুরুষের শরীর হইতে,—এক নারীমূর্তির বিকাশ হইল, তিনি—মততপা, তাহাকেই বাণী, সরস্বতী, গায়ত্রী, গুণ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে; ইহার দেবতা বলিয়া যায়। একা দেবতা কিন্তু রক্ত নহেন।

বেদান্তমতে

এম তিনিই,—বাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, হিতি এবং ভস হয়। “জগদন্তঃ ভসঃ” হ্রস্ব (১।১।১২) হইতে

ইহাই বাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই রক্তের ‘তত্ব-লক্ষণ। পণ্ডিতেরা বলেন—বেদান্তের কোন কোন হ্রস্বে, বৌদ্ধধর্মের প্রথম পরিচালিত হয় (২ম। ২এর ২৮, ২৯, ৩০ ব্রহ্মাদি)। ইহা যদি সভা হয়, তাহা হইলে, বেদান্তের দ্বয় বিশেষ,—ঐক্যপূর্ণ মত শব্দের মধ্যভাগের পরবর্তী কালের রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

সাংখ্য—অবগত হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না ৫৭।

বিধ-মানবের আদি পিতা-মাতা

সম্পর্কে, পরবর্তীকালে অহুসন্ধান যখন আরম্ভ হয়, তখন দর্শনচর্চা সবেমাত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। নৈতিক বাস্তব বিষয় চর্চা হইতে, ক্রমশঃ কল্পনাবলে, অবাস্তব জগতের দ্বার উল্কাটিত হইয়া, একা-দ্বাবিকীর উপাখ্যান স্রজিত হয়। ইহা ইতিহাসের হিসাবে বলা চলে। এই প্রকার বৈদিক-সাহিত্যের দেব-তত্ত্ববাদ—বাস্তব, প্রকৃত শরীরবিশিষ্ট কিছুই কল্পনা নয়। মীমাংসা দর্শনে—এই মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

শরীর স্বামীর ভায়ে, কুমারিসের বাঁকিকে, এবং অজাত দার্শনিকগণের মতে,—যাবতীয় দেবতা, ময়ূরপী, —শরীরী নহেন। দার্শনিক ব্যাপার,—এই প্রকারে অদৃশ্য শক্তি বা শক্তিমান কিছু হইতে—মরজাতির অভ্যাস কল্পনা ব্যতীত, অজ উপায় নাই। অনির্দিষ্ট বিষয়ের, একটা কুল-কিনারা করাকেই—সিদ্ধান্ত বলা হয়। মানবের আদি পিতা-মাতা ছিলেনই, কিন্তু অজাত বিষয়ের ‘মীমাংসা’, তথাকথিত উপায়ে করা হইয়া থাকিবে। ইহাকে ‘সাহিত্যিক-মতত্ব’ বলা হইতে পারে।

মতসামা—

পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-শাস্ত্রে, মত-ত



মুখ্য আলোচনা আছে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে—  
আদি নরমিশ্বনে প্রকটের বিবরণ বা উপাখ্যান মধ্যে,  
নরদের ইহুতই নারীর আবির্ভাব বর্ণিত হয়।  
ভারতীয় 'ভাব-সামান্য' বিশ্বদান আছে। গ্রীক-পৌরাণিক  
ব্যাপারগত—দি হিম্ফটরি অব্ এমারী— নামক  
গ্রন্থের ইতিহাসে দেখা যায়—পূর্বকালে নর-নারী  
এক-দেহী ছিল, তখন অসীম-শক্তি সেই দেহে বিভ্রম  
ছিল। যথাকালে—ইহুট—পৃথক হয়। পড়ে এবং  
শক্তিও কমিয়া যায়। নারী—নু-প্রেমের মূর্ত রূপায়ন।  
প্রেম—মূর্ত রূপায়ন লাভ করিয়া, প্রেমময়ী-নারী  
হইয়াছেন।

#### ময়-রূপী দেবতার রূপলাভ

মায়েরই কল্পনা; অল্পকৈ রূপায়িত করিয়াছে  
মায়ের। 'অভিমাত্রী-দেবতা' ইহুতছেন, ব্রহ্মাদি  
সাধারণ দেবতাগণ। 'অভিমাত্রী-দেবতা' বলিতে ইয়া,  
—ময়রূপী মায়ের দেবতার বাস্তব রূপে অর্থাৎ ব্যক্তির  
রূপের আবেগ মাত্র। কল্পনা করা হইল, নিরাশার  
দেবতার সাকার রূপ। এই সাকার রূপের 'অভিমাত্রী'  
দেবতার ক্ষরয় প্রেম—মূর্তরূপে প্রকট লাভ করিয়া,  
ব্যক্তির আবেগিত হইয়া, হইলেন—সাকার। শতরূপা  
দেবী সার্বিকী।

অবশ্য ইহুত বস্তুর উৎপত্তি হয় না।

এই দার্শনিক মতটি,—সাংখ্যদর্শনের। নর-নারী  
বাস্তব রূপায়ন। সম্ভবতঃ সাংখ্যমতাবলম্বী সম্প্রদায়গণের  
মতবাদ যখন আনুত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তখন  
অবাস্তব কিছু ইহুত পদার্থ বিয়ক প্রকটন করার  
কথা, উত্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। তথাকথিত  
আন্তঃদার্শনিক কালে ময়রূপী দেবতাদিগকে, 'অভিমাত্রী-  
দেবতা'রূপে কল্পনা করিয়া, সাকার রূপে প্রবর্তিত করা  
হইয়া থাকিবে। এইরূপ যদি বাস্তবতার দেবতাবর্ণকে  
অনয়ন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, শ্রীবিদ্যাবিশিষ্ট  
ব্রহ্ম-সার্বিকী ইহুত—বাস্তব নর-নারীর অব্যাক্তিতে  
কোনই বাধা হয় না। মানবীয় চিন্তা-প্রবাহ, এই

পৃথক অগ্রসর হইয়া, দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্ব-মানবের  
আদি নর-মিশ্বনের প্রকট বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাও  
অসম্ভব বাস্তব অজ্ঞ কিছু নয়। গ্রীক দার্শনিক  
পিথাগোরাস, এরিস্টটল প্রভৃতির মতও প্রায় সাংখ্যের  
অনুরূপ।

#### আরম্ভ—

যে প্রকারেই হউক, আদি নর-মিশ্বনের উদয়  
পৃথিবীতে হইয়াছিল,—এসকল দার্শনিক মতাবলম্ব  
কাল গত হইলে, প্রত্যক্ষগোচর মানবের অভিব্যক্তি  
বিয়ক বর্ণনার আরম্ভ হয়। বৈদিক-সাহিত্য বলেন,  
ভারতে আদি নর-মিশ্বনের স্বপ্রকট হইয়া—এই বিশ্ব-  
মানবের প্রকট হইয়াছে। বিশ্ব-মানব মূলে একই  
বংশধারারূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এ মতবাদটি  
'একজানি' (মনোজেনেটিক) মতবাদ। সাম্প্রদায়িক  
ধর্ম-শাস্ত্র মতে,—ইহাই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।  
নৃত্য বিজ্ঞাবিদ পণ্ডিতগণের ধারণা—'বহুজানি' (পলি-  
জেনেটিক) মতবাদের অভিমুখে। এই হেতু—সাম্প্রদায়িক  
ধর্ম-মতবাদের সহিত এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের  
মত বিতর্ক চলিতেছে। বহুজানি মতবাদটি—  
সাম্প্রদায়িক ধর্মীরা স্বীকার করিতে পারেন না, কেননা  
তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রীয় মতের অসম্মত হইয়া যায়।  
নৃত্যবিদদের, প্রমাণ-গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বনে, যমত ব্যক্ত  
করেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় মতবাদ গ্রাহ্য করেন না।

#### সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক মতবাদ

অবলম্বনে, বৈদিক-সাহিত্য-পুণ্য অবলম্বনে, একজানি  
মতেই, আদি নর-নারী অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইয়া  
থাকে। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের মত, ভারতীয়  
পৌরাণিক মত ইহুত বিভ্রিত নহে। তজ্জাত পৌরাণিক  
মত, বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতেছেন না।  
বাইবেল মতে গড়—বিশ্বশক্তি করিয়াছিলেন, জীতপূর্ণ  
চারি হাজার (১) বংশধরের কিছু পূর্ণ, ঐতিহাসিকগণ

১। আমেরিকান বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত পবিত্র  
বাইবেল ভ্রমণ।

দেখিতেছেন, জীতপূর্ণ, (বিশ্বশক্তির পূর্ণ) ইষ্টিক দেশে,  
মীশে নামক জৈনক রাজা প্রজাবর্গসহ রাজত্ব করিতেন।  
ভারতে সম্ভ্রুতি মহেন্দ্রজাদাও, হরপ্রসাদ দ্বিজদাস  
উপকান্ত দেশে যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইয়াছে,  
উহার আদি বিকাশ-কাল, বিশেষজ্ঞগণের মতে জীতপূর্ণ  
পাঁচ হাজার বর্ষের কম নহে। সূত্রগা বাইবেলের বিশ্ব-  
শক্তিকালের সত্যতার সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছে।

#### সেমিটিক জাতির মতবাদ

প্রাচীন জীতপূর্ণ ঐতিহাসিকগণ, তাঁহাদের  
ইতিহাসে,—'সেমিটিক জাতি' বলিয়া কল্পনাবৎ বহু জাতির  
উল্লেখ করিয়া থাকেন। তথাকথিত 'সেমিটিক জাতি-  
গণের উৎপত্তির বিবরণ তাঁহাদের বাইবেলে আছে।  
নোয়া (নূহ) জন্মের সময়ে, মহাজলপ্লাবন হইয়া,  
পৃথিবীর সমস্ত স্থলচর জীব ধ্বংস হইয়া যায়।  
কেবল জন্ম নোয়ার পরিবারবর্গ রক্ষা পাইয়াছিলেন।  
জলপ্লাবনের কিছুকাল পরে, তাঁহার সৈম, হোমাম  
নামে পুত্র জন্মলাভ করেন। সেই সৈমবংশই—  
'সেমিটিক জাতি' বলিয়া খ্যাত হয়। তথাকথিত  
বাইবেল মতে,—মহাজলপ্লাবন সম্ভূত হইয়াছিল,  
জীতপূর্ণ ২৩৪৫ অব্দে, সূত্রগা তথাকথিত কালের পরে,  
সেমিটিক জাতির প্রকাশ-সাম্রাজ্যকাল। সূত্রগা ভারত,  
ইষ্টিক, চালদীয়া, বাবিলনাদি দেশে—তৎপূর্ণবর্তী  
যে সকল জাতি বিজ্ঞমান ছিল, তাহার সেমিটিক  
জাতি কখনই নয়। তত্বেপরি জীতপূর্ণ চারি হাজার  
বৎসর পূর্ণ হইতে, জলপ্লাবনের সময় ও পরবর্তী  
কালেও, তথাকথিত জনপদে,—প্রজা এবং রাজার  
অভাব পাঠো হয় নাই। সূত্রগা তথাকথিত দেশে,  
যথাক্রমে কাল জলপ্লাবন হয় নাই—প্রমাণিত হইতেছে।

#### বাইবেলের জেনিসিস-নাম পৌরাণিক

বিবরণ,—সত্য কিনা, সম্বন্ধেই কারণ উপস্থিত  
হইয়াছে। প্রকৃতবিশ্বপুণ্যের যখন ব্যাপারে, প্রাচীন  
চালদীয়া নগরের ভূমধ্য হইতে, যে সকল লিপিবদ্ধ  
আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে একখণ্ড লিপি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানিতে জলপ্লাবনের বিবরণ  
অক্ষর-মালায় খোদিত আছে; পণ্ডিতেরা সেই  
লিপিবদ্ধকালের নাম রাখিয়াছেন—'জেনিসিস-ট্যাবলেট'।  
উহাতে উৎকর্ণ আছে, চালদীয়ার রাজা উবরুলু  
ও তাঁহার পুত্র গুস্তাশুর সময় জলপ্লাবন হইয়াছিল।  
তাহাদের প্রধান দেবতার ক্রোধে,—মানবের অব্যাহতা  
হেতু, জলপ্লাবন ঘটাইয়াছিল। এবং সেই প্লাবনে—  
রাজপরিবারবর্গ এবং বহু-বাকবেরা, নৌকার  
সাহায্যে, দেবতার রূপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই  
খটনা জীতপূর্ণ পাঁচ হাজার বৎসরের বহুপূর্ণে সম্ভূত  
হইয়াছিল। এই 'জেনিসিস-ট্যাবলেট'ের আক্ষরিক  
অনুবাদ, বাইবেলের জেনিসিস অধ্যায়ে হিব্রু-ভাষায়  
অনূদিত হইয়াছিল। কেবল রাজার নাম এবং  
দেবতার নামের পরিবর্তন করা হইয়াছে। দেবতার  
স্থলে—দেবত্ব (এঞ্জেল) লিখিত হইয়াছে। রপোয়া  
চালদীয়া পাঠে একথা অবগত হওয়া যায়,  
'জেনিসিস-ট্যাবলেট'ের চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।  
কোনটি আসল এবং কোনটি নকল, এ রিচারের  
প্রয়োজন লেখক করিতে ইচ্ছুক নহেন।

#### বৈদিক জীতপূর্ণ-মতবাদ ভারতের ইতিহাস

লিখিয়াছেন, সেই ইতিহাস পঠন-পাঠন দ্বারা  
শিখিয়াছি; সন্দর্ভ প্রাচীন ভারতবর্ষে, মানব বলিয়া  
কোন জীব বিজ্ঞমান ছিল না। তাহার কল্পনাযুক্ত  
স্বপ্ন-ভাবে ভাবিত হইয়া, ইতিহাসে লিখিয়াছেন  
যে, 'কোলায়ান' নামে এক গণ-জাতি, ভারতের  
বহির্ভাগ হইতে, সর্বপ্রথমে ভারত প্রবেশ করে, এবং  
বিস্তারিত হয়, ইহার অবশ্য সেমিটিক জাতি। এই  
কল্পনাক্রমে সেমিটিক কোলায়ানদের ভারত-প্রবেশের  
পূর্বে, ভারত মানব-শূন্য অরণ্য-জীবে পরিব্যাপ্ত  
ছিল। এই ঐতিহাসিক উক্তি কোন প্রমাণ  
তাহারা কোথাও দেন নাই। কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক  
কল্পনা (বিগরি)-বলেই, ভারতকে অস্ট্রালোন প্রত্নতত্ত্ব  
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। তাহার বাইবেলের  
'একজানি' মতবাদ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।



বাইবেল ধর্ম গ্রন্থ বলিয়া মাত্র হইতে পারে, প্রকৃত ইতিহাসরূপ নয়।

তার বহুকাল পরে, তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা, কল্পনাবলে বলিয়াছেন, ভারতের বহির্ভাগ হইতে, অল্প এক উন্নত ধরনের জাতি, ভারতে প্রবেশ করে— তাহারা 'ড্রাকিডিয়ান' গণ-জাতি। কিন্তু—এই ব্যাপারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদান করেন নাই। ইহারা ভারতে বিস্তারিত হয়।

তারপরে, তাহারা লিখিলেন, এক খেতকার অশ্বসভা বা অসভা বর্করপ্রায় জাতি, ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা—'এরিয়ান' জাতি নামে খ্যাত। এ সম্বন্ধে খেতকার বৈদেশিক জাতির ভারত-প্রবেশ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তবাদের উল্লেখ তাহারা করেন নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতকে অবনত মণ্ডকে, তথাকথিত উপাখ্যান স্বীকার করিয়া লইতে ইহারাছে। শিক্ষাধীনগণকে প্রচুর উত্তর, তথাকথিত ঐতিহাসিক উপাখ্যানই—উত্তর স্বরূপ দিতেই হইবে! সুতরাং শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই, তথাকথিত 'এরিয়ান উপাখ্যান'—পড়াইতে ও পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। ভারতকে হীন প্রতিদ্বন্দ্ব করা, এবং এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া ভারতীয় জাতিত্বের বিকৃতি সাধন করা, সম্ভবতঃ মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ এদর্শিত হইল।—শ্রীযুক্ত নমিনিমোহন সান্যাল ভাষ্যতত্ত্বর, এম-এ, মহাশয় তাহার 'বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচন' নামক পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এখন তাহাদের কেবল এই চেষ্টা— ভারতীয় প্রাচীন ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব আধুনিক বলিয়া প্রতাপন করা, এবং সাহিত্যে যে সকল উক্তি পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি অবিধাস জ্ঞাপন করা। এ কথা উইটটর্গিভ হায়েব ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লেক্চার করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন (ক্যালকুট্য রিভিউ, নভেম্বর ১৯২৩—এজ্ অব দি বেদ বাই

ডাঃ এম, উইটটর্গিভ), প্রতীচ্যেরা বলেন যে, ভারতবাসী কেহই ভারতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থের আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যদি একাধিক কাহারও দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ভারতের দেশবাসী। তাহারা চাহেন যে, বিদেশীয়েরা ভারতীয় সাহিত্য কেবল ভাবে গঠিত করিয়া দিবেন, আদর্শগত তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।" ইহার উপর আর কথা নাই। আমাদের শক্তিক যুবকগণকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। বৈদেশিক 'এরিয়ান'-আগমন উপাখ্যানটি, তাহারা ভারতে প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া বইয়াছি। ইহা যে একটা দ্ব্যস্ত কল্পনা, তাহা ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্যেই অবগত হই। ভারতীয় সাহিত্য এ কথা স্বীকার করে নাই। অথচ আমরা মোহনসে, ভারতীয় সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, দ্ব্যস্ত প্রতীচ্য মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকি।

ভারত সন্দর্ভি সভা-জনপদ, এই ভারতবাসী অজীত কালে—মুরোপাদি জনপদে বিজয়-যাত্রা করিয়া, তথাকথিত দেশকে সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছিল, একথা এখন আর ঈর্ষান শ্বেতকার পণ্ডিতগণের অবদিত নাই। ঐতিহাসিক এইচ, আর, হল তাহার 'এনসাইক্লপেডিয়া হিন্দু'র পৃষ্ঠা ১১২—১১৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন সেই অংশ পাঠ করা আবশ্যক। তিনিও খেতকার পণ্ডিত। তিনি লিখিয়াছেন—"ভারত আদ্যমিত মানব-সভ্যতার কেন্দ্র মধ্যে অজন্তম, এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচিত হয়—আশ্চর্য্য এই যে,— অ-সেমিটিক, অ-আর্য্য লোকগণ, যাহারা পূর্বদেশ হইতে পশ্চিম জনপদকে সভ্যতা দান করিয়াছিল— তাহারা মূলতঃ ভারতীয়। হুমারীয় জাতি ভারতের।"

সাহিত্য বিজ্ঞান বলিয়াছে। ভারতের এই জাতিও হুমার (সম্ভবতঃ—সোমার), রামায়ণাদি পৌরাণিক কাব্যাদি সাহিত্যে, এই জাতির বিবরণ আছে, পূর্ণ

বিবরণ—যোদিনী-স্তরে উজ্জলরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। "দেশের যোগ্য ভিক্টি পায় না।" বর্তমানে (যোদিনী-স্তর ২৪৪ পাঠ করুন) দেখিতে পাই—আসাম অঞ্চলে এখন—হুমার ও আকা (আকাদ্) নামে দুইটি প্রাচীন জনপদ বিদ্যমান রহিয়াছে,—এই দেশের সম্বন্ধে, 'গেইটস-আসাম'—নামক ইতিহাসে কিছু আছে (ই, এই, গেইটস হিষ্টরি অব আসাম, ১৯০৩) এবং কিছু তথ্য আছে—'ডল্টনস্ অব এনালজি অব বেংগল্' নামক পুস্তকে, এবং জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল, সংখ্যা ১, ১৮৫৫ খ্রি। হল সাহেবের মতে, হুমার-আকাদীয়গণ অবশ্য ভারত হইতে গিয়া,— মেসোপটেমিয়ার উত্তর ও দক্ষিণে, মাতৃভূমির ন্যায়, হুমার ও আকাড্ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। চালদীয়গণের প্রাচীন ইতিহাস-লেখক—রোশোনি, তাহার ইতিহাসে,—ভারতীয় সিদ্ধতীরবাসী রুকমার গণ-জাতিবিধকে—হিন্দু-ধর্মের উপর দিয়া লইয়া গিয়া—চালদিয়ার গোড়া পত্তন করিয়াছেন। ব্যাবিলনের, ইজিপ্টের ইতিহাসে—ভারতীয় কালা জাতিদের সম্বন্ধে কিছু আছে। এসকল নব-আবিষ্কৃত মতবাদ, এখনও খেতকার ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক হল, স্বীকার করিয়াছেন, হুমার-আকারীরা, 'অ-সেমিটিক' সুতরাং বাইবেল-উক্ত সেমিটিক জাতি নয়। বর্তমান কালের নৃত-তত্ত্ববিচার বিশেষ আলোচনা এবং আবিষ্কার হেতু বলা হইতে পারে যে, হিমালয়ের দক্ষিণ—বর্তমান ভারত-সীমার আদি নর-মিথুনেরও অভ্যুদয় হইয়াছে।

কোল-জাতি সম্বন্ধে প্রাথমিক অহুসন্ধান

কার্য্যে ব্রতী হইবার কারণ এখানে কিছু বলা আবশ্যক,—ইতিহাস (প্রাচীণতর) এবং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যেন একটি তথ্য লুক্কায়িত

রহিয়াছে দেখা যায়। বর্তমান যুগেদী-বিশেষী ঐতিহাসিকগণ, যখন 'কোলারিয়ান' নামক গণ-জাতিকে ভারতে আনয়ন করিয়া, অন্তরিত আরম্ভ করিয়াছেন, তখন বৃষ্টিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতীয় গণ-জাতি 'কোল'দিগের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহারা ইহাদিগকে, আত্ম-জাতি বলিয়া অহুমান করিয়াছেন, এবং বাইবেলের মত সমর্থন করিয়া ভারতের বহির্ভাগ (পশ্চিম) হইতে ভারত-প্রবেশের গর আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোল-জাতি সম্বন্ধে অহুসন্ধান প্রথমেই আরম্ভ করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ, ইহাদের বংশ-পরম্পরাগত ক্রটিমধ্যে ইহাদের প্রাথমিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে—এই আশা করিয়া অহুসন্ধান আরম্ভ করি। প্রথম বাধা ইহাদের কথিত-ভাষা, বর্তমান-প্রচলিত কোন প্রকারের ভাষা ভাষা নহে। এই বাধা দূর করিতে প্রথম অশ্বলপন হইল—গ্রাম্যর অব্ দি কোল ল্যাংগুয়েজ,' কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল কলিল না। দুই এক বংশের মধ্যে এ বাধা অতিক্রম করিয়া, ছোটনাগপুরের কোল-জাতির তথ্য সংগ্রহ কালে, আসানসোল অঞ্চলে করণা বাসের মহিমায় কোলগণের পরিচয়-প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহারা নিম্নলিখিত জাতি (বৃন্দী কোল বাদে), তরাই ইহাদের মধ্যে যোয়রুগুগণের জাতীয়-জাতিজ্ঞান বিলম্বন রহিয়াছে। বৃষ্টিয়াস, কোলজাতি গাঁওতাল জাতির অজন্তম শাখা-বিশেষ। সুতরাং কোল সম্বন্ধে অহুসন্ধান স্থগিত রাখিয়া, গাঁওতাল (সমেতাল বা হড় জাতি) জাতির তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলাম। প্রথম বাধা—হড় ভাষার অনভিজ্ঞতা। এক বংশের এ বাধা দূর হইল। সুযোগ-ক্রমে বুদ্ধিমান জৈনক সমেতাল মাষ্টির (মণ্ডলবদ) সহিত বন্ধু হইল। সেই ব্যক্তির নাম 'মাতাল-মাষ্টি', দেখিতে ভীমারূপিত। তিনিই হইলেন আমার সখা—গুরু। তাহার অন্তরগহে, গাঁওতাল (হড়) জাতির ঐতি সম্বন্ধে পরিচয়-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তরাই এক ব্যক্তির কথিত ক্রতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া জাতীয়-স্তর সংগ্রহ করা উচিত



নহে বিবেচনায়, তাঁহারই সাহায্যে, বিভিন্ন পল্লীবাসী কয়েকজন হুড়-জাতীয় মণ্ডলের (মাথির) সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম। আমার বন্ধ যে সকল শ্রুতি বলিয়াছেন, সেগুলির সত্যতার পরিচয় বিভিন্ন ব্যক্তির কথিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখি, সকল শ্রুতিই এক।

#### সাঁওতাল বা সাত্তাল—

এ জাতির প্রকৃত নাম নয়, ইহাদের জাতীয় উপাধি 'হুড়'। হুড় অর্থে দেহী-মানব—অর্থাৎ 'আদি-মানব'। ইহারা সমস্ত-শেখরবাসী আদি-জাতি। সমস্ত ক্ষেত্রের বর্তমান নাম,—পরেসনাথ পাহাড় শ্রেণী। হুড় অর্থে মাহুয়। মাহুয় জাতিকে ইহারা বলে—মাহুয়ী। হুড় জাতিয়, হিন্দুগণকে বলে—কেকো। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু দিগকে বলে—ডেংকে। মুসলমানকে বলে—তুতুহু। ইহাজকে বলে—জেটে। গ্রাম্যগণকে বলে—বাংড়ে।

#### হুড়-ছাহুতোর

বলিয়া ইহাদের শ্রুতি-শাস্ত্র আছে, শ্রুতির ভাষাকে ইহারা বলে,—'পারসী' (হুড়-পারসী); যে-ভাষায় ইহারা পরস্পর কথা-বার্তা চালায়, ইহার নাম—হুড়-রড়্ (রড়্-ভাষা)। যে-উপের সাঁওতালী ভাষার নাম—'হুড়-রড়্-ভাক'।

#### প্রথম-শ্রুতি

উক্ত ইহারা, কি প্রকারে ভূমি (ধারতী) প্রকটিত হইল। আদি নর-মিথুনের অভিব্যক্তির কথা, এই শ্রুতিতেই পাওয়া যায়। পৃথিবী-সৃষ্টির কথা ইহারা বলে না। ইহারা বলে—সকল বস্তু তাহাদের সর্দার পিতা-মাতা জন্মগত করিয়াছিলেন, যথায় তাহারা বাস করিত বা করে, সেই ভূভাগকেই ইহারা 'ধারতী' (ধরিতী) বলিয়া থাকে।

#### প্রথম মূল-শ্রুতি (হুড়-শ্রুতি)

"সেদায় সানাম্ এখেন্ দাঃ গি তাঁহেবান। সেরমা বন্ 'মারাং-বুধ' তোড়ে হুতামতে ডিলউ আং,— আঙগা সেনায়। আং দাঃ চেতান্বে, সেনেবদ-মাচি বেলু কাতে এ ছুতুপ্ এনায়। উনি আ বারেআ

মাইলাখন্, হাঁস-হাঁসিন্ চ্যাড়ে—কিন্ জানাম্ এনা। মারাং-বুধা হুতুম্ভে, ওনা সেনেবদ-মাচি, পরমাণি-বাহা দারে এনা। এনা পরমাণি-বাহা-তাকাম্ চেতান্বে, উনকিন্ বারেরা-চ্যাড়ে কিন্ বেলে কেন্দা। উনবে ধারতী বেনাও আগিং মারাং-বুধ, আডি আডি রাজকয়, মেতাং কো আ। তায়ান্ রাজা, কাটুকোম রাজা, ইচাঃ রাজা, পোংহা রাজা, এনান্দ বাথকা দাড়ে আদাঃ; মেন্খান্ হররাজা আর কেঁচুখা রাজা, কিন্ দাড়ে আদাঃ। কেঁচুখা রাজা পরমাণি-বাহা-ভাঃ ভিন্নি ভিন্নিতে বল্গ কাতে হাসা এ বুরুধ্ রাকাব্ কেন্দা। আং হররাজা দেয়া চেতান্বে ওনা হাসাকয় আতাং কেন্দা। নোংকাতে ধারতী বেনাও এনা। ওনা বারেআ বেলে খন্—'পিলু-চু-হাডান্' আং—'পিলু চু-হুড়ি' কিন্ জানাম্ এনা। ধুকনিগি সানাম্ হুড়েন্ আগিল্ এগাং-আপা। চাবাএনা।

#### প্রথম শ্রুতির (হুড়ের) ব্যাখ্যান—

সৃষ্টির প্রথমে—আদিতে (সেদায়) সমুদ্র কেবল জলময় ছিল। স্বর্গ হইতে (সেরমা খন্) শ্রেষ্ঠ-প্রভু—(ধরম্-গুণ্ড) বা আদি-দেব, রেশনী হুতা অবলম্বিত সোনার সিংহাসন বসিয়া নামিয়া আসেন, এবং জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন। তাঁহার দেহের চুইট ময়লা (মলা) হইতে, রাজহংস এবং রাজহংসী পক্ষী প্রকট ঘাত করে। মারাং বুদ্ধ (আদি-প্রভুর) অমৃতভ্রায়, স্বর্গ-সিংহাসন পর-ফুলের ঝাড়ে (গাছে) পরিবর্তিত হইয়াছিল। ঐ পদ্ম-পাতার উপরে পক্ষী—চুইট প্রথম পাড়ে। এই কাণে, আবার—হান (ধরিতী) নিম্নাংশের জন্ত, অনেক অনেক (আডি আডি) রাকাকে বলিয়াছিলেন। কুমীর (তায়ান্)-রাজা, কীকড়া-রাজা, শামুক-রাজা, গিঙী-রাজা (ইচাঃ) ইত্যাদি কেহ পারে নাই; কিন্তু কচ্ছপ-রাজা (হুড়) এবং কেঁচো (কেঁচু), মাং-কিছুলুক (রাঙা), এই দুইজনকে পারিয়াছিল। কেঁচু-রাজা পদের নাল (মুণাল) মর্দা দিয়া, মাটি (হাসা) ভুলিয়াছিল, এবং কাছিম-রাজা, তার দেহে—পিঠের উপরে (দেয়া চেতান্বে) মাটি

ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে ভূ-ভাগ নিখিত হয়। ঐ ছুটি ভিম হইতে,—পিলু চু-হাডান্ ও পিলু চু-হুড়ি জন্মগত করেন। ইহারাই সকল মাহুয়ের (হুড়েন্) আদি (আগিল্) পিতা-মাতা। সমাপ্ত।

হুড়-শ্রুতিতে পাওয়া গেল, কি প্রকারে আদি-প্রভু ধরিতী সৃজন করিয়াছিলেন। এই কল্পনা কেবল সমেতালী পরিকল্পনা নয়,—সমগ্রা বংশের বাঙালী জাতিরও ধারণা। মালদহে গম্ভীর উংসবে, 'শিব-গড়া' বন্দনতে দেখা যায়—

(১)

"না ছিল জলতল দেবের মণ্ডল।  
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূভাকাং।  
কীকড়াকে পাঠালেন মুক্তিকার তরে।

\* \* \* \* \*  
কুর্ধের পুটে পৃথিবী করিল সৃজন।  
কহন ত গুপ্তগোঁসাই দরশতার বরে।  
পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে।

—আন্তের গম্ভীর, ১৯ পৃঃ।

২য়-বন্দন।

সৃষ্টি

বাংলাগীর আদি সৃষ্টি-বন্দন।

"জন্মায় সসার গিতিত ভগবান।  
কি মতে ছিল হে প্রভু হইয়া শূভাকাং।

\* \* \* \* \*  
সেই ভিন্ন হইল চুইখান।  
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান।  
—গম্ভীর, ২৪ পৃঃ।

"মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।  
রক্তা বিধু মধেধর তিনে মাটি সৃজন করিল সে।"  
—ঐ।

প্রাচীন বাংলাগীর নিরঞ্জন—

"ধবল খাটে ধবল খাটে ধবল সিংহাসন।  
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম-নিরঞ্জন।"

—ঐ, ২৫ পৃঃ।

"জলেতে আসন গোঁসাই জলেতে বৈসন।

জল তর করিএা ভাসেন নিরঞ্জন।"

—ঐ, ৩৪ পৃঃ।

আদি-প্রভুর দেহ-মলা সঞ্চকে, বাংলাগীর শূভপুরাণে

দেখা যায়—

"তিলেক পরমাণ মলাং নিল নারায়ণ।"

—শুঃ পৃঃ ১০৭।

"হিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে।"

—ঐ, ১০৮।

ধর্মের আসন পদ্মশুশের সৃষ্টি—

"সমুদ্রে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল।

তাহাতে বসিএা গোঁসাই জলে আভ মূল।"

—গম্ভীর, ৩৬ পৃঃ।

"আপনে ধর্ম গোঁসাই কৃষ্ণ রূপ হৈল।

কৃষ্ণের উপরে প্রিথিবি রাখিল।"

—গম্ভীর, ৩৭ পৃঃ।

শূভ-পুরাণে—

"পদ্মহস্ত দিআ পরভু বোলে থির থির।

পদ্মহস্তে জনমিল শ্রে কৃষ্ণের সতীর।"

—২২।

হুড়-শ্রুতিতে পাওয়া গিয়াছে, ধর্ম-গুণ্ডের (মারাং বুদ্ধ) দেহ হইতে মলা দ্বারা হংস-হংসীর জন্ম হয় এবং

আদি-প্রভু, তাহাদের অবস্থান জন্মই নেন, হুড় সমেত সিংহাসনটি—একঝাড় পদ্মগাছে পরিবর্তিত করেন। এই ব্যাপারটি,—বাংলা গম্ভীর পুজা-উৎসবেও গীত হইয়া থাকে। —"আমি জাকে জন্ম দিব তাকে বিধি ঠাই।"—গম্ভীর, ৩৬ পৃঃ। এ পর্যন্ত বাহা কিছু লিখিত হইল,—এ সকল ব্যাপার প্রাচীন বাংলার। হুড়-শ্রুতিতে—আদি-প্রভু হংস-হংসী সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের আশ্রয়ের জন্ত ধরিতী নিম্নাংশ করিয়াছিলেন।

\* মাহাগুরু—"আগনি নিরঞ্জিল গরুড় আগনার কাষা,"  
"অংপরে গায়ের মলা হইতে বহনতীর জ্ঞান বিকাশ হইল। এই  
প্রকার উপাখ্যান—নানিক মন্তের ভণ্ডি, বিবহরী পান, ও গম্ভীর  
বন্দনা মনে দুই হয়।"—আন্তের গম্ভীর, ২৫৩ পৃঃ।



চিত্র ধায়, নিত্য চুটে যায় আকাশের মৌন নীলিমায়,  
দূর দূরান্তের ঐ স্বপ্নভরা বিচ্ছিন্ন পানে,  
সারি সারি তরুশ্রেণী যেথা মিশে যায়  
নীলো আর ধূসর কালোয়,  
সেইখানে এ ধ্বংস করে আনাগোনা।  
শাঁকের আঁধারে যবে বিশাল প্রান্তর  
বোঁয়ার চানর গায়ে ঢেকে  
ঘুমাবার করে আয়োজন,  
সুদূর পল্লীর বুকে অলে কীর্ণ আলো  
তরুশাখা-ছায়া ভেদি', ভেদি' ধূসরতা—  
প্রান্তর-বদর ভালে যেন এক চন্দন-নিসিক—  
সে আঁধারে, সেই দীপ্ত তিলকের মোহে  
চুলে চুলে নেচে যায় এ চিত্র আমার।  
মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত রক্ত-শোভায়  
চিত্র ধায় অনিবার।  
বরষার আকাশের ছিন্নহীন জমাটে সে মেঘ-আবরণ,  
তাও ভেদি' বারংবার চিত্র চাহে হেরিবারে  
এই বিখলীনের কল্পোত্তীর্ণ উৎস সে উদ্গাম।  
পশ্চিম আকাশে পুন' সূর্য্যোত্তর স্বর্ণ-পারাবারে  
গান করে চিত্র বারংবার।  
পাখী হ'য়ে মাখি' লয় প্রভাত-সূর্য্যের দাগ ডানায় ডানায়।  
একনি সে নিশিদিন অবিরাম গমন আমার  
অসীমের অন্তর আলাড়ি'।  
তবু তবু হৃদয় নাই,  
মন প্রাণ তবু বৃত্তিক্ত  
জানি না কি গুপ্ত পিপাসায়!

মর্ত্যে পুন' ফিরে আসি।  
বিছাইয়া দিই এ হিদয়ারে

প্রভাসল প্রকামল তৃণ-শয্যা'পরে।

স্বপ্ন-স্বপ্ন পাঠা-ভরা তরুণের শাখা শাখায়

চিত্র ওঠে জড়িয়ে জড়িয়ে।

শৈবালে ও হেলা শাখে আহত যে কীবা ফুলা

তটিনীর জগ,

তারি স্বপ্ন মন্তর ধারায় প্রাণ মোর ধায়

অতি বীর একে বৈকে শিশুর সমান।

ফুল-পল্লী-অননীর আভিনায় আভিনায় যোরে এই হিয়া;

ফেরে যেথা নত নেড়ে চুমা বেন জননী শিশুর;

ফেরে যেথা লাজমায় মরাল-গমনা,

কপালে সিন্দূর-বিন্দু

রক্তবসে পোর রক্ত তরুণের ঢেকে

আমেক গুণ্ডনে আর লাল পাড়ে মুখপদ্ম গিরে,

বাঙ্গালীর অতি মিষ্টা বধু

প্রিয় সাথে স্বপ্ন ভাবে করে আলাপন।

চিত্র ফেরে শিশু যেথা করিছে নর্দন

আপনার অহেতুক প্রাণের উল্লাসে,

অবোধা ভাষায় তার একাদি' উল্লাস।

চিত্র ফেরে বদর যেথা রোগশয্যা-শায়িত বন্ধুরে

নিদ্রাহীন হয়ে শ্রমে সেবিছে কঠোর।

চিত্র ফেরে অবাধ্য শিশুটি যেথা পিতার শাসনে

ভীত-ক্রোধ চুটে এসে লুকাইছে জননীর অঞ্চলের কোণে।

হে দরগী, এই মোর স্থান—

এই মোর প্রিয় প্রিয়তার প্রিয়তম স্বপ্নের আবাস।

হে মাটা, হে হৃৎ-স্বপ্নে নিত্য দেলায়িতা

ক্রন্দনে মুখর কন্তু, আনন্দেতে কন্তু উজ্জলিতা,

তুমি মোর তুমি মোর পরম আশ্রয়

চিরদিনকার আর চিরকামনার।

শুভে শুভে প্রান্তরের ওদাঙে, আকাশে

যোরে বটে চিত্র-পাখী,

তবু তার আশ্রয়ের নীড় আর পরম শরণ

এই মাটা, এই ধরা, এই তৃণ-খলি-ভরা দেশ।

হে জননী পৃথিবী মৃদুহী,

আমারে ভুল না তুমি।

আমি নাহি ভুলিব তোমার।

জীবনে তোমার বক্ষে করি বিচরণ,

মরণে তোমারি গর্ভে অনন্ত শরণ

দিও দিও যুগ যুগ কোটা যুগ ধরি'।

অসীমের সন্তান মাহুৎ—

জানি তাহা।

কিন্তু তব সীমার আগার,

মধুর মধুর অতি বেদনে হরয়ে।

হৃৎ মাকে বৃষ্টি হেথা স্বপ্নের স্বপ্নপ,

শোকে লজি চিত্ত-বল,

প্রেমে পাই স্বপ্নের অমৃত-আশাদ।

হৃৎমহী, স্বধামহী, হে ধরা জননী,

তোমারে ছাড়িতে নাহি চাই

শুভে নম, শুভে নম,

আকাশের নীলিমায় নহে—

আমার আবাস নহে নীল নভতল।

আমার আবাস এই মাটির ধরণী।

রে করি, রে কিশু-চিহ্ন,

রে উদ্গাম আকাশ-বিলাদী,

ফিরে আর, ফিরে আর, মাটির ভবনে।

মাটাই জননী জোয়,

মাটা তোর সত্য দেশ, পরম আশ্রয়।

## আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা

### নিয়মাবলী

১। প্রাকৃতিক দৃশ্য বাদে অথ যেকোন

প্রকার ভাল ছবি যথা—আকৃতি (Portrait,

Subject study), খেলা, কোন বিশিষ্ট ঘটনা,

ভাল কারুকার্য বা ভাস্কর্য-শিল্প প্রভৃতি সকল

প্রকার চিত্রই প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া চলিবে।

২। ছবি কোয়ার্টার প্লেটের ছোট বা ফুল

প্লেটের বড় হইলে চলিবে না।

৩। বিচারের সময় ছবি তুলিবার কৌশল,

‘প্রিন্ট’র উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে

লক্ষ্য রাখা হইবে।

৪। ‘মাউন্ট’ করিয়া অথবা মোটা বোর্ডের

মধ্যে ভরিয়া ছবি পাঠাইতে হইবে।

৫। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ভাল ছবি

ছাপিবার সম্পূর্ণ অধিকার ‘উদয়ন’-সম্পাদকের

থাকিবে।

৬। সঙ্গে যথোচিত ডাকটিকিট পাঠাইলে

অমনোনীত ছবি ফেরত দেওয়া হইবে।

৭। ডাকে ছবি পাঠাইবার সময় ভাল

করিয়া মোটা বোর্ড দিয়া প্যাক করিয়া

পাঠাইবেন। কভারের উপরে “আলোক-চিত্র

প্রতিযোগিতা” লিখিয়া দিবেন।

৮। প্রেরিত চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার

কুপন পাঠাইতে জরুরি নহে। কুপনের উপরে

নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৯। প্রেরিত ফোটো অল্পতর পুরস্কার পাইয়া

থাকিলে সে-কথার উল্লেখ করা আবশ্যক।

১০। পুরস্কার বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই

চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

১১। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছবি

উদয়ন-কাঠালিয়ে পৌছান দরকার।

১ম পুরস্কার ... ৩০০ টাকা

২য় ” ... ২০০ ”

৩য় ” ... ১৫০ ”

ইহা ভিন্ন আরও ৫ খানি ভাল ছবির

জন্য Consolation পুরস্কার দেওয়া হইবে।



## পদব্রজে ভারতবর্ষ

### ঐশ্বরীপদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম মাস

মাহুদের পাদে-চলা এই যে অনন্ত পথ, এর ভগ্নর  
দিগেই কত পথিক অনন্তকাল ধরে তাদের পদচিহ্ন  
রেখে গেছেন। এই সব পদচিহ্ন অহুসরণ করে  
ভাটপাড়া "চিরিষ্ট-ক্লাব" থেকে বছর ছয়কে আসে  
কন্ধুনে এক শীতের ভোরে ছুটা মাত্র দরবারী সজ্জা  
চোখ, মলিন মুখ ও উৎসব-মৌন বিদায়-বাণী  
ভারাক্রান্ত স্বদয়ে বহন করে সেদিন অনিশ্চিত  
যাত্রার যাত্রী হয়েছিলুম—সেদিন এ আশা অল্পই  
ছিল যে, সঙ্কলিত পণ্যটন শেষ করে সশরীরে আবার  
জন্ম-পরাইহিত্যে ফিরতে পারব, বা জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা-  
সভার উৎসাহ-গর্ভ আশীর্বাদে রাত হয়ে সেই ভ্রমণের  
দিন-দিগ্ধি-সাধারণ উপহার দেবার সুযোগ পাব।

"চিরিষ্ট-ক্লাব" নামে কোনো বনেনী ভগ্নত্বের  
অজ্ঞা না থাকলেও স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত  
অজ্ঞপ্রকাশ হালদার মহাশয়কে কেন্দ্র করে জনকতক  
অমণ-রস-পিপাসুতে মিলে আমরা একটা দলের সৃষ্টি  
করেছিলাম; আর, সেদল থেকে সভ্যদের পথ-যাত্রা  
এই প্রথম নয়। আরও কয়েকবার বন্ধানা, কাশী,  
সিংল হ'তে কুমারিকা ও পঞ্চাবের জলদর পুরে  
আসা এই কালের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল—তবে সে  
যাত্রায়ত ছিল বিচক্ষণ-বোণে, সদলবলে এবং  
পকেটে পাথের রেখে। এবারকার প্রস্তাবের  
নূতনত্ব ছিল এই যে, হান-বাংলার শরণাপন্ন না  
হ'য়ে, সকল মাটি মাড়িয়ে ঢালার বাদ গ্রহণের  
সঙ্গে-সঙ্গে পথের ধোরাক পথেই সংগ্রহ করে চলতে  
হবে। তবে প্রবাসের সেক্রেটারী "জঁচাকার হুঁজার  
মাইল"র অল্পতম পথিক শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য একটা  
"রিজার্ভ কাণ্ড" "প্রিজার্ভ" করার চেষ্টায় থাকবেন।

এবারও কথা ছিল তিনজনে একসঙ্গে বেরবার,  
এবং আয়োজনও হয়েছিল তত্ত্ববোধী; কিন্তু যাত্রার  
পূর্বেই অপর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে "বাড়ীর অমত" বাধা হয়ে  
দাঁড়াল। এ ঘটনায় মন মুগ্ধে পড়লেও নিজে পেছাতে  
পারলুম না,—কারণ, ম্যাকিটেট প্রভৃতির কাছে দলের  
অগ্রণী হ'য়ে দরবার করে যথাযোগ্য অহুমতি-প্রদান  
সংগ্রহের পর মত বদলাবার সম্ভাব্য অতিক্রম করা  
আমার পক্ষে সহজ হ'ল না।



ঐশ্বরীপদ ভট্টাচার্য্য

"ভারত-ভ্রমণ" প্রস্তাবের প্রাথমিক সাহায্য-কল্পে  
গ্রামের জনকয়েকের স্বাক্ষর-সংগ্রহ এক নিয়মের-পত্র  
প্রচারিত হয়; ফলে ৪২টা টাকা চাঁদা সংগৃহীত  
হয়েছিল। ঐ পুঁজিতেই তিন জনের উপযোগী পোষাক  
ও আবহাঙ্গিক উপকরণ আহৃত হয়, কিন্তু কাজে  
লাগে শুধু নিজেরগুলিই। তারাপদ ও গিরিশ

তাদের সঙ্গ বজায় রাখতে পারছিল না, তা  
আগেই বলেছি।

১৯৩০ সালের ৩রা ডিসেম্বর। শেখরাখি।

ভাটপাড়া চট্টকলের প্রথম বাণী নিম্নাকার শ্রমিকদের  
উদ্দেশে জানাচ্ছে—

"উঠে পড়, সব,

জাগা কলরব

আয় গুট গুট কাজে;

আর ঘুম নয়,

হয়েছে সময়—

"হাজিরার বাণী বাজে।"

ঐ কলের বাণীর নিমন্ত্রণ এককাল আমাকেও নিয়মিত  
ক'রে এসেছে—আজ কিন্তু কানে বাজছিল কবি-বীণার  
আমন্ত্রণ-বাণী—

"হের—উবার আলোকে জাগে শুকতার।

উদয়-অচল-পথে,

কনক-কিরীট তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে;—"

শুধু কবির বিদীই নয়, "খনা"র বিদানেও নাকি

ঐ সময়ে যাত্রা করার কথা আছে। কেননা,

"মঙ্গলের উষা"ও সেই স্থলয়ে "বৃদ্ধ" চরণ-স্থাপনার

উপক্রম ক'রেছিলেন! তখন খোয়াল করিনি, কিন্তু

পরে পণ্ডিতদের মুখে শুনিছি—উত্তরকালে বাঘের

পেটে দমতে যেতেও যে যাইনি, বা অরণ্য-পথে

বজা হস্তীর ভঁড় থেকেও যে পরিচায় পেয়েছি, তা' তবু

অজ্ঞাতসারেও "খনা"কে মাত্র করার জন্তে। "অজ্ঞাত-

সারে" বসুি এই কারণে যে, প্রথমে যাত্রার দিন স্থির

হয়েছিল ৩০শে নভেম্বর; কিন্তু এক নূতন "লাইট-পোষ্টের"

আলোহীন থাকের "কীট-তারের" পায়ের আশ্রুল বিষম

জঘম হওয়ার দিনটিকে কিছু পেছিয়েই দিতে হয়।

যাত্রাদিনেও যে নৈক্যত নিরাময় হয়েছিল তা নয়;

তবু কোন এক পরম শুভাখীর "নিবেদ"ই যে সেদিন

চরণে আঘাত হয়ে বেজে, আজ "খনা"র বিধিতে মুক্তি

দিয়ে গেল, এমন একটা ধারণা করাও অসম্ভব নয়।

একটু পরেই নিশ্চয়ে ঘরে এসে দাঁড়া'ল চুটী।

বালক—দেবপ্রসাদ হালদার ও সীতারাম পাণ্ডে—পূর্ণ

সম্ভার ব্যবস্থাস্বার্থী আমাকে বিদায় দিতে। এদেরই

হাতে ঘরের চারিটা 'মেজদ'কে দেবার ভার চাপিয়ে  
রাজপথে এসে যখন দাঁড়া'লুম, তখন কলের অভিস্রু-  
লোক-চলচল অল্পে অল্পে প্রবাহ হ'চ্ছে।

১১৫ পাউণ্ড ওজনের দেহের ওপর ৩০ পাউণ্ড

ওজনের বোঝা চাপিয়ে রওনা হ'লুম কলকাতার

দিকে। অঙ্গের মধ্যে রইল, লাইসেন্স-করা ছোরা ও

বর্শা; আর বোঝার আধার "হোন্ডা-অঙ্গের" মধ্যে

হাফ-পাউন্ড, হাফ-লাইট, টর্ক-লাইট, ছুরি, কব্জল, চাদর,

জামা-কাপড়, ছোট ব্যাগ-বন্দী রোড-ম্যান, সার্টফিক্ট-

শুলা, টাপার খাতা, খারমোস্ত্রা, প্রদাধনের

ব্রহ্মাি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু কিছু উপকরণ।

কলকাতা পূর্ণতা চেনা-পণ, যাত্রায়ত অনেক বারই

হয়েছে—তবু আশ্রুল-কাটা খালি-পায়ে অনভাসের বোঝা

খাড়ে ক'রে চলতে চলতে ক্রমেই অবসন্নতা অহুত

হ'তে লাগল। নিরিবিলি দেখে খড়দে কিছু খেয়ে

নেওয়া গেল, এবং আড়পাড়ায় সাগর-দত্তের বাগানে

আধ-বন্টীটাক বিশ্রাম করারও দরকার হ'ল।

বিশ্রামের ফলে পা বদল থেকে—তবু সমস্ত শক্তি

দিয়ে তাদের খাড়া ক'রে লম্ভার খাতির আবার

বোঝাটাকে খাড়ে তুললুম এবং পুরো দমত চলতে আরম্ভ

করলুম।

বেলা একটায় টালার পুল পার হয়ে বাগবাজারের

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে

যখন উপস্থিত হ'লুম, তখন তাঁর স্থান হ'য়ে গিয়েছে।

বাইরের ঘরে বোঝা নামিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলুম।

ডাক্তার-বাণু আমাদের গ্রামের লোক, আত্মীয়,

সর্গজনপ্রিয়,—তবু, সূখা-সুখার আবাদা সত্ত্বেও এই

অসময়ে মনের অভ্যপ্রায় প্রকাশ করত দারুণ লজ্জা

বোধ হ'তে লাগল। আরও মনে হ'তে লাগল—প্রথম

দিনেই যখন এত কষ্ট হ'চ্ছে, তখন ভারত-পরিভ্রমণ

আমার দ্বারা অসম্ভব।

ডাক্তার-বাণুর ছেলে মুরারির সঙ্গে কথোপকথনের

ছলে ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করার পর, এক অবকাশে,

তার অজ্ঞাতে পাড়ি নিলুম—অতিকটে—হরিতকী



বাপান। এখানে আমার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাসায় এসে মান ও জলযোগ হ'ল; ভগিনী তখন কান্দিতে রোগশয্যায়। মাও ছিলেন তাঁর কাছে। সন্ধ্যায় ভগিনীপতি ও তাঁর দাদারা এলেন। ব'ল্লেখ্য, হেঁটে এসে একটু ক্লান্ত; বিশেষ কোন কথা তখন ভাবলুম না। যা' কিছু কথা হ'ল পরে শুধু ভগিনীপতির সঙ্গে। রাতে আহার সেরে একটি ঘুম; বাপ, পরদিন বেলা ৮টা। ভাটপাড়া থেকে কলকাতা এই ২০ মাইলই প্রথম দিনের যত্নবদ্ধ।

ভগিনীপতি ডাক্তার-মাহুষ—কাজেই শরীরের বাধা খাবার গুণ্য দিলেন হোমিওপ্যাথি। কতকটা উপকার হ'ল; কিন্তু পায়ের তলার বা অবস্থা, তাতে খালি বিপাকে মাড়ান দায় হ'য়ে উঠয়।

বিকালে সেলাম হইল। এক জোড়া খড়গা কিনে, পাশের এক মৃত্তিকে দিয়ে বেশ ক'রে পেরেক লাগিয়ে নিলুম। পায়ে বিয়ে চলতে একটু আরামই হ'ল।

আজ শুক্রবার এই ডিসেম্বর। সকলেই কাছে গেল বেলা ১০টার মধ্যে; আমিও আহরাদি সেরে স্নানসেবায় প্রতীক্ষায় রইলুম। যখন দেখা গেল বাধা নিতে আর কেউ নেই, তখন বোঝা কমাবার কাজে মন দিলুম। পল্লব কাপড়, জামা; বোঝার মধ্যে রইল—কঞ্চল, চাদর, ছুরি, টর্ক-শাইট, পট্ট, সরসের মোজা, গাম্ভা, নোট-বই, ছোট ব্যাগ, টুপি ও পারমোজালা। বোঝাও হ'ল অনেক হালকা। বাকী অস্ত্রাবস্তুগুলো বাসায় রেখে ও একথানা চিঠিতে ওগুলো বাড়ীতে পাঠাবার অম্বরোধ জানিয়ে বোঝাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল মেটেবুজের দিকে। পথে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, “হকির ম্যাচ, বুধি?”

কলকাতার জনাধিক পথে কেমন একটা লজ্জা বোধ হ'তে লাগল—যেন কত অপরাধী; কোন প্রকারে শহর পার হ'তে পারলে বাঁচি। এই ভাবে, চৌরঙ্গী থেকে ভবানীপুর হ'য়ে মেটেবুজের পথ ধরলুম। নবাবের বাড়ীর ধার দিয়ে, কিংজঙ্ঘের ডকের পাশ

দিয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছে প্রাণটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এক আনা ভাড়ার নৌকায় উঠলুম রাজপল্লের বাট লক্ষ্য ক'রে। বাড়ীও ছিল অনেক। তাঁরে পৌঁছে বি-এন রেলের পথ ধরলুম। পাজার ভিতর দিয়ে যেতে দেখা হ'ল একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে, তাঁর বাড়ীর দরজায়; নাম শ্রীকৃষ্ণ যতীন্দ্রনাথ বসু, কাজ ক'রতেন ভাটপাড়ার চট্টকলে। তাঁর বাড়ীতে কৈবালিক চা পান করা গেল; আর জানা গেল যে, বালেগরের সাব-ডিস্ট্রিক্টমায়া ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকৃষ্ণ জানকীন্দ্র ব্রহ্ম মহাশয় তাঁর ভগিনীপতি। উলুবেড়ের পথ জেলে নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিলুম, এবং শাঁকরেলের ঠেশনের কাছে রেল-লাইন পেরিয়ে লাইনের পাশে-পাশেই মেটে পথ গাওয়া গেল। ফিরে পেয়েছিল বৃষ্, পথে ভাস্বেতা ভাবনার ভাল খাওয়া হয়নি; পরীক্ষাও অবসর, তাই আবার ঝড়পার ফোয়া। এক “চা ও খাবারের দোকানে” ছুটো রসগোলা ও চা খেয়ে পথ চলতে চলতে কতকটা আরাম বোধ হ'তে লাগল। রাতি আটটায় প্রায় ১৮ মাইল পথ চলার পরে এলুম বাড়িভাড়া ঠেশনে। অজানা পথ, তাই বিদেশ; অন্ধকার মেঠো রাস্তায় দুর্দ্বল বাঙ্গালী একলা; মনটায় কেমন যেন একটু ভয় হ'তে লাগল। ঠেশনে আসতেই সে ভাবটা কেটেছিল বটে, কিন্তু শরীর প্রথম দিনের অবস্থায় ঠাঁড়াল। সারা দেহ পাকা কোঁড়ার মত; পায়ের তলা হ'তে মাথার চুল পর্যন্ত ব্যথা। কাছেই ছিল দোকান; খেগুম কিছু কিনে; পয়সা বাকী রইল মাত্র দশটা।

ঠেশনে এসে কোথায় শোব তাই ভাবছি। একে শীত, তাই ঠেশনে কত রঙবেরঙের লোক; ভয়, পাছে হারায় পাশের সখল—সরকারী কাগজগুলা। বিনা সরকারী অধুমোদনে এই ভাবে পথ চলা যে কত বিপজ্জনক, তা বোধ হয় ভারতবাসী সকলেরই বিশেষ ভাবে জানা আছে। ঠেশন-মাষ্টারকে আবেদন করায় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর খোলা বারান্দা দেখালেন। গ্রুপ হ'ল মনে; প্রথম দিনেই এই, না

জানি আরও কত লাক্ষনা ভোগ্য আছে। ভাববার সময় কম, শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, কাজেই কঞ্চল ও চাদর বের ক'রে, খড়পাটাকে বোঝায় রেখে মাথায় দিয়ে একটা বেঞ্চে কাং হ'লুম। মাঝ রাত্রে একজন এসে ডেকে বললেন, “গুঠো” ভারী রাগ হ'ল; বললুম, “কারণ?”—উত্তর হ'ল, “আমি এখানে রোজ শুই।” সেবলুম রেলের বাস, রাতের কাজ শেষ ক'রে এইখানেই থাকেন; রাগ হ'লেও তা দমন ক'রে বেঞ্চ ছেড়ে দিয়ে শু'লুম মাটিতে মোয়ের ওপর। ভাবলুম, আমি তো কষ্ট করতাই বেরিয়েছি, তখন আর কেন এই একশো-আট-পাখা-মরা কেরাণ্ডির অদ্বৈত বাদ মারি।

রাতের ঘুম কাঁকা জায়গায় যেমন হয়, তেমনি হ'ল। পরদিন শনিবার কর্দ্দ হ'তেই উঠে, মুখ মুয়ে, বোঝা-বাঁধা শেষ ক'রে যাত্রার যোগাড় করলুম। শরীরাটা দুর্দ্বল মনে হ'তে লাগল। পাশেই চায়ের দোকান, কিন্তু বিদ্যার কম; শীতের ভোর, কাজেই তখনও দোকান খোলেনি। একটু অপেক্ষা করলুম, চা না খেয়ে আর পথ চলতে যেন মন সব্বিছল না। ডেকে দোকানদারকে তুলে পানতুল্য ও চায়ের ব্যবস্থা করা গেল।

বেলা প্রায় ৮টার মোঠো পথ ধরে উলুবেড়ের দিকে রওনা হ'লুম আশাবরীর স্বরের সাথে। ছ'মাইল যেতে হবে; শীতের শিশিরে ভেজা অন্ন অন্ন বাসের ওপর দিয়ে ঝড়পা-পায়ে চলা দায় হ'য়েই পড়তে লাগল; স্বরের ও চলার তাল কেটে যেতে লাগল। অন্ধ্যাক্ষ ৯টার উলুবেড়ের পাকা রাস্তায় পড়ে বাজারের একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি কালীবাড়ীর নাম করলেন ও জানালেন যে, থাক্কার ও খাবার ব্যবস্থা হবে, যদি শ্রীকৃষ্ণ শরৎচন্দ্র ষড়্জ মহাশয়ের কাছে যাই। এ নাম পূর্ণ-পরিচিতি, কেননা স্নানামন্ত্রক কন্ট্রাক্টর (contractor) গেরি, সি, বানানজ্ঞারী অধীনে চাকরী নিয়ে ছ'মাস এই উলুবেড়তে এক সময়ে থাকতে হয়েছিল। সে

পরিচয় গোপন ক'রে উপস্থিত পরিচয়েই আশ্রয়-প্রার্থী হ'লুম। একবেলা খাবার ব্যবস্থা হওয়ায়, কালীবাড়ীর একটা ঘরে জ্বিনিসপত্র রেখে এবং গম্বাহান দেরে, বাকী ছুটি পয়সায় চা পান ক'রে সখল শেষ করলুম।

মধ্যাহ্নে আহারের পর একটু বিশ্রাম-বাসনা করণ ভেতর থেকে মনটা অধিকার ক'রেছিল ঠিক বোঝা না গেলেও—পথ চলতে পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে, যখন চেতনা হ'ল, তখন চিন্তা হ'ল পয়সার। কার কাছে যাই? কি বলি? মাজ এই-ই হুঁহু গথ এসে, কেমন ক'রেই বা সাহায্য চাই? পাখি কি না জানি না, তবে কি বেরি বলি যে, হেঁটে ভারত যুগতে বেরিয়েছি? নানা চিন্তায় মগ্নের সৌন্দর্য্য ছুটে উঠতে লাগল। অবশেষে ব্যাগ-বন্দী কাগজ সমেত, চক্ষুলাজ্ঞার মাথা খেয়ে হ'ল এক জলের “কাজে গিয়ে প্রস্তাব করলুম। এভাবে চাওয়া যে কী জীবন ও মর্মান্তিক—তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর আর কি বৃক্বে!

কিন্তু যে-কাজটা হ'বার, দেখা গেল তার উপায় ঠিক আপনা হ'তে কলের মতই হ'য়ে যায়। আমারও জুটে গেল এক সরঙ্গী; নেশা আছে ঘুরে বেড়াবার; পূর্ণী পর্যন্ত সাইকেলেও পেছেন; নাম শ্রীকৃষ্ণ নীলরতন চাটাজ্ঞী, শরৎ-বাবুর অধীনস্থ চাকুরে। ক্রম-পথে প্রথম বাইরের সাহায্য পাই এর কাছে, একটা টাকা; নদীগুলি পার হ'বার ও সামান্য চাপানের মত খরচ। পথে বিনি বা দিয়েছেন তার হিসাব ও দাতার নাম, স্থান, তারিখ তাঁদার খাতায় যথাযানে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ যে বিনা-পয়সায় খোরা যায় তার সাক্ষ্য দিয়ে।

সন্ধ্যায় নীলরতন-বাবু দৌলতে আর এক অজানা অপরিচিতের সাক্ষাৎ মিলল, ইনি উলুবেড়ে থানার সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২৪ পরগণার গোয়েন্দা বিভাগের শ্রীকৃষ্ণ শশীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য



মহাশয়ের পুত্র। রাতের খাওয়া তাদের হাতেলেই একসঙ্গে শেষ করে, নিমস্র বাজার কথা উঠতে তিনি বললেন, “কেন একটা আশ্রয়স্থান ব্যবস্থা করেননি, যখন সবই পরিচিত রয়েছেন? যদি বেরলেন-ই, তবে ভাল ব্যবস্থা করে বেরুনই উচিত ছিল।” কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সে-টো লাগবাজার পুলিশ অফিসে আমার বন্ধু কবিরাজ হরকুমার গুপ্তের মাতুলের কাছে গিয়ে, দেখা করে, সরকারী অফিসের পত্রাদি দেখিয়েও সমসের অব্যবহৃত কৃতকার্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা’ছাড়া সমস্ত সশস্ত্র সঙ্ঘেও মনের দৌর্বল্যা থাকায় কেউয় কোর পৌছাননি। আর ঐ একই কারণে, কতকটা অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত কাগজেও খবর দিতে মানা করেছিলুম। মনে হয়েছিল যে, চাক বাকিয়ে ফেরার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিদায় নিয়ে গঙ্গাতীরে কাগীবাড়ীর সেই ঘরের মধ্যেই কলখনানা বিছিয়ে রাত কাটানুম।

৭ই তারিখের সকাল-বেলায় মুখ-হাত ধুয়ে খালের পুল পার হয়ে এসে ধলুয় উজ্জ্বা ট্রাক বোড। মেটেবন্ধ দিয়ে না এসে বজ্রবন্ধ দিয়ে আসাই ছিল হুবিধাজনক; কিন্তু পথের শেষ বেখানে শূন্য—সেখানে একসমের একটু-আধটু ভুলে কিছু বাহ-আসে না। উল্লেখে থেকে পথটা কতকটা খালের ধার দিয়ে গেছে; দেখলে মনে হয়—অনেক দিন সন্ধ্যার হয়নি। এই পথে ৮ মাইল এসে দামোদর নদ খোয়ার পার হ’লুম। পারের এসে স্থির করা গেল, একদিন পথ চলব, আর একদিন বিশ্রাম। সারা ভোর্ত খোরা এত আর বা-চা নয়; শরীর ঠিক রেখে চলতে হবে; আর থাকতে হবে এমন জায়গায় যেখানে বিপদ না হতে পারে, বাই আর না থাকে। তারপর অস্থির। যখন বেরিয়েছি, তখন হয় সন্ধ্যাত, না হয় মরণ; মাঝামাঝি কিছু চাই না। হিরাব করে দেখা গেলে ৩০ মাইল পথ চলে তবে ভাল জায়গা “পাটকুড়া” উপস্থিত হতে পারে। সেখানে থাকবার

ঠিকানা পেয়েছিলুম আমার বন্ধু ঠাকুরদাসের কাছে; তার বাবা এ জম্মতে বহুদিন ছিলেন। নীলরতন-বাবুর দেওয়া ঠিকানা ছিল ১২ মাইল পথের পারের “দেউলটা” গ্রামের জমীদার ভীষ্মক মোহিনীমোহন ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর। মোজা পথ থেকে সে প্রায় মাইলখানেক দূরে। দেউলটা আসতে পথ ভুলে আর একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়ি—পরে আবার বড় রাস্তায় এসে মোহিনী-বাবুর বাড়ী যাই। পথটা মাঝে মাঝে নির্জন। মাথায় টুপি থাকায় গ্রাম্য বেসরকারী পাহারাদার কুকুরগুলার অবাচিত পাহারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করার চেয়ে আমাদেরই বেশী শক্তি করে তুলছিল; কারণ, তাদের শুকনো দেহের সারস্বত দাঁতগুলোকে নিতান্ত অবলোকার যোগ্য মনে করা চলেনি।

গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করে করে প্রায় খাবার সময় হাঙ্গির হ’লুম মোহিনী-বাবুর গৃহে, গ্রামের পায়ের-চলা পথের দাগ ধরে। নিজের ছুঁতের কাহিনীর উল্লেখ ও উল্লেখের নাম করায় তিনি ভরসা দিলেন এবং জানালেন যে, ভাটপাড়ার তাঁর গুদামের বাড়ী।

বাড়ীর কাছেই পুকুর থাকে সবেও খান কলুয় না; কারণ এক-কাপড়ে শীতে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা ছিল,—তা’ছাড়া খেয়ে উঠেই পথ চলার এবং “একা নদী বিশ ক্রোশ” পার হওয়ারও তাগিদ ছিল। আহার সমাপ্ত হ’ল; এটো পথ দ্রুতম করে আসার ফলে ক্খারও অস্ত ছিল না। বেলা প্রায় ২টার দেউলটা হতে রওনা হ’লুম। অল্প পথ চলার পরেই দেখা দিলেন “রূপনারায়ণ”; বা দিকে চাইতেই দেখা গেল যে, রেলগেজে-সেতুর স্তম্ভ ভূগুর চরণের মত এর যুকও নেমে এসেছে—তবু খোঁজাচি খটাতে পারেনি। দেউলটার আগে শীর্ণকায় দামোদর পার হ’তে বিশেষ বেগ পেতে হবনি। রূপনারায়ণের তীরে এসে দেখি নৌকা দূরের কথা, জন-প্রাণীর সাড়া পর্যন্ত নেই।

নৌকার অভাবে ঐ সেতুপথে নদী পার হ’বার অভিশ্রমে প্রায় আধ মাইল চলে এলুম, কিন্তু বাধা পেলাম পুলিশের হাতে—মেতের গরবর আশ্রয়ে। দ্বিভুক্ত বাধা হ’লুম আবার সেই নৌকার চিহ্নহীন খেরাঘাটে। ইতিমধ্যে হু’একজন পারের যাত্রী এসে মাঝির অপেক্ষা করছিলেন। ওপারে হচ্ছে সেই ইতিহাস-এসিদ্ধ সময়কেন্দ্র “কোলাঘাট,” তবে আজ ঐ নাম ও রূপনারায়ণ নদ ছাড়া যুদ্ধের অজ চিহ্ন কিছুই নেই। দূরের যাত্রী নিয়ে বেগে ধামনান একাধিক বাম্পায় পোত খেরাঘাটে বসে বসেই দেখতে পাওয়া গেল।

তলুয়, মাঝির দেবী হচ্ছে, তার কারণ এই যে, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু “রসত” হওয়া বেচারার অভ্যাস। অনেক ডাকাডাকি ও হাতি-কাপড়-নাড়ার পর ওপার থেকে যাত্রী-ওঁটার আস্ত পাওয়া গেল; এবং প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আমাদের প্রতীক্ষায় রাখার পর, নাবিকপ্রবর তাঁর নৌকা নিয়ে বাটে ভিড়লেন। উঁহলুম সকলে নৌকায় একটু কাদা ভেঙ্গে; কারণ মেটে ঘাট, তার জল গিয়েছিল কয়েক। বেলা প্রায় চারটেই কোলাঘাট কোলাহল করতে করতে পায় গেল; পারানি দিতে হ’ল জটা পয়সা। ওপরেই ছিল হু’একখানা লোকান, খড়ের গাদা, ব্যবসাদার জনকয়েকের বাসা আর হু’একটা চাল-কল; এখানে কাণবিলম্ব না করে “পাটকুড়া” পৌছাবার অভিশ্রমে পথ চলতে লাগলুম।

পথেই সন্ধ্যা এসে উত্তীর্ণ হ’য়ে গেল, ক্রমে পল্লী-পথের তরঙ্গজায়া-মসী-খন অন্ধকার বেন গ্রাস করতে ছুটে এল; টর্ন-লাইটের সাহায্যে বাকী পথ চলে, আদ্যক্ষ ৭টা-৮টা এলাম পাটকুড়ার বাজারে। দেখি শীতের প্রকোপে লোকান-বাজার প্রায়ই বন্ধ হ’য়ে গেছে,—ওঁরি মনে একটা দোকান খোলা পাণ্ডায় জিলাপী ও বেঁগুণী জাতীয় কিছু খেয়ে নিয়ে কাছেই অবস্থিত খালের পুলের পারের ডাক-বাংলায় উপস্থিত হ’লুম। এই বলে সেই উল্লেখেরই থাল। মেদিনীপুর পর্যন্ত

গেছে। রেল হ’বার পূর্বে নৌকাযোগে যাত্রীপণ যাওয়া-আসা করতেন। নাবিকগণ ডাকা-ডাকির পর, চৌকীদার দোর গুলেই আমার দেখে সহাস্তে বলল, “আরে বাবু যে, নমস্কার! আশ্রয়ন আহনন।” আমি তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলুম—“তুমি আমার চেন?” সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে উত্তর দিলে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি বই কি; আপনি যে আমার বাবু।” তার কথাব জড়তা লক্ষ্য করে বসলুম, তার ভুলের বখার্ব হেতুটি কি। প্রকাশ্যে বললুম, “দেখ যে, আমি তোমার বাবু নই, পথিক মাত্র, রাতটা থাকতে চাই। হাতে পয়সা নেই যে হুবিধাজনক জায়গা জোপাড় করি; অর্থাৎ এই অতেনা জায়গায়, অন্ধকারে, আশ্রয় আর পুঁজতে পারা যায় না।” কি ভেবে সঙ্গে একটা আলো নিয়ে কাছেই তার মনিব ভক্তারসিয়ারের বাড়ী আমাকে নিয়ে গেল। তাঁকে ওঁতার সন্ধা করে ব’লে রাত কাটাবার অম্মতি পেলাম। তবে কথা রইল যে, সকালেই বেন অজ আশ্রয় দেখি; অকস্মিক কেন্দ্র জলে তাঁর চাকরীর বিপদ অনিবার্য। ধনবাদ ও নমস্কার জানিয়ে ডাক-বাংলায় ফিরে এলাম।

আরাম-চোরে কলণ ও চোরে অস্তরালে “লগা” হ’লেও, সারা দেহের বেদনা, পারের কোথা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জ্বল হুসের ব্যাঘাত ঘটিতে লাগল। শীতের প্রাণাণ ও জায়গার নৃতন হৃদয় তার কতকটা কারণ। সকালে উঠে চৌকীদারের ক্রিয়াজিনিসপত্র রেখে চাপানোতে কাগজ-বন্দী ব্যাপটা সঙ্গে করে ৫ মাইল পথের অন্তে অবস্থিত রঘুনাথ-বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হ’লুম। শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না এবং স্থানিয়ার অভাবে দৌর্বল্যও অস্বস্তি ছিল। পাটকুড়া ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, পাড়ারদেয় পুলিশ, ষোলায় কাপড়-চোপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেল-সাইনের ধারে। মনে পড়ল গরবের অভাবে আমার কথা। তাঁর পেপেটাল ট্রেন, শনিবার থেকে পাহারা দিয়ে, রবিবার যাবার কথা; আজ সোমবার তত্ত্ব দেখা দেই। পাহারা-ওয়ালদের মুখ-চোখ রাত জেগে জেগে শুকিয়ে দিয়েছে।



সময়ে না নেদেরখেয়ে মেজাজও হ'য়ে গেছে কড়া; এক নবীন সাধুবোধধারী রাজকুমার। বেশ ভাল তার গুণর ম্যালেগিয়া-ভোগা দেহগুলিকে প্রচণ্ড শৈত্যের সঙ্গেও যুক্ত হ'য়েছে। পদেপাওয়া অত্যন্ত লোককে পথ জিজ্ঞাসা করলুম, যখন পাহারাদার পুলিশের বিরক্তিতরা "জানি না, বাবু" উত্তর কানে বাজল।

রঘুনাথ-বাড়ীর মোহাৎ শ্রীঅতীতহুজ দাস মহাশয়ের গৃহে এসে নিজের ও বন্ধুর নাম ক'রে পরিচয় দেবার পর ম্যানেজারের সহিত আলাপ হ'ল; ইনি বেশ ভদ্রলোক। এ সব অঞ্চলে তখন নাকি গড়গোল চলছিল ব'লে প্রথমে কে, কোথা হ'তে আসছে, এসব না জেনে ভাল ক'রে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। পরে শুনলুম, লবণ-ভৈরী-করা স্বদেশী ছেলেদের জালায় গ্রামবাসী পর্যন্ত অস্তিত্ব হ'য়ে উঠেছে। তখন মনে পড়ল,—পথে আসতে বিজ্ঞাত মোটর-বাসে, মোট-বাট সমেত, অনেক বিদেশীকে আসতে দেখেছি গ্রামের মধ্যে সরকার পক্ষের ছ'একটা ছোট ছাউনিতে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর প্রসাদ পাওয়ার পর চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখা গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পুকুর, মন্দির, স্থল, লাইব্রেরী, জমিদারী। মোহাৎ মহারাজকেও দেখলুম দুই, ত্রুটিসম্পন্ন,

এক নবীন সাধুবোধধারী রাজকুমার। বেশ ভাল লাগল তার এই "সব-পাওয়া" "সব-ছাড়া" বেশ, ও রাত কাটল আরামে ঘোপের মধ্যে।

এই শান্তিময় স্থানে থেকে দেহের ও মনের শান্তি ফিরে এল এবং দেশ ছাড়ার বিরহও যেন কতকটা জুলে গেলুম।

সকালে উঠে মোহাৎ মহারাজ সকলের তহাফসকানে রত; আমিও তাড়াহুড়ি সকালের কাছ ও চায়ের পালা শেষ ক'রে ৫ টাকা পাণের খাতায় লিখিয়ে নিয়ে রুতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শরীরটাও ভাল বোধ হচ্ছিল—বেদনা যা একটু ছিল তা প্যারে।

বেলা প্রায় ১০ টায় পাটকুড়ার বাজার থেকে আরও কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম বোঝা পিঠে। বাজার, দোকান সবই খোলা এবং ধরিত্রীর ও লোকের বেশ ভরাট ভাব চলেছে। পেছ থেকে একটা কোতুহলী কোলাহলের আগুয়াজ এল অস্পষ্ট স্বর নিয়ে; আমার অসুস্থ পোষাকই বোধ হয় তার কারণ। বড় রাস্তায় এসে, একটু পথ যেতেই এক নদী পড়ল—নাম "কাঁসারাই" বা "কংসারতী"। নদীটা ধামের মত হ'লেও পারাপারের ব্যবস্থা নৌকামোড়েই ঘটল। পারানি লাগল এক পর্যায়ে।

(ক্রমশঃ)

## খেলাধুলায় বাদ্দালী

বাদ্দালী জাতি খেলাধুলায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। মানসিক উন্নতিত বাদ্দালী আজ যেন-স্থান অধিকার করিয়াছে, শারীরিক উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখি। শারীরিক উন্নতি না হইলে খেলাধুলায়ও উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না।

আমরা

‘ভাভ’

বেচারার যাচ্ছেই সকল দোষ চাপাইয়া বলি, ‘ভেতো’ বাদ্দালীর আর কত উন্নতি হবে?’ সত্য বটে, আমাদের খাদ্য শারীরিক অবস্থার জঙ্ক কতক পরিমাণে দায়ী; কিন্তু, আমাদের আরাম প্রিয়তা ও চেষ্টার অভাবও এই অবস্থার জঙ্ক অত্যধিক দায়ী।

স্বথের বিপর্যয়, খাদ্য, ব্যায়াম ও খেলাধুলায় প্রতি বাদ্দালীর আজ নজর পড়িয়াছে। তাই আজ বাদ্দালীরও খাচ্ছে ও ব্যায়ামে পুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় এবং খেলাধুলায় অস্বস্তি ভারতীয় ও বিদেশীয় জাতির সহিত বাদ্দালী প্রতিযোগিতায়

উচ্চস্থান অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। ‘প্রয়াসী’ পরাজিত করেন।

হইয়াছে’ বলিলাম, কারণ অনেকস্থলে বাদ্দালী জয়লাভের চাহাকাছি গিয়াও সফল হইতে পারে নাই। বিগত চাকুরীর বাজারেও খেলোয়াড় হইলে হ্রাশা হয়।



সারদারঞ্জন রায় (এল রায়)

‘ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা’ তাহার একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রতিযোগিতার জঙ্ক একজনও বাদ্দালী নির্বাচিত হয় নাই। গত বৎসর যে ভারতীয় খেলোয়াড়ের দল বিলাতে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও একজনও বাদ্দালীর স্থান হয় নাই। নির্বাচনের

প্রক্রিয়াটি— খেলার তিনজন বাদ্দালীকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারিগণকে দলভুক্ত করা হয় নাই। আন্তর্জাতিক টেনিস-প্রতিযোগিতা Davis Cup খেলায় ভারতীয় দলে বাদ্দালীর স্থান আজও হয় নাই। একমাত্র ফুটবল খেলায় বাদ্দালী বেশ উচ্চ স্থান পাইয়াছে। সম্ভ্রুতি এক দল বাদ্দালী ফুটবল খেলোয়াড় সিংহলে গিয়া তথাকার সমিলিত (ইউরোপীয় ও দেশীয়) ফুটবল দলকে পরাভূত করিয়া উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে একদল বাদ্দালী খেলোয়াড় ব্যবধানে গিয়া তথাকার সকল দলকে

British Medical Journal চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নবমত আবিষ্কারের সুবাদে বিদ্যাহে—

বহুবৎসর গবেষণার পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে শিরঃপীড়া সৃষ্টি করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; Histamine acid Phosphate সামান্য পরিমাণে ভক্ষণ করিলে ২০ সেকেন্ডে মুখে তীব্র কষার বাদ লাগিবে এবং ক্রিয়া আন্তর হইবে। অধিকন্তু বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, গবেষণার কার্য গভীর মনঃসংযোগের সহিত অগ্রসর হইতেছে।



রেল, টেলিগ্রাফ, কাপটনস, পোট কমিনাস প্রভৃতিতে খেলোয়াড়দের চাকুরির সুবিধা ত' আছেই; এমন কি, বড় বড় আপিসেও খেলোয়াড়ের চাকুরির সুবিধা হয়। তাই, চাকুরির এই দুর্দিনে আজ খেলাধুলার প্রতি বাঙ্গালীর আরও অবিক নজর পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর খেলাধুলার কথা মনে করিলেই, এ বিষয়ে বাঁহারী অগ্রগামী এবং উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহাদের কথা সর্বপ্রায়ে মনে পড়ে। সকলের আগে মনে পড়ে, পরলোকগত প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়ের কথা। বেসময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দেশীয় কোন অধ্যাপকের ক্রিকেট বা অল্প কিছু খেলা 'ছেলেমানুষী'—এমন-কি, হাস্যকর ব্যাপারও মনে হইত। তিনিই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া, বহু বৎসরব্যাপী চেষ্টা ও যত্নের ফলে, ক্রিকেট খেলা বাঙ্গালীর মধ্যে—বিশেষতঃ, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজে তিনি ভাল খেলোয়াড় হইয়াই সম্ভব হন নাই; ছাত্রদিগের সহিত খেলায় বোশ দিয়া এবং খেলার কায়দা-কানুন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সর্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন। কলেজের ছাত্রদের জন্ত Harrison Shield ও Lansdowne Shield নামে যে ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা হয়, তাহা ইঁহারই চেষ্টায়। বড় বয়সেও তিনি যুবকের ছায় উৎসাহে ক্রিকেট খেলার

রীতিমত বোশ দিয়াছেন;—এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণেও তিনি নিয়ম-মত খেলিয়াছেন। বিজ্ঞানসার কলেজ তাঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে ক্রিকেট খেলায় অত্যন্ত সকল কলেজকে—এমন কি, বড় বড় ইউরোপীয় ক্রিকেট-দলকে,—পরাক্রান্ত করিয়া কলেজ-সমূহের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

তাঁহাকে "Father of Bengali Cricket" বলা হইত; বাস্তবিকই তিনি তাহাই ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়, পরলোকগত ডাক্তার ডব্লিউ, জি, গ্রেসের সহিত তাঁহার চেঁহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অনেক সাহেব "W. G. of Bengal" নাম দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, অজ্ঞাত কাজ যেমন মন দিয়া সাধনা করিতে হয়, খেলাও সেইরূপ মন দিয়া সাধনা করা আবশ্যক। অল্প কাজে বাধ্য না। দিয়া বা অল্প কাজ ফেলিয়া না রাখিয়া খেলা আবশ্যক এবং খেলাকেও বাদ না দিয়া কাজ করা আবশ্যক। "Mens sana in corpore sano." অর্থাৎ—"স্বস্থ শরীরে স্বস্থ মন"—তাঁহার মধ্যে স্তম্ভিমান ছিল। বাঙ্গালী যদি তাঁহার দৃষ্টান্ত অমূল্যরূপ করিয়া খেলাধুলায় বোশ দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আশাশ্রয় হইবে বলা যায়।



## খুঁ টিনাটি

### দাগ উঠান—

[অভাবের দিনে ব্যবহারের জিনিসের যতও বাড়িলে। কাপড়-চোপড় বা কাছের জিনিষ দাগ প'ড়ে নষ্ট হ'লে দুর্দিনে তাঁর জন্ত আপশোষ হয়ও বেশী। তাই এ বিষয়ের কিছু দ্বিকির জন্য থাকলে এ সময়ে তা' সকলকে বলা দরকার। দাগ উঠাবার কয়েকটি উপায় এবার লিখছি। বলা বাহুল্য, দাগ লাগলে যত শীঘ্রি সম্ভব সে দাগ উঠাবার চেষ্টা কর্তে হয়। দেরি করলে অনেক সময় কৃতকার্য হ'তে পারা যায় না।—অর্থাৎ, দাগটা তখন পাকা রংএর মত স্থায়ী হয়ে যায়। দাগ উঠাবার জন্ত যে-সব জিনিসের আবশ্যক, সব সময় সে-জিনিষ ঘরে থাকে না। কাপড়ে দাগ পড়লে, তৎক্ষণাত্ কাপড়টির উপর জল ঢেলে ধুয়ে ফেলা দরকার। দাগ তখনই অনেকটা হাফা হ'য়ে যায়। তারপর সে দাগ ছুটাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।]

(১) কালীর দাগ—সুতার কাপড়ে পড়লে Oxalic Acid (অক্স্যালিক এসিড) জলে গুলে লাগাতে হবে। আগে Acetic Acid (গ্যাস্ট্রিক এসিড) দিয়ে, পরে Oxalic Acid দিলে আরও ভাল হয়। রেশমী ও পশমী কাপড় থেকেও এই উপায়েই দাগ উঠান যায়।

(২) চা, কফি বা ফলের রস—সুতার কাপড়ে পড়লে, তখনই সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারলে উঠে যায়; না হ'লে একটু সাধারণ 'ব্লিচিং পাউডার' দিয়ে ধুলেও উঠে যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলে কাজ হয়। ফলের রসের দাগ গিলাসিনে ভিজিয়ে সাবান দিয়ে ধুলেও ওঠে।

(৩) রবর ক্যাম্পার বেগুনী কালী—সুতার কাপড়ে পড়লে কষ্টক সাবান জল দিয়ে ধুলে উঠে যায়। দামী কাপড় হ'লে স্পিরিট আর

গ্যামোনিয়া দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। রেশমী বা পশমী কাপড়েও স্পিরিট আর গ্যামোনিয়া দেওয়া যায়।

(৪) চিনির রস, সিরিষ ইত্যাদি—জল দিয়ে ধুয়েই যায়। সিরিষের দাগ গরম জলে সহজেই উঠে যায়।

(৫) গালার দাগ—স্পিরিট দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে উঠে যায়। বেশী বড় দাগ হ'লে ২৪ বার স্পিরিট বুলিয়ে দিলে আশে আশে সবটা গালা স্পিরিটে গুলে যাবে।

(৬) বার্মিশের দাগ—উপরের লেখা উপায়ে বার্মিশের দাগও উঠাতে হয়। বার্মিশ স্পিরিটে-গোলা গালা বৈ আর কিছু নয়।

(৭) রক্তের দাগ—জল দিয়ে ধুয়ে একটু রিচিং পাউডারের জলে ধুলে একটুও দাগ থাকবে না। রেশমী কাপড়ে জল আর সাবান দিলেই হবে।

(৮) আলুকাঁচ রাস দাগ—বেবিন বা পেট্রোল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে। এ কাজটি খুব সাধনানে করতে হবে, কাছে যেন কোন আগুন না থাকে; কারণ এই দুটিই দাহ জিনিষ, অতি সহজে অ'লে ওঠে।

(৯) রং বা এনামেলের দাগ—গ্যাস্ট্রোন, নাইট্রোবেজিন বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দিয়ে ধুলে উঠে যাবে। এই জিনিষগুলি বড় বড় ডাক্তার খানার পাওয়া যেতে পারে। বেশী পুরানো হয়ে গেলে রং-এর দাগ ছুটান দায়।

(১০) কচি ঘাসের দাগ—সাবান আর স্পিরিট মিলিয়ে জল দিয়ে ধুলে উঠে যাবে।

(১১) পোড়া দাগ—বেশী গুড়ে গেলে দাগ যায় না। অল্প-স্বল্প হ'লে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা রিচিং পাউডারে উঠে যায়।



(১২) তেল, বি, মোমের দাগ—পেট্রোল বা বেঞ্জিনে ওঠে। সাদা কাপড়ে বি বা চর্চি জাতীয় জিনিষের দাগ অনেক সময়, কাপড়ের নীচে লুটি কাগজ রেখে ইতিরি করলে উঠে যায়। ইতিরি টানে আর গরমে বি বা চর্চি গলে যায় আর লুটি কাগজে সোটা হয়ে নেয়।

(১৩) ঘামের দাগ—দাগের উপর গ্লিসারিন

লাগিয়ে খটখটানেক রেখে, গরম জলে সাবান গুলে উঠে যায়।

(১৪) ছাঁহালা-ধরা দাগ—হুতার কাপড়ে ছাঁহালা-ধরা দাগ পড়লে কাপড়টিকে মেলে ধরে হুতার ওঁড়ো দাগের উপর ছিটাতে হবে। তারপর, লেবু দিয়ে ঘষতে হবে। কিছুক্ষণ বাদে পুয়ে ফেলতে হবে। আবশ্যক হ'লে ২১৩ বার এরকম করতে হবে।

## বৈশাখ-তুপুর \*

শ্রীলতিকা দে

আকাশ চিরে বরষে আশুন,  
ফিরিয়ে আসে বনের ঝাঁপ।  
শুভ-ফল মাঠের বৃকে  
ঘুরছে কৃষা-কাতর পাখী।  
দূর বনের ঐ ঝামল পাতা  
রোদ্রে রূপার চুমকি-পরা,  
দম্কা হাওয়ায় আসছে ধেরে  
অধি-ধারা দহনভরা।  
আকাশ-গায়ের টুকরা মেখে  
পখিক-চোখে লাগায় ধাঁধা;

ষোপের মাঝে কোন্ গোপনে  
ঘুরে প্রিয়ার কাতর কান্না।  
কুঁড়ের পাশে অশ্ব-ছারে  
ছাগল-শিশু ঘুমায়ে রুখে;  
রাখাল-শিশু বড়ই খুশী  
কচি আমের গন্ধ শুঁকে।  
মৌজ-নেশায় মাতাল ব'শেখ  
রক্ত-ঝাঁখির দৃষ্টি হানে;  
তপ্ত হৃদয় নিখুঁত নীরব,  
মুণ্ডে আছে অরিয়াণে।

\* লেখিকার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

## পথরণ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাঁকড়া জেলার সদর (বাঁকড়া) হইতে প্রায় ছয় কোশ উত্তর-পশ্চিমে “শুভনিয়া” পাহাড়। সমুদ্রতীর হইতে এই পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত ফুট। এই পাহাড়ে বিভিন্ন অক্ষরের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে সর্গপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত যে লিপিতার পাঠোদ্ধার হয়্যাছে, তাহা এই—

- (১) চন্দ্র স্বামিনো দাসাগ্রেনাতিপষ্টঃ
- (২) পুত্রবাধিপতিমহারাজঐসিঙ্হবর্ধনঃ পুত্রজ
- (৩) মহারাজ ঐচন্দ্রবর্ধনঃ কৃতিঃ

পাহাড়ের উত্তরাংশে

হুমি হইতে কিয়দূর উচ্রে পাহাড়ের গায়ে বহু অরক্ষিত একটি চক্র ফোঁদিত আছে; (বুর্গারমান) চক্রের কেন্দ্রে স্থলে (পরিবেশে উদ্ভূত) অল্প অয়িধিখা নির্গত হইতেছে। প্রথম পংক্তি লিপি-চক্রের দক্ষিণ-তাম্বে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি চক্রের নীচে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই লিপির “পুত্রবাধ” এবং তাহার অধিপতি “মহারাজ চন্দ্রবর্ধন”কে লইয়া ঐতিহাসিকগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। সেই গবেষণা সধকে কিছু বলিবার জুই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষির ঐশ্বরক নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, তিনিই সর্গপ্রথম সাধারণের নিকট এই লিপির কথা প্রকাশ করেন। বোধহয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক-সোসাইটির কার্য-বিবরণীতে তাহার লেখা এই বিবদ্যক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

যতদূর স্মরণ হয়, ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় “মহারাজ চন্দ্রবর্ধন” শীর্ষক তাহার লেখা বাঙ্গলা প্রবন্ধও দেখিয়াছি। বহু মহাশয়ের মতে “শুভনিয়ার চন্দ্রবর্ধন এবং দিল্লী লৌহস্তম্ভের চন্দ্র ও এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি-লিখিত চন্দ্রবর্ধন একই ব্যক্তি।”

অতঃপর ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্ণগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অল্পমতি লইয়া রাখালদাস ১৮৭৩ সালের ফাল্গুন-মংখা “প্রবাসী” পরে “শুভনিয়ার পূর্ণতলিপি” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, “মাগবের অন্তর্গত দশপুর—বর্তমান মান্দা-সোরে প্রাপ্ত লিপির সিংহবর্ধন, শুভনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ধনার পিতা

সিঙ্হ বর্ধন হইতে অভিন্ন। শুভনিয়ার চন্দ্রবর্ধনই দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্র, এলাহাবাদে সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি মধ্যে এই চন্দ্রবর্ধন নামই উৎকীর্ণ আছে।” মান্দাসোরে লিপির সিংহবর্ধন পিতার নাম জয়বর্ধন, পুত্রের নাম নরবর্ধন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া গত খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৯ সালের “ইণ্ডিয়ান এ্যাটিকোয়ারী”তে অধ্যাপক - শ্রীযুক্ত রাখাগোবিন্দ বসাক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কোন উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। শাস্ত্রী



গণেশমূর্তি ও অগ্ন্যস্তম্ভের অংশ



মহাশয় অহুমান করিয়াছিলেন, রাজপুতানার বোধপুর রাজ্যস্থিত “পোখরণ” নগরই শুভনিয়া-গিণির পুঙ্খবর্ণা।

আমাদের ধারণা অসঙ্গত। শুভনিয়া-গিণির চন্দ্রবন্দীর সঙ্গে দ্বিতীয় লৌহস্তম্ভের চক্রের অথবা সমুদ্র-স্তম্ভের প্রস্তুতি-লিখিত চন্দ্রবন্দীর কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে বাঁকড়া জেলার “পখরণ”ই শুভনিয়া-গিণির “পুঙ্খবর্ণা”। বহু মহাশয় “বীরভূম-অহুমান-সমিতির” সভাপতি ছিলেন। “বীরভূম-বিবরণ” লগুনকালে শুভনিয়া-গিণির আলোচনা প্রসঙ্গে

বহু মহাশয়কে আমাদের মতের কথা জানাইয়াছিলাম। বালাকাল হইতেই “পখরণা—পাশাভায়া”র (চৌ পাশাপাশি গ্রামের) নাম শুনিয়া আসিতেছি। স্বর্ণগত শাস্ত্রী মহাশয়কে সে কথা নিবেদন করিয়া তাহার নিকট পখরণা



সিংহমুর্ধি ও অস্ত্রাভ্যুদিত মূর্তির ভাষা

পরিদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। নানা কারণে তাহা ঘটয়া উঠে নাই। অতঃপর স্বর্ণীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে শুভনিয়া-গিণি লইয়া আমাদের আলোচনা হয়। ফলে শুভনিয়া দেখিয়া আসিয়া তিনি গত ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা “ভারতবর্ষে” “শুভনিয়া শৈলে” নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি, শাস্ত্রী মহাশয় ও রাথালদাসের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পখরণা না দেখিয়া সাহস করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। পখরণায় যাওয়া ঘটে নাই বলিয়া আমরাও এতাবৎ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই, আমাদের সম্পাদিত গীতগোবিন্দে বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গতঃ পখরণার কথা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। সম্ভ্রুতি চণ্ডীদাস-পদাবলীর সঙ্গান বাপদেশে, পুঁথির সম্মুখে বাঁকড়া ভ্রমণকালে প্রথিতবশা অধ্যাপক বদ্ববর ভট্টর শ্রীকৃষ্ণ

হুনীতিভূমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি পখরণা দেখিয়া আসিয়াছি। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সত্যকবির সাহায্যে মহাশয়ের সৌভাগ্যে শুভনিয়া দেবীবার সৌভাগ্যও ঘটয়াছে। স্বতরাং আমরা এইবার আমাদের মতের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। হুনীতিভূম ইতিমধ্যেই গুহার সংকল্প মত্তবা “বহুশ্রী” দ্বন্দ্ব-সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বলিবার কথা মোটামুটি এইরূপ—

(১) আমরা শুভনিয়ার

সিংহবন্দী ও মান্দাসোরে সিংহবন্দীকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। শুভনিয়ার সিংহবন্দী পুঙ্খবর্ণার অবিপত্তি ছিলেন। মান্দাসোর-লিপিও সিংহবন্দীর পূজ নরবন্দী আপনাদিগকে—

“সিদ্ধম” সহগ্রন্থিগণের তঁহ পুঙ্খবর্ণা মিতাঙ্কনে

চতুস্কলমুদ্র-পূর্ণাঙ্ক-তোর-পিড়ালবোমণম

ক্রীড়াবর্ণণায়াজতে প্রশস্তে কৃত্যস্থিতঃ”

“মাগবর্ণণায়াজতে” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—বোধ-পুরের পোখরণ নগর যে ইহাদের রাজধানী ছিল, মান্দাসোর-লিপিতে তাহার কোন প্রমাণই নাই। সর্বাঙ্গপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই লিপিতে চন্দ্রবন্দীর কোন প্রসঙ্গ নাই। স্বতরাং কে বলিবে যে, মালবের সিংহবন্দীর চন্দ্রবন্দী নামের অপর এক পুত্র ছিল? এই লিপির অষ্টম শ্লোকে—

“বাসুদেব জগদ্ধামপ্রময়মজ্ঞ বিভূম্

মিতকৃত্তান্ত সংকর্তা স্বকুলস্তাণ চন্দ্রমাতঃ

যন্ত বিজ্ঞ চ প্রাণাশ দেব ব্রাহ্মণে সাগতাঃ”

এই যে চন্দ্রমাত উল্লেখ, ইহা হইতে যদি কেহ চন্দ্রবন্দীকে উদ্ধার করিতে চাহেন, আমাদের বলিবার কোন কথা

নাই। মালবের সিংহবন্দীর পুত্র নরবন্দী ৪৩১ বিক্রমাব্দে, ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে, বোধ হয় দশপুরের (মান্দাসোরে) রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুভনিয়ার চন্দ্রবন্দীর পিতা সিংহবন্দী বৈষ্ণব (?) এবং মালবের সিংহবন্দীও বৈষ্ণব ছিলেন, অতএব ইহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মাত্র নাম-সাদৃশ্য ও ধর্ম-সাদৃশ্য দেখিয়াই ঐতিহাসিক ঐক্য স্থিরীকৃত হইবে না। ভারতে বৈষ্ণব-



পখরণার সিংহ-মন্দির

ধর্মের আন্দোলন জীবা-পূর্ণাঙ্গ হইতেই বেশ প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল। মালবের রাজা ভাগভট্টের নিকট সমাগত যনরাজদেব হেজিওদোরসের বৈষ্ণব ধর্মে লীলা ও গুরুভক্তি-প্রতিষ্ঠা (বৈসনগর-লিপি) নানাঘাট ও বোস্তাণ্ডির লিপি, শক সম্রাটগণের বাহুদেব নাম গ্রহণ ও বহু কীর্তি পরিচয় প্রভৃতি নানাবিধ আবিষ্কারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে রাজবন্দীরূপে বৈষ্ণবধর্ম ভারতে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অতএব নামসাদৃশ্য বা ধর্ম-

সাদৃশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা চলিবে না। (২) আমরা দ্বিতী-লৌহস্তম্ভের চন্দ্র এবং শুভনিয়ার চন্দ্রবন্দীকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না।

লৌহস্তম্ভের লিপি এইরূপ—

“যন্তোদয়তঃ প্রতীপমুদয়া শঙ্কন সমতোগতান্ বদেবাবববর্তিনোতিলিখিতা খঞ্জন কীর্ত্তিভূজে তীর্থা সমুদয়নি যেন সমরে সিকোদ্ধিতা ব্যালিকাঃ যন্তাধ্যাপাদিবাভ্যতে জ্ঞানিবিবীর্ঘ্যানিলেদ দিগ্ধা বিমত্তেব বিষ্ণুজাসাং নরপতের্গম্যাত্তত্তেভাং মূর্ত্তা কণ্ঠস্থিতাবনীং গতবতঃ কীর্ত্তাস্থিত্ত দ্বিতো শাস্ত্রেব মহাবনে তত্বভূজো যন্ত প্রতাপো মহান্ নাগাধ্যাপ্যন্তজতি প্রণাশিত রিপোবরন্ত শেবঃ ক্ষিত্ব্ আশ্বেন স্বভূজাভিত্তক স্থচিরঃ চৈকাবিরাজ্যঃ ক্ষিতো চন্দ্রাঙ্কেন সমগ্ৰ চন্দ্র সূদীর্ঘ বজ্রপ্রিয়ঃ বিপ্রতা তেনোয়ঃ প্রণিবার ভূমিপতিনা ধাবেন বিগ্ধো মতিম্ প্রান্তঃ বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিকোশলঃ স্থাপিতঃ”

এই লিপি হইতে ব্রুহিতে পারা যায়, চন্দ্রের মূর্ত্তার পর অপর কাহারো দ্বারা এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই ব্যক্তি যেক্টে আজিও তাহা জানা যায় নাই। এই চন্দ্রের উপনাম “ধাব” ছিল বলিয়া মনে হয়। এই চন্দ্র বঙ্গ জয় পূর্ব্বক সিদ্ধর সমুদ্র পার হইয়া ব্যালিকপলকে পরাভ করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র বিষ্ণুপাদগিরিতে বিষ্ণুর স্কন্ধা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শুভনিয়া-গিণির চন্দ্র নিজেকে পুঙ্খবর্ণাপিত্ত এবং মহারাজ নামে পরিচিত করিয়াছেন। যিনি বঙ্গ হইতে ব্যালিক পশ্যন্ত জয় করিয়াছেন, তিনি কোনও দেশের নামে পরিচয় না দিয়া মাত্র রাজধানীর নামে, মহারাজাধিরাজ, পরম ভট্টারক ইত্যাদি না লিখিয়া মাত্র “মহারাজ”—এই পদবীতে কেন নিজের পরিচয় দিবেন, কেহ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। বিষ্ণুপাদগিরি বলিতে গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দির যেখানে অবস্থিত সেই স্থানকেই বুঝায়। শুভনিয়া কোনও বিষ্ণুপাদগিরি নামে পরিচিত ছিল না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, লৌহস্তম্ভটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত



আছে, ঐ স্থানেই বিষ্ণুপাদগিরি নামে পরিচিত, শুভট চন্দ্রবর্ষে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে শুভনিয়ার চন্দ্রের স্বর্ণযোহনের পর কে দিল্লীতে এই লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহারও ত' একটি পরিচয় চাই। কিন্তু সে কথাও কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের মতে লৌহস্তম্ভের চন্দ্র গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাহার মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্তের আদেশে পিতার স্থতি-স্তম্ভে এই স্বারক-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে বিস্তারিত বঙ্গ-জয়ের উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকগণ অস্বাভাবিক করেন, সমুদ্রগুপ্ত পিতামাতার স্মরণার্থ মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বতন্ত্রা পিতার স্থতি রক্ষার্থ দিল্লীর লৌহস্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করানোর অস্বাভাবিকতাও বোধ হয় চলিতে পারে। শুভনিয়ার চন্দ্রবর্ষা বৈকব (?) এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্রও বৈকব (?)। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে ইতিহাসের কিছু যায় আসে না।

(৩) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির চন্দ্রবর্ষা এবং শুভনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ষা যে একই ব্যক্তি, জোর করিয়া তাহা বলা চলে না।



জিন-বুদ্ধি-চতুরঙ্গ-মুক্ত গুপ্তাকার শিলা

সমুদ্রগুপ্ত আঘ্যাবর্ডের যে কল্পজন রাজাকে পরাজিত করেন—তাহাদের মধ্যে রুদ্রদেব, মতি, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ষা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী ও বলবর্ধার নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণগত শাস্ত্রী মহাশয় প্রকৃতির মতে প্রশস্তিলিখিত উক্ত চন্দ্রবর্ষা ও শুভনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ষা অভিন্ন। কিন্তু ভারতের পূর্বে প্রাপ্তে অবস্থিত রাষ্ট্রের বনময় প্রদেশস্থিত পুরুবীর মহারাজ চন্দ্রবর্ষা কি আঘ্যাবর্ডের রাজত্ব-তালিকার স্থান পাইবার যোগ্য? আঘ্যাবর্ড বলিতে সাধারণতঃ উত্তর-ভারতই বুঝায়। অতি পূর্বকালে রাষ্ট্রসেন হুম্ম বেন নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে ইহার উত্তরাংশ কক্কতুলি ও দক্ষিণাংশ বর্ডমান-চুক্তিগণের আখ্যাত হইত। একদিকে রুদ্রদেব, মতি ও নাগদত্ত এবং অপরদিকে গণপতিনাগ, নাগসেন,

অচ্যুতনন্দী ও বলবর্ধার রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান নিখীত হইলে প্রশস্তির চন্দ্রবর্ধার অবিধান-ভূমির সন্ধান মিলিতে পারে। আঘ্যাবর্ড বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশের রাজ্যগণকে জয় করিয়াছিলেন। এই আটবিক ভূমির মধ্যে রাষ্ট্রের সংস্থিতি ধরিয়া লওয়া চলে। দাক্ষিণাত্য-সভিমানেব পথে সমুদ্রগুপ্ত যে ছেইজন আটবিক ভূমিপতিগণকে জয় করিয়াছিলেন তাহাদের একজন দক্ষিণ-কোশল-পতি

মহেন্দ্র, অজ্ঞান মহাকায়ারপতি বায়্যরাজ। মধ্য ও উত্তরাংশ মণেই ইহাদের রাজ্য ছিল। এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে সীমান্ত নরপতিগণ সমস্ত (পূর্ববর্ড), ডবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্ণপুরের রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলাচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, বঙ্গ-কলিঙ্গাদির সঙ্গে রাষ্ট্র দেশ ও গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানে গুপ্তরাজাদের মুদ্রা ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়

ইহা ইতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। সে সময় রাষ্ট্রদেশে এমন কোন প্রবল-প্রভাপ নরপতি ছিলেন না, যিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের কবল হইতে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি পুরুবীরপতি চন্দ্রবর্ধাই যে সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির



পথরণা গ্রামে খৃষ্টাব্দ (বা গাংকু-খ্যাম) মূলের সমগ্রী মূর্তি

চন্দ্রবর্ষা, একথা বলিবার মত ঐতিহাসিক প্রমাণ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৪) আমাদের মতে শুভনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ষা হইতি গ্রাম,—অথবা “পথরণা-পলাশাডালা” নামে পরিচিত। পথরণা সমুদ্র পল্লী। পলাশাডালায় একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ডাকঘর আছে। পথরণা গ্রামের প্রান্তস্থিত একটা উচ্চ ভূমিও

প্রশস্তির অক্ষর, দিল্লী-লৌহস্তম্ভলিপির অক্ষর এবং শুভনিয়া পাহাড়ের লিপির অক্ষর প্রায় একই প্রকার। অতএব শুভনিয়ার চন্দ্রবর্ষা গুপ্তরাজাদের সময়ে বর্তমান ছিলেন। এই অস্বাভাবিক সমর্থনযোগ্য। তবে শুভনিয়ার চন্দ্রবর্ষা যে সমুদ্রগুপ্তের সময়েই বর্তমান ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। গুপ্ত-সম্রাটগণের “উপরিচ” গণ মহারাজ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। আমাদের মনে হয়, গুপ্তসম্রাটগণ এই দেশ জয় করিয়া দেশের শাসন-সৌকর্যার্থ দে-সমস্ত “উপরিচ” পদবীভুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চন্দ্রবর্ষা তাহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি কোন্ সম্রাটের অধীনে “উপরিচ” নিযুক্ত হইয়াছিলেন, জানা যায় না। তবে গুপ্ত আমলের অক্ষর দেখিয়া অস্বাভাবিক হয়, দেশ বর্ডন মুশাসিত হইয়াছিল, মণবের শিলা, দীক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম এদেশে বর্ডন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, চন্দ্রবর্ষা সেই কালের লোক। ৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (খোপ্তাদ ১২৪) রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত গঙ্গার উত্তর তীরে পুণ্ড্রবর্ডন-চুক্তিতে মহারাজাবিরাজ কুমারগুপ্তের অধীনে যে “উপরিচ” ছিলেন, তাহার নাম চিত্রাদত্ত। এই চিত্রাদত্ত বর্তমান বরেন্দ্রের উত্তরাংশ কোটাধিবর্ডন-বিষয়ে কুমারামাতা বেজবর্ধাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়, এদেশে সে সময় বর্ষা উপাধিধারী শাসনকর্তার অপভ্রুততা ছিল না। যদি আমাদের অস্বাভাবিক সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে পারি চন্দ্রবর্ষা জীবীর চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। শুভনিয়া পাহাড়ের প্রায় ১২ কোশ পূর্বে পথরণা গ্রাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে রাজবাহ ষ্টেশনের দক্ষিণে দামোদরের দক্ষিণ তীরে পাশাপাশি হইতি গ্রাম,—অথবা “পথরণা-পলাশাডালা” নামে পরিচিত। পথরণা সমুদ্র পল্লী। পলাশাডালায় একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ডাকঘর আছে। পথরণা গ্রামের প্রান্তস্থিত একটা উচ্চ ভূমিও



আজিও “গড়ের-ভাঙ্গা” নামে পরিচিত। ভাঙ্গার উপরে কয়েক ঘর বাড়ীর বাস, ইহাদিগকে শোকে গড়ের বাড়ী বলে। ভাঙ্গার একদিকে এখন কতগুলি ঘর মূলনাম বাস করে, তাহারই কাছাকাছি খানিকটা হান রাজবাড়ী নামে পরিচিত। বিশাখ পরিষা মজিয়া গিয়াছে, তাহারই কিয়দংশে মাঝে মাঝে বাঘ দিবা সোকে পুত্রিণী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। তথাপি সেগুলি দেখিয়া পরিখার লুপ্তাবশেষ বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। পথরপায় প্রবাদ আছে, এখানে বহু পূর্বে একজন রাজা ছিলেন। প্রায় বিপ পচিশ বৎসর পূর্বে পরিখার কিয়দংশের (বর্তমানে পুত্রিণী) পক্ষোদ্ধার কালে চৌ বাচ্চা বা আকারে সাজানো কতগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তরগুলি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। সেগুলি কোন মন্দির বা গৃহের অংশবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।



পথরপায় গ্রাণ্ড গুপ্তযুগের সিংহ-বাহিনী দেবী মূর্তি

গ্রামের বাহাসিদ্ধি ধর্মরাজতলায়, মনসাতলায় এবং অপর দুই একটি গ্রাম-দেবতার বেদীর উপর আমরা কয়েকটা মূর্তি দেখিয়া আসিয়াছি। তন্মধ্যে একটি গণেশ-মূর্তি, একটি হৃৎ-মূর্তির ভগাংশ, একটি বাহুবল-মূর্তির পাদশিষ্ট ও ভয় হত ইত্যাদি, একটি জৈন তীর্থঙ্কর বা বুদ্ধমূর্তি, নাগকণ্ডাভে উপবিষ্টা কোন দেবীর ভয়মূর্তি, একটি সিংহমূর্তি ও একটি অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এতদ্বিধা অনেকটা চোতার আকারে গঠিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের চারিদিকে চারিটা দাননিরত উপবিষ্ট মূর্তি—ইহা প্রত্যেক মূর্তির নিম্নে ছইপার্শ্বে ছইটা করিয়া সিংহ—ইহা জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি, অথবা বুদ্ধমূর্তিও হইতে পারে।

মূর্তিগুলি প্রাচীন, তবে কত প্রাচীন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তিটা পাল-রাজত্বের শেষের দিকের অথবা সেন-রাজত্বের প্রথম আমলের বলিয়া মনে হয়। অপরপাশ ভয়মূর্তিগুলি দেখিয়া কাগ-নির্গম হয় কিনা দন্দেহ। পথরপা হইতে তিনটা মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে, (১) একটি পোড়ামাটির নারীমূর্তি; শ্রীকৃষ্ণ হুণীতিভুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটা কুশাণ-যুগের, এমন কি তৎপূর্ব কালেরও হইতে পারে। (২) একটি সিংহবাহিনীর কুম্ভ প্রস্তরমূর্তি, নারী সিংহের উপর উপবিষ্টা, বামকোড়ে একটি শিশু। বাম পার্শ্বে আরো দুইটা মূর্তি। হুণীতি-বাবু বলেন, এটা গুপ্ত যুগের। শুনিলাম, ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ রমাপ্রসাদ চন্দ এবং বিদ্যুৎ ঠেলা জামুনি প্রভৃতিও নাকি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। (৩) একটি বাগীন্দ্রী মূর্তি। এই মূর্তি চতুর্ভুজা। দক্ষিণ উচ্চহস্তে স্বধাপূর্ণ কলস, বাম

কিংবা একটি কামণ, বাম উচ্চহস্তে পুস্তক, এবং অপর দুই হস্তে বীণা। এই মূর্তিটা কোন যুগের, হুণীতিবাবু অথবা অপর এমনও ঠিকমত ধরিতে পারিতেছেন না, তবে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কুম্ভ মূর্তির ভগাংশ দেখিয়া যুগ নির্ণয় বিশেষজ্ঞগণেরই সাধ্যায়ত্ত। তথাপি একথা বলা চলে যে, হাণ্ডতা বা ভাণ্ডার্যের কোন বিশিষ্ট রীতির অঙ্কনের বহু দিন দুরিয়া চলিতে থাকে। এমনকি একস্থানে কোন শৈলী যখন ধ্বংসমুখে আসিয়া পৌছিয়াছে, অন্যস্থানে তখন সেই শৈলীরই হয়ত প্রথম অঙ্কনর যুগ হইতেছে, একগুণ্ড ঘটয়া থাকে। রাজা চলিয়া গেলে, সমুচ্চ জন্মদগ ধ্বংস হইয়া সেগ, বিপর্যস্ত দেবদ্র অধিবাসিগণ ভাণ্ডার্যে দিকার দিয়া পুরাতন রীতি-নীতি

আঁকড়াইয়া বাস্তব মাটির কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যুগের পর যুগ বহিয়া গেল, তাহাদের অবস্থা কিরিল না, তাহারা নূতনকে গ্রহণ করিতে পারিল না, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার পরবর্তী কেহ আসিয়া পুরাতনের আদর করিয়াছে, ভবৎ পুরাতনরই



পথরপায় গ্রাণ্ড সর্বস্বতী মূর্তি

পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে, এমনও দেখা গিয়াছে। স্তম্ভরাজ্য একগুণ্ড ভগাংশ দেখিয়া কোন বিশেষ যুগ নির্ণয় কতখানি নিরাপদ বলিতে পারি না। বড় জোর এই কথা বলা চলে যে, এই মূর্তি এই যুগের ভাণ্ডার্যের রীতিতে গঠিত।

পথরপায় যে মূর্তিগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, এবং যে

মূর্তি তিনটা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি কতদিন পূর্বে কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অথবা কেহ অজ্ঞ কোন স্থান হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, স্থানীয় লোকে তাহার কোন সংবাদ বলিতে পারেন না। সংগৃহীত মূর্তি তিনটা মাটির উপরই গ্রাম-দেবতার বেদীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পোড়ামাটির নারীমূর্তি ও চতুর্ভুজা বাগীন্দ্রী বাগ দ্বীপ-পাড়ার মনসাতলায় এবং সিংহবাহিনী মূর্তি বাহাসিদ্ধি ধর্মরাজতলায় ছিল। এই দুই স্থানেই আরো ভয়মূর্তি ও প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। আমাদের মনে হয়, এগুলি পথরপা বা আশ-পাশের গ্রাম হইতেই সংগৃহীত। নানা কারণে অহমান করিতে হয় যে, চক্রবর্তীর পরবর্তী কালে পাল এবং সেন রাজাদের সময়েও পথরপা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। শুভনিয়া পাহাড়ে অপর যে কয়েকটা কুম্ভ লিপি আছে, সেগুলির পাঠোদ্ধার হইলে অনেক রহস্যের সন্ধান মিলািতে পারে। এদিকে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পথরপার দক্ষিণে “চাঁদাই” গ্রাম। “সিগাই” নামে একটি জননাথী (জোড়) ও “চাঁকাই” গ্রামের নামাঙ্কনের হুণীতিবাবু “চক্রাবর্তী”, “সিংহাবর্তী”, এবং “চক্রাবর্তী” সম্ভাবনায় অহমান করিয়াছেন—চক্রবর্তী, সিংহবর্তী এবং চক্রবর্তীর মূর্তি উভারাই রক্ষা করিতেছে, এইরূপই তাহার অহমান। পথরপার আদ কোশের মধ্যেই চক্রাবর্তী ও সিংহাবর্তীর স্থিতি। সিগাই আবার গ্রামও নয়, গ্রামের জন-নিকাশের বড় নালা। রাজধানীর মধ্যেই তাহা হইলে সিংহাবর্তী ও চক্রাবর্তী ছইটা পাড়া ছিল, স্বীকার করিতে হয়। চক্রাবর্তীতে চক্রবর্তীর মন্দির থাকিলে শুভনিয়ায় তাহার জন্ম শিলা-লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন হইয়াছিল, ভাবিবার বিষয়। গ্রাম উৎসর্গের প্রাচীন রীতি ত’ একগুণ্ড ছিল না। লিপিতে কোন বিষয়গতি, বা পুতপাল, বা শ্রেষ্ঠ, বা কুলিক বা কায়স্থ প্রভৃতি কুটুম্বগণকে কোন সম্বোধন নাই। হুতরাজ এই সমস্ত অহমানের সমর্থনযোগ্য আরো প্রমাণ চাই।

(৪) আমাদের মতে চক্রবর্তী বিষ্ণুর নাম



নহে, এবং লিপিতে কোন গ্রাম উৎসর্গের কথা নাই।

প্রয়াসকান বিভাগের অত্যন্ত অধ্যাক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দ্বিতীয় মহাশয় “চক্র-বামিনে ঘোষগ্রামোতি স্তম্ভঃ”—লিপির একাংশের এইরূপ পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন। “ঘোষ”গ্রাম শুভনিয়ার নিকটে পাওয়া যায় নাই। চক্কাই, সিঙ্গাই, চাড়াই বাঁটিয়া থাকিলে তাহারও থাকা উচিত ছিল। আমাদের মনে হয় শুভনিয়ার যে অংশে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পূর্বে সেই স্থানে একটি গুহা ছিল, এবং সেই গুহা বা উক্ত স্থানটী চক্রবামী নামক কোন সাধুকে উৎসর্গ হইয়াছিল। এই সাধু হয়ত চক্রবামীর গুরু বা গুরুস্থানীয় ছিলেন। বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে অথবা কোন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতে বিষ্ণুর “চক্রবামী” নাম পাওয়া যায় না।

দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বৃণ্ডেশ্বরের দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে “কোকাব্রহ্ম স্বামী” ও “শেতবরাহ স্বামী” দেবতাদের নাম পাওয়া যায়। এই লিপির কাল আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ৫ম শতকের শেষ ভাগ। এই দুই দেবতার “মন্দির পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটীবর্ধ-বিষয়ের অন্তর্গত “হিমবল্লব” নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রাবিরাজ ভাষ্করেশ্বরের রাজ্যকালে (খ্রীষ্টাব্দ ৫০৩-০৪ অব্দে) শেতবরাহস্বামীর মন্দির পুনঃসংস্কৃত হয়। শেতবরাহ নাম পুরাণে পাওয়া যায়। “কোকাব্রহ্ম” শব্দের অর্থ কি? কামনাশয়ের অপর নাম কোকশাণার। কোকাব্রহ্ম কামদেব, কি বিষ্ণু, কি অপর কেহ—পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। এই দুইটি নাম দেখিয়া চক্রবামী যে বিষ্ণুর অপর নাম হইতে পারে না, ভ্রমের করিয়া একথাও বলিতে পারি না।

তবে সেকালে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বামীযুক্ত নাম অনেক পাইতেছি। দ্বিতীয় চক্রেশ্বরের মন্দির নাম ছিল শিবরস্বামী। প্রথম কুমারগুপ্ত বরাহস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ধর্মাদিত্যের তাম্রলিপিতে গোপালস্বামী, বাহুদেব-

স্বামী ও সোমস্বামী নাম পাওয়া যায়। গোপালস্বামী শাসনকর্ত্তা, বাহুদেবস্বামী ভূমিদাতা, এবং সোমস্বামী ব্রাহ্মণের পরিচয় পাই। গোপালেশ্বরের তাম্রলিপিতে শাসনকর্ত্তা বৎসপালস্বামী ব্রাহ্মণ ভট্টগোমীদত্ত স্বামীকে ভূমি দান করিয়াছেন। সমাচারদেবের তাম্রশাসনে স্বপ্রতীকস্বামীর নাম পাওয়া যায়। চক্রস্বামী এইরূপ কোন ব্যক্তির নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। উৎকীর্ণ চক্রটিকে দেখিয়া বিষ্ণুচক্র বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অহমান, চক্রবর্ত্তা অথবা চক্রস্বামী অথবা দুইজনেই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; চক্রটী তাহারই প্রতীকস্বরূপ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা “রাজমুদ্রার” মত ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়।

বীরভূমের সীমান্তে মূর্শিবাদন জেলায় “গোকর্ণ” নামে একটি স্থান আছে। লোকের এখানে বলে, “গোকর্ণে কে কার কড়ি ধারে।” এইরূপ পথরংগর নামও “গোকর্ণ” ছিল বলিয়া সম্ভব হয়। গোকর্ণ সংস্কৃত রূপ ধরিয়া পুরণা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে “বোধীমণ্ডর”, “এরঙপল,” “কুশলপুর” প্রভৃতি নাম দেখিয়া মনে হয়, সেকালেও রাজধানীর নামে (কুশল জুহ?) রাজাদের পরিচয় দেওয়া রীতি ছিল। স্বতরাং চক্রবর্ত্তা আপনাকে “পুরুষাবিপত্তি” নামে পরিচিত করিয়া কাল ও ধর্মের রীতি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে রচিত সঙ্গাকরনন্দীর রামচরিতে এইরূপ নগরপুরের নামে পরিচিত সামন্তরাজ্যপের সাফাং পাই। পরংগার সীমানা খুব বড় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শুভনিয়া শৈলের সমুদ্রতীরে, বাঁকুড়া হইতে আসিবার পথের ডাহিনে একটা ঋণা আছে। প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই ঋণার পাশে একটী মেলা বসে। এই স্থানের একটা মূর্ত্তিকে লোকের নরসিংহ মূর্ত্তি বলে। একসং প্রস্তরের উপরে একটা সিংহের প্রতিমূর্ত্তি। নাচে অসংখ্য সৈনিক বা সেনাপতির

সমূহে একজন লোক পথ দেখাইয়া চলিতেছে, অথচ ইতিহাস না হইলে চলিবে না। নিজেই চিনিতে পশ্চাতে একজন ছত্রধারী, অসংখ্য মূর্ত্তির মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। স্থানীতিবাসু বলেন, এই ধরনের মূর্ত্তির নাম “বীরজন্ম”। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রচুর আছে। যুদ্ধে কোন সৈনিক বা সেনানী নিহত হইলে এদেশে সেকালে এই ধরনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্থতি রক্ষা করা হইত। ছাত্রনায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এইরূপ মূর্ত্তি কয়েকটাই দেখিয়া চালের রাজ-অভিযানের স্থতি রক্ষা করিতেছে? বাঙ্গালার ইতিহাস আশ্চিও লিখিত হয় নাই।

অথচ ইতিহাস না হইলে চলিবে না। নিজেই চিনিতে পশ্চাতে একজন ছত্রধারী, অসংখ্য মূর্ত্তির মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। স্থানীতিবাসু বলেন, এই ধরনের মূর্ত্তির নাম “বীরজন্ম”। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রচুর আছে। যুদ্ধে কোন সৈনিক বা সেনানী নিহত হইলে এদেশে সেকালে এই ধরনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্থতি রক্ষা করা হইত। ছাত্রনায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এইরূপ মূর্ত্তি কয়েকটাই দেখিয়া চালের রাজ-অভিযানের স্থতি রক্ষা করিতেছে? বাঙ্গালার ইতিহাস আশ্চিও লিখিত হয় নাই।

“আপনি খাইব, সুখ হইবে আর একজনের; আপনি পরিব, তৃপ্ত হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর এক-জনের ভাবী হিতসাধন হইবে; এই ভাবটি বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ-সংস্কারের কার্য্য। বিবাহ দ্বারা স্বার্থবৃদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এইজন্মই বিবাহ অতি প্রধান ‘সংস্কার’।”

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়



ভবভূতি যে সভ্যসভাই বহু পাগল হইয়া গিয়াছে, সে কথা বৃত্তিতে কাহারও বিশেষ দেরী হইল না। কিন্তু সূর্যনাশ, এত বড় একটা বিরাট সমস্যার একমাত্র কর্ণধার ঐ ভবভূতি, —অতগুলি লোকের মুখে তাহাকেই হু'বেলা আর জোগায়েতে হয়, অথচ সেই কিনা আজ উন্মাদ হইয়া গেল। এমন বিধাতার বিধান।

কিন্তু উন্মাদ সে হইল কেন? হৃৎ, প্রিয়দর্শন যুবক, এই সেদিনও তাহাকে হাসিয়া কথা বলিতে দেখিয়াছি, বিপদের সময় তাহারই পরামর্শ চাহিয়াছি, কিছুদিন আগেও যাহাকে আমাদের গ্রামের পৌরব বলিয়া মনে হইত, আজ আর তাহার কাছে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই, বড় বলিয়া আগের মত তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে সে আর চিনিতেই পারে না। কে-ই বা তাহার বন্ধ, আর কে-ই বা আত্মীয়, কে-ই বা স্ত্রী, আর কে-ই বা কন্যা! এই দু'দিন আগে যাহারা ছিল, তার সর্গাপেক্ষা প্রিয়, এখন আর যেন তাহাদের সঙ্গে ভবভূতির কোনও সম্বন্ধই নাই, সে যেন তাহার বাস করিবার মত একটা পৃথক জগৎ মনে-মনে তৈরি করিয়া লইয়াছে; সেখানে কে যে তাহার সাথী আর কে যে প্রিয়—কে জানে। ভব মনে হয় দিবারাজি তাহাদেরই সঙ্গে সে যেন বিড়-বিড় করিয়া কথা বলিতেছে। ডাকিলে সাড়া দেয় না, ডাকিলেও চীৎকার করে।

ভবভূতিকে দেখিলে চোখ কাটিয়া জল আসে। ডাক্তারকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কেন এমন হ'ল বস্তু দেখি?'

ডাক্তার তাহাদের বংশের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, 'ওদের বংশে কেউ কোনদিন পাগল ছিল কি?'

ছিল না আমি জানি। বলিলাম, 'না!'

তাহার পর ভবভূতিকে তিনি একদিন নিজে দেখিয়া গেলেন।

ডাক্তারকে সে বেশ ভালই চিনিত, কিন্তু সেদিন আর তাহাকে সে চিনিতে পারিল না। ডাক্তার তাহার কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ভবভূতি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বেরোও! হুপিড, পাঞ্জি কাংকা! টাকা! টাকা! আমি বৃষ্টি টাকার পাছ? টাকা যদি আমার কাছে না থাকে ত' তোর বাবার কি রে—!'

এই বলিয়া সে আপন মনেই বিড়-বিড় করিয়া কি যেন বলিতে বলিতে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলছ, ভবভূতি?' ভবভূতি প্রথমে সাড়া দিল না। তাহার পর অনেক ডাকাডাকির পর সে মুখ তুলিয়া চাহিল। চাহিয়াই হাত নাড়িয়া হর করিয়া গান ধরিল—

'দিন ছুরালো আজিকে আমার ব্যালু বান্দন-সাঁথে।'  
এবং তাহার পরের গাইন হইল—

'অলপ বয়সে পীরিত করিয়া রহিতে নারিছ ঘরে।'  
এমনি সব ভবভূতির অনেক কাণ্ডকারখানা ডাক্তারবাবু স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিয়া আমার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যদি দয়া ক'রে একটি কাজ করতে পারেন ত' ভাল হয়।'

বলিলাম, 'কি কাজ বলুন।'  
ডাক্তারবাবু তাহার জীবনের সমস্ত স্মৃতি জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, 'আগামোড়া একটি কাগজে যদি আমার লিখ দিতে পারেন ত' কেসটা একবার ঠাট্টা করতে পারি।'

বলিলাম, 'ওকে সারিয়ে দিন, ডাক্তারবাবু, নইলে ওর সঙ্গরে এই এতগুলি মাহুৎ—'

কথাটা ডাক্তারবাবু আমাকে আর শেষ করিতে দিলেন না, বলিলেন, 'পুকেছি।'

ডাক্তারের কথায় আশ্রয় হইয়া ভবভূতির জীবনী আমি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কোনও কাজে লাগিল না। লেখাটা ডাক্তারবাবু পড়িয়া আমার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'রাবিশ', এসব সাহিত্য কবুত তোমার কে বলেছিল, 'হে ছোদুরা? আমি বা চেয়েছিলাম, এ তা' নয়।'

কি যে তিনি চাহিয়াছিলেন, বুঝিলাম না। আবার যে নুতন করিয়া লিখিব তাহারও অবসর আর নাই। ভবভূতির পাগলামি আরও বাড়িয়াছে। সমসার ত' একরকম অচল বলিলে হয়।

ভবভূতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে তুলিয়া দিলাম। উহা ত' কাহারও কোন কাজে লাগে নাই, সুতরাং সাহিত্যের কাজে লাগিতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ভবভূতিক বাল্যকালে আমরা তুতি বলিয়াই ডাকিতাম। এখন তাহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, কিন্তু নাম তাহার সেই তুতি রহিয়া গিয়াছে।

তুতির জীবনের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানা উপভাস হইয়া পড়িবে, কাজেই সে-চেটা আমি করিব না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার জীবনের কথা বলিতে চাই।

তুতির বয়স এখন পনেরো-ষোলো, তখনকার কথাই বলি। তুতি তখন ইষ্টুলে পড়ে। গ্রাম হইতে ইষ্টুল প্রায় মাইল-দুইএর পথ। সকলে মিলিয়া হাঁটাই বাই, হাঁটাই আসি। ইষ্টুলে বাইবার আগে তুতিকে এক-একদিন ডাকিতে

বাইতাম; সেদিনও গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, তুতি তাহাদের সদর দরজার কাছটিতে বই-খাতা হাতে লইয়া রানমুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঘরের ভিতরে মা তাহার চীৎকার করিতেছেন। আমি বাইবামাত্র তুতি বলিল, 'চলু।' বলিয়াই সে আমার সঙ্গে বাইর হইয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খেয়েছিলু?'  
তুতি বোধ হয় হ'ল! বলিতেই বাইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলে সেহাং মিথ্যা। বলা হয় বলিয়াই বোধ করি বলিল, 'না।'

ক্ষিরিতে আমাদের সন্ধ্যা হয়। বলিলাম, 'সে কি রে! সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকবি?'  
যাণ্যারটা যেন কিছুই নয় এমনভাবে তুতি বলিল, 'তাকে কি হয়েছে! রোজই ত' আমি এসে খাই।'

'কেন? সকাল-সকাল রান্না হয় না. বৃষ্টি?'  
তুতি কথা বড় কম বলে। সন্ত দিন হইলে হয়ত চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন তাহার কি হইয়াছিল কে জানে, কথা বলিল। দৈব হাসিয়া বলিল, 'আজ আমাদের এখনও রান্নাই চড়েনি। ঘরে চাল নেই।'

অবশ্য তাহাদের ভাল নয় জানি, কিন্তু তাই বলিয়া রান্না চড়ে না, সেকথা করনাও করিতে পারি নাই। শুনিয়া হুংব হইল। তাহালা, আমাদের বাড়ী লইয়া গিয়া তুতিকে খাওয়াই। কিন্তু তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতেই চিনি। জানি, সে বাইবে না। কাজেই হুজুনে নীরবেই পথ চলিতে লাগিলাম। থানিক পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোরা না বৃষ্টি ঐজুতেই ঝগড়া করছিল?'

মা অর্থাৎ তুতির বিমাতা। তাহার মা নাই। কথাটাকে তুতি উড়াইয়া দিল। বলিল, 'না, ও কিছু নয়, সেজন্ত কেন হবে? ও—এমনি।'  
বাই হোক, বুঝিলাম—বলিতে সে চায় না। আগমাকে ঝাঁপটি ফেলিয়া রাখিয়া ইষ্টুলে বাইবার জন্ত মাঠের উপর গিয়া যে লোভা রাস্তাটা আমরা



আবিকার করিয়াছিল। সবেমাত্র তখন আমরা সেই মেঠো পথ ধরিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে ডাক শুনিলাম, 'হুতোদা! হুতোদা!'

হু'জনেই পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, হুতির বৈমাত্রেয় ভাইটা ছুটিতে ছুটিতে আমাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ছেলোটার নাম নিরঞ্জন। কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা তোমায় ডাকছে, হুতোদা!'

হুতি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'  
নিরঞ্জন বলিল, 'তা আমি কি জানি! আসবে ত' এমো, না আসবে ত' বলে সিঁছি—এমো না।'  
হুতি আমার মুখের পানে তাকাইল। তাকাইবার অর্থ—তুই আজ একাই ইষ্টুলে যা, আমার ফিরিতেই হবে।

বলিলাম, 'চলু তবে আজ আমারও গিয়ে কাজ নেই। বাউই ফিরে যাই।'

হু'জনেই ফিরিলাম।  
হুতি একটুখানি তাড়াতাড়ি আগে-আগে চলিতেছিল, তাহার পর নিরঞ্জন, তাহার পর আমি। স্বয়ংগ বুদ্ধিয়া নিরঞ্জনকে ডাকিলাম, 'শোন!'

'কি?'  
'হুতিকে শুধু দাদা বলতে পারি নু? 'হুতোদা' 'হুতোদা' কি?'

নিরঞ্জন বলিল, 'বা-রে! এ ত' ওর নাম।'  
'দাদাকে বুঁচি নাম ধরে ডাকতে হয়?'  
'কি বলব?'  
'শুধু 'দাদা' বলবি। 'হুতোদা' আবার বলে নাকি? হি!'

নিরঞ্জন বলিল, 'আজ্ঞে বেশ মশাই, তাই হবে।'  
ছেলেটি পাকা শরতান। হুতির ভাই বলিয়া মনে হয় না। নিরঞ্জনকে তিনি। হুতরায় বিধিত হইবার কিছুই নাই। তবু কাছে পাইয়া মাথায় তাহার ঠাসু করিয়া একটা চড় মারিয়া বলিলাম।

নিরঞ্জন একবার 'উং' বলিয়াই আমার মুখের পানে

তাকাইয়া বলিল, 'হু' দিয়ে দাও, নইলে চুল উঠে যাবে।'

খানিক দূর গিয়া ভাল করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁরে নৌক, তোর বাবা ওকে কিজন্তে ডাকছে রে?'

হুতি তখন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল। নিরঞ্জন আমাকে সব কথাই বলিয়া বলিল। 'হু' তিন মাস ধরিয়া হুতির ইষ্টুলের বেতন দেওয়া হয় নাই। গত কয়েক দিন হইতে হুতি তাহার বাবাকে সেই কথাই বলিতেছিল। আজ বলিয়াছিল, বেতন না দিলে সে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। অথচ তাহার বাবার হাতে টাকা নাই। হুতরায় মা তাহার বাবাকে একটা খুব ভাল বুদ্ধি শিখাইয়া দিয়াছে। এই মাসেই হুতির বিবাহ দিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইষ্টুলের খাবারটা খরচ আর তাহাদের দিতে হইবে না, হুতির খরচ দিবে। তাই তাহার বাবা হুতিকে ডাকিয়া 'পাঠাইলেন। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আর ইষ্টুল বাইতে হইবে না।

হাত নাড়িয়া চোখের ইসারা করিয়া কথটা আমাকে নিরঞ্জন বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু সেইখানেই বলা তাহার শেষ হইল না। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় থমকিয়া দাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া অত্যন্ত চুপিচুপি কহিল, 'হুতোদার ইষ্টুলের মাইনে এতদিন কে দিচ্ছে জানো?'

বলিলাম, 'কে?'  
গভীরভাবে নিরঞ্জন বলিল, 'মা। গয়না বিক্রী করে' দিচ্ছে।'

তাহার পরেই হুতির বিবাহ।  
বিয়ে কি রে! আমরা ত' অবাধ! হুতি কিন্তু চিরকালই কম কথা বলে। আমাদের প্রণে সে একবার হাসি মাঝ।

কিন্তু তাহার বাবা রামলোচনের মুখে আমরা সবই শুনিলাম। বাগ্‌দিপাড়ায় হরি মিছিরের গোলাদারী দোকানের আটচালার একটা গুটি টেসে দিয়া রামলোচনকে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কেন যে তিনি সেখানে এমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া কাটান সে-কথা আমরা জানি, এবং জানি বলিয়াই হুতিকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নাই। রামলোচন গাঞ্জা খান।

অবশ্য একা খান না। সন্ধ্যার আগে গ্রামের আরও অনেকেই শুধু ঐ একই প্রয়োজনে আসিয়া জোটে এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐখানে বসিয়া বসিয়া গাঞ্জা চালায়।

সেদিন ঐ আজ্ঞার মাঝখানেই রামলোচন বলিয়া বসিলেন, 'মাহুদ তাহ'লে আর কিজন্তে সময়ের ছেলে চায় বল দেখি, বিহারী! এই ত, অবস্থা দেখছ আমার এত খারাপ, ছ'দিন পরে আবার দেখো, হুতির বিয়েটা একবার চুকে যাক!'

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, 'বিয়েতে কিরকম পাওনা হচ্ছে বল দেখি?'

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, 'তা নগদে গয়না-গাঁটিতে প্রায় হাজার-দেড়েক টাকা। কম কি?'  
কম যে নয় সে-কথা সকলেই স্বীকার করিল। হুতরায় বৃত্তিতে পারা গেল, হুতির বিবাহ রামলোচনের অত্যাচারে ঘুচাইবার জ্ঞ।

হুতির তাহাতে আপত্তি করা চলে না।  
আপত্তি যে করিলও না। বিবাহ নির্দিষ্টে চুকিয়া গেল।

দেখিলে মনে হয় ভূতিকে সে কোলে করিয়া সারা গাঁটা বারকতক ঘুরাইয়া আনিত পারে।

বয়সে সে ভূতির চেয়ে বড় ক্রিমা। সে সন্দেহও অনেকে করিতে লাগিল, কিন্তু রামলোচন বলিলেন, 'না হে না, হুখীর খয়ের মেয়ে ত' নয় যে, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাবে! অমনি বৌই আমি চেয়েছিলাম।'

ইহার উপর আর কথা চলে না।  
তা যেমন শান্তকী, তেমনি বৌ।

শান্তকীর নাম লক্ষী, আর বৌএর নাম সরস্বতী।  
পৈতৃক যে কয় বিধা ধানের গুঁড়ি রামলোচন পাইয়াছিলেন, একমাত্র তাহারই উৎপন্ন ফসল হইতে তাহাকে সংসার চালাইতে হয়। বারো মাসের খরচ তাহাতে ভাল করিয়া চলে না। একাক্ষই যখন অচল হুইয়া গুটে লক্ষী-বৌকে তখন তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেন। নিরঞ্জনকে লইয়া লক্ষী-বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া যায়। হুতিকে বলেন, 'তুইও তোর মামার বাড়ীতে দিনকতক থেকে আর পে যা। আর আসবার সময় মামার কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনি।' বশিস্—ইষ্টুলের মাইনেটা মাসে মাসে পাঠিয়ে দিও।'

এই বাহ্যবাহ্যেই বছরের পর-বছর কাটিতেছিল। কিন্তু এরকম স্বাব্যবস্থা সত্ত্বেও লক্ষী-বৌএর কয়েকটি সোনার গহনা সেই যে বদক পড়িয়াছে, রামলোচন এখনও তাহা ছাড়াইয়া দিতে পারেন নাই।

লক্ষী-বৌএর কাছ হইতে রামলোচনকে তাহার জ্ঞ গল্পনাও কম সহিতে হয় না।

লক্ষী-বৌ বলেন, 'অন্ধকার শাড়ি! মাগ-ছেলে পোম্বার ক্ষমতাই যদি না থাকে ত' বিয়ে করত

সিগেছিলো কেন?'

কিন্তু হুতির বৌ দেখিয়া আমরা ত' আমরা, আমহুজ লোক একেবারে বৌএর পানে হী করিয়া তাকাইয়া রহিল। বৌ যেমন পাচপাচি সকলের হয় তেমনি, কিন্তু লথায় চণ্ডায় এত বড় যে,

কখনও বা হি হি করিয়া হাসেন।



লক্ষী-বৌ বলে, 'হাস্চ্ কৌন্ লজ্জার শুনি! এই যে গরনাগুলো আমার—'

গহনার কথা উঠিলে সহজে আর থামিতে চাহিবে না, রামলোচন তাহা জানেন। কাজেই হা হা করিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলেন, 'চুপ কর লক্ষী-বৌ, ভূতির বিয়েটা একবার দিতে দাও, বাসু, তোমার গরনা তখন বহি আমি না ছাড়িয়ে দিই ত' শুনে সাত হাত নাকখং দেবো।'

তা নাকখং তাঁহাকে দিতে হয় নাই। ভূতির বিবাহ দিয়া সর্বপ্রথম তিনি লক্ষী-বৌএর গহনাগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন, পড়ের ঘরখানা নুতন করিয়া ছাওয়াইয়াছেন এবং বাকি টাকা ভাসিয়া ভাসিয়া দিন তাঁহারে এমন বেশ ভালই চলিতেছে।

ঝিড়কির পুতুর হাত ধুইতে গিয়া সরস্বতী সেদিন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। লক্ষী বলিল, 'পড়ে গেলে, বোমা? লগেনি ত' না।

সামান্য একটুখানি লাগিলেও বোমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

লক্ষী বলিল, 'তোমার বাবাকে বোলো, বোমা, এবার যেন কিছু টাকা তিনি তোমার হাতে দিয়ে দেন। কিছু ইট পুড়িয়ে এই ঘাটটা তাহ'লে ঝাঝিয়ে দেবো, বাছা। বর্ষাকালে তোমার তাহ'লে কষ্ট হবে না।'

সরস্বতী বলে, 'বলব।'

লক্ষী বলে, 'আর শুধু ষাট বাঁধালেই ত' চলবে না, মা, মাটির ঘরে থাকা তোমার অভ্যেস নেই, তোমার জন্তে দালান-বাড়ী ত' একখানি তোমার বাবাকে তৈরি করে দিতেই হবে। তোমার শরৎকে এবার আমি তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।

তুমি হয়ত শুছিয়ে তোমার বাবাকে সব কথা বলতে পারবে না।'

সরস্বতী দেখিতে লগ্না-চণ্ডা হইলেও তখনও নিতান্ত ছেলোমহুত। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

কিছুদিন ধরিয়া আকাশকুহলের চাষ তাহারে এমনি করিয়াই চলে।

ভূতি আমাদের সঙ্গে ইষ্টুলে যায়। বৌএর কথা তুলিয়া আমরা তাহার সঙ্গে হাসিরহুত করিতে ছাড়ি না। কিন্তু তাহার কি যে চুপ করিয়া থাকা স্বভাব, অনেক কথার বলিলে হয়ত' একটুখানি হাসে।

কিন্তু তাহার পড়া আর বেশি দূর অগসর হইল না, আর ছ'মাস ইষ্টুলে থাকিলেই ভূতি মাটিবুলেদন পাশ করিতে পারিত, কিন্তু লজ্জার সে তাহার ইষ্টুলে মাওয়া বন্ধ করিল।

ভূতির তখন বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। লজ্জা তাহার সেলজ নয়। লজ্জা এইজন্ম যে, ভূতির স্বী সরস্বতী একটি কড়া-সন্তান প্রসব করিয়াছে।

এই ছ'বৎসরের মধ্যে ভূতির খণ্ডর তাহার কঠার জন্ম দালান-বাড়ীও তৈরি করাইয়া দেন নাই, পুতুরের ঘাট বাঁধাইবারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। রামলোচন ও লক্ষী-বৌ বৈবাহিকের উপর রাগ করিয়াছেন।

ভূতির মেয়েটি যখন ছ'মাসের শিশু, রামলোচন তখন একদিন নিজে গিয়া বোমাকে তাহার ঘরে লইয়া আসিলেন। এইবার কেমন' করিয়া বৈবাহিক তাহাদের দুঃখ ঘূটাইয়া না দেন তিনি একবার দেখিবেন—এইরকম মনের ভাব।

সমসারে তখন তাহার অভাবের আর অন্ত নাই।

বাড়ী কিরিয়া সেইদিন রাতেই রামলোচন কসিয়া গাঙ্গা টানিয়া আসিয়া সকলকে কাছে

ভালিলেন। বলিলেন, 'বোমা এসো। ভূতি, তুইও আয়। আর তুমি—হ্যাঁ, তুমিও থাকো।'

এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লগিলেন, 'আচ্ছা বোমা, এই ত' দেখছ মা আমার অবস্থা, ছ'বেলা হয়ত' ভাল করে' খেতেই পাবে না। কিন্তু মেয়ের এই এত কষ্ট দেখেও তোমার বাবা কি কিছুই করবে না?'

সরস্বতী হেটমুখে নীরবেই বসিয়া রহিল। কোনও কথা বলিল না।

লক্ষী-বৌ বলিল, 'কেন করবে না? খুব করবে।' মিন্সের দেবার ক্ষেত্ৰতা ত' নেই তা নয়।

দেয় না শুধু তুমি বলতে পার না বলে'। কই এইবার একবার ভাল করে' বল দেখি।'

রামলোচন বলিলেন, 'আহা, সেই পরামর্শ করতেই ত' ডাবলাম সবাইকে।'

লক্ষী-বৌ বলিল, 'বেশ, তবে কালকেই একটি গাইএর কথা লিখে দাও। বল যে, গাইএর টাকা না পাঠালে নাটনী তোমার দুঃখ খেতে পাবে না।'

কিন্তু শুধু গাইএ রামলোচনের মন উঠিল না। বলিলেন, 'হ্যাঁ, তোমারও যেমন বৃদ্ধি। শুধু একটি গাই হ'লেই তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে? না, শোন, তার চেয়ে লিখে দিই—অবিলম্বে একশ' টাকা পাঠিয়ে দেও। না দিলে তোমার সঙ্গে ভক্ততা রাখা আর চলবে না দেখছি।'

লক্ষী-বৌ বলিল, 'সেই ভালো।'

সেই পরামর্শই রহি হইল। ভূতি একটি কথাও বলিল না। শিশুর আশ্রানে যেমন সে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আবার তেমনি নীরবেই চলিয়া গেল।

রাত্রি ওদিকে তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীতে কি যে কথা হইয়াছে কে জানে, পরদিন সকালেই দেখা গেল, ভূতি কোথা হইতে একটা গাই কিনিয়া আনিয়াছে। গাই দেখিয়া রামলোচন বিজ্ঞাসা করিলেন,

'এ কি রে। গাই কোথায় পেলে?'

ভূতি বলিল, 'ত্রিশ টাকায় কিনে আনলাম।'

'টাকা কোথায় পেলে?'

'ওর কাছে ছিল।'

ওর অর্থাৎ সরস্বতীর।

ব্যাপারটা রামলোচন যে না বুঝিলেন তাহা নয়। গাইটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া

গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হুঁ।' লক্ষী-বৌ ছুটিয়া আসিল, নিরঞ্জন আসিল।

রামলোচন বলিলেন, 'ওগো, শুনেছ? গাই কিনতে তোমার বোমা যে টাকা বের করে' দিয়েছে।'

সরস্বতী তাহার মেয়েকে কোলে লইয়া একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, লক্ষী-বৌ বলিল, 'তুমি কেন টাকা দিলে, বাছা? গাইএর টাকা তোমার বাবার কাছে থেকে আদায় কর্তাম। তা বেশ করেছ, না, আরও পোটা-দশেক টাকা আমার আঙ্গ হুপুরবেলায়' দিও। যবে একটি চাল নেই, পাচ টাকার চাল কিনব আর পাচ টাকার আমার সেই চুড়িগাছটা বন্ধক আছে—ছাড়িয়ে আনব।'

সরস্বতী কি দেন বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কি যে বলিল কিছুই ভাল শোনা গেল না।

দুপুরে আহারারির পর লক্ষী-বৌ সরস্বতীর কাছে হাত পাতিয়া বলিল। বলিল, 'কই দাও বাছা, দেখে আসি।'

সরস্বতী বলিল, 'কি?'

'ওমা! এ যে আকাশ থেকে পড়লে গো। সেই যে বললাম সকালে,—দশটা টাকা।'

সরস্বতী বলিল, 'সকালে যে বললাম, মা, টাকা ত' আমার কাছে আর নেই।'

লক্ষী-বৌ গম্ভীর ভাবে খানিকখণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভূতি বৃষ্টি শিথিয়ে দিলে?'

সরস্বতী বলিল, 'না মা, তাঁর সঙ্গে ত' আমার এখনও দেখাই হয়নি।'



লক্ষী-বৌ সেদিন আর কোনও কথাই বলিল না, কিন্তু তাহার পরের দিন দেখা গেল, তাহাদের রান্না চড়ে নাই, উনানটা পর্য্যন্ত না ধরাইয়া লক্ষী-বৌ গুম্ব হইয়া পা ছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে।

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, 'উনানটা কি আমি গিয়ে ধরাব, বা?'  
'কিছলো ধরাব, বাছা, ঘরে চাল বাড়ন্ত।' বলিয়া সে যেমন বসিয়াছিল তেমন বসিয়াই রহিল। ভূতি বাড়ী ছিল না, কিরিয়া আসিয়া দেখিল, সব চূর্ণচাপ, কোথাও কোনও সাদাশব্দ নাই। রান্নাবসনি একবার দেখিয়া আসিয়া উঠানে ঠাড়াইয়া আপন মনেই জিজ্ঞাসা করিল, 'শাখ আমাদের উনান ধরেন কেন গো?'

ও-ঘর হইতে লক্ষী-বৌএর জবাব আসিল, 'কেমন করে' ধরবে, বাছা! বাড়ীতে ভাতের চাল নেই আর নিজের মেয়েটী দুধ খাবে বলে' গাই কিনে আনলে। এইবার মেয়েকে দুধ খাওয়াও আর বাপ-মা উপাস্ দিচ্'।

আরও কি যেন সে বলিতে বাইতেছিল কিন্তু ভূতি আর কিছুই না শুনিয়াই সেখান হইতে ঘরে চলিয়া গেল। সরস্বতী বসিয়া বসিয়া তাহার মেয়েকে আদর করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কোথার ছিলে এতকণ? এদিকে রান্নাবান্না আশ কিছুই চড়েনি।'

ভূতি বলিল, 'জানি। কিন্তু তোমার কাছে ত' আর কিছুই নেই?'

সরস্বতী বলিল, 'বচলেই ত' দেখলে।'  
স্বামী তাহার হান মুখে চূর্ণ করিয়া ঠাড়াইয়া ঠাড়াইয়া ভাবিতেছে দেখিয়া সরস্বতী বলিল, 'অনন্য ম্ভাবারি করে' ঠাড়াইতে থেকে না বাপু, আমার একটা গরনাট-চন্দা নাও, নিয়ে কোথাও টাকাভরি গোপাড়া করে' কিছু চাল কিনে নিয়ে এসো।'

এই বলিয়া মেয়েকে সে তাহার কোল হইতে

নামাইয়া হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, 'নাও।'

সম্প্রদায় বাহাদের আর বলিতে কিছুই নাই অথচ ব্যয় আছে, অভাব-অভিযোগ তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক। রামলোচনেরও সেই অবস্থা। রোজগার তিনি কখনই করেন নাই—এখনও করেন না। অভাব যখন দারুণ হইয়া উঠে, উনানে হাড়ি যখন লম্ভাই চাপে না, তখন হয় তিনি তাহার নিজের খন্তরের কিপা ভূতির খন্তরের নিন্দা করিতে বসেন। বলেন, 'আশা দিয়ে দিয়ে ওরাই ত' আমার সর্গনাশ করে' দিলে।'

লক্ষী-বৌ বলে, 'খবরদার বলছি, আমার বাবার কথা তুমি মুখে এনে না। আমার বাবা তোমাকে অনেক দিয়েছে। পুজোর সময় যখনই গেছি, গুটিলুকা একছোড়া ক'রে কাপড় দিয়েছে, জামা দিয়েছে, বাবার-আম্বার গাড়ী ভাড়া..... এমন কে দেয় গো তুমি।'

রামলোচন বলেন, 'না গো না, তোমার বাবার কথা বলিনি। বলছি আমার আপেকার খন্তরের কথা—ভূতির দাদা-মশাই। ভূতির মা তাঁকে গিয়ে একবার বললে, 'বাবা, আমার ওখানে বড় কষ্ট হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'কত টাকা হ'লে তোমার দুখ খোঁচো বল ত', মা?' ভূতি মা বললে, 'আজার পাঁচেক টাকা দাও, বাবা, আমি আপনার ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই তাহ'লে ঐ থেকেই করে' নেবো।' হেসে বললেন, 'তাহ'লে পাঁচ হাজারের কম এবার আর তুমি খন্তরবাড়ী যাবে না দেখছি।' তারপর কথা হ'ল যে, এক মাসের মধ্যে টাকাটা তিনি দিয়ে দেবেন। বাসু—সেই মাসেই ভূতির মা গেল মরে।'

সে-সব দিন আর নাই। সে আশা-ভরসাও ঘুচিয়াছে। এখন তার একমাত্র ভূতির খন্তর।

কিন্তু ভূতি কিছুতেই তাঁহাকে বলিতে দিবে না।

রামলোচনের নেপাটা যেদিন একটুখানি বেশি হইয়া যায়, সেদিন হয়ত কথা শুনিয়া ভূতির উপর রাগ করিয়াই বলিয়া বসেন, 'লবাবের ব্যাটা! খন্তরের কাছে চাইতেও লজ্জা! কুলীন আমরা—আমাদের চোন্দ-পুঙ্খ খন্তরের কাছে চেয়ে এসেছে, তা জানিন্? তা' বেশ, চাইতে পারবে না ত'—চালাও সংসার। আর ত' ছোট ছেলোটা নও বাবা,—এখন উরুগু হয়েছ।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলেন, 'আর আমাকেই যদি এই বয়েসে রোজগার করতে হয় ত' বেশ, তাও বল, বাই, কোনও দূর দেশ পানে চলে' বাই, গিয়ে বাহনের ছেলে ভাত র'খিগে।'

কথাটা শুনিয়া ভূতির চোখ ছুইটা ছলছল করিয়া আসে। বাবা তাহার বহু দূর দেশে গিয়া ভাত র'খিয়া রোজগার করবে! না, সে নিজেই এইবার চাকরির সন্ধান কোথাও বাহির হইবে।

হানমুখে ভূতি সরস্বতীর কাছে গিয়া ঠাড়ায়। বলে, 'ভুলে ত'? এই বয়েসে বাবাকে আমি ভাত র'খার চাকরি করতে দেবো না।'

'তাহ'লে তোমাকেই বেরোতে হয়।'

'কাল সকালেই বাড়ী থেকে যাব ভাবছি। কলারগুণ্ডো একবার ঘুরে আসি।'

কিন্তু সরস্বতীর ইচ্ছা, স্বামীকে যদি বাইতেই হয় ত' আর কিছুদিন পরেই যেন যায়। কারণ, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। যেমন রোদের তেজ, তেমন অসহ্য গরম। সমস্তা ধুয়াপ। তাহার চেয়ে—জল পত্ৰক, আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষায় মাটিটা একটুখানি ঠাণ্ডা হোক।

ভূতদিনের জন্ত আবার সে তাহার হাত হইতে একগাছা চুড়ি খুলিয়া দেয়। ঘরে আবার কিছুদিনের জিনিষ-পত্র আসে।

রামলোচন খুশী হইয়া বলেন, 'সেখ' গো, ও লক্ষী-বৌ, দেখো! এতদিন ছিলো বাপের ছেলে,

এখন আমি ছেলের বাপ। আমার আবার ভাবনা কিসের!'

তখন হইতে ভূতিকেই সব ভাবনা ভাবিতে হয়। যেন ভূতিরই সংসার।

এবার আমরা অনেকদিন পরের কথা বলিতেছি। অনেকদিন—প্রায় বোম্বো বংসর।

রামলোচনের বয়স হইয়াছে। ভূতিকে দেখিয়া আর তিনিবার উপায় নাই। নিজস্বের বিবাহ হইয়াছে। একটি ছেলেও হইয়াছে। লক্ষী-বৌএর আরও দু'টি মেয়ে আর একটি ছোট ছেলে। হয় নাই শুধু সরস্বতীর। তাহার সেই যে সেই মেয়েটি—তাহার পর আর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। সেই মেয়ে তাহার বড় হইয়াছে। মায়ের মতই বাড়ন্ত গড়ন। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। নাম—অম্বপা।

বছর-দশেক আগে ভূতি একটি চাকরি পাইয়াছে। মুকিয়াছিল পিচি টাকার, এখন হইয়াছে পকাশ। আমাদের গ্রাম হইতে ক্রোশদুই মূরে নূতন যে কলার রুটি খুলিয়াছে, সেইখানেই তাহার কাজ। রোজ সকালে উঠিয়াই সাইকেলে চড়িয়া তাহাকে রুটি বাইতে হয়, দুপুরে একবার বাইতে আসে, তাহার পর তাহার বায়, বাড়ী ফিরিতে কোনদিন সন্ধ্যা হয়, কোনদিন রাতি।

তাত ভাগ্যিস, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাহেবকে বসিয়া-কহিয়া ঐ চাকরিটি ভূতি পাইয়াছিল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে সমসার আশকাল ঐ অতগুলি লোক,—কহারও গ্রন্থ-কষ্টের আর সীমা থাকিত না।

সম্প্রতি গ্রন্থ-কষ্ট তাহাদের ঘূটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রামলোচনের নেপা যেন একটুখানি বাড়িয়াছে। বাগুদিপাড়ার হরি মিছিরের গোলাদারি দোকানের আটচালার তাঁহাকে আর বড় একটা দেবা যায় না। বাড়ীর স্বমুখে অশ্বখাঘের তলাটা দেবা ইট দিয়া ঝাড়াইয়া দিয়াছে। সেই ঝাটানো



রকের উপরেই সকাল-সন্ধ্যা আন্ধকাল রামলোচনের আড্ডা বসে। সন্ধ্যা-সন্ধ্যার তাহার সেইখানেই আসিয়া জোটে।

জন্মে তাহার বয়সের দোহেই হোক কিংবা নেশার গুণেই হোক, কাজে-কৰ্মে আন্ধকাল তাহার একটুখানি ভুলচুক হইয়া যায়।

যেমন ধরন—

ভূতি সেদিন তাহার কুঠি হইতে বাড়ী কিরিবামাত্র জমিদারের কাছারি হইতে লোক আসিল খাজনার তাপাদায়।

ভূতি বলিল, 'মাইনে এখনও পাইনি, দিন সাতকে পরে দেবে।'

জমিদারের লোক বলিল, 'আজ্ঞে হ'বছরের। গত বছরের খাজনাও আপনাদের দেওয়া হয়নি।'

ভূতি একটুখানি অবাক হইয়া গেল। বলিল, 'হ'বছরের? না, আমার ঠিক দ্রব হুজ্জৎ, গত বছরের খাজনা ত' আমি বাবার হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আজ্ঞে না। বাবাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে' দেখবেন।'

রামলোচন তখন বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী ফিরিলে ভূতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'গত বছরের খাজনা কি আমাদের দেওয়া হয়নি, বাবা?'

রামলোচন চোখ বুজিয়া একবার চিন্তা করিলেন। তাহার পর বাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কই আর হ'ল! ভূই সমিতিছিল ঠিক, কিন্তু তোর মা'র ভত-উদ্বাপনের সময় মেজ-বোমার সেই যে সেই গরনটা বন্ধ পড়েছিল, সেইটে দিতে হ'ল ছাড়িয়ে।'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। হ'বছরের খাজনা একদমে প্রায় তিরিশ টাকা দিতে হইবে, অথচ বেতন পাইবে পঞ্চাশ টাকা। ভূতির মাথাটা একবার ঘুরিয়া গেল। কোনোরকমে মুখ বুজিয়া সে তাড়াভাড়ি বাহিরের দাঁকা বাতাসে গিয়া পাড়াইল।

কথাটা সরস্বতী বোধ করি শুনিতে পাইয়াছিল।

ভূতিকে এক সময় একা পাইয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, মেজ-বোমার গরন বুঝি ছাড়িয়ে না দিলে চলে না, আর আমার গরনাগুলো? চাকুরি পাবার আগে যা বন্ধ দিলে তা ত' আশ্রয় কিংল না।'

ভূতি বলিল, 'যা গেছে তা গেছে, তার জন্তে আর হুখু ক'রো না।'

সরস্বতী বলিল, 'তা না হয় হ'ল, কিন্তু অম্বর বিয়ে? মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ? বোলা পেরিয়ে গেল।'

কথাটা ভূতি বিধাস করিল না। বলিল, 'ধেং! বোলা পেরোবে কি রকম?'

সরস্বতী রান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'হিসেব করে' দেখো।'

ভূতি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এ ভাবনা যে কিসের সরস্বতী তাহা বুঝিল।

বলিল, 'টাকার কথা ভেবে আর কি ক'বে বল? সেই যে বলেছিলে—আপিস থেকে ধার নেবে!'

ভূতি বলিল, 'ধার বোধ হয় পাব না। আপিসের অবস্থা ভাল নয়।'

সরস্বতী বলিল, 'না পাও, আমার সমস্ত গরনা আমি বিক্রি করে' দেবো। ভাল দেখে তুমি একটু ছেলে দেখো।'

এই সেদিনের সেই ছোট অমৃণমা ইহারই মধ্যে যে এমন সর্গাদ্রবন্দরী ঘুরতী হইয়া উঠিতে পারে, সে ধারণা ভূতির ছিল না। সেদিন সে তাহার পরিপুষ্ট সেহের পানে তাকাইয়া সহসা চমকিয়া উঠিল। সরস্বতীকে বলিল, 'গরনা তুমি ঠিক করে' রেখো, অম্বর বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।'

যাই হোক, অমৃণমার ঘরের জন্ত ভূতিকে খুব বেশি হায়রান হইতে হইল না। চিরকালই তাহার ইচ্ছা ছিল, ভাল ঘর এবং ভাল বর দেখিয়া অম্বর বিবাহ দিবে। শের পরাণ হইলও তাহাই। হলগী জেলার একটি ছোকরা

তাহাদের আপিসে চাকুরি করিত। তাহার ভাইপোটি মূবে এই বৎসর বি-এ পাশ করিয়া আবার কি যেন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলের বাবা মত্ত বড় উকিল। ছেলোটো দেখিতে চমৎকার।

বিবাহের বন্দোবস্ত সেইখানেই সব ঠিক হইয়া গেল। সরস্বতী তাহার হ'হাতে হ'গাছি মাত্র চুড়ি রাখিয়া বাকি সমস্ত গরনা তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

বিবাহের মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি। গরনা বেচিয়া ভূতি টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বরবাড়ীদের ষাণ্ডায়াবীর আয়োজকও মন্দ হয় নাই।

এমন সময় দেখা গেল, রামলোচন বাকিয়া বসিয়াছেন।

রাতে সেদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া নেশার খোঁকেই বোধ করি চাঁৎকার করিতে লাগিলেন, 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও! 'বিয়ে বন্ধ করে' দাও! 'ডাকিলেন, 'ভূতি, শোন! এতদিন চুপচাপ করে'ছি জিলাম, কিছু বলিনি, ভাব-জিলাম ভূতির আকলোটা দেখি। কিন্তু এবার ত' আর না বলে' থাক পেল না!'

ভূতি হেঁমুখে পাড়াইয়া রহিল। বলিল, 'কেন, কি হয়েছে, বাবা?'

রামলোচন বলিলেন, 'বোমার কথা শুনে ঝাঞ্ঝে তুমি অন্ধ হয়েছ, বাবা, কি হয়েছে না-করছে এখন ত' তা বুঝবে না! তোমার অভাবও ঐ বোনের বিয়েটা রইল পড়ে' আর এখন বিয়ে দিচ্ছ কার? না—নিজের মেয়ের।'

রামলোচনের এ-একশের মেয়েটা বড় হইয়াছে সত্য, দেখিতেও মন্দ নয়, কিন্তু অমৃণমার চেয়ে সে প্রায় তিন বছরের ছোট। তাহার বদি হয় বোলা ত' বৃদি বয়স তেরো।

ভূতি সেই কথাই বলিল। বলিল, 'বৃদি ত' অম্বর চেয়ে অনেক ছোট, বাবা!'

রামলোচন হাসিলেন। বলিলেন, 'ভবে আর বলছি কেন! আরে, হাজার ছোট হোক, তবু পিসী ত! পিসী থাকতে ভাইবির বিয়ে হয় কখনও? কেউ শুনেছে?'

ভূতি হেঁমুখে পাড়াইয়াছিল, বলিল, 'ভেবেছিলাম আগে অম্বর বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর একবার সামলে নিয়ে—'

রামলোচন এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'ভূই হাসলি, ভূতি! মেয়ের বিয়ে বলে' কথা, সামলে নেওয়া কি এতই সোজা! তার চেয়ে এ বিয়ে ভূই বন্ধ করে' দে।'

কিন্তু তাহাদের সে পাক। কথা দিয়াছে, আগামী উনিশে তারিখে বিয়ে। এখন বন্ধ করিবে বলিলেই বন্ধ করা যায় না।

রামলোচন বলিলেন, 'তার চেয়ে এক কাজ ক'—শোন। ঐ এক-বরফে দুটো বিয়েই সেরে দেব। এইটাই ত' শেষ নয়, আবার ত' আর-একটা বোন আছে এখনও। সেটাকেও ত' তাকেই পার কর্তে হবে।'

ভূতি তেমনি হেঁমুখে পাড়াইয়া পাড়াইয়া কি যেন ভাবিল। বলিল, 'আচ্ছা তাই হবে বাবা, আপনি ভাবুনেন না, বাবা।'

এই বলিয়া তাহার বাবাকে সাধনা দিয়া কথাটা বোধ করি ভাল করিয়া ভাবিবার জন্ত স্বার্থাঙ্ক ভূতি অজ্ঞত চলিয়া গেল।

ভূতি আন্ধকাল একটা দগের জন্তও ঘরে বাস করে না, সাইকেল লইয়া দিবারাজি বাহিরে-বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথায় যে থাকে, কোথায় দান করে, কোথায় খায়, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করেন, অমৃণমা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভাল করিয়া কেহই কোনও জবাব পায় না।

বিবাহের আগের দিন ভূতি আনাইয়া সে, বৃদিও বিবাহ হইবে স্ত্রতারা গাভ-বহিরা তাহারও হোক।



কথাতা শুনিবামাত্র লক্ষ্মী-বৌ রামলোচনের কাছে ছুটিয়া গেল। বলিল, 'হ'ল ত' এবার! ঐ নাও, শোনো কি বলছে।'

রামলোচন বলিলেন, 'ঠিকই ত' বলছে। কাল বিয়ে, আজ গায়ে হলুদ হ'বে না?'

লক্ষ্মী-বৌ দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল, 'পাঁজা খেয়ে খেয়ে তোমার কি আর বৃদ্ধিহুঁ কিছু আছে? জামাই দেখলাম না কিছু না, কোথাকার কোন বান্দর ধরে' এনে কাজ সেরে দেবার মতলব করেছে বৃদ্ধে পাওছ না?'

রামলোচন বলিলেন, 'না গো না, তা ও করবে না।'

লক্ষ্মী-বৌ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, করবে না। সংবোনের ওপর দরদর কত!'

ঠিক সেই সময়েই ভূতি ঘরে ঢুকিতেছিল, রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, বৃদির বিয়ে কোথার ঠিক করলি বল দেখি? জামাইটি দেখতে শুনতে বেশ ভাল হবে ত? দেখি, বাবা, আমার বৃদির মত মেয়ে যেন শেষে জলে না পড়ে।'

ভূতি অত্যন্ত ব্যত হইয়া ঘোরা-কোরা করিতেছিল। বলিয়া গেল, 'আপনারা কিছু ভাববেন না, বাবা, সে ত' আমি আগেই বলে' দিবেছি।'

ভূতি অত্যন্ত ব্যত হইয়া ঘোরা-কোরা করিতেছিল। বলিয়া গেল, 'আপনারা কিছু ভাববেন না, বাবা, সে ত' আমি আগেই বলে' দিবেছি।'

অল্পনাকৈ বিবাহ করিবার জ্ঞান বর আসিল লগ্নী ঘোলা হইতে। চমৎকার ছেলটি। বহুলোকের ছেলে। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। অল্পমহার সঙ্গে মানাইবে ভাল।

কিন্তু বিবাহের সময় যে-ব্যাপারটা ঘটয়া গেল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অদ্ভুত।

রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর-একটি জামাই কই এখনও এসে পৌঁছোন না ত?'

ভূতি বলিল, 'অম্বর বিয়ে আজ বন্ধ করে' দিলাম, বাবা, আজ বৃদির বিয়েটাই হ'য়ে যাক!'

বৃদির বর যে এত সুন্দর হইবে রামলোচন তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন, 'সেই ভাল।'

সুতরাং অল্পমহার বরের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল বৃদির। অল্পমহার বিবাহ সেদিন আর হইল না।

বরণক্ষেত্র বলিবার কিছুই নাই। বাহা পাইবার কথা ছিল সবই তাহার পাইলেন। বৃদি-মেয়েটিও দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়।

কথা সম্ভাচন করিয়া রামলোচন ভাঁড়ারের দরজার বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাঁড়ার অগ্ধ লাইতে লাগিলেন। শুদিককার কাজ-কর্ম মেজ-বোকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মী-বৌ নিজেই দেখাশোনা করিতেছিল। পাড়াপড়শী হ'চার জন মেয়েও আসিয়া-ছিল। তাহাদেরই মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বড়-বোকে দেখছি না যে, লক্ষ্মী-বৌ? আর তার মেয়েটাই বা গেল কোথায়?'

লক্ষ্মী-বৌ বলিল, 'কি জানি, মা! বড়িয়াই সে তাহার কাছে আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ উল্টাইয়া ঈং হানিয়া বলিল, 'সবই ত' তোমরা জানো, মা, তবু কেন যে জিজ্ঞাসা করছ কে জানে!'

মেয়েটি বলিল, 'ভুলে যাই, বাহা, মনে থাকে না। তোমার ব্যাভারে সং-শাউড়ী বলে' ত' আর মনে হয় না, মা, তাই আজ তোমার আনন্দের দিনে ও-পক্ষের বৌ-বাটা না যদি আসে ত' বড় ভুখু হয়।'

আর-একজন তাহার টিপ্সি কাটিল। বলিল, 'তা আজকের দিনে বৌমার কিন্তু ঘরে ষিল দিয়ে পড়ে' থাকটা ভাল হ'ল না, বাহা, তা তুমি যাই বল, আর তাই বল।'

যাই হোক, বড়-বউএর অভাবে ক্ষতি কিছুই হইল না। বিবাহ নিষ্পিড়েই চুকিল।

সরস্বতী এদিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা।

অল্পমা বলে, 'চুপ কর, মা, এর জন্মে তোমার এত কাঁদা কিসের?'

সরস্বতী কিন্তু কিছুই চুপ করিতে পারে না। কাঁদিত কাঁদিত বলে, 'কেন যে কাঁদিছি তা তুমি কেনম করে' জানবি, মা! তাক দেখি একবার তোর যাবাকে!'

কাল থেকে, আমার সঙ্গে তার দেখাই হচ্ছে না।'

দেখা সে ইচ্ছা করিয়া করিতেছে না কিনা তাই বা কে জানে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা একদিন হইল।

সরস্বতী কাঁদিল না, অল্পমহার বিবাহের কথা তুলিল না, শুধু গুপ্তীভাবের ভূতির ভ্রমুরে 'হাত পাতিয়া বলিল, 'দাঁও আমার টাকা-কড়ি দাঁও, আমার গরম দাঁও!'

ভূতি বলিল, 'দেবো!'

'দেবো নয়, এতুণি দাঁও। তোমার ঢালকি আমি বুঝেছি।'

ভূতি বলিল, 'এতুণি কোথায় পাব? দেবো দিনকতক পরে। অম্বর বিয়ের জোগাড় ত' আমার করুতেই হবে।'

সরস্বতী বলিল, 'থাক' আর অম্বর বিয়েতে কাজ নেই, তার চেয়ে তোমার আর-একটা বোন আছে; তার বিয়ের জোগাড় করগে দাঁও! এই বলিয়া সে একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আমার সর্বস্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, স্বামী হ'য়ে এমন শ্রদ্ধা করবে তা জানুতাম না। দাঁও, আমার সব কিরিয়ে দাঁও, অম্বকে নিয়ে আমি বাপের বাড়ী চলে' যাব।'

ভূতি বৃষ্টি—এগুলো রাগের কথা। ঈং হানিয়া বলিল, 'আচ্ছা তাই যেও, তোমার সবই আমি কিরিয়ে দেবো।'

হাসি দেখিয়া সরস্বতীর সর্বস্ব জন্মিয়া গেল।

বলিল, 'হাঃহাঃ কোন লজ্জার! কবে দেবে বল।'

ভূতি বলিল, 'এক সপ্তাহ পরে দেবো।'

সরস্বতী আর কোনও কথা কহিল না। ভাবিল, এক সপ্তাহ সে নীরবে অপেক্ষা করিবে।

করিলও তাহাই।

তোমার দেবার কথা, মনে থাকে যেন। না দিলে আমি কিন্তু কিছু বাকি রাখব না।'

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে এত টাকা সে দিবে কেনম করিয়া!.....দিতে সে পারিল না।

সরস্বতী কিন্তু 'দাঁও' 'দাঁও' করিয়া জীবন তাহার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। শেষে অল্পমাও তাহার মাকে বলিতে ছাড়িল না। বলিল, 'তোমার কি বৃদ্ধি-হুঁ কিছু নেই, মা? বাবাকে চকিশ ঘটা ওরকম করে' বলে! মাছটো পাগল হ'য়ে যাবে যে!'

সরস্বতী রাগিয়া বলিল, 'তা হোক পাগল। তুমি চুপ করে' থাক!'

সেদিন রায়ে অমনি স্বামীর স্বস্থে খাবার ধরিয়া দিয়া সরস্বতী বলিল, 'দেবার কি আমার মাছে-ঝিরে লাগা দড়ি দিয়ে মরলে তুমি স্বামী হও? আপিস থেকে ধার করবে বলেছিলে, তাই কর না! মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার যে ঘুম হচ্ছে না।' ছি ছি, এমন হতভাগা স্বামীর হাতে তুমি আমার দিয়েছ, ভগবান!'

ভূতি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, 'তুমি এত অধীর হ'য়ো না, শোনো! আমার অবস্থাটা একবার বোঝো। টাকা-কড়ি পাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও কিছু পাচ্ছি না।'

সরস্বতী বলিল, 'গং-মার গুটীর কাপড় ত' এল। কই তার বেলা ত' না-পাওয়া হও না!'

ভূতি বলিল, 'ও ত' সামান্য কয়েকটা টাকা। বাবা বললেন, কাপড়-চোপড় কারও কিছু নেই, কি আর করি বল!'

সরস্বতী দাঁত কিড়মিড় করিয়া জবাব দিল—

'কি আর বলব তোমাকে! ছি ছি ছি ছি, এমন স্বামীর হাতে থাকার চেয়ে মরা ভালো।—তাও যদি নিজের মা হ'ত!'

হাত নাড়িয়া ভূতি বেশ জোরে-জোরেই বলিল, 'ওগো চুপ কর! শুনতে পাবে যে! ছি!'

ততোদিক জোরে সরস্বতী টাঁচনার করিয়া



উঠিল, 'না আমি চূপ করব না। আমি ওদের  
ওনিয়ে ওনিয়ে বলব। ওরা সং, ওরা—'

'আমি, কেন চোঁচাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, চোঁচাব বেশ করব। ওরা আমাদের শত্রু।  
ওদের মুখে ছাই দিতে হয়।'

ভূতির মত শান্তশিষ্ট নিষ্কিরোণী মাহুগুণ  
একবার পর হাসিয়া উঠিল। তাতের গ্রাস হাত  
হইতে কেলিয়া দিয়া বলিল, 'চূপ করবে না?'

সরস্বতী বলিল, 'কেন, ভয়ে নাকি? না, চূপ  
করব না।'

কিন্তু ভূতিও বেন এইবার দপ্ করিয়া অলিয়া  
উঠিল। নিজেই আর সে সরণ করিতে পারিল না।  
হাতের কাছে ডালের বাটটা তুলিয়া লইয়া সজোরে  
ছুঁড়িয়া মারিল সরস্বতীর দিকে। বলিল, 'মু' তবো!'  
বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কীদার ঐ অত বড় বাট সরস্বতীর কপালে  
মাগিয়া ছিটকাইয়া সেটা ঝন্ ঝন্ করিয়া দূরে থিয়া  
পড়িল। অহুশা বোধ করি কাছেই কোথাও দাঁড়াইয়া  
ছিল, শব্দ শুনিয়া ছুটয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখে, মা  
তাহার দুই হাত দিয়া কপালটা চাপিয়া ধরিয়াছে আর  
তাহার আঙ্গুলের কীক পিচকারির মত ফিক্‌ফিক দিয়া  
কাঁচা রক্ত ছুটিয়া গিয়া থালায় ভাতগুলোকে পর্যন্ত  
রাঙা করিয়া দিয়াছে।

অহুশা অনেক করিয়াও তাহার মা'র কপালের  
রক্ত কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। বলিল, 'রক্ত  
সে বন্ধ হচ্ছে না, বাবা, কি করি?'

বলিয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে পিছন ফিরিয়া  
তাকাইতেই দেখে, বাবা তাহার তখনও পর্যন্ত হতভম্বের  
মত এটো হাতে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থব  
করিয়া কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির  
হইতেছে না, চোখ দুইটা জ্বলে ছলছল করিতেছে।

তাহার পরদিন, প্রত্যহ যেমন যাম, সাইকেলে চড়িয়া

ভূতি তাহার আপিস ঘাইতেছিল, কোথায় কোন পথের  
ধারে ভিন্নগ্রামের শ্মশানে একটা মড়া গুড়িতেছে  
দেখিয়া সেইখানেই সে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই দিক্  
পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, একটা  
আম-গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ গান  
গাহিল, তাহার পর আপন মনেই কি যেন বলিতে  
বলিতে বাড়ী ফিরিল।

রসিক পোয়ালা দুইয়ের ভাঁড় লইয়া ভিন্নগ্রামে  
বেহিতে ঘাইতেছিল, পথে তাহার সঙ্গে ভূতির দেখা।  
ভাঁড় দুইটা মাটিতে নামাইয়া রসিক তাহাকে একটি  
প্রণাম করিল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ভূতি বলিয়া  
উঠিল, 'হাঁরে রসিকে, তুই আমার বাজনার টাকাটা  
কবে দিবি বল দেখি?'

রসিক ত' অবাক!

বাজনার টাকা রসিকের পূর্ণপুরুষেরাও ভূতিকে  
কখনও দেয় নাই। বলিল, 'আমার কাছে বাজনার  
টাকা—'

ভূতি বলিল, 'হ্যাঁ, না যদি দিল ত' আমি সন্মান-  
করে' ফেলব বলে' দিচ্ছি। বাট দিয়ে মাথা কাটিয়ে রক্ত  
বের করে' দিতে পারি—হ্যাঁ।'

এই বলিয়া সে আর অপেক্ষা করিল না। সাইকেলের  
উপর চড়িয়া-বসিয়া সজোরে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

সেই তাহার পাগলামির প্রথম হুপ্পাত!

তাহার পর পনেরোটা দিন পার হইতে না হইতেই  
বন্ধ উদ্যায়!

এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি ডাক্তারকে দিয়াছিলাম।  
ডাক্তার পড়িয়া ত' হাসিয়া পুন! বলিলেন, 'এ  
তুমি সাহিত্য লিখিয়েছ, এ আমি চাইনি।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি তবে চেয়েছিলেন?'

ডাক্তারবার বলিলেন, 'সে তুমি বুঝবে না।'

তখনও আমাকে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে  
দেখিয়া ডাক্তারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই জল্পই কি  
ভবভূতি পাপল হয়েছ, তোমার বিশ্বাস?'

ডাক্তারবার বলিলেন, 'কথ' বনো না। এর চেয়েও  
কত ভীষণ ঘটনা মাহুগের জীবনে ঘটে থাকে।  
আমার জীবনেই ঘটেছে। যদি শুনতে চাও ত' সন্ধ্যার  
পর এসো।'

## গল্প-প্রতিযোগিতা

### নিয়মাবলী

১। গল্প ফুলস্কেপ্ কাগজের ৯।১০ পৃষ্ঠার  
মাথো হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায়  
লিখিতে হইবে। বাদিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ  
'মার্জিন' (margin) রাখিতে হইবে।

২। গল্পের আখ্যানভাগ, লিখন-প্রণালী এবং  
ভাষা—সকল দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার  
বিচার করা হইবে।

৩। গল্পের সঙ্গে ভাল ছবি দিতে পারিলে  
তাহার জন্ম বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ছবি  
Drawing Paperএ বা Bristol Boardএ  
আঁকা হইতে পারে। তুলি বা কলম ব্যবহার  
করা হইতে পারে। কলমে আঁকিতে হইলে  
লাইনগুলি গাঢ় কালো রঙের এবং পরিস্কার  
হওয়া দরকার।

৪। প্রেরিত গল্পের আবরণের (cover)  
উপরে "গল্প-প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

৫। মনোনীত গল্প প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ  
অধিকার "উদয়ন"-সম্পাদকের থাকিবে।

৬। অমনোনীত গল্প ফেরত পাইতে হইলে  
উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৭। গল্প পাঠাইবার সময় "গল্প-প্রতি-  
যোগিতা"র কুপন পাঠাইতে ভুলিবেন না।  
নিজের নাম ও ঠিকানা কুপনের উপর স্পষ্ট  
করিয়া লিখিবেন।

৮। এ সম্পর্কে অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য বিষয়  
সাধারণ নিয়মাবলীতে দেখিবেন।

৯। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল।

১০। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের  
বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রথম পুরস্কার	...	৫০ টাকা
দ্বিতীয়	...	২৫ " "
তৃতীয়	...	১৫ " "
চতুর্থ	...	১০ " "



## রয়েল বেঙ্গল টাইগার

শ্রীকুমারগন মল্লিক

বাঙলা দেশের হুঁদরী কাঠের ঝপলে  
কেমন ক'রে জন্মালি তুই বাথ ?  
মেঘের দেশের অজানা কোন্ খোঙ্গলে  
হুগু ছিল প্রচণ্ড এ দাপ !

যেখার ভীক শশক ফিরে শঙ্কতে,  
লাকিয়ে বেড়ায়, দস্ত দেখায় হুহু ;  
উঠল কেঁপে কানন যে তোর ডঙ্কতে,  
যেমন আরাব, তেমনি ভীষণ তহু !

চকু ও কি ? দীপ্ত অনল-কুণ্ড যে,  
ও কি নবর, ও কি দারুণ থাবা ;  
যেমন গ্রীবা, তেমনি ও তোর মূণ্ড যে,  
সিঁহ সেও হচ্ছে কেবো হাবা !

শক্তি বিপুল, বিপুলতর লক্ষ রে,  
দস্ত সাহস ! আছা বুকের পাটা ;  
ধাক্কা ধরায়, দেখে কাঁপানু অধরে,  
কটকিত শঙ্কতে হয় গাটা !

নায়েগ্রার এ জল-প্রপাত মৃদু কি ?  
লাগছে 'আঁরি' জীবন্ত এ ধম বলি',  
সত্য প্রলম্ব-ঘুনি সাথে বুঝত কি ?  
দস্তে ধরি' ইন্দ্রাজ্ঞের দস্তালি !

বগু বী-চর্য পলি মাটির পৃথী এ,  
জমকে ছিল ধাত, পাণ ও সর্পণে ;  
বুঝতে নারি কোন্ খেয়ালীর কীর্তি এ,  
কে জানুত এ বাঘের খাবার ভর দ'বে।

ভীতু ভেতো ভাঙা দেশের শর-ক্ষেতে  
একি ভয়াল ভীষণতার ভাণ্ডার,  
হায় রে ফণি-মনসার এ অর্থোতে  
লক্ষীরে আজ পুঞ্জ-সে এ কোন্ পাণ্ডার !

এ নয় ফুল আর প্রজাপতির দেশ শুধু,  
ভেবো না কেউ কেবল ফেউ আর ছাগ আছে ;  
হেখায় জাগে লতার বুক ডাঁশ, মধু,  
মোদের বনে আজও এমন বাথ আছে !



ত্ৰিবিধপতি চৌধুরী, এম-এ

মেসের চারতলার উপরের ছোট একরকি ঘর। হঠাৎ দেখি আরসোলাটা চৌ ক'রে দেয়াল বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে, আর টুকটুকীটা তার পেছনে একে বেকে ছুটেছে। হয়ত বা বেচারী পালাতে পাবত—কিন্তু পারলে না;—মানুষকে মহাশয় গান্ধীর ফ্রেম-বঁধানো ছবিখানা পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়াল। তারপর ছুঁ-চারবার পাখার ঝটপট শব্দ এবং পরমহুর্তই সব ঠাটা। কাল বৈকালে মহাশয়গীর ছবিখানি সখ ক'রে টানিয়ে-ছিলাম। কে জানুত, অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের ছবি হিসার সহারতা করবে !

হঠাৎ কার ভাষাকণ্ঠের কাশ-স্বনিতে স্বপ্নভঙ্গ হ'ল—দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখি—রায়বাহাদুরের পেয়াদের বান্দামা বনমালী চৌকাঠের বাইরে গরুড় পক্ষীর মত হাত ঝোড় ক'রে দণ্ডায়মান।

স্বিথয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—“কি খবর, বনমালী ? রায়বাহাদুর কলকাতায় ফিরলেন কবে ?”  
উত্তরে সে বা বললে তার সারমর্ম এই যে, রায়-বাহাদুর আজ তিন দিন হ'ল দেৱাছন থেকে কলকাতায়



কিরেছেন এবং তাঁর বরানগরের বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেয়েছেন। উপস্থিত আমার ডাক পড়েছে।

তথ্য!—বড়লোকের হুমু,—তামিল না ক'রে উপায় নেই। বল্লম—“আচ্ছা, তুমি এগোও,— আমি এগুনি যাচ্ছি।”

এই কীকো রায়বাহাদুর নামক জীবটির সম্বন্ধে চ-চার কথা ব'লে রাখি। রায়বাহাদুর কেমদাফির রায়চৌধুরী বাংলাদেশের একজন মাঝারি গোছের জমিদার। জমিদারির আয় নিতান্ত কম নয়। অথচ সংসারে ভোগ করবার কেউ নেই বললেই চলে। বয়স এখন বাটের কিছু ওপর হবে। গোলগাল লোকটি—মাথাভরা প্রকাণ্ড টাকু। বছর পাঁচেক হ'ল পতীব্রিয়োগ হয়েছে। একটি মাত্র পুত্র, তাও চিরকণ্ঠ—সুতরাং আমার অল্প দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভড়লোকের নিজের কোন বাধ্যনা বা বদ খেয়াল নেই। সখের মধ্যে ছাটি জিনিষ এ পর্যন্ত আমার নজরে এসেছে,—একটি হচ্ছে সরকারী খেতাব অর্জনের বাদনা, আর একটি হচ্ছে লুপ্ত তহ-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য উৎকট চেষ্টা।

আজ বছর ছয়েক হ'ল এর কাজে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কাজ আর কিছুই নয়—রোজ বটা দুই ক'রে ডিক্টেশন্স লেখা। রায়বাহাদুর তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে তহ-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে যাবেন, আর আমাকে তাই লিখে যেতে হবে।—এই হচ্ছে কাজ। এইভাবে প্রায় একটা বছর কাজ চলেছিল। তারপর একদিন বই লেখা শেষ হ'ল।—রায়বাহাদুর বইয়ের নাম দিলেন “কুলকুণ্ডলিনী-রহস্য”। বই ছেপে বেরতে আরও মাস দুই লেগেছিল। সেড় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট অন্তিকার গ্রন্থ—বিশীল মহাভারত বললেই হয়। এক কপি বই আমাকে উপহার দিয়ে বললেন। এইভাবে “শীপিরিই এর একটা ইংরেজী, তর্জমা করব মনে করছি।—এসব জিনিষ পৃথিবীর লোকে বত পড়তে পায় ততই মঙ্গল,—বুঝে কিনা।”

বল্লম—“তা তো বটেই।”

তার পরই হঠাৎ একদিন জমিদার-পুত্রের শরীর খারাপ হ'ল। ডাক্তারের পরামর্শে রায়বাহাদুর গম্ভীর দেরাছন যাত্রা করলেন। বছর খানেক পর আজ খবর পেলাম—ভড়লোক কলকাতায় ফিরেছেন এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।



বনবাণী গরুড় পক্ষীর মত হাত জোড় ক'রে বসায়মান

সন্ধ্যার কিছু পূর্ণে বরানগরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লুম। আমাকে দেখেই রায়বাহাদুর সোহাগে ব'লে উঠলেন—“এস এস, আজ কেমন?”

উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলাম, তৎপূর্ণেই একটা অন্তিকার গ্রন্থ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—“দেখো?”

মলাটের ওপরকার সোনার জলে লেখা ইংরেজী হরফ-গুলোর দিকে নজর পড়তেই অবাক হ'য়ে পেলুম,—বড় বড় অক্ষর লেখা রয়েছে—“Mysteries of the Court of Kulakundalini.”

অতিকণ্ঠে হাসি সামলে বল্লম—“খাসা নামকরণ।— কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজী তর্জমাই বা করলেন কখন, আর বই-ই বা ছাপালেন কখন?”

একটা চাপা গর্দের হাসি হেসে রায়বাহাদুর বললেন—“দেবদেব এক রিটার্ডড, হেডমাস্টার জুটে গেল। তাকে দিয়েই তর্জমা করালুম—শেবেকালে আগাখোড়া অবস্থা নিজে দেখে দিচ্ছে। নামকরণ কিন্তু আমার নিজের। তারিগীবাবু নাম দিয়েছিলেন Mysteries of Kulakundalini;—ও-নাম যে ভুল হ'ত তা নয়—কিন্তু কেমন বেন ছাড়া-গাড়া ঠেকে

—বুঝে কিনা!—সেখ, এইটুকু সন্দেহ মনে রাখবে একে, ব্যাকরণ-তত্ত্ব হ'লেই হ'ল না, শব্দ-স্বাক্ষার একটা মস্ত বড় জিনিষ!—এই দেখ না, রেনল্ড-সাহেব যদি তাঁর বইয়ের নাম রাখতেন Mysteries of London, তাতে ক'রে কিছু ভুল হ'ত না তো!—

কিন্তু তা না ক'রে তিনি যে তাঁর বইয়ের নাম রাখলেন—Mysteries of the Court of London, সে কেবল শব্দ-স্বাক্ষারের খাতিরে,—বুঝে কিনা!”

অতিকণ্ঠে হাসি সামলে বল্লম—“বাস্তবিক এটা এতদিন আমাদের মাথায় আসেনি।”

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে রায়বাহাদুর বললেন—“মস্তিষ্কের পরিচালনা না করলে মাথা কি আপনি খুলবে, পেরেশ?”

বল্লম—“তা তো বটেই।”

উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর ব'লে যেতে লাগলেন—“তা ছাড়া তোমরা কোন জিনিষ ঠিক নজর ক'রে দেখ না। তুমি তো বি-এ পাশ করছ, এমন কোন ইংরেজী ক্রিয়াপদের নাম কর দেখি—যা বাংলাভাষা থেকে নেওয়া।”

একটু ভেবে নিয়ে বল্লম—“আজ কাল দু'একটা

দেশী ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে চল হ'য়ে গেছে বটে,— যেমন ‘গুট করা’ কথাটার জায়গায় ইংরেজীতে আঙ্গকাল ‘loot’ শব্দটা অনেক সময় ব্যবহার হ'তে দেখা যায়।”

অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে রায়বাহাদুর ব'লে উঠলেন—“আরে না না, ও তো হালুফিল ব্যাপার। আমি এমন ক্রিয়াপদের নাম করব যা কোন যুগে এদেশ থেকে ওদশে গেছে তা ওরাও জানে না—আমরাও জানি না।”

বল্লম—“তাই নাকি?”

বল্লম—“হ্যাঁ!—এই ধর না, ‘অক্সাপাওরা’ কথাটা তো বাঁটা দেশী শব্দ।”

বল্লম—“সে-বিষয়ে সন্দেহ কি!”

বল্লম—“আমি যদি এই কথাটাই ইংরেজী গ্রামারের বইয়ে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে দেখতে পাই—”

বল্লম—“তাই নাকি!”

বল্লম—“এগুনি দেখাচ্ছি দাঁড়াও!” কথাটা শেষ ক'রেই একটা খুলপাঠা ইংরেজী গ্রামারের ‘কন্জুগেশনের ‘চাপাটায়’ খুলে আমার চোখের হুহুখে মেলে ধ'রে বললেন—“দাশ-দেওয়া কথাটা প'ড়ে দেখ তো।”

অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি—লেখা রয়েছে—“Occupy—Occupied—Occupied.”

কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে রায়বাহাদুরের মুখের পানে চেয়ে রইলাম। রায়বাহাদুর বললেন—“কেমন, পেলে তো?”—তারপর তিনি প'ড়ে যেতে লাগলেন—“অক্সাপাই—অক্সাপায়েড—অক্সাপায়েড।”

বলা বাহুল্য, হাসি চাপতে গিয়ে আমাকে সেদিন হেঁচে, কেশে, ঘাড় চুলকে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠতে হয়েছিল।

রায়বাহাদুর বললেন—“চারদিকে একটু নজর রাখতে হয় যে—শুধু পড়াপাঠার মত প'ড়ে গেলেই হয় না।”



কথাটা শেষ ক'রেই রায়বাহাদুর হঠাৎ ব'লে উঠলেন—“আর একটা শুভ সংবাদ আছে; কিছুদিন হ'ল লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার অসম্মতি প্রার্থনা ক'রে এক পত্র লিখেছিলুম—প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; ১১ই আগষ্ট দেখা করবার তারিখ পড়েছে। আজ হ'ল তোমার ১০ই জুলাই। তা হ'লে হাতে রইল মোটে একমাস ছ'দিন।—এর মধ্যে সব—”

কথাটা আর শেষ করা হ'ল না—হঠাৎ ব'লে উঠলেন—“এদিকে কিন্তু এক মহামুসলি প'ড়ে গেছি হে;—আমাদের গ্রামের এক ছোকরা আজ ক'দিন হ'ল স্বদেশী হাঙ্গামায় ধরা পড়েছে।”

বললুম—“তাতে আপনার বিপদ কোনখানটার তা তো বুঝতে পারলুম না।”

বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলেন—“তাকে যে আমিই মাসহারা দিয়ে—কলকাতার লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলুম,—রাজদ্রোহীকে অগ্নিস্রাব্য করা কতবড় অপরাধ তা জানি?—আমি অবশ্র না জেনে করেছি, কিন্তু পুলিশে কি তা শুনবে!”

এই সব আলোচনার পর ভূরিভোজন সেরে যখন মেসে কিছুলম্ব তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

চার দিন পরে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। বেলা তখন পাঁচটা হবে। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ি পার হ'য়ে উঠানে পা দিয়েই শিউরে উঠলুম;—দেখি উঠানের পশ্চিম দিকের রকের উপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে লাল পাগড়ীধারী এক পাহারাওয়াল। বিপুল নাসিকা গর্জনে পূর্বক নিজা যাচ্ছে।—সে কি আগুয়াল!—পিলে চমকে যায়। মনে মনে ভয় পেদুম—পুলিশ কেন রে বাবা!—সেই স্বদেশী ছোকরাকে স্বর্ধন-সাহাব্যের স্মরণ নয় তো?

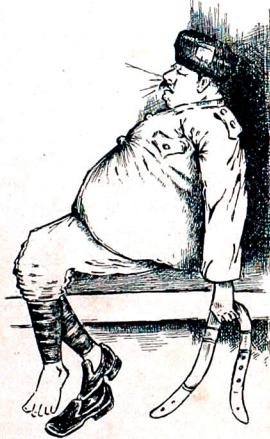
ভয়ে ভয়ে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ ক'রে

রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলুম—“বাণার কি, মশাই,—বাড়ীতে পুলিশ কেন?”

একটু মৃৎকে হেসে রায়বাহাদুর বললেন—“ও হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাহারাওয়াল!—”

বললুম—“তা তো বুঝলুম—কিন্তু এখানে কেন?”

বললেন—“ও রোজই একবার ক'রে আসে।”



পাহারাওয়াল নাসিকা গর্জনে ক'রে নিজা যাচ্ছে

বললুম—“রোজ আসে কেন?”

হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠে বললেন—“বনমালীকে পাগড়ী বাঁধা শেখাতে।”

কথাটা শেষ ক'রেই ডাকলেন—“বনমালী!”

সঙ্গে-সঙ্গেই বনমালী ভক্ত হুহমানের মত জোড়করে

হুস্বে এসে দাঁড়াল।

পাতলা লিঙ্গিকে লোকটি। আকাশ-প্রদীপের

বাণের মত বৈকে গেছে। বয়েস গোটা পরতাশ্রি হ'বে।

অত্যন্ত ভারী কণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“পাগড়ী বাঁধা হুস্বে-ক'রিনি কেন এখনও?”

হাত জোড় ক'রে বনমালী বললেন—“আজ্ঞে, আপনি যে হুস্বে করেছিলেন—আজ থেকে আপনার সামনে পাগড়ী বাঁধা হবে।”

গলার স্বরটাকে আরও ভারী ক'রে তুলে রায়বাহাদুর বললেন—“আচ্ছা, ভক্তসিংকে এইখানে জেকে আন, আর আমি যে আধখান শালু কাগ কিলে এনেছি, ম্যানেজারবাবুকে বার ক'রে দিতে বল।”

কয়েক মিনিট পরেই আধখান শালু বগলে বনমালী এবং তৎপশ্চাত্ত ভক্তসিং, ঘরে প্রবেশ করলে। রায়বাহাদুর বললেন—“দেখ ভক্তসিং, আজসে ঐ আধখান শালু বনমালীকে মতকমে বাঁধনে হোগা। পাগড়ী যত বড় হবে ইচ্ছত ততই বহিত হোগা কি না।”

“জি!” ব'লে পাহারাওয়ালগুণ্ডব শালুর থানের পাট ভাঙতে হুস্বে ক'রে দিল। আধখান শালু—চাড়ভিনা বাপার তা আর নয়। যত খোলে ততই নেন মনে হয় কাপড় বেড়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কথা মনে পড়ে গেল। পাট-ভাঙ্গা যদিই বা অতিক্রমে শেষ হ'ল পাগড়ী-বাঁধা আর শেষ হ'তে চায় না। একে বাঙ্গালীর মাথা—বাগ মানতে চায় না—ক্রীড়িনের অভাব। তার ওপর আধখান কাপড়!—খানিকদূর অবধি এগোয়, তার পরেই হঠাৎ থলে যায়। এমনি ক'রে বার বার পাট বার চেষ্টার পর অষ্টম বারে শেলাই কেঁড় দিয়ে পাগড়ী অতিক্রমে খাড়া হ'ল, কিন্তু মুকিল বাবুল বনমালীর। পাগড়ী খাড়া হ'ল বটে, কিন্তু পাগড়ীর ভায়ে বনমালী আর খাড়া হ'তে পারে না। একে লিঙ্গিকে পাতলা মাছুর তার ওপর ঐ আধখান কাপড়ের বিরাট পাগড়ী!

ভক্তসিং চ'লে যেতে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলুম—“রোজই কি এমনি ক'রে পাগড়ী বাঁধা হয়?”

বললেন—“হ্যাঁ—রোজই!—এর জন্তে ভক্তসিংকে রোজ একট ক'রে টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়।”

জিজ্ঞাসা করলুম—“এত খরচ ক'রে গুকে পাগড়ী-বাঁধা শেখাচ্ছেন যে বড়?”



পাগড়ীর ভায়ে বনমালী খাড়া হ'তে পারে না

বললেন—“জান না বৃষ্টি?—সাতমাসহেবের সঙ্গে দেখা করবার সময় বনমালী যে সঙ্গে থাকবে।”

কথাটা শেষ ক'রেই হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে—

বললেন—“ঐ ব্যাটাকে নিয়েই তো ভাবনা।—ব্যাটা



সেখানে গিয়ে যদি খাবড়ো যায়?" পরক্ষণেই বনমালীর দিকে চেয়ে বললেন—“কি রে, লাটদরবারে গিয়ে খাবড়ো যাবিয়ে তো?"

সে পাগড়ীভাঙে মাথা থেকে একটু একটু করে খসাতে খসাতে বলল—“আজ্ঞে খাবড়ো কেনে—লাটসাহেবও মাহু, আমিও মাহু!”

রায়বাহাদুর হতশ হ'য়ে বললেন—“ব্যাটা সর্পনাশ করলে দেখছি!” আমি তো আবাক—ভেবেছিলাম, বনমালীর সাহস দেখে রায়বাহাদুর খুশি হবেন—কিন্তু কল হ'ল ঠিক উভে।

বলুন—“ভালই তো, মশাই—ওর যদি ভয় না করে সে তো স্বপ্নের কথা!” বললেন—“না—তুমিও দেখছি ওরই মতন মুখা হ'লে!”

বলুন—“কিছুই তো বস্তুতে পারছিনে, রায়বাহাদুর!”

কিছুক্ষণ চুপ করে ব'সে থেকে অত্যন্ত নিরাশ কণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“আরে বাপু, ভয়কে জয় করতে হয় ভয়ের সঙ্গে লড়াই করে, ভয়কে এড়িয়ে গিয়ে নয়!—এ আমার কথা নয়!—একথা 'বগলা-তরুর' মতো লিখছে—গুচ্ছ!”

বলুন—“জিনিষটা ঠিক বস্তুতে পারছেন না!”

বিরক্ত হ'য়ে বললেন—“এসব কথা যদি এত সহজে বস্তুতে তা হ'লে তো ‘কুলকুওলিনী-রহস্য’ তুমিই লিখে দেবোত হে!” তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে ব'সে থেকে বললেন—“ব্যাপারটা গুলে বলি যোনো,—ও বাটা যে বলছে লাটসাহেবও মাহু, ও নিজেও মাহু—সে কথা ঠিক—কিন্তু লাটসাহেব না দেখে ওকথা বলা আর লাটসাহেব দেখে ওকথা বলা এক জিনিষ নয়!—লাটসাহেবকে আমি ভয় করি না, একথা বললেই ভয় চ'লে যায় না। বরং লাটসাহেবকে আমি ভয় করি, একথা স্বীকার করে একটু একটু করে অভ্যাসের দ্বারা ভয়কে জয় করতে হয়।—তালিকরা সেইজনে ভূতের ভয়কে অস্বীকার না করে অমাবস্তার রাতিরে—

শশানে গিয়ে ইচ্ছে করে ভূতের ভয়ে কাঁচক উঠে, তবে ভূতের ভয়কে জয় করে ফেলেন। কীকি চলে না বাপু—সব জিনিসেরই সামান্য আছে!”

বলুন—“সে কথা ঠিক বটে!”

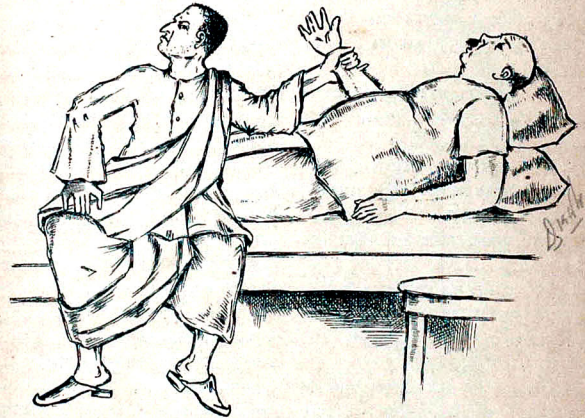
সেদিনও মেসে দ্বিত্তে অনেক রাত হয়েছিল।

এমনি ভাবে দিন বেতে লাগল। রোজই বৈকালের দিকে একবার করে বরানগর ঘুরে আসি। উজ্জাপর্ণ বৈশ ঘটা ক'রেই চলেছে। মাঝে আর নাট দিন মাত্র বাকী!—সবই প্রস্তুত। একখানা Mysteries of the Court of Kulakundalini দপ্তরীকে দিয়ে ভালো মরকো-সোদারে বাধিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটা রূপোর ট্রে কেনা হ'য়ে গেছে। রায়বাহাদুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ রূপোর ট্রে ওপর মরকো-সোদারে বাঁধানো Mysteries of the Court of Kulakundalini খানি নিয়ে বনমালী বাবে। কাছাকাছি গিয়ে ট্রে ওপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে রায়বাহাদুর নিজহাতে লাটসাহেবকে উপহার দেবেন। ব্যবস্থা সব আগে থাকতেই ঠিক হ'য়ে আছে—এখন কেবল গেলেই হয়। এতদিনেও কিন্তু বনমালীর পাগড়ী কিছুতেই বাগ মানছে না—কেবল গুলে গুলে পড়ে। রায়বাহাদুরকে বলেছিলাম—“পাগড়ী ছোট ক'রে দিন!” রায়বাহাদুর বলেছিলেন—“তুমি দেখ, পরেশ, ঐ পাগড়ী আমি মাথায় ফিট ক'রে দেখো!”

প্রতিদিনের মত সেদিনও বৈকালের দিকে জমিদার-বাড়ী গেছি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি—রায়বাহাদুর তালিকার হেলান দিয়ে মড়ার মতন প'ড়ে রয়েছেন, আর পাশে ব'সে এক প্রবীণ কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করছেন। কয়েক সেকেন্ড পরে, পরীক্ষা শেষ করে, মুখনাকে বাঁগার পাঁচের মত বৈকিয়ে কবিরাজ বললেন—“নাড়ী বড় দুর্বল!

মাত্র দিন আগেও তো দেখে গেছি—তখন তো এরকম নাড়ী ছিল না। সম্ভ্রুতি কি কোন নতন দৃষ্টিভঙ্গি? আপনার মাথায় ঢুকেছে? খবরদার, আমার কাছে কোন কথা গোপন করবেন না। প্রতিকারের বাইরে গিয়ে পড়লে তখন আর কোন উপায় থাকবে না।”

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কবিরাজ বললেন—“বড় বৈশিষ্ট্যবশত দেখেন কি?” “আজ্ঞে দেখি।” ঐযথ-ব্যবস্থা ক'রে কবিরাজ চ'লে গেলেন। বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—“অথবা কি, কবিরাজ মশাই?”



কবিরাজ রায়বাহাদুরের নাড়ী পরীক্ষা করছেন

তো কিছুই দেখেছি,—তবে চার দিন পর লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে—তারি জন্তে একটু ব্যস্ত আছি বটে!”

কবিরাজ শুধু বললেন—“হুঁ!” তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবে নিয়ে বললেন—“রাত্রে কি হুমিলা হয় না?”

পূর্ণবৎ কীর্ণ কণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“আজ্ঞে না।”

একটু হেসে কবিরাজ বললেন—“নার্ভাসনেস্ আর কি!—ভয় হয়, লাটসাহেবের সামনে গিয়ে হাটফেল না করেন।”

যদিও কবিরাজ এসে দেখি রায়বাহাদুর চক্ষু বৃদ্ধ প'ড়ে রয়েছেন—মুখটি কিন্তু অল্প অল্প নড়ছে—কি যেন বিড় বিড় করে ব'কেছেন। মুখের কাছে কান নিয়ে শুনি, তিনি ক্রমাগতই আঙড়ে বাছেন—“জীব-জন্তে ভয় কি রে যার জগদাধী জননী!”—হাসিও গেল,



জ্বংগ হ'ল। বৃষ্ণভূম ভদ্রলোক প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে আদ্যাহোলা খেয়ে লেগেছেন। এখন 'জগদধা জননী' নূর ভুলে চাইলেই হয়।

'জগদধা জননী' সত্যই মুখ ভুলে চাইলেন। পরদিন গিয়ে দেখি কবিরাজের বড়ীর গুণেই হোক, আর জগদধার কুপা লাভ ক'রেই হোক, রায়বাহাদুর অনেকটা চাচা হ'য়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ কেমন আছেন?"

উত্তরে শুধু বললেন—"জীব-জন্তু ভয় কি রে যার জগদধা জননী।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর হঠাৎ বল'ে উল্লেন—"দেখ, একটা মন্তলব এঁটেছি।"

বললুম—"কিসের মন্তলব, রায়বাহাদুর?"

বললেন—"এখনও তো হাতে তিন দিন রয়েছে।"

বললুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বললেন—"বনমালী ব্যাটার মাথা কামিয়ে দিলে হয় না?"

বললুম—"তাতে কি লাভ হবে, মশাই?"

বললেন—"আমার কথাটা আগে শেষ অবধি শোনই না ছাই।"

বললুম—"বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—"আজ যদি বনমালীর মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিই—তিন দিনে নিশ্চয়ই অল্প অল্প খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে।"

বললুম—"তা গজাতে পারে।"

বললেন—"গজাতে পারে কি—নিশ্চয়ই গজাবে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ হে!—উপনয়ন হয়েছিল তো তোমার।"

বললুম—"তা হয়েছিল বৈ কি।"

বললেন—"উপনয়নের সময় মস্তক মুণ্ডন হয়েছিল তো?"

বললুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বললেন—"দণ্ডভাঙ্গনের দিন, মনে পড়ে, উত্তরীয়

দিয়ে মাথা ঢেকে যখন গঙ্গামানে গেছে—তখন উত্তরীয় মাথায় কি রকম কামড়ে ধরেছিল।"

বললুম—"মনে পড়ে বটে—উত্তরীয় বৃত্তে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।"

বললেন—"মনে করেছি, বনমালীর মাথাটা কামিয়ে দেবো। তা হ'লে হবে কি জান,—এই তিন দিনে বেশ খোঁচা খোঁচা চুল গজাবে, তাতে ক'রে ফল হবে এই যে, পাগড়ী বেশ মাথার সঙ্গে কামড়ে ধরবে—সহজে থুঁবে না,—তুমি কি বল?"

কি আর বল,—অবাক হ'য়ে লোকটার মূষের দিকে চেয়ে রইলুম,—মাথা বটে!

আখ বটীর মধ্যেই বনমালীর মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপার সমারোহে হুস্পন্দ হ'য়ে গেল। বেচারার সে কি ছাখ, মথের বাবুী চুল,—কতকালের সাধনার ফল। স্পষ্ট দেখলুম—বেচারার চোখ দিয়ে টু টু ক'রে জল পড়ছে। কিন্তু উপায় কি?—চুল আগে, না চাকরী আগে!

বাইরে গিয়ে বনমালীর সে কি আবেগ!—আজও সেকথা ভুলতে পারিনি। সে বলল—“বাবু, সব টিক-ঠাক—আর পনেরো দিন পরেই দেশে গিয়ে বিয়ে করব, এই সময় কিনা মাথা মুড়িয়ে গিলে।”

বললুম—"এত বয়সে এখনও বিয়ে করিনি?"

বললেন—"কিটায় পক্ষ, বাবু—পনেরো বছরের মোসোজ মেয়ে—নেড়া-মাথা দেখলে কি আর বিয়ে করতে রাজী হবে?"

দেখি, বেচারার হুঁচোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আজ ১৬ই আগষ্ট। কাল বেলা ছুঁটার সময় লাট-দিন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"আজ কেমন বোধ করছেন?"

বললেন—"দেখ, আশ্চর্য্য। ব্যাপার—আজ আর আমার একটুও ভাবনা হচ্ছে না।—অথচ শিরে সজোস্তি।"

বললুম—"ভালই তো!"

বললেন—"কৈ, আমাকে দেখলে কি নার্ভাস হয়েছি ব'লে মনে হয়?"

বললুম—"মোটাই না।"—মনে মনে কিন্তু বেশ বৃত্তে পান্ধিলুম—ভদ্রলোক অত্যন্ত নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন।

রায়বাহাদুর বললেন—"দেখ, ভয় জিনিষটা হচ্ছে মনের ব্যাপার। মন যাদের নিজের বশে—তারা ভয়কে অন্যরাসে জ্বর করতে পারে। এই দেখ না, এতবড় একটা বিপদ মাথার উপর ঝুলছে—অজ্ঞ কেউ হ'লে হয়ত শয্যা নিত—আমি কিন্তু দিবা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি।" আমি কি বসতে যাচ্ছিলুম, বাধা দিয়ে বললেন—"আমি এক বর্ণণ্ড বাড়িয়ে বলছি, পরেশ।"

বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় বললেন—"কাল সকালের দিকে একবার এসো, পরেশ। বাবার সময় তোমাদের মুণ্ডলি একবার দেখে যাব।"

অতিকণ্ঠে হাসি সামলে বললুম—"আসব বৈ কি।"

পরদিন বেলা দশটার সময় গিয়ে দেখি রায়বাহাদুর দেহ-গুণে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে রয়েছেন। গায়ে প্রকাণ্ড এক শালের জোকা, মাথায় রেগেমের বাঁধা পাগড়ী। আমাকে দেখেই বললেন—"এসেছ, তোমার জজ্ঞেই অপেক্ষা করছি। এইবার তা হ'লে 'জুগু' 'জুগু' ব'লে বেরিয়ে পড়া যাক।"

সবিস্ময়ে বললুম—"এখন তো সবে দশটা;—আপনার তো ছুঁটার সময় দেখা করবার কথা।"

বললেন—"আহা! বাজ্ঞে বকে! কেন?—আমরা তো আর এখন লাটসাহেবের কাছে যাচ্চিনে।"

বললুম—"তবে?"

বললেন—"আমরা এখন যাচ্ছি ইডেন্ড গার্ডেনে।"

বললুম—"তার মানে?"

বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"বোঝ না, কাছাকাছি

পাকা ভাল, সময় হ'লেই তট ক'রে চ'লে যেতে পারবা।" বৃষ্ণভূম—এর ওপর আর কথা। চলে না।

'জুগু' 'জুগু' ব'লে রায়বাহাদুর বেরিয়ে পড়লেন। আগে টলছেন রায়বাহাদুর, পশ্চাতে গঙ্গামদন মাথায় বনমালী, সে এক অপূর্ণ দৃশ্য!



রায়বাহাদুর দেহ-গুণে প্রস্তুত

মোটর ছাড়বার পূর্বে ম্যানেজারবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"ভক্তনিকে নিয়ে আপনি কখন যাচ্ছেন?" ম্যানেজারবাবু বললেন—"আপনি কিছু ভাববেন না, বাবোটার মধ্যেই আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছোছি। পাগোভার তলায় থাকবেন তো?"



রায়বাহাদুর বললেন—“হাঁ!” তারপর আমার দিকে অত্যন্ত করুণ নয়নে চেয়ে বললেন—“ওবেলা একবার এসো!”

বললুম—“নিশ্চয়ই আসব!”

রায়বাহাদুরের মোটার ছেড়ে দিলে ম্যানেজার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—“ভকৎসিংকে নিয়ে যাবেন কেন?”

ম্যানেজারবাবু বললেন—“বুধছেন না—এখন তো সব দলটা—এর মধ্যে কতবার পাগড়ী খুলে যাবে তার ঠিক কি!—বড়লোকের কাণ্ড, মশাই!”

সমস্ত ছপুট্টা ছটফট্ট করে কাটিয়ে বেবো পাচটা নাগাদ বরানবর অভিযুগে রওনা হলুম। বুক দুঃস্বপ্ন করছে—না-জানি কি শুনতে হয়। সেট পার হ’য়েই বনমালীর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই সে ছুটে এসে পা-ছট্টা ভড়িয়ে ধ’রে কাঁদতে ব্রহ্ম করে দিলে।

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল, তবে কি?—কণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—“বাপার কি, বনমালী?”

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—“বাবু, আমার সর্লশান হ’য়ে গেছে!” কিছুই বুঝতে না পেরে বললুম—“কি হয়েছে, শিগগির খুলে বল!” সে বলল—“আমার চাকরী গেছে, বাবু!” খড়ে বেন প্রাণ এল। বললুম—“বাবু ভাল আছেন তো?”

বলল—“তিনি তো শয্যা নিয়েছেন।—আমার কিন্তু কি হবে, বাবু?”

বললুম—“হয়েছে কি খুলে বল না!” বলল—“বাবুর মুখে সব শুনবেন, হুজুর!—আমার কোন কর্তার নেই, শুধু শুধু চাকরি গেল!” বললুম—“আচ্ছা, বাবুকে বুঝিয়ে বলব’খন—এখন ছেড়ে দে!”

বৈঠকখানা ঘরে ঢুক দেখি—ঘর খালি—কেউ কোথাও নেই। বেরিয়ে আসছি, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—“এই যে, আপনি এসেছেন—বাবু আপনাকে অনেক ক্ষণ থেকে খুঁজছেন।—চলুন ওপরে।” বললুম—“সন্ধ্যা না হ’তাই আজ ওপরে উঠেছেন যে বড়?”

বললেন—“শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।—কবিরাজ মশাই এইমাত্র ব’লে গেলেন—নাড়ী বড় কীণ।”

রায়বাহাদুরের তেতলার শরনকে প্রবেশ করলুম। ভয়লোক শয্যার উপর হতান্ত ভাবে পড়ে রয়েছেন,—“আমার সাজানো বাগান ভুজিয়ে গেল” গোছের অবস্থা। বাড়ীর বোকে কেউ বাতাস করছে—কেউ পা টিপছে—কেউ কিছু করছে না। পেরে শুধুই ভীড় বাড়ছে।—সে এক হৈ-হৈ বাপার! আমাকে দেখেই কাছে গিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

কাছে গিয়ে ব’সে জিজ্ঞাসা করলুম—“লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা হ’ল?”

কীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“আমার সর্লশান হ’য়ে গেছে, পরেশ!—বনমালী বাটা সব নষ্ট করে দিয়েছে!” বললুম—“কেন, কি হয়েছে?”

সেক্ষার কোন উত্তর না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে রায়বাহাদুর বললেন—“বাটাকে আমি দেখে নেবো!”

বললুম—“কেন, সে কি-এমন অপরাধ করলে?”

একটু দম্ব নিয়ে রায়বাহাদুর বললেন—“সব শোন তা’ হ’লে;—এখন থেকে তো বেরোলুম। তোমাদের সামনেই ত দিবিয়া গাঁট গাঁট করে মোটরে গিয়ে বসলুম। তখন পর্যন্ত নাড়াসুনেদের নাম-গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। তার পর ইচ্ছেমত গার্ডেন গিয়ে প্যাপোডার তলায় আশ্রয় নিলুম। তখন পর্যন্ত বেশ আছি। তার পর বারোটা নাগাদ

ম্যানেজারবাবু আর ভকৎসিং গিয়ে হাজির হ’ল—তখনো দিবিয়া আছি।—ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কত কথা হ’ল—দিবিয়া স্বাভাবিক অবস্থা।

“তার পর ক্রমে একটা বাহুল। ভকৎসিং বন-মালীর মাথায় নতুন করে পাগড়ী বাঁধতে বসল, আমিও এদিকে তৈরী হ’তে লাগলুম।

“তখনো দিবিয়া চান্দা আছি।

“ক্রমে পোনে ছটো হ’ল। ওদিকে বনমালীর পাগড়ী বাঁধাও শেষ হ’য়ে গেছে। নেড়ে-ড়ে দেখে লুম—পাগড়ী দিবিয়া মাথায় কান্ধে বসেছে। ভাগ্যিস তিন দিন আগে মাথা কামানো হ’য়েছিল। সবই তৈরী—নাড়া করলেই হয়।

“ছটো বাজতে দশ মিনিটের সময় লাটসাহেবের গেটের সামনে হাজির হ’লুম। যথাসময়ে ডাক পড়ল। ম্যানেজারবাবু আর ভকৎসিং বাইরে মোটরে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি আর বনমালী ভেতরে ঢুক গেলাম।

“আমি আগে আগে চলেছি—পছনে রূপার ট্রেব ওপর মরোকা-লোবারে বাঁধানো Mysteries of the Court of Kulakundalini নিয়ে বনমালী আসছে। এখর সেবার পার হ’য়ে শেষকালে লাটসাহেবের বাসুন্ধারামার দরজার সামনে এসে তো হাজির হ’লুম। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকতে হুতুম এল। সত্বে বলছি, পরেশ, তখন পর্যন্ত একটুও নাড়াসুই হইনি।

“প্রকাণ্ড হল—চলেছি তো চলেছি, দু’র থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে প্রকাণ্ড একটা উঁচু চোম্বার লাটসাহেব ব’লে রয়েছেন। এ গুণ্ডে লাগলুম—মনে মনে কেবলই ডাকছি—মা জগদম্ম, শেখরকে কোরো, না!

“আর বোম্ব হয় হাত দশেক এগুলোই লাটসাহেবের সামনে গিয়ে উপস্থিত হই—এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে

গেল—বনমালী বাটাকে তো দেখা হয় নি—বাটা ঠিক আসছে তো?

“সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন ফিরে একবার তাকালুম।—তাকিয়ে মা দেখলুম—তাতে সমস্ত শরীর কিম্ব কিম্ব করতে লাগল। মাখাটা টপ্ মল্ করে উঠল, চারিদিক অন্ধকার হ’য়ে এল। দেখি, বনমালীর মাথায় পাগড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। সঙ্গে-সঙ্গেই নজর প’ড়ে গেল,—অন্তবড় হৃদয়ের দরজা থেকে হুক-ক’রে যে পর্যন্ত আমরা চলে এসেছি, সমস্ত পথটি কে বেন শালু বিজিয়ে দিয়েছে। লাটসাহেবের দিকে ফিরে দেখি তিনি রমাল মুখে দিয়ে হাসছেন।—মাথা ঘুলিয়ে গেল।—দেখি দৈবিক-জ্ঞানশূন্য হ’য়ে তাড়াতাড়ি বনমালীর কাছে গিয়ে ট্রেব ওপর থেকে Mysteries of the Court of Kulakundalini-খানা ছুপে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে দেবো ব’লে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ থব্ থব্ করে হাত ছটো কঁপে উঠে; সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তবড় মোটা বইখানা ধপ্ করে হাত থেকে ব’সে মেঝের ওপর প’ড়ে গেল।

“অতিকণ্ঠে নিজেই সামলে নিয়ে মেঝে থেকে বইখানা তুলে নিয়ে লাটসাহেবের হাতে দিতে গিয়ে দেখি, মরোকা-লোবারের মলাটটি কেবল হাতে ঝুলছে—বইখানা মলাটহীন অবস্থায় মেঝের ওপর প’ড়ে রয়েছে।

“তার পর যে কি হ’ল, জানি না। চোখ চেয়ে দেখি নিজেব পোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, আর কবিরাজ মশাই নাড়ী ধ’রে প্রাশে ব’সে রয়েছেন।”

এই অবধি ব’লেই রায়বাহাদুর চূপ করলেন; তার পর হঠাৎ একসময় ব’লে উঠলেন—“আমার বুকটা কি-রকম যেন করছে, এগুলি কবিরাজ মশাইকে খবর দাও।”





## ভারতের লুপ্ত অতিকায় সন্ন্যাস

শ্রীহর্ষনাথ রায়চৌধুরী

কোট কোট বস্ত্রের পূর্বে—মানবের জন্মেরও  
বহু যুগ পূর্বে—পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, কিরূপ  
শ্রেণীর জীব তখন পৃথিবীতে বাস করিত, তাহাদের



শ্রীহর্ষনাথ রায়, বি.এস.সি. (লন্ডন),  
এ.স.আর.সি.এল.

প্রকৃতি এবং আকৃতি কিরূপ ছিল, এসকল বিষয়ে  
মাহাত্ম্য বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কথা জানিতে  
পারিয়াছে। সে-কালের গাছপালা ও লুপ্ত অতিকায়

জীবসকলের কথা লইয়া "Palaeontology" নামক  
শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছে।

মাটির নীচে, প্রস্তরীভূত লুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্থি-  
কঙ্কালাদি অনেক স্থানে খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে,  
এবং সেগুলিকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া ও সে-বিষয়ে  
গবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা নানা সিদ্ধান্তে উপনীত  
হইয়াছেন। লুপ্ত প্রাণীর সামান্য ছই-চারটি অস্থি  
পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞেরা সেই প্রাণীর চেহারা,  
স্বভাব, আকার প্রভৃতির বিষয় অনেক খবর বলিয়া  
দিতে পারেন। প্রস্তরের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর লুপ্ত  
উদ্ভিদ ও জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া  
প্রস্তরের বয়স নির্ধারণ করার উপায় বাহির করা  
হইয়াছে। আবার, প্রস্তর দেখিয়া লুপ্ত জীবের  
অস্থি বা চিহ্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও তাহারা নির্ধারণ  
করিতে পারেন।

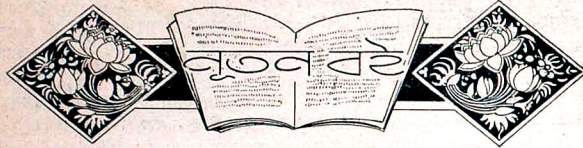
ভারতবর্ষে সেকালের জীব কিরূপ আকারের ছিল  
এবং কোথায় তাহারা বাস করিত, সে-বিষয়েও অনেক  
গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার  
সি. এ. ম্যাটলি নামে এক বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত  
জঙ্গলপুরের নিকটস্থ 'বড়-সিমলা' পাহাড়ে 'ডাইনোসর'  
জাতীয় লুপ্ত অতিকায় সন্ন্যাসের অস্থি আবিষ্কার  
করেন। এ বৎসরেও তিনি জঙ্গলপুরে গিয়াছিলেন।  
তাহার সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ভূতত্ত্ব-জরিপ-বিভাগের  
শ্রীমুকু মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাহাদের চেষ্টায় এবারও

'হোট-সিমলা' নামক পাহাড়ে খননের ফলে কয়েকটি ও লম্বা গলা বসাইলে বক্রপ হই, সেইরূপ;  
অতিকায় সন্ন্যাসের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ইহার তব, আকারটি ছিল বিরাট। ইহার উভর ছিল—  
মধ্যে, একটি জন্তুর হাড় লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, অর্থাৎ জলে-ফুলে বাস করিত; তবে, অধিকাংশ  
পায়ের ভূইটি হাড় লম্বায় ২ ফুট ৮ ইঞ্চি করিয়া, সামনের সময় জলেই কাটাইত। মস্তক নিতান্তই ছোট ছিল  
পায়ের উপর দিকের হাড় লম্বায় ৩ ফুট, একটি এবং আশ্চর্য্যের বিশেষ কোন অঙ্গ ছিল না; সেজন্ত  
পাঞ্জরের হাড় ২০ ইঞ্চি। এই জানোয়ার লম্বায় প্রায় জলে বাসই ইহাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল।  
ত্রিশ হাত ছিল। ১৯১৯ সালে যে অস্থি পাওয়া এই সকল সন্ন্যাসের 'ডাইনোসর' নাম দেওয়া  
গিয়াছিল, তাহা ছিল আরো বড় জানোয়ারের—লম্বায় হইয়াছে ('ডাইনো' অর্থাৎ ভয়ানক, 'সর' বা 'সরাস'  
সে জানোয়ার ছিল প্রায় ত্রিশ হাত। এবারে যে অর্থাৎ সন্ন্যাস—কথাগুলি গ্রীক)। ইহাদের মধ্যে  
জানোয়ারের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম নানা জাতীয় সন্ন্যাস আছে; আমিষভোজীও  
দেওয়া হইয়াছে টাইটানোসরাস। এই জীবের চেহারা আছে। ভারতবর্ষেও আমিষভোজী ডাইনোসরের  
ছিল অনেকটা, খোলাপের শরীরে সাপের মাথা অস্থি পাওয়া গিয়াছে।

"জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিসৃষ্টির অবমাননা করা।  
মহা বংশোদ্ভূত, 'বর ন্যাস্য পুঞ্জান্তে নন্দন্তে' তরা দেবতা, যত্নতান্ত্র ন পুঞ্জান্তে সর্গাত্তাকলা:  
ক্রিয়াঃ।"—যেখানে স্রীলোকের আদর নাই, স্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে  
দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্ত এদের আগে ভুলত হইবে—এদের জন্ত আদর্শ মঠ  
স্থাপন কর্ত্তে হবে।"

—বিবেকানন্দ





[ 'উদয়ন' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারের অন্তর্গত করিমা তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন ]

## দি ইনসিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ—

ম্যানেজিং এডিটর—ডাঃ এন্সি, রায়। এডিটর—শ্রীমণীশ্রমোহন মৌলিক।—১৪, ক্রাইস্ট ট্রিট, কলিকাতা, ইংলে প্রকাশিত। তৃতীয় বার্ষিকী সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

গত তিন বৎসর হইতে এই পত্রিকা দেশীয় ব্যবসায়িকের ভারতীয় অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বীমা, শিল্প এবং অজ্ঞাত উপায়ে জাতিগঠনের বিশেষ সহায়তা করিতেছে। সত্যকার অসমস্তার প্রতি ভারতীয়দের বাহাতে শৈথিল্য না ঘটে, তদুপেক্ষে এই পত্রিকার অঙ্গান্ত পরিশ্রম আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শুধু সমতা-সমূহের বিবৃতি লইয়াই ইহা ক্ষান্ত থাকে নাই, দেশের বিখ্যাত এবং বিখণ্ড অর্থনৈতিকদের এবং ব্যবসায়ীদের চিন্তার ফল এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া উন্নতির এবং কর্মকুশলতার নতুন পথ আবিষ্কারে সহায়তা করিতেছে।

এই সংখ্যা বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ ও নানা প্রকার নতুন তথ্য পরিপূর্ণ। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বিশ্বেশ্বনাথ ঘোষ, অধ্যাপক রামচন্দ্র রাউ, অধ্যাপক বাংলা শিরোভিত্তির উপায়, বিদ্যাবাগী অর্থনৈতিক দৃষ্ট এবং লণ্ডনের অর্থনৈতিক সম্মিলন সম্মেলনে কয়েকটি দৃষ্টান্তগ্রাহী এবং সুস্বিকৃপূর্ণ প্রবন্ধ দিয়াছেন। ব্যবসায়িকের সর্বাঙ্গের পাতননাম নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদচরিত্র সমৃদ্ধ মন্তব্য লইয়া সত্যই এই 'ফাইনান্স রিভিউ' গর্ব্যমত্ব করিতে পারে।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীদিগের বিশেষভাবে রচিত এবং অতি-আধুনিক তথ্য সংবলিত প্রবন্ধগুলি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে; সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিও অত্যন্ত সারবহুলপূর্ণ।

## মিত্র

### বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (তৃতীয় ভাগ)—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২১, কংগ্রেস ট্রিট, কলিকাতা, ইংলে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। কাপড়ে বাঁধাই: ৪৮২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকের নতুন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। ইহার যে তৃতীয় ভাগ অবধি লিখিত হইল, তাহাই ইহার সুপ্রচারের পরিচয়। অলস ও ঘরমুখো বলিয়া বাঙ্গালী জাতির কৃথাকি আছে। কিন্তু এই অলস বাঙ্গালীই জীবিকার সন্ধানে বা নতুন দেশ দর্শনের মোহে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছুটিয়া গিয়াছে, এবং অদ্য সাংসে আপনাদের ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে যে-সব বাঙ্গালীর জীবন-কথা পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই উদ্ভম্মী, উদ্যমী ও কন্দলী—অর্থাৎ তাহারা অলস বাঙ্গালীর ব্যতিক্রমগুলি। এইসব কৃত্তি বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালী-সাধারণের ধারা পটিত হইলে বাঙ্গালীর নৈরাশ্রম্য জীবন আশাপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে।

## গুপ্ত



যে-সব সম্ভব সাহিত্যিক ও কৃত্তবিদ্য ব্যক্তি আমাদের 'উদয়ন'ের সাফা কামনা করিয়া প্রীতিপূর্ণ পত্র দিয়াছেন, তাহাদের শুভ-ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র পক্ষে। আমরা কৃত্তজতার সহিত তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি:—

মাননীয়া লেডী অবলা বসু, মেয়র শ্রীমূল সন্তোষ-কুমার বসু, ডাঃ শ্রীমূল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীমূল কালিদাস নাগ, অধ্যাপক শ্রীমূল চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমূল কালিদাস রায় কবিশেষণ, অধ্যাপক শ্রীমূল প্রবোধচন্দ্র সেন, স্টেটম্যান পত্রিকা-আফিস ইংলে মিঃ গুণালটার বাকু, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এডভান্স, লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, বীরভূম-বাণী, বাতায়ন, হিন্দু, জনশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ, 'পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়' ইংলে শ্রীমূল বীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং এফ, ডবলু, হিগলার্স এণ্ড কোং ইংলে মিঃ ই, এ, বোলামি, প্রভৃতি।

'উদয়ন' যে সাহিত্য-জগতে একটা কিছু অভিনব ব্যাপার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্যের সেবকমাত্র, 'উদয়ন'ও সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই আপনাকে কৃত্তার্থ করিতে চাহে। সেবাকার্য্যে একট-বিচ্ছাতি ঘটা সম্ভব নহে। সহস্র ও সহস্র পাঠকগণ আমাদের লক্ষ্য-সাধনে সহায়তা করিবেন; এ ভরসা আমাদের আছে।

লেখকগণের রচনা সংগ্রহ ও তাহা দ্বারা ই কাগজের কলেবর পূর্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য, যে-কোনো সাময়িক পত্রিকার এইটিই মুখ্য কাজ; তথাপি, সাময়িক পত্রিকার আর-একটি কার্য্য ইংলে সাহিত্যের বিবর্তন-ধারার সহিত, তাহার অতীতের সম্পর্কতার সহিত বাস্তবতার পাঠক-সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া। 'উদয়ন' সেই কার্য্যেও আপনাকে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।

বর্তমানে একপ্রকার পাঠক দেখা যায়, বাহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পাঠ করিয়াই বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ করেন। তাহাদের মতে প্রাক-রবীন্দ্র-শরৎ বঙ্গসাহিত্য সাহিত্য হিসাবে গণ্যই নহে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভাবলে যে বঙ্গসাহিত্য অত্যন্ত লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়াজ সন্দেহ নাই। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, জীবজগতে যেমন, সাহিত্য-জগতেও তেমনি জন্মবিবর্তন আছে। ভিত্তিশূন্য জীবন যেমন অসম্ভব, অতীত-উৎস-শূন্য সাহিত্যও তেমনি শূন্য। বঙ্গসাহিত্যের বয়স প্রায় হাজার বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার যুগ-বিভাগও কম নহে। অল্প কয়েকটি নাম করিতে হইলেও দেখিতে পাই, রামায়ণ পণ্ডিত, বিষ্ণু গুপ্ত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস-কাশীদাস, গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণদাস করিবার, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু ও ইন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও অক্ষয়-কুমার, গিরিশচন্দ্র ও শিবেশ্বরলাল—প্রত্যেকেই যুগ-

সাহিত্যের সেবা অর্থে কেবলমাত্র বর্তমান



বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাধনার বঙ্গসাহিত্য পরিপূর্ণ হইয়াছে। স্মৃত্যং এই যে দেবকদল, ইহাদের সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক কি না, এবং আকস্মিক না হইলে তাহা পূর্ববর্তী সাহিত্য-পারার সহিত কি সঙ্গদে আবদ্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে। মুহম্মদরাম না থাকিলে ভারতচন্দ্র কতটা দাঁড়াইতে পারিতেন, ভারতচন্দ্র না থাকিলে কবিগোলাল, কিরণ উগ্রতি লাভ করিতে পারিতেন, কবিগোলাল না থাকিলে দ্বৈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা কতটা খুলিত, এবং দ্বৈশ্বর গুপ্ত না জন্মাইলে রঙ্গলাল, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা কতটা অগ্রসর হইতে পারিত, এবং মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভা কতটা বিকশিত হইতে পারিত, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহাই হইবে সাহিত্যের বার্থ বিচার। এই সাহিত্য-বিচারের অথবা সাহিত্যের সত্যতা দ্বারা ও সত্যীত পৌরবের সহিত বর্তমান সাহিত্যের সঞ্চ-নির্ণয়ে আমরা নিযুক্ত থাকিব।

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি-কাহিনীর যে-সব অবশেষ তাহার ভয় মন্দির ও শৈবালম্ভর দীর্ঘ প্রতীকিত্তে আজও লুপ্তাঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার পরিচয় সর্বসাধারণকে দেওয়া—সাহিত্য-পত্রিকার কর্তব্য। কেননা, দেশের ঐতিহ্যের অহুদরান

সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। আমরা গতবারে এগুলাকে দেশবাসীর নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু চুপের বিষয়—আমরা এ জাতীয় কোনো প্রবন্ধাদি এখনও পাই নাই। আমরা আশা করি, এবিষয়ে দেশ-বাসী আপনাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিবেন, এবং দেশ-প্রেমিক ব্যক্তিগণ গ্রামা গোঁরব-বস্ত্রের বিবরণাদি পাঠাইয়া আমাদের প্রবন্ধ-ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরচর্চা সপক্ষে ১৯১৪ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর যে ওলাদী ছিল, আজকাল দীর্ঘের দীর্ঘের তাহা দূর হইতেছে। ইহা একটা বিশেষ আশার কথা। আরও আশার কথা এই—ব্যাঘ্রম-চর্চা বাহাতে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহার জ্ঞান সাধারণের মোটা মোটা চান্দর কলিকাতার গোলদীঘির কাছে একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকগণকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলুক—ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কয়েকজন বীর জয়গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর চরিত্রতার ব্যক্তিত্বমূল্য হইয়াছেন। তাহারাই হইতেছেন,—জামালাকান্ত, আশানন্দ, কলি হরেশ বিদ্যাস, ক্যাপটেন শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ভবানী, গোবর, প্রভৃতি। কেবল সাহিত্য নহে, কলাচর্চা নহে,—শারীরিক বল অর্জনেও বাঙ্গালীকে বিশেষ ভাবে ব্রতী হইতে হইবে।



## ট্রিটেক্স — “TREE TEX”

### ভবিষ্যতে গৃহনির্মাণের কার্যে ট্রিটেক্স ব্যবহার করুন



হালুকা ও শক্ত বস্ত্রিমা ট্রিটেক্স শীশ ও সহজে গাঁথুনি করা যায়।



ট্রিটেক্স অপরিচালক এবং ইহার উপরে মাষ্টারের কার্য করা যায়।



ইহার উপর রং করা যায়, ছবি আঁকা যায় এবং রংয়ের অজান্তে কাটুও করা যায়।

### ট্রিটেক্স ওয়াল বোর্ড আকারে ইহা—

১২ ইঞ্চি পুরু × ৪ এবং ৪ ফিট চওড়া এবং ৮, ৮.৫, ৯, ১০, ১২ ও ১৪ ফিট লম্বা। প্রত্যেক ফ্রেমে ২২ শিট থাকে

ট্রিটেক্স—গৃহ নির্মাণের আধুনিক উপাদান—গ্রীষ্মকালে তাপ দূর করে এবং শীতকালে তাহা আবদ্ধ রাখে। অখরিত ইহা শব্দ রোধ করে। অল্পব্যয়ে আধুনিক ভূমি অহুয়াই গৃহ-সজ্জা করিতে ইহা সাহায্য করে।

ট্রিটেক্স—ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং দেওয়াল, সিলিং (ceiling) ও পার্টিশনের (partition) বিশেষ উপ-যোগী। প্রয়োজন হইলে ইহা তাপ-নিয়ন্ত্রণ করিতে, ময়লা জমা (condensation) দূর করিতে এবং শব্দ রোধ করিতে পারে।

### ট্রিটেক্স কি করিবে—

গরম ও শীত নিবারণ করিবে, শীত-গ্রীষ্মের সমতা রক্ষা করিবে, আর্দ্রতা নিবারণ করিবে, দেওয়াল রক্ষা করিবে, শব্দরোধ করিবে, গোলামাল বন্ধ করিবে, মাষ্টার বা গোয়ার সহিত আবদ্ধ থাকিবে, মাষ্টারের বেড়াগানের কাঁচা করিবে, গাঁথুনির বাহু কমাইবে।

### ট্রিটেক্স কি করিবে না—

চুমড়াইবে না বা বঁকিবে না, পড়িবে না বা পড়ানুপ হইবে না, কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করিবে না, ফাটিবে না বা চিরিবে না, সহজে ভাঙিবে না, আলোক প্রতিফলিত করিবে না, খরচ বাড়াইবে না, মাষ্টার হইতে বসিবে না, সহজে আগুন ধরিবে না, গন্ধ আটকাইয়া রাখিবে না,

### হিটলী এণ্ড প্রেসাম, লিঃ

(ইংলণ্ড সমসত্ত্ব)

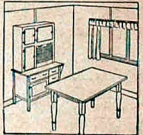
কলিকাতা : বোধাই : মাজা : লাহোর



এই বস্ত্রিমা মাঝকালার জালে ও আঁকেছে। বায়ুতে ভর্তি ছিল কিন্তু ট্রিটেক্স ব্যবহার করায় ইহা এখন আয়ামমূলক ধুনপান কক্ষে পরিণত হইয়াছে। শীতে গরম এবং গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা।



ট্রিটেক্স ব্যবহার করায় পাশের ঘরের কথা বা রাস্তাঘরের গোলা-মাল শোনা যায় না।



ট্রিটেক্স বেড়াগানের ময়লা জমা (Condensation) দূর করে বস্ত্রিমা রাস্তাঘর পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর হয়। রাস্তাঘরের উত্তাপ এবং গোলামাল অল্প কোন আসে যায় না।



বিষয়

১। প্রশান্তি—আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়	...	২৪৮(খ)
২। উদয়ন (কবিতা)—শ্রীকুমারচন্দ্র মল্লিক, বি-এ	...	২৪৯
৩। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন—আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়	...	২৫০
৪। নতুন পুরাতন—ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ চাকুর, সি-আই-ই	...	২৫১
৫। প্রকৃতি (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	...	২৫৭
৬। প্রাচীন কলিকাতা—কবিত্ত্বগ্ন ঐগুণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উত্তরসাগর, বি-এ	...	২৬৫
৭। প্রশান্তি—বক্তৃতাধর বাবসায়—শ্রীশ্রবিনয় রায়চৌধুরী	...	২৭০
৮। সর্গাঙ্গি (উপন্যাস)—শ্রীমতী অম্বুকা দেবী	...	২৭৪
৯। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শান্তিনিকেতন (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ	...	২৭৪
১০। ঈশ্বর (গল্প)—শ্রীবৃন্দবৎ বহু, এম-এ	...	২৮৬
১১। পদ্মজ্ঞে ভারতবর্ষ—শ্রীচূর্ণাপদ ভট্টাচার্য্য	...	২৯৫
১২। রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার—শ্রীচাকুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	...	২৯৯
১৩। “আবারো প্রথমদিবসে” (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ	...	৩০০
১৪। বঙ্গ-পরিচয়—জ্যেষ্ঠের কাহিনী—শ্রীদ্বীপকুমার মিত্র	...	৩১১
১৫। উদয় ও অস্ত (গল্প)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	৩১২
১৬। কৃষ্ণবাসের গঙ্গাবতরণ—শ্রীললিতাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম-এ	...	৩১২
১৭। সরস্বতী (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৩১৩
১৮। অরুণোদয় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৩১২
১৯। নতুন স্বাধীনতা—ডাঃ শ্রীধরেন্দ্রনাথ মৈত্র	...	৩১৮
২০। জিজ্ঞাসা	...	৩৪৩
২১। বর্ধাতি (গল্প)—শ্রীসৌরভমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল	...	৩৪৫
২২। শিশিরকুমার ইন্সটিটিউট	...	৩৪৫
২৩। নতুন বই	...	৩৫৬
২৪। মাধুকরী	...	৩৫৯
২৫। ঘরে-বাইরে—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-স	...	৩৬১

## চিত্র-সূচী

ত্রি-বর্ণ চিত্র—		
সেবাস্বর্ধ—শ্রীচূর্ণ চূর্ণাপদ ভট্টাচার্য্য	...	৩২১
দ্বি-বর্ণ চিত্র—		
আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়	...	২৪৮(ক)
এক-বর্ণ চিত্র—		
(১) ভারতীয় মাহাত্মের জিন্সায় বন্দী হাতী ইউরোপে চালান হইতেছে	...	২৭০
(২) জেভাগুলিকে সদা দখিয়া চালান করা হইতেছে	...	২৭০
(৩) বাজার-দরের নমুনা	...	২৭১
(৪) বন্দী বামরেরা অজান্তদেশের পানে অবাধ হইয়া চাহিতেছে	...	২৭২
(৫) পেটে ক্ষুধা থাকে সত্ত্বেও বন্দী সঙ্গীরা অভাবই বেশী বোধ করিতেছে	...	২৭৩
(৬) কি উৎসাহে! (বাস্তবচিত্র)	...	৩৩৭
(৭) কি উৎসাহে! (বাস্তবচিত্র)	...	৩৩৭
(৮) মহাত্মা শিশিরকুমার বোষ	...	৩৫৫

উদয়ন — আষাঢ়. ১৩৪০



স্বাক্ষরিতঃ শ্রী প্রমথ চৌধুরী



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

আষাঢ়

১৩৪০\*



## উদয়ন

শ্রীকৃষ্ণদরঙ্গন মল্লিক, বি-এ

১  
উদয়ন, শুভ উদয়ন,  
অন্ধকারে জ্যোতির প্রপাত,  
তৃতীয় নয়ন উন্মীলন,  
শুভদৃষ্টি দেবতার সাথ।

২  
নীল সিঁদ্ধ মন-কাতর,  
অমৃতের অনিল সংবাদ,  
মহাখ্যানে লভিল সাধক,  
অরূপের রূপের আশ্বাদ।

৩  
বাক্সীকির পুণ্য তপোবন  
পরিপূর্ণ ছন্দের গৌরবে,  
মান পৃথ্বী হ'ল রসাত্তিকা  
সৃজনের মহামহোৎসবে।

৪  
মানবের হৃদি পদ্মাসনে  
এলো তার আকাজিক জন,  
নশ্বর এ জীবনের মাঝ  
দেখা দিল অনন্ত জীবন।

৫  
বৃন্দাবন-চন্দ্র উদয়নে  
দূরে গেল ভীতি, মৃত্যু, জরা—  
নরনারায়ণে কোলাকুলি,  
দেবভূমি হ'ল বহুধরা।

৬  
উদয়ন, শুভ উদয়ন,  
জীব মাঝে শিব আবিষ্কার,  
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ,  
খুলে গেল স্বরগের দার।



# মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

( ১ )

পরাধীন জাতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হারািয়া ফেলে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, আমরা হাত-পা শুটাইয়া আলগে বুধা সময় কাটাই এবং অর্থনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্ত সমস্ত দোষই গভর্ণমেন্টের হাড়ে ঢাপাইয়া বসি।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিজ্ঞান এবং বিশ্ববিজ্ঞানের পরীক্ষা পাশ না করিতে পারিলে জীবনের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া পেল—এই ভাষা ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফল হইয়াছে যে, বালকগণ তাহাদের প্রথম জীবনে যে সময় নানারকম impression (ছাপ) গ্রহণ করিতে পারে সেই মহাশূন্য সময় বুধা অচরণ হইয়া থাকে। ৭৮ বৎসর হইতে ১৪১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক-বালিকার জীবন কুস্তকারের হাতের কড়িদের ভায়া, তাহারা ইচ্ছামত্যাগী পাত্রের গঠন দিতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এতই শাপগ্রস্ত যে, আজ বাঙ্গালী জাতি এই বিশালপরিমাণে নিমজ্জিত হইয়াও তাহার চৈতন্যের হইল না। ২০ বৎসর বাবৎ ক্রমাগত ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা পড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশ ক্ষুদ্রপ্রধান; ধান, পাটের রপ্ত গড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, টাকার আদান-প্রদান বিশেষতঃ মফস্বলে একেবারে বন্ধ, একখানি দশটাকার নোট ভাঙ্গাইতে হইলে দুর্বর্তী কোন মহাশয়ের গদি বা 'কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক' ভিন্ন গতান্তর নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুর্ব্বৎসর সত্ত্বেও প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এসসি, বি-এ, বি-এসসি, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বাঙ্গপেক্ষা বাড়িয়া চলিয়াছে।

আজকাল এক জন্মেরোপ উঠিয়াছে, এমন কি যাহারা চিন্তাশীল ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ট বসিয়া পরিশ্রমিত তৈয়ারীও খবরের কাগজে জলদস্তারি স্বরে অভিযোগ করেন যে, যাহা কিছু অর্থকরী বিজ্ঞা তাহার সমাধান ও দায়িত্ব বিশ্ববিজ্ঞানের হইতেই গ্রস্ত। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও দৃঢ়ি না। শুদ্ধি বুদ্ধি গ্রাহ্যেতে স্তম্ভ করাই বিশ্ববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তাহা কামার স্বত্বকে দেখিতেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার ছেলেকে ডিগ্রীধারী করিবার জন্ত বিশ্ববিজ্ঞানের প্রেরণ করিতেছে; আজ সহস্র সহস্র যুবক বেকার অবস্থায় বসিয়া উপবাস করিতেছে, এমন কি সময় সময় আত্মহত্যা করিতেও কুটিল হইতেছে না। আমি প্রায়ই এই কথা বলিয়া থাকি যে, পাটের বাজার বড়ই মন্দা, কত মহাজন সর্ব্বপাত হইয়া যাইতেছে; যে মহাজনের গুদামে পাট অধিক বিলিয়া ২০ বছরের মন্দা জমাতে বা মজুত রহিয়াছে, সেই মহাজন আবার কি নিজের পৈতৃক ভিটে-মাটি বাঁধা দিয়া পুনরায় পাটের দানন করিবে? কিন্তু অন্ধ সংহার এমনই মজ্জাগত হইয়াছে যে, ইহা দেখিয়াও দেখে না,

\* অল্প প্রাতে (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) গ্রাম সন্ধ্যোপবাসের সময় দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিম্নলিখিত নিদারণ কাহিনীটির প্রতি নজর পড়িল।

আত্মহত্যার কাহিনী—বেকার যুবকের আত্মহত্যা

রথনাথপুত্র, ৪৩১ জন গত পথিম তারিখে শৈলেশ্বরপুরায় রায় নামক জনৈক ভ্রম যুবক প্রায় সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, যুবকটি কিছুদিন হইতে বেকার ছিল, ইহাতে তাহার জীবন অবর হইয়া উঠে। ফলে, এইজন ভ্রম আত্মহত্যা করে।

অতাদের জালায় আত্মহত্যা—কেনারীর শোচনীয় পরিণাম বেলগাছিয়ায় কোটাবিনারী কলেজের কন্ডাক্টরী জীকানীন্দ্র চক্রবর্তীর স্তব্ধে তাহার বাসার সমুপে গাওয়া গিয়াছে। তাহার নিকট একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে সে লিখিয়াছে, জীবন দুর্লভ বোধ হওয়ায় সে আত্মহত্যা করিতেছে। প্রকাশ যে, কন্ডাক্টরী পূর্বে তাহার বাড়ী হইতে টাকার দ্রুপ পত্র আসিয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা নাকি প্রায় অশ্বশনে দিন কাটাইতেছিল। কোন প্রকারে অর্থের সংগঠন করিতে না পারিয়া তাহার ভাতা নিষ্পেষের নিকট হইতে শিক্ষা কইতেছিলেন। ইহা সহ করিতে না পারিয়া সে বিদ্যানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ভনিয়াও শুনে না; হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বলেন, similia similibus curantur অর্থাৎ 'বিষত্ব বিধেমনোষত্ব'। যেহেতু সহস্র সহস্র গ্রাহ্যেতে যুবক জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইতেছে, তাহারই ঔষধ আবার নূতন করিয়া গ্রাহ্যেতেই স্থগিত করা!

মানব-জীবনে বিশ্বাশিক্ষা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ সর্বাঙ্গিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, যাহাকে ইংরাজীতে culture বা কাল্ট বলে। শিক্ষাই মানুষকে পতঙ্গ হইতে প্রকৃত মহাত্ম্যে পরিণত করিয়া আনে। বাল্যকালে আমাদের চারী প্রজাগণ আমাদের বলিত, "বাঁবা, আমরা চোখ দেখতে কাপা, কাপ থাক্তে কালা"।

আজ যে দেশের নবজাগরণের ও স্বাধীনতা লাভের জন্ত নূতন গাওয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে কদাচিৎ পৌছায়। এই কারণেই নব্য জাপান, চীন, পারস্য, তুর্কী প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতাবদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহার ফলে এই দীর্ঘায়ুহেতু যে, যেমন ইউরোপ ও যার্কিন দেশে তেমনই জাপানেও আজ মুটে-মুহুর, দাস-দাসী, হালচাণী যখনই একটু ফুরত্ব পায় অমনি খবরের কাগজ লইয়া কেবল নিজের দেশের নব, জীবিতার খবর লইয়া আলাপ করিয়া থাকে; এবং এই ভাবে তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা ভাব সঞ্চারিত হয়।

আমি যখন লিখিতেছি আমার সামনে অজ্ঞতার 'আনন্দবাজার' রহিয়াছে। আজকাল দৈনিক 'আনন্দ-বাজার' যে প্রকার হুচ্চাকভাবে সম্পাদিত হয় অনেক ইংরাজী পত্রিকাও সেরাপ হয় না। ইহাতে 'রয়টার', 'এসোসিয়েটেড প্রেস', 'ফ্রি-প্রেস'র বাবতীর খবর থাকে এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক (বঙ্গদেশের) 'ব্যবস্থাপক সভা'র কার্যাবলী দেওয়া হয়। এতদুজ্জীবে যে সমস্ত সম্পাদকীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকে তাহা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মনে কখন, আপনাদের ছেলে মাতা ছাত্রভিত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে; সে যদি এই প্রকার দৈনিক ছাত্রভিত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে; সে যদি এই প্রকার দৈনিক 'আনন্দবাজার' পড়ে এবং 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ',

প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা হইতে গল্প বাঙ্গা দিয়া বিবিধ প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি পড়ে তাহা হইলে সে এত বিদ্য জ্ঞানিতে পারে যে, কোন ইংরাজী-বিশ্ব গ্রাহ্যেতেও তাহা জানেন না। উপরিনির্দিষ্ট পত্রিকাগুলিতে শুধু আমাদের দেশের নব, সমস্ত পৃথিবীর এত তথ্য থাকে, যদি তাহার এক-তৃতীয়াংশও আমাদের উপাধিধারীরা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইতেন তাহা হইলে আমি নিজেই কল্প মনে করিতাম।

আজকাল কথায় কথায় অহযোগ কথা হয় যে, ইংরাজী শিক্ষা বাস্তবিক পৃথিবীর বাবতীর জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার উপায় নাই; এবং বড় বড় master-piece অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চিত্তাপূর্ণ গ্রন্থের সহিত পরিচয় বাধা সম্ভব। এই অভিযোগের বৌদ্ধিকতা আমি মানি কিন্তু অসম্মত। হইতেছে এই যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই কি ইহার জন্ত ইংরাজী শিখিতে হইবে? কথটি একটু বিশদরূপে বুঝাইতেছি; বাব্বীক্স-সামান্য খরচ ভায়ায় রচিত, এমন কি স্থানে স্থানে উপক্রমণিকা ব্যাকরণ পড়িয়াই বেশ দরদর মন্দা যায়।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীদের মধ্যে কয়জন মূল বাব্বীক্স-সামান্য পড়েন? এমন কি দুঃখের বিষয় এই যে, আজকালকার শিক্ষিতগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও বড় ধার ধারেন না। আমাদের যুবা পিতামহী ও সমাজ দোকানী-পুসারীরা আজও ইহা আমাদের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। যদি বৈদ্য, কৃত্তিবাসী ও বাব্বীক্স রামায়ণে মাকে মাকে ঘটনার পার্থক্য আছে; কিন্তু হেমাঙ্গ বিদ্যায়ব মহাশয়ের যে যুদ্ধর বাব্বীক্স মুগাহাবদ আছে তাহা আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই বোধ হয় কোন খোঁজ রাখেন না। মহাভারত সপক্ষেও সেই কথা। ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত দূরের কথা, কাশীধামের সহিতও ইহাদের পরিচয় থুব কন।

ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্র সংক্রান্ত, এন্ট্রিটল প্রভৃতি মনীষিগণের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং প্লেটোর কথোপকথন দর্শন-শাস্ত্রের একটি অপূর্ণ সম্পদ। কিন্তু আমি জানিতে চাই যে, কয়জন শিক্ষিত ইংরাজ গ্রীক



ভাষায় পাকিতা লাভ করিয়া ইহাদের গ্রন্থ পাঠ করেন? যদি প্লেটো পড়িতে হয়, তাহা হইলে Jowett-এর উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদই যথোচিত পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ইংরাজী অনুবাদেরই বা কয়জন খবর রাখেন? হতভার ইংরাজী ভাষা বাহন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা নেকামি ও পাগলামি।

আজ যদি আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে এই এক শতাব্দীর মধ্যে কত নত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইত এবং বঙ্গভাষায় ও ক্রমাগতের সমৃদ্ধিশালিনী হইত।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আদৌ কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিলে না। বীহাদের সাহিত্য প্রকৃত অল্পভাগ আছে, তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বরং উৎসাহিত করা দরকার, তাঁহারা আধীন্য সাহিত্য-রসে ভুবিয়া থাকুন এবং কেবল ইংরাজী কেন ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করুন। অর্থাৎ বীহাদের প্রকৃত প্রেরণা আছে তাঁহাদের সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানের চর্চা করিবেন। আমাদের আশ্চর্য্যের বিষয়টি এই, যখন আমি সাবেক কালের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়িতাম, তখন আশ্চর্য্যের অর্থাৎ ভাব্য ও সহ্যতা গ্রন্থ না করিয়া 'ল্যাটিন' ও 'ফ্রেন্স' কাহা শিক্ষা করি। কেননা প্রেরণা ছিল।

আমাদের বালকগণকে ও বৎসর বয়স হইতে ইংরাজী শিক্ষার জন্ত যে কিরূপ ধস্তাধরি করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে বুঝা শক্তি ও সার্থকতার অপসন্ন হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ পূর্ব্ব কমই হইয়া থাকে। আমি সর্ব্বত্রই বঙ্গভাষা প্রথমে বলিয়া থাকি যে, "A degree is a cloak to hide the degree-holder's ignorance"। হুই একটা ঘটনা হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিতেছি।

সম্প্রতি গ্রীষ্মকালীন আমি একটা কলেজে কয়েক-দিন অবস্থিত করি। একদিন মধ্যাহ্নে একটা আই-এ ক্লাসের ছাত্র আমার নিকট আসিয়া বলে, "মহাশয়, আমি বহুদূর পদবী, বাহাতে কলেজে ফ্রি হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা আপনাদের করিয়া দিতে হইবে।" আমি

বলিলাম "ছাত্রের হাছার গ্রাডুয়েট যুরক বেকার অবস্থায় 'হা' অন, হা অন' করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি আবার তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি করিবে?" সে বলিল, "তাই বলিয়া কি জ্ঞানার্জন করিব না?" আমি মনে মনে বলিলাম, তবে ত' বাহু ফাঁদে পা দিয়াছ। "আচ্ছা বলত হায়রাবাদ কোথায়?" সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "মধ্যপ্রদেশে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে কি বলে?" সে বলিল, "হায়রাবাদ একটি গণতন্ত্র (republic) দেশ।" তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বলত, 'গাংধি নতুন মালা রত্ন মনুচক' কার লেখা এবং তারপরে কি?" প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "মহাশয়, আমরা পাড়ারার স্থল থেকে এসেছি, গুণব জ্ঞানি না।"

আমার দেশের স্কুলেও ঠিক ঐ প্রশ্ন কয়টা জিজ্ঞাসা করিলাম। হুই একটা ছেলে ব্যতীত আর সবাই ই। করিয়া রহিল। এখন এই হইতে বোঝা বাইতেছে যে, ছাত্রেরা স্কুল-কলেজে কিরূপ বিভ্রাট আহরণ করিতেছে। এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইবে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমার এই বিজ্ঞান-মন্দিরে যে সমস্ত ছাত্র B. Sc. Honours গইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের শিলাভ্য সামাজ্য বিষয়ের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষা যে কি রকম মেকী ও স্টো, তাহা উপরিগৃহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশজননের তিনজনই হায়রাবাদ কোথায় বলিতে অক্ষম, এবং 'গাংধি নতুন মালা রত্ন মনুচক' কদাচিত তাহাদের কল্পহুত্রে প্রবেশ করিলা। পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের বাহিরে যে কিছু শিখিত হয়, ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাধিকার একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে, কোন রকমে নোট কর্ত্তব্য করিয়া 'তকমা' পাইলেই হইবে। বিশ্বাধিকার আধার কি? আগামী বারে এই বিষয় সচিবের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীমান অরবিন্দ সরদার কল্কর অনুদিত

## নতুনে পুরাতনে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সারারাত চোখের জল পড়ছে। আটের কি হ'ল, এতাবয়্য নয়—একটা স্টুটো পড়োছিল, তাই সারারাত নিদ্ৰা ছিল না। ঘুম পালানো যখন, ভাবনা এলো তখন আটের—পুরোনো আর নতুনদের সমস্ত! পুরোনো চোখ, নব্যতরীদের কথামতো একে কি ছাড়া যেতে পারে? কিছুতেই নয়, পুরোনো হ'লেও চোখ অন্ধা জিনিস। পুরোনো চোখের বদলে অপ্‌থ্যালমিষ্টের দোকান থেকে কচো গড়া দিব্যচক্ষু বসাতে চায় পুরোনো চোখের পুরোনো কোটের। কারেই পুরোনো চোখকেই শাসি বন্ধ করে ধরে রাখতে হয় চশমার কাঁচের আড়াল দিয়ে। এই স্বজ ধরে পুরোনো আটের কথা মনে আসে। পুরোনো আছে হরকমের। এক রকম পুরোনো, ইংরিজিতে যাকে বলে rotten—পচা পনির, প্লাম দেয়াল, তুণ-বরা কাঁচ, তারই মত অব্যবহার্য্য পুরোনো। সব দেশেই, সব আটতেই, সব কারো, সব সাহিত্যে এই rotten পুরোনো আছে। দ্বিতীয় রকম পুরোনো বেটা, সেটা আবহমান কারের পুরোনো। যেমন পুরোনো চঙ্গ-পর্গা, যেমন পুরোনো নবাবী আমলের সিরাজী মদ, যেমন পুরোনো পুরাতন যুগের শিল্প-সম্ভার, পুরাতন-ইতিহাস ও tradition। Rotten পুরোনো সে আপনি মরছে, তার উপরে খাড়ার থা দিয়ে কোন বাহারী নেই। এই যে পুরোনো চাঁদ — বাহারী ক'রে এটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তালপাতার দেপাইএর হাতের চাণাখানার মতো একটা কালো চাঁদ কিংবা 'হুয়া' বসানোতে ঐ তালপাতার দেপাইয়ের পল্লীর নকলই দেখানো হয়, তা' ছাড়া আর তো কিছুই লাভ হয় না।

পুরোনো চাঁদ ভাতে বাড়ে, একথা সকলেই মানে। মদ বতই পুরোনো হয়, ততই ময়ূরতা

উৎকৃষ্টতা গুণকে পায়, নেশা দেবার শক্তি খুব না থাকলেও। পুরোনো ঘী — মুচি ভাজা চলে না তাকে, কিন্তু এটা দেখা যায়, পুরোনো ঘী মাল্পি করতে গরম লুচি খাবার অবস্থার টিকিয়ে রাখে মাছকে অনেক দিন। ভারতবর্ষ দেশ কালের সেই ভরত রাজার আমলের পুরোনো বেশ; এটাকে ফেলে নতুন একটা এবাল ধীপের মটীচিকার মাঝে উপনিবেশ স্থাপনের করনায় নতুনত্ব থাকতে পারে কিন্তু—যাক!

এই ভাবনার রাত কাটলো। উদয়-কালে ঘর থেকে বার হলেম। প্রবীণ ৩৬বির কথায় বলি, তখন —

"নিশি অবদান প্রায়,  
সুখে সবে নিদ্ৰা যায়,  
শব্দা কেহ ছাড়িতে না চাহে।

যা দিয়া দ্বয় মাঝে  
মগ্ন আরতি বাড়ে,  
সেখলনি কি মধুর তাহে।"

এই সময় কোন কাজ থাকে না, নিজেই বিশ্বকন্মার সঙ্গে দেখা হয় আমাদের। কথাবার্তাও চলে নিরবিচ্ছিন্ন; কেমন সময়টিতে দেখা হয় হুঁজনে, তাঁও সুপ্রবীণ ৩৬বির কথায় বলি —

"বিদ্যুৎ অতি এই কাল,  
নাহি কোন যোগমালা,  
নিজন্ত রক্ষাও সমুদয়।  
কোণে কাড়ে অন্ধকার,  
নভস্তল পবিত্রার,  
লতাপাতা হিমবিন্দুসহ।"

তোমরা বিশ্বাস করবে কিমা জ্ঞানি না, এই সময়টিতে সভ্যই বিশ্বকন্মাকে সঙ্গী ভাবে পান শর্খা।

এর দু'দিন আগে মত একটা বড় বয়ে গেছে আমার বাড়ির দক্ষিণের কুঞ্জবনের উপর দিয়ে। বাগানের



একটি কোষে ছিল বহুকালের এক মহাকায় মহানিম। ভিতরটা তার যুগ্ম ধীরে কোঁপরা হ'য়ে গেছে—বাইরে থেকে সেটা লক্ষ্য হয় না। সবুজ পাতার আড়াল অনেকখানি বিস্তার ক'রে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিনও। তারি তন্মায় নবীন একটি রসাল বৃক্ষ নতুন প্রকীর্তি ধরিয়েছিল। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লো মহানিম মঞ্জরী বনলাঞ্ছনের একটার মতো মড় মড় শব্দে। যে আম-গাছ তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাকেই পড়লো চেপে সে! Rotten পুরানোর চাপে কি ভাবে মারা যায় শুরু নতুন, তার প্রমাণ এই। লোকে উই-এ কোঁপরা করা ফুটে। নোকোর চেপে যখন হাবুডু খেয়ে উঠে আসে, তখন দোষ ধের নোকোটার; কিন্তু নিজেরও যে বৃদ্ধির দোষ আছে, একথা অস্বাধানি মানুষ অনেক সময় স্বীকার করতে ভুলে যায়; এবং বলে, বা! কিছু পুরানো তাই দাঁও বিসর্জন। চিরন্তন পুরানোর কথা তখন আর মনে থাকে না। বর-একটা গন্ধর মতো সে শিঁড়ের মেঘ দেখেও আঁৎকে গঠে। এই ভাবে সলল আটের মতো যে একটি পুরানো tradition, যেটা আবহমান কালের, তারও উপর ঝাঙ্কা হয়ে যায়—দিতে চায় দৌঁড় দে বিকে বায় হুঁচোখ।

এই যে মহানিম সে যখন পড়লো, মানুষ তাকে জ্ঞাননি কাঁচ ক'রে ছেড়ে দিলে, তার বেশী মর্যাদা সে একটুও পেলো না। কিন্তু আমার মনে কেন বেদনা বাজছে এখনও সেই আমার মায়ের হাতে পোতা আধ-rotten মহানিম গাছের জ্বলে?

—সবুজ পাতায় মনোহর ক'রে রেখেছিল সে যতটা পারে বাগানের এই কোণটি। তার সেই কোঁপরা বৃক্ষের পাঞ্জরায় বেঁধেছিল বাসা সহজে একটি কাঠ-চৌদ্দুর। ঝড় কেটে গেছে। আজ সকালে বসন্তের বাতাস যখন বয়েছে, পাশে এসে বসেছেন বৃদ্ধ বিখকর্মা। রোদে নতুন দিনে ফুটিয়েছে ফুল বাগানের আর সকল গাছই। সেই সময় শুনিছি কাঠ-চৌদ্দুরের কর্ণন শ্রব—বাসা কোথায়—বাসা কোথায়—সেই যুগ্মধরা

মহানিমের জন্ত তার বেদনা। সে বেন আমারও পোশন করার প্রকৃতিধনি নিলে ঐ মহানিম গাছের জ্বলে।

সেই সময় তুমি খাচার ধরা পোষা ময়নাটাও ডাকছে—সরা—সরা—যেন সে বাক্তে নতুন খাচার কাঠিগুলোকে সরে বেচে, মুক্তি নিতে তাকে ঐ বাসা-খোঁজ কাঠ-চৌদ্দুরের সঙ্গে এক যোগানে। নতুন খাঁটা আর পুরোনো জীর্ণ বাসা, এরি রহস্য দেখছি আর ভাবছি, মনের বাঁশিতে বাজছে লগিত শ্রব সেই সময়।

বিখকর্মার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেম—“শিল্পের আনন্দতরী সোনার চাঁপার ভার নিয়ে কোথায় চলেছে নতুন মাখিনের হাতে?”

বিখকর্মা বললেন—“সে ভাবনা তোমার কেন? তুমিও এখন সে-তরীতে নেই, আমিও নেই। আমরা তো হঠাৎতো ডাঙার পাঁড়ে খাবি বাজি।”

—“ওতে যে সোনার চাঁপা রয়েছে সোনার প্রাচীর-মুষ্টির মতো।”

বিখকর্মা হাসেন, বলেন—“তাই ভাবছ? সে অনেক কাল বিসর্জন হ'য়ে গেছে, প'ড়ে আছে এর-ওর-তোমার পূজা-সময়ের দেওয়া ছুচারাটে চাঁপালুলের পাপুড়ি, একরকম গিটকর্ড চাঁপা।”

মন মানে না—“পুরানোর উপর কি কারো দয়া-মারা হ'ল না?”

বিখকর্মা বলেন—“তাই তো দেখছি, নোকো কেবলই আমবাণী ও রপ্তানি করছে গিটকর্ড। চল একবার দেখা যাক যে নদীতীরে গিয়ে ব্যাপারখানা।”

প্রকাণ্ড নদী, এ-নদী সেন-দী একখানে মুখ; জীবন-নদীর মতো অদ্বন্দ্বস্ত তার প্রোতা। সেখানে বাসা সেই অনানি কালের জেলে-ভিড়ি; বিখকর্মা ইঙ্গলজাল বৃন্দেন তার মধ্যে ব'সে এক বুড়া জেলে। ছ'জন বাতীর বেশী তাতে আর ধরে না; হুই বৃদ্ধকে নিয়ে ডিঙি পৌছিল মাঝ-বরিয়ায়—বেন ছোট্ট একটি জলের পাখী অবলীলায় দাঁতুরে চলে গেল চেউ কাটিয়ে।

একবারে দেখা যায় নদীর একমুখে বন্দর, আর

একমুখে যেন কুদ্যারার কালো পর্দা জল পর্যন্ত কালো ক'রে নেমেছে। বন্দরের দিকে চেয়ে আছি, ছুটে বেগল একখানা নতুন র-চপে বাচ খোপার পান্দী, রাশ-ছেঁড়া ফোপা বোড়ার মত, বেজ বার হ'ল সে।

আমি বললেন—“গেল বৃষ্টি গিয়ে—দেখ দেখ—”  
বিখকর্মা। যাবেক কালের ছেঁড়া পোঁটলা থেকে একটপ গাঙের বাণী নদীর উপর ফেলে দিলেন—এপার-ওপার একটা মত বালুচর সৃষ্টি করলেন ঠিক জলের তলায়। বাঁধন-ছেঁড়া নোকো পড়লো গিয়ে খুঁপ ক'রে চড়ার উপর কাং হ'য়ে। মুখটা রইল জলেতে বাগিতে ডোবা, বাকিটা রইল শুকনের লাজের মতো জলের উপরে হেলতে-হুলতে!

আমি বললেন বিখকর্মা—“বাধা দিলে কেন ভেসে বাবার পথে, বেশ তো চলছিল উধাও।”

বিখকর্মা বললেন—“বাধা দিই নি, বাঁচালুম।”  
চড়া-ঠেকা নোকোর ঠাঁড়খানা এলো ভেসে আমাদের দিকে; নাবিক কুলের দিকে হাবুডু খেয়ে উঠলো।

তারপর এলো টিমার—ভাস্কর রকম আধুনিক শক্তি নিয়ে। সে না মানে উজান, না মানে ভাঁটা, না মানে চড়া, না মানে কিছু। চললো নিজের বেজ বৃক্ষ হুলিয়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দিক্ অন্ধকার ক'রে। তার ডেউ-এ আমরাও টলোমলো। পেরিয়ে গেল বাণির বাঁধ কেটে অনেক দূরে থেখানে কটন অন্ধকার জগকে কালো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পর্যন্ত! তারপর আর দেখা পেল না! শুধু বাণীর তরীর তড়কা বীণীর তরাস-জাগানো চাঁৎকার বাতাসকে ছিদ-ভিন্ন ক'রে পৌঁছল আমাদের কাছে একটা বার—

আমি বললেন—“কি হ'ল?”

বিখকর্মা বললেন—“ভালিয়ে গেল ভোগবতীতে বাচ খেলাতো।”

খানিক শুভ হ'য়ে থেকে বললেন—“বৃষ্টি ছি। ডাঙা চলো, আর কাং হ'য়ে।”

অন্ধকার ডাঙার ধারে বাট, সেখানে মনে পড়লো

গান—অনেক কালের পুরোনো, মনে নেই কোন ফকিরের লেখা,—

“ত্রি লিখিলাম নয়ন কজ্জলে  
দেই নাই চরণ চলিবে ব'লে।”

বিখকর্মা হেসে বললেন—“দাঁও নাই, ভালই করছে। তা' হলে বাজারে চলি ত্রিই একে মব্বত্!”  
আমি বললেন—“বৃক্স লেম যেন ত্রি সে চিগপুস্ত-লিকার মতো চিগপয়ের উপরে স্থির হ'য়ে থাকবে, হাটে-বাটে চ'লে বেড়ায়ে না, কিন্তু অচল ত্রি ব'লে যে লোকে বদনাম করে, তার কি?”

বিখকর্মা বললেন—

“বদি কেহ বলে, এ ত্রি কি চলে?

দিও ব'লে—সময়ে চলে;

অচলো বলে।”

আমি বলি—“তোমার ত্রি সে তো দেখি হাটেও চলে, বাটেও চলে। সে কি উদ্যে, কেনই বা চলল?”

বিখকর্মা বললেন—

“সময়ে চলে, অসময়ে চলে,

যেমন নলের দণ্ড মীন সেও চলে

যেমন মুক্তিকার ময়ূর সেও পাখনা মেনে'লে চলে

কলে কৌশলে।”

এই দেশের ফকির-কালাল কতকালের মাছ তার কে জানে, তাদেরই মুখের এই সব কথা। যারা চিরন্তনের খেলা দেখে গেছে। মনের ভিতর কথা বদি চলাচল করতে পারে, শ্রব চলাচল করতে পারে, তেমনি চিরেরও চলাচল মন থেকে মনে, এ তো সহজ কথা। শিল্পীর কৌশল আর কিছুই নয়—স্থির যে চিত্র, চলনা যে চিত্র, তাকে মন থেকে মনে চলাচল করাবার কৌশল আবিষ্কার করায়। সবাই জানে শিল্পের একটি অর্থ দিয়েছেন আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা—কৌশল।

নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের সমস্ত পুরাতন সেই বিখকর্মার দেখা হবে, যেমন আমরাও হয় মাকে মাঝে। সেইদিন বৃক্সে, ক্ষীর বাওয়া হ'য়ে গেলে



খুরী কোন কাজে আসে না। শিল্পী হ'য়ে গেলে তখন আর কাগজের সার্টিফিকেট মেডেলেরও প্রয়োজন থাকে না; ওর মর্যাদা ততক্ষণ যতক্ষণ অমৃতপান তাপো ঘটে নি।

শির-সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে—অহংকার পরিভাগ। এইটুকু মনে বোঝা এবং বলতে পারা আমাদের দেশেরই ক্ষত্রের মতো—

“ধীর কুল নকল করে গহনা গ’ড়ে

দিখ রে মন কতই বাহার।

তিনি যে জপংগুর কল্লতর

তীরে ভোল, একি ব্যাপার।

ও যার আকাশের রং দেখে

রং করতে শেখে জগৎ সসার

দিই তাঁর পদে প্রণাম পদে প্রণাম

তার মতো কে আছে আর।”

এই আকাশ, বাতাস, পাখীর গান, সকালের আলো, রাতের অন্ধকার—এদের দিকে মন চলুক তোমাদের; শিল্প-সাধনার জন্ম প্রস্তুত হবার অঙ্গের পাও; শিল্প-রসের পেয়াদা তোমাদের হাতে আঙ্গুঠিই আঙ্গুঠিই হস্তময়ের মধুমাংস। সেদিন খেয়ে নিও অমৃত, কেলে দিও পেয়াদা—মিথ্যা মায়া কাটরে।

শিল্পীর জীবন চাতক পাখীর জীবন, সে চায় অমৃত-বিন্দু। শিল্প হ’ল সাধনার বস্তু। ফুটবলের মতো নিজের শিরের সঙ্গে নিজেকেও হাওরায় ঝাঁপিয়ে নন্দন-বিজয় যাত্রার মতো বার্ষ চেষ্টা আর কি হ’তে পারে?

শিল্পীর পুরস্কার এইটুকু—একটি কি দুটি মহায়া পাখী জীর্ণ কোটেরে বাসা বাঁধে। শিল্পী থাকে না যখন, জরাজীর্ণ মহানিসের মতোই ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে যখন, তখন তারাই খোঁজে শিল্পীর যুগের পাজরের মধ্যে তাদের হারানো বাসা, তারাই পাঠায় কাদা থেকে থেকে নতুন যুগের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে। কোথায় বাসা? হায় কোথায় সে পুরোনো দিনের বিবিড় খোপ—যুগোপাচ্ছের সবুজ পাতার ছায়া-আলোর লুকচুরি!

মাছের মাতে পুরোনো কাঠের অগ্নি-সংস্কারের আয়োজনে যখন—কাঠ-ঠোকরা পাখী কীদে তখন সকালে-বৈকালে থেকে থেকে রাতের স্বপ্নেও সাড়া পৌঁছয় তার! \*

\* ‘পলিন চার্চ’ কলেজের শিল্প-প্রদর্শনীর পুরস্কার বিজয়ী সত্যর প্রদত্ত বক্তৃতা। বিহুতি চৌধুরী, জলীমউদ্দীন ও শ্রীমোহন-লাল খসোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।

“আমার বিবেচনায় ভালবাসা জিনিষটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুট-স্বরূপ। উহা পথে ঘাটে দেখানো দেখানো কুড়াইয়া পাওরা যায় না। উহাকে বহু যত্নে গড়াইয়া পরিতে হয়। ভালবাসাটী প্রফুল্লিত হৃদয়পদ্ম। ..... ভালবাসা পদাঘটি অভীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেষ্টন এবং তপস্বিনী হয়।”

—ভূদেব যুথোপাধ্যায়

## প্রকৃতি

### ত্রিবিজয়রত্ন মজুমদার

১

ভাই বোনে কথা হইতেছিল।

ভাই—মোহনবাগানের গোপালকে তোর কেমন লাগে?

বোন—ওহ, আই লাভ হিম্!

ভাই—সত্যি?

বোন—সত্যি নয় ত কি মিথো? বাঙ্গালীর মধ্যে অমন ‘সিওর স্টু’ কেউ আছে?

ভাই—শোনু পলি, দক্ষিণাভার কাকা তোর সঙ্গে গোপালের সখ্য এনেছেন। পলির পাতলা রাঙা চোঁট ছ’খানিতে বেন বিজলী বেগা করিয়া গেল, মুখখানিও রাঙা হইয়া উঠিল। সে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না।

ভাই পঞ্চ বলিল—আমাদের ‘বাবের’ একটি ছোকরাকে দিয়ে কাকা এই কথা আঙ্গ জানিয়ে পাঠিয়েছেন। কি বলি বল ত’?

—তোমরা কি বল?

পঞ্চ হাসিয়া বলিল—আমি ত’ বিয়ে করব না যে আমার মত কাছে লাগবে? শোনু, কথাটা তোকে আরো গুলে বলি। গোপাল তোকে দেখেছে, তার ভারি পছন্দও হয়েছে, গত শনিবারে মোহনবাগান-সীমানার কাকাও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন-না, সেই সময়ই সে তোকে দেখেছে—

পলি রক করিয়া বলিল—কি করে তিনি আমায় দেখলেন?

—যেমন করে সবাই দেখে, চকু দিয়ে। কাকা আমাদের সঙ্গে কথা-টকা কইছেন দেখে, গোপাল সেইদিনই রাতে কাকার কাছে তোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পট্টাপাট্টি বলে, বিয়ে করতে চায়।

পলি এইবার ছয় গাভীঘের সহিত বলিল—তার পর?

পঞ্চ বলিল—তারপর আবার কি! আমার সেই উকীল বন্ধুট যা’ বললেন, তার মতখানি হচ্ছে যে, গোপালের আর্থিক অবস্থা ভাল, দক্ষিণাভার একখানা, থিয়েটার রোডে একখানা বাড়ী আছে—

বাধা দিয়া পলি গম্ভীরমুখে বলিল—দক্ষিণাভার খানা ভাড়া দিয়ে থিয়েটার রোডে থাকা যাবে, কি বল, বড়দা’?

পঞ্চ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা। আচ্ছা, তাই হবে। চাকরী-বাকরী কিছু করে না, অবিশিষ্ট লেখা-পড়া জানে, গাজেটে ত’ বটেই, বছর বানেক এম-এ-ও পড়েছিল। ইচ্ছে করলে চাকরী যে একটা জোটেতে না পারে, তা’ নয়—

—ও ইচ্ছেটা না করলেই ভাল, বড়দা!

—তা’ সত্যি। চাকরী এক বিষয় স্বকমারী! তা’ হ’লে ববর পাঠাই, তোর মত আছে, কেমন?

—ওমা! এত শীগগির! তুমি বোন ভাই ‘কী’!

জ’দিন দাঁড়াও, একটু ভাবি, একটু বিবেচনা করি। পঞ্চ হাসিয়া বলিল—যা বা, আর বিবেচনা করতে হবে না। শোবার ঘরে মাথার কাছে টাঙ্গিয়ে রেখেছে গোপালের ছবি, এইমাত্র বলল,

I love him—আবার ভাবি! বিবেচনা করি! যাঃ। পলি ছোঁয়ে হাসিয়া উঠিল, বলিল—না দাদা, তুমি একবারে hopeless! ছবি ত’ বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ, গান্ধী, হুভান, বিধান—অনেকেরই টাঙ্গিয়েছি, তাই ব’লে ওদের সবাইকেই বিয়ে করতে হবে?

পঞ্চ বলিল—ওঁরা ত’ আর কেউ বিয়ের candidate নন।

পলি মুখখানি করুণ করিয়া বলিল—তা’ বটে! I plead guilty।

পঞ্চ বলিল—তা’ হ’লে কাল তাই ব’লে দিই?



—মেজদা', সেজদা', ন' দাদা, ছোট দাদাকে বলেছ? তারা কি বলে?

—এখনও বলি নি, 'বেতে বসে' রাজে বলব। পলি চুপাতিমিডরা হুয়ে বলিল—তাই বোলো। মেজরিট যা' বলবে, তাই হবে।

পঙ্কজ বলিল—বিয়ে হ'লেও কিন্তু তোর বি-এটা দিতে হবে, পড়া ছাড়তে পারি নে।

—বড়দা' বে কি বল তার ঠিক নেই, ডবল বিয়ে! 'পলিগ্যানি' হ'য়ে পড়বে যে! — বলিয়া ষণ খল হাতে ঘর ভরাইয়া দিয়া পলি পলাইয়া গেল।

২

পাচ ভায়ের একটি মাত্র বোন। ভায়েরদের কাছে তারার আশ্বাসের অংশ ছিল না, ভায়েরদের আদরও ছিল অকুরন্ত। পঙ্কজ, পরিমল, প্রহ্নন, প্রমোদ, প্রণব, আর সব শেষে এই বোনটি—পল্লব। পল্লবকে জন্ম দিয়াই মা মারা যান, আর তারার মুখের আধ-আধ স্বরে 'বাবা'-ডাক শুনিতে শুনিতেই নিজের জীবনাবসান হয়। আগার সিভিল সার্জনের পিকার্ট হইতে এক দুইবতী পাগলিঝি (wet nurse) আনা হইয়া এই ভায়েরা বোনটিকে মানুষ করে। বাপ ছিলেন ডাক্তার, পক্ষা-কড়ি রাখিয়াও গিয়াছেন, ছেলে কাটিও ভাগ।

পাচ ভাই এক বোন একসঙ্গে খাইত, একসঙ্গে খেলিত, একসঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত। ছোটবড়, লম্বা-গুরু জ্ঞানটা জন্মাইয়া দিবার জন্ত বাহিরের কোন লোকের মাথাব্যথা ছিল না বলিয়া, ইহাদের সম্পর্কটা হইয়া গিয়াছিল, বন্ধুর মত! বোনটিকে মেয়ে-ই হ'লে পোছাইয়া দিয়া, পাচ ভাই এক সঙ্গে পড়িতে বাইত, ছুটি হইয়া বোনটিকে লইয়া পাচ জনে বাড়া করিত। বল-ভাড়া হইয়া ইহাদের কেহ যে কোনদিন কোথায় গিয়াছে, ইহা তারারা ম্লরন করিতেই পারে না।

পঙ্কজ এম-এ ও ল' পাশ করিয়া উকীল হইয়াছে; পরিমল ফাইনাল এম-বি-র জন্ত প্রস্তুত হইতেছে; প্রহ্নন ও প্রমোদ বখাজমে সিক্সথ ও দ্বিপ্থ

ইয়ারে, প্রণব কোর্স, পল্লব খার্ড ইয়ারে পড়িতেছে।

বাঙ্গালীর সমাজে পাচ-পাচটা রূপবান ও গুণবান অনুচ্চ 'পাচ' ও একটা পূর্ণ-যৌবন 'পাড়ী' থাকার সঙ্গে যে বঙ্গ-সমাজ চকল হইয়া উঠে নাই, তারার একমাত্র কারণ, ঢাকলা জাগাইবার নিতান্তই লোকান্তর। দূর সম্পর্কের এক খুড়া দর্জিপাড়ার ছুটি পক্ষ এবং ছুটি পক্ষের গুটী কুড়ি শাবক লইয়া এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে কালে-ভল্লের ইহাদের 'শোজ-খবর' লইতে অশ্বম ছিলেন।

এই গেল খুড়া মহাশয়ের কথা। আর ঢাকলা আনয়ন করিতে পারিত পঙ্কজাদির সঙ্গীতার্থিগণ। কিন্তু এই পাচটি ভাই নিজেরাও যেমন কাহারও বাড়ী বাইত না, বাড়ীতেও কাহারে আনিত না। কাজেই বহু মনুষ্যে বহু কোকিলের কণ্ঠ চিরিয়া গিয়াছে, কত কাণ্ডন কত বলে কত লজ্জাও করিয়া গিয়াছে, গৃহস্বলয় পুষ্পাভ্যাসনটিকে মধুমত লদ মধুপ লদ রহই করিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাগা হৃদয়ের আগমনের পূর্ববর্তী কালে, কয়ের আগমনের মত এই ঘরবানির অধিকারী ও অধিকারিণীদের নিশ্চিন্ত-বাসে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই।

বাগ্গার হুখিয়া হয় বলিয়া ইহার। টেবিলে বসিত, —বাইত দেশীয় অন্ন-বাছানি। রাতে 'ডিনার-টেবিলে' পঙ্কজ কড়া-পাড়িল—পাঁচ ছোড়া অর্থাৎ দশটা চকু তীক্ষ্ণ ও তীর দৃষ্টি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল পল্লবের মুখের উপর। সে মিটিমিটি হাসিতেছিল।

মেজ দাদা পরিমল, সে বলিল,—বেশ ত!

প্রহ্নন 'সেজ দাদা, ইংরাজিতে বলিল—আমি ত' বাঙ্গালীর ব'লেই মনে করি।

প্রমোদ, সেজদার কথাতেই সায় দিল।

প্রণব এতক্ষণ হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া

বসিয়াছিল, এক্ষণে কহিল—পল্লব বিয়ে হবে I. C. S.

না-হয় কোন ব্যাটীরের সঙ্গে! তা' নয়—

পলি হাসিয়া বলিল—কিছু ভেবে না দাদা

প্রণবকুমার, তোমার জন্তে আমরা I. C. S.-এর মেয়ে খুঁজ'বই খুঁজ'ব।

এই কথায় প্রণব ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

প্রণব বলিল—লোককে জিজ্ঞাস করবে, ভগিনীপুত্রিট কি করেন? আমার বলতে হবে, ফুটবল খেলেন। আহা কি পরিচয়!

পলি কি একটা বলিতে বাইতেছিল, পরিমল তাহাকে থামাইয়া দিয়া, বলিল—তোরা মতে চাকরীটাই বড় পরিচয়, নারে প্রণব?

প্রণব কহিল—সুখ আমার মতে নয়, দেশ শুদ্ধ লোকের মতেও তাই সেজদা'!

পরিমল বলিল—এইত শতক শতকে I. C. S. এই বাবা দেশেই আছে, ক'জনের নাম লোকে জানে? তুই বা ক'জনের নাম জানিস বলত? আর মোহনবাগানের জি, দাশের নাম পোনো নি, এমন লোক ভারতবর্ষেই ন'জন আছে?

পলি বাম হাত দিয়া, পার্শ্বোপরি প্রণবের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, তারার বৃথানা কানের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—আহা, তোমরা আমার এই ছোট দাদারটিকে জন্তে I. C. S.-এর মেয়ে নিতান্ত নাই পাও যদি, একটি আস্ত I. C. S.-ই না হয় দেখে দিও।

আবার তুলন হাসা উদ্ভিত হইল।

একটু পরে প্রমোদ জিজ্ঞাসিল—পোপালের আর কে আছে—তাঁকে, কিছু শুনলে?

পঙ্কজ বলিল—নেই কেউই! একটা বোন, ভগিনীপুত্রি ভেগুটা না সাব-ভেগুটা কি ছিল! এখনও আছে কি নাই, এ'ও খবর জানে না, তারও খবর রাখে না।

পরিমল বলিল—আখীর-কুটন বত কম থাকে ততই ভাল, ঢাকের বাতির মত!

পলি বলিল—জাতির চেয়ে মিত্র নেই যদি না থাকে বেঁচে!

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

পঙ্কজ বলিল—তা' হ'লে খবর দিই?

প্রণব ও পল্লব ছাড়া সকলেই মত দিল।

পল্লব বলিল—বড়দা', এরই মধ্যে কুলে পেলো?

—ওহ, সেই কথা! তা' বিবেচনা করতে ক'দিন

লাগ'বে তোমার শুনি।

—রবিবারে বলব।

প্রমোদ কহিল—You rat! আমি ধরিছি। বুলে না দাদা, শনিবারে Local vs. Visitor ম্যাচ আছে না, পলি একবার ভাল ক'রে পোপালকে দেখে নিয়ে তব মত দেবে।

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল—! See!

পলি বলিল—But why 'Gopal'? Why not 'Das'?

প্রহ্নন বলিল—কেন, পোপাল নামটা কি খারাপ? দ্বিতীয় ভাগেই ত' রয়েছে, পোপাল বড় সুবোধ বালক, সে যাহা পায়, তাহাই খায়—

পলি বলিল—সেই জন্তেই নামটা বদলান দরকার। With due respect to Vidyasagar ম'শায়, that goody goody "Gopal" won't do!

তাহাদের একটি বুদ্ধি ছিল, বাড়ীতেই থাকিত, গির্জাবাসির মত। রাতে শুইতে গিয়া পল্লব কাছে অসুযোগ করিয়া বলিল—হ্যাঁগা দিদিমণি, একটা বরাটে ছেঁড়ার সঙ্গে নাকি দাদাবাবুরা তোমার বিয়ে দিচ্ছে?

—বরাটে কে বরো?

—ওমা, ফুটবল খেলে বেড়ার, তুমি বলছ বরাটে নয়!

—তা' তোকেই বা দোষ দোষ কি বল! আমাদের ছোড়দা'র বিদ্যোও তোরাই মত!

তারার বিদ্যার দোষ কোনখানে, তাহা ত' সে গুণিলই না, উপদ্রব গুণিল, মা-বাবা নাই বলিয়া ভায়েরা মিকুলে জন্মশ্রু, পিতৃমাতৃভাঙিত এক হতভাগ্যার করে পোনো বোনটিকে জুগিয়া দিতেই কৃতদম্বরা। বুদ্ধির কাগা পাইতেছিল। ঐ পঙ্কজ হইতে সব ক'টা ছেলেমেয়ে ত' তাহারই হাতের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছে।



৩

যাক—বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বে একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সে যুগান্ত বোধ করি এক্ষণে নিশ্চয়োত্তর; তথাপি যদি কোন কোতূহলী পাঠিকার সেই ঘটনাটা জানিতে বাসনা থাকে, তাহার কোতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পূর্ণ বিবরণ না হোক, আশির্কি বিবরণ বিনোদিত। শনিবারে মাঠে খেলা ছিল, “নোহন-বাসান” নাম “অর্থ্য”। বিরাম সময়ে গোপাল যখন এনকোজারের ফটক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, পথের উকীল বন্ধুটি তাহাকে ডাকিয়া ইহাদের সহিত ‘হত্যাহ’ হইয়াছে।

নায়ক বলিল—মরাকে মারতে কার ইচ্ছে হয় বলুন তা’?

নারিকা কহিল—কিন্তু লোকে তা’ বুঝে না; তাহা বলবে, আপনাদের ‘টিম’ নেমে গেছে।

নায়ক হাসিল, বলিল—ভাল, তা’ হ’লে পোটা কতক হিসেবে দেওয়া দাক।

কথা ঐচ্ছিক ও ঐ পর্যন্ত। কিন্তু যে কথা সেই কাজ। শোবার্কে “অর্থ্য” পদশীল গোলা ভঙ্গ্য করিয়া ফেলিল। পলির ভায়েরা বলিল—তুইই গুণের মাগিল, পলি!

পলি সগর্বে সানন্দে এই অপবাক শিরোধাৰ্য্য করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিবাহিত জীবনের স্বপ্নের দিনের একটি বসন্ত কি আনন্দেই কাটিল! অভিনন্দন ফুড়িয়া বেড়াইতে তাহাদের শ্রান্তি আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। ভোজ খাইয়া খাইয়া পলির ভিগপেপুসিয়া ধরিয়া গেল। গোপাল তখন পলিকে লইয়া নৈমিত্তাল পলায়ন করিল। সেখানেও অব্যাহতি নাই, ছোকরার সত্য করিল, ভোজের ব্যবস্থা করিল, শেলার আয়োজন করিল, মিষ্টার এবং মিসেস্ দাশের আগমনে শান্ত নীরব নৈমিত্তাল হুচ্চল হইয়া উঠিল।

নৈমিত্তাল হইতে দিল্লী, সেখান হইতে নামিয়া আগ্রা, আগ্রা হইতে সুভরী, সপ্তমণ্ড শিমলা-শৈবে পলায়ন—কিন্তু সর্বত্রই সেই “ধর ধর” রব! এই জয়ন্তীর ছিনিমিনির যুগে লোকে ছাড়িবে কেন? পলি, শেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, ছয় নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যদি এই উপায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তবে তাহার তাহাও করিবে।

সে-বছর লণ্ডনের রেলের একদল ছুবনবিজয়ী খেলোয়াড় ভারতবর্ষে ফুটবল খেলিতে আসিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সমূহের মধ্যে খুব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সবক’টি নামজাদা ও বড় রেলওয়ের গুস্তার বাছিয়া বাছিয়া খেলোয়াড় সমূহ করিতে ছিলেন। ই, আই, রেলের এক বড়দাহেব গোপালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি গোপালকে দ্বন্দ্ব করিলেন। গোপাল টেলিগ্রাম পাইয়া সন্নীক কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। সেই দিনই গোপালকে একটা চাকরী দিয়া, রেলের টিম-ক্লক করিয়া লওয়া হইল। চাকরী লওয়ার পলির বিশেষ আগ্রহ। গোপাল বুঝাইল—আমি যদি চাকরী না নিই, রেলের ভরফে খেলার অধিকারও আমার থাকে না। বিলাতের রেলওয়ের লোক বন্ধু, ভারতের রেল বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে নিয়ে খেলেছে, ভারতের রেলের পক্ষে সে বড় অপমান। আমার দেখ, বিলেতের রেলের কাছে ভারতের রেল যদি হেরে যায়, ভারতের পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে, আমাদের পক্ষে সে-ও বড় অপমানের কথা। না?

পলি আর তর্ক করিল না। যে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আকীবন সে বঞ্চিত, তাহাতে হুকুরীয়াস্তি সর্ঘ্যন না করিলেও, স্বাধীন প্রদত্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিতেও পারিল না।

বিলাতের খেলোয়াড়রা ভাবিয়াছিল, তাহারা ভারতকে ঘুরে উড়াইয়া দিবে—দিতও তাহাই, কিন্তু গোপাল তাহাদের আশা-ভরসা ছিন্ন করিয়া দিতে

লাগিল। এক গোপাল যেন শত গোপাল হইয়া মাঠের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। কোন এক বিবাহ সভায় এক বালিকাকে বিভ্রমিত করিবার জন্য চারজন লোক তাহার কান্য পতি সাজিয়া বসিয়া গিয়াছিল, বালিকা পাচটি ভাবী পতিকে দেখিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল, কাহাকে মালা দান করে!

বিলাতের খেলোয়াড়রাও যেদিকে চায়, গোপালকে দেখে। যে-তাহারা ভারতবর্ষকে ফুৎকারে উড়াইবে স্থির করিয়া অগ্রস্ত অবস্থাজাতের মাঠে নামিয়াছিল, সেই-তাহারা টাংকার করিয়া, গর্জন করিয়া, দাখাধাকি করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া ধুকিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাহারা শীতল দেশের লোক, শোণেশেই তাহাদের জিত ও জ্ঞান দুইই বাহির হইয়া পড়িতেছিল। খেলা শেষ হইয়া, গোপাল হেড করিল, বলটা সোজা পেলের ভিতরে ঢুকিয়া নিশ্চল হইয়া গেল। মাঠের সে সময়কার দৃশ্য বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। আমার পাঠক-পাঠিকা মননশূন্যে তাহা পরিদার দেখিয়া নইতে পারিতেছেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। হেড ওয়ার্ড কোম্পানীর ভবনবাবু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, মাঠ সাফ করিবার কালে ধাক্কাড়া তিন হাজার ছাত্রের জা বাট, প্রায় সাত হাজার শ্রাবণে চট ও দশ হাজার কমালা ফুড়িয়া পাইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজ, শহুনাথ হাঙ্গামতাল, চিত্তরঞ্জন হাঙ্গামতাল প্রভৃতিতে খবর হইয়া জানা যায় যে, সেদিন মুনপক্ষে নয় শত লোক ব্যাঙ-চান্দা হইয়া চিকিৎসার আসিয়াছিল, তন্মধ্যে সস্ত্রাভীনের সংখ্যা তিন শত। বেচারী পলি, কর্মকর্তনের চাপে তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিখানি প্রায় সস্ত্রা হইয়া অক্ষম হইয়া গিয়াছিল, “গুলাড” লেশনের পটি বাঁধিয়া বাঁধিয়া হাতখানাই হাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

রেলের সেই বড়দাহেব বলিলেন—গোপাল, তুমি ভারতবর্ষের রেলপথেই মুখ রক্ষা করিয়াছ। কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করিও, কথা আছে।

রেলের একেট গোপালকে সঙ্গে লইয়া লাটসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন; লাটসাহেব ও লাট-পত্নী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গোপালের করদ্বন্দ্বিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন; পলির ডাক পড়িল, লাট-পত্নী তাহার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার জন্য আইস ক্রীম করমায়েস করিয়া পাঠাইলেন। বিলাতের রেলের নেতা আসিয়া গোপাল ও মিসেস্ গোপালকে মালা-বিকৃতি করিল।

পাড়াতে উঠিবার সময়, পলিকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া পিয়া প্রণব বলিল—পলি আমাকে ক্ষমা করো ভাই! ছার I. C. S.। আজ গোপালের যে সম্মান স্বত্বে দেখেছি তার তুলনায় I. C. S. ফাই-সি-এ কিছুই নয়।

পরদিন রেলের সাহেব বলিলেন—গোপাল, তোমাকে আমরা এডিস্ট্রাট ট্যাক্সি ব্রপারিটেটেট করছি। আশা করি অকিসরের dignity (মর্যাদা) অক্ষুর রেখে তুমি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করবে।

পলি যখন খবর শুনিল, প্রসন্ন অথবা অপ্রসন্ন হইল বুঝা গেল না, চুপ করিয়া রহিল।

৪

Dignity! এই ইংরাজী শব্দটা কি মজা বিশেষ? যে যায়, মাতাল হইয়া সে আনন্দ উপভোগ করে; আর তাহার আত্মীয়-স্বজন মনে-প্রাণে অভিসম্পাত করে। Dignity রাখিতে রাখিতে গোপাল মত্ত সাহেব হইয়া উঠিয়াছে, আকিসে তাহার ভারী পায়! বাড়ীতেও কম কি! সকালে, রাতে, যতখন বাড়ীতে থাকে, ভিজিটর আর ভিজিটর! সকলেই প্রসাদ-ভিক্ষু। এই বহুজনবাসিত সম্মান-স্থান আকর্ষণ পান করিয়া গোপাল যখন অন্তঃপুরে আসিত, তখন তাহার দেহ-মন যেন বাতাসে উড়িত; নারী হাসিমুখে তাহাকে প্রত্যাগমন করিয়া লইত বটে কিন্তু কোন্দলানটায় যে একটা ঠাঁট-খা-বড় করিত, তাহা অজ্ঞে তো নয়ই, সে-ও বুঝিত না। অহযোগ করিবারও কিছু নাই, তবু যেন কিসের একটা অভাব, কি একটা অপর্যাপ্ত



রহিয়া যায়, তাহার বাখা বটে হৃদের মত স্বপ্ন, কিন্তু যায় না, কিছুতেই যায় না।

পলির ভায়েরা যখন-তখন আসে, বসে, পল্ল করে, খান-দায়, ভূখ করিবারও কিছু নাই, কখন-কখন থাকিয়াও যায়—তাহারও বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোপালের সঙ্গে বসে ছুটো কথা কইবারও হুহুং মেলা না যে বো! কেবল লোক!

পলি বলে—আলাতন নানা, আলাতন!

ভায়েরা বলে—তুই কেন ধমকাসু নে?

পলি বলে—ধমকাইনে বটে, তবে বলি। হাশে।

খেলা দেখা তো উঠিয়াই গিয়াছে। বাইবে কি করিয়া, কহারই বা সঙ্গে? অফিসার লোক, অফিস হইতে, অফিসারদের সঙ্গেই মাঠে চলিয়া যায়, পলির বাগ্মা আর হয় না। ভায়েরা লইয়া যাচ্ছে চায়, পলি কাজের ছুটা করিয়া কাটািয়া দেয়। কাজ তো তাহার কম নয়! অফিসারের প্যাট, কোট, সার্ট, ভেট পলি নিজেই সব প্রস্তুত করে—সাহেব-বাড়ীর পোষাকও তাহার তৈরী পোষাকের কাছে হার মানে। তাহার অবসরই বা কই? গোপাল যখন অফিসে থাকে, অফিসের যত কাইল, যত কাগজ বাড়ীতে পায়, পলি সমস্তই নিঃশেষে পড়িয়া ফেলে। যদি দেখে, তাহার স্বামী বা অজ্ঞ কোন অফিসার কোন কেরানী বা নিম্নপদস্থ কর্মচারীর প্রতি কোনরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহা হইলে, সময় পাইবামাত্র, তাহা লইয়া স্বামীর সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দেয়। গোপাল তর্ক করে না, মিট-মিট হাসে।

লাইনে বাইবার কথা উঠিলে, প্রথম প্রথম পলি বাইতে চাইত, গোপাল কাটািয়া দিত। গোপাল যে বিশেষ অজায় কিছু বলিত, বা করিত, তাহা নহে; ছই একদিনের জন্ম বাগ্মা, তাহাতে 'লটবর' লইয়া বাগ্মার দ্বাবা হয় না, এইটুকুই ছিল তাহার বক্তব্য। তবে অদ্ব্য হইবার যে বাস্তবিক প্রকৃতি সকল নারীর মধ্যেই অন্তর্বিষ্ট হইয়া আছে থাকে, তাহাই পলির মধ্যে যথো যথো

দিয়া উঠিত বলিয়া সে এই সহজ সিদ্ধান্তটুকুও প্রকাশও একটা ব্যাপারে পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না, পলি কলহ বা বচসা করিয়া, অথবা মুখ অগ্রসর করিয়া গোপালের মানসিক পীড়ার কারণ হইত। একেবারেই নয়। ভেট ও শিকিত নারীর পক্ষে তাহা একান্তই অসম্ভব। ততটুকু মত-বিরোধ হইত, হাসিমুখে মানিয়া লইতেই পলি অভ্যস্ত ছিল।

আমি একটি উত্তানলতা দেবিতাম, এখনও দেখি। যখনই দেখি, দেখি—লতাটি পরম্প্রে সমুদ্র—শীত নাই, বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত নাই, সমর-অসমর নাই, লতাটির গায়ে রুমকা রুমকা ফুল ফুটাইয়া আছে। ইহাও দেখি, লতাটির মূলে কেহ কখনও বারিসিকন করে নাই, কেহ গোড়াটি খুঁড়িয়া দেয় নাই, কেহ তাহার অনাবগুজ ডাল-পালাগুলি কাটিয়া-কুটিয়া কেদারী করিয়া দেয় নাই, তবুও সেই তিরপুপিতা লতাটিকে একটি দিনের তরে আমি শুক বা অগ্রসর দেখি নাই। কে তাহাকে যত করিল, কি করিল না, কে তাহাকে আদর করিল, কি করিল না, সে যবনের সঙ্গে তাহার যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে, সে যেন তাহাও জানে না। তাহার পরিখাতি পুপিত হওয়াতে, তাহাও যে হইয়া চলিতেছে; শোভা বিকাশ করাই তাহার ধর্ম, সে তাহাই করিয়া চলিতেছে—কে দেখে, কে ভোগ করে, কে দেখে না, কে ভোগ করে না—সে দৃষ্টিভঙ্গি তাহার ছিল না!

৫

ছই বৎসর পরে, একদিন গোপাল অফিস-কক্ষে বসিয়া একটা 'প্রান' দেখিতেছিল, পলি ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—যান করবে না? বোমা যে বায়োটা হ'ল।

—এই যে উঠি, বলিয়া গোপাল নিবিষ্টচিত্তে আবার প্রান দেখিতে লাগিল।

—কিসের প্রান ওটা?

রাঁটা থেকে কয়খু পর্যন্ত একটা নতুন মোটর-রাঙা হয়েছে, তারই প্রান।

—সেখানে দেখবার কি আছে?

—পথে ছড়, আর রাজকুপায় মোমেলের উৎপত্তি দেখা যায়। রাঙাটা মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে বেরিয়েছে।

পলি একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া জাঁকিয়া বসিল, বলিল—তোমার গুডফ্রাইডের ছুটি আরম্ভ করে থেকে?

কক্ষ-প্রাচীরে রেলের লাল-কালো-নীল তারিখ-অঙ্কিত সূর্যসং নিম্পত্তী লগিত ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গোপাল কহিল—এবছর ঈদটাও ঐ সঙ্গে পড়েছে, বুধবার থেকে ছুটি আরম্ভ।

পলি হিসাব করিতে লাগিল,—বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শনি, রবি, সোম—ছদিন ছুটি, কেমন?

—হ্যাঁ।

—ইচ্ছে করলে আরও ছ'একদিন নেওয়া যায় না?

—তা' যায়; কিন্তু কেন বল ত?

পলি বলিল—চলো, কয়খু বেড়িয়ে আসি।

নতুন গাড়ীতে দুই কোথাও বাগ্মা হয় নি!

গোপাল বলিল—বরাবর মোটরে! কি সর্বনাশ!

পলি কৃত্রিম কাপেণের সহিত বলিল—সর্বনাশ কি আবার! মোটরে রাঁটা যায় না, এমন কোন লোক মোটর রাখে ব'লে আমি ত' ভনি নি।

গোপাল বিশ্বাসের ভান করিয়া জিজ্ঞাসিল—তাই নাকি? এমন?

পলি বলিল—হ্যাঁ; তাই! এত সুন্দর রাঙা আর পঞ্চের এত দৃশ্য সৌন্দর্য যে একবার গেলে বারবার যেতে ইচ্ছে হয়। লজ্জীটি, চলো।

গোপাল নিমরাণী হইয়া বলিল—তা গেলে হয়।

পলি সোমসাথে কহিল—আজ রবিবার, কাল সোমবার, পূর্ন মঙ্গলবার, তারপর দিন ত' বুধবার। বুধবার বু' তোরে বের হ'তে হবে। আমি আজই সব শুজিয়ে-

গাছিয়ে ফেলছি। আর কি-ই বা গোছাব ছাই-ভস্ম আমার মাথানুহু! একটা বেজি, ছোটো হুটকেশ, এই বৈ ত' না! কতকণই বা লাগবে! রামলগন স্নানার যাবে, ডাইভারের দরকার নেই, কেমন?

—জিগী জিগিমু' তুমিই ত' সব করছ, আমাকে আর নিমন্ত্রণের ভাগী করা কেন?

—ডাইভার কি হবে! তুমি ডাইভ না করলে না? ভিসুটেনে গিয়ে স্বপ্ন নেই! সেই-ই একবার বাগ্মা হয়েছিল, মনে আছে, পাটনা থেকে আগা, আবার আগা থেকে কিরে ডেরা! সে তবু ছিল তাড়া গাড়ী, বাজে গাড়ী!

গোপাল চেয়ারে হেলান দিয়া আলতের হাই তুলিয়া বলিল—প্রণব-ঊষর কেউ বাবে না কি?

পলি বলিল—বললে যায় নিশ্চয়; কিন্তু কাজকে বলব না। একটু ধামিয়া, গলাটা একটু নামাইয়া, স্বরে খানিক শোহাগ ঢালিয়া দিয়া আবার বলিল, শুধু তুমি আর আমি!

—যাই যান ক'রে আমি, বলিয়া গোপাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। পলি মনে মনে কত হিসাব-নিকাশই করিতেছিল, বলিল—রিডলভারটা নিতে হবে; টট নিতে হবে; আচ্ছা, রাইফলটাও নেওয়া যাক না, যদিই কোনদিন শিকার-টিকারো যাব; বাইনাকুলার সব কটাই নিতে হবে; ঘামোঁ, ছোটো নিলেই হবে, একটা চায়ের, একটা জলের, কেমন? তুমি যান ক'রে এসে দেখবে, আমার সব গোছান সারা!

গোপাল হাসিয়া কহিল—আজই ত' আর বাগ্মা নয়, এত তাড়া কেন?

পলি বলিল—মা! বললে আর কি! আজ না গোছালে তুমি সব দেখে বুঝে নবের কি ক'রে মশাই! মাঝের হুদিনই ত তোমার অফিস! শেষে দেখা যাবে এটা ভুল, সেটা ভুল। বিশেষে সে ভারি বিশ্রী লাগবে। তার চেয়ে আমি এখন শুজিয়ে ফেলছি, তারপর ছুজনে দেখে টেপে কিছু বাদ পড়ে যনি, আবার টিক ক'রে নিলেই হবে। কেমন?



গোপাল বলিল—প্রানটা ত করা বাবু, তারপর দেখা যাবে।

নারীর শক্তি সম্বন্ধে যে সকল পুরুষ সবিশেষ সচেতন নহেন, তাঁহারা তঁ' ধারণাতেই আনিত্তে পারিবেন না যে, গোপাল প্রান মারিয়া বাহিরে আসিবার কিছু আগেই পলি ছুঁইটা স্টেবল, হ্যাণ্ড বগ, বন্দকের বাগ, খামোঁ, টেট, রিভলবার, কার্ডজ সমস্তই গুছাইয়া লইয়া ড্রিং রুমে বলিয়া গোপালের প্রার্থনা করিতে লাগিল। গোপাল তাহার মুখ দেখিয়া সবই স্থগিল কিন্তু সে-প্রসঙ্গ না তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—খাবার দিতে বলগে? পলি কহিল—না, বলি নি; বলছি।

ফিরিয়া আসিয়া কহিল—চলো দিকিন, সব দেখে-জেনে নেবে!

গোপাল বলিল—বাওয়া-দাওয়ার পর।

আহারাদির পর, পলি পাণ খাইয়া ড্রিং রুমে আসিয়া দেখিল, গোপাল তথায় নাই, অফিস ঘরেও তাহাকে দেখা গেল না, শরনককে চুকিয়া দেখিল, শয়ান চৌক শোয়া হইয়া, চান্দর মুড়ি দিয়া সে পা নাচাইছে। পলির পদশব্দে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। হাসিয়া পলি পার্শ্বে আসিয়া বলিল, মুখের ঢাকা তুলিয়া দিবা বলিল—তুমি যে বড় ঘুরতে এলে?

গোপাল পলাটা জুড়াইয়া জুড়াইয়া বলিল—ছুটির দিন, দুপুর বেলায় একটু ঘুরব না?

—ওগুলো দেখে এসে ঘুরবে, চলো।

—বিকলে দেখব না।

অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। গোপাল তাহাকে শয়ান আছেন দিল, পলি বলিল—হ্যাঁ! আমার ত' কাজ-কর্ম নেই, প'ড়ে প'ড়ে ঘুরি আর কি! —বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। গোপালের অফিস-কামরায় চুকিয়া সেই প্রান, মাঝ কাগজ, লাল-নীল পেন্সিল লইয়া, কোথায় চা, কোথায় রেকর্ড, কোথায় লাঞ্চ, কোথায় বৈশিষ্ট্য চা, কোথায় ডিনার খাওয়া যাইবে, কোথাই বা প্রয়োজন হইলে রাঞ্জি বাস করা যাইবে, তাহারই স্থান এবং সময় নির্দেশ করিতে বলিল।

এসকল কাজে সময় বতটা লাগা উচিত অথবা লাগিলে ভাল হয়, দুখের বিষয় তাহার চেয়ে কম সময়ই লাগে এবং সব শেষ করিয়াও অনেক সময় হাতে থাকিয়া যায়। ইহার মধ্যে দু'একবার শরনককে প্রদক্ষিণ করাও হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিট পূরম নিশ্চিত মনে নিতাময়। কোন তাহার স্বামীর 'ইনসামনিয়া' হয় না, পলি কেবল তাহাই ভাবে!

চায়ের বেলা প্রায় শেষ করিয়া গোপাল শয্যা ত্যাগ করিল; শান-কামরাতেও অনেক দেরী করিল। পলি চায়ের টেবিল সজ্জিত করিয়া বসিয়াছিল, গোপাল আসিতেই বলিল—তবু ভাল যে ঘুম ভাঙল বাবু!

গোপাল বলিল—বড় ঘুমিয়ে গেছেছি, না?

চাপান চলিতেছে, বেহারা একখানি কার্ড আনিয়া দিল, গোপাল কার্ডে অঙ্কিত নামট দেখিয়া, আগন্তুককে অফিস ঘরে বসাইতে বলিল। পলি কার্ডখানা টানিয়া লইয়া, দেখিতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও না দেখিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

গোপাল হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর ভিতরে না আসিয়াই, আগন্তুকের সঙ্গে তাহারই গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। পলির ইচ্ছা হইল, সাজান স্টেবলসাদি ভান্ডিয়া চুরিয়া শতখান করিয়া কেলে। সব রাগ পড়িল, সেই অজ্ঞাত অপরিচিত আগন্তুকের উপর। ডাইনিং রুমে চুকিয়া লোকটির কার্ডখানা জুড়াইয়া লইয়া দেখিল, কোন একজন ইরাজের নাম ছাপা আছে। অফিস-সংশ্লিষ্ট লোক ভাবিয়া পলির আরও রাগ বাড়িয়া গেল। চাকুরীর উপর তাহার ঘৃণা চিরদিনই ছিল, আজও আছে এবং দিনের পর দিন তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

গোপাল গভীর রাতে আহারাদি করিয়া শয্যা প্রবেশ করিল। নিজে হইতে সে প্রসঙ্গ তুলিতে না, পলি ইহাই সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, গোপালও কোন কথা বলিল না, সেও স্থগিল না, একজন অথচো ঘুমাইল, আর একজন সেই শয্যাতে শুইয়া ঘুমের চৌদ্দপুরুষ করিতে লাগিল। (আগামীবার সমাপ্ত)

## প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাজারের ইতিহাস)\*

কবিভূষণ শ্রীপ্রচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটনাগর, বি-এ

ছয় শত বৎসর পূর্বের কলিকাতা ও বর্তমান কলিকাতা সম্পূর্ণ পৃথক। আজ সেই জব-চার্জ জীবিত নাই,—থাকিলে তিনি স্বল্পদে বলিতে পারিতেন যে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট (১০২৭ বঙ্গাব্দে ২২শে ভাদ্র) রবিবার বেলা ২১০টার সময়, উত্তরে ৩ আনন্দময়ীর তলা ও দক্ষিণে শিবনারায়ণ ঘোষের বাটা বা মণ্ডল-স্ট্রীট, এই দীমার মধ্যে মোড়া-বাগানের কোন এক স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ-পূর্বক সাত জন সহচর লইয়া ও আট খানি গোলা-পাতার ঘর বান্ধিয়া এবং নিকটবর্তী স্থলতল নিখলবে বসিয়া কলিকাতা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ইরাজদিগের বাসিলা মনে মনে তিনি কি কল্পনা করিতে তিনি কলিকাতার কিরূপ করিয়াছিলেন। আজ সেই জাহাজ থাকিলে তিনি কহিতে পারিতেন (চাপকে) কোন ব্রাহ্মণ-কর্তৃক হইতে নিবৃত্ত করিয়া করিয়া আশি ও উ সমাহিত রহিয়াছেন নাই,—থাকিলে কি শিয়ালদহের অন্তর্গত গুড়-গুড়ি টানিতে একখানি রথের কুঠী-নিম্মাণ বিষয়ে আজ সেই নবীন নাই,—থাকিলে বায় সেনাপতি ইরাজ বন্দী



কেলসালু হাউস" হইতে ভবানীপুরস্থ স্বীয় বাগান-  
বাড়ীতে শান্তিলাভ করিবার আশায় গিয়া  
চৌরঙ্গীর জঙ্গলস্থিত বায়াদি স্থাপন-সমূহের ভীষণ  
গর্জনে জননে কিরূপ আশঙ্কিত রাখিয়া বন্দুক-হতে  
সমস্ত রাতি তিনি অনিদ্রায় যাপন করিতেন।  
আজ সেই চৌরঙ্গী গিরি জীবিত নাই,—থাকিলে  
তিনি সাক্ষা দিতে পারিতেন যে, বর্তমান চৌরঙ্গীর  
মাঠের উপর নিবিড় জঙ্গলে ব্যায় ও অস্ত্রাঙ্ক হিংস্র  
জন্তুগণ কিরূপ ভীষণ চীৎকার করিত, এবং তিনিই  
কিছুকাল কষ্ট সহ্য করিয়া প্রত্যাহ কালীঘাটে গিয়া

করিয়া আসিতেন! ছই শত বৎসর  
কি মাত্র পাক বাড়া  
আজ

এই হেতুই, এই স্থানের নাম “বাগবাজার” হইয়াছে।  
পেরিন-সাহেবের কথা পরে বর্ণিত হইবে।

## ২। বাগবাজার ষ্ট্রীট

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে,  
“বাগবাজার ষ্ট্রীট”, “চিৎপুর রোড” হইতে আরম্ভ করিয়া  
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখন  
বাহ্যকে লোকে “অন্নপূর্ণা-ঘাট” বলে, পলাশীর যুদ্ধের  
পূর্বে তাহাকে “ওন্ড-পাউডার-মিল ঘাট” বলিত।  
এই ঘাটের দক্ষিণ দিকে আর একটী ঘাট  
ছিল:—ইহার নাম “ব্রহ্ম মিলের ঘাট”। এই ব্রহ্ম মিল,  
কুমারটুলী-নিবাসী, সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিলের পুত্র।  
গোবিন্দরাম মিল জেকোনিয়া হলওয়েল-সাহেবের  
অধীনতায় “গ্লাস জমীদার” বা “ডেপুটি গভর্নর” ছিলেন।

কলিকাতার ক্ষোভদারী বিচারের ভার তাহার  
পারিত ছিল। এতদ্বিধ তিনি “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-  
কম্পানী” হইতে কলিকাতার রাজস্ব আদায়  
করিতে “বাগবাজার ষ্ট্রীট” নাম হইবার কারণ এই  
ঘাটের পেরিন-সাহেবের বাগানে  
স্থিত ছিল। পলাশীর যুদ্ধের  
পূর্বে “ওন্ড-পাউডার-মিল-  
“ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র  
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বীয় “কলিকাতার  
করিয়া গিয়াছেন।  
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে  
পাওয়া যায় যে,  
দ্রব স্বন্দর বৃক্ষ  
হব-কৃত মানচিত্রে  
র দৈর্ঘ্য সিকি  
উপর হইতে  
মহাশয়ের  
ষ্ট্রীট” দিয়া  
কৃত আভাবল

হইতে বাগবাজারের মোড় পর্য্যন্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ  
ছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে “কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট” নির্মিত  
হইলে “বাগবাজার ষ্ট্রীটের” সহিত ইহা সংমিলিত  
করিয়া দেওয়া হয়।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল তারিখের আগবন্ধ-  
কৃত মানচিত্রে “বাগবাজার ষ্ট্রীটের” নাম ছিল “ওন্ড-  
পাউডার-মিল-বাজার রোড”। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে “ইষ্ট-  
ইণ্ডিয়া-কোম্পানী”র আদেশ-মতে কলিকাতার অনেক  
রাস্তার নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। “ওন্ড-পাউডার-  
মিল-বাজার রোড,”—এই নামটী অস্ত্রাঙ্ক লগ্না বলিয়া  
পেরিন-সাহেবের বাগান অর্থাৎ “বাগ”, এবং পেরিন-  
সাহেবের “বাজার” এই দুইটী শব্দ মাত্র লইয়া “বাগবাজার  
ষ্ট্রীট” এই সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই  
এই ষ্ট্রীটের নাম “বাগবাজার ষ্ট্রীট” হইয়াছে।

## ৩। পেরিন-সাহেবের বাগান (Perrin's Garden)

বর্তমান “বাগবাজার ষ্ট্রীটের” উত্তর দিকে পেরিন-  
সাহেবের বাগান ছিল। উত্তরে “মাহাতা ডি”, পূর্বে  
“হরলাল মিলের ষ্ট্রীট”, দক্ষিণে “বাগবাজার ষ্ট্রীট” ও  
পশ্চিমে “চিৎপুর রোড”,—ইহাই এই বাগানের চতুর্দশীমা  
ছিল। তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সিভিলিয়ান-গণ  
দ্রোণ লইয়া প্রত্যাহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে  
এই বাগানে বেড়াইতে আসিতেন। লং-সাহেব ছাড়া  
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বাগানে কেবল  
সাহেবেরাই বিহার করিতে আসিতেন। কোন  
বাহাদুরী এখানে প্রবেশ করিতে পারিত না। তৎকালে  
বাগবাজারে আট দ্রব সাহেবের বাস ছিল। পেরিন-  
সাহেব এই আট জনের মধ্যে এক জন। কিন্তু  
অবশিষ্ট বাজিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।  
তখন এই অঞ্চলে চারি জন সন্ন্যাস ও উত্তপদস্থ  
বাহাদুরীর নাম পাওয়া যায়। ইহাদের নাম,—  
শোভাবাজার-নিবাসী নন্দরাম সেন, কুমারটুলী-নিবাসী  
গোবিন্দরাম মিত্র এবং শ্রামবাজার-নিবাসী দয়্যারাম  
বহু ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাম বহু। এই কৃষ্ণরাম

বহু বংশধর নবীনচন্দ্র বহুর বাটীতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে  
“বিজ্ঞান-স্বন্দর বাড়া” নির্মিত হইয়াছিল। ইহাই  
বাহাদুরী দেশে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক যাত্রার অভিনয়।  
নবীনবাবু অস্ত্রাঙ্ক বিলাসী ও সৌখিন ছিলেন। তিন  
রাতি গাওনা হইয়াছিল। ইহাতে নবীন বাবু ২৫০  
লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের জন্য  
“রাজবাড়ী”, “মালিনীর সরোবর ও কুটীর” এবং  
“স্বন্দরের স্তম্ভ” বর্ণার্থ ই নির্মিত হইয়াছিল। তৎকালে  
দৃশ্যপটের প্রথা প্রচলিত ছিল না।

পেরিন-সাহেবের অনেকগুলি জাহাজ ছিল। তন্মধ্যে  
তিনখানি জাহাজ বর্তমান “অন্নপূর্ণা ঘাটে” বাধা  
থাকিত। বিলাত হইতে মাল আমদানী ও রপ্তানী  
করিবার অভিপ্রায়েই পেরিন-সাহেবের জাহাজগুলি এই  
ঘাটে থাকিত। আমার নিকটে একখানি অতি চমৎকার  
পুস্তক ছিল। ইহার নাম “Alexander Hamilton's  
Accounts of the East Indies.” পুস্তকখানি  
১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্তম্ভভাষে ইহার  
বন্দ্যু এখন ১৯৪ বৎসর। এই পুস্তকে বাগবাজারে  
পেরিন-সাহেব সন্ধ্যা অনেক নৃতন তথ্য লিখিত  
আছে। Sceptre নামে পেরিন-সাহেবের একখানি  
জাহাজ “বাগবাজার ঘাটে” বাধা ছিল। ১৭০৭  
খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই জাহাজখানি গ্রেপ্তার  
করেন। কারণ পেরিন-সাহেব, টমাস পিট ও  
বেনজামিন বাউচার সাহেবের নিকটে বেনাদার  
ছিলেন। কিন্তু কোম্পানী যখন জানিতে পারিলেন  
যে, এই জাহাজখানি পেরিন-সাহেবের অধিকারে  
আর নাই, তখন তাহারা পেরিনকে ও তাহার  
জাহাজকে ছাড়িয়া দিলেন। পেরিন-সাহেব  
কোম্পানীকে এই বাগানখানি বিক্রয় করিয়া  
কেলিলেন। কোম্পানী ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই  
বাগানখানি বাসে রাখিয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে  
২০শে নভেম্বর তারিখের Consultations-এ একটী  
বিজ্ঞাপন এই মর্মে বাহির হয় যে,—“পেরিন-সাহেবের  
বাগান, মেসার্সের অর্জবে ক্রীত হইয়া পড়িয়াছে।



সিভিলিয়ান সাহেবগণ লাল দীঘীতেই বেড়াইয়া থাকেন, এ বাগানে আর বেড়াইতে আসেন না। স্ত্রতঃ আশানী ১১ই ডিসেম্বর সোমবার তারিখে প্রকাশ নিলামে ইহা বিক্রয় করা যাইবে।" বিখ্যাত জেকোনিয়া হলওয়েল-সাহেব (বিনি অকুপেণ্ডে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ) ২৫০০০ টাকা দিয়া ইহা ক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন, হলওয়েল-সাহেব ২৫০০০ টাকায় ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বোধ হয়, একটি শুল্কের গোপনাল ইহা থাকিবে। C. F. Scott সাহেব তৎকালে ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর সেনাপতি ছিলেন। ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের পূর্ব-পক্ষের স্বত্তর। ইনিই পরিশেষে এই বাগানখানি হলওয়েল-সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন।

#### ৪। পেরিন্স-পয়েন্ট (Perrin's Point)

বাগবাঝারে পেরিন্স-সাহেবের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণকে Perrin's Point বলা এখন যেখানে গঙ্গার সহিত বাগবাঝার-খাল মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধি-স্থলই Perrin's Point। ইহার দিক দক্ষিণ-দিকে প্রস্তর-নির্মিত একটি ঘাট ছিল। তাহাকে লোকে "পারলী সাহেবের ঘাট" বলিত। এখন তাহার কিস্যোও নাই। Perrin's Point-এর কিয়দূর উত্তর-দিকে তিংপুরে মহম্মদ রেজা খাঁর একটি অতি বৃহৎ স্তম্ভমা অট্টালিকা ও উজ্জান ছিল। এখনও লোকে এই স্থানকে "নবাব-পটী" বলে। মহম্মদ রেজা খাঁ, বাদশা, বিহার ও উড়িষ্যার নায়ক-নামদ্বয় ছিলেন। চুচুড়া ও বরাহনগর হইতে গুলশা-গণ, চন্দননগর হইতে ফরাসী-গণ এবং কলিকাতা হইতে ইংরাজ-গণ নবাব-সাহেবের অতিথি হইয়া নানাবিধ আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ করিতেন। তাহার অনেক হস্তী ও অশ্ব ছিল। নবাব-সাহেব হস্তীর উপর চড়িয়া দক্ষিণপথের নিবিড় জঙ্গলে গিয়া বায় ও অজ্ঞাত হিংস্র জন্তু শিকার করিতেন। পেরিন্স-পয়েন্টের দক্ষিণ-দিকে দুইটা কামান আঙ্গিও মাটির ভিতর প্রোথিত রহিয়াছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাগবাঝারে যুদ্ধ হয়। বোধ হয়, এই যুদ্ধের সময় নবাব মীরজাফর পরাজিত হইয়া এই কামান দুইটা ফেলিয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণ এই প্রবন্ধে কিছু পরে দেখিতে পাইবেন।

#### ৫। বাগবাঝার-রিডাউট বা পেরিন্স-রিডাউট (Bagbazar Redoubt or Perrin's Redoubt)

পূর্বে বাগবাঝারে পেরিন্স-সাহেবের বাগানের উপর একটি আট-কোণা ছোট কেল্লা ছিল। ইহারই নাম Perrin's Redoubt। পূর্বেই বলিয়াছি যে, C. F. Scott সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংসের পূর্ব-পক্ষের স্বত্তর ছিলেন। তিনি "ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী"র অধীনতায় সেনাপতির কার্য করিতেন। এতদ্বিত্ত তিনি Engineer Generalও ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রস্তাব করেন যে, মার্চটি-ভিড্ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে; ইহা সম্পূর্ণ করা উচিত। এক-ব্যতীত কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্ত পেরিন্স-সাহেবের বাগানের উপর একটি আট-কোণা কেল্লা নির্মাণ করা উচিত। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম-ভাগে তাহার মৃত্যু হওয়াতে এই কার্যের ভার কোম্পানীতেই ওয়েল্স-সাহেবের ওপর অর্পিত হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে ওয়েল্স-সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে Bartholomew Plaisted সাহেবের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কারণ-বশতঃ "ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী" তাহাকে কর্মণ্ডিত করাতে ও'হারা (O'Hara) নামক জনৈক সিভিলিয়ান ও পিম্পসন (Simpson) নামক জনৈক নৌবিক কর্মচারীকে এই কার্য করিবার জন্ত এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হয়। এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে "বাগবাঝার-কেল্লা" (Bagbazar Redoubt) নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই জাহুয়ারী তারিখের Consultations পাঠ করিলে "বাগবাঝার-কেল্লা" সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারা যায়,—“ওয়েল্স ও ডেক-সাহেব বাগবাঝার-কেল্লা সম্বন্ধে

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর-মাসের জন্ম ৩৩৮৮/১৫ টাকা খরচের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা পাশ করা গেল। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বেন এই টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেন।”

এখন যেখানে শ্রীমুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয়ের গদি ও ফুৎের গুণাল রহিয়াছে, সেই স্থানেই Bagbazar Redoubt ছিল।

#### ৬। বাগবাঝারে বারুদ-খানা (Bagbazar Powder Mills)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, C. F. Scott, “ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী”র এঞ্জিনিয়ার ও সেনাবিভাগের এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন। বাগবাঝারের পেরিন্স-সাহেবের বাগানের উপর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি “বারুদ-খানা” নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কর্মদাফক Captain John Buchanan পেরিন্স-সাহেবের বাগান ও বারুদ-খানা ক্রয় করিয়া লইলেন। “ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী”, বৃকান-সাহেবের নিকট হইতে ৪০০০ টাকা মূল্য দিয়া পেরিন্স-সাহেবের বাগান, জমী, তত্ত্বপত্রি বাটী ও বারুদ-খানা সমস্তই কিনিয়া লইলেন। বারুদ-খানায় কিঞ্চিৎ বারুদ একত্র হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত বৃকান-সাহেবকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

এখন যে স্থানে শ্রীমুক্ত নৃতামোপাধ্যায় দত্ত মহাশয়ের বাটী ও স্তম্ভকীর কল রহিয়াছে, সেই স্থানেই “বারুদখানা” ছিল। নৃতামোপাধ্যায় বারুদ মুখ্যতঃ তিনটি বর্ধন বাটী নির্মাণ করেন, তখন ভিত্তি গৃহিবার সময় বহুবিধ মোহা-সঙ্কট পাওয়া গিয়াছিল। কৃচ্ছিকার নিয়োগ, নন্দলাল মথোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ সরকার ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়,—এই চার জন

কৃতবিদ্যা ও প্রাচীন লোকের মুখে “বাগবাঝার” নাম শুনি নাই। তাহার “বাগবাঝার” না বলিয়া “বারুদখানাই” বলিতেন। তাহার আঙ্গ জীবিত থাকিলে তাহাদের বয়স ১০০ বৎসরের অনেক অধিক হইত।

#### ৭। “ওল্ড-পাউডার-মিল বাজার” (Old Powder Mill Bazar)

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উজ্জ-সাহেব-কৃত কলিকাতার মানচিত্রে একটি বাজার ও রাস্তার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার নিকট দিয়া নেবুবাগান লেন পর্যন্ত একটি রাস্তা “টিংপুর রোডের” মুখ হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। ইহার নাম “Old Powder Mill Bazar Road”। রাস্তাটি দেখ্যে সিকি মাইল। এই রাস্তার উত্তর-পূর্ব কোণে উক্ত বাজারটি অবস্থিত ছিল। তখনও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সহিত এই রাস্তাটি মিলিত হয় নাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুরের সময়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন “কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট” নির্মিত হয়, তখন ইহাকে “কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের” সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

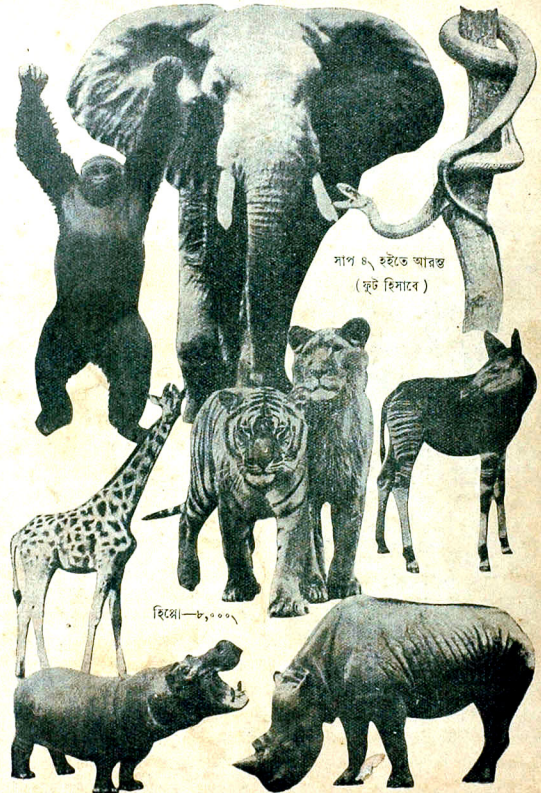
১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এ-আপকন্-সাহেবের অঙ্কিত “কলিকাতা ও তদিকটবর্তী স্থানের মানচিত্র”খানি দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, আজ যেখানে ৮ অক্ষয়কুমার বসু, এঞ্জিনিয়ার শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার ও আমার বাটী রহিয়াছে, সেই সীমার মধ্যভাগে একটি বাজার ছিল। ইহার নাম “Old Powder Mill Bazar”। বোধ হয়, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই “পুরাতন বাজারটি” উড়াইয়া লইয়া গিয়া বর্ধমান “শ্রামবাঝারের” স্থলি করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)





বাজার-দরের নমুনা—গরিলা—১৪,০০০; হাতী—৭,০০০; হইতে ১০,০০০; বাঘ, সিংহ—৪,০০০



শাপ ৪, হইতে আরম্ভ  
(ফুট হিসাবে)

হিদ্রো—৮,০০০

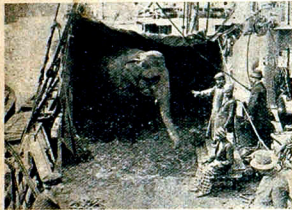
জিরাফ—১০,০০০; হইতে ১৫,০০০; ওকাপি—৪০,০০০; গণ্ডার—১০,০০০; হইতে ১৬,০০০



## বন্য-জন্তুর ব্যবসায়

### শ্রীহরিনয় রায়চৌধুরী

বন্য-জন্তুর ব্যবসায় কত লোকেরই বা অঙ্গ-সংগ্রহন হইতে পারে? কে-ই বা এত বন্য-জন্তু খরিন করিবে



ভারতীয় সাহিত্যের জিন্দায় বন্দী হাতী ইউরোপে চালান হইতেছে  
(আহাঙ্কের ডেকের দৃশ্য)

যে, তাহার একটি রীতিমত ব্যবসায় চালান যায়? এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে বৃষ্টিতে পারা যায় যে, কত প্রকার কাঙ্ক্ষা বন্য-জন্তু ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী জুড়িয়া প্রায় সকল সভ্য দেশেই চিড়িয়াখানা আছে এবং তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রতিবৎসর নতুন নতুন জন্তু আমদানী করা হয়। অনেকের সখের চিড়িয়াখানাও আছে; তাহার জন্তু জন্তু আবশ্যক। সার্কাসওয়ালারা জন্তুর খেলা দেখাইয়া থাকে এবং অনেকের সার্কাসের সঙ্গে ছোটখাট চিড়িয়াখানাও থাকে। আজকাল সিনেমার ফিল্ম তুলিবার জন্তুও অনেক বন্য-জন্তু আবশ্যক হয়। অনেক সময় এক দেশ হইতে

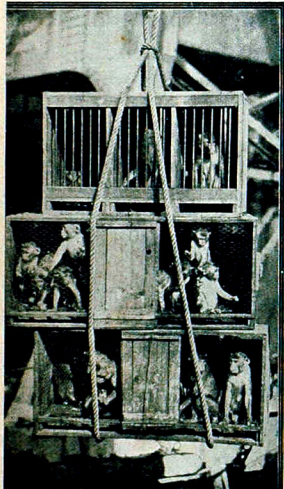


জেরাডমিকের সভা পরিচালনা করা হইতেছে  
সকলেরই বিশেষ আকর্ষণ

আজকাল বন্য-জন্তুর ব্যবসায়ের মধ্যে উন্নতি হইয়াছে; সঙ্গে-সঙ্গে ধরার প্রণালীরও উন্নতি হইতেছে। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুদের স্বভাব, চারিদিক, খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়িতেছে এবং তাহার



কলে জন্তু ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হইতেছে। পূর্বে যে-সকল জন্তু ধরা হইত তাহার অনেকগুলিই বিক্রয়ের পূর্বেই মারা যাইত। কোন কোন জন্তকে তো ধরিয়া বাঁচানই যাইত না,—যেমন গরিলা। গণ্ডার, হিল্লোপটেমাস প্রভৃতি জন্তু ধরিলে তাহাকে বন্দি করিয়া বিক্রয়ের স্থানে লইয়া আসা এক সমতার ব্যাপার ছিল। হিংস্র বা চূর্ণদাঁত জন্তুদের



বন্দি বানরেরা অজান্তে বেশের পানে অবাক হইয়া চাহিতেছে (জাহাজ হইতে নামাইবার কালের দৃশ্য)

আজকাল প্রায়ই শিশু অবস্থায় ধরা হয়। শিশু অবস্থায় তাহাকে খাওয়ান, বাঁচান এবং পোষ মানান অনেক সহজ। বড় হইলে তাহাকে অধিক দামে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

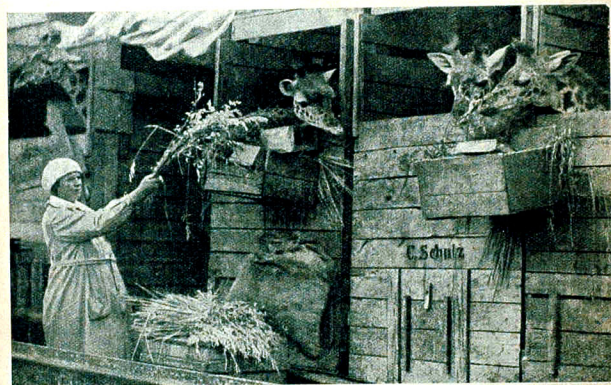
বন্ত-জন্তু পোষ মানান এখনকার দিনে সহজ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও যত ও চেষ্টার ফলে পোষ্য মানে। এক্ষণ করিতে না পারিলে অনেক সময় দৃত জন্তু মনের ভুলধে ও কষ্টে ভয়-ভয় হইয়া মারা যায়। আজ যে বনের পশু, কাল হইতে সে পোষ্য মানিয়া ‘গৃহপালিত’ পশু হইয়া যাইবে। সহায়ত্বিত, যত ও চেষ্টার ফলে বন্ত-জন্তুর ব্যবসায়ের এত উন্নতি হইয়াছে যে, এখন আর দৃত জন্তকে ‘বাজারে’ আনিয়া বিক্রয় করা ‘কখন-কি-ঘটের’ ব্যাপার নয়। অবশ্য, ছপ্পা পা জন্তু সন্তকে এখনও অতটা হোর করিয়া বলা কঠিন। বাহা হউক, এখন ব্যবসায়ীর সাহসও বাড়িয়াছে; জন্তু জোগাড় করাও সহজ হইয়াছে। এক একজন ব্যবসায়ীর ‘এজেন্ট’ পৃথিবীর চারিদিকে থাকে। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ জন্তু-সংগ্রহের বড় আড্ডা। হাতী, হিল্লো, গণ্ডার, বানর, বনমাছ, সাপ, বাঘ, সিংহ, জেব্রা, জিরাফ, ভল্লুক,—এই সকল জানোয়ার আফ্রিকা ও এশিয়া হইতেই প্রধানত চালান যায়। জার্মেনীর শুলজ (Schulz) নামক পশু-ব্যবসায়ী বীতিমত জাহাজ ভাড়া করিয়া পৃথিবীর সকল দিক্ হইতে (বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে) পশু-সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করেন। পশু-চালানের যে চারটি ছবি দেওয়া হইল তাহা শুলজের জাহাজের ডেকের দৃশ্য।

জার্মেনী জন্তুর ব্যবসায়ের প্রধান দেশ। কাল্ হেগেন বেক্ প্রভৃতি অনেক জার্মান বিশেষজ্ঞ জন্তুর ব্যবসায়ে ও জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে জাননাভের চেষ্টায় জীবন কাটাইয়াছেন। হেগেন বেকের চিড়িয়াখানা বিখ্যাত। জার্মেনীর অনেক জন্তু-ব্যবসায়ীও বিশ্ব-বিখ্যাত। গরিলাকে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানান বা বাঁচাইয়া রাখা আর্থেকার দিনে এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। বড় গরিলা ধরিয়া আনা তো সাহসেই কুলাইত না; যা-ও ধরা যাইত, অল্পদিনেই ভয়-ভয় হইয়া মারা যাইত। শিশু-গরিলাকে ধরিয়া আনিলেও অল্পদিন মধ্যে উদরাময় রোগে উহার মৃত্যু হইত। জার্মান বিশেষজ্ঞেরা এখন গরিলাকে বাঁচাইয়া রাষিবার উপায়

জানেন,—ফলে, এখন পরিবার বাচ্চা অনেক চিড়িয়া-খানায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতার ফলে, জন্তুর ব্যবসায় আজকাল বেশ নিয়মিত চলে। এখন জন্তুর ‘বাজার-দরও’ অনেকটা

কারণ, আফ্রিকার অস্বাস্থ্যকর গহন বনে মাসের পর মাস অতি সাবধানে লুকাইয়া অপেক্ষা করিলে হয়ত ‘ওকাপি’র দর্শন পাওয়া যাইতে পারে,—যহার চেষ্টা তাহার পর। ততদিনে হয়ত অল্প অনেক জন্তু সংগ্রহ



পোটে ফুবা ধাক্কা সহ্যও বন্দি সন্টার অভাবই বেশী বোধ করিতেছে (জাহাজের ডেকের দৃশ্য)

বলা চলে। কয়েকটি ভূম্বু জন্তুর মোটামুটি বাজার-দর ছবিতে দেওয়া হইল। “ওকাপি”র দর প্রায় ৪০,০০০ টাকা! কিন্তু, এত ভূম্বু হওয়া সম্ভবও “ওকাপি” ধরিতে ব্যবসায়ীরা একপ্রকার নারাজ;

করিয়া ফেলা যায়; প্রাণটি হাতে করিয়াও থাকিতে হয় না। “ওকাপি” অপেক্ষা ছপ্পা পা জন্তু আছে, কিন্তু, তাহা এত বেশী ছপ্পা পা যে, তাহার ‘বাজার-দর’ বলা অসম্ভব,—তাহার দর পরজ মুখিয়া।





## সর্বাণী

(উপভাস)

ক্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্বাহ্নয়তি]

( ৩ )

ছোট একটা সহর। নেহাৎ গানের উপর নয়, একটু দূরে দূরে চিত্তব্রজের মত ধূসর রঙের পাহাড় দেখা যায়; স্বরূপের গান-গাওয়া কোথাকার স্বরণ-স্বরা একটা বেন ছোট পাহাড়ী নদীও একটা পাশে বয়ে বাচ্ছে। নদীটার কি একটা বিশিষ্ট কটোমটো দেখোয়ালি নাম আছে, সেটা স্বরজন ও সর্বাণীর পছন্দ নয়। তাই এঁরা নিজেদেরই একটা বেশ পছন্দসই দেখিয়া নাম রাখিয়া দিয়াছেন, 'কল্লোলা', 'কল্লোলা' নামটাকে নামের মর্যাদা কুণ্ঠ হয় নাই, আবার কবিরঞ্জন ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 'কল্লোলা'—যেমন তার অবিবর্তন কল্-কল্ ছলছল নাদ, যেমন তার কল্-কল্ কল্লোলাস, তার উপরন্তুই তো নাম রাখিতে হইবে? নাম রাখিয়াছিল সর্বাণী। এই নদীর তীরেই তাদের বাসাবাড়ী; ভাড়া-করা বাড়ী নয়, জঙ্গ-সাহেবের বাগান। বরাবর বেকোন জঙ্গ এখানে বন্দি হইয়া আসেন, এই বাড়ীতেই থাকেন। সাধারণতঃ ইহঁদের জঞ্জেরাই আসিয়াছেন, তাই সাহেবী কৈতায় বাড়ীটা সাজানো। বাড়ীর সঙ্গে এর আশ্চর্য্য সবক ছোট ছোট রান্নাবাড়ী প্রভৃতি আছে, সে সব তাঁদের রোয়াক করিয়াই করা অর্থাৎ বাবুচিহ্নানা, দুগুণীর ঘর—এই সবই আছে, হিন্দু-খৃষ্টিয়র উপযুক্ত ভাড়াপয়দর বা রান্নাঘর নাই। সর্বাণীর এর ভিতরেই চলিয়া বাইত; ভাড়া সে এই বাড়ীরই একটা পার্শের দিকের ঘরকে করিয়া লইয়াছে। সঙ্গার তো তাদের শোক কত! বাপ আর মেয়ে বই তো নয়। কিন্তু আভার বেশ হইত তার সব চাইতে এখানকার এই সঙ্গী-হীনতার জ্ঞ। মাথার উপর দিগন্ত-প্রসারী আকাশ আর

দূর দিগন্তে বিলীময়ান-প্রায় কখন নীল কখন ধূসরাত পর্কতের একটুখানি রেখা, আর ছোট নদীটার জলে সূর্য্যের ঘর রৌদ্রের খেত আভা, প্রভাত-রবির রঞ্জনজ্বলন্তা, সান্ধ্য তপনের স্বর্ণাভানুপ্রভ তরঙ্গের সীলানুভা, আর তা' ছাড়া ছোট ছোট লতাগুচ্ছ হইতে বড় বড় গাছগুলার অপূর্ণ শ্রামশোভা; তাহারাও সকালে, বিকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে রহৎ এবং রেখা পরিবর্তিত করিয়া নূতন মূর্তিতে চোখের সামনে আবির্ভূত হইতেছে, এসব অনেক কিছুই এখানকার এই মূল দেশের মূল প্রকৃতির মধ্যে দেখার আছে, এবং এদের মধ্যে মিশিয়া গিয়া এদের ভাগ করিয়া অল্পবয়স ও উপভোগ করিতে সর্বাণীর বেশ ভালই লাগে; কিন্তু তাই বলিয়া সর্বাণী তো আর 'কপাল-কুণ্ডলা' নয়, যে কানন-বনরী আর নবপুঞ্জিতা বন-মল্লিকার প্রেমে মগ্নিয়া মাহুদের সঙ্গ-লিপ্সা ভাগ করিবে। বনবাসিনী 'শকুন্তলা'রও হৃৎজন সখী ছিল; পিঙ্গী পৌত্তমী তার রোগ-শয্যার তত্বাবধান করিতে আসিতেন। অনেক সময় সর্বাণী এক একা বসিয়া গাঢ় সবুজ রঙের একটা কাঁঠালী টাণ্ডার ঝোপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনমনে ঐ কথাটাই মনে করিয়াছে; অহুস্যা-প্রিয়দ্বন্দ্বা নাই হোক, শুধু অনন্থা কিংবা শুধু একটা প্রিয়দ্বন্দ্বা যদি তার থাকিত! কিন্তু কোথায় পাইবে? ও তো আর বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না!

এর একটু পরেই যখন অশু-সূর্য্যের অঙ্গ হইতে উজ্জ্বল লাল আলো ঝিকরাইয়া আসিয়া সমস্ত

প্রকৃতিকে একেবারে লালে লাল করিয়া দেয়; গাঢ় সবুজ, গাঢ় নীল, এমন কি নদীর স্বচ্ছ সান্ধ্য জল সব কিছুই সেই গাঢ় লালের মধ্যে বেন ডুবিয়া যায়, আর বার্ষাৎ শ বা টেনিসদের একখানা বই কোলের উপর খোলা রাখিয়া সর্বাণীও বিশ্বদ্রষ্ট মূখে সেই লাল আলোতে বেন রঞ্জন হইয়া উঠে; আবার তারপরই যখন সেই অপরূপ ও অপরিণাপ্ত রঙের খেলা, সেই অপূর্ণ আবারোবস সন্ধ্যার সাবধানী জ্বলন্ত তলায় আত্মগোপন করিয়া বসে, দূরে পাহাড়, অদূরে বনভী, অনতিদূরে নদীজল সমস্তকেই ব্যাপ্ত করিয়া সরম-কুণ্ডিত সন্ধ্যার ধূসর অবশস্তবানি নামিয়া আসে, ও একটু একটু করিয়া বেন একটা মোহময় আবরণের আবরণে আচ্ছিন্ন হইয়া এতদ্বন্দ্বকার কণ্ঠ-তংপর সচল বিগ্ন তাহারই মধ্যে ধীরে ধীরে চলিয়া পড়ে, সর্বাণীর এই সারাদেশ ধরিয়াই বেন মনে হইতে থাকে, কি বেন নাই, কি বেন হইল না, কিসের বেন একটা মস্তবড় কঁাক বহিয়া গেল! জীবনের সর্ব-পাণ্ডার মাথবাসেন কিসের যে এতবড় একটা অপূর্ণতা এবং অস্বার্থকতা—তার সেই শূন্যতাটা তাকে অনন্তরত বেন পীড়ন করিয়া চলিয়াছে! সকল সময় ধরিয়াই মনে বেন মনে মনে বলে, 'সব অস্বার্থক! সব ফাঁকি!'

অথচ কি-ই বা তার নাই? বাপ তাকে ভালবাসেন, বড় ভালবাসেন, এত ভালবাসেন যে, সে মাটিতে হাঁটিলেও বুকের তীর লুক বাধা থাকে। দান-দারী, অশন-বশন, অলঙ্কার-প্রদানন কিছুই তার অভাব নাই, অথচ মনে কেবলই তার কাছে নাগিল জ্ঞানাইতেছে—নাই, নাই, নাই!

একটা হৃৎকুণ্ডিত হওয়া মাহুদের পক্ষে ভাল না! মা নাই, কি ভাই-বোন হয় নাই, তার জ্ঞ কে কি করিতে পারে, বল? বা' জুটিয়াছে আক্ষেপ মিটাইয়া ভোগ কর, তা' নয়; অনেকের পক্ষে দ্রুগত অনেক কিছুই ভো পাইয়াছে, সে দিকে না চাহিয়া, কি পাও নাই, তাহারই জ্ঞ মুখতার আর অভিমান

সর্বাণী

২৭৫

করিতে বস! হাতের মধ্যে বেটা পাওয়া যায় সেইটাই নাকি নেহাৎ সত্তা হইয়া পড়ে, তাই এসব নজরে চোকে না, না? শুভে বাপু, জোর করিলেই কি কপালের দেখা মুখেরে?

সাবী একটা জুটিল। হৃৎমাইল দূরে মাহুদীপুরে থাকে, সামান্য কাঁচা দেওয়ালের বাপরা-ছাওয়া বাড়ী, বাড়ীর গায়ে ত্রি-তরকারির সঙ্গে গাঁনা, দোপাটী, রঞ্জনীপল্লা আর একটা মুন্সকো-লতার বেড়া দেওয়া বাগান আছে; একটা চালায় ছব-গুলি গাই-গরুও আছে। এখানকার স্কুল-মাস্টার এবং তার স্ত্রী মণিকার। মাস্টারের নাম শিবধর। শিবধর ভালমাহুয় গোছের লোক, চলিত কথায় থাকে বলে গোয়েন্দারী। তা' হোক তার জ্ঞ সঙ্গার-ধর্ম্মে কিছু আটকায় না। মণিকার কাজ চালাইয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে; বইই অক্ষম হোক, মণিকার হাতে পড়িয়া মাহুদের ছেলের ছেলের শিব দিনে-দিনেই মাহুয় গড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু এদিকে ভাল-মাহুয় হইল কি হয়, শিশু-মাস্টার বৈদিনি মণিকার বত বড় শক্ত মেয়েই হোক, তাকে বাগ মানাইতে পারে না। এদের একটা ছোট ছেলেও আছে, তার নাম মণিক। মণিক হলে মণিক হওয়াই তো সমস্ত।

সর্বাণী এর আগে বাপের সঙ্গে বেন-সহরে থাকিত, সেখানে একটা ক্যাথলিক কন্ডেট ছিল। সেখানেই সে পড়িত; এখানে আসিয়া স্কুলে পড়ার কোন সুযোগও নাই, স্কুল-শুধা তার শেষও হইয়া গিয়াছে। কলেজে বোর্ডার হইয়া থাকা তার মনঃপূত নয়, বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে; কিন্তু ভাল মাস্টার ছাড়িয়া এখানে মন মাস্টার শুদ্ধ যে পাওয়া যায় না, তার কি? হৃৎমাইল দূরে সহরে ছেলেরদের জ্ঞ যে স্কুলটা আছে, তাহাই মাস্টার মশাইরা এদেশের সঞ্চ। বাপ বলিলেন, 'ওদেরই একজনকে মাস্টার রাখি—' মমেরের তা' পছন্দ হয় না। তার বিধান—বাপস্বামী মাস্টার আবার কেমন পড়া পড়াইবে? সে সিনিয়র কেথিউ পাশ করিয়াছে; ফ্রেক ভাষায় মোটানুটি কথা বলিতে পারে; আশ-মল্লা গুণি আর তেরার গড়ে, বামের গড়ে তরা পিরাণ-পরা একটা



বাঁটি বাসলী কি-না তাকে বিদ্যাবান করবে? কি জানে সে? যদি পড়িতেই হয় তো বাপের কাছে—হ্যাঁ সেই ভাল। ইংরেজী দেখেন ঠিক ইংরেজের মতন। ফ্রেন্সে অবশ্য জানেন না, হোক, তা, সেটা না হয় নিজে-নিজেই কাজ চালাইয়া লও। যাইবে, আর না হয় ওর বদলে সংস্কৃত—আরে ছ্যাঁ! সংস্কৃত আছে কি? পঢ়া মরা জ্ঞানের পঢ়া ভাষা। শুভ কং বং—এর যে পুস্তক-গুলোর চাল-কলা ঠিকাইয়া লইবার কলি। ও লইয়া সর্বাঙ্গী করবে কি? কিন্তু সংসারের যে কি বিস্তীর্ণ বিধান! শেষ পর্য্যন্ত সবুকে সেই স্বদেশী নোহারা মাঠের এবং পঢ়া ভাষারই আশ্রয় লইতে হইবে। তার আই-এ পরীক্ষাটা তা' না হইলে দেখেই হয় না। নিজে-নিজে ফ্রেন্স পঢ়া ভাল লাগে না, তা'তে রস পাওয়া যায় না; দুই হোক—মক্কুসে, ঐ চোদ্দ পুরুষের শ্রদ্ধা করার ভাষাটিকেই শেখা যাক। লোকের মিউজিক্সিমে ম্যামাং ও জিনোসোরও তো দেখিতে যায়। মাঠের আগিল তার কল্পনাকে সার্থক করিয়া, বাংলাদেশের মধ্যবিন্দু শ্রেণীর বাসায়ীর ঘরের সাধারণ ছেলেরা যেমন হয়, এ ঠিক তেমনি, একটুও বিশেষ নাই। গায়ের রঙ শ্রাম্ভা; নাক-চোখ মন্দও না, খুব ভালও না; হুলুগুলি সোজা-মোজা কিন্তু তা' বাঁকাইয়া বাঁ দিকে নিক্ষেপে কাটা; দুটিমোটা মাঠো তাতে ময়লা পরে না, আর গায়ের যেমন পঙ্কটো বড় পাওয়া যায় নাই। ছ'টার দিনেরই সর্বাঙ্গী অক্ষর চিনিয়া 'অধঃ ধাবতি', 'গোঃ শব্দায়তে' ইত্যাদি পড়িতে আরম্ভ করিল। মাদ্যাদ্যেকের মধ্যেই তার "ভাস্কর্য-কিং", "কুপীরক-বক:" প্রভৃতির সহিত বর্নিত পরিচয় শেব হইয়া গেল; ব্যাকরণ তার অনেকখানি আয়তের ভিতর পায়িয়া পড়িল; প্রাণাণ্ড পরিগ্রহের সাক্ষ্য লাভ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া সে প্রীত হইল এবং ছ'মাসের মধ্যেই তার আর মধ্য-পোড়ানর আর মৃতের আধারেরে দেখেলে ভাষাটির উপর কিছুমাত্র বিবেচ্য থাকিল না। সে তখন আরম্ভ করিয়াছে "মধ্যান্তরায় দিশি দেবতাব্য হিমাশ্রয়ো নাম মাণিরাধা:।।।"

চমৎকৃত, বিম্বিত, সর্গভোবা হইয়া সে এই ভাষা-মাণেরে ভূষিয়া গিয়া পড়িতে লাগিল,

"মন্মাকিভা: পয়ঃশেবং দিগ্‌বায়ণমদাবিলম্ব।  
হেমাশ্রয়ঃকণ্ঠশুনানো তদ্বাপোয়া ধাম সাশ্রুতম্।।"

মাঠের মশাইকেও সে শব্দা কথিল প্রুহ। ভালমাহুয় শাস্ত্রপ্রকৃতি কি শব্দকর্তব্যে দৃঢ় এই সামান্য ঘরের সাধারণ ছেলেরা এর জ্ঞান কি কম বাটাটাই খাটাইয়াছে? না, মাহুয়, মাহুয় বটে! সর্বাঙ্গী তার জ্ঞানদানের উপলক্ষ্য করিয়া মাঠের মশাই-এর দ্বীকে নিম্নগণ করিয়া আনিল, তার ছেলেরাও একটা ভাল হাট, অনেকগুলি খেবনা, আর মণিকাকে দামী শাড়ী দিয়া তত্ত্ব করিল। তারপর হইতে ছ'জনে ছ'জনকার বন্ধ।

মণিকা ছেলেরাংবাংলা মূল্যে পড়িয়াছে; ইংরেজী বিভাগও অল্প-স্বল্প আছে, ফ্যাসান করিয়া শাড়ী পরিত জানে; জাঁকলে যে রোচ্চ ঝাঁটে, তারে রূপার বটে, ডিজাইনটা কিন্তু অল্পশ্রা গুহার। কানে পিপুক্ষ-পাতা পরে, বোখধরি শান্তভীর কাছে পাইয়াছিল, মাশ্ব্যানে সেকলে হইয়া আবার একালের রঙ্গভূমে প্রবেশা-ধিকার পাইয়াছে, সর্বাঙ্গী তাকে একছোড়া মুখকো গড়াইয়া দিল। জন্মে এমন হইলে যে, মাঠের মশাই-এর সকল মহিমাকে পরাণ্ড করিয়া তার গুণগণীর সঙ্গে এমনই মূদুর সখী জমিয়া উঠিল যে, সে তার নাম ধরিতেই আরম্ভ করিয়া দিল। 'মণিকা' নামটা বেশ। সর্বাঙ্গীর মতন এমন বিদ্যুৎ হতভাগ্য নাম নয়। এমন নাম যদি ধরিলে না, তবে ধরিলে কি! না, সে হয় না, হইলই বা সে যখন ছ'বছরের বা? ছ'বছর বই এটা নয়, সে তো দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া যায়, এমন বেশী দিন তো সে নয়। আর মাঠের মশাই? হইলেনই বা উনি মাঠের মশাই, তাই বলিয়া ওর দ্বীকে বলিতে পাইবে না 'মণিকা'! এমন চমৎকার নাম দেওয়া তা' হইলে বিবাহ করিয়াছিলেন কেন? সে মণিকাই বলিবে।

এদের ভালবাসা এতটাই গাঢ় হইয়াছিল যে, এদের ভিতরকার অবস্থার ব্যবধান যেন দূরে চলিয়া গিয়াছিল, সর্বাঙ্গী মণিকাকে এদের বাড়ী আসিতে হই। সবুই কি সেখানে না যায়? একঝুড়ি চারাগাছ আর মালা লইয়া গিয়া সন্ধ্যা বেলাই উপস্থিত, বায়ানে পুঁতিতে হইবে। ছ'শিপি আচার আর গুজরাটী পাপর নিজের হাতে দিতে আসিয়াছে, একটা হাতের সেলাইএর আদম, একখানা ছোট টেবিল-স্বথ, কাজটা পরিপাটি, বড় টেবিল তো এ-বাড়ীতে নাই।।।।।

আজ যে তা'রা কতদিনই গত হয় সেদেশ ছাড়িয়া আনিয়াছে এখনও চলে কাছাকাছেও ভালে নাই, চিঠিপত্র ছ'পক্ষেই কহে। অশ্রুত আয়ের মতো ঘন ঘন নয়, তবু মাসে দু'ক্ষেণ আসা-বাওয়া করেই। সর্বাঙ্গী এক-এক সময় চুপচাপ বসিয়া বসিয়া ভাবে, কি স্বপ্নেরই সেসব দিন ছিল; সেদিন যদি তার গত না হইত! অথচ সে এ'ও জানে যে সেদিন না আসিলে হয়ত তার এ-দিনও আসিত না। মাঠের উপর তার আন্ধকের এই জটিল অবস্থার ঐ মণিকা সৌর্যরও একটা অংশ আঘেই তো! সে কথাটা শুদ্ধ এক-এক সময় সে ভুলিয়া যায়; হয়ত তখন করিয়া কোন দিনই ভাবে নাই; অথচ অনেকেরই হয়ত তা' দেখিতে পারিত। ভালবাসা মাহুয়কে এমনটা কল করে বই কি!

( ৪ )

মণিকার সঙ্গে মিশিয়া সর্বাঙ্গীর যে উপকার হইল তার চেয়ে বেশী উপকার হইল মণিকারই। লেখা-পড়া সে বেশী করিতে স্নবেগ পায় নাই, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের পরিধি তার সর্বাঙ্গীই ছিল; সর্বাঙ্গীর স্নব তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেন একটা পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত করিয়া তুলিল। সংসারের যথা-নিষ্ঠ কাজ-কর্মের পর দিবানিয়ার ও সান্দ্যনিয়ার দিনগুলোকে স্বথ না করিয়া এখন সে দীর্ঘ অবসরগুলোকে

কাজে খাটায়। সেলাই করে, বোনে, বই পড়ে, ছেলেরাও তার ডগর হইতেছে—তাকে অক্ষর-পরিচয় করায়; এদিকে সর্বাঙ্গীও তার কাছে সাংখ্যিকতার অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছে। সে আম-তেল, মিঠে-আমদী নিজের হাতে তৈরি করে, ক্ষীরের পানভুয়া, বাজা নিজেই গড়িয়া ভাজিয়া রসে বাইয়া বাপের কাওয়ায়, পাটজনের সঙ্গে কেমন করিয়া চলিতে হয়, কি কথা কেমন করিয়া বলিতে হয়, সেসবেরও যেন কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল; মা-হারাপো মেয়ে, কে-ই বা তাকে কি শিখাইয়াছে!

স্বরজন এই পরিবারটির 'পরে সস্ত্রী ছিলেন। এরা দু'জনে তাঁর যেরূপে বৃদ্ধী করিতে পারিয়াছে, অতএব এদের যদি কোন গুণ না-ও থাকিত তথাপি এরা তাঁর কাছে স্বর্গের দেবদেবীর মতই বিচিত্র হইয়া উঠিত। মাঠের মশাই-এর কিছু বেতন-বৃত্তি তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়াই করিয়া দিলেন; প্রণাবটা করিয়াছিল অবশ্য সর্বাঙ্গী।

একদিন—সেদিনের কি তিথি, কোন্ গ্রহ কোথায় ছিল—পাঞ্জি দেখা হয় নাই, শনি কি রাহু, মঙ্গল কি পাপমূল কোন দ্বর্ঘল গ্রহ এই অননুগ্রহায় পিতা-পুত্রীর ভাষ্যস্থানে সেদিন নিশ্চয়ই উকি দিয়া থাকিবে—এমনি একটা দিনে—সেদিন আবার শেখ-আখতারের রঙের বর্ণপত্র শেখ-মহেশ্বর দিবসান্ত; পৌর্যার রঙের মেশ-কুহেলিকায় সারা প্রকৃতিকে, যেন ময়লা ঢালর ঢাপা দিয়া বিছানায় পড়িয়া ক্রমশঃশীলা অভাগী নারীর মতই, স্করণ দেখাইতেছিল। গাছে গাছে বৃষ্টি-জমা জলের কৌটাগুলি চুপচাপ, ঝরিয়া পড়িয়া যেন সেই বিরহকাতরা অতুলন বেননার পরিচয়ে প্রকৃতক নরনারীকে পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল। সেদিন জঙ্গলাহেবের বায়োর সন্ধ্যুর জনবিরল রাজপথ প্রায় জনশূন্য, কদাচিৎ কোন হাঁটুর-উপর-খুঁত-তোলা ছাতা-মাখায় পাচচারী পথবাহী, যুব কদাচিৎ একখানা চটের ছেঁড়া-ছেঁড়া বোরা ঢাকা দেওয়া মাল-বোঝাই গরুর গাড়ি লইয়া তার গাড়োয়ান্ অনবরত টক্-টক্, ছেঁই-ছেঁই শব্দ



করিতে করিতে ছিপটি পূর ছিপটি মারিয়া পৃষ্ঠভারনামিতসেহ এবং বর্ধমানপদ্মকুল একান্ত অনিচ্ছুক বলদ দুইটিকে কোনমতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। আকাশের পশ্চিম সীমাতে বেলাশেষের রক্তবর্ণ বেনে কার বোহাগীত দৃষ্টিপাতের জ্ঞান মধ্যে মধ্যে সঙ্গ মেষের তর ভেদ করিয়া বাহেলা বাড়ীর টানা দালানের ইজিয়ারের অর্ধশায়িত স্বরজনের এবং ঐ দালানেরই আর একপ্রান্তে পঠন এবং পাঠকশীল শিক্ষক ও ছাত্রীর মুখের উপর কণে কণে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। একের দুই পক্ষের মাঝখানে মেকের উত্তর তত্তর পাতিয়া বসিয়া মণিকা ছুই কাঁটার বোনায়ে বাল উল্লের একটা ছোট কোট বুনিতছিল, আর তার ছেলে মণিক টিনের কলের-গাড়ী চালাইয়া মুখে-মুখে শব্দ করিতেছিল কু—উ বাস্—বাস্—বাস্—।

এদের আজ সকাল হইতেই এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। কথা আছে, রাজেও আজ তাদের নাকি বাড়ী ফেরা ঘটবে না। এমন ঘটনা ইদানীং নিতাই ঘটে।

সর্বাঙ্গীর 'কুমারসম্ভব' শেষ হইয়া গিয়াছে। সে এখন 'মেঘবৃত্ত' পড়িতেছিল। বাহিরেও সেই সজল প্রকৃতি, কাব্যের বর্ণনাতেও তাই চমৎকার লাগিতেছিল, সে তার পরিবৃত্ত অস্তরের পূর্ণোজ্জ্বল ঢালিয়া দিয়া পড়িতে লাগিল—

“মন্দং মন্দং হুবতি পবনশালুকুলোবধাঃ স্বাঃ

বামশাখাঃ নরতি মধুরঃ চাতক্যেন্দ্রে সপথঃ—” ইত্যাদি

শিরেখর নতনেয়ে পির হইয়া বসিয়া তার সঙ্গীতময় উচ্চারণের মাথুয়া অহভব করিতেছিল; শুনিতে শুনিতে প্রসাদ-পোরবে তার সমস্ত চিত্ত বেনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এত শীঘ্র মাজ একটি বয়সের মধ্যে এতখানি উন্নতি—একি আর কাহারও দ্বারা বাহিতে পারিত? এ এমেরে সাধারণ মনে নয়, সাক্ষাৎ সরস্বতী এ! সন্ধ্যার পর মণিকেরে ঘুম পাড়িতেছে মণিকা বিছানার চুকিয়াছে, সর্বাঙ্গী নশাশি তুলিয়া প্রবেশ করিল। মণিক অমনই

বসিয়া উঠিল, “মা চলে” বা, মাসিমা গল্প বলবে, মাসিমা ভায়ে গল্প জানে, মা জানে না।”

মণিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, বলিল, “বেশ বাপু, তোর মাসিমা বলুক তোকে গল্প, বাঁচি আমি, বকে বকে মুখ বাধা হয়ে যায়, চোকে আর ঘুম আসে না।”

স্বরজন ব্যারান্দার সেই ইজিয়ারটারেই আধ-শোয়া হইয়া বই পড়িতেছিলেন, সামনের ছোট টিপরের উপর রক্তা বড় মাসাদানে আলো জালিয়া রাখিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী আসিয়া ইতস্ততঃ রক্তিত হুঁখানা চোয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। স্বরজন একবার চাহিয়া দেখিলেন, আবার এমন পড়া চলিতেছিল তেনেই চলিতে লাগিল। তিনি বেশী কথা বলার লোক নহেন, অপ্ৰয়োজনীয় কথা বড় একটা বলেন না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া মণিকা ঈষৎ সংশয়াজ্ঞর স্বরে জাকিল “কাকাবাবু!”

স্বরজন মুখ তুলিয়া তার দিকে কিরিয়া তাকাইলেন, তাঁর জিজ্ঞাস্য দুইই তাঁর হইয়া প্রশ্ন করিল।

“সবুর বিয়ে কি দেবেন? একটি ভাল ছেলের খবর পেয়েছি। সব রকমে তর সঙ্গে বেশ মিলবে। আমারই সম্পর্কে দেওর হয়।”

স্বরজন অস্বাভাব্য এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যবে বোধকরি বেশ একটুখানি বিস্ময়াহতব করিলেন। যেন এ-পর্যন্ত এ-বিষয়ে তাঁর ভাবনার কোন কারণই ঘটে নাই, এমনি ধারা মুখ করিয়া তিনি একটুকু চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিলেন, তারপর ধীরে ধীরে অতি চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, “ছেলোটা কি করে?”

“এ—এসি পাশ করেছে; কাকজন্ম এখনও কিছু করেনি; তুচ্ছি কোথায় নাকি কেমিস্ট্রীর প্রফেসর হয়েছে, শিগুগিরই দেখানে যাবে। আমার জ্যাঁ-বগুর—নিজের নয় পিসুতো, তাঁদের অবস্থাও ভাল—সেনি একখানা চিঠি দিয়েছেন; তাতে তার জন্তে একটা ভাল মেয়ে খোঁজবার কথা লিখেছেন; তাই আমার সর্বাঙ্গীর কথা মনে হ’ল।”

স্বরজন আবার কিছুক্ষণ নীরব চিন্তার পর প্রশ্ন করিলেন—

“ছেলোটা কে তোমরা নিজেরা দেখেছে? শুভাব ভাল, চোহা কি রকম? বাপ পুত্র রূপ নয় তো?”

মণিকা হাসিয়া ফেলিল, “সে সবই ভাল না হ’লে কি সবুর জন্তে বলতুম? আপনি তো জানেন সবুকে আমরা কত বেং করি। আমার জ্যাঁ-বগুরই একে মানুহ করেছেন, মা-বাপ ছোট বেলায় মারা যান কিনা; পরমা একটু ভালবাসেন, তবে রূপ নয়।”

স্বরজন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাই কহিলেন না, কি জানি কতকিই না তিনি ভাবিতে লাগিলেন। খুব স্পষ্ট নয়, তবে অনেক কিছুই বেন আবহা-আবহা ভাষা-ভাষা অতীতে দৃষ্টকারী স্বভাব—সে স্বভাবকে তিনি তাঁর মনের মধ্যে প্রশ্ন নিতে প্রশস্ত নহেন, তেমনি সব অপছন্দ জিনিসের ছাটারে টুঁকরা যেন চঞ্চল বিভ্রান্তের মতই মনের মধ্যে লাচাচল করিতে লাগিল। বর্তমানের, তারপর ভবিষ্যতের একটা অপ্রিয় অবহার ছায়া! ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস উঠিয়া আসিল, ধীরে ধীরে টোকে মোচন করিলেন। একবার বাহিরের (তখনও) মেঘব্যাপ্ত কালিমায় নীরকু আকারের পিক তাকাইলেন, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সুহাগর চিহ্নও নাই, সব একাকার করিয়া একমার অন্ধকারময় শূন্যতা বিরাজ করিতেছে! কিরিয়া চাইলেন, ‘ছ’জনকারই দৃষ্টি সমুদ্রক হইয়া তাঁহারই মনোভাব পর্যাবেক্ষণে নিয়োজিত। ষিধাকে আর মনের মধ্যে স্থান দিলেন না, একেবারেই নিশ্চিত নিরায়ন চিত্তে বসিয়া ফেলিলেন, “আমার মত আছে, তাঁদের লিখতে পার; কিন্তু সবুকে এখন কিছু ব’গ না। সে আমায় ব’লে রেখেছে, সোনামানার মতন তাকে যারা বাচাই করে’ নিতে চাইবে, সে তাদের বউ হবে না। তাকে তো চেনে?”

হ্যাঁ, সর্বাঙ্গীর একটু জিদ আছে বটে, তবে সে এমনই বা কি বেশী? মেহাভারত বাপের মন তাকে

পৃথিবীর সকল অসম্মান হইতে ঢাকা দিয়া রাখিতে যতটা ব্যগ্র, সে নিজে হয়ত তত বেশী নহে, কারণ সে তো যোকা মেয়ে নয়! মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া মণিকা প্রকান্তে পিতার সহিত সহায়হুতি জ্ঞানাইতে বাকি রাখিল না। সে প্রস্তাব করিল, ছেলের বাপকে তার বাড়ীতে আনাইয়া সে সর্বাঙ্গীরকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেখানে লইয়া বাইবে। দেখা-শুনা হইবে, কিন্তু সর্বাঙ্গী তার খবর পাইবে না।

প্রস্তাবটা বড়ই সমীচীন ঠেকিল; এ রকম স্বযোগ অজ্ঞান মিলিবে না, এই মনে করিতেই স্বরজনের মনের সকল বিভ্রমখুঁচি চিত্তা একমুখী হইয়া এই প্রস্তাবিত বরণাটাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গেল। ছেলের ফটো আনাইয়া দেখা যেন, সে হুজী পুণ্য। মুখশ্রী তার কোনমতেই মন হইতে পারে না, এক পাশে রঙ; তাও যখন শিরেখর আর মণিকা ‘ছ’জন বসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই রঙ তার কালো নয়। বরের বাপের সর্বাঙ্গীকে পছন্দ হইয়াছে, এত পছন্দ হইয়াছে যে, তিনি অগ্নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন। পর দিরাছেন, তাহাতে সাত কথার সঙ্গে একটা শাস্ত্রীয় মুক্তিও দেখানো হইয়াছে—“তত্ত্ব শীঘ্র”—মুক্তি। যাতে বেশ, শুনিতেও ভাল, কিন্তু ইহারই বাকি অর্ধেকটাকেও এই সঙ্গে বেন মন পাড়াইয়া দেয়। “অন্ততঃ কান্দরবান্” একে তো খুব অবৌদ্ধিক বারো নয়! ভাবিবার কথা আছে বইকি! চিঠি পড়িয়া স্বরজন অনেক বার মাথার হাত বুলাইলেন (অবশ্য নিজেরই মাথায়), দাড়ি গজাইতে সেওয়া হয় নাই, তিরুকে আঙ্গুল ঘষিয়া ঘষিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন;—তারপর মণিকাকে ডাকাইয়া ফেলিলেন,—

“এত ভাড়াভাড়ি হ’য়ে উঠবে কেন? আমি বলি কি অগ্নয় মাসেই হোক।” উত্তর মণিকা ঠিক করিয়াই আসিয়াছিল, বলিল, “ও যে বড়ছেলে, অগ্নয় মাসে তো বিয়ে হয় না।”

সমজার কথাই! “বোজ্জৈ” তো কোঠাখের বিয়ে এমনই বা কি বেশী? মেহাভারত বাপের মন তাকে



করিয়া বসিয়া আছেন, পুরুষ মানুষ স্বরজন তা' কেমন করিয়াই বা জানিবেন? আঘাত মতো ভূমিহাঙ্গাছে, সঞ্চল আছে ধারা-শ্রাবণের গুণ্ডিত করা দিন করটা। আচ্ছা তাই হোক! ছুটির দরখাত কাগজ লেখা হইবে, যদি মঞ্জুর হয়, কলিকাতায় যদি বাড়ী পাওয়া যায়, “ভক্ত শীর্ষ”ই হোক।

আর তো সর্গাণীকে লুকাইয়া রাখা চলে না। সব কথাই তাকে বলা হইল। স্বরজন নিজেই বলার ভারটা হাতে রাখিয়া ঐ শিক-দম্পতির হাতে শুভ-বিবাহের আর সমস্ত ভারই ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নিষ্কিঁচরে নিলিঙ্গ হইয়া রহিলেন। তাঁর বিধান রহিল, তিনি যে কাছারীর ভার নিজের হাতে রাখিলেন, সেই ভারটাই এ বিবাহ-ব্যাপারের সর্গাপেক্ষা বেশী কঠিন ও জটিল সমস্যাভরনক মহাভার। নিশ্চয়ই পাণ্ডি দেখিয়া নয়, তবে তাঁর মনের মধ্য হইতে কাছাকাছি যে-দিনের যে-সময়টিকে সবচেয়ে স্তম্ভকণ বলিয়া মনে হইল, তিনি সেই সময়টাই মেয়েকে কাছে বসাইয়া, অনেক ভাষাগড়া করিতে করিতে নিজের বক্তব্যটিকে বেশ শোছ করিয়া লইয়া, তারপর তাকে তার আসন্ন-প্রায় অভাব্যাদের স্বপ্নাবানটা অত্যন্ত কুণ্ঠিতমুখেই প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিলেন। নিজের ব্যয়-বৃত্তি, শারীরিক অপটুতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চিততা—সব কিছুই বলিতে বাধি রাখিবেন না; তারপর কার্য-কারণের সমন্বয় দেখাইয়া গভীর ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে নিজেকে সাধনা দান করিয়া ভাবিলেন, একটা মন্তব্য কর্তব্যের সমাধান করিতে পারিয়াছেন। মেয়ের হাত ছুঁতী নিজের একধাণি হাতের মধ্যে ধরিয়া তার ঈশ্বরম মস্তকর উপর আর একধাণি হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর সেহভরে ঈশ্ব বাসবধ কণ্ঠে অতি ধীরে বলিলেন,—

“বেশ ভঙ্গলোক, তোমার একটা দিন মাত্র শিবেরখর বড়ীতে দেখে গেছেন, টাকার কথাই তোমার মনে; খবর পেয়েছি সব কিং খেয়েই ভাল, তোমার স্বয়ত অমত হবে না? যদি কিছুমাত্র

আপত্তি থাকে বল, আমি এক্ষণি ঠুন্দের জ্বাব দিয়ে দেব। কিছুমাত্র যদি থাকে বলতে বিধা কর'র না, কিছুমাত্র যদি থাকে, বুজ্জ্ব মা!”

সর্গাণী তা' বুঝিয়াছিল। বাপের মনের কোন্ কথাটাই বা সে না বুঝিত? কলকাল মত মস্তকে নীরব থাকিয়া তারপর সে ঘাড় তুলিয়া বাপের শ্বের দিকে তালিল, কোন বিধা না করিয়া, কিছুমাত্র আপত্তি না জানাইয়া খুব পরিকার সহজ স্বরেই উত্তর করিল,— “না বাবা! আমার কোন আপত্তি নেই।”

স্বরজন যেন হঠাৎ চমুকাইয়া উঠিলেন। এ যেন প্রভাসাণী করেন নাই। এত শীঘ্র এত সহজে এমনি করিয়া—! তোরের দৃষ্টি ঈশ্ব বিধারিত হইয়া আসিল, ছই টোঁট ঈশ্ব বিভক্ত হইয়া রহিল, কিছুকণ একটা কথাও কহিতে পারিলেন না, তারপর যখন পারিলেন, ঈশ্ব একটু স্ককণ হাসি হাসিয়া আবার নিজের শিখিল কবরুটে মেয়ের বখাওয়ানে সঞ্চত হাত গ্রহণি চাপিয়া ধরিয়া যেন কিছু ব্যগ্রভাবেই কহিয়া উঠিলেন,—

“ঠিক করে' বলি' মা! তাড়াতাড়ি' মা' হয় একটা যেন বলে' ফেলি' নি। ভাল হবে মনে হচ্ছে তো? এ না হয় কি ছেড়েই দোব? বেশী শিগ'গির হয়ে যাচ্ছে না?”

সর্গাণী তার অচঞ্চল কালো হরিণ-চোখের তারা ছুঁতী বাপের উত্তেজনা-ব্যগ্র চোখের উপর স্থির করিয়া একান্তই অস্থির শীতল কণ্ঠে জ্বাব করিল,—

“মন্দও তো কিছু মনে হচ্ছে না, বাবা! তাড়াতাড়ি আর এমন বেশীই বা কি হবে?”

“হবে না তো? তা হ'লেই হ'ল। আচ্ছা আমি শিবুক একটা ঢেক লিখে দিই, নিয়ে কলকাতায় যাক; তোমার কাবাদের টেলিগ্রাম করে' দিই একটা বাড়ী ঠিক করে দিতে—হ্যা! ভাল কথা, গহনা কি রকম হবে, সে তুমিই ঠিক করে দিও, কি বল? আর যে-সব দিতে চান সে আবার কে ঠিক করবে? ওঁরা তো কিছুই চান নি, আর চাইবেনও না। কিন্তু, সেই জন্তেই

তো আরও ভাল করে' দেখে' শুনে' দেওয়া চাই!—বুজ্জ্ব!”

স্বরজন নিজের হ'হাত তুলিয়া লইয়া আবার একবার ‘কেশবিরল মাথাটাকে চুলাকিয়া চাঙ্গা করিয়া লইতে চাহিলেন। তা' কথার ইঙ্গিত বুঝিতে তো সর্গাণীর আটকায় নাই; সেও বাপের মনোগত ভাব বুঝিয়াছিল, বলিল,—“তুমি কিছু জেবো না, আমি সমস্ত ফর্দ করে' দিচ্ছি; ওসব আমি মলিনাদি'র বিয়ের সময় দেখেছি।”

মলিনাদিদি সর্গাণীর এক গুঁড়ুতো বোন; বছর-বানেক হইতে যায় তার বিবাহোপলক্ষে ইহার দেশে গিয়াছিল।

স্বরজন যেন অকূল সমুদ্র হইতে কূলে নামিলেন; এই মেয়েটাই তো তাঁর সকল দিকের একান্ত সঞ্চল। পাছে নিজের বিবাহে সে বঙ্গবাণীর স্বাভাবিক লঙ্ঘন-সরমের দ্বারে নিলিঙ্গ থাকিতে চান, (তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করা তো আর স্বরজনের মাধ্যম নয়) সেই ভয়েই তিনি মেয়ের বিয়ের দ্বারে বাস্তবক্ষেপে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন নিজের কাজ সে নিজের হাতে তুলিয়া লওয়ায় একেবারে যেন বাঁচিয়া গিয়া যখন ঘন চকুট টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সর্গাণী যখন সব ভার লইয়াছে, আর তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত শিবেরখরও রহিয়াছে, তখন তাঁর আর ভাবিবার কি আছে? মেয়ের বিয়ে তাঁর হইয়া গিয়াছে ভাবিলেও ভাবিতে পারা যায়!

সর্গাণী বাপকে যে কথা বলিল, কাজেই তা'তে কুল করিল না। একখানা মন্তব্য ফর্দ সে লিখিল। বরের রিট-ওয়াচ, হীরার আট্টা, বেনারসী জোড়, একটা শোবার বরের মতন কার্ণিচার, আর নিজের জন্ত সোনার ছ'জোড়া সুখো চুড়ি, মফ'চেন, কাপড়ি তপা, সোনার রিগ, কাঁটা, রোচ, একজোড়া আটপোরে সঙ্ক নেক্লেস, আর হীরার একটা জোড়-কুল। বাপকে ফর্দ আনিয়া দেখাইতে স্বরজন যেন

কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার, দু'বার, তিনবার ফর্দটা আপাযোগা পড়া হইয়া গেলে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করিলেন,—“এ কি নেহাৎ কম হবে না? তুমি বা ফর্দ করেছ, ও তো হাজার-তিনকের ভিতরের মতনই মনে হচ্ছে; হচ্ছে না, মা? আচ্ছা হিসাব করে' দেখো; কি পিছে? কত ভরি? চুড়ি দশ+দশ=কুড়ি ভরি। সোনার দর কত ধরেছ? ২০০? আচ্ছা, হ'ল তা হ'লে ৪০০? ও বানি আছে, ই! সে কত টাকা? ৮০? মোটে? অত কম? অত কমে ওসব জিনিষ কেমন করে' গড়ে? হয়? ভাল হয় না তেমন বেশ হয়? যেমন করে' সে তোমার একবার আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়েছিলাম?”

সর্গাণী মুখ চিপিয়া ঈশ্ব হাসিল। সেই যে এগার বছর বয়সের জন্মদিনের সময় তার বাবা নিজে দোকানে গিয়া তাকে একজোড়া দর সোনার তারের বালা পছন্দ করিয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন, তারপর হইতে আজিকার দিন পর্যন্ত যখনই কোন পছন্দ-নই ভাল জিনিষের উপমা দিবার দরবার হয়, উনি ঐ কথাই উল্লেখ করেন। হাসি চাপিয়া স্বাভাবিক মুখ করিয়া সর্গাণী জ্বাব দিল, “মন্দ হবে না, বানি এমন সস্তা হয়েছে।”

“ও? তাই বলা!” বলিয়া স্বরজন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু যতই যা' হোক, তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ের ফর্দখানা তাঁর খুবই মনঃপুত হইতে পারে নাই। একি একটা দেওয়া? যার জন্ত সর্গাণী দ্বাং করতাকে আপত্তি নাই, তার বিবাহে যতক হইবে মোটে তিন, পাড়ে-তিন হাজার? ভাল দেখায় কখন? সস্তা? না, নিশ্চয়ই না। মণিকাকে বলিল, শিবেরখরকে জানাইলেন। শিবেরখর চুপ করিয়া থাকিল, মণিকা তাঁর মতকে প্রবল ভাবেই সমর্থন করিল। তার মতে, হীরার স্টাট গহনা, হাজার টাকার নমস্বারী ফুশখ্যা, ব্যতীতই হীরের বোতাম, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, রূপার শুভু থালা গেলার বাটা রেকাব নয়, যড়া গাড়া পুরাপুরি সেট; আর



ফার্টিচারেরও একটা ড্রেসিং রুম এবং ড্রইং রুম সাজানোর স্টেট ওর সঙ্গে যোগ করা চাই। হ্যাঁ, গরীবের ঘরের মেয়ে-বউ হইলে কি হয়, মেয়েটার নজর আছে।

সর্বাণী সেই ফর্দের কাগজখানি হাতে নিয়া ফেরা আসিল, ডানহাতে একটা মুখবড় পেন্সিল।

“আজ্ঞা, ওদের ঘরে কি মা আছে? তা’ হ’লে পাবে একটা যেন গরদের শাড়ী দেওয়ার বিবি আছে, আর সব আত্মীয়দের জন্তে খোয়া মিলের কিংবা কোরা ভীতের বেশ চণ্ডা-পাড় দেখে দেখে শাড়ী নিতে হবে। পশ্চিম বানা, আর দশখানা বাস মুচি যথেষ্ট! ওর বেশী আঙ্গলকা কার আত্মীয় থাকে না। আগে তুনেছিল একশো বানা দিতে হ’ত, তখন পাড়ার লোককেও আপনার মনে করত—সেরিন নেই—হ্যাঁ ভাল কথা; বোন নেই তো? নন্দ-কেন্দী না দিলে আবার ভারী দোষ হয়; মলিনাদি, মেচারীকেই অপরাধে কম কথা ভুত্বতে হয়েছে। থাকে তো ক’জন একবার খবরটা নিও!”

স্বরজন কোনদিক দিয়া কথাটা পাড়িবেন স্থির করিতে না পারিয়া মাথাটা একটু চুলকাইয়া, একবার উচ্চৈঃস্বরে কড়াকট পানো তাকাইয়া, পরে সাধে সংগ্রহ পূর্বক কন্ম করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “তা’ নেবো, তা’ হ’লে শাড়ী আর একটা বেনারসী আর নন্দ-কেন্দীতে একটা করে” গিনি আর একখানা করে বেনারসী শাড়ী দিলেই হবে। ভাল কথা, শাড়ীগুলো জন্তে কি বেনারসেই লেখা হবে? না, লোক পাঠাবে? তোমারও তো ছ’পাঁচখানা চাই!”

সর্বাণীর ঠোঁটের ছ’পাঁচ ঈষৎ চাপা হাসির ছটী বিদ্যৎ-রেখা স্মৃতিত হইয়া উঠিল, “এদর আবার কোথায় নুনি শিখতে গেলে, বাবা? ওদর আবার কি? না, সাদা শাড়ী আর চারটে করে টাকা, বান্দ! কেন, দেখনি আমাদের ননীদা’র বিয়েতে আমরা কি পেয়েছিলাম? মোটে ছ’টাকা করে। নিজের নন্দ ক’জন শুধু ওর সঙ্গে একখানা করে

শাড়ী। আর মা’য়ের পক্ষে গরদই ঢের হবে। বেনারসীর কড়িয়াল শাড়ীও দিতে পার, দেখতে ভাল হবে, আপত্তি নেই; কিন্তু আমার পাঁচখানা বেনারসী একসঙ্গে কি হবে, তুনি?”

স্বরজনের মনে সাহস বাড়িতেছিল, একটু জোর করিয়াই বলিলেন, “কি হবে, কি? পূর্বে তুনি। নেছা তুচ্ছ ভাবে তো আর আমি তোমায় তাদের বাড়া পাঠাতে পারব না। তুনি বা’ ঠিক করেছ, ওর উপর হীরের হাট গয়না আর বরেরও কিছু; তা’ ছাড়া বাড়ী সাজানোর ফার্টিচার, রূপার ছ’স্টো বাসন, আরও দরকারী অনেক কিছুই দিতে হবে। তারা যখন কিছু চায়নি, এ না ভাবে যে, চায়নি বরো’ ঠকে গেলা।”

সর্বাণীর সেই ঈষৎ স্মৃতিভার গুণার হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণবরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “যদি সত্যিই তারা কিছু না চেয়ে থাকে, আমার ফর্দই যথেষ্ট হবে; আমাদের মত অবস্থাপন্ন মেয়ের বাপরা যা’ দিতে পারে, ওদের মত ছেলের বাপরা তা’ পাবার অযোগ্য নন। স্মেরের যখন বাপের বাপজীতে অল্প পাওনা নেই, তখন বিয়ের সময় অবস্থা মত ব্যবস্থা করে’ বাপ তাকে কিছু-কিছু দেবেন বই কি; কিন্তু যদি তাঁদের এ-মতলব থাকে যে, এ-মেয়ের ভাই-বোন নেই, না চাইতেই ঢের বেশী পাপ এবং তার মধ্যেও আবার একজন প্রতিনিধিকেও মধ্যস্থ রাখা হ’লে থাকে, তা’ হ’লে অবশ্য তার কথা স্বত্ত! কিন্তু আমরা যখন ভার দিয়েছ, ফেরানো চলবে না; যা করুব, আমিই করুব, মনিকা বর-পক্ষের লোক, তার মতে এবং হ’তে পারে না।”

স্বরজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। রায় যে আর বলল হইবে না, তা’ জানাই ছিল; মনের মধ্যে কিন্তু অনেকটা অস্থিতি জন্মিয়া উঠিল। অমন ছেলে, ভাল ঘর, এত কমে যদি তা’রা—না, মেয়েটাকে বুঝাতে হইবে।

চেষ্টাও করিয়াছিলেন। মেয়ে বুঝিল না; সে বলিল, “রূপার স্টেট, হীরের হাট, ওদর গরীব বাসুনের

ঘরের জন্তে নয়, বাবা! ধনী কায়স্থদেরই ওদর রীতি। আমাদের ঘরে ক’জন মেয়ের বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করবার যোগ্য, বল তো? তিন, সাড়ে-তিন এই যথেষ্ট! কেন ভাবব? ভুললোকা হ’লে এতই সম্ভব হ’য়ে যাবে। আর না হ’লে তুনি বুঝবের ডাঙার চেলে দিয়েও পার পাবে না।”

স্বরজনের মন বৃষ্ণিল না; কিন্তু তিনি যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হইয়া অগত্যা নীরব রহিলেন।

ছুটী মজুর হইয়া গেল, বাড়ীও মিগিল। যত্নভূক্তা ভাইদের মধ্যে ছ’একজন সপরিবারে আগেই আসিয়া বাড়ী দখল করিলেন, হাট-বাজারও প্রচুর ভাবেই কাঁচ হইল, সানাই-ব্যাগুপাইপের ফরাসা, মন্দে-দরজারের ফরাসা—সবই হইতে লাগিল; অনেক দূর-দূরান্তর হইতেও আত্মীয়, বন্ধ, কুটুম্ব, তত্ত্ব কুটুম্বেরা আসিয়া আসিয়া ঘর-দার, ছাদ-উঠান ভরাইয়া ফেলিলেন। এদিকে দারা-শ্রাবণের বর্ষপাখারও অবিশ্রামে চলিতে লাগিল। বানা-পুকুর তো ভরিয়াই, ‘লালদীঘী’, ‘মোলদীঘী’ ভরাইয়া অথবা যেরূপ জল কলিকাতার রাস্তা-পথ-বাট নিষ্কিচায়ে ভরাইয়া দিতে লাগিল। বিবাহ-বাড়ীতে ব্যাগুপাইপের বাজনা, সানাইয়ের তাল—কোন কিছুই ভাল ভাবে জমিয়া উঠিল না; তুচ্ছতাক, বাটা-পোতা সব কিছুই হইতে লাগিল; কিন্তু বৃষ্টির আর ধরণ না। আকাশ যেন আজ ছুটা হইয়া গিয়াছে, অথবা দিয়াধন্যদের চোখের মধ্যে যত জল জমিয়া রহিয়াছিল, সমস্তটাই যেন নিশেপে আজ এই বিবাহ-বাড়ীটার উদ্দেশ্যে ভাঁরা অথবা চালিয়া দিয়াছেন। থাকিয়া-থাকিয়া উত্তা উত্তবে’ হাওয়া উচ্চ আত্মনিদানে হাঁকিতেছিল, ‘হা-হা-হা! শব্দটা কানের কাছে পৌঁছিয়া কী যেন বনাইতেছিল, ‘নানা-না’; কিন্তু কি যে সেই ‘না’, এইটুকুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছিল না, এইটুকুই না দেব-বিভূষণ। বিবাহ স্থনির্মাণ হইবে না, ইহারই ‘না’, অথবা বিবাহ দিও না, এত বড়ই সে ‘না’? কে জানে? কে বলিতে পারে?

দৈবের পথকে দৈবজ্ঞরাই ধরিতে পারেন না, সাধারণ লোকে আর কি পারিবে? তবে এই সব নানা দিক্ দিয়া বিচার করিতে করিতে মনের মধ্যে কি যেন একটা অপরিমীম অস্থিতি বোধ করিতেছিলেন স্বরজন, আর করিতেছিল মণিকা। তার অস্বস্তি আধি-দৈবিক ছাড়িয়া আধি-ভৌতিক কারণও কিছু কিছু ছিল; স্বরজনকে সে সেকথাটা গোপনে জানাইতেও জরী করে নাই এবং তাহাদের ছ’পাঁচের ভিতরে আরও গোপনে একটা রক্ষার কথাবার্তাও হইয়া গিয়াছে; তাখানি মন তার ভালরূপে শাস্তি পায় নাই। সর্বাণীকে আরও কয়েকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ঐ ছেলেকে পত্ররূপে পাওয়া যে তার বস্তুত সৌভাগ্য, সে-সম্বন্ধেও হিরাব বতাইয়া, নব্বির দিয়া সপ্ৰদান করিয়া দিতে জরী করে নাই, স্বর, সর্বাণীর ব্যবস্থা তাকে ঈকান্তে ফেলিতেছে। অল্প এক বাড়ীতে ওরা শুণ পাঁচহাজার টাকা নম্বরের সঙ্গে সোনা হাট, হীরে হাট গহনা ইত্যাদি পাইতেছিলেন, শুধু সর্বাণীদের কথা দিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের বিদ্যুৎ করিতে হইবে, অতএব ক্ষতি-পূরণটা সর্বাণীদের করা উচিত। সর্বাণীর কিন্তু সেই রকমই ধর্ড্র পণ। সাধারণ ভুললোকের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তার চেয়ে বেশী পণ দিয়া সে বিবাহ করিবে না। ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’—এ জানা কথা, মণিকা রাগ করিয়া নীরব হইল। কাকীমা-পিসীমা’দের মধ্যে অনেককে বলিলেন, “সবুর আমাদের আক্ষেপ আছে, বেশ করছে; এমন না হ’লে লেখা-পড়া শেখা! এই ধরো, ওর বিয়েতে অবশিষ্ট দশ ছেড়ে ভাষুর ঠাকুর (অথবা দাদা) বিশ হাজারও খরচ কর্বতে পারবেন, কিন্তু তার পরদিন আমাদের মেয়েগুলো র দশা কি হ’ত? ওদের জন্তেও ঐ রকম দাবী উঠত তো? না, এ ভালই করেছে।”

আবার কেহ কেহ বাকীয়া বলিলেন, “তা’ মাই বসো, নজর একটা জিনিষই আলাদা, নজর কি



সবার থাকে? আর সবই যখন মেয়েই পাবে, তখন একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে পাচজনে তবু চোখে দেখত! কিপ্টে সভাবও একটু আছে, আর তা' ছাড়া এখন ওদব দিলে কুটুমকেও কিছু দিতে হবে কিনা, তাই সেটা ঝাটালে। সবুঢ়ালাক কি কম!”

সরলাঞ্জি ছ'রকম কথাই জ্ঞানিল, ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিল না, সে বরং মলিনার সঙ্গে মিলাইয়া এক রকমের শাড়ী কেনা, এক গুজনের গহনা গড়ানোর বন্দোবস্ত করিল। রূপার দান, পিল-

কাসার ফর্দ সেজ-কাঁকীমার বাস্র হইতে চাহিয়া লইল এবং নমন-ক্ষেমী আর নমস্বারীর ভার দিল সেজ-কাঁকীরই উপর। তার মলিনাদির বরটা কিন্তু সায়েন্দেবের ছাত্র নয়, আটের। এ-এ পাশ করিয়া সে-ও গোয়ালিঘরের প্রবেশের হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-উপলক্ষে ছুটি লইয়া সে-ও এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তা' আসাতে কোন কুলে কাহারও তো বাকি ছিল না।

(ক্রমশঃ)

## রবীন্দ্রনাথের প্রতি শান্তিনিকেতন \*

শ্রীকালিদাস রায়

ভুবনভাঙ্গার মাঠ,—কত যুগ হ'তে ছিহু পড়ি,  
নির্গুন পঙ্করতলে জীব নর-কঙ্কাল আঁকড়ি,  
নিশীথে দহ্মার লন লুকাইত মোর শুভ্রবনে,  
শব্দহীন ক্ষেত্রে লতা-কাঁড়ি উঠিত ক্ষণে ক্ষণে,  
কঙ্করে খুঁজিত খেহ দুর্লভার সিনের বেলায়,  
জ্যোৎস্না দেবিত রৌদ্র, রাখালের মাতিত খেলায়,  
অহিন-কুলের ঘেঁষে শোণিতাক্ত নখর-দোদিত  
এ রুঢ় রাঢ়ের গুণ্ড। ভাণ্য তার একি আশাভী!  
কেমনে সন্ধান পেলে, বাহিরে আনিলে তুমি টানি'  
বরিশ পুস্তল-খুঁত রসরাজ-সিংহাসনখানি  
তাঁহার অন্তর হ'তে? পূর্ণ ছিল বন্দীকের গুপে  
অঙ্গ তার, বিহারি' তা' অভিনব সৌকন্দ্যরূপে  
বাহিরিল রম্যধারা,—বোধিধারা মুক্ত তার সাথে,  
জানি না কে সমাহিত ছিল তার অখণ্ড-ছায়াতে!

নব নিরঞ্জন সনে তমসার অপরূপ মিলন,  
তমসিকী সাথে বেধা নিরঞ্জন দিব্যর মতন,  
সহসা ফিরিয়া পেল হারা কণ্ঠ বেন এ ভারত,  
একসাথে উচ্চারিত তেতা, মঠ, আগ্রহ, সংসং

নবযুগ-সংঘোদারে। যত মুতা উণীরের মূল  
ভূ-পঙ্কর তাজি বোমো ধূপধূমে করিল আকুল।

তোমার চরণ-স্পর্শে মোর প্রতি পল্লব-মর্দন,  
প্রতি তুল, প্রতি কটা অপাধির সঙ্গীতে মূর,  
অসাড় কঙ্কর ধূলি রসাবেশে জীবন চঞ্চল।  
নিখিল ধরণী চায় মোর পানে বিশ্বদ্ব-বিহ্বল।  
গাহিছে তিষ্ঠিরি হ'য়ে প্রতি পক্ষী নবোপনিষৎ  
মিলে এ সংহিতা-ধামে কত তন্ত্র, কত 'শত পথ'।

হে রবি, সহস্র দলে চিৎসরোজ ফুটা'লে আমার  
তোমার সহস্র করে। বাণী-করে বাজে অনিবার  
সহস্র তারের বীণা সে সরোজে। বিধে ছিল যত,  
অকথিত বাণী, হৃদয় ধনি হ্রস্ব গীত অনাহত  
নিশেপে মুচ্ছনা লভে। শোনে মুক্ত বিখচচার,চ,  
কোটি-কর্ণ-বলয়িত চিত্ত মোর কাঁপে ধর-ধর।

কত যুগ যুগ হ'তে পৃথ্বীভূত রসের সঞ্চয়  
নিঃস্বা হ'য়ে করে দান সরস্বতী,—একি এ বিশ্বয়,

\* রবীন্দ্র-সম্বন্ধীয় সাহিত্য-সংকলনে পাঠের জন্য নির্ধারিত

বিনা ভগ্যাসুর তাই লভে আজ বিশ্ব কুতূহলী;  
আমারে ঘেরিয়া আজি বিকসিত সহস্র অঙ্গলি।  
গৌরবের নাই সীমা। এ মহিমা স'বে কি আমার?  
স্বয়ং হিমালয় নারে বহিবারে এ গৌরব-ভার,  
সহিবারে এ মহিমা। পদে পদে কণ্ঠ পাষা  
উজ্জ্বলিত ধূপ স্বরে প্রচারিতে আপন মধ্যমা।

ক' দিনের এ জয়ন্তী? থাক' আত্মগৌরবের কথা!  
শাল-বনে থনাইছে প্রত্যাগার বিরহের বাধা।

তোমা পানে চেয়ে দেখি, হে আমার চিত্তের সম্মুখ,  
লোকান্তর ভারনায় আকৃষ্ট তোমারো ললাট।  
বিশ্ব-মহামানবের চিত্তলোক-অন্তাচ্চা পানে  
ঘন ঘন চাহ তুমি। রাস্তা কণ্ঠে অনন্তের পানে,  
কি বেনে কহিছ ধীরে। চারিদিকে বৈভালিক দল,  
তব আয়ুষ্কামনায় উচ্চ গাহে জয়ন্তী-মঙ্গল,  
স্বস্তারন-হোম-ধূমে হেরি তব শুভিত আনন,  
সুভিত মহিমা মোর। স্বস্তি-স্বহ হারায় এ মন।

তোমার বীণায় বাজে সঙ্গরূপ সায়াম-পুরবী,  
মধুরে মছয়া-বনে তব তপ্ত নিঃশ্বাস সুরভি।  
কোন্ দূর দূরান্তের নেভে শুকতারার আধাস  
অজ্ঞের রহস্যজাল ভেদি' বহি' বোধন-আভাস

পরশে ললাট তব, অজীভ্রিয় আনন্দ-বনিমা  
গোখলি-নিগন্ত-সম মুখে তব ফুটায় শোণিমা।

আজি শুধু মনে পড়ে কত বারই বনিয়াছ হায়  
পথের ধূলার মত জড়িয়ে বা' ধরে ধুটি পায়,  
অনন্ত পথের যাত্রী দেয় তাহা ফিরিয়ে দুগিরে;—  
প্রভাতের আম্রমেঘে নবনব পূর্ণাচল-শিরে,  
জীবন উৎসব শেষে যুগপাতের মত পায়ে চলে  
চলে যায় মহাংশব-ক্ষেত্রখানি উপেক্ষায় ফেলে।  
রূপা প্রেম রোষে পথ। এই কথা বার বার 'হরি'  
উঠে মোর অন্তরের ধূলি মাটি শিহরি' শিহরি'।

সায়াক্ষের রবি পানে যত চাই রক্তিম গগনে,  
সপ্তপর্ণ-তরুশির হেরি মাত অস্তিম স্মরণে,  
গ্রামান্তের রেখা যত মুছে দেবে গোখলি আঁধার,  
বিদ্যার-মাঙ্গল্য বাজে রাস্তা কণ্ঠে পিক পালিয়ার,—  
কোণার্কের কথা 'হরি' চিত্ত মম হয় যে অধীর;  
চলিছে রথের রবি,—তার লগি যুগা ত্রীমন্দির,  
যুগ-যুগান্তের পথে যাত্রা তাঁর অবিরত-গতি,—  
এ সত্য না বৃষ্টি হায় সিদ্ধ-ভীরে গড়িল নুপতি  
রবির দেউলখানি করি চারু-কলা-ঐ-মন্ডিত,  
বেদানে অসংখ্য যাত্রী শব্দধানে সন্মুখে মিলিত  
বন্দিল সহস্রকরে। হরি শুধু ভাব পরিণাম,  
গৌরবের ভূষণে চিত্ত মোর গাহে সন্ধ্যা-সাম।

“মনের নগ্নত্ব জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত, অন্ধকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ,  
অন্ধকে বাঙ্কিতকে বসাত।”

—বঙ্কিমচন্দ্র



ডাক্তারকে ছেঁক পাঠাতে হ'ল। আমাদের আইন বড় দয়াময়; হ'দিন বাদে যে কামিলাকাত খুলেছে, তাঁর একটি অর হয়েছে কি আমরা তাঁর ডিক্টিংসার ব্যবস্থা করি; কয়েদখানায় সে যখন অপেক্ষা করছে কবে শেখরায়ে আসবে তাঁর ডাক, তখন যদি তাঁকে অল্পে মরতে দেওয়া হয়, সেটা তো হ'ল বরফরাত। আমাদের আইন যে 'হিউম্যান', স্বভাবঃ অনেক বর করে' তাঁকে সারিয়ে তোলা হবে, যা'তে সে নিশ্বাসে মরতে পারে। থাকবে তাঁর সম্পূর্ণ আইনসম্বন্ধ ভাবে মরবার তৃষ্ণা।

কিন্তু চুপচাপ, শান্ত ভাবে সে শুয়ে ছিল, এক হাত মাথার নীচে—হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে, যুগ্মে, তাঁর চোখ ফুটো লাগ, নিঃশ্বাস পড়ছে যখন-য। একদৃষ্টে সে তাঁর উন্মোচন দিকের শাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে—শাদা, ফাঁকা, মৃত দেয়াল।

ডাক্তারটির বয়েস অল্প; তিনি 'অভিজ্ঞ' লোক নন। মানে, তিনি এখনো সে-অবস্থায় এসে পৌঁছন নি, যখন আমরা কথাসংক্খ্যায় বলি, 'ও, রেখে দিন মশাই, এমন ঢের দেখেছি।' যখন আমরা কিছুতেই অর্থাৎ হই নে, কিছুতেই চটে' বাই নে—সব জিনিষই অনাগ্রাসে মেনে নি, আবার, কিছুই বিশ্বাস করি নে, এরি নাম সাময়িক ভাষায় অভিজ্ঞতা, যা'র নাকি সোনার দাম, যা' নাকি সম্ভ্রান্ত বুদ্ধি ও অজ্ঞিত বিস্তার চাইতে ঢের, ঢের দামী। একবাক্যে ঠাণ্ডা, আগাশোড়া জমট, পাকা জিনিষ। ডাক্তারবাবুর মনে খানিকটা নবীনতা জ্বলার চাকুরি সবও রয়ে' গিয়েছিল। এর আগেও তিনি হ'বার এমন রোগী দেখেছিলেন, যা'র কামির হুজুম হয়েছে; তবু তাঁকে দেখতে এসে তাঁর মনটা অদ্ভুত একটি মোড় দিয়ে উঠল। খানিকটা করুণা, একটি ভয়—আর কোঁতুলল।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে সে একবার মুখ ঘুরিয়ে মূহুর্তের জন্তে তাকা'ল তাঁর দিকে; তারপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দেয়ালের উপর। একটা দিন সে আশ্চর্য্য রকম চুপচাপ কাটিয়েছে; চক্ষিণ খট্টা শুয়েই থেকেছে, উঠে বসেছে শুধু খাবার এলে। মাথা নাচু করে' খেয়ে উঠেছে; কখনো একটি কথা বলে নি। বেশির ভাগ সময় তাকিয়ে থেকেছে দেয়ালের দিকে—কখনো-কখনো, বোধ হয় বেক্রম প্রান্তিতে, দেয়ালের নিরবজ্বির শব্দাৎ আর অপরিসীম শূন্যতায় দ্রাস্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্নিহিত কামি হবার আগেই নাকি অনেক কয়েকী মরে' থাকে; ও-ও তাঁ'রই একটা উদাহরণ।

কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষা (তাঁর হাতে নিজেকে সে এমন ভাবে ছেড়ে দিল যেন তাঁর শরীরটা এক টুকরা কাঠ) শেষ হবার পর সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'ডাক্তারবাবু, আমি কি বাঁচব না?' তাঁর বিচার শেষ হ'য়ে খাবার পর এই হচ্ছে প্রথম কথা, যা' তাঁর মুখ দিয়ে বেরল।

প্রশ্নটা একটা হাহুড়ির বাড়ির মত ডাক্তারের বুকের উপর এসে পড়ল। খানিকখান তিনি চুপ করে' তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। তার পর আন্তঃআন্তঃ বললেন, 'না, তুমি সেরে উঠবে বই কি।'

'আর, না-ই ব'নি উঠি, তা'তেই বা কী? আমাকে খুন করবার সব ব্যবস্থা তো প্রস্তুত। লোকটার চোঁট একটা বিকি চওে বেকে পেল—সব চেয়ে বিকি এই যে, সেটা প্রায় হাসির মত দেখতে। ডাক্তারবাবু বৃথতে পারলেন না, কী ভাবে সেটাকে নেবেন। প্রথমে তাঁ'র মনে হয়েছিল, লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; এখন তাঁ'র মনেহ হ'তে লাগল, সে মুখ মুকিয়ে তাঁ'র উদ্দেশ্য হাসছে।

কিন্তু সেই বিকি হাসি শিশুগিরিই মিলিয়ে গেল; আবার স্বরূপ হ'ল তাঁ'র নিঃশব্দ তাকিয়ে থাকা দেয়ালের দিকে। তখন ডাক্তারবাবু বলবার কথা খুঁজে পেলেন, 'খুন তো তুমিই আগে করেছ। একথা জেনো, তোমার উপর কারো রাগ নেই।'

'তা' জানি।'

'সকলের ইচ্ছা এক রকম হয় না; কিন্তু সব লোকের ইচ্ছা যোগ্য করলে যেটা সৃষ্টি যা' দাড়া, তাঁ'র নামই তো আইন।'

'তা'ও জানি।'

—ডাক্তারবাবু এসব বিবয়ে কিছু পড়াশুনো করেছিলেন, তাঁ'র হবার অনেক কথা বলবার ছিল। কিন্তু কী হবে বলে—তিনি ভালো—বেলোক মরতে বসেছে, কোনো শাস্ত, কোনো তবই তাঁ'র আর কাছে লাগবে না। তাঁকে যে হত্যা করছে, সে যে কোনো বাস্তবিশেষ—এমন কি, কোনো শাসনতর নয়—সমগ্র মানব জাতির সমবতে ইচ্ছা, একথা শুনে তারি তো সাহসনা সে পাবে। তাঁ'র কাছে আইনের 'কিলজকি' আসোচনা করা—ডাক্তারবাবুর মন এমন নিঃসাড় হ'য়ে পড়ি নি যে, তাঁ'র অজ্ঞতা, অশীলতা তিনি উপলব্ধি করতে না পারেন। লোকটি বেধ হয় চোখের কোণ থেকে ডাক্তার-বাথকে দেখে নিচ্ছিল; হঠাৎ সে বলে' উঠল, 'আমি যা' করেছি, বেশ করেছি। আমি একটুও ছত্রিত নই।'

কথাটা শুনে ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন। কথার ধরে কোনো রাগ ছিল না, ঝাঁপ ছিল না—যেন নিতান্ত সাধারণ একটা উক্তি করছে, এই রকম। তাঁ'র মুখের ভাব তেমনি নিরোঁট, নিশ্চাপ। তাঁ'র শরীরে এক অনির্বচনীয় স্থিরতা—যেন তাঁ'র আত্মা তাঁ'র শরীর ছেড়ে গেছে, যেন ভিতর থেকে কথা করে' উঠছে এক প্রেত। অর্দ্ধ-জট বয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ও-কথা বোলা না।' আবার, 'না, ও-কথা বোলা না।'

ব্যাপারটা সত্যি বড় ভয়ানক—ডাক্তারবাবু তা' মনে-মনে ভাবতেই শিউরে উঠতেন। ছোঁচোটা পেটের মধ্যে এতদূর বসে' গিয়েছিল যে, ভিতরকার সব নাড়ি'ড়ি উন্মিত বেরিয়ে এসেছিল। ভয়লোক গুমুছিলেন। টাকার জন্তে, নিছক টাকার জন্তে একাধি করা! প্রমাণের কোনো অভাব ছিল না; ছিল না তাঁ'র বাঁচবার, তাঁ'র দণ্ড লণ্ড হ'বার এতদূর অস্থিলা। ভয়লোক গুমুছিলেন, ঘরে লোকের সাড়া পেয়ে চমকে উঠেই—

'কেন, কেন তুমি ও-কাজ করতে গেলে?'

'কী করব? টাকার যে দরকার।'

'কিন্তু তাই বলে', ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনা প্রকাশ পেল, 'তাই বলে' ... তুমি বৃথতে পারছ না, তুমি কী করেছ? অস্ত্র সব রকম স্ত্রি মেটানো যায়, কিন্তু প্রাণ—যে-প্রাণ তোমার দেবার সমতা নেই—এ যে পরম পাপ—' ডাক্তারবাবুর বক্তব্য অগোছাল হ'য়ে পড়ল।

'কিন্তু একাধিই যখন খুব জাঁকজমক করে' করা হয়, সেটা হ'য়ে ওঠে মহাপুণ্য।'

'তা'র মানে?'

'যখন একজন লোক আর-একজনকে মারে না, যখন হাজার-হাজার হাজার-হাজারকে মারে। নিজের কোনো-রকম ভালোর জন্তে নয়—এমন কি, টাকার জন্তেও নয়; কেন যে মানুষে আর মরছে, তা' তাঁ'র জানে না। তখন তাঁ'র নাম হয় দেশের রক্ত প্রাণ দেওয়া। তা'রাই হয় দেশের বীর।' খুব আশ্বে-আশ্বে, যেন অনিচ্ছায় লোকটি কথাগুলো বলল।

'কিন্তু যুদ্ধ—তা'র কথা যে আলাদা।'

'হ্যাঁ, আলাদাই তো। কিন্তু আমার মনে হয়, কেন মাঝি, তা' না জেনে মাঝবার চাইতে টাকার জন্তে মারা অনেক ভালো। আমার একটা কারণ ছিল।'

'পৃথিবীতে যে যুদ্ধ হয়, তা'রও কারণ থাকে।'

'কী কারণ?'



‘যদি জানতেই চাও, তা’র কারণও টাকা।’  
‘কিসের জন্তে টাকা? বড়লোক হবার জন্তে। সেতার নাম গোল। কিন্তু আমার যে ছিল দরকার—সেড়ে থাকবার দরকার। ডাক্তারবাবু, বাঁচবার অধিকার আমারও আছে।’

‘দৈন্যকৌটিক তুমি মেরেছ, তা’রও ছিল। তা’র অবস্থায় নিজেকে তুমি একবার ভেবে দ্যাখো, কেউ যদি ওরকম করে তোমাকে মারত।’

‘কী আর হ’ত। মরে’ যেতাম। একটা দুর্গীর, একটা ভেড়ার, একটা মাছের কি বাঁচবার অধিকার নেই? তা’দের আমরা নিষ্প্রিয় মারি—কেউ কিছু বলে না। কেননা, তা’দের মারলে আমাদের লাভ। আর তা’দের চাইতে আমাদের চেয়ে বেশি জোর। যার জোর, মারতে তার দোষ নেই।’

‘ও সব কেন বলছ? ও হচ্ছে শুধু কথা, মুখের কথা, মনের ভিতর তাকিয়ে দ্যাখো। মুখী কি ভেড়া আমাদের পক্ষে কখনো সত্যি বেঁচেই থাকে না। কিন্তু একজন মাহুং, মাহুং! একটা প্রাণ পৃথিবীতে এসেছিল, কী হৃদয় সে প্রাণ, আলোর মত, আশুনের মত। কোন কোনো বাহতে একটা আশ্রয় ফুল ফুটে উঠেছে। সেই ফুল তুমি পায়ের নীচে মাড়িয়ে দিলে, সেই আশুণ তুমি নিবিড় দিলে। যে ছিল, সে নেই। কোনোখানে নেই। এক ধাক্কায় তুমি তা’কে ঠেলে ফেলে দিলে পৃথিবীর বাইরে—সে কোথায়, কোথায়? আর সে কিরে আপনো না—কখনো, কখনো, কখনো নয়। তা’র মনের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা—তা’র সব কাজ আর চঞ্চ, ভালো না লাগা আর চূপ করে’ থাক, তা’র স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে ওঠা আর হাসির শব্দ—তা’র মগজের মধ্যে ব্যস্ত এক পৃথিবী—সব তুমি এক বৃহত্তর শূন্য করে’ দিলে। কেন তুমি তা’কে বাঁচতে দিলে না? তুমি তা’কে বাঁচতে না দেবার কে?’

‘কে জানত সে সত্যি-সত্যি মরে’ যাবে।

কী অস্বস্ত তা’র চেহারায় হয়েছিল—সেখলে হাসি পায়। মুহূর্ত্ত—তা’ এরি নাম? বোকা, বোকা—বোকা না হ’লে কেউ অমনভাবে মরে! যেন জেদ করে’ সে রক্ত বইয়ে দিল। কে জানত তা’র শরীরে এত রক্ত আছে।’

লোকটি খানিকক্ষণ চূপ করে’ রইল; কিন্তু মনে হ’ল আরো কিছু সে বলবে। যেমন ভাবে সে শুয়েছে, তার শরীরের সেই শক্ত ভরীতেই যেন চাপা কথা। ডাক্তারবাবু নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তা’র চোখের মধ্যে গুমিয়ে ছিল একটা প্রশ্ন; আন্তে-আন্তে সেটা জেগে উঠল, ফুটে উঠল। অদ-রক্তিম চোখে সোজা ডাক্তারবাবু মুখের দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ চাপা গলায় জিজ্ঞাস কবল, ‘খুব কি লাগে?’

‘কী? কিসে?’—ডাক্তারবাবু প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন না।

‘এই—কিসিতে?’

ডাক্তারবাবুর দৃষ্টিও হঠাৎ যেন লাগিয়ে উঠল। ‘না, না, তাড়াহাড়ি তিনি বললেন, ‘খুব বেশি লাগে না।’ তারপর, অস্বস্ততা ফিরে পেয়ে বললেন, ‘তুমি যা’কে মেরেছিলে, তা’র বড়টা লেগেছিল, তা’র চাইতে অনেক কম লাগবে। সত্যি বলতে, এতে একটুও যত্না নেই।’

‘তা’ হ’লে স্বপ্ন পেয়ে মরবে—কী বলেন? ভালো।’

‘শেষ পর্যন্ত ঝগড়া করো না। নরম হও, নরম হও; তা’তে শান্তি পাবে।’

লোকটির যেন একেবারে পেটের ভিতর থেকে উঠে এল একটা অস্পষ্ট শব্দ—মাহুংয়ের হাসির কোনো অস্বাভাবিক, বিকৃত ‘প্যারডি’। ‘আমি যা’কে মেরেছি তা’কে মেরেছি; ওরা আমাকে মারবার কে? আমি ওদের কী করেছি যে, ওরা আমাকে মারছে?’

‘নরম হও, নরম হও। তুমি বে-পাশ করছ, শান্তি নাও তা’র। তোমার হাতের রক্ত—’

‘সে-রক্ত কি আমার রক্তে মুছে যাবে?’ ডাক্তার-বাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লোকটি বলল ‘উঠল, ‘রক্ত তো রক্ত লেগে আরো লাগ হ’য়ে উঠবে। এ তো প্রতিহিংসা।’

‘না, না, হিসাব নয়। ধরো, তা’র ছেলে যদি তখনই তোমাকে মেরে ফেলত—’

‘সেটা বোঝা যেতো; তা’র রাগের যথেষ্ট কারণ ছিল আমার উপর। কিন্তু ওরা কে? ওরা আমাকে মারবে কেন? ওরা সবাই মস্ত লোক—জানী আর মানী। আমি একটা পোকাম মত। আপনি বলছেন, আমি পাপ করেছিলাম—পরম পাপ। কিন্তু সেই পাপই তো ওরা কবলে আমার উপর। কেন ওরা আমাকে ছেড়ে দিতে পারলে না! কেন ওদের আমাকে খুন করতেই হ’ল?’

‘এখন—এখন আর মনে রাখ রেখো না। তোমার উপর ওরা বা’ করেছে—হত্যা নয়, তা’ তোমার মুক্তি। কী করে’ তুমি বাঁচতে—তোমার হাতে একজনদের রক্ত, সে ভীষণ ভার কী করে’ বহন করতে? সেই রক্ত যে চাঁৎকার করে’ উঠত তোমার নামে—ছাড়াবার করে’ ভিত তোমার জীবন। এই শাস্তি যে তুমি গ্রহণ করছ—এটাই তোমার শাস্তি, তোমার মুক্তি।’

‘হ্যাঁ, মরে’ গিয়ে শাস্তি, মরে’ গিয়ে মুক্তি! তা’র চেয়ে আমি বরং বাঁচতাম—আমার পাশ নিয়ে, জুখ নিয়ে, মনের মধ্যে জলন্ত নরক নিয়ে বরং বাঁচতাম। এনিও, আমি একটা পোকাম বেশি কিংবদন্তি নই। আমাকে দয়া করতে খুব বেশি দয়ার দরকার হ’ত না। আমি মাটিকে জড়িয়ে থাকতাম, মাটির উপর মুখ বুজড়ে পড়ে’ থাকতাম—কে আমাকে দেখতে আসত? কেন ওরা আমাকে বাঁচতে দিল না?’

‘তুমি যা’ করছ—কে তোমাকে দয়া করতে পারত, কখনো করতে পারত?’

‘কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা না করে, তা’ হ’লে আমারই বা চলে কী করে?’

‘তবু নেই তোমার, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন।’

‘ঈশ্বর!’ চাঁৎকারের মত স্বরে সে বলল ‘উঠল। ‘ঈশ্বরের উপর আশা রেখো, তা’র অসীম ভালোবাসা। তিনি তোমাকে—’

হঠাৎ ডাক্তারবাবু পেন্সে গেলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকটির মূর্ত্তি একেবারে বদলে গেছে। কহরের উপর ভর দিয়ে, হাতের উপর মাথা রেখে সে আচ্ছন্ন উঠে বসেছে; তা’র সমস্ত মুখ টুকটেকে লাল, চোখ দুটো বিস্ময়িত, যেন বেরিয়ে আসছে। কপালের উপর দৃঢ় দৃষ্টি করছে একটা মোটা নীল শিরা। ডাক্তারবাবু একটু ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাস কবলেন, ‘কী হ’ল?’

‘কোনো কথা না বলে’ লোকটি আবার শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ জোরে-জোরে বদল তা’র নিশ্বাস। তারপর আন্তে-আন্তে তা’র সেই যুতের মত, প্রেতের মত শাস্ততা ফিরে এল। তখন সে বললে, ‘একটা গল্প শুনবেন? ছোট! হঠাৎ মনে পড়ে’ গেল।’

ডাক্তারবাবু নীচু হ’য়ে তা’র কপালে হাত দিলেন। অরটা বাড়ছে। আর তা’কে বকানো উচিত নয়। ‘এখন থাক। তুমি এখন—’

‘না, না শুধু না। ছোট গল্প।’

‘আর এক সময় এসে শুনবা’

‘না, না—এখনই, এখনই। শুধুন, ছোট! এক ছেলে ছিল, তা’র মার খুব অস্বস্ত। কী? আপনি ভাবছেন, আমি জুগ বকছি? মোটেও তা’ নয়; আমি জানি, আমি কী বলছি। একটু শুধুন, তা’ হলেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ—মার ছিল খুব অস্বস্ত। মরণাপন্ন। শুনছেন?’

‘হ্যাঁ—বলো, বলো।’

‘মা আর ছেলে—সময়ের আর কেউ তা’দের ছিল না। তা’রা ছিল গরিব—এত গরিব যে, একবেলা পেট ভরা’ খেতে গেলে তা’রা গুলি হ’ত; আর তা’ যেদিন জুটত না, তা’দের একটু মন খারাপ হ’ত। কখনো তা’রা পায়সা চোখে জাখে



নি; একটা ঠাকু হিল তা'দের কাছে আকাশের চাদের চাক্তির মত।

‘ছেলেটা কোমরে ছেঁড়া কাপড় ভড়িয়ে সারাদিন টাই-টাই করে’ বেড়ায়; কা'দের বাগানে পেয়ারা পাকল, কোন্‌ গাছের নীচে মিষ্টি কুল স্বরে পড়ছে, কোন্‌ বাবুদের বাড়িতে ঠিক সময় বুকে গিয়ে হামির হ'তে পারলে জুটেও যেতে পারে একটা চিড়ির মোগা কি একই আমলক—এসব ছিল তা'র মুখের। তা'র চোখ থাকত সব সময় ভোজের উপর; সেটা চাটুযোদের বিড়কির বাগানে আরম্ভ করে' শেষ করত চাই-কি যোজদের বাড়ির নরুর সঙ্গে ছুপ-খই-সে—যদি কপাল ভালো থাকত। ছেলেমাশুধ—খেতে ভালোবাসত, খেতে পেত না। ওর মুখের চেহারা ই এমন—দেখলেই মনে হ'ত, কিছু চায়। দয়া করে' অনেকেই ওকে দিত কিছু না-কিছু। কিন্তু সব সময় ও যে দয়ার অপেক্ষার বসে' থাকত, তা' নয়। হরিখে পেলেই মিটিয়ে নিত ওর লোভ। যাক বলে গিয়ে চুরি। তা'র ফলে ঠ্যাগনিও ওকে কম খেতে হ'ত না; কিন্তু তা' ও গায়েই মাখত না। পেটে খেলে পিটে নয়।

‘এদিকে ওর মা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে একটা বেগুন কি আখানা হুমডো জড়িয়ে আনতেন—সোটা কয়েক উচ্ছে, একমুটা ঢেঁকিশাক। আর যেদিন আনাকে বলে'ক'রে একটু জিজ্ঞা কি মশলির গুড়ের ঝোপাড় হ'ত, সেদিন তো কথাই নেই। সেদিন বাড়িতে দশরমত হৈ-ঠে।

‘হুপুর পার করে' দিয়ে ছেলে তা'র পাড়া বেড়ানো সেরে কিন্তু বাড়িতে; দাওয়ায় পানি দিয়েই বলত, ‘না, খেতে দাও।’ মা বলতেন, ‘দস্তি ছেলে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে?’ ছেলে হাসিমুখে বলত, ‘উঁ, নরুর মা আখ বা খাওয়ালে, মা— একটা আত কলা—একবারে আত। এই এ—স্ত বড়—ঢেয়ে স্নাখো, মা।’

‘মা চেয়ে দেখে বলতেন, ‘তা' হ'লে পেট তো তোর ভরাই আছে—এখন আবার খেতে চাস কেন?’

‘না, মা, একটু ভাত খাব—এই ইটু'খানি।

‘দুধ বোকা—আল কুজুরবার, বেগুনপোড়া খাবি কী রে? শোন, আদা আখ চিড়ি দিয়ে গেছে।’

‘জিড়ি মা! কই, দাও মা, শিমুরি।’

‘তত্বব্ধ করিসু' নে ওরকম। বা, একটা ডুব দিয়ে আয় আগে।’

‘না, মা, এগুলি, এগুলি দাও।’ ছেলেটা চুটে

গিয়ে মা-কে পিছন থেকে ভড়িয়ে ধরে' চ্যাচামেচি করে' বাথিয়ে তুলত হলুতুল।

‘আর একদিন হয়ত ছেলেটা বলছে, ‘বড় ড

বিদে পেয়েছে, মা।’

‘তো'র সব সময় খালি বিদে। এতক্ষণ যে

বাইরে ছিলি—খাসু' নি কিছু?’

‘শোনো, মা, ননীদে'র বাড়িতে একটা আতা-

গাছ আছে না, মা—আমি কিছু করি নি,

খালি দেখছিলাম, আতা ধরছে কি না—ননী'র সেই

বুড়ী পিসী ঝাঁটা নিয়ে আমাকে তড়া করলে।

তা' ও-বুড়ী ছুটে পারবে কেন আমার সঙ্গে?

চৌকিরে চৌকিরে বলতে লাগল, আমি নাকি ওদের

সব আতা খেয়ে শেষ করি—আবার আমাকে

দেখতে গেলে হাত মটকে দেবে। ইস, দিক্‌ তো

দেখি মটকে, কেনম' গায়ে জো! আর, সত্যি বলছি,

মা—আমি ওদের ছুটোর বেশি আতা খাই নি—কি

তিনটে হ'তে পারে।’

‘বেশ, বেশ, খাসু। তুই-ই বা ওদের আতা

চুরি করে' খাবি কেন?’

‘কী মিষ্টি, মা। একদিন খাওয়াবো তোমাকে

একটা এনে।’

‘বাক্‌, আমাকে আর খাওয়াতে হবে না।’

‘না, দেখো একটু খেতে, তারপর বোলো।

কই, ভাত দেবে না?’

‘মা হঠাৎ ছেলের গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন, ‘এ কী? তোর অর হয়েছে নাকি রে?’

‘দুঃ, অর হবে কেন?’

‘ছেলের গায়ে ভালো করে' একটু হাত বুলিয়ে

মা বলেন, ‘তাই তো, একটু ছাঁত-ছাঁত করছেই তো

গাটা। না এগুলি, শুয়ে পড়গে, আখ আর তোর

নেয়ে-খেয়ে কাছ নেই। কান্ডিক মাসের দিন,

চারদিকের জলজরি হ'চ্ছে—শেণটায় একখানা থেকে

আর-একখানা হয়ে বয়স্ক।’

‘ছেলের মুখ ততক্ষণ শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে।

ভয়ে ভয়ে বলে, ‘কিছু খাবো না, মা? খিদে

পেয়েছে বড়।’

‘মা একটু ভবে বলেন, ‘আজকে বৃষ্টি আবার

পঞ্চমীর ষো পড়ছে। না রে, আজকের দিনটা একটু

কষ্ট করে'ই থাক। আমিও ভাবছি উপোস দেবো—

শরীরটা কেনম' মাল্‌জাম্‌ করছে রে।’

‘মোটের উপর, খাই হোক, এদের দিন একরকম

চলো' বাচ্চিল, যদি না মা পড়লেন অল্পে।’ অল্প

নিয়ও তিনি যদি পালনেন, রইলেন পায়ে দাঁড়িয়ে,

রা'ধে লাগলেন ছেলের জন্তে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন

দিন এল, যখন তিনি মাথা নিলেন। মনে-মনে তিনি

বুললেন, শেষ হয়ে এসেছে।

‘ছেলেটার অসহ্য এবার একেবারে পনের কুকুরের

মত হ'ল। এমন কেউ নেই যে, জেকে একটা কথা

কয়। পাড়ার চপলা-মাসী দয়া করে' তাঁর বাড়ীতে

ওর জন্তে হ'বেলা ছুটো ছুটোতেন; কিন্তু মা কাছে

নেই বলে' ওর খেতে ভালো লাগত না, খেয়ে পেট

ভর্ত না। যদিও খাওয়া হিসাবে চপলা-মাসীর বাড়ির

বাগা ছিল চের বেশি ভালো।

মোজা চলতে থাকে রেল-ইষ্ট্রিশানের দিকে—কেউ

ডাকলে কিরে' তাকায় না। একদিন দেখা গেল,

একটা কুকুরের ব্যাকো দড়ি দিয়ে ধেয়ে লে' তাঁর গায়ে

একটার পর একটা কুলের বীড়ি ছুঁতে মাঝে। যখনই

একটা লাগছে, বাজাটা কেঁদে উঠছে কঁকিরে

কঁকিরে।

‘বোশেখ মাস পড়ল। মা ছ'মাস জুয়ে আছেন

—আর বেশি দিন নেই। একদিন ছেলেকে ডেকে

তিনি বললেন, ‘বাইরে-বাইরে কোথায় থাকিসু' তুই

সারাদিন—একটু কাছে আয় না রে।’

‘ছেলে কাছে এল।

‘মা তাঁর মুখে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, ‘ইসু

কী ছিরি হয়েছে তোহারার। আজ নাম্‌ নি রে?’

‘না, মা।’

‘মা নাইল কি শরীর ভালো থাকে রে, বোকা?

খেতে বাবার আগে ডুব দিয়ে নিসু' একটা—চপলার

কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে নিসু' মাখার দিতে।

চুলগুলো তো একেবারে জট পাকিয়ে গেছে।’ মা

তা'র চুলের ভিতর একটু আঙুল বুলিয়ে সেলেন।

‘আর শোন—মাঝে-মাঝে আমার কাছে এসে একটু

বসিসু', কেনম'?’

‘আমি তো কত সময় আসি, মা; এসে দেখি, তুমি

ঘুমোচ্ছে।’

‘আমি ঘুমোই না রে, চোখ বন্ধ থাকি শুধু।

তুই আমার গায়ে হাত দিসু', তা' হ'লেই আমি জেগে

উঠব।

‘তোমার গুব কষ্ট হয় নাকি, মা?’

‘না, না, আমি বেশ আছি। তুই যা এখন—

বাইরে থেকে একটু ঘুরে পাবে। চাটুযোদের বাগানে

কীচা আম পড়ছে নাকি রে?’

‘হ্যাঁ, মা; সেদিন ঝড় হ'ল না, মা—এক কৌড়

কুড়িয়েছিলাম—তারপর আর খেতে ইচ্ছে করল না;

ভটু, ননী আর পোপ্লালে সব বিলিয়ে গেলুম।’

‘কয়েকদিন পর ছেলেটা মা-র বিছানার পাশে এসে



বলল। বললে, “আর ভালো লাগে না, মা। মা, তুমি কবে ভালো হবে?”

“ভালো তো আমি হ’লেই গেছি।”

“তা’ হ’লে তুমি কয়ে আছ কেন? এবার কাহ্নি করলে না, মা; আম-মাথা আর খাওয়া হ’ল না।”

“হবে না কেন রে—চপলার কাছ থেকে একটু কাহ্নি চেয়ে আনলেই হবে।”

“তা’ হ’লে তুমি শিগগির সেয়ে ওঠো,—মা—”

“এই তো, যাক্ না আর হুটো দিন।”

“মা, ডাক্তার ডাকলে তোমাকে আজকেই বোর হয় ভালো করে” দিতে পারে।”

“তুইই তো আছিস্ রে সব-চেয়ে বড় ডাক্তার।”

“না, মা, সত্যি। মনে নেই, সেবার যে ডোয়ার মার অশ্রুত করেছিল—ওর মামা সহর থেকে নিয়ে এল ডাক্তার। কত লোক এসেছিল দেখতে—

তোমাকে কেউ দেখতে আসে না, মা।”

“কথা শোনো ছেলের! আমার কী হচ্ছে যে, আমাকে দেখতে আসতে হবে।”

“আমাদের বৃষ্টি কেউ নেই, মা।”

“এব কথা তুই কোথায় শিখিস্ রে?”

“না, মা, বলা না, মা।”

“আর কেউ যদি নাই থাকে, আমাদের তো ঈশ্বর আছেন।”

“ঈশ্বর আমাদের?”

“হ্যাঁ, ঈশ্বর তো আমাদেরই; তিনিই তো তোকে আমার দিয়েছেন।”

“ঈশ্বর পূর্ব ভালো নাকি, মা?”

“পূর্ব ভালো, সব-চেয়ে ভালো; তাঁর মত ভালো কিছু নেই।”

“সে তোমার অশ্রুত সারিয়ে দিতে পারে?”

“হুচ্ছে করলে তিনি সবই পারেন না, মা।”

“তা’র সঙ্গে দেখা করা যাবে না, মা?”

“চাইলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়।”

“চাইলেই?”

“হ্যাঁ—মন দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে যদি চাওয়া যায়, নিশ্চয়ই।”

“কোথায় থাকে সে?”

“তিনি তো সবখানেই আছেন।”

“তা’ হ’লে আমরা তাঁকে দেখিনে কেন?”

“তিনি দেখা দেন চুপে চুপে, নির্জনে।”

“আমাদের কদমতলার মাঠে সে আছে, মা?”

“হ্যাঁ, আমাদের কদমতলার মাঠে।”

পরদিন ছেলোটা গুব ভোরে উঠল ঘুম থেকে।

বাড়িতে কিছু ছিল না; সব হাড়িঝুড়ি খুঁজে মোটে এক টুকরো মিছরি পাওয়া গেল! যাক্, গুডাই হবে।

মিছরি টুকরোটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। গ্রামের বাইরে প্রকাণ্ড কদমতলার মাঠ, জমিটা কোনো কারণে যেন আগাগোড়া স্বলস গেছে—

একটা গাছ নেই, এমন-কি, বাসগুলোও যেন শিতানো, তেমন সবুজ নয়। গ্রামের লোক দেখানো বড় একটা

কেউ আসে না। জায়গাটা সব চলতি পথের বাইরে। তা’ ছাড়া, পোড়ো জমি বলে জায়গাটার নানা রকম বদনামও আছে। হর্যোদয় থেকে হর্যাত, মত মাঠ খা-বা করে।

“সেখানে গেল সেই ছেলে, তখনও ভালো করে” হুঁয়া ওঠেনি। মাঠের উপর হাঁটু পেড়ে বসে পড়ে” সে চোখ বুজল। মনে মনে বলতে লাগল, “ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি এসো। তুমি এসো। আমি তোমাকে ডাকছি। তুমি আমার মা-কে ভালো করে” দাও।”

ঠায় একভাবে সে রইল; বার-বার, বার-বার মনের মধ্যে আউড়ে যেতে লাগল—সেই এক কথা, “ঈশ্বর, তুমি এসো।”

অনেকক্ষণ কাটল। রোদ তাঁর গায়ে গড়তে লাগল গরম হ’লে, তাঁর রোজা চোখের অন্ধকার লাল হ’লে উঠল, শরৎ মাটিতে তাঁর হাঁটুর চামড়া ছড়ে” যেতে লাগল, তাঁর কোমর উঠল টুন্ টুন্ করে। তারপর, বনম আর সে ও-ভাবে থাকতে পারছিল না, তখন সে চোখ মেলাল। অতক্ষণ চোখ বুজে থাকবার পর

প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না; তারপর দেখল, দূরে একটা শাদা-কালো গোকার ঝাণ্ডাভাবে লেগে

নাড়াচ্ছে।

“না, হই নি। এবার সে আসন-পিড়ী হ’য়ে বসে” নিলে। “আমি তোমাকে চাই, ঈশ্বর, আমি তোমাকে চাই। তুমি এসো। আমাদের আর কেউ

নেই, শুধু তুমি আছ। মার অশ্রুত তুমি ভালো করে” দাও—ইচ্ছে করলে তো তুমি সবই পার।

আমাকে তুমি আর বসিয়ে রেখো না, বড় রোদ। আমি কিছু খাই নি। কিন্তু তোমার জন্মে এই

জাখে মিছরি এনেছি—। তার বে-হাতে মিছরি টুকরোটা ছিল, সেটা সে সামনের দিকে বাড়িয়ে

দিল—“তুমি কি মিষ্টি ভালোবাস না? এটা তুমি বাও। তোমার জন্মেই এনেছি এটা। আর-কিছু

ছিল না আমাদের ঘরে। ঈশ্বর, তুমি এসো।”

“রোদ চড়তে লাগল; দরদর করে” ছেলোটার

গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, তাঁর মাথা কেটে যাচ্ছে। তবু সেই মিছরি টুকরো বাড়িয়ে দিয়ে সে বসেই

রইল, বসেই রইল। বেগা বাড়ল, রোদ আরো গড়ল। জমি ভেতে উঠছে আগুনের মত, আকাশ থেকে

স্বরে” পড়ছে আগুন।

“ঈশ্বর, আর দেরি করো না, আর আমি থাকতে পারছি নে। বড় রোদ—আর আমার

এমন তপ্তা পেয়েছে! ঈশ্বর, তুমি এত ভালো, তুমি সব-চেয়ে ভালো—তবু তুমি দেরি করছ কেন? তুমি শিগগির এসো, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

আমি তোমার বেশিক্ষণ পরে” রাখব না; তুমি যদি শুধু বল, আমার মা-কে ভালো করে” দেবে, তা’

হ’লেই চলে” যাব। আমার মা-কে তুমি ভালো করে” দাও, ঈশ্বর, ভালো করে” দাও।”

সে চোখ মেলাতেই রোদে তাঁর চোখ যেন স্বলস গেল। সমস্তমির মত খা-বা করছে মাঠ

—চারদিকে একটা কাকপক্ষী নেই। এমন ঝাঁক, এত চুপচাপ—যেন মাঝরাতে অন্ধকারের কালো

রঙ হঠাৎ শাদা হয়ে গেছে। হাওয়া বইছে আগুনের

হাজার মত। ছেলোটার মাথার ভিতরটা যেন কেটে

পড়ছে। সে আর সহ করতে পারছিল না।

“ঈশ্বর, আমার গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে, বড়

বড় গোত হচ্ছে মিছরি টুকরোটা মুখে দেবার। কিন্তু তোমার জন্মে এনেছি, তুমি আগে খাও।

তুমি একটুখানি খেয়ে দাও, ঈশ্বর, না হ’লে আমি যে

থেকে পারছি নে।”

হাত বাড়িয়ে ছেলোটা ব’সে রইল; তাঁর মনে

হ’তে লাগল, কেউ যেন আসছে—শোনো বাচ্ছ

পায়ের হালকা শব্দ। চুপ-চুপে সে আসছে। সে দেখা দেয় চুপ-চুপে, নির্জনে। কাছে আসছে

পায়ের শব্দ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত

গা কাটা দিয়ে উঠল, হঠাৎ সেই গরমের মধ্যে

একটা ঠাণ্ডা মোত যেন বয়ে” গেল তাঁর মেসদও

দিয়ে। আরো কাছে। সে নিচু হ’য়ে তাঁর হাত

থেকে তুলে নিচ্ছে মিছরি টুকরো। টুট করে” সে

চোখ মেলে ফেলল। তাঁর চারদিকে, তাঁর উপরে

আর নিচে—রোদ আর রোদ, আর রোদ।

তখন সে হাত থেকে মিছরি টুকরোটা ফেলে দিয়ে

সেই শব্দ আর গরম মাটির উপর ছ’হাতের মধ্যে মুখ

ঢেকে উপুড় হ’য়ে শুয়ে পড়ল। “না-ই বা তোমার

থোকা পেপেম, ঈশ্বর, আমি তোমায় দেখতে চাই নে।

তুমি শুধু একটু মিছরি খেয়ে যাও—এক কামড়,

একটুকু। আমি নিজে না খেয়ে রেখেছি তোমার

জন্মে—তুমি একটুখানি খাও। তুমি খাচ্ছ না বলে”

আমির বেতে পাচ্ছি নে—তপ্তায় আমি মরে” যাচ্ছি।

তোমার পায়ের পিচ্ছি, ঈশ্বর, তুমি একটু খেয়ে যাও;

তা’ হ’লেই আমি বুঝব, তুমি এসেছিলে, তা’ হ’লেই

বুঝব, মা ভালো হবে। আর কিছু আমি চাই নে।”

“মনে-মনে একথা বলে” ছেলোটা লম্বা হ’য়ে শুয়ে

রইল; রোদে তাঁর সমস্ত শরীর খামা হ’য়ে যেতে

লাগল। যেন একটা মুন্সীয়ে সে রইল পড়ে—আর

তা’র কোনো কষ্ট নেই। ছুঁহর গড়িয়ে গেল; আকাশ



রোদে রোদে জলে' বেতে লাগল, হাওয়া পেল মরে'।  
সমস্ত পৃথিবী যেন সেই ছেলেরাই মত মজ্জিত হ'য়ে  
পড়ে' আছে।

'বেন ঘুম থেকে জেগে উঠে' ছেলেরা দেখল,  
তাঁর সেই মিছরি টুকরোটাকে লাঞ্ছনিক পিপড়ে  
আক্রমণ করেছে। হঠাৎ এক লাথি মেরে সে  
সেটাকে পাঠিয়ে দিল অনেক দূরে—কতগুলো পিপড়ে  
ছড়িয়ে পড়ে' গেল। তারপর হনু হনু করে' গিরে  
এল বাড়ি।

'এসে দেখল, তাঁর মা চোখ বুজে শুয়ে আছেন।  
কাছে গিয়ে সে তাঁর গায়ে হাত রাখল। তিনি চোখ  
মেললেন না। আস্তে সে ডাবল, "মা"। মা চোখ  
মেললেন না। একটু জোরে আবার ডাবল, "মা,  
মাপো"। তবু তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। তখন  
সে তাঁর গুঁতলি ধরে' নাড়া দিল। তাঁর মুখটা  
হাঁ হয়ে গেল—আর বুজল না। তা' দেখে ছেলেরা  
একটু ভয় পেয়ে গেল। চাঁৎকার করে' ডাকতে  
লাগল "মা, মা, মাপো"। তাঁর গলা প্রায় ভিঁড়ে  
গেল, কিন্তু মা কোনো জবাব দিলেন না। তখন সে  
মায়ের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে' আকুল হ'য়ে কাঁদতে  
লাগল।

'চাঁৎকার শুনে পাড়া-পড়শীরা সবাই ছুটে এল।  
"আহা কী মরাটাই মরল গো—যুখে এক দৌঁটা জল  
দিতে কেউ ছিল না।" "ছেলেটার এখন কী দশা  
হবে!" "যে কষ্ট পাচ্ছিল, বেচেছে।" চপলা-মাসীমা  
আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "এই, তুই অত  
কাদিসু নে—তোর মা-কে ঈশ্বর ডেকে নিয়েছেন তাঁর  
গায়ে।"

'হঠাৎ আমার সব কান্না বন্ধ হ'য়ে গেল। মুখ  
তুলে আমি প্রাণপণে চাঁৎকার করে' বলতে লাগলুম,  
"মিথো কথা, মিথো কথা! চোর! চোর! ঈশ্বর  
চোর, ঈশ্বর ঠক—মিথো, মিথো—"। ভিতর থেকে  
প্রকাণ্ড ডেউয়ের মত কান্না ঠেলা দিয়ে উঠে আমার  
বাকি কথা আটকে দিল।

'ভান্ডারবার, অরটা বোধ হয় বাড়ল—একটু  
দেখবেন? এই জেরেই কি আমি মরব, আপনার  
মনে হয়? আচ্ছা, সত্যি করে' বলুন, কেন ওরা  
আমাকে মারলে? আমি বেঁচে থাকলে কী ক্ষতি হ'ত  
ওদের? আমি যে বাচতে চাই—আমার সেই ছেঁটা  
কিছু না? আপনাকে বলছি, আপনি কি ওদেরকে  
আমায় মারতে দেবেন? আপনিও কি আমাকে ক্ষমা  
করতে পারেন না? ঈশ্বর, ঈশ্বর...'

## পদব্রজে ভারতবর্ষ

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

'কানাই' পেরিয়ে ঘণ্টার চার মাইল হিসাবে পথ  
চলতে লাগলুম। আটদশ মাইল যাই, আবার একটু  
বিশ্রাম করি। বোঝাটা বেশীকণ রাখা কষ্টকর হয়,  
ক্লান্ত হ'লে ভার যেন বেড়ে যায়, চামড়ার বান্দন ছুঁটা  
শরীরের মধ্যে কেটে বসতে থাকে।

পথিপার্শ্বের ছোট-খাট দোকানের কোনটাকে জল  
পান ক'রে ও সময়মত কিছু কিছু খেয়ে নিয়ে, কোথাও  
বা গাছের নীচে একটু আধটু জিড়িয়ে, পথ অতিক্রম  
করতে লাগলুম। কখনও ক্ষেতের বুক ভেদ ক'রে,  
কখনও ছোট-ছোট পল্লীর মধ্য বা পার্শ্ব দিয়ে ঢলে,  
আবার সেই 'কানাই' নদীটি পার হ'তে হ'ল; এবার  
কিন্তু খড়পা হাতে নিয়ে হেঁটে নদী পার হ'লুম; কেননা,  
জল ছিল কম। সন্ধ্যা সাতটার পঁচিশ মাইল পথ হেঁটে  
মেদিনীপুর পৌঁছলুম; এবং সহরের বৃক্ক্ষ-স্বল-বাগানের  
এক ব্রাহ্মণের হোটেলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। সন্ধ্যার  
পর থেকেই এই পথিক-বিরল অটোনো পথটা ভয়ে ভয়ে  
অতিক্রম করতে হ'লো—অন্ধকারের পথের মাঝখানে  
সরু চক্কে দাগ বারবার নজরে প'ড়ে সর্পের স্তম্ভ-  
প্রস্থান বিজ্ঞপিত করেছে—স্বোপ-কাজের অন্তরাল  
থেকে বিচিত্র নিশান-শব্দও আচম্ভ্য কানে বেজে  
মনটাকে সন্নগ্ন ক'রে তুলেছে। এ অবস্থায়, শুধু তাঁরই  
লোহাই পাড়তে পাড়তে চলে এসেছি, বার কথা বিপদে  
না পড়লে মাহুর ভাবে না।

হাতপা ধুয়ে হোটেলের বাগান ও পরিচয় দেওয়ার  
পর শয়নের ব্যবস্থা করা গেল। হোটেলওয়ালার বললেন,  
'এক আনা চৌকী-ভাড়া লাগবে'। যখন গ্রাম থেকে  
আমরা সেহের কল-কল্লার যত যানি, সমগ্র বৃক্ক্ষ-এক-  
বোণে আক্রমণ করে। শীত ব'লে পথে যান করা

প্রায়ই সম্ভব হয় না, বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা একটু  
চাঙ্গা হয় বটে, কিন্তু আবার পথ চলার ফের পূর্ণা-  
বহাতেই ফিরে আসে। ভাবি, এমন কি শেষ পর্যন্ত  
চলবে? রাতে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প-প্রশ্নে জানা গেল  
যে, প্রায় মাসখানেক আগে ললিতমোহন গান্ধী নামে  
এক ভ্রমলোক এই হোটলেই এসেছিলেন, আর তিনিও  
নাকি পায়ের হেঁটেই যুবুছেন; বাড়ী—কলকাতার  
বাসবাজারে। কতকটা আশস্ত হওয়া গেল; এটা  
যখন টুরিষ্টেরই আচ্ছা হ'তে চলছে, তখন অপরিচিত  
স্থান হ'লেও ভয় পাবার কিছু নেই।

হোটেল বলতে যা' বোঝায়, এ অবস্থায় সে' হোটেল  
নয়; এ হচ্ছে শুধু বাবার ও রী'বার ঘর; মালিক থাকেন  
এক পাশে, সকলের আহ্বারাদির পর তবে হয় তাঁর  
শোবার স্থান। যথাসময়ে কখন-চানর নিয়ে চৌকী  
দখল করা গেল। ব্যতির করে 'দশান-কেরত' মাথার  
বাগিন্সও একটা দিলেন।

সকালে কাপড়-পরা সমেত, মেদিনীপুর থানায়  
যাওয়া গেল। ভারতের ঘটনাগুলো ক্রমে যে ভীষণ  
আকার ধারণ করছিল তা'তে শোশোষোণের ভয় ছিল।  
যা' হ'ক দারোগা প্রভৃতি সকলে দেখে বললেন, "না,  
আপনার কোন ভাবনা নেই; তবে পুণ্ডিমে দেখা করা  
মন্দ না হ'লেও, না করাই ভাল"। কথাটার বুদ্ধি  
উপলব্ধি ক'রে ফিরে এলুম। রানের কোন ব্যবস্থা  
হোটলে ছিল না; কাছে একটা বারান জলের পুকুর,  
যদিও অশিক্ষিতেরা ব্যবহার করতে ছাড়ে না। কিছু  
দূরে গ্রামের মধ্যে কতকটা জল ভাল। এক পুকুর  
গিয়ে ক্রমাল, গেছি, কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার ক'রে,  
থানাতো হোটেল থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ  
মেদিনীপুর 'বার-লাইব্রেরী'তে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শ্রীমুখ





উপস্রাজ্ঞাণ মাইতি মহাশয়কে পরিচয় নিলুম। আদালত-গৃহ গ্রামের প্রান্তে; এখান হ'তে দুই মাইল দূরে ছোট-ছোট পাড়া আছে; বর্ষাকালীন দৃশ্য নাকি খুব সুন্দর। পাড়া-তলে ঘর-বাড়ী আছে, আর সেই সব ঘর-বাড়ী নাকি বিরাট রাজার পোশালায় লসাবাশে। প্রবাদ—পাড়াতে কেউ বাস করলে তার গ্রাম নষ্ট হয়। মেদিনীপুর হ'তে দুই মাইল দূরে 'কর্ণপড়'; রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর ভূপ্রাধিকৃত পুরাতন ঘর-বাড়ীও গোপ-পাহাড়ের তলদেশে আছে। 'গোপনন্দিনী' নৃদিকও আছেন। মেদিনীপুর রেল-ষ্টেশনের কাছে 'কঁকরির কূপ' নামে কূয়া আছে; জল নাকি স্বাস্থ্যকর এবং বাবার করলেও ফুরায় না। গোপ পাহাড়ে শাল-পাতা সঙ্গ্রহকারীরাই বেশী ব্যাভারত করে।

বাবার অত্যন্ত মধুর শ্রীচন্দ্র স্বাময় ব্যানাজী আমার সম্বন্ধ-পথে সহায়তা করবার জ্ঞান সন্দেহে উদ্ভেলিত করেছিলেন, ফলে পরদিন আমার আশা কলবতী হয়েছিল। সাহায্য পাবার আশায় সঙ্কীর্ণ মন থেকে দুই টাকার ক্রেপ-সোল জুতা কেনা গেল; কাশ, খড়গা পায়ে পথ চলা ক্রমেই অচল হ'য়ে পড়েছিল। স্বগ্রামে চিঠি লিখলুম—অবস্থানের কথা, পথের দূরত্ব ও ভ্রমণের সঙ্কল্প বিবরণ দিয়ে।

আরও কতকগুলি ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে সাফল্য করা গুলিছিল মনে হ'ল না। নিজেকে বেশী প্রচার করবার ইচ্ছা ছিল না তা বটেই, তা' ছাড়া সামর্থ্য-হীন হ'য়ে কিরে তেতে হবার ভাবনাও অল্প ছিল না। বিশেষতঃ, অপরিচিত হামের দূরত্ব বেশ থেকে বত বেশী হয়, ততই ভয়ে ও ভাবনায় মনের বল কমে থাকে।

আজ আদালতে গিয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা হ'ল। হোটেল-খরচা জুগিয়ে হাতে কিছু অতিরিক্ত থাকবে; তারপর খরচপত্রের মতন জন-বহুল জায়গা থেকেও কিছু না কিছু সংগ্রহীত হ'তে পারবে। মন এখন বিমর্ষ হয়, তখন এদনি ক'রেই আশার ভ্রম বাকী তাকে ভরসা জোগায়। পায়ের যা ও শরীর অনেকটা

আশাভঞ্জন; অজ্ঞ কাছ না থাকায়, মানচিত্রখানা গুলে পথের সন্ধান নিতে ব'লে সেলুম।

যতই দেখি ততই প্রাণ থেকে আশার বাতি নিবে' বেগে থাকে! এখনও বাংলা দেশ ও ভাষার রাজ্যে র'য়ে গিয়েছি; তবু উজারপের পার্শ্বকাটুতেই মনে হচ্ছে, ত্রিপুরার দেশ যেন কতদূরে কোলে এসেছি।

২২ই ডিসেম্বর চারটাটা হোটেলের নোনা চুকিয়ে জুতা ও মোজা প'রে রওনা হ'লুম খড়গপুরের দিকে। খানিক পথ এসেই আবার সেই 'কঁসাই' নদী; এবারও নৌকার ব্যবস্থা; নদীতে বাঁধ দেওয়ায় জল ছিল বেশ।

পায়ের কড়ি দিয়ে দিয়ে আবার পা চালালুম। সন্ধ্যার পূর্বেই ছয় মাইল পথ এসে, 'খড়গপুর-পুত্রী'র পথের বাঘ এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিলুম। পথে আসতে, পার্শ্বতা প্রদেশের মত স্থানে-স্থানে পাথর চোখে পড়ে। পথটী প্রায় নির্জন; রেল-লাইন পার হ'য়ে, ষ্টেশনকে ডানদিকে রেখে, অল্প-সল্প দোকান-বাজারের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেছে উড়িয়ার দিকে। ধর্মশালায় প্রথমে ঘর পাওয়ায় বাধা বটে; পরে এক মোকাদ্দারের পরামর্শে কোন মেসের অধিকারী শ্রামসি ও রামসি বাবুর সৌজন্তে ঐ ঘর পাওয়া যায়। তালচাচি না থাকায় এক চৌকীপায়ের শরৎপান হ'তে হয়, এবং বাবার ব্যবস্থা হয় ঐ মেসেই। মেসটী জনকতক ছাড়াই তৈরি হয়েছে। প্রকৃত সহর এখান থেকে কিছু দূরে। ষ্টেশন পার হ'য়ে গেলেই একদায়ে ইউরোপীয়, অজ্ঞপারে ভারতবর্ষীয়দিগের বাস; বেশ জনকালো সহর, ভদ্রলোকের বাসও বপেট। কাছেই যখন বাঙ্গালী-সব 'দুর্গাবাড়ী' বাই তখন মনে অনেক আশাই জাগতে লাগল। কয়েকদিন বিশ্রামের পর মাত্র ছ'মাইল হাঁটায় আজ আর স্রাস্তি ছিল না; বেশ উজ্জই সহরে এসে 'দুর্গাবাড়ী'র পথ ছিজাসা করলুম; হাতে ছিল খাতা, 'রোড-ম্যাপ' ও ব্যাগ। পৌঁছে দেখা গেল, দ্রাবতী বেশ সুন্দর ও সুসজ্জিত। কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়ে ও উদ্দেশ্য জানিয়েও যখন মাতঙ্গরদের কোন উত্সাহই পেলুম না, তখন ক্রমশঃ

প্রত্যাবর্তন-পথে রেলের ভারতীয় ক্লাবেও একটা 'ছ' দিনম; এখানেও ঐ ভাল টোকাই সার হ'ল।

রাত্রি প্রায় দশটা দারুণ চুপ্চুপ নিয়ে মেসে ফিরে এলুম। আহার শেষ হ'লে, পরমা দিতে বাগ্গায় গ্রামসি বাবু প্রাত্যহিক চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে বললেন, 'এখানে সকলেই গরীব ছাত্র, তা'রা অজ সাহায্য কিছু না করলে পারলেও এখানকার খরচা বাঁচিয়ে দিতে চায়।'

এই আশ্চর্য বদান্ততার জ্ঞাত ধন্যবাদ দিয়ে ধর্মশালায় ফিরে এলুম।

পরদিন শনিবার প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে শীতের প্রেক্ষাপ কিছু কমলে রামসি ও গ্রামসি বাবুর নিমন্ত্রণ বন্ধা করার পর পথের সংবাদ জেনে রওনা হ'লুম। এঁদের জন্মভূমি পাঠাবে হ'লেও ত্রিপুরা বঙ্গের বাঘ বাংলায় থেকে বড়ভায়ায় বেশ অধিকার লাভ করেছেন। এঁদের মুখে কাণির সংক্ষেপ অনেক কথা শোনা গেল; আর জানা গেল যে, প্রথমে এঁরা আমাকেও ঐ 'স্বরাষ্ট্রা দল'ের লোক মনে করেছিলেন। 'স্বরাষ্ট্রা দল'কে সাহায্য করলে অনেকেই ভয় পান। এবার যে-পথ ধরলুম সে পথে মোটর ও বাস-মার্ডিন আছে; আর ঐ পথই কাঁধি গিয়েছে। আমারই মত পোষাক অনেক নাকি সে দিকে পূর্বে যাত্রা করেছেন।

কুড়ি মাইল দূরে বেলাদা গ্রাম; পথের ধারে হোটেল আছে; মন্দির-সংলগ্ন ধর্মশালাও আছে, শুনে এসেছি। পথ চলতে লাগলুম বেশ জোরেরই; ইচ্ছা—'বাবার' ড্রাইভাররা আমার হাঁটার তারিক করুক, আর আমি যে হেঁটে যাচ্ছি তাও প্রশংসা হ'ক। সঙ্গে ছিল চা, কিন্তু 'ধারমোটা' ছিল বোখার মধ্যে; চামড়ার বোলা আধারটী ভুলশাক কেনা হয়নি।

একে একে বাজার, দোকান প্রভৃতি পার হ'য়ে ক্রমে নির্জন পথে এসে পড়লুম। কখনও ছ'একজন পথিক, ছ'একজন মোটর, গরুর গাড়ী, পাশের থানক্ষেতে ছ'একজন কৃষকের ও পথিপার্শ্বের বাগানে

ছ'একটা লোকের কণ্ঠস্বর, অথবা গ্রামা কুটারে কদাচিৎ কার্য্যত নরনারীর সাড়া পাওয়া যাকিল।

কাঁধি বাবার একটা পথ পার হ'য়ে চলেছি আপন মনে; ভাবনাই ছিল সাথী। একবার দাঁড়িয়ে দেখে নিলুম সেই দেশ-বিক্রত কাঁধি বাবার পথ—যে-পথে চলে 'আমারই' মত কত উত্সাহী প্রাণ নিরুৎসাহে ফিরে এয়েছে; যদি আমাকেও ফিরে যেতে হয়? যদি ফিরিয়ে দেয়—পথ থেকে সহরের কোন নূতনতর বিপত্তি? ভাবছি আর চলেছি।

প্রায় নয় মাইল পথ চলে আসার পর দেখি, ছ'জন মাছ—একজন মাইকেলে ও অপরজন হিন্দু-স্থানী পায়েল—আমারই নিকে আসছেন; ঐ কিছু আসে আমার গন্তব্য পথের দিক থেকে খড়গপুরের দিকে গিয়েছিলেন। আমার নাগাল ধরার পর তাঁদের পতি মধুর হওয়ায় ভদ্রলোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'বেলদার আগে কোন দোকান বা গ্রাম আছে কি?' প্রতিপ্রশ্ন হ'ল—'আপনি কে?' প্রকৃত্যেই যখন 'বেলদার' লোক মনে করেছিলেন। 'স্বরাষ্ট্রা দল'কে সাহায্য করলে অনেকেই ভয় পান। এবার যে-পথ ধরলুম সে পথে মোটর ও বাস-মার্ডিন আছে; আর ঐ পথই কাঁধি গিয়েছে। আমারই মত পোষাক অনেক নাকি সে দিকে পূর্বে যাত্রা করেছেন।

কুড়ি মাইল দূরে বেলাদা গ্রাম; পথের ধারে হোটেল আছে; মন্দির-সংলগ্ন ধর্মশালাও আছে, শুনে এসেছি। পথ চলতে লাগলুম বেশ জোরেরই; ইচ্ছা—'বাবার' ড্রাইভাররা আমার হাঁটার তারিক করুক, আর আমি যে হেঁটে যাচ্ছি তাও প্রশংসা হ'ক। সঙ্গে ছিল চা, কিন্তু 'ধারমোটা' ছিল বোখার মধ্যে; চামড়ার বোলা আধারটী ভুলশাক কেনা হয়নি।

মোট প্রায় তিন মাইল আসার পর 'নাগুরগড়' গ্রামের থানা পথের পাশেই পাওয়া গেল, এবং সেই ভদ্রলোকটী আমার থানায় নিয়ে এসে বললেন— 'সাবভিভিনালাল ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট মোটরে যেতে আপনাকে পথে দেখে পরিচয় নিতে বলে গেছেন।'



মুখের কথায় বিবাহ-স্থাপন হয় না বলেই বাজার প্রাক্কালে সংগৃহীত হয়েছিল 'প্রজ্ঞা'। সরকারের অসহমোদিত সেই 'অঙ্গ' প্রয়োগ করতই জয় হ'ল; এমন কি খানাহারের ব্যবস্থাও চলতে লাগল। যে ছোটবাকী আমরা গ্রেপ্তার করেছিলেন, তিনি বড়-বাংকে সঙ্গে ক'রে উপস্থিত হ'তেই বললুম—'ঠকে সেলেন, কেবল বোঝাই বাড়ল'। বড়বাবু যেসে উত্তর দিলেন—'জ্বললে আপনাদের মত নিরীহ অতিথি পেলে আমাদের হুবিধাই বেশী'।

বলতে না বলতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মোটার কিয়ে বাবার মুখে পথে এসে পাঁড়া'ল এবং সকলেই সেই দিকে ছুটলেন। আমার কথাই হচ্ছে বুকে', রক্ষাকবচ নিয়ে অগ্রসর হ'লুম; সেগুলি দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন—'মোটে; আপনাবার ভ্রমণের পক্ষে এইগুলিই যথেষ্ট। কেন আপনি বড়পুত্রে আমার বাড়ী যান নি? যখন সাধারণের সাহায্য নিচ্ছেন, তখন আমারও কিছু দেবার অবিকার ছিল'।

দেখা গেল, গোড়া থেকেই এটাই ভুল হ'য়ে আছে; প্রতি হামের উচ্চপদস্থ ভ্রমলোকের অথবা ব্রাহ্মসঙ্ঘাচারীর পদ ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপকার করে। স্থির করা গেল—অতপণর এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাধা-কব-এবং গাঁরা সাহায্য করবেন তাঁদের সেই বাতায় রক্ষা ক'রে চললেই এক ঢিলে দুই পাখী মারার কাজ হবে। এ ধারণা কিন্তু পরিবর্তন কর্তে হরোলে মইসুরে গিয়ে।

আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল কাছেই, পোটামাটার পাছাড়া মহাশয়ের গৃহে। ইনি উৎকলী গ্রাম—বেশ ভ্রমলোক; সবিনয়ে বললেন—'তাড়াতাড়ি বা'

হয় ছটী যান; সময় অভাবে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কর্তে পারি নি।' খেতে বসিয়ে, তাঁর স্ত্রী অনেক প্রশ্ন করলেন—বিবাহিত কিনা? পিতামাতা ও বাড়ীর সবাদ? হুহু ক'রে বললেন—'মাকে কষ্ট দিলে, এমন ছেলে পথে-পথে ঘুরে প' বলে' বললুম—'মায়েদের এই দুর্ভাগ্যই বোধ করি ভারত-সন্তানদের এই দুর্ভাগ্য ক'রে দিয়েছে। অথচ পুরাকালে ঐ মায়েদের উৎসাহ ছেলেরদের কতই সঙ্কটজনক কাজে ব্রতী করেছে—আশীর্বাদ করন যেন উদ্বেগ সফল ক'রে কিতে পারি।' ববীয়সীর মাতৃদয় ঐ সামাজ্য কথাতোলে জল হ'য়ে গেল, এবং তিনি উজ্জিসিত শুভেচ্ছায় আমার সিলক ক'রে দিলেন।

আর আট মাইল হাটার পর, পূর্ব সন্ধ্যায়, বেলদা গ্রামে এসে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ টি, এন, দে মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করা গিয়েছিল। ১৪ই রবিবার প্রাতে তাঁর কাছ থেকে কিছু সাহায্য ও পরবর্তী গ্রামের অল্প এক ডাক্তারের টিকানা চেয়ে নিয়ে পা চালালুম। বারো মাইল পথ অতিক্রম ক'রে 'পাঁতন' গ্রামের ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী এসে, সম্বন্ধেওয়া এক পুত্রবিরহীত রান ও পরম পরিতোষ পূর্ণক আহার সমাধা করা গেল।

ডাক্তার বাবু প্রবীণ ও চিন্মণ্য ব্যক্তি—চল-আসা পথটার সকল কথা গুটিয়ে গুটিয়ে জেনে নিলেন এবং একদিন থেকে বাবারও আমরণ জ্ঞানলেন। তা' সম্ভব নয় বলায়, অগত্যা গোল মাইল দূরবর্তী 'জলধর'র ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন রায় মহাশয়ের টিকানা দিয়ে বিদায় দিলেন।

(ক্রমশঃ)



## রবীন্দ্রনাথের লুপ্তকাব্য

শ্রীচরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভগ্নহৃদয়'

রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর বয়সেই ছ'খানি কাব্য 'রনকুল' ও 'কবিকাহিনী' রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে প্রথমবার বিলাতে যান।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিতেই 'ভগ্নহৃদয়' নামে একখানি কাব্য-নাট্যিকার রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহা বাংলা ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকার কাষ্ঠিক হইতে মান সংখ্যায় ছাপা হয়, এবং পরে ১৮০৩ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বা বাংলা ১২৮৮ সালে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা আর ভিত্তীয় বার মুদ্রিত হয় নাই, কেবল ইহার কোনো কোনো অংশ স্বতন্ত্র গীতিকবিতার আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ঐকেশ্বরক' পর্যায়ে ছাপা হইয়াছিল; এখন তাহাও আর ছাপা হয় না। এই নাট্য-কাব্য রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল উনিশ বৎসর মাত্র।

এই কাব্যের পাত্র-পাত্তোপায়—কবি, অনিল, মুরলা—অনিলের ভগিনী ও কবির বাবা-সহচরী, ললিতা—অনিলের প্রণয়িনী, নলিনী—এক চণ্ডাল-স্বভাব কুমারী, চণ্ডালা—মুরলার সখী, লীলা, স্বকৃতি, মাধবী প্রভৃতি—নলিনীর সখীগণ, হরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতি—নলিনীর বিবাহ-প্রার্থী বা প্রণয়কাক্সলী।

কাব্যখানি চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। প্রথমই বনের দৃশ্য। বনের মধ্যে মুরলা একাকিনী বসিয়া আছে, চণ্ডালা তাহাকে গুঁজিতে সেখানে আসিয়া বলিল—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারী?

জটিল-মস্তক বট চারিদিকে কুঁকি!

জয়েরকট রবিকর সাহসে করিয়া ডর  
অতি সম্ভরণে যেন মারিতেছে উকি।

চণ্ডালা মুরলাকে বলিল—'মনে আছে, অনিলের ছলশয্যা আছ?' ইহার পরে সে অনিল ও ললিতার পূর্ণরূপের কাহিনী বিবৃত করিল, কেনন করিয়া একদিন সে লুকাইয়া থাকিয়া অনিল ও ললিতার মিলন দেখিয়াছিল এবং তাহাদের সমুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুরলা বলিল—'আহা, কেন বাবা নিতে গেলি তাহাদের কাছে?' ইহার উত্তরে চণ্ডালা বলিল—'বাবা না পাইলে সখী হুখেতে কি স্বপ্ন আছে?' ইহার পরে কথায় কথায় চণ্ডালা মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কোন্ ব্যক্তি বাহাকে ভালোবাসিয়া মুরলা দিবারাঙ্গি এমন বিজনে চিত্তা করে?

মুরলা বলিল—সে ব্যক্তি উচ্চ, আর আমি তুচ্ছ, হুস্তরা তাহার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহস পাই না।

ভালবাসি; শুধায়ো না করে ভালবাসি।  
সে নাম কেমনে সখি, কহিব প্রকাশি!  
আমি তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,  
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!

হৃদ ওই হৃদমট পৃথিবী-কাননে  
আকাশের ভারকরে পুঞ্জ মনে মনে—  
দিন দিন পুঞ্জ করি' শুকাবে পড়ে সে করি',  
আজ্ঞায় নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার।—

তেমনি পুঞ্জিয়া তারে এ প্রাণ বাইবে হা হা,  
তুও লুকানো রবে একথা আমার!

চণ্ডালা বলিল—মুরলার এ প্রণয় স্ফটিকাঙ্ক।  
প্রণয়িনী তো প্রণয়ীর নাম জপমালা করে, তাহার  
রসনার খেলনা করে। মুরলা যদি তাহার প্রণয়ীর



নাম প্রকাশ করিয়া বলে তাহা হইলে তাহার সখী  
চপলা তাহাকে অবিরাম তাহার নাম গান করিয়া  
গুনাইবে, আর—

ফুলের মালায় কুহুম-আখরে  
লিখি' দিব সেই নাম;  
গলায় পরিবি—মাথায় পরিবি,  
তাহারি বলয় ঝাঁকন করিবি,  
ছন্দ-উপরে বসনে ধরিবি

নামের কুহুম-নাম!

তখন মুরলা দূরে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া কবিকে  
দেখাইয়া দিল।

কবি ছই সখীর নিকটে আসিল এবং মুরলাকে  
বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিল এবং চপলা প্রস্থান  
করিল। কবি মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কোনো  
যুবাকে কি ভালোবাসিয়াছে, বাহার জন্ম সে এমন  
নিভৃত চিন্তামতী হইয়া থাকে? কে সেই যুবা?  
কবির প্রশ্ন শুনিয়া মুরলা কাতর হইল এই ভাবিয়া  
যে, কবি তাহার ছন্দরের গুঢ় তথ্য এখনো ধরিতে  
পারে নাই। কবিও মুরলাকে বলিল—তাহার  
অন্তরে যেন কিদের অভাববোধ তাহাকে পীড়িত  
করিতেছে, সে কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,  
মহা-উজ্জ্বলের সিদ্ধ বন্ধ এই 'জ্বল কারাপারে';  
মনের এ বন্ধ যোত দেখানা কবির বিদারিত।  
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্রাতিত।  
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের জীভাংশ,  
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল,  
চৌদিকে রিগন্ত আসি' রবিত না অনন্ত আকাশ,  
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,  
হরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির গুণ পান করি'  
আনন্দ-সখীত-স্রোতে কেলিত গো শূন্যত ভরি'।

কবি-মনের বিখণ্ডীত যুবা কবিকে বিবল করিয়া  
তুলিয়াছে। কে এই অনন্ত যুবা নিবারণ করিতে

পারিবে? মুরলা পারে, কিন্তু সে তো তাহার প্রাণের  
অপরিস্রব প্রণয় কবিকে নিবেদন করিতে সাহস পায়  
না। সে গান গাহিয়া তাহার শৈশব-সহচর কবিকে  
সামান্য দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—সেই গানের ভিতর  
দিখা কাব্যের পরিণামের পূর্ণাভাস দেওয়া হইয়াছে—

কতদিন একসাথে ছিহ যুগ্মধারে,  
তবু জ্ঞানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে।

অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,  
হেলেনবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,  
লইয়া দলিত মন হইহু প্রবাসী,  
তখন জ্ঞানিহু সখি কত ভালোবাসি।

দ্বিতীয় সর্গের স্থান জীভাকানন, এবং ব্যক্তি  
নলিনী ও তাহার সখীগণ। নলিনী কৃষ্ণবর্ণ  
পরিহেত। নলিনী তাহার পোষা জামা-পাখীকে  
গান গেয়ে গেয়ে তালি দিয়ে' দিয়ে' নাচাইত  
লাগিল—'নাচ জামা, তালে তালে!' এই কবিটি  
প্রথম-প্রস্তাবলীর 'কৈশোর' বিভাগে ছাপা হইয়াছিল,  
পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ বিবাহ-সভায় নলিনীর ভক্ত অঙ্কচরো সকলে  
আসিবে, তাহাদের মনোহরণের জন্ম নলিনীর বেশভূষা  
শোভন ও শোভন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের  
কাহাকেও নলিনীর পছন্দ নয়, সে সখীদের বলিল—

হেথা আয় তোরা, দে সখি সাজয়ে  
জামা পাখীটির মোর।  
ছোট ফুল বসে ছোট চাঁদা,  
বেলগুড়ি-মালা কেমন মানায়  
সুগন্ধে গলায় ওর!

তৃতীয় সর্গে মুরলা ও তাহার দাদা অনিলের  
কথাবার্তা বর্ণিত হইয়াছে। মুরলা এক দুর্বল মুহূর্তে  
তাহার প্রাণের গোপন প্রণয়ের কথা তাহার দাদার  
নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনিল কবিকে  
মুরলার প্রতি উদাসীন দেখিয়া ও ভগিনীর বিষমতা

দেখিয়া কবিকে নিন্দা করিতে উজ্জত হইতেছিল,  
কিন্তু মুরলা তাহাকে বাধা দিল, সে কবির নিন্দা  
কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

চতুর্থ সর্গে কবি একাকী গান গাহিয়া দিহিতেছে—

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে বাই,  
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই  
লতা-পাতা-শেফা জানালা-মাঝারে  
একটি মধুর মুখ।

চারদিকে তার ফুটে আছে ফুল,  
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে তুল,  
হয়েকটি শাখা কপোল ছুঁইয়া,  
হয়েকটি আছে কম্পোলে হুইয়া,  
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়  
চুমিয়া আছে চিবুক!

পর পর ছোট গানে কবি সেই মনোরম-মুখ-ধারিণী  
রমণীর প্রতি নিজের প্রেমের কথা ব্যক্ত করিল,  
এবং অবশেষে তাহার নামও বলিয়া ফেলিল—

শুনছি—শুনছি কি নাম তাহার—

শুনছি—শুনছি তাহা।

নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—

কেমন মধুর আহা!

নলিনীর মতো ছন্দ তাহার

নলিনী যাহার নাম!

পঞ্চম সর্গের স্থান কানন, কাল রাত্রি, পাত-পাতী  
অনিল, ললিতা, নলিনী, নলিনীর সখীগণ, বিজয়, হরেশ,  
বিনোদ, প্রমোদ, অশোক, নীরদ। কাননের এক  
পাশে অনিল তাহার নব-পরিণীতা যু বালিতাকে  
গান করিয়া বলিতেছে—

'বউ! কথা কও!'

অনিল তাহার. নবোঢ়া লজ্জিতা প্রণয়িনীকে কথা  
কহাইবার জন্ম কত সাধা সাধনা করিল, কিন্তু

লাজমতী ললিতা কিছুতেই তাহার প্রাণের প্রণয়  
প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। বিনোদা ললিতা  
স্বখাভিষেকের অসহনীয়তার কাদিয়া ফেলিল।

কাননের অপর পার্শ্বে নলিনী অভিমান করিয়া  
বিজয়কে তাহার ভালোবাসার অগভীরতার জন্ম  
ভৎসনা করিতেছিল, কেবল মুখে ভালোবাসি বলিলে  
ভালোবাসার ও রমণী-স্বপ্নের অপমান করা হয়।  
যদি প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় দিতে হয়, তবে  
'স্বপ্নের অন্ধ ফেল' দিবানিশি পদতলে।' ইহার  
পরে নলিনী বিজয়কে একটি কামিনী-ফুলের গুচ্ছ  
তুলিয়া দিতে বলিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—  
'কি পাইব পুরস্কার?' নলিনী বলিল—

একটি কুহুম, যদি হাঁই পায়

আমার অলক-মাঝে,

একটি কুহুম হয়ে পড়ে যদি

এ মোর কম্পোল 'পরে,

একটি পাপড়ি ছিঁড়ে পড়ে পারে

শুধু মুহূর্তের তরে,

তুলে যদি রাখি একটি কুহুম

রচিত এ কণ্ঠহার!

তার চেয়ে বলা' আছে ভাগ্যে তব

আর কিবা পুরস্কার!

বিজয় ফুল তুলিয়া দিল। নলিনী সেই ফুল পদদলিত  
করিয়া বলিল—

'অশুগ্রহ করি' এ চরণ দিয়া

ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,

এই তব পুরস্কার!

বিজয় বলিয়া উঠিল—

আহা! আমি যদি হেতম সজনি,

একটি কুহুম ওর,—

'ওই পদতলে দলিত হইয়া

ভাঙিতাম দেহ মোর।



নলিনী বিজয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া  
নিষ্ক মনে গাছের দিকে চাহিয়া ফুলগুলিকে সম্বোধন  
করিয়া গান করিতে লাগিল। দূর হইতে অশোক,  
শ্রবণ, বিনোদ, নীরদ, প্রমোদ বিজয়কে নলিনীর  
নিকটে দেখিয়া তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া  
উঠিত লাগিল। প্রমোদ নলিনীর নিকটে গিয়া  
গান ধরিল—

‘আঁধার শাখা উজল করি’  
হরিত পাতা খোঁচা পরি’  
বিজন বনে মাগী-বালা  
আঁহিস কেন ছুটয়া ?

নলিনীও গান গাহিয়া ইহার উত্তর দিল—

‘আঁধার বনে আঁহি গো ভালো,  
অদিক আঁশা রাখি না।  
তোদের চিনি চতুর অলি,  
মন-ভুলানো বচন বলি’  
ফুলের মন হরিয়া ল’য়ে  
রাখিয়া যাস যাতনা !

নলিনী প্রমোদকে পরিচায়ক করিয়া বিজয়ের  
কাছে গেল। বিজয় প্রত্যাখ্যানের ভয়ে নলিনীর  
কাছে যায় না, কিন্তু নলিনী তা চায় প্রণয়ভিলাষী  
পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করিবার আনন্দ। তাই সে  
বাতিয়া গিয়া বিজয়কে তাহার প্রণয়লভ বচনে  
প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল—

এ মুখ আমার, এ রূপ আমার  
পূর্য্যান হইয়াছে ?  
ভালো কথা, ভালো, প্রেম না থাকিলে  
আসিতে নাই কি কাছে ?

কিন্তু বিজয় নলিনীর চপল চরিত্রের পরিচয়  
পাইয়াছিল, সে আর কিছুতেই নলিনীর নিকটে  
ধরা দিল না।

ষষ্ঠ সর্গে পুনরায় কবি ও মুরলার কথোপকথন।  
কবি মুরলার মুখ রান দেখিয়া তাহার মানিমার কারণ  
জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে কিছুতেই প্রকৃত কারণ  
অনুভব করে না; কবির কথায় মুরলাকে মুগ্ধ  
করে। কবি মুরলাকে বলিল—‘আমার একটা পোশাক  
কথা আজ আমি তোমাকে বলিব।’ মুরলা ইহা  
শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কবি সেই  
পোশাক কথা মুরলাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিল—  
‘শুভ্র এ ছন্দ মোর ভালোবাসিয়াছে।’ মুরলা এই  
কথা শুনিয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

ভালোবাসে ? কারে কবি ? কারে কথা ? কারে ?  
কবি উত্তর করিল—

‘মধুর নলিনী সম নলিনীবালারে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মুরলার বুক ভাঙ্গিয়া  
গেল’ তথাপি সে মনের ক্রেশ গোপন রাখিয়া  
দেবতার কাছে তাহার বাল্যসখাকে স্বামী করিবার  
জন্ত প্রার্থনা জানাইল। সে আবার কবিকে জিজ্ঞাসা  
করিল—‘বড় ভালোবাসা: কি সে নলিনীবালারে ?’

তাহার উত্তরে কবি বলিল—

শুধু যদি বলি সখি ভালোবাসি তায়,  
এ মনের কথা যেন তাহে না দুঃখার !

মনে কর বেন সখি এত ভালোবাসা  
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই,  
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা।

এই সময়ে নলিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল  
এবং কবিকে লক্ষ্য না করিয়াই উপেক্ষা করিয়া  
চলিয়া বাহিতছিল। তখন কবি গাহিয়া উঠিল—

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা, কোথা যাও, কোথা যাও !  
একবার এইদিকে মুখানি তুলিয়া চাও !

কবি মুরলাকেই সাক্ষী মানে যে সে কি কোথাও নলিনীর  
অপেক্ষা হৃদয়ী কাহারোও দেখিয়াছে ? মুরলা বলিল—

হা, ঐ সৌন্দর্য্যই কবি-প্রিয়া হইবার যোগ্য। এবং  
সে মনে মনে বলিল—‘ভূমি যদি স্বামী হও, কি ছাঃ  
আমার !’

চপলা আসিল গান গাহিতে গাহিতে—

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?  
সখি, যাতনা কাহারে বলে ?  
তোমরা যে বলে দিবস রজনী  
ভালোবাসা, ভালোবাসা,  
সখি, ভালোবাসা কারে কয় ?

চপলা মুরলার মুখে হাসি দেখিয়া তাহাকে স্বামী মনে  
করিল, এবং তাহাকে ডাকিয়া বইয়া প্রস্থান করিল।  
সপ্তম সর্গে অনিল ও ললিতার কথা। অনিল  
ললিতাকে কাছে চায়, তাহার মুখে প্রণয়ের কথা  
শুনিত চায়, কিন্তু ললিতা লজ্জায় পারে না, কিন্তু  
তাহার সমস্ত অন্তর তাহাই চায়, সে তাহার দহিতের  
আদর সোহাগ আরও চায়। কিন্তু সে নিজে  
এমন সামান্য অহুসুখ মনে করে যে, সে সাহস করিয়া  
তাহার দ্বন্দ্ব উদ্ভুক্ত করিতে পারে না।

অষ্টম সর্গে মুরলা ও চপলার কথা। মুরলা যে  
তাহার স্বামীর নিকটেও দ্বন্দ্ব-বেদনা ব্যক্ত করে না,  
ইহার অভিযোগ চপলা জানাইল। মুরলা বলিল—

যাহাদের হৃদয়ে আমি হৃদয়ে রই,  
সকলেই স্বামী তারা।

চপলা মুরলাকে সংবাদ দিল যে—

এতদিনে দেখি কবির অধরে  
হৃদয়-কিরণ অঙ্গে,—  
যেন আঁধার তার ছুঁয়াছে  
হৃদয়ের বপন-তলে !

মুরলা জিজ্ঞাসা করিল—‘বড় কি সে হৃদয়ে আছে ?’  
চপলা সংবাদ দিল যে কবি নলিনীকে ভালোবাসে  
কিন্তু নলিনী নিষ্ঠুর-হৃদয়া, তাহাকে চপলা দেখিতে পারে  
না। তখন মুরলা নলিনীকে সমর্থন করিতে লাগিল,  
তাহার প্রিয় কবি-বৈর-মণিকে ভালোবাসিয়াছে তাহার

নিন্দা মুরলা সহ্য করিতে পারে না। পরে চপলা  
সংবাদ দিল যে, নলিনীও কৃষ্ণ কবিকে ভালোবাসিয়াছে।  
তখন মুরলা বলিল—

নলিনী-বালারে ভালোবেসে যদি  
কবি মোর হৃদয়ে থাকে,  
তাহা হ’লে সখি, বদ দেখি মোরে,  
কেন না বাসিবে তাকে ?  
মোরা তাহা ল’য়ে ভারি কেন এত ?  
চপলা লো আমরা কে ?

চপলা সেই ভাবে গান ধরিল—

কাঁধ কি লো, মন লুকানো থাক,  
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ।  
হাসিয়া বেশিয়া ভাবনা তুলিয়া  
হরয়ে প্রমোদে মাতিয়া থাক !

নবম সর্গে নলিনী ও স্বামীশ্রয়। নলিনী গান  
গাহিয়া স্বামীশ্রয়কে বলিতেছে—

কি হলো আমার ? বুঝি বা সজনি,  
দ্বন্দ্ব হইয়াছে !  
সে কবির দর্শন পাইবার জন্ত ব্যগ্র। সে স্বামীকে  
বলিল—

পথের ধারেতে বসি’ র’ব মোরা,  
সেই পথে যাবে কবি।

দশম সর্গে মুরলার স্বপ্নাত্তি। কবি তাহার কাছে  
আসিয়া, নলিনীর প্রতি প্রণয়ে তাহার মন যে কেন  
করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই বার্তা শুনাইতে লাগিল।  
অধীর-হৃদয়ে তাহার শূন্য অন্তর যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা  
সে তাহার বাল্যসখী মুরলাকে না শুনাইয়া কোথাও  
শান্তি পাইতেছিল না। কবি মহানন্দে গান ধরিল—

কে ভূমি গো যুগ্মিছ স্বপ্নের ছয়ায় ?  
চালিতেছ এত স্বপ্ন, ভেঙে গেল—গেল বুক—  
বেন এত স্বপ্ন হৃদে ধরে না গো আর !



তোমার সৌন্দর্য্যভারে  
হৃদয়-বন্দন হা রে  
অতিকৃত হ'য়ে বেন পড়েছে আমার!

তোমার চরণে দিহু প্রেম-উপহার।  
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,  
নাই বা দিলে তা বালা, থাক' দৃঢ়ি করি' আলা,  
জন্মে থাকুক ভ্রেষ্টে সৌন্দর্য্য তোমার!

একাদশ সর্গে অনিল ও ললিতা। অনিল ললিতার  
কাছে প্রণয়ের পরিচয় পায় না বলিয়া ক্লান্ত। প্রণয়ের  
বাগতা-বিহীন প্রণরিনী—

বেন গো বাহার তরে মন ব্যগ্র আছে,  
অশ্রুস্রী ছায়া তার দাঁড়াইয়া আছে।

ললিতা প্রিয়তমকে বিষয় দেখিয়া চিন্তিত ও ব্যাকুল।  
কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহার বিষয়তার কারণ জিজ্ঞাসা  
করিতে পারিল না। ইহাতে অনিল আরও ক্ষুব্ধ হইয়া  
প্রস্থান করিল। ললিতাকে সে সম্ভাষণ না করিয়াই  
চলিয়া গেল' দেখিয়া ললিতার জন্ম হাহাকার করিতে  
লাগিল।

দ্বাদশ সর্গে নলিনী ও তাহার প্রণয়্যাকাজ্ঞীপণ।  
পুরুষ-পতঙ্গ রূপদীর রূপের শিখায় পাখা গুঁড়াইয়া আর  
নড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু নলিনীর ইহা মনঃপূত  
হইতেছিল না—

রূপ—রূপ—রূপ—পোড়া রূপ ছাড়া  
আর কিছু মোর নাই?

নলিনী সকলকে উপেক্ষা করিয়া বাক্যবাহে বিন্দু  
করিয়া প্রস্থান করিল। অনিল নলিনীকে দেখিল, এবং  
মনে মনে ললিতার সহিত নলিনীর রূপ তুলনা করিতে  
লাগিল।

উভের মধুর স্বপ্ন, ললিতার নলিনীর,  
অধীর সৌন্দর্য্য কারো, কারো বা প্রশান্ত হির!

কিন্তু সব আলোচনা করিয়া অনিল বুঝিতে পারিল—  
ললিতা নলিনী-কাছে না-হয় রূপেতে হারে,  
ভালোবাসি—ভালোবাসি তবু আমি ললিতারে।

অনিল প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেল' দেখিয়া  
নলিনীর মন কাতর হইয়া। সে দেখিল কবি তাহার  
দিকে আসিতেছে। সে কবির প্রথম চাহে না,—

আমি গো অবলা—কবির প্রথম  
অন্ত নাহি করি আশা।

আমি চাই নিজ মনের মাহুত,  
মাদাসিদে ভালোবাসা।

ত্রয়োদশ সর্গে আমার দেখি ললিতার লজ্জার বাধ  
তাড়িয়াছে। সে মুখ ফুটিয়া প্রিয়কে প্রশ্ন করিতেছে—

দিসেছি তো বাহা কিছু ছিল আপনায়,  
তবু কেন শুকাল না অশ্রুবিরিধার?

অনিল তাহাকে বলিল—যাহার এমন প্রেমময়ী  
প্রণরিনী আছে তাহার আর কিসের অভাব, কিসের  
গুণ? কিন্তু ললিতার প্রেমের পুষ্টিকে সে ঠাকি দিতে  
পারিল না, তাহার হাসি যে যন্ত্রণার ছদ্মবেশ তাহা  
ললিতা বুঝিয়া বলিল—

মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে।

চতুর্দশ সর্গে কবি মুরলিকে বলিতেছে যে, আমি  
অনেকদিন তোকে বিরলে ঈদ্রিতে দেখিয়াছি, তুই  
কি কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিল? যদি আমার এ  
অম্রদান দস্য হই, তবে তাহা আমাকে বলিল। কিন্তু  
মুরলা সত্ত্বোচে নিম্নের বাখার কথা ব্যক্তি করিতে পারিল  
না। সে নলিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজের  
প্রসঙ্গ চাপা দিল। কবি নিষ্ঠুর নলিনীর আচরণে  
ব্যথিত হইয়া আসিয়াছে, সে পুনরায় নলিনীর মন  
জানিবার জন্ত প্রস্থান করিল। মুরলার সব আশা  
নিঃশূল হইয়া গেল, সে সম্মানসিদ্ধি হইবে সন্দেহ করিল।

পঞ্চদশ সর্গে কবি ও মুরলার পুনর্মিলন। মুরলা

কবিকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি মরিয়া গেলে তোমার  
কি বড় কষ্ট হইবে? কবি বলিল—অমন কথা বলিতে  
নাই, হাজার হোক 'তুই ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী  
আমার!' মুরলা বলিল—'কবি, তুমি কুল ভালোবাস'  
বলিয়া আমি তোমার জন্ত কিছু রজনীপঙ্কজ ফুল  
আনিয়াছি, তুমি কি সেগুলি লইবে?' কবি সেই ফুল  
লইবার কথা কুণিয়া নলিনী যে তাহাকে ফুল দিয়াছিল  
তাহার প্রসঙ্গ তুলিল—

মথি শো, নলিনী কাল ছুটি চাপা তুলে'  
পর্যবে দেখিল মোর ছুই কর্ম্মলে;  
পরশিতে দলগুলি পড়িছে স্বরিতা,  
এখনো প্রহাস তার যাহারি মরিয়া!

মুরলা ছল করিয়া কবির হাত ধরিল—

দেখি মধা, একবার দেখি হাতবানি,  
এ হাত কাহারে কবি করিবে অর্পণ?  
কত ভালো তোমারে সে বাসিবে না জানি?  
না জানি, তোমারে কত করিবে মত্তন!

কিসে তুমি র'বে স্বামী সকলি সে জানিবে কি?  
দেখিবে কি প্রতি ক্ষুদ্র অভাব তোমার?  
তোমার ও মুখ দেখি' অমনি সে বুঝিবে কি  
কখন পড়েছে মনে একটু আঁধার?

কবি কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না যে,  
তাহার মনের শূন্যতা কেন পূর্ণ হইতেছে না—

কিছু হারাইনি তবু কুণিয়া বেড়াই,  
কিছুই চাই না তবু কি মনে কি চাই!  
কোনো আশা না করিয়া সেরাগ্রেতে দহি,  
কোনো কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট গহি।

কবি মনে করিল তাহার এই যে অতৃপ্তি তাহা  
বোধ হয় মুরলার মনের কোনো অতৃপ্তির জন্মই। তাই  
সে মুরলাকে তাহার অন্তর-কথা প্রকাশ করিতে  
অনুরোধ করিল। কিন্তু মুরলা বলিল—

তুমি স্বামী হও কবি, এই আমি চাই,  
তুমি স্বামী হ'লে মোর কোনো গুণ নাই!

কবি স্বামী হইবার জন্ত নলিনীর সন্ধানে প্রস্থান  
করিল। মুরলা উভয় সঙ্কটে পড়িল, কবির কাছে  
থাকিলে সে নিজে স্বামী হই, কিন্তু কবি তাহার বালা-  
সহচরীর পোষন গ্রহণ অশুভব করিয়া গুণিত হইয়া  
মুরলাকে চ্যুত করিয়া তোলে। সে একবার মনে  
করে যে, কবির নিকট হইতে চির-বিদায় লইয়া বাইবে,  
আবার মনে করে—

কিন্তু কবি মোর বাহা ভালোবাসাময়,  
আমারে না দেখি যদি ঠার কষ্ট হয়!

কিন্তু অবশেষে মুরলা স্থির করিল সে কবিকে  
ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বাইবার আগে সে প্রাণনা  
করিল—

অন্তর্গামী দেবতা গো, গুন একবার,  
যদি আমি ভালোবাসি কবিরে আমার,  
কবি বেন স্বামী হয়, নলিনী সে স্বপ্নে রয়,  
মধারে আমার আমি ভালোবাসি যত,—  
নলিনী-বালাও বেন ভালোবাসে তত।  
নলিনী-বালার যত আছে দুখ জালা,  
সব বেন মোর হয়, স্বপ্নে থাকে বালা!  
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম,  
মুরলা করিছে এই বিদায়-প্রণাম।

ষোড়শ সর্গে ললিতার স্বগতালি। সে বে লজ্জা  
তাগ করিয়া প্রিয়কে প্রথম নিবেদন করিতে পারে  
নাই, তাহার মনে প্রিয়ের মন তাহার প্রতি বিষ্ময়  
করিয়া দিয়াছে, এবং সেই সর্বনাশের উপক্রম করিয়া  
এখন সে লজ্জা তাগ করিয়াও আর সর্বনাশ রক্ষা  
করিতে পারিল না। সে তাহার প্রিয়ের মনের  
পরিবর্তন ত্যাগ করিয়া চিন্তিত অহতস্ত্র ভীত হইয়াছে। অনিল  
তাহাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার তীরে নির্জন  
বাপন করে, ললিতা তাহার কাছে গেলে তাহার মুখে  
বিরক্তির ভাব তাহার অজান্তারই ফিটা উঠে, অথচ  
কেন যে সে ললিতাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার  
তীরে গিয়াছে তাহার শত সহস্র কারণ প্রদর্শন



করিতে থাকে। ললিতা তাহার কাছে গেলেই ললিতা দেখে—

সহসা চমকি উঠে 'কি বেন হয়েছে বলি  
আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান।

আপনি বলেন আসি' ভালোবাসি, ভালোবাসি,  
সন্দেহ করেছি বেন প্রণয়ে তাঁহার!

সমুদ্র-সর্গে মুরলা একাকিনী প্রান্তরে চিত্তা  
করিতেছে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,  
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে;  
তারি করে উঠে রবি শশী তারা,  
তারি করে তুটে কুসুম গাছে।  
একটি বাহার নানিক আলর  
সমস্ত জগৎ তাহারি বর,  
একটি বাহার নাই সখা সখী

কেহই তাহার নহেকো পর!

মুরলা এইরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া নিজের মনকে  
সান্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। যে কবি পরবর্তী  
কালে লিখিয়াছিলেন—

মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাবিরে না মোহগর্ভে,  
তাই লিখি' দিলো বিশ্ব-নিখিল ছবিবার পরিবর্তে।

তাঁহারই দার্শনিকতা এই সর্গে দেখিতে পাই।

অষ্টাদশ সর্গে ললিতা চিত্তা করিতেছে যে, সে তো  
এমন না ডাকিতে কাছে যায়, যাচিয়া সোহাগ করে,  
তবু সে বেন তাহার প্রিয়তমকে স্বামী করিতে পারিতেছে  
না। চপলা আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া বলিল—'তুমিও  
কি শেষে মুরলারই মতো হইতেছ?' এমন সময়ে কবি  
সেখানে আসিল। চপলা কবিকে মুরলার নিকটে  
হাইতে অস্বরোধ করিল। কবি মুরলার জন্ত দ্রুতিত;  
মুরলা যে তাহার মনের বেদনা প্রকাশ করিয়া কবিকে  
বলে না, ইহার জন্ত কবি ব্যথিত। কিন্তু কবি কিছুতেই

অশ্রুভব করে না যে, সে তাহার বালাসখী মুরলাকে  
ভালোবাসে বা মুরলা তাহাকে ভালোবাসে। ইহা অতি-  
পরিচিত বসিত্তার ফল—নৃনন্দ না থাকিলে প্রথম  
মনকে সজেন করিয়া তুলে না।

উনবিংশ সর্গে অনিল বিপাশার ভীরে আসিয়াছে,  
তখন তাহার মনেও ঝড় বহিতেছে, বাহিরেও ঝড়  
বহিতেছে। ললিতা আসিয়া উপস্থিত। সে তো  
ছায়ার ভায় অনিলের সঙ্গে সঙ্গে গুরে। তাহাকে দেখিয়া  
অনিল আগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিল  
এবং তাহার মান স্মৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল।  
তাহাকে প্রেম করিবার জন্ত অনিল ললিতাকে গান  
গাহিতে অস্বরোধ করিল। ললিতা গান গাহিল—

বুকেছি যুবকি সখা, ভেসেছে প্রথম,  
ও মিছা আদর তব না করিলে নয়?  
ও শুধু বাড়ায় বাথা, সে-সব পুরাণো কথা  
মনে করে দেয় শুধু, ভাসে এ দময়।

অনিল ললিতার তিরসকারে ক্রুদ্ধ হইল, সে মনে  
করিল যে, সে তো ললিতার প্রতি কোনো প্রণয়হীনতার  
পরিচয় দেয় নাই, তবে কেন সে কথা তিরসকার  
সহ করিতে। সে ললিতাকে তাগ করিয়া প্রস্থান  
করিল।

ললিতাও অভিমানে স্থির করিল—

হবে যা হবার,

না ডাকিলে কাছে কতু যাব নাকে। আর!

বিশ সর্গে নলিনী একাকিনী গান গাহিতেছে—

পেয়েছি পেয়েছি আমি সখী,  
একটি সমগ মন প্রাণ।

সেবো কি ইহারে দূরে ফেলো,  
অথবা রাবির কাছে ক'রে,  
তাই ভাবিতেছি মনে মনে,  
কি করিব, বল তাহা মোরে!

একবিংশ সর্গে অনিল চিত্তা করিতেছে—

জেবেছিলি যাবি ভেসে কোনো ফুলময় দেশে,  
চাঁদের চুম্বনে বেথা ঘুমায়ে শোলাপ  
স্মৃতির স্বপনে কহে স্বরভি প্রাণ।

কিন্তু তাহা তো তাহার ভাণো হয় নাই। দূরত্বের  
হত্যা করা যার ব্যবসায়, এমন রমণীর প্রতি তাহার  
বিরাগ জন্মিয়াছে, তাই সে নলিনীকেও আর চায় না,  
কিন্তু মানসখী ললিতাকেও তাহার আর চৃষ্টি নাই।  
কাজেই সে ললিতাকে আসিতে দেখিবার প্রস্থান করিল।  
ললিতা অনিলকে জিজ্ঞাসা করিল—

বলো সখা কোথা যাও, চাও কি করিতে?

অনিল উত্তর করিল—

মরিতে! মরিতে বালা! যেতেছি মরিতে!

অনিল প্রস্থান করিল এবং ললিতা মুজ্বিতা হইয়া  
পড়িল।

ষাবিশ সর্গে নলিনীকে সন্ধান করিয়া বিনোদের  
গান—

তুই রে বসন্ত-সমীরণ,  
তোর নহে স্মৃতির জীবন!

এই গানটি সম্পূর্ণ 'কৈশোরকে' ছাপা হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গে কবি মুরলাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে,  
মুরলার সখী চপলাও মুরলাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কবিকে  
দেখিল এবং উভয়ে মুরলার সন্ধানে বাজা করিল।

চতুর্দশ সর্গে নলিনীর মনে সখ্য উপস্থিত  
হইয়াছে যে, পুরুষ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ না পাইয়া  
হতাশ হইয়া চলিয়া যায়, কেন?—

এ কি তবে মন বিনিময়?

দূরত্বের বিসর্জন নয়?

পঞ্চবিংশ সর্গে মুরলা পথশান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে  
চপলার অভাব বোধ করিতেছে এবং খেদ করিতেছে  
তাহার একাকী জীবনের জন্ত, কবির জন্তও তাহার মন

হাহাকার করিতেছে। কিন্তু সে মনকে সান্বনা  
দিতেছে—

সমুদ্র হয়েছে তোর মরণের সাথো,—

দে রে তোর হাত তার অধিময় হাতে!

এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালোবাসে

সে কেবল ওই মুড়া—ওইরে আকাশে!

গুরুভার রক্তহীন হিম-হস্তে তার

আগ্নিদন করেছে সে দ্বন্দ্ব ততোমার।

হে মরণ প্রিয়তম— খানী গো— জীবন মম,

কবে আমাদের এই সম্মিলন হবে?

জীবনের যুঝা-শায়া তেরাপি বকে?

ষড়বিংশ সর্গে নলিনী তাহার প্রেমিকের  
প্রত্যাখ্যানে ব্যথিতা হইয়া চিত্তা করিতেছে যে, ইহার  
আগে যে ব্যক্তি তাহার চরণের ধূলা ইহবার জন্ত ব্যগ্র  
ছিল সেই ব্যক্তিই আজ তাহার প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া চলিয়া  
গেল?

সপ্তবিংশ সর্গে কবি মুরলাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।  
অষ্টাবিংশ সর্গে নলিনী যৌবনের অবসান অশ্রুভব  
করিয়া চিন্তিতা হইয়াছে, সকলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান  
করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার ভয় হইতেছে  
—তবে কি 'নলিনী' হইতেছে পুরাতন? তাই সে  
স্বাধীর উদ্দেশ্য করিয়া ব্যতিতে—

ভালো করে সাজিয়ে দে মোরে।

বৃষ্টি রূপ পড়িতেছে ক'রে!

করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা  
বৃষ্টি আসে ভিল ভিল ক'রে!

চিত আশ্ব-বিসর্জন করে যে ভক্ত-মন  
হেন মন কোথা গুপি পাই?

উনত্রিংশ সর্গে ললিতা শ্রান্ত জীবন মৃত্যুর বিশ্রাম  
প্রার্থনা করিতেছে, তাহার 'নিঃশব্দ নিদ্রার কোলে'  
ঘুমাতে গিয়াছে সাধ।



ত্রিশে সর্গে নলিনীর—

বড় সাধ গেছে মনে ভালোবাসিবারে;  
সখি, তোরা বল দেখি, ভালোবাসি কারে ?

একত্রিশ সর্গে অনিল কবিকে মুরলার অবস্থা  
দেখিতে বাইবার জ্ঞান আন্ধান করিতেছে। মুরলার  
মুহূর্ত্ত আসর, সে মরিবার আগে একবার কবিকে  
দেখিবার জ্ঞান তাকে কবির সন্ধানে পাঠাইয়াছে।

ষাতিশে সর্গে নলিনীর নিঃসঙ্গ জীবনের হাহাকার  
বর্ণিত হইয়াছে—

আজ আমি নিতান্ত একাকী,  
কেহ নাই, কেহ নাই হায় !

জগদ্বিশ সর্গে মুরলা পর্ণশয্যায় শয়না, তাহার  
পার্শ্বে চপলা আদীনা, কবি ও অনিলের প্রবেশ।  
আজ কবি মুরলাকে চিরকালের জ্ঞান হারায়ে  
বসিয়া বসিতে পারিতেছে যে মুরলা—

প্রাণ মোর, মন মোর, ছন্দের ধন মোর,  
সমস্ত ছন্দ মোর, জগৎ আমার !

এতদিন এত কাছে ছিল এক ঠাই,  
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।  
কে জানিত ভাগ্যে সখি, ঘটিবে এমন—  
মরণের উপকূলে হইবে মিলন !

আজ মুরলার আর স্বপ্নের অবধি নাই, সে  
তাহার প্রিয়তম কবির মূখে শুনিল যে, সে তাহাকে  
ভালোবাসে। তাই সে কবিকে বলিল—

এই মরণের দিন যদি না দূরায়—  
মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকি যায়—

কবিও তাহাকে বলিল—

বিবাহ হইবে সখি আজ আমাদের,  
দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে সই,  
অনন্ত মিলন হোক এই ছজনের।  
আকাশেতে পত তারা! চাটয়া নিমেষধারা,—  
উহার অনন্ত সাক্ষী র'বে বিবাহের !

আজি এই ছোট প্রাণ হইল অভেদ,  
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ,  
হোক তবে হোক সখি বিবাহ স্বপ্নের—  
চিত্তায় বাসরশয্যা হোক আমাদের !

আজ মুরলার আনন্দের দিন, সে কবিকে অহুরোথ  
করিল—

তবে তুলে আনে তরা রাশি রাশি ফুল !—  
চিত্তা-শয্যা হোক আজি কুস্থমে আকুল !  
রজনীগন্ধার মালা গাথো শো অরায়,—  
সে মালা বদল করি' দিও এ গলায়—

অনিল ফুল আনিতে গেল ও ফুল লইয়া আসিল।  
মুরলা আনন্দে বলিল—

কবি গো, স্বপ্নেও আমি ডাবি নাই কত  
শেষ দিনে এত স্বপ্ন হবে মোর প্রান্ত !

কবি ফুলমালা বদল করিয়া মুরলার শয্যা কুস্থম-  
ছবিত করিয়া দিতে দিতে বলিল—

বিবাহ মোদের আজ হ'ল এই তবে,  
ফুল দেখা না ওকায় সদা ছুটে শোভা পায়  
যেখায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে !

মুরলা চিরবিদায় লইল কবি ও ভ্রাতা ও সখীর  
নিকটে, তাহার মূখের শেখ কথা—

আজ তবে বিদায় বিদায় !

চতুর্দশ সর্গে ললিতার অন্তিম কাল, সেও শেখ  
পব্যায় শয়না থাকিয়া আপন মনে গান গাহিতেছিল—

বায়ু বায়ু, কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা ?  
কৌতুকে আকুল !  
আমি একটি জুই ফুল !

সারা রাত এ মাধব পড়েছে শিশির—  
গর্গেছি কেবল।  
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত দ্রাস্ত হে সমীর !  
অতি হীনবল !

ভাঙ্গা যুগে ভর করি' রথেছি জীবন ধরি'  
জীবনে উদাস !  
ওগো উদার বাতাস !

কাননে হাসিত চাঁপা হাসিত গোলাপ  
আমি ঘবে মরিতাম কান্দি,  
আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায়  
হাতে হাতে বাধি !  
সে অজস্র হাসি মাঝে— সে হরষরাশি মাঝে  
জুড় এই বিদায়ের হইবে সমাদি !

অনিল প্রবেশ করিল। সব দূরাইয়া গেল !

এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি। 'এই কাব্য  
আখ্যায়িকামূলক হইলেও ইহা 'পিরিকের' মালা  
এবং ইহার অধিকাংশ গীতিকবিতাই কবির  
গ্রন্থাবলীর 'কৈশোরক' নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে  
বাল্যকালের রচনা 'কবিকাহিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া  
'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের' পক্ষ হইতে কবির সমস্ত  
বই প্রকাশের ভার লইয়া এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণ  
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে বইখানি হইতে  
অংশ নির্বাচন করিয়া ও বাল্যরচনা সংশোধন  
করিয়া 'কবি ঋণ ঋণ কবিতার বিভিন্ন নাম রাখিয়া  
'কৈশোরক' নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই বইখানিই  
তিনি আমাকে প্রেরণ করিবার জ্ঞান দিয়াছিলেন।  
ঐ পুস্তকে কবির নিজের হাতের সংশোধন ও  
নামকরণ প্রভৃতি থাকাত ইহার ঐতিহাসিক মূল্য  
আছে মনে করিয়া আমি সমস্ত বই হাতে লিখিয়া  
নকল করিয়া প্রেসে 'কবি' দি, আসল বইখানি  
ছদ্মশ্রাব্য ও বহুমূল্য বলিয়া আমি নষ্ট করি নাই।  
সমস্ত বইখানি একসঙ্গে কম্পোজ করায়া 'ইণ্ডিয়ান  
প্রেস' যখন কবির কাছে প্রেরণ পাঠাইলেন, তখন

কবি প্রেরণ পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া প্রেরণ  
হিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন—  
"এ কি আবার দেখা ! আর এই তুমি ছাপতে  
চাইছ ! না, এ ছাপা হবে না।"

কবি তাঁহার নিজের পরিণত প্রতিভার বিচারে  
যাহাকে ছাপায় অযোগ্য বিবেচনা করিয়া প্রকাশ  
বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার সখা হইতে আমরা  
যে-সমস্ত অংশ অল্প অল্প উদ্ধার করিয়াছি, তাহা  
হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কি কবির  
ও কৃত্রিম ছিল। কাঁচা অপরিণত রচনাও অনেক  
আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যে বিকাশোদ্ভব মহা-  
প্রতিভার পরিচয়ও পদে পদে পাওয়া যায়। ইহা  
প্রতিভার সৌরভগ্লের নীহারিকা-অবস্থা, সে কথা  
কবি নিজেও তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে স্বীকার  
করিয়াছেন।

মাহুঘ নিকটের জিনিসকে অবহেলা করিয়া  
দূরে চলিয়া যায়, তাহাতে সে নিকটকে হারায়,  
দূরকেও পায় না,—এই কথাটি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার  
বাল্যকালের রচনা 'কবিকাহিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া  
বহুবার বলিয়াছেন। মায়ায় খেলায়, লিপিকার  
তপস্বীর কাহিনীতে ও পদীর কাহিনীতে তিনি এই  
কথাই স্মরণরত করিয়া বলিয়াছেন। অতএব এই-সব  
শৈশবরচনার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল  
স্রবের সন্ধান আমরা পাই। অতএব কবিকে  
সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার এই-সব বাল্য-রচনা  
অবহেলা করিবার উপায় নাই।

উদ্যম—রবীন্দ্র-পরিচয়—ঐশ্বর্যচন্দ্র মহলানবিশ,  
প্রবাসী, ১০২৮, মাঘ—চৈত্র; ১০২৯, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়,  
শ্রাবণ। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী—ঐশ্বর্যচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।  
'জীবন-স্মৃতি', ১৪০ পৃষ্ঠা।

\* লেখক 'পিরিকের' নামে কবি-জগৎ সমস্ত কাব্যের পরিচয়  
লিখিতেছেন; তাহারই এক পরিচ্ছেদ—উদয়ন-সম্পাদক



## “আষাঢ় প্রথমদিনে”

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

তোমার তুলিপাশে ওগো কবি, ওগো বরগীষ,  
শতাব্দী শতাব্দী ধরি আষাঢ় হয়েছে রমণীয় ;  
নবধনমেঘছায়া, বরষার অশ্রান্ত বর্ষণ  
জনপদবধূমেন যুগে যুগে করেছে হরণ,  
বিরহী পেয়েছে তৃপ্তি, প্রেমিকের মিলনরজনী,  
তপোবন-তরুতলে প্রণয়ের মধুকলধ্বনি  
ঈদ্রিত হইয়া আছে, হইয়াছে অমরবরষী ;  
অনির্বাণ ব্যাতি তব, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

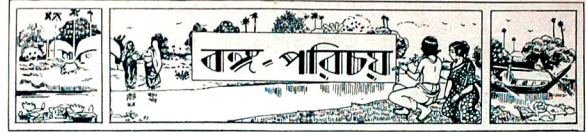
ফসল হ'ল কত রাজ্য, কত রাজ্য হ'ল নামধেন,  
সুখ হ'ল কত নদী, লুপ্ত হ'ল কত বনোদধন,—  
বসি কবে শিলাপটে শিখ্রাটতে রাজসভাকবি,  
অপূর্ণ অরুণজ্বলে ফুটাইলে কি বিভিন্ন ছবি,  
আজো তা রহিয়া গেছে,—চিরকাল রহিবে ভুবনে,—  
একথা কি ভেবেছিলে কোনোদিন অসতর্ক-কণে ?

কি চোখে দেখেছ তুমি প্রকৃতির গোপন বিলাস  
নদীধিরিবনপথে যে লীলা চলেছে বারোমাস !  
মাহুরো প্রকৃতির নুকেছিলে নিরীকণ কবি,  
শাশ্বত বা চিরন্তন, তাহারে লেখনীমুখে ধরি

রাখিলে অমর ক'রে, ধরণীতে বচিলে অমিয়  
কাব্যপিপাসুর লাগি, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

কাল যারা এসেছিল, আজ তারা নিলালে কোথায় !  
তাদের পৃথির পাতা শ্লিষতলে সরমে লুটায় !  
আজ যারা সম্মানিত, একদিন রহিবে না তারা,  
বসন্তে যুগন্ধ বায়ু, বরষার অবিশ্রান্ত ধারা  
তবুও চলিবে নিত্য, চিরদিন চলেছে যেমন,  
বিগত দিনের মত অনাগত নবীন জীবন  
তোমারে করিবে পূজা, তোমারে ভাবিবে বরগীষ,  
ভারত-ভারতী-গর্ভে, ওগো কবি, ওগো বরগীষ !

নূতন সভ্যতা এল, চ'লে গেল কচি পুরাতন,  
জামিল নূতন ভাষা, নব আশা, নব আকিঞ্চন ;  
পরিবর্তনের যুগে প্রতিদিন হেরি অগ্রগতি,  
তবুও অকুর জীতি কেন পুরাতনতম এতি ?  
বর্ষে বর্ষে এসে কিরে আষাঢ় প্রথম দিবস,  
একালের কবিচিত্র হয়ে ওঠে অমৃতরস,  
ছায়া যুগযুগান্তের স'রে যায়,—হেরি চিরপ্রিয়  
শত শতাব্দীর তুমি—ওগো কবি, ওগো বরগীষ !



## জেজুরের কাহিনী

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ মিত্র

জেজুর ভগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ মহাক্ষমার  
একটা বহিষ্কৃত গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল,  
'কম্বা', এবং জনশ্রুতি আছে যে, ১০৫০ সালে  
গোবিন্দরাম মিত্র এই গ্রামের 'জেজুর' নামকরণ  
করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই গ্রাম  
'নাগর' নামক এক রাজার রাজধানী ছিল।  
বর্তমানে যে-স্থানে জেজুরের শ্মশান অবস্থিত, তথায় রাজ-  
প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ। ময়ূরভঞ্জ ঠেটের ভূতপূর্ণ  
প্রত্নতত্ত্ববিদ কয়েক বৎসর পূর্বে শ্মশানের নিকটে  
একটা পাথরের স্তূপি আবিষ্কার করেন। তাহার অভিমত  
এই যে, জেজুর পূর্বে একটা নগর ছিল। শ্মশানটিকে  
গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বর্তমানে 'নাগর-গাছি' বলেন।

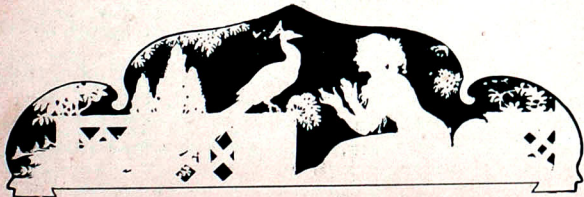
জেজুর গ্রামের উত্তরে 'মোগলপুর' ও 'ময়নাপাড়া'  
নামক দুইখানি গ্রাম, পশ্চিমে 'মুসিহ আড়ি রোড'  
নামক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, পশ্চিমে 'নাগরপুর' ও  
'মাদ্রাপাড়া' এবং পূর্বে 'বলীপুর' নামক গ্রাম। এই  
গ্রামের মধ্য দিয়া একটা নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।  
'নাগর-গাছি' নামক শ্মশানের উত্তরে 'রাণীয়া' নামক  
একটা বৃহৎ পুকুরি আছে। উহার চারিপাশে সুন্দর  
ফুলের বাগান এবং বহু বীধান ঘাট ছিল বলিয়া প্রকাশ।  
বর্তমানে ঘাটগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও, তাহাদের  
ভগ্নাংশে এখনও দেখা যায়। কিংবদন্তী এইরূপ  
যে, রাজার মহিষাশয় ঐ পুকুরিগেতে যান করিতে  
বলিয়া উহার নাম 'রাণীয়া' হইয়াছে। কয়েক বৎসর  
পূর্বে পুকুরিটার পক্ষোক্তার কালে, উহা হইতে বহু

বিষমুষ্টি এবং শিবমুষ্টি বাহির হয়। পূর্বে নগরটা  
শৈব-প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ  
যে, কালাপাহাড় আসিয়া যুদ্ধে 'নাগর' রাজাকে পরাভূত  
করিয়া শেষে তাহার রাজধানীর সমুদায় দেব-দেবীর  
মুষ্টি 'রাণীয়া' পুকুরিগেতে ফেলিয়া দেন।

বর্তমানে এই গ্রামের মধ্যে একটা মঠ মাঠ দেখা  
যায় ; উহাকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 'গড়ের মাঠ' বলেন।  
প্রবাদ এইরূপ যে, রাজার এইস্থানে 'গড়' ছিল।  
'নাগর' রাজার পূর্ব-সমুদ্রি বহু পরিচয় সর্বত্র  
পরিচিতি হইলেও, তাহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি  
কিছু পাওয়া যায় না।

জেজুরের পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের নামকরণ 'নাগর'  
রাজার স্বয়ং হইতে হইয়াছে বলিয়া গ্রামবাসিন্দাদের  
বিশ্বাস। যেমন, বলীপাশে যে স্থানে রাখা হইত, তাহার  
নাম 'বলীপুর', রাজার হাতীশালা যেখানে ছিল, তাহার  
নাম 'হাতীশালা', রাজার দনদৌলত যেখানে থাকিত,  
তাহার নাম 'ভাণ্ডারহাটী', প্রভৃতি। এসমস্ত কথার  
সত্যতা নিশ্চয় করিয়া বলা এক প্রকার অসম্ভব, তবে  
বহু পুরাকাল হইতে এই সমস্ত কথা লোকমুখে চলিয়া  
আসিতেছে।

'নাগর' রাজার বহু পরে, কুচপালের নবাব-বংশের  
এক নবাবও এখানে থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়।  
তাহাকে সকলে 'মোগল-শা' বলিত। কিংবদন্তী এইরূপ  
যে, তাহার নাম হইতে জেজুরের পার্শ্বে 'মোগলপুর'  
গ্রামের স্রষ্ট হইয়াছে।





## উদয় ও অস্ত

## শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তাড়াভাড়ি আকিসের পোষাক পরিতে পরিতে পরীক্ষিত ডাকিল, “শ্রাব কই পিসীমা—পাণ ?”  
রাত্রাঘর হইতে পিসীমা বলিলেন, “ওই যে, তোর টেবিলের ওপর ভিঘের রয়েছে রে।”

সমস্ত টেবিল হাতড়াইয়া পরীক্ষিত পাণ পাইল না ; রান্ধারিয়া বলিল, “আর পাণ খেয়েছি। এতটা বেলা আজ হইবে গেছে, মায়েব আজ যা’ বল্বে, তা’ বুঝতেই পারছি—”

“এই যে দাদাবাবু, পাণ এনেছি—”

পাণের ভিহা হস্তে যে মেয়েটি প্রবেশ করিল, তাহার পানে একবার তাকাইয়াই পরীক্ষিতের ব্যস্ততা যেন ভিগুণ বাড়িয়া গেল।

মেয়েটি আস্তে আস্তে টেবিলের উপর পাণ রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভিহা বুগিয়া ছইটা পাণ একবারে মুখে পুরিয়া পরীক্ষিত গম্ভীর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

গীতের দিন, বাড়ী কিরিভেই সন্ধ্যা হইয়া আসে।

বাড়ীর কাছাকাছি একটা গলির মুখে যে লোকটা ধাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহার পরিচিত। মুখের আলাপ কোন বিন না থাকিলেও প্রতিদিন ‘বাগরা-আসা’ কিংবাবর সময় পরীক্ষিত এই লোকটাকে ‘অন্ধকার-প্রাণ’ ছোট একটা ঘরে সেবিতো। এই ঘরটির মধ্যে লোকানের জিনিষপত্র থাকে, ঢাল, ডাল, লবণ, মিছরি—কিছুই অভাব নাই।

লোকটাকে জিনিষপত্র ওজন করিতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে সে পুর করিয়া রান্ধার-মহাভারতও পড়ে। পরীক্ষিত দেখিতে পায়, অনেক উড়িয়া দেশীর লোক সেই পাঠ শোনে, শেষকালে তাহাকে ভক্তিবরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

লোকটা যেমন কালো, তেমনি মোটা। মাথায় মস্ত

বড় একটা শিখা আছে, গলায় খুব মোটা সাদা পৈতাও দেখা যায়, কাজেই সে যে পবিত্র ভ্রাম্মণ-বস্ত্রে ভ্রমগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আজ পরীক্ষিত পাশ কাটাইয়াই চলিয়া আসিতেছিল, লোকটা বাধা দিল। অত্যন্ত বিনয়ময় কণ্ঠে ডাকিল—  
“বাবু—”

সে যে পরীক্ষিতকেই ডাকিতেছে তাহা পরীক্ষিত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, সেই জন্তই একবার কাছাকাছি স্থান দেখিয়া লইল—আর কোন বাবু নিকটে আসেন কি না।

লোকটা ছই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে ধাঁড়াইল, হাত হুঁখানা কচলাইতে কচলাইতে বিনয়ময় কণ্ঠে বলিল, “আপনাকেই ডাকছি বাবু, একটা বিশেষ কথা আছে।”

“আমায় ডাকছে ? আমার সঙ্গে কথা আছে ?”—

পরীক্ষিত যেন আকাশ হইতে পড়িল।

দীর্ঘ পাচটা বৎসর সে এই গলি দিয়া বাগরা-আসা করে, প্রতিদিনই এই লোকটাকে দেখিতে পায়, তাহার সঙ্গে কোন দিন একটা কথা হয় নাই। আজ এমন কি বিশেষ কথা তাহার সহিত থাকিতে পারে, বাহার জ্ঞে সে দোকান বন্ধ করিয়া পথে আসিয়া ধাঁড়াইয়াছে।

পরীক্ষিত বলিল, “কি কথা বল, একটু তাড়াভাড়ি বললেই ভালো হয়।”

মোটো লোকটা বাধিত হইয়া গিয়া বলিল, “আজ্ঞে তাড়াভাড়িই বল্বে বৈ কি। আমি দোকানদার হ’লেও আমার কি সে জ্ঞান নেই যে, আপনি সেই নটা’র সময় আকিস দিয়ে এই সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী কিঞ্ছেন। আমি দোকানদার বটে বাবু, কিন্তু, ওই নিতাই, হ’লের মতন মুখা দোকানদার নই ; লোকের কষ্ট বেশ বুঝি। আপনাকে কষ্ট দেব না বেশীদূর পাড় করিয়ে রেখে—”

সে আরও কথা বলিত, বিরক্ত হইয়া পরীক্ষিত বলিল, “না, ভূমি যে মুখা নও, বেশ সোয়ানা, তা’ আমি বেশ বুঝছি। তোমার কথা দেখছি আধ মতায় শেষ হওয়ার মত। এক কাছ কোরো বাবু, কাল সকালে বরং আমার বাড়ীতে যেয়ো, এই কয়খানা বাড়ীর পরেই—অগ্নি নথরের দাল বাড়ীটা—বুঝ্লে ? সকালে কাল বাড়ীতেই থাক্বে, তোমার কথা শোনা যাবে।”

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মোটা লোকটি বলিল, “আজ্ঞে, আমি তো আপনার বাড়ী যাব না। যেহেতু যদি—কয়দিন আগেই যেতে পার্ভুম। আপনার বাড়ী আমি বেশ চিনে রেখেছি, নথর দেওয়ারও কোন দরকার ছিল না।”

আশ্চর্য হইয়া গিয়া পরীক্ষিত বলিল, “তোমার কথার মানে তো কিছু বুঝতে পার্ভুম না, বাবু। বাড়ী চেন—তু’যেতে পার না, —মানে ?”

মোটো লোকটা একটু কাশিয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমার পরিবার যে আপনার বাড়ীতেই আছে কিনা, সেই জন্তই আমি যেতে পারছি নে। সে যদি আপনার বাড়ী না থাক্বে, আমি কি আপনাকে ছাড়্ভুম, বাবু—মাই ? আপনার সঙ্গে সঙ্গে একদল চলে যেহেতু।”

পরীক্ষিত যেন আকাশ হইতে পড়িল, “তোমার স্ত্রী আমার বাড়ীতে আসেন ?”

প্রায় কীদ-কীদ হইয়া লোকটি বলিল, “আজ্ঞে বাবু, সে আমারই স্ত্রী। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, চাপা-ফুলের মতন রঙ, চুল তার হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে, আর কি চোখ-মুখ—কি গড়ন—”

বাধা দিয়া পরীক্ষিত বলিল, “অত ভালো ক’রে দেখি নি, বাবু ; চাপাফুলের মত রঙ, কি অব্যবহার মত অন্ধকার, চুল ঠার—”

মোটো লোকটি অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বাধা দিল—“কালো বলবেন না, বাবু। দেখবেন বরং, কালো সে কিছুতেই নয়। আমার কথা সত্যি কি না একবার দেখ্লেই বুঝতে পারবেন।”

পরীক্ষিত বলিল, “বুঝ্ভুম,—কিন্তু আসল কথা যে কি, তাই কেবল শুনেতে পেভুম না, কাজেই বুঝতেও পার্ভুম না। আর নয় বাবু, তোমার যা’ কথা বলবার না-হয় কাল সকালে আমি এখানে এসে শুনে যাব। বেজায় শীত ধরেছে, এখন কথা থাক। এই তো আলাপ-পরিচয় হ’ল, কাল সকালে কথাবার্তা হবে।”

মোটো লোকটাকে আর একটা কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া পরীক্ষিত হুন্হুন্ করিয়া চলিল। থানিক দূর গিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, মোটা ঠেঁটে লোকটা পথের পাশে তেমনই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

কয়েক দিন পূর্ণ হইতে মেয়েটিকে বাড়ীতে দেখা যায়। একদিন তাহার কথা কানে আসায় পরীক্ষিত তাহার পরিচয় লইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল।

কিছু পরিচয় সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, পিসীমাও কিছু বলেন নাই।

আজও সে পিসীমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না ; অপরিচিতা মেয়েটার নাম মুখে কোথায় যেন বাধিয়া যায়।

সন্ধ্যা ও-বেলা সে আসিয়াছিল,—  
বসিয়াছিল, কি কথা তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, কি কথা তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, কি কথা তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

এত স্বন্দর—এত কে  
আহাভারতের বিছানা  
একখানা উপভাসের  
পিসীমাকে লক্ষ্য কর  
সে বুঝা মানদা কথা  
এই মেয়েটি  
অব্যবহার অন্ধ  
বাড়ীতে আজ ক



আজ মাজ তাহাকে নিজে ঘরে আসিতে দেখিয়াছিল—তথ্যসি সে তাকায় নাই।

তাহার ঘরের ঐ কিরিয়া গিয়াছে, এ কথা সত্য। সেখানে বে বিনিমস্টা থাকিলে মান্য, সেই-খানে সেই বিনিমস্টা সাজানো। টেবিলের উপর বই-খাতাগুলি ডিককাল অপোহাল ভাবেই পড়িয়া থাকে, কেহই কোন দিন গুছাইয়া দেয় নাই। সে নিজে কত দিন মতলব করিয়াছে, টেবিল ও আল-মারিতা গুছাইয়া রাখিলে, কিন্তু সে চিন্তা কোন দিন কার্যে পরিণত হয় নাই, তাহার দীর্ঘত্বজ্ঞতা সব উদ্ভ্রম নষ্ট করিয়া কেশিয়াছে।

আজ কলম্বন হইতে টেবিল প্রত্যহ গুছানো দেখা যায়, আলমারীর বইগুলি স্বন্দর ভাবে সাজানো। দেখিলেই বুঝা যায়, কেহ সস্তপণে সব সাজাইয়া রাখে।

মনের মধ্যে উদ্ভুল করে, জানিবার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে—এ কে, কোথা হইতে আসিল।

পরিচয় বাড়ী হইতে জানার চেয়ে বাহির হইতে জানা ভালো, আর সেইটাই প্রকৃত পরিচয়। বাড়ীতে সে কি বলিয়া আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কে জানে। বুঝা পিলীমা তাহাকে চেনেন না, জানেন না, জমনিই যেনে গলিয়া গিয়া টানিয়া লইয়াছেন।

পিলীমা কইতে বাইবার সময় দরবার মুখ পলিয়েন, “ওমা, এত রাত হ’ল, এখনও

কি বলিবে, পরী? আবার তো উঠিবি

আর কোন রকমে নাক-মুখে ছুটি

ত দোঁড়ানি। সে নে, বই

বলিল, “মহেন্দ্রকে ব’লে

জুতেই সে এসে আলো

এখন। ভূমি আর

—তুতে যাও।”

লালপাড় শাড়ী কিনে আনিস সে কিনা। পোড়ার-মুখো মহেন্দ্রকে ঢাকা দিলুম, সে কিনা কালোপাড় শাড়ী নিয়ে এল। বিবির মজ্জি—কালোপাড় পরবেন না, গুঁর জল লালপাড় কাপড় চাই। ওই যে বলে না—গুঁটেজুড়ুনীর ছেলের নাম পঞ্চোচন—গুঁর হয়েছে তাই। কোন্ চুলোয় যেতে হ’ত ঠিক নেই, আদর করে নিয়ে এলুম—কাপড় দিলুম—পছন্দ হল না, লালপাড় শাড়ী চাই। যাক গে, তুই বাপু কাল একঝোড়া লালপাড় শাড়ীই আনিস, বুঝি?”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কথাটা শুনিয়াও হাসি পায়।

এ নিশ্চয়ই সেই হৃদয় মেয়েটার আবদার। সে লালপাড় শাড়ী চায়, পিলীমা মুখে যাই বলুন, অন্তরে তাহাকে সমর্থন করেন, সেই জন্মই লালপাড়ের অর্ডার দিয়া গেলেন।

কিন্তু যে অত হৃদয়, তাহার তো কালোপাড়ই

মাখায় ভালো।

কে জানে মেয়েদের কি পছন্দ, লালপাড় না

হইলে হয় তো মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তু বানিকঙ্গণ বিহানায় শুইয়া থাকিয়া শব্দে

পরীক্ষিত উঠিয়া পড়িল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথেই দেখা হইল

সেই মেয়েটার সঙ্গে;—অত ভোরে দারুণ শীতের

মধ্যেও সে গঙ্গাস্নান করিয়া কাপিতে কাপিতে

কিরিগেছে, হাতে একটা ধনের খটি।

হী, অপক্লান্ত সূন্দরী বটে, বেঁটে লোকটা বাহা

বলিয়াছে, মিথ্যা নয়।

মেয়েটা তাহাকে সপুণে দেখিয়া একটু হাসিল,

জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?

আমি এখনই চা ক’রে দেব—থেকে বার হবে।”

উত্তর কি দেওয়া যায়?

কিন্তু উত্তর দিবার আগেই হৃদয় গরিয়া গিয়াছিল,

পিছন ফিরায়া পরীক্ষিত আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ফিরায়া আসিয়া সে নিজে ঘরে বলিল।

একটু পরেই এক কাপ চা ও কয়েকখানি

বিদ্যুৎকি লইয়া হৃদয় প্রবেশ করিল—

“নিন দাদাবাবু, খেয়ে নিয়ে বার হ’ন।

একটু বেলা না হ’লে তো কাপড়ের দোকান

খুলবে না। এই ভোবেলা গিয়ে কি-ই বা

করবেন? পিলীমার যেমন কাজ নেই, শুভে

যাচ্ছেন বোরোটার সময়, তখন কিনা কাপড়ের কথা

বলতে এলেন।”

পরীক্ষিত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কষ্টকণ্ঠে

বলিল, “এ তোমার ভাবি অন্তর; পিলীমা কি

বলেছেন, সে সব কথা ভূমি লুকিয়ে শুনেছ।”

হাতখুঁচী মেয়েটা হুঁচী হাত জোড় করিয়া

বলিল, “দোহাই, ও অপরাধটা দেবেন না। লুকিয়ে

শোনার অভ্যাস আমার কোন কালেই নেই। কি

করব বলুন, আপনাদা। অত জোরে কথা বললে তা’

কি কানে না এসে পারে?”

পরীক্ষিত আর কথা বাড়াইল না। ইহার কথা

বলিবার ধাঁজ দেখিয়া সে চমকিত হইয়াছিল, তাহার

ভ্রমও হইয়া গিয়াছিল। সামাজ্য অশিক্ষিতা মেয়ে

বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না, ইহা যেন সে

তাহার একটা কথার ভঙ্গিমাতেই ধরিয়া লইয়াছিল।

হৃদয় যেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল,

পিছনে এই ছেলের মনে যে ছাপ রাখিয়া গেল,

তাহা একটা বার ভাবিলও না।

অকস্মাৎ অবসরের অন্তরাল হইতে সে যে

বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে পরীক্ষিত খুসি হইয়া

উঠিয়াছিল। যতদিন হৃদয় বাহির হয় নাই, ততদিন

তাহার সন্দেহ যে বিরাট কৌতুহলটা জাগিয়াছিল,

এবার সহজেই তাহার রীমাসে হইয়া গেল।

সেই বেঁটে কালো লোকটার কথাটাই যেন জাগিয়া

মাঝে মাঝে মাথা ধারণ করিয়া দেয়। সে বলিয়াছে,

হৃদয় নাকি তাহার ধী; কিন্তু এও কখন সম্ভব হইতে

পারে? সেই বেঁটে, ভীষণ মোটা, ভীষণ কালো

লোকটা—সে কিনা এই নিরুপমার বামী? এ

কখনই বিবাস করা যায় না।

সেদিন কিরিবার পথে আবার সেই লোকটা আসিয়া

ধরিল।

তেমনই বিনয়নর কণ্ঠে বলিল, “তারপর বাবু,

আমার কথাটা—”

উগ্রভাবে পরীক্ষিত বলিল, “কি তোমার কথা

বাবু,—ব’লেই ফেল যা’ বলার আছে। এক খণ্ডী সময়

চাই, নিরিবিলি ধারণা চাই,—অত থোস মেজাজে

জন্মার সময় আমার নেই তা’ তো জান।”

লোকটা বলিল, “আজ্ঞে, এক খণ্ডী সময় আর

নিরিবিলি জায়গার দরকার আমার নেই, এখানে

দাঁড়িয়ে কথাটা শুনে।”

তেমনই উগ্রকণ্ঠে পরীক্ষিত বলিল—“বল।”

সে যাহা বলিল তাহা এই—

তাহার বাড়ী বর্ডমান জেলার একটা পল্লীগামে।

ইঙ্গুল-কলেজে না পড়িলেও গুরুমহাশয়ের পাঠশালা

পড়িয়াছে, এবং প্রতিবৎসরই পরীক্ষায় সর্ব সন্মানের

সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। বুঝি ছোট বেলায় পিতামাতা

মারা যান, পিলীমাই তাহাকে মাছুর করেন।

তাহার পূর বিবাহ হয়। তখন সে ছিল

বৎসরের, এবং হৃদয় ছিল পাচ বৎসরের বা

মেয়ে তাহাকে তখন হইতে বড় ক

নাই। কতদিন তাহার টিকি কা

নাকি ঝগড়া করিয়া যখন রাম

টিকিতে আশ্রয় পাব্যন্ত ধর

জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই

পুড়িয়াই মরিত।

হৃদয় বয়স এখন

আজও সে সেই ছেলে

খণ্ডা কান্নাকাটি

নিকে আর দুটু দো



এই করেকদিন আগে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া হয়; বাড়ীর অল্প ভাড়াট্টারি মিটিংবার চেষ্টা করিয়াছিল, একথা না বলিলে সত্যই মহাপাপ হয়। তারপূর্ন কিছুই বাইতে চাহিয়াছিল, প্রতি ভাত দিয়াছিল। তারপূর্ন পদাঘাতে সব ভাত ফেলিয়া দিয়াছিল এবং অত্যন্ত রাগের বশে প্রতিরূপে একটা চড় মারিয়াছিল। প্রতি সেদিন সত্যই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আর ফিরে নাই।

অবশ্য স্ত্রীকে প্রহার করা তারপূর্ন পক্ষে বড় অজ্ঞায় হইয়াছিল—সে পরক্ষণেই তাহা বুঝিয়া স্ত্রীর জন্ত ছুটু ছুটু করিয়াছিল। তাহার জনৈক উড়িয়া বন্ধ তাহাকে খবর দিয়াছিল—‘মাতৃ’কে সে গদ্যার দিকে বাইতে দেখিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই তারপূর্ন চক্ৰবর্তি হইয়া গিয়াছিল, এবং সে প্রায় কাদিতে কাদিতে গঙ্গাতীরে ছুটিয়াছিল। সেখানে গিয়া অনেক অশ্রুসিক্ত করিয়া সে জানিতে পারিল যে, প্রতি গঙ্গাতীরে গিয়াছিল বটে, কিন্তু ভুলে নাই। সে পরীক্ষিতের পিসীমার সহিত তাঁহার বাড়ীতেই গিয়াছে এবং মহা আশ্রমে সেখানে রহিয়া গিয়াছে। এটিকে তাহার স্বামী বেচারার যে কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, সে কথা সে একটী বারও ভাবে নাই।

কথাগুলো বলিতে বলিতে কতবার তারপূর্ন কণ্ঠে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সিঁদুরে কি কাদিতে ভাবিয়া পায় না, তারপূর্ন বলার চেয়ে তুমিই গিয়ে একবার কথা শুনে তার মনটা নরম

বলিল, “আমি বলব—

রয়েছেন, বাবু। তাকে

মাথা পর্যন্ত জলে

শেটায় স্ত্রী-হত্যা

বাপু, তবে থাক,

তোমার আর বেতে হবে না। ‘আচ্ছা, আজ তুমি যাও, তাকে বা’ বুঝিয়ে বলবার তা’ আমিই বলব এখন।’

অনুগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে তারপূর্ন বলিল, “হ্যাঁ, অবশিষ্ট ক’রে বলুন, বাবু। বলবেন—সে গিয়ে পর্যন্ত আমার আহার নেই; গৃহই বটে—বদ্বিও পুরো গুম হয় না।

রোজ ছ’বেশা আহার হয়েছে ছাত্ত-গুড়—

পরীক্ষিত আশ্চর্য হইয়া বলিল, “কেন, ভাত হ’টো জুটছে না তোমার কপালে?”

করুণ স্বরে তারপূর্ন বলিল, “কেননা ক’রে জুটবে, বাবু? ও বে আমার পরকাল খেয়েছে, ইহকাল স্বরূপের ক’রে দিয়েছে। কোন দিন আমার একখট জল গড়িয়ে যেতে দেয় নি, একটা পাণ পর্যন্ত না।

হাতে-হাতে সব জুগিয়ে আমার মাথা খেয়েছে। দুঃখের কথা বলব কি, বাবু—উনান মোটেই ধরতে পারবুম না। শেষে অনেক কষ্টে উনান ধরল—ভাতও হ’ল—

কিন্তু এই হাতটাই পেল।”

বাম হাতখানা সামনে বাহির করিতেই, বৃহৎ ফোলা দেখিয়া পরীক্ষিত চমকিয়া উঠিল—“ইহ, বড় ড পড়েছে তো!”

তারপূর্ন সজল নেত্রে ফোলাটার পানে চাহিয়া বলিল, “তবে আর বলছি কি? এই দুঃখেই আর উনানের দ্বারা যাই নি। বা’ হোক, দোকানে ছাত্ত, চিড়ে, গুড় আছে, খেয়ে দিন কাটাচ্ছি।”

পরীক্ষিত সমবেদনার স্বরে বলিল, “এক কাছ কর না কেন। যে কয়দিন তোমার স্ত্রী না আসে, কোন হোটেল গিয়ে খাও না?”

বিশ্রিয়া উঠিয়া তারপূর্ন বলিল, “তা’ হ’লে ও কি আর আমার মুখ দেখবে ভেবেছেন? জা’তের বড়াই কত,—অহঙ্কার দেখে সন্তা রাগ হয়। বলে, ‘হোটেলের কত মুচি মেখর গলায় হ’তো তুলিয়ে এসে রান্না করে।

বেসিন শুন্ব হোটেল খেয়েছি, সেই দিনই বাড়ী থেকে বার ক’রে দেব, নয় নিজে চলে যাব।’ এতদিন কি কষ্ট করতুম, বাবু? পাছে একথা শুনে চলে যায়—এই ভয়ে ফিপে থাকলেও হোটেলখুঁজে হইনি।”

পরীক্ষিত বলিল, “সে জানবে কি করে?”

তারপূর্ন হাসি হাসিয়া বলিল, “ও কথাটা বলবেন না; ওর চোখ সব দিকে আছে। কোথায় কি করি না করি, সব খবর ওর কানে আসবে। কেননা ক’রে যে পায়, ক’রে জানে।”

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে হাত ছ’বানো কপালে ঠেকাইয়া বলিল, “আচ্ছা আশ্রম বাবু, আপনার অনেক দেবী করিয়ে নিলুম, কিছু মনে করবেন না।”

আপ্তে আপ্তে সে চলিয়া গেল।

ওই মোটা বেটে লোকটার সুন্দর আঙুলে সে কতখানি প্রেম ও মেহ লুকাইয়া আছে, তাহাই ভাবিয়া পরীক্ষিত আশ্চর্য ভাবে তাহার পানে তাকাইয়া পড়িল।

পরিচয় বেশ হইয়া গিয়াছিল।

প্রতি কোন দিনই লজ্জাসঙ্কেত করে নাই, পরীক্ষিতের সঙ্কেতও আপ্তে আপ্তে সরিয়া গেল।

সেদিন সে স্পষ্টই বলিল, “আচ্ছা, তোমার স্বামী বেচারার না হয় তোমার একটা চাই মেরেছিল, সে জন্তে তোমার বাড়ী ছেড়ে এমন ক’রে বার হ’য়ে পড়া উচিত হয় নি।”

বড় বড় ছুইটা চোখের দৃষ্টি পরীক্ষিতের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া প্রতি সঙ্কেতকে বলিল, “ও, এসব কথা আপনার সঙ্গে হ’য়ে গেছে বুঝি?”

পরীক্ষিত গম্ভীর হইয়া বলিল, “সন্তা, কাজটা তোমার ভারি অজ্ঞায় হয়েছে, প্রতি।”

প্রতি মুখ ভার করিয়া বলিল, “এক তরফ দেখে বিচার করবেন না, দাদাবাবু। সে বোকটা হ’তো

কথা ব’লে, ছ’ফোঁটা চোখের জল ফেলেই আপনার মন গুলিয়ে দিয়েছে দেখছি। আমি সব ভুলেছি—

সব জানি। পথে-ঘাটে বার-বার কাছে আমার নিজে

গেয়ে বেড়াচ্ছে—সে আমি সব জানি।”

পরীক্ষিত উট্টা উৎপত্তি দেখিয়া প্রমাদ গণিল, ভাড়াভাড়ি বলিল, “নিজেকে কিছু করে নি গো, আমার কাছেই থুথ করেছ—কেননা, তুমি আমাদের বাড়ীতেই আছে। সে বেশ জানে, তার কথা সব আমি তোমার বলব।”

প্রতি রাগভরেই বলিল, “আপনার মুখ দিয়ে তারই কথা কেন আমি শুন্ব বলুন, দাদাবাবু? সন্তা তার যদি ছুখই হ’ত—সে নিজে আসতে পারত না, পথে কিছু বলতে পারত না?”

হাসিয়া ফেলিয়া তখনই গম্ভীর হইয়া পরীক্ষিত বলিল, “না, এজ্ঞেও তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সে তোমার সাংঘাতিক ভয় করে দেখলুম; তোমার ভয়ে সে হোটেল না খেয়ে চিড়ে-ছাত্ত খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।”

কঠিন মুখেই প্রতি বলিল, “আমার ভয়ে নাকি হোটেল খায় না, সেকা বুঝাচ্ছে আর কি? নিজের ভাত খা’তে কি হয়েছিল?”

পরীক্ষিত বলিল, “প্রথম দিনের চেষ্টার ফলেই অনেকখানি হাত পড়েছে দেখলুম।”

ইহাও দপ করিয়া অলিয়া উঠিয়া প্রতি বলিল, “ও সব নেকামো—আপনি ব’লে তাই বিখাস করেছেন, আমি কথাও বিখাস করতুম না।”

পরীক্ষিত বলিল, “বা, অত বড় ফোলাটা যে হাতে দেখলুম, ওটা তা’ হ’লে কিছুই নয়?”

প্রতি বলিল, “নয় কে বলছে, দাদাবাবু; তবে সন্তা ওটা যে ভাত খা’তে গিয়ে হয়েছে, তা’ আমি কিছুতেই মানব না। ও সব কেবল আমাকে জ্ঞপ করার—”

বলিতে বলিতে সে ধামিয়া গেল এবং অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

পরীক্ষিত বলিল, “সে যাই হোক, তোমার কিছু ওখানে যাওয়া দরকার মনে করি। বেচারার কোন দিন আমার কি দেখেছে। আমি সব ভুলেছি, তখন—”

প্রতি দৃষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, “হ্যাঁ, আমি যাব বই কি? আবার ওখানে—ওই স্বামীর কাছে আমি যাব।”



আজ এত বছর বিয়ে হ'য়েছে, একটা দিন যদি আমার একটা ভালো কথা বলে থাকে। নিত্য ঋগ্ভা-বিবাদ,—ভালো লাগে না বাপু; তার চেয়ে এই যে আমি এখানে রয়েছি—শান্তিতে আছি, নির্ভঙ্করে আছি। আবার আমি যাব? নিত্য একে ডাক, তাকে ডাক, এ ও সে এসে কিনা ঋগ্ভা মিটার। চিরটা কাল এক সমান, একটু বদলায় নি—আর বদলাবেও না।”

পরাক্রান্ত শান্ত ভাবে বলিল, “উটেটা কথা বলছ। সে বললে, তুমিই নাকি কতবার তার টিকি কেটে নিজেছ; অবশেষে একবার নাকি আগুনও দিয়েছিলে?”

সদর্পে প্রতি উত্তর দিল—“হ্যাঁ, দিয়েছিলামই তো! দেব না? রোজ আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমার মাথার বেঁটটাকে খাটের পায়ায় এমন করে বেঁধে রাখত যে, ঘুম ভেঙ্গে পরিত্রাণী চীৎকার করতে হ'ত। বেশ করেছি, টিকি কেটেছি, আগুন দিয়েছি, সেই ভয়েই তো টিকি ছোট করেছি।”

পরাক্রান্ত আর কথা তুলিল না, বাপার গুরুতর দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

পিসীমা দিন পনের ঋতু দেশে বাইবেন। প্রতি আজ কয়মাস আসিয়াছে, পিসীমার ভারি বিবাদের পাত্রীও হয়। পিসীমার মুখে এ মেয়েটার খ্যাতি আর ধরে না। বাড়ীর আশে-পাশে বতগুলি বাড়ীর বসিন্দা আছে—প্রত্যেককেই শুনাইয়া দিয়াছেন, মেয়েটা যেমন হুমকী, শুণ্ডও তার তেমনি।

প্রতি হাতেই সংসারের সমস্ত ভার দিয়া তিনি একদিন ভক্তকণ্ঠ রওনা হয়। গেলেন।

বতরিন পিসীমা ছিলেন, নিসঙ্কোচে ততদিন কথা-বাড়ী চলিয়াছে। পিসীমার বাড়ীতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি যেন সন্সারের পূর্ণ কতী হয়। পড়িল,—তারার আর সেখা পাওয়াই হুমকি হয়। উঠিল।

পরাক্রান্ত অস্থির হয়। উঠে।

এই হুমকী মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার লোভ সে সামনাহাতে পারিত না। আজকাল আফিসে যাতে তার যেনম দেব হয়, কিরিয়া আসে তেমনি সকাল সকাল।

প্রতি পত্রীর মুখে জিজ্ঞাসা করে—“এত সকাল সকাল আজকাল আসেন মে, মায়েব কিছু বলেন না?”

পরাক্রান্ত কোমদিন বলে—মায়েব আফিসে নাই, কোমদিন বলে—মাথা ধরিয়াছে।

সেলিনে মাথার মগ্নরায় সে ছটকট করিতেছিল। প্রতি প্রথমতায় আসে নাই, দাসীর মুখে শুনিতে পাইল—পরাক্রান্ত যরণায় অস্থির হয়। তাহাকে ডাকিতেছে।

যরে আসিয়া দেখিল, পরাক্রান্ত সতাই ছটকট করিতেছে।

হৃৎক দেখিয়া একটু রাগ করিয়াই সে বলিল, “বেশ মাহুত তুমি, প্রতি। মনে কর, আজ যদি পিসীমা থাকতেন, তিনিই মাথার কাছে বসতেন। তিনি তোমায় কেবল সন্সার দেখা পোনার ভারই তো দিয়ে যান নি, আমার দেখবার ভাণ্ড দিয়ে পেনেছ। আমি এই বরণায় মরি, আর তুমি কিনা—”

অপ্রস্তুত হয়। প্রতি তারার মাথার কাছে বসিয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

পরাক্রান্ত চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া বানিক পড়িয়া রহিল—

“জান প্রতি—তোমার সেই কদাকার স্বামী কাল-পর্যন্ত দেশে চলে যাচ্ছে লোকান তুলে দিয়ে।”

মনে হইল প্রতি যেন কাঁপিয়া উঠিল।

পরাক্রান্ত তাকাইয়া দেখিল, প্রতির মুখভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই।

সে বলিল, “বোটা আজ সকালেই আমার ধরেছিল। ছোটসোকা কিনা—বত দূর দূর কর, তত কেনে মুখ ভাসায়—আর বলে—‘একটা বার দেখা করব’।” পষ্ট

বলে নিয়েছি, দেখা হবে না। চাকরটাকে বলে রেখেছি, আমি আফিসে থাকার সময় যদি আসে তখন পুলিশের হাতে দেবে।”

প্রতি একটা উত্তরও দিল না—সে যেন কি ভাবিতেছে।

পরাক্রান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি তার কাছে নেতে চাও, প্রতি?”

প্রতি উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল—“না—”

পরাক্রান্ত বলিল, “সত্যি কথা। সেই কালে

বোটে বামন—সে কি তোমার মত হুমকী মেয়ের স্বামী হওয়ার উপযুক্ত? যাকে দেখলে ঘৃণা হয়, জানি নে—কি ক'রে এতদিন তারই ঘরে ছিলে। দেখতে ভই বিজয়ন চেয়ারা, প্রকৃতিও ততোধিক চমৎকার,—কোনো কালে গুর চেয়ে কদাকার কোনো মেয়েও গুকে ভালোবাসতে পারবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।”

হাতখানা সরাইবার চেষ্টা করিয়া প্রতি বলিল, “এবার আমি যাই দাদাবাবু, রত্ননাথকে আসতে বলি, আপনার মাথায় হাত বুলায়ে দেবে।”

হঠাৎ রোর করিয়া তারার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পরাক্রান্ত বলিল, “রত্ননাথ এসে কি করবে, প্রতি? এসে আমার প্রার্থনা করে, আমার কুপন স্বামীর আমি আজ তোমাকেই চাই, সেই জন্মে বাড়ী চলে এসেছি।”

প্রতির চোখ দুইটা একবার ধক করিয়া জলিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে হাতখানা মুক্ত করিয়া বলিল,

“তাই হবে, একটু ক্ষমতা থাকুন—আমি আসছি।”

ক্রম পদে সে বাহির হয়। গেল।

প্রতি চুপ করিয়া বারান্দার ধারে পাড়াইয়া ছিল। নিকটস্থ হয়। পরাক্রান্ত বলিল, “তুমি নাকি চলে যাচ্ছে, প্রতি?”

কিরিয়া তারার মুখের উপর যুগল চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রতি বলিল, “হ্যাঁ, আমার স্বামী বাড়ী আসতে পেনেছ। আমরা আজই বর্ডমানে চ'লে যাচ্ছি, কদাকার আর থাকবে না।”

“তোমার স্বামী—?”

পরাক্রান্তের আর কথা ফুটল না। প্রতি উত্তর দিল, “হ্যাঁ, আমার স্বামী।”

পরাক্রান্ত বলিল, “সে তোমায় অপমান করেছিল না?”

একটু হাসিয়া প্রতি বলিল, “অপমান? না, তাকে অপমান বলে না, দাদাবাবু; সাময়িক ভাবে আমার একটু রাগ হয়েছিল, সে-রাগ মিটে গেছে, তাই তারই সঙ্গে বাড়ী যাচ্ছি।”

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, “ধর করতে গেলে এমন গুটিনাটি বেখেই থাকে। দোষ তার একার নয়, আমারও বটে। সে বা' বলত, আমি তা' শুভুতুন না—কেবল তাকে রাগাবার চেষ্টা করতুম। সে দেখতে বিজী, তবু তাকেই আমি পৃথিবীর সব জিনিসের চেয়ে—আমার নিজের চেয়েও ভালোবাসি, দাদাবাবু। তুমি তো অতি ছোট, আজ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবান পুরুষও আমার সামনে এসে আমার প্রার্থনা করে, আমার কুপন স্বামীর তুলনায় সেও হবে অতি ঋণাত্মক, অতি দুঃখপূর্ণ।”

বোটার পরাক্রান্ত একটা কথাও বলিতে পারিল না।

প্রতি বলিয়া চলিল, “মেয়েদের এতটুকু দুঃখলতার অবকাশ পেয়ে তাদের সর্বদা ক্রমতে থয়ো না, দাদাবাবু। গুদের বাইরের আকৃতি দেখে বিচার করতে থয়ো না। গুদের মধ্যে থোমনে সত্যিকার দুঃখ থাকে, সেই জায়গাটা আসে দেখতে চেষ্টা কোরো। জেনো—সকল মেয়েই স্বামী কদাকার হ'লে ঘৃণা করে না, সত্যিকার প্রেম-ভালোবাসা মাহুদের দৈহিক সৌন্দর্য দেখে বিভ্রান্ত না, সে দেখে মাহুদের অন্তর—সেইখানেই তার বদন। তাই তোমার প্রেম-নিবেদন বার্থ হয়ে



গেছে, তোমার স্বপ্নের আকৃতি আমার চোখে অতি  
জঘন্য বলে বোধ হয়েছে।”

নীচে গাড়ী আসিয়া ধাড়াইল, তারপর পত্নীকে  
ডাকিতে আসিল।

পরীক্ষিতকে দেখিয়া সে মহানন্দে একগাল হাসি হাসিয়া  
বলিল—“এই যে, বাবু; আপনাদের দয়াকেই আমি আবার  
ওকে ফিরে পেলুম। আপনি এসে ওকে আমার সব  
কথা বলেছিলেন বলেই ও কাল আমার কাছে লোক  
পাঠিয়েছিল। আপনি মিটার চেষ্টা না করলে এ  
মনাস্তর কখন মিটত না। এ কয়টা মাস ওকে আপনারা  
না রাখলে কোথায় ভেসে চলে যেত, আপনারা  
রেখেছিলেন বলেই ওকে আবার আমি পেলুম।”

পরম ভক্তির স্রোত স্তম্ভিতপ্রায় পরীক্ষিতের পায়ে  
ব্লা লইয়া মাথায় দিল।

দুটি নত হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া ধাড়াইল,  
বলিল, “কিছু মনে করবেন না, দাদাবাবু। অনেক  
অকথা-কুকথা বলেছি, ‘আপনি’ ছেড়ে রাগের মাথায়  
‘তুমি’ও বলেছি। দোষ ধরবেন না, ছোট বোন বলে  
কমা করবেন। পিঙ্গীমা কাল ফিরবেন, তাঁর সঙ্গে  
আর দেখা হ’ল না, তিনি নিশ্চয়ই আমায় অকৃতজ্ঞ  
ভাববেন। আপনি দয়া কর’রে তাঁকে কেবল এই কথাটা  
বলবেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, তাঁর দয়ার কথা  
চিরকাল—মেথানেই থাকি আমার মনে থাকবে।”

স্বামী-স্বাী ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

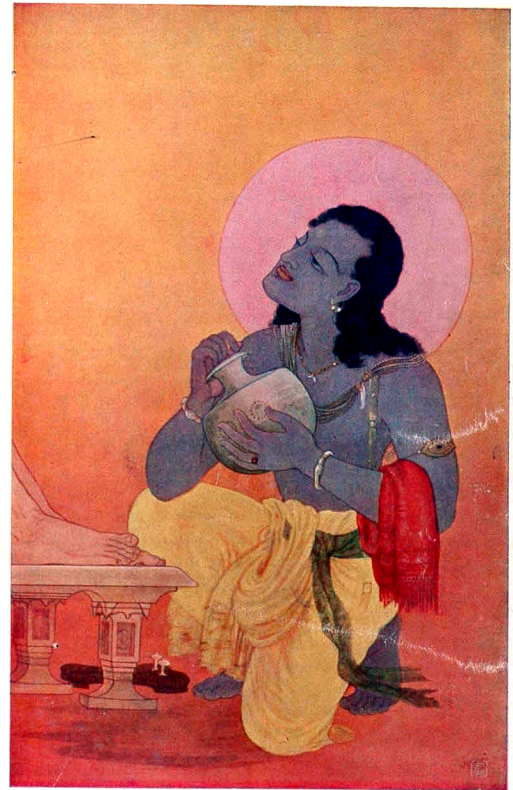
পরীক্ষিত দেখিল—হাসিমুখেই তাহার গাড়ীতে  
উঠিল।

ছজ্জের নারী-চরিত্র—

পরীক্ষিত কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

“পরম্পরের সুখবর্ধন জন্ম সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী ভূমণ্ডলে  
আসিয়া শয্যা পড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া,  
সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন,  
আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা  
কিঞ্চিৎ ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাহার জীজন্ম নিরর্থক।”

— বঙ্কিমচন্দ্র



সেবা-দম্প

[রাজস্বয় যজ্ঞে ঐক্য]

[শিল্পী শ্রীমতী হর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে]



## কৃত্তিবাসের গঙ্গাবতরণ

ত্রিািনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেরিগ্রন্থ ক্রীতামপুরের মিশনারী-  
গণ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে দিয়া সম্পাদিত  
করাইয়া 'মিশন প্রেস' হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ  
মুদ্রিত করেন। শ্রীমূল পুঁক্ত্র দে উষ্টটামগর মহাশয়  
লিখিাছেন — (তৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ,  
তুমিকা—১৫ পৃষ্ঠা) "এই পুঁক্ত্রখানি অতি দুর্লভ।  
আমি দুইখানি মাত্র এই পুঁক্ত্র কলিকাতায়  
দেখিয়াছি।" পুঁক্ত্রখানি দুর্লভ হইবারই কথা,—  
বর্ডমান ১৯৩৩ সনে উহার বয়স ১৩১ বৎসর  
হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই পুঁক্ত্রখণ্ডাবক পুঁক্ত্রকের  
সম্পূর্ণ পাটটি বঙাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে  
সুরক্ষিত আছে। সর্গসাধারণের একটা নিতান্ত  
ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের  
সর্গবিধ বিকৃতি-দুর্গতির মূল এই পণ্ডিত জয়গোপাল-  
কৃত সংশোধন। এই ধারণা নিতান্তই ভুল। পণ্ডিত  
জয়গোপাল সাধারণ রকম বর্ণনাত্মক সংশোধন ও  
বিষয় পদের ছন্দাদির স্বর্ণাখ্যা বিধান ব্যতীত  
কৃত্তিবাসী রামায়ণের (অর্থাৎ তিনি কৃত্তিবাসী  
রামায়ণের যে পুঁক্তি পাইয়াছিলেন, এবং যাহা বাঁটি  
কৃত্তিবাসী রচনা নহে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন  
কথাই সম্ভবতঃ পণ্ডিত মহাশয়ের মনে উঠে নাই)  
পায়ে আর কোন হস্তক্ষেপই করেন নাই। আমার  
এই মন্তব্যের প্রমাণ দিতে হইলে ইহা লইয়াই  
একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়,—কিন্তু তাহাতে  
কাজ নাই। আপাততঃ পাঠকগণকে আমার  
কথায় বিশ্বাস করিয়াই কৃত্তিবাস-বিকৃতীকরণের  
অপরূপে বহুদিন ধরিয়া অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত  
জয়গোপালকে বেকসুর খালাস দিতে হইবে। বস্তুতঃ,  
জয়গোপালের বহুদূরেকই কৃত্তিবাসে বিকৃতি প্রবেশ  
করিয়াছিল। দেশময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ গাওয়া

হইত এবং উল্লেখ্য গায়নগণ বহুদিন পূর্বে হইতেই  
তাহাতে অল্প কবির রচনা আনিয়া প্রবেশ করাইয়া  
আসর জমাইতে চেষ্টা করিতেন। ফলে যতই দিন  
বাইতেছিল, কৃত্তিবাসী পুঁক্তিগুলি ততই পাঁচমিশালি  
হইয়া উঠিতেছিল। জয়গোপাল অমনি একখানি বা  
একাধিক পাঁচমিশালি পুঁক্তি দেখিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ  
সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং আশ ১৩১ বৎসর  
ধরিয়া সেই পাঁচমিশালি পুঁক্তিখানিই বাঙ্গলা দেশে  
কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া চলিতেছে। প্রাচীন পুঁক্তির  
সঙ্গে বাঙ্গারের মুদ্রিত পুঁক্তি মিলে না দেখিয়া  
অনুসন্ধিৎসুগণ জয়গোপালকেই অপরাধী সাব্যস্ত  
করিয়া বলিয়া আছেন।

বস্তুতঃ প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুঁক্তির সহিত বাঙ্গার-  
সম্ভরণের কৃত্তিবাস যিনি মিলাইতে বলেন, বুঝ  
কড়া কড়া মন্তব্য তাহার লেখনী-মুখে বাহির হওয়াই  
স্বাভাবিক। শ্রীমূল হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গীয়  
সাহিত্য পরিষদের ঋজু অধোধ্যাকার সম্পাদন করিতে  
বসিয়া তুমিকায় এই ঋজুই নিয়রণ মন্তব্য করিতে  
স্থিা করেন নাই—

"এখন বটভায়া যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া  
বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র  
গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ... এই বিখ্যে আরও  
আলোচনার ফলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে  
যে, প্রচলিত রামায়ণে এমন কোন এক পংক্তি  
বিরল বাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই।"

চক্ষুমান পাঠক মাঝেই জানেন যে, এই কথা কেবল  
বটভালার রামায়ণগুলি সম্বন্ধে নহে,—ঐ রামায়ণের  
ভদ্রবেশধারী যতগুলি সম্ভরণ বাঙ্গারে চলিতেছে  
তাহাদের সমস্তগুলি সম্বন্ধেই খাটে। কৃত্তিবাসী  
রামায়ণের যে সম্ভরণগুলি হুন্দর ছাপা, অনেক



ছবি এবং চমৎকার বাঁধাই-এর জোরে বাজারে চণ্ডিভেজে, তাহাদের প্রত্যেকখানিই বটতলা-সম্বরণের পুনমুদ্রণ মাত্র। ১৮০২ সনের জীৱামপুত্রী সম্বরণের উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে ছিল—

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।

শম্ভু চক্র গদা পয় শরঙ্গ ধারী।

আর যে কোন ভদ্র সম্বরণ বা বটতলা-সম্বরণ খুঁজিা দেখুন,—উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে আছে—

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।

শম্ভু চক্র গদা পয় দিবা শাশ্বধারী।

কোন কোন সম্বরণে দেখিতে পাইবেন,—পারটীকায় বাখ্যার ভান আছে। কিন্তু আজি-কালিকার বৈকুণ্ঠ নগরী শম্ভু চক্র গদা পয় শরঙ্গ-ধারী কেমন করিয়া হইতে পারে, কোন সম্বরণেই তাহার বাখ্যা পাইবেন না। বটতলা, সম্পাদক-পরম্পরার সূত্র (১) পুঁজি এড়াইয়া এইরূপ অর্থহীন দুইটি ছত্র উত্তরকাণ্ডের আরম্ভে কেমন করিয়া এই ১৩১ বৎসর ধরিয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি?

কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অবস্থায় যখন নিভাত্তই যেন দেবপ্রেরিত হইয়া ১৫১৩ শকাব্দের একখানি সাতকাণ্ডে সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী পুথি আমার হাতে আসিয়া পড়িল, তখন বাটী কৃত্তিবাস উদ্ধারের কল্পনা আমাকে ঝিকিত করিতে লাগিল। ইহার অন্ন পরেই আমার আর একখানি সাতকাণ্ডে সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি আমার হস্তগত হইল। এই পুথিখানি প্রথম-খানি প্রায় ১৫০ বৎসরের পরবর্তী—কিন্তু প্রথম-খানির সহিত চমৎকার মিল আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় কাণ্ডে কাণ্ডে বিভক্ত, ৪৮ই ভূমি কাণ্ড একজ্ঞ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু পুথি আছে। মুদ্রিত তালিকা হইতে ঠিক সংখ্যা নিতে যখন ব্যক্তি হয়,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে ১৩২ খানা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

আছে ৪১২ খানা। কিন্তু সাত কাণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের পুথি একখানিও নাই। \* এইরূপ দুইখানি সম্পূর্ণ রামায়ণের পুথি যখন হাতে আসিয়া পড়িল, তখন কার্য্যান্তরে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম। ঐ কাঁজ থামাইয়া রাখিয়া রামায়ণের দিক্‌ই মনোযোগ দিতে হইল। এই দুইখানি পুথি এবং ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি-শালায় পুথিগুলির তালিকা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিলাম, এইবার মূল কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টায় হাত দিবার সময় আসিয়াছে বটে। উপকরণ গুটুর,—বিশুল-পরিশ্রম-ভীক বাঙ্গালী মনকে একবার কাছে ভেঁজাইতে পারিলেই হয়!

মহা হইতে স্বরস্বরূপে সম্পাদন আরম্ভ করিয়া দিলাম,—এই আশায় যে, মধ্যবর্তী ঐ কাণ্ডে সম্ভবতঃ ভেঁজাল কম পড়িবে। আমার উদ্দেশ ছিল—বাটী কৃত্তিবাস উদ্ধার করিব, কিন্তু ভাবাকে প্রয়োজন-মত সামান্য অদল-বদল করিয়া কাণোপযোগী করিয়া দিব এবং বাঙ্গালী-পাঠক-সাধারণের জন্মই সম্বরণটি সম্পাদন করিব। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমুক্ত ভাঙ্কর সুনীতিচৌধুরার চট্টোপাধ্যায় এই সময় ঢাকায় আসিয়া সমস্ত যোগালাপ করিয়া দিলেন। তাহার অমরোপ-মত সাধারণ সম্বরণ মূলভূমী রহিল—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জ্ঞ মূলগ্ৰন্থত সম্বরণেই হাত দিতে হইল। কাজটি কিরূপ পরিশ্রমসাধ্য, তাহার আভাস ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় রিয়াছি। উপকরণ-প্রাচুর্য্যে মন মগ্নে কণে অবসর ও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে,—ক্রান্তিতে কষ্টবিশম্ব হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উপরে, কৃত কষ্টকুঁড়ি নিঃশেষীকৃত হইল কি না, সেই বিষয়ে মনের সন্দেহ কিছুতেই ঘূচিত চাহে না। এই অবস্থায়, কি করিয়াছি, কি করিতেছি, বঙ্গীয় সভ্যজনকে তাহা মনে

\* মাত্র কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উহার ত্রিভাষা শাখার সম্পাদক অক্ষয়কুমার রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ রামায়ণের একখানি পুথি উপহার পাইয়াছেন। পুথিখানি ১৩১৬ সনের নবল এবং ৩৪০ পাতায় সমাপ্ত।

মধ্যে জ্ঞানান আবশ্রুক বিবেচনা করি,—তাহাদের সহায়কৃত্তে ও সদনয় আপোচনার উপকৃত হইব, এই আশায়। দোষত্রুটিও সংশোধিত হইতে পারিবে। আদিকণ্ডের বহু স্থগাচীন পুথি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, বাজার-সম্বরণে উহার আদিভেদে যে নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ এবং দশা বামীকির কাহিনী সম্বন্ধীয় দুইটি নিকট পাণ্ডা যায়, উহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গ নহে। প্রথমটি হালের অর্থাৎ শ'দেড়েক বছর আগের পশ্চিম বঙ্গের কোন গায়নের রচনা। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি অন্ত্যতাচার্যের রামায়ণ হইতে গৃহীত। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরম্ভ অল্প প্রকারে। বাস্ক, আজ আদিকণ্ডের একটি বিশিষ্ট প্রদম,—“গঙ্গাবতরণ”—নইয়া আলোচনা করিব।

মূল রামায়ণে দেখা যায় যে, গঙ্গাবতরণ-কাহিনী তাত্কা-বধ এবং বজ্র-সম্মার পরে জনক-ভবনে গমনের পথে বিধামনি রান-লক্ষণকে স্তনাইয়াছেন। আমার অবলম্বিত বাটী কৃত্তিবাসী পুথিখানিতেও এই কাহিনীর জন্ম অক্ষরপূর্ণ। বাজার-সম্বরণে কিন্তু এই কাহিনী হানচূড়ত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক রূপে আদিকণ্ডের আদিতে বাইয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত বহু-যোগাণের অবলম্বিত পুথিগুলি কিরূপ বিশৃঙ্খলপন্ন ছিল,—এই বাপার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

বহু কৃত্তিবাসী পুথি মিলাইয়া গঙ্গাবতরণ-কাহিনীর যে পাঠ দাঁড়ায়, বাজার-সম্বরণের ঐ প্রসঙ্গের পাঠ তাহার সহিত মিলে না। কিন্তু ভূমনা-মূলক সমালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে পাঠক-সাধারণের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করিবার জ্ঞ গঙ্গাবতরণ-কাহিনী সংক্ষেপে এই স্থানে বলা দরকার।

স্বর্গাধিপে সগর নামক নৃপতি ছিলেন,—কেশিনী ও হুমতি নামে তাহার দুই পত্নী। কেশিনীর এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম অমমজ। হুমতির বাট হাজার বৃদ্ধ হইয়াছিল। সগর রাজা অমমজে বজ্র আরম্ভ করিলেন—বাট হাজার ছেলে অধের রক্ষক

হইয়া চলিল। কপিল মুনি পাতালে বসিয়া তপস্বী করিতেছিলেন—ইক্ষ বজ্রের ঘোড়া চুরি করিয়া কপিলের পিছনে নিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। সগর-সন্তানগণ মাটি খুঁড়িয়া চারিটি সাগর কাটিয়া ফেলিল—পরে কপিলের পিছনে ঘোড়া বাঁধা দেখিয়া কপিলকে চোর ভাবিয়া প্রহার করিল। খান ভাঙ্গিয়া কপিল চক্কু ফেলিয়া চাহিলেন—চোখের আগুনে সগরের বাট হাজার ছেলেই ভস্ম হইয়া গেল।

এদিকে প্রজ্ঞা-পীড়ন দোষে সগর অসমজকে ত্যাগ্য পুত্র করিয়াছেন, অসমজের পুত্র অন্তম্যান পিতামহের প্রিয়পাত্র হইয়াছে। ঘোড়া লইয়া ছেলেরা ক্ষিতিভেদে না দেখিয়া সগর অন্তম্যানকে ঘোড়ার খোঁজে প্রেরণ করিলেন। অন্তম্যান কপিলকে তুষ্ট করিয়া ঘোড়া লইয়া আসিল এবং গঙ্গাভ্রমণে স্পর্শে ভবীভূত পিতৃহৃৎসবের মুক্তি হইবে, কপিলের নিকট এই তথ্যও জানিয়া আসিল। সগর অনেক তপস্যা করিয়াও গঙ্গা আনিতে পারিলেন না। সগরের পরে অন্তম্যান-গঙ্গা হইলেন—গঙ্গা আনিতে তিনিও বিফলপন্ন হইলেন। অন্তম্যানের পুত্র বিলীপও অনেক চেষ্টা করিয়া গঙ্গা আনিতে পারিলেন না। দিলীপের পুত্রের নাম ভগীরথ। ভগীরথ অনেক তপস্যা করিয়া রত্নার নিকট হইতে গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গীর মহাবেশ স্বর্ণ হইতে মর্ত্যে পতন কালে গঙ্গার বেগ ধারণ করিলেন। ঐরাবত আসিয়া হিমালয়-শিখরে আবদ্ধ গঙ্গার জ্ঞ দন্তে শৃঙ্গ বিদার করিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিল। গঙ্গা হই কুলে তাঁর স্তম্ভ করিয়া নীচে নামিয়া আসিতে লাগিলেন। পথে এক স্থানে জলমুনি তপস্যা করিতেছিলেন। তাহার যজ্ঞস্থান গঙ্গাঘোঁতে ভাসিয়া যায় দেখিয়া রাগ করিয়া জলমুনি গঙ্গার জল সব পান করিয়া ফেলিলেন। পরে ভগীরথের আরাম্যায় তুষ্ট হইয়া স্বীয় জাহ্ন নখে বিদীর্ণ করিয়া ঐ ধার দিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গা কপিলাগ্রমস্থিত সগরসন্তানগণের ভস্ম স্পর্শ



করিয়া তাহারিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং সাগরে যাইয়া নিশিলেন।

এখন এই কাহিনীর এক একটি অংশ ধরিয়া বিচার করা যাক। প্রথমে—

### গঙ্গার উৎপত্তি

বাক্সার-সম্বন্ধে কপিল সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র ছত্তে অন্তর্মানক গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনী শুনাইয়াছেন—  
যথা—

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।

গান পঞ্চমুখেতে করেন পঞ্চানন।

শিশু বলে ঐরাম, ডুবুরি বলে হরি।

পঞ্চমুখে পঞ্চানন গান ত্রিপুরারি।

লক্ষী সহ বসিয়া আছেন মহাশয়।

তুমি যে গান হইলেন দ্রবময়।

দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপাণি।

সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী।

সেই জল কমণ্ডলু ভরিয়া আদরে।

রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে।

কপিল এই কমণ্ডলুরাসিনী গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য অন্তর্মানক উপদেশ দিলেন। ঋত্বিবাসী পৃথিবীতে কিন্তু গঙ্গার উৎপত্তি-বর্ণনা একধাণিতেও গৃহীত পাইলাম না। বিদ্রিষ্ট হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনীর মূল গৃহীতে লাগিলাম।

মূল রামায়ণে গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনী আছে। আদিকাণ্ড, ৩৭ম সর্গ। তিনি হিমালয়ের ছোটা কন্ডা। দেবগণ তার্পনা করিয়া তাহাকে সর্গে লইয়া গান। ভগীরথের তপস্যায় তিনি সর্গ হইতে শিবজটা পতিত হন। রামায়ণে গঙ্গার বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভবের কোন কথাই নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গঙ্গার এই বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভবের কাহিনী বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতভাবে দশম অধ্যায়ে আছে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বাধার রাস-মহোৎসবে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্ৰু রাস-

মণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐক্লবিক্রমক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বাধার সহিত ঐক্লব গলিয়া জল হইয়া গেলেন। এইরূপে গঙ্গার উৎপত্তি হইল। পরে ক্লব তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে স্থাপিত করিলেন। ইহার পরে আবার আর এক কাহিনী আছে। তাহাতে দেখা যায়, মুনিমণ্ডী গঙ্গাকে ক্লবপার্শ্ববর্তিনী ও ক্লবাহুরাগিণী দেখিয়া রাধা তাহাকে গুহুণে পান করিয়া কৈলিবার ভয় দেখাইলেন। গঙ্গা ক্লবের পদে বিনীত হইয়া গেলেন। সমস্ত গোলোক শুক হইয়া গেল। পরে ব্রহ্মা ও শিবের অহুরোধে ক্লব গঙ্গাকে পাদাঘূষ্ঠ দ্বারা বাহির করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাহাকে নিম্না নিম্ন কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন, ঐক্লবজন্ম বধে, ৩৪ম অধ্যায়ে আবার এই কাহিনী পুনঃকৃত হইয়াছে।

বামন পুরাণে ২২ অধ্যায়ে আছে, বামনের উচ্ছ্বাসী পদ যখন ব্রহ্মাণ্ডের কোটা ভেদ করিল, তখন তদবলম্বনে গঙ্গা নামিয়া আসিলেন। অহরূপ কাহিনী বৃহদ্রথদীর পুরাণেও আছে,—বঙ্গবাসী-সম্বরণ, একাদশ অধ্যায়, ১৭৮—১৮১ শ্লোক।

কবিকল্প চণ্ডীতে আছে, বামনের পদ ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গাজল-দ্বারা সেই পদ যৌত করিয়াছিলেন। উহা অবলম্বনে প্রচাপ্তে নিম্নমণ্ডী হয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সম্বরণ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)। এই কাহিনী ব্রহ্ম-পুরাণের ৭৩ম অধ্যায়ে আছে। বৃহদ্রথপুরাণেও এই কাহিনী আছে—১২শ অধ্যায়।

১২শ অধ্যায় মিজ মহাশয় তাহার সম্বলিত বাঙ্গালা অভিধানে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক “পৌরাণিক কাহিনী” দিয়াছেন, কিন্তু কোন পুরাণের এই কাহিনী তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কোষগ্রন্থে নির্দেশ নী না থাকিলে অঙ্গসঙ্কীর্ণত্বের গুরুতর অসুবিধা হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। এই কাহিনী মতে নারদের অন্তর গানে রাগরাগিণী বিকলারূপে পথে পড়িয়াছিল। নারদের জিজ্ঞাসায় তাহার

বলিল, মহাদেবের তানলববিক্ত সঙ্গীতে তাহাদের অঙ্গবৈকল্য দূর হইতে পারে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রোতাক্ষণে পাইলে মহাদেব গাহিতে বীকার করিলেন। মহাদেবের গানে রাগরাগিণী কিরিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ব্রহ্মা সেই গান কিছুই গৃহিলেন না। বিষ্ণু কিছু গৃহিয়াই সব হইয়া গেলেন,— ব্রহ্মা সেই সব বিষ্ণুকে কমণ্ডলুতে ভরিলেন। উহাই গঙ্গা। গৃহীতে গৃহীতে পাইলাম,— এই কাহিনী বৃহদ্রথপুরাণের মধ্যবর্ত্তের ১৪ম অধ্যায়ে আছে। পাঠ করিয়া বুঝা গেল, গঙ্গাবতরণ-কাহিনী কৃত্তিবাস সমগ্রটাই বৃহদ্রথপুরাণ হইতে লইয়াছেন,— রামায়ণ হইতে নহে।

রঙ্গপুর পরিদ্রম হইতে অম্বুজাত্যাগের রামায়ণের যে আদিকাণ্ড স্মৃতি হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে অল্প কথাই আছে। কিন্তু এই স্মৃতি পৃথিবীতে অম্বুজের সম্পূর্ণ পৃথি কি না, সম্বন্ধের বিষয়। কারণ আমি অম্বুজের আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পৃথি পরীক্ষা করিয়াছি, বাহাদের পাঠ স্মৃতি পৃথির সহিত কতক মিলে, কতক মিলে না। এই রকম একখানা পৃথিতে গঙ্গার উৎপত্তি নিয়মিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দশদণ্ড গঙ্গাদেবী আড়ে পরিসর।  
মহা বেগবতী অতি স্রোত বরতর।  
বিধামিত্র প্রণমিল পদ্য দ্রবশনে।  
গঙ্গাপান করিলেক সঙ্গল বিধানে।  
গঙ্গাকে দেখিয়া রাম পোছে মূনি স্থানে।  
কেমতে জন্মিল গঙ্গা আনে কোন জনে।  
তিন জন বসিলেক গঙ্গাদেবীর তীরে।  
হস্তছোঁড়ে মূনিবর লাগে বসিবারে।

ইহার পরে তুঙ্গ ও নারদের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে—উহা বাদ দিলাম। তুঙ্গ ও নারদের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার বিবরণ লিঙ্গপুরাণের উত্তর ভাগের ১—৩ অধ্যায়ে আছে।

ব্রহ্মাও কোটা দশ যোজন বিস্তার।  
তাথে সভা করি বৈসে দেব গঙ্গাবর।  
ব্রহ্মা আদি দেব আইল আর এইতি।  
কলা কাটা (১) দণ্ড পল আর দিবা রাত্রি।  
অখিলাদি আসিলেক বদান্ত করণ (২)।  
বিদ্বত্তাদি যোগ আইল উপলক্ষ্য পবন।  
মাস অঙ্গ আসিলেক আর বড় ক্ষত।  
শক্তি সম্মে সবে মেলা বিষ্ণু আত্মা হেতু।  
চতুর্দিকে রহিলেক করি ভোজ্য হাত।  
সভাকে বসিতে আত্মা কৈলা জগদ্রাথ।  
বিষ্ণু বোলে শুন সন্তে আমার বচন।  
তুমি সব কর গাএন করিব শ্রবন।  
এতক কহিলা যদি দেব গঙ্গাবর।  
নাচিতে লাগিলা প্রভু দেব মহেশ্বর।  
হুই মুখে গাএন শিব লাগে করিবারে।  
তিন মুখে থই থই তাল জে ফুকারে।  
হুই মুখে শ্রুতি (৩) মাতা পুত্রেন পার্শ্বতী।  
আপনি যুদ্ধ লৈলা দেব গঙ্গপতি।  
ভৈরব ভৈরবী ভণা হৈ হৈ করে।  
নন্দী মহাকাল লাগে কাঁদে (৪) বাজাবারে।  
মধুর বীণা বাজাএ নারদ ভপোধান।  
আনন্দিতে তাল ধরে দেব মুনিসণ।  
ধীরে ধীরে ব্রহ্মদেব দেয় করতালি।  
সিংহাসনে উঠি নৃত্য করে বনমালী।  
বিষ্ণু পদাঘাতে কাঁপে ইতিন ভুবন।  
দেখিয়া বিদ্রিষ্ট হৈল জত দেবগণ।  
নৃত্য দেখি দেব সব হইল ফাঁকর।  
ইন্দ্র আদি দেব আইল পলাইয়া সত্বর।  
ব্রহ্মা বিষ্ণু রহিলেক দেব জিলাচত।  
আর মাত্র রহিল নারদ ভপোধান।

(১) অষ্টাদশ নিমেষাঙ্ক কাল। (২) অল্পতাপ পরিমিত কালকে বর্ণন যথোপযুক্ত।

(৩) সমগ্রতর মাত্রাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি ২২টী। (৪) বড়, করতাল।



মহাদেবের গাএনে বিষ্ণু হইলা বিভোর।  
 অবমরী হইলা প্রভু দেব গদাধর॥  
 গঙ্গাদেবী জন্ম হৈল এক্ষা এ জানিল।  
 থাৰা দিয়া মহাদেবে চৈতন কৰাইল।  
 গাএন সধরিল হর, এক্ষা করতালি।  
 উঠিয়া বসিলা প্রভু দেব বনমালী।  
 এক্ষা দেব জানিল গঙ্গার উপাদান।  
 সেই জলে অর্ঘ্য দিয়া করে গঙ্গানাম॥  
 গঙ্গাকে রাখিল কমণ্ডলুর ভিতর।  
 কমণ্ডলু রাখে এক্ষা কটীর ভিতর॥  
 সভাভঙ্গ হৈল সব গেল নিজস্থানে।  
 এক্ষাও কটীতে গঙ্গা রৈল সেই হনে।  
 যে কালে হইল। সুনি বামন মূর্তি।  
 ছলিয়া পাঠাইল। বলি পাতাল বশতি।  
 একপদে আচ্ছাদিলা সপ্ত বহুমতী।  
 আর পদে সপ্ত স্বর্ণ আশিলা ঐপতি।  
 সেই পদে এক্ষাওর কটাহ ভেদিল।  
 পায়ে ঠেকি কমণ্ডলু কহিত হৈয়া পৈল॥  
 প্রতুপদ বাইয়া গঙ্গা বৈকুণ্ঠে আসিলা।  
 বিষ্ণুদেবের গঙ্গা সেই হতে হৈলা।  
 কুণ্ড হৈয়া রৈলা গঙ্গা বৈকুণ্ঠ ভুবন।  
 এই মতে গঙ্গা হৈলা স্তন নারায়ণ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, গঙ্গার এই উপক্ৰিকাহিনী  
 কৃত্তিবাসী পুথিগুলিতে নাই। অতুতাচার্যের রামায়ণে  
 হইতেই উহা সন্নিবিষ্ট হইয়া। শ্রীরামপুরী রামায়ণে  
 প্রবেশ করিয়া থাকিবে। অতুতাচার্য্য হইতে শ্রীরাম-  
 পুরী রামায়ণ আর একটি অতুত কাহিনী গ্রহণ  
 করিয়াছে, তাহা—

**ভগীরথের বিচিত্র জন্মকাহিনী**  
 বাজার-সংস্করণে ভগীরথের জন্মকাহিনী নিম্নরূপ  
 বর্ণিত আছে—  
 অংকনান রাজ্য করে অযোধ্যা নগরে।  
 তাঁর পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে॥

চলিল দিলীপ রাজ্য গঙ্গা অম্বহারে।  
 কটোর তপতা করি থাকে অনাহারে॥

তপাপি না পায় গঙ্গা। না হয় অশোক।  
 মরিয়া দিলীপ রাজ্য গেল অশ্লোক॥

দিলীপের ছুই পত্নী ছিল নিজ দেশে।  
 শব্দর পেলেন তথা আরোহিয়া বুধে।  
 দৌধাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।  
 নম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী॥

দৌহেতে জানিল বনি দৌহার সমর্থ।  
 দৌহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভ॥

ইহার পরে অস্থিহীন ভগীরথের জন্ম এবং অষ্টা-  
 বক্র-শাপে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা-প্রাপ্তি বর্ণিত  
 হইয়াছে।—

আসিয়া সকল মূনি করিল কল্যাণ।  
 ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম॥

ভগীরথের এই যে বিচিত্র জন্মকাহিনী, ইহা  
 বাবীকীর রামায়ণে নাই। মুদ্রিত কোন পুরাণে  
 অথবা মহাভারতে এই কাহিনীটি পাইলাম না।  
 অথচ কাহিনীটি বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।  
 কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে, — কলিকাতা  
 বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত—চাক বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত  
 সংস্করণ; ১৬৯ পৃষ্ঠা। ৩সহীশঙ্কর দাস মহাশয়ের  
 সম্পাদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কব্জক প্রকাশিত কবি  
 ভবানন্দ্যের ‘হরিবংশ’ নামক প্রাচীন কাব্যেও এই  
 কাহিনীটি প্রদত্ত হইয়াছে; ৫৯ পৃষ্ঠা, ২৪৩৭-২৪৩৮  
 পংক্তি ও পাদটাকা। কাহিনীটির বিশেষ্য নিয়ে  
 প্রদত্ত হইল—

( ১ )

মুদ্রিত অতুতাচার্য্য। দিলীপ গঙ্গার অষ্ট  
 আরাধনা করিয়া বিকল মনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ  
 করিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ ঐ

বাজার-সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ। ঐ ঐ  
 আদিকাণ্ড সম্পাদন করিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে  
 সমস্ত পুথি আমাদের বাঁচিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে  
 একখানি বিচিত্র পুথি পাইয়াছিলাম। ইহা অতুতা-  
 চার্য্যের রামায়ণের পুথি কিন্তু ভণিতা সর্বত্র কৃত্তিবাসের।  
 আবার পাঠও ‘অতুত’ের মুদ্রিত পুথির সঠিক সর্বত্র মিলে  
 না। আমার পাঠ্যলিপিতে ইহাকে ‘খ’ পুথি বলিয়া  
 অভিহিত করিয়াছি। এই খ-পুথিতে আছে—  
 খ-পুথি। সঙ্গমরত কুবঙ্গকুবঙ্গিণীর মধ্যে

কুবঙ্গকে বধ করায় দিলীপ—‘সঙ্গমকালে মুখ্য হইবে’—  
 কুবঙ্গিণী কব্জক একরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া একরূপ উজ্জমে  
 নারা পেলেন।

( ২ )

অতুতাচার্য্য। স্বর্ণবৎসের ক্ষম হয় দেখিয়া  
 ব্রহ্মা আসিয়া ছুই রাণীকে নিজেদের চোঁয়ই পুত্র-  
 উৎপাদনের উপদেশ দিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। তুর্কবাসী রাণীদ্বয়কে বর  
 দিলেন এবং পুত্র-উৎপাদনের উপায় বলিয়া দিলেন।  
 বাজার-সংস্করণে রামায়ণ। এক্ষা শিবকে  
 পাঠাইলেন, শিব ‘পুত্রবতী হও’ বর দিলেন এবং উপায়  
 বলিয়া দিলেন।

খ-পুথি। দেবপণ মন্ত্রণা করিয়া মদনকে  
 পাঠাইয়া দিলেন। গাভুমতী রাণীদ্বয় মদনের প্রেরণানায়  
 কেলি করিলেন এবং একজন গর্ভবতী হইলেন।  
 গর্ভবতী রাণী কলহের ভয়ে তুর্কিয়া মরিতে গেলে এক্ষা  
 আসিয়া নিবারণ করিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত পাপভার  
 গ্রহণ করিলেন।

( ৩ )

অতুতাচার্য্য। বশিষ্ঠের উপদেশে অস্থিবিহীন  
 ভগীরথকে অষ্টাবক্র মূনির পথে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।  
 কিশ্করকিমাকার অস্থিবিহীন শিশু তাহাকে বিজ্ঞপ  
 করিতেছে মনে করিয়া অষ্টাবক্র শাপ দিলেন—“এই  
 অবস্থা তোমার স্বাভাবিক হইলে মহাশয়ের স্বাভাবিক  
 আকার প্রাপ্ত হও। নচেৎ এইরূপ অবস্থায়ই চিরকাল  
 থাক।” এই শাপের ফলে ভগীরথ মাংসের আকৃতি  
 প্রাপ্ত হইল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ ঐ—অতি সংক্ষেপে  
 বিবৃত।

বাজার-সংস্করণ। ঐ ঐ  
 খ-পুথি। ‘অষ্টবক্র’ এবং ‘অষ্টাবক্র’-শাপের  
 উল্লেখ নাই।

এই বিশেষ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, কাহিনীটি  
 বাঙ্গালা দেশে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল কিন্তু  
 সোকে ইচ্ছামত ইহার এক আর্ধট অঙ্গল-বদল করিত।  
 কৃত্তিবাসের কোন পুথিতে এই কাহিনী পাই নাই।  
 কৃত্তিবাস যে এই কাহিনী জানিতেন, তাহার কোন  
 প্রমাণ তাহার রামায়ণে নাই—জানিলেও এই সম্বন্ধে  
 তিনি ইংরেজীতে যাহাকে বলে discreetly silent!  
 বাজার-সংস্করণে এই কাহিনী যে অতুতাচার্য্য হইতে  
 আসিয়াছে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই কাহিনীটির পৌরাণিক মূল খৃষ্টিয়া খৃষ্টিয়া  
 হয়রায় হইয়াছিল। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
 পুথিরক্ষক শ্রীমান হুবেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্-এ,  
 এই কাহিনীর মূল খৃষ্টিয়া বাহির করিতে সক্ষম  
 হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ‘বান্ধিত  
 রামায়ণ’ নামে একখানি সংস্কৃত রামায়ণের পুথি  
 আছে—নং ২৫৯। যতদূর অনুসন্ধান করিতে  
 পারিলাম, তাহাতে অমরূপ পুথি পৃথিবীর ‘অজ কোন  
 সংগ্রহে আছে বলিয়া জানিতে পারিলাম না। এই’  
 বান্ধিত রামায়ণখানি বীরভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত।



ইহাতে রামায়ণের আদি ইহাতে উত্তর পর্য্যন্ত সমস্ত কাণ্ডের বহুবিধ কাহিনী আছে। লব-কুশের যুদ্ধের কাহিনীও ইহাতে বিস্তৃত ভাবে আছে। এই পুথিতে ছুই রাণীর সংযোগে ভগীরথের জন্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এবং ভগীরথের নামের ব্যুৎপত্তি পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। কিন্তু এই বিরল-প্রচার গ্রন্থ ইহাতে অল্পতাস্য এই কাহিনীটী গ্রহণ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয় না।

সোভায্যক্সেম শ্রীমান হ্রবেথচক্ষ পদ্যপুরাণের মত জনপ্রিয় এবং সুপ্রচারিত পুরাণের স্বর্ণখণ্ড ইহাতেও এই কাহিনীটি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গবাসী-সম্প্রদায়ের মুদ্রিত স্বর্ণখণ্ডে এই অধ্যায়ই নাই! এই স্বর্ণখণ্ডের পৃথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিপাঠ্যার ১৩২৫ নং পুথি, বীরভূমের শ্রীমূল শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট ইহাতে জ্ঞীত। ইহার ৪১ পাতায় স্বর্ণখণ্ডের রাজাদের তালিকা আছে, তাহাতেই ভগীরথের কাহিনীটি আছে। ইহাতে দেখা যায়, নীলপা পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলেন তাহার ছই পত্নী বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন, এবং স্বর্ণখণ্ডের ধর্মের কথা বশিষ্ঠ মুনিকে নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ মুনি ধ্যানে অধগত হইয়া বলিলেন,—স্বর্ণবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। তিনি স্বর্ণবংশে বংশধর-উৎপাদনের জন্য পুণ্ড্রটী বজ্র করিলেন এবং বজ্রের চক এক বাণীকে ভোজন করাইলেন। অজ রাণী তাহাতে পুরুষব্যব আচরণ করিলে প্রথম রাণীর গর্ভে পুত্র হইল। এই কারণে পুত্রের নাম ভগীরথ হইল। অষ্টাবক্ষ-চেষ্টায় সে বাতাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হইল। এই পদ্যপুরাণের মূল ইহতেই বাঙ্গালা কাব্যগুলিতে এই বিচিত্র কাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

### ঐরাবতের কাহিনী

কৃত্তিবাসী পুথিগুলি মধ্যে মধ্যে—“পুস্তক বিশাল হএ লিখিব কতক”—বলিয়া কাহিনী বাদ দিয়া গিয়াছে।

আমাদের অবলম্বিত আদর্শখানিও (ক-পুথি) এই দোষ ইহতে মুক্ত নহে। তবে অনেক পুথি মিলাইয়া পাঠ উদ্ধার করার আদর্শ পুথির জটিল অজ কোন পুথি দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সর্গজননবিনিত ঐরাবতের কাহিনীটির উল্লেখ করা যায়।

এই কাহিনী মূল বাণীক রামায়ণে নাই। অজ কোথাও এই কাহিনী খুঁজিয়া পাইলাম না, একমাত্র বৃহদ্রথপুরাণেই ইহা আছে। বৃহদ্রথপুরাণ ইহতেই কৃত্তিবাসী এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ক-পুথিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই কাহিনী আছে। গঙ্গা হিমালয়-শিখরে আটকাইয়া গেলেন,—বলিলেন,—ইন্দের ঐরাবত ভিন্ন অজ কেহ আমাকে এই স্থান ইহতে মুক্ত করিতে পারিবে না। ভগীরথ হইয়া ঐরাবতের আরাধনা করিলেন। ঐরাবত পারিশ্রমিকরূপে গঙ্গার প্রণয় প্রার্থনা করিল। ভগীরথ আসিয়া এই লজ্জাজনক কথা গঙ্গাকে জানাইলেন। গঙ্গা বলিলেন, ঐরাবত যদি আমার তেজ সহিতে পারে তবে আমি তাহার অঙ্গদাহিনী হইব। ঐরাবত বীকৃত হইয়া দন্ত-ধারা পর্কত-দুশ বিদীর্ণ করিল গঙ্গা সেই পথে নিম্ন-গামিনী হইলেন। ঐরাবত গঙ্গারোহণের বেগে-ভাসিয়া চলিল এবং তেঁহের চোটে জল বাইরা কীপার হইল। অবশেষে গঙ্গাকে মা ডাকিয়া পরিণাম পাইল।

এখন বিদ্যুৎ-বৈষম্যগুলি দেখুন। আমাদের গ-পুথিতে আছে, ঐরাবত উল্লবিধ পারিশ্রমিক চাহিয়াছিল বটে, তবে ইন্দের উপদেশে ক্ষান্ত হইয়াছিল। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত চ-পুথিতে এবং বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত ক-পুথিতে পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গমাত্র নাই। ঢাকায় প্রাপ্ত হ-পুথিতে ক-পুথি অনুযায়ী বর্ণনা আছে, কিন্তু রচনা বিস্তৃততর ও সুন্দর। এত সুন্দর যে, পাঠকগণের জ্ঞ উদ্ধত না করিয়া পারিলাম না।

চলিলেক ঐরাবত প্রথম ক্ষয়।

প্রবীণ শরীর বেন দ্বিতীয় হিমালয়।

কনক কঙ্কণ শোভে স্থগলিত অতি।

গলে খট্টা বাজে ধায় হৈয়া মনে মাতি।

উচ্চ ছুই দন্ত যেন ফটিকের স্তম্ভ।  
চলে হস্তীর মনে করি অতি দন্ত।  
চলিলেক ঐরাবত হরষিত চিত্তে।  
সিন্ধুরে মণ্ডিত শুণ্ড শোভে ভাল মতে।  
নিখাসেতে ধূলা উড়ে চলে মহাবল।  
কুণ্ডলী করিয়া শুণ্ড অতিশয় দীপক।  
কম্বোজের মদগন্ধে মাতি জ্বলে অগ্নি।  
গান করে অলিঙ্গল দেখি অতি ভালি।  
পদে পদে চলিতে অবনী হয় বাদ।  
বৃক্ষ ভাঙ্গে অতিশয় তনিত্রে প্রমাদ।  
বৃক্ষ পাথর সম্মুখেতে বাহা দেখে।

নিখাসের ভরে হাইয়া পড়ে অজ বৃক্ষ।  
বড় বড় পর্বত সব সম্মুখে দেখিয়া।  
নানা দিকে ফেলে নিজ দন্তে উপাড়িয়া।  
কেহ জলে কেহ হলে যত প্রাণিগণ।  
অতিভয় পায় তারা তনিয়া জঙ্ঘন।  
গর্জনে তনিয়া যে আইসয়ে নিকটে।  
ধ্বংসীয় ছায় হাতী অতিবেগে ছুটে।  
সিংহ ব্যাঘ্র আদি যত পশুপক্ষীগণ।  
নিজ প্রাণ রাখিবারে সব ভয় মন।  
পাতালের নাগগণ হয় চমকিত।  
ঐরাবত পর্বতের বাসুকী চ্যুতিত।

ঐরাবতের এই চমৎকার বর্ণনাত হ-পুথি ভিন্ন অজ কোন পুথিতে পাই নাই। অতঃপর হাতী আসিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে—

হাতী দেখি ভাগীরথী কোপদুষ্টে চায়।  
মহাশোভে গঙ্গারাজ ভাসি জাগি যায়।  
পৃথিবী মণ্ডলে হৈল গঙ্গা অবতার।  
জয় জয় ধ্বনি হৈল এতিন সংসার।  
গঙ্গাদেবী ঐরাবতে ভাষায় পর সোভেতে।  
অবিরত গঙ্গাদেবী পড়ে পৃথিবীতে।

তরঙ্গে পড়িয়া হাতী তৃণ বেন ভালে।  
দেখি ভগীরথ রাজা হরিষ বিশেষে।

বলদ্বীপ হইয়া হাতী খায় প্রচুর জল।  
রহিবারে ঐরাবত নাহি পায় স্থল।  
অবিরত ভাসিলা বেড়ায় ঐরাবতে।  
তৃণ ছায় ভাসে হাতী অগাধ জলেতে।  
আছুক লাভের কার্য্য জীবন সংশয়।  
সদ্যে চৈকিল হাতী উপায় না দেখয়।  
আকুল হৈল ঐরাবত প্রাণ রাখিবারে।  
সদ্যে পড়িয়া হস্তী গঙ্গা জতি করে।  
জল হৈতে তুলি শুণ্ড উচ্চ করি মাথা।  
জতি করি বীরে বীরে গঙ্গায় কহে কথা।

জতি করে ঐরাবত করিয়া বিনয়।  
তনিক্রা জমিল দয়া গঙ্গার ক্ষয়।  
এক তরঙ্গেরে ভীরে ফেলিলেক হাতী।  
প্রাণ পাঞা কর্ষ ঝাড় দেয় শিশুগতি।  
শেষ ছয়ের বর্ণনাত হস্তারসের বিক্ষোভক!

গঙ্গাতীরের বিবরণ একমাত্র হ-পুথিতেই বিস্তৃত ভাবে আছে—অজ সমস্তগুলি পুথিতে এই স্থান সংক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটী ভূমিচারী ভ্রামকের কাহিনী আছে। ব্যাঘ্র-নিহত পাতালের নাগগণ হয় চমকিত। এই দ্বারাচরের অধি বনমধ্যে পড়িয়াছিল—উহাতে গঙ্গাজল-পর্শে ভ্রামক মুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। বাহার-সংঘর্ষে এই ভ্রামকের নাম কাণ্ডার মুনি। আমাদের হ-পুথিতে ভ্রামকেই,—গ-পুথিতে লবণ-চক্র পুথিতে ধর্মকেই। এই গল্পটির মূল দশপুরাণের কাশীখণ্ড, পূর্বাঙ্ক, ২৮শ অধ্যায়। তথায় ভ্রামকের নাম বাহীক।

জঙ্ঘ মুনির গঙ্গাপান প্রসঙ্গে মূল রামায়ণে আছে—  
জঙ্ঘ, গঙ্গাকে কর্ণপ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।  
কৃত্তিবাসের পুথিগুলিতে দেখা যায়, বিদীর্ণ জঙ্ঘ দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়াছিলেন। এই ক্ষাঘপক্ষে নির্গম-কাহিনী বৃহদ্রথপুরাণে আছে।

পদানদীর উৎপত্তি-কাহিনী প্রসঙ্গে বাহার-



সংস্রবণে দেখা যায়,—ভগীরথনামে গঙ্গা পদ্ম মূনির পিছনে চলায় পদ্মা নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মূলও বৃহদ্ধর্ষপুরাণে। তথায় দেখা যায়, পদ্মা জন্ম মূনির কস্তা,—গঙ্গাকে দেখিতে তাহার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি শম্ভুধর্মনি করেন। তাহা শুনিয়া গঙ্গা অমিকোণে ধাবিত হন—পরে ভগীরথের শম্ভুধর্মনি শুনিয়া কিরিয়া আসেন (মধ্যখণ্ড—২২১৩-৩৭)। অমৃততাতারের মূর্তিত পৃথিতেও পদ্মাজন্মপ্রসঙ্গ আছে—কিন্তু জন্ম কাহারও পিছনে চলিয়া নহে। ব-পৃথিতে পদ্মাহরের পিছনে চলিয়া।

বাসলা দেবের ভাগীরথী-তীরহু গঙ্গা-তীরগুলির নাম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক হিসাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু রামায়ণে জন্মপ্রসঙ্গের পরেই সাগর প্রবেশ। বৃহদ্ধর্ষপুরাণে জন্মর ভাষ্য হইতে বাহির হইয়া বমুনাসর পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মুক্তবেণী ত্রিবেণী-সমুদ্রগ্রাম হইয়া গঙ্গার সাগরে প্রবেশ বর্ণিত আছে। আমার ক-গ-চ-পৃথিতে রামায়ণবৎ বর্ণনা। হ-পৃথিতে আদিভা তীর, একাদশী তীর ও সমুদ্রগ্রামের উল্লেখ আছে। বাজার-সংস্রবণে ইন্দ্রেশ্বর, মেঘাতলা ও সমুদ্রগ্রাম। ব-পৃথিতে শীতপুর, নবদ্বীপ, সমুদ্রগ্রাম।

মুদ্রিত অমৃততাতারো তুলসীঘাট, মহেশ্বরনগর, নেতাই ঘোপানীর ঘাট, কপিলমুনি, গঙ্গাগাঙ্গর। রুতিবাসের কোন পৃথিতে নবদ্বীপের নাম পাই নাই—উহা একমাত্র ব-পৃথিতে দেখিয়াছি। সম্ভ্রুতি পণ্ডিতবর ঐশ্বর্যক যোগেশচন্দ্র রায় তৃতীয় বারের গণনার রুতিবাসের জন্ম ১৩২০ শকের মাঘ মাস, রবিবার ঐপক্ষমী দিন হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তখন বাঙ্গালার রাজধানী পাণ্ডুরায়,—গৌড় পরিত্যক্ত। রুতিবাস ১৩৩৯-১৩৪০ শকে বিশবর্ষ বয়সে রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গার গমন-পথে নবদ্বীপের মত প্রধান স্থানের অন্বেষণে দেখিয়া মনে হয়—ই-ব-ত্ৰিয়ারুদ্দিন-বিশগু নবদ্বীপে তখন পর্য্যন্তও পুনরায় জনবসতি আরম্ভ হয় নাই।

হ-পৃথিতে ইহার পরে চমৎকার একটি রচনায় গঙ্গা-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উহা সম্পূর্ণ বৃহদ্ধর্ষপুরাণের অমৃতবায়ী। কিন্তু প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এই মাহাত্ম্য পাঠের পুণ্য হইতে পাঠকগণকে সন্তোষ বঞ্চিত করিলাম। \*

\* 'তাহার' 'তাহাদের' প্রভৃতি বানান লোকের মৈশিষ্ট্য। —  
উদয়ন-সম্পাদক

“দেশের ইতরসাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ, এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তির যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না।”

—বিবেকানন্দ

( লঘুগুরু-স্বরমাত্রিক )

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শুনি' বংশী বিভল হিয়া উর্ধ্ব-উক্তল, পিয়াসদে সে চায় লো—জিভল ভ্রামল  
যাগ রটে : “জনমে জনমে  
মোর মূচ্ছাদল যবে মুগ্ধ অমল—ভবে বিদগ্ধি' ত্ব-বাধা বন্ধা বিফল  
গান-তটে শরণে পরমে।”...

ছিল সঙ্গারে আশ কত...দীর্ঘ নিশাশ সব বধিল—অন্তরে সিদ্ধ-উদাস  
যবে ডমক তুহার নিনাদিল হে !  
সেই রোল তব স্বংপরে সকলি' নিদ্রহরে স্বপ্ন-আলিপিনে দীপল তিয়াস,  
রক্ত-পথে অভিসারিল যে।।...

রতি নিত্য-নৃতন বত গঞ্জিল—মন তত তৃষ্ণিকা গন্ধি' লো ছুটল বনে—  
বাধা পতি-পৌরব স্বথ-সাজ ভরম,  
হেলি' শবিল : “হায়, বাধা কটক-পায় কী নিরদেখে যাকিল মৃত্যুপাণে ?  
সবে বাজ কুলে তাভি' লাজ ধরম।”...

হানি' তৃপ্ত যে জন গেছে—ক্লম-চরণ-ডাকে হয়নি কলঙ্গিনী সর্বনাশী—  
য-শেঙ্ক-ফুলে নিতি দর্প সহ—  
যে ন পুঙ্খ-বেদন তারে বল তে। কেমন ক'রে বর্ষি সোই—যে না শুন্ল বাশি—  
মজী-দীর্ঘিত আয়তি ব্যর্থ বহে ?

কছু কিঞ্চিৎ-কল্পণে-অকৃত-অঙ্গনে মুক্তি-মকুৎ তোলে দীপ্তি কলি' ?  
কছু মোহ-বিশ্বাস-বিদ্যাল তরী  
ধায় অথুথি-আছানে শম্ভু-উপাঙ-টানে সৈকত-জঙ্গল না বুতে দলি' ?—  
উঠে ফুল-ফুলে যে চির শিহরি' ?

খেত মণ্ডর-সৌম যে সম্পদ-ওরসে জন্মি' বরণ করে যুক্তপাণি—  
সে কি বোম-বিতান শিখান স্বপে ?  
উগু-উৎসব-উল্লাস নিত্য বে-কুল্লরা—কান পাতি' শুন্বে সে মৌন বাণী ?  
মদ-বদ সভা ব্রত-ময় জপে ?

হায় ঘবহাড়া অঙ্গনে শূভ ভুবন প্রেমে নীলগরুড় নমিত দেখল না যে—  
তার নয়ন নীলমণি কছু কি ভরে ?  
ছুই' বিধ যে অধরপুটে ছয়নি অমর—শিতকণ্ঠ-শিখারুনে তার কি নাচে  
বুক অমৃত-রসে লহরে লহরে ? \*

\* জতি গুরুতর গণন ও তৃতীয় লাইন বরনামি ছিল ( মরিচা ) রচিত ; দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইন লঘুগুরু ছন্দ, অর্থাৎ আ, ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ, হ্রস্বা।। অতিপঞ্জিক শব্দগুলি ( শুনি' যার মোর ইত্যাদি শব্দ ) মাত্রাবৃত্তে রচিত।



কলিকাতায় সে-বৎসর বসন্ত রোগের মহামারী হুক হইয়াছে। বীরেন সেন-দীন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াই নারায়ণীকে সাবধান করিয়া দিল।—‘দেখো বেন হেলেন্টার ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ অর-ভাগা না হয়। তোমার বাড়ীউলী-মা’কে ব’লে দিয়ে।’

নারায়ণী বলিল, ‘হ্যাঁ, তাই শুনি। মা বলছিলেন, ঐ যে ঐখানে কদমগাছগুলো বাড়ীটা আছে না, ঐ বাড়ীতে কার বেন কি হয়েছে।’

বীরেন বলিল, ‘ছেলেটাকে বাড়ী থেকে বেরোতে দিয়ে না।’

ঘাড় নাড়িয়া নারায়ণী বলিল, ‘বেশ।’

‘তুমি বেশ বললে কি হবে? তোমার সঙ্গে ত’ আর বেরোয় না, বাড়ীউলীকে সাবধান ক’রে দিও, তা’ হ’লেই হবে।’

নারায়ণী বলিল, ‘মা’কে কিছু বলতে হবে না। তিনি তোমার চেয়ে বেশী জানেন।’

কিন্তু ব্যাপি যখন আসে, তখন আর জানা-জানির তয়োক্তা রাখে না। দিন কয়েক পরে একদিন সকাল দেখা গেল, দেবুর রীতিমত জ্বর হইয়াছে। শরীর বেন আগুনের মত গরম, চোখ দুইটা লাল। নারায়ণী তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া গায়ে ঢাকা দিয়া শিরের কাছে বসিয়া রহিল। মাসি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ‘ও কিছু না মা, হ’দিনেই সেরে যাবে।’

মায়ের মন কিন্তু তাহাতে আশ্বাস মানিল না।

পাড়ার চারিদিকে বসন্ত হইতেছে, স্বামী তাহাকে আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তবু ছেলেটার জ্বর হইল, সে হয়ত আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার অপমানের কিছু আর বাকী রাখিবে না।

তা’ অপমান করে করুক, হে ভগবান, তাহার ছেলের বেন কিছু না হয়।

বীরেনের জ্বর রাতে প্রতিদিন নারায়ণীকে রান্না করিতে হয়। সেন-দীন তাহার রান্নার কথা আর মনেই রহিল না। ছেলের শিরের বসিয়া ভয়ে-ভাবনায় সজুতি হইয়া গিয়া দুর্দল ও অসহায়ের একমাত্র ভরসা দেবতাদের কাছে তাহার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

মাসি বলিল, ‘ভয় কিলের নারায়ণী, ছেলের অস্থব-বিশ্বহ হবে না?’

নারায়ণী বলিল, ‘কিন্তু এসময় অস্থব করলে যে বড় ভয় করে, মা।’

মাসি বলিল, ‘কিন্তু ভর নেই, মা; ভয় করিসনি। তুই বরং ছেলের কাছে বোস, আমি তোর রান্না ক’রে দিই।’

বলিয়া নারায়ণীকে ছেলের কাছে বসাইয়া মাসি নিজেই রান্না করিতে গেল।

বীরেন তখনও বাড়ী কিরে নাই। বাড়ী ফিরিয়া ছেলের অস্থব দেখিয়া কি যে সে বলিবে, কে জানে। বাহিরের দিকে কান পাতিয়া সে তাহার পাখের শব্দ শুনিতে লাগিল।

ও’জনের রান্না এমন বিশেষ কিছুই নয়। শেষ হইতে বেশী দেরি হইল না। মাসি বলিল, ‘রান্না-ঘরেই সব ঢাকাঢাকি দিয়ে রাখলাম মা, বেড়ে

নিয়ে বা’স।—কিন্তু বীরেন আজ এখনও কেন আসছে না, বল দেখি? আসবে না—না কি?’

ঘাড় নাড়িয়া নারায়ণী বলিল, ‘আসবে।’

‘এসে যদি তোকে বকাবকি করে ত’ আমাকে ডেকে দিল, বাছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।’ বলিয়া মাসি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাসি বোধ হয় তখনও তাহার উপরের ঘরে গিয়া পোছে নাই, এমন সময় জুতার শব্দ করিয়া বীরেন ঘরে ঢুকিল।

চুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, ‘ও কি? খোকা ওরকম ভাবে শুয়ে কেন?’

নারায়ণীর মুখখানি তখন ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না। শেষে অতি কষ্টে গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, ‘জ্বর হয়েছে।’

‘হঁ’ বলিয়া গদীর মুখে বিছানার কাছে আগাইয়া গিয়া দেবুর মাখার গায়ে হাত দিয়া বীরেন বলিল, ‘চেনৎকার।’

তাহার পর জামা খুলিয়া, জুতা খুলিয়া, কাপড় ছাড়িয়া হঠাৎ সে উমাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘মা’ ভেবেছিলাম, ঠিক তাই।’

বলিতে বলিতে সে হাত-পা দুইবার জ্ঞক কলতলার দিকে চলিয়া গেল। বলা তাহার তখনও শেষ হয় নাই। কলতলার হাতে পায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে সে বলিতে লাগিল, ‘ছি ছি ছি ছি, এবার আমি করি কি! এই জ্ঞকে কতদিন ধরে সাবধান ক’রে দিছি, তবু হ’ম্ নেই।’

সিঁড়িতে ঠাড়াইয়া ঠাড়াইয়া মাসি সবই শুনিла। তাহাকে সাধুনা দিবার জ্ঞক কি যেন সে বলিতেও বাইতেছিল, কিন্তু কথাটা তাহার মূব দিয়া বাহির হইবার আগেই বীরেন বলিয়া উঠিল, ‘মা, ছেলেকে আমার ভালবাসতে হবে না। বুড়ী মাগী—এইটুকু ছেলেকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, জানে না। যে ঘরে-ঘরে বসন্তের রণী! রণী দেখতে নেচে ইচ্ছে হয়

ত’ নিজে-বাও না বাপ, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কেন?’

কথাটা যে তাহাকেই বলা হইতেছে, মাসি তাহা বুঝিল। ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সর্দভই সে যায় সত্য, ছেলেটা কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না, কিন্তু ছেলে লইয়া কোনও রোগীর বাড়ী সে কোনও দিনই যায় নাই। এবং অস্থব যে তাহার শুণু সেই জ্ঞকই, এ তুল ধারণাই বা বীরেনের হইল কেন!

সিঁড়ির এক ধাপ এক ধাপ করিয়া বীরে বীরে মাসি নাঁচে নামিয়া আসিল। বীরেন কলশর হইতে ঘরে গিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, ‘মাগীকে তুমি বুঝিয়ে ভাল ক’রে বলনি যে, পাড়ায় বসন্ত হচ্ছে, ছেলেকে এ সময় কোথাও তুমি নিয়ে যেনো না?’

নারায়ণীর মন ভাল ছিল না। কথাটার সে ভাল করিয়া জবাব দিতে পারিল না; বলিল, ‘ও তোমার কি যে স্বভাব, কে জানে। কেন তুমি ওঁকে শোধ দিচ্ছ, বল ত?’ ছেলে তোমার মা মা ক’রে অজ্ঞান! একা ওঁর এক-পা বাড়ী থেকে বেরোবার জো আছে? লুকিয়ে বেরিয়ে গেলে কীদতে কীদতে দে’ ওঁর পিছু-পিছু ছোটো।’

বীরেন বলিল, ‘তাই ব’লে এই অস্থব-ব্যারামের কথা ভেনে শুনেও নিয়ে বেতে হবে? কচি থুকি ত’ নয়,—বুড়ী মাগী জানে না যে—ছেলের যদি এখন ঐ রকম একটা কিছু হ’য়ে যায় ত’ বাঁচানো শক্ত হবে।’

মাসি অন্ধকারে ঠাড়াইয়া ছিল। ইহার কারণেই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। মাসিও আর চুপ করিয়া ঠাড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া দরজার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, ‘অনর্থক আমার তুমি কেন দোষী করছ বাবা, ছেলের দরদ আমি বুঝি।’

বীরেন রাগিয়াই ছিল, তেমনি রাগিয়াই জবাব দিল। বলিল ‘ছাই বুঝেন। নিজের ছেলেকেই হয় নি, কেমন ক’রে বুঝবেন আপননি?’

সে যে হঠাৎ এত বড় একটা শক্ত কথা বলিয়া বসিবে, মাসিও তাহা বুঝিতে পারে নাই, নারায়ণীও



ভাবে নাই। ছি ছি, এ তার ভারি অগার। নারায়ণী মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ খাট হুইতে নামিয়া মাসি যেখানে গাড়াইয়াছিল, সেইদিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। 'কিন্তু, 'মা'!' কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া বলিল, 'মা, আপনি কি চলে গেলেন?'

এবারও কোনও জবাব পাওয়া গেল না। নারায়ণী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বীরেনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ছেলের অশ্রু, বেশি কিছু তোমায় বন্ধ না, কিন্তু তোমার পায়ে আমার মাথা বুঁজে মরতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন?' বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরেন তাহার মুখের পানে তাকাইল।

নারায়ণী বলিল, 'কেন, তা' বুঝতে পারছ না? মা'কে তুমি মিছামিছি অপমান করে' দিলে, উনি রাগ করে' চলে গেলেন।'

বীরেন দাঁতবুখি ঠাট্টায়া জবাব দিল। বলিল, 'না না, রাগ করে' নি। তোমার সবচেয়ে বাড়াবাড়ি। যাও—ছেলের কাছে চুপ করে' বোসো যে বাও।'

ভয়ে আর নারায়ণী কোনও কথা বলিল না। একবার ভাবিল, উপরে গিয়া মাতের রোগ ভাগাইয়া আসে, কিন্তু স্বামী পাছে আবার রাগিয়া চাঁৎকার করিয়া গুঠে বলিয়া তাহাও সে পারিল না, আবার তেমনি বীরে বীরে দেবুর শিররের কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া বলিল।

বীরেন গানকি চুপ করিয়া হেটমুখে কি বেন ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বান্নাবান্না কিছু হয়েছে, না তাও হয় নি?'

নারায়ণী বলিল, 'হয়েছে। তুমি একটু এইখানে এসে দেখো, আমি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।' ছেলের অশ্রুধের চিন্তায় খাওয়া সেদিন কাহারও আর ভাল করিয়া হইল না। আহারাদির পর

বীরেন শুইয়া পড়িল। লঠনটা হাতে লইয়া হেসেলেসে কাছ সারিবার নাম করিয়া নারায়ণী কিন্তু চুঁত করিয়া একবার উপরে উঠিয়া গেল।

বেশিল, দরজায় খিল বন্ধ করিয়া মাসি তখন শুইয়া পড়িয়াছে। 'মা' 'মা' বলিয়া বারকতক ডাকাডাকি করিয়াও খিল বন্ধন তাহাকে সে খোলাইতে পারিল না, তখন কি আর করিবে, বাধ্য হইয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্রুকণ্ঠ বসিয়া দরজার কাছে চুপ করিয়া গাড়াইয়া গাড়াইয়া কি বেন ভাবিল, তাহার পর লঠনটা বাটের কাছে নিবাইয়া রাখিয়া দেবকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া শুইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রিটা এক রকম বিনিস অবস্থায় কাটাছিল ভোনের দিকে নারায়ণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালে বীরেনের ঘুম ভাঙ্গিছেই দেখিল, মা ও ছেলে ছ'জনেই ছ'জনকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইকেছে। দেবুর গায়ে হাত দিতেই সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়াই বাবাকে সে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া কি যে ভাবিল, কে জানে; কিন্তু করিয়া একবার হাসিয়াই সে তাহার মা'র বুকের ভিতর মুখখানি লুকাইয়া ফেলিল।

'দেখি বাবা, আর একবার দেখি'—বলিয়া বীরেন তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, উত্তাপটা বেন কাল রাত্রির চেয়ে অনেক কম। তাহা ছাড়া সমস্ত রাত্রির মধ্যে দেবু একবার মূর্ছ তুলিয়া তাকানো দূরে থাক, একটা সাড়াশব্দ করে' নাই, জ্বরের ঘোরে বেরে'স হইয়া পড়িয়াছিল; এতক্ষণ পরে মুখে তাহার হাসি ফুটরাছে। তবু বিশ্বাস নাই, সময় ব্যাপ্য, ভাল একজন ডাক্তার ডাকিয়া দেখানো উচিত। অথচ, আট টাকা 'জিজি' না দিলে ভাল ডাক্তার কোথায় হয় পাওয়া যাবে না। লাইফ ইন্সিওরের প্রিমিয়াম দিয়া হাতে তাহার মাত্র গোটা দশেক টাকা রহিয়াছে।

ডাক্তারের ঔষধ যদি এ দশটি টাকা আছই খরচ হইয়া যায় ত' মাসের বাকি কমটা দিন তাহাদের দেয়।

মাথা কি আর সাথে বিগড়াইয়া যায়! ... নারায়ণী বুকে না। ভাবে, বুঝি সে ইচ্ছা করিয়াই বাহার-তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।—এবনি সব নানান কথা ভাবিতে ভাবিতে বীরেন হাত-মুখ বুজিতে গেল।

দিরিয়া আসিয়া দেখিল, নারায়ণীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং সে শয্যাভাগ করিয়া উমান ধরাইয়া ঘরের কান্নকণ্ঠ করিতে বসিয়াছে।

বীরেন আসিছেই নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপিস যাবে ত'?'

বীরেন বলিল, 'যাব।' বসিয়াই সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আগে একজন ডাক্তার ডেকে আনি, কিন্তু—'

এই বলিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নারায়ণী বলিল, 'কি?'

বীরেন বলিল, 'টাকাকড়ি হাতে নেই, কি যে হবে, কে জানে।'

নারায়ণী একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল, একবার দেবুর দিকে তাকাইল। বলিল, 'দাঁড়াও, তোমার চা এনে' দিই, বোসো।'

চা বাইয়া বীরেন ডাক্তার ডাকিতে যাইবে বলিয়াছে, কিন্তু হাতে তাহার টাকা নাই। নারায়ণী তাহার গলায় সৰ্ব্ব হারপাতি গুলিয়া চুপ্তিপুপি বীরেনের হাতে দিয়া বলিল, 'বন্ধক দিয়ে' মা' পাও তাই দিয়ে কোনও রকমে এখন চাটিয়ে নাও, কিন্তু মাইনে পেলে আসুছে-মাসে আবার ছাড়িয়ে দিয়ে' সেন।'

হার ছড়াটি হাতে লইয়া বীরেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কি করিবে, বোধ করি তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় বাহিরে অপরিস্রব কন্ঠের ডাক শুনিয়া সে উঠিয়া গাড়াইল। বলিল, 'কে?'

'কে' বলিয়া আর বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইল

না, বিনি ডাকিতেছিলেন তিনি বরং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, অপরিস্রব এক বৃদ্ধ—মাথায় লম্বা লম্বা পাকা চুল, মুখে একমুখ শাধা দাড়িগাঁক, একেবারে দরজার কাছে আসিয়া বলিতেছেন, 'কোথায় গো মা—আহা কি বলল, নামট বে ভুলে গেলাম। কার অশ্রু করছে গো, কণী কোথায়?'

বীরেন আগাইয়া গেল।—'কাকে চান আপনি?' আশ্রুক বলিলেন, 'আমাকে চিন্তে পারলে না, বাবা? বুড়া চিন্তামনি কোব্রেরের নাম শুনেছ?'

বীরেন বলিল, 'জানছি।' 'হ্যাঁ, তা' ত' শুনেই, বাবা। এ পাড়ার রয়েছ যখন... আমিই সেই বুড়া কোব্রের। সেই কোন্‌ ভোর রাতে মা আমার গিয়ে ব'লে এলো—ছোট একটি ছেলের নাকি মা শীতলার রূপা হয়েছে, কই দেখি বাবা, একবার ছেলোটেকে আমি দেখ'।

এতক্ষণ ব্যাপারটা শুধিতে কাহারও আর বলপ হইল না।—মাসি গিয়াই কবিরাজকে ডাকিয়া দিয়াছে।

বীরেন বলিল, 'আম্বন।' বলিয়াই সে তাহাকে দেবুর কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'এই ছেলে।'

কবিরাজ মহাশয় পারের চট ছোড়াট ঘরের বাহিরে গুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন। খাটের একপাশে চাপিয়া বসিয়া দেবুর মুখের 'পরে' ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বুড়ার লম্বা লম্বা দাড়ি দেখিয়া দেবু তখন ভয়ে একেবারে কাঁ হইয়া গিয়াছে। হাত বাড়াইয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'কই দেখি বাবা, হাতটি দেখি।'

ভয়ে-ভয়ে দেবু তাহার হাতটি বাহির করিল। নিষিদ্ধ মনে কিয়ৎক্ষণ নাড়ি টপিয়া কবিরাজ মহাশয় একবার বীরেনের মুখের পানে বিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন। বলিলেন, 'রাতে বুঝি জর হয়েছিল?'

বীরেন হাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'



কবিরাজ মহাশয় ঈবং হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আর শোনাবার মেয়ে? কিছুতেই শুনে না, বললে, এর বসন্ত হয়েছে, কে বললে?'

বীরেন বলিল, 'রাগে ভয়ানক জ্বর—জরের ঘোরে একেবারে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে ছিল, তার ওপর এই সময়টার প্রায় ঘরে-ঘরেই ঐ ব্যারাম হচ্ছে কি না, তাই একটুখানি—'

বুদ্ধ কবিরাজ ঘাড় নাড়িয়া, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, 'না। বসন্ত ওর হবে না। সে জরের চেহারা-ই আলাদা বাবা, সে-সব কিছু নয়। আপনারই সম্ভান বুঝি?'

বীরেন বলিল, 'অজ্ঞে হ্যাঁ।'

কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'আম্বন আমার সঙ্গে, ছ'টো বড়ি দেবো, মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দেবেন, কাল আপনার ছেলে ছুটে বেড়াবে।'

বীরেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জামাটা গায়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কণী দেখতে আপনি ক'টাকা—'

কবিরাজ বলিলেন, 'সে ত' আমার মা-ঠাক্কণ আপনাই দিয়ে এসেছে, বাবা। বললাম, আগে কেন মা, কণী আগে দেখে আসি, কিন্তু সে কি

আর শোনাবার মেয়ে? কিছুতেই শুনে না, বললে, সন্ধ্যা বেলা আপনাকে ডাকতে এসেছি, টাকা ছ'টি আপনাকে নিতেই হবে।'

বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহিরে 'হাসিয়া দাঁড়াইলেন।—'কই, আমার মা কোথায় গেল গো! মা'র সঙ্গে যে আমার দেখা হ'ল না!'

বলিয়া তিনি মিথিরা কাছটায় দাঁড়াইয়া একবার উপরের দিকে তাকাইলেন।

পাশেই কলঘর। মাসি এতক্ষণ বোধ করি এই খানেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল, কলঘরের ভিতর হইতে তাহার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।— 'আপনি যান। আমি সব শুনেছি।'

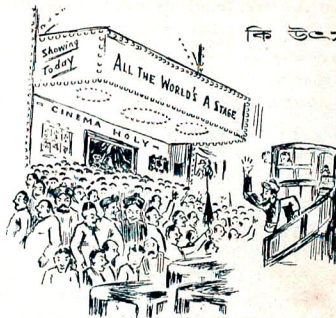
কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, 'সে রকম ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলে মা, ভেবেছিলাম সত্যিই বৃষ্টি বা কিছু হয়েছে। কিন্তু এসে যা' দেখলাম, ও কালই আবার তোমার পিছু-পিছু ছুটে বেড়াবে, মা। কিছু ভেবো না।'

মাসির কাছ হইতে আর কোনও জবাব পাওয়া গেল না। কবিরাজ ও বীরেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)



আমরা কিসে কন?



কি উৎসাহে!



কি উত্থানে!



## নূতন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

ডাঃ ত্রিবিজ্ঞেন্দ্রনাথ মৈত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

কি করিলে স্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা হয়?

এই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ-সংখ্যায় আমরা আদর্শ জীবন কি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি, স্বাস্থ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ কি—এই সকল কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছিলাম। এই প্রবন্ধে, কি উপায়ে স্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়ে নূতন স্বাস্থ্যনীতি কি শিক্ষা দিচ্ছে, সেই বিষয়ে কিছু বিচার করব।

যাকে আমরা 'সভ্যতা' বা Civilisation বলি, সেই মানুষের স্বাস্থ্য, বিলাস-আরাম-প্রবণ সভ্যতা সমাজের মধ্যে বহু পরিমাণে অস্বাস্থ্য এনেছে। চল্লিশ বৎসর কাল বৃত্তান্তনিকের ওপাশ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি ঠাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কোন বৃত্তান্তকে ব্যারামে মরতে দেখেন নি। হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে হুজা নামে এক জাতি বাস করে। অহম্মদান ক'রে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে কখনও সভ্য জগতের নানাবিধ রোগ দেখা যায় নি। এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। দেখতে পাওয়া যায় এই যে, বাঁরা সহজবুদ্ধি ও প্রকৃতির (instinct) নির্দেশে, জৈব নীতি অহুসারে (biological laws of living) জীবন যাপন করে, তাদের মধ্যে সহজে রোগের প্রাচুর্য্য হয় না।

সভ্যতা যে কি তবে অস্বাস্থ্য এনেছে, সে কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। ভগবান্ চান যে, আমরা বিত্তমূলক বায়ুর মধ্যে বাস করি। তার পরিবর্তে আমরা আমাদের দরবাড়ী এমন ক'রেই তৈরী করি যে, ঘরের মধ্যে বায়ুচিহ্নিত ও বাতাসপরিমাণে বাত-চলাচল সম্ভব হয় না। এইরূপে বায়ুর 'উপবাসে' আমরা আমাদের এমনই অভ্যস্ত ক'রে ফেলি যে, অধিক বা খোলা হাওয়া আমাদের যেন 'হুমক' বা সহ্য হয়

না; "ঠাণ্ডা লাগে"। বহুই ভাবি ঠাণ্ডা লাগে, ততই আরও জানালা বন্ধ করি; বড়বড়ি-শাদি বন্ধ ক'রেও নিশ্চিন্ত না হ'লে কাঁকে-ফোকে করে কাপড়-কাপড় পর্য্যন্ত গুজতে কুড়িত হই না; শুষ্ক তাই নয়, দেহটিকে আরও কাপড়ের উপর কাপড় দিয়ে মুড়ি! ফলে হয় এই যে, আমাদের হাওয়া-বাতাস সহ্য ক'রবার ক্ষমতা ক'মে যায়। এইরূপে এক চক্রের (vicious circle) সৃষ্টি হ'য়ে, মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা ক'মে যায় ও আমরা সহজে রোগাক্রান্ত হই।

রোগের গুণ অনেক। রোগালোক রোগবীজ নষ্ট করে; হাড় ও মাংসকে শক্ত করে; আমাদের আহাৰ্য্য সামগ্রীর 'পাণ্ডপ্রাণ' বৃদ্ধি করে ও তা'র অম্বতাকে পূর্ণ করে। স্বর্গ্যালোক 'সরলপাপর'; "আরোগ্যং ভাষ্যরাগিচ্ছৎ"। হেলেনিপেলের পেছনে বাপ-মায়াদের "রোসে যানি", "রোদ লাগবে"—এ চিৎকার লগেই আছে। পাছে আমাদের রঙ কালো হই যায়, এই ভয়ে বা অজ কারণে আমরা বস-বাঁটা, ছাতা-কাপড়ের বদলেবস্ত্র ক'রে, রোদকে আমাদের দেহের সংস্পর্শে আদৌ আসতে দিই না। অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক-ভাষ্যের যে অপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করছি না; কিন্তু, তাই ব'লে রোগালাকের গুণ থেকে আমাদের শরীরকে যেন বঞ্চিত না করি।

আমরা অনেকই জানি না যে, আমাদের দেহের আবরণ যে-চামড়া (বা বহু), সেটা একটা বিশেষ ইঞ্জিন; তা'র অনেক বড় কাজ আছে। রোদ ও বাতাসের সংস্পর্শে স্বস্থ ও সজ্জিত হ'লে, এই চামড়ার মধ্যে যে বায়ু, শিরা, পেশী ও গ্রন্থিসমূহ আছে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়া-কলাপে ও নিয়ন্ত্রণে সহজে আর ঠাণ্ডা লাগে না; বরং দেহ শক্ত ও সবল হয়।

সরল। আলো-হাওয়ায় উন্মুক্ত রাখি ব'লে আমাদের মুখে তো ঠাণ্ডা লাগে না! আমি যুরোপ ভ্রমণকালে, শীতকালে ও বরফের উপরেও ধুতির সঙ্গে মোজা না পরে অনেক বেড়িয়েছি; কৈ, ঠাণ্ডা তো কখনও লাগে নি। হাতে দস্তানা (gloves) পরি নি; বরং পরলে দেখেছি হাত যেন আরও শীতল ক'রুন করে।

কাল এল যে, ধৃত্তিপোষাকে আমাদের পা সরল। অনাবৃত থাকায়, যথেষ্ট মত সরল। আলো-বাতাসের সংস্পর্শ লাভ করে। অবশ্য খুব শীতের কথা বলছি না। আমাদের প্রাচীনপন্থী মেয়েরা, বিশেষতঃ বিধবারা, ঐ একখানি কাপড়ই যেমন শীত সহ্য করতে পারেন, আমরা নব্যপন্থীরা কাপড়ের উপর কাপড় চাপিয়েও তা' পারি না; সর্দিকানিও বন্ধ হয় না।

আমি দেখছি, এদিকে-খুব-পণ্ডিত এক বাগকে, মেয়ের কাশিপিচ্ছ "আবার কাশি! গায়ে বা গলায় আর একটা কাপড় জড়াও" ব'লে, পেরোলের খোশার মত, কাপড়ের উপর কাপড় চাপিয়ে তাকে প্রায় গোলাকৃতি ক'রে ফেলতেন! তার পর ঘণ্টার ঘণ্টায় ঔষধ সেলানো তো আছেই!

সভ্যতা কত রুজ্জিম উপায়ে ও রকমে, আমাদের আহাৰ্য্যসামগ্রীর ভ্রাবণ্ড তো নষ্ট করছেই; আবার তাদের লোভনীয় ও রসনা-উত্তেজক ক'রে আমাদের রাস্তাবিক মুদ্রা-পরিচরিত্বের যে সহজ প্রকৃতি তার অতিরিক্ত এক অনাবৃত্তক ও অস্বাভাবিক কুদার কাম বা লালসার উদ্রেক করে। ফলে, তার চরিত্ত্যস্থান করতে গিয়ে, অপরিমিত ও অস্বাস্থ্যকর ভোজনের দ্বারা আমরা আমাদের পরিপাক-বন্ত্রগুলিকে বিকৃত, রক্তকে তছমনি দূষিত ও শরীরকে দুর্বল ও রোগগ্রস্ত ক'রে ফেলি। আমরা যেন বাঁচবার জন্ত ঝাই না; খাবার জন্তই বাঁচি। সহরে ও আছরে কুকুর-বিড়ালের কথা বলছি না, সভ্যতাদোষে তারাও ছুট; কিন্তু সহজ প্রকৃতিচালিত প্রাণীদের মধ্যে, আহারে এক-কামপ্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না।

সভ্যতা, আমাদের স্বস্থ ও আরামপ্রিয়, অমবিযু

ও বিলাসী ক'রে, আমাদের দেহের পেশীগুলিকে নরম ও রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাকে ক্ষীণ ক'রে, আমাদের দুর্বল ও ক্ষীণকার ক'রে ফেলছে; আর দেহের 'জমি'কে, যেন নরম 'দারমাটি' পেয়েই, বিবিধ রোগের বীজসঞ্চার সহজে অধুসিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এদিকে আবার এই বর্তমান কাম্ববল, সদাচকল, উত্তেজনাপূর্ণ জীবনধারা কত দিক থেকেই আমাদের শরীরের উপর তার কুপ্রভাব বিস্তার করছে। প্রায়বিক দুর্বলতা (Nervous debility, Neurasthenia) রক্তের চাপবৃদ্ধি (Blood pressure) এখন যেন সভ্য সমাজের এক অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। তা' ছাড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation), বদ্বহজ (Dyspepsia), বহুস্বরোগ (Diabetes), দূর্দৃষ্টিগততা (Short-sightedness), মেদবৃদ্ধি (Obesity), কৰ্কটরোগ (Cancer), হৃদরোগ (Heart-disease) প্রকৃতিকে সভ্যজগতের রোগ বলা যেতে পারে।

## সভ্যতা ও বিজ্ঞান

সভ্যতামূলক বিজ্ঞি ও জটিল জীবনযাত্রার পক্ষে আমাদের সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধি যেমন এক দিকে হারিয়ে দেবে, তার পরিবর্তে এই সভ্যতাই হারিয়ে, আমাদের নিত্য নব অহুসৃতি ও অভিজ্ঞতা-পূর্ণ বৈচিত্র্যময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও অহম্মদান মেটাবার জন্ত, বিজ্ঞানের জয়দান করেছে।

এই বিজ্ঞানের আলোকেই আমরা আজ হিন্দু জাতির স্বাস্থ্যমূলক নিত্য ক্রিয়ার অর্থ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করছি, বা' প্রাচীন কাল থেকে আমরা ধর্মের নামে অহুসরণ ক'রে আসছি। গম্ভীর (বা নদীতে) ধানের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝি এই যে, ধর্মের নামে এই 'বাব্যহ-পত্র' আমাদের হাতের ওড়াচ্ছে, বানিকটা বা অনেকটা রাত্তা পোষা ইটোচ্ছে; ভুব বিহীয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা নদীর উপরকার বিত্তমূলক বায়ুর সহযোগে আমাদের রক্ত



পরিষ্কার ও সতেজ কর্হে: স্নাতকের দ্বারা অদ্ভা-  
চালনা ও রাসায়নামাধান হচ্ছে; খোলা গায়ে  
বাতাস ও বায়ুর সংস্পর্শ শরীর দৃঢ় ও স্বস্থ  
হচ্ছে; স্নোতের জলে গামছা দিয়ে ঘঁসে শরীরের  
সংকল মরলা ঘূরে তো যাচ্ছেই, তা' ছাড়া দেহের  
আবরণ নেক-বন্ধ, তাকে সক্রিয় কর্হে; আর ঐ  
জলস্রাব বহলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের দ্বারা  
চিহ্নকৃষ্টি লাভ ও জ্ঞানবিত্তার সাহায্য কর্হে।  
এই এক Prescription-এ কত কাজ হচ্ছে। তা' ছাড়া  
প্রত্যহ্ন গাছের কাঁচা ডালনী ভেঙ্গে, চিবিবে চিবিবে তা'  
মিয়ে টাটকা টাটক। 'চুখরাশ' ক'রে তাই দিয়ে  
দাঁতন করা; এতে দাঁতের ব্যায়াম ও গোড়া শক্ত  
হয়। ছেলেকে তেল মাখিয়ে কিছুকণ রোদে ফেলে  
রাবার ও গৃহীণীর সিল্ক দীর্ঘ কেশকে শুকবারা জুজ  
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ধানিকটা রৌদ্রমানে রৌদ্রসেবন  
হ'য়ে যায়। তা' ছাড়া, আমাদের উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান রোগ-  
সম্ভ্রমণে কত বাধা দেয়। কলার পাতা বা মাস্তীর  
শেলস একবার ব্যবহার ক'রেই ফেলে দি। বাইরের  
জুতা ও তা'র সঙ্গে ধূলা-ময়লা বাবার ঘরের  
ভিতর আসতে দিই না। গায়ে-লাগা কাপড়  
প্রত্যহ্ন জল-কাচা ক'রে রোদে শুকিয়ে নিই।  
আহারান্তে বেশ ভাল ক'রে কুলচুচো ক'রে মুখ  
ধুয়ে ফেলি। এবং যে একটা পান চিবেই,  
তা'র উপকারিতাও অনেক। সেদিন একখানি স্বাস্থ্য  
সম্বন্ধে বইয়ে পড়লাম—বইখানি আমেরিকার ১২টা  
স্বাস্থ্য-সমিতির সহযোগিতায় লেখা—যে, মানুষের  
আদর্শ-পোষাক হবে, সাদা, স্ফোতা, যা' সর্পলা  
সম্বন্ধে বোরা যায়, হাতা ও আলগা; এক কথায়  
বললেই হ'ত যে, আমাদের শাড়ী, আমাদের দুটি-  
চাদর; প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদেরও বোধ হয়  
তাই ছিল। এতকাল ধর্মপানের ব্যবস্থা ছিল—হঁকো;  
গড়পাড়ির জন্মের ভিতর দিয়ে ধোঁয়াটাকে অনেক  
পরিমাণে 'নরম' ও বিস্তৃত ক'রে সেবন করা।  
আর মস্ত র্তো আছেই—'অপের, অদের, অশুশ,

অগ্রহা—ইতাদি। এই সব কথা একবার  
(১৯০০ সালে) লণ্ডন সম্মেলনে একটা সভায়  
বর্ণিতহিলাম। ইংলণ্ডের বিখ্যাত (জগদ্বিখ্যাত) ও  
শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বিকৎসক ও এখন নৃতন স্বাস্থ্যধর্ম-তত্ত্বের  
প্রধান প্রচারক Sir Arbuthnot Lane সে-সভার  
প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি আমার কথা শুনে  
বললেন যে, "ভারতবর্ষ এখনও বহুকাল (বা কিছু  
কাল) আমার চিকু মনে নেই। ইংলণ্ডকে স্বাস্থ্যধর্ম  
শেখাতে পারে। এই কুস্র ঘটনামাত্র উল্লেখ করার  
উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদের যা' সব ভাল  
তা' ভাল ক'রে জ্ঞানি না; সেগুলি যে কতটা  
বিজ্ঞানসাহুমোদিত তা'ও বুঝি না। এইগুলিকে আমাদের  
আজ্ঞাকবলিত সম্মোদিত ও সঙ্কত ক'রে সমরোপযোগী  
ক'রে নিতে হবে।

সভাতালাভ এই বিজ্ঞান আজ আমাদের এই  
শিফা দিচ্ছে যে, "Health is won more by a way  
of living than by bottles of medicine"—অর্থাৎ  
বোতল বোতল ঔষধ সেবন অপেক্ষা আমাদের  
জীবনযাত্রার রীতিনীতির দ্বারাই স্বাস্থ্যলাভ হয়। এই  
way of living-এর অর্থ biological living, অর্থাৎ  
স্বাভাবিক জৈববিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসারে জীবন-  
যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা।

সম্বন্ধে এবং গ্রামেও আমরা নানাবিধ রোগবীজ  
দ্বারা পরিবেষ্টিত—তা'দের মধ্যেই বাস কর্হি।  
যক্ষা, ইনফ্লুয়েন্সা, নিউমোনিয়া, সর্দি-কাশি, বসন্ত,  
হাম, প্রকৃতির রোগবীজ যা' ধূলা-বাতাসের সঙ্গে  
ধাসপথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে; কলেরা, আমাশয়,  
টাইফয়েড, প্রকৃতি রোগের বীজ যা' আহার্য ও  
পানীয় জবোয়র সঙ্গে স্বাভাবিক যোগে দেহমনো আসে;  
মাংসেরিরা, কালাজ্বর, গোদ, প্রকৃতি রোগ যা' মশা  
প্রকৃতি কীটসমূহের দ্বারা, এবং ছনীতিমূলক অজ্ঞাত  
কুস্মিত রোগ যা'র জীবাণু কুস্রসর্পের দ্বারা সাপাফ-  
ভাবে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, এই সমস্ত বীজ বা  
জীবাণুর য'য বিশিষ্ট রূপ ও মাদাঙ্ঘক গুণ আছে।

এরা শরীরমধ্যে প্রবেশ লাভ ক'রে মানুষের রক্তের  
বীজশক্তি প্রতিস্থাপন ক'রবার ক্ষমতার ভারতম্য অনুসারে  
বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রকাশ ও প্রকাশ নিবারণ  
করে—দেহের "মাটি" ও রোগের "বীজ", এই দুয়ের  
পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার (reaction) উপর। আমরা  
এই সকল বীজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করি দুই  
উপায়ে—এক, আমাদের জ্ঞানপ্রসারের দ্বারা  
এদের শরীরমধ্যে প্রবেশ ক'রতে দিই না;  
যেমন, কলেরার সময় জল ছপ ছুটিয়ে খাই,  
স্বাস্থ্যদ্রব্যে কলেরার বীজ-বহনকারী মাছি বসতে দিই  
না; কলেরা-রোগীর জীবাণুপূর্ণ মলমূত্রবর্মির এমন  
ব্যবস্থা করি, যাতে সেই সব বীজ সম্ভ্রমণ হ'তে  
না পারে; প্রসবকালীন নাড়ী বীধবার হুতা-কাঠি  
ভাল ক'রে ছুটিয়ে নেওয়া ও প্রসবকালীর হাত ও  
প্রতিমাতার সর্পিষ্ঠিক কাপড়চাদর, তুলা একেবারে  
বিস্তৃত ও পরিষ্কার রাখা; ইত্যাদি। দ্বিতীয়,  
দেহের "নাটকে" শক্ত করার; অর্থাৎ দেহমধ্যে,  
আমাদের সতর্কতা সহজে বা অসতর্কতার জন্ত, রোগ-  
বীজ প্রবেশ করলেও তা' যেন 'শিকড়' ব্যতীত  
বা বাড়তে না পারে। এই যে দেহের  
'কমি' শক্ত করা, বা তা'র রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা  
বাড়ানো—এইটাই হ'ল স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আসল  
কথা। শারীরিক দৃষ্টি থেকে, এইটাই আদর্শ ব্রহ্ম  
জীবনের প্রধান ভিত্তি। এটি লাভ ও রক্ষা হয়,  
হুমিগ্নিত ও জৈবনীতিসম্মত জীবনযাত্রার প্রণালীর  
দ্বারা। এই এককালে সেই কথাই সম্বন্ধে উল্লেখ  
করলাম। যথা—

১। বিস্তৃত মুক্ত বায়ু সেবন—অন্তরে, অর্থাৎ  
খাদ্য-প্রদানের দ্বারা খাদ্যতরঙ্গের (ফুসফুস) মধ্যে সাপাফ-  
ভাবে রক্তের সঙ্গে যোগস্থাপনে বা যথাবিধিমেয়;  
এবং বাহ্যস্থান—বাহিরে, অর্থাৎ দেহের স্বত্বের সঙ্গে  
বায়ুর সাপাফ সম্বন্ধে।

২। স্থানালোকের সহিত অনাবৃত দেহের যোগসম্ব-  
ন্ধপরিযোগে।

৩। পরিমিত গৃহীকরণ ও যথা-পরিমাণে বিভিন্ন  
বীজশক্তি প্রতিস্থাপন ক'রবার ক্ষমতার ভারতম্য অনুসারে  
বাতোৎপাদনশীল (balanced) টাটকা বিস্তৃত  
খাদ্য।

৪। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও অঙ্গচালনা; এবং  
যথাযথ চিত্ত প্রশ্রামলাভ।

৫। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার, অর্থাৎ দেহের ভিতরে  
ও বাহিরে (Personal hygiene), ঘরের ভিতরে ও  
বাহিরে (Domestic hygiene) এবং সম্বন্ধে, গ্রামে  
ও দেশ-বিশেষে রোগ-জনক জীবাণুসমূহের প্রাচুর্য  
ও আধিপত্য নষ্ট বা দূর করার।

এর সঙ্গে আর একটা স্বাস্থ্য-মন্ত্র যোগ কর্তে পারি,  
সেটা—

৬। রোগের ও ঔষধাদির বাতীকবর্জন।  
বিগত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় দেখা গেল  
যে, যুরোপ আমেরিকার মত শক্তিশালী ও অগ্রগী জাতি  
সমূহের মধ্যেও, সৈন্যসংগ্রহের সময়, শতকরা তেরিশটা  
বা এক-তৃতীয়াংশও লোক পাওয়া যায়নি না যারা  
যুদ্ধ ক'রতে শক্ত ও সমর্থ। আজ আমরা যদি আমাদের  
মধ্যে সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করি—শতকরা ক'জন পাই?  
ঐ অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার, পাশ্চাত্য জগতে এক  
মহাভেতনার উদ্বেগ হ'ল। সেই অবধি যুরোপ ও  
আমেরিকার, প্রকৃত শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভের জন্ত বিরাট  
আন্দোলন চলছে। কোনো কোনো দেশে এমন  
আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে যে, যদি ২২ বছরের ত্রয়োদশ  
কোনো পুরুষ ও নারীকে ধরতে পাওয়া যায়, যিনি,  
বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত, নিয়মিত শরীরচর্চা  
করছেন না, তবে তিনি তা'র জজ দণ্ডনীয় হবেন। আজ-  
কাল তাই যুরোপে দেশেতে পাওয়া যায় যে, সন্ধ্যার  
পার বড় বড় 'হল'-ঘরে, কিশোর ও প্রৌঢ়েরা, তাদের  
নির্দিষ্ট সময়ে, কিছুকণ জিম্জাজিক-ব্যায়াম অভ্যাস  
ক'রে আসেন। স্কুল-কলেজে এটি শিক্ষার একটা অঙ্গ  
হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; এবং তা'র জন্ত চমৎকার বন্দোবস্ত ও  
সরঞ্জাম প্রকৃতিও আছে। জা'দানীর বার্ষিক সম্মেলনে  
উচ্চশিক্ষার জন্ত মেয়েদের একটি বিভাগলয়ে লেখাই



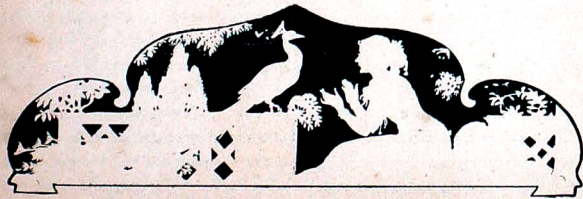
আছে—“মেয়েদের জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শ উদ্দেশ্যই এই যে, বাহ্য ও শক্তি লাভই তাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, পুষ্টিগত উচ্চশিক্ষা পরে।” এই প্রচেষ্টা খেলা-ভাঙ্গার খেলাতে (sports) সর্বত্র বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

শুধু খেলা ব্যাধ্যমেই নয়। যুরোপ, আমেরিকা, আজ নূতন স্বাধীন-ত্বের আদর্শে, তার জীবনযাত্রা-প্রণালী (way of living) পরিবর্তন করিতে লেগে গেছে। একটু কীক ও হুবিধা পেলেই, দলে দলে সকল বয়সের ছেলে ও মেয়েরা, অতি সাদাসিধে ও সামান্য হালকা পোষাক পরে, একটা পুচ্ছীতে (rucksack) তাদের আবশ্যক সব জিনিসপত্র পুরে ও গিটে বেঁধে, হাতে এক লাঠি বা কাঁধে এক বেহালা নিয়ে, ছেঁটে বেরিয়ে পড়ে—রোদে-বাতাসে, পাছাড়ে-মাঠে, গ্রামে-জঙ্গলে। নদী-সমুদ্রে অবধা বান ও রোদে নিজেদের একরকম কালো করে পুড়িয়ে নিয়ে, বাহ্য, শক্তি ও শক্তি লাভ করে ফিরে এসে, আবার মে-নার কাছে লেগে যায়। তাদের জ্ঞানপ্রাণ জাহায্য পান্থনিবাস আছে; অতি অল্প খরচে খেদানে থাকতে পারে। ধর্ম ও মন্যপান নিষিদ্ধ, এমন কি রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন পণ্যস্ত—পাছে সে তর্কবুদ্ধি পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য-স্থাপন না হয়ে, বিরোধ-বিতণ্ডা এসে এই মেলামেশার সম্মুখীন করে! আহা—ছদ্ম, মধু, ফলমূল, ভাল পাউরুটি, মাখম, আর ডিম

বা আনন্দ। এই open-air-mindedness আজ নব্যযুগের আমেরিকাকে পেয়ে বসেছে; তার সঙ্গে ফুটে উঠছে, জীবনব্যবহারের এক সরল, সহজ ও সত্য আদর্শ।

ব্যক্তিগত ভাবেই হ’ক, আর জাতিগত ভাবেই হ’ক, আমাদের বাঁচতে হ’লে, স্বস্থ, সবল, সমর্থ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবিশ্বাস হ’তে হবে। “বৈতে মরে” থাকলে চলবে না। কথায় কথায় ম্যাগেরিয়া, দারিদ্র্য, পরাদীনতা ও বৃষ্টি-শোষণের অজ্ঞাত দিয়ে আমরা নিজেরাই যে আত্মমর্গাদা-বোধহীন হয়ে আত্মশক্তিকে তেমন উদ্ভাষিত করছি না, সত্যিকার আত্মজ্ঞান-হারা অসুপ্রাণিত হয়ে তেমন সক্রিয় ও সচেষ্ট হচ্ছি না, এইটা চাপা দিলে চলবে না। আমাদের ভিতরকার সব দোষ “নন্দ ঘোষের” খাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, বা কপালের দোহাই দিয়ে ব’সে থাকি। ঐ “নন্দঘোষ” সহজেও, আমাদের এই বর্তমান অবস্থার মধ্যেই, আমরা যদি একটু আত্মনিরীক্ষণ ও আত্মচেষ্টাপর হ’তে চেষ্টা করি, তা’ হ’লে এই প্রবন্ধে যে ছয়টা সহজ, সামান্য ও একান্ত সহজ উপকরণমিশ্রিত ব্যবস্থা দিলাম, সেই নূতন ‘টনিক’ নিয়মিত ‘সেবন’ করলে শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভ ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে পারি। মানসিক স্বাস্থ্য-লাভের ব্যবস্থার কথা পরে বলব।

পরের প্রবন্ধে এই সকল উপকরণ সহজে বিশেষ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।



প্রশ্ন

( ১ )

হিন্দুসমাজে অশুভতার উৎপত্তি হ’ল কিরূপে? এর ঐতিহাসিক কারণ কি? জাতিভেদের সঙ্গে অশুভতার কোন সম্পর্ক নেই কি? অশুভতা তিরোহিত হ’লে জাতিভেদও কি তিরোহিত হবে না? জাতিভেদ বলতে কি বোঝায়?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

( ২ )

পরশুরোক্ত যে ব্যবস্থাবলে বিজ্ঞানগণ মহাশয় হিন্দুসমাজে বিধবার পক্ষে পতন্তর গ্রহণের বিধি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই ব্যবস্থাদ্বারা নয় (নিরুদ্ধি), প্রজ্ঞিত (সন্ন্যাসী), স্ত্রী ও পতিত (স্বর্ঘ্যভাগী) পতির পত্নীর পক্ষেও অজ্ঞ পতিগ্রহণের বিধি বিদ্যমান আছে। শেবোক্ত চতুর্বিধ পুরুষের ভার্গ্যার জ্ঞান এ পর্যন্ত পুনর্নিবাহের কোথাও কোন চেষ্টা হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি?

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ

( ৩ )

“তোমার গদা পার হওয়া উচিত নয়”— এই পদটির কি বাচ্য? এবং পরিবর্তিত বাচ্যেই বা ইহার রূপ কি হইবে?

শ্রীঅনিলকুমার সরকার

( ৪ )

‘স্বন্দরবন’ নামটির উৎপত্তি কোথা হইতে? এবং ঐ নামটি কত প্রাচীন?

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

( ৫ )

বাংলা সাগর কোন্ সময় হইতে গণনা করা হয়? ‘সাগর’ শব্দের উৎপত্তি কি করিয়া হইল?

শ্রীঅমরনাথ দেবী

( ৬ )

হিন্দু-বিজ্ঞানে লিখিত আছে, গুরুমতী নারী দীর্ঘকাল অনুরা অবস্থায় থাকিলে, তাহাদের বঙ্গা, ক্ষয়, শোণ, প্রদর, বস্ত্রগুণ্ড প্রভৃতি রোগে সহজেই আক্রমণ করে, ইহা প্রকৃতই ঠিক কি না? কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন কি না?

শ্রীদীনেন্দ্র সেন কবিরাজ

( ৭ )

বঙ্গভাষার উৎপত্তি—সংস্কৃত, না অজ্ঞ কোন ভাষা হইতে? পালি ভাষার সহিত বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষার কি সম্বন্ধ?

শ্রীস্বধাংশুকুমার দত্ত



(৮)

বাংলা ভাষার বর্তমান ব্যয়ক্রম কত? বাংলা কবিতার জন্ম কোথা হইতে? বাংলা ভাষার ছড়া হইতেই কি ইহার উৎপত্তি? কোন্ কবিতা বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা বলিয়া পরিচিত? বাংলা ভাষার আদি উৎপত্তির কথা এবং কবিতার জন্ম-কথা সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাওয়া যায় কি?

কুমারী বিচিত্রা দেবী

উত্তর

বৈশাখ মাসের 'উদয়নের' প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

প্রাচীন বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রে "হিন্দু" শব্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু বেদের কিছু পরকালীন বা সমসাময়িক শাস্ত্রে "হিন্দু" শব্দ আছে। পানীদিসের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেনাবেন্তা গ্রন্থে এবং ইহুদিদিগের ধর্ম-শাস্ত্র Old Testament এ 'হন্দু' শব্দ পাওয়া যায়; এবং যেমন বেদের নিরুক্ত ব্যাকরণ অহুসারে অনেক বৈদিক শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তেমনি এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থেরও বৈদ্য-করণদিগের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে "হিন্দু" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। হিন্দু ভাষার হন্দু শব্দের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিত্তব, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব ইত্যাদি। খট্যাক্ষ বলেন, "ভারতবর্ষের বিক্রম ও গৌরব বৈষ্ণবাই ইহুদিরা ঐ দেশকে (ভারতবর্ষকে) হন্দু বলিয়া ডাকিত; ঐ নাম এগিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পূর্বে প্রচলিত ছিল। হিন্দু ভাষা, জেন্দ ভাষা হইতে উৎপন্ন—জেন্দের

'হিন্দব' হিন্দুভাষায় 'হন্দু' হইয়াছে। যে পথ দিয়া গ্রীক বীরেরা ভারতে আসেন, সেই পথে তুয়ারারূত অত্যাচ গিরিমালা দেখিয়া তাহার নাম জানিতে চাহিলে একজন পুরোহিত বলেন, "তিনিয়াছি ইহার একদিকে হন্দু দেশের সীমা, অপর দিকে কুশ রাজ্যের রাজনৈতিক সীমা"। ইথিওপীয়া রাজ্যের হিন্দু নাম Cush (কুশ)। গ্রীকরা হন্দু দেশের সীমা-জ্ঞাপক পুরাত, এই অর্থে ঐ পুরাতকে "হন্দুকোশ" বলিয়া অভিহিত করেন। এই "হন্দুকোশ" অপভ্রংশে "আন্দাকশ" (Indikos) হইয়াছে—এখন তাহাই India হইয়াছে। হিন্দুকুশের নিকট প্রচলিত ভাষা পশ্চু...পশ্চু ভাষাভাষীদের আদি নিবাস পারস্যদেশ। পশ্চু ভাষাভাষী লোকেরাই হন্দু শব্দের উত্তর হব উ প্রয়োগ করিয়া হন্দু পদ করেন। পশ্চু ব্যাকরণে 'উ' গুণবাচক জ্ঞাতি বা গুণবাচক পুঙ্কদের উত্তর প্রত্যয় হইয়া থাকে। প্রাচীন আখ্য জ্ঞাতির গৌরব, পবিত্রতা, বিত্তব, মহিমা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পশ্চু ভাষাভাষীরা ঐ উ প্রত্যয় করিয়াছিলেন। বাবা নানকের সময় গুগন্ধুখী ভাষায় হন্দু শব্দ পান্ডাবী সৈনিকদিগের দ্বারা 'হিন্দু' শব্দে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বহু সংবাদ পাইবেন ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় শ্রীমতী সরলা দেবী মহাশয়ার "হিন্দু ও নিমার" প্রবন্ধে এবং ১৩০৮ সালের আশ্বিন ও কান্তিক সংখ্যা "ভারতী"তে ও ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের লেখা "হিন্দু" শব্দতত্ত্ব প্রবন্ধে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ



সে আসিয়া আসার বরের সঙ্গে দেখা করিল, বর্ষাতি কিনিচি! বহুদিন থেকে বলচ! না হ'লে কহিল,—আজ আর বসু না, ভাই—বাড়ী গেষ্টে হবে। ট্রেণের টাইম ...

অজয় কহিল,—বো-ভাতের ঝাওয়ার দিন আসা চাই মোক্ষা...একটা নয়, যুগলে!

—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বিদায় লইয়া বিনোদ পথে বাহির হইয়া পড়িল। গৃহ নাই। বর্ষাতি-কোট আর গায়ে চড়াইতে হইল না।

২

সকাল বেলা। চমৎকার রৌদ্র ফুটিয়াছে। কেমন আশ্রয় হইতেছিল, বিনোদ তাই বিছানায় পড়িয়া আছে। শান্তি চায়ের পেয়াদা হাতে ঘরে ঢুকিল, কহিল,—শ্রীহরিণ পার্শ্ব-শরম এনে। চলেছে! ওঠো, ওঠো... বেলা হ'য়ে গেছে। আর ভুগে থাকে না! চাউতৌ। —উঠ।

বিনোদ উঠিল; তাড়াহাতি মুখ-হাত ধুইয়া চায়ের পেয়াদায় মনোনিবেশ করিল।

শান্তি কহিল—অমন ক'রে ভিজতে হয়! জুতো-জোড়া ভিজ্জে চ্যাপ্‌চ্যাপ্‌ ক'রছে! যেন আমসবো! মা গো! ঐ ভিজ্জে জুতো পায়ে এই পথ এসেচো! যদি অশ্রু ক'রে? তখন মন্‌ মাগী ভুই ভেবে!

শান্তির এইগুলি বিনোদের বড় ভালো লাগে। যেন অসহায় সে—তাকে দেখা-শুনা করার অহরহ তাই এ সতর্কতা।

হাসিয়া সে কহিল,—তুমি সেবা করবে।

কৃত্রিম কাশের ভাবে শান্তি কহিল,—ব'য়ে গেছে আমার! ইচ্ছে ক'রে অশ্রু ডেকে আনু—আর আমি করব সেবা! ক'ব খন্দো না!

বিনোদ কহিল,—কাল যে-বুড়ি গেছে, শান্তি...সেই জলে নেমস্তন বাগায়া!

শান্তি কহিল,—না হয়, একখানা পাড়ী ক'রেই যেতে! টামে বাগায়া কেন! ছ'পরসার এ সাম্রয় নাই ক'রুতে! বিনোদ কহিল,—চুপসো নয়! বড়-বংশী ধরচ হ'ত! তোমার একটা কথা মোক্ষা রেখেচি—দেখেচো!

বর্ষাতি কিনিচি! বহুদিন থেকে বলচ! না হ'লে বর্ষাতি-কোট আমার সাজে না, সস্তা! পঁচিশ টাকা দাম পড়ি গেল।

শান্তি কহিল—কিনে ভালোই করেছে। কত দরকারে লাগে, বলো-দিকিনি!...বিদেশে পড়ি আছে—জল-বুড়ি—কত অসাবধানে থাকো! ভাবনায় এখানে সারাক্ষণ কাটা হ'য়ে থাকি!...নেহাং নাকি উপায় নেই!

শান্তির কণ্ঠস্বর আরম্ভ হইল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বিনোদ কহিল,—তোমার জন্ত একখানা ভালো সিন্ধের শাড়ী কিনব ভাবছিলাম—তা' আর হ'ল না। ঐ বর্ষাতি-কোট কিনে ফেললাম।

শান্তি কহিল,—আমি খুব গুণী হয়েছি। শাড়ী গেলে এত আশ্রয় হ'ত না, সস্তা!

বিনোদ কহিল,—তা' আমি জানি। সতী-সাক্ষী স্ত্রী—

শান্তি কহিল,—খানো, খানো। তুমি খুব পণ্ডিত, আমি জানি।

সকালের আলাপ এই পর্যন্ত। তারপর শান্তি ঢুকিল রান্নাঘরে—চা খাইয়া বিনোদ গেল বনমালীর বাড়ী। বনমালীর গৃহে 'তেলিনীপাড়া বান্ধব নাট্য-সমিতির' রিহাঙ্গাল বসে—রবিবারে আসর ভালো করিয়া জমে। কলিকাতা-বাসী অনেকেই শনিবার রাতে দেশে আসে, তাই।

আসর রাতিয়া বিনোদ বাড়ী ফিরিল বেলা বাওরাটায়। শান্তি আসিয়া দেখা দিল না। ঝাওয়ার সময় ছোট গুড়ী আসিয়া কাছে বসিলেন। বিনোদের ভালো লাগিল না।

ছোট গুড়ী কহিলেন,—বোমা কি আঙ্কি চুঁচুড়ায় যাবেন রে?

চুঁচুড়ায় শান্তির পিতামহ। সহসা চুঁচুড়ায় ঝাওয়ার



কথা শুনিয়া বিনোদ বিস্মিত হইল, কহিল,—‘চুটচো! আমি তো চুটচো যাওয়ার কথা জানি না।

—জানি না?

—না।

—সে কি রে! বোমা সেই চান ক’রে ইস্তক বায়না ধরেচেন, গেল-রাতে ভারী হুংসর দেখেচেন—মন অস্থির রয়েছে—কিছু ভালো বাগতে না...

রাতে হুংসর! কৈ, শান্তি তো এমন হুংসরের কোনো আভাস দেখে নাই! চায়ের পেয়ালা আনিয়া দেখা দিল, হাসি-মুখ, ঘুন্সি-মন... এমন হুংসর দেখিলে বিনোদকে বলিত না?

হোট গুড়ী কহিলেন—‘তুইই তো নিয়ে যাবি? না ছোটা বোসে কার সঙ্গে!

বিনোদ ক্রুদ্ধ হইল, গম্ভীর স্বরে কহিল,— আমার সময় হবে না...

—তবে কার সঙ্গে যাবেন?

বিনোদ কহিল,—হাবুলকে ডাকাও। সে পারে, নিয়ে যাবে।

তারপর চুপচাপ...

আহার শেষ করিয়া বিনোদ উঠবার উদ্দেশ্য করিল, হোট গুড়ী বলিলেন,—তোমর মত আছে তো? আমি বলিচি, বিনোদের যদি অমত না থাকে, যাও বাছা! ... তা, কি বলিস?

বিনোদ কহিল,—আমার মতামতে কিছু এসে যাবে না!

তার বিরক্তি ধরিয়াছিল। বিদেশে সারা সপ্তাহ পড়িয়া থাকে; একটা দিন বাড়ী আসে... শান্তির সঙ্গ চাহিয়া মন কতখানি আকুল হয়!... শান্তির সেলিকে খোঁজা নাই! তারের প্রেম এখন এমন পুরানো হইয়া গেল? অভিমানে তার বুক ভরিয়া উঠিল।

নিজের ঘরে আসিয়া সে বসিল। অভিমানের হুঁচকিয়া বচনের লোভ ছাড়া কঠিন! শান্তি একবার আসিলে হয়... বসিয়া বসিয়া অভিমানের কয়েকটা তীব্র বচন সে মনে মনে আঁচিতে লাগিল।

কিন্তু শান্তির দেখা নাই। একখানা খবরের কাগজ ছিল—বিনোদ সেখানা লইয়া তার পুঁজাঙলা বার-বার পড়িল। রাজ্যের খবর মুগ্ধ হইয়া গেল। এখনো আসে না? শান্তি কি করিতেছে?

উঠিতে হইল। নীচের দালানে আসিয়া দেখে, শান্তির হাতে ছোট একটা পুঁটলি—শান্তি হাবুলকে বলিতেছে,—আর কিছু নেবার নেই, ভাই। চলো... সঙ্গে বিনোদকে দেখিয়া শান্তি কহিল,—আমি চুটচোর যাকি...

গম্ভীর কণ্ঠে বিনোদ কহিল,—বেশ!

শান্তি কহিল,—হাত জোড়া, নমস্কার কর্তে পাব্‌নুম না! মনে মনে নমস্কার জানাচ্ছি।

বিনোদ কোন্‌ কথা কহিল না। তার মনে হইতেছিল, শান্তি অহমতি চাহিবে—চাছিল না। ...কবে ফিরিবে, সেকথাটা...?

তা’ও বলিল না! শান্তি ঘর ছাড়িয়া বাহিরের উঠানে নামিল। বিনোদ অবিরল দাঁড়াইয়া রহিল, যেন পাখরের মুক্তি... এমন ব্যাপার সে কখনো কল্পনা করে নাই! তার শক্তি...

বিনোদ নড়িল না। শান্তি ও হাবুল সদরের চৌকাঠ পার হইল। পথে গাড়ী। হোট গুড়ী বলিলেন,—হাবুলকে দিয়ে খপর পাঠিয়ে, মা,—আমি ভারী ভাব’ব...

—হ্যাঁ! গুড়ীমা, খপর পাঠাবো। বলিয়া শান্তি বাহির হইয়া গেল। বিনোদের চোখের সামনে ঘর-দালান, চুনিয়া—সব অশ্লষ্ট কাপুসা হইয়া গেল!... সে যেন চেতনা-হীন...

চেতনা ফিরিল হাবুলের কথার। হাবুল আসিয়া বলিল,—তোমার বিছানায় বাগিসের তলায় চিঠি আছে—বৌদি তা’তে সব কথা লিখে গেছেন। তোমার সে-চিঠি পড়তে বললেন!...

কথাটা এক-নিঃশেষে শেখ করিয়া হাবুল সদরের দিকে ছুটিল। পথে ও-দিকে চলন্ত গাড়ীর একটা শব্দ... এদিকে বিনোদের অন্তর চিরিয়া মত্ত এক নিঃশ্বাস!...

বিনোদ দোতলায় উঠিল; উঠিয়া নিষ্কের ঘরে আসিল। বাগিশের তলায় চিঠি—শান্তির লেখা!... চিঠি খুলিয়া বিনোদ পড়িল, লেখা আছে—

—তোমার দেশের উপর কেন এত টান, বৃষ্টিয়াছিল। প্রিয়তমা প্রণয়িনী পাইয়াছ! ভালো! তোমার বর্ষাতি-কোটাটা শুধাইয়া রাখিতে গিয়া হাতে পড়ে, হীরার কচ—তাহাতে টিকিট আঁট—‘প্রাণের প্রিয়তমা শ্রীমতী নীহারিকাকে প্রেমোপহার’! কচটা ফেলিয়া দিই নাই। তোমার আলমারির ড্রয়ারে রাখিয়া দিয়াছি। রবিবারের দিনটা পাড়ারগায়ে আমার মত মূর্ণ পচা জানোয়ারর গীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না! তোমার ছুটি দিয়া গেলাম—কোনো চক্ক-লজ্জা করিয়ে না। নীহারিকার কাছে যাও। সে আশা-পথ চাহিয়া আছে!—প্রেমোপহার পাইলে তোমার প্রেমের বজায় ভাসাইয়া দিবে।

দররের কথা আমি শিরোধার্য্য করি—যতদিন তোমার বিশ্বাস, ততদিন আমারো বিশ্বাস। যতদিন তোমার ভাগোবাসা, ততদিন আমারো ভাগোবাসা। আমি ধী—তা’ বলিয়া তুমি যাচা করিবে, তাহাই মানিয়া চলিতে আমি পারিব না! হয়ত কালের দোষ—কিন্তু এক-কালেই জন্মিয়াছিল। সেকালে জন্মিলে হয়ত তোমার নীহারিকার দাসী হইয়া তাহার পরিচর্যা করিতে পারিতাম। কিন্তু একালের মনকে সেকালের হাটে তৈয়ার করিতে পারি নাই। বোধ হয় পারিব না।

আমি হুঁচুড়ায় চুলিলাম। সোমবার তুমি কলিকাতায় গেলে ফিরিব। তারপর আমার শনিবারে চলিয়া যাইব। তোমার সামনে দাঁড়াইয়া তোমার অগ্রভিত্ত করিতে যেমন পারিব না, তেমনি নিজের জুঁজায়া বহিয়া লাঞ্চী সতীর মত তোমার পরিচর্যাও করিতে পারিব না। ইহাতে যদি অপরাধ হয়, ক্ষমা করিয়া।

শান্তি

চিঠি পড়িয়া বিনোদ হতভম্ব! নীহারিকা! হীরার কচ! প্রেমোপহার!—এসব কি কথা! শান্তি এসব কাহিনী কোথায় পাইল! তবে কি রাতে এই শব্দই দেখিয়াছিল!

এ কি পাগলামি!

কিন্তু না!...

আলমারির ড্রয়ার টানিয়া দেখিলে তো সব গোল মিটিয়া যায়! বিনোদ আসিয়া কপিত বৃকে ড্রয়ার টানিল। ড্রয়ারের মধ্যে একটি ভেলভেট-কেশের মধ্যে সত্যই হীরার কচ, আর তাহাতে আঁটা ছোট স্মিলে লেখা আছে—‘প্রিয়তমা প্রণয়িনী শ্রীমতী নীহারিকাকে প্রেমোপহার’!

বিনোদের মাথা গুরিয়া গেল—পায়ের তলায় মাটি জন্মিয়া উঠিল। নীহারিকা! কে এ নীহারিকা? হীরার কচই বা কোথা হইতে আসিল?...?

আর-ব-রজনীর কাহিনী সত্যকার জগতে সত্যই ঘটে না!...

বর্ষাতি-কোটা বিছানার উপর সে মেলিয়া ধরিল, তার পকেট হাতছাড়াই দেখে, কিছু নাই। মনে পড়িল,—চুটচো!... কাশ! নিম্নগত-বাড়ীতে বহু চুট হাতছাড়াই সরাইয়া পকেটে পুরিয়াছিল! অফিসের বন্ধ অপর্যাপ্ত চুট ভাগোবাসা—তার জন্ম...

সে চুট কেখানায় গেল?

তবে কি? তাই! নিশ্চয় তাই! বর্ষাতি বলল হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কতবার সঙ্গে বলল হইল? সে যেখানে বর্ষাতি রাখিয়াছিল, সেখানে দ্বিতীয় বর্ষাতি ছিল না। শুধু পোটা-কয়েক ছাড়া! ভুল! ভুল... ভুল হইয়াছে—কোনো সন্দেহ নাই!—এখন এক-ভুল শুধাইতে...

সে কোথায় যায়? হুঁচুড়ায় শান্তির কাছে? না, কলিকাতায় অজয়ের গুণানে?

হুঁচুড়ায় গিয়া লাভ নাই! শান্তির কাছে কি করিয়া প্রমাণ দিবে, নীহারিকাকে সে জানে না, চিনে না—একটু সে চক্ষুও দেখে নাই—কেনা তো দুয়ের কথা! অজয়ের কাছে যাওয়াই কল্যাণ—সেখানে



হয়ত কত হারানোর জ্ঞান চুরির মত কলরব চলিয়াছে।

বিনোদ দাঁড়াইল না—কাপড় বদলাইয়া তড়াতাড়ি নামিয়া আসিল।

নীচে বঁট পাতিয়া ছোট খুড়ী নারিকেল-পাতা কাটিয়া তাহা হইতে খাঁটার কাঠি বাহির করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন,—চুঁচড়ায় যাহাঙ্গি নাকি ?

—না, কলকাতায়।

—কলকাতায় ?

—হ্যাঁ, আপিসের একটা জরুরী কাজ আছে।

—কি সব তো ?

—যদি কাজ মেটে, কিংবা না হ'লে থেকে বেতে হবে।

বিনোদ দাঁড়াইল না—বাহির হইয়া গেল।

৩

সন্ধ্যার সময় অজয়ের গৃহে পৌছিয়া বিনোদ তুলিল,—অজয় বাড়ী নাই। শিবপুরে তার এক মামাতো বোনের বিবাহ—সে শিবপুরে নিমন্ত্রণ গিয়াছে। সে-রাত্রে কিরবে না!

বিপদ আর কাহাকে বলে!

বাড়ীতে সে কিরিল না। কার জ্ঞান কিরবে? শান্তি নাই—তাই সে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে মেশের বাসায় কিরিল।

বাসার লোক তাকে দেখিয়া অবাক! শান্তহাব্য কহিলেন,—কি ভায়া, অসময়ে বিভ্রান্ত-বিকার!

বিনোদ কথা কহিল না। শান্তহাব্য কহিলেন,—বোমার সঙ্গে কলহ না কি?—ভুল করেছে ভায়া! একলহের পর দূরে থাকা মৃত্যু। তা'তে ব্যাধ চতুর্গুণ বাড়ে। সুখ-ভার করে কাছে-কাছে থাকতেও আরাম মেলে। তা'তে মাধুর্য আছে।

কথাটা কতখানি খাঁটি, বিনোদ তাহা হাফে-হাফে

বুঝিয়াছে। শান্তি যখন চুঁচড়ায় ব্যাধ,—তখন বাচিয়া বুটী কথা কহিলে এমন এমন হতাশায় মরিতে হইত না।

সঙ্গে করিয়া শান্তিকে চুঁচড়ায় লইয়া গেলেও হয়ত এই ভাবী মুখেই এক সময়ে হাসির ঝিলিক ফুটিয়া এমনান্তরের অবসান ঘটত! আবার মনে হইল, সে সকালে আড়ড়া দিতে পাড়ায় যদি না বাহির হইত, তাহা হইলে এ-ব্যাপার ঘটতে পারিত না! এমনি বহু চিন্তা মনকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। এত দিন শান্তিকে কাছে পাইয়াও তাহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া পাচজন বন্ধুকে লইয়া সে বাজে আসর বসাইয়াছে—হাতের লক্ষীকে পায়ে ঢেলিয়াছে! সে-সব দিন-রূপ অধিকার মত মনের আঁধার পটে জলিতে নিবিত্তে লাগিল। হায় রে, সাথে লোককে বেলে, পাঁচ থাকিতে দাঁতের মর্দ আমরা বুঝি না! মাসের মধ্যে ক'টা দিন বা শান্তির সান্নিধ্য নিলে! সে-দিনগুলোতে সব ভুলিয়া শান্তির 'পরেই যদি সকল মন ব্যস্ত করিত!...

চিন্তার সঙ্গে নিশ্বাসের বোঝায় বুক ভারী হইয়া গেল।... নিঃশ্বাস ঘরে বাতি নিবাইয়া বিছানায় সে পড়িয়া রহিল। আঁধারের অস্পষ্টতায় শান্তিকে বৃকের কাছে নিবিড় করিয়া যেন পাওয়া যায়—আশোর ভিত্ততায় শান্তি চিন্তাও দূরে সরিয়া যায়।

শান্তহাব্য আসিয়া কহিলেন,—থাবে চলো, ভায়া। বিনোদ কহিল,—পেটটা ভার আছে। থাকো না।

শান্তহাব্য কহিলেন,—ও ব্যাধার নিশ্বাসে! বেলে সেরে যাবে।

বিনোদ কহিল,—না।

শান্তহাব্য কহিলেন,—কথা শোনো ভায়া। না হয় কাল অকসি-ফেরত বাড়ী যাও—বউমার চরণ স্পর্শ ক'রে সন্ধি করে। ওদের উপর যখন ক'রে কোনো বীর আশ্রয় পাবো! ওদের আশ্রয় থাকতে পারেন নি—না রাজা রামচন্দ্র, না সেকন্দর শাহ, না নেপোলিয়ন!

বিনোদ কোনো জবাব দিল না। শান্তহাব্য কহিলেন,—থাকো ভায়া তবে বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী। বিরক্ত করব না। এসময় বন্ধুর

সামান্য ঘটন মনে শর-শয্যা রচনা করে—জানি, ভায়া, জানি। এ ভোগ কুপেতি তো একদিন। যখন গৃহিণী ছিলেন...

শান্তহাব্য বিদায় লইলেন। বিনোদ বিছানায় পড়িয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল, হুনিয়ার আঁট-সীট বাঁধা বিবাহবাহার ক্লপঙলা কোথায় যেন ঢিলা হইয়া গিয়াছে—হুনিয়া তাই নঙ্গল গুজ্জ করিয়া নড়রোড়ে হইয়া গুরিতেছে! কোথাও শৃঙ্খলা নাই!

রাজিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। ভাণ্ডো নিদ্দা-দেবী প্রাণে মমতা আছে! ব্যাধাতুর, শোকাভুরের প্রতি ভাণ্ডো তাঁর মমতার মাত্রা একটু বেশী! নহিলে, হুনিয়ার মাহু বোঝ হয় বাঁচিতে পারিত না! সস্তাপ-হারিণী নিদ্দা—কথাটা ভারী গতা!

সকালে অকসি। কাজে-কথায় বিনোদ মনকে ছুঁবাইয়া দিল। কিন্তু এত সহজে মনকে আঁটিয়া উঠবে, ক্লম মাছের এমন কি সাধা আছে!...

তবু উপায় যখন নাই...

বৈকালে অকসি হইতে ফিরিয়া সে শাঙ্কলজ্ঞা করিল। অজয়ের গৃহে আশ্রয় ফুলশয্যা, বো-ভাত। নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণে বাইবার জ্ঞান চালায়া বেশী। হীরার কচের সন্ধান করিতে হইবে।...

অজয় বাহিরের ঘরে ছিল। বিনোদকে দেখিয়া কহিল,—একা যে! শান্তি দেবীকে আনোনি?

বিনোদ কহিল,—না। উপায় ছিল না, ভাই। অজয়ের কাছে গোপনে সে বুড়াত গুলিয়া বলিল। তুমি অজয় কহিল—আমার পীর নাম নাইহারিকা।

নববধুর নাম নাইহারিকা! ভাই তো!

কিন্তু তাহাকে প্রেমোপহার দিতে কে আসিল? শুধু প্রেমোপহার নয়—প্রিয়তমা প্রণয়িনী! বিনোদের গায়ে কাঁটা দিল। কচটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, কহিল,—এই ঝাণ্ডো!...

মিপের লেখাটুকু দেখিয়া অজয় হাসিল, কহিল,—

দেখি, তাঁর কোনো ভুলতপূর্ণ lover-এর উপহার! কার লেখা, তা' অবশ্য সিদ্ধি না!

বিনোদ যেন কাঠ! কহিল,—তুমি হাসত!

অজয় কহিল,—কীভাবে বলা? যদি কেউ তাঁকে ভালোবেসে থাকে!...ভালোবাসার উপর কি কারো হাত আছে, ভাই? আমার পীকে তুমি ঝাণ্ডোনি, বোধ হয়—তাই বৃদ্ধ না! She is so lovable! তা' ছাড়া I feel myself proud! সত্যি বিনোদ, এ-কি দেখে ভালো না বেসে থাকার যায় না। আমি তো শুভদৃষ্টির সময় থেকেই ভালোবেসে ফেলিচি! I am love-mad. Really!

বিনোদ অবাক! অজয় কহিল,—দাও, তাঁকে গুটা দেখাই গিয়ে। একে ভালোবাসা, তার সঙ্গে হীরার কচ! নারী জাতি, yes—they adore both... দেখে ভারী খুশী হবেন 'খন!...

বহু-চালিতের মত বিনোদ অজয়ের পানে চাহিয়া রহিল, অজয় ক্রম লইয়া অন্ধরের দিকে গেল।

বিনোদ যেন পাখরের 'ধাঁচ'! বাহিরে তুলল কলরব। লোকজনের হাঁকাহাঁকির অন্ত নাই। পান, চা, তামাক, চুট...সেই সঙ্গে—ওরে শিব, এই ছুটি ভক্ত-লোককে নিয়ে গিয়ে চুট করে খাইয়ে দে—এরা অপেক্ষা কর্তে পারবেন না—টপে কিরবেন। যেন সেই pandemonium! তার পরও লোকজনের আসা-নাওয়ার বিরাম নাই। ব্যস্ত-ভাবও কেহ ফিরিয়া চাহে না—আসে, আসিয়া কি খোঁজে এবং পরক্ষণে চলিয়া যায়!

আধ ঘণ্টা পরে অজয় কিরিল, কহিল,—না রে, হাতের লেখা তিনিও সমান কর্তে পারলেন না। তবে শুভ্রত, এমন প্রণয়ী তাঁর ছুঁতটি আছেন—ভারী জালাতন করেন! এ-উপহার কার হাতের—তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। তবে এখন সন্ধান পাবো। এ-বস্তুটা এখন তোমার কাছেই রাখো।



বিনোদ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। অজ্ঞ  
তো ভারী মজার মাহুৎ। দ্বীর প্রণয়-লীলা নইয়া। এমন  
আমদে বোধ করে! এ বিলাত যাওয়ার ফল,  
নিশ্চয়!...

অজ্ঞ কহিল,—এখানে বসে থাকবে কুনোর মত?  
না, আসরে আসবে?

বিনোদের কিছ্র ও-কলরব অসহ্য বোধ হইতেছিল।  
সে কহিল,—এখানেই থাকি।

—বেশ!...

৪

খটখটানেক পরের কথা। বিনোদের সে নিম্নত  
কোণটাতে ক্রমে কোলাহল-কলরবের চেউ আসিয়া  
লাগিল। পাঁচ-মাত্র জন তরলোক আসিয়া জায়গা  
জুড়িয়া বসিলেন।...

বাহিরে হাসা-কলরবের অস্ত্র নাই! একজন  
ভরলোক বলিতেছিলেন,—হাত ভারী সাক!...কিন্তু  
তাই বা কি করে বলি! ভুল নিশ্চয়! না হ'লে বদলি  
একটা বর্ষাতি দিয়ে যাবে কেন? যেটা দিয়ে গেছে,  
quite fresh! আম্কারা নতুন — তার পকেটে  
একরাশ চুকুট!

বিনোদের হুই চোখ বিফারিত হইল। কবে সেই  
কলঙ্কে-পড়া miracle-এর কথা মনে জাগিল!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সামনে একটা বেয়ারা—  
তাহাকে কহিল,—অজ্ঞবারুক একবার খপর দাও  
তো শীপসির ...

অজ্ঞ আসিল। বিনোদ কহিল,—বোধ হয়, মাগের  
কিনারা হবে রে!

অজ্ঞ কহিল,—কি রকম?  
সে-কথা শুনিয়াছে, বিনোদ বলিল।  
অজ্ঞ কহিল,—বাহিরে এসো।

হু'জনে বাহিরে আসিল।  
বাহিরে হোদোরা গড়নের এক সৌন্দর্য ভরলোক—  
বয়স প্রৌঢ়। তখনো তাঁর মুখে সে-কাহিনীর জের  
চলিয়াছে। শ্রোতাদের মুখে কৌতুক-হাস্য।

অজ্ঞ ডাকিল,—প্রকাশদা!  
ভরলোক কহিলেন,—কি বল্লে, ভায়া?  
—একবার এগিকে আসবেন?  
—নিশ্চয়।

প্রকাশদা উঠিয়া আসিলেন। অজ্ঞ কহিল,—এ  
জিনিষটা দেখুন তো।

বিনোদের কাছে হইতে ক্রম নইয়া অজ্ঞ প্রকাশদার  
হাতে দিল। প্রকাশদা ক্রম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,  
কহিলেন,—বাহ! এই তো সে বস্তু... আমার হাতের  
লেখা টিকিটটুকু অবধি...

হাসিয়া অজ্ঞ কহিল,—এ'র সঙ্গেই আপনার বর্ষাতি-  
কোট বদল হয়েছে... সেজ্ঞ এ'র গৃহে অশান্তির  
সীমা নেই। শান্তি দেবী গৃহ ছেড়ে মান-ভরে পিতালয়ে  
গেছেন।

প্রকাশদা কুতূহলী দৃষ্টিতে বিনোদের পানে  
চাহিলেন; অজ্ঞ তাহাকে বিনোদের করণ কাহিনী  
বিবৃত করিয়া বলিল।

শুনিয়া প্রকাশদা কহিলেন,—আমার গৃহেও বিভ্রাট  
অর ঘটেনি, ভায়া! অর্থাৎ আমি একটু ... মানে,  
রৈগে! হু'দিন পরিচয় হ'লেই জানতে পারবে।  
কাজেই আগে থাকতে স্বীকার করার আমার  
বিন্দুমাছ লজ্জা নেই!

হাসিয়া অজ্ঞ কহিল,—বিবাস হয় না, দাদা! রৈগে  
মাহুৎ পরকায়ার প্রেমে বিভ্রান্ত হয় না। আপনার  
এই নীহারিকা-প্রীতি ...

—ও! প্রকাশদা হাসিলেন; কহিলেন,—এটুকু  
latitude আমি পেরেছি! শালিকাদের প্রতি প্রণয়-  
পোষণ আমার অবিকার আছে। গৃহিণী এসময় মনেই  
আমায় সে অবিকার দান করেছেন। নীহারিকা  
আমার সব-চেয়ে প্রিয়তমা জালিকা — তাই তাঁর প্রতি  
আমার প্রেমও অগাধ!

—তবে আপনার বিভ্রাট ঘটল কিসে?

প্রকাশদা কহিলেন,—পাণ-তামাক ত্যাগগুলি আমি  
উপভোগ করব, তোমার দিদি তা' বরদাও করতে

পারেন না। আমি পাণ-চুরকটের একটু বেশী ভক্ত  
ছিলাম। একবার দাঁতের রোগ হয়—ভারী কষ্ট  
পাই। ডাক্তারের ব্যবস্থায় কাজেই পাণ-চুরকট  
তাগ করতে হয়। তোমার দিদি এসময় ভারী  
হু'শিয়ার। হু'চার বার আমার ভুল-চুক খটেছিল—  
মাহুৎ মাঝেই ভুল হয়, জ্ঞানো তো ভাই! তা সে  
ভুল-চুরকের জ্ঞান সপ্তাহ কাল তাঁর  
segregation-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। একটু  
কথা কননি, আমার ঘরে আসেননি, এক-  
শয্যা গ্রহণ করেন নি! দীপাশ্রম-বাসের চেয়েও  
কটোর শান্তি! প্রিয়তমা আসে-পাশে যুগেন—কথা  
কইবেন না, হাসবেন না, আমার পানে চাইবেন  
না—বেন সেই টাটালাসের কাপু! তুম্বাকুরের  
সামনে পেয়ালা-ভরা সিদ্ধ পানীয়, অথচ তা'তে  
অধর-পর্ণা ঘটবে না! ... আমি তাকে বলি,  
ভূমি এত strict যখন, তোমার উচিত ছিল  
আমার গৃহিণীকে ছেড়ে হাইকোটের বেঞ্চে  
বসা!—তা সে-রাজের কথা বলি, পোনো—  
বাধা দিয়া অজ্ঞ কহিল,—কিন্তু পোপনে  
আমার দ্বীর চিত্ত-হরণের এই চেষ্টা—এর  
নাশি দিদির কাছে আমি পেশ করব।

হাসিয়া প্রকাশদা কহিলেন,—তা'কোরে। তা'তে  
আমার acquittal হবে!—সেই কথা বলি,  
পোনো—অর্থাৎ বিয়ের দিন রাতে আমার বর্ষাতি  
খোঁয়া যায়—তার সঙ্গেই প্রেমোপহার! বাসরে এ  
উপহার নীহারিকার হাতে দেবো, সঙ্গ ছিল—অর্থাৎ  
একটা triangle-এর আভাস জাগবে! পুরান প্রেম  
নতুন প্রেমের পর্ণা টেকে কি না, তারও পরীক্ষা  
হবে; বর্ষাতির সঙ্গে ক্রম অদৃষ্ট হ'তে মন খারাপ হ'য়ে  
গেল। বাসরে সেলুম না। রিক্স হাতে যাওয়া  
সাজে না, তাই। গভীর রাতে বদলি-বর্ষাতি যাড়ে  
শোবার ঘরে এসে শয্যা গ্রহণ করি। এ-বর্ষাতির  
পকেট কতকগুলো চুকুট তখন লুপ্ত করি!  
ঐ লকাই—তা' নিয়ে কিছু ঘটতে পারে,

কল্পনায় আসে নি! মনের সে-অবস্থার কল্পনা  
সাড়া তোলে না! শোবার ঘরেই বর্ষাতি ছিল।  
—তোমার দিদির একটা স্বভাব আছে—ভালো  
বলো, আর মন্দই বলো,—প্রত্যহ সকালে আমার  
জামার পকেট সার্চ করেন। কাল সকালে সার্চ  
করে ঐ বর্ষাতির পকেটে এক-পাশা চুকুট পান।  
আমি ব'সে একটা হিরাব দেখছি, তিনি হু  
করে খাচার উপর চুকুটের রাশ ফেলে নিশাপে  
দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখের পানে চেয়ে আমি  
দেখি—সে কি ভাব? কবিরী বলে গেছেন,  
ঝড়ের পূর্বক্ষণে প্রকৃতির গুপ্তি ভাব! ঠিক তেমনি!  
সে ভাবে দারুণ স্বপ্না, আর বিপ্লবের আভাস!  
আমার মত পত্নী-প্রেমিক ছাড়া সে-লগ্ন অপরের  
বোধগম্য হয় না...

হাসিয়া অজ্ঞ কহিল,—তারপর?  
প্রকাশদা কহিলেন,—তারপরও তনুতে চাও,  
ভায়া? তার আর পর নেই—ট্রাজেডির ঐখানে হুঙ্গ,  
ঐখানেই ইতি। তারপর হু'জনে বাকালাপা। বহা।  
বীর-নারী চাঁদবিবির মত তিনি উজ্জ্বল শিরে চলা-  
ফেরা করছেন—কথাটি কন না। আমি সেধে  
বহবার কথা কইতে গেছি, মিনতি-ভরা বচনে তুণ্ড  
করতে চেয়েছি, তিনি তা'তে দৃকপাত করেন নি।  
অজ্ঞ কহিল,—তা' হ'লে ভুলন, এই বামালা-সম্মত  
আপনাকে তাঁর সামনে বাড়ি করে দি। এতে না  
কুলোয়, বহু বিনোদ আছে। তার বাচনিক এজাহার।  
বিনোদের দশা আরো সঙ্গীন কি না—হু'চুড়োর কোঠে  
আপনাকে বৃষ্টি-বা হাঙ্গির হ'তে হয় সাক্ষ্য দিতে।

বিনোদ কহিল,—তার প্রয়োজন আছে! এবং  
বত শীঘ্র সম্ভব...

অজ্ঞ কহিল,—সহপায় বহু?  
বিনোদ কহিল,—বলো।  
অজ্ঞ কহিল,—কাল ভূমি শ্রীমতী শান্তি দেবীকে  
এইখানে নিয়ে এসো...

প্রকাশদা কহিলেন,—আনান্দির কাজ হবে...আরে



রামচন্দ্র! এমন কাজও করে! তিনি বলবেন, আমি শেখানো সাক্ষী।

অজয় কহিল,—তবে?

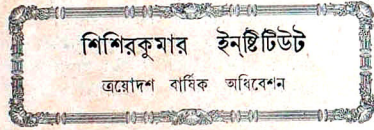
প্রকাশনা কহিলেন,—অর্থাৎ কাল অজয়, নীহার, বিনোদবাবু এবং সঙ্গীক আমি—ক'জনে মিলে চুচড়ায় বাই, চলো—এরহস্ত এমনি গোপন থাকুক—কাজের গোলামে বিরহ-রেননা শিখিল হবেই; তারপর ক'জনে একত্র হয়ে এরহস্তের গ্রন্থি মোচন করব। আমার কথা শোনা ভার্য—বহুকাল ধাবৎ আমি স্বীর সঙ্গে বর কর্তি। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে আমার জ্ঞান কাবা থেকে সংগ্রহ করা নয়, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সম্ভাভ। আভাল-আবভাল, কিংবা গোপন রন্ধুর আশ্রয় নিমোচো,

কি দ্বিগুণের চিত্ত বিরোধী হয়েছে! এ-তব আমার ভাবো রকম জানা আছে!

অজয় কহিল,—উত্তম পরামর্শ! কি বলো, বিনোদ?

প্রকাশনা কহিলেন,—আমার দীর্ঘতর অভিজ্ঞতা—আমার কথা শুধুন। প্রমাণ-স্বত্ব লুটো বর্ধতি সঙ্গে যাবে। আর আমার ইনি ত্রিমতী নির্মলাবালাও চুকেট পাওয়া, কত উপহারের কথা সাক্ষ্যে বলবেন। আমাদের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস হ'লেও সে-আদালতে নারীর সাক্ষ্য অকাটা হবে। এছাড়া সঙ্গ্যায় তো আমি দেখছি না!

বিনোদ কহিল,—বেশ, তাই হোক।



শিশিরকুমার ইন্সটিটিউট

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন

গত রবিবার ২১শে মে অপরাত্রে শিশিরকুমার ইন্সটিটিউটের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভার অধিবেশন স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বহু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ বাসভবনে কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমুত সন্তোষকুমার বহু মহাশয়ের সভাপতিত্ব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বহু সম্রাট ভ্রমসোক ও মহিলা সভায় আসিয়াছিলেন।

ইন্সটিটিউটের সম্পাদক শ্রীমুত বিমলকান্তি ঘোষ বে ত্রয়োদশ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায়, ইন্সটিটিউট সাহিত্য, সমাজসেবা, নাট্যকলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সেবা করিতেছে। ইহা আলোচ্য বৎসরে দশ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিল; তাহাতে ছয়টা কাপ ও এগারটা পদক, 'কার্যন'-প্রতিযোগিতায় একটা কাপ ও ছইটা পদক

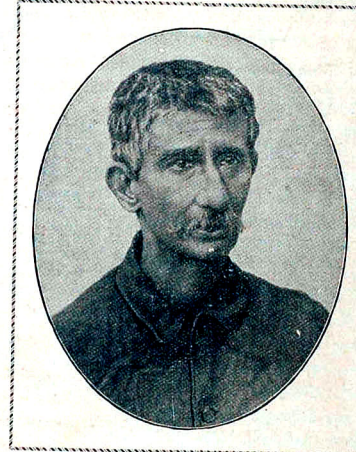
এবং নাট্যাভিনয়ে সাতটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ইন্সটিটিউটের সহ-সভাপতি শ্রীমুত মুখলকান্তি ঘোষ স্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে ইন্সটিটিউটের সমস্ত সংখ্যা প্রথমে ছিল ১৪৮ জন; শেষভাগে হয় ২২৬ জন। লাইব্রেরীতে আলোচ্য বৎসরে ৩৮০০ খানা পুস্তক ছিল; পূর্ববর্তী বৎসর হইতে ৩৭৭ খানা পুস্তক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন ইন্সটিটিউটের বার্ষিক সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া ৩০০ টাকা করিয়াছিলেন; বর্তমান বৎসরে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া ৫০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন। ইন্সটিটিউট শরীর-চর্চা এবং খেলা-ধুলায়ও ব্যবস্থা করিয়াছে। উপসংহারে সম্পাদক বলেন,

ইন্সটিটিউটের কাজকর্ম একপ রুদ্ধ পাইয়াছে যে, প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া প্রতিশ্রুতি দেন যে, সমিতির বর্তমান আকিষে আর স্থান সম্বলান হইতেছে না। সাহায্য বৃদ্ধির জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

সমিতির একধান।

নিজস্ব বাড়ী  
আবশ্রক।

অন্তঃপুর শ্রীমুত  
রাজেন্দ্রনারায়ণ  
বাড়ুয়া, শ্রীমুত  
প্রভুদয়াল হিন্দু-  
সিংহ ও শ্রীমুত  
ভূতনাথ মুখো  
সমিতির প্রশংসনীয়  
কাজের স্থাতি  
করিয়া বক্তৃতা  
করেন। সর্বশেষে  
সভাপতি মহাশয়  
একটি নাত্তির্ঘ  
বক্তৃতা করিয়া  
স্বর্গীয় মহাশয়  
শিশিরকুমারের  
স্মৃতির প্রতি  
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ  
করেন এবং  
সমিতির কর্ম-



মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

তারপর কুমারী  
কল্যাণী চাটুজো  
নারী একটি আট  
বৎসর বয়স  
বালিকার নৃত্য ও  
গীত, ত্রীমান অনিল  
ভট্টাচার্য ও ত্রীমান  
নির্মল ভট্টাচার্যের  
বাউল-সঙ্গীত,  
বাগবাজার ফ্রেণ্ডস  
ইউনিয়নের আটটি  
বালিকার সঙ্গীত  
ও পল্লী-নৃত্য, উক্ত  
ইউনিয়নের বৃক  
সদস্যদের বঙ্গি ও  
গুরুত্ব এবং স্বর্গীয়  
রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের  
“মানমরী গালস্  
স্কুল” ও শ্রীমুত  
প্রবোধ মজুম-  
দারের “গুডবাজা”  
অভিনীত হয়।





[ 'উদয়ন' সমালোচনার জন্ম গ্রন্থাকরণ অম্বুধ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখনি করিয়া পাঠাইলেন ]

**ভারত কি সভ্য ?**—ঐশ্বরবিন্দুর "Is India Civilised ?" হইতে অনূদিত। অম্বুধাক—ঐশ্বরবিন্দুর রায়। ঐশ্বরবিন্দু শাইবেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

কতক বসন্ত হইল উইলিয়ম আর্চার (William Archer) নামক একজন লেখক "ভারতের সমগ্র জীবন ও শিক্ষা-দীক্ষাকে উৎকট ভাবে আক্রমণ করিয়া একখনি বই লিখিয়াছেন।"

"তিনি ভারতের দর্শন, ধর্ম, আর্ট, সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ সব একসঙ্গে জড়াইয়া বলিয়া দিয়াছেন—জ্ঞানরজনক অধ্যয়ন বর্জিতরূপে।"

এই পুস্তক প্রচারের অল্পকাল মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ণ জজ ও এপ্রিভেন্সাল তত্ত্বাবধায়ক স্যার জন উড্ডোক মি: আর্চারের এই বিবেচনু-প্রণোদিত নিম্নোক্ত আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া একখনি পুস্তক লেখেন—তাহারই এই চমকপ্রদ নাম—"Is India Civilised ?" ঐশ্বরবিন্দু এক ইংরাজী প্রবন্ধে এই শেখোক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজ অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। সমালোচ্য পুস্তিকাখনি (৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) অনিল-বরণাবৃত কৃত সেই প্রবন্ধের অম্বুধ।

উড্ডোক সাহেবের মতে—"ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।" সেজন্য তিনি মনে করেন—"এই সব অজ্ঞতাপূর্ণ আক্রমণকে অবহেলা করা কখনই উচিত নহে।"

এই ধারণাতে এমন ভাবে তিনি মি: আর্চারের সিদ্ধান্তগুলি অযৌক্তিক, ভ্রান্তাত্মক ও ভ্রান্তিসিদ্ধান্তক প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, অম্বুধাক মহাশয়ের

ভাষায়—"মেনে একটা প্রকাশ্যতিকে (না—গুপ্তের পোকারকে) জাঁতার পিথিয়া ফেলা হইয়াছে।" তিনি অবিসম্বাদী রূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "মি: আর্চারের বোলাগুলি উদ্দেশ্য হইতেছে রাজনৈতিক।" আধুনিক ইউরোপের ইন্ট্রিগোপাঙ্ক সভ্যতার এই উপাসক বলিতে চান—

"হু হু তাহাকে (ভারতকে) তাহার সমগ্র সমস্ত ইউরোপীয় ভাবাধর্ম, মুক্তিপন্থী, জড়বাদী ইহুয়া উঠিতে হইবে এবং এই ভাবে স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে নতুবা তাহাকে পরাধীনতাশে বদ্ধ রাখিয়া শাসন করিতে হইবে, তাহার খ্রিস্টোক্তা ধর্মতীক্ষণ বর্জিতক জোরে করিয়া চাপিয়া রাখিয়া... ইউরোপীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত ও সভ্য করিয়া তুলিতে হইবে।"

ইহা হইতে বুঝা যায়—"এটা হইতেছে কালচারের কলহ, এবং রাজনৈতিক সমস্তার দ্বারা ইহা আরও জ্বলি হইয়া পড়িয়াছে।" উড্ডোক সাহেবের আশঙ্কা—"একদিকে ইউরোপীয় আধুনিকতার স্থতী আক্রমণ, অজটিক তাহার (ভারতের) সম্ভ্রামণের নিদানক অবহেলা"—ইহার ফলে হয়ত ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই তাঁহার উপদেশ হইতেছে—

"এমন তাহাকে (ভারতকে) নিজের পায়ে দগ দিয়াই দাঁড়াইতে হইবে, বিদেশী প্রভাব হইতে নিজের কালচারকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহার বিশিষ্ট আখ্যা, মূল্যত নীতি, স্বভাবানুযায়ী অম্বুধন সমুদ্র রক্ষা করিয়া নিজের মুক্তি-স্বাধীন এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।"

ঐশ্বরবিন্দু তাঁহার প্রবন্ধে বলিতেছেন—"এই মতবাদটির সহিত মোটামুটি ভাবে আমার মতের একা আছে...কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার (স্যার জন উড্ডোকের) সহিত আমার কিছু মতভেদ আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া ভাল মনে করি।" আর তিনি তাহা বেশ ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে।

এই পুস্তক স্থলভ হইলেও বহুমূল্য। ক্ষুদ্র হইলেও গুরুভার। বিশেষতঃ বর্তমানে যুগান্তর-সূচক তুমুল পরি-বর্তনের সমস্তগুণ সন্নিবেশে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনের ও নবীনের, প্রাচ্যের ও প্রত্যাচ্যের ভাব ও আদর্শের পারস্পরিক সংঘাতে ধর্মক্ষেত্র ভারতে যে প্রবল সমস্তার উত্তর হইয়াছে—এই মনীষিগণ তাহার কিরণ সমাধান করিতে চাহেন, তাহা অবশ্যই দেশের ও জাতির প্রেরণাশী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধানম্যো।

কিন্তু হুজুরের বিষয়, অনিলবাবুর অম্বুধা সম্বন্ধে আমরা বলিতে বাধ্য, তাহা ওজস্বী হইলেও যথেষ্ট প্রাঞ্জল নহে; এমন কি অনেক স্থলে—মাহাদের জন্য প্রধানতঃ অম্বুধাবাদের আবশ্যকতা—সেই ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক-দিগের বোধগম্য হওয়া দুস্কর। পরন্তু, অম্বুধা নিত্যত "আক্ষরিক" হওয়াতে বহুক্ষেত্রে তাঁহার বাঙ্গলা উৎকট ইংরাজী গদ্য বিকীর্য করিতেছে। এছাড়া এতদূর একখনি বই, তাহাও ভুরি ভুরি ছাপার ভুলে ভরা। আশা করি ভবিষ্যৎ সম্বরণে এসকল জটী পরিহারে তিনি যত্নশীল হইবেন।

### বীকন

**দায়ী**—উপভাস। শ্রীহাসিরাশি দেবী ও ঐপ্রভাবতী দেবী সম্বন্ধী প্রণীত। ৪৪নং কৈলাস বহু স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান যুগে বাঙা ভাষায় গল্প-উপভাস লিখিয়া যে কয়জন মহিলা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই উপভাসখানির লেখিকাশ্বয়ের নাম সন্ধানম্বে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও তাহাদের সেকৃতিত্বের পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। বইখানি আগাগোড়া বেশ চিত্তাকর্ষক। একটানা পড়িয়া যাইতে একটুও বিরক্তি বোধ হয় না। উপভাসখানির "দায়ী" নাম সার্থক হইয়াছে; কেননা, পুস্তকে বর্ণিত ঘটনা-স্রোত এমন বিচিত্র গতিতে আঁকিয়া থাকিলা গিয়াছে যে, প্রত্যেকটি কার্যের জন্ম এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে দায়ী করা চলে।

তবে চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া এই উপভাসখানির উপর শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপভাস "পল্লীসমাবেশ" বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। পুস্তক-খানিতে কিছু কিছু মুদ্রাক-প্রমাদ দেখা গেল। এইরূপ দুই একটি দোষ-জট বাদ দিলে বইখানিকে মোটের উপর বেশ ভাল বলা যায়।

**দিদির বর**—উপভাস। শ্রীসারবিহারী মণ্ডল প্রণীত। ৪৪ নং কৈলাস বহু স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

এক 'হামি-অনাদূতা' অথচ 'হামি-প্রেম-বিহারিণী' নারীর আত্মকাহিনীর আকারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কামনা-পীড়িতা নারীর মনোভাব লেখক বেশ নিপুণ ভাবেই ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সর্বত্র তাঁহার এই নিপুণতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, শেষের দিকে যখন মণ্ডলী-কল্পা নাট্যীয় বিমাতা ও পিতার প্রণয়-ব্যাপারে যোগ দেয় এবং ভূতপূর্ণ দায়ীর সহায়তায় বিমাতাকে একরকম জোর করিয়াই পিতার শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দেয়, তখন পাঠকের স্বকৃতি-বোধে বড়ই আঘাত লাগে।

বীধাই ভাল। ছাপা ও কাগজ চমকসই।

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র



**যোগ-বিয়োগ**—শ্রীশচীন সেন-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদ সরকার, বাতায়ন পার্বণিগি হাউস, ১৪৪, ধর্মভদ্রা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষ প্রেমের মিলন-বিরহের করুণ কাহিনী। এনাঙ্কী ও বিনয়ের উপাখ্যানই plot, মতন ও নমিতার ইতিকথা bye-plot। ছোট দম্পতির জীবনের যোগ ও বিয়োগ অপরূপ সুস্বাদু সহিত দেখানো হইয়াছে। প্লট ধোরালো হইলেও লেখকের ভাষা ধোরালো, সমালোচনা ধারালো এবং মতামত প্রকাশে অপটুতার লেশমাত্র নাই। আধুনিক সমাজ ও অতি-আধুনিক সাহিত্যের ধাক্কা-বোম্ব, এবং আভিজাত্যের নামে যে আধুনিকতম সভ্যতা (১) চলিয়া যাইতেছে, তাহার দাবি-কিছু জটিল, তাহার প্রতি কথাতার রীতিমত সাহসিকতার সহিত করা হইয়াছে। কাজের দিকিতি দিয়া এক একটা type এমন উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা ইহাদের প্রত্যেককেই ভাল করিয়াই চিনি এবং নামও জানি। যে স্থানে স্থানে অতি তীব্র হইলেও বাহ্যিকের গালি দেওয়া হইয়াছে, তাহারও উপভোগ করিবে, এবং হৃদয় নিজেদের সম্বোধনও করিতে পারে। লেখক নূতন, কিন্তু নূতনের অঙ্গমতা চোখে পড়িল না; সহজ, সরল এবং মনোমরম করিয়া গিথিবার কায়া কসারাই মনে হইল। কেবলমাত্র কোনো-কোনো জায়গায় পরিণতি। abrupt লাগিল। আর অক্ষম কবিরের বার্ষ কাব্য-প্রচেষ্টার স্বদীর্ঘ নমুনা না দিলেও চলিত। ছাপা, বঁধাই ভাল। ছাপার তুল সখ্যে প্রকাশকের আক্ষেপোক্তি সবেও বিশেষ তুল নজরে পড়িল না।

### শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

**Women of India**—by Otto Rothfeld, F. R. G. S., I. C. S. with 48 Full-page illustrations. Edition—De Luxe. Price Cloth Rs. 20, Popular Edition Rs. 11.

উপহারের পক্ষে অতি উপায়ের পুস্তক। সারা

ভারতবর্ষের ৪৮টি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর চিত্র একত্রে গ্রন্থিত। বিবিতাংশও স্থাশ্রী। চমৎকার ছাপা, চমৎকার বঁধাই।

**Do We Agree?** বার্গাড শ ও জি, কে, স্টোবটনের মধ্যে বিতর্ক। সভাপতি—বেলক্। মূল্য—১০/-। বইখানি সাধারণের পাঠ্য করা উচিত।

**The New Webster's Collegiate Dictionary**—মূল্য ১৫/-। বিশ্ববিখ্যাত Webster অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ১২৫০ পৃষ্ঠার অধিক, ১০৩,০০০ শব্দগণি আছে, ১১০০ ছবি আছে এবং তাহাতে সত্যই অভিধানের গৌরব বাড়িয়াছে। জীবন-চরিতাংশ ইত্যাদি আরও কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় গৃহীত হইয়াছে।

**New Discoveries relating to the Antiquity of Man**—by Sir Arthur Keith, M. D. (Aberdeen), D.Sc. (Oxford, Durham and Manchester), L.L.D. (Aberdeen and Birmingham) F. R. C. S. (Eng.), F. R. S. মূল্য—১৫/-

স্বন্দর পুস্তক; ভাষা সহজ করিবার দিকে লেখকের বিশেষ দৃষ্টি আছে। মানুষের নিজ ইতিহাসে যদি সভ্যতার কৌতুহল থাকে তবে পুস্তকখানি নিশ্চয়ই পাঠ্যব্যয়।

**Faridu'ddin 'Attar: The Persian Mystics**: 'Attar. By Margaret Smith etc. John Murray 1932. 3s-6d.

(ইশ্টিখারিয়েল হায়েরীর হায়েরীরায় নিঃকে, এম, আসাউল্লাহর সৌজতে প্রাপ্ত)

"Wisdom of the East" series-এর এই ছোট বইখানিতে কবির স্বন্দর একটি ছোট জীবনচরিত এবং তাঁহার দার্শনিক মতের পরিচয় আছে। অম্বাবাঙলি হইতে Sufism-এর স্বন্দর একটি আভাস পাওয়া যায়। এদেশের কাব্য-জগতে Sufism-এর প্রতি উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকেরা পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

“ন”



### ইতিহাস—

হংলী জেলায় প্রাচীন নগরী আবিষ্কার—

শ্রীওম্বদাস রায়

(প্রবন্ধক—বৈশাখ, ১৩৪০)

মিহলী প্রবাদ ও উপাখ্যান—

হামী জগদীন্দ্রনাথ

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৩৪০)

অতীত ও ভবিষ্যৎ—শ্রীমদাশ্রম চন্দ্র

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

সেকালের কথা—শ্রীরঞ্জেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বুদ্ধকথা—শ্রীঅম্বলচন্দ্র সেন

(বঙ্গলক্ষী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

প্রাচীন ভারতে বিদ্যুৎ মহিলা—

শ্রীমতী কমলাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৩৪০)

বঙ্গ স্বাধীন-প্রভাব প্রবেশের ধারা—

মুহম্মদ এনাহুল হক্, এম্-এ

(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

গ্রীক ইতিহাসের সংকলিত—

ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

দুর্ভিক্ষের স্বপ্নের কাল—

শ্রীকৃষ্ণের মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

(অভ্যাস—বৈশাখ, ১৩৪০)

### সাহিত্য—

কবি তানসেন—শ্রীশ্রীতরুনার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৪০)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছিন্ন-পত্র—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(বিচিত্রা—বৈশাখ, ১৩৪০)

কাব্য-সাহিত্যের উপেক্ষিত—শ্রীপ্রিয়লাল দাস

(অর্কন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)

বৈষ্ণব কাব্য—শ্রীসেঙ্গনাথ গুপ্ত

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—

শ্রীজগৎমোহন সেন, বি-এসসি, বি-এড্

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

শ্রীশ্রীত-গোবিন্দ কৃষ্ণলীলা—

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

জননী, রমণী, নন্দিনী—

শ্রীজ্যোতিষ চট্টোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ

(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

সাহিত্যে অমীলিত—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দাস

(বঙ্গলক্ষী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

মূল কৃত্তিবাসের অঙ্গসন্ধান—

শ্রীমণিলাল কান্ত ভট্টাচার্য, এম্-এ

(বঙ্গলক্ষী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ—শ্রীকালিদাস রায়

(গুপ্তপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

লোকসাহিত্যের ধারা—

শ্রীমদোমোহন নরহর

(বঙ্গলক্ষী—বৈশাখ, ১৩৪০)



বাঙলা সাহিত্য ও মুহললান সমাজের রুচি-বিপর্যয়—

মোহাম্মদ আল্লাহেল কাবী  
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

দর্শন—

ভারতীয় দর্শন—স্বামী চন্দ্রশ্ররানন্দ  
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ধর্মজীবন ও বিজ্ঞান—

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন  
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বিজ্ঞান—

তরল বায়ু—মোহাম্মদ ইসহাক, বি-এসসি  
(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বৈজ্ঞানিক শক্তির আবিষ্কারের কাহিনী—  
ঈশ্রুপেক্ষ চট্টোপাধ্যায়

(মাসিক মোহাম্মদী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

টায়ল্ড ভাস্ক—ঈজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়  
(মাসিক বহুমতী—বৈশাখ, ১৩৪০)

অর্থনীতি—

দেশের অর্থ যায় কোথায়?—

ঈশ্রুপেক্ষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বাংলায় অর্থসমস্যা—

ঈহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ  
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

দেশের অর্থের সন্ধান—

ঈশ্রুপেক্ষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
(রাহিত ঈটি—বৈশাখ, ১৩৪০)

স্রম—

মহাপ্রস্থানের পথে—

ঈশ্রুপেক্ষকুমার সান্নাল  
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

খুঁসী—প্রতীকানুসূরী—

ঈশ্রুপেক্ষনাথ গুপ্ত  
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

হুজুরদাও—

অধ্যাপক ডাঃ ঈশ্রুপেক্ষকুমার পাল,  
ডি-এসসি, এম্‌বি  
(ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

সিগেটের দেশে—

ঈশ্রুপেক্ষকুমার ভট্ট  
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

প্রভাবর্ধন—

ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ চট্টোপাধ্যায়  
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ভূবার্তা—অমরনাথ—

ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
(মাসিক বহুমতী—বৈশাখ, ১৩৪০)

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—

তরুণের দেহচর্চা—ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ  
(ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৪০)

বেকার-সমস্যা—

বীমা ও বেকার-সমস্যা—ভাস্কর এম, সি, বার  
(জীবন-বীমা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

পূর্ববিদ্যা—

The Early History of Irrigation—  
Sukumar Ranjan Das  
(Modern Review—May, 1933)

রুবি—

আগন্তবলয় মোহাম্মদের চাষ—  
ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ ভট্ট  
(রুবি-গল্প—বৈশাখ, ১৩৪০)

জীবন-চরিত—

মাজাম কুরী—ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ  
(জয়শ্রী—বৈশাখ, ১৩৪০)

শিক্ষা—

শিক্ষার আদর্শ—ঈশ্রুপেক্ষদারনাথ গুপ্ত  
(জয়শ্রী—বৈশাখ, ১৩৪০)



(১)

আমরা যাকে ঘরের কথা বলি, তা' যে কতটা  
ঘরের, কতটা বাইরের, তা' বলা কঠিন। কারণ  
আমাদের মন স্রুণু ঘরেই থাকে না, বাইরেও থাকে।  
নিজা বাইরের পাচরকম জিনিষ আমাদের মনে  
প্রবেশ করে ও মনকে ধাক্কা দেয়; এবং তার  
ফলে আমাদের অন্তরে নতুন ভাব, নতুন চিন্তার উদয়  
হয়। বাইরের অধীনতা থেকে আমাদের কারও মন  
মুক্ত নয়। বরং সত্যকথা এই যে, বাইরের সঙ্গে  
সম্পর্কহীন মন বলে কোনও পদার্থ আছে কিনা, তা'  
আমরা জানিমে, — হয়ত বোঁগীরা জানেন।

(২)

বিশেষতঃ এ-মুখে সংবাদপত্র ও রেডিও প্রভৃতির  
প্রসারে বাইরের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক ঢের বেশি  
ব্যাপক হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে কোথায় কি ব্যাপার  
ঘটেছে, তা' আমাদের না জেনে উপায় নেই। এর  
ফলে আমাদের আত্মজ্ঞান বাহ্যিক আর না বাহ্যিক,  
আমাদের বাহ্যজ্ঞান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীতে  
কোথায় কি ঘটনা হচ্ছে, কে কি করছেন, কে কি  
বলছেন, সে খবর আমরা নিতা পাই। এবং এ-সব  
খবর আমাদের মন নিতা উত্তেজিত হয়, ব্যতিব্যস্ত হয়,  
বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইরূপ দৈনিক উত্তেজনা আমাদের  
একরকম নেশার মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-জাতীয়  
খবরখবরের মোতাজ আমাদের প্রতি সকালে হয়, আর  
চায়ের মোতাজে চাইতে খবরের কাগজের মোতাজ  
ওক বিদ্যুৎ কম নয়; ফলে বাইরের কথা একালে  
একরকম ঘরের কথা হয়ে উঠেছে।

(৩)

এক কাল ছিল যখন বাঙালীর কাছে "ঘর হতে  
আগ্নিবা বিদেশ" ছিল। আর এ-মুখে প্রায় সমগ্র  
পৃথিবী, অর্থাৎ বিলকুল বিদেশ, আমাদের ঘরের আগ্নিবা  
হয়ে উঠেছে। আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের, দেশের  
সঙ্গে বিদেশের, সম্পর্ক অতি নিকট হয়ে উঠেছে। সকাল  
বেলায় খবরের কাগজ খুললেই দেশ-বিদেশের কথা  
আমাদের চোখে পড়ে, আর আমাদের মনটা সমস্ত  
পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সব বাইরের  
কথার সঙ্গে ঘরের কথার কি বোণামোণ আছে, তা'  
আমরা ভাবতে বাধ্য হই; — কারণ বোণামোণ যে  
আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া  
যাক। খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকা  
Dundee থেকে দেদার পাট কিনছে। এর ফলে যে  
বাঙালী পাটের বাজার চড়ে ঘাবে, এজন্য আশা করা  
অসম্ভব নয়। ফলে, বাঙালীর বর্তমান দৈন্য যে কতক  
পরিমাণে ঘুচবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ  
বাঙালীদেশের টাকা হচ্ছে বাঙালীর পাট। আর পাট  
সত্তা হলোই বাঙালীর টাকার চুক্তি হয়। ব্যবসা-  
বলছেন, সে খবর আমরা নিতা পাই। এবং এ-সব  
খবর আমাদের মন নিতা উত্তেজিত হয়, ব্যতিব্যস্ত হয়,  
বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইরূপ দৈনিক উত্তেজনা আমাদের  
একরকম নেশার মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-জাতীয়  
খবরখবরের মোতাজ আমাদের প্রতি সকালে হয়, আর  
চায়ের মোতাজে চাইতে খবরের কাগজের মোতাজ  
ওক বিদ্যুৎ কম নয়; ফলে বাইরের কথা একালে  
একরকম ঘরের কথা হয়ে উঠেছে।



(৪)

এই আন্তর্জাতিক বিরোধ ব্যবস্থা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পৃথিবীর economic war-এর সৃষ্টি করেছে। আর পৃথিবীর বড় বড় বড় অর্থ-শাস্ত্রীর মতে মাহুয়ের বর্তমান অর্থসঙ্কট প্রাধান্যতঃ এই economic war-এরই অবশুস্বাভাব্য ফল। এই কারণে Roosevelt যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এ-ঘটনা বাইরের একটা বড় ঘটনা। Roosevelt পৃথিবীর এই economic war-এর পরিবর্তে শান্তিস্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন; এবং কতক পরিমাণে তিনি যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন, একদম আশা করা অসম্ভব নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এক হিসেবে Dictator বলা যেতে পারে, কারণ ডিক্টরের অনেক ক্ষমতা তাঁর আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশ এখন বিধম ভারাক্রান্ত, এবং আমেরিকাই হচ্ছে সে সব দেশের প্রধান উত্তরণ। স্তরতঃ তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে যুরোপের ক্ষমতার অনেকটা লাস্যব করতে পারেন। বিতীর্ণতঃ, তিনি নিজেই সেনার অর্থসঙ্কট দূর করার জন্য gold standard বর্জন করেছেন। অর্থাৎ কিছুদিন পূর্বে ইংলও আশ্চর্যকর জ্ঞান যে পছা অবলম্বন করেছিল, আমেরিকাও আজ সেই পথের পথিক। উপরন্তু Roosevelt আমেরিকার টাকা সত্তা করার উপায় অবলম্বন করেছেন। ইরাকীতে যাকে বলে টাকার Inflation, আমেরিকার গবর্নমেন্ট নির্ভয়ে তারই শরণাপন্ন হয়েছেন। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়লে যে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়বে, সে কথা বলাই বাহুল্য। টাকার অভাব ঘটলেই টাকার মূল্য চের বেড়ে যায়। অর্থাৎ টাকার জিনিষ এক টাকায় কেনা যায়। Inflation-এর ফলে দেশের সেই অল্পসংখ্যক লোকের কিঞ্চিত ক্ষতি হয়, যারা তাদের টাকার একটা ঝাঁপ উপসর্গ ভোগ করে, যথা টাকার স্বল্প ইত্যাদি। যার ব্যক্তি কালের এই ব্যাপারে লজ্জা বই লোকসান নেই। ভবিষ্যতে দেখা যাবে এর ফল কি হয়।

(৫)

পৃথিবীর আর একটা বড় ঘটনা হচ্ছে—Hitler-এর জার্থানির হস্তাকর্তব্যবিধাতা হওয়া। কারণ তাঁর কথাবাণীতে বোকা যায় যে, তিনি পৃথিবীর পোলিটিক্যাল শান্তিভঙ্গ করার জন্য বহুপরিকল্পনায় হয়েছেন। জার্থানি গত যুদ্ধের ফলে একটি অধঃপতিত জাত হয়ে পড়েছে। Hitler আবার জার্থানিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে রতী হয়েছেন। ফ্রান্স ভয় পায় যে, Hitler যে উপায়ে জার্থানিকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চান, তা' ফ্রান্সের আশ্রয়কার অন্তরায়। ইংলও ভয় পায় যে, সে দেশের রাজস্বদ্বারা যুরোপের জাতিতে জাতিতে যে আশোপবীমালাসার প্রস্তাব করেছেন, Hitler তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করবেন। Roosevelt যেমন economic war বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন, Hitler আবার নতুন political war বাধাবার চেষ্টা করছেন। পৃথিবীতে economic শান্তি অথবা political যুদ্ধ, যাই ঘটুক, তার ফলক ও কুলক আমরা ভারতবাসীরাও ভোগ করব। অথচ এই শান্তিস্থাপন অথবা যুদ্ধসংঘটনের উপর আমাদের কোনই হাত নেই। আমরা ধনেপ্রাণে সম্পূর্ণ পরবশ। স্তরতঃ বিদেশের এই সব বড় বড় কথা শুনিনি বলে আমাদের ঘরের কথা হয়ে উঠবে। এই কারণেই পূর্বে বলেছি যে, এ-মুখে বাইরের কথা আমাদের ঘরের কথা হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ চিরকালই মাহুয়ের আশা ও ভয়ের দেশ। গত শতাব্দীতে ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ আশার দেশ ছিল; বর্তমানে তা' হয়ে উঠেছে প্রাধান্যতঃ ভয়ের দেশ। এর কারণ, গত শতাব্দী ছিল মূল্যতঃ পৃথিবীর আর্থিক প্রগতির যুগ; আর বর্তমান হয়েছে স্পষ্টতঃ আর্থিক হ্রাসিত যুগ। কিন্তু এই আর্থিক হ্রাসিতিকে প্রগতিতে পরিণত করা সম্ভব আমাদের হাত কবে, বাইরের হাত বেশি।

(৬)

এখন ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক। ভারতবর্ষে সম্প্রতি সর্বপ্রধান ঘটনা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর অনশন রত। এ-ব্যাপারে বেশদূর লোক লোকান্তর চলাকৃত,

উদ্বুদ্ধিত এবং উৎক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহুলোক মনে করেন যে, মহাত্মা গান্ধীর কার্যকলাপের উপর দেশের ভাগা অনেকটা নির্ভর করছে। এই কারণে, দেশের লোকের কাছে তাঁর জীবন সন্মাপনো বহুমূল্য। এই বহুমূল্য জীবন তিনি হেলায় বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন,—এতে যে দেশের লোকে যুগপৎ ভীত ও বিদ্বিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধী কোন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলে, তার পরিণামের জন্য দেশের লোক এতটা উত্তলা হয়ে উঠত না। মহাত্মা বা' বরণ করেছিলেন, সে হচ্ছে বেহেমামৃত্যু, এবং তার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁর এ-প্রয়োগবিশেষনরূপ কঠোর সহকের মূল ছিল 'হরিজন'দের অস্পৃশ্যতা হিন্দুসামাজ থেকে দূর করার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুসামাজের অস্পৃশ্যতারূপে পাপের তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বোধহয় তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসামাজ এ-পাপ হতে মুক্ত হবে। তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের ভীষণ অধি-পরীক্ষা অদ্বত শরীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এতে দেশের লোক হাঁক ছেড়ে বেটেছে। এ-অনশনরত পালন করে তিনি আবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি দেহে ও মনে একজন অসাধারণ পুরুষ। যারা মহাত্মার শিষ্যও নয়, অমরতত্ত্ব ভক্তও নয়, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের তুলনায় তিনি একজন superman। Supermanমাত্রই সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাত্মার জৈনক সহচর ও অমরতত্ত্ব বলেছেন যে, তিনি একজন mystery-man; এ-কথা সত্য। কারণ আমরা সেই ব্যাপারকে mystery বলি, যার কার্য-কারণ আমরা আমাদের সম্বন্ধ মনে দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে, অথচ যার শক্তিও আমরা স্বীকার করতে পারিনে।

(৭)

এখন মহাত্মার অমরতত্ত্ব রতের ফল কি হবে, তা' অমরতা বর্জন করতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথমতঃ, মহাত্মার ডাক্তারবন্ধুদের মতে তিনি এই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর মন তাঁর দেহের উপরে জয়লাভ করেছে। মাহুয়ের মন তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং মনের শক্তি যে দেখছেন অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে, এ-সত্য বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু মহাত্মা এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রমাণ করার জন্য অনশনরত গ্রহণ করেননি। যে উদ্দেশ্যে তিনি এই ভীষণ রত অবলম্বন করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর প্রয়োগবিশেষনের ফলে কতটা সিদ্ধ হবে, তাই হচ্ছে আসল বিচার্য। মহাত্মার এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসামাজ যে অপ্রায়শ্চিত্ত করবে, একদম আশা করা অসম্ভব; এবং হরিজন-সমাজ যে তার চূড়ান্ত সমাধানের পথে বেশি দূর এগাবে, এমনও মনে হয়না। মহাত্মা গান্ধী আশ্ব ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পূর্ণিমা অস্পৃশ্যতাবর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু এই এক মূগের আলোচনের ফলে হরিজনরা কি হিন্দুসামাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?—ধরুন এই বাঙালার কথা। এ-অঞ্চলে অস্পৃশ্যতার কোন বাড়বাড়ি নেই। এর প্রথম কারণ, বাঙালাদের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর লোক অস্পৃশ্য বলে গণ্য নয়। বিতীর্ণতঃ, বাঙালার উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ লোক ইংরাজীশিক্ষিত। ফলে, তাঁরা মাহুয়কে স্পর্শ করা অধর্ম বলে বিবেচনা করেন না। অথচ আমরা জাতিভেদের গণ্ডির ভিতর বাস করি বলে, সে গণ্ডি লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত নই। মনে আমরা অধিকাংশ লোক অস্পৃশ্যতা মানিনে, কিন্তু আমাদের হালচাল ব্যবহার পূর্ণের মতই রয়ে গেছে, বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কেবলমাত্র বর্তমান যুগে যে-যে স্থলে জীবনযাত্রার জন্য আমরা সেকোলে বন্ধন ঢিলে দিতে বাধ্য হয়েছি, সেই সব স্থলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে হুঁহিয়ার খাতিরে কতকটা মুক্তিদাতা করেছি—সামাজিকভাবে নয়। আমাদের জীবনে ও মনে যে মিল নেই, এ-কথা ত সর্বজনবিদিত।



(৮)

আসল কথা এই যে, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করে হিন্দুমতাবধারী সকল লোককে একজাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। কারণ, জাতিভেদ-প্রথার অর্থই হচ্ছে উচ্চনীচের প্রভেদ। মাহাত্মজীকেই মাহাত্ম হিমেবে গণ্য করা সামাজিক হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমাদের এই যুগশক্তির সংহার ও অভ্যাস একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। হিন্দুসমাজ এক নয়—অসংখ্য ভাষাংশের সমষ্টিমাত্র। এই ভাষাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা আমাদের পক্ষে পোলিটিকাল হিসেবে নিতান্ত কামা হয়ে উঠেছে; তাই আমাদের পোলিটিকাল নেতারা পূণ্য-প্যাণ্ডি প্রভৃতির দ্বারা সে পোলিটিকাল যোগাধান করবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এ-যোগ সামাজিক যোগ নয়। ইলেকশনের ক্ষেত্রে সমাগপন করা যায়না। এই উচ্চনীচের অসম্ভব প্রভেদ হিন্দুসমাজের শুধু পাপ নয়, তার দুর্লভতারও মূল। বর্তমানে এই ভেদবুদ্ধিকে আমরা ঝাঁকুড়ে ধরে থাকব, ততদিন আমরা জাতকে জাত দুর্লভ থেকে ক্রমে দুর্লভতর হব। যে সমাজ আজ হুঁহাজার বৎসর ধরে ভেঙে উঠেছে, তার হঠাৎ-পরিবর্তন কি করে সম্ভব হতে পারে, তা বুঝতে পারিনে। অথচ এ পরিবর্তন করা যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থার দেশের ভরস্প্রদায় মহাশয় গান্ধীর মতের সঙ্গে মনে মনে সায় দেবেন; কিন্তু জীবনে তাঁর মতের অমুগামী হবেন না, বা হতে পারবেন না। মহাশয় গান্ধীর প্রায়োপবেশনের বিষয় দেশে দোদার সেধাপড়া ও বলা-কওয়া হচ্ছে; কিন্তু কি উপায়ে যে তাঁর মননাম্মা পূর্ণ করা যায়, সে বিষয় বড় কিছু আলোচনা শোনা যায় না। বরং মহাশয় গান্ধী পোলিটিকাল ক্ষেত্রে

শান্তিস্থাপন করবেন, কি অশান্তির সৃষ্টি করবেন, এই নিয়ে পোলিটিকাল দল ব্যক্তিত্য হয়ে পড়েছেন।

(৯)

হরিজন উদ্ধারের অন্তরায় সনাতনপন্থীর দল নয়। কারণ এ-দল স্বরসংখ্যক, উপরন্তু এ-গুণের বা প্রাধান্য শক্তি—শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি—সে শক্তিতে তারা বঞ্চিত। স্তরতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি আমাদের সামাজিক গঠনের পরিবর্তন সাধনে যথার্থ প্রতী হন, তাহলে সনাতনপন্থীদের দত্ত বাধা তাঁরা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা বহু নতুন আইডিয়াল লাভ করেছি। কিন্তু সেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার সাহস ও চরিত্রবল অর্জন করিনি। অনেক সময় মনে হয় যে, শিক্ষিত লোকের এ-সব আইডিয়ালের সার্থকতা আছে একমাত্র বহুত্বের ক্ষেত্রে—কর্মক্ষেত্রে নয়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, সনাতনপন্থীরা যে-সব কথা মুখ ফুটে বলছেন, সে-সব কথা অনেকটা আমাদের শিক্ষিত দলেরই গোপন মনের কথা। কথায় মনের যে অংশটুকু প্রকাশ পায়, সেইখানেই আমাদের ও সনাতনপন্থীদের মনের অনেকটা আছে। কিন্তু যে মন জীবনের রূপ দান করে, সে মনে বাস্তবিক লোকের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের মনের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কোন সামাজিক প্রথার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে ভয় পাই, কারণ আমরা অশঙ্কা করি উক্ত পরিবর্তনের ফলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এবং কোন নতুন সমাজ গড়বার শক্তি যে আমাদের আছে, সে বিষয়ে আমাদের কোন ভরসা নেই। হরিজনদের উদ্ধার করবার পূর্বে আমাদের নিজেদের মনকে এই সামাজিক জড়তা থেকে উদ্ধার করতে হবে।

ঐ প্রমথ চৌধুরী

## ট্রিটেক্স — “TREE TEX”

ভবিষ্যতে গৃহনির্মাণের কার্যে ট্রিটেক্স ব্যবহার করুন



হালুকা ও শক্ত বলিয়া ট্রিটেক্স মিশ্র ও সহজে গাথান করা যায়।



ট্রিটেক্স অপরিভালক এবং ইহার উপরে মাল্টাঘের কাটা করা যায়।



ইহার উপর বাঁধা যায়, ছবি পাঁচা যায় এবং রঙের অস্ত্রাঙ্ক কাঙ্কও করা যায়।

ট্রিটেক্স ওয়াল বোর্ড আকারে ইহা—

১/২ ইঞ্চি গুরু × ৩ এবং ৪ ফিট চওড়া এবং ৮, ৮০, ৯, ১০, ১২ ও ১৪ ফিট দীর্ঘ।

প্রত্যেক ক্রেতে ১২ শিট থাকে

ট্রিটেক্স—গৃহ নির্মাণের আধুনিক উপাদান—গ্রীষ্মকালে তাপ দূর করে এবং শীতকালে তাহা আকর্ষণ করে। অদিকন্ত ইহা শব্দ রোধ করে। অল্পব্যয়ে আধুনিক রুচি অমুগামী গৃহ-সজ্জা করিতে ইহা সাহায্য করে।

ট্রিটেক্স—ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং দেওয়াল, সিলিং (ceiling) ও পার্টিশনের (partition) বিশেষ উপ-যোগী। প্রয়োজন হইলে ইহা তাপ-নিয়ন্ত্রণ করিতে, ময়লা জমা (condensation) দূর করিতে এবং শব্দ রোধ করিতে পারে।

ট্রিটেক্স কি করিবে—

গরম ও শীত নিবারণ করিবে, শীত-গ্রীষ্মের সময় রক্ষা করিবে, আর্দ্রতানিবারণ করিবে, ময়লা জমা রোধ করিবে, শব্দরোধ করিবে, গোলমাল বন্ধ করিবে, মাল্টিয়া বা গোয়ার সহিত আকর্ষণ থাকিবে, মাল্টিয়ের বেড়াঘের কাটা করিবে, গাছদ্বারি বায় কাঠাইবে।

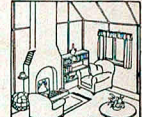
ট্রিটেক্স কি করিবে না—

হুমড়াইলে না বা থাকিবে না, পড়িবে না বা ধারাগ্রাণ হইবে না, কাঁপিত্তর আকর্ষণ করিবে না, ছাটিলে না বা চিরিবে না, সহজে ভাঙিবে না, আলোক প্রতিফলিত করিবে না, বরফ বাড়াইবে না, মাল্টিয়া হইতে পড়িবে না, সহজে আকর্ষণ করিবে না, গন্ধ আটকাইরা থাকিবে না।

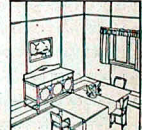
হিটলী এণ্ড গ্রেসাম্, লিঃ

(ইংলণ্ডে সনকত)

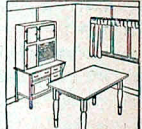
কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : লাহোর



এই ঘরখানি মাকড়সার ছালে ও অকরোয়া বায়ন্তি ছিল কিন্তু ট্রিটেক্স ব্যবহার করার ইহা এখন আরামজনক দুখপান কক্ষে পরিণত হইয়াছে। নিচে গরম এবং গ্রীষ্ম ঠাণ্ডা।



ট্রিটেক্স ব্যবহার করার পাশের ঘরের কথা বা রান্নাঘরের পোশ-মল শোনা যায় না।



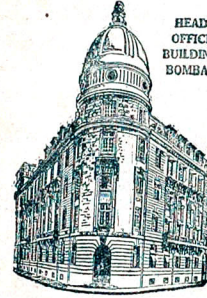
ট্রিটেক্স দেওয়ালের ময়লা জমা (Condensation) দূর করে বলিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার এবং বায়াকর হয়। রান্নাঘরের উপায় এবং গোলমাল অপর কোন অংশে যায় না।



## বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। প্রশান্তি—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বহু, এম-এ, বি-এল (মেয়র) ...	৩৬৪(খ)
২। উদয়ন-কথা—ডাক্তার তার শ্রীদেবপ্রসাদ সর্গাদিকারী ...	৩৬৪(গ)
৩। স্বর্ণধারে (কবিতা)—কবিশ্রীকালিদাস রায়, বি-এ ...	৩৬৫
৪। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন—আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায় ...	৩৬৬
৫। অপ্রেমিক (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৩৬৯
৬। দরাসী জাতির স্বরূপ—ডাক্তার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি.লিট ...	৩৭০
৭। স্বর্ণায় তুদের মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা ...	৩৭৪
৮। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোষ্ঠার কথা—শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ ...	৩৭৬
৯। প্রকৃতি (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মহম্মদার ...	৩৮১
১০। প্রাচীন কলিকাতা—কবিকুমার অশুপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ ...	৩৯১
১১। ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার প্রথম যুগ—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ...	৩৯৯
১২। বঙ্গ-পরিচয়—মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার—শ্রীগুরুদাস রায় ...	৪০৬
১৩। গীত ও রূপ—কথা ও হুর—কাজী নজরুল ইসলাম, স্বরসিঁপি—শ্রীজগৎ ঘটক ...	৪১২
১৪। অরুণোদয় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৪১৫
১৫। ভালোবাসা—মরে সেও (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ...	৪২৩
১৬। হৃৎ ওদ্বারম (গল্প)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী ...	৪২৫
১৭। পদপ্রবেশ ভারতবর্ষ—শ্রীচরণপদ ভট্টাচার্য্য ...	৪৩৪
১৮। বিক্রমশীলা বিখ্যাতলাল ও দীপকর শ্রীজ্ঞান—শ্রীস্বরেশচন্দ্র নন্দী ...	৪৩৯
১৯। "কতদিনে কিরিয়ে পু" (গল্প)—শ্রীমালিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-লিট ...	৪৪৫
২০। সর্বাঙ্গী (উপন্যাস)—শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী ...	৪৫৩
২১। জিজ্ঞাসু ...	৪৬০
২২। মাদুকরী ...	৪৬১
২৩। অসাধারণ (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ...	৪৬৩
২৪। কবি (কবিতা)—শ্রীশেখরকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৪৬৭
২৫। নৃতন বই ...	৪৭২
২৬। প্রপতি ...	৪৭৫
২৭। শেষের বাঁশী (কবিতা)—শ্রীকর্ণযোগী রায় ...	৪৭৬
২৮। মরে-বাইরে—শ্রীপ্রথম চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল ...	৪৭৭
২৯। প্রবাসে বাঙ্গালী ছাত্র ...	৪৮৪

## জাতীয় সম্পদের ভিত্তি



হেড অফিসের বাড়ী

HEAD  
OFFICE  
BUILDING  
BOMBAY.

ব্যাঙ্কিং—চলতি আমানতী হিসাব, স্থায়ী আমানত, কাশ সার্টিফিকেট, হোম সেভিংস একাউন্ট, একজিকিউটর ও ট্রাস্টার কাজ এবং অ্যান্ড ব্যাঙ্কিংএর কার্যের উপর—  
**ইন্সিওরেন্স**  
কাশ সার্টিফিকেট ও স্থায়ী আমানতের উপর বিনা প্রিমিয়ামে ইন্সিওরেন্স গৃহীত হয়।

ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্ক  
ব্যবসায়ের সহায়তা করুন

মেয়াদী বীমা—প্রবিধানক কিস্তিতে চান। দেওয়ার নিয়মে সেভিংস ডিপজিটের উপর ২০ বৎসর (গোড সহ) মেয়াদে বীমা গৃহীত হয়।

১৪ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়সের টাওয়ার হার বার্ষিক ৪২% টাকা  
৩১ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়সের টাওয়ার হার বার্ষিক ৪৮% টাকা

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

জুপিটার জেনারেল ইনসুর্যান্স কোং

লিমিটেড

সম্পূর্ণ দেশী কোম্পানী এবং দেশীয় তত্ত্বাবধানে চালিত

হেড অফিস — বোম্বাই

কলিকাতা শাখা — ৯, ক্লাইভ রো

জীবন, অগ্নি, নৌ, মটরগাড়ী ও দুর্ঘটনা প্রভৃতি

সাবতীর্ণ বীমার কার্য গ্রহণ করেন



# চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

## ত্রি-বর্ণ চিত্র—

দিনের শেষে—শ্রীঅসিতকুমার রায়

৩৮০

## দ্বি-বর্ণ চিত্র—

শ্রীমন্তোবকুমার বসু, এম-এ, বি-এল ( মেয়র )

৩৬৫(ক)

## এক-বর্ণ চিত্র—

(১) উইলিয়ম কেরী	৪০১
(২) জন মার্শম্যান	৪০১
(৩) উইলিয়ম ওয়ার্ড	৪০২
(৪) কেরীর হস্তলিখিত ওয়ার্ডবুক	৪০৪
(৫) প্রভুদেব ( মিনো-কাট )—শ্রীহুধাশুভকুমার রায়	৪০৪
(৬) গুপ্তবৃক্ষের হুজুপা স্ববর্ণমুদ্রা	৪০৬
(৭) রাজা শশকের মুদ্রা	৪০৬
(৮) সম্রাট আকবরের স্বর্ণমুদ্রা	৪০৭
(৯) বৌদ্ধপ্রভাব অবদানের সময় পৌরীপটের অঙ্কন	৪০৭
(১০) অশোকের সময়ের গুহামন্দিরের অঙ্কনপত্র অপরূর্ণার প্রাচীন মন্দির	৪০৮
(১১) প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি	৪০৯
(১২) বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়গুণে হর-পার্বতীর প্রস্তরমূর্তি	৪০৯
(১৩) একপাদ ভৈরবমূর্তি এবং হস্তারের মুখবিশিষ্ট একটি পদ্মপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ	৪০৯
(১৪) একটি প্রস্তরমূর্তির নিদ্রাংশ	৪১০
(১৫) মাটির হাড়ি ; প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন	৪১১
(১৬) কুমারী চিন্ময়ী তেজপাঠ করিতেছেন	৪১৭
(১৭) 'সেকথা বরং কহিতে পারেন আপনারা ওঁকে'	৪২৯
(১৮) মদন মণ্ডল জুতার খলি সমেত হুড়ি বাইয়া পড়িয়া পেলেন	৪৩১
(১৯) জৈনগুহার দৃশ্য ( বগুদিরি )	৪৩৮
(২০) শিকারী—শ্রীআর, কে, পাল	৪৪৪
(২১) আমরা কিসে কম ?—( ব্যঙ্গচিত্র )	৪৪২
(২২) 'অটো-গাইরো' হইতে পার্শেল বদল	৪৭৫
(২৩) শ্রীমহাদেব বসু	৪৮৪
(২৪) শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ	৪৮৪



চিত্র-সূচী : ১৩৪০



কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রাবণ

১৩৪০



## স্বর্গদ্বারে

শ্রীকালিদাস রায়

অই জানালায় কাছে মেয়েটি বসিয়া আছে সে পথে জলে না বাতি অশেষ তামসী রাত্রি,  
গালে রাখি হাতখানি তার, জলে নাক চন্দ্র তারা রবি,  
চক্কার মুখখানি, শীর্ণ পাখু ছুটি পানি, মিলিবে না কারো দেখা, যেতে হবে হায় একা,  
শিরে কেশ করে হাহাকার। এখানে পড়িয়া রবে সবি।

অগাধ কারুণ্যে ভরা, যেন কাচ দিয়ে গড়া থাকেনি কখনও হায় একাকী এ ছুনিয়ায়,  
বড় বড় চোখ ছুটি মেলি নারী-প্রাণ তাই কাপে ডরে,  
অনিমেয়ে চেয়ে চেয়ে কি দেখিছে অই মেয়ে? সবাই থাকিতে তার কেউ রবে নাক আর,  
দেখিছে কি তরঙ্গের কেলি? সাথী হ'তে ছই দিন পরে।

ও যে চেয়ে আছে হায় দিগন্তের নীলিমায় অর্ধেক বন্ধন খুলে এসেছে সিদ্ধর কূলে  
অজানা সে অনন্তের পানে, পিছে টানে অর্ধেক বন্ধন,  
প্রতিট তরঙ্গ-শ্রোতে ব্রহ্ম দিগন্ত হ'তে শুকানো যুগাল 'গরে চলে পড়ে বায়ুভরে  
অনন্তের আমন্ত্রণ আনে। হেমন্তের পদের মতন।

হহ 'ক'রে আসে বায়ু দীপসম কাপে আয়ু, ধরণীর কোল তোজে যেতে ভয়াতুর সে যে,  
যনায়ে আসিছে আঁধারিয়ার, তবু যেতে হবে মনে জানি  
চিতাধুমময় রথে যেতে হবে অই পথে, খুঁজিছে দিগন্ত-লোকে নীরক্ত অয়ত চোখে  
অই পথ অকূল অপার। শেষ ছুটি আশ্রয়ের পাণি।

পূর্বীর সিদ্ধকূলে]



## মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২

১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেসলি কোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিলাত-আমদানী সিলিজিয়ারনা বাঙ্গলা, উর্দু, পার্শী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়ে, বাহাতে ভারী শাসনকর্ত্তারা ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, লেকটেন্যান্ট-গভর্নর প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও মেলামেশা করিতে পারেন। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরীই প্রথম বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহারই উৎসাহে ও সাহচর্য্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানচন্দ্র, রাজীবলোচন প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার নানাগ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগরও (১৮৪১ সালে) কোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন; আবার ১৮১৮ সালে ত্রীদামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী প্রথম মিশনারীপদ কর্তৃক “সমচার দর্পণ” প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপর দিকে রামমোহন রায় “সমচার কোমুদী” এবং পৌত্তলিকতা নিবারণ ও সহমরণ প্রথা দমনের জন্ত বাঙ্গলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করেন। এই সকল মহাপুঙ্গব ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা বাস্তবিকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অসম্ভব। ইহার পরে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইংরাঞ্জী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ত আমাদের পূর্বপুরুষগণ পাগল হইয়া উঠিলেন। ইহা স্বাভাবিক। এতদিন আমাদের দেশ নানাবিধ অন্ধবিবাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল; কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে সপ্তকলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে গভর্নর-জেনারেল আমহাষ্টের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে

তখনকার দেশের উদার-প্রকৃতি ঘোষকদিগের মনোভাব বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায়।

বাতবিকই ইংরাঞ্জী ভাষা শিক্ষা সহজে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মপ্রিয় আবার বিপদ ডাকিয়া আনা হইল। ইংরাঞ্জী শিক্ষার জন্ত যে কি প্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা বোণিগ্রেসডর বহু রুত “মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত” এবং শিবনাথ শাস্ত্রী রুত “রামতত্ত্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসামাজ্য” পাঠ করিলে সর্বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু এই ইংরাঞ্জী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার অনাদর হইতে লাগিল এবং মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষাবিস্তার হইতে পারে, সে বিষয়ে সকলে উদারীনা হইতে লাগিলেন।

গীহারী ইংরাঞ্জীতে রুতবিরজ হইলেন, তাহার নানা বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। কাজেই মাতৃভাষার সাহায্যে বিভাজিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল এবং ইহার ফলে ছাত্রবৃদ্ধি, মাইনের প্রভৃতি স্বল্পগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল।

আজ বাঙ্গলা দেশে এই ইংরাঞ্জী শিক্ষা প্রচলনের দরুন ১২০০ উচ্চ ইংরাঞ্জী বিভাগ এবং প্রায় চল্লিশটা কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং প্রত্যেক বৎসরে হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বেকার-সমাজকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। এখন অনেকে এক লাঠ ধারণা গোপন করিয়া থাকেন যে, এই বেকারসমাজের জন্ত গভর্ণমেণ্টই দায়ী; পরাধীনতার ও দাসমনোভাবের ইহা একটা প্রধান লক্ষণ। কথায় বলে, “যত দোষ, নন্দ ঘোষ”। আমরা নিজেদের পায়ে নিজেই কুণ্ডল মারিতেছি,

এবং সমস্ত দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিত ভাবে কালবাপন করিতেছি।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যান্ড (Auckland) আদালতে পার্শী ভাষার পরিবর্তে ইংরাঞ্জী ভাষা প্রাধান্তি করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা আনন্দে অধীর হইয়া গভর্নর-জেনারেল হার্ডিঞ্জ (Hardinge) মহোদয়কে একখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করেন। কিন্তু তখন তাঁহার একথা ভুলিয়া গেলেন যে, যতই ইংরাঞ্জী শিক্ষা হোক না কেন দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অজ্ঞতা-তাহাতে কখনও দূর হইতে পারে না। তাই আজ বাঙ্গলা দেশে এখনও শতকরা ৯০-৯৫ জন অজ্ঞান-কারে আচ্ছন্ন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অতি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, ইংরাঞ্জী কেন জাধান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সবকেই যে ইংরাঞ্জী শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, এক জেলায় হইত মাত্র একজন ইংরাঞ্জ জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন; এই কারণে আদালতে সমস্ত কাৰ্য্যকর্ম ইংরাঞ্জীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখন আবার অনেক জেলায় আদালত ইংরাঞ্জ জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট নাই, কিন্তু সমস্ত proceedings ইংরাঞ্জীতে হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একটা হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; বার বৎসর হইল আমি হাইকোর্টে একটা দ্বারা মোকদ্দমার জুরীতে বসি এবং ফোরম্যান (Foreman) নিযুক্ত হই। হুজুর বিধ যে, বিচারপতি আমার তৃত্বপূর্ণ ছাত্র, কিন্তু যে প্রশ্নন অভিনীত হইল তাহার কথাই বলিতেছি। Standing Counsel বাঙ্গালী এবং অপরাপর ব্যাটিলারও বাঙ্গালী। কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষীর বাঙ্গলা ভাষায় জবানবন্দী দো-ভাষী (Interpreter) কর্তৃক অনূদিত হইয়া জজ ও জুরীদের নিকটে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে My lord বলিয়া সন্ধান

করিতে হইল এবং বিচারপতিও জুরীদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আমাকে Mr. Foreman বলিয়া সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য যদি বাঙ্গলা ভাষায় চলিত তাহা হইলে বেশ হয় ইহার সিকি সময়ও লাগিত না।

আর একটা উদাহরণ দিতেছি, বাহাতে আমাদের দাসমনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জাতীয়তাবাদী, কিন্তু চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুত্রকাম্বলীর সমালোচনা ইংরাঞ্জীতে না করিলে সম্মান-হানি হয়; প্রায়ই দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের উপজ্ঞান-গুলির নায়ক-নায়িকার সমালোচনা মাতৃভাষায় লিখিতে আমরা লজ্জিত, একজ ইংরাঞ্জী সাময়িক পত্রে বিদেশীয় ভাষায় এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে, বিশেষতঃ যেদিন হইতে তিনি “বঙ্গদর্শন” প্রকাশ করিলেন, আমাদের মাতৃভাষা একরকম নবজীবন লাভ করিল। ইহার পূর্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং রামচন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকা” প্রকাশ করিয়া, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া, জনসাধারণের জ্ঞানপ্ৰসূহা জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে মাতৃভাষা যে কি প্রকার সুদৃষ্টিশালিনী হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা নিম্নরোপে।

আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলি উত্তরোত্তর কি প্রকার ত্রীভি লাভ করিতেছে, তাহা পূর্বকার প্রবন্ধে দৈনিক “আনন্দ বাজারের” কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম। আমার সন্দেহে অত্কার “দৈনিক বহুমতী” রহিয়াছে, ইহাতে প্রায় সমস্ত তারের খবরগুলি আছে। এতদ্বি “দৈনিক বহুমতী”তেও পৃথিবীর নানা দেশের যে সমস্ত সচিব দীর্ঘায়ত্তন প্রবন্ধ থাকে তাহা, হইতে নানাবিধ জাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়; গত সালের (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)



বহুমতীতে নিউ জার্সি যে বিবরণ প্রকট হইয়াছে, তাহারে স্বন্দর স্বন্দর ৩৬টা আলোকচিত্র আছে। প্রবন্ধটা পড়িলে মনে হয় যেন সেই দেশটা নখপর্শে দেখিতেছি, এবং অজ্ঞাত প্রদেশেও অনেক বিষয় জানিবার থাকে। পুরাতন বংশেরের বাঁধান বহুমতীর পাতা উঠাইয়া দেবিলে নবা ভূকী, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য মাসিক ‘প্রবাসী’ ও ‘ভারতবর্ষ’ এই বকম উদ্ভবের। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষায় নবা জাপান, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সংক্ষেপে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। স্বতরাং একথা মোটেই খাটে না যে, বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা আদৌ হয় না। ইউরোপীয় সমাজে বলে যে, he is an well-informed man অর্থাৎ লোকটার বেশ পড়াশুনা আছে এবং খোঁজ-খবর রাখে। ইহাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। আমার মন্তব্য এই যে, যদি মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ১২১৪ বংশেরের মধ্যেই সবগুলিই কিছু কিছু আয়ত্ত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতাম, তখন দেখিতাম যে, হেলেনা মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি লইয়া হেয়ার ও হিন্দু স্কুলে তত্বর্ষ শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইতে; তাহার জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও মোটামুটি সমস্তই পড়িয়া আসিত। কেবল ইংরাজীতে পঞ্চাঙ্গদ্বয় বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাহাদের আর চারি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। আজকালও অনেক স্কুলে দেখা যায় যে, মাইনর পাশ ছাত্র অনেক বিষয়ে ইংরাজী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরোপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী; আমার এইটুকু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা দরকার, কিন্তু ইহা বাহনবর্ণন জ্ঞাতব্য বিষয় পড়িতে হইলে আমাদের হেলেদের ৪৫ বৎসর, এবং পরে দেখাইবে যে ৭৮ বৎসর, বুঝা নষ্ট হয়।

বাঙ্গলবর্ণের পিতামাতা ও অবিভাববর্ণন নূর

হাত দিয়া আমাদের বসুন ত, তাহাদের গুল্মগণের ইংরাজী শিক্ষার মূলে কোন গুঢ় অভিজ্ঞতা আছে কি না? আমি তাহাদের পক্ষ হইতে ব্যক্ত করিতেছি যে, তাহারা এই অন্তর্নিহিত আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে, তাহাদের প্রত্যেক ছেলেই হাইকোর্টের জজ হইবে, না হয় ম্যুসিকি, ডেপুটিমিস্ট্রী ইত্যাদি একটা উচ্চপদ লাভ করিবে, অথবা বড় বড় উকিল, ডাক্তার না হয় ইঞ্জিনিয়ার হইবে। অতএব, পোড়া হইতেই যদি ইংরাজী শেখান না যায়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বা নিগিলে না, এবং চাকরীর আশাও অন্তর্হিত হইবে; কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে, দশ হাজার গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনের হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা, আর ২১০ হাজার গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যুসিকি, হন; এবং আমি এই বলিয়া বলিয়া হুয়ারান হইয়াছি যে, এক আলিপুরের ‘বাবের’ সহস্রাবিক উকিল, সেখানে শতকরা ৫ জনের হুচাকসরূপে অসংখ্য হন কি না সন্দেহ, আর ২৫ জন কি হাওরা খাইয়া দিনাতিপাত করেন? আমার নিজ বাসভূমি, গুলানা একটা ক্ষুদ্র জেলা। কিন্তু ইহার সদর থানা সহরেও ১৫০ জনের উপর উকিল। এই ভীষণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও প্রত্যেক জেলার মহকুমার আদালতসমূহেও নতুন নতুন B. L. ভর্তি হইতেছে। আমি ইহাদের উপদেশ করিয়া বলিয়া থাকি যে, তোমরা জানিয়া তিনিয়া উপদেশ এই অর্থনীতিভিত্তিক আশ্রয়তা করিতেছ কেন?

এই সকল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত উচ্চশিক্ষার অর্থ্যাৎ এম-এ, এম-এসসি, পি-এইচডি, ডি-এসসি, বি-এল, এম-এল, ডি-এল এর জন্য বাছা বাছা ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। আমার মতে এখন যদি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার এক-দশমাংশ উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে; অধুনা কদিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০,০০০ ছাত্র ভর্তীরা দাঁড় করিয়াছে, আমি বলি, মাত্র ৩০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করুক।

আগামী বার হইতে জন্মশঃ দেখান হইবে যে, দেশের স্বকণণ জীবন-সংগ্রামে কিরূপ বিপ্লব ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া দেশের শিক্ষা-হইতেছে। \*  
বিভারের পথ কিরূপ সংকীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার জগ

\* শ্রীবাসু অরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনুদিত

## অপ্রেমিক

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক, বি-এ

১

অপ্রেমিকের পূজার বাধা দেখছি অনন্ত,

বড়ই কঠিন অমুরারের সাধন-পথ।

গদ্য তাঁরে যায় কি দেয়া,

গৃহিণী ঘর পথাগয়া,

অম্ববাসেই হরভিত্তি স্মরণ দিগন্ত।

২

তাহার পূজার উপকরণ বলা কি করবে,

চূর্ণ হয়ে যায় যে আমার সকল গর্ল।

নিজে যিনি রসের পাথর

মিষ্ট জিনিষ কি দিব আর,

বসতি ঘর ক্ষীরোদ সাগর অমৃতগর্ভ।

৩

পাণ্ড দেবো। কাহার পায়ে হয় বড় শব্দ,

উদ্ভব হয় যেখায় হ’ল পাবনী থদ।

মাগরকে এই শিশির রিত

হয় না সাহস আবার চিত্তে,

কাণা কিছু হুইবে বোধে দান বাজারে ডকা।

৪

ওই যে নিখিল পাগল করা অমির আঁখি,

লক্ষ্য সরম বল দেখি মোর কোন্ খানে রাখি?

আরতি কার করতে যাবে

প্রদীপ জ্বলে চান দেখাবো,

চকোর চোখের চাওনি ল’য়ে বলিয়া থাকি।

৫

যদি কভু ভাগা আবার হয় গো প্রসন্ন

বৃন্দাবনের প্রেমের রঞ্জে হয় দেহ ধজ,

রাধা পায়ের পরাগ যদি

প্রেমিক করে পাষাণ ছাতি,

ব’লে আছি আমি শুণু তাহারি জগ।

৬

হয়ত আমার নিগড় তখন হবে মো ভয়,

ভীতি আবার হবে নিবিড় পলকে ময়।

বেহুলা এই কীসর গলি’

হয়ত হবে তাঁর মুরলী

কোন জনমে আসবে আমার সে শুভ লয়?



## ফরাসী জাতির স্বরূপ

## ঐ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ইরাজ ব্যতীত অন্য বিদেশী জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, আর যেটুকু পরিচয় আছে তাও ইরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে অনেক জাতির নাম আমাদের ঘরে এসে পৌঁছেছে—কিন্তু তাতে সে সব জাতির কোন পরিচয়লাভ হয়নি। তাই ফরাসী জাতির সহজে সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অথচ এ জাতি বর্তমান জগতের ইতিহাসে কত পরিবর্তনই না এনেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও আর্টের নানা দিক দিয়ে বর্তমান যুগের প্রথম সৃষ্টিগুলি এই জাতির হাতেই হয়েছে।

ফরাসীর মত এত খোলা অথচ এত চাপা জাতি বিরল। প্রথম আলোণে মনে হয় যে, এ জাতির চরিত্র সহজবোধ্য, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চরিত্র চূর্ণসিঁধ্য হয়ে পড়ে; অর্থাৎ নিজের জাতি ও সমাজকে ঝাঁটিয়ে রাখবার জ্ঞত্ব ঘরের ও বাইরের মধ্যে যতটা ব্যবধান রাখা উচিত, তা তাঁরা জানে ও রাখে। সেই জ্ঞত্বই বাইরে থেকে ফরাসী জাতিকে অনেকটা অজুত মনে হয়—মানে হয় নেন তাদের চরিত্রে পরম্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হয়েছে। অথচ প্রকৃত হিসাবে তা নয়। নিজেকে চরিত্রে নানা বিসদৃশ গুণের সমাজস্থ-বিধান তাঁরা করতে পেরেছে।

ইরাজের দিকে তাকালেও সেই একই কথা মনে হয়। সেই ইতিহাসের ধারা উচ্ছাদিত কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত। তাই দেখা যায় কখনও ফরাসী জাতি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে—কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নীচে নেমে এসেছে। অত্ৰ কোন জাতির ইতিহাসে অল্পকালের মধ্যে এত পরিবর্তন ঘটে নি। নানা স্বত্ব এ জাতির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—অন্ত-বিপ্লব, বাইরের আক্রমণ, ও অজ্ঞাত জাতির জীবনে

যে সমস্ত বিপদ ঘটবে, তা' সবই ফরাসী জাতির ভাগ্যে ঘটেছে। কিন্তু সে স্বত্ব শেষ হবার পরমুহূর্তেই যে আবার ফরাসী জাতি গা' ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তা' তাঁর ইতিহাসের আলোচনাতেই ধরা পড়ে। তখন আর তাঁর চরিত্রে কোন অশান্তির ছায়া লক্ষিত হয় না—একটা অজুত নিশ্চিন্ত-ভাব ধরা পড়ে। এ ভাব তাঁর নিজস্ব।

এই জাতির স্বরূপ নির্ধারণ করবার জ্ঞত্ব সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ফরাসী লেখক কলম ধরছেন। পল ভালেসের (Paul Valéry) নাম স্বপরিচিত, তিনি বহুদিনের লেখক, ফরাসী একাডেমির সভ্য ও প্রতিষ্ঠাবান। সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ যে শীঘ্রই তাঁর ভাগ্যে ঘটবে—একবার অনেক দিন থেকেই কানাকানি চলছে। লেখক হিসাবে তিনি সুবিবেচক, তাঁর লেখার রীতিতে স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর ভাষা বিস্তৃত—শব্দ-বিজ্ঞান অতুলনীয়।

ভালেসের ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ আদ্যাবান—গত মহাযুদ্ধের পর যখন অনেকের মনে ইউরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কর উপস্থিত হয় ও রোমান' রোল', কানিসারপ্রতি প্রভৃতি লেখকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ প্রকাশ করেন ও বলতে শুরু করেন যে, প্রাচ্য সভ্যতার সাধারণ বানিত্বকে আর ইউরোপের রক্ষা নেই, তখন ভালেসের জোর হাতে কলম চালিয়েছিলেন ও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার সভ্যই কোন আশাধারনক অবনতি হয় নি। সে সভ্যতার উন্নতির জ্ঞত্ব অপ্রতিষ্ঠিতই রয়েছে। শুধু কবিত্ব অবসাদের জ্ঞত্ব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ এসেছে। আর সে অবসাদের প্রধান কারণ হচ্ছে শুধু স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় মন। বস্তুতঃ, ভালেসের মতে ইউরোপীয় পন্থা পরিচ্যাপ করে সবাইকে

যোগাসনে বসবার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয় সভ্যতা ঠিকই আছে—ঠিক নেই ইউরোপীয় মন।

ভালেসের সম্প্রতি নিজের দেশের সভ্যতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ফরাসী দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তাঁর জলাশয়, তাঁর ফলস্রাব ও প্রাকৃতিক শতসত্তারই ফরাসী সভ্যতার গঠনে সাহায্য করেছে।

ফরাসী চরিত্রে নানা পরম্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও তাঁর ভিতর যে সমীকরণ দেখতে পাই, তাঁর, খোঁজ তাঁর দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই পাই। নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রদেশ নিয়ে ফরাসী-দেশ গঠিত। কোথাও কুনি সমতল, কোথাও উচ্চভাট, কোন প্রদেশ পর্বতময়, কোথাও সমুদ্রতীর সমভূমি, আবার কোথাও সমুদ্র পর্বতমালা ও সমুদ্রে একত্র সমাবেশ। ফ্রান্সের তিনটা সমুদ্রতীর পরস্পর বিভিন্ন রূপের। ফ্রান্সের ভূমিতে ফরাসী জাতির বা' কিছু দরকার, সমস্তই উৎপন্ন হয়। কোথাও শত, কোথাও বা আদ্র, ভূগর্ভে লৌহ ও কয়লার খনি, গৃহনিশাণোপযোগী প্রস্তর—সমস্তই প্রচুর পরিমাণে ফ্রান্সে পাওয়া যায়। তবে বর্তমান যুগে ইউরোপীয় মন যে সমস্ত অভাব বাড়িয়েছে, সে সবের পূরণ হয়ত শুধু তাঁর জমি দিয়ে হয় না। কিন্তু ভালেসের মতে সে সব অভাব সভ্যতার নষ্ট, স্বভাবা চিরস্থায়ী ও নয়। ফরাসী জাতি তাঁর সভ্যতার প্রয়োজনীয় বস্তু সব তাঁর দেশের মাটিতেই পায়, তাঁর জ্ঞত্ব তাকে অন্তরে মূণ্ডাণেই হয়ে থাকতে হয় না।

ইলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন ইউরেশিয়া-মহাদেশের শেষ প্রান্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র ইলণ্ডকে ও পিরিনিজ পর্বতমালা স্পেনকে এই মহাদেশ থেকে বিছিন্ন করে তাদের পৃথক অবস্থানে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইউরোপীয় থেকে ফ্রান্স সে ভাবে বিছিন্ন নয়। উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে মহাদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ

যোগাযোগ আর অজ্ঞাত দিক দিয়ে সমুদ্রপথে দেশান্তর থেকে ফ্রান্সে পৌঁছবার সম্পূর্ণ সুবিধা রয়েছে। তাঁর ওপর ফ্রান্সের উর্বরা ভূমি ও সহনীয় জলবায়ো নানাবিধে বাইরের জাতির চিত্তাকর্ষণ করেছে। তাই ফরাসী জাতির গঠন আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন পথে নানা জাতির লোক এসে এ জাতির গঠনকার্যে নিজেরের প্রভাব বিস্তার করেছে—তাই এ জাতির চরিত্র বৈচিত্র্যময়। বহিঃশক্তির আক্রমণ, অধিকার বিস্তার, অজ্ঞাত প্রবেশ, প্রকৃতির জ্ঞত্ব ফরাসী জাতির গঠন কখনও প্রতিভূত হয়েছে, কখনও বা সমুদ্র হয়েছে। এ দেশে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে যুগে যুগে স্বভেদে হাওয়ায় মত মাহুদের হাওয়া এসে পৌঁছেছে। আর দক্ষিণ দিক থেকে অল্প পরিমাণে হ'লেও প্রাচীন-কালে গ্রীক, ল্যাটিন, ফিনিসীয়েরা ও পরবর্তী যুগে মুর ও সারাসেনেরা এসে দক্ষিণ ফ্রান্সে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এই নানা জাতির আগমনে ফরাসী জাতির স্বরূপ বদলেছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। প্রত্যেকেই যেন উভার মত এসেছে—কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছে সে ফরাসী জাতির ভিতর নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে—তাই তাঁর পুরানো সভ্যতার কোন বৈশিষ্ট্য রাখতে পারে নি।

সুতরাং ফরাসী জাতির গঠনের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে, ফ্রান্সে নানা জাতির অবস্থান ও তাদের সমিশ্রণ। ইউরোপের প্রায় সব জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু সমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশী। তা' তাঁর বর্ণ ও ভাষার সমুচিতই ধরা পড়ে। ফরাসী জাতির গঠনের এইরূপ বিশ্লেষণ করে ভালেসের বলেছেন যে, এ জাতিকে দেখলে এমন একটা বৃক্ষের কথা মনে হয়, যার বহুবীর 'কলম বাঁধা' হয়েছে—তাঁর ফলের গুণ ও স্বাদ তৈরি হয়েছে নানা প্রকারের রসের একত্র সমাবেশে।



নজর রেখেই সেগুলি তৈরি। আর এই একান্ত ঐক্যের ধারণা অজ্ঞত বিরল। এর স্বস্থ কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, ফরাসীর জাতীয় জীবনে যে সব বড় ঘটনা ঘটেছে, তা' সাধারণতঃ ছুই প্রকারের—নানা জাতীয় উপাদানের-মধ্যে যে একা সমাধান করা হয়েছে, একদিকে সেই একাকৈ নষ্ট করবার চেষ্টা, আর অপরদিকে তার বিপরীত চেষ্টা—কলে পুনরায় দৃঢ় ঐক্যবন্ধন। এই ছুই ধরণের ঘটনাবলীর আলোচনা করলে মনে হয় যে, ফ্রান্সে বহনই কোন অস্বপ্নবিরূপ ঘটেছে তখনই বিজয় প্রকারের চেষ্টা—অর্থাৎ পরম্পরবিরুদ্ধ উপাদানগুলির মধ্যে পুনরায় সাম্যের দৃঢ় পত্তনের চেষ্টাই সর্বদা জরী হয়েছে। সেই জন্তই ফরাসী জাতির বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে কতকগুলি ব্যক্তি (personnes), পরিবার (familles) বা গোষ্ঠীর (assemblés) নামই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এই সব ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর ভিতর দিয়ে অস্বপ্নবিরূপের সময় পুনরায় জাতীয় একা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে এবং বস্তুতঃ জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন হয়েছে। তাই Capetians, Jeanne d'Arc, Louis XI, Henri IV, Richelieu, La Convention অথবা Napoleon সমন্বিত ফরাসী জাতির ঐক্যবন্ধনের একটি নমুনা।

এই ঐক্যবন্ধনের আর এক প্রতীক মহানগরী (city)—আর সে নগরী হচ্ছে প্যারিস। বহু শতাব্দী ধরে এই মহানগরী ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রধান স্থান অধিকার করে আসছে। প্যারিস সর্বত্রভাবে ফ্রান্সের কেন্দ্র। শিক্ষা, দীশা, বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই ফরাসী জাতি প্যারিসের মুখাপেক্ষী। তাই ফ্রান্সের যে কোন প্রদেশেই যাওয়া যায়, সেখানেই প্যারিস সন্দেহ লোকের উচ্চ ধারণার বোঁদ পাওয়া যায়। ফ্রান্সে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে—কিন্তু তন্মধ্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় বা সোরবোনে (Sorbonne) শিক্ষা যতদূরী, আর এই সোরবোনের আওতার নানা শিক্ষাক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। তাই ফ্রান্সে বারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে জীবনের

ত্রুত করে নিয়েছে, তা'দের সবাই প্যারিসে এসেই শিক্ষা সমাপ্ত করে। ফরাসী সাহিত্যের ইতিবৃত্তের আলোচনা করলেও বৃষ্ণতে প্যারি যায় যে, প্যারিস না থাকলে এ সাহিত্য কখনও গড়ে উঠত না। এ সাহিত্যের আদর্শ প্যারিস থেকেই গড়ে উঠেছে। অজ্ঞাত কলাবিজ্ঞা, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্বন্ধেও এ একই কথা বলা চলে। এক কথায়, সমস্ত ফরাসী-সভ্যতার ইতিহাস প্যারিসের সঙ্গে গুতপ্রোত ভাবে জড়িত। দৈনন্দিন জীবনের আদর্শও ফরাসী জাতি প্যারিস থেকে নিয়েছে—সামঞ্জস্য, আচরণ-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির আদর্শের জন্তও এই মহানগরীর দিকেই ফরাসী জাতি তাকিয়ে রয়েছে। তাই সভ্যতার প্যারিস দেখলে ও বৃষ্ণতে ফরাসী জাতি ও তা'দের দেশের অনেকখানি ধরতে পারা যায়। বস্তুতঃ সর্বত্রভাবে কেন্দ্রীভূত এই মহানগরী ফরাসী জাতির হাতেই গঠিত। প্যারিস-গঠনের পিছনেও ফরাসী জাতির সেই একই চেষ্টা রয়েছে—যা'তে পরম্পর-বিরুদ্ধভাবে চরিত্রগুলির একীকরণ সম্ভব হ'য়।

ফরাসী ভাষা আলোচনা করলে ভালেটির মত ঐ একই জিনিসের বোঁদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ও বিভিন্ন উপাদানের সম্মিশ্রণই হচ্ছে ফরাসী ভাষার বিশেষ সৃষ্টির কারণ। অজ্ঞাত—লাটিনীয়, ইতালি, স্পেন, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই ফরাসী ভাষার অপূর্ণ সৃষ্টি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কিন্তুভাবে ফরাসী ভাষা বলা হ'লে (Français bien, parlé) যে ভাবার ভিত্তি জিনিষ চোখে পড়ে, তা' অল্প ইউরোপীয় ভাষায় নেই। প্রথমতঃ, ফরাসী ভাষায় নাকি-স্বর (sing-song) নাই বললেই চলে—অতি সাধারণ ভাবে এ ভাষা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসী ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণগুলির কণ্ঠ উচ্চারণগুলি একদম নেই—তাই ইংরাজী c, d, h উচ্চারণ নেই। ফরাসী ভাষার r এর উচ্চারণ অবিকৃত (neither rolled nor aspirated)। কণ্ঠ উচ্চারণ বাদ দেবার এই চেষ্টাই অনেক কথার রূপ

বদলে গেছে। ফরাসী ভাষার তৃতীয় বিশেষত্ব তা'র স্বরবর্ণ। এত বিভিন্ন স্বরবর্ণ আর কোন ভাষায় নেই। শব্দতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে ফরাসী ভাষায় ৩৬টা স্বর ও ২৯টা যুগ্মস্বর (diphthongs) পাওয়া যায়। ফরাসী ভাষায় স্বরবর্ণের (accent) অভাবের জন্ত ভাল কবিতা হয় না, একথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু ভালেটির বলেন যে, স্বরের বৈচিত্র্য দিয়েই সভ্যতার কবি সে অভাব পূরণ করতে পারেন।

নানাভাষী জাতির সম্মিশ্রণের জন্তই ফরাসী ভাষার এ রূপ গড়িয়েছে। ফ্রান্সের নানা প্রদেশে এখনও বিভিন্ন ভাষা বলা হয়—বুটানীতে বুটন, পিরিনিজ লীমারে বাস্ক (Basque), দক্ষিণে প্রভান্স (Provençal) পূর্বে ও উত্তরে জার্মানি। এ ছাড়া নানা স্থানে স্থানীয় ফরাসীও (patois) চলতি আছে। এ সমস্ত বিভিন্ন ভাষার প্রভাবে ফরাসী ভাষার উচ্চারণ ও শব্দসম্পত্তি ক্রমশঃ সৃচ্ছলিত করে তা'র বর্তমান রূপ নিয়েছে। এর পিছনেও ফরাসী জাতির সেই একীকরণের চেষ্টা রয়েছে। তাই কোন প্রাদেশিক ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি না হ'য়ে বিতৃষ্ণ বা প্যারিসের ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ফরাসী দেশের ছ'জন বড় ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শাতোব্রিয় (Chateaubriand) ও রেনী (Ernest Renan) উভয়েই ছিলেন বুটন—তা'দের মাতৃভাষাও ছিল বুটন। কিন্তু তা'দের রচনা ফরাসী ভাষায় অমর হ'য়ে রয়েছে। মিস্ত্রাল (Freddie Mistral) ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের কবি, তিনি ছিলেন কিন্তু তা' ফলবতী হয় নি। অথচ একই প্রদেশের লেখক লোদে (Laudet) ফরাসী সাহিত্যে অমরীয় হয়েছেন, কারণ তিনি বিতৃষ্ণ ফরাসীতেই লিখতেন।

ফরাসী ভাষার আর দুটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, একটা হচ্ছে শব্দের সঠিক প্রয়োগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে রচনার স্বচ্ছতা। ফরাসীতে ভাষা-ভাষা কথা বা রচনা সম্ভব নয়, তাই ফরাসী ভাষা বহুদিন ধরে ইউরোপের সাধারণ ভাষা (lingua franca) ছিল, ও আন্তর্জাতিক

ব্যবহার এই ভাষাতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ফরাসী ভাষার clarity ও precision। আরও বৃষ্ণ কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, নানা বিভিন্ন জাতির সম্মিশ্রণে গঠিত একটা জাতি অভাব পূরণ করতে গিয়েই ভাষায় এ স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট প্রয়োগ এসেছে; অর্থাৎ ফরাসী ভাষা যে ইউরোপের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের উপযোগী তা'র কারণ যে তা'কে প্রদেশেই ফরাসী দেশের ভেতরেই আন্তর্জাতিক ব্যবহারের উপযোগী হ'তে হয়েছে।

সংক্ষেপ করে বলতে গেলে ফরাসী জাতির যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তা' যা'তে চাপিয়ে দেওয়া বৈশিষ্ট্য নয়, সে বৈশিষ্ট্যের ছায়া তার দেশ, দেশের জল-হাওয়া, কল, ফুল ও পাছ, শাসনস্থার ও তা'র বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিণত হ'য়। এ বৈশিষ্ট্যের পিছনে রয়েছে বহু শতাব্দীব্যাপী পরিবর্তন, পরিবর্তন ও বিবর্তন। তাই দেশের মাটির জন্ত ফরাসী জাতির এত মায়ী, patrie বা মাতৃভূমির জন্ত তা'র এত আকর্ষণ ও প্যারিসের জন্ত এত টান। বর্তমান ইউরোপে সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় নানা গণ্ডি টানা হ'লেও ফ্রান্সের দিকে ইউরোপীয় মনের একটা দৃঢ় আকর্ষণ রয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। পূর্বেই ইউরোপের নানা দেশে ফরাসী ভাষা, সাহিত্য ও জীবনের সঙ্গে পরিচয়—শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। এ সভ্যতার সে প্রভাব এখনও অটুট রয়েছে। আর বঙ্গবীরের নানা সময়ে যে ইউরোপের নানা স্থান থেকে পৃথকী ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে ছুটে আসে, তা'র কারণ তসিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তা' শুধু আয়োজন-প্রমোদের এক নয়, ফ্রান্সের জলহাওয়া, কল, ফুল প্রভৃতির জন্ত। অজুত মোহিনী শক্তি আছে, আর সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপভোগে যা'তে মাহমের কোন ব্যাঘাত না ঘটে তা'র জন্ত ফরাসী জাতি তা'র গৃহকেও চিত্তাকর্ষক করেছে—তাই French Dishes, অথবা French Drinks এখনও সর্বত্রই আদর পেয়ে আসছে।



# স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা

## ভূমিকা

[১৯৩৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৯৬খৃঃ) উনিশশ পুরাণ প্রথমভাগ-  
তান পূর্ব নামে একখনি পুস্তক প্রকাশের প্রেরণ হইতে প্রকাশিত  
হয়। ভূদেবাব্যুর কোন প্রতিনিধি তাঁহার নিকট অনিলা এবং  
তাঁহারই কাছে বসিয়া এই পুস্তক রচনা করেন। কাঠকট কবিত্তে  
কবিত্তে রচনা একেবারে তাঁহারই হাড়াইয়া যায়। শেষে  
অস্বাস্থ্যে সম্পূর্ণরূপেই ভূদেবাব্যুর নিজের লেখা। উহাতে  
ভূদেবাব্যুর কবিত্তপুর্ণ দৃষ্টান্ত ইতিহাসিক দৃষ্ট এবং যোগাভিনন্দন  
অধিকাংশ দৃষ্ট প্রকটকিত। আত্মকৃত শক্তিই তাহা যতই মহাভারত।  
তাহা পূর্বে হইতেই দেখিতে পান এবং সেইদিকে লোকের মন  
কিরিয়াইয়াছেন। ভূদেবাব্যুর "সেখ খন্দে মী যুগের প্রবন্ধক"  
বসিয়া বিশেষভাবে সকলেরই স্বীকার করিয়া থাকেন।—ভূদেব-  
চরিত, প্রথম খণ্ড ৪০৬ পৃঃ।]

উনিশশ পুরাণের স্বরূপভাষ্য পূর্ব নামক এক-  
খনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অনেকদিন  
হইতে ভাবিয়াছিলাম, সত্য সত্যই কি ভগবান ব্যাসদেব  
এখন পর্যন্ত পুরাণ রচনা করিতেছেন? কখন মনে  
করিতাম, না, এমন হইবে না, ভগবান আর এই কলি-  
যুগে লেখনী ধারণ করিবেন না; আর যদি করিবেন  
তথাপি কখনই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন না। আবার  
এও মনে করিতাম, ব্যাসদেব তো চারি যুগ অমর,  
তিনি তো এখন জীবিত আছেন; আর যদি জীবিতই  
থাকেন, তবে চিরভাষ্য পুরাণরচনা কেনম করিয়াই বা  
একবারে পরিভ্রান্ত করিবেন? অবশেষে লিখিতেছেন।  
—যদি লিখেনই তবে এখনকার লোকে যে ভাষা বুঝিতে  
পারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিবেনই বা কেন?

\* এখানে অনেকই জানেন না, আজ দেশে পাশ্চাত্যের  
যে হাওয়া বহিতেছে, যে পক্ষা পূহীত হইয়াছে, তাহার সমুদায়ই  
কর্তৃদন পূর্ণ বর্ষমান মহাভারত জন্মস্রোতেরও পূর্বসূরী এই  
বাঙ্গালদেশেরই এক স্বদেশপ্রাণ মহাভারত মহাভারতের  
পাঠ করিয়াছি। বাঙ্গালী হইলে ইনি ভূদেব ব্যাসের প্রেরণিত  
পথ হইয়াছেন বলিলে সন্দেহ করা হইত না। অশ্বপুত্র-  
বলেনও, অশ্বক ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুণ্ড্রাঙ্গলি এখন ভাগ,  
বিবির প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ, সামাজিক প্রবন্ধ প্রকৃতি পঞ্জিকা  
এই কথার সত্যাসত্য নিশ্চিত করিতে যে কেহই পারিবেন।  
এমন কি পুণ্ড্রাঙ্গলিতে মহারাষ্ট্র-ভারতও সাক্ষ্যবাক্য লাভ  
করবেন। "কর্তৃদন" তাঁহার অধরে দূর ভবিষ্যৎ ছায়াপাত

— মধো মধো এইরূপ চিন্তা করি, হঠাৎ অনিলা  
আমাদিগের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঠাকুরের পরলোক  
হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্র (ইনি ইংরেজীতে কৃতবিদ্যা)  
আপন পিতার রক্ষিত বাবতীয় পুণ্ড্রাঙ্গলি নিত্যন্ত  
আমরা বিবেচনার গদ্যালপে নিমগ্ন করিবার জন্য আদেশ  
দিয়াছেন।

আমরা স্বর্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঠাকুরকে সর্লভ্য-  
করণে ভক্তি করিতাম। হুতরাং তাঁহার পুণ্ড্রাঙ্গলি-  
গুলি গদ্যালপে বিশুদ্ধিত হইতে চলিল অনিলা হুতবিত্ত  
হইলাম এবং পুস্তকভারবাহী ভূতাদিগের সমভিযাচারে  
গদ্যভক্ত গমন করিলাম। ভূতেরা প্রভুর আদেশ  
পালন পূর্বক দূর জলে গিয়া পুণ্ড্রাঙ্গলি সমুদায় নিমগ্ন  
করিল। অনন্তর তাহারা চলিয়া গেলে ভূদেব আমরা  
সেই স্থানে অহলক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু হুতবিত্ত  
কথা কি বিবির, একখানিও পুণ্ড্রাঙ্গলি হুতগত করিতে  
পারিলাম না। হুতবিত্তের প্রথর প্রোতে সমুদায়  
ভাসিয়া গিয়াছে।

নিত্যন্ত হুতবিত্ত হইয়া প্রত্যাপন করি, এমত  
সময়ে একখনি খাতা হাতে তৈলিক। তাহাই বহুপূর্বক  
আনিলাম এবং কাগজগুলি রৌদ্রপ্রাপ্ত তুকাইয়া  
সইলাম। অনন্তর পড়িয়া দেখি পুস্তকখনি আত্মোপাস্ত  
বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এবং লিপি-প্রাণীও অশ্লোকের  
প্রচলিত রূপ।

পুস্তকখনি পাঠ করিয়া জানিলাম যে, ইহা  
উনিশশ পুরাণের অন্তর্গত তীর্থদর্শন পূর্ব। ইহারও বহু  
ব্যাসহুতবিত্ত, চিন্তাশীল, শ্রোতা স্বতন্ত্রই অথবা অন্ধ বদ্র।

কি মর? পুণ্ড্রাঙ্গলির রূপবর্ণন আজ পাঠকের নিকট সত্য  
এবং বার্ষক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর পুণ্ড্রাঙ্গলির শেষ নির্দেশ-  
টুকুই কি এদেশের ভাষাবিশিষ্ট অর্পণ রূপে?

"সমকথা, সত্যকথা সত্যসত্যসত্য সত্যকথা যে কাটা সম্পন্ন  
করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগ্যবিশেষ্যাদিগের প্রতিও সেই  
কালের ভাষা মর্মান্বিত হইয়াছে। ইহারিগণের সঙ্গে পূর্ব-  
পিতৃদেবের পুনরুৎসাহ নাহিক হইবে।"—পুণ্ড্রাঙ্গলি, ২য় ভাগ।

পুস্তকখনি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঠাকুরের রচিত নয়,  
ভগবান বেদব্যাসেরই বিরচিত এবং দেবদেবগণের  
আমাদের হস্তগত, তদ্বিষয়ে বিপুলসংকল্প নয়।

আমরা পাঠ করিয়া ইহার সমগ্র ভাষা বুঝিতে  
পারি নাই, অথবা কেবল বুঝিয়াছি প্রকৃত ভাষা  
তাহাই কিনা তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। মায়া  
হউক আমরা যে স্থান কেবল বুঝিয়াছি তাঁকারণে  
তাহার আভাস লিখিয়া পুস্তক মুদ্রিত করাইলাম।

দেবদেব যে এখনও পুরাণ রচনা করিতেছেন এবং  
বাঙ্গালা ভাষাতেই তাহা লিখিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা  
নিঃসন্দেহ হইয়াছি। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিশ্বাস না হইবে  
কেন?—৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

## অধিকারীভেদ ও স্বদেশীভূরণ

১। আমি মাতৃভূমির নানাদেশ দর্শন করিয়াছি। যে  
সকল ভাগ পড়কে দেখি নাই তাহারও বিবরণ বহুপূর্বক  
সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি  
অথবা যেখানকার ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি, সকলই মনে  
দ্রষ্ট প্রকার চক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। এক  
আমার চক্ষুচক্ষে, অপর হৃদয়প্রাপ্ত কোন মহাপুরুষের  
জ্ঞানচক্ষে। যখন আমার বয়স পঞ্চবর্ষের অধিক  
তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম স্রোত আবৃত্তি  
করিতে শিখিয়াছিলাম। দাদর বা জ্যোদেবগিরি বয়সে

তাঁহারই স্থানে ঐ স্রোতের সর্বজনবিদিত সৌন্দর্য  
ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স চত্বারিংশত্বর্ষ তখন  
তাঁহারই স্থানে আবার ঐ স্রোতেরই আধ্যাত্মিক ভাব  
অবগত হইয়াছিলাম। একই স্রোত, একই গুণ, একই  
শিখা; কিন্তু কালভেদে অধিকারভেদ এবং ব্যাখ্যার  
ভেদে।

২। যখন হিন্দুকলমে পণ্ডিত্যম তখন মাহেব  
মাহার বসিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশীয়তাবাদ  
নাই, কারণ ঐ ভাবার্থ-প্রকাশক কোন ব্যাক্যই কোন  
ভারতবর্ষীয় ভাবার মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার  
কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন  
মনে মনে যৎপরোনাস্তি হুঃখান্বিতও করিয়াছিলাম।

তখন অদামস্বপ্ন গ্রন্থ হইতে দক্ষকণ্ঠ সত্যের স্বেচ্ছা-  
বিবরণ জানিতাম; কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও  
শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপনায়  
মনকে প্রোবদ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে  
জানিয়াছি যে, আধ্যাত্মশাস্ত্রদিগের চক্ষে ৫২ পীঠ সমভিত্ত  
সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষ্যং ঐশ্বরীদেহ\*।—৩ ভূদেব  
মুখোপাধ্যায়।

\* প্রবন্ধটি অসমাপ্ত, যুগসত্ত্ব পুণ্ড্রাঙ্গলি দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবিষ্ট  
কোন ভাগ। এইরূপ কিছু কিছু, এবং মহাভারত ৩ ভূদেব ব্যাসের  
ভাষ্যের এবং পুণ্ড্রাঙ্গলীর (জীবনকর্ত্তিত অপ্রকাশিত) কোন কোন  
আশ আশের "উৎসবের" পাঠ্যবর্ণকে যথো যথো উপহার  
দিল হির করিয়াছি।—সম্পাদক, উদয়ন





## ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ

প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে কোন দৃশ্যকাব্যের অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্বে কুশীলবণ একত্র মিলিত হইয়া রসবিদ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্যে একপ্রকার মাসলিক উৎসবের আয়োজন করিতেন। উহার নাম ছিল “কর্করোংসব”। প্রাচীন ইংলণ্ডের May-day rites বা May-pole dance-এর সহিত ইহার অনেকটা মিল ছিল। সে-যুগের অভিনয়ের সহিত “কর্করোংসবের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, এটিকে বাদ দিয়া অপরটি কল্পনাও করা যাইত না। এই “কর্করোংসবের ইতিহাসই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা।

পুরাকালে একদিন মহর্ষি ভরত তাঁহার নিতা রূপ শেখ করিয়া শতপুর ও শিখ্য পরিবৃত্ত হইয়া তপোবনে বসিয়া ছিলেন। পৈনিন্দ অনন্যায়—বেশপাঠের পরিশ্রম হইতে স্বর্ণিণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাই উপযুক্ত অবসর বৃত্তি। আরোহণদ্রুত জিহ্বাক্রিয় নিম্নগত ভরতকে প্রশ্ন করিলেন—“বেদাদ্যমোদিত ও চতুর্লসদের সমকক্ষ নাট্যবেদ নামে যে গ্রে আপনি কিছুদিন পূর্বে সন্মিলিত করিয়াছেন, তাহা কিরূপে ও কাহার নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইয়াছিল?” ইহা হাড়া—নাট্যের কন্মট অঙ্গ, কি প্রমাণ ও রসমঞ্চে উহার প্রয়োগবিধি কীদৃশ—এসকল বিষয় সম্বন্ধে ও তাঁহার বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সুনিশ্চেষ্ট ভরতও একে একে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নাট্যের উৎপত্তি ও নাট্যবেদের উৎপত্তির কথা। সাধারণের ধারণা নাট্যবেদ ত্র্যশ্রয় রচিত। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বকে চতুর্লসদের হ্রায উহাও অপৌরাণিকের ও অনাদি। ব্রহ্মা উহার প্রবর্ত্তগিতা মাত্র, রচয়িতা নহেন। স্বায়ম্ভুব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈবস্বত অবধি

প্রত্যেক মন্বন্তরেই \* জ্যোত্স্নেগে নাট্যবেদ পিতামহ- (ব্রহ্মা) কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কখনও কোন সত্যযুগে নাট্যবেদের প্রচার হয় নাই।

স্বায়ম্ভুব হইতেছে প্রতি কল্পের আদি মন্বন্তর। উহার প্রথম সত্যযুগ ও সত্য-হেতব্র সন্নিধিলা অতিক্রান্ত হইবার পর জ্যোত্স্নেগের প্রারম্ভে—দেব, দানব, বক্ষ, রক্ষস, গন্ধর্ব্ব, মহারাক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সমাজান্ত্র—লোকপালগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—মানবের কন্মভূমি জন্মস্থানে—প্রজাপতি গ্রাম্যমণ্ডলে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশ্য, জ্যোত্স্নেগ প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাক-সমাজে একপাদ পাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রজাপতি পাপসঞ্চারের ফলে কাম ও মোহের বশীভূত—ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং ও গুণ্য গোপ করিতেছে দেখিয়া ইজাদি দেববৃন্দ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

“পিতামহ! আমরা চিত্তবিনোদনের উপযোগী এমন একটি হিতকর জীড়ার স্রব্য চাই, যাহা একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য হইতে পারে। মৃদুভাষিত্বের পক্ষে বোধদায়ন বা অবশেষ কোন বিধি নাই। অতএব, আপনি রূপাসুন্দরী সকল জাতির শ্রবণযোগ্য একটি সার্বজননিক পঞ্চম বৈদে সৃষ্টি করুন।”

তদবধি ব্রহ্মা “তথাস্ত” বলিয়া সন্মতবলে দেবরাজকে

\* মনু মোট ১৪ জন—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) যাম্যোজি, (৩) উজম, (৪) তামি, (৫) ইবজ, (৬) চান্দ্র, (৭) বৈবস্বত, (৮) স্বায়ম্ভু, (৯) দক্ষ্যসাবদি, (১০) ত্র্যম্বকসাবদি (১১) ধর্ম্মসাবদি (১২) রুদ্রসাবদি (১৩) বৈশ্বাসাবদি ও (১৪) ইন্দ্রসাবদি। এক এক মন্বন্তর আবার কালের দিন এক মন্বন্তর=কিঞ্চিকবি ১১ দিবস। ১০০০ দিবস= ১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প = ত্র্যম্বক ১ দিন = ৪০২ কোটি বৎসর। সত্য, ত্রেতা, ধার্ম্ম ও কলিযুগ পরিমাণ = ৪০২,০০০ বৎসর। সত্যযুগ = ১৭২,০০০ বৎসর। ত্রেতা = ১২৬,০০০ বৎসর। ধার্ম্ম = ৮৪,০০০ বৎসর। কলি = ৪২,০০০ বৎসর। বর্মান কলিযুগ ত্রেতার শেষের অন্তর্গত সপ্তম দৈবত মন্বন্তরে অবস্থিত যুগ। প্রতি কল্পান্তে একবার করিয়া মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।

তখনকার মত বিদায় দিলেন। পরে যোগবলে চতুর্লসদের শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন সমস্ত করিলেন—“আমি নাট্যোপা এমন এক পঞ্চম বৈদে সন্মত করি, যাহা ধর্ম্মবুদ্ধির অহঙ্কৃষ্ণ, অর্থপ্রদ, স্বচ্ছ, প্রয়োজনীয়, শশস্ত, নানা উপদেশবহুল, ধর্ম্মবিকার-মোক্ষাত্মক চতুর্লসদের উপায়প্রবর্ত্তক, চতুর্লসদের সংগ্রহ-রূপ (digest), সর্বশাস্ত্রের সারভূত, সর্বপ্রকার শিল্পের আকর্ষণরূপ ও ইতিহাসসমৃদ্ধ হইবে।”

এইরূপ সমস্ত করিয়া ভগবান্দ লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্লসদের অঙ্গসমৃদ্ধ নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। অথেষ্ট হইতে গ্রহণ করিলেন উহার পাঠ্য অংশ, সান্বেদে হইতে গীত, বজ্রলসে হইতে অভিযা ও অর্থলসে হইতে লইলেন রস। এইরূপ সর্বলসদেবিত পিতামহ-কর্তৃক চতুর্লস ও আচার্য্যদিগে উপবেদগুলির সহিত সমৃদ্ধ নাট্যবেদ সৃষ্ট হইল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় নাট্যবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অপরূপ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ। অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষকগণ ইহাকে একেবারেই রূপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদিগের বিভিন্ন মতবাদ এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে।

নাট্যবেদ সন্মতনের পর ব্রহ্মা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে জামিতা বলিলেন—“দেখ, দেবরাজ! ইতিহাস (দর্শনরূপক) ত আমি সৃষ্টি করিলাম। এখন তুমি দেবগণের মধ্যে উহার প্রচার কর। ধারাত্য উল্ল বিজ্ঞা গ্রহণে (গুরুমুখ হইতে শিক্ষা করিতে) ও ধারণে সমর্থ, উদ্যোগোপ বিচার করিতে অপরায়ুধ, লোকসমাজে ভীত (nervous) শিখন—এইরূপে কুশল, বিদগ্ধ, প্রণয়ন ও জিতশ্রম শিখ্যগণের মধ্যে এই নাট্যবেদবিজ্ঞা তুমি বিতরণ কর।”

ইহার উত্তরে ইন্দ্র কৃতজ্ঞমিলপুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন—“ভগবন্! দেবগণ চিরদিনই স্বথভোগে অস্তিত। নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান (উদ্যোগোপবিচার), প্রয়োগ (রসমঞ্চে অভিনয়) এজুতি পরিশ্রমসাম্পেক নাট্যকর্মে তাহার কখনও সমর্থ হইবেন না।

বেদের রহস্যবিৎ, কষ্টদহ, জিতেন্দ্রিয়, ত্রতনিয়মপরায়ণ ধর্ম্মিগণই নাট্যবেদ শিক্ষা ও প্রয়োগ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।”

ইন্দ্রের এই বৃত্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে কমলাসন ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে সোধান করিয়া বলিলেন—“তুমি শতযুগে সযোগে নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ কর।”

অনন্তর ভরত ব্রহ্মার নিকট যথাবিধি নাট্যবেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক নিম্নের শতযুগকে যথাবিত্তি নাট্যশিক্ষা প্রদান করিলেন। অভিনয়ে যিনি যে ভূমিকা গ্রহণের যোগ্য, তাহাকে সেই ভূমিকা প্রদান করা হইল। সর্বনাট্যের নাট্যকায়রূপিণি চারিটি বৃত্তির (style in composition) মধ্য হইতে নাট্যপ্রয়োগের উপযোগী দেখিয়া ভরত প্রথমে তিনটাই বৃত্তি বাছিয়া লইয়া-ছিলেন। ভারতী, স্বায়ম্ভু ও আরভটী—এই তিনটি বৃত্তি অশ্বলখন করিয়া ভরত নাট্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা উহাদিগের সহিত কৈশিকী বৃত্তিও \* যোগ করিতে আহবান দিলেন। উত্তরে ভরত বলিলেন—“পিতামহ! কৈশিকীপ্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ

\* ভারতী—নাট্যকায়রূপ, গুরুগম্ভায্য, বাক্য-প্রদান ব্যাপার। ভরতসমুখ হইয়া গণন প্রচোপ করে বলিয়া ইহার নাম ভারতী। অভিনয়প্রণেয় মতে ইহা যথ্যবিত্তি। ইহা স্বয়ং হইতে গৃহীত। রূপ ও অসুতরত বাহ্যবাহ্য। ইহা নান্যবাহ্য জ্যোতিষিত। স্বায়ম্ভু—স্বয়ং, শৌর্য, ত্যাক, দয়া, মজুতা প্রভৃতি গুণ বর্ণনার উপযোগী। উৎকট হই হইতে স্বাভা—কিছু পোক নাই। অভিনয়প্রণেয় মতে মনোব্যাপারগত সার্বিকমুখি নাট্য। স্বয়ং—মন। মজুত হইতে ইহা গৃহীত। বীর, বীর ও অসুতর রস বর্ণনার উপযোগী—লোক বা শূর্য বর্ণনার অঙ্গব্যাপার। আরভটী—বাক্য, প্রকারণ, স্যোগ, ক্ষেপ, উদ্ভাষ্যভটী, বক্ষ, বক্ষ, মিনা, বা প্রভৃতি পোষিত হইবার উপযোগ। অভিনয়প্রণেয় মতে ইহা কাব্যবিত্তি। স্বয়ং=সোহাগ, অবলম্ব। উল্ল=ভূত, ভূত। অবলম্বন কর্তে যে সকল গুণ—বহুভাষ্য, মিনা, বাক্য, কাগো—সে সব হইতে স্বাভা হইয়া। ইহা অর্থলসে হইতে গৃহীত। ভানক, গীতা ও বীর রসে আরভটী বৃত্তি বাহ্যবাহ্য। কৈশিকী, লিলা গোমক পরিয়া ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা গ্রন্থগত, সত্যজিৎবহন ও শূর্য্যগ্রন্থিতাপাক। অভিনয়প্রণেয় মতে ইহা লৌকিকমুখি ব্যাপার। কেনে শব্দে কোন প্রয়োগে নানন না করিলেও মর্দক-শোভার ইতিহাস থাকে, ইহাও সৈক্য। ইহা নামলসে হইতে গৃহীত। শূর্য ও হাঙ্গলসে ইহা বাহ্যবাহ্য।—নাট্যশাস্ত্র—২২ অং।



আমার অধিকারে নাই। সে ত্রা আপনাকেই সংগ্রহ করিয়া নিতে হইবে। এই কৈশিকী বৃত্তি নৃত্ত (১) ও অশ্বহারম্পন্ন, রসভাবক্রিয়াস্বক, ধ্রুবেপথ্যকুল ও শূদ্রাধরসমুজ্ঞ—ইহা আমি ভগবান্ শরৎের নৃত্যে লক্ষ্য করিয়াছি। একমার ‘পরিপূর্ণানন্দনির্ভরীভূত-সেহ স্বন্দরকার’ অঙ্গীকৃততাপ্পত্য অর্ধরানীশ্বরদেব বাতীত অপর কোন পুরুষের পক্ষে কৈশিকীপ্রয়োগ অসম্ভব। শুধু অভিনেতার দ্বারা এ কাব্য চলিবে না—অভিনেত্রীও প্রয়োজন।

এই কথা শুনিয়া পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যা-লঙ্কারচতুর্বা (২) অক্ষরোপণের সৃষ্টি করিলেন। এই অক্ষরোপণ ত্রাচার মানসী সৃষ্টি। ইহারাই ভারতের আদি অভিনেত্রী। আর ভারতের শতপুত্র হইলেন প্রথম অভিনেতা।

তাহার পর শশিদ্ভাতি নামক জ্বি ভাণ্ডের অধিকারে ও নারদাশি গন্ধর্বগণ গানযোগে (৩) নিযুক্ত হইলেন। ইহাই হইল ভারতের প্রথম নাট্যসম্প্রদায়।

এইরূপে নিজে দল গঠন করিয়া ভারত কৃত্যভগ্নি-পুটে ত্রাচার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

(১) নৃত = অঙ্গোপাশ্রয়ণের সন্ধান বিক্ষেপ। অশ্বহার = অঙ্গপথের অঙ্গভিত্তিকের সন্ধান স্থান প্রাপ্ত। নৃত = ভাবাভাবক্রিয়া সহ অঙ্গবিবরণ। রসভাবক্রিয়াস্বক = রসময়নে যে ভাব (ভাবন) অর্থাৎ কবি, নট্যমাসিকগণের মতো বাহির; তাহার দ্বারা লিখা অর্থাৎ অভিনেত্রীভাষা, তাহাই ইচ্ছা (হস্ত) বাহার—এই বৃত্তি কৈশিকী। ধ্রুবেপথ্য = চিত্রা পোষাক—Deshabille।

(২) নাট্যাঙ্গকার = নাট্যের বৈচিত্র্যকে প্রদান অলঙ্কার স্বরূপ কৈশিকী বৃত্তি। অঙ্গোপাশ্রয়ণ নাট্যাঙ্গকার = প্রয়োজকের হস্তাঙ্গ অলঙ্কার লম্বট = নীলা, বিলাস, বিখিতি, বিমন, কিসাংকিত, মোটামুটি, সুচলিত, বিলাস, ললিত, বিকৃত; অঙ্গোপাশ্রয়ণ অলঙ্কার সাতটি = শোভা, কাণ্ড, দীপ্ত, মনুষ্য, ধোঁ, প্রাণলম্ব, উপাঙ্গ।

(৩) ভাণ্ড = বাত্মবিশেষ। এক্ষণে চক্কা জাতীয় বাত্ম = স্বনন্দক বা শোভন বাত্ম। পদ, দূর, বস্ত্রী, প্রকৃতি পূরক জাতীয় বাত্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত। গানযোগ = গীতের অধিকার বাত্ম। বাহার = তত (বা ত্রাভাষ্য) অর্থাৎ তার বা গীতের গায় ও গৃহের (গায়কের বাত্ম)। ইহা ছাড়া বাত্মক বাত্ম (দন) ইহাতে লিখা। বাত্ম মোটে চারি প্রকার = তত, বাত্ম, দন ও স্বনন্দক। এক্ষণে ইহাদিগকে ‘হস্তাঙ্গ’ বলিত।

“পিতামহ! নাট্যশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন কি করা যায়, আদেশ করুন।”

পিতামহ উত্তর দিলেন—“ভরত! নাট্যাঙ্গোপণের উপযুক্ত অবসর ত সমুদয় উপস্থিত। শ্রীমান্ মহেশ্বরের ক্ষমতাহোমস প্রবৃত্তপ্রায়। ইহাতেই নাট্যবন্দের প্রয়োগ কর।”

দেবগণের সহিত সজর্বে অশ্বর ও দানবগণ নিহত হওয়ার মহেশ্বরের বিষ্ণুসৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত অমরগণ একত্র মিলিত হইয়া উক্ত ইন্দ্রক্ষম মহোৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন।

শুরুক্ষমহোৎসবে অভিনয়ের প্রারম্ভে ভরত প্রথমে নানী রচনা করিলেন। ঐ নানী আশীর্ষচন্দন-ময়ুক্ত, বিচিত্র, বেদনামত ও অষ্টাঙ্গপদময়ুক্ত হইয়াছিল (৪)। তাহার পর কেবল দৈত্যগণ বেগগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার অহরহর ত্রিক তদধরূপ ঘটনার সন্নিবেশ নাট্যে করা হইল।

ত্রাচারি দেবগণ অভিনয়ের আয়োজন দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভারতের পূজ্যগণকে সর্বপ্রকার উপকরণ প্রদান করিলেন। প্রথমেই প্রীত হইয়া ইন্দ্র দিলেন তাঁহার শুভ বিজয়ধ্বজ। ত্রাচা দিলেন বিদ্যুৎকে রবহারাণবগণী কুটিলক অর্থাৎ বজ্র দণ্ড। বজ্র দ্বারাশ্রয়ণের উপলক্ষী ত্রাচার। স্বর্গ দিলেন জ্ঞানপ্রতিম ছত্র বা বিভান (চাঁদোয়া)। শিব দিলেন দৈবী ও মাছবী সিন্ধি। বায়ু দিলেন ব্যানন, বিষ্ণু—সিঁহাসন, কৃষ্ণ—মুকুট ইত্যাদি।

অতঃপর দৈত্যদানবগণের অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া যে কল দৈত্য অভিনয়দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা স্তুতিচিহ্নে বিজ্ঞাপক প্রকৃতি বিজয়গণের সহিত পরামর্শ আঁটিল—“এক্স ধরণের অভিনয় আমরা পছন্দ করি না। অতএব, আইস—ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাক।”

(৪) অষ্টাঙ্গপদময়ুক্ত = আটটি পদ বাহার অঙ্গবৃত্ত। ‘পদ’ বলিতে অভিনয়গণের বসে হস্তপ্ৰতিভা পদ অথবা আঁতর বাকা উভয়ই বুঝায়। নানী নামাবলি (নাঃ শাঃ মেঃ অঃ)।

তখন অশ্বর ও বিজয়গণ মায়াবেল অশ্ব হইয়া রত্নমণ্ডপ নর্তকগণের বাকা, শারীরিক চেষ্টা ও স্তুতি শুভিত করিয়া ফেলিল। স্বধারাকে এইরূপে সহসা বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া দেবরাজ—“একি! কোথা হইতে সহসা অভিনয়ের এক প্রকার মায়াবেল উপস্থিত হইল?”

—বলিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। বেগবলে তিনি নিবাস্যপ্ৰীতে দেখিতে পাইলেন যে, বিজয়গণ অশ্বভাবে রত্নমণ্ডপটি একবারে ছাড়িয়া ফেলিয়াছে। আর স্বধারা ও তাহার সহকারী সকলেই তাহাদের প্রভাবের নষ্টাঙ্গ ও জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপার গুরুতর যুগ্মিয়া ইন্দ্র সহসা উঠিয়া তাহার, বিজয়ধ্বজ তুলিয়া লইলেন। বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে তাঁহার দলমত্যাও বিলম্ব হইল না। ধ্রুজদগুপ্তে তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দেহ বিজয়রত্নপ্রভার ভাষার হইয়া উঠিয়াছে; ক্রোধে রক্তত নমন আশ্রুত। রত্নগীতগত বিয় ও অশ্বরগণকে সেই ইন্দ্রপ্রভাবে তিনি জর্জর করিয়া ফেলিলেন। বিয় ও অশ্বরগণের মধ্যে কেহ নিহত, কেহ বা পলায়নপর হইলে দেবগণ স্তম্ভনে বগিত লাগিলেন—“দেবরাজ! অশ্বত তোমার এই দ্বিপ্রাণের, তাহার সাহায্যে তুমি দানবগণের সর্বাঙ্গ জর্জর করিয়া দিয়াছ। যেহেতু তাহার প্রভাবের বিয় ও অশ্বরগণ জর্জরীকৃত হইয়াছে, অতএব অশ্ব হইতে তোমার এই দ্বিপ্রাণের নাম হউক—‘জর্জর’। যে সকল ছুটে অতঃপর নাট্যহিন্সার চেষ্টা করিবে, তাহারা এই জর্জর দেখিলে আর পলাইবার পথ পাইবে না।” ইন্দ্র উত্তর দিলেন—“তথাস্থ। আশ্ব হইতে রত্নগণের রক্ষক হইবে এই জর্জর।”

ইহার পর ক্ষমতাহোমস আবার জমিয়া উঠিল। অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হইল। কিন্তু হস্তাবশিষ্ট বিজয়গণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত ছিল না। তাহারা অশ্বভূ পাখিয়া নর্তকদিগের ভাষা জমাইতে লাগিল। তখন ভারত পিতামহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বিজয়গণ নাট্য-বিদ্যায়ের জ্ঞান বদ্ধবিকরণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, আপনি স্বয়ং ইহার রক্ষা বিধান করুন।”

তখন ভগবান্ ত্রাচা বিবকর্ষাকে ডাকিয়া সর্বমূলকপ-সম্পন্ন চুর্ভেট দ্বিবা নাট্যগৃহ নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। অচিরে প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হইল। পিতামহ দেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন—“তোমরা এক একজন নাট্যাঙ্গের এক এক অংশ রক্ষার ভার লও।” সকলেই সন্মত হইলেন। মণ্ডপরক্ষার ভার পড়িল চন্দ্রমার উপর। লোকপালগণ দিক্রক্ষা ও মারুতগণ বিদিক্র-রক্ষার ভার লইলেন। নেপথ্যভূমিরক্ষার নিযুক্ত হইলেন মিত্র। অশ্বর রক্ষা করিতে লাগিলেন বরুণ। রত্নবেদিকার রক্ষক হইলেন অগ্নি ও বজ্রভাও রক্ষার অবশিষ্ট সকল দেবতাই তৎপর রহিলেন। এইরূপে এক এক জন দেবতা নাট্যাঙ্গের এক এক অংশরক্ষার দ্বৈচ্ছাসেবক লাগিলেন।

তখন দৈত্যদানবক বজ্র জর্জরের শিরোভাগে নিক্ষিপ্ত হইল। আর উহার এক একট পর্শে অমিতভাষা দেবগণ অধিষ্ঠান করিলেন। সর্বোচ্চ শিরঃপর্শে বলিলেন ত্রাচা স্বর, তাহার নিম্নপর্শে শব্দ, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে ব্রহ্ম ও পঞ্চম বা সর্গনি পর্শে বলিলেন—শেষ, বাহুরিক ও তক্ষক—এই তিন মহানাগ। নায়কের রক্ষার ভার লইলেন ইন্দ্র, ও নায়িকার রক্ষার নিযুক্ত হইলেন সরস্বতী।

তার পর দেবগণের অশ্বরোষে বিজয়গণের সহিত বিবাদ আপোষে মিটাইবার নিমিত্ত ত্রাচা ত্রাচাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“অভিনয় পণ্ড করিবার জ্ঞান তোমাদের হইত প্রয়াস কেন?”

ত্রাচার বাক্যে একটু নরম হইয়া বিজ্ঞাপক দৈত্য ও বিজয়গণের মুখপাঞ্জ হইয়া বলিল—“দেবগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আপনি যে নাট্যবন্দে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মুখা উদ্বেগ ত দেখিতেছি লোকচক্ষুর সমক্ষে আমাদিগের হেয়তা প্রতিপাদন করা। দেবতাই বদন, আর দেবতাই বদন—সবই ত আপনার সৃষ্টি। আপনার নিকট আমরা উভয় পক্ষই সমান। তবে দেবতাদিগের প্রতি এ পক্ষপাত কেন করিলেন?”

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—“বৎস দৈত্যগণ!

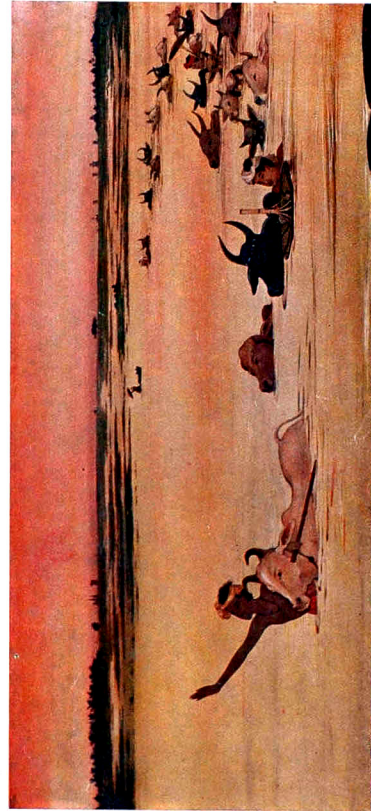
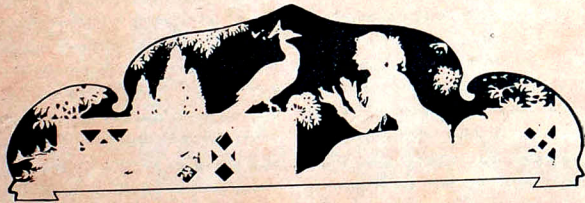


তোমরা ক্রোধ ও বিবাদ পরিত্যাগ কর। কেবল তোমাদেরই পরিভব দেখাইবার নিমিত্ত নাট্যবেদ সৃষ্ট হয় নাই। আর দেবতারিণের নিছক স্ততিবাদের নিমিত্ত বে ইহার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাও মনে ভাবিও না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জৈলোকেরই ইহা ভাবাম্-কীর্তনস্বরূপ। ইহার মধ্যে কোথাও ধর্ম্মাহুতান, কোথাও বা ক্রীড়া, কোথাও অর্থলাভ, কোথাও বা শমপ্রাপ্তি, কোথাও হাস্য, কোথাও বা মৃত্যু, কোথাও কাম, কোথাও বা বধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধার্মিকগণ ইহাতে ধর্ম্মের সন্ধান পাইবেন। কামাভিলাষীর ইহা কামপরিপূরক। তুর্বিনীতের ইহা নিগ্রহস্বরূপ। বিনীতগণের পক্ষে ইহা দমক্রিয়া। শূরমানিগণের ইহা উৎসাহজনক। মুঢ়গণের পক্ষে ইহা শিক্ষার উপায়। পণ্ডিতগণের নিকট পাণ্ডিত্যপ্রকাশের উপযুক্ত উপকরণ। ঐক্যশালীর নিকট ইহা বিলাসের উপাদান। শোকগ্রস্তের ইহা শান্তিদাতা। অর্থলিপ্সুর পক্ষে ইহা উপার্জননের একটি প্রধান উপায়। উষ্মচিত্তের ইহা শৈথিল্যসম্পাদক। সপ্তবীপের মধ্যে যেখানে বাহা ঘটয়াছে বা ঘটতে পারে—দেব, দানব, রাজা, ঋষি, মন্ত্র্য—বাহ্যার বৈরুপ স্বভাব—তাহার অবিকল অঙ্করণ এই নাট্য। এক কথায়,

ইহাকে ‘জীবনের জীবন্ত অঙ্করণ’ বলিতে পারা যায়। অতএব এ বাপ্যারে তোমাদের ক্রোধের কোন কারণ থাকে সমস্ত মনে করি না। কারণ, ইহাতে সত্য ঘটনারই হুবহু অঙ্করণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেল।”

এইরূপে সামগ্র্যযোগে বিয়গণকে শান্ত করিয়া ত্রুক্ষা দেবতাসমূহকে আদেশ দিলেন—“আজ নাট্যমণ্ডপে তোমরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন কর। ময় পাঠ করিয়া বচা-বলা-গ্রীহি প্রভৃতি গুণবি দ্বারা হোম কর। মোদকাদি তক্ষ্য অব্য ও ক্ষীর-ইক্ষু-দ্রাক্ষারস-পায়স-কুসর (খিচুড়ি) প্রভৃতি সরস দ্রব্যের দ্বারা বলি প্রদান কর। গোমাদের বেথিয়া মন্ত্রের অবিদ্যগিনণ জর্জরের পূজাবিধি শিক্ষা করিতে পারিবে। রত্নপূজা না করিয়া কলপি অভিনয় করিতে নাই; করিলে অভিনয় নিফল হয় ও অভিনয়কারিগণ তিথ্যয্যোনি প্রাপ্ত হন। পদ্মাস্তরের রত্নপূজাবারা অভীষ্টসিদ্ধি ও স্বর্ণপ্রাপ্তি ঘটয়া থাকে”। ইহা বলিয়া ত্রুক্ষা অন্তর্হিত হইলেন।

পরবর্তী সংখ্যার অন্যথকে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল—লেখক।





শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

## প্রকৃতি

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সোম-মঙ্গল আফিসের দিন, কথা কহিবার সময়ই বা কখন? মঙ্গলবার আফিস হইতে কিরিয়া গোপাল চা খাইতে পাইতে জিজ্ঞাসিল—তোমার গোছান গোছান হ'ল?

পলি মনে মনে রাগে জ্বলুর্ন অন্ধকার দেখিতেছিল, বলিতে বাইতেছিল 'না', কিন্তু বলিল না; মুখে হাসি আনিয়া স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বলিল—সে সব ত আমি রোববারেই ক'রে রেখেছি।

গোপাল এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—দেখ, আমি ভেবে দেখবুম, পুজার ছুটির সময় বেকনো যাবে।

পলির মনের ভিতরকার কথা বলিবার অনধিকার চেষ্টা আমি করিব না, তবে তাহার হাসিমুখের উপরে যে চোখ দুটি, তাহা যেন পদ্মপত্রের মত টল টল করিয়া উঠিল, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। যে দেশের নারী অজ্ঞের ইচ্ছার তলে স্বীয় ইচ্ছা, সাধ, কামনা বিসর্জন দিতেই চিত্তাভ্যস্ত, সে দেশের নারী ইহা লইয়া তর্ক করে না, করিতে চায় না, পারে না, বোধ হয় তাহার প্ররক্তিও হয় না। পলি চুপ করিয়া রহিল, চায়ের পেয়ালার মধ্যে চামচ ডুবাইয়া, নিজ মনের উত্তাল তরঙ্গকে ও ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

গোপাল অন্তরমন্থের মত বলিল—পাচদিন সময়, পাচ-সাত শ' মাইল মোটর-জার্মি ক'রে ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে হবে, আমি শুধু তাই ভাবছি। বে তোমার শরীর!

পলি বলিয়া উঠিল—আমার শরীরের খরাপটা কি দেখলে আবার!

—খরাপ! রামো—চনত্রো!

পলি এইবার রাগ প্রকাশ করিল,—যাবে না, ইচ্ছে

নেই,—তাই বল না ম'শাই, আমার শরীরের দোহাই পাড়া কেন মিছামিছি!

গোপাল বলিল—যাব না, তা' ত বলিনি—

পলি বলিল—আবার বলা কাকে বলে?

গোপাল এক চুমুকে অনেকখানি গরম চা পান করিয়া লইয়া, যেন গরম হইয়া উঠিল, বলিল—তবে চলো, বেকনো যাক!

—ঠিক? ঠিক? ঠিক?

—ঠিক! তিন সত্যি।

কেহ কোথাও নাই দেখিয়া লইয়া, পলি তারি সন্ধানপনে একটা কাণ্ড করিয়া, হাসিয়া লুটাইয়া যাব হইতে এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।

পথ সুন্দর, মোটর নতুন, সন্নিহী মধুর, গাড়ী তিন ঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া চলিল। পলির টাইম-টেবল অফিসের মনে, পানাহারও বথাসময়ে স্নানসম্পন্ন হইল।

আজ সেই অবিবাহিত জীবনের দিনগুলির কথা পলির মনে পড়িতেছিল। পাচটি ভায়ের একটমাত্র বোন সে ভায়েরের সঙ্গে যে আনন্দে, যে পুলকে ভাসিয়া বেড়াইত, মথোর কয়েকটা দিনের অন্ধকার বিপত্তি দিনের স্রষ্টব্যার্থ্য ভুলাইতে বসিয়াছিল, আজ সন্তর্পারব পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারিয়া তাহার আনন্দের সীমা-পরিমীমা নাই। গোপালের সিগারেট খাওয়া সে কোনদিন পছন্দ করিত না, কিন্তু আজ গোপালের সিগারেট-কেস তাহার কোলের উপরে, সে স্বহস্তে বার বার তাহার মুখে সিগারেট গুঁজিয়া দিয়াছে, স্বয়ং অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।

আর মাইল দুই পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই কয়াধুর ডাক বাজলোহ পৌছিতে পারা যায়। এমন



সময়ে এক বিপদ! সন্ধ্যার অন্ধকার গাছপালায় ভিতর নিবিড় হইলেও ধরণী তখনও স্থম্পট। হঠাৎ এক সময়ে তাহাদের মোটরের বিশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া ছই পুলিশ প্রহরী সন্ধান সমেত বন্ধু তুলিয়া হাঁকিল—হু কাম দার (Who comes there) ?

ব্রেক চাপিয়া গাড়ী 'ডেড এন্ড' করিয়া ফেলিতে হইল।

পুলিশ তখনও হাঁকিতেছে—হু কাম দার ?

গোপাল বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—কি বিপদ?

শেষে কি মিলিটারী সীমানায় পড়া গেল না কি ?

—হু কাম দার ?

পরি গোপালকে বলিল—শীগুণি বল, ক্রেও।

—তাতে কি হবে ?

—তুমি বল ত !

গোপাল বলিল—ক্রেও।

বন্ধুকের মাথা উঠিয়া পড়িল। পুলিশ বাণী বাজাইয়া দিয়া মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। বাঁশীর শব্দে দূর হইতে অস্ত্র একটা প্রহরী অত্মদিকে চলিয়া গেল।

প্রহরীর সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া বুঝা গেল, ছোট-নাগপুরের পার্শ্বভাষী কিছুদিন পূর্বে বিদ্রোহভাব ধারণ করিয়াছিল। তখন হইতে এখানে আইন প্রচলিত হইয়াছে—সন্ধ্যার পর চিহ্নিত সীমার মধ্যে কোন লোককে প্রবেশ করা আইন-বিগর্হিত ব্যাপার। সেদিন একটা গুলিও হইয়া গিয়াছে। গোপাল খেলোয়াড় লোক, খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদের সঙ্গেই তাহার পরিচয়, গুলিগোলা, গোলামাণ, এসকলের নামেই তাহার মস্তক বিঘ্নিত হইল এবং এই সমস্তের সূলেই যে পুলিশ জেদ, তাহা মনে করিয়া গোপাল গরম হইয়া বলিয়া উঠিল—‘দ্রাবিড় প্রলয়করী’, এই জন্তেই বলে।—বলিয়া বন বন স্রমালে মুখ মুছিতে লাগিল।

বিপদে ধৈর্য হারা হইতে নাই, এশিষ্টা পলির ছিল, আশঙ্ক্যবশত অতীত তাহার ধ্বংস। কিন্তু শব্দ ধরে বলিল—আমরা না জেনে এসে পড়েছি, এখন ফিরে যেতেও পারি, তুমি দেখ,

এতে কোনই দোষ হবে না।—সে প্রহরীকে কহিল, তোমাদের অগ্নিসার সাহেবকে খবর দাও।—প্রহরী অস্থূলি সঙ্কেতে দেখাইয়া কহিল—সাহেব আস্তা হায়।

সাহেব বটে, তবে বাঙ্গালী সাহেব। প্রহরী সামরিক কাযদায় সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেবের পিছনে উজ্জল বর্ষিকা হস্তে ছইটা লোক। গোপাল তখনও ক্রমাল দিয়া মুগ্ধ, কানেক, নাকের ধূলা কাদা তুলিতেছিল, সাহেবের আগমন-বার্তা বোধ করি সে পায় নাই।

পুলি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া, নমস্কার করিয়া শুদ্ধ ইংরাজীতে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল; জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদের গন্তব্য স্থান এবং উদ্দেশ্যও কহিল। সাহেব হাসিলেন,

বলিলেন—কি মুগ্ধ। কয়খু যেতে হ’লে মোটর ছেড়ে দিয়ে হুঁমাইল বনের মাঝে পথ হাঁটতে হবে; শুনা যায়, বাঘ-ভালুকও আছে, সাপ-খোপ থাকাও অসম্ভব নয়। তার ওপর আপনারা পপ চেনেন না!

এই রাতিকাল! এ কি হাস্যহাস!

গোপাল স্তীর পানে যে ভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার অর্থ বৃদ্ধিতে পলির কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোন সময়ে কোন কারণে স্বাভাবিক মন্থরা নাষ্ট হইতে দিবে না, ইহাই তাহার জীবনের সর্বপ্রধান শিক্ষা।

আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মিঠে হারির দ্বারা স্বামীকে নীরবে একটু ভৎসনা করিয়া সাহেবকে বলিল—‘ফরেনার’ কি সকল দেশেই ক্ষমার মেগা নয় ?

সাহেব বলিলেন,—অবশ্য। আপনাদেরও ক্ষমা করা যায়, নরি আপনারা অন্তঃসারাজিটার মত এই পরীবে রক্তের নিবিড় যাপন করবার প্রতিক্রিয়া নেন।—

বর্ষিকাবাহীদের মধ্যে একজনকে কহিলেন,—মেম্ সাহেবকে খবর দেও, হিয়া আনে কহ দেও।—লোকটি চলিয়া গেল, কহিলেন—তিনি হয়ত পূজো-আজিকে ব’লে গিয়েছেন, ঠিক জানিনে, তা’ হ’লে কিন্তু

আমরা নিম্নলিখিত আশ্বিনের চ’লে আসতে হচ্ছে।

পল্লব কহিল—তাকে বুঝা কষ্ট দিলেন, আপনারা

এতে কোনই দোষ হবে না।—সে প্রহরীকে কহিল, তোমাদের অগ্নিসার সাহেবকে খবর দাও।—প্রহরী অস্থূলি সঙ্কেতে দেখাইয়া কহিল—সাহেব আস্তা হায়।

সাহেব বটে, তবে বাঙ্গালী সাহেব। প্রহরী সামরিক কাযদায় সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেবের পিছনে উজ্জল বর্ষিকা হস্তে ছইটা লোক। গোপাল তখনও ক্রমাল দিয়া মুগ্ধ, কানেক, নাকের ধূলা কাদা তুলিতেছিল, সাহেবের আগমন-বার্তা বোধ করি সে পায় নাই।

পুলি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া, নমস্কার করিয়া শুদ্ধ ইংরাজীতে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল; জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদের গন্তব্য স্থান এবং উদ্দেশ্যও কহিল। সাহেব হাসিলেন,

বলিলেন—কি মুগ্ধ। কয়খু যেতে হ’লে মোটর ছেড়ে দিয়ে হুঁমাইল বনের মাঝে পথ হাঁটতে হবে; শুনা যায়, বাঘ-ভালুকও আছে, সাপ-খোপ থাকাও অসম্ভব নয়। তার ওপর আপনারা পপ চেনেন না!

এই রাতিকাল! এ কি হাস্যহাস!

গোপাল স্তীর পানে যে ভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার অর্থ বৃদ্ধিতে পলির কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোন সময়ে কোন কারণে স্বাভাবিক মন্থরা নাষ্ট হইতে দিবে না, ইহাই তাহার জীবনের সর্বপ্রধান শিক্ষা।

আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মিঠে হারির দ্বারা স্বামীকে নীরবে একটু ভৎসনা করিয়া সাহেবকে বলিল—‘ফরেনার’ কি সকল দেশেই ক্ষমার মেগা নয় ?

সাহেব বলিলেন,—অবশ্য। আপনাদেরও ক্ষমা করা যায়, নরি আপনারা অন্তঃসারাজিটার মত এই পরীবে রক্তের নিবিড় যাপন করবার প্রতিক্রিয়া নেন।—

বর্ষিকাবাহীদের মধ্যে একজনকে কহিলেন,—মেম্ সাহেবকে খবর দেও, হিয়া আনে কহ দেও।—লোকটি চলিয়া গেল, কহিলেন—তিনি হয়ত পূজো-আজিকে ব’লে গিয়েছেন, ঠিক জানিনে, তা’ হ’লে কিন্তু

আমরা নিম্নলিখিত আশ্বিনের চ’লে আসতে হচ্ছে।

পল্লব কহিল—তাকে বুঝা কষ্ট দিলেন, আপনারা

নিম্নগত ঈশ্বর-অধঃস্থতী, ‘আমরা তা’ শিরোধার্য’ করে নিয়েছি।

—তা’ হ’লে গাড়ীটা একটু ব্যাক করে নিন, আমার ক্যাম্পের ফটক ঠেকে!—বলিয়া তিনি অস্থূলি-নির্দেশে ফটক দেখাইয়া দিলেন।

পলি আর গাড়ীতে উঠিল না; সে নিশ্চয়ই এই অপরিস্রুত লোকটির সঙ্গে ধীরে ধীরে গাড়ীর পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

—আপনারা কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলেন কবে ?

—আজই। পথে সময় নষ্ট বড় করিনি। আজ পূর্ণিমা-রাত্রি, চাঁদের আলোয় কয়খু ও রাজকুপা দেখার আস্তি।

গাড়ী ফটকে চুকিয়া পড়িল। সাহেব বলিলেন—সোজা চালিয়ে যান।

আলোকবাহী লোকটি দিগিয়া আদিত্য বলিল—মেম্ সাহেবকে কামরা বন্ধ রাখা, হুজুর।

—বা! বলেছি, তিনি পূজোব বসেছেন। চলতে চলতে কথা হইতেছিল। রক্তকরময় পথটি, ছই পার্শ্ব মন্থরা-প্রবী, মন্থরার কল পড়িয়া গাছ-তলা দাদা হইয়া গিয়াছে, স্রমিষ্ট গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

পাহের কঁকে কঁকে কীর্ণ জোৎস্না কখনও কখনও ইহাদের মুখে আসিয়া পড়িতেছে।

পল্লব জিজ্ঞাসিল—এ জায়গাটার নাম কি ?

—নাম বিশেষ কিছু না, একটা বনের স্তকট। কেটে কুটে সাফ করে আমরা ক্যাম্প বসিয়েছি।

টিকানা—ক্যাম্প, পোষ্টফিস রীতি, এই মাত্র।

—লোকজনের বাস আছে ?

—লোক আমাদের, জনও তাই। হুঁচার মাইলের মধ্যে আর কেউ না।

—আপনার কথা বলি না, কিন্তু আপনারা স্তীর এই নির্জনবাস কেনম লাগে ?

—মন্দ লাগে ব’লে ত মনে হয় না। আপনারা হ’লেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর জাতি, বনবাসে আপনারা ত চিরদিনই অভ্যস্ত।

পল্লব হাসিয়া বলিল—অস্বীকার করবার উপায় কি।

তাহারা ক্যাম্পের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একখানা ছোট টেবিল, চারি পার্শ্ব ছই তিনখানি চেয়ার পাতা ছিল। ক্যাম্প-স্বামী

চেয়ারগুলি দেখাইয়া বসিতে বলিয়া নিজেও বসিলেন; জিজ্ঞাসিলেন—একটু চা করুক, কি বলেন ?

পল্লব হাসিয়া বলিল—মন্দ কি ?

মুখের কথা বুঝাইতে হইল না, লোক চলিয়া গেল। সাহেব গোপালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমরা কেউ

কারও নাম জানি নে, তার জন্তে যতখানি অস্ববিধা হ’বার তা ত হচ্ছেই, সে অস্ববিধা এখনই মিটে যাবে’বন। তার আগে, আপনার মত একটা লোকের

মুখ আমার মনে পড়ে। আমি যখন তাকে শেখ দেখেছি, তার বয়স তখন দশ এগারো হবে। নাম ছিল, গোপাল; গোপালেরই মন্ত-শাস্ত্র হুবোষ বলক।

গোপাল জিজ্ঞাসিল—কোথায় দেখেছিলেন ?

—মথুরাপুরীতে।

মথুরাপুরী নামে কোন স্থান গোপালের, তত্ত স্ত্রী পল্লবের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে লিখিত ছিল না; উভয়েই

বিশ্বদ্রাশয় হইয়া চাহিয়া রহিল।

—কথটা একটু লম্বা। তা’ লম্বা করে আর কিই বা হবে। সেই যে গোপাল, সে-গোপালের সঙ্গে

আমার সখ্য ছিল, এখনও আছে, সখ্য নিকট ও মধুর।

গোপাল বলিল—কি রকম সখ্য ?

সাহেব হাসিয়া, গোটা ছই হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া অস্ত্রে অস্ত্রে বলিলেন—সেই গোপালের ভগ্নী আমার

অর্দ্ধাঙ্গিনী।

—আপনি কি সম্ভাষণবাস ?

—সম্ভাষণ নিশ্চয়ই, তবে বাবু কিংবা সাহেব, সেটা আমার বিবেচনা নয়।

—আমি সেই গোপাল।

ঠিক এই সময়ে ক্যাম্পের পর্দা সরাইয়া মেম্ সাহেব



বাহির হইলেন, সন্তোষ বলিলেন—নাজ্জ নারীর কৃপা, তা' সকলই জানে; আপাততঃ কৃপা তাগ কর' চলে এস, গোপাল শশুরের উপস্থিত।

—কে গোপাল?

—ভাই গোপাল।

—সত্যি?—বলিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। পরশে লাল পাড় গরদের শাড়ী, আঁচলটা গলায় জড়ানো, দেখিলেই মনে হয়, পুজার আসন ছাড়িয়াই আসিয়াছেন।

—কত বড় হয়েছিল, গোপাল?—দিকের চিনতে পারিস? কোন খোঁজ খবর ত রাখিস্ নে। তোর বো? বেশ বৌ ত গোপাল! বোয়ের নাম কি—

সন্তোষ কহিলেন—পাম, পাম, ঐ প্রপঞ্চলোর আগে জবাব নিয়ে নাও, তারপর আবার একদফা প্রশ্ন করো। বর গোপাল এক এক কর'—কত বড় হয়েছ?

গোপাল বলিল—বত বড় হওয়া সম্ভব। চিনতে পারার কথা না তোলাই ভাল; আর খোঁজ খবর? বরসে বড়, মস্তে বড় হ'য়ে দিদি যতটা রাখেন, গোপাল তার চেয়ে কম রাখে না। হা বৌ-ই বটে, ভূমি বেশ বলার ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই খুসী হয়েছ; বোয়ের নাম পল্লব, লোকে পলি ব'লে ডাকে।

সন্তোষ পল্লবের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমরা কি বলব, তাই বলুন!

—আমি কেন বলব, পল্লব হাসিয়া দিদির দিকে চাহিয়া, কথাগুলি বলিল।—আমি বড় ভোর এই বলতে পারি, বাই বলুন, আমার কাছে অপ্রীতিকর হবে না।

চা আসিল। পল্লব বলিল—দিদি বসবেন না? দিদি বলিলেন—বুড়া মাণ্ডি, আমি বাব চা?

সন্তোষ কহিলেন—বরদ যত বাড়ি, মোতাজের তত দরকার, পল্লব সম্ভবতঃ এই উত্তরই দেবে। পল্লব, ভূমি—ঐ বা, 'ভূমি' ব'লে ফেললাম, তা' হ'ক্, কি মিল—ভূমি দিদি তোমার ঐ দিদিটিকে স্বস্তি চায়ের মোতাজটা ধরিয়ে দিয়ে যেতে পার, আমি খুসী বই অশুখী হবে না। একলা ব'সে চা খাওয়া, আর জেলখানার ব'সে পাখর তাল্লা, প্রায় এক।

হাসি-গল্পের মধ্যে সভা জমিয়া উঠিতেছিল, দিদি বলিলেন—তোমরা কাপড়-চোপড় বদলাও, মুখ-হাত ধোও, আমার কাজ একটু বাকী আছে, সেয়ে আসছি।

উত্থাকে বাদ দিয়াই, তখন সভা চালাহিতে ইল।

৬

আহারাদির পর, আবার সেই মহাযতলার সভা বসিয়াছে। সন্তোষ বন্দুকটার ঘর পরীক্ষা করিতে করিতে বলিতেছিলেন—আজ কাল বাঘের দর্শন বড় পাওয়া যায় না, চারদিকে আলো, পাহারা—এসব তাঁদের বাঘ হয় বড়ই অসহন, এগুণ মাড়ান না, মাঝে মাঝে ভালুক ম'শার এসে মহাধা খেয়ে যান। ঐ যে সব মহাধা ফুল পড়েছে, গুড়লোর গুণর তাঁর ভারি টান। যেতে নিষ্ঠি, একটু নেশাও হয়, খেয়ে খেয়ে ভালুক ম'শার ভেঁদা ভেঁদা কর'ে ঘুমান প'ড়ে।

পল্লব জিজ্ঞাসা করিল—ভালুক কি মাংস খায়? —মারব ব'লে মারে না, আলিঙ্গন, মাংস আলিঙ্গনের চোটেই মারা যায়।

পল্লব বলিল—আপনি রাজকুপা গেছেন?

সন্তোষ বলিলেন—পাপমুখে মিথ্যা কথাই শোভা পায় বটে, তবে সত্যি বলতেও দোষ নেই; একবার খেললাম।

—জাখাটা নাকি ভারি স্থলর?

—কবিরা নিশ্চয়ই তাই বলবেন!

—আর অকবির কি নিশ্চয় করবেন?

—নিশ্চয় হয়ত করবেন না। তবে সেই পাখর, সেই জল, সেই বন,—বৈজ্ঞানিক হয়ত দেখতে নাও পেতে পারেন। আমার কাপোরে কাছেই একটি ঝরগা আছে, লোকে বলে, সেটো খুব স্থলর; আমি কিন্তু—

পল্লব সাগ্রহে কহিল—কতখুর সেটা?

—খুব কাছে, দশ মিনিট লাগে।

—এখন যাওয়া যায়?

—কেন যাবে না!

—চলুন, দেখে আসি।—গোপালকে বলিল, চলো না, সেয়ে আসি।

গোপাল আরাম কোনারায় স্টান পা ছড়াইয়া দিয়া বলিল—ইচ্ছে হয় ভূমি যাও, আমি এখন 'পাদমেক' ন গজ্ঞানি।

—আমি ত বাবই। এমন জোখা রাতে, এমন স্থানিখল আকাশ, এমন মনোমুগ্ধকর পার্শ্বতা প্রদেপ, তুয়ে প'ড়ে থেকে লাভ কি! চলুন সন্তোষ বাবু! দিদি কি আসবেন?

সন্তোষ বলিলেন—দাদারই দিদি ত! আসবেন ব'লে মনে হয় না।

—আমি একবার জিজ্ঞাসা কর'ে আসি।—বলিয়া পল্লব ক্যাপের ভিতর চলিয়া গেল। একমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দিদির এখনও মালা শেষ হয় নি।

—হবেও না, বলিয়া সন্তোষ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, চলা ঘুরে আসা দাক্। ওহে গোপাল, ভূমি আধখটোকা-বিরহ-লগণা ভোগ কর, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

গোপালের নাসিকা, গর্জন করিয়া সম্ভতি জ্ঞাপন করিল।

ফাল্গুই দুই সোজা রাস্তায় চলিয়া একটা অপ্রশস্ত পার্শ্বতা পথ ধরিতে ইল। পাখরগুলা এলোআলো ভাবে পড়িয়া আছে, তাহারই উপর দিয়া পথ। চলিতে চলিতে একটা অসমতল পাথরের উপর দাঁড়াইয়া পড়িয়া সন্তোষ বলিলেন—এই উঁচুনিচু পথে, রাস্তার বেলা, ভূমি কি পারবে চলতে?

পল্লবের ধমনীতে বালিকাঘরসের নবীন শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; বলিল—পারব।

—কিন্তু ওপাখর থেকে এটার কি আসতে পারবে? আমরা এককালে সাগুর লগ্নন করেছিলাম, আমরা পারলেও তোমাদের চারা তা' সম্ভব হবে না। এক কাজ কর, আমার হাতে হাত দাও।

পল্লব নিঃসঙ্কোচে সন্তোষের হাত ধরিল, সন্তোষ টুক করিয়া পার করাইয়া লইলেন। মোড় ফিরিয়া বে দৃষ্ট দেখা গেল, পল্লবের মনে ইল, না দেখিতে

পাইলে জীবন বুঝা হইরা বাইত। নির্ঘরটি কুদ্ব কিন্তু দুই দিকের জামল তরলতার মধ্য দিয়া, কৃষ্ণ প্রপঞ্চের উপর খেত বারিধারা নামিয়া আসিতেছে, জোখায়া দিগন্ত প্রাবিত করিতেছে, মনে ইহতেছে কে মনে পর্শতশিখরের কোন অদৃষ্ট হান হইতে তরলিত রৌপ্যধারা চলিয়া দিতেছে। নীচে যে স্থানে জল জমিয়া, আবার একটি হৃদয় পথ ধরিয়া সমতল ভূমির দিকে বাইতেছে, সেইখানকার জলে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতেছে। দুই জনে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষ বলিলেন—এস, এখানটার একটু বিল। তিনি ক্রমাল লইয়া ছইখানি পাখর মুছিয়া দিলেন। পল্লব ইহাই চাহিতেছিল। বসিয়া জলে হাত দিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল—কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল!

—স্বহাভেও খুব। খাবে একটু?—পকেট হইতে ছোট একটা স্ন্যাক বাহির করিয়া, এক স্ন্যাক জল খুসিয়া পল্লবের হাতে দিলেন। পান করিয়া পল্লব বলিল—আঃ, গলাটা বেন জুড়িয়ে গেল। এইবার আপনাকে একটু তুলে দিই।

সন্তোষ বলিলেন—দাও। পল্লব বলিল—স্বরণার শব্দটা ঠিক যেন কারার মত, নয়?

—আমার কাছে কিন্তু তা' মনে হয় না। আমার মনে হয়, ও যেন গুণ গুণ কর'ে গান গাইছে। এখন এর এই শীর্ণ রূপ দেখছেন, বাঙালীর ঘরের কিশোরীটি যেন, বর্ষাকালে এ পূর্ণবোবনা এগলভা নারী, সর্বাঙ্গে যৌবন ফেটে পড়েছে। তখন কি ভেঙ্গ, কি দর্প!

পল্লব বসিয়া এক মনে নিশ্চর গান গুনিতোছিল, কোন কথা বলিল না।

সন্তোষ বলিলেন—ওপাশ থেকে দেখলে গুর আর এক রূপ দেখা যায়; কিন্তু পথটা ভাল নয়, জুতো চলবে না।

পল্লব কহিল—জুতো খুলতে কতজন?—বলিতে



বলিতে সে জুতা বুলিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসিল—জুতা এখানেই থাক?

—থাক।

আবার উটনীচু পথে হাত ধরিয়া সন্তোষ সবরে তাহাকে টিলাটার অপর পার্শ্বে লইয়া গেলেন। স্বরগার জল হুস্ক একটু রেখাপাশ ধরিয়া কতদূর যে চাষিয়া গিয়াছে, তাহার যেন সীমা নাই। জোয়াং-লোকে সেই রেখাপাশটি কাপড়ের নীল পাড়ের মত দেখাইছে। মর্জালাকে এত সৌন্দর্যও যে ছদ্মন আছে, পল্লব তাহা বেন করনা করিতেও পারিতছিল না। কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেই জলরেখাটির পানে চাষিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। অসত্য। সন্তোষকেও বসিতে হইল।

সন্তোষ বলিলেন—রাত কিন্তু অনেক হয়েছে! পল্লব হাসিয়া বলিল—আপনার কষ্ট হচ্ছে বন্ধি? সন্তোষ হাসিয়া কহিলেন—আমার? তাই বটে!  
—জব্ব বহন চূপ ক'রে। আমি দেখি।  
—দেখ, ততক্ষণ আমি একটা সিগারেট খেয়ে নিই।  
—সেই ভাল। ওনেছি পুরুন্দর। তামাক পেলে বড়

সস্তর।

এক সময়ে পল্লব জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা এটা ত নদী?

সন্তোষ বলিলেন—সস্তর তাই!  
—বরাবর কি এই রকম ছোট?

—ভাই ত মনে হয়। অন্ততঃ পাহাড়ের ওপর ঐ রকম ছোটই, নীচে গিরে বড় হ'য়েও থাকতে পারে।

—ওর ধারে ধারে বদি যাওয়া যায়, কোথায় গিরে পড়েছে জানা যায় ত?

—জানা যাবারই ত কথা; তবে এ পর্যন্ত সে ইচ্ছা কেউ করে নি ব'লে জানা যায় নি। ভূমি যদি যাও, মীমাংসা হ'য়ে যেতেও পারে।

—আপনি সঙ্গে যাবেন ত?

সন্তোষ হাসিয়া গুণ গুণ করিয়া গাছিলেন—  
'পদ্ম-দ্বীপ আচ্ছা দিলে—'

পল্লব বলিল—আমি পদ্ম-দ্বীপও নই, আজ দেবার অমিকারও আমার নেই। আপনি যদি যান, আর দশা ক'রে আমার সঙ্গে নেন, আমি যেতে পারি। এর পরিণতি দেখে আসা যায়।

—কিন্তু সে কি ভাল লাগবে? একঘেরে ব'লে মনে হবে না? ধারে একটা গ্রাম পড়বে না, একটা শহর দেখা যাবে না, একখানা মোকা নেই, আর জল, তা'ও ঐ ছ'ইঞ্চি, কোথাও গভীর নয় যে রহস্যভূত ব'লে মনে হবে, সে কি ভাল লাগবে?

—তা' বটে!

সেদিন যখন তাহারা ক্যাম্পে ফিরিল, আকাশে চন্দ্র চলিয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে শয্যাভাগ করিয়া মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া পল্লব দেখিল, প্রশান্ত হাসিমুখে সন্তোষ বসিয়া আছেন। সন্তোষ চেয়ার ছাড়িয়া ঝাড়াইয়া উঠিয়া, জলপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন—তোমার জল্লেই ব'লে আছি। পাহাড়ের পাশ থেকে সূর্যোদয় দেখতে বড় সুন্দর।

—চন্দ্র, দেখি পে। একমিনিট, আমি নিপায়টা বললে আসি।

পথে বাহির হইয়া সন্তোষ বলিলেন—আমাদের এখানে এখনও সূর্যোদয় হয় নি, নীচে কিন্তু অনেকক্ষণ ধূম উঠেছেন। তার কারণ, চারদিকেই পাহাড় দেখছ ত! এই পর্বতশ্রেণী ভেদ ক'রে বেরতে তাঁর দেবী লাগে!

পল্লব বলিল—আমি তেবেছিলাম, আপনি এখনও ওঠেন নি; আপনাকে তুলব মনে করছিলাম। তুলে, কোন জায়গায় একটু বেড়িয়ে আসা যাবে, এই ভাবছিলাম। রাত্রে কতক্ষণই বা শুয়েছি, তা'ও ঘুম হয়নি। কেবল মনে হয়েছে কখন সন্ধ্যা হবে, কখন বেরব, কখন কিছু দেখব। জানেন ত,—

'পোয়া পাখী, পিঙ্গর বুলিলে  
চাহে পুনঃ পশিতে কাননে।'

তাহারা যে সময়ে পর্বতের সাহুদেগে উপস্থিত হইল, সেই সময়ে ঝগ করিয়া তরুণ অরুণ কোন্ কীকে যে বাহির হইয়া পড়িলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সমস্ত ভূমির সঙ্গে পার্থক্য এখানেই। সমস্ত ভূমিতে আমার কি দেখি? প্রভাতের আকাশে একটর পর একট বর্ণ বিকশিত হইতে থাকে, যখন স্বর্ষবর্ণ দাগণ করে, তাহার পরই সূর্যোদয়! এখানে তাহা নয়। অরুণ যেন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে কাহারও সহিত লুকাচুরি খেলিতেছিলেন, হঠাৎ এক সময়ে বুড়ী ছুঁইয়া নির্ভয় হইয়া প্রকাশ হইলেন!

পল্লব আনন্দে উজ্জ্বলিত হইয়া বলিয়া উঠিল—যে ক'দিন থাকব, এ দৃশ্য দেখব।

সোপানের তখনও অর্ধেক রাত্রি, পল্লব কিরিয়া আসিয়া অনেক ঠেলাঠুলি করিয়া তাহাকে জাগাইল। সোপাল বলিল—ছুটির দিনেও যে একটু ভাল ক'রে ঘুমব, তোমাদের জল্লে তারও বে! এই!

চায়ের টেবিলে সন্তোষ বলিলেন—খাওয়া দাওয়া সেরেই কিছু বেরতে হবে, নইলে কিরতে রাত হ'য়ে যাবে।

সোপাল ঝিমাহিতে ঝিমাহিতে প্রশ্ন করিল—  
দ্রাব্যটা নষ্ট করতে কোথায় যাওয়া হবে ভনি?

সন্তোষ বলিলেন—রাজকপা যাওয়ার কথা আছে না? পথে কয়খু? সেখানেই লাঞ্চ টা পাওয়া যাবে, ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে।

সোপাল বলিল—তোমার অফিস নেই?

—অফিস না থাকলে খাব কি রে, শালা! বাঙালীর অফিসও চিরন্তন, ফ্রেন্স গিল্ডও সমাজ। আজ সেই ব্যবস্থা।

পল্লব বলিল—সকলেই ত আর অফিসকে জপমালা করে না।

সোপাল হাসিয়া বোঁচাটা ভক্ষণ করিয়া কহিল—  
তা' যেন হ'ল, সেখানে কি আছে ভনতে পাই কি?

—রাজকপায় দামোদরের উৎপত্তি—ছিন্নমস্তার মন্দির—শব্দালদার অজ্ঞাতম পীঠস্থান।

সোপাল চক্ষু মুদ্রিয়া বলিল—মাথা খারাপ না হ'লে ঐ সব দেখবার জল্লে কেউই ত্রুপ্ত নষ্ট করতে রাবী হয় না। আমার মনে হয়, তোমাদের একবার কীকে ঘুরে আসা দরকার।

প'রটার মরিকটবস্ত্রী কীকে পল্লাতে মস্তক চিকিৎসালয় অথবা পাগলা গারদ প্রতিষ্ঠিত, ইহা হইতেই ঐ রহস্যের উৎপত্তি।

পল্লব বলিল—গুণব কথায় আপনি কান দেবেন না, মিঃ বোশু! দেখে ত আমি, পরে দরকার হয়, কীকে যাওয়া যাবে। বিশেষ এসে, যারা কিছু দেখে না, আর প'ড়ে প'ড়ে ঘুমেয়া, কীকে তাদের বেন না গা?

সোপাল মিট মিট হাসিতে লাগিল।

পল্লব বলিল—দিনি যাবেন ত?

সন্তোষ বলিলেন—সে গুড়ও বাগি। তিনি যাবেন কখন বল। এই মাত্র পূজোর ঘরে ঢুকলেন, বেরতে দেড়টা, ছটা হবে। যদ্দা ধানেক বাইরে থেকে আবার ঢুকতে হবে, বৈকালীর ব্যবস্থা করতে হবে।

পল্লব বলিল—তা' হ'লে আপনি আর আসি।

সন্তোষ বলিলেন—আর কেউ ঘি না জোটে। অবশ্য সকলেই welcome! এস ভাল, না এস, তাও ভাল।

সন্তোষ 'বয়'কে ডাইভারকে খবর দিয়া রাখিতে বলিলেন, পাড়ী একটার সময় রাজকপা যাইবে, সে বেন ভৈয়ার থাকে।

সোপাল গোটী কতক হাই জুড়িল, আড়মোড়া ভাঙ্গিল, তারপর সকলের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া গিয়া আবার শয্যা প্রবেশ করিল।

—আচ্ছা মিঃ বোশু, দিল্লির কি রোজ ঐ ব্যবস্থা?

—রোজ, ভাই, রোজ। তিন শ' পয়ষট্টিদিন।

পল্লব কিম্বৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—আপনি একলা একলা কি করেন?

—কি আর করব বল, ভাই! যতক্ষণ অফিসের কাজ-কর্ম থাকে, করি; তারপর অপর-ওপর; এপাশ-ওপাশ; শোয়া-বসা! বাস!



পল্লব ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—  
আমারও টিক ঐ দশা! সমস্ত দিন-রাত বাটার মধ্যে  
জান্না বেড়ে কাটাতে হয়।—বলিতে বলিতে পল্লবের  
দুদরের অন্ততল মখিত করিয়া আর একটি দীর্ঘ  
নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সন্তোষ আপন মনে বলিতে লাগিলেন— ভগবান  
তোমাদের অর্থাৎ দ্বীভাসিক পুরুষের অপেক্ষা  
অধিক মাত্রায় দৃষ্টি দান করছেন। তাই তোমার  
দৃষ্টি দেখলেন, এ লোকটা হাকিমি ক'রে প্রশ্ন তৈরিয়ে  
পাপই ক'রে চলেছে, স্বতরাং তিনি বির করলেন, এই  
পাপাচার সঙ্গে থেকে পাশে লিখ হওয়ার চেয়ে  
পরকালের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। আর এ-লোক  
বাগপায়ে চিত্তা কার্যে পরিণত করত দেবীও তোমাদের  
হয় না। কারণ পরকাল সম্বন্ধে তোমাদের চেতনা  
পুরুষদের চেয়ে তের বেশী। থাকলে ওদর বাজে কথা!  
এক হাত তাকে রাজী?

—হু'জনে? কি খেলা হবে?

—কিছু না হয় পিটোপিট ত হবে। অফিসটা যে  
কামাই করা গেল, তার একটা মর্যাদা আছে ত?

পল্লব সাগ্রহে কহিল—বেশ ত!

হু'হাং পিটোপিট খেলিয়া দেখা গেল, জমে না।

সন্তোষ বলিলেন—এস, কারাম খেলা যাক।

কারামে পল্লব 'মব্যাসাটা' বলিগেও চলে, ভায়েদের  
সঙ্গে খেলিয়া বেশিয়া এ-খেলায় সে বিশেষরূপ দক্ষতা  
অর্জন করিয়াছিল; বলিল—সেই ভাল।

ছুটির খটাট পূর্বে পার্শ্বের ক্যাম্পের পর্দা সরাইয়া  
গোপাল বাহির হইয়া আসিল, বলিল—না, একটু  
নিরিবিলি সাধনা করবার স্থানেরও অভাব হ'য়ে পড়ল  
দেখছি।

পল্লব বলিল—ছুটির দিনে যুম, এত অল্প শবে ভাঙে?  
গোপাল একটা কেরাদা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া  
কহিল—গেল ভেঙ্গে সে ত দেখতেই পাছ।

সন্তোষ বলিলেন—না হে গোপাল, অমন কুঁড়ের মত  
ব'লে থেকে। না, আর গানিক ঘুমোবার চেষ্টা করগে।

—না, দশটা বাজল, একেবারে ঘানাহার সেরে  
শোয়া যাবে 'খন।

—দশটা, তাইত! বলিয়া পল্লব তাড়াতড়ি খেলা  
ভাসিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল; বলিল—দান সেরে নিই  
গে, বারোটায় 'রেডি' হ'তে হবে ত?

—Latest মাডে বায়ো, বলিয়া সন্তোষ দিগারেট  
ধরাইলেন। পল্লব বাহির হইয়া গেল।

গোপাল ক্যাম্প খাটের উপর ভুইয়া এপাশ-ওপাশ  
করিতেছিল, পল্লব বেশবাস হুস্পন্দ করিয়া আসিয়া  
কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—তা' হ'লে যাই?

গোপাল তাহার পানে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া যেন  
তাহার আশা নিকিবেছিল না। পল্লব হুস্মদী, এ-সত্য  
তাহার চেয়ে বেশী অবগত কে ছিল? তবু তাহার মনে  
হইল, আজ যেন রূপসাগরে বান ডাকিয়াছে। গোপাল  
মৃদু করিয়া পল্লবের একশব্দা হাত ধরিয়া কেলিয়া  
কহিল—কোথায় যাবে এই রোদে? তার চেয়ে শুয়ে  
পড়—আরাম কর।

পল্লব শয্যায় বসিয়া কহিল—না ছিঃ! উনি প্রায়  
আধঘণ্টা 'রেডি' হ'য়ে ধাড়িয়ে রয়েছেন। ভূমিও কেন  
চলো না, লস্কীটি, চলো।

আজিকার কুস্তলচর্চা হইতে জুতাট পর্যন্ত  
গোপালের পর্যবেক্ষণের বস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,  
গোপাল দেখিতে দেখিতে বলিল—দিদিরও ইচ্ছে নয় যে,  
ভূমি যাও।

পল্লব সরস হইয়া উঠিয়া কহিল—দিদি ত পূজো-  
আলিক নিম্নেই বাস্ত, কে কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে তার  
খবর তিনি কি রাখবেন?

—ভূমি জিজ্ঞাসা ক'রে এস-না-হ'র দিদিকে।

পল্লব একমুহুর্ত নীরব থাকিয়া, কঠিন হইয়া কহিল,  
দিদিকে বলতে গেল কে? ভূমি?

গোপাল একবার আর জবাব দিল না।

পল্লব বলিল—আমি যাক্সি দিদির কাছে। তাঁর  
আপত্তিটা কি জেনে আসা দরকার।

—জনবে, আপত্তিটা কি?—বলিয়া গোপাল হাসিল।

—না। শুনেত হয়, তাঁর মুখে শুনে।

এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—পল্লব, এদেই  
মনো ভূমি তিন কোয়ার্টার দেবী ক'রে ফেলছে।

—আমি আসছি। বাহিরের দিকে চাহিয়া পল্লব  
এই কথা কয়টি বলিয়া নত হইয়া গোপালের বৃকের  
উপর মুখ রাখিয়া বলিল—জানি না, দিদির অমত কেন  
ও কিসের? জানবার চেষ্টা না করাই বোধ হয় ভাল।  
সে যাই হ'ক, ভূমি চলো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার  
এই একটি কথা রাখ।

গোপাল বলিল—দোড়-ক'প, ছুটোছুটি আমার ভাল  
লাগে না।

—কিন্তু আমার লাগে যে! আমার জীবনটা যে ঐ  
ক'রেই কেটেছিল গো! তোমার পায়ে পড়ি, ব্যগ্রতা  
করি, একটাবার একটি কথা আমার রাখ, আর কখনও  
তোমার কোন অহরোধ করব না।—পল্লব স্বরে  
জল ছলছল করিতেছিল, এরাপণ বলে পল্লব  
অশ্রুনিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল।

গোপাল বলিল—এমন হাতী-ঘোড়া কি আছে যে,  
না গেলেই নয়?

পল্লব অতিকণ্ঠে কহিল—মাহুয় কি হাতী-ঘোড়া  
দেখেই বেড়াই? তা' ছাড়া আর কোন আনন্দই তার  
নৈ?

গোপাল ওপাশ ফিরিতে ফিরিতে কহিল—আমি  
জানি নে, ইচ্ছে হয় যেতে পার। আমি ওদরের মধ্যে  
নৈই।

পল্লব নিম্নল মূর্তির মত মাটির পানে চাহিয়া  
চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোপাল তাহার দিকে  
চাহিয়া নাই মনে হইতেই ছুটই চকু ফাটিয়া হুস্মদর বারে  
অশ্রু বাহিরিয়া আসিল। ছই চোখের ছুটই দারা  
গণ্ড, গণ্ড হইতে চিকু ভাসাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া  
মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা  
হইতেছিল, ডাক ছাড়িয়া কাদে। আরও ইচ্ছা হইতে-  
ছিল, সে চলিয়া যায়। কাহারও কথা সে শুনিবে  
না। সারাটা জীবন সে কি অন্ধকারে আবদ্ধ থাকিতেই

জমাগ্রহণ করিয়াছিল? তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন  
মূল্যই কি নাই?

গোপাল ওদিকে গিরিয়া, চকু বৃষ্টিয়া পড়িয়াছিল,  
কহিল—যাবে ত যাও না, ব'লে রইলে কেন?  
পল্লবের রাগ চড়িয়া গেল। বলিল—বাইরে ত!  
বলিগেই যে পর্দা সরাইয়া বাহিরে আসিল। ক্রোধের  
আগুনে জল শুকাইয়া গিয়াছিল, দাগটা বরাবর  
মুছিয়া ফেলিল।

সন্তোষ কার্পেটের উপর পায়চারি করিতেছিলেন,  
নির্লিপ্তের মত বলিয়া উঠলেন—আজ তবে থাক  
পল্লব, বেলাও প্রায় প'ড়ে এল, আর—  
'আরটা' শেষ হ'লে না; পল্লব 'আর'এর  
শেখাশে শুনিবার জ্ঞ কিসংকাল অপেক্ষা করিয়া  
রহিল; তারপর দীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—যাবেন  
না?

সন্তোষ প্রশান্ত ও প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—না।  
বিশেষ, গোপালের বখন ইচ্ছে নেই, শুধন থাক।

পল্লব মাটির পানে চাহিয়া নিম্ন স্বরে কহিল—  
ওঁর অমতে বিশেষ আসত যে'ত না, দিদি অমত  
করাতেই সব গোল হ'য়ে গেল।

সন্তোষ আকাশ হইতে গড়িয়া বলিলেন—তাঁরও  
অমত! তা' হবে! তবে ত শোববোধ হ'য়ে গেল,  
পল্লব। ছড়িটা জুতার ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন—  
তা' হ'লে যাই, বাদর-সাকুগুলো খুগিলে।

তিনি চলিয়া বাইতেছিলেন, পল্লব ডাকিয়া  
বলিল—মিঃ বোদু!

কিরিয়া দাঁড়াইয়া সন্তোষ বলিলেন—বদুন।  
'ভূমি' যে 'আপনি'র রূপ পরিগ্রহ করিল, পল্লব  
তাহাও লক্ষ্য করিল।

—বাইরে চলুন, বলিয়া পল্লব নিজেই অগ্রসর হইল।  
বাহিরে আসিয়া অতি সন্নিবিষ্ট দাঁড়াইয়া বলিল—  
আপনি আমার কুল বৃন্দলেন না ত?

সন্তোষ হাসিয়া বলিলেন—না, পল্লব।  
পল্লব অশ্রুজ্ঞ কণ্ঠে কহিল—আমায় ক্ষমা



করেছেন বলুন? আপনার কাছ থেকে শুকখাতি না শুনে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না।

‘আপনি’ আবার ‘তুমি’ হইল।

—না, না, তোমার দোষ কি, পল্লব? তুমি কখনো আমাকে অপরাধী ক’রো না।

পল্লব যেন শুনে নাই অথবা হৃৎকের চাপে তাহার সর্বোচ্চ্রিয় অবশ হইয়া গিয়াছিল, বলিতে নাগিল—আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা’ আমি কি ক’রে বোঝাব আপনাকে! বিয়ের পর থেকে বেশ ত বন্ধ ছিলাম নিজের ঘরে; আমার বালা, আমার বৈশ্যের, আমার প্রথম যৌবন সেই বন্ধ ঘরের মধ্যেই সমাধি হইয়াছিল। এই ছ’দিন আপনার এখানে, আপনার আদরে, আপনার যত্নে আমার জীবনের সেই প্রথম দিনগুলি ফিরে পেয়েছিলাম! কিন্তু সে আমারই ভুল! বা’ সমাধিই তা’কে ফিরে পেতে যাওয়াই ভুল! আমাকে আপনি মাগ করুন, সন্তোষবাবু, আপনাকে অশান্তির মাগে ফেলে আমার হৃৎকের সীমা নেই, আমার একথা আপনি বিশ্বাস করুন।—সে আবার কাঁদিয়া কেলিল।

—আমি বিশ্বাস করেছি, পল্লব। নিজের মনের গতি দিয়েই বিশ্বাস করেছি। ঐ পূজো-পাঠ সন্ধ্যা-আখিকের তলে আমার জীবনকেও আমি বহুদিন গোর দিয়েছি। আমারও উচিত ছিল না সে পঙ্কোদ্ধার করতে যাওয়া।

পল্লব সন্তোষবাবুর কঠোর কাতরতা মধ্যে মধ্যে অহতব করিতেছিল, প্রত্যেকটি শব্দে যে দরদ করিতেছিল তাহা তাহার হৃৎককে মণিত করিতেছিল। এ প্রদর শেষ করিবার মানসে মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল—তা’ হ’লে বাই। বলুন, মনে হুংখ রাখবেন না?

সন্তোষ ক্রিষ্ট স্বরে কহিলেন—মাগ কর, পল্লব! অতবড় মিথোটা গলা দিয়ে বেরবে না। হুংখ থাকবেই, হয়ত আমারও থাকবে, হয়ত পরকালে এ হুংখের বোঝা নামাতে পারব!

পল্লব ত্রুটে জিজ্ঞাসা করিল—পরকালে কেন?

—শুনবে কেন?

—না, না, শুনব না, দয়া ক’রে শোনাবেন না! আপনার পায়ে পড়ি, শোনাবেন না—বলিয়া, কাঁদিয়া, রক্তাশ্রয় অস্থির হইয়া, বাণবিদ্ধা, হরিণীর মত পল্লব পলাইয়া গেল।



## প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাজারের ইতিহাস)

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উম্মটনাগর, বি-এ

(পূর্বোদ্যত)

৮। মার্হাটা ডিও ও মার্হাটা ডিও লেন

রবীন্দ্র ভৌসলার পুত্র জানকী ভৌসলা বহু-সংখ্যক মার্হাটা-ডিও লইয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেশে আক্রমণ করেন। মার্হাটা-সেন্তগণ ‘বঙ্গী’ নামে খ্যাত। বলেগর হইতে রাজমহল পর্যন্ত স্থান তাহার ভীষণ উৎপাত-পূর্বক সমভূমি করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার প্রথমতঃ হাবডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে মাগিবা, বালি, উত্তরপাড়া, তন্দকালী, জীরামপুর, হগলী, বৈঠি প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে বর্ধমান গিয়া দেখা দিল। এখানে তাহার রাজবাড়ী লুণ্ঠন-পূর্বক কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে উপদ্রব করিয়া তাহা চরিয়া ফেলিল। অবশেষে নদী-পার হইয়া তাহার মুরশিদাবাদে নবাবের নিকটে গিয়া চৌধ অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ চাহিয়া বসিল। শুধু তাহাই নহে। জগৎপেঠের (১) বাটা ও তাহার টাকশাল লুণ্ঠন করিয়া তাহার চারি কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যের সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইল। বর্গাদিগের নাম শুনিবোও অজাপি বাঙ্গালীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

পদ্মনদীর পশ্চিম-পারস্থ প্রজাগণ এবং কলিকাতায় বসিগুন্য ও অজ্ঞাত অধিবাসিসমূহ বর্গাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া ইংরাজদিগের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন নবাব আলিবর্দী খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন।

(১) যৎকোন জগৎপেঠের বিজ্ঞান ইথরা ছিল, এবং বর্গাদিগ তাহার প্রতি বিজ্ঞান ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা ‘রস-সাধন’ রচয়িতা ভাট্টী মহাশয়ের নিম্ন-লিখিত সমস্তা-পুণ্ড-কবিতা দেখিলেই বিদগ্ধ হইতে পারা যায়—

বাঙ্গালীরা ইংরাজদিগকে বলিলেন, ‘আমরা স্বয়ং অর্থব্যয় ও পরিশ্রম-পূর্বক বাগবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া এবং কলিকাতার পূর্বদিক দিয়া ভবানীপুর পর্যন্ত একটা খাত কাটাই দিতে প্রস্তত আছি। আপনারা এ বিষয়ে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আপনাদিগকে টাকাকড়ি দিতে হইবে না। খাত কাটাই কলিকাতা ঘেরিয়া ফেলিতে পারিলে বর্গাদিগ আর কলিকাতায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। আমাদেরিগেও তাহাদিগের, নিখাতন সঙ্ঘ করিতে হইবে না।’ ইহা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেব কহিলেন, ‘নবাব আলিবর্দী খাঁর অহমতি না পাইলে আমরা তোমাদিগকে খাত কাটিবার অহমতি দিতে পারি না।’ ইহা বলিয়াই তিনি খাত কাটিবার অহমতি-লাভের জন্ত নবাবকে বিশেষ অহরোধ করিয়া

সমস্তা—‘জগৎপেঠের কাছে সুবের কোথায়।’  
পুণ্ড—কি নবাব, কিবা রাজা, কিবা মহারাজ,  
কি আমানী, কি ধরানী, অথবা ইংরাজ,—  
যখন টাকার ঘাঁর হ’ত প্রয়োজন,  
পুঁথি উঠত মাথা উঠাই তখন,  
জগৎপেঠের কাছে তিনিই ঘাইখা  
ঐশ্বর্যবহি-পাঠ বিতেন লিখিলা।  
যাঁর হাথিরের সঙ্গে যবে বর্গাদিগ  
যোণার মুরশিদাবাদ করে আক্রমণ,  
জগৎপেঠের গতি তখন গুটিগ,  
চারি কোটি টাকা জোরে কাটাইয়া লইল।  
ইহা! যদি মুক্তা লোণা জগৎপেঠ আর,  
কতই বন্ধকী ছিল, কত অলঙ্কার,—  
এ সব গুটিয়া যবে বর্গাদিগ গেল,  
জগৎপেঠের মনে হুংখ নাহি হ’ল।  
হেসে হেসে বলে শেষে শেখ-সিদ্দীকী বুড়ী,  
চারি কোটি টাকা মোর চারি কড়া কড়ি।  
এ রস-সাধন তাই বলে হার হার,  
‘জগৎপেঠের কাছে সুবের কোথায়।’



একখনি পত্র লিখিলেন। আলিবর্দী ঐ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্গীদিগের হস্তে নিরতিশ্রম নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাষিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, “খাত কাটবার অসম্মতি দিলে কলিকাতা অনেকটা নিরাপদ হইবে। বিশেষতঃ বর্গীদিগের উপদ্রব-নিবারণ করিতে হইবে ইরাজেরাও আমাকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারিবেন।” নবাবের অসম্মতি আসিল। প্রেসিডেন্ট সাহেব কলিকাতাহ ও গঙ্গা-পারশ্ব লোকদিগকে খাত কাটবার অসম্মতি প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে, উক্ত খাত ২১ হাত অর্থাৎ ৩৩০ ফিট প্রশস্ত হইবে। বাঙ্গালীপন কাল-বিপণ্য না করিয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে খাত কাটিতে আরম্ভ করিলেন (১)। নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক গৃহস্থকে অন্ততঃ একটা করিয়া মজুর দিতে হইবে। কুমারটুলী-নিবাসী “রাজ-কমিশার” হুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক মজুর দিয়াছিলেন। তখন এক জন মজুর উদ্যাত পরিশ্রম করিয়া একটা পরস্য মাত্র মজুরী পাইত। তাহাতে তাহার খোরাকী চলিত। মুরশিদাবাদে নবাব-বাড়ীর রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, তৎকালে একজন ভোক্তাপুরী বলবান পুঙ্খ পাচ আনা মাত্র খরচ করিয়া একসময় কাল স্বাক্ষরে জীবিকানির্বাহ করিতে পারিত। সর্বস্বত্ব সাত মাইল খাত কাটবার কথা। ছয় মাসের মধ্যে তিন মাইল কাটা হইল। এরিকে বাগবাজার হইতে এবং ওদিকে গোবিন্দপুর হইতে খাত কাটা হইতে-ছিল। নন্দন-বাগানে গোবিন্দরাম মিত্রের এবং হালদী-বাগানে উমিচাঁদের স্বরমা প্রাসাদ ও উজান ছিল। তাহার তৎকালে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও ধনাঢ্য লোক। তাহার উভয়েই প্রেসিডেন্ট সাহেবকে

(১) “মার্শটা-ডিক্-নবমের জন্ত ইরাজেরা বাঙ্গালীদিগকে ৫০০০০ টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা এই টাকা ৩ মাসের মধ্যে ইরাজবিশিষ্ট পরিণামে করিয়াছিলেন।” *The Calcutta Municipal Gazette*, 1st. June, 1929

বলিলেন, “আমাদের বাগান-বাড়ী গড়ের মধ্যে রাখা হউক। গড়ের বাহিরে থাকিলে চোর ভাঙাতের উপদ্রবে আমাদের বাস করা অসম্ভব হইবে।” ইহা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেব হতুম্ব দিলেন যে, এই ছই জনের বাগান-বাড়ী গড়ের মধ্যে রাখিয়া একটু সুবিধা গিয়া যেন খাত কাটা হয়। এই সময় আলিবর্দী ঐর সহিত বর্গীদিগের সন্ধি হইল। বর্গীরা আর কলিকাতার দিকে আসিল না। অগত্যা আর খাত কাটবার প্রয়োজন হইল না। ইটালী-কর্ণারের নিকট হইতে দক্ষিণ-দিকে কিয়দংশ স্থান পর্যন্ত খাত কাটা বন্ধ রহিল। যে যে স্থানে খাত কাটা হইল, তাহা জলে পরিপূর্ণ হইল বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে নানা আবেক্ষনা-রাশি পড়িয়া খাতের জল দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিল। তখন শর্ড ওয়েলেসলি এদেশের গভর্ণর-জেনারেল। তিনি মার্শটা-ডিক্-বুজাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্ত বৃজাইয়া দেওয়া হয় নাই। তবে খাত কাটরা যে মাটি ছই পার্শ্ব পল্লত-প্রমাণ জমা হইয়াছিল, তাহাই চৌরস করিয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে Circular Road নির্মাণ করা হইল। এখন আমরা যে স্থানকে “গড়পার” বলি তাহা গড়ের (মার্শটা-ডিক্-র) পারে (বাহিরে) ছিল বলিয়া তাহার নাম “গড়পার” হইয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সাহেব ও বিবিগণ এই সারুকার রোডে প্রত্যেককালে বায়ু-দ্রবন করিতে আসিতেন।

কিরূপে মার্শটা-ডিক্- (বর্গীর খাত) খনিত হইয়াছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত সমস্ত-পুঙ্খ কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। একদা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্র স্বীয় সভাপতিত্ব রস-সাগর কৃষ্ণকায় ভাঙী মহাশয়কে “বর্গীর খাত” সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত সমস্তাটা পুঙ্খ করিতে দিয়াছিলেন। তদনুসারে রস-সাগর মহাশয় এই সমস্তা পুঙ্খ করিয়াছিলেন—

সমস্তা—“অত্যাধি বর্গীর খাত রহে বিভ্রমণা।  
পুঙ্খ—কি কাও মহোদয়ালি হায়ে কাটোয়ায়,  
শুনিলেই বাঙ্গালীর বুক ফেটে যায়।

কাটোয়ায় ছিল এক শত্ৰুর ভাণ্ডার,  
অগ্নি দিয়া বর্গীগণ করে ছারখার।

বাহা কিছু প্রজ্ঞানের ছিল টাকা-কড়ি,  
লুটীয়া লইল সব করি' ভড়াহড়ি।  
ভাণ্ডার বর্গীর ভয়ে যত প্রজ্ঞাগণ  
মাটার ভিতরে পুঁতে রেখে দিল ধন।  
কাল হাড়ি ছাঁদা করি' মাথায় লইয়া  
প্রাণভয়ে জলে যায় ব্যাকুল হইয়া।  
মুক্তিকার গর্ভ করি' ল'য়ে ছাঁদা টোকা  
আশ্রয় লইল সবে দিয়া মাথা ঢাকা।  
কোম্পানীর রূপাবে কত শত জন  
ধন মান প্রাণ রক্ষা করিল তখন।  
গঙ্গার পশ্চিম পারে অধিবাসি-চর  
প্রাণভয়ে নিল কলিকাতায় আশ্রয়।  
আলিবর্দী-নবাবের লইয়া সম্মতি,  
নিরমিলা গড়-খাত ইরাজ হুমতি।  
বাগ-বাজার ভিতরে খাত আরম্ভ করিলা,  
ছয় মাসে দেড় কোশ প্রশস্ত হইল।  
করিল দেশের লোক কিবা পরিশ্রম,  
এক এক বিশ্বাসী ব'লে হ'ল ভ্রম।  
বর্গী-কান্দারের এক প্রধান প্রমাণ,  
“অত্যাধি বর্গীর খাত রহে বিভ্রমণা”।

মার্শটা-ডিক্-নবমের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।  
কলিকাতা মিউনিপ্যালিটি দেখিলেন, মার্শটা-ডিক্-  
ক্রমশঃ বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাহার জল  
এক পঙ্খিল ও অস্বাস্থ্যকর হইতেছে যে, ইহা নানাবিধ  
হুতিকিৎসা রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিতেছে।  
বর্ষাকালে কত শত জন্তুর মৃতদেহ তাহাতে পড়িয়া চতুর্দিক  
দুর্গন্ধময় করিতেছে। এই হেতু, মিউনিপ্যালিটি  
এই বৃজাইয়া ফেলিবার আদেশ দেন। বৃজাইয়া রাস্তা  
প্রস্তুত হইল; এবং ইহার নাম হইল, “মার্শটা-  
ডিক্-লেন।” ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই বোধ হয় এই নাম  
হইয়াছে।

৯। বাগবাজারে যুদ্ধ

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালা, বিহার  
ও উড়িষ্যা নবাব আলিবর্দী ঐ উদীর-রোপে  
প্রাণত্যাগ করেন। তাহার তিনটা কন্যা ছিলেন,—  
যেসেটা বেগম, ময়নামা বেগম ও আমিনা বেগম।  
যেসেটা বেগমের সন্তান ছিল না। আমিনা বেগমের  
তিনটা পুত্র ছিলেন,— সিরাজ-উদ্দৌলা, একরাম-  
উদ্দৌলা ও মির্জা মাদী। যেসেটা বেগমের সন্তান  
না থাকায় তিনি একরাম-উদ্দৌলাকে পোষ্য-  
পুত্র লইয়াছিলেন। যেসেটার স্বামীর নাম নিবাইস  
মহম্মদ। আলিবর্দীর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাহার জ্যেষ্ঠ  
জামাতা নিবাইস মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছিল। বৈষ্ণব  
বংশীয় রাজা রাজবল্লভ (১) আলিবর্দীর সমুদ্র-ইহতে  
ঢাকায় নৌ-বিভাগের শাসন-কর্ত্তা ও নিবাইস মহম্মদের  
নামের ছিলেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে  
তিনি সিরাজের ভয়ে আদর্শন কর ও প্রাণ নিষ্পাদ  
নহে, মনে করিয়া ঝুল কৃষ্ণবল্লভকে স্বীয় প্রচুর ধন  
ও বহুগুণ্য সুবর্ণি সহ কলিকাতায় ইরাজদিগের  
স্বায়ত্রে পঠাইয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার  
নাম কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণবল্লভ গর্ভবতী রীকে সঙ্গে লইয়া  
৬ পরদিন যাইবার ছলে ঢাকা ত্যাগ করিয়া ১০ মার্চ

(১) আলিবর্দী ঐ সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালার  
ইতিহাসে ব্রহ্মজ রাজবল্লভের নাম অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়।  
একজন বেঙ্গ ও আর একজন কান্দার। যিনি ঢাকায় নৌ-  
বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বেঙ্গ ও তাহার উত্তারি “সেনা”  
পানালীর ভিতরে তাহার স্বরমা প্রাসাদ ও বসন্ত ছিল। কান-  
প্রাসাদে তাহা পঞ্চাশত বিঘার জগতায় এই স্থানে পানালীর নাম  
“সীতানন্দা” হইয়াছে। এখানে এই আলোচনা “রাজবল্লভ”  
বেঙ্গ-জাতীয়। নবাব মীরকাসিম ই হাকে ও ইহার পুত্র  
সুন্দরভক্তকে শাসন বাহির বর্গা বর্গীরা ও সেনের-দুর্গ হইতে পলায়  
নিকশ করিয়া বুজাইয়া দিয়াছিলেন। আর একজন “রাজবল্লভ”  
কায়দা। ইহার উপাধি “সেনা”। তিনি কানকীরানের পোষ  
ও ছত্র-ভরাসের পুত্র। বাঙ্গালাবাসে যে “রাজবল্লভ-স্ট্রট” আছে,  
ইনি সেই রাজবল্লভ। জানকীরাম আলিবর্দীর শপকে বর্গীগণের  
সহিত এবং জল-ভরান পানালীর যুদ্ধে সিরাজের শপকে বর্গীগণের  
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানীর “রায়রায়াল” (king of kings) হইয়াছিলেন।



তারিখে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশিবার সময় কৃষ্ণবল্লভ কাশিমবাজারের কুঠার অধ্যক্ষ গুয়াট্‌স্‌-সাহেবের নিকট হইতে ড্রেক-সাহেবের নামে একখানি স্থপারিস্পন্ন আনিয়াছিলেন। ড্রেক-সাহেব তখন বাগেখার বাহু-পরিবর্তনের নিমিত্ত মিথ্যাছিলেন, এবং তাঁহার স্বামে মানিহাম-সাহেব কার্য্য করিতেছিলেন। কৃষ্ণবল্লভ আসিয়া উমিচাঁদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা বলেন, কৃষ্ণবল্লভের অতুল ধন-সম্পত্তি আশ্বাস্য করিবার নিমিত্তই উমিচাঁদ তাঁহাকে সাদরে আশ্রয়মান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবল্লভকে ধন-সম্পত্তি সহ মুরশিদাবাদে ফেরৎ পাঠাইবার নিমিত্ত সিরাজ ক্রোধান্বিত ইংরাজদিগকে পক্ষ দেখেন। ক্রাইভ, গুয়াট্‌স্‌-সাহেবকে এই মর্মে পত্র লিখিত্বছিলেন যে, আমি বরং কৃষ্ণবল্লভকে ধন-সম্পত্তি সহ নবাবের নিকটে ফেরৎ পাঠাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার বাটার ব্রীলোকদিগকে কিছুতেই ফেরৎ পাঠাইতে পারি না। এই কথা ক্রাইভের মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। গুয়াট্‌স্‌-সাহেব সিরাজকে এই কথা জানাইবা মাত্র সিরাজ কোষে অশিশু হইয়া উঠিলেন। ইংরাজদের প্রতি সিরাজের ভাতক্রোধের ইহাই প্রথম কারণ।

ইংরাজদের প্রতি সিরাজের ভাতক্রোধের দ্বিতীয় কারণ এই—উমিচাঁদের আশীষ রাজারাম-নামক একটা লোক সিরাজের প্রধান চর ছিলেন। সিরাজ কিছু পুঙ্খই রাজারামের মূখ্য জনিয়াছিলেন, ইংরাজেরা কলিকাতায় দুইটা নতুন চর নির্মাণ করিয়াছেন, এবং পুরাতন চরের সংস্কার করিতেছেন। ইহা সভ্য কি না, তাহা জানিবার জন্ত সিরাজ রাজারামকে আদেশ দেন। রাজারাম নিজ সহোদর নারায়ণ দাসকে এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত কলিকাতায় পাঠায়। নারায়ণ দাস হুগলী পর্য্যন্ত আসিয়া গুনিলেন যে, সিরাজের লোক কলিকাতায় বাইলে ইংরাজগণ-কর্তৃক হৃত হইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নবাব-প্রাণর একখানি চিঠি ছিল। ইহা ড্রেক-সাহেবের নামে লিখিত। ইহাতে সিরাজ লিখিয়াছিলেন, “তোমরা পত্র-পাঠ-মাত্র

কৃষ্ণবল্লভকে তাহার ধন-সম্পত্তি ও ব্রীলোকগণ সহ পাঠাইয়া দিবে।” নারায়ণ দাস উমিচাঁদের বাটতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, কারণ উভয়েই পরস্পর আশীষ। ড্রেক-সাহেব সেদিন বারাসতে গিয়াছিলেন। একজন উমিচাঁদ, নারায়ণ দাসকে সঙ্গে লইয়া হলুয়েল ও গিয়াবিস্‌-সাহেবের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে সিরাজের পত্রখানি দিলেন। তাহারা পত্রখানি হইলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে উমিচাঁদ ও নারায়ণ দাস পুনর্বার ড্রেক-সাহেবের নিকটে যখন করেন। তখন ড্রেক, মানিহাম ও হলুয়েল-সাহেব, পত্রখানি লওয়া উচিত কি না, এবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। শেষে তাহারা স্থির করিলেন, পত্র লওয়া হইবে না, ইহা এখনই ফেরৎ দেওয়া উচিত। ড্রেক-সাহেব হতুঃম দিলেন যে, এখনই নারায়ণ দাসকে কলিকাতা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক। ড্রেক-সাহেবের হতুঃম নারায়ণ দাসকে নানারূপে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিয়া কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। নারায়ণ দাস সিরাজের একজন বিশ্বস্ত চর। তিনি ইংরাজদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। গোপনে মুনসীর কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া তিনি বাগবাটজায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পেরিন-সাহেবের বাগানের উপর একটা আট-কোণা ঘর নির্মিত রহিয়াছে, এবং তাহার উপরি-ভাগে প্রব্রীহ সমস্ত পাথরা নিজেছে। তৎপরে গঙ্গার উপর দিয়া উত্তর দিকে বাইতে বাইতে দেখিলেন, চিংপুর নবাব-শাটীর কিয়দূর উত্তরে কাশীপুর-নামক স্থানে আরও একটা আট-কোণা কেল্লা নির্মিত রহিয়াছে। এই কেল্লার নাম Kelsall House বা Kashipur House (১)। এই বাড়ীখানি এখনও বিদ্যমান। নারায়ণ দাস মুরশিদাবাদে গিয়া সিরাজকে জানাইলেন যে, ইংরাজেরা দুইটা কেল্লা

(১) এই বাড়ীখানি ইতিহাস-শ্রবীক্ষ। বাগবাটার ঘাসের উপর দিয়া রাসদানের বাইতে হইলে মনে কাশীপুর পড়। এই কাশীপুর ১৮তম শতাব্দীতে যে ছিল, তাহার উত্তর-দিকে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত একটা ডাক বাড়ী আছে। ১৮৮০

নির্মাণ করিয়াছেন,—একটা বাগবাটজায়ে ও আর একটা কাশীপুরে। ইহা শুনিয়াই সিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া ড্রেক-সাহেবকে পত্র লিখিলেন, “তোমরা এখনই এই দুইটা কেল্লা ভাঙ্গিয়া ফেল, নচেৎ আমি শীঘ্রই গিয়া কলিকাতা-আক্রমণ করিব।” প্রথমতঃ সিরাজ কাশিমবাজারের কুঠী আক্রমণ করিয়া তাহা একপ্রকার ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা-আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

ইংরাজেরা সিরাজের আগমন-বার্তা শুনিয়া আপনাদের কিরণ গোশা-গুলি, কামান ও রসদ আছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১১ জুন তারিখে গভর্নর ড্রেক-সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন, ইউরোপীয়, আর্মিনিয়ান ও ফিরিঙ্গি সৈন্ত লইয়া সর্ব্বসম্মত তাঁহাদের ৫১৫ জন যোদ্ধা আছে। তাহারা নামে যোদ্ধা,—জীবনে একদিনও বন্দুক ধরেন নাই। কর্ণেল স্কট-সাহেব, অগ্নি-আহবেদকে লিখিয়াছিলেন, কলিকাতা রক্ষা করিতে এক হাজার লোকের অধিক লাগে না।

খৃষ্টাব্দে আসিয়া দেখিবারি যে, এই রাজ্যটির উত্তর পার্শ্ব বড় বড় নদীরা আঁড়াইয়া ছিল। এখন তাহা আর নাই। এই রাজ্য বহিরা পশ্চিম-দিকে আইলেই একটা সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ দেখা যায়। ইহা টিক পলাতীয়ে অবস্থিত। এই প্রাঙ্গণে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কল্টারী কেল্লা (Kelsall) নামক একজন সাহেব একখানি বাগান ও একটা আটকোণা বাড়ী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইহা ভয় ও ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কেল্লাপাশ-সাহেব ইহার পুনঃ পুনঃ করাইলেন। সিরাজ-উল্লাহ-র প্রবাস চর রাজারামের সহোদর নারায়ণ দাস এই আটকোণা বাড়ীখানিকে কেল্লা বদল করিয়া সিরাজকে তাহা বলিয়া মিথ্যাছিলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় বাট কেল্লা হুজির-কোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া এই বাড়ীখানি কেল্লাপাশ-সাহেবের নিকটে হইতে স্বয়ং করিয়া ইহাতে বাস করিতে থাকেন। কোর্স এই বাড়ীতে একটা সুবৃহৎ লাইব্রেরী করাইলেন। এই কাশীপুরের বাড়ী হইতেই তিনি মহারাজ নবম-মহারাজ কামির কারোবর সম্বৎ-১৮৫০-এ বাইতেন। এমন যেখানে ভ্রমশূন্যের জগতাব্যবহার আছে, সেখানে তাঁহার একখানি বাগান-বাড়ী ছিল। কোর্স-সাহেব, ডিউর জন্মল, গোডামিন, সুগুয়েল ও স্ত্রী জোহাভা সেনের পুত্র বহু ছিলেন। কলিকাতায় আশিবার

Hill সাহেব মহাশয় লিখিয়াছেন (২), “ইংরাজেরা সৈন্ত-সরিবেশ করিবার একজন বন্দোবস্ত করিলেন। বর্তমান রাইচাম-বিল্ডিঙের পূর্ব্বদিকে “কোন্ট হাউসের” নিকটে এক সারি কামান বসান হইল। স্কটন ও হলুয়েল-সাহেব ইহার অধ্যক্ষ রহিলেন। সেখানে ৯৮ জন সৈন্ত রক্ষিত হইল। দক্ষিণ দিকে এক সারি কামান বসান হইল, এবং ৯৮ জন সৈন্তও সেখানে রাখা হইল। বুকানন ও ম্যাকটে সাহেব এখানে কর্তব্য করিতে লাগিলেন। উত্তর দিকে যে সৈন্ত কামান বসান ও ৬৬ জন সৈন্ত রাখা হইল, দিখ ও মেন্‌লুট-সাহেব তাহাদের তদারক করিতে লাগিলেন। পুরাতন কেল্লা তদারক করিবার নিমিত্ত মিন্টিন ও বেলানী সাহেব-দ্বয় নিযুক্ত রহিলেন। বাগবাটজায়ে পেরিন-সাহেবের বাগানের উপরি যে নতুন কেল্লা নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে এন্সাইন্স পিকার্ডিঙের ২৫ জন মাত্র সৈন্ত লইয়া তাহা রক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমই সিরাজের সেনাপতি মীরজাদার বাগবাটজায়ে আক্রমণ করিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া বর্তমান অঙ্গুষ্ঠা-বাটের নিকটে গঙ্গার

সময় কোর্স, ডিউর জন্মলের নিকট হইতে একখানি পরিচয়পত্র (Letter of introduction) আনিয়া চাকরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রব্রীহ করিয়া কলিতে আসিলে জন্মল, সুগুয়েলকে বসিয়াছিলেন, “Chambers, you find is gone far, and poor Goldsmith is gone much further”। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ফিল্ড-মুনসীর কোর্স তাঁহার বহুলা লাইব্রেরী একজন টাকা মূল্যে বার্লিন লাইব্রেরীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে কোর্সের বাগান-বাড়ীখানি “কেল্লাপাশ ও গোশা কেল্লাপাশ” বদল করেন। ইহার কতক কলসের গাছ লরেন্স পিল (Sir Lawrence Peel) এই বাড়ীতে গাছ করিলেন। সর্ব্বমুখে ডি-এল রিচার্ডসন (D. L. Richard) এই বাড়ীতে ১০০ টাকা ভাড়া দিয়া বাস করিয়া পটোলাভারায় হিন্দু-কলসের পড়াইতে বাইতেন। লর্ড কার্ভান বাগানের এই বাড়ীর সমুখ একখানি পিক্ত-ফলকে লিখিয়া রাখাযাই, “This house was the residence of Sir Robert Chambers, Chief Justice of the Supreme Court, Calcutta, 1791-1798”। এমন এই বাড়ীর নাম “শ্রীমদে বাগান বাড়ী”।

(২) Hill's Bengal in 1756-1757, P. lxxiii, 141



উপরি-ভাগে তিনখানি যুদ্ধের জাহাজ রক্ষিত হইল। প্রথমখানির নাম Prince George, হেগ-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন; দ্বিতীয়খানির নাম Fortune, কামবেল-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন; এবং তৃতীয় খানির নাম Chance, চামশিয়ন-সাহেব ইহার ক্যাপ্টেন রহিলেন। আরও বন্দোবস্ত রহিল যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্রাগ-সাহেব ২০ জন সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। যাহারা কামান ছুড়িবার জন্ত লব্ধ নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। কুলীগণ পাছ ভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যায়, এই ভেদে তাহাদিগেরও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইল। ইংরাজদিগের এই ছুতাবনা রহিল যে, তাহাদিগের কামান ও গোলাগুলি অতি অল্প। যাহা কিছু বাকস ছিল, তাহাও ভিজা অর্থাৎ জ্বাংসেতে। পুরাতন কোয়ার ভিত্তর অধিক লোক থাকার ভিজা বাকসগুলি রোড়ে শুকাইয়া লইবার স্থান ছিল না। আরও বন্দোবস্ত রহিল যে, ইংরাজ স্রীলোকগণ কামানে বারুদ চাসিয়া দিবেন। কলিকাতার উত্তর-দিশ্বে বর্তী বাঙ্গালীদিগকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করা হইল না। কেবল বলিয়া দেওয়া হইল, তাহারা স্বয়ং আত্মরক্ষা করিবে এবং রাত্তা সকল বড় বড় গাছ কাটিয়া তাহা ধরা বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীগণ আমাদের প্রজা; সুতরাং তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহারা পূর্বে হইতেই ধন-সম্পত্তি ও প্রাণ-পুত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই স্থলে মনে রাখা উচিত যে, সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ, কুমারতুলী-নিবাসী সহর-কোতোয়াল পোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই সময়ে আপনাব লাঠিয়াল, সড়কীদার, বরকন্দাজ লইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় বড় বড় গাছ কাটাইয়া আনিয়া চিৎপুর-রোডের উপর পাহাড়ের মত তৃপাকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সে সময়ের পূর্বেই

পোবিন্দরাম মিত্র ৩সিদ্ধেশ্বরী-মূর্তি, নবরত্ন এবং ঘোড়-বাঁশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩সিদ্ধেশ্বরী দেবীও পশ্চিম-দিকে পাঠকগণ যে একটি রূহৎ মন্দির দেখিতে পান, তাহা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পোবিন্দরাম মিত্র নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল "নবরত্ন"। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের জীষ্ম মাসে তাহার রূহৎ রত্নটি পড়িয়া যায়। বর্তমান অন্তঃকোণী মহামেট অপেক্ষাও ইহা উচ্চরত্ন ছিল।

১৩ জুন দিবসে গঙ্গার উপরে একখানি নৌকা ধরা পড়িল। ড্রেক-সাহেব লুণ্ঠন দিয়াছিলেন, যাহার প্রতি মনেই হইবে, তাহাকেই যেন গ্রেপ্তার করা হয়। নৌকার দাঁড়ি-মাথাকে ধ্বংস করায় তাহারা বলিল, "এই নৌকার ভিতরে দুইখানি চিঠি আছে। যেদিনী-পুরের মেজদার ও সিরাজের প্রধান চর রাজারাম এই দুইখানি চিঠি উন্মিটাদকে দিয়াছেন।" রাজারাম বৈবাহিক স্থলে উন্মিটাদের-কুণ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি এই চিঠিতে উন্মিটাদকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, "নবাব কলিকাতা-শাসকগণ করিতে বাইতেছেন। আপনি বিশেষ সাবধান থাকিবেন। আপনার স্থানবৎ বস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবেন এবং আমারও স্নিহনস্বপ্ন কলিকাতায় না রাখিয়া তাহা আমাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন।" চিঠিগুলি পাঠাইয়া ভাষায় লেখা ছিল দেখিয়া ড্রেক-সাহেব উন্মিটাদের প্রতি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নাহে,—ড্রেক-সাহেব তাহাকে পুরাতন কোয়ারমধ্যে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে উন্মিটাদের সখী হুস্বীমল হালদী-বাগানে উন্মিটাদের বাটীতে এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি বাটার চাকরদিগকে বলিলেন, "যে সকল সাহেব আমাদের গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, যোমরা তাহাদিগকে গুলি কর"। হুস্বীমল গ্রেপ্তার হইবার পূর্বেই আপনাব বাম হস্তখানি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। জগন্নাথ সিংহ নামক একটা লোক উন্মিটাদের প্রদান তৃত্য ছিল। বাটার স্রীলোকগণ জগন্নাথকে বলিলেন, "তুমি আমাদের জন্ত চিতা প্রস্তুত কর।

আমরা সকলেই অধি-কৃত্তেও কাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিব।" উন্মিটাদের বাটার ১৩তী স্রীলোকের এবং ৩তী বালক-বালিকার মন্তক সহজে কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহজে আপনাব গলায় তলোয়ার দিয়া আঘাত করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না। মহাশয় হলওয়েল সাহেব ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জগন্নাথের গলায় ব্যান্ডেজ বান্ধিয়া ও চিকিৎসা করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণবস্ত্র পরাইবার চেষ্টা করিলে হলওয়েল সাহেব তাহাকে কোয়ার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের কথা একদম বলা হইল; এমন সিরাজের সৈন্যগণ মীরজাদকে কি করিলেন, তাহাও বলা উচিত। চিৎপুর, কাশীপুর, পাইকপাড়, বরাহমণ্ডর ও টালায় নবাবের সৈন্য তাঁহু ফেলিয়া বসিল। হিল সাহেব মহাশয় বলেন, "তাহাদের সংখ্যা ৩০,০০০ হইতে ৫০,০০০ এর মধ্যে। সঙ্গে ১৫০ হস্তী ছিল এবং কামান ছুড়িবার জন্ত ২৫ জন ইউরোপীয় ও ২০০ ফিরঙ্গী পটুগিজ ছিল।"

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন (১৭৫৬ বঙ্গাব্দে ৬ আষাঢ় বুধবার) সিরাজ উদ্দিন হুস্বীমল বসিল। ১২তীর সময় চিৎপুরের দিক হইতে বজ্রধনির স্তর কামানের ঘন ঘন ভীষণ গর্জন শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্বে বলিয়াছি, বাগবাাজারে যে ৮-ঘর সাহেবের বাস ছিল, তাঁহার আঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করিলেন। যে কয়েক ঘর বাঙ্গালী ছিলেন, তাহারা স্বীয় স্বীয় ধন-সম্পত্তি লইয়া কোথায় চাশিয়া গেলেন, তাহা বলা যায় না। কলিকাতার অবিকাশে বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ গঙ্গার পশ্চিম-পারে ও অজান্তে স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রথমতঃ বাগবাাজারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। তৎকালে চিৎপুরের দিক হইতে উপরিভাগে একটা draw-bridge (টানা সঁকে) ছিল। মনে করিলে ইংরাজেরা এই ব্রিজ গুলিয়া দিতে ও বন্ধ করিতে পারিতেন।

বেলা ১টা বাজিল। নবাব-সৈন্য বাগবাাজার-জগন্নাথ বাটীতে আগুন ধরাইয়া দিলেন, এবং উন্মিটাদের বাটার ১৩তী স্রীলোকের এবং ৩তী বালক-বালিকার মন্তক সহজে কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহজে আপনাব গলায় তলোয়ার দিয়া আঘাত করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না। মহাশয় হলওয়েল সাহেব ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জগন্নাথের গলায় ব্যান্ডেজ বান্ধিয়া ও চিকিৎসা করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণবস্ত্র পরাইবার চেষ্টা করিলে হলওয়েল সাহেব তাহাকে কোয়ার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এখানে এনসাইন্ড পিকার্ড-সাহেব এই কল্পনা রক্ষা করিতেছিলেন। স্কেটচম্যান ব্রাগ, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত ২৩তী কামান ও ৫০ জন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব-সৈন্যের পরাজয় হুতি হইল। কয়েক জন ইংরাজ নিহত হইলেন। হাহাখে ও স্থলে পাকিয়া বাহারা যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ পশ্চত প্রাণ হইলেন। দমদমা রোডের নিকটে Cow Cross নামক একটা স্থান আছে। (১) নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এই স্থান হইতে আসিয়া ও মার্হাটা-ডিচ পার হইয়া ১৫ই জুন শুক্রবার দিবসে দ্বিতীয় সহাব্দর একরাম-উদ্দৌলার সহিত কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১০০০ লুণ্ঠনকারী লোক ছিল। তিনি হালদী-বাগানে উন্মিটাদের হস্তম্বা ও হস্তবৃত্ত প্রদানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১৫৫৩ হাতী আসিয়াছিল। যে স্থানে তাহারা থাকিত, সেই স্থান অত্মপিত "হাতীর বাগান" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। বাগবাাজারের মধ্যে সিরাজের সেনাপতি মীরজাদকে প্রবেশিত হইয়া দমদমা-রোড দিয়া লাল-বাজারে প্রবেশ করিলেন। কামান ইংকল-হাঙ্গালাভের নিকটে মীরজাদকে ২৩ কামান ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ৮৯৯ বৎসর হইল যখন দমদমা ব্রিজ নির্মিত হয়, তখন প্রায় তিন তাবার নিম্নে এই দুইটা কামান পাওয়া গিয়াছিল। একটা কামান ৮-ফুট ৯-ইঞ্চি ও আর একটা কামান ৯-ফুট ৮-ইঞ্চি। বড়টীর মুণ্ডের বাস-পরিমাণ ৪০০-ইঞ্চি ও ছোটটীর ৪-ইঞ্চি।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমি বাগবাাজার-বাসের দক্ষিণ পাড়ে ৭টা কামান মার্হাটে পোতা দেখিয়াছিলাম। এখন তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু, পলি-মাটিতে তাহা ঢাপা পড়িয়া গিয়াছে।

(২) এই স্থানের আর একটা নাম "কেশ্বর বাগান" (Camp Bagán)। সিরাজ-উদ্দৌলার সৈন্যগণ এই স্থানে কাশ পুত্র ফেলিয়াছিল বলিয়া ইহা এখনও "কেশ্বর বাগান" বলিয়া অভিহিত রহিয়াছে।—লেখক



এখন কেবল ২১ মাত্র কামান দেখিতে পাওয়া যায়,—  
গঙ্গার ধারে চিংপুর-পোলের ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা,  
এবং তাহার কিছু পূর্বে আর একটা। বোধ হয়,  
মীরজাফর যুদ্ধ পরাজিত হইয়া এই কামানগুলি ফেলিয়া  
গিয়াছিলে।

সিরাঙ্ক-উল্লোগার কতকগুলি সৈন্য সিমলায় আসিয়া  
রহিল। ইংরাজেরা তাহাদের অনেকগুলিকে বন্দী  
করেন। বন্দীগণ বলিল, “নবাব বলিয়াছেন, ১৮ ছুন  
সুজবাব মুসলমানদিগের মতে অতি শুভদিন। ঐ  
দিন তিনি পুনর্বার বাগবাাজারের কেল্লা আক্রমণ  
করবেন।” উনিচাদের তৃত্য জবাব দিয়া সিরাঙ্কের  
নিকটে উনিচাদের একখানি চিঠি আনিয়া দিল।  
তাহাতে লেখা ছিল, “মার্কিট-ভিট, এখনও সম্পূর্ণ কাটা  
হয় নাই। আপনি ভিট অতিক্রম করিয়া ও লাল-  
বাঝার হইতে ধাপা পর্যন্ত রাত্তা দিয়া স্বল্পদৈ  
পুরাতন কেল্লা আক্রমণ করিতে পারেন।” পুনর্বার

বাগবাাজারের কেল্লা সিরাঙ্ক আক্রমণ করেন নাই।  
এই পর্যন্ত বাগবাাজারের যুদ্ধের কথা শেষ হইল। তার  
পর অনেক কথা আছে। লালবাাজার যুদ্ধ, রাণীমুদ্রী  
গণিতে (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে) যুদ্ধ, বড়বাাজার-  
আশুন ধরাইয়া দেওয়া, মিসন-রোডে যুদ্ধ, অক্ষুণ্ণ-  
হত্যা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে, তাহা বাগবাাজার-  
যুদ্ধ-বর্ণন-কালে বর্ণনা করা অবান্তর। \*

(ক্রমশঃ)

\* Hill's Bengal in 1756-1757, Vol. I; Mr. W.  
H. Carey's The Good Old Days of John  
Company, Vol. I; Dow's Hindustan; Orme's  
War in Hindustan, Vol. I; Blochman's  
Calcutta, A Century Ago; Holwell's Black-Hole;  
Captain D. L. Richardson's Siege and Fall of  
Calcutta; A. K. Roy's Calcutta, Past and Present.  
—এই সকল পুস্তক অবগদন করিয়া “বাগবাাজার যুদ্ধ-বিবরণ”  
লিখিত হইল। —লেখক



## ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার প্রথম যুগ

### শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী ভাষা এখন আমাদের রাজভাষা।  
আমাদের ব্যবসা, চাকুরী প্রভৃতি যাবতীয় দৈনন্দিন  
কাণ্ড বর্তমানে ইংরাজী হাব-ভাব এবং ইংরাজী  
ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না। আপন বন্ধ-বান্ধব  
আত্মীয়-পরিজন—এমন কি পিতামাতার সহিত  
আলাপ-আলোচনা, ঘরকরার কথা কহিতে সেলেও,  
সেই কথোপকথনের মধ্যে হুই-চারিটা ইংরাজী শব্দ  
না থাকিলে আমরা যেন আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে  
বুঝাইয়া উঠিতে পারি না। বিজিত-জাতির ভাষার  
মধ্যে বিজ্ঞেয়-জাতির ভাষা অঙ্গ-বিস্তার সর্বদেশেই  
সম্মিশ্রিত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে বিভিন্ন  
বৈদেশিক শব্দ সেরূপ অধিক পরিমাণে প্রবেশলাভ  
করিয়াছে, সেরূপ আর কোন ভাষায় পাওয়া যায় না।  
বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস এবং তাহার  
তৎকালীন বিকাশ এখনও সঠিকরূপে নির্ণীত হয় নাই।  
বর্তমানে যে সময় হইতে আমরা বঙ্গভাষাকে খুঁজিয়া  
পাইতেছি, তাহার সমকাল অথবা তাহার কিছু পূর্ববর্তী  
সময় হইতে বঙ্গদেশে বিদেশীয়দিগের আগমন আরম্ভ  
হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি। আমাদের মনে হয়,  
এই কারণেই বঙ্গভাষা কখন হঠাৎবে গড়িয়া উঠিবার  
অবকাশ পায় নাই। মুসলমান রাজত্বায় বাঙ্গালার  
কবি-সমাদরের কথা ইতিহাসে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে  
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্বারা বাঙ্গালা ভাষা কখনও  
পুষ্ট হয় নাই। মুসলমান-শাসক একদিন বাঙ্গালার  
পৌরাণিক কাহিনী রচনা করাইয়া রচয়িতাকে পুরস্কৃত  
করিয়াছেন, আবার একদিন বাঙ্গালার কবিকে হস্তিপুটে  
বাধিয়া বেড়াইতে তাঁহাকে বমপুর্বে পাঠাইতেও ছাড়েন  
নাই\*। পাঠানদিগের সময় হইতে ক্রমান্বয়ে দেশে

এক-একটা জাতির আগমনে এক-একটা রাষ্ট্রবিপ্লব  
সংঘটিত হইতে লাগিল, এবং যখন যে জাতির প্রাধিকার  
বৃদ্ধি হইল, তখন সেই জাতির শাসন, বাক্য-বিনিময়  
এবং তৎকালীন স্ত্রে সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের  
হুই-চারিটা শব্দ বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।  
এইরূপে আরবী, ফার্দী, আর্মারী, পর্তুগীজ,  
গুলদাঙ্গ, করাগী, দিনেয়ার প্রভৃতি অনেক ভাষার  
অনেক শব্দই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।  
কিন্তু বঙ্গভাষার মধ্যে ইংরাজী শব্দ যে পরিমাণে  
প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেরূপ অধিক পরিমাণে আর  
কোন ভাষা আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিতে  
সক্ষম হয় নাই।

ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমরা লাভবান অথবা  
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিতে চাহি না;  
কিন্তু হ্রাণ ও সত্যের অঙ্গুরাণে আমরা ইহা স্বীকার  
করিতে বাধ্য যে, আমরা ইংরাজী শিখিয়া একদিকে  
আমাদের প্রাচ্য স্বাতন্ত্র্যকে যেমন নষ্ট করিয়াছি,  
অতীতকে সেইরূপ আমরা যথেষ্ট উন্নতিলাভও  
করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার  
গর্বে আমরা একদিন স্বরাপান ও উত্তান-  
বাটিকায় আমোদ-প্রমোদকেই ইংরাজী শিক্ষার চরম  
সার্থকতা মনে করিতাম; কিন্তু আজ সে ভুল আমরা  
অনেকটা বুঝিয়াছি। ইংরাজী শিখিয়া একদিন আমরা  
'Captive Lady', 'Rajmohan's Wife' প্রভৃতি  
লিখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু অজ্ঞদনের মধ্যে  
আমাদের সে ভ্রম কাটিয়া যায়,—আমরা 'মেঘদূত বর্ষ',  
'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত  
করি। বঙ্গভাষার এই গৌরব-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা  
যে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার নিকট ক্ষুণ্ণী তাহা স্বীকার  
করা যায় না। আজকাল আমাদের মুখে একটা

\* চতুর্দশশতাব্দীর মধ্যস্থলে বিজিত বঙ্গ দেখা যায়। কেহ কেহ  
বলেন, চতুর্দশশতাব্দীর মধ্যস্থলে বঙ্গ ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে  
তাঁহার পূর্বদেহে তেঁগের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।



কথা লাগিয়া আছে যে, আমাদের স্বকীয় কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সকলই ছিল,—বিশেষায়বিশেষ আগমনের বহুপূর্ব হইতে আমাদের দেশে সে সকলের যথেষ্ট আশোচনা হইত এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা কিছু পাইতেছি, তৎসমূহই আমাদের পুরাতন জিনিষ বলিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিতেছি। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে আমাদের হাতছাড়া হইয়াছে—এ কথাটাও মিথ্যা নয়। এই হাতছাড়া হইবার ভূঁইটা কারণ আমরা দেখিতে পাই;—এক বিদেশীয় আক্রমণ ও কৃতীয় আমাদের পুরাতন জিনিষ বলিয়া আমরা গর্ব হয়, শ্বেচ্ছাকৃত কারণই অধিক পরিমাণে আমাদের পুরাতনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে অজ্ঞাত দেশেও যুগে যুগে বহু রাষ্ট্রবিপর্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের মত এমন করিয়া তাহারা আমাদের পুরাতন গৌরবান্বিত নিঃশেষে কাগজগারে নিষ্কণ্ট হইতে দেয় নাই। জুং, দারিদ্র্য, অরাজকতা, রাজাপরিবর্তনের পর আবার তাহারা যখন তাহাদের হুসিন ফিরিয়া পাইয়াছে, তখনই তাহারা তাহাদের হারানোকে আবার পুঁজিয়া আনিয়া তাহার গৌরব খারও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু ভাষা-রূপায় আমাদের যদি কোন আবার হুসিন ফিরিয়া আসে, তখন কি আমরা আমাদের হৃত বহু উদ্ধারের জন্ত তাহার প্রকৃত উপাদানের একটু অংশও পুঁজিয়া পাইব? বর্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে তাহার মধ্য দিয়া আমরা যদি আমাদের পুরাতন কলাগুলোরও সাক্ষ্য পাই, তাহা কি আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়? বিদেশীয় ভাষায় বিদেশী লিখিত আমাদের ইতিহাসকে আজ আমরা ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমরা যে আমাদের পিতামহের উত্তম আর এক পুত্রের নাম বর্ণিতে পারি না, সেটা কি একটা জাতির কণ্ঠের কথা নয়? একদিন যাহা হারাইয়া আমরা অপরায় করিয়াছি,

বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে তদনুসরণের কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার দ্বারা আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করা হইতেছে বলিয়া আমরা দিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গবাসীর মধ্যে কেমন করিয়া প্রচলিত হইল, তাহার ইতিহাস আমরা অনেকই জানি না। ইংরাজ জাতি এদেশে আসিয়াছিলেন বিধিকের যোগে—বাণিজ্য করিতে। তখন এদেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া অথবা এদেশে ইংরাজী সাহিত্য প্রচার করিবার কোনই মার্ককতা তাহাদের ছিল না। বহু এদেশের ভূঁই-চারিত্রী কথাবার্তা তখন দ্রুতদ্রুত করিয়া লইতে পারিলে ব্যবসায়ের পক্ষে তাহাদের সুবিধাশাসক হইত। এই সকল বিদেশীয় বণিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া যে ভূঁই-চারিজন এদেশীয় ব্যক্তি ক্রমে স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশীয় বণিকদিগকে বঙ্গবাসীর অনন্ত ভাঙরের সন্ধান দিবার জন্ত নিযুক্ত হইত, তাহারাও পরস্পর সামিশ্রণের ফলে ভূঁই-চারিত্রী ইংরাজী শব্দ শিখিয়া ফেলিত। সেই সম্প্রদায়ের বসে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যাহা পারিত বণিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত; অবশিষ্টাংশ হস্তপদ নাড়িয়াই গারিয়া লইত। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ইংরাজেরা যে পরিমাণে এদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও এদেশীয় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে পারিল না। এদেশের শ্রীমদ্রাজবত, এদেশের

\* কুরাচাঁপাল আমাদের বংশতালিকা নবত প্রকা কহেন  
বাহায়া জানা যাহা সেই সকল বংশতালিকার মধ্যস্থ মূলা-  
নির্ভরণের জন্ত খ্যাতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়  
জন্মের কুরাচাঁপাল-রক্ষকের নিকট তাঁহার নিজ (কুরাচাঁপাল-  
রক্ষকের) বঙ্গাবসীর পরিচয় চান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই রক্ষক  
মহাশয় তাঁহার সমস্ত পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রী  
মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, বাঁহারা গণের বঙ্গাবসী যুগ যুগ ধরিয়া  
নবত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারের নিজ বংশের প্রতি এ  
ওরাসীজ কোন? ইহাতে সেই রক্ষক মহাশয় উত্তর দেন যে,  
গণের পিতা-পিতামহের নাম কুরাচাঁপাল করিয়া দেওয়া যায়,  
কিন্তু নিজ বংশে 'বা' তা' নাম প্রয়োগ করা সেই বংশগণের  
পক্ষে অসম্ভব।

ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া লণ্ডনের এবং  
লিস্‌বনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া গেল; কিন্তু  
এদেশীয়গণ তখন মুদ্রায় অথবা মুদ্রিত পুস্তকের  
কোন অভাবও পাইল না। বঙ্গবাসীকে ইংরাজী  
শিক্ষা দানের জন্ত ইংরাজগণ তখন মনঃসংযোগ করিবার



উইলিয়ম কেরী

সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও  
করেন নাই। তাহারা আপন ব্যবসা-বাণিজ্য  
মরফের নিমিত্ত প্রথমে চুট্যচুটি করিয়া নিন  
কাটাইলেন। তাহার পর ঘটনাক্রমে যখন রাজস্বভারের  
একটু ক্ষীণ আলোক তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া  
উঠিল, তখন তাহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালীর ইংরাজী  
শিক্ষার আশা আরও দূরে সরিয়া গেল।

বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রথম  
সুযোগ পাইল শ্রীমদ্রাজবতের যুগীন ব্যাকটিং মিশনারীদের  
নিকট হইতে। ইহার বহুপূর্ব হইতে জেহুউ প্রভৃতি  
মিশনারীরা বৃষ্ণধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া-  
ছিলেন, কিন্তু তাহারা আপনাপন প্রচারকাণ্ড লইয়াই  
নিন কাটাইয়া গিয়াছেন। দিনেমাঝ-অধিকারভুক্ত  
শ্রীমদ্রাজবতের পাদরী কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ

মনীষিগণই আমাদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত  
করিবার প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা। এদেশে  
খাঞ্চিয়া তাহারা নিজেরা এদেশীয় বিভিন্ন ভাষা  
বেষ্ণু যথেষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ  
প্রাচীরের অনেক কিছু তাহারা অস্ফুটর আমাদের  
দান করিয়া এইখানেই জীবন শেষ করিয়া  
গিয়াছেন। বৃষ্ণধর্ম-প্রচার যদিও তাহাদের মুখ্য  
উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এদেশবাসীর সর্ববিধ উন্নতির  
জন্ত তাহাদের যে আন্তরিকতা দেখা যায়, তাহা  
বৃষ্ণধর্ম-প্রচারের অভিন্নই কৌশল বলিয়া মনে করা  
যায় না। বাঙ্গালা দেশকে তাহারা আপনাদিগের ভাষা,  
তাহার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে আপনাদিগের করিয়া  
লইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়  
যে, আমাদের উন্নতির পক্ষে তাহাদের সাহচর্য্য  
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বা ধর্মগত স্বার্থপ্রাধান্টি নয়।



জন মার্শম্যান

ইহার জন্ত তাহাদিগকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে,  
চূড়মাণ পতিত হইতে হইয়াছে, শেষে মিশন এবং  
আমাদের জন্ত অর্থক্ষেপে পতিত হইয়া মার্শম্যান  
সাহেবকে জীবন বিসর্জনও দিতে হইয়াছে।



১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ তাহাদের সনন্দ অমুহাযী বার্ষিক ৩৭,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা নবাব সরকারে আদায় দিয়া বঙ্গদেশে প্রথম বাবদা আরম্ভ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে ঢলননগরের সন্নিকটে করাচীদিগের আশ্রয়ধানে দেখা যায়। তাহার পর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তাহারা নবাবের পরওয়ানা অমুহাযী আশ্রমপুর ও আক্কায়া ষাট বিঘা জমি অধিকার করিয়া তাহাদের নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করেন। মধ্যে ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের হুইবার মনোমালিঙ্গ সংঘটিত হয়; কিন্তু তাহা আপোষে মিটিয়া যায়। শেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর নিরানন্দুই বংশের তিন দিন অধিকারের পর দিনেমারগণ ইংরাজের হস্তে আশ্রমপুরকে দিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রমপুরে দিনেমার-অধিকারের নিরানন্দুই বংশের শেষ অর্দ্ধাংশ আমাদের ইংরাজী-দিবার প্রথম যুগে। মি: টমাস নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক আসিয়া কলিকাতায় এক মিশন স্থাপন করেন। পরে তিনি নীলকর সাহেব হইয়া মালদহে গমন করেন এবং সেখানকার নীলচারীদিগের মধ্যে যুগ্মধর্ম-প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহাতে সফল পাইয়া তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া সেখানে আপন সাক্ষ্যের কথা বিবৃত করেন। মি: কেরী ইহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া পর বৎসর এদেশে চলিয়া আসেন এবং যুগ্মধর্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ক্লক পাল নামক জনৈক দেশীয় ব্যক্তিকে তিনিই প্রথমবার যুগ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। শুনা যায়, এই দীক্ষা-কার্য্য ক্লক পালের অল্পবয়সে হিন্দুর আরাধ্যা ভাগীরথীচন্দ্রপুত্র জাহ্নবীসঙ্গিতদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার পর মি: কেরী দিনাজপুরে অকলে গমন করিলে ডা: মার্শম্যান ও মি: ওয়ার্ড আর দুইজন পাদরী \* সমভিষাহারে আমেরিকান কংগ্রেসে

চড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছান। এখান হইতে তাহারা কেরী সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্ত মালদহের উদ্দেশে যাত্রা করিবার উত্তেজা করিলে ইংরাজ কোম্পানী তাহাদের বাধা দিলেন। ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের তখন বিপুল বিক্রম। এদেশেও ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধটা লাগিয়াই আছে। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবকে ইংরাজগণ ফরাসীদের গুপ্তচর ভাবিয়া মালদহে বাইতে দিলেন না \*। তাহার



উপনিবেশ ওয়ার্ড

পর অনেক ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে কলিকাতায় অল্পের দিনেমার-উপনিবেশ আশ্রমপুরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর রবিবার সকালে তাহারা আশ্রমপুরে আসিয়া পৌছান। আশ্রমপুরের দিনেমার গভর্নর কর্ণেল বাই তাহাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় মি: ওয়ার্ড ও মি: রানস্‌ড্রকে ইংরাজদিগের নিকট যাইয়া তাহাদের সং উদ্দেশ্যের কথা জানাইবার জন্ত কলিকাতায় প্রেরণ করেন। তাহাতেও কোন ফলাদয় হইল না। দিনাজপুরে যুগ্মধর্মচারী নীলদ্রুতিতে বসিয়া মি: কেরী বধন মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমন ও দুর্দ্দশার সংবাদ পাইলেন, তখন তিনিও অনেক চেষ্টা করিয়া ইংরাজদিগের নন পাইলেন না।

তখন দিনেমার গভর্নর আশ্রমপুরেই তাহাদের মিশন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অমুহাযী করিলেন এবং সেই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্ত নিজেও প্রতিক্রিয়া হইলেন।

ধর্মবাহকদিগের সহিত ইংরাজদিগের এই অধিনুকূল সম্বন্ধ একমাত্র রাজনৈতিক কারণ বলিয়া ধরিয়া গণ্য হইয়া যায় না। তখনকার ইংরাজ-সমাজ যে সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তাহার সহিত ধর্মের সম্বন্ধ ছিল পরস্পর-বিরোধী। কোনরূপ ধর্মের সংস্পর্শ তাহারা যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি ইংরাজ অধিকারের মধ্যে যে কোন ধর্মবাহককে দেখিতে পাইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ জাহাজে চালাইয়া দিয়া বাবদা গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে যোগিত হইয়াছিল \*। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই সেই সময়ের ইংরাজ-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃত কারণের সন্ধান পাইবেন। ইংরাজ-সমাজের ছোট-বড় কেহই এই পুণ্ড্রগন্ধময় পাপের হস্ত হইতে নিবৃত্তি পান নাই। হেষ্টিংসের নৈতিক চরিত্র, ক্রাফিন্সের পাপ-প্রবৃত্তি, ম্যাকডোনাল্ডের উদ্যম লাগল, পরবর্তী-ঘটিত ব্যতিক্রম, বারগ্রেস-স্ট্রোভিং ও হেষ্টিংস-দ্বাদশের বৈরত্ব-যুগ, এমন কি ব্রহ্মীস কাউন্সিলের সমস্তমতের মধ্যে ধর্মপন্থের হতাশ্রয়তা ও প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা লম্পের নৃশংসতা, অজ্ঞাতাচার ও পাপাচ্ছাদন প্রভৃতি সর্বজনবিদিত কাহিনী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমানগণ এদেশে ইসলামধর্ম প্রচারে বন্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, পর্তুগীজগণ দখলভূতি অরলখনের সহিতও অজ্ঞেয়ী গীজ্ঞা ভুলিতে কুড়িত হইতেন না, গুলবার্গগণ আপন ক্ষুদ্র উপনিবেশ সমূহের বিশিষ্ট স্থানে ইট-পাথরের উপাসনাসমিতির নির্মাণ করিয়া সহরের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, যুগ্মধর্ম-প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া পেনন ও আমেরিকা জয় ভারতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতে ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আপনাদের অধিকারের মধ্যে যুগ্ম-

ধর্মবাহকদিগকে যে বাস করিতে দিতেন না, এবং দূর করিয়া দিবার জন্ত যে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেন, তাহার একমাত্র কারণ — তৎকালীন ইংরাজ-সমাজের ধর্মবিগর্হিত নৈতিক অবস্থা। ধর্মবাহকরা যে পাপের প্রতিবাদ করিবেন, — ইহা তখনকার খেজাচারা ইংরাজদিগের সহ্য হইত না। \*

কয়েক সপ্তাহ পরে কেরীসাহেব আশ্রমপুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মার্শম্যানপ্রমুখ মিশনারীদের সহযোগে বিখ্যাত ‘আশ্রমপুর মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্যকরূপে মিশন-প্রতিষ্ঠানবাস জন্ত প্রথমে তাহাদিগের এতদংশীয় জ্ঞান ও ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন হইল। তাহারা হিন্দু-পণ্ডিত রাখিলেন, মোল্লাই নিযুক্ত করিলেন এবং আরও শিক্ষিত বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিকট হইতে নানাবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া গুজরতি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, পারসিক, মহারাষ্ট্রী, ওজরাতি, উড়িয়া, কর্ণাটী, তেলিগা, বর্মী, আসামী, ভূটানী, মালয়ী, তামিলী এবং চীনভাষার বাইবেল অমুহাযী আশ্রমপুরে দিলেন। যুগ্মধর্ম প্রচার করা যদিও তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি এতগুলি ভাষা আশ্রমপুরে দিবার সময় বিভিন্ন দেশীয় লোক ও সমাজের সংস্পর্শে প্রভাব তাহাদিগকে কেবলমাত্র প্রচারকের স্বার্থেই নহীনের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। আশানামিদের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বর্দ্ধায় রাখিয়া এই দেশ ও জাতির কল্যাণ-কামনা তাহাদের মনোমধ্যে দীর্ঘে দীর্ঘে জাগিয়া উঠিল। ইহাদের পূর্ণে ও সমকালে হালহলে, যে প্রভৃতি সাহেবেরা এতদুদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তত কার্য্যকরী হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা পুস্ত-সাহিত্য যেকোন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এই সময় বাঙ্গালা গজ-সাহিত্যও সেইরূপ উন্নত হইবার প্রথম পথ পুঞ্জিয়া পাইয়াছিল। ‘মুদ্রাঙ্কনী’ অথবা ‘আশ্রমপুরী’ বাংলা বলিয়া আমরা সেই সময়ের গজ-সাহিত্যকে স্থবার চক্ষে দেখিলেও

\* Grant &amp; Brunsdour.

\* ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোন জাহাজে তাহাদিগকে উন্নত দেখা হয় নাই।—Bengal as a field of Missions—Wylie.

\* Cal. Review Vol. IV. 1845 p. 499.

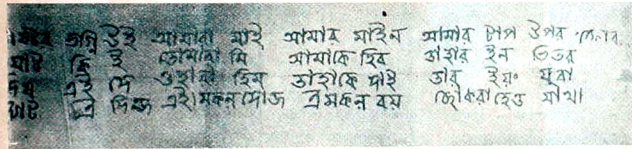
\* Bengal as a field of Missions (1854) p. 169

\* সাহিত্য—১ম বর্ষ, ৭৫৩ পৃ.



ইহার প্রথম প্রচার ও প্রচলনের অবিকালে স্থান  
সেই সকল মিশনারীদেরই প্রাপ্য। এদেশবাসীকে  
পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করিবার আগ্রহ যদি একমাত্র খৃ-  
ষ্টধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যেই হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুদিত  
বঙ্গভাষায় খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তকসমূহই সে কার্য সাধন  
করিতে পারিত। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল  
না। এদেশীয় সমাজ ও আচার-বিচারের সহিত  
তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এমন ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে জড়িত  
হইয়া পড়িতেছিলেন যে, ওয়ার্ডসাহেবের সহিত  
মেরী ফাউন্টেন নারী এক খেতমহিলার বিবাহের  
চুক্তিপত্র কয়েকজন খেতাব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া  
সত্ত্বেও ছয় জন বাঙ্গালীকেও স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল।  
তাঁহাদের নাম বথাক্রমে,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পীতাম্বর সিংহ,  
কমলাকান্ত শর্মা, পীতাম্বর মিত্র, রমাকান্ত ও শ্রীমানাশ।

ছাত্রদিগের পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণ সম্ভবপর হয় নাই।  
তখন কেরীসাহেব পুথির আকারে স্বল্পে পুস্তকাদি  
লিখিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ঐক্লপ  
পুথির আকারে হস্তলিখিত একখণ্ড ইংরাজী ওয়ার্ড-  
বুকের সমান আমি শ্রীরামপুরে পাইয়াছি এবং তাহার  
একখানি কটোগ্রাফও কুনিয়া আনিয়াছি \*। এই পুথির  
ইংরাজী শব্দ এবং তাহার বঙ্গবর্ণ সমগ্রই বঙ্গাক্ষরে  
লিখিত। ইংরাজী-অক্ষরজননীন বঙ্গবর্ণদীকে সেই  
বঙ্গভাষায় লিখিত পুথিই ইংরাজী শিক্ষার প্রথম  
পথ দেখাইল। ঐ পুথির মূল্য তখন ছিল পাচ  
(সিক্কা) টাকা। কিছুদিন এই ভাবে কাটবার  
পর মিশনারীদের মুদ্রায় হৃদিত হইলে ও স্কুলের  
ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় পাঠ্য-পুস্তকাদি মুদ্রণ  
আরম্ভ হইল। এইরূপে ক্রমে সেই সকল মুদ্রাবয়ের



কেরীর হস্তলিখিত ওয়ার্ডবুক

এই হস্তলিখিত চুক্তিপত্র এখনও শ্রীরামপুর কলেজে  
রক্ষিত হইতেছে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে কেরীসাহেব এক স্কুল  
খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার  
পর তিনি সহকর্মীদের সহযোগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা  
মে শ্রীরামপুরে প্রথম স্কুল খোলেন। ছেলেরা বিদ্যার্থী  
হইয়া বাইবে এই ভয়ে প্রথমে অনেক আপনাপন  
পূরণপক্ষে সেই বিজ্ঞানের পাঠ্যহিতে সাহসী হইতেন না।  
পরে স্কুলের বথাবধি পরিচয় ও গুণাবলীর কথা প্রচারিত  
হইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ছাত্রদিগের স্থান সমুলান  
হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্কুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে

সাহায্যে ইংরাজী অঙ্ক, হিসাব-নিকাশ, ভূগোল, ইতিহাস  
প্রভৃতির প্রচার ছাত্রদিগের মধ্যে জনপ্রিয়তায় অগ্রসর  
হইতে থাকে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরের  
মিশনারীরা কলিকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে ঐক্লপ  
একশত পনেরোটা ইংরাজী বিজ্ঞান, গণিতা কুলিলেন  
এবং সেই সকল বিজ্ঞানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র নিয  
ইংরাজী ও অজান ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইল।  
শ্রীরামপুরে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার সময় তাহার এক  
বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে, সেই বিজ্ঞান্যের ছাত্রদিগকে

\* শ্রীরামপুরের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনাথ চন্দ্রবর্তীর অধ্যক্ষ এই  
পুথির ফটো লইতে সমর্থ হইয়াছি—লেখক



প্রস্থান

শিল্পী শ্রীযুক্তসুন্দর রায় অঙ্কিত একখানি 'গিনো-কাটু'। এই 'গিনো-কাটু'খানি ১৯০১  
সালে Indian Society of Oriental Art-এর Exhibition-এ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছিল।  
মহামায়া জাটপুত্রী দেবী জাকিন্দ পুস্তকালয়কর্তা শ্রী ব্রজেননাথ শিল্পীকে গ্রহণ করেন।



বোড্রিং-এ বসবাস, কাপড় ধোলাই, পড়া, লেখা, গণিত-শিক্ষা, হিসাব-শিক্ষা, এবং ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার জ্ঞান মাসিক ত্রিশ (সিঁড়া) টাকা বেতন দিতে হইত। এতদ্বিধা ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, পারসী অথবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে অতিরিক্ত পাঁচ (সিঁড়া) টাকা লাগিত। বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করা ইহার জ্ঞান এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষ মূল্য লগ্ন্য হইত। \*

ইহার পর মিশনের চেষ্টায় ডাঃ কেরী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ উচ্চতরের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে প্রথম কলেজ ও ইউনিভারসিটি গড়িলেন, ছাপাখানার সাহায্যে প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র প্রচার করিলেন, বিভিন্ন ভাষার অক্ষরের ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ আরম্ভ করিলেন, বাপ্পীয় পেশ-মন্ত্র স্থাপন করিয়া তদ্বারা কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতি অনেকানেক উন্নতিমূলক সংস্কার্য করিলেন। মধ্যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ আগুন লাগিয়া তাঁহাদের ছাপাখানার অধিকাংশ সরঞ্জাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবলমাত্র বারোটো মুদ্রায়ণ এই অমির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।† এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ও সেই সকলের নকল প্রস্তুত করা মিশনারীদের আর এক মহান কীর্তি। ইহার কতকগুলি তাঁহারা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি এখনও হস্তলিখিত অবস্থায় শ্রীরামপুর

কলেজে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল নকলের মধ্যে অল্পসংখ্যক করিলে আমরা হয়ত আমাদের অনেক প্রাচীন দৃশ্যোপা গ্রন্থের সন্ধান পাইতে পারি। ইহার মধ্যে সংস্কৃত রত্নপুরাণ, অম্বিপুরাণ, সংস্কৃত-অভিধান প্রভৃতি অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। সংস্কৃত-অভিধানখানি হরিন্দ্রাবর্ধের মোটা কাগজে লিখিত বৃন্দাবনকারে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থ। ইংরাজী-শিক্ষাদানের প্রথম যুগের পুরোহিত ডাঃ উইলিয়ম কেরী ও তাঁহার সহকর্মীগণ ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শ্রীরামপুরেই তাঁহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির জ্ঞান তাহাদিগের মধ্যে ব্যায়াম-প্রচলন প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা যুগান্তের পর বাঙ্গালীকে আবার মাহুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার তখন বেন তাঁহাদের উপরই জ্ঞাত হইয়াছিল। এমন কি দরিদ্র বালকদিগের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার মানসে তাহাদের মলিন বস্ত্র পরিবর্তিত করার স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিতেও তাঁহারা কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ওয়ার্ডসাহেব, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কেরীসাহেব এবং সর্বশেষ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেব আপনাদিগের কর্মজীবনেই দেহরক্ষা করেন। \*

\* ১১৩০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তালতলা সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস-বিভাগে শ্রীযুক্ত রমাজান্নার চন্দ্র (রাহ বাহাদুর) মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।—জি-অনিলকুমার দে, অধ্যাপনা-সমিতির সম্পাদক

\* Selections from Calcutta Gazette, Vol. III p. 544

† Selections from Cal. Gazette, Vol. IV. p. 265







## মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার

শ্রীগুরুদাস রায়

[কিছুদিন পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তরায় মহাশয় অত্যন্ত মহানার গ্রামে বাজার একটা প্রাচীনতম নগরীর ক্ষাণ্যবশেষের নকশা পাইয়াছেন। সেখানে কৃশান ও গুপ্ত যুগের এবং আকবরের সময়ের স্বর্ণ-মুদ্রা, বহুসংখ্যক প্রত্নমূর্তি, মৃৎশায়াসি, বৃহৎ প্রস্তর কুন্তের ও ত্র্যমুখাকারের ভাস্কর্যসমূহ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিবেণী, নগরগ্রাম, গাঢ়তা প্রভৃতি বাসিন্দা-প্রধান স্থানগুলিতে ইহাযার লক্ষ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটা পুণ্ড্রপাণ্ডা বিদ্যাগে, নগরপেচনা বৃহৎ পুণ্ড্রী স্বর্ণবর্ণ মাইবেরও অধিক পান হুজিরা আছে। গুপ্তবাসাব্দু এই সময় যানের আলোকচিত্র নষ্টমা আনিয়াছেন, তত্বে কতকগুলি চিত্র উপহার লিখিত এই প্রকৃষ্ণ সহ প্রকাশিত হইবে। কবিতা তা সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের শ্রীকৃষ্ণ কামিনীরায় দাক্ষিণ্য মহাশয় এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়া আনিয়াছেন। উঃ:]

ই, আই রেলের মগরা জংসন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একমাত্র বাগানী কোম্পানীর রেল-পথ গিয়াছে, তাহারই মধ্যবর্তী হুগলী জেলার অত্যন্ত একটা স্থানের নাম মহানাদ ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে গ্রাম। বর্তমানে গ্রামের আয়তন প্রায় পাঁচ বর্গ মাইল; ইহা বাইশটা পাড়ায় বিভক্ত। এতদ্ভাষীত বরাট, আলিনগর, সিংগাচ প্রভৃতি কয়েকটা পাড়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের নিকট লক্ষ্যবাহী গ্রামবাসিন্দা সেকালের রাজা লক্ষ্য গুহের ক্ষীণ মূর্তি আঙ্কিও বহন করিতেছে। এইখানেই রাজা কেশব গুহ কেশবপুর, কৃষ্ণ গুহ কৃষ্ণগ্রাম ও চণ্ড গুহ চণ্ড বা শওগ্রাম স্থাপন করেন। এইখানেই মহারাজ হরিশ সিংহ ও মহারাজ সর্দারের বিরাত গুহ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন। পরবর্তী কালে কায়স্থ রাজা রামহরদত্ত ও স্বর্ণবর্ণবিক্র রাজা রাধাকান্ত রায় এখানে রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র কর্ণপুরের পর ইহা শোভা-বাড়ারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জমিদারীভুক্ত হয়।

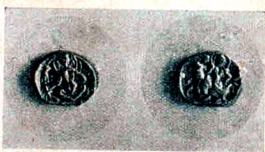
রাড়ের রাজধানী ছিল এই মহানাদ—ইহা প্রথমে বর্দ্ধমান ও পরে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে

হইতে গুপ্তযুগের কুমার গুপ্তের নামাক্রিত ধর্ম্মলীপ-হস্তে রাজমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্তি সন্নিবিষ্ট ও তৎ



গুপ্তযুগের হুগলীয়া স্বর্ণমুদ্রা ৫০০—৪০০ খৃস্টাব্দ

গুপ্তের রমণীমূর্তি (ম্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি) সন্নিবিষ্ট এবং শশাঙ্কের সময়ের স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি



রাজা শশাঙ্কের মুদ্রা; ৬২০ খৃস্টাব্দ

কুমারনগরের হরিকেশ্বর মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা ব্রজনাথ সিংহের স্বর্ণমুদ্রা ও রাজা শৌর্য্যনাথ সিংহের

রৌপ্যমুদ্রা পুষ্করিণী ধননের সময় পাওয়া গিয়াছে। এখানকার রাজা হেমন্ত সিংহের নামাক্রিত মুদ্রার কথা ইতিহাস-লেখক হান্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ জিতেন্দ্রনাথ করের বাড়ীতে আমি একটা স্বর্ণ-মুদ্রা দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন যে, জনৈক মৌলবী পাঠোদ্ধার করিয়া সেটাকে আলাউদ্দিনের সময়ের মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দাক্ষিণ্য এবং আমি উহাকে আকবরের সময়ের মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করি; কারণ উহাতে স্পষ্টভাবে 'জালালুদ্দিন আকবর' এই কথা লেখা আছে, এবং বোধ হয় মৌলবী সাহেব এই জালালুদ্দিন নামটি ভুল করিয়া আলাউদ্দিন পড়িয়াছেন। এতদ্ভাষীত আরও কয়েকখানি নানা প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এখনও পাঠোদ্ধার সমাপ্ত করিতে পারি নাই। শশাঙ্কের মুদ্রাটি



আকবরের স্বর্ণমুদ্রা

৬২০ খৃস্টাব্দের মোহরাক্রিত। ঐ প্রকারের মুদ্রা ভারতীয় সারসম্প্রদায়ের আর মাত্র চারি খানি আছে। হরিকেশ্বর স্বর্ণমুদ্রাখানি দ্বিতীয় শতাব্দীর। উক্তরসঙ্গে ঐকম আর একটামাত্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভাষীত পাণ্ডাবের দিক্ হইতে প্রাপ্ত ঐ প্রকারের ১৮ খানি মুদ্রা বর্তমানে কলিয়ার সারসম্প্রদায়ের সময়ে রক্ষিত আছে। কোচ-রাজা এবং আসামের রাজাদের মুদ্রাও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে বাগিচা-বাগদেশে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে নানা দেশের মুদ্রার আমদানী হইত।

৬৮৬ খৃস্টাব্দে রাড়ের রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময়ও এখানে হইতে বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষয় করিবার জন্য

সিংহবংশীয়গণ শৈব ও শাক্ত সঙ্গোদায়ভুক্ত জনমণ্ডলীকে উজ্জ্বলিত করেন। এই উত্তেজনার ফল স্বরূপ এখানে নাথ ধর্ম্মের উত্থান হয়।



বৌদ্ধজগৎ অবসানের সময় গৌরীপটের অর্ধাংশ (খ্রিস্টাব্দ—২৪ দ্বিতীয় দ্বীপ)

মহানাদের রাজা হরিশ সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। মহাক্ষিত বীরবর বীরবাহুও বৌদ্ধ ছিলেন। সিংহ ও গুহবংশীয়েরা রাড় বহু ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। বর্তমানের অস্ত্রবিপ্লব ও ঐচ্ছাঙ্কের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধনের পর মহানাদে পুনরায় প্রাচীনকালের বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানাদের সিংহবংশ সৌরবংশীয়। "পবনদত্তন" গ্রন্থে পাণ্ডা যায় যে, লক্ষ্য সেন কোনও এক সিংহ-উপাধিপারী বীরকে রাড়দেশাধিপতি গদ্যাতীরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সিংহবংশের কুশীনাথায় আছে যে, হরিকেশ্বর "সিংহ বিক্রমশালী" ছিলেন বলিয়া সিংহ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।" অতঃ পরে "সমরে হরিশ সিংহ অত্যন্ত প্রথর। যুদ্ধক্ষেত্রে তুল্য পুত্র অবনী ভিতর।"

মন্দির-শিল্প রাড় দেশের রচনা। বাস্তব-বিজ্ঞান প্রথমে রাড়ের পুরননগুচ্ছ শঙ্কু সিংহ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। নানা প্রকারের ইষ্টক প্রভৃতি পরীক্ষণ করিয়া ইহাই অস্বীকৃত হয় যে, গুপ্তীয় ভূতীয় শতাব্দীতে মহানাদ শিল্পদর্শনের চরম উচ্চাধিকার করিয়াছিল।

রাড়ের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ প্রথমে



কাশী-কোশলেশ্বর প্রাসাদগুলির কল্পা অধালিকার পারিগ্রহণ করার শিতার কোথ-নয়নে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র পুৰ্ণোজ্জ্বলিত পুরন্দর। এই বিজয় সিংহ তাম্রপট্টা দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং সিংহ বংশের নামাঙ্কিত ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হয়, এক্ষণ প্রবাদ আছে।

মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ বংশের লক্ষণ সেনের অধীন করণ দৃষ্ট হইলেন। পুত্র গোরাচাঁদের সহিত যুদ্ধে মহারাজ চন্দ্রকেতু বন্দী হন। কিন্তু রাজপুত্র

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাসাদ বেটন করিয়া স্থলভূজ প্রস্তরদ্বারা ছিল—অত্যাধি সেই অতীত যুগের জীর্ণ স্থিতি বহন করিয়া বহু নিদর্শন বর্তমান আছে। বনন কার্যের সময় ওধান হইতে কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্তি, বিষ্ণু-মূর্তি, মহেশ্বরী-মূর্তি, হরগোবিন্দ-মূর্তি, একপাদ ভৈরব-মূর্তি, দ্বারকাচণ্ডী-মূর্তি এবং বৌদ্ধদের ধনদেবতা জম্বলের মূর্তিও বনন কার্যের সময় পাওয়া গিয়াছে। জম্বল-মূর্তিটার অপর পৃষ্ঠে কতকগুলি বৌদ্ধ নীতি বোদিত আছে।



আশোকের সময়ের গুহামন্দিরের অপরপাশে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দির

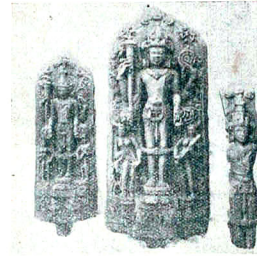
বিজয়কর্তৃক সাহায্যে মুক্তিক্রান্ত করেন। কিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পরাজয় হইয়াছে মনে করিয়া রাজ-মহিলা ও পুরনারীগণ মূলমানের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া চন্দ্রবংশের জলে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন,—তখন মহারাজ চন্দ্রকেতুও আত্মীয়-স্বজনদের শোকে উদ্ভাদ হইয়া সেইখানে জলে সঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন।

কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণী হইতে অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে বাতায়াতের স্তম্ভ ছিল। রাজপ্রাসাদ স্রুতং প্রস্তরনির্মিত ছিল।

স্রুত রাজপুত্রানা হইতে একদল সমরকুল রাজপুত্র বীর মহানাদে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। ঐ পুত্রানী এখন জনমানবশূন্য হইয়া বিজন অরণ্যানীতে পর্দাবসিত হইয়াছে।

রাজা প্রজ্ঞা সিংহ জলদস্তা দমন করিবার জন্ত মহানাদ হইতে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বাহিরের আক্রমণ নিরোধ করিবার জন্ত রাজপ্রাসাদের চারিদিকে দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে ইহাদের

অধিকার সাগরদীপস্থ কলিঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।



প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি

বৈদিক ভক্ত শত্ৰু সিংহ দীর্ঘ দিন ধরিয়া অক্রায় ভাবে চেষ্টা করিয়াও মহানাদ হইতে তাত্তিক প্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হন নাই।



বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে হরপার্কটীর প্রস্তরমূর্তি

৭২২ খৃষ্টাব্দে বিজয় সিংহ মহানাদে সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মহানাদের সনাতন সিংহ আত্মীয়-স্বজন কষ্টক পরিত্যক্ত হইয়া জেতারি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। হরিশ সিংহের সময়ে দেখানো বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। মহানাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কমলশীল প্রণীত “জায়বিন্দু পদ্য পঞ্চমংগল” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ তিল্পতাধিপতি



একপাদ ভৈরবমূর্তি এবং হাজলের মুখনির্ভিত একটি গজাশ্রাব্যীর ক্ষায়াবশেষ

দলাই লামার সহযোগিতায় তিল্পতায় ভাষায় অনূদিত হয়।

হরিশ সিংহ মহারাজে একটি নগর নির্মাণ করেন এবং অগ্রদ্বীপে ও নবদ্বীপে ছুটি মহাকাল-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রবর্তী তিনি বে মহাকাল-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ভাষায়া অতুলনীয় ছিল বলিয়া শোনা যায়।

পাল ও সেন রাজবংশ মহানাদে রাজা বিস্তারের



চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কত যে বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই নাই। আজ পর্য্যন্তও বহু যুদ্ধেরই নিদর্শন আছে। প্রত্নতত্ত্বের পোতা এবং কামানের ব্যবহার এক সময় এখানে যে খুব বেশী হইয়াছিল তাহারও নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

সিরাঙ্গ-উল্লাখার দেওয়ান রাজা মানিকচাঁদ সিং মহানাদবান্দী ছিলেন। মহানাদের রাজা চন্দ্রকেন্দুর বংশধরদের মধ্যে রাজা শোভা সিং, রাজা মহেন্দ্র সিং, রাজা হেমন্ত সিং, রাজা গুরুদী সিং, রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিং, রাজা শঙ্কজি সিং, রাজা চুর্জন সিং, রাজা সমর সিং, রাজা পূর্ব সিং বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসন অবসান করিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, ইহা বাদশাহ্‌নামাতে পাওয়া যায়।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মহানাদ নগরে সিংহ ও গুহ বংশীয়দিগকে আহ্বান করিয়া রাইবার জঙ্গ রাজা কর্তৃক রাজ্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরিতে রাজা ভগীরথের বংশে জগৎ সিং, ব্রহ্ম সিং, বিনোদ সিং, উদয় সিং, বিপ্ল সিং, মং সিং প্রভৃতি নৃপতিগণের নামোল্লেখ আছে।

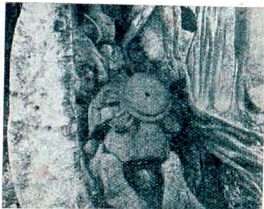
চম্পন বংশের পূর্বোক্ত রাজভট্ট নামে এক জাতি মহানাদে বাস করিত। ইহারাও মহানাদের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। পালবংশীয় প্রথম রাজা পোপাল এই রাজভট্টবংশীয় ছিলেন।

প্রায় ৭০ বঙ্গাব্দে পলাবেরা মহানাদ আক্রমণ করিয়াছিল।

রাজা গুরুমোহন সিংহের গুপ্তর তত্ত্বাবধানে ১৮১৩ নির্ধারিতকালে গয়ায় একটি বৌদ্ধধর্ম-কূট নিশ্চিত হয়।

মহারাজ চন্দ্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, জটেশ্বরনাথের মন্দির, অনাদি শিবলিঙ্গ, জামাই-জাদান নামে সুপ্রস্তুত রাজা, গড়পাড়া স্থবিশুত গড়, বৌতা ও বর্শি-গদা নামে হস্তবৃত্ত জগাশন, জীহবকুণ্ড নামে একটি দেবখাত কুণ্ড এবং ছাঁট একটি স্থূপ আজিও কৌন হ্রদ্র অতীতের প্রাচীন নিদর্শন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ চন্দ্রকেন্দ্র মহানাদ হইতে জিব্রেশী পর্য্যন্ত যে রাজপথ

নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার প্রস্থই ২২৫ ফিট বা দেড়শত হাত। রাজবাড়ীর হাতীশালা প্রভৃতিরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মহানাদের লীমাত্ত্ব ধনপোতা নামক যে প্রকাণ্ড প্রাস্তর বর্তমানে বিজ্ঞান অবগা সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার খনন কার্যা করিলে অতীত যুগের বহু চিহ্নই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এতদ্ভাষীত রাজা মহেন্দ্র সিং যে স্থবিত্তীর্ণ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ ৮০ বিঘা। মহানাদের সুলুগুণ্ডের নীচে ভূত্বর্গে আটালিকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের গুহ রাজবংশের জৈনক রাজা বরাটের মুখ হইতে পাওয়া ও স্থলীণ পর্য্যন্ত একটি গু-উক্ত রাজপথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মেদিলীপুর এবং ময়ূরভঞ্জের নানাপ্রানে মহানাদের গুহ রাজবংশের প্রাচীন কাঁটির অনেক প্রমাণই আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে। বরাটের বিরাট স্ফলঙ্গপূর্ণগুলি দেখিয়া মনে হয়, রাজা বিরাট গুহের রাজপ্রাসাদ বর্তমান গোপাপুরুরের সন্নিকটবর্তী স্থানে ছিল।



একটি প্রাচীন মন্দির : ইহারই উপর প্রথমমুর্তি স্থান থাকিত

মহারাজ সিংহবাহুর পরে রাজা মাধব সিং ৩৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহানাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর আরও ছয়জন নরপতি রাজত্ব করার পর এখানে পৌড় ও মগদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণ রাজা মুকুট রায় মহানাদের সন্নিকটে

সমুদ্রতীরের নামে একটি গড় নির্মাণ করেন। ৬০ জন মুসলমান রাজা ১২৪৪ বঙ্গাব্দে মহানাদে রাজত্ব করিলে মহারাজ রামদেব বখা পিতৃরাজা উজ্জয় করেন।

বৌদ্ধরাজ পাণ্ডুল মহানাদে বাস করিতেন। তাঁহার নামে পাণ্ডুপুত্র অগ্নাবধি বর্তমান আছে। বাগ্ধারার বার হুঁইয়ার মধ্যে মহানাদের মহেন্দ্র সিং অন্ততম ছিলেন। “মহাবাদ রাক্ষস” গ্রন্থে আছে—

“হাতে বুক বেষ্টিত বসেছে ভার হুঁঞ।

মহেন্দ্র সিং আর কত জন বড় মিঞা॥”

হরিশ সিংহের বংশে বিশ্ব-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মানিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জয়গ্রহণ করেন।

শকজাতি ভারতে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর তাহাদেরই একদল মহানাদে আসিয়া বসবাস স্থাপন করে। রাজা বিরাট গুহ জননিগমকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া ‘দেশের পরমেশ্বর’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বাদলিভা গুহ বহুে ছনদের উদ্ভেদ সাধন করেন। গুপ্তবংশের নামাঙ্কিত মুদ্রা দুটো অহমিত হয় যে, তাহাগুলির সন্মুখেরা গুহরাজদিগের পরে প্রাচুর্য হন। ৩০৪ খৃষ্টাব্দে মহানাদের গুহবংশের একটি শাখা তাহাগুলিতে রাজত্ব করিত। বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধারদেশে যে প্রত্নরলিপি আছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, মহানাদের সিংহ বংশের অশোকচন্দ্র সিংহের নাম অঙ্কিত আছে। অশোক সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ মহেন্দ্রপাদ ভট্টের আদেশে লক্ষ্যাদেশের ক্রিস্টিয়িতম বর্ষে ১২২ই বৌদ্ধ বহুপতিবার উহা লিখিত হয়। ১১৩১ হইতে ১১৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা মাধব সেন মহানাদের অন্তর্গত টগর নগরে রাজত্ব করিতেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ভাটীয়া মহানাদে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজার রাজত্বকালে মহানাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অন্ততম কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

মহানাদের রাজপ্রাসাদের ক্ষয়বশেব পরিদর্শনকালে অধিমসোপে গলিত ধাতুপদার্থের একটি অঙ্কসর

পরিমিত জমাট পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদের একস্থানে ইষ্টক সংগ্রহ করিবার সময় একটি ডাবার মধ্যে ক্ষয়বশেবের ভিতর ডাবা সমেত প্রায় একমণ চুন পাওয়া গিয়াছে—সেই চুন প্রায় ৮০০ শত বঙ্গবর্ষের পুরাতন বলিয়া অহমিত হয়। একটি স্থান খননকালে প্রায় সহস্রাবধিক বঙ্গাব্দ পূর্বের মাটির হাড়ি ও অস্ত্রাশ্রয় মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়াছে।



মাটির হাড়ি : প্রায় এক হাজার বঙ্গবর্ষের পুরাতন

মহানাদের সিংহ ও গুহ রাজবংশের মিলিত শক্তি ৪১০ বঙ্গাব্দ বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্গীতবে দণ্ডায়মান ছিল। যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল—তখন নানা অসদা জাতীয় বোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করে—এবং পরে উহারাও এক চুর্জন সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অগ্নাধা বীরের লীলাক্ষেত্র মহানাদ একদিন তাহাদেরই বোকোশোপিতে বিরজিত হইয়াছিল। রাজা লীলীপ সিংহকে নিহত করার পর ইংরাজগণ বন্দদেশে প্রবেশ করিতে পান। রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরাজগণ কোট উইলিয়াম চুর্ন নির্মাণের স্বযোগ পাইলেন।

\* এই প্রকৃতি লিখিবার জন্ত যুগোপ-প্রতাপত ইন্ডিয়ানার শ্রীযুক্ত বটুক সিংহ মহাশয় তাঁহার নিকট রচিত প্রাচীন বুলী হইতে রাজসংঘের যে নামগুলি আলাকে লিখিয়া রাখিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার নিকট আধুনিক সূত্রভাষা প্রকাশ করিতেক।





## গান

গল্পা সিদ্ধ নন্দনা কাবেরী যমুনা ওই,  
বহিরা চ'লেছে আগের মত,—কইরে আগের মানুষ কই?

মৌনী শুদ্ধ সে-হিমালয়  
ভেমনি অটল মহিমময়,  
নাহি তার মাথে সেই ধানী ক্ষয়ি,  
আমরাও আর সে-জাতি নই ॥

আছে আকাশ সে-ইন্দ্র নাই,  
কৈলাসে সে-বোগীন্দ্র নাই,  
অদা-স্বত তিফা চাই,  
কি কহিব এরে কপাল বই ॥

সেই আগ্রা, সে-দিল্লী ভাই  
আছে প'ড়ে, সে-বাদশা নাই,  
নাই কোহিনুর ময়ূর-তল,  
নাই সে-বাহিনী বিখজ্জী ।

আমরা জানি না, জানে না কেউ,—  
কুলে ব'লে কত গণিব চেউ,  
দেখিছাছি কত, দেখিব এ-ও

নিষ্ঠুর বিপির লীলা কতই !

কথা ও স্বর —কাজী নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—শ্রীজগৎ খটক

III সা -১ সা | গা -১ মা | মপা -১ পা | পা -১ ॥  
গ ড্ গা | সি ন্ ধু | নং ব্ ম | দা ০ ০ |  
I পা -১ পা | পা -১ পা | পা -১ পা | পধা -পমা -গা |  
কা ০ বে | রা ০ য | য় ০ না | ও ০ ০ ০ ই |

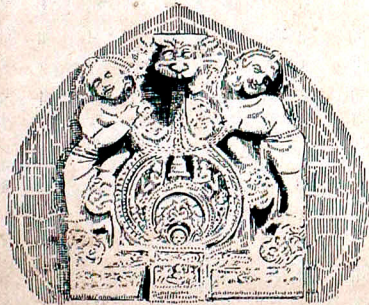
## গীত ও রূপ

৪১৩

I গা মা মপা | পা পা পা | পা পা -ধা | ধস' গা -১ |  
ব হি যাং চ লে ছে | আ গে ব্ মং ত ০ ০ |  
I ধা -১ পা | মা মধা -পা | গা গপা -মা | গা -১ -১ |  
ক ই রে | আ গেং ব্ মা হুং ন্ ক ই ০ ০ |  
II মধা -ধা ধা | ধা -১ ধা | ধা ধা ধা | ধা -১ -১ |  
মৌ ০ নী | ত্ত ব্ ধ | সে হি মা ল ০ ০ ০ |  
[ ধনা ]  
I মধা -ধা ধা | ধা ধপা -স' | ধা স'গা -ধা | পা -১ -১ |  
তে ম্ নি | অ টং ল ম হিং ম ম ০ ০ ০ |  
I গা মা পা | -১ পা পা | পা -ধা ধস' | স'গা -গা -ধা |  
না হি তা | ব্ সা থে | সে ই ধ্যাং নীং ০ ০ ০ |  
I মা -১ মা | -মা মা -ধপা | মা মপা মা | গা -১ -১ |  
আ ন্ রা ও আ ব্ ০ ০ জাং তি না ই ০ ০ ০ |  
II মা মা মধা | -ধা -১ ধনা | না -স' | স' -১ -১ |  
আ ছে আং | কা ন্ সে | ই ন্ জ না ই ০ ০ ০ |  
I পা -না না | না স' স' | নস' -নস' গা | ধা -১ -১ |  
কৈ ০ লা | সে সে যো | গীং নং জ না ই ০ ০ ০ |  
I -স' -গা গা | গা গা গা | গা -গ'মা -র' | স' -১ -১ |  
অ ন্ ন | দা হু ত | ডি ০ ০ জা চা ই ০ ০ ০ |  
I পা না না | না না -স' | ধা ধস' -১ | গা -ধা -গা |  
কি ক হি | ব এ রে | ক পাং ল্ ব ই ০ ০ ০ |  
I পা -ধা পা | মা মধা -পা | মা মপা -মা | গা -১ -১ |  
ক ই রে | আ গেং ব্ মা হুং ব্ ক ই ০ ০ ০ |  
[ -স' গা ]  
II মধা -ধা ধা | ধা -১ ধা | ধা -ধা ধা | ধা -১ -১ |  
সেং ই আ | আ ০ সে | দি ল্ জী ভা ই ০ ০ ০ |  
I মধা ধা ধা | ধা ধপা -স' | ধা -স'গা ধা | পা -১ -১ |  
আ ছে প | ডে সেং ০ ০ বা ব্ শা না ই ০ ০ ০ |  
I গা -মা পা | পা পা -১ | পা -ধা ধস' | স'গা -১ গা |  
না ই কো | হি ন্ ব্ ম য় রং তং ব্ ত ০ ০ ০ |



I	ধা	না	পা	মা	মহা	পা	গমা	মপা	মা	গা	গা	না	II
	না	না	সে	বা	হি	নী	বি	..	খ	জ	দ্বী	.	
II	মা	মা	মা	ধা	ধা	না	না	সী	না	সী	না	না	I
	আ	ম	রা	জা	নি	না	জা	নে	না	কে	উ	.	
I	পা	না	না	না	সী	সী	না	রসী	গা	ধা	না	না	I
	ক	লে	ব	সে	ক	ত	গ	বি	ব	চে	উ	.	
I	সী	গী	গী	গা	গা	গা	গী	গমী	রা	সী	না	না	I
	কে	খি	য়া	ছি	ক	ত	নে	খি	ব	এ	ও	.	
I	পা	না	না	না	সী	সী	না	সরী	সর	সী	গা	না	I
	নি	ক	র	বি	খি	ব	লী	লা	ক	ত	ই	.	
I	পা	ধা	পা	মা	মহা	পা	গা	মপা	মা	গা	না	না	II II
	ক	ই	রে	আ	পে	ব	মা	হ	ব	ক	ই	.	



## অরুণোদয়

(উপজ্ঞাস)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্বসংস্কৃতি]

বুড়া কবিরাজ মিথ্যা বলেন নাই। সেই দিনই 'হ্যাঁ, এই দেখ না।' বলিয়া সেবু তাহার বৈকালে সেবু উঠিয়া বলিল। কিন্তু সারাদিন কিছু বিহানার তলা হইতে কাগজে মোড়া খানিকটা মিহরি, খায় নাই বলিয়া নারায়ণী তাহাকে আর খাট হইতে নাচে নামিতে দিল না।

আজ সে যেমন পারিয়াছে, সকালে চারট রাসা করিয়া বীরেনকে খাওয়াইয়া দিয়াছে, নিজেও খাইয়া লইয়াছে। মাসি কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একটবারও ছেলের খোঁজ লইতে আসে নাই। নিশ্চয়ই সে রাগ করিয়াছে। নারায়ণী ভাবিয়াছিল, ছপুকে একবার সে উপরে গিয়া তাহার রাগ ভাঙ্গাইয়া আসিবে, কিন্তু কাল সারাটা রাত একরকম জাগিয়া কাটাইয়া ছপুকে সে দেবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘুম খখন ভাঙ্গিল, বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। ধড়মড় করিয়া তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া বলিল। দেখিল, দেবু তখন বসিয়া বসিয়া তাহার বাবার-আনিয়া-সেওয়া সেই মোটা ছবির বইখানি খুলিয়া ছবি দেখিতেছে। নারায়ণী তাহার গায়ে মাথায় একবার হাত দিয়া দেখিল, অর একবারেই নাই। বলিল, 'বোস্ বাবা, মা কি করছে আমি একবার ওপর থেকে চট ক'রে দেখে আসি।'

দেবু বলিল, 'মা ত' ওপরে নেই।' নারায়ণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি দেখে এলে বৃষ্টি?'

দেবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'তবে তুমি জানলে কেমন ক'রে? ছুই ছেলে, তুমি না গিয়ে কখনও থাকতে পার! তুমি নিশ্চয়ই গিয়েছিলে।'

দেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

দেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

দেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

দেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

দেবু বলিল, 'মা ওইখানে কাঁদছিল যে।'

বিরহানার তলা হইতে কাগজে মোড়া খানিকটা মিহরি, হুটি কমলা সেবু ও বিস্কুটের একট টিন বাহির করিয়া বলিল, 'এইগুলো চুপি-চুপি দিয়ে গেল।'

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললে?'

দেবু বলিল, 'কিছুই না। শুধু কাঁদছিল। তারপর ছুটে পাগিয়ে গেল।'

নারায়ণী শুন্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল, 'বিস্কুটের টিনটা তুমি খুলে দাও না, বোমা।'

নারায়ণী বলিল, 'আমি ত' খুলতে জানি না, বাবা। তোমার বাবা এসে খুলে দেবে।'

বীরেন ভাবিয়াছিল, ছেলেরা বসন্ত নিশ্চয়ই হইবে, এবং বসন্ত হইলে তাহাকে আর কেহই ঝাঁচাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা খখন হইল না, তখন সে বোধকরি আনন্দে আত্মহারা হইয়াই তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল এবং আপিস হইতে সেদিন বাড়ী ফিরিবার পথে একটুখানি মজ পান করিয়াই বাড়ী ফিরিল।

নারায়ণী রাসা করিতেছিল, বামীকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়াই সে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'খাও, হাত-পা ধুয়ে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বীরেন বলিল, 'হাত-পা খেঁচো না, কি কথা বল।'

সে যে মদ খাইয়া আসিয়াছে, নারায়ণী তখনও তাহা বৃষ্টিতে পারে নাই। বলিল, 'মাকে চট্টয়ে দিয়ে ভারি খারাপ কাজ করলে কিন্তু।'



মুখ তুলিয়া বীরেন বলিল, 'কেন ?'

নারায়ণী বলিল, 'মার সঙ্গে দেখা হ'ল, কি বসিছিলেন জান ? বসলেন, ভাড়া যদি তোমরা না দিতে পার, মা, তাহ'লে আমি অজ্ঞ ভাড়াটে আনব'।

বীরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ ত'। কলকাতা শহরে বাড়ী কি আর আমরা পাব না, নাকি ?'

তাহার কথা বলিবার ধরণ এবং এই নিরর্থক হাসি দেখিয়া নারায়ণীর মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা সন্দেহ হইতেই, সে তাহার মুখের কাছে মূখ লইয়া বসিয়া বলিল, 'আজ্ঞ আবার থেরে এসেছ ? তবে সে এই সেদিন বসলেন—'

হাত বাড়াইয়া বীরেন তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, 'আমো। অনেক শুনেছি।'

নারায়ণী বলিল, 'কিছু বলব না, কিন্তু এমন ক'রে কতদিন আমাদের চলেবে ?'

বীরেন বলিল, 'যতদিন চলে।'

বসিয়াই সে আবার হাসিতে লাগিল।

নারায়ণী একবার দেবুর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। তাকে সে ছবির বইখানি দিয়া বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া রান্না করিতে গিয়াছিল, এখনও সে ঠিক ভেমনি বসিয়া আছে।

নারায়ণী বলিল, 'তোমার বিস্কুটের টিনটা এইবার গুলিয়ে নাও।'

দেবুর সেকথা মনেই ছিল না, তৎক্ষণাৎ টিনটা হাতে লইয়া সে তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'এ টিন তুমি কোকে দিয়ে আনলার ?'

নারায়ণী বলিল, 'মা দিয়ে গেছেন। দেবু দিয়ে গেছেন, মিছরী দিয়ে গেছেন—দেখ, মাকে তুমি কোনও কথা ব'লো না, ভানি সজ্ঞার হবে।'

বীরেন আবার হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'ছেলের গুণর যে পূব ভালগা।'

অজ্ঞ ভাড়া দিতে না পারলে ছেলের বাবাকে ত' ভাড়িয়ে দিতে চান।'

এমন সময় দরজার বাহিরে মাসির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে যে কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহারা কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'না বাবা, ভাড়িয়ে দিতে আমি চাই না। নীচের ভিনখানা ঘরের মধ্যে ছ'খানি তোমরা নাও, আর একখানি ঘর আমি অজ্ঞ কাউকে ভাড়া দিই। নইলে আমি খেতে পাচ্ছি না বাবা, বড় টানাটানি চলছে।'

বীরেন বলিল, 'বেশ ত', আমরা আগে উঠে বসি, তারপর আপনি একখানি কেন, সব ঘরই ভাড়া দিতে পারেন।'

মাসি বলিল, 'তোমরা উঠে যেতে চাও—যাবে।'

নারায়ণী ভাড়াভাড়ি মাসির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না মা, গুর কথা আপনি শুনেছেন কেন, উঠে আমরা যাব না।'

বীরেন বলিয়া উঠিল, 'উঠে যাব না কি-রকম, নিশ্চই যাব। তিন মা আমরা এখানে আছি, এক মাসের ভাড়া দেওয়া হ'য়েছে, আর ছ' মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা উঠে যাব। এই আমি শেখ কথা ব'লে রাখলাম আপনাকে।'

মাসি আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। নারায়ণী হতভয়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে ?'

নারায়ণী ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া মুকিল। মূখ তুলিয়া বলিল, 'স্নেহ থাকতে তুমি চাও না, না ?'

বীরেন বিস্কুটের টিন খুলিবেছিল, দেখিল, নারায়ণীর ছই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'কাদবার কি হ'য়েছে ? কাঁদছে যে ?'

'কিছুই হয়নি।' বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ

ছইটা তাহার মুখিয়া লইল।

বীরেন তাহার ছেলোটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে

লাগিল, 'দেখু দেখু, মা'টা তোর ভারি বোকা, বুদ্ধ্য-বুদ্ধি গুর ক'খনো হবে না।'

দেবু যাড় নাড়িয়া বলিল, 'হী, বোকা। কে বোকা বাবা ?'

'তোমার মা।'

'মাকে ব'লে আসব ?'

বীরেন বলিল, 'তোর ওমা নয় রে, এই মা। এই

যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই মেয়েটা।'

'তোমাদের সঙ্গে ব'কে কি হবে, আমার রান্না

প'ড়ে আছে, আমি যাই—'বলিয়া নারায়ণী রান্নাঘরে

চলিয়া যাইতেছিল, বীরেন বলিল, 'শোন। কেন উঠে

যাব বললাম, বুঝতে পারলে না ?'

'বোকা। মাহু, কেন ক'রে বুঝব বল।'

বীরেন মূখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'আমাদের

এই ছেলোটাকে বুড়ী ভালবেসে কেসেছে। আমরা

যত যাব যাব করব ও তত আমাদের এখানে ধ'রে

রাখতে চাইবে। তা' জান ?'

নারায়ণী বলিল, 'কি জানি বাপু, অত সব বুঝি না।'

বীরেন আবার হঠাৎ তীব্রকার করিয়া উঠিল,—

'বোঝো না ত' যেমন মাহু তেমনি চুপ ক'রে থাক।'

আবার হঠাৎ এখনই একটা বিজী কাণ্ড বাধাইয়া

বসিবে ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে নারায়ণী সেখান হইতে

সরিয়া গড়িল।

বীরেন বলে, 'দেখ না ও-রোটাকে দিয়ে আমি এই বাড়ীখানা খোকার নামে লিখিয়ে নেবো।'

নারায়ণী বলে, 'ওগো, তোমার ছুটি পায়ের পড়ি,

ও-সব কথা তুমি চেটিয়ে ব'লো না। মা যদি

শুনতে পান ত' ভারি খারাপ হবে।'

বীরেন বলে, 'ওই ত' তোমাদের দোষ। ভয়েই

ওর বাড়ী ? কে আছে ?'

'কেউ নেই, কিন্তু বাড়ী উনি সেবেন কেন ? তুমিই ত' মাকে সেদিন চাটয়ে দিয়েছ।'

বীরেন হাসিতে থাকে। বলে, 'দেখ, মেয়ে-মাহুদের কাছে যদি কিছু আদায় করতে হয় ত' জোর ক'রেই করা উচিত। নরম হ'লে মেরো

কিছু দেয় না, তখন পরে বসে।'

নারায়ণী চুপ করিয়া শোনে। মূখ দেখিয়া মনে

হয়, কথটা সে বিশ্বাস করে নাই।

বীরেন বলে, 'বিশ্বাস হ'ল না ? তোমার নিজের

কথাই ভেবে দেখ না। আগে যখন তোমার আমি

গুর শাসন করতাম, সব খেতাম, বাড়ী আস্তানা না,

এতটুকু আদর ক'রে কথা বললে গ'লে একেবারে ক্ল

হ'য়ে যেতে। আর, আজকাল হ'য়েছ ঠিক তার উল্টো,

ভয় ত' মোটেই কর না, মুখের ওপর জ্বাব লাও,

দিনকতক পরে হয়ত আমাকে অপমান করতেও

বাঝবে না।'

নারায়ণী বলে, 'হা' তা' ব'কছ কেন, চুপ কর। আজ

তোমার নেশাটা একটুখানি বেশি হয়ে গেছে।'

'নেশা ?' বীরেন আবার হাসিতে হাসিতে বলে,

'নেশা আর আমার তোমার। করতে দিলে কোথায়,

রাগী ! ছেলেলোয়ার ভাবতাম, বড়লোক হ'ব, অনেক

টাকা কড়ি হবে, জীবনটা বেশ স্নেহেই কাটিয়ে

দেবো। কিন্তু বড় হ'য়ে দেখলাম, বড়লোক ত' হ'লামই

না, দুখে-দুখে বুকা একেবারে ঝাঁঝুরা হ'য়ে গেল।

দুখু-ভোলুবার জন্তে বন্ধদের পাল্লায় প'ড়ে নেশা ধরলাম।

ভেবেছিলাম, নেশার ঝেঁকই কোনরকমে সব-কিছু

ভুলে থাকব। কিন্তু তাতেও তোমরা দুই মাসে আর

ছেলেয় বাস পাখো। এখন দেখছি—তোমরা আমার

ভাল-মাহুদ না ক'রে আর ছাড়বে না।—বড়জা বেশি

ব'কছি, না ? আজ্ঞা, এই চুপ ক'রে রইলাম।'

ব্যাপার দেখিয়া নারায়ণী মূখ টিপিয়া হাসিতে

লাগিল। হাসিটা বীরেন দেখিতে পাইয়াছিল। বলিল,

'হাসছ বুঝি ? হাস। কিন্তু দেখ, তোমরা আমার হত

খারাপ মাহু ভাব, তত খারাপ আমি নই। খারাপ



বতুই আমার হ'তে হয়, সে শুধু আমার অভাবের জন্তে। তা' নইলে হাতে যদি আমার অনেক টাকা থাকত, তোমাদের যদি আমি খুব স্বখে রাখতে পারতাম, তা'হলে দেখতে, আমার স্থাব্যতিকে বেশ একেবারে ভরে যেত।' আচ্ছা বাবু, কথা কইব না ভাবলাম, আবার কথা কইছি।—দেবু খুমিয়েছে?'

দেবুর বিদ্বানার দিকে তাকাইয়া তাহাকে একবার দেখিয়া লইয়া নারায়ণী বাড়ি নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, খুমিয়েছে।'

বীরেন বলিল, 'তুমি ধাঁড়িয়ে রইলে বে? উঠ এল। এম, আমরা খোকার কথাই বলি।'

নারায়ণী খাটের উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে গিয়া বলিল, 'বলিল, 'তোমার কি মনে হয়, খোকা বড় হ'য়ে খুব রোজ্জার করবে?'

বীরেন বলিল, 'করুক আর নাই করুক, আমাদের ভাবতে দোষ কি।'

নারায়ণী ঈশং হাসিয়া বলিল, 'আমার ভাবতে বেশ লাগে। এক-এক সময় এক-একা ঘরের কাজকর্ম করতে করতে আমি ওই সব কথা ভাবি। ভাবি—খোকা আমাদের বড় হ'য়েছে, বৌ ঘরে এসেছে, খোকা খুব রোজ্জার করছে, আর আমরা ছই বুড়ো-বুড়ী ব'সে ব'সে তাই দেখছি, আর আনন্দ করছি। কিন্তু সে ভাগ্যি কি আর আমাদের হবে? আমরা হয়ত কষ্ট ক'রেই যাব, ছেলের স্বখ আর দেখতে পাব না।'

বীরেন বলিল, 'আর আমি কি ভাবি জান? আমি ভাবি—হঠাৎ একদিন আমার ভ্রাতৃনক অশ্রু কল্প, হাতে ডাক্তার দেখাবার পরমা নেই, অথচ বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্তে অতি কষ্টে হয়ত হাঁসপাতালে পোলাম। পরমা অভাবে, লোক অভাবে তোমরা হয়ত আমার স্থানো দেখতে বেতেও পারলে না। আমি সেইখানেই ম'রে পোলাম। খবর পেয়ে তোমরা—'

বীরেনের মুখশানা নারায়ণী তাহার হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

হাতটা সরাইয়া দিয়া বীরেন বলিল, 'কিন্তু মৃত্যু যদি

এমনি ক'রেই আসে তাকে ত' তুমি আটকতে পারবে না, রাণী! অথচ আজ হোক, কাল হোক, মৃত্যু একদিন আসবেই। তখন তোমরা পথে বসবে। এখন অবশ্য আমি মারা গেলে একহাজার টাকা তোমরা পাবে, কিন্তু সে একহাজার টাকা আর ক'দিন। তারপর? এই দুঃখের ভূনিয়ার নিত্যন্ত অসহায় একটি নাবালক ছেলে কোলে নিয়ে তোমার মত চিরভূমিহীন একটি বিধবা মেয়ে—ভাবতেও কষ্ট হয়, নারায়ণী, মনে হয়, বিসে-খা না হ'লেই ছিল ভাল। তাই আমি মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে অনেক সময় ভুলে থাকি।'

ভবিষ্যৎ জীবনের স্থখ-শান্তির আলোচনা করিতে গিয়া এই দুঃখের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তখন হৃৎনেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বীরেনই প্রথমে তাহাদের সেই অবস্থিত নীরবতা ভাঙিবার চেষ্টা করে। নারায়ণীকে সাধনা দিবার জন্তই বোধ হয় হাত বাড়াইয়া তাহার একধানি হাত নিজের হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া বীরে বীরে বলিতে থাকে, 'এ সমস্ত ত' সকলের জীবনেই আছে, নারায়ণী! মানুষ বাঁচবার জন্তে চিকিৎসা আসে না, মরতে তাকে একদিন হয়ত। তাই ব'লে মরবার কথা দিবারাশি ভাবলে ত' আর কোনও কাজ চলে না। ভেবে না। অতুটে যা' আছে তাই হবে।'

নারায়ণী কোনও কথা বলিতেছে না দেখিয়া বীরেন তাহার হাতখানি একবার নাড়িয়া দিয়া বলে, 'কি ভাবছ?'

নারায়ণীও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'ভাবছি—তোমার আগে আমি যেন মরতে পারি। ভ্রমাবানের কাছে শুধু আমার ওই একটি প্রার্থনা।'

এমনি করিয়া নিজের দুঃখের আলোচনা করিতে করিতে এই ছই স্বামী-স্ত্রী কখন একসময় যে ঘুমাইয়া পড়ে, নিজেরাই বুঝিতে পারে না। তাহার পর অতি প্রত্যুষে দেখা যায়, প্রতিদিনের অভ্যাস মত নারায়ণী সর্বাঙ্গে শয্যাভাগ্য করিয়া গুথের কাজকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে।

দেবু সেদিন সকালে উঠিয়াই টুক টুক করিয়া শিঁড়ি বাহিয়া কখন যে উপরে উঠিয়া গিয়াছে, কেহই বুঝিতে পারে নাই। মাসি আজকাল কখন যে বাড়ীতে থাকে, কখন যে বাহিরে হয়। যায়, কখন র'খে, কখনই বা ধায়—কেহই বড় একটা টের পায় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, সে তাহার উপরের ঘরের নেশের এক পাশে মাটিতে ঝাঁচল বিছাইয়া শুইয়া আছে। একটা মাজ মাছসেব কি-ই বা কাজ! তাহার উপর রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই তাহার শয্যাভাগ্য করার অভ্যাস চিরকালের। কাজকর্ম সারিয়া সেদিনও মাসি তেমনি নেশের একপাশে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল।

দেবু তাহার কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'মা!' আমচুকা চমকিয়া উঠিয়া মাসি একবার চোখ মেলিয়া দেখিল। অশ্রু হইতে উঠিয়াই দেবু আজ আর থাকিতে না পারিয়া অব্যাহিত ভাবে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা করিল, তাহাকে আদর করিয়া হাত বাড়াইয়া কোলের কাছে টানিয়া আনে, কিন্তু কিসের যেন একটা দুরন্ত অভিমান মাসিকে পাইয়া বলিল। আবার চোখ বুজিয়া সে যেনম পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়াই রহিল,—দেবুর ডাকের উত্তর একটা সাড়া পর্যন্ত দিল না।

দেবু আবার ডাকিল, 'মা!' হাত দিয়া মাসি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, 'তুই আবার এখানে কেন এসেছিস? বাবা, নীচে যা। দেখতে পেলে তোর বাবা এগুনি ব'কে আর কিছু বাব রাখবে না।'

দেবু বলিল, 'না, বাবা বকেবে না, তুমি ওঠো।' মাসি চুপ করিয়া রহিল।

দেবু এবার তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিতে লাগিল।—ওঠো। পদ্ম নাইতে যাবে না?'

মাসি বলিল, 'না, আমার অশ্রু করেছে।'

দেবু তখনো জুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। দেখিত, তাহার বাবা তখনও চোখ বুজিয়া বিদ্বানার পড়িয়া আছে। সেদিন তাহার অশ্রুত্বের সময় পাথরের

যে বল-হুড়ি ও একশিশি মধু কিনিয়া আনা হয়।ছিল, তাহাই সে হাতে লইয়া আবার চুপি চুপি উপরে উঠিয়া গেল। দেখিল, মাসি তখনও তেমনি পড়িয়া আছে। থলের উপর শিশির ছিপি খুলিয়া একটু মধু ঢালিয়া হুড়ি দিয়া তাহাই মাড়িতে মাড়িতে দেবু বলিল, 'নাও, তোমার গুণ্ড এনেছি, খেয়ে ফেল, ভাল হ'য়ে যাবে।'

মাসি একবার আড়চোখে ব্যাপারটা দেখিয়া লইল। এবারও ভাবিয়াছিল সে চুপ করিয়া থাকিবে, কিন্তু দেবুর জ্বরহাতি, সে এক ভীষণ ব্যাপার!—অশ্রুত্ব যখন করিয়াছে, ঔষধ তখন তাহাকে বাইতেই হইবে।

মাসি তাহার হাত হইতে নিম্নত পাইবার জন্ত বলিল, 'গুণ্ড তুমি ওইখানে রেখে বাও, আমি এখনও জ্বর খাই নি, কাল একাদশী গেছে—'

একাদশীর দিন মাসি উপবাস করে এবং তাহার পরের দিন সকালে উঠিয়াই সে মিছরি সরবু খায়, দেবু তাহা জানে। তাই সে ঔষধের বলহুড়ি ঘরের একপাশে নামাইয়া রাখিয়া আবার তাহাদের নীচের ঘরে নামিয়া গেল। তাহার অশ্রুত্বের সময় বে মিছরিটা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার সখশানি সে খাইতে পারে নাই, বাকিটা এখনও তাহার বিদ্বানার তলায় রহিয়াছে। দেখে সেই মিছরিটা হাতে লইয়া আবার উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া আর কোনও কথা না বলিয়া মাসির গ্লাস লইয়া ফুঁধো হইতে থানিকটা জল দেখে ফেলিল, থানিকটা ঢালিল, তাহার পর মিছরির ঢেলাটা লইয়া সে সরবু তৈরি করিতে বলিল।

ব্যাপারটা মাসির মন লাগিতেছিল না। এমনটো তাহার জন্ত কেহ কখনও করে নাই।

মাসি মাথা তুলিয়া ডাকিল, 'শেনু!'

মিছরির ঢেলাটা কিছুতেই গলিতে চায় না। 'হাই' বলিয়া দেবু গ্লাসে গ্লাসে ঢালাঢালি করিয়া আরও বারকতক সেটা গলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া শেষে গ্লাস ছুটো ছেঁইনেই নামাইয়া রাখিয়া মাসির কাছে গিয়া বলিল, 'কি বলছ?'



‘বোঁস’ বলিয়া মাসি তাহার হাতে ধরিয়া তাহাকে বসাইল।

‘হাঁরে দেবু, তুই আমার এত ভালবাসিদ্?’

দেবু মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কোনও কথা বলিল না।

মাসি বলিল, ‘আচ্ছা, আমার এই যে অস্থব্ব করেছে, আমি যদি ম’রে যাই খোকন্-’

কথাটা বলিতে গিয়া কি জানি কেন অদম্য বাশোঙ্কসে কণ্ঠ তাহার বন্ধ হইয়া গেল, কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না এবং চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া মাসি ভিজাঙ্গা করিল, ‘হাঁরে, আমি ম’রে গেলে কি কবির? কাঁবির?’

দেবু তাহার গায়ে একটা চড় মারিয়া দিয়া বলিল, ‘হাঃ!’

‘হা নয় বাবা, আমাকে মিছেমিছি ভাল তুই আর বাসিদ্ নি।’

বলিয়া মাসি ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, তাহার পর হাত বাড়াইয়া দেবুকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, ‘নীচে তোর বাবা রয়েছে?’

বাড় নাড়িয়া দেবু বলিল, ‘হা।’

‘তুই এখানে এসেছিদ্ তা’ সে দেখেছে?’

দেবু বলিল, ‘হা-রে, আমি লুকিয়ে পালিয়ে এলাম যে! দেখতে পায় নি।’

মাসি বলিল, ‘দেখতে গেলে কিন্তু তোমায় বকেব।’

‘হাঃ, বকেব কেন?’

মাসি বলিল, ‘হ্যাঁ বকেব। তুমি জান না বাবা,

তার চেয়ে তুমি আর আমার কাছে এস না।’

কথাটা সে যে কি-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, তাহা জানিলেন একমাত্র তাহার অন্তঃকামী। কিন্তু দেবু সেরুখা বিবাস করিল না।

বলিল, ‘হ্যাঁ, আসূবে না।’

মাসি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ‘লগ, তোমার গিরে আসি।’

এমন কথা মাসির মুখে দেবু কোন দিন শোনে নাই। তাই সে একবার অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, ‘হাঃ! তাহ’লে অস্থব্ব তোমার করে নি। মিছে কথা?’

মাসি বলিল, ‘না বাবা, মিছে কথা নয়, অস্থব্ব করেছে। চলা।’

‘না, যাব না।’—বলিয়া দেবু ছুটিয়া একটুখানি দূরে চলিয়া গেল।

মাসি তাহার পিছু পিছু গিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। বলিল, ‘এ ত ভারি বিপদে পড়লাম বেথেছি। দেবু, যা বৃদ্ধি, নইলে আমি কিছু বাকি রাখব না।’

বাটের তলা দিয়া গিয়া দেবু ওপাশে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মুখ ভারি করিয়া বলিল, ‘আমি যাব না।’

মাসি এইবার একটুখানি শক্ত হইয়া উঠিল। কক্ষকণ্ঠে কহিল, ‘যাবি না কি-রকম?’

দেবু বলিল, ‘না, যাব না। আমার পাড়ী দাও, আমি খোঁসা করব।’

দেবুর অস্থব্বের রাজে বীরেনের কথা শুনিয়া মাসি তৎক্ষণাত্ উপরে গিয়া দেবুর টিনের পাড়ী, বান্ধি, খেলনা, কাপড়-কামা, যাবতীয় বস্তু তাহার কাছে ছিল সবই একটা পুঁচিলিতে বাঁধিয়া ঘরের এককোণে নামাইয়া রাখিয়াছিল। সেইদিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া মাসি বলিল,

‘জুঁখানে সব বেঁধে রেখেছি, নিয়ে যা।’

এমন করিয়া তাহার সব জিনিষ একসঙ্গে পুঁচিলি বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে দেবু বৃষ্ণিল না, ভাবিল, অমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পাড়ীটা হুহু তাহার ভাবিয়া

যাইবে, তাই সে চাঁৎকার করিয়া উঠিল, ‘কেন তুমি বেঁধে রেখেছ, পাড়ীটা আমার ভেঙ্গে যাবে, তুমি খুলে দাও।’

‘এ ত আমি ভারি বিপদে পড়লাম দেখছি।’

বলিয়া মাসি তৎক্ষণাত্ ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার রেলিং-এর কাছে গিয়া ডাকিল, ‘বলি ও বোমা, তোমার ছেলে নিয়ে বাও ত বাছা।’

রাগ করিয়া এমন কথা যে যে আজ বলিলে, নারায়ণী তাহা জানে। তাই কথাটা সে শুনিয়াও শুনিল না।

মাসি আর-একবার ডাকিল।

নারায়ণী এবারেও চুপ।

মাসি তখন বোধকরি বীরেনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, ‘কাজ কি বাপু আমার শুকুনো ভালবাসায়! আমি বুড়ী মাগী—ছেলে মাহুব কর্তে জানি না, সন্দেহ করে যেখানে সেখানে নিয়ে যাই, ছেলের অস্থব্ব করে, তা’ বেশ ত’, ছেলেকে আমার কাছে আসতে বারণ ক’রে দিলেই ত’ হয়! আমি ত’ বাপু এত ক’রে বৃদ্ধি, তবু ত’ নড়ে না।’

এই বলিয়া মাসি আবার ঘরে ঢুকিল। কিন্তু এবার সে আর ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া রহিল না, তাড়াতাড়ি দেবুর কাছে গিয়া ‘তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া হিড়, হিড়, করিয়া তাহাকে টানিয়া সেখান হইতে অতি নিষ্ঠুরভাবে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া বলিল, ‘হা বাপু হা, কাজ নেই আমার ভালবাসায়, কথার গল্পনা সইতে আমি পারব না।’

দেবু মুখ ভার করিয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মাসি দেখিল, চোখ দুইটা তাহার ছন্দ ছন্দ করিতেছে। তবু সেদিকে সে জ্ঞপ্তেও না করিয়া ঘর হইতে

প্রথমে তাহার জিনিষদ্বয়-বাঁধা কাপড়ের পুঁচিলিটি, পরে বগলছড়ি, মধুর শিশি এবং মিছরি-ভিজানো গ্লাসট লোহার করিয়া চৌকাঠের বাহিরে নামাইয়া দিয়া

বলিল, ‘পরের ছেলে মাহুব করার সাথ আমার মিটেছে বাবা, এবার যা!’ বলিয়া উজ্জ্বলিত ক্রন্দনের বেগে একবারে তাহার পড়িয়া দরজাটা মাসি তাহার

চোখের দ্বন্দ্বখেই চুঁহাট দিয়া সজোরে এবং সপক্ষে বন্ধ করিয়া দিল।

এ কয়দিন নারায়ণীর সঙ্গে মাসি ভাল করিয়া কথা

বলেন নাই। মাসি যে রাগ করিয়াছে, নারায়ণী তাহা

বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও সে তাহার রাগ ভাগ্যবাহির

অবদর পায় নাই। ভারিয়াছে, দেবু সারিয়া উঠুক, তাহার পর মাসির কাছে গিয়া একদিন সে ভাল

করিয়া কথা বলিয়া আসিবে। স্বামী তাহার অন্তর করিয়াছে, স্নেহ-কথাও জানাইবে এবং তাহার জন্ত

মাসির গায়ে ধরিয়া কমা চাহিতেও সে কল্পন করিবে না।

বীরেনকে সেদিন বিছানা হইতে তুলিয়া নিতে আসিয়া নারায়ণী দেখিল, দেবু ইহারই মধ্যে উঠিয়া

বোধকরি মাসির কাছেই চলিয়া গিয়াছে। পাছে স্বামী কিছু বলে তাবিয়া দেবুর সন্দেহ কোন কথাই না

জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, ‘ওটা গো, আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে?’

বীরেন বলিল, ‘উঠি।’

নারায়ণী বলিল, ‘রান্না যে আমার শেষ হ’রে এল। চাই বা কখন খাবে, তাহাই বা কখন খাবে?’

বীরেন বলিল, ‘চা আজ আর খাব না। এক গ্লাস সরবৎ ক’রে দাও।’

সরবৎ করিবার জন্ত তিনি র সন্ধান করিতে গিয়া

নারায়ণী দেখিল, ঘরে তিনি নাই। হঠাৎ তাহার

মনে পড়িল, দেবুকে মা সেদিন অনেকখানি মিছরি

দিয়া গিয়াছে। কিন্তু মিছরির অতরুড় চেনাটা কোথাও সে বুজিয়া না পাইয়া ডাকিল, ‘দেবু!’

নারায়ণী জানে, সে নিশ্চয়ই উপরে গিয়াছে। তাই সে সিঁড়ির কাছে গিয়া আবার ডাকিল, ‘দেবু!’

কিন্তু দেবুর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নারায়ণী তখন বীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে

উঠিয়া গেল এবং সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছিয়া যে দৃশ্য তাহার নজরে পড়িল, তাহাতে তাহার আর

বিষয়ের সীমা রহিল না। দেখিল মার ঘরের দরজা বন্ধ এবং সেই বন্ধ দরজার বাহিরে চৌকাঠের কাছে ছেলে তাহার বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। চৈতনের ইহারই মধ্যে বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং দম্ভিত্যের

বায়ান্দা অতিক্রম করিয়া সে-দোর আসিয়া পড়িতেছে



দেবুর গারে। রৌদ্রে সে ঘামিরা উঠিয়াছে, তবু তাহার সেরিকে হ'ল নাই। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে, কান্দছিলে বে ? না বুঝি এখনও দরজা খোলেন নি ?—ওমা, এই বে মিছরি ঢেলাটা! তবে আর আমি মিছরি খুঁজলে পাব কোথায়! এ কি রে, এত বড় এই মিছরি ঢেলাটা পেলাসে দিয়ে জল ঢেলেছ কেন ?'

দেবু বলিল, 'মার অশ্রুত করেছে বে !'

'অশ্রুত করেছে ? কেমন ক'রে জানলি ? দরজা বন্ধ বে রে ! মা! মা!' বলিয়া নারায়ণী নিজেও বারকতক দরজাটা ফোটেলি করিল, কিন্তু দরজাও খুলিল না, মার কোন সাড়াও পাওয়া গেল না।

'এ ঝলহড়ি কে আনলে ? আর এই মধুর শিশিটা ?'

দেবু আবার বলিল, 'বললাম ত' মার' অশ্রুত করেছে !'

'তাই বুঝি মাকে ওষুধ খাওয়াতে এসেছ ?' বলিয়া ঈবং হাসিয়া সে কাপড়ে-বাঁধা পুটলিটার হাত দিয়া বলিল, 'এতে কি আছে ?'

বলিয়াই সেটা সে খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, দেবুর কয়েকখানি হাড়-প্যান্ট, কাপড়-জামা, টিনের বাঁশী, রেশের গাউ, মোটরকার, পুতুল ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ তাহার মায়ের ঘরে ছিল, সবই একসঙ্গে বাঁধিয়া

রাখা হইয়াছে। ইহার অর্থ সে ভাল করিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব এখানে কে রাখলে, দেবু ?'

কথাটা বলিতে গিয়া দেবুর মুখখানা আবার কান্দ-কান্দ হইয়া উঠিল, বলিল, 'মা আমাকে তড়িয়ে দিলে !'

এবার আর বুঝিতে তাহার কিছু বাকি রহিল না। চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া বসিয়া একবার কি যেন সে ভাবিল, তাহার পর জিনিষ-পত্রগুলি খুলিয়া লইয়া দেবুকে বলিল, 'চল !'

দেবু বলিল, 'না, যাব না।' 'যাবি না ? এই রোদুরে ব'সে ব'সে কান্দবি ? চল বাবা, চল—আজ সব জর থেকে উঠেছিল—চল।'

দেবু বলিল, 'না, ও দরজা খুলবে না কেন ?'

নারায়ণীর এবার সত্যই বড় ভয় হইল। তাহার স্বামী না হয় ছুটা কথা তাহাকে বলিয়াছে, তাই বলিয়া বে-ছেলে তাহাকে এত ভালবাসে, তাহাকে এমন করিয়া এই রৌদ্রের মাঝখানে তেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া, দরজায় বিল বন্ধ করিয়া যদের মধ্যে তিনি চুপ করিয়া রহিয়াছেনই বা কেমন করিয়া!...

নারায়ণী এইবার গোর করিয়াই দেবুকে একরকম টানিতে টানিতে নীচে নামাইয়া আনিল।

(ক্রমশঃ)



## ভালোবাসা—মরে মেও

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আজ্ঞো ডাকিতেছি প্রিয়া,

মোর আসো নিতে নাই—

ডাকিতেছি মোর জীবন-মরণ সকল চিত্ত দিয়া।

কত দিবসের কত কথা আজ্ঞো সে আলোকে পড়ি তাই।

ডাকিতেছি মোর চোখের সলিলে সাগর রচনা করি',

আজ্ঞো পড়ি তব নথ বৃক্কের মাঝখানে মাথা রাখি',

ডাকিতেছি মোর উষ্ণ শোণিত অর্থা-পাত্রে ভরি'।

ঈদর আমার যে কথা ক'য়েছে নিশীথ রাজি জাগি'।

উষ্ণ শোণিত—টপ্ টপ্ করি' ফুটে বা মর্শ্ব তলে,

হুটুই দেহ যবে এক হ'রে গেছে বাহিত বাহতলে,

কামনার দাহ—বলির জালা যার মাঝখানে জলে।

আজ্ঞো পড়ি তার মিলনের লেখা করুণ কোতুলে।

তুমি জালায়েছ কামনার দাহ—নীল গরুর শিখা,

পড়ি ব'সে ব'সে যে কথা গিধিত অধরে—অহুস্মণ,

মরণ-মরণ তীরে তীরে তারা আঁকিছে তুমার লিখা।

গাঢ় চুখন আঁকিবার ছলে ক্ষুধিত মুগ্ধ মন।

মরণ পিপাসা—যত পোড়ে আরো পুড়িবারে চায় তত,

অলিখিত পুঁথি—যত পড়ি হার বেড়ে যায় কথা তার,

তাই তো তোমারে ডাকিতেছি প্রিয়া—ডাকিতেছি

জুঁজনার পড়া একা পড়ি আজ—পড়িতেছি বারবার।

অবিরত।

কতদিন চলে যায়—

ভালোবাসা মরে মেও—

কতদিন আজ বসি নি তোমার এলো অঙ্গের ছায় !

আমার চেয়েও ভালো ক'রে আর একখা জানে না কেও!

তোমার 'টোপো'র ডাকে নাই তুমি কতদিন চলে গেছে,

আমার কামনা ঘুচেছে তোমার, তবু মোর এই বৃক্ক,

'ওপো'ন্নি কি ক'রে 'টোপো' হ'য়ে গেল তাও মনে পড়িতেছে।

তুমি জেগে আজো মহারহস্য অনন্ত কোতুলে।

পথে যেতে যেতে সহসা সেদিন সফন সাগর কুলে,

তুমি জেগে আজো শ্রুতির অন্তলে স্তম্ভ পদ্যদম,

নীল আঁধি কোনো বিদেশী নারীর ছুঁয়েছিছ বাহুল্যে—

তুমি জেগে আজো বর্গমানের সকল ছুঁতে মম।

অভিমান তব ঠোঁটের ছায়ারে থনাগো মেঘের রেখা,

তুমি জেগে আজো যে জন এখনো নামে নি খাজা-পথে,

সেই রেখাটিও বার বার আজ অরণে দিতেছে দেখা।

অনাগত সেই ভবিষ্যতের অশ্রু-ধৌত রথে।

সাগরের ফেনা ফণা তুলে' তার দিয়েছিল যত প্রণ,

তোমার দিকের আলো নিভে' গেছে—আমার মর্শ্ব মাঝে

ভুলে' গেছি সব—ভুলি নি তোমার কঠিন ক্রুদ্ধ মুখ।

যে আলো তোমার নিজ হাতে জালা তেমনি সে

ছোট কথা সব বড় হ'য়ে ওঠে শ্রুতির পুঁথির পরে,

তাজা আছে।

আঙনের শিখা রেখা টেনে যায়—অশ্রুবিধু স্বরে।



মিছে কথা তারা কর—

যারা বলে—এম শুধু বিশ্বাস, নেই তাহে সংশয়।  
পলে পলে মনে সংশয় জাগে, অবিশ্বাসের মায়া  
কত বাণেশ বৃন্দ তোলে, কত রূপে ফেলে ছায়া।  
কত বাণ তুমি কত না রকমে হেনেছ আমার বুকে,  
বাধা বাজিয়াছে, ব'লেছি কত কি নিষ্ঠুর কোঁড়কে।  
তবু আজ বৃষ্টি—তারি মাঝে ছিল সঙ্গী

প্রেমের ভাষা,

তারি মাঝে ছিল তোমার মনের অক্ষরনো ভালোবাসা।

সংশয় পেছে, প'ড়ে আছে শুধু বিচারের শত হল,

শুধু বিচার—তার মাঝে ফোটে প্রেমের পয়লল।

দেহ দিয়েছিলে জানি—

জানি তারে নিয়ে আজে করা যায় যত খুশী টানটানি।  
দেহ-তীর্থের পূজারী যাহারা, নারী-মাংসের জাগি'  
লোনুপ জুখার বলি যাদের নগ্নে র'য়েছে জাগি',  
খুশী হোক তারা—মনহীন দেহ আমার নিকটে আত  
শোনা প্রিয়ে, কই—ভোগ ক'রে জানি, কোনো লাম  
নাহি তার।

প্রাণ চেয়েছিহ, পারো নাই দিতে—তাই তো এসেছি স'রে,

এই বিরহের বিষের পেয়েছি পিইছি পেয়োলা ভ'রে।

প্রিয়েরে তোমার হারায়েছ তুমি, আমি হারায়ে নি প্রিয়া,

তাই তো তোমারে ডাকিতেছি আজো সকল চিন্তা দিয়া।

ভুক্ত ওয়ারম্

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী

আজ্ঞে — কৰ্মকাণ্ড

ছিলেন সাব্বেরিজিষ্টার, — শেষ-বয়সে একসঙ্গে  
মাধার সাদা চুল এবং সিলুকে সাদা টাকা সঙ্ঘ করিয়া  
লইয়া, প্রবাস হইতে স্বগ্রামে আসিয়া বসিলেন অবকাশ  
যানন করিতে। কিন্তু কৰ্মবীরী শ্রীনিবাস চট্টরাজ  
অবল অবসর উহার মাতে সহিবে কেন? ঋতি  
উঠিয়া দাড়াইলেন পরোপকারের পৈঠায়।

কি সৰ্মনাশ! — গ্রাম বে উৎসব বাহিতে বসিয়াছে!

নদী গিয়াছে কচুরি-পানায় ঢাকিয়া, — পুকুর-পুকুরি  
হাজিয়া মজিয়া একাকার, — জঙ্গলে আগাছার গ্রামের  
পথ সমাচ্ছন্ন। ঋদ্ধশীর্ণ শিশুরা সব, — গৃহাবরোধে  
বন্দি নী মাতৃজাতি, — নিরঙ্কম যুবকের দল। ইহা-  
দিগকে টানিয়া তুলিতে হইবেই! — শ্রীনিবাস গ্রামের  
শ্রী কিরাইয়া আনিতে তৎপর হইয়া স্বীয় গৃহের দিকে  
মুখ কিরাইলেন।

কিন্তু শ্রীদুল চট্টরাজ পরোপকার-প্রবৃত্তির পাথুরে  
চমায় গ্রামের ভূদ্বার যে কদাল-মুষ্টি নিরাক্ষণ  
করিলেন, প্রকৃতপক্ষে তদূর কদালসার অবস্থা তাহার  
ছিল কি? একটা শাখা-নদীর এপার-ওপার লইয়া  
পাশাপাশি দুইট গ্রাম। — নদী অবশ্য বাংলা দেশের  
অজ্ঞাত নদীর মতই কচুরি-পানায় আচ্ছন্ন, —  
বর্তমানে নদী না বলিয়া নালা বলাই সম্ভব। নদীর  
ওপারে, দ্বিতীয় গ্রামান্তরে রেল-ষ্টেশনটিকে কেন্দ্র  
করিয়া, গজ-গোলা-আড়ং সহ বেশ একটা ছোটখাটো  
সহরের মতই আবেষ্টন গড়িয়া উঠিয়াছিল — ডাকঘর,  
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতিরও অভাব ছিল না।  
মাইনর স্কুলটিকে গত বৎসর হইতে এন্ট্রান্স স্কুলে  
পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এপারে, যে গ্রামের  
কথা বলা হইতেছিল, সেটিতে সম্বন্ধে দুইদিন হাট  
বসে, — একট উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় ও একট টোল

আছে। গ্রামের মধ্যে দুইট পুকুর — একট দক্ষিণ  
পাড়ার পৌসাইদের, অপরট উত্তর পাড়ার চট্টরাজ  
পরিবারের। প্রাচীন কালের পুকুর হাজিয়া মজিয়া  
যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু পৌসাইদের পুকুরের জল  
তখনও পানের অযোগ্য হয় নাই, — যদিও উত্তর  
পাড়ার পুকুরটি অধিকারীদের স্বীয় অধুপস্থিতি ও  
অনবধানতায় অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামে  
সাধারণতঃ কুপের জলই উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইত।  
শ্রীনিবাস বলিতেন, — কুপমধুক যাহারা, কুপোদক  
তাহাদেরই একমাত্র কামা!

নবমস্কৃত বহির্লোকীয় প্রাপ্তে পায়চারি করিতে  
করিতে চট্টরাজ মহাশয়ের দুটি পড়িল সর্বাঙ্গে  
উহার পিতৃপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত স্থপতিসর গোড়ো  
পুকুরটিরই প্রতি; এবং বিতীয় দুটিপাত হইল—  
পার্শ্ববর্তী আগাছার ভরা বৃহৎ পতিত জমিখণ্ডের  
উপর। সমুখের দিকে খুঁকিয়া, পশ্চাদ্গদিকে উত্তর  
হস্ত কিরাইয়া কিছুক্ষণ তিনি স্বকর-পীড়ন করিলেন, —  
চম্-মান্নিগু উত্তর চকু-প্রান্তবর্তী নাসা-পৃষ্ঠভাগে দক্ষিণ  
হস্তের অন্তর্গত ও তর্জনী তাকনা করিলেন কিছুক্ষণ, —  
একবার জকৃৎখন স্থপরিষ্কৃত হইল, — তাহার পরই  
অপরূপ সৌমা হাসিতে তাঁহার মুখিত মৃদুত্ব রমা-ভা  
দারণ করিল।

দুই বৎসর পরের কথা। কে না স্বীকার  
করিবে, এই দুই বৎসরে চট্টরাজ-প্রবর্তিত পরোপকার-  
প্রণালি বেশ কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছে? উত্তর পাড়ার  
সেই মৃদু পুকুরটি, অপ্রাণিত গ্রামা যুবকদিগের

“শ্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী — ইন্দ্রই শ্রীতি। শ্রীতিই আমার কর্ণে একগণকার  
সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক।  
মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার শ্রীতি থাকে, তবে আমি অজ্ঞ মুখ চাই না।”

— বঙ্কিমচন্দ্র





শ্রমে, আজ বিগতপন্ন হইয়া 'শ্রিনিবাস সাগর'-রূপে নবযৌবন লাভ করিয়াছে; এবং সেই পতিত ভূমি-ভাগ-কি অলৌকিক তাহার পরিবর্তন!—প্রান্তর-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে অমর যুগ-প্রতিষ্ঠান—প্রান্তর ভাগে 'শ্রিনিবাস', প্রান্তর ভাগে 'অন্নপূর্ণক্ষেত্র'।

'শ্রিনিবাসের' তোরণ-মুখে একটু খেত-প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ শিখর-মুখি—লগাটনেত্রস্থানে বজাকারে খোদিত হইয়াছে, 'রাধা'। মুষ্টিটির ছোট বাহু হইদিকে প্রসারিত—বান বাহুতে উৎকর্ষী 'স্বর্জী', উহা 'অন্নপূর্ণ-ক্ষেত্র'কে নির্দেশ করিতেছে; দক্ষিণ বাহুতে উৎকর্ষী 'মংজী', উহা 'শ্রিনিবাস সাগর'র পথনির্দেশক।

দুই বৎসর মাত্র পূর্বে, একদিন চট্টরাজ মহাশয় তাহার গামের স্বদেশীয় শিল্পদের দেখিয়া, নিরানন্দ গৃহাবরোধে বন্দি নীচতাত্ত্বিক দ্রবণ করিয়া, নিরানন্দ মুকবিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃৎ প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং কল্পণায় আর্দ্র হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ছিলেন—ইহাদিগকে টানিয়া তুলিতে ইহঁদের। আপনাদ্বারা বহুল, সে-প্রতিজ্ঞা অশেষতঃ তিনি পালন করিয়াছেন কি না? অহমান নহে, প্রত্যক্ষ উদ্যান-মান' দেখুন,—

(ক) স্বদেশীয় শিল্পদের জ্ঞাত 'শ্রিনিবাস' প্রত্যহ প্রাতে হোমিওপ্যাথি রূপ হৈবতী-প্রসাদ বিতরণ করেন—অবশ্য নিবাসের মঙ্গল-ভাগের জ্ঞাত প্রতি পঞ্চমাত্রায় এক পয়সা করিয়া বৎসামাত্র প্রণামী গৃহীত হয়।

(খ) মধ্যাহ্ন-স্নাতঃ ছোট-মা'রা অর্থাৎ বালিকা ও না-বালিকা কুমারীরা শটন: শটন: নিরানন্দময় গৃহাবরোধ ত্যাগ করিয়া আনন্দের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে অগ্রবর্তিনী হইতেছেন। 'অন্নপূর্ণক্ষেত্র' স্বব-জী-সত্ত্বের সহিত সেই আনন্দের চাও অহুশ্লিষ্ট হয়। সব-জী-বিক্রয়কর অর্থ 'অন্নপূর্ণ-ভাগের' সঞ্চিত হইয়া থাকে; কৃষিগিগকে কিছু কিছু করিয়া শাক-সব-জী—মাসে দুই দিন—অপাততঃ উপহার দেওয়া হইতেছে।

(গ) যুবকবিশেষের উন্মেষের পরিচয় 'শ্রিনিবাস সাগর'-সংস্কৃতি ও 'শ্রিনিবাস সাগর' মৎস্যের চাককে অতিক্রম করিয়া 'শ্রিনিবাসের' মঙ্গল-প্রচারে তর-তর ক্রম-প্রবহমান। বিশেষ বিশেষ কক্ষের জ্ঞাত কৃষিগণকে পুরস্কৃতও করা হইতেছে। যথা—(১) 'মঙ্গল-ভাগের' প্রণামী-সংগ্রাহকগণ শতকরা মুদ্রা সপ্তদশক আশীশদ্বীপী স্বরূপ নিয়মিত ভাবে পাইয়া থাকে। (২) 'মৎস্যগদা বিভাগের' কৃষিগণকে 'শ্রিনিবাস সাগর'-যুত মৎস্য এণ্ডারের হাতে ও ও-গারের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত লভ্যাংশের এক-দশমাংশ সমভাগে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। (৩) এতদ্ব্যতীত, একজনকে প্রথম প্রচারকর্মী রূপে নির্দিষ্ট বেতন দিয়াও রাখা হইয়াছে।

—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বদান্ত ঐশ্বর্য্যকৃত্ত শ্রিনিবাস চট্টরাজ,—তাহাকে পাইয়া তাহার গ্রাম ও গ্রামবাসিগণ সত্যই আজ পৌরবাসিত—যত!

অতঃপর—

### মধ্যে — নার্দকাণ্ড

বর্ডিনের মনুষ্যে আজ সহর কলিকাতা হইতে আসন্সকা আলিয়া পড়িল—“হুৎ ওয়াবু”। চমকাইয়া উঠিলেন না,—ধীরে ধীরে হুৎ হুৎবিত্তর বলিতেছি।

অগ্রহাণ গিয়া পোষ মাস পড়িয়াছে। অগ্রহাণয়ে মহা দুর্ম্মময়ে 'অন্নপূর্ণক্ষেত্র' নবাবোৎসব হইয়াছিল,—এবার হইতেছে ততোধিক সমারোহের সহিত 'কপি-উৎসব'। কপি-উৎসবের আজ দ্বিতীয় দিন—কাল ধীরাধিকারপূর্ণ গিয়াছে, আজ ফুলকপি-পার্শ্বক।

কপিপাতারঙের সবুজ শাড়ী পরান বয়স্ক ফেব্রুয়ারিগীরা, তাহাদের পশ্চাতে বালিকারা, কেহ খোঁপায় কেহ বেলমূলে কেহ ফুলে ডাটা-ভাঙা ফুলকপির ফুল শুঁড়িয়া, পার্শ্ববর্তী চিত্রিত ফুলকপি-ফেব্রুয়ারি

চারদিকে ধীরে ধীরে গুরিয়া সপ্তপরিক্রমা সমাধা করতঃ সারি বাঁধিয়া গাড়াইলেন।

কিছু দূরে কয়েকখানি ঘোঁরায়ে, একভাগে ঐশ্বর্য্যকৃত্ত চট্টরাজ এবং গ্রামস্থ কয়েকজন মাতঙ্গর ব্যক্তি উপবিষ্ট,—অন্তভাগে ঐশ্বর্য্যকৃত্ত চট্টরাজগৃহিণী গুরুকে ফেব্রুয়ারী বা সপ্তপে ফেব্রুয়ারী, নিম্নগিতা বর্ষায়ী জনককে এবং চট্টরাজকন্যা কুমারী চিত্রময়ী চট্টরাজ বসিয়া ছিলেন। ফেব্রুয়ারী তাহার সমুখে সঞ্চিত একটি ছোট টেবিলের উপর হইতে একখানি লিখিত কাগজ তুলিয়া লইয়া তাহাতে একবার চোখ বুলাইলেন, পরে হে রূপধারময়ী পরদেশীয়া স্বব-জী-স্বন্দরী ফুলকপি, আমরা তো মা কে নমস্কার করি,—

‘তোমার’

কুমারী চিত্রময়ী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া স্বরচিত তোত্রাটু স্থর করিয়া পাঠ করিতে শুরু করিলেন। তিনি তোত্রের এক-একটি চরণ এক-একবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং দণ্ডায়মানা অদ্বন্দ্ব-বন্দি ফেব্রুয়ারিগীরা ও বালিকারা সমস্তকে কণ্ঠে অভিব্যক্ত করিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিলেন। তোত্রাটুটির ভাব-তাৎপর্য্য এইরূপ—

‘হে পরদেশীয়া স্বব-জী-স্বন্দরী ফুলকপি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি,—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর তুমি! তুমি আমাদের ঘরের মধ্যে ঘরদেশীয়া না হইলেও, তোমার আদর্শ আজ আমাদের ঘরে ঘরে গ্রহণ

করিতেছি, করিব; তুমি আমাদের সহায় হও। শুধু বিলাসের বস্ত্র ফুলই নও তুমি, অথবা কেবল খাদ্যসামগ্রী কপিই নও,—একাধারে তুমি ফুল ও কপি অর্থাৎ ফুলকপি! তোমার ফুল মিতার আমাদের মনের ক্ষুধা এবং কপির মিতার দেহের ক্ষুধা,—হে দেহ-মনোময়ী জীবন্ত স্বব-জী-স্বন্দরী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি,—আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর তুমি! গুরু?—না-ই বা থাকুক গুরু তোমার, রূপ তোমার কোন ফুলের চেয়ে কম? আর বাধাধারে তুমি তোমার কোথায় গো! হে রূপধারময়ী পরদেশীয়া স্বব-জী-স্বন্দরী ফুলকপি, আমরা তো মা কে নমস্কার করি,—



কুমারী চিত্রময়ী তোত্রাটু স্থর করিতেছেন

‘তোমার’

নমস্কার গ্রহণ কর তুমি আমাদের!’

প্রবল করতালি-ধ্বনির সহিত তোত্রাটু স্থরিত হইয়া পরে তোত্রের কথা ও হরের জ্ঞাত রচয়িত্রী কুমারী চিত্রময়ীকে মৌখিক স্বতন্ত্র বক্তব্য জ্ঞাপন করিয়া একজন বিশিষ্টা ফেব্রুয়ারিগীরা তাহাকে একটি তাড়া ফুলকপি উপহার দিলেন। তিনি উপস্থিত ফুলকপিটি দ্বন্দ্ব-শিরাস্থান সহ উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া

সেই ছোট টেবিলটার উপর রাখিয়া দিয়া, মুখ তুলিয়া নুহ হস্ত করিলেন।

ফেব্রুয়ারী তাহার করতঃ কাগজখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—‘কপি-নৃত্য!’



এবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন একজন গ্রামবাসী বিশিষ্ট বৃদ্ধ — রাইচরণ ভট্টশালী মহাশয়। ইনি গ্রামের সরকারী রাইচরণ খুড়া এবং ঐ নামে দশশানি গ্রামের লোকের পরিচিত। খুড়া ভবাবতাই একই কোলকুঁড়া,—বার্দ্ধক্যবশতঃ এখন কুজতর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাহার নিত্যসহচর তৈলপক্ষ বংশ-বধিষ্ট আন্দোলিত করিবামাত্র সমুখের সবুজ শাড়ীর দারি হইতে টুটয়া, সবুজ পরীর মত ছুটয়া আসিল ঘাসপাতি ছোট ছোট বালিকা। ক্ষেত্রপার্শ্ব আলম্বিত একটি পক্ষীর অন্তরাল হইতে অর্গ্যান বাজিয়া উঠিল। বালিকারা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া, পিঠি বাঁকাইয়া, মাথা নোয়াইয়া, গোড়ালির উপর পা ভাঙিয়া বসিয়া, পরস্পর বাহুতে বাহু জুড়াইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া সে কি নৃত্য ছড়িয়া দিল — অফুল্লনীর কপি-নৃত্য। এই নৃত্য রাইচরণ খুড়ার স্মারিত এবং বালিকাদিগকে স্বয়ং বহুকণ্ঠে তালিম দিয়া তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রথম-বৌবনে সখের থিটেটোরে নৃত্য করিয়া তিনি যে ‘মেডেল’ পুরস্কার পাইয়াছিলেন বসিয়া শোনা যায়, — এই বুদ্ধবয়সের আনন্দিত কপি-নৃত্যের নয়ান-ও দেখিয়া তাহার সেই নৃত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে কাহারও আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। নৃত্যজ্ঞানে অর্গ্যান বাজিয়া চলিল,—বালিকারা নৃত্য করিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় তাহার হাতের লাঠিট দূর হইতে দূর হইতে গোপে গোপে হেলিয়া-হুমিয়া, ব্যাঘ্রাসুর বৈঠকের ভঙ্গীতে ঘন ঘন উঠা-বসা করিতে লাগিলেন। সভ্যই সে এক স্বর্গীয় শোভনীয় দৃশ্য! হঠাৎ—  
আহা-হা! কি হ’ল,—কি হ’ল! — খুড়া হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেছেন বৃষ্টি! ভয় নাই,—ঐ যে তিনি আপনি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন — না, বিশেষ কিছু ব্যথা পান নাই তিনি! অনেকেই মুখে মু-কি-বাসি কুটয়া উঠিল, কেহ কেহ মুখ ফিরাইয়া ব্যস্ত-হাসি গোপন করিলেন। একটি বালিকা মুখে ‘আঁচল চাপা দিয়াও প্রবল মুক্ত-হাসির বেগ সামলাইতে না পারায় কুমারী চিন্ময়ী নিকট ভিরক্ততা হইল।

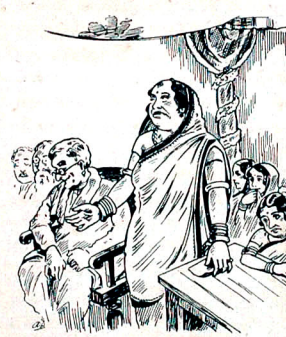
ক্ষেত্ৰমা পুনরায় উৎসব-সূচী পাঠ করিলেন,—  
‘কপি-কামিনী একাঙ্কিকা’।

একাঙ্কিকা অভিনীত হইল—‘কবি ফুল লইয়া তুলিয়া ছিল — করনা-বিলাসী বিভ্রান্ত কবি। পুষ্পিত লতাবিতানে বসিয়া জামিয়া জামিয়া স্বপ্ন দেখিত সে—  
মধুর মন্দির দিব্যস্বপ্ন! একদিন যায়, ছুইদিন যায়, তারপর জ্বিনের দিন — সেদিন দেহের কুখ্য মনকে তার মুড়াইয়া জাগাইয়া দিল বাস্তব জগতে।  
কুখ্য, — কুখ্য, — কুখ্য, — ফুলে ‘ত’ কই কুখ্য মিটে না রে! সহসা কপি-কামিনী আসিয়া কবির সমুখে দাঁড়াইলেন। কবি হাত বাড়াইল — তিনি দিলেন তার হাতে একাধারে ফুল ও কপি — যুগপৎ দেহ ও মনের কুখ্য মিটিবার অপূর্ণ যত্নীকৃত হুখ্য ফুলকপি।’  
— একাঙ্কিকার নায়িকা কপি-কামিনী পরিলেখে সমাগত ভ্রম মহোদয় ও মহোদয়াগণকে একধানি প্লেট হইতে একটুকরা করিয়া সমুদ্র কপিসিদ্ধ বিতরণ করতঃ ‘মধুরেণ সমাপয়ে’ করিলেন।

এবার ক্ষেত্ৰমা স্বয়ং উঠিলেন বক্তৃতা করিতে — ‘খুড়া মাহুদ আমি, এই বয়সের দাবীতে এবং এ বয়সে অনেক বেবেছি কুনেছি, এই জানের দাবীতে এই ক্ষেত্র-সভায় সামান্য কিছু বলতে সাহস করি, নতুবা তেমন কিছু দ্বিধা-বুদ্ধির জাহাজ নই আমি — সেকথা বরং কহিতে পারেন আপনারা ঠকে।’

অতুলি-সংকটে ক্ষেত্ৰমাতা ঠাকুরাণী এইখানে চট্টরাজ মহাশয়কে নির্দেশ করিলেন। চট্টরাজ মহাশয় স্থিত-হাস্তে ভূমিসম্বন্ধ নত-শ্রুতিতে বিনয় প্রকাশ করিলেন। ক্ষেত্ৰমা বসিয়া চলিলেন,—‘কিন্তু আমি বা’ বলছি, তা’ আমার আশ্রয় মধ্য থেকে পাওয়া — ধার করা নয়। আমার যুকের গহ্বর থেকে আমার আশ্রয়কন্ডই গুড়িয়ে থেকে কথা কইছেন — আমি নই। এটা পূবে-পশ্চিমে মিলবার ও মেলাবার যুগ; — একদিন আমার অন্তরবাসী এক বগলেন, তুমি তোমার গ্রামের মেয়েদের নিয়ে এই মিলনের সহস্র-তার বীণা বাজু’ একটা তার জুড়ে’ দাঁও না, মেয়ে। ব্রহ্মানন্দে বিপলিত হ’য়ে

ওর সঙ্গে এলাম গ্রামে চলে — তারপর এই প্রতিভা-প্রতিভা, — এই ‘অরপূর্ণাফের’।



‘সেকথা বরং কহিতে পারেন আপনারা ঠকে’

ক্ষেত্ৰমা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, কুমারী চিন্ময়ী টেবিলের উপর হইতে জলপূর্ণ কাচের গ্লাসটি তাহার দিকে আঘাইয়া দিলেন, তিনি ‘শ্রীনিবাস সাগরের’ নির্মল শীতল বারি পান করিয়া পুনর্বার আশ্রয় করিলেন,—  
‘আমাদের এই উৎসবের মধ্যেও পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের সহস্র-তার বীণায় তার জুড়বার হুম্ব ইঙ্গিত আছে। আপনারা জানেন, গত মাসে আমরা নবীন ধাঙে নবান্নোৎসব করেছি — আমাদেরই ঘরের জিনিষ সেই ধান। কিন্তু, কপি পরদেশী সব জী হ’লেও, এই কপি-উৎসব সেই নবান্নোৎসবেরই পরপৃষ্ঠা। কপি পরদেশী ব’লেই আমাদের এই উৎসব অরপূর্ণ এবং সার্থক। আমরা এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে জানাচ্ছি, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিদেশীয় জড়বাদও আমরা গ্রহণ করবুম — পূর্বের প্রাণশক্তির সঙ্গে পশ্চিমের কর্ণশক্তিকেও আমরা মিলিয়ে নিলুম। অজ দিক দিয়ে, উদ্ভিদের প্রাণবত্তা বীকার করে আমরা বিশ্বপ্রেমের প্রতিভা করলুম আমাদের এই —’

শ্রীমুকু চট্টরাজ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,— ‘হাঁ, আচার্য জগদীশচন্দ্র এই কথাই বলেন।’

ক্ষেত্ৰমা তাঁহার অর্ধসমাপ্ত বাক্য শেষ করিলেন,—  
‘বিশ্বপ্রেমের প্রতিভা করলুম আমাদের এই অর-পূর্ণাফেরে, আমাদের এই গ্রামে, আমাদের এই গ্রামের ঘরে ঘরে!’

কত তালি, জলুধনি, শম্বধনি — এই মিলিত বিশ্বনিশ্চয়বাদ ক্ষেত্ৰমার বক্তৃতার উপর সমভাবে বর্ষিত হইয়া ‘ফুলকপি উৎসবের’ সমাপ্তিকৃত ঘোষণা করিল। সকলে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিশিষ্ট-বিশিষ্টদের মধ্যে বিশদ-পূর্ণ অভিবাদন-প্রত্যভিধান চলিতেছে, এমন সময় ‘শিবনিবাসের’ দিক হইতে আত্মকলিকাতা-করের শ্রীমুকু অণ্ডমান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অণ্ডমান বানু আমাদের চট্টরাজ মহাশয়ের শ্রালক এবং তাহারই সম্মানিত গোষ্ঠ,—যদুনা শিবনিবাসের প্রচার-বিভাগের কর্মধাকার। ইনি গতকলা ল্যাণ্টার্ন-শেক্কার বা আলোক-বক্তৃতার জ্ঞত পূর্ণে কুম্বাইস-দেওতা কতকগুলি নুতন সুাইড্ এবং আরও ছোট নুতন লণ্ডন কিনিয়া লইয়া আসিতে কলিকাতা গিয়াছিলেন — আজ এইবার ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাস তাহার শ্রালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—‘খবর কি, অণ্ড? সুাইড্, লণ্ডন — সব এনেছ ত’?’

অণ্ডমান বলিলেন,—‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। আর এই দেখছেন আমার হাতে —?’

অণ্ডমান এক বাঙালি কাগজ উঁচু করিয়া ধরিলেন।  
—ও কি?’

অণ্ডমান মুখ গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন,—  
‘এ কি? এ হচ্ছে ছক ওয়ার্ন! হাসছেন? — হাসবেন না। আমার সঙ্গে এসেছেন কলকাতার বিখ্যাত লণ্ডন-বক্তা মিঃ মদন মণ্ডল, আমি নিমন্ত্রণ করে এনেছি তাঁকে, আজ সন্ধ্যায় কিছু বলাবেন এ সম্বন্ধে।’

এই বলিয়া শ্রীমুকু অণ্ডমান তাঁহার হাতের



কাগজের বাতিল পুলিশী শ্রীনিবাসের হাতে এক-খানি দিয়া, কয়েকখানি নিজের হাতে রাখিয়া, বাকী কাগজগুলি ছড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। চতুর্দিকে সোরগোল উঠিল—“হুক ওয়ারম্!” “হুক ওয়ারম্!” “হুক ওয়ারম্!”

### অন্তে—চর্যকাণ্ড

শিবনিবাসের প্রচার-বিভাগের পোল টেবিলটিকে বেঁটন করিয়া বসিয়া, তিনজন প্রচারকর্মী বৈপ্লবিক কার্য করিতেছিল। একজন পরলিন-কর্মী ব্যাপ্ত—“অপর হইল উব্ব হইয়া বসিয়া, আগামী আলোক-বলুতার বজ্র সুইড-গুলি বাছিয়া বাছিয়া পর্যায়ক্রমে নুতন করিয়া সাজাইয়া, বিভিন্ন বাস্তবের ভিতর শুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলিতেছিল নানাপ্রকার গল্পগুজব।

দাতা গোঁসাই বলিল,—“বাই বল ভট্টাচার্য, মদন মণ্ডলের হুক ওয়ারম্ এসে এ জলটটা শুষ্ক ওলট-পালট করে দিয়েছে। যেমন বলুতা, তেমনি তার সুইড-গুলো—চমৎকার!”

দীর্ঘ মেজ বালিল—গতি গোঁসাই, ভারী চমৎকার! সুইডের হুক পোকাকুলোর শুঁড় সেবেছে?—বাবা—এইয়া বড়-বড়! তার ওপর—

শিব ভট্টাচার্য মৈত্রের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, “তার ওপর তার সেই জুতার সুইড-ক’খান, না? লোকটা চামার না কি হে, তাই ভাবি।”

দীননাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোঁসাই হালিল না, বিজ্ঞতাের বলিল, ‘দাঁটা কর আর বাই কর হে, মদন বাবুর ক্ষমতা অসীকার করবে কে? পোটো একহপ্তাও পেরোয় নি, এই বেশ না এই মধ্যে এগী-পেগী জুড়ে জুতো পরবার হিড়িক পড়ে গেল কি রকম!’

মৈত্র বলিল, ‘গড়বে না? এ ত সব ক’খান, নয়, ভয় ক’খান। হুক পোকার ভয়! ভেবে দেখে একবার, সেই শুঁড়ওয়ালা হুক পোকার দল পা ফুঁড়ে, মাংস ভেদ ক’রে, প্রহুহুহু ক’রে সদার গা বেয়ে বেয়ে উঠে—! ওরে বাবা: রে! কুতের ভয়ের বাড়ি ভয় যে! জুতো না প’রে রইবে কোন্—’

একটা বড় ঘরকে পাটশন দিয়া ছুটাই ছোট কামরায় পরিণত করা হইয়াছিল। তাহারই এককিট বসিয়া প্রচারকর্মিণ কাজ করিতেছিল। অপরটি অস্তমান বাবুর কর্ণ-কক্ষ। তিনি সাধারণতঃ তিনটারও পর গুহার কর্ণ-কক্ষে আসিয়া বসেন। তখনও গুহার আগার সময় হয় নাই তাবিয়া, কর্মীরা তাহাদের গল্পের লাগাম বেপরোয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। লাগাম-ছাড়া ঘোড়া যখন তড়-বড় করিয়া ছুটয়া চলিয়াছে, তাহারই ক’কে অস্তমান কখন আসিয়া গুহার কর্ণ-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কর্মীরা জানিতেও পারে নাই।

শিব তখন মিঃ মদনের প্রঙ্গমে বলিতেছিল যে, কলিকাতার লোককে বিশ্বাস করিয়া অনেক সময় ভ্রমাক ঠিকিতে হয়, যেমন ‘কিয়াছিলেন একবার তাহার মাঝার বাড়ীর গাঁয়ের অধিকারীরা; ব্রাহ্মণ অতিথিকে লইয়া আহার করিতে বসিয়া অকস্মৎ তিনিলেন তাঁহারা, পৈতাধারী ব্রাহ্মণপুত্র বলিতেছেন,—‘পানির পোটো কই, লিবেদন কর!’—অতএব, এ যোকটাও যে চামার নয়, তাহা কে হালপ করিয়া বলিতে পারে?

এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটা মচমচ শব্দ উঠিয়া, পাটশন পার হইয়া সেই পোল টেবিলের দিকে দ্রুত ‘কুচ’ করিয়া আসিতে লাগিল। অস্তমান বাবু—সর্বনাশ!—প্রচারকর্মিণ সদয়মে উঠিয়া পাড়াইয়া নুরুকর ললাটে তুলিয়া নমস্কার জ্ঞাপন করিল।

অস্তমান বাবু প্রতিমহার মাত্র না করিয়া

করশ্বর বেরি উঠিলেন,—‘কাজকর্ম নেই, ব’সে ব’সে আড্ডা দিচ্ছেন আপনারা?’

মৈত্র বলিল,—‘আজ্ঞে না, দেখুন এইসব সুইড—’

মৈত্রকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়াই শিব গরক শিবেন ভট্টাচার্যের দিকে কটুটম করিয়া তাকাইয়া অস্তমান বলিলেন,—‘শিব বাবু, আপনি মিঃ মদনের নামে যাচ্ছেতাই কুংসা ছড়াতে শুরু করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনিছি। বোধ হয়—জেলাসি। কোনদিন অমন পোকতার শুনেছেন? আপনার ত কোনই মুরাদ নেই—হাবড়-জাবড় কি সব ছাই বললেন সেদিন। আমারই লজ্জা করলি! শিব-নিবাসের পাবু-সিগিট অফিসার আপনি—এর জন্তে আপনাকে বিশেষ-বেতনের ব্যবস্থা ক’রে রাখা হয়েছে।—ভারী ডিপার্টেড মশাই আমরা আপনার কাজে!’

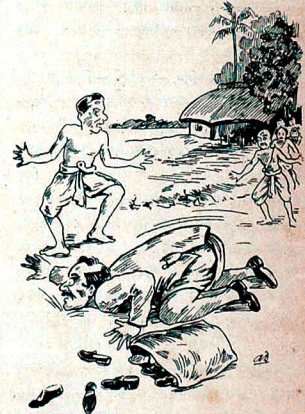
অস্তমান কাহারও নিকট কোন কৈফিয়ত তিনবার প্রয়োজন বোধ না করিয়া, জুতা মচমচ করিতে করিতে তখনই তাহার কামরায় কিরিয়া চলিলেন। শিব কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিল—নিজের বক্তৃতা-শক্তি সন্দেহে তাহার আত্মবিশ্বাস গ্রাম ও গ্রামের বাহিরের শ্রোতা-সাধারণ কর্তৃক বহুল-সমর্থিত এবং শিবনিবাস-কর্তৃপক্ষ তাহার মুখজে দেবীয়া তাহাকে খামোকাই অমনি বেতন দিয়া রাখেন নাই। দীর্ঘ মেজ হতভম্ব হইয়া শিবনের দিকে চাহিয়া ছিল। গোঁসাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা বাইত, মুখে হাসি ফুটয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ বাহিরে আবার কিসের সোরগোল উপস্থিত হইল?—ব্যাপার কি? আকুঙ ও কোঁহুই হইয়া, একদিক দিয়া শিবনিবাসের কর্মিণ এবং অস্তদিক দিয়া অস্তমান বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পাড়াইলেন। চাহিতেই নজ্জ পড়িল—অদ্রবত্তী পথ বাহিয়া, প্রকাণ্ড একটা চটের থলে ঘাড়ে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, প্রায় দৌড়াইবার মতই ছুটয়া আসিতেছেন মিঃ মদন মণ্ডল,—আর আক্রমণকারী সৈন্যদের মত একদল লোক তর্জন-পর্জন করিতে

করিতে তাহার প্রতি সবগে দাবমান!—গুরুতার ব্যাপারই বটে!

অস্তমান দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে বানিকটা পথ আগাইয়া গেলেন,—‘কি হ’ল? কি হ’ল?’

হতবুদ্ধি কর্মিণ অস্তমানের অদ্রবত্তী হইবে কি না ভাবিবেছে—কিন্তু তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে হইল না, সেই মুহূর্ত্তই মদন মণ্ডল আসিয়া তাহাদের কয়েক হাত মাত্র দূরে চটের থলি সমেত মাটির উপর হুড়ি বাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আচরিতে সেই হুহু থলি তুলিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল নানা আকারের অনেকগুলো আন্দকারী জুতার পাট!—বিশ্বয়ের পরিপাটি প্রকাশ!



মদন মণ্ডল জুতার থলি সমেত হুড়ি বাইয়া পড়িয়া গেলেন ‘প্যাথোটিক!’—শিবেন লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল,—উত্তেজনার মুখে তুলিয়া গিয়াছিল যে,



সেখানে অংশমান বাবু উপস্থিত আছেন,—‘মৈত্র জোর করিয়া তাহাকে ধামাইয়া দিল। গোঁসাইকী একবার আড়চোখে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অগ্রণী হইয়া হাত ধরিয়া মদন মণ্ডলকে টানিয়া তুলিতে তুলিতে কহিল,—‘আহা! শুকনো মাটিতে অমন ক’রে আছাড় খেলেন, মদন বাবু? উঃ!—হাঁটুর কাছে এই বে ছ’ড়েও গেছে অনেকটা দেখছি—’

অংশমান ব্যতিত হইলেন। অহরপকারীদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া চকু রক্তবর্ণ করিয়া তিনি হৃদয় দিয়া উঠিলেন—অহরপ প্রতিরুদ্ধ হইল। তাহার। স্থানীয় টোলের পাঠাখী কয়েকজন বয়স ছাত্র এবং পথচারী কয়েকজন কৌতুকী পথিক। অংশমানের হৃদয়ে তাহারা কয়েক-পা পিছাইয়া গেল।

‘মদন বাবু, ব্যাপার কি?’—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অংশমান মিঃ মদন মণ্ডলের বদনমণ্ডলের প্রতি চাহিলেন।

দাও গোঁসাই বলিল,—‘ওঁকে একটু জিরোতে দিন না দয়া ক’রে! এখন কথা কইবেন কি উনি,—হাঁপাচ্ছেন কেমন, দেখছেন না?’

কতক টোলের ছেলেরিগকে জেরা করিয়া, কতক মিঃ মণ্ডলের মুখে শুনিয়া সংখতি ঘটনাকে কিছু পরে আকার দান করা হইল এইরূপ—মিঃ মণ্ডলের অস্থায়ী বাসের জন্ত টোলবাড়ীর একটা কোণের ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। হঠাৎ সেই ঘরে আজ ছিদ্দাষেখী জনৈক ছাত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—চমৎকার জুতার আড়! সহ্যাদারীরা প্রথমে তাহার কথা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হইয়া গেল যে, আবিষ্কার নির্ভাল সত্য; এবং তদন্তেই তাহারা সেই চমৎকারস্বায়ী ধুপ্ততার জন্ত—পবিত্র টোল-বাড়ীকে অপবিত্র করিবার চমৎকারস্বিকতার জন্ত, নিজেদেরই দণ্ডভার গ্রহণ করিয়া, চমৎকার সহ তাহাকে চতুপাশী হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।—কিন্তু কি অবিরেচক, কি মূর্খ এই সেঁয়ে ছাড়ের দল! ইহারা কি একবারও

বিবেচনা করিল না যে, কত কষ্টে, কত অর্থব্যয়ে, এই জনহিতৈষী অধিবাসিক স্বাধীনতাপ্রচারক মিঃ এম, এল, মণ্ডল অকালমৃত্যুর হাত হইতে, হুকুপাকার মুখ হইতে তাহাদের গ্রামকে উদ্ধার করিবার জন্তই এতদূর বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এই সব পাত্তাকারূপ কীটরাণ কবচগুলি,—নামমাত্র মূল্যে এগুলি ত’ তিনি তাহাদিগকেই বিতরণ করিয়া দিয়া যাইতে!—হার রে অকৃতজ্ঞ, চুষ্টকণ্ঠার দল!

গোঁসাইকী আসিয়া অংশমান বাবুর কানে কানে কি কহিল। শুনিয়া, তিনি শিবু ভট্টাচার্যের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিলেন—টোল-কর্ত্তা মহেশ ন্যায়বাগীশের ভাতৃপুত্র এই মিটমিটে শয়নত শিবেন ভট্টাচার্য যত অনিষ্টের মূল। অংশমান কহিলেন,—‘ভট্টাচার্য, আজ থেকে আপনি ডিম্‌মিস্‌ড!’

গোঁসাই একবার নিজের জীর্ণ পাত্তাকার প্রতি ও একবার সেই ছড়াইয়া-পড়া চক্‌চকে জুতার পাটগুয়ার প্রতি চাহিয়া মিঃ মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—‘আহা! মণ্ডল সাহেব, কেন এই গরীবের বাড়ীতে অতিথি হ’লেন না আপনি?—তা’ হলে কি এই বিভ্রাট ঘটে!’

অহরপকারীদিগের ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া পথচারী জিজ্ঞাসামবাসী কয়েক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ দলের একজন নিম্নশ্রেণীর লোক অংশমানের সমুখে আসিয়া সেলাম দিয়া কহিল,—‘আমার কথাটা দয়া ক’রে শুনুন কি একবার, হুজুর!’

‘আঃ বল না’—শিবু সোৎসাহে লোকটিকে বলিল। এ যে তাহার পরিচিত কেষ্টা মুচি! কি বলিতে চাহে সে?

কেহ লক্ষ্য করিল না, এই সময় মিঃ মদনের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। অংশবাবু শিবুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া, অপরিচিত লোকটিকে তাহার বক্তব্য বলিতে অস্বস্তিযুক্ত ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল,—‘হুজুর, এই মণ্ডলের-পো আপনাদের গায়ে নয়া মাছব হ’লেও আমাদের গায় পুরানো।

গেল ক’বছর থেকে আমাদের সঙ্গে এর চামড়ার কারবার আছে। কলকাতার সেই যে কি বলে—তারি উনি চামড়ার দালাল। আমার নাম কেষ্টা মু—’

অংশমান মিঃ মণ্ডলের হাত ধরিয়া অবিলম্বে শিবনিবাসের গেটের খিলানের ভলে গিয়া দাড়াইলেন। চাঁৎকার করিয়া বলিলেন,—‘সব ঐ শিবু ভট্টাচার্যের কাগুগাঞ্জি—বদমাঁইসি! দাশু, দীষু, তোমরা চলে এস। এই রামরতন, হেই দারোয়ান, ভীড় ভাঙ্গাও তুহু!’

মাস্কুতো ভাই এখানে আসিয়া পৌছাইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া দেওয়া হইবে। সর্বশেষে স্থানীয় টোলের মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

অধিবেশন-শেষে ত্রিগুরু চট্টরাজ তাঁহার নিহৃত লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেষ্ট হইলেন। আলমারি খুলিয়া বাহির করিলেন কলিকাতার পুরাতন বইয়ের ষ্টল হইতে কিনিয়া আনা একখানি সাম্প্রতিক ‘স্পেক্টেটর’। পৃষ্ঠা উটাইয়া বাহির করিলেন ‘মেজর এডলিন রেল’ লিখিত বিখ্যাত পাত্তাকার-ব্যবসায়ী ‘বাটা’র জীবন-পরিচায়ক বিশেষ একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অনেককণ ধরিয়া তিনি একাগ্রমনে পাঠ করিলেন।

সেইদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—প্রকাণ্ড প্রান্তরজোড়া এক ইমারত,—তাহার এক দিক দিয়া চামড়া বোঝাই অগণিত শকটশ্রেণী প্রবেশ করিতেছে এবং অল্প দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে অজস্র প্যাকবন্দী জুতার বাগ বোঝাই গাড়ীর সারি। পৃথিবীর অতমত কণ্ঠবীর ও ধনবীর ধীমান ‘বাটা’ যেন স্বহস্তে তিনিই—তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় তাঁহারই নিজের আরোহণে প্রস্তুত হইয়া আছে,—এখনই তাহার পাখার শব্দ প্রতিগাচর হইবে!



Baku Khat Basha  
Dy.  
Baku Khat Basha  
Dy.



দাতন গ্রামের একজন অবসর-প্রাপ্ত উকিল আমার চলার ধরনে খুঁচী হ'য়ে আর একটা টিকানাও দেন—সেটা হ'চ্ছে ময়ূরভঞ্জের। কিন্তু সেটিকানার বিভ্রমনার কথা পরে হবে।

সন্ধ্যার 'জলধর'-ট্রেনের রায় মহাশয়কে আবিষ্কার করা গেল। তাঁকে ধাত্বনের কথা ও নিজের উদ্দেশ্য বলতে আরম্ভ করছি, এমন সময় এল এক পুলিশের পোক। সংবাদ—কলকাতার 'রাইটার্স' বিল্ডিং-এ নাকি মুন হ'য়ে গিয়েছে। আমার পথের সঙ্গ, লোটা-কথলাদি ও সরকারী কাগজ-পত্রগুলো সন্ধিষ্ট দৃষ্টিতে পরীক্ষা করার পর, রাত পোহালেই রওনা হ'ব কিনা জানতে চাওয়ায়, হুটিনে ক্রমাগত পথ-চলার দ্রুতি সত্ত্বেও "হ্যাঁ" বলতে হ'ল। সূর্যের উদয়াস্ত-কালের মধ্যে বেগদা থেকে আটশ মাইল চলে আসায়, রায় মহাশয় নেরকম উৎসাহে 'বাহবা' দিলেন, তাতে আর পরের দিন বেরুতে দেবী করার ইচ্ছা থাকলেও, উপায় ছিল না।

সকালসূর্য্যকাল নৈশ-ভোজন শেষ হ'য়ে গেল; বাঁকে তাঁকে হান দেওয়া সে-সময়ে যে কত বিপজ্জনক, একাবিক দৃষ্টান্ত সহ রায় মহাশয় তার পরিচয় দিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মুখে শোনো গেল যে, এখান থেকে সাত মাইল দূরে 'রায়-বনিয়া' নামক স্থানে বিরাট রাজার গড় প্রকৃতি পৌরাণিক কাহিনীকল্পের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাতে শয্যাভাগের পর, অগ্রদ্রোহনে কোনও বিপদ ঘটে নি দেখে রায়-পরিবারের যে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন পাশের দোকান থেকে আমাদের খারমোস্ত্রাভ ভরে চা আনতে দেখে রায় মহাশয় বললেন—"দোকানে কেন গেলেন; চা বাড়ীতেই হ'ত"।

বিদায়ের সময় প্রায় বোল মাইল পথের মাথায় 'বস্তা' গ্রামের থানার দারোগা শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের টিকানা ব'লে দিলেন; বললেন—"তাঁর কাছে আমাদের নাম করলে বাবস্থা হবে।"

অতিক্রান্ত পথ হাঁটতে লাগলুম। পায়ের তলা আর যেন পাভা যায় না, নীচে আড়ষ্ট আঙ্গুলগুলো ঝন্ ঝন্ করছে লাগল। কিছু দূর এসেই সামনে পড়ল পথ-ভাগ-করা একটা 'নালা'। জুতো-মোজা খোলার হুঁচকানো মনে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখে পড়ল একটা গরুর গাড়ী; গাড়োয়ানকে রাজি করিয়ে, ঐ গাড়ীর সাহায্যেই জলটুকু পার হ'য়ে কেরে চলতে লাগলুম। মাইল স্তম্ভক এসেই সামনে পড়ল 'স্বৰ্ণরেখা'; যদিও ছিল রেখার মত, তবু বর্ষায় যে ভীষণ হয় তার প্রমাণ উত্তর তীরের ব্যবধান। রাভা ক্রমে জলহীন বাগির ওপর নেমে আসায় বাগির ভেঙ্গেই জলের কাছে আসতে হ'ল; কান্দা থাকায় এইবার জুতো-মোজা খুঁতে হ'ল। পাশেই রেলের পুণ্ড, তবু পুণ্ড দিয়ে পার হ'তে সাহস হ'ল না; পারানি দিয়ে নৌকায় পার হ'য়ে এসে চলতে চলতে এক গ্রাম্য চৌকীদারের সঙ্গে দেখা হ'ল; সে চলেছিল থানায় 'হাজিরা' দিতে।

দারোগাবাবুর বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিয়মগত চলেছি, এক-বর তাকে দিচ্ছেই আগাম পাঠিয়ে, পথের ধারের এক 'কাক-চক্ক' নদী-জলে বানান্ধিপ্রেয়ে গিঠের ধারের নামান। অগ্রদ্রোহী চৌকীদারকে উচ্চৈঃস্বরে আবার খবরটা পৌঁছে দিতে বললুম। রান সেয়ে, গামছা শুকিয়ে, 'বস্তার' আসতে একটু দেবীই হ'ল। থানায় এসে শুভলুম দারোগাবাবু বাইরে গেছেন, আছেন তাঁর ছেলে; বাসায় এসে ঘোষ মহাশয়ের নাম ক'রে ডাকতেই তাঁর ছেলে বেরিয়ে এলেন। আশ্চ-

পরিচয় প্রদানের পর, চৌকীদারকে দিয়ে বর পঠানার কথা বলতেই তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চৌকীদারও পাশেই ছিল, তাকে দেখিয়ে নিলুম; বেদারী বকুনী খেলে; অতঃপর তিনি সন্তুষ্টে অতুল অপার কারও সূত্রে গ্রাম আমার জন্তে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। দারোগাবাবুর ছেলে ছিলেন Sub-Inspector; চাকরী রাগাণারগি ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন—"এক হস্তা আগে বর পেলে আমিও যেতাম সঙ্গী হ'য়ে, কিন্তু হঠাৎ কি করি? আটক রাখাও যায় না; দেখছি, এমন সঙ্গী হেলায় হারালুম; বাড়ী ব'সেই বা লাভ কি?" এক বাবাভীর নামে তিনি একথানা চিঠি লিখে দিলেন—নয় মাইল পথের 'রূপনায়', পথের পাশে এক সাধুর মঠে। সন্ধ্যায় 'রূপনায়' এসে পড়তে বাবাভীরকে নমস্কার জানান গেল। চিঠির দোহেতে বাড়ির-বর, আহা ও আশ্রয় কিছুইরই কটা ঘটল না। ছোট মঠ; থানকয়েক চালাঘর; ঠাকুর, শিখাও আছে; খাট-বিহানোও ছ'একটা দেখা গেল। গ্রামের লোকেও বাবাভীরকে বেশ ভক্তি করে ব'লে মনে হ'ল।

সকালে যুম ভাঙতেই মনে ভাবলুম—"ময়ূরভঞ্জ থেকে কিছু সাহায্য পেলে অজীত-লাভের সুবিধা হবে, রাজবাড়ী দেখাও হ'তে পারবে; কিন্তু ও-রাজ্য এখন মোশা পথের বাইরে, তখন হেঁটে না বাওয়াই ভাল"। মঠ থেকে রূপনার ট্রেন প্রায় খড় মাইল দূরে, আর ঐ ট্রেন থেকেই ময়ূরভঞ্জে narrow gauge গাড়ী State-এর নিজের লাইন ধ'রে বাড়ী বহন ক'রে চলে। এগার আনায় টিকিট কিনে উঠলুম গাড়ীতে; ছুপুর বেলা 'বারিপাদা' ট্রেনে নানা গেল—সহর এখান থেকে এক মাইল দূরে। সহর এসে এক হোটেলের দান, আহা হ'লে আরশ্রয় নিলুম মহারাজীর ধর্মশালায়! খাওয়ার পরে এখানে গুব কম, সাধারণ লোকে খায় ছ'পয়সা ও ছ'আনা, আর ভরলোক দেয় দশ পয়সা; তরকারীর অল্পতা ও আদিকাই খরচের ঐ তারতম্যের কারণ।

উকিল শ্রীকৃষ্ণ লামমোহন পতি ও মহারাজের ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বর পতি মহাশয়দ্বয়ের সহিত সাহায্য ক'রে সকল কথা বললুম—মায় ট্রেনে আসা পর্য্যন্ত। তাঁদের নির্দেশ-মত সেলাম দেওয়ারের ভবনে; একজন বললেন, "তিনি বাড়ী নেই, তা' ছাড়া, দেখা করতে হ'লে proper channel দিয়েও আসা দরকার।" রাজার জর হ'য়েছিল; প্রাইভেট সেক্রেটারীর দেখা পেলাম; মুখে উৎসাহ দিলেন মাত্র। বার-লাইবেরীতে গেলাম, বাজে কথায় সময় কাটিল। হরত হেঁটে এলে ফল হ'ত কিছু, কিন্তু গাড়ীতে আসায়, অর্পণের সহায়হুতি তো দূরের কথা—নিজের মনেই যেন জোর পৌঁছাচ্ছিল না। সন্ধ্যায় হোটেলে যেয়ে, শু'লাম ধর্মশালায়; লীত খুব কনকনে; রাতে ভাল ঘুম হ'ল না; পয়সাও গেল ফুরিয়ে; পড়লুম হুচিস্তায়।

১৭ই সকালে, যে ক'টা পয়সা ছিল মুড়ি ও চা খেয়ে রাজদর্শন-ইচ্ছায় রাজ-বাড়ীর সুবৃহৎ তোরণ ও রক্ষীশের বৃহৎ ভেদ ক'রে, হয়েই waiting room পর্য্যন্ত এগিয়ে, বিকল-মনোব্রত, হ'য়েই কিব্বত হ'ল। সারাটা দিন Hydro-Electric Power-House, Excavation, মন্দির, ধর্মশালা, নদী ও পর্বতময় স্থানের দৃশ্য প্রকৃতি দেখে বেড়ান গেল। ময়ূরভঞ্জ থেকে প্রায় ৭০৭২ মাইল দূরে এক পাহাড়ে প্রাপ্ত 'Iron-ore'-এর প্রাচুর্য্য নাকি 'টাটার' লৌহ পণ্যের খুব সুবিধা ঘটবে দিয়েছে।

সকলেই পরামর্শ দিলেন, এই সব দেখে যেতে, কিন্তু বাই কি নিয়ে? সন্ধ্যায় শরীর হ'ল হ্রাস্ত; ধর্মশালায় এসে দেখি সদাত্ত পাচ্ছে ভিহারীর দল। আমি ব'সে দেখতে লাগলুম। আমাদেরও শেখ প্রশ্ন হ'ল—"তুমি কিছু নেবে?" অজ্ঞে পাচ্ছিল 'আনি'—কিছু, আমি একে ভরলোক, তার রাজদর্শনভিলাষী—তার ওপর প্রথম দিনে কিছু গ্রহণ করি নি। স্তব্ধতা চতুর্গুণ পাবার যোগ্য বিবেচিত হ'লুম। শোনা গেল—এই ধর্মশালায় দৈনিক সদাত্তের budget



নির্ধারিত আছে; প্রার্থী লোকের অন্নতা ও আর্থিক অস্থায়ের বর্ধনের পরিমাণ কম বেশী হয়।

পরদিন উকিল শ্রীমূল লালমোহন পতি ও ডাক্তার শ্রীমূল মহেশ্বর পতি মহাশয়ের অর্থ-সাহায্য বাতায় লিখিয়ে নিয়ে, আহারান্তে, যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই শঙ্কাকালে সেই বাবাভীর মঠে উপস্থিত হওয়া গেল। মনে মনে সজ্জ করলুম, যেখানেই বাই, হ'ক তা' শাখা-পাখ, অতঃপর হেঁটেই যাব; যেতে না পেলেও, হাঁটা-পথে হাড়া অল্প উপায়ে কোনবানোই আর বাওয়া নহ।

১১এ শুক্রবার সকালে বাবাভীর কাছে বিদায় নিয়ে বারো মাইল দূরবর্তী 'বালেশ্বর' রওনা হলুম। 'রূপসা' নদী নৌকায় পার হ'য়ে, এবং শীত এলেককে কম থাকায় দান প্রভৃতি পথেই সেয়ে, মধ্যাহ্নে বালেশ্বর শহরের এক ধর্মশালায় উপস্থিত হ'লুম। এক হোটেলের অহারের সেয়ে প্রায় ছই মাইল দূরে বালেশ্বরের ঠেপনের কাছে S. D. O. জ্ঞানবাবুর বাড়ী অভিমুখে রওনা হ'লুম। কাছাকাছি এসেই মনে পড়ে গেল, এই ঠেপনেই শ্রীমূল ইন্দুবন চ্যাটার্জি মহাশয় বাস করেন। খোঁজ নিয়ে, তাঁর বাসভাটেই আর নিলুম। ঠেপনে দেখা হ'ল আর এক ভজলোকের সঙ্গে; তিনি মজুরী গেষ্টের ম্যানেজার, নাম শ্রীমূল রসাক মোহান্তি, থাকেন আখোয়াপোতা, ভজরেকর পন যেখানে 'গ্রাম্ভী' পার হবার রাস্তা। ইনি বলে দিলেন—পথে যেন তাঁর বাড়ী বাই।

S. D. O. জ্ঞানবাবুর বাড়ীও হ'য়ে এলাম; সে-সময়ে তাঁর ছেলের অল্পত্ব, তবু ইন্দুবাবুর বাড়ীর আশ্রয়ে থেকেই জ্ঞানবাবুর বাড়ী আহার্যাদির ব্যবস্থা হ'ল।

শনিবার সকালে জলসাঘের পর বিদায় নিয়ে জ্ঞানবাবুর সহিত দেখা ক'রে একটা টাকা পঞ্চমত্যা চেষ্টে নিয়ে পথ ধরলুম। পুলিশ-ঠেপনের এক একজন 'জিজ্ঞাসা' করতই বললুম—'জ্ঞানবাবুর আতিথ্য

গ্রহণান্তে চলছি'। আর বিজিক্ত না ক'রে বললেন 'নাশ করবেন'।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে ওপথে যান সেয়ে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে বিকালে পৌঁছলুম 'সোরা' নামক গ্রামে। পথ হ'তে গ্রাম কিছু দূরে। পথ ও গ্রামের মধ্যে এক উড়িয়ায় হোটেলের আশ্রয় লাভ করা গেল। গ্রামে আর গেলুম না, আশ্রয় সত্তা ছিল এবং ইচ্ছা ছিল যে, এই নির্জন স্থানটীতে বিশ্রাম নিয়ে জামা-কাপড়গুলো ও একটু পবিত্রায় ক'রে নিতে হবে। হ'তিন জন উড়িয়া ব্রহ্মর সঙ্গে নারকেল-পাতার 'চাটাই' পেতে ছুটতে রাত বেশ কাটলুম। পথটা বেশ নির্জন; অনতিদূরেই পাগাড় দেখা যায়; ডাকবাংলাও একটা আছে।

২২এ সোমবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'সোরা' থেকে বাতা করলুম ভজরেকর বিকে। সঙ্গে ছিল কয়েকটা ডিম সিদ্ধ, পথে যান সেয়ে তাই খেয়ে নিলে, ভজর নদীর পুল পেরিয়ে সন্ধ্যার শহরের contractor শ্রীমূল প্রবোধচন্দ্র মুখার্জী মহাশয়ের গৃহে উপনীত হলুম; রাক্ষসে যেখানে থেকে সাত মাইল দূরে এক অহিনেও ও গন্ধিকা ব্যবসায়ীর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন সেয়ে, সন্ধ্যার প্রায় ত্রিশ মাইল পথের প্রান্তে 'আখোয়াপোতা'র এলাম। 'গ্রাম্ভী' নদীর তীরেই এই জায়গাটি; ভজরে বাওয়ায় ভয়ে নদীতে বাঁধ দেওয়া আছে। সন্ধ্যার আখোয়াপোতার বাঁয়ের ওপর দিয়ে 'এ্যানিকটের' কাছে Inspection Bungalow ও টোল-গেটের বাঁয়ের নিকট—মজুরীর পথ জিজ্ঞাসা করি, এবং আরও চার জন cycle-tourist-এর অবস্থানের কথাও জানতে পারি। জলপরিপূর্ণ স্থান; সঙ্গে লোক নিয়ে, গ্রাম্য পথ ভেঙ্গে সেই বালেশ্বর ঠেপনের পরিচিত শ্রীমূল রসাকর মোহান্তি মহাশয়ের বাড়ী গেলুম। তাঁর অধঃপস্থিতের নিকটপার হ'য়ে অন্দরে সংসার পাঠাইয়েই ব্রহ্মল হ'ল; তাঁর দ্বারাতী দ্বীপ আতিথ্য গ্রহণ করলুম।

পরদিন ২৩এ বুধবার। এই বুধবারেই একবার ক'রে জম্মস্থান ভ্রামের দ্বিতী প্রাণে জাপে। সকাল হ'তেই বারো মাইল দূরবর্তী বাজপুরের উদ্দেশে যাত্রা করি। ঠিকানা ছিল শ্রীমূল গোবিন্দপ্রসাদ বোম মহাশয়ের বাড়ীর; মধ্যাহ্নে বৈতরণী হেঁটে পার হ'য়ে এসে বাজপুরে যান ও আহার করি। বাজপুর একটা তীর্থস্থান; বৈতরণীর তীরে শ্রাদ্ধ প্রস্তুতি ক্রিয়া প্রশস্ত। গরুর লেজ ধ'রে ঐ নদী পার হ'লে, সপনীরে স্বর্গারোহণও অনায়াস হ'য়ে আসে, এইরূপ প্রসিদ্ধি। একে সাব-ভিভিন জাখা, তাঁর তীর্থস্থান, হুতরাং এ জায়গার মাছা অশ্বত্থ স্বীকার্য। পরের দিনটা গুর-কিরে চতুর্দিক দেখে ও সাংঘা সংগ্রহ ক'রে কাটানোর পর দারোগা শ্রীমূল অজ্ঞানবন ভট্টাচার্যের উপদেশবাণী শ্রবণ ক'রে, শুক্রবার পুনরায় রওনা হ'লুম। বারো মাইলের মাথায় হরিপুর গ্রামের ডি, এন, বোম মহাশয়ের বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে আরও বারো মাইল হেঁটে 'নেউলপাড়া' এলাম। এখানে আসতে বিজ্ঞাপ ও মহানদীর শাখা হেঁটে পার হ'য়ে আসতে হ'য়েছিল। হ'ল্লন ছাড়ের সাহায্যে, নিকটস্থ মাঠ পার হ'য়ে, ছোট পাগাড় মন্দির ও ঐশ্বর্য জলের স্বরণ দেখে এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। রাত্রে ভগবানের প্রসাদ লাভান্তে এক নিদ্রায় রাত কাটালুম। সকালে পথে বেরকতেই একদল লোককে হৈ হৈ শব্দে লাঠি হাতে ছুটতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল—কেতের মধ্যে এক হরিণের শুভাগমন ঘটছে। এ দেশের বড় হরিণকে 'শবর' বলে। বাঘ বা অল্প কিছু ভবে হঠাৎ যে একটু আতঙ্ক স্থগি হ'য়েছিল, এটা অস্বীকার করলেই সত্যের অপলাপ হয়। পথে বালেশ্বর হুতর বহুর। তাঁকে নিজের পরিচয় দিলুম; সেখানে পরদিন আসবার ব্যবস্থা হ'ল।

সকালে তর্রি বৈধে ও মন্দিরের পূজারীকে দত্তবাদ

পরম-করা একটু জলে চা ভিজিয়ে গলাধঃকরণ করার পর আবার নির্দিষ্ট পথে এসে চলতে আরম্ভ করি। পথের ধারে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষে যে সব ফল-মূল বিক্রী করতেন, তাই সেয়ে এবং পথ ভুলে সন্ধ্যার এলাম 'জগৎশিব'। এখানে লোকান-পত্র, রেল-শ্রেন ও মহানদী পারাপারের ব্যবস্থা আছে। হটাৎ হিমার ও নৌকা ছেড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে এখন পূলের ওপর রেলপথও বিপজ্জনক ভাবে, প্রায় ত্রিশ মাইল পথ হাঁটার পর অবসর শরীরে টেনে এসে এক আনার টিকিট কিনেই টেনে মহানদীর পরপারে রাত্রি আটটার পৌঁছান গেল। আরও কিছু পেরেছিল, কারণ চিঠি লিখেছি ২১এ কটক যাব। অন্ধকার অজানা সঘরে, গেলাম ডাকবাংলায় সন্ধান। প্রায় এক মাইল হেঁটে এসে দেখা গেল গুহানের ভাড়া অতিরিক্ত। হোটেলের আহার শেষ ক'রে, তালান কেমার কাছে পথের ধারে এক গাছতলায়। মহানদীও এখান হ'তে কাছেই। রাত প্রায় ১২টার কে একজন আলো-হাতে নদীতীরান্তিমুখে চলেছে দেখে, ডেকে আশ্রয়-প্রার্থী হ'লুম। ইনি মন্দিরের রক্ষক ও পূজারী; আশ্রয় লিলেন ৩কটকতীর মন্দিরে, যেখানে ঐতিহ্য দেব পুত্রীর পথে প্রথম মহানদী পার হ'য়েই কটকে আশ্রয়পন্ন রক্ষা করেন। এই নির্জন মনোরম স্থানে, মহানদীর তীরে, পরিষ্কার বৃক্ষতলে শিথ, পবিত্র দেবমন্দিরে রাতটা কেটে গেল।

সকালে স্নানান্তে প্রসাদ লাভের পর, শ্রীমূল হুতায় বাবু পিতা শ্রীমূল জনকীনাথ বহু মহাশয়ের বাড়ীর সন্ধান গেলুম। সন্ধ্যার উড়িয়া-বাজারের বোঁজ করলেই সেই বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েই দেখা গেলুম শ্রীমূল হুতরচন্দ্র বহুর। তাঁকে নিজের পরিচয় দিলুম; সেখানে পরদিন আসবার ব্যবস্থা হ'ল।

সকালে তর্রি বৈধে ও মন্দিরের পূজারীকে দত্তবাদ দিয়ে চলে এলাম হুতায় বাবুর বাড়ী। বাগান-বাগিচা ও হুতরচন্দ্র সমস্ত আসবাব-পেয়ে পূর্ণ এ যেন এক রাজপ্রাসাদ। শিথ ভায়ায়, অমারিক বাহায়ে ও



পরকে আপন করার সহজ স্বভাব দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলাম; প্রাণে নৃতন উৎসাহ-উত্তম এল।

সন্ধ্যা সুরেশ বাবু আমায় নিয়ে 'টুরিষ্ট'দের কত কাঙ্ক্ষা, তার বিবরণ দিতে বসলেন, এবং ভারতের ও সিংহলের মত বিখ্যাত স্থান ও দেখবার জিনিসের নাম ও বস্তুদের টিকানা লিখে দিলেন।

কয়েকজন বাঙ্গালী ভ্রমণ্যাকের সহিত দেখা করে কিছু সাহায্য নিম্ন; ইনিও কিছু দিলেন; সঙ্গে বাবার রাখা উচিত, চলা-পথে লাঠি প্রয়োজনীয়,— 'গেজেট্‌র' বা এই প্রকারের কিছু সঙ্গে রাখলে পিপাসা-ক্ষুধা ছ'য়েরই নিবৃত্ত হবে বলার পর, কি করে শরীর রাখতে হয়, হাঁটার পর কি করা উচিত, এ সম্বন্ধেও বিশেষ করে অনেক উপদেশ দিলেন।

৩০এ মঙ্গলবার, সকাল আটটায় সুরেশ বাবুর দেওয়া খাবার ও কটক থেকে কেনা কিছু জিনিষপত্র নিয়ে শহর ত্যাগ করা গেল। অল্প এপেই 'কাটজুড়ি' নদী—জল না থাকায় মাটির সাহায্যে তার খোলাটা অশক্ত; ভরাট করে চলাচলের পথ প্রশস্ত হয়েছে—পার হয়ে ভূবেনথরের রাস্তায় পড়লুম। লতাগুহ ও বৃক্ষবহুল ছায়ারামা নির্জন পথ কখনও বা ছোট ছোট গ্রামের মাঝনান দিয়ে, কখনও বা শূন্যক্ষেত্র ও বিহঙ্গ-কাকলী-মুগুরিত বনভূমির অভ্যন্তর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে; কচিং এক-আধটা Inspection-Bungalow গাছ-পালায় কঁকে কঁকে বাড়া আছে, দেখা যায়। অরণ্য-বিহারে অকতি ধরলে নেড়েও প্রকৃতি ব্যাধ জাতীয় জীবও এ পথে পানচারণ করে থাকে; তবে দিনের আলোয় তাদের খড় একটা দেখা যায় না। সুরেশ বাবুর উপদেশ সমূহের প্রসাদে আজ নির্ভয়েই পথ চলেছিলাম।

বেলা প্রায়দ্বয়, কটক থেকে আঠারো মাইল পথ অতিক্রম করে, ভূবেনথরে স্বভাববাসুদের বাড়ীর দরবার গতি বন্ধ হল। এখানে চাকরের নাম ধরে ডেকে ও সুরেশ বাবুর হাতের লিখন দিয়ে থাকার ব্যবস্থা পাকা

করা গেল। তার পর, আহাঙ্গারির আরোহণ হল। সে সময়, এখানে অনেকেরই বাবু-পরিবর্তনে এসেছিলেন; রাজ্যে তাদেরই একজনের বাশায় আহাঙ্গারি সেয়ে,—চোর-ডাকাতে ও বাঘের বহু অপকীর্তির কাহিনী শুনে,—মন্দির, পুকুর, কুণ্ড ও নকশাভিনিকার গাছ দেখে পথের স্রাস্তি দূর করা গেল। ছ'এক বেলা স্থানিটেরিয়ামেও নিমগ্ন হুটছিল।

পরের দিন সকাল সকাল বেয়ে নিয়ে বাতায়তে সাত মাইল দূরের ছুঁটা ছোট পাহাড় দেখতে পেলাম,—অগ্নিগিরি বা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে অভিহিত হয়ে



জেন ওয়ারে দৃশ্য (খণ্ডগিরি)

কোন হ্রদের কাল থেকে এরা বহু তীর্থযাত্রীর অহেতুকী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছেন। ইয়াঙ্গী বর্ষের শেষ দিনটাকে (৩০এ ডিসেম্বর, ১৯৩০) ঐ অগ্নিগিরি থেকেই অন্তঃগমনের অবিকার দেওঁরা গেল,—নববর্ষের প্রথম উষাও হয়ত এখানকার উদয়গিরি থেকেই উদ্ভিত হয়ে থাকবেন,—কিন্তু আমি সে সময় ভূবেনথরের রুদ্ধ-মরে গুরে পুরীর পথেইই স্বপ্ন দেখে ছিলাম।

(ক্রমশঃ)

## বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপঙ্কর ত্রিভুজান

শ্রীহরেশচন্দ্র নন্দী

সহস্রাব্দিক বংসর পূর্বে বাঙ্গালী জাতি জ্ঞান, সভ্যতা ও শিক্ষায় কত উন্নত এবং ধর্ম, শিক্কা, জ্ঞান ও সভ্যতা এতদে কীরূপ অগ্রগতি ছিল, তাহা পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে বৃষ্টিতে পারা যায়। হুবিংশাল পাল-সাম্রাজ্য বাঙ্গালীর কক্ষশক্তিতে পূর্ণ—রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালী—রাজ্য-পরিচালক বৃহস্পতিতুল্য বৃদ্ধিমান্ মন্ত্রী বাঙ্গালী—রাজ্যরক্ষক ধনয়্যতুল্য বোদ্ধা সেনাধ্যক্ষ বাঙ্গালী। সমগ্র পাল-সাম্রাজ্য বাঙ্গালীর কর্যোবাদনা—বাঙ্গালীর কৌশল-গৌরব-মহিমায় সমৃদ্ধ।

পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ের ইতিহাস। সেই-ইতিহাস কত তাম্রলিপি, শিলালিপি, কত চৈত্য, বিহার, পুণ্ড, স্তম্ভ, কত পাথানে গঠিত দেবদেবী-মূর্তি পদতল, কত শত মন্দিরে উৎকীর্ণ ইহঁয়া বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরব-মহিমা যোষা করিতেছে!

বাঙ্গালী রাজা ধর্মপাল, দেবপাল দেব যেমন দিগ্বিজয় করিয়া সমগ্রাধা ধরতীর অধীশ্বর ইহঁয়াছিলেন, তেমনই বঙ্গজননীর মুখোজ্জলকারী বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র, দীপঙ্কর ত্রিভুজান ও শাস্ত্ররক্ষিত ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, শিক্কা, জ্ঞান-ঐর্ঘ্য বিতরণ করিয়া বহির্ভারত জয় ও বাঙ্গালী জাতিকে অর্ধ-এসিয়ার নমস্ত ও শিক্ষা-গুণের আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী নরপাল ধর্মপাল দেব ধর্ম, শিক্কা, সভ্যতা এতদেয়ের উদ্দেশ্যে অষ্টম শতকের শেষ পাদে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাল-সাম্রাজ্যের অত্মদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হুবিখ্যাত নরেন্দ্র বিহার বা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কর্তৃহাদীন হয় এবং তিনিই নালন্দা ও বিক্রমশীলা—উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন করেন।

ঐগীয় যষ্ঠ এবং অষ্টম শতকের মধ্যে এবং শেষ পাদে

মগধে যথাক্রমে নালন্দা, উদুগুপ্তী ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—ভারতবর্ষের ইতিহাসের মত মানব-সভ্যতার ইতিহাসেরও অতুলন উল্লেখযোগ্য ভূগণী ঘটনা। নালন্দা যেমন শঙ্করাচার্য ইহঁতে আরম্ভ করিয়া, পঞ্চম ইহঁতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, মহীপাল দেব প্রমুখ রাজগুণের সাহায্য-প্রাপ্ত ইহঁয়া স্বদ্বীর্ঘ পাঁচ শতাব্দিক বংসর জগৎবাসীকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল, বিক্রমশীলাও তেমনই ধর্মপাল ইহঁতে আরম্ভ করিয়া নরপাল প্রমুখ খোড়-মগধ-বংসের অধীশ্বরগণের সাহায্যপুষ্ট ইহঁয়া চারি শতাব্দিক বংসর ভারতে ও বহির্ভারতে অক্লান্ত ভাবে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল। নালন্দার পর বিক্রমশীলা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের—বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় একাধারে ধর্ম ও বিজ্ঞানমন্দির। তিস্ততীর ঐতিহাসিক লামা ভারনাথ বলিয়াছেন, এই জ্ঞানের মন্দির মগধ সহরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী এক গগনপর্ণী পর্বতোপরি অবস্থিত ছিল (১)।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রাণপাথ্য ষোড়শকীর্তি (২), বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ (৩) এবং তিস্ততীর ভাষায় অনুদিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে (৪) বিক্রমশীলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিক্রমশীলা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক অজ্ঞাত (৫) বলিয়া

(১) Taranath, PP. 234-242; J. A. S. B. 1909, P. 3; Indian Pandits in the Land of Snow, P. 58; History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 150.

(২) Bibliotheca Indica Series, Edited by S. C. Vidyabhusan, P. 50.

(৩) Edited by M. M. H. P. Sastri, PP. 320-321.

(৪) Tangyue, Rayud. La, Folios 11-26, 54 etc.

(৫) J. A. S. B. 1910, P. 11.



উল্লিখিত হইলেও, ঐতিহাসিক ভিন্সেট স্মিথ (৬), স্বর্গীয় মরচন্দ্র দাস (৭) এবং মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্র (৮) এই বিহার জিয়ার অষ্টম শতকের শেষ পাশ্বে পাল বংশীয় বিভিন্ন নরপাল ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিক্রমশীলা বিহারের স্থিতিস্থান সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রেনারেল কানিংহাম বলিয়াছেন, রাজগৃহের ছয় মাইল উত্তরে আধুনিক বড় গ্রামে (প্রাচীন নালন্দা গ্রাম) অন্তর্গত শিলাও গ্রামে (৯), মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্রের মতে ভাগলপুর জিলার কলগড় নামক স্থানে (১০), স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নন্দলাল দে'র মতে ভাগলপুর জিলার 'পাথরঘাটা' নামক স্থানে এই বিহার অবস্থিত ছিল (১১)। স্বর্গীয় দে মহাশয় বলিয়াছেন, পাথরঘাটার প্রাচীন নাম বিক্রমশীলা-সম্ভারাম; ইহাই ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত ভাবে "শিল-সম্ভর" অর্থাৎ বিক্রমশীলা বিহার নামে পরিচিত ছিল।

মোটকথা, বর্তমান না এই স্থানটী খনন করা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার স্থানীমাঙ্গা অসম্ভব। যদি কখনও এই স্থান খনন করা হয়, আশা করা যায় এই স্থান হইতে এমন কোন শিলাপিপ্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে, যদ্বারা বিক্রমশীলা বিহারের স্থিতিস্থানের চূড়ান্ত নীতিমাঙ্গা হইবে।

বিক্রমশীলা বিহারের নামকরণ সম্পর্কে দুইটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা — প্রথমটা, বিক্রম নামক এক বৃক্ষ এই পর্বতশিখরে বাস করিত, তাহারই নাম হইতে এই বিহারের নামকরণ হইয়াছিল (১২)। দ্বিতীয়টা

এইরূপ, — বৌদ্ধ তাত্ত্বিকচাচা কাপ্পিলা এই পর্বতে মহামুদ্রাবোধ সাধনার সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি গম্ভাজীরবতী গগনস্পর্শী পর্বতশিখরে বিহার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন করেন, এবং ধ্যানযোগে ইহাও জানিতে পারেন যে, এই বিহার রাজাহুগ্রহে পরিচালিত হইবে, এবং পরবর্ত্তে তিনিই রাজা ধর্মপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বিহার প্রতিষ্ঠা করিবেন (১৩)।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানমণ্ডলিকায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। বিক্রমশীলা বিহার — বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম-স্থান হইতে রাজসাহায়া লাভ করিয়াছিল বলিয়া রাজকীয় (বিক্রমশীল) বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয় (১৪)।

নরপতি ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহারের সমস্ত ব্যয় নির্মাণের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন (১৫)। বহুসংখ্যক গ্রাম ব্যাপিয়া বিহারের বিস্তৃতি ছিল। বিহার গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড অট্টালিকা; ছয়শতক ছয়টা প্রবেশদ্বার। বিহার-চত্বর সুবৃহৎ — বহুযাজ্ঞন-ব্যাপ্তি; উহার মধ্যস্থলে আট হাজার লোকের স্থান সঙ্কলন হইতে পারিত। তিস্তীতীর ছাড়া নাপচোর লিখিত বিবরণ হইতে একবার বাধ্যতাই প্রতিপন্ন হয় (১৬)। বিক্রমশীলা বিহার যে গগনচুম্বী বিরীত অট্টালিকা, তাহাতে বিদ্যুদ্বাস সন্দেহ নাই। এই বিহার একগু চমৎকার কৌশলে ও শৃঙ্খলার সহিত নির্মিত যে, কোন বিদেশী লোক পর্বতশিখরে বিহারে উঠিতে কোন প্রকার ক্রেশ অসম্ভব করিত না। যদি একগু ভাবে গঠিত না হইত, তাহা হইলে তিস্তীতীর ছাড়া নাপচো বিনায়াসে

গভীর নিশিথে বিহারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। বিহারের নিম্নতলে ধর্মপালার স্বয়ম্ভোবিত পাক্ষা সন্বেদ সে তথায় অবস্থান না করিয়া, পর্বত অতিক্রম করিয়া বিহারে প্রবেশ করে (১৭)। শুধু ইহাই নহে, ধর্ম ও বিজ্ঞানমন্দির ছিল বলিয়াই তিস্তীতীর রাজা নিম্নদেশে বিহার এই বিহারের আদর্শে গঠন করিয়াছিলেন (১৮)।

বিহারের চতুর্দিক সুবৃহৎ ও যুগ্ম প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ইহার চতুর্দিক বেটন করিয়া ১০০টা ছোট ও বড় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যস্থলে মহাবোধি মন্দির মধ্যমণির মত শোভা পাইত। সর্বগুণ্ড ১০৮টা মন্দির বিহারের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই কারণে বিক্রমশীল বিহার "দেব-বিহার" নামেও সুপরিচিত ছিল (১৯)।

নালন্দা বিহারের মত বিক্রমশীলা বিহারও ছয়টা কলেজে বিভক্ত ছিল। এই ছয়টা কলেজের পরিচালন-ভার ছয়জন ভিক্ষুর উপর অর্পিত ছিল। উপরোক্ত ছয়টা কলেজের মধ্যে চারিটা কলেজে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। মধ্যম ভাগের মন্দির — "বিজ্ঞান-মন্দির" নামে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরের আচার্য্য ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপারমিতার অধ্যাপনা করিতেন। মধ্যম ভাগের মন্দির গুহীজন পণ্ডিত পরমার্থ-তত্ত্ব অধ্যাপনা করিতেন। ইহার ষাৎকালে বিহারের প্রথম ও দ্বিতীয় "সত্ত্ব" নামে খ্যাত ছিলেন (২০)।

এই বিহারে ১০৮ জন আচার্য্য বাস করিতেন। ইহা বাতীত একজন উপসম্পাদ্যচার্য্য, গুহীজন বজ্রাচার্য্য, একজন কর্মপরিচালকচার্য্য, একজন ভূত-সরবরাহকারক, কপোতরক্ষক, তীর্থস্বামী ভিক্ষুগণ ও বহুসংখ্যক অস্থায়ী ভিক্ষু বাস করিতেন। মহারাজ ধর্মপাল সুদৃঢ়ত এই সমস্ত ব্যক্তির ব্যয়ভার বহন

করিতেন (২১)। লামা তারনাম এই ব্যয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন গৃহস্থের সম্ভার প্রতিপালন করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইত, একজন ভিক্ষুর তাহার অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ব্যয় হইত (২২)। বিহারের ছয়টা প্রবেশদ্বার ছয়জন আচার্য্য-ভিক্ষু রক্ষা করিতেন। এই কারণে ইহার "দ্বার-পণ্ডিত" নামে সম্মানিত ছিলেন (২৩)।

নালন্দা বিহারের মত বিক্রমশীলা বিহারেও ছাত্র-পরীক্ষা প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ না হইলে যেমন গৃহপ্রবেশ করা যায় না, সেইরূপ বিহার-প্রবেশার্থী ছাত্র দ্বার-পণ্ডিতের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহার বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার ঘটিত না (২৪)।

যে সমস্ত ছাত্র কোন বিশেষ বিদ্যে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ আগমন করিত, কেবল মাত্র সেই সকল ছাত্রই দ্বার-পণ্ডিতের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিত। হিউয়েন সাঙের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঠিক এইরূপ প্রথাযুগেরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পরীক্ষা করিয়া বিহার-প্রবেশার্থীকে প্রবেশ-অধিকার দেওয়া হইত (২৫)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র ভিক্ষু অধ্যয়ন করিত (২৬)। দর্শন, ব্যাকরণ, তির্কিৎসা, জ্যোতিষ বিশেষ ভাবে অধ্যাপনা করা হইত (২৭)। মহাযান মতবাদের মাধ্যমিকা বোণাচার-

- (২১) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.
- (২২) প্রবাসী—১০০০ পৃ. ৮৭।
- (২৩) Hindustan Review, 1906, PP. 190—191.
- (২৪) Manual of Buddhism, P. 133—Dr. Kern.
- (২৫) Beni's Records of the Western Countries, Vol. III, P. 171.
- (২৬) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.
- (২৭) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 151.

- (৬) Early History of India, 3rd edition, P. 338.
- (৭) Hindustan Review 1906, PP. 190—191.
- (৮) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 150.—S. C. Vidyabhusan.
- (৯) Arch. Survey Report, Vol. VIII, P. 83.
- (১০) History of Mediaeval School of Indian Logic, Appx. P. 150.—S. C. Vidyabhusan.
- (১১) J. A. S. B. 1909.
- (১২) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.

- (১৩) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I, Part I, P. 11.
- (১৪) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 150; Indian Pandits in the Land of Snow, P. 50.
- (১৫) Introduction to Ramcharit, Edited by M. M. H. P. Sastri, PP. 5-6.
- (১৬) Indian Pandits in the Land of Snow, P. 58 By S. C. Das

- (১৭) Journal of the Indian Buddhist Text Society, 1893.
- (১৮) J. A. S. B. 1909, P. 4.
- (১৯) Hindustan Review, 1906, PP. 190—191.
- (২০) Ibid.



দর্শন ও বিশেষ যন্ত্রের সহিত ভিক্ষুগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত (২৮)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর-গায়ে বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অবিভীয়া মনীর পণ্ডিত-গণের মূর্তি চিত্রিত থাকিত (২৯)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের উপাধি ছিল—“পণ্ডিত”। বৌদ্ধ সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই জ্ঞানের মন্দির হইতে অশেষ সম্মানজনক “পণ্ডিত” উপাধি ও সঙ্গে সঙ্গে লোহিত বর্ণের “পণ্ডিতোক্তির” লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই পণ্ডিতোক্তির প্রদান প্রথার প্রথম প্রচলন হয় (৩০)। রাজা স্বয়ং উপাধি ও প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পরীক্ষোক্তির ছাত্রকে দান করিতেন।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক আচার্য্য ভেত্তারি ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মহীপালের স্বাক্ষরিত উপাধি, প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিতোক্তির লাভ করেন (৩১)। কামীর দেশীর আচার্য্য রত্নবর নরপতি কনকের স্বাক্ষরিত উপাধি, প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিতোক্তির লাভ করেন (৩২)। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে নৈয়ায়িক যমারি রাজা নরপালের স্বাক্ষরকালে “পণ্ডিত” উপাধি, প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিতোক্তির লাভ করেন (৩৩)।

ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলা বিহারের অনিনায়ক নিযুক্ত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমাফারে বিহার একজন পুত্রচারিত মহাপণ্ডিত ভিতর অর্চনে থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিনায়কের অধীনে ছয়জন “ধার-পণ্ডিত” বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। সর্দাধাঞ্চ ভিক্ষুর কর্তৃত্ব সকলকেই বীভার

করিত হইত। তাহার আদেশ চরম আদেশ বলিয়া গণ্য হইত। সর্দাধাঞ্চ ভিক্ষু বিহারবাসী ভিক্ষুগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনিই বিহারবাসী সমস্ত ভিক্ষুর চরিত্রের জ্ঞান দ্বারা থাকিতেন (৩৪)। মহারাজ ধর্মপালের রাজত্ব সময়েই মহামনীষী প্রাজ্ঞবর বুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্দাধাঞ্চ ছিলেন (৩৫)। এই সময়েই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য জীমরক্ষিত মগধ-রাজ-গুরুপদে বৃত্ত হইয়া বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতেন (৩৬)।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থলীয় চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া ভারত ও বহির্ভারতে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল। এই স্বদীর্ঘ কালের মধ্যে ২৬ জন বৌদ্ধাচার্য্য এই জ্ঞানের মন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা বিহারের অনিনায়কগণের ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—(১) বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ, (২) লগ্নাজয়ভট্ট, (৩) শ্রীধর, (৪) ভব-ভট্ট, (৫) ভব্যকীর্ত্তি, (৬) নীলবল্লভ, (৭) চন্দ্রসুভট্ট, (৮) কৃষ্ণসমরবল্লভ, (৯) তত্ত্বাপত্তরক্ষিত, (১০) বোধ-ভট্ট, (১১) কমলরক্ষিত, (১২) রত্নাকরশান্তি, (১৩) বাণীশবরকীর্ত্তি, (১৪) নাড়পাদ, (১৫) প্রভাকরমিত্তি, (১৬) রত্নবল্লভ, (১৭) জ্ঞানকী মিত্র, (১৮) দীপঙ্কর জীজ্ঞান, (১৯) মহাজ্ঞানস, (২০) কমলরূপশীল, (২১) নরেন্দ্র জীজ্ঞান, (২২) দানরক্ষিত, (২৩) অভয়াঙ্কর গুপ্ত, (২৪) শুভাকর গুপ্ত, (২৫) সুনায়ককী, (২৬) শাক্যকী (৩৭)।

কিছুকালের জ্ঞান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ (intercourse) ছিল (৩৮)। একই অধ্যাপক উভয় বিদ্যালয়ের

- (৩৪) Hindustan Review, 1906, PP. 190-191.
- (৩৫) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 151.
- (৩৬) Sanskrit Buddhist Literature of Nepal—by R. L. Mitter, P. 229.
- (৩৭) Journal of the Buddhist Text Society.
- (৩৮) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 146.

অধ্যাপনা করিতেন। একই রাজ্য উভয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঞ্চালাপের প্রতি সর্বাংশে দৃষ্টি রাখিতেন (৩৯)।

খ্রীষ্টাব্দ দশম ও একাদশ শতকে বিক্রমশীলা বিশ্ব-বিদ্যালয় বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞান নালন্দার প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল (৪০)। এই জ্ঞানের মন্দির গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া স্বীয় গৌরব অকল্প রাখিয়াছিল (৪১)। নরপতি মহীপাল দেবের রাজত্ব সময়ে খ্রীষ্ট একাদশ শতকের প্রারম্ভে নালন্দার সমস্ত শক্তি বিক্রমশীলায় কেন্দ্রীভূত হয় (৪২)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমশীলা ভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হয়। ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত বাঙ্গালার গৌরব বাঙ্গালী দীপঙ্কর জীজ্ঞান গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধীশ্বর নরপালদেব কর্তৃক মনোনীত হইয়া বিক্রমশীলা বিহারের মহা গৌরব ও দায়িত্বময় অনিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন (৪৩)।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পণ্ডিত মহামনীষী প্রাজ্ঞবর দীপঙ্কর জীজ্ঞানকে বিক্রমশীলা বিহার-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনিনায়কপদে অধিষ্ঠিত করার যে তাহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা নহে—পরন্তু, যে অনিনায়কপদে তাঁহাকে মনোনীত করা হইয়াছিল, সেই পদেই গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল,—আর যিনি এই জ্ঞান-বৃদ্ধকে এই রাজ্য নরপালদেব করিহাসের পুণ্ডারীক আশ্রিত হইয়া

দীপঙ্কর জীজ্ঞানের অনিনায়কতার সময়েই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয় (৪৪)। এই সময়েই শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকরশান্তি, জ্ঞানকী মিত্র, নাড়পাদ প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। অনিনায়ক দীপঙ্কর জীজ্ঞান এই সকল বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন (৪৫)। ইহার পূর্বে এতজন সুবিখ্যাত আচার্য্যের একত্র সমাবেশ হয় নাই। কাজেই বলিতে হয়, মহামনীষী আচার্য্য দীপঙ্কর জীজ্ঞানের অনিনায়কতার সময়েই বিক্রমশীলার গৌরব ভারতেন ও বহির্ভারতে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

যে সকল বৌদ্ধাচার্য্যের জীউচরণতলে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধক দীপঙ্কর জীজ্ঞান নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষী রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তরুণ হইয়াও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা দায়িত্ব এবং গৌরবময় অনিনায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি তাঁহার সেই শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরুগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

নালন্দা যেমন বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়া জগৎব্যাপী জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিল, বিক্রমশীলাও তরুণ জ্ঞান বিতরণে রূপগত করে নাই। বিক্রমশীলার দান ভারতে ও বহির্ভারতেই লীমাবদ্ধ ছিল। নালন্দার সৌরভ-গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া জ্ঞানভরে নানা দিগ্বেশে হইতে বহু জ্ঞানপিপাসা ছাত্র যেমন তথায় আসিয়া সমবেত হইত, বিক্রমশীলার খ্যাতি-গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া তেমনই ভারত ও বহির্ভারতের বহু জনপদের বহু জ্ঞানার্থী জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এই জ্ঞান-বিশ্ব-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইত।

ইতিহাস-বিখ্যাত চৈনিক শ্রমণ হিউয়েন সাং যেমন নালন্দার বাঙ্গালী অনিনায়ক শীলভট্টের জীউচরণতলে বসিয়া অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া স্বদেশে

(৪৪) Journal of the Dept. of Letters, Cal. Uni. Vol. I

(৪৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৯২৩ পৃ. ৮৬।

(২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, P. 4.

(২৯) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 151.

(৩০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৯২১। (৩১) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 151.

(৩২) History of Mediaeval School of Indian Logic, P. 141.

(৩৩)

—Do—

(৩৯) Indian Buddhism—By Taranath.

(৪০) Introduction to Ramcharit—Edited by M. H. P. Sastri, P. 11.

(৪১) Hindustan Review 1906, PP. 190—191.

(৪২) Journal of the Dept. of Letters, Cal. Uni. Vol. I

(৪৩) Introduction to Ramcharita, P. 11. : Indian Pandits in the Land of Snow, P. 51.



প্রভাবর্ধন করিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনই তিব্বতীয় ছাত্র ধর্মকীর্তি বিক্রমশীলার স্থপিতিক্ত হইয়া স্বদেশে বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সংস্কৃত গণ্ডরাজীর তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় অম্বাদের কেন্দ্র হইয়াছিল, বিক্রমশীলারও তেমনই সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অম্বাদেরও কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

নালন্দায় বৌদ্ধ দর্শন, মহাব্যাস ও তত্ত্ব-সাহিত্য-সৃষ্টির যে বীজ উদ্ভূত হয়, পরে উহাই বিক্রমশীলার পুষ্ট হইয়া মহামহীকহে পরিণত হয়। জন্ম-স্থলনা হইতেই বিক্রমশীলা বৌদ্ধতত্ত্বের স্রুতং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই বিহারের অধিনায়কগণ প্রত্যেকেই ময়বজ্রাচার্য্য ছিলেন (৪৬)।

নালন্দা বিহার তত্ত্ব-সাহিত্যের জন্মস্থান হইলেও তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নালন্দা হইতে বিক্রমশীলার বিহারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমধিক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ছিল (৪৭)।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেমন বহুসংখ্যক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিল, বিক্রমশীলা বিহার হইতেও তেমনই বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিল। বাঙ্গালী

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই ধর্মপ্রাণ তিব্বতরাজ্যগণের অম্বরোধে তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্থার করিবার জন্ত প্রথমে তিব্বত দেশে গমন করেন। গৌড়নিবাসী নালন্দা বিহারের অধিনায়ক, তাত্ত্বিক-শাস্ত্রবিশারদ প্রথমে তিব্বত দেশে গমন করিয়া রাজগুরুপদে বৃত্ত হন (৪৮)। অচাৰ্য্য শাস্ত্রবিশারদ তিব্বতীয় বিহারের প্রথম বাঙ্গালী অধিনায়ক (৪৯)। ইহার কিছুকাল পরে অচাৰ্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী তিব্বতরাজ্যের অম্বরোধ-আমন্ত্রণে তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের সংস্থার করিবার জন্ত তিরতুথারাত্ত তিব্বত দেশে গমন করেন (৫০)।

বিক্রমশীলা চারিশত বৎসরকাল অজ্ঞানভাবে ভারতীয় সভ্যতা, শিল্প, জ্ঞান, ধর্ম প্রচার করে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী অজ্ঞান বিহারের মত বিক্রমশীলাও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস হইয়া যায় (৫১)। এই সময় কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত অচাৰ্য্য শাক্যশ্রী বিক্রমশীলা বিহারের শেষ অধিনায়ক ছিলেন।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক স্থবিখ্যাত পাণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল। পদ্মসম্ভব, শাস্ত্রবিশারদ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জেতারি, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, শুভাকর প্রভৃতি অবিভীত পণ্ডিতগণের প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল।

(৪৮) Indian Pandits in the Land of Snow—by S. C. Das, P. 49.

(৪৯) History of Mediaeval School of Indian Logic—by S. C. Vidyabhusan, P. 125.

(৫০) Ibid, P. 50. (৫১) Early History of India—by V. A. Smith.

(৪৬) Indian Buddhism—by Taranath P. 257; Kern's Manual of Buddhism, P. 132.

(৪৭) Magadhan Literature—by M. M. H. P. Sastri, P. 131.

উদয়ন — শ্রাবণ, ১৩৪০



শিকারী

[ভাষ্য — শ্রীমদ্র আদ, কে, পাল মহাশয়ের গঠিত মূর্তি প্রতিষ্ঠা]



## “কতদিনে ফিরিবে?”

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য

( ১ )

ডাক্তার শশাঙ্ককুমার খোম যুবক হইলেও ইহারই মধ্যে কলিকাতার ভিতরে ও বাহিরে যথেষ্ট নাম করিয়াছে। সকালে ঘণ্টা ছই গৃহগত রোগিণীগকে দেখিবার পরেই তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়। বিভিন্ন স্থানে রোগী দেখা, বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ঘণ্টাখানেক হাজিরা দেওয়া—এসব সাধারণ বেল। একটা কি দুইটার আগে তাহার গৃহে ফিরিবার অবকাশ হয় না। অপরাত্তের দিকে প্রতিদিন সাড়ে চারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সে তাহার স্বন্দরী তরুণী স্ত্রী সন্ধ্যারাণীর সহিত একত্র বসিয়া চা-পান ও গল্প-গুজব করিয়া তবে বাহিরে যায়। ঐ সময়টুকু সাধারণ প্রয়োজনে সে উঠে না। অবশ্য মরণাপন্ন রোগীর জ্ঞাত আত্মন আসিলে সে কথা স্বতন্ত্র।

সেদিনও যথানিয়ম শশাঙ্ক উপরে বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছে—সঙ্গে অবশ্য কিছু বাস্তব আছে। একবার খাও দুরাইয়া যাইতেই সন্ধ্যারাণী উঠিয়া আবার খাও দিয়া, চায়ের পাত্র হইতে আর একটু চা ঢালিয়া দিতেছে। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া সে খাবার খায় না। কেবল চা পান করে। কিন্তু তাহাও গোপনে। পাছে ভুতোর। কেহ দেখিতে পায়, এজ্ঞ মতক্ষণ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক নীচে না নামে, ততক্ষণ কাহারও উপরে আসিবার আদেশ নাই। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহারা সিঁড়ির দুয়ারের বাহির হইতে ডাকিবে—ইহাই নিয়ম।

সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টুকু সন্ধ্যারাণীর নিজস্ব সময়। এই সময়ে তাহার স্বামীর উপর আর কাহারও কোন অধিকার নাই। বিশেষ কোন কাজ আসিয়া না পড়িলে চা-পানের পরেই দুইজনে কখন কখন

কিছুদণের জ্ঞাত বেড়াইতে বাহির হয়। কাজ পড়িলে শশাঙ্ককে একাকীই বাহিরে যাইতে হয়।

শশাঙ্ক চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া ‘কাণ-বাড়া’ করিয়া বলিল, কে ডাকছে না?

সন্ধ্যারাণী নিঃশব্দ ফেলিয়া বলিল, মাথার শরীরকে জোর করে ধরে রাখা যায়, মনকে যায় না।

শশাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া বলিল, কেন, একথা কেন বলছ?

সন্ধ্যা। সমস্ত দিনের মধ্যে শুধু এইটুকু সময় তুমি দয়। করে ভেতরে থাক। তার মধ্যেও কত জনের ডাক তোমার কাছে এসে পৌছায়। সত্যিকারের ডাক তো আছেই, তার উপর কালনিক ডাকেরও অভাব নেই। তুমি ডাক্তার না হয়ে কবি বা গল্পলেখক হলে বোধহয় বেশী উগ্রভিত্তি করতে পারতে।

শশাঙ্ক। যদি অসুস্থতা দাও, না হয়, আঙ্গ থেকে চেষ্টা করি।

সন্ধ্যা। রুগে কর। কবি বা গল্পলেখকের লেখা পড়তে ভাল; কিন্তু স্বামী হিসেবে তাঁরা মাথার থাকুন!

শশাঙ্ক। তাঁদের প্রতি তোমার এ অবিচার কেন?

সন্ধ্যা। এ অবিচার নয়, সুবিচার। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁরা নমস্ত, অজ্ঞ ক্ষেত্রে নয়। আমার স্বামীকে আমি ভাবব, অপরে কেন ভাববে?

শশাঙ্ক। ভাগ্যে লিখতে নিষি নি! নইলে কি দুর্দশাই হ’ত তোমার হাতে!

সন্ধ্যা। যা’ শিখেছ, তাতেই আমি অস্থির। ঘণ্টা বাজলেই আমার ভয় লাগে।

এমন সময় সিঁড়ি হইতে সত্যি আস্তান-কণি বাজিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা বিরক্ত হইয়া বলিল, দেখলে, এই সময়টাতেও একটু শান্তি নেই। বাবর করলেও তো চাকর-বাকর গুলো শুনবে না।



বোধহয় বিশেষ কিছু কাজ পড়ে থাকবে, নইলে এ সময়ে এরা ঘটা বাজাবে না বা বাজাতে দেবে না,—বলিয়া শশাঙ্ক, কি হইয়াছে জানিবার জ্ঞাত, সিঁড়ির কাছে উঠিয়া আসিল।

একটু পরেই শশাঙ্ক বাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমার এক পুরানো বন্ধু অনেক দিন পরে এসেছে। তুমি তা ও বাবারের ব্যবস্থা কর; আমি তাকে এখানে আনতে চলালাম।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, কে সে বন্ধু?

শশাঙ্ক বলিল, তুমি তাকে চেন না। সে আমার বড় উপকারী বন্ধু। তুমি একটু শীঘ্র ক'রে নাও, আমি এলাম ব'লে।

বলিয়া শশাঙ্ক ক্ষতপদে নীচে নামিয়া গেল।

সন্ধ্যা বিস্মিত হইয়া ভাবিল, কে এমন বন্ধু আসিল যাহার জ্ঞাত তিনি এমন ব্যক্ত হইয়া ছুটিলেন! অথচ সে তাহাকে চেনে না।

(২)

কিছুক্ষণ পরে শশাঙ্ক একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি টাইব বোধহয় সন্ধ্যা, কি হ'লেই ভাল হ'ত। অন্তত জ্ঞাতর না হ'লেই ভাল ছিল।

সন্ধ্যা বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? আর তুমি একা ব'লে? তোমার বন্ধু কোথায়?

শশাঙ্ক বলিল, সেই কথাই তো বলছি। এত বছর পরে শৈলেন এল, অথচ আমাকে এখনই বাইরে যেতে হচ্ছে। ও কি, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

সন্ধ্যার হালি হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। চোখের রাগাল ধরিয়া আপনাকে যেন সামলাইয়া সে বলিল, ও কিছু নয়। আজ হৃদয় থেকে কেমন মাথা ঘুরছিল। তা এখন বাইরে যাবে কেন?

শশাঙ্ক বিরক্তিতা মুখে বলিল, পণ্ডপতিবাবু হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নাকি পক্ষাঘাতের মত হ'য়েছে; তাই তাড়াতাড়ি ডাকতে এসেছে। অত্বে কোন নৃতন রোগী হ'লে না গেলেই হ'ত। এখানে যে বেতাই হবে। আমি এখনই চললাম। ঘটা-

খানেকের মধ্যে ফিরব। শৈলেন এখন ওপরে এল না। বললে, তোমার বোয়ের সঙ্গে দেখা করব এই অবস্থায়! ও এখন ঘানের ঘরে ঢুকেছে। বান্দিক পরে আসবে। যদি দেবী হয় ডাকিয়ে এনে। লজ্জা ক'রো না। শৈলেন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি না দেবো পর্যন্ত আতিথ্যের ভার তোমার। ঐ দেখ, আবার হ'ল দিতে শুরু করলে। চ'ললাম।

শশাঙ্ক যেমন ক্ষতবলে আসিয়াছিল তেমনই ক্ষতবলে নামিয়া গেল।

একটু পরেই হ'ল দিতে দিতে একখানা গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা বলিয়া বলিয়া ভাবিতে লাগিল, সে কি করিবে? স্বামীর বন্ধকে কি উপরে ডাকাইয়া আনিবে? কতি কি? কেন আনিবে না? বিশেষ, যখন তিনি এত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। নামে ভয় কি? শৈলেন তো একটা সাধারণ নাম। ঐ নাম বাংলা দেশের অন্তত একশ' লোকের আছে। কি ভীক সে! ভাগ্যে তিনি তেমন কিছু মনে করেন নাই। এককাল পরে সে আসিবে? তাহা সম্ভব নয়। আদিবার হইলে সে বহুপূর্বে আসিত।

সন্ধ্যা ছোঁর করিয়া উঠিল। স্বামীর বন্ধুর জ্ঞাত ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নীচে হইতে খবর আসিল, বাবুর দান হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কি উপরে ডাকিয়া আনা হইবে?

তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া সন্ধ্যা উত্তরিয়া বসিয়া রহিল।

প্রভুর বন্ধকে উপরে পৌছাইয়া দিয়াই কৃত্য নীচে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া বাইতেই আগন্তুক লক্ষণক সন্ধ্যার ভীত-আনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! তুমি! সন্ধ্যা নির্বাক!

আগন্তুক সন্ধ্যার দিকে আবার বান্দিকগণ চাহিয়া

ধাকিয়া, আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, তুমি সন্ধ্যা! তুমি শশাঙ্কের স্ত্রী!

সে যেন উত্তরের জ্ঞাত বন্ধ অপেক্ষা করিয়া, পুনরায় বলিল, আমার কি পরিচয় দিতে হবে যে, আমি শৈলেন, বার সঙ্গে তোমার—

সন্ধ্যা এতক্ষণে বলিল, আমার কমা কর।

আগন্তুক আবার সন্ধ্যার মুখের দিকে বান্দিকগণ চাহিয়া বলিল, কমা কথাটি তোমার মুখ থেকে বেরল? তোমার কমা কেন করব? তুমি আমার নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছ, তাই? তুমি আমার ভুলে, তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে, আমার এক বন্ধকে বিবাহ করেছ, তাই? —

সন্ধ্যা কাতর হইয়া বলিল, আমার দয়া কর, শৈলেন।

শৈলেন নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, তুমি আমাকে কতখানি দয়া করছ, সন্ধ্যা? আমি শশাঙ্কের সঙ্গে দেখা ক'রেই আজ রাতের ট্রেনেই কোথায় যাব ভেবেছিলাম, জান? আজই ঢাকা-মলে ঢাকা যেতাম। গিয়ে তোমাদেরই বাড়ীতে সর্বপ্রথম উপস্থিত হ'তাম। ভালই হ'ল, অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে গেলাম। সেখানে গিয়ে যে জ্ঞানপাত হ'ত, কলকাতাতেই সেটুকু লাভ করলাম। ওখানে গিয়ে না' শুনে কণ্ঠ শীতল হ'ত, দগ্ধ হ'তাম, এখানে তাই ভলকে দেখে চকু পরিষ্কৃত হ'ল, কৃতার্থ হ'লাম। হ্যাঁ, ভাল কথা—তোমাদের ক' বছর বিবাহ হয়েছে?

সন্ধ্যা অতি ধীরে ধীরে ক্ষীণবরে বলিল, চার বছর। শৈলেন প্রোত্বক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আর ক' বছর প্রেমে পড়েছিলে? বোধহয়, বাকি দু'বছর হবে? তা' হ'লে বিরহে তেমন দ্বন্দ্ব পাও নি, মনে হয়। কি বল?

সন্ধ্যা এবার জাহ্নু পাতিয়া বলিল, আমি অপরাধিনী, আমার চিত্ত দুর্বল। আমি অজ্ঞান করেছি। তোমার পায়ে খ'য়ে আমি কমা চাইছি। তুমি সহং, আমার কমা কর।

শৈলেন বিভ্রান্তে আসন ছাড়িয়া একটু দূরে আসিয়া বলিল, আমি সহং? আমি মাহুং নই? আমার স্বপ্ন-দ্বন্দ্ব, আশা-ভরসা নেই? তুমি জান, এক বছর তোমাকে কেন পত্র লিখি নি? পাছে তোমার কোন বিপদে পড়। পাছে আমার চিঠি তোমাদের কারও কাছে পৌছালে তোমাদের কারও কোন ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে। কিন্তু আমার আশা ছিল, তোমার উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি ভুলবে না। বত বছর পরেই আমি বাই না কেন, তোমায় আমি ফিরে পাব। তোমার পেলেই আমার সকল দ্বন্দ্ব, সকল ব্যথা সার্থক হবে। কি ভুল আমার! কি নির্দোষ আমি! অথচ সবাই বলত, আমার মত বুদ্ধিমান পুং কম দেখা যায়। এই আমার বুদ্ধির পরিণতি! তোমার মত সামান্য একটা মেয়েমানুষেরও আমাকে ঠকতে পারে—আর এমনি ভাবে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন স্থানে আমি তোমার এই প্রতারণাপূর্ণ সুখানি ভেবে, তোমার ঐ মুখের প্রেমের কথা মনে ক'রে কাটিয়েছি। আর সেই তুমি তখন পরম আনন্দে অজ্ঞের সঙ্গে প্রেম করছ। আমিও এর প্রতিশোধ নিতে জানি। তোমার লেখা চিঠি আমার সঙ্গে ছিল জান তো? প্রবাসে সেই চিঠিগুলির মধ্যে আমি বেঁচে ছিলাম—যেমন তুমি নৃতন প্রেমের মধ্যে ছিলে! সে চিঠিগুলির মধ্যে একখানা শশাঙ্ককে দেখালেই চলবে।

সন্ধ্যা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উজ্জ্বলিত কণ্ঠে কাহিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় চম্পক-বিনিন্দিত অশ্রুটির ফাঁক দিয়া স্বল্প ঋণধারণার মত বিন্দু বিন্দু অশ্রু ধরিয়া পড়িতে লাগিল। শৈলেন কিছুক্ষণ বদ্ধব্রতীতে সেই বিগলিত অশ্রুধারার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে দেখলে একদিন মনে হ'ত বুকে বিভাজ্য শর বিধেছে; আর আজ তোমার এক এক ফোঁটা চোখের জলে যেন আমার হৃদয়ে এক একটা কদম ফুল ফুটে উঠছে। ভারি



আনন্দ হ'চ্ছে। বাঃ! এতই এত আনন্দ, না জানি, যখন শশাঙ্ক নিম্নে আসবে, তাকে যখন সব কথা বলতে পাব, তখনকার আনন্দ কি রকমের হবে!

সন্ধ্যা এবার হাত হইতে মুখ সরাইয়া অশ্রু-বিগলিতনেত্র শৈশবের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পার?

শৈশব সন্ধ্যার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য, চোখের জলে তোমার এখনও এত স্বন্দর দেখায়! এত প্রতারণাত্মক মুখের ভাব বদলায় নি। আশ্চর্য্য! ক্রমতা আছে তোমার বটে!

এমন সময় হ'ল দিয়া সেটের মধ্যে পাড়ী প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা কপিতলপদে উঠিয়া শৈশবের কাছে আসিল ও তার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, আমার স্বামী আসছেন। আমার সর্বনাশ করো না। একখানি আমার ভালবাসতে। সেই কথা ভেবে আজ আমার দয়া কর।

নীচে মোটর থামার শব্দ শুনা গেল।

শৈশব হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, সে-ভালবাসার কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হ'ল না? সে-কথা আর তুলো না। চিরকালের মত তার সমাধি হ'য়ে গেছে। তুমি আমার দয়া কর নি, আমিও করব না। তোমায় হৃদয়ে রেখে, আমি তোমার দেওয়া হৃদয়ে নিয়ে নির্দোষে জীবন কাটাতে, সে-আশা আমার কাছে থেকে করো না। সে-মহাব আবার মধ্যে নেই।

শিঙিতে জুতার শব্দ হইল। সন্ধ্যা বিপরীত দিকে মুখ দিরাইয়া বরাবরে মুখ ও চক্ষু মুছিয়া লইল ও কাতর সুরিতে একবার শৈশবের পানে চাহিয়া নিকটবর্তী একটা আসনে বসিয়া পড়িল।

পরসূর্ত্তে শশাঙ্ক শিঙির ছয়ার গুঁড়িয়া বারান্দার প্রবেশ করিল।

কক্ষমধ্যে আসিয়াই শশাঙ্ক বলিল, কর্তব্য এত অপ্রিয় জীবনে আর কখন হয় নি, শৈশব। তুমি এককাল পরে এসে, আর আমি তখনই বাইরে চলে

গেলাম; এজন্য ভক্ত্যারি বৃত্তির উপর আমার রাগ হইছিল।

শৈশব শাস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর তোমার রোগীর খবর কি?

শশাঙ্ক বন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল, একটু ভাল। আর একজন ডাক্তার আনিবে, তাকে কাছে বসিয়ে, সব বৃত্তির দ্বিগুণে ভবে ছুটি পেয়েছি। চা খেয়েছ তো?

শৈশব খুব সহজভাবে বলিল, তুমি এলে একসঙ্গে খাব বলে এখনও খাই নি। একা বাওয়া তো আছেই, আর থাকবেও চিরকাল। তার উপর তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হ'ল,—সেটাও চায়ের চেয়ে কম মধুর নয়। তোমার স্ত্রী অবশ্য কেবলই জিদ করছিলেন খাবার জন্ত।

শশাঙ্ক হাসিয়া বলিল, তোমার কথার ভঙ্গী এখনও তখনই আছে দেখছি। 'তোমার স্ত্রী' বলবে কেন তুমি? তুমি 'সন্ধ্যা' বলবে। 'তোমার স্ত্রী' মানে মিসেস ঘোষ—বেটা তোমার বলা সাজে না।

পরে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিল, শৈশবের কথা বলার ক্রমতা একবারে অসাধারণ ছিল। তুমি শৈশবকে জান না। ও আমার—

শৈশব বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, কি ক'রে জানবেন, বল! তুমি তো বল নি, আর উনিও কিছু হাত গুণতে জানেন না।

সন্ধ্যা উঠিয়া মূরুর খুঁজে জিজ্ঞাসা করিল, সব তৈরী আছে; আমি নিয়ে আসি? কেবল চা বদলে আনতে হবে।

শৈশব বাতুল হইয়া বলিল, না, না, আমি ঠাণ্ডা চাই ভালবাসি। সেই চাই দিতে বসুন। আপনিই বা কেন উঠছেন? আর কাউকে দিতে বসুন না। আপনি একটু গল্প করুন।

শশাঙ্ক বলিল, ঐ ওর স্বভাব। আপনি হাতে ঐটুকু না দিয়ে ওর তৃপ্তি হয় না।

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। যখন সে চা ও খাবার লইয়া ফিরিতেছিল, তখন

ছয়ারের বাহির হইতে সে জনলি, শৈশব বলিতেছে, I congratulate you, Shashanka. She is really an angel. তোমার স্ত্রীভাষা অতি সুন্দর। কেবল তোমার স্ত্রী, তাই আমি দ্বিধা স্বরূপ করলাম। নইলে—

সন্ধ্যা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। তারার হৃৎকত পাতাগুলিও একটু শব্দ শব্দ করিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

কোনমতে শৈশবের সমুখে পাত্র ধরিয়া দিয়া সমুখের একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া সন্ধ্যা বস্তির নিখোঁস ফেলিল।

( ৩ )

আকাশে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছিল। কাছে কোথাও বোধহয় ঝুটি হইতেছিল। মনে হইতেছিল, এখানেও ঝড় হইতে পারে।

খাবার ও চা শেষ করিয়া শৈশব বাড়ি দেখিয়া বলিল, এখনও ঘন্টা ছয়ক আমার পরমায় এখানে আছে।

শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বলিল, তার মানে?

শৈশব বলিল, আটটার সময়ই আমাকে আবার উঠতে হবে।

শশাঙ্ক। সে কি! আজকের রাতটাও তুমি এখানে থাকবে না?

শৈশব। তুমি তো আমার অবস্থা জান। কলকাতায় মাত্র একরাতি থাকবার আমার অধিকার। তারপর কাহ্নই আমাকে দেশে রওনা হ'তে হবে।

শশাঙ্ক। দেশে কিছুদিন থাকবে এখন?

শৈশব। থাকব ভেবেছিলাম; কিন্তু আর থাকব না।

শশাঙ্ক। কেন?

শৈশব। কি হবে? দেশে কে আছে? কলকাতায় আমার থাকবার উপায় নেই। কাজেই আবার বাড়ি ফিরে যাব। এখনও ফিরে গেলে সেখানকার কাজটা পাব। যে ক'দিন বাঁচবে, সেখানেই থাকব।

শশাঙ্ক। কেন? এখন যখন দেশে ফিরে আসবার অধিকার পেয়েছ, দেশে থাক ভাই। তুমি কলকাতা না আসতে পাবে, আমরা গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। তুমি তো চিরকাল নারীকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছ, এবার বিবাহ কর, স্বামী হও।

শৈশব। সে শ্রদ্ধা আর নেই, শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। তোমার মুখে তো একথা মানায় না, শৈশব। আর তুমি তো কখন প্রেমে পড়নি—সে, বার্ষপ্রেমে নারীর উপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে।

শৈশব। চারদিকেই বে বার্ষপ্রেমের ছবি,

শশাঙ্ক। নিজে প্রেমে না পড়লেও তো নিজস্বার নেই। চারদিকেই বার্ষপ্রেমের ছবি। পুরাতন প্রেম ক'জন মনে ক'রে রাখে? ভালবেসে ক'জন লোক হৃদয়ে আছে? তোমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার স্ত্রী সন্ধ্যা দেবার কথা ছেড়ে দাও। খুব কম লোকেরই এমন স্ত্রী হয়।

শশাঙ্ক। তুমি একবার বলে দেখ, সন্ধ্যা, তোমার কথা যদি শৈশব রাখে। তুমি এর পরিচয় জান না। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। হঠাৎ ওকে একবার intern করবার কথা ওঠে। সে-যবর ও পায় এবং কল্লনায় সে-জীবন ওর অসহ্য হওয়ার পূর্বেই ও পাগলি বিয়েতে চলে যায়। সেখান থেকে ও যুরোপের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ওর কোন বিপদ হয় নি; কিন্তু দেশে ফেরা সেই থেকে ওর নিষেধ হয়ে যায়। ওই অবস্থাতেও সেখানকার এক যুনিভার্সিটি থেকে M.A., Ph.D হয়, ও শেষে বার্লিনে প্রফেসরি পেয়ে চলে যায়। দেশেও ওর চাকরির অভাব নেই। তবু ও থাকবে না।

সন্ধ্যা কপিতলপদে বলিল, উনি অত ক'রে বলছেন, তুমি—আপনি থাকুন না কেন। আমরা সবাই বড় স্বামী হব তা' হলে।

শৈশব। আপনার অন্তরে দয়ার সমুদ্র, তাই আপনি এমন ক'রে বলছেন। কিন্তু আমার থাকার কোন উপায় নেই। আমার জন্তও বটে, আপনার



জগৎ বটে। আমার অতি-আপনার জনের মধ্যে এমন কেউ আছে, যিনি আমি চ'লে গেলে তাঁর কৃষ্ণ গণ ব'লে মনে করবেন।

সন্ধ্যা কি-একটা বলিতে গিয়া নিখাস ফেলিয়া চূপ করিল।

শশাঙ্ক রীর পানে চাহিয়া বলিল, একধার জগৎ তুমি জঘতি হয়ে না, সন্ধ্যা। শৈশবের কথা বলার ধরষই এই। কাউকে ছুঁতে দেওয়া গুণ উদ্ভঙ্গ নয়।

এই সময়ে একটা বনকা বাতাসের সঙ্গে রুটি নামিয়া আসিল। উপরে গভীর নীল আকাশ, নীচে তুহার-গুণ ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের মত রুটিবিন্দুগুলি ভিড় করিয়া নামিয়া আসিল।

হুঁজনেই কিছুক্ষণ আমননে বাহিরের বর্ষণের পানে চাহিয়া রহিল।

হুঁজ বন্ধুতে ধীরে ধীরে আরও অনেক কথা হইল। হঠাৎ শশাঙ্ক বলিল, তুমি একসময়ে কবি ছিলে, শৈশব। এই বর্ষার মধ্যে একা চ'লে যেতে কি ক'রে মন চাইছে তোমার?

শৈশব শৈশবের হালি হাসিয়া বলিল, এখন আমি দারুণ অকবি, শশাঙ্ক। কবিরের এক বিন্দুও আজ আমার অন্তরে নেই। আর হুঁজ এক জনের সঙ্গে দেখা ক'রে আজ রাতেই আমার শেখের ট্রেন ধরতে হবে। আমি উঠলাম।

বলিয়া শৈশব বড়ির পানে চাহিয়া সভাই উঠিয়া পড়িল।

শশাঙ্ক অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিস্মিত কর্তে বলিল, সে কি, শৈশব! তুমি এই রুটির মধ্যে যাবে?

শৈশব শশাঙ্কের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, হ'লই বা, তাই! বাইরে বেরিয়েই আমি ট্যাক্সি পাব।

শশাঙ্ক ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার গাড়ী ক'রে নেতও তোমার বাধা আছে, শৈশব?

শৈশব। তাতেও তোমার বিপদ আছে, তাই। সামান্য ক্ষয়ের জগৎ এসে তোমাকে একটা চিরকালের বিপদ দিয়ে যাব, এতে যে আমি বড় ছুঁতে পাব,

তাই। আমার উপর ক্ষম হয়ো না। তোমাকে ও সন্ধ্যাদেবীকে চিরকাল আমি যেখানে থাকি মনে রাখব। শরীরের দূর কিছুই তো নয়, তাই; জনের দূরই হবে।

তিন জনে কিছুক্ষণ চূপ করিয়া রহিল। বাহিরে রুটির ধারা তখনই ঝরিতে লাগিল। মেঘের ছায়া সন্ধ্যাকে আরও আগাইয়া আসিল। তিন জনেই বৃষ্টি আপন আপন চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল।

শৈশবই সে নিতান্ত ভঙ্গ করিয়া বলিল, তোমরা বস; আমি নীচে থেকে তৈরী হ'য়ে এখনই আসছি। হুঁজ জনে বসিয়া রহিল। শৈশব ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

শশাঙ্ক রুটি খরে বলিল, একটা কথা তোমাকে আজও বলি নি, সন্ধ্যা। আজ যে আমি নিশ্চিত হ'য়ে ডাক্তারি করছি, সে শৈশবেরই পার্বত্যানের ফল।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাস্য ভাবে শশাঙ্কর মুখের পানে চাহিল। শশাঙ্ক বলিয়া বাইতে লাগিল, তখন ভয়ানক ধর-পাকড়ের যুগ। ধরা আর 'অস্তরীণ' করা।

আমি তখন বন্দেবী আন্দোলনের মধ্যে খুব পড়ে গেছি। এমন সময় পুলিশ একদিন এসে আমাদের মেস ঘেরাও করলে। তখনকার দিনে যাদের নামের উপর পুলিশ সদর ছিল না, তাদের হুঁজ একখানা চিঠি আমার কাছে ছিল। সেগুলো নির্দোষ হ'লেও তাদের চিঠি। শৈশব সে কথা জানত। তাড়াতাড়ি করে যখন হুঁজ বন্ধ ক'রে নিয়ে আমার বাসটা তার বিছানার কাছে নিয়ে আমার চাবি দিয়ে বাস খুলে ফেলল।

সাতখানা ধানের চিঠি। চিঠিহীন খাম ক'রে টুকুরা টুকুরা ক'রে ছিঁড়ে তাতে তখনই শৈশব দেশলাই জেলে দিলে। এমন সময়ে দুয়ারে লাথির শব্দ। অস্থমানে বোম্বা গেল যে, সে সবল লাথি প্রবল পুলিশের। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে বাধ্যলাম। শৈশব ইঙ্গিতে আমাকে নিবেদন করলে। চিঠির টুকুরাগুলো আপন মনে পুড়তে লাগল। এবার গর্জন শোনা গেল, দুয়ার খোলা, নইলে দরজা ভাঙা হবে। আমি ব্যস্ত হ'য়ে

উঠলাম। শৈশব চুপি চুপি বললে, ভাগ্যে দে।

তুই চূপ ক'রে থাকবি। যা' বলবার আমি বলব। এমন সময়ে সশস্ত্র দুয়ার ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশের লোক এসে তার হাত চেপে ধরল।

তখন সে চিঠির টুকুরাগুলো ভগ্ন হ'য়ে গেছে, তা' থেকে আর পাঠোক্তার অসম্ভব। পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে—এ

চিঠি কার? নির্ভীকভাবে শৈশব বললে—আমার। পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে—কার লেখা? উদাসীনভাবে শৈশব বললে—কান্না হবে। আবার প্রশ্ন হ'ল—

পোড়াছিলে কেন? শৈশব বললে—কেনম জনে, তাই দেখিলাম। আমি ভয়ে বিশ্বের একবারে স্তব্ধ হ'য়েছিলাম। যখন পুলিশ সঙ্গে ক'রে তাকে নিয়ে

যাবার উদ্ভোগ করছে, আমি মুখ মূলেতে রেখেই পুলিশের অলক্ষ্যে সে আমাকে চক্ষের ইঙ্গিতে নিবেদন করলে। আমি কিছু বলবার আগেই তাকে নিয়ে পুলিশ

চ'লে গেল। এমন ক'রে আমাকে সে বাঁচিয়েছিল। তারপর তার নামে কেন হ'ল। কোন প্রমাণ না

পাওয়ায় সে খাবাস গেল। এর পরেই তার অন্তরীণে আরম্ভ হবার কথা ভনলাম। এর মধ্যে অতি গোপনে

সে পাহারী সেজে ইলগাও চ'লে গেল। ইলগাও যাবার কথা সন্ধ্যা জানিত। যাবার আগে

শৈশব গোপনে তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সে দায়মুক্ত

হইয়া নিজস্বই করিয়া আসিবে। সন্ধ্যা যেন তাহার জগৎ অপেক্ষা করে। সন্ধ্যারও মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল,

পাঁচ ছয় বৎসর কেন, যাবজ্জীবন সে শৈশবের জগৎ অপেক্ষা করিয়া থাকিবে।

টুক ছয় বৎসর পরে শৈশব ফিরিয়াছে। সে তাহার কথা রাখিতে পারে নাই।

শৈশবের পদশব্দ শুনা গেল। হুঁজনে চাহিয়া দেখিল, শৈশব তাহার বধাঁতি, ব্যাগ ইত্যাদি লইয়া একবারে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে।

শশাঙ্কের পানে চাহিয়া শৈশব বলিল, যাবার সময় সন্ধ্যা দেবীকে একটা উপহার দিতে চাই। দিতে পারি?

শশাঙ্ক বলিল, একথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ?

শৈশব আর কিছু না বলিয়া একটা স্তব্ধ মধ্যমের কেন্দ্রীয় পকেট হইতে বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে

দিয়া বলিল, এটা পরবেন। তারপর বন্ধুর দুই হাত ধরিয়া বলিল, তবে বাই,

তাই; জগৎ ক'রে না। বিশ্বাস ক'রে, তোমাদের চেয়ে জগৎ আমার আপনার আর কেউ নেই।

তারপর শৈশব দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

কক্ষের বাহির হইতে শৈশব মুখ ফিরাইয়া বলিল, তোমরা নেনে এস না। তোমরা ঐ জানালার কাছে

ধাঁড়ও, আমি যাবার পথেও তোমাদের দেখে যাব। সেই আমার পাথেয়।

শৈশবের পদশব্দ সিঁড়িতে ক্ষীণ হইয়া আসিল। খল পরেই একখানা ট্যাক্সি হর্ফ বাজাইয়া তাহাদের

গেটের সম্মুখে থামিল। হুঁজনে জানালার খুঁকিয়া দেখিল, পাশে রাস্তার

উপর একখানি ট্যাক্সি আসিয়া পৌঁছিল। শৈশব ট্যাক্সি হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহাদের পানে চাহিল। হাত

তুলিয়া সে সন্ধ্যাকে নমস্কার করিল। শশাঙ্কের পানে চাহিয়া একবার অতি করুণ মধুর হাসি হাসিল।

ট্যাক্সি ক্রমে দ্রুতপদের অতীত হইয়া গেল। শশাঙ্কের চকুতে অশ্রু আসিয়াছিল। অশ্রু মুছিয়া

সে সন্ধ্যাকে বলিল, শৈশব কি দিয়ে গেল দেখত? সন্ধ্যা কেন্দ্রীয় গুলিয়া দেখিল, একগাছি অতিহৃদয়

কারুণ্যবাহু চক্কণ সোনার হার; তাহাতে একটা স্তব্ধ লকটে লাগানো। লকটে খোদাই করা এই

কয়টি কথা—“কতদিনে ফিরবে?” সন্ধ্যার মনে পড়িল, যখন শৈশব ঢাকা হইতে

কলিকাতা পড়িতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে এই লকটেই তৈরী করা হইয়া সেই শৈশবকে উপহার

দিয়াছিল। এতদিন পরে শৈশব সেই উপহার আবার সন্ধ্যাকেই ফিরাইয়া দিয়া গেল।





এই ভানে



পালন করিতে পারিলে



দেশ এই মুহূর্তে



এক (আকান) হইয়া যায়

# সম্বাদ

## প্রীত অলুপা দেবী

[পূর্ণাহুতি]

(৫)

তা আহুক; একটা মেয়ের বিয়ে, যেখানে যে আছে সকলেই আহুক না; বারণ তো নাই; নিমন্ত্রণ-পত্র অপর্যাপ্ত ছাপাও হইয়াছে, বিলি করার ভারও আছে ওদের হাতেই, দার ইচ্ছা সেই আহুক, আমোদ করুক, খাওয়া-দাওয়া করুক, আপত্তি কিছুই নাই। শুধু দুখ এই যে, সেই আগলেনও সকলে, অথচ সকলের মুখেই সেই এক বাণী, "এত বর্ধায় নাকাল হ'তে এতদূর থেকে কে-ই বা আসত? শুধু ঐ নেমস্ত্র-পত্রে গিয়েই না ছোর ক'রে নিয়ে এস!" ছ'একবার একথাও হয় যে, "দিলেই হ'ত দেশের বাড়িতে বিয়ে; যতই হোক, এ ভাড়া-বাড়িতে সকাইকার তো আর এক-একটা ঘর কুলায় নি, হুর্দশার একশেষ! এমন জামলে কে-ই বা এখানে আসত!"

স্বরজন ভো বাইরের ঘরের একটা পাশে থাকেন; সেইখানেই রাতে তাহাকে বিছানা পাকিয়া দেওয়া হয়; সর্বাণী থাকে তার পুতুতুতো বোনদের সঙ্গে এক বিছানায় ঠামাঠামি হইয়া; কেননা, তাহার ননীদার'র বউকে একটা পুরা ঘর ছাড়িয়া দিতে হয়, নতুন-বিয়ে-হওয়া ছেলে-বউ। মলিনাদি'র ঘর সঙ্গে, তারও একট চাই। তরলাদিদির সাতটা ছেলেমেয়ে, কণ্ঠীটার ঘুম না হ'লে 'কলিক' ধরে। চারজন কাকীমার চারটা ঘরের দরকার, তার উপর পিসী'রা, আর অগাধ কটু-কুঁড়িনীও বিস্তর আছে। তা আর গুজ সর্বাণীর কোন আপত্তি ছিল না। ইংহারা

তাহাদের বাড়ীর আগন্তুক, অতিথি, বাড়ীর বেকিছু স্বয়ং এবং স্বাক্ষন্দা, সে তো ইহাদেরই প্রাপ্য বটে! তবে তাহাতেও যে ইংহারা থাকিয়া থাকিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন; তাহাদের বাড়ীতে এরকম অবস্থায় কি নাকি ঘটে, তাহারই উদাহরণ উঠিতে-বসিতে টানিয়া আনেন। এইতাই বাপ ও মেয়ে নিত্যন্ত বিপদ বোধ করিতে থাকে, আর নিজেরা ক্রমশই কোণঠাসা হয়।

সেদিন সর্বাণীকে তাহার ভাবী শস্তর পাকা দেখা দেখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের বাড়ীর মাতঙ্গররা সর্বাণীর বাপকে সঙ্গে করিয়া পাজ-আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন একখানা মোহর দিয়া। এপক্ষের ইচ্ছা ছিল, আশীর্বাদে অন্ততঃ একসেট হীরার বোতাম দেওয়া হয়; কিন্তু সর্বাণীর কি যে ঐ ধরুর্ভ পণ, সে-বন্দোবস্ত তাহার মনঃপুত হইল না। মলিনাদি'র বরকে যখন মোহর দেওয়া হইয়াছিল, তখন একেই বা হীরার বোতাম দেওয়া কেন? বাড়ীর একটা ঝাঁপা ঢাল থাকা ভাল! সেজ্ঞাকালীকে সে নিজেই এই কথা বলিয়া দিল, বাবাকে তেও সব কথা বলিয়াই রাখিয়াছে। সেজ্ঞাকালী শুনিয়া কিন্তু মনে মনে খুসীই হইলেন। "তা সবর আমাদের বেশ আক্কেল আছে বাবু! সত্যি তো, একবাড়ীর মেয়ে হাজারও হোক; একজনের অনেক হ'লে আর একজনকার তো মনে বাজে; জামাইবাও সব এসেছেন, তাঁদেরও মনটা খারাপ হবে। আবার দেখ গিয়ে, এই তো মাথায় মাথার



হ'য়ে র'য়েছে আমাদের স্থলোচনা, প্রতিমা, আর সম্রা, ওদের বোম্বার্ড তো আবার দাবী উঠতে পারে। না, বেশ করেচে সব, এই তো ভাল।"

ছোটগিলী বলিলেন, "এই দেখ ভাই, তোমরাই তো বলতে, লেখাপড়া শিখিয়ে পাশ দিয়েছে তাহতরাকুর মেয়েটাকে খিদি ক'রে তুলছেন। তা এখন দেখ সন্ধ্যাই, কত খিদি মেয়েই ও হয়েছে।"

হ্যাঁ, একখাটা অনেকবারই উঠিয়াছে বটে। সেজকাবী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "অনেকেই হয়, তবে বাপের শিক্বে ভাল আছে কিনা, তাই গুর গুটা হয় নি।"

ছোটকাবী এদের বড় ভালবাসে, সে একটু গুণী হইয়া বলিল, "সবু-না মেয়ে বড় ভাল, সে আমি বরাবরই জানি।"

অমনি চারিদিক্ হইতে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়া অনেকগুলি প্রবল কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "ওনা, তুমি আর ক'দিন এসেছ, ছোটবউ। অতবড়টা একে কল্ কেশ? আমাদের ঘরের মেয়ে, আমরা চিনি নে? তুমি আজ ওকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দেবে?"

অপ্রতিভ হইয়া ছোটবউ নীরব রহিল। কাকীদের মধ্যে এই কাকীটাই একটা আন্ত ঘরের দাবী রাখে নাই। আর সর্দাগীর বাপের খাওয়া-দাওয়ার তদারক যথাসাধ্য নিজের হাতে রাখিয়া সর্দাগীকে যতটা পারে ছুটি এই-ই দিয়াছে।

বরের বাপ সকাল বেলাতেই পাড়ী-আগীদার সারিলেন। জল তিনি কোথাও খান না, এখানেও পাইলেন না; মুখ একটু বেন ভার-ভার; একখানি গিনি দিয়া আগীদার করিলেন। সঙ্গে ছ'জন মাত্র লোক, একজন আত্মীয়, একজন পুরোহিত। আর শিখরের তো ছিলই; সে তো 'বরের ঘরের মাসি, আর ক'নের ঘরের শিসী'।

এবাড়ীর অন্ততঃ গড়া পাঁচছয় ছেলে-বুড়া মিথিয়া ওড়াইতে পাকা দেখা দেখিতে গিয়াছিল। সর্দাগী খুব চট্টয়া গেলেও কাহাকে ঠেকাইবে ভাবিয়া পায় নাই।

এখন ইহার বলাবলি করিল যে, বরকন্ডা ইহাদের ঘরের মতন জুতা দিয়াছে। তা দিক না, পেটে খেলেই গিঠে যায়। সঙ্গে ছ'জনকে খাওয়াইয়া অনেক প্রকার মিষ্ট কথা দিয়া উঠে করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহারা ভুঠে হইলেন কিনা, বুঝিতে পারা গেল না। একটু পরে তাহারা বিদায় হইলেন।

মেয়েমহলে 'অনেকে' বলিল, "ওমা—ভেবেছিলাম, একখানা গরনা দেবে। একটা গিনি হাতে ক'রে দিলে কি 'বলে'?"

আবার অনেকে মিথিয়া প্রতিবাদও করিল, "তা বাবু, কেনই বা দেবে? তোমরা মোহর দিলে, ওরা গিনি দিয়েছে, তাই তো সবাই দেয়। ক'নেরেই তো বেশী দিতে হয়। এই দেখ না, সন্দেশের টাকা তোমরা পকাশ দিয়েছিলে, ওরা পণ্ডি দিয়ে গেল। তাই নিরম। মগিনার খন্তরই বা কি দিয়েছিল?"

সেজগিলী ভারী মুখ আর একটুখানি ভারী করিয়া বলিলেন, "ওর সঙ্গে, আর এর সঙ্গে। আমাদের পাচটা, আর গুর এই সব তো একটা। মনে তো জানবে—সবই ওর। মিনসে একটু কিপুটে আছে।"

একজন মহরবা করিলেন, "তা ভাই, ছেলের কুটুম কিপুটে ভাল।" আর একজন বলিলেন, "একটাই হোক, আর পাচটাই হোক, ও তো আর্পিতে মুখ দেখা; যেমন দেবে, তেমনি পাবে।"

এসব তর্কের কোন মীমাংসা হয় না।

কিন্তু বাহারা সর্দাগীর ভারী খন্তরকে রূপণ বসিয়াছিল, তাহাদের ভুল স্বীকার করিতে হইল তাহাদের আইবুড় ভাতের তত্ত্ব দেখিয়া। এমন তত্ত্ব এবাড়ীর কোন মেয়ের জন্মই নাকি এর আগে আসে নাই! খেলনা পুতুল, ড্রেসিং কেস, টয়লেটের মূল্যবান জিনিষপত্র, রাইটিং কেস, মায় 'টেনিনস', 'বায়রন', 'সেলী', 'কিপলিং'এর ভাল ভাল বীথানো বই, বাগার শামছাটা শেখকদের লেখা গল্প-কবিতা উপগ্রাস এবং কাব্য। এছাড়া হস্তী আর বেশমী

হাত ক'নের জন্ত খোটা কুড়ির কম তো নথই। পাচ এয়ারে জন্ত খেলব জিনিষ আসিল, তাহা দেখিয়া 'আয়তি-সম্পরা' বউ-শিলের সকলের মনেই একটুখানি প্রবল রহস্যগুণের উদয়ক হইল। মোটে পাচটা জিনিষ, অথচ প্রাণী অন্ততঃ পণ্ডিগী।

কুটুম-বাড়ীর লোকদের ভাল করিয়া খাওয়ান এবাড়ীতে হয়, আত্মও হইল। মণিকার ইচ্ছা ছিল, ছ'টাকা করিয়া বিদায় দেওয়া হয়, রং করা খুতি দিলে ভালই দেখাইত; সর্দাগী তার সেজকাবাকে আসিয়া বলিল, "মলিনারি'র খন্তর-বাড়ীর লোকদের বা দিয়েছিল, এদেরও তাই দাও।"

কাকা এবার একটু ঢাল ঢালিলেন, জবাবটাকে একটু ঘুরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "সন্ধ্যাইকে তো সমান দেওয়া যায় না। নাশু'র পাতনা আলাদা, আর সে মাছ আনে, তাকেও বেশী দিতে হয়; বাকি সব খুতি আর এক টাকা ক'রে দিয়েছি। পাড়ীভাড়া এছাড়া।"

হিসাব ভুল হয় নাই, কিন্তু যোগ দিতে ভুলটা সর্দাগীর মন এড়াইয়া গেল। মলিনার খন্তর-বাড়ীর লোক ছিল জন দশেক, জিনিষ-পত্র বেশীর ভাগ আসিয়াছিল ঘোড়ার গাড়ি করিয়া, এদের বাড়ীর তত্ত্ব আনিয়াছে 'আশী জন লোক'।

বিদায় নিয়া কুটুম বাড়ীর লোকেরা খুব খুশী হইল না। তাহারা 'আশা' করিয়াছিল, ছ'টাকা নগদ বিদায় পাইবে, এমন নাকি কোথাও কোথাও পাইয়াছে। বিদায় পাইয়া না হোক, বউ দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে সুখ্যাতি করিল। গিলীর পুরাতন ষি, এই বিবাহ উপলক্ষে 'বে দামী তসর পাইয়াছে, তাহা পরিয়া আসিয়াছে। সেজকন্ডাকে সে-সব দেখাইয়া বেশ কিছু পুরস্কারের দাবী তুলিল। ব্যাপারটা স্বরজনের কানে উঠায় তিনি নিজের হাতবাক্স খুলিয়া চুপি চুপি দশটা টাকা তসরের দাম দেওয়াতে মন খুলিয়া সর্দাগীর রূপের খ্যাতিটা সেই একবাক্যে খুব গলা ছাড়িয়া প্রচার করিতে লাগিল। এ-বাড়ীতে

যত পারিল বলিল, সাধীদের মধ্যে বলিতে বলিতে গেল, আবার সে-বাড়ীতে গিয়া এমন গলা জাহির করিল যে, সে-বাড়ীর আত্মীয়েরা বউ দেখার জন্ত উদ্ভীর্ণ ও অস্থির হইয়া উঠিল। 'সে-বাড়ীর মা' বলিয়া সর্দাগী বাহার উল্লেখ করিয়াছিল, সমিও তিনি বরের আসল মা নন, বিমাতা, তথাপি বউ তোমার আগ্রহ, তাহারও বোধকরি, আদম না থাকিলে যতখানি হইত, তার চাইতে কিছুমাত্রও কম হইল না। ছেলেকে মার চেয়ে বেশী বা মার মতন ভালবাসেন বলিয়া নয়, সতীনপো-বউ কতবড় সুন্দরী হইতেছে, সেইটা দেখিবার জন্মই।

বরপক্ষ হইতে মণিকারের দাবী করিয়াছিল; কিন্তু স্বরজন তাহাদের ছাড়িলেন না। বরক'নের সঙ্গে একজেরে তাহারা সে-বাড়ীতে যাইবে, এই রকমই ঠিক রহিল।

যথাকালে সকল বাধা-বিপত্তি সরাইয়া বিবাহের লগ্ন নিকটবর্তী হইল। বরের বাড়ী সান্ধ্যায়; বড়-জলের জন্ত ওরা-আগে হইতেই কলিকাতার আসিয়া কোন এক আত্মীয়ের, না বন্ধুর, বৈঠকখানা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। লগ্ন একটু 'বেশী' রাখে; সন্ধ্যার পূর্বেই অন্তর্য্যা একটা বার আরক্ত চক্ষু মেথিয়া সারা-দিনের অপ্রপাতমলিন ক্রুর প্রকৃত্তির শোকাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। কাকা আসিয়াছে, চোখ মিঠা তখনও বিস্মৃ বিস্মৃ জল গড়াইতেছে; বর্ষার হাওয়ার নুকডাঙ্গা দীর্ঘকাল তখনও থাকিয়া থাকিয়া খসিয়া উঠিতেছে। জলকাদার সামনের রাস্তাটা ভাবাবহ হইয়া উঠিতে আর কিছুমাত্র বাকি নাই। বাঁধা মেরাপের তলার কুরাস পাড়া হয় নাই; বেকি দিয়া, চোয়ার পাতিয়া আসর সাজানো হইয়াছে। বরের বিদায়ার বাগ্যা 'শ্রোনের' মত করা, তার পিছনে একখানি নতুন 'খাঁকা' 'সীম', দুখ খুব ভাল। মালিনী নদীর তীরে সর্দাগিলিনী শব্দন্তলা কলসী ভাসাইয়া জল আহরণ করিতেছে; অল্পদূরে বিদিত আগন্তুক ছয়ন্তের শ্রিত্তমুখে অবস্থিতি; নদীজলে বোধকরি বা স্রোত ছিল না, রাশি



রাশি পদ্ম ফুলিয়া রহিয়াছে (হয়ত এরাই একমিন বিরহতাপসম্বন্ধা শকুন্তলার বিরহশগুনের সহায়তা করিবে); মরাল (হয়ত বা মুখাল লোভেই) এই নদীতে বিচরণ করিতেছিল; অলিফুলও অশুভ ছিল না; তাহাদেরই একটা শকুন্তলার মূখের কাছে উড়িয়া গিয়াছিল আর কি! নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনের মধুর চিত্র! অন্ধন-ভঙ্গীও অতি পুষিগাটা।

বর যখন আসিল, রূপি আবার নামিয়াছে; টিপিটিপি নহে, প্রায় মূলধারায়। মোটরগুলির 'গুড' তো তোলাই, কতকগুলির আশ-পাশও বন্ধ। বরের 'সিডান বডি উইলমিনাইট কার' খানা চুলপাতা ও নানারকমের লতার মধ্যে ইলেকট্রিক বাস্‌ব দিয়া সাজানো হইয়াছিল; রূপির ঘরে কোটা ফুলগুলি রাতায় পুষ্পরূপী করিতে করিতে নিজেরা দুলধারা হইয়া আসিয়াছে। জায়গায় জায়গায় লতাপাতাও ধারা-শ্রাবণের প্রচণ্ড ধারাপাত সহিতে পারে নাই। জানালার একটা হাঙেল ঠিক ছিল না, কাঁচ তোলা গেল না; মাক রাতায় রূপি নখন চাপিয়া আসিল, তখন গাড়ী বদল করার উপায় নাই, মিতবর এবং ছ'একজন বন্ধুর সঙ্গে বরও রীতিমত ভিজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।—বিবাহ-বাড়িতে ঠিক এই সময়টাকেই কেহ বর আবার জ্ঞাত প্রস্তুত হয় নাই। অনেককণ পূর্ণ্য প্রতীক্ষা করার পর রূপি যখন রীতিমত চাপিয়া আসিল, বাড়ীর কর্তার মনে করিলেন, এত রূপিতে নিশ্চয়ই বর বাহির হইবে না। লম্বা যখন বেশী রাতে, সময় যখন রহিয়াছে, রূপি অন্ততঃ কখনও বর আসিবে। তাহার নিজেদের কুটুং-আত্মীয়-বন্ধুরে বাওরাইয়া খানিকটা কাজ চুকাইয়া রাখিতে-ছিলেন। চুকিল তো সব, মাঝে হইতে একটা গণ্ডগোল!

রাতার উপর একটুখানি খোলা জমি, সেখানে না ঢোকে গাড়ি, আর না আছে ছাদ; ছাতা রাখারও ব্যবস্থা হয় নাই। বরযাত্রীদের যতটুকু বা দুর্দশা হইতে বাকি ছিল, তাহাও পূর্ণ হইতে বাকি থাকিল না। এ অবস্থায় স-বরযাত্রী বরকর্তার মেজাজটা কেমন

হইতে পারে, বরকর্তা ভিন্ন সেকথা কাহারও মাথায় চুকিবে না!

বরকে অবশ্য পরিশেষে ছাতা ধরিয়া হাতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু সে-রূপী কি ছাতায় আটকাই! একটা 'গুয়াটারপ্রক' আনা উচিত ছিল; আছেও বাড়ীতে কিন্তু সেকথা যখন গুন্দের খোঁজা খাইয়া মনে পড়িল, তখন রূপিজেলে ভেঙা বরের অঙ্গ হইতে বেনারসীর চেলির নীল ধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে, জগেরে ছাটে গলা চন্দন তাহার চোখের উপর, গালের উপর অল্পত ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। ক্রোড়ে, কোতে অপর দর্শন পূর্বক সে গুন্ড হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, গুণ্ডখসুদের আনা তোয়ালে ও নববরের আম্রগুণ গ্রাহণ করিল না। স্বরঞ্জন নিজে আসিয়া যখন অম্লচর্য্য কবিলেন, তখন শুধু এই কথাটা বলিয়া উত্তর করিল, "থাকেত দিন, সকলেই যখন ভিজেছেন, তখন একা আমি কাপড় ছেড়ে আর কি করব?"

সত্য কথা! অপ্রতিভ হইতে আর কিছু বাকি থাকিল না, কিন্তু উপায়? এতগুলি লোক; তা প্রায় সব 'ইই' হইয়াছে, এদের সবাইকে কাপড় খোঁসান কেমন করিয়া সম্ভব? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, স্থানে স্থানে জটলা পাকাইয়া সমস্তা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইল, বরকর্তাকে এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জ্ঞাত, বাড়ীর মধ্য হইতে যতগুলি খুঁটি ছিল আনিয়া ফেলা হইল; কিন্তু তাহাতে বড়োদের জন ভিগলিলে লোকের দুর্দশা ঘৃণিতে পারে, বাকি লোকের কি হইবে? এতাত সব ক'দিনের জ্ঞাত এখানে জন্মে হইয়াছে, তার উপর রূপিতে কাদায় রোজ ছ'বেলা কাপড় ময়লা হয়; বরং ময়লা কাপড়ের বাস্তবী খুলিলে বিস্তর খুঁটি মিলিতে পারিত; তাহা তো আর দেওয়া যায় না!

অনেকগুলি মাথা চুলকাইয়াও এর মীমাংসা মিলিল না। একপক্ষ জুজু হইয়া দৈববিড়ম্বনার সমুদায় অপরাধটাকে অপর পক্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া মনে তো নিশ্চয়ই, মুখেও কতক কতক বিদ্যোদগীরণ করিয়া মেঘ-তপিত আকাশের মতই ভীষণ হইয়া রহিলেন, অপর

পক্ষ প্রায়-অকারণে, হয়ত বা অতি ভুল কারণেই, অতবড় একটা অভিশাপের বোঝা মাথার উপর ধরিয়া বিন্দুচাবুয়া পতিত রহিলেন। স্বরঞ্জন তো হতভয়; তাহার গুণ্ডকোটা সেজ ভাই-ই তাহার বল-বুদ্ধিভরসা। চারটা মেয়ের বিবাহ তিনি দিয়াছেন, আশা করেন, আরও তিনচারি দিবেন; তা ছাড়া ভাই-বির-ও আছে। সেই তিনি-হেন কুটুং-খোঁষা, এবং কুটুং-তোষা দশকন্ধ্যবিত পুণ্ড্রও যখন সরগীর ভাবী গুন্ডের কাছে যোড়হাত করিয়া করিয়া হাত জুখানা ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াও না পারিলেন তাহাকে কাপড় ছাড়াইতে, না পারিলেন খাইতে বসাইতে, তখন স্বরঞ্জনর প্রায় পাত ছাড়িবার উপক্রম হইল। তাহার কেমন যেন আশাঘোড়াই মন বলিতেছিল, ভাল নয়, ভাল নয়, এ বিবাহ যেন ভালয় ভালয় হওয়া ছুট!...

অথচ ঐ বরপক্ষই তো ঘরিতে গেলে এইটা ঘটাই-যাচ্ছেন। কি দরকার ছিল অত ভাড়াভাড়ি করিয়া এই ভরা বর্ষায় বিবাহের দিন ফেলিবার? কতকন্ধ্যের ফলটাকে অতের ঘাড়ে ঠেঁগিয়া ফেলিয়া, আগুন হাত দিয়া হাত পোড়ানো আবদারে ছেলের মতই, তাহার। এ নিমফল ক্রোধ দেখাইতেছেন; কিন্তু এ রোয়ের ধাক্কা সহিতে যে আর ধৈর্য থাকে না! স্বরঞ্জনেরই না হয় কল্যাণ, তাহার আত্মীয়দের...

বিবাহের লাজ কাছে বেসিয়া আসিতেছে। পুরোহিত শাশুগ্রাম শিলা লাগে লইয়া উৎকর্ষ। বাজনা এতকণ রুটির দাপটে শোনা বাইতেছিল না, এতকণ বর্ষাধারার পাকজলর ফীল হওয়াতে সাহানার আলাপ কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল; কিন্তু কি স্বর, তা' ভাল বোঝা বাইতেছিল না। ঝিম্‌ঝিম্‌, ঝুম্‌ঝুম্‌, টপ-টপ্‌ একটা না একটা তো আছেই, আর শ্রোতাদের মনের কানেও তখন বোঝায় বেহুয় চড়িয়াছে। সাহানার আনন্দ-উজ্জল আশ-নিবেদনের মিলন-মধুর তানকে থাকিয়া থাকিয়া ভৈরবীর করণ মুচ্ছনা বলিয়া জ্বল হইতে থাকিলে দোষ দেওয়াও যায় না। কানে তার

বেশ চুকিতেছিলই বা কার কতটুকু? বড় বড় মাতঙ্গরদের তখন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে!

অবশেষে বরকর্তা কি ভাবিয়া বরকে, আর যা'দের যা'দের জ্ঞাত শুকবর পাওয়া সম্ভব হইল, তা'দেরও কাপড় ছাড়িতে অগ্রহতি দান করিলেন। জ্ঞাত অবশ্য তিনি মন, স্বরঞ্জনই; কিন্তু আজ ছ'জনের অবস্থার বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটয়াছে। মনে করা বিচিত্র নয় যে, ইনিই বিচারক, আর তিনি আসামী। আর তাও নেহাৎ ছোটখাট আঙ্গুল নয়, মরণ-বাচনের ব্যাপার!

বরযাত্রীরা বুদ্ধি; হকুম পাইলেই যায়, হকুম পাওয়ার জ্ঞাতও যে-ক'উনিমল বসিয়াছিল, তাও অগ্রহান করিলে নেহাৎ জ্বল হয় না,—বেশীর ভাগ লোকেই অর্থায় যুবকত্বল হুন্‌-ফান্‌ করিয়া বলিতেছিল, "এদের দোষ কি?" বর বেচারীও তাহার বন্ধুরের মূর্তি স্তমিতে স্তমিতে কাঠের মত শক্ত হওয়া ছাড়িয়া, সহজ নমনীয় হইয়া গুন্দের মধ্যেই একটা চেয়ার লইয়াছিল। শোনে, শিবা বদার জ্ঞাত যদিও তাহার মনে মনে অশা ছিল না, কিন্তু সেটা তো এখন আর কোন দিক দিয়াই শোভনীয় হইবে না। বিশেষ করিয়া, এই নীলবর্ণরঞ্জিত এবং গলিতচন্দন কিছুত মূর্তি হইয়া। ছেলেরে-লগান-শোনা নীলবর্ণ শূণ্যের রাজবেশটা মনে পড়িয়া তাহার এই মানসিক বিগ্লবের মধ্যেও স্নেহ হাসি পাইল।

বরকর্তাকে বাদ দিয়া বরযাত্রীরা যখন অনেকেরই কল্যাপনের প্রতি সহায়ত্বিত প্রকাশ করিতে উভত, তখন বিচক্ষণ বরকর্তা নিজের 'প্রোজেক্ট' বজায় রাখার জ্ঞাতই হুতাং খুব বেশী অমারিক হইয়া উঠিলেন। "হাঁ, হাঁ, কর কি সব, খেতে বসিয়ে দাও, লম্বা যে এসে পড়ল! থোকা! ভূমি যাও, একটু গরম জলে চান সেরে নিয়ে ভৈরী হও গো। গুরে, ও—নাগপেতে হেঁটা সেল কোথায়? গুরে রাজীব! থোকা! বাবুকে সাবান দিয়ে চান করিয়ে দে না। আপনরা একটু চন্দন পাঠিয়ে দিন আর গরম জল, একটা সাবান, তোয়ালে—" যাক্‌ সমস্তার সমাধান হইল! যেন জননীজঠর-বরণ্য হইতে মুক্তিলাভ! ব্যাসপাইপ, সানাই নৃতন



একটা স্বর ধাবিল। স্বরটাকে বুঝিতে এবার আর কাহারই ভুল হইল না। সেটা বেহাগই বটে! অন্তঃপুরে যোর বোলো শব্দ বাজিয়া উঠিল। নৃতন-কাপড়-পরা, নবপ্রণামে হস্মিত বর এইবার ছান্ধা তলায় প্রবেশ করিবার জ্ঞান দানের বর হইতে শব্দের ধারা সম্পৃক্ত হইয়া উঠিয়া আসিতেছে। মুখ তাহার প্রসন্নতার দীপ্তিতে সম্ভ্রান্ত, ললাটে উৎসাহ-গৌরবে জ্বলিতা, অতীত কালের সলিলারা বিকল্পভাষা অবাঞ্ছন্য সম্পূর্ণরূপেই তাহার মনের উপর হইতে আত্মবিলোপ করিয়াছে। (পুঁচন খানায় যে বসিতে পায় নাই, সেই হুংটাই যেটুকু মাঝে মাঝে উকি মারিতেছিল।) দীনে আঁকা রাঙ্গা ব্রহ্মস্তর মতই তাহার হৃদয়িত মুখে ঢোকে কোঁহুলের একটা মধুর উদ্ভীপনা নেন ক্রীড়ার ছলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল; সেটুকু সেই আলবালে সলিলসেচননিরতা অক্ষমাং-দৃষ্টা শরুস্তার মতই পুণ্যমালাধরতরু, তাহার এতদিনের বসন্তস্মীর পঞ্চাওয়ার পরিসমাপ্তির উগ্র বায়ুতা। বৃক তাহার সপন আবেগে দ্রুত দ্রুত করিয়া উঠিতেছিল; প্রতি মুহূর্তকে দীর্ঘ যুগান্তর এবং প্রত্যেক অস্থানটাকে একান্ত অনবরক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সংসা তাহার পিতা পদ্মীর গলায় হাঁকিয়া উঠিলেন, “খোকা! একটু দাঁড়িয়ে যাও।” দাতার আসনে আলীন, ক্ষোমবাস-পরিহিত, এতক্ষণের পর জামা-দর্শনে প্রসন্নমুখাবি, বভাবতই শান্তমুখি বৈবাহিকের দিকে কিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কার্ণিচার, বরাভরণ যা’ দিচ্ছেন, সে তো দেখাই গেল। মেয়ের গায়েও কি এই হিসেবে গয়না গড়িয়েছেন? আমি একবার দেখতে চাই—”

স্বরজনের মুখ শুকাইয়া গেল, প্রস্রের উত্তর তাহার মনে পড়িল না। তিনি অপহাসের মতই চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সেখকর্তা তখন তেতলার ছাদের উপর বরাবরা খাওয়ারোয় ব্যস্ত আছেন।

বড় অর্থায় স্বরজনের হিচাবে যিনি মেজকর্তা, তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রণাবটী অগ্ন্যমোদন করিলেন,

বলিলেন, “সে তো ভাল কথা, আপনি আহ্নন, মেয়ে এখন পুঁতিকালে বসেছে, এখন তো ওখান থেকে ওঠাতে নেই; আপনি এসেই না হয় দেখে যান—”

বর সেইখানেই বাপের জুগুমের প্রভীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। মুখের হাসি তাহার ঈষৎ গাভীরের বিরমতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল, জ্ঞ একটু কুচকাইয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ চোখের ক্ষুদ্র দৃষ্টি গোপন করিবার জুই হইত মেজের বসান কাঁচের টুকরাগুলার সং মিলাইতেছিল।

সর্বগীর মুখ খোলা, হুকানে ছুঁটা হীরা অগিতোহে, গায়ে ক’খানি সোনার গহনা। কাকারা, লিলীরা, কোন কোন দিদি পেম্পিন, ইয়ারিং, ছোট সেকলেস, কলি, সোনার শাঁখা এমন সব উপহার দিয়াছে, সে-সব পরে নাই, ঝাড়া ঝাড়া ঐ কয়েকখানি মাঝই গহনা তাহার গায়ে; একখানি লাল রংয়ের বেনারসী শাড়ী পরা।

বরকর্তাকে হাত জুলিয়া, কান জুলিয়া, খোঁপা ফিরাইয়া সব দেখান হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ ভজানলবক অন্ধকারাঙ্কর আকাশের মতই কঠিন ও ভাঙ্গা হইয়া আসিল; রোষতীর কঠোর বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন—“অপনাদের বাড়ী বিয়ে দিতে স্বীকার ক’রে আমি দেখছি মশাই, একেবারে সকল দিক থেকেই কীকিতে প’ড়ে গেছি। তা’ কি ভরতীর দিক থেকে, কি সেনা-পাণ্ডার দিক থেকে। দশহাজার টাকা নিয়ে খোদামোদন করেছে; ছেলের মত বিদ্বান বউ, তাই তা’দের কথা কানে জুলি নি, তার ফল হবে না? নিকু এখন খোকা তার বিদ্বান বউএর পা খুঁয়ে খুঁয়ে জল খাচ্ছে।”

রোষভরে তিনি কিরিয়া আসিলেন। স্বরজনকে পাইয়া যে অনলোদ্গীরণ করিলেন, তাহার ভাষা যে আরও একটু কঠোর হওয়াই বাতাবিক, তাহা বোধকরি বলাই বাহুল্য! ভরে, অপমানে স্বরজনের মুখে কথাই ফুটতেছিল না; কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার জ্ঞত সেখা দিল শিবের।

তাহার সঙ্গে কথাই ছিল, যদি একটা গোপমালা উঠিয়া

পড়ে, সেই কাজটা করিবে। পূর্ববাবস্থা মত সে কাছ বেঁধিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ নির কঠে, পদদলিত ফলীপ্রের মতই দংশনোজ্ঞত হইয়া গর্জনকারী বরকর্তার কানের কাছে কি কয়েকটা কথা বলিল, কি যেন একটা জিনিষ একটা রেশমী কাপড় করা পোটকোণিও একটুখানি ফাঁক করিয়া দেখাইল, অমনি যেন মস্তোষদি-দ্বতবীর্ঘ্য সর্পরাজের মতই বাগালী ঘরের বরকর্তা নম্র ও নত হইয়া পড়িলেন। ঈষৎ সংশয়ে ভাইপোকে কি একটা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তরটা পাইলেন, ঠিক মনঃপূত না হইলেও ঐ খাতার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কারেসি নেটগুলিও তো তুচ্ছ নয়! মেয়ের আপত্তি আশ্চর্য্য কথা! তা’ আশ্চর্য্যই বা কি! খোপাটা করিতে করিতে ছেলেমেয়েরা কতই না খেয়াল করে। তাহার হেলোটাও এবিষয়ে একটা ধর্ম্মস্তর না হইলে হৃদয়পুরের জমিদারবাড়ীর মেয়ে কবে না কবে তাহার ঘরে আসিত। বাপের বিয়স সে-ও কি অর্ধেক পাইত না? একটা সবজ্ঞ বা জ্ঞের কতই বা টাকা পাগিতে পারে? তাও তো বৃহৎ গোষ্ঠী, আর একদমবত্তী পরিবার।

ছাড়পর সংগ্রহ করিয়া বর আসিয়া ছান্ধা তলায় পৌছিল। পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছে; উৎসাহের ধোয়ারে যেন ভাঁটা

আসিয়াছে। তথাপি এদিনটা কিরকম? জীবনের মধ্যে এমন দিন তো আর মিলিবে না। মনকে সে যথাসাধ্য চাপা রাখিতে চাহিয়া মনে মনে এই লাইন ছুঁটা আবৃত্তি করিল —

“Hope, like the gleaming taper’s light—  
Adorns and cheers the way.”

আবাহ আকৃষ্ট অপরমিত স্মরণলব্ধারে, আর নিজের বিবাহকালের সেই সনাতন রাঙ্গা বেনারসীর মোটা চেলিখানিতে সর্বগীরী বুড়িয়া ফেলিয়া শাড়ীতানানীয়া মেজগিরী তাহার শ্বেদবহুল মাংসগ দেহ লইয়া কোন মতে বর বরণ করিলেন। নানান সাজের সাজ করিয়া শ্রামা, কৃষ্ণা এবং গৌরাঙ্গিনী ভবীরা বরণডালা, যতদীপ জলন্ত চিতার কাঠী, ত্রীশস্তিক-সমবিত পাতাদি লইয়া হাঙরহু ছড়াইতে ছড়াইতে সাতপাক গুরিয়া শুভদৃষ্টির অবসর করিয়া দিল। চারিদিকে রব উঠিল, ক’নে আন, ক’নে আন,—একি এত দেবী কিসের? গয় যে ভড় হ’য়ে যায়—

কিন্তু কই, কোথায় ক’নে? পিড়ির উপর বরের পরিত্যক্ত চানদের উপর চণ্ডীর পুঁথি পড়িয়া আছে, কাঞ্চলতা পড়িয়া আছে, ক’নে তো নাই।

সারা বাড়ী গুঁজিয়া কোথাও ক’নে মিলিল না।  
(কনেশা)

“স্মরণ রাখিও, মাংস খাইলে শীঘ্র বার্কিকা উপস্থিত হয়, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাকস্থলীতে ক্ষত (gastric ulcers) এবং চুষ্টকত (cancer) ও আব (tumour) রোগের সৃষ্টি হয়। বাছ বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, শস্ত-খাড়া (ভাত, রুটি), ফল, শাক-সব্জী, পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, পানী, ডিম ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা সস্তোযজনক খাদ্য।”

—D. A. R. Aufranc





প্রশ্ন  
(১)

"Surplus Value" ও "Relative and Absolute Surplus Value"-র বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি?

শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত

(২)

কপ্তাভঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে? তাহাদের পীঠস্থান কোথায় এবং তাহাদের ধর্ম্মাভিষ্টানের পদ্ধতি কি? উক্ত ধর্ম্মদর্শকের কোন মূর্তি গ্রন্থ আছে কি না?

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল

(৩)

কাদ্দলে চোখে জল আসে—কেন?

শ্রীঅনিলকুমার সরকার

(৪)

'বঙ্গদেশ'-র নামটি কি অহ্মসারে হইয়াছে? ইহা কত প্রাচীন? রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ আছে কি না? পুরাকালে বঙ্গদেশের সীমানা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত

(৫)

করেন, ধরেন প্রভৃতি বাঙ্গলা শব্দে ব্যাকরণের গুরু-বিধান অহ্মসারে ন হুনে গ হয় না কেন?

শ্রীনাহাররঞ্জন মিত্র

উত্তর

(১)

আঘাট সংখ্যার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—  
'তোমার গঙ্গা পার হওয়া উচিত নয়'—এই বাক্যটা ভাববাচ্য। ইহার পরিবর্তিত বাচ্য—

তুমি গঙ্গা পার হইও (বা হ'ও) না—অনুজ্ঞা  
তুমি গঙ্গা পার হইবে (বা হ'বে) না—বিধিবাচ্য

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

আঘাট সংখ্যার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—  
স্বন্দরবন—এই বন "স্বন্দরী" গাছ বিশিষ্ট জঙ্গল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলস্থ বন সমুদ্র-বন নামে অভিহিত ছিল; ইহারই অপভ্রংশ স্বন্দরবন। ১৪৫৯ খৃঃ এই বন আবিস্কৃত হয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত



অর্থনীতি—

স্বর্ণমান—শ্রীঅনাথগোপাল সেন  
(প্রবাসী—আঘাট, ১৩৪০)  
শ্রমের মর্যাদা—বাজালীর পরাজয়—  
আচার্য্য প্রমুদচন্দ্র রায়  
(প্রবাসী—আঘাট, ১৩৪০)  
রেল বনাম মোটর-প্রতিযোগিতা—  
শ্রী—(বঙ্গশ্রী—আঘাট, ১৩৪০)  
ব্যাক্তিগত কয়েকটি মূলতত্ত্ব—  
শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন  
(জীবন-বীমা—আঘাট, ১৩৪০)  
বিখ্যাতাণী অর্থপত্রট—শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র  
(প্রদীপ—আঘাট, ১৩৪০)

সমাজতত্ত্ব—

জৈন দৃষ্টিতে অস্পৃহতা—  
শ্রীপূরণচাঁদ সামন্ত  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)  
মন্দির প্রবেশে সনাতন মতবাদ—  
শ্রীঅট্টকনাথ ভট্টাচার্য্য  
(প্রবর্তক—আঘাট, ১৩৪০)  
হিন্দুর অধঃপতন কেন?—  
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী  
(মাসিক মোহানন্দী—আঘাট, ১৩৪০)  
পরিবর্তন বা পরিবর্তন—  
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কতৃণ  
(উত্তরা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)  
অস্পৃহতা—আচার্য্য প্রমুদচন্দ্র রায়  
(পুষ্পপত্র—আঘাট, ১৩৪০)

জীবন-চরিত—

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—  
শ্রীবিহারেন্দ্রনাথ ঘোষ  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)  
জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর—  
শ্রীবিমলাচরণ লাহা  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)  
রসিকরস মল্লিক—  
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল  
(বঙ্গশ্রী—আঘাট, ১৩৪০)  
৩ অধিকাচরণ উকীল—  
শ্রীহুমাংগল বিকাশ রায়চৌধুরী  
(রাইড ষ্ট্রীট—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

ভ্রমণ ও দেশ-পরিচয়—

সিংহলের চিত্র—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত  
(প্রবাসী—আঘাট, ১৩৪০)  
প্রত্যাভর্তন—শ্রীকেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়—  
(প্রবাসী—আঘাট, ১৩৪০)  
অগ্নিগর্ভ মাকুরিয়া—  
শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)  
তীর্থকামীর পূজা—শ্রীনিরুপমা দেবী  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)  
উদয়-পাথর সহযাত্রী—  
শ্রীতিলকবরণ ভট্টাচার্য্য  
(ভারতবর্ষ—আঘাট, ১৩৪০)



আগ্রা—ঐতর্য্যচন্দ্র দত্ত

(প্রবর্তক—আবাচ, ১৩৪০)

সাতসাগরের পারে—কুমারী অমলা নন্দী

(স্বরূপ—আবাচ, ১৩৪০)

নিগ্গনের যাত্রী—ঐপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

(উত্তর—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

পানীরের রূপলোক—

ঐবাসিনীকান্ত সেন

(বঙ্গ—আবাচ, ১৩৪০)

টানের স্বতি—

ঐকেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(বিচিত্রা—আবাচ, ১৩৪০)

## বিজ্ঞান—

কর্মবিশেষের সমতা—

ঐশশাঙ্কেশ্বর সরকার

(প্রবাসী—আবাচ, ১৩৪০)

তরল বায়ু—মোহাম্মদ ইসহাক

(মাসিক মোহাম্মদী—আবাচ, ১৩৪০)

বিজ্ঞানে অনির্দেশ—

ঐশিশিরকুমার মিত্র

(বিচিত্রা—আবাচ, ১৩৪০)

## ইতিহাস—

মহাভারতে ভারত-যুদ্ধ কাল—

ঐপ্রবোধচন্দ্র রায় বিজানি

(ভারতবর্ষ—আবাচ, ১৩৪০)

বঙ্গ স্বাধীন-প্রভাব-প্রবেশের ধারা—

মুহম্মদ এনামুল হক

(মাসিক মোহাম্মদী—আবাচ, ১৩৪০)

গ্রীক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত—

ঐভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(প্রবাসী—আবাচ, ১৩৪০)

## সাহিত্য—

বাঙ্গলা কবিতায় প্রথম অমিরাসফর ছন্দ—

ঐআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

(ভারতবর্ষ—আবাচ, ১৩৪০)

প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য—আব্দুল করিম

(মাসিক মোহাম্মদী—আবাচ, ১৩৪০)

উপন্যাসে জাতীয় আদর্শ—

মোহাম্মদ আব্বাস চৌধুরী

(মাসিক মোহাম্মদী—আবাচ, ১৩৪০)

ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় সমাজের ছায়া—

ঐঅম্বরূপা দেবী

(প্রবাসী—আবাচ, ১৩৪০)

বর্ণপরিচয়—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—

ঐকমলাকান্ত বসু

(অর্জুন—আবাচ, ১৩৪০)

গল্প বনাম উপন্যাস—

ঐধীরেন্দ্রনাথ ধর

(অর্জুন—আবাচ, ১৩৪০)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ—ঐকাদিনাস রায়

(পুষ্পপাত্র—আবাচ, ১৩৪০)

কাব্যের কথা—ঐরুক্মিণীহারী গুপ্ত

(অভ্যাস—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

বাংলায় পারসীক শব্দ—ঐবটরুদ্ধ বোম

(বঙ্গ—আবাচ, ১৩৪০)

## শিক্ষা—

সাধনা ও সিদ্ধি—ঐরমাপ্রসাদ চন্দ্র

(অভ্যাস—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান—

কুমার মুন্সিঙ্গ দেব রায়

(বিচিত্রা—বৈশাখ, ১৩৪০)

দেশিকা চাই—ঐমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

(অভ্যাস—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

## অসাধারণ

## ঐপ্রবোধকুমার সান্মাল

কত গল্পই তোমরা শোনালে, বুসি হ'য়ে শুনে গেলাম।  
কোনোটা রস, কোনোটা তব। জীবনকে জানবার  
আগ্রহ তোমাদের প্রবল, তোমরা চেষ্টা মানব-চরিত্রের  
সকল রহস্যকে উন্মোচিত কর্তে—

একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর  
কামরায় বসিয়া প্রায়-বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এই কথাগুলি  
বলিয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাইলেন।  
সঙ্গীরা সবাই যুবক, সম্ভবতঃ পূজার অবকাশে  
কনসেন্স টিকেট লইয়া তাহারা পশ্চিমে বাহির  
হইয়াছিল। দিগ্বিরার পথে মাত্র ঘণ্টা দুই আগে  
এই দ্বন্দ্বের সহিত তাহাদের পরিচয় ও আলোচনা  
ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ কি ষাট—তাহা কাঁচাপাকা  
চুল দেখিয়া সহজে তাঁহাদের করিবার উপায় নাই।  
মধ্যপথে কখন তিনি উঠিয়াছেন, কখন পাশে আসিয়া  
বসিয়া ছোঁকরাদের গল্প শুনিতে শুরু করিয়াছেন,  
অথচ এতদূর কোনো চাক্ষুষ প্রকাশ করেন নাই  
—কখন এবং কোথায় তিনি নামিবেন, তাহাও  
ইহাদের অজ্ঞাত।

ছেলেরা কহিল, আপনি এমনিই নিঃশব্দে শুইছিলেন  
যে, আমরা ভাবছিলাম আপনি ঘুমাছিলেন অথচ, গল্প  
বলিয়া তাহারা হাসিল। পুনরায় কহিল, এতটা পথ  
বেতে হবে, আমরা চারজনকে বাজি রেখেছি—কে কটা  
গল্প শোনাতো পারে। আমাদের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে  
মাঘের ছন্দোঁধা দিকটার প্রতি ইঙ্গিত করা।

—ছন্দোঁধা যদি হয় তবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।  
আমি বলি—ওটা দুজনে। এই বলিয়া ভদ্রলোকটি  
শুরু করিলেন, মাঘ ও নিজেই সৃষ্টির এই অনন্ত  
মহাকাব্যের এক একটি 'সিম্বল', তাদের চরিত্রকে  
ছুঁয়ে বিশ্বের বিপুল রিস্তৃতিকে আমরা অহত্ব করি।

রূপের পারে রস, কথার পারে ব্যঙ্গনা, কুলের পারে  
যেমন গন্ধ। কিন্তু আমি তোমাদের খেগলট শোনানো  
সেই অত্যন্ত সাদাগিসে, সরল এবং সহজবোধ্য।  
মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অথবা মানব-চরিত্রের  
জুজুয় রহস্য—এ দুটোর কোনো তরুই তাকে ফেলা  
চলে না।

রাজির অঙ্গকারে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসিয়া তার  
জোড়া কৌতুহলময় দৃষ্টির সমুদ্রে ভদ্রলোক তাঁহার  
গল্প করিলেন।

শোনো! প্রায় পশ্চিম বছর আগের কথা।  
তখনো আমার জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের পাল্লা  
চলেছে, চোখে তখনো নিবিড় কৌতুহলের রঙ  
মাখানো, সজ্জিত জ্ঞানের গর্ভে তখনো পৃথিবীকে  
কল্পনা কর্তে শিথি নি। সেদিনো এমনি ট্রেনে  
চলেছিলাম। পথে বার দুই গাড়ী বদল কর্তে হয়।  
বেলা অপরাহ্ন; প্রান্তরের পারে অন্তর্গামী হর্বোর  
কিরণে দিনান্তকালের আকাশ রঙীন হ'য়ে এসেছে।  
কি-একটা ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল। যাত্রীর ভিড় খুব,  
ভিতরে গোলমাল চলছে, বাইরে নানা কর্তের আন্দোলনে  
সমস্ত ষ্টেশনটা তখন মুখরিত। ট্রেন অল্পক্ষণই থামবে।  
এমন সময় শোনা গেল বাইরের একটা হৈ হৈ।  
ভিড় পার হ'য়ে গাড়ী থেকে নেমে সমস্তটা জানবার  
চেষ্টা আমরা ছিল না, কেবল বোঝা গেল প্লটফর্মের  
ভিড়ে একটি ভদ্রমহিলা ও একটি যুবক ব্যাকুল হ'য়ে  
কাকে যেন খোঁজাখুঁজি করছেন; প্রত্যেক কামরার  
দরজায়-দরজায় তাঁরা মাথা কুটে কিংকেন, কি-একটা  
নাম ধরে সমস্ত ষ্টেশনে তাঁরা হাঁকাহাঁকি করতেন।  
সাপ যেমন হারায় মাথার মণি, চক্রবাক যেমন খোঁজে  
তার সাথীকে, বহু ঐচ্ছ যেমন পাপাল হ'য়ে কেড়ে



তার হৃদযাবকের অবস্থানে—সে কি তোমাদের জানা আছে? আমিও হৃদয় মতো ব'লে আত্মীরে জ্ঞ আত্মীরে এই ব্যাকুলতার দিকে নির্ভর করে চেয়ে বসিলাম। বাঁশি বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী চলচে। অপরাহ্ন গেল গোয়ালিতে, গোয়ালি গেল সন্ধ্যায়। একটা অক্ষুট কোলাহল শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি একাধাণ। বন্ধির তলার মালপত্রের খিশির ভিতর থেকে একটি ঘুঘু মনে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। গাড়ীর ভিতরে পশ্চিমা এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। তাদের কারো পা, কারো হাত, কারো বা জিনিসপত্র নিষ্কারণে ঠেসেঠুসে সরিয়ে মেয়েটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালে। তার এই রহস্যময় আচরণপন, এই চৌক্যবৃত্তি ও হৃদয়তপন দেখে অনেকেই চক্কল হ'য়ে তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। বয়সটা তার ভাল নয়, চেহারাটা তার নিরাপদে চলবার মতোও নয়। উঠে দাঁড়াতেই আমার প্রথম চোখে পড়লো তার পরনে একাধাণ। সঙ্গপাণ্ডু বৃত্তি এবং মাথার রাশিকৃত চুলের মাংশবনে চওড়া সিঁড়রের দাগ, বেন নববর্ষার বয়সায়মান আকাশ বিছাববিশিষায় বিখণ্ডিত হয়েছে। কোনো প্রশ্ন ও কোলাহলের দিকেই সে জ্ঞপন করলো না, সমস্ত গাড়ীর ভিতরটায় চেয়ে চেয়ে একসময়ে হেসে হঠাৎ আমাকেই তার কথা কইবার মাহুহ বেছে নিল। বললে, 'ওরা চ'লে গেছে জানেন? মা আর দাদা?'

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম, ঢোক গিলে কি-একটা উত্তর দেবার আগেই বেঞ্চের উপর দিয়ে টপকে মেয়েটি কাছ এসে বসলো। হাতের মধ্যে ছিল সামান্য একটু বিছানা। গাড়ীর বাত্মীর ভাবলো আমি বৃষ্টি বা তার পরিত্রিত মাহুহ, নানা জটলা ও কানাকানি ক'রে এক সময় তারা নিরন্ত হলো।

এত দেশ পালিয়ে-পালিয়ে গুরেটি তবু গুদের বিছান, একলা বেকসুর পথে-বাটে আমার বিপদ ঘটবে—কিছুতেই ছাড়তে চান না। সন্ধ্যা, বিছানাটা পেতে বসি।

অতি চক্কল তার চোখের চাহনি, কিন্তু সে-চাহনি কোনো চুল্লুপভাবা নারীর নয়, সে-চাহনি আধ-পাললের মতো অস্থির। বিছানা পেতে নিশ্চিত হ'য়ে ব'লে সে এক হাতে মুখের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিল। বার বার মুখের উপর থেকে বা-হাতে চুল সরিয়ে দেওয়া তার একটা মুদ্রাদোষ। বঙ্গলায়, 'টিব্বিট কেচেনে?'

'ক'লেই হবে এক সময়, আমি ত আর কাকি দেবো না, কাছে অনেক টাকা আছে। হাতে এই বালা, গলায় রয়েছে হার, ভাবনা কি? তা' ছাড়া সব দেশের ষ্টেশন-পাঠারনা আমাকে চেনে' ব'লে সে একবার হাসলো।

পরম হৃদয়বান নয়, কিন্তু সে-রূপের চারিদিকে ছিল একটা অনির্লচনীয়া জ্যোতির্মণ্ডল, তার ভিতরে সাধারণের প্রবেশ-নিষেধ। আপন ইচ্ছায় হুনিয়াকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন মেয়ে তোমরা দেখে? তার মাথার সেই চওড়া সিঁড়রের দাগ শুধু সে সন্ধ্যা আগায় তা' নয়, মাহুহকে তার কাছে অবনত করে, মনে মনে কেমন একটা ভয় এনে দেয়। তার চোখের উপরে চোখ রাখা যায় না।

এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদূরে যাবেন?'

'ঠিক নেই, দেখি না গাড়ীখানা কোন্ দিকে যায়! আপনি কি কোথায়?'

বললাম, 'পৈনিবাথ হ'য়ে যাবো—'

'পৈনিবাথ? ও, এই সময়ই ত সেখানে মেলা বসে—তলুন, ওই দিকেই যাওয়া বাদ। হাটপথ কিন্তু, হাটতে পারবেন, কষ্ট হবে না? পথে ভাল খাবার-দাবারও পাওয়া যায় না, ভারি বিক্ৰী লাগে।'

কথা বলার এই বৈ-পরোয়া ভঙ্গী দেখে আমি আড়ন্ত হ'য়ে বসেছিলাম। এ-পাণ্ডলের মূর্খ কি কথা বলা চলে? মনে হচ্ছে যদি কোথাও মতের মিল না হয়, তা' হ'লে অগুনি আপনানি করতেও এ-মেয়ে হৃদয় বিধা করবে না। উজ্জল চক্ক, হৃদয় মুখশ্রী, মেহ-লেশ-হীন স্বক্ক রূপ, বলিষ্ঠ দেহ—পাথর কেটে বিদ্যাত পড়েছেন

সে-দেহ। মুখ তুলে তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে মুখে একটা ভীষণতা ফুটে ওঠে।

সকল কথা আত্ম তোমাদের বলতে পারবো না, পুছাহুপুছা মনেও নেই, শুধু আছে বৃত্তি। চিত্রটা নেই, কেবল আছে রঙ—জলে খোয়া রঙ। বসিয়া ভরলোকে একটু থামিলেন। নজ বাহির করিয়া নাকে লইয়া পুনরায় কহিলেন, ইয়লাপুতুরের বাটে এসে গাড়ী থামলো। হাঁ, বলতে চলেছি মেয়েটির নাম চারুবালা। তার নাম বে চারুবালা একথা সে কথা-কথায় অন্তত পশ্চিম বার আমাকে জানালো। গাড়ী থেকে নেমে আমাকে সে পথ দেখিয়ে বাত্মীশালার নিয়ে এল। অনেক স্ত্রী-পুত্রকে জমেনে। রাত কাটিয়ে সকালে উঠে স্নানই করবে প্রথম; সকলেরই গতি পৈনিবাথের মেঘার দিকে। লোকজনের হাত-পা মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে, একে বেকে বাত্মীশালার একান্তে একটু নির্জন জায়গায় সে এসে থামলো। এ বেন তার অভ্যাস—সমস্তটাই তার পরিত্রিত। নিশ্চয়ই তার বিলি-বাবাহাকে মনে নেওয়া ছাড়া আমার আর গতন্তর ছিল না। আমি তখন কেবলমাত্র অভিভূতই নয়, আপন ব্যক্তিগতকেও হারিয়ে ফেলিছি। হারাবারই কথা; সেই রাত, আশে পাশে সেই হৃদাভেজ অককার, বাত্মীশালার সেই জন্মবিলীয়মান কলরব, তিমিত আলো—তাদের মাংশবনে এসে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা রহস্যময়ী হৃদয়বীর অগুণি-নির্দেশ—জানিনে এরকম ঘটনা তোমাদের জীবনে ঘটবে কি না।

'জায়গাটা রাখবেন, আমি আসছি।' এই ব'লে হাতের বিছানাটা আমার ক্রিয়ায় রেখে চারুবালা একবার অদৃষ্ট হ'ল। কী অলসত সে, কী তার উল্লাস! ফিরে যখন এল, তার হাতে একরাশি খাবার। নিঃসঙ্গভাবে হুঁভাগ করলো, এক ভাগ দিল আমার দিকে এগিয়ে।

'ওই বা, জল আনা হয় নি। দিনে যদি আপনাদের কমনগুলটা?'

দেবার অপেক্ষা সে রাখলো না, হাত বাড়িয়ে

কমনগুলটা নিয়ে সে আবার জল আনতে ছুটলো। জল এনে রেখে পরিদ্বার সহজ কষ্টে বললে, 'খাবারের দরুন তিন আনা আপনি আমাকে দেবেন।' —কোনো সন্কেচ, কোনো অকারণ চক্কলতা এবং সামাজিক সৌভাগ্য তার নেই।

সে-রাত কাটলো। ভেবেছিলাম একটু আলাপ করব, তার কথা জানাবো, তার এই বাধারদনহীন জীবনের আসল কথাটা শুনে নেবো, কিন্তু হৃদয়োগ পেলাম না। শামিতাগিনী মেয়েটি সেই-সে বিছানা পেতে গুরে চোখ বুজলো, আর জাপলো না, নিশ্চিত নির্ভরতায় পাশে শুয়ে অল্পকণের মধ্যেই তার নাক ডেকে উঠলো।

প্রভাতে ঠামার ছেড়ে বেলা নটা আশাঙ্ক পারের বাটে এসে লাগলো। মাংশবনে চারুবালা একবার অদৃষ্ট হলো, ঠামারে কোথাও তাকে বুঁজে না পেয়ে বাটে নেমে এলাম। বাটে এসেও প্রশংসা পাই নি। তবে কি চলে গেছে? ব্যাকুল চোখে চারিদিক হাতড়ে হাতড়ে ফিরিচ্ছি এমন সময় দেখলাম, বাসনে বাটের ধারের সে জ্ঞপ বসেচে। সে কী জ্ঞপ, যেন সে পাথর হ'য়ে গেছে! কতদূর পরে তার জ্ঞপ শব্দ হলো। তারপর উঠে এসে হৃদয়ে আমাকে দেখে সে বিদ্বিত হ'য়ে বললে, 'একি, এখনো সে' দাঁড়িয়ে? চ'লে যানু নি?'

মাথার সেই চওড়া সিঁড়ির জ্ঞপ লেগে আরো বেন উজ্জল হ'য়ে উঠেচে। সকালের রোদ এসে পড়েছে মুখে। স্বকোমল সে মুখশ্রী। বললাম, 'আপনারি অপেক্ষায়—'

'আমার অপেক্ষায়? বৈধ্য ত আপনায় কম নয়! ব'লে হেসে সে হৃদয়প্রণামটা সেরে নিল।

বললাম, 'তা' হ'লে আমি এখন যাই, আপনি আসবেন পরে।'

'দাঁড়ান, পাগলের ওপর রাগ করবেন না। মেয়েমাহুহকে আঘাতায় ফেলে রেখে স'রে পড়তে চান? আমি কী করেছি আপনায়? —ধরন দেখি বিছানাটা, গরুর গাড়ী পর্যন্ত ব'য়ে নিয়ে চানু।'



আমার হাতে বিছানাটা দিয়ে ভিঙ্গা কাপড়-খানি হাতে নিয়ে শুণপাঠ করতে করতে সে আগে আগে চলতে লাগলো। ভিঙ্গা চুলের রাশ থেকে টুং টুং করে জল পড়ে তার পিঠের কাণড়টা তখন স্পষ্ট স্পষ্ট করছে। এবারও সে শাড়ী পরে নি, আর একখানা নরনপাড় ধুতি। তাকে অহরহ 'ক'রে চললাম। কিছুদূর এসে গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। কয়েকজন বাড়ী ইতিমধ্যেই উঠে বসেছে, বারো জন হ'লেই গাড়ী ছাড়বে। বারো জন হলো কিন্তু গাড়ী ছাড়তে বেরি হচ্ছে শেষে চারবালা বকাবকি করতে লাগলো। এমন চঞ্চল, এমন অধীর মেয়ে তু-তারতে দেখা যায় না। স্বা-হাত দিয়ে কপালের চুল সরায় আর হেসে-হেসে সকলের সঙ্গে গল্প শুরু করে দেয়। কয়েকজন পশ্চিমা স্ত্রী-পুরুষ তার পরিহার্য হিন্দী ভাষায় বসিকতা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেমন সহজ তেমনি সাবলীল। একসময় উদ্ভাস হ'য়ে সে ছইয়ের ভিতর থেকে নেমে পড়লো। চোখ রাঙা করে হিন্দী ভাষায় জানালো, 'চড়বো না তোমার গাড়ীতে, আমার সময়ের দাম আছে। পরয়া দিলে কত গাড়ী মিলবে।'

ভিঙ্গা কাপড় আর বিছানা নিয়ে সে হুং হুং করে চলতে লাগলো। গাভোয়ান ছুটলো তার পিছনে পিছনে। অনেক দেখে ভাল কথায় বৃষ্টিয়ে তাকে আবার ক্রিরিয়ে আনলো।

গাড়ী যখন ছাড়লো তখন সে ভিঙ্গা কাপড়খানা ছইয়ের উপরে টাঙিয়ে বোদের দিকটা আড়াল করে দিল। বললে, 'কি দেখেচেন বোকার মতো, ভাল হয়ে বহন।'

একটি বৃক হঠাৎ এই সময় বলিল—তারি মুখা মেয়ে ত?

—শুধু মুখা? ভয়লোক কহিলেন, বাচাল, বোয়াদপ, মাঝেমাঝে তার অমাজ্জিত অভদ্র মন্তব্য শুনে গায়ে রক্ত আমার আগুন হ'য়ে উঠেছিল। নারীর সহজ মনের লাবণ্য আর সজ্জতা তার

বিশ্বমাত্রও নেই। এমন একটা উদ্ধত, বেয়াদব মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। কোনো মেয়ের জীবনে যদি শূন্যতা না থাকে তবে তার চেহারা হয় কী ভয়ানক! হ্যাঁ, ঘণ্টা ছই বাড়ে অহতুভার মন্দিরের ধারে এসে গাড়ী ধাঁড়ালো, এইখান থেকেই পাহাড়ী হাঁটা পথ। মন্দিরের কাছে প্রকাণ্ড এক আশ্রম, সসারভাণ্ডারি কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে তপস্তা করেন। চারবালা নেমে এসে বললে, 'আহ্নন, দেখিয়ে দিই আপনাকে, এই আমার গুরুবাড়ী।' বাসিন্দাদের দর্শন করে যাবেন না? বললাম, 'না, আপনি ঘুরে আসুন, আমি এখানে ধাঁড়াই।'

'এই যে,—বলি, কি গো সনতের মা, এই যে বড়পিনী,—তোমরাও এসেচ দেখাচি।' বাসিন্দাম এই দিক দিয়ে, তাবলাম গুরুদেবের একবার দেখেই যাই। চলো।

একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে চারবালা ছুটে গেল। তারা পরপর হাসাহাসি করে বলতে লাগলো, 'ওমা, কি হবে গো, পাগলী আবার কোথা থেকে উড়ে এল মা? সিঁদুর দিয়ে মাখাটা যে জ্বড়ে রেখেচিস মুখপুড়ি? এখানে মতিগতি ফেরে নি? ক'বছর হলো?'

একে-একে সকল বাড়ী হাঁটুতে হাঁটুতে চললো, ধুলোয় আর রোদে আমি রইলাম ধাঁড়িয়ে। সে যে কী আকর্ষণ, কী মোহ তা' আর তোমাদের বোঝাতে পারবো না, আমি তার জন্মে সব হারিয়ে দেউলে হ'য়ে গেছি! —এ রোমাপ্-নয়, প্রেম নয়, একটা প্রবল ইচ্ছাপুং, একটা হৃৎসব!

ছেলোরা কহিল, আর তার দেখা পানু নি?

—কিছুক্ষণ পরেই দেখা পেলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, হতাশ হ'য়ে ভাট্টি, আর কেন? অনেক দূর পথ, এবার আস্তে আস্তে যাই। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে বা' দেখলাম, আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি! ধর্মশালায় দালালে ব'সে চারবালা নিশাশেষে চোবের জল

ফেলেছে। বয়স আমার অল্প, প্রায় তারই সমবয়সী, নারীর অশ্রুতখনো আমি সহিতে পারিনে, সমস্ত মন আমার মমতার স্রবীভূত হ'য়ে এল। কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হলো এর মধ্যে, কাঁদছেন কেন?'

'আপনি বান, আমি আর মুখ দেখাবো না কার কাছে।' ব'লে সেদালালে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আবার ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু আমি গেলাম না, কোথায় যাবো তাকে ফেলে? আমার তখন সব হারিয়ে গেছে! চুপ করে তার পায়ের কাছে ধাঁড়িয়ে রইলাম। অশ্রুতে অভিমানের রুদ্ধকণ্ঠে একসময়ে সে বললে, 'আমাকে কোনো অহরোখ করবেন না, আমি এইখানে জীবন দিয়ে প্রাশস্তিত্ব করে যাবো।' সবাই আমাকে অপমান করবে, আমি কি এতই হীন? বে-গুরুর কাছে মগ্ন নিষেচি তাঁর অসন্তোষ দেখবার অধিকার আমার নেই? তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি না-হয় ভীতীর মেয়ে! বেশ, আমি ভীতী, আমি চণ্ডাল, আমি ডোম, আমি... অঝোরে আবার সে কাঁদতে লাগলো।

'—আজ বৃহস্পতি, আমি ছোট জাতের মেয়ে, আমি হীন, কুহসিত; তোমরাই বড়, তোমরাই মাজ!' বহু ক্ষেদ্রান্তির পর সে চোখ মুছে উঠে বসলো। ছ' একটা কথা বলতে সেলাম কিন্তু সে গ্রাহ্য করলো না। নিঃশব্দ মনে উঠে জিনিষপত্র নিয়ে সে কোনো-দিকে না তাকিয়ে পথের নামলো। মধ্যাহ্নের রোদে চারিদিক তখন টাটা করছে। মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে সে নিশাশেষ পথ হাঁটতে লাগলো।

শীতের শেষ। সমুদ্রের ছোট একটি পাহাড়ী নদী পার হ'তে হবে। নদীর ধারাটি অতি শীর্ণ, সহজেই ছেঁটে পার হ'য়ে সেলাম। নদীর পায়েই পাহাড়ের পথ। চারবালা আগে-আগে কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম করে গেল। পিছনে সে চাইলো না, আমার সঙ্গে বহুদূরের কোনো স্মৃতিই সে মিল না, অতঃপর তাকে অহরহর করার প্রবৃত্তি আমারো আর রইলো না, আমি চললাম ধীরে-ধীরে। পাহাড়ের এক একটা বাঁকে বহু দূর তার দ্রুতপাশীল লীলায়িত

ক্ষুদ্রিত দেখতে পাচ্ছিলাম, সে অক্লান্ত চলছে, কোথাও থামছে না, তাকে বেন পেয়ে বসেছে এক অবিরাম চলার নেশা! আমি তার কাছে হার মানলাম।

ছেলোরা কহিল, এখানেই শেষ?

আর একবার নজ লইয়া বৃদ্ধ কহিলেন, এখানে শেষ হ'লে মন্দ হ'তো না, কিন্তু তা' হয়নি। পেটটুকু সামান্যই, খুব সামান্য, জন্মের মতো সহজ। তার চরিত্রের যেটুকু অস্পষ্টতা সেটুকু আমার কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে। বলি শোনো—

সাত আট মাইল পাহাড় ভেঙে সন্ধ্যার প্রাকালে এক নদীর তীরে এসে পৌছলাম। শরীর ক্লান্ত, কীত ধরতে। কাছেই ছোট একটি ধর্মশালা, কিন্তু বাড়ীর সংখ্যা এত বেশি যে ভায়াগা সঙ্ঘলান হলো না। নদীর ধারে কয়েকটা সরকারি তাঁবু পড়েছে, দেখাশোনাও স্থান নেই। এখানে-ওখানে আগুন জালিয়ে বাড়ীরা রাস্তা করতে বসে গেছে। আগে-ভাগে এলে হরত আশ্রয় ছুটলো। নদীর চড়াতেই করে কাটােনো সারাবতী করবক এপাতেই পাশের তাঁবুর ভিতর থেকে চারবালায় গলার আগুয়াজ পেলাম।

'এই যে, আহ্নন আহ্নন, ভায়াগা পানু নি বৃষ্টি?—তা' ত দেখেই পাচ্চি। এত দেরী হলো আসতে? আহা, হাঁটা অভেস নেই কিনা, ভারি কষ্ট পেয়েছেন, কেন না?'

তার সারদ অভ্যর্থনায় ভীত ও গুস্তিত হ'য়ে সেলাম। যে-মানে সে কাছে জেকে নেয়, সেই মনেই সে অকারণে মাহুকে বিভাজিত করে। বললাম, 'ভায়াগা হবে?'

'হ'তেই হবে, আহ্নন, নৈলে এই রাত্তি যাবেন কোথায়? এইটুকু তাঁরতে কুড়ি জন্মের ওপর লোক। এই গুটিটার আগে-আগে কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম করে গেল। পিছনে সে চাইলো না, আমার সঙ্গে বহুদূরের কোনো স্মৃতিই সে মিল না, অতঃপর তাকে অহরহর করার প্রবৃত্তি আমারো আর রইলো না, আমি চললাম ধীরে-ধীরে। পাহাড়ের এক একটা বাঁকে বহু দূর তার দ্রুতপাশীল লীলায়িত

'রাস্তা করে নেবো।' ব'লে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম। ভিতরটা যেন জঙ্গ বিশেষের ঝোঁড়। কোনো জন্মে এক ভায়াগায় কোলাটা নামিয়ে বললাম, 'আপনার আহার্যি?'



‘ওই যে, বাইরে মহারাজ-স্বামী রামা চড়িয়েছে।’

‘মহারাজ আবার কে?’

চাকরবালা কলকণ্ঠে হেসে উঠে তাঁর ভিতরটা মুখরিত করে তুলে। বললে, ‘নতুন বন্ধ। এমন সবিয়ে পেয়ে রাখাখানো আলাপ করলো যে, মেয়ে-মাহুদের মন, তুনি গুপি হয়ে পেলো। বেশ, ভাল, গুপ্ত মনে পড়ে একটা পুরুষ মাহুৎ থাকে মন্দ কি? ওগো ও মহারাজ?’

তখন অন্ধকার হয়েচে। বাইরের খোলা জায়গায় বেগোনা আঙন সেলে রামা হাঙ্গিন সেখান থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জবাব এল, ‘কেও জি?’

‘চাওল বোলতা হায়?’

‘জি।’

আমার মিকে কিয়ে হেসে চাকরবালা বললে, ‘কী নিশ্চয়্য বন্ধ হলুন ত, এমন দেখেচেন কোথাও? জল এনে দিল, রান্না করে দিলে, গখে তনিয়েচে ভজন-গান, আমার শ্রু-শ্রবণের দিকে কড়া নজর, কিসে আমি গুপি হই—বান আপনি, আর দেবী করবেন না, চাল আর আলু এনে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিন, সারাদিন ত উপবাসেই কাটলো আপনার।’

ধর্মশালার সোকান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনলাম। শীতের হাওয়ায় অন্ধকারে বাইরে থাকা এক ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু উপায় নেই, পেটের ক্ষুধাটা সমস্ত জীব্যপাকে তাক্সিলা করতে। কাঠ এনে কয়েকখানা পাথর একত্র করে আগুন জালুবার চেষ্টা করলাম। উত্তমটা ঠিক জ্বলই করতে পাচ্ছিলে, কাঠ এত ঠাণ্ডা যে, জ্বলতে চায় না। সে এক বিঘ্ন বিপদ। ইতিমধ্যে মহারাজের রান্নাবান্না হয়ে গেল, ভাত-তরকারি নিয়ে সে চুকলো তাঁরুতে। এতক্ষণে হারিকেনের আলোয় তার চেহারাটা দেখলাম। বয়স তার পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে, মাথায় একমাথা টাক, গলায় একটা তুলসীর মালা, মুখে দাড়ি-পোঁক, ছোট-ছোট ছুঁটা চোখ। সবচেয়ে চাকরবালার কাছে হাতের জিনিসপত্র নামালো, চাকরবালা তখন কল ও বিছানার মধ্যে

অতি আরামে বসে সজাত বস্ত্রীদের সঙ্গে মন্থরকণ্ঠে আলোপ করছে।

‘মহারাজ, বাড়ি দেও বাবুকে।’

‘মহারাজ বললে, ‘কোন বাবু?’

‘ছোঁষা ঘো চাওল বনাতা, বেচারাকো তুলিৎ হোতা হায়।’

মহারাজ অসম্ভব দৃষ্টিতে একবার আমার মিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুলিৎ ত করনা চাই, তাঁরখ ওগালে, —বাড়ি কিসে দেই?’

‘তোমার মুখে আগুন, ইতর কোথাকার।’ ব’লে বিছানা ও কল হেঁটে চাকরবালা বাইরে এল, আমার হাত থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে বললে, ‘দরদ, অকম্মার চিপি আপনি, এমনি করে উঠুন তৈরী করে? কাঠের আগুন জ্বালতে জানেন না, কী জানেন তবে?’

তিন চারখানা পাথর মাটিয়ে অতি সহজেই সে উঠুন তৈরী করে আগুন জ্বাললো। বললে, ‘বার কাজ তারেই সঙ্গে, পুরুষ মাহুৎ কি আর রামা করে খেয়েচে কোনোদিন?’

ভাতের হাড়ি উঠনে সে চাপিয়ে দিল। বললাম, ‘তরকারি কিছু করবেন?’

মুখের উপর সে ধমক দিল, ‘তরকারি?’ ভারি লোভ যে আপনার। বসে, মলুতে পেলে স্ততে চায়। ভাতে-ভাতই হয়ে গঠে না, আবার তরকারি! তারপর সে হেসে বললে, ‘বোকাটার কি হিসে দেখলেন আপনার ওপর?—আলোটা দিলে না।’

বললাম, ‘হিসে কেন? কী করলাম ওর?’

‘ভারি ভাড়া আপনি।’ বলে সে হুঁ দিয়ে কাঠ আগিয়ে দিল। আলোয় দেখলাম, কাঠের ঘোঁরায় ইতিমধ্যে তার চোখ ছুঁটা রঙ হয়ে উঠেচে, জল পড়ছে। অনেক সাহায্যই চাকরবালা করলো। বাওয়া-মাওয়ায় পর নদীতে বাসন সেজে দোকানদারকে ক্রিয়ের দিয়ে বধন তাঁরু। ভিতরে এসে চুকলাম তখন বেশ রাত হয়েচে। পথশান্ত যাত্রীরা বিশেষ কেউ জেগে নেই। পাশাপাশি সবাই শুতে। চাকরবালার পাশে মহারাজ।

চাকরবালা মাথাটা দে গরিয়ে এনেচে চাকরবালার বিছানার কাছে। বোকাটা একটু ঘেঁষ-মমতা চায়।

‘মাহা, বুড়ো কত গল্পই করলো আমার কাছে।

বৌ ম’রে আবার পর থেকে সরসী হয়েচে, অনেক দেশ খুরেচে, কিন্তু জীবনে আমার মতো মেয়ে আর দেখে নি—এই সব।’

তার কথা শুনে মহারাজ মাথাটা উঁচু করে বললে, ‘কেয়া বোলতা?’

চাকরবালা এক হাতে তার মাথাটা দাবিয়ে দিয়ে বললে, ‘বলতি যে, চুল পাকলেই পুরুষ মাহুৎ বোকা হয়। বস্তুতে পেরেচ গদ্বত?’

মহারাজ অতি গুপি হয়ে আবার চোখ বুললো। চাকরবালা আবার বললে, ‘বুড়ো হয়েচে তু’ মেয়ে-ভেলের ওপর কী টান দেখেচেন?—তোমার কি আর কিছু হবে বাবা? ইচ্ছে হলে, তোমার গলা টিপে রাতারাতি শেখ করে রাখি। আচ্ছা, মহারাজ?’

মহারাজ মুখ তুলে হেসে বললে, ‘কেয়া?’

চাকরবালাও হেসে হেসে বললে, ‘দেখুন দেখুন, আমার মাথা বান, এবার এর জঘন্ট চেহারাটা একবার দেখুন, বেনে হুনো ওলু। মুখে কী নোদুপ কাভালপণা দেখেচেন,—এরাই আসে পৃথাসকয়ে। মহারাজ, তোমাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত জানো?’

মহারাজ মুখের মতো অতি আনন্দে মাথাটা আবার উঁচু করে তাকালো। চাকরবালার চোখ ছুঁটা তখন দুপ দুপ করে জ্বলচে। তু’ সে হাসিমুখেই বললে, ‘মনে করে না, ঘোয়ার উঠে তোমার কাছ থেকে সরে বাবে, সেমেরে আমি নই। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হলে জানো?—গরম সাঁড়ানি দিয়ে তোমার চোখ ছুঁটা উড়িয়ে দেবুতে।—যাক, সাঁড়ানি ত আর নেই হাতের কাছে, তুমি বেঁচে গেলে! কিন্তু যদি দরকার হয়, তোমার বুকের ওপর বসে নখ দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নেবো, বুকে বন্ধ?’

তাঁর ভিতরে সেই তিমিত আলোয় চাকরবালার

চেহারা দেখে আমার গা কেঁপে উঠলো। বললাম ‘ও একটু প্রশ্রয় পেয়ে অমনি কয়চে, আপনি না-হয় একটু সরেই যান না?’

‘খামুন আপনি, ঠিক এমনি করেই শোবে এখনে, ভয় কিসের? সারারাত ও জেগে থাকবে, আর আমি নাক ডাকবো!’

বাইরে অন্ধকার, শীতল রাত্রি শী শী করে। নদীর ওপারে বন, সেই বনে হাওয়া উঠে অন্ধের মতো শব্দ আনছে, তার সঙ্গে নদীর স্বর স্বর কলতান। যাত্রীদের কলরব নীরব হয়ে গেছে। অনেককণ নিশেবে কাইবার পর চাকরবালা বললে, ‘আপনার পোষার কষ্ট হচ্ছে, বিছানাটা দেবো?’

আবার সেই শব্দের করাৎ! হী না, কিছুই বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম।

‘মুসোলেন নাকি? এমন ঘুম ত কোথাও দেখি নি বাপু?’

বললাম, ‘বিছানা চাই নে, এইতেই হয়ে বাবে।’ সে বললে, ‘আমার বিছানাটি দেখেচেন ত? একটা ছোট বাগিশ, আর অড়-পরানো একখানি কাঁধা।’

‘ক’বল একখানা আলু পায়তেন!’

‘না, এ ছুঁটা ছাড়া আর কিছুই আমি ব্যবহার করি নে। কী শীত, কি গরম,—এই কাঁধা আর বাগিশটি। আজ ন’বছর এই ছুঁটা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে।’ ছই হাতে ভর দিয়ে উপড় হয়ে মাথাটা সে তুললো। তিমিত দীপালোকে তার মাথার চওড়া সিঁছরের দাগটা জল জল করে!

মুখের উপর থেকে চুল গরিয়ে সে বললে, ‘আপনাকে বিছানাটা দিতে চাইলাম বটে কিন্তু দিতাম না, এ বিছানার আমি কাজকেই গুতে দিই নে। কেউ এর যোগ্য নয়।’

এইবার হরিবা পেয়ে বললাম, ‘আপনার স্বামী কোঁমার?’

‘এই বিছানা তারই,—কিন্তু তিনি নেই।’

‘নেই, মানে?’



‘সে অনেক কথা। আমার বয়স তখন আঠারো, —রাপের বাড়ী থেকে আস্থিলাম খন্ডরবাড়ী। খন্ডরবাড়ীর দরজায় পা দিতেই জন্লাম, যানী মারা গেছেন ক’দিন আগে।—এ কি হয় কখনো? স্বহ মাহুয বেধে গেলাম, জলজাত্ত মাহুয, সে যাবে ম’রে? নবা কি এতই সহজ? সত্যি বলতে কি, আমি সেদিন পাগল হ’য়ে গেলাম। সে মরে নি, তার মরবার কথা নয়,—চলিষ বছরের ভাঙ্গা-বুকে ছেলে। যদি সে মরবেই, আমার কোলে তার মরণ হলো না কেন? তখন চুটলাম সেই মৃত্যুর পিছনে। ময় প’ড়ে বিবাহ হ’য়েছিল, সে-ময় কি এত বড় মিথো? তাকে আমি কিরে পাবোই একদিন, একদিন না একদিন তাকে ধ’রে ফেলবোই!’

সেদিন কী রহস্তময় অন্ধকার রাত! তেমনা কখনো দেখেচ, নারীর আশ-প্রত্যয়ের চেহারা কেমন? তিস্তবের জ্যোতি: বাইরে আসে কেমন জ্যোতির্প্ণবল হ’য়ে? তেমনা কোনোদিন সতী-নারীর দেবা পেয়ে?

‘কিরে পাবোই একদিন—’এই কথা বলতে বলতে চাকবালা রোমাঞ্চ হলো। চোখে তার এল স্বপ্নঘোর, কণ্ঠে এল সঙ্গীত, তার রূপ হোল অপরূপ! সেদিন আর তাকে বিচার করি নি, বিশ্লেষণ করি নি, সেদিন তাকে অহুত্ব করেছিলাম। সে আবার বললে, ‘ন’বছর কাটলো তাঁকে বুঁজে-বুঁজে। এই বিছানা তাঁর, এই দেহ তাঁর, আমি তাঁর, আমার যা’ কিছু সমস্তই তাঁর হাতে ঝুঁপে দেবো ব’লে ছুটে চলেছি, আমাকে ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন বলুন ত? কত ছুঁয়ে আমার দিন কাটে, কত বিপদে ...তিনি নির্দয়, আজও তাঁর দেখা নেই!’ বলতে বলতে চাকবালার চোখে জল এল।

‘সমস্ত জীবন ধ’রে লোকের ভিড়ে তাঁকে খুঁজে

বেড়াবো। পাবো না তাঁকে, ধরতে পারবো না, বলুন ত আপনি?’

পাগল, পাগল, উদ্ভাদ মেয়ে! তাঁজীর রক্ত তার দেহে, তাই হয়ত আজও বুনতে তার ইন্দ্রজাল!

প্যাসেজার ট্রেনের গতি মত্তর হইয়া আসিল। রাত আর বাকি নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া বাড়াইয়া কহিলেন, পঠিন বছর আগের ঘটনা, শুছিয়ে বলা গেল না ভাই। আচ্ছা,—এই ষ্টেশনে আমাদের নামতে হবে।

ছেলেরা ব্যস্ত হইয়া কহিল, তারপর, তারপর? গাড়ী তখন থামিয়াছে। হাটকেশটা হাতে লইয়া তিনি কহিলেন, তারপর সকাল হলো। ঘুম ছাড়িয়ে আমি আর মহারাষ্ট্র উঠে ব’সে অবাক হ’য়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে কেউ কোথাও নেই। যাত্রীর দলের সঙ্গে চাকবালা ভোর রাতেই পাণিয়েছে আমাদের ছেড়ে। বলিয়া ভদ্রলোক নামিয়া পড়িলেন।

অন্ধকারে গলা বাড়াইয়া একটি যুবক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আর দেখা পানু নি? ও-মশাই?

দূর হইতে উত্তর আসিল, ‘না।’ চারিজনই নীরবে বসিয়া রহিল। আবার গাড়ী ছাড়িয়াছে। কোথায় যেন তাহার ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের কথা বলিবার কিছু নাই।

একজন কেবল কহিল, লোকটার চুল পেকেতে, কিন্তু কী মিথোবাবী বল ত? সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা কেমন গোঁজামিল দিয়ে ঢালিয়ে গেল? —জোচ্চোর কোথাকার!

কিন্তু বাকি তিনজন তেমনিই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গাড়ী নী-নী করিয়া ছুটিতেছে।

## কবি

### শ্রীধেতুমার মুখোপাধ্যায়

আমি কবি—মোর লাগি প্রকৃতির পুষ্পখ্যাতার,  
বহি আনে ষড় ঋতু, পূর্ণ করি স্থাপাচার তার।  
আমি কবি—মোর লাগি সিদ্ধকুকে ভ্রঞ্জে ওঠে হাসি;  
ছন্দে ছন্দে পুষ্প-পনে দিপান্ততে বেঞ্জে ওঠে বাঁধী।  
অরে ছন্দ, গন্ধ তার দিকে দিকে যায় শুধু ভেসে;—  
খুঁজে ফেরে তিস্ত মম অর্থে নিয়ে সাক্ষণ হেসে।

জ্যোৎস্না-লাবণ্য-মুগ্ধ বনানীর শ্রামল কুন্তল,  
অনন্ত আকাশে জাগে জ্যোতির্ধর তারকার দল।  
প্রকৃতির স্থাপাচারে পূর্ণ এত অমৃতের রাশি;  
আমি কবি—মোর লাগি দিকে দিকে এত কলহাসি।  
আকাশে বাঁধীর হুরে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ-শিহরণ;—  
আমি কবি যুগে যুগে তার মাঝে পেতেছি আসন।

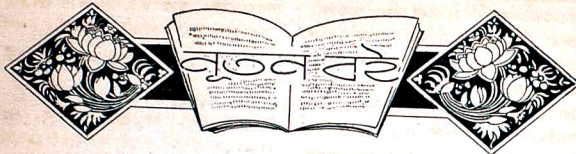
বসন্তে বকুল বনে অহুত্ব জাগে বে হিম্মোল,  
শ্রামল পাতার শাখে বিহগের আনন্দ-কল্লোল।  
আমি কবি—মোর ঘরে নিতা তারা সাক্ষণ-স্বরে  
হান চায় মুহূর্ত্তে, প্রেমাসন পাকিবার তরে।  
অনন্ত আকাশ-বুকে নীলিমার দিশাহারা গীতি;—  
জ্যোৎস্না-রাত্রে মধ্যপথে ধীপ-প্রভা শূজ ছায়াবীথি।

বরিষার শ্রাম-বন লক্ষাহারা মেঘের কুন্তলে,  
বাথা মোর ভ্রঞ্জে থাকে অলীমের রক্ত ঈথি-জলে।  
কিশোরের চিরস্তন এই মধু-সমীরণ দোল  
ছন্দে, ছন্দে, সিদ্ধ গীতে এত হুর এত বে হিম্মোল।  
তরুণ বসন্তরাত্রে স্বপ্ন-মুগ্ধ আকুল পূর্ণিমা;—  
আমি কবি—মোর চেয়ে আনন্দে সে নাহি পায় সীমা।

বসন্তের কুন্তল অহুত্ব জাগে ভরা তাই আছি,  
প্রিয়া-হারা কোকিলের কুচবাণী উঠিয়াছে বাজি।  
যার যত জীবনের চিরপুণ্য সঞ্চয়ের রাশি,  
আমার ছুরেতে সবে অর্থা-সম দেয় ভাশোবাসি।  
আমি কবি—হরি’ মোর সাক্ষণ হুরে যত মানি;—  
মোর লাগি জলে তাই আরতির পঞ্চদীপনানি।







[‘উৎসব’ সমালোচনার জন্ত গ্রন্থাকারণ অসম্ভব করিয়া তাঁহাদের পুস্তক উইদানি করিয়া গাইয়াছেন]

**সন্তান পালন**—ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগ্গী, এম্. এ., এম্. এম্. এ. প্রণীত। প্রাণ্ডিহান—সরকারি বিবাহ এণ্ড কোং, ১৯১৩ এ, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা ছই আনা।

সন্তান কেবল মাতা-পিতার কেন, সমগ্র জাতির মূলধন। এই সম্পত্তি (assets) অর্জন, সারক্ষণ ও পরিবর্তন বে পরিবার বা যে জাতি যত স্বরূপ, সেই জাতি বা পরিবারেরই সেই পরিমাণে উন্নতি হইয়া থাকে। ভারতে সন্তান-পালন ও সংশিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল। গ্রন্থকার চরক, সুশ্রুতের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ বিধের অমূল্যদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং প্রযুক্তি এবং শিশু-চিকিৎসার তিনি ডাক্তারী ব্যবস্থাই করিয়াছেন। শিশু-গ্রীষ্ম ভেদে আবহাওয়ার পার্থক্য দেখা যায়; সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষায়ও বিভিন্ন জাতির পুঙ্খ পুঙ্খ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সত্য, ন্যায়, সর্বাচার প্রধান ভারতীয় সভ্যতা। সেই ভারতের শিশু-শিক্ষা-প্রণালীও সেই বিধানমুখারী হওয়া স্বাভাবিক এবং কার্যকরী। আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া শিক্ষা, আমোদপ্রিয় জাতি গড়িয়া তুলিলে। তারপর পেটের খাবার কথা, কলে তৈয়ারী খাবার কথা। ইহা শস্যের দৃষ্টি করে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ডাক্তারেরই মত লিবিলাম—Lt. Col. W. Shirely, C. M. G., M. A., writes—Whatever may be the ultimate verdict of science as to Calories, Vitamins etc., it is certain that most artificial foods, highly

milled cereal products, muscle meat, etc. are insufficient by themselves to maintain animals in health.....The quantity of insidious poisons in each of these manufactured food articles is so minute that positive and obvious injury is out of the question, for the time being, but their cumulative effect in the course of years is bound to become visible...No organism can stand it indefinitely.

‘মনের পরিপতির উপর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রভাব’ অধ্যায়টিও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোচনা সমন্বয়ে, আরও সংক্ষেপে এবং সহজে লিখিলে, পরিবার, সুস্থিয়ার এবং কাজ করিবার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থকারের মনঃ উদ্ভঙ্গ দেশবাসী স্বয়ংসম্মত করিয়া, কার্যতৎপর হউন, শিশুগণকে কাজের মাহু্য গড়িয়া তুলুন—তাঁহা হইলেই তাঁহারা জানেন, গুণে, সচ্ছবিত্ত্য, কর্মে, বংশের মর্যাদা, এবং জননী জন্মভূমির গৌরব রক্ষায় সক্ষম হইবে।

শ্রীরমেশ শর্মা

**WOOD & LINO-CUTS.** Fifteen Wood & Lino-cuts Being Studies in Portraits and Landscapes of Bengali Life and Locality. By Sudhansu Kumar Ray. (The Book Company Private Limited. College Square, Calcutta.) মূল্য ২০ টাকা।

Wood-cut বা কাঠখোদাই-এর সহিত আমাদের ভে-ভাবে পরিচয়, তাহাতে এই শিল্প শব্দে আমাদের

কোন উচ্চ ধারণা থাকা সম্ভব নয়। পূর্বে কাঠ-খোদাই ছিল পুস্তক চিত্রিত করার প্রধান উপায়; কিন্তু হাক-টোন এবং লাইন-রকের প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ-খোদাই অল্পে অল্পে উঠিয়া বাহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে কাঠ-খোদাই-এর পুনর্জাগরণ দেখা দিল। বিংশ শতাব্দীর কাঠ-খোদাই-শিল্পী সাদার কালোর অপূর্ণ খোদাই-চিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাঠ শিল্প জিনিষ বলিয়া কেহ কেহ ‘Linoleum’ (বাহা যবের মেয়ের উপর বিছান হয়) কাঠিয়া চিত্রের রক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং এই ‘লিনো-কাট’-এরও (Lino-cut) একটি আর্টের সৃষ্টি হইল। বাস্তবের বহু অক্ষরগণ না করিয়া, বাস্তব জিনিসের সহিত নিম্নের কল্পনা মিলাইয়া বিংশ শতাব্দীর শিল্পী স্বন্দর খোদাই-শিল্প গড়িয়া তুলিলেন।

আমাদের দেশের কয়েক জন নবীন শিল্পীও এই ‘কাঠ-খোদাই’ ও ‘লিনো-কাট’-এর চর্চা করিতেছেন এবং আলোচ্য পুস্তক বাসিন্তেও শিল্পী শ্রীমুখ্য স্বাংক কুমার রায় কর্তৃক খোদিত কতগুলি অতি স্বন্দর উদাহরণ ছাপা হইয়াছে। সামান্য কয়েকটি মোটা টানে কত স্বন্দর ছবি হইতে পারে, আলোচ্য পুস্তকের ছবিগুলি দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাস্তবের ছায়ার সহিত এই নবীন শিল্পী কর্তৃক কল্পনা মিলাইয়া কয়েকটি অপরূপ চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে ‘A Weather-beaten Face’ নামে রক্তের মুখের ছবিটি আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। গ্রাম্য-বালিকার ছবি (১নং), গৃহ-গুপ্তশাসী বৃদ্ধের ছবি (২নং), বালকের ছবি (৩নং), কলিকাতার ময়রানো তরুণীর ছবি (৪নং) এবং কলিকাতার একটি বৃদ্ধের ছবিও (১২নং) আমাদের গুরু ভাল লাগিয়াছে। আশা করি এই নবীন শিল্পী ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও স্বন্দর স্বন্দর খোদাই-চিত্রের উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন। ছবির কাগজগুলি এবং কালো কালি চকচকে না হইলে ছবিগুলি আরও

স্বন্দর দেখাইত। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে শিল্পী বা প্রকাশক এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীহরিনারায়ণ রায়চৌধুরী

**দিগ্ধধু**—কাব্য। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত; মূল্য চার আনা।

ছোট্ট একটি বইয়ের একটি মাত্র কবিতা; কবিতাটি কিন্তু ছোট্ট নয়। কাব্যের সমস্ত উপাদানই ইহাতে আছে। স্থলিত ভাষা, ছন্দের স্বভাব, অলঙ্কারের মাধুর্য, বর্ণনার ওজল্যা। হাতে হাতে কবিত্ব-রস উজ্জলিত শারদ-জ্যোৎস্নার মনে স্থান দ্বন্দ্বিত্বের রক্ত-ধারার দ্বান করা হইয়াছে।

কাব্যের মধ্যে আরব্য উপজাতির যে নূতন ব্যাখ্যা কবি তুলিয়াছেন, তাহা যেমন মৌলিক তেমনি স্বন্দর!

তবে এ ধরণের দীর্ঘ কবিতার পাঠক সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ, লোকের সময় কম, ধৈর্য্য কম। তবে ‘দিগ্ধধু’ সন্দেহ ইহা বলা যায় যে, সমস্ত বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শুনা হইলেও কাহারও ক্লান্তি আসিবে না। কারণ, ইহার সর্গাঙ্গ অলঙ্কারের, উপমার, অমূল্যপ্রসার ঐশ্বর্য্যে স্বল্প মূল্য কবিত্তেছে।

**দখিন হাওয়া**—কবিতার বই। শ্রীপ্রভাতকিরণ বর প্রণীত। মূল্য আট আনা। পকেট-বুক আকারের ৫৬ পাতা। দাম একটু বেশী মনে হইল।

প্রভাতকিরণ বর বহুদিন ধাবৎ বহুবিধ মানিক পদ্যে কবিতা লিখিতেছেন; তাহার রচনা মিষ্ট ও সরস হইয়া থাকে। লঘু ও ললিত কবিতা গাহারা ভালোবাসেন প্রভাতকিরণ বর। ‘দখিন হাওয়া’ তাহারদিগকে নিশ্চয়ই কিংবদন্তির জ্ঞান আমোদিত করিবে। পুস্তকের প্রথম কবিতাটি serious কবিতার মধ্যে ভালো লাগিল; ‘দ্বিতীয় পক্ষ’, ‘উত্তীর্ণ বৃন্দী রাম’, ‘দ্বিতীয় দিন’, প্রভৃতি হাসির কবিতাগুলি বেশ উপভোগ্য।



আমরা কবির অজ্ঞাত পরবর্তী রচনা-সংগ্রহের অপেক্ষার রহিলাম।

### শ্রীরামেন্দু দত্ত

পদ্মা—ঐক্যমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমুখ্যর চট্টোপাধ্যায়, গোবাপ পারিশিং হাউস, ১২নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই, সবুজ ত্রিশটি কবিতা আছে। অতি আধুনিক কবিতার মধ্যে ক্রমোন্নতির একটি বিশিষ্ট বান আছে, তাই আগ্রহের সহিত বইখানি পড়িয়া বসিলাম। সব কটি কবিতায় একটা সম্বন্ধ-বৈশিষ্ট্য আছে, ছন্দ সাবলীল, ভাব ও ভাষা গভীরগতক পথ ছাড়িয়া বহু বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া এই ক'টি কবিতা আমাদের ভালো লাগিল—প্রভাতে রবির রস, মিলন-বাসর রাতে, স্বর্গ-সিংহাসন, ছালালী, আজ শুধু মনে হয়, প্রণয়ের পরোষি মৃদু, সকলেই ভুলিয়াছে, ও শেব। সে দিন গরব যাবে, এখানে আকান ও আঘাতের প্রথম বর্ণণে—কবিতায়, বিশেষ করিয়া শেনোক্তিতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া অল্পতভাবে পড়িয়াছে, বেটু না পড়িলেই ভালো হইত। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট স্বকচিসঙ্গত ও মনোহর।

### শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

নিশি পদ্ম—গল্পের বই। লেখক—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্নাল। প্রকাশক—শুধুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বর্তমান যুগের উদীয়মান কথা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রবোধকুমার স্বীয় প্রতিভাবলে একটি বিশিষ্ট বান অবিকার করিয়াছেন। চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্য এবং নরনারীর ক্ষয়ভাবের বিশেষণ করিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছোটগল্প-রচনার বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সে-বৈশিষ্ট্য তাঁহার এই পুস্তকের গল্পগুলিতেও বর্তমান আছে। ভাষার লগিত বিজ্ঞাস, ভাবের গভীরতম ইঙ্গিত, কখন-ভঙ্গীর প্রাণ-চাক্ষুশ—‘নিশিপদ্ম’র একটি দিকের পরিচয়।

‘নারায়ণ’, ‘গভীর’, ‘ছন্দোপতন’, ‘বাতাস দিল দোল’—এই চারটি গল্প আমাদের অন্তরেও দোল দিয়াছে। এ কয়টি গল্পে লেখকের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ‘নিশিপদ্ম’, ‘মর্ম্মকামনা’ ও ‘কল্পনা’ চলনসই। ‘প্রসাধন’ আমাদের ভাল লাগে নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল; প্রচ্ছদপটের ছবিখানি বেশ মনোজ্ঞ।

মধুরা—কবিতার বই। স্বর্গীয়া সুরবাসা যোগ্য প্রণীত। ১১৩ রূপায়াম বহুর ষ্টীট, কলিকাতা হইতে ক্রীমমুখনাথ যোগ্য কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে মোট নয়টি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতাই এক-একটি ক্ষুদ্র গল্প। লেখনীর সাবলীল গতি-ভঙ্গী, ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, গল্পের মাধুর্য্য ও অন্তর্নিহিত পরিভ্রমতা কবিতা-গুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রন্থা জটিলীর মত সেগুলি ছন্দোমুক্তো আর মুহমল সঙ্গীতে পাঠকের চিত্ত সরল করিয়া তুলে।

### শ্রীনিহাররঞ্জন মিত্র



### ১। অতি আধুনিক ‘অটো-গাইরো’

উদয়নের প্রথম সংখ্যায় ‘অটো-গাইরো’ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত Senor Cierva নামক এক ব্যক্তি সর্বাধুন্য আধুনিক প্রণালীতে একখানি ‘অটো-গাইরো’ বিমান প্রস্তুত করিয়াছেন। একখানি তিন-কলা ‘রোটর’ (যাহাতে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন এবং বিমানের গতিস্থিতি হয়), একখানি হিঁর পুচ্ছকলক (tail plate) ও একখানি দণ্ডায়মান ডানা না থাকিলে ইহাকে ডানাহীন ‘অটো-গাইরো’ বলা যাইত। এই বিমানখানির কার্য্য-কলাপ দেখিয়া British Air Ministry-র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে বিস্মিত হন। ৪৫ গজ পরিমিত হান দোড়িয়াই এই বিমানখানি ১০০ ফুট উপরে উঠে এবং ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে উড়িত থাকে।

এবং ইহা পুনরায় উড়িতে থাকে। ইহার কিছুদিন আগে একবার, ইহা একখানি পাখকের মত ভূমির উপর নামিয়া আসে এবং ২০ ফুট দোড়িয়াই উপরে উঠে। তারপর ইহা লাক্কাইয়া লাক্কাইয়া কতকগুলি ফিতার বেড়া ভিঙ্গাইয়া এমন আত্মে আত্মে স্তরের

উপর ঘুরিতে থাকে যে, ভূমি হইতে একজন লোক অন্যরাসে পার্শ্বে বদল করিতে পারিত। ইহার পূর্বে পক্ষীর অঙ্করণে বিমান নির্মিত হইত বলিয়া ইহার পক্ষে সরল ভাবে ওঠা-নামা করা অথবা বায়ুমণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভব হইত না। বর্তমানে এক প্রকার কীটের অঙ্করণে বিমান-প্রস্তুতির কথা উঠিয়াছে। পাখীর মত ডানা ঝাপটা না দিয়া এই কীট পক্ষ-সকলান করিয়া যুদ্ধাকারে ঘুরিতে থাকে। মাছও এই কৌশল আয়ত্ত



Senor Cierva তাঁহার অটো-গাইরো হইতে পার্শ্বে বদল করিয়া দেখাইতেছেন

এই সময় উহার ইঞ্জিনের বাষ্প-প্রবাহ বন্ধ করা হয় এবং বিমানখানি ধীরে ধীরে ঠিক সোজা ভাবে নীচের দিকে নামিতে থাকে। মাটি হইতে ১২ ফুট উচ্চে আসিলেই আবার ইঞ্জিন খুলিয়া দেওয়া হয়

করিতে পারিলে বিমান-নির্মাণে যুগান্তর আসিবে।

### ২। ‘ওজোনে’ (Ozone) জল পরিষ্কার

লন্ডনের Metropolitan Water Board সহরের পানীয় জল পরিশুদ্ধ করিবার জন্য Chlorine-এর



পরিবর্তে Ozone-ব্যবহার করিবার চেষ্টা আরছেন। আমের মত এত অধিক পরিমাণে A ভিটামিন Oxygene-এরই রূপান্তর Ozone; ইহার প্রতি অণুতে (molecule) দুইটি পরিবর্তে তিনটি করিয়া পরমাণু (atom) থাকে। একটি পরমাণুতে বীজাণু ধ্বংস করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে Ozone পৃথক হয়, এবং Chlorine-এর মত ইহাও ফলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত (blown) করা হয়। থাকে। ফলে দুর্গন্ধ বা বীজাণু থাকিলে ইহা তাহা নষ্ট করে, কিন্তু Chlorine-এর মত ইহার কোন দুর্গন্ধ নাই।

### ৪। নূতন ধরনের নিব

Joseph Gillott & Co. এক প্রকার নূতন ধরনের নিব তৈয়ারী করিয়াছেন; কোন প্রকার কালি ব্যবহারেই ইহাতে মরিচা ধরবে না, বা ইহা ক্ষয় হয়। বাইবে না। কাউন্টেন পেনের ব্যবহার যে এত বেশী তার কারণ সাধারণ নিব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। ইহার বার; এই নিবের প্রচলন হইলে একটা মত অসুবিধা দূর হইবে।

## শেষের বাঁশী

### শ্রীকর্ম্মাণ্যী রায়

নিজাহারা নয়ন নায়ে জাগিয়া আছি বিরহ রাত  
বাহিরে হাওয়া পায়লপারা কুসুম বাসে উঠেছে মাত।

চাঁদের বাঁকা চাহনি নিরা  
গরবে হাসে নীলিমা প্রিয়া,

সরসী ধ্বংস কলে প্রিয়ের মালা রেখেছে গাঁথি।  
নিজাহারা নয়ন নায়ে জাগিয়া আছি বিরহ রাত।

সকল হিয়া স্বপন-সীনা, বিরহ শুধু আমারি বুক  
অতীত হৃদি জাগায় তুলি দীর্ঘ খাসে গভীরে হৃদে।

ধরার বেন বিবাহ আঁজি,  
বাসরে বেন চলে সে সাজি,

বিষাদ শুধু লিখেছে ধাতা বেদনা-স্নান আমারি মুখে  
সকল হিয়া স্বপন-সীনা, বিরহ শুধু আমারি বুক।

জীবন-নদী বহিয়া চলে পরাণ-হীন মন্থরতা

কহিছে শুধু ছ'কুলে তারি গোপনতম ব্যথার কথা।

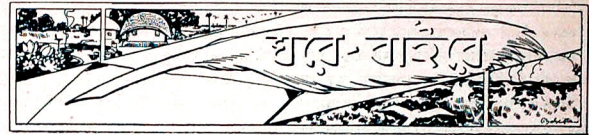
নারিক হাসি কলধ্বনি  
দুন্দ-ভার অসহ গণি

মানস-বনে মানসী মম আজিকে শুধু কান্দনরতা  
জীবন-নদী বহিয়া চলে পরাণ-হীন মন্থরতা।

স্নাত্ত দেখে স্নাত্ত মনে শেষের বাঁশী বাজিবে কবে  
হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ের সাথে মরণ-পারে মিলন হবে।

রয়েছে জমা নতক ছখ  
হরনি পাওয়া যে প্রেমস্থখ

সকলি এসে সে রমণীর আমারি প্রিয়ে তুলিয়া লবে  
স্নাত্ত দেখে স্নাত্ত মনে শেষের বাঁশী বাজিবে কবে।



### (১)

আজকের দিনে কি-যরের কি-বাইরের বিষয়ে লিখতে বসলেই, বীরবলের কলম ধরবার লোভ হয়। আজকের দিনে যা বড় ঘটনা ঘটে, তার ইংরাজী নাম হচ্ছে Conference। আর Conference ব্যাপারই হচ্ছে ধরারস্তে লব্ধিক্রিয়া। আজ এক যুগ ধরে যে League of Nations-এর বৈঠক বসছে, তার কলে আর মাই হোক, জাতিতে জাতিতে কোনও সন্ধি হয়নি। আর, সম্ভ্রতি বিলতে যে Economic Conference বসেছে, তাও যে দুদিনে কীসে যাবে, তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; যদি না ইতিমধ্যেই তা কীসে গিয়ে থাকে।

Conference-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচজনকে তর্ক করে একমত হওয়া। কিন্তু যেখানে পাঁচজনের মনের মিল নেই এবং কেউ কারও কথায় বিশ্বাস করেন না, এবং সকলে ঠকবার ভয়েই অস্থির, — সেখানে পাঁচজনের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব। অথচ সকলেই যখন বোঝেন যে, পৃথিবীর জাতিমাঝেই এইরকম পরস্পর রোষারবির ফলে নিত্যন্ত দুঃখস্বায় পড়েছে, তখন পরস্পরের সঙ্গে সলা-পারামর্শ করে এই আন্তর্জাতিক Economic War-এর একটা আপোষ-মীমাংসা করবার প্রবৃত্তিও অতি স্বাভাবিক। এই জল্পই ইউরোপে আজকাল নানারকম Conference বসে; এবং সেখানে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মনের ও মস্তের অমিল প্রচার করেই, যে বার স্বস্থানে সরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বীরবলের প্রকৃতির লোক ব্যাপার দেখে হেসে উঠবেন, কারণ তিনি নিকাম ধর্মের চক্কো অর্থাৎ ফলনিরপেক্ষ বলাকওয়ার অর্থ বোঝেন না।

আমি কিন্তু এই সব Conference-এর ব্যর্থতাকে হাসির জিনিষ মনে করিনে, কাদার জিনিষও মনে করিনে।

### (২)

শুনতে পাই বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক Plato বলে গিয়েছেন যে, সভ্যতার অর্থই হচ্ছে Force-এর উপর Persuasion-এর জয়। একথা সর্লান্তকরণে গ্রাহ্য করি। কারণ, অগ্রাহ্য করবার কোন সম্ভব কারণ নেই। মানবসমাজে সভ্যতা বলে যদি কোনও পদার্থ থাকে, আর মানবসমাজে ইতিউদান বলে যদি কোন ধর্ম থাকে ত সভ্যসমাজের ইতিউদানের ইতিহাস Plato-র মতই প্রমাণ করে। এ মত গ্রাহ্য করতে অনেকে যে ইতস্ততঃ করবেন, তার কারণ বলপ্রয়োগের ফল বড়টা প্রত্যক্ষ, Persuasion-এর ফল আমাদের চর্চাক্ষুর কাছে ততটা প্রত্যক্ষ নয়। বিশেষতঃ এ দেশে আমাদের যখন মারাত্মক বল নেই, তখন আমরা কল্পনার বশকে খুব বড় করে দেখি। Conference-এ যে কোনও সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে না, তা আমরা নিতাই দেখতে পাই; কিন্তু Force-ই কি কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে? — ইউরোপের গতযুদ্ধের মত বিরাট যুদ্ধ বোধহয় পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখন হয়নি। এর তুলনায় কুদক্ষেত্রের যুদ্ধকেও Football Match-এর পর্যায়ের কেল্লা যেতে পারে। কিন্তু গতযুদ্ধ কি কোন মানবসমস্তার মীমাংসা করেছে; না নানা নতুন সমস্তার সৃষ্টি করেছে? অপর কথা ছেড়ে দিলেও, পৃথিবীর বর্তমান আর্থিক দুর্গতি কি গতযুদ্ধের



অনিবার্য ফল নয়? আর বর্তমান Economic Conference কি গভীররূপে পাপের শাস্তি থেকে উদ্ধার পাবার উপায়ের সন্ধান পাবার চেষ্টা নয়? এক হিসেবে তর্কযুক্ত অশেষক আন্দোলনের মনোমত। যুদ্ধের কথা থাকলে সুবাদপত্র স্থগিত হয়ে ওঠে, আর ইকনমিক্সের তর্কে তা আমাদের অধিকাংশ পাঠকের কাছে অপ্রাচ্য হয়ে পড়ে।

(৩)

এর কারণ, নিম্নের লোকের খুন-জখম করতে ভাল না বাসুক, খুন-জখমের কথা স্মরণে ও তার অভিন্ন দেখতে ভালবাসে।

পড়ের মাঠে নিতাই দেখা যায় যে, Football Match দেখতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়, আর ম্যাচ নামক নকল যুদ্ধ দেখে তাদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ হয়! এ আনন্দের কারণ, এ খেলাতে হাতাহাতি আছে, লাথাবাণি আছে, আর খুন না হোক জখম আছে।

তরপের সিনেমার এত পসার কেন?—সিনেমাকে চামড়ার গোলা নিয়ে নয়, রক্তমাংসের রমণীর কাঁধ নিয়ে না হোক, ছায় নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি আছে; অন্ততঃ ছদ্মি আশে ছিল। আর এ দর্শকের দল আবালবৃদ্ধবনিতা, ছোট-লোক, বড়-লোক সবাই। অপর পক্ষে ইকনমিক্স সফরে বক্তৃতা শোনার নিমন্ত্রণ আমরা ক'জন রক্ত কবির? যদিও ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে হার-জিতের উপর আমাদের জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। আর অপর ছই ক্ষেত্রে হার-জিতের ফলে কারও কিছু আসে যায় না।

ইকনমিক্সের বিধি-নিয়ম সফরে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কেননা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু জ্ঞানবার আমাদের কৌতূহল পর্যাপ্ত নেই। ফলে, যবনের কাপড়ের সেটিংয়ে ইকনমিক্সের বুলিগুলো আমরা মুগ্ধ করেই সন্মত থাকি। কিছুদিন থেকে আমরা ব্রিট-নারায়ণের মহা ভুল হয়ে পড়েছি,

অন্ততঃ মুখে। এর একটা কারণ—ও মনগড়া নারায়ণের পুত্রায় ভোপ দিতে হয় না। তা' যদি দিতে হত, তাহলে দরিদ্র আমাদের কাছে নারায়ণ না হয়ে রাক্ষস হয়ে উঠত; যেমন ইংলণ্ডে dole-এর রূপায় দনী সঞ্চারের কাছে তারা হয়ে উঠেছে।

(৪)

ইকনমিক্স সফরে আমাদের এ অজ্ঞতা, এ উদাসীনতার অনেক কারণ আছে। তার ভিতর একটা স্পষ্ট কারণ এই যে, বহুসাহিত্যে আজ পর্যন্ত ইকনমিক্সের স্থান নেই। বাঙলা যে আমরা ইংরেজীর চাইতে ভাল বুঝি, আর টের সহজে বুঝি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং ইকনমিক্স শব্দের যদি বাঙলা ভাষায় প্রচার হত, তাহলে এ বিষয়ে কোনরূপ মত দেবার অধিকার আমাদের না জ্ঞানোও, ইকনমিক্স-শাস্ত্রীদের মতামত বোঝবার অধিকার আমরা লাভ করতুম। ইংরাজিতে যাকে Science বলে, তার সফরে আমাদের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান কি এই জাতীয় নয়? আজকের দিনে পৃথিবী যে স্বর্ণকে প্রদক্ষিণ করছে, এ সত্য আমরা সকলেই মানি; কিন্তু কি প্রমাণের ফলে এ সত্য আমরা মানতে বাধ্য, তা' কি আমরা সকলেই জানি?

অন্ততঃ ইকনমিক্স দ্বিভিক্ষার ভুয়া Science নয়; তবে ধনের সৃষ্টি-হিস্তি-প্রণয়ের যে কতকগুলি মোটা নিয়ম আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অধ্যাপকরা যদি বাঙালি কথা কইতেন, ত আমরা সাধারণ লোকে ইকনমিক্সের কতকগুলি সাধারণ নিয়মের সঙ্গে পরিচিত থাকতুম। তাঁরা যে তা' করেন না, তার কারণ তাঁরা অধ্যাপনা করেন ইংরেজী ভাষায়। তার থেকে হয়ত তাঁদের ধারণা জন্মেছে যে, ও শাস্ত্র-বাক্য বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে না। কারণ পারিভাষিক শব্দে বাঙলা ভাষা দরিদ্র। কিন্তু পরিভাষা বাদ দিয়েও যে ইকনমিক্স শার বোঝানো যায়, এ জ্ঞান বোধব্য অধ্যাপকদের নেই। আর এ শব্দের পরিভাষা যে নানা নোকে নানা অর্থে বোঝেন, অথবা

(৬)

বোঝেন না, তার বহু প্রমাণ আছে। অন্ততঃ পরিভাষার জুজুকে ভয় করবার কোন প্রয়োজন নেই।

(৫)

বিলেতি অর্শশাও যে বাঙলা ভাষায়, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা লিখি আর পাঠকেন পড়ে, সেই পরিচিত ভাষাতেই পরিষ্কার করে লেখা যায়, আমি সপ্রতি তার প্রমাণ পেরেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ইকনমিক্স শাস্ত্রের শ্রীযুক্ত বোদ্বিল চন্ড সিং গত প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মেলনের ইকনমিক্স-শাখার সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন, সে অভিভাষণের ভাষা ইংরাজী নয় বাঙলা; তাও আবার সাধু বাঙলা নয়, চলিত বাঙলা। উল্ল প্রবন্ধ যে কত সরল ও সহজবোধ্য, তা যাঁর ইচ্ছা তিনি পড়ে দেখতে পারেন।

আর গত মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেন নামক কোনও নতুন লেখক স্বর্ণমান সফরে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমতঃ তিনি যে ভাষায় লিখেছেন, তা' বাঙলা; কারণ প্রবন্ধটো বিনা আয়ালে আয়োজ্য এক নিঃশেষে পড়া যায়।

Gold-Standard ইকনমিক্সের একটি জটিল সমস্যা। এ বিষয় ইকনমিক্সের নানা মূর্খির নানা মত। শুধু তাই নয়, নানা গভর্নমেন্টেরও নানা ব্যবহার। কেউ Gold-Standard আঁকড়ে ধরে আছেন, কেউ বা তা' প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে যাই হোক, Gold-Standard-এর পক্ষে কি বলবার আছে, শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন তা' অতি সহজ ভাষায়, অতি বিশদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পরিভাষার সাহায্য তাঁকে একরকম নিতেই হয় নি। পরিভাষার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তার মহা দোষ হচ্ছে এই যে, অনেক শাস্ত্রী ঐ পরিভাষাকেই শার বলে ভুল করেন। তখন এই শব্দের পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

এখন ইকনমিক্স Conference-এর আলোচনার ফিরে আসা যাক।

এ শব্দের শাস্ত্রীরা বহুকাল পূর্বে আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান অর্ধদলিত শুধু আমাদের কিংবা জোমাদেরই ঘটেনি, তাদেরও ঘটেছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যে দেশ অর্থের অভাবে বিপর্যয় নয়।

ফলে কোন দেশই নিজের চেষ্টায় এ দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবেন না। কারণ প্রতি জাতির বার্ষিকরতা এ দুর্গতির অন্ততম কারণ। সুতরাং সকল জাতি একত্র হয়ে মিলেমিশে পরামর্শ করে, এ বিপদ কাটিয়ে উঠবার উপায় স্থির করতে হবে।

এই কারণেই এই ইকনমিক্স Conference-এর বৈঠক বসেছে। পৃথিবীর এই আর্থিক দুর্দশা প্রদানতঃ গত যুদ্ধের ফল। এ যুদ্ধের চারটি প্রত্যক ফল আছে—(১) Reparation বা ক্ষতিপূরণ, (২) যুদ্ধশুল্ক, (৩) শুদ্ধজিরি যার আমদানি রোধ, (৪) টাকার মূল্যের অস্থিরতা।

এই Conference-য়ে Ramsay Macdonald ও Chamberlain-এর কথাই বুদ্ধিমান লোকের হার কমানো, যুদ্ধশুল্ক থেকে অর্থমর্গ জাতিদের নিরুতি সেওয়া, ও নানা দেশের টাকার একটি বাধ্যবাধা মূল্য স্থির করবার জটাই এ Conference-এর প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন ইতিপূর্বে এ বিষয় গোপনে পরামর্শ করেছিলেন, তখন অম্মান করেছিলেন যে, তাঁরা দুজনে একমত হয়েছেন।

(৭)

এ Conference-য়ে কিন্তু Reparation-এর কথা শুঠনি, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ক্ষতিপূরণের প্রধান দেনদার জার্মানী, ও পাওনাদার ফ্রান্স; আর ইতিপূর্বেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সে দেনা-পাওনা মূলতঃই রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ফ্রান্সের ডিজি বন্ধার আছে, কিন্তু সে ডিজির জারি স্থগিত রাখা হয়েছে।



ভারপর যুদ্ধে ধোঁয়াই ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ইংলণ্ডকে যে টাকা ধার দিয়েছে, সে টাকা সে ছাড়বে না। ইংলও এ ক্ষেত্রে আর্থিক স্বেচ্ছা আদায় দিয়ে তামাদি রাখা করেছে। ঋণ ইংলও এবার সোনার বদলে রূপো দিয়েছে।

এত রূপো ইংলও পেলে কোথেকে?—ভারতবর্ষের কাছ থেকে। ভারত গভর্নমেন্টের তহবিল অনেক রূপো মজুত ছিল, বুটশ গভর্নমেন্ট সেই রূপো কিনে তাই দিয়ে এ কিস্তির আর্থিক টাকা দিয়েছেন।

খ্রীষ্টান নগিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বুটশ গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সমস্ত রূপো কিনে, চড়া দামে আমেরিকায় তা চালান দিয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের এক ক্রোর টাকা লোকান। সরকার মহাশয়ের কথার গভর্নমেন্ট কোনও প্রতিবাদ করেন নি। এর কারণ নাকি এই যে, কোন প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। একটি ইংরাজী সংবাদপত্র এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইংলও লাভবান হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইকনমিক্স শাস্ত্রে গানের অন্তর্ভুক্তি আছে, তাঁরা নাকি এ কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আমাদের নেই বলেই আমাদের মনে ঘট্টা লাগে।—সে যাই হোক, এই যুদ্ধের বাইরের কথা হলেও যে আমাদের ঘরের কথা,—এই লেনদেনই তার প্রমাণ।

(৮)

গত কিস্তির টাকা ইংলওকে সোনার দিতে হয়েছিল। সে সোনাও সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষ। এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের সহায়তা ব্যতীত ইংলও তার কিস্তির টাকা দিতে পারত না। ভারতবর্ষ যে এ ক্ষেত্রে ইংলওকে তার দায় হতে মুক্ত করেছে, অন্ততঃ Keynes, Salter প্রভৃতি ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য ইকনমিক শাস্ত্রীদের মত তাই।

অনেকের বিশ্বাস, কোটি কোটি টাকার সোনা রপ্তানি করা আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

গভর্নমেন্ট বলেন, তা' নয়। এখন এ ক্ষেত্রে কার কথা ঠিক বলা কঠিন। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর বহু জাতি আইনের দ্বারা সোনা রপ্তানি বন্ধ করেছে; ব্যাপারটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, এই বিশ্বাসে। শুধু ভারতবর্ষের সোনা রপ্তানির পথ খোলা। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, অপর জাতির পক্ষে যা ক্ষতিকর, ভারতবর্ষের পক্ষে তা লাভজনক।

সে যাই হোক, এই সোনার বিনিময়ে ভারতবর্ষ কি পেয়েছে?—অবশ্য সোনা নয়, রূপো নয়, তামা ত নয়ই; অতএব ধরে নিতে হবে যে, ভারতবর্ষ সোনার বদলে কাগজ পেয়েছে—যাকে ইংরাজীতে বলে নোট। এ সব বিলেতি নোটের বাজারে কাটতি নেই। অতএব এ সব বিলেতি নোট বহলে স্বর্ণবিক্রেতার দোকান নোট নিয়েছেন। অবশ্য নোটও টাকা; তবে এই কোটি কোটি টাকার নোটের দৌলতে, ভারতবর্ষের টাকার বাজার সস্তা হয়নি। এত নোট বখন বাজারে নেই, তখন গেল কোথায়? স্তবরাং বাইরের কেনা-বেচার কারবার আসলে ঘরেরই লাভ-লোকসানের কথা।

(৯)

এই ইকনমিক Conference-এর ফলে কোন জাতিই যুদ্ধের দায় থেকে অব্যাহতি পায়নি, কোন জাতিরই Tariff-এর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে নি, আর এক দেশের টাকার সঙ্গে অপর দেশের টাকার চির সম্বন্ধও স্থির হয়নি; আর সম্ভবতঃ হবেও না।

Exchange-এর সমস্তা ইকনমিক্সের বিষয় কুটিল সমস্যা। ইউরোপের পলিটিক্যাল সন্থ যে এ সমতাকে সরল করতে পারবেন, এরূপ আশা করা য়া; কারণ পলিটিসিয়ানরাই এ সমতাকে কুটিল করে তুলেছেন।

যে সব জাতি Gold-Standard-কে তাগ করেনি, সে সব জাতি বলছে যে, অন্ততঃ পাউণ্ডের সঙ্গে ডলারের বিয়ে দেওয়া হোক; যেমন আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট

টাকার সঙ্গে পাউণ্ডের বিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এই অবিচ্ছেদ্য বিবাহের ফল প্রকৃষ্টান্তের Gold Standard বজায় রাখা। আমেরিকা যে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেননা, এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে inflation বন্ধ করতে হয়। স্তবরাং এ Conference-য়ে নানা সমস্যার বিচার হবে, কিন্তু কোন বিষয়েই দশে মিলে এক রায় দেবে না। তসত্ত্বেও বলি, এ Conference একবারে নিরর্থক নয়। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, পাটজনকে একত্র করতে পারলেই সকল গোল মিটে যাবে। সে বিশ্বাস যে ভুল, এ Conference-এর বার্ষিকই তা' প্রমাণ করবে। ইকনমিক Nationalism যখন লোকের মনে প্রভুর করছে, তখন এই সব international সন্থ, national মন নিয়ে international বিদ্যে একমত হতে পারবে না। ইকনমিক্সের বিধিনিষেধ সর্বসাধারণ, কিন্তু পলিটিক্যাল বিধিনিষেধ বিশেষ করে জাতিগত।

(১০)

এই সময়েই বিলেতে আর একটি ঐক্য বসেছে, ভারত গভর্নমেন্টের Constitution নতুন করে গড়বার জ্ঞা। এ গড়টো যে কি হবে, তা' White Paper-এই প্রকাশ। এই White Paper-এর কি রস-বদল করা হবে, তারই আশা বিচার চলছে। উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে ও বিপক্ষের মাঝী নেওয়া, উকিলদের বাহাজ শোনা হচ্ছে। রায় কি হবে, দুদিন পরেই জানা যাবে।

খ্রীষ্টান নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলেত থেকে লিখেছেন যে, ও বন্দুকার বিশেষ কোন বদল হবে না। White Paper-এর বিপক্ষে হ'ল দাঁড়িয়েছেন। বিলেতে Churchill-প্রমুখ Conservative-রা, এবং এ দেশে কংগ্রেসওয়ালারা।

আমাদের দেশের খবরের কাগজ পড়ে মনে হয়, Churchill-প্রমুখ Conservative-দের এ বিপক্ষতা শুধু বিপক্ষতার কপট অভিনয়;—আসলে Baldwin ও Churchill একমত।

আমার বিশ্বাস অন্তরূপ। বিলেতে সব দলের পলিটিসিয়ানরা সব বিষয়ে একমত নন।

Baldwin-এর মত যে, তিনি ও তাঁর সহ-মন্ত্রীরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেছেন। Churchill-দলের মতে এই ব্যবস্থাতেই ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থার ঘোর পরিবর্তন হবে; আর সে নতুন অবস্থার নাম ভীষণ দুরবস্থা। কার দুরবস্থা? দেশের লোকের, না ইংরাজের? এঁদের মতে, উভয়েরই।

কিন্তু Conservative সম্মে Churchill-এর দল ভোটে হেরে গেছেন, Baldwin-এর দল জিতেছে। এর থেকে অসুহান করা যায়, Churchill-এর বিপক্ষতার White-Paper-এর দল বিশেষ বিচলিত হবেন না।

(১১)

এই প্রস্তাবিত নব Constitution-এর গোড়ায় গলদ এই যে, সেটি জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভিতর সামাজিক জাতিভেদ আছে, সেই জাতিভেদ এখন পলিটিক্সে ভল প্রমোশান পাবে। আমরা আমাদের সামাজিক জাতিভেদ গুলকণের ভেদপ্রস্থত বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারি;—কিন্তু এই পলিটিক্যাল জাতিভেদ যে গুলকণের বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা বুঝেও আনবার জো নেই।

ভবিষ্যৎ ল্যাট-কাউন্সিলে দেশী রাজারা হবেন এক জাত, মুসলমানরা আর এক জাত, হরিজনরা আর এক জাত, ইংরেজরা আর এক জাত, আর জাতি-হিন্দুরা অর্থাৎ আমরা সব পক্ষম জাত। আর আমরাই হবে সংখ্যা নগণ্য। জাতি-হিন্দুরা যে অধিকাংশই শিক্ষিত, অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর শিক্ষার যদি কোন ফল থাকে ত জাতি-হিন্দুরাই যে পলিটিক্যাল হিসাবে গুণী, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; কিন্তু ল্যাট-দরবারে এ গুণের কোনও মান্য নেই। কার কি ধর্ম, তার উপরই লোকের পলিটিক্যাল কর্তৃত্ব নির্ভর করবে। আমরা যাকে democratic



গভর্নমেন্ট বলে জানি, তা' অবশ্য এ পদ্ধতিতে গড়া নয়।

শ্রীমুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, এ কাঠামোর কোনও বদল হবে না। আর বাঙালার দরবারে আমাদের প্রতিনিধিত্ব কোঠামা হয়ে থাকবে। বাঙালার যে এ অবস্থা হয়, তা' নাকি বাকী ভারতবর্ষেও অভিমত। এর কারণ, বাঙালীরা নাকি একমাত্র বাঙালকেই ভারতবর্ষ বলে গণ্য করে।

(১২)

তারপর White-Paper-এর প্রস্তাবিত Safe-guardগুলি সবই বজায় থাকবে। আমাদের ভারী গভর্নমেন্টের দেশী মন্ত্রীদের হাতে যে সমরবিভাগ ও অর্থবিভাগ তুলে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে যেকোনো সকল রাজনৈতিক দলের কর্তব্যবিক্রি একমত। গভর্নমেন্টমাত্রেরই প্রধান বল হচ্ছে অল্পবল ও অর্থহীন। এ ছুই বল হস্তান্তর করে ইংরেজ সরকার যে সাফ-গোপাল হয়ে এখানে বসে থাকবেন, আশা করি এ আশা কেউ করেন নি।

White Paper-এর প্রধান পুষ্পোদক Baldwin নাহেব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের Fiscal policy দেশী মন্ত্রীদের মতামতধারী হবে না। তিনি বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান Dominions আছে, তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের বর্তমান ও মনাস্তর যতটুকু, সবই এই Fiscal policy নিয়ে। অবশ্য Dominions-এর কান্ডক্রমে এ বিষয়ে স্বাভাব্য লাভ করেছে। তা' যে করেছে তার প্রমাণ, বর্তমান Economic Conference-তে, Canada ইংলণ্ডের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। স্বতরাং ভারতবর্ষকে বর্তমানে এ বিষয়ে স্বাভাব্য দেওয়া অসম্ভব। ধরুন যদি ল্যাট-কন্ট্রিসিলের বড়কর্তারা দেশীলোক হতেন, তাহলে যুগ সম্ভবতঃ দেশ থেকে সোনা রপ্তানি বন্ধ করতেন, আর সপ্তাহের রূপো বিক্রী করতে রাজী হতেন না। ফলে, বুদ্ধদেবের হৃদ দিত ইংলণ্ডকে কি সুবিধেই পড়তে হত। এ যুগের বর্তমান পলিটিকাল

সমস্যা, একটু তলিয়ে দেখা যায় সবই আসলে বর্ণচোরার ইকনমিক সমস্যা।

(১৩)

শ্রীমুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে, বাকী ভারতবর্ষের পলিটিসিয়ানরা বাঙালীর প্রতি অস্বস্থ নন। পূর্বে পূর্ণ থার Round Table Conference-য়ে গিয়েছিলেন, তাদের মুখে এই একই কথা শুনেছি। অপর প্রশ্নের এই বাঙালী-বিরোধের কারণ কি?

এর কারণ, বাঙালী বহুকাল পূর্বে স্বাভাব্য অবলম্বন করেছে, এবং বাঙালীরা নিজদের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। অল্প প্রশ্নের পলিটিসিয়ানদের মতে, কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলে বাঙালীরা এতদূর দোষাক্রমে হয়ে উঠেছিল। কলিকাতা রাজধানী হওয়ায় বাঙালী মনের কি বিকার ঘটেছিল, লেখা আছে এখন থাক।

কিন্তু যে বাঙালীরা সমগ্র ভারতবর্ষে বুক ফুলিয়ে বেড়াত, তারা যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

গত শতাব্দীতে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশে যে বাঙালী অধ্যাপক ও বাঙালী উকিলই প্রভুর করত, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। এবং এই প্রকৃতি বাঙালী তার বিজ্ঞা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

আমরা যেসব বাঙালীকে বাঙালার গৌরব মনে করি, তারা যে সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গড়া লোক, তা' অবশ্য নয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ধরেন নি। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপায় গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিলেন, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। জাতি হিসেবে... বাঙালীর প্রাধাত্য তার শিক্ষার উপরেই নির্ভর করত।

(১৪)

বোধহয় এই কারণেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা জাতের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়ে উঠছে। এক হিসেবে

এ অতি সুখের কথা। এত বড় বিরাট দেশের উচ্চ শিক্ষা ছাট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে উঠতে পারে না। ইংরাঞ্জীতে একটি কথা আছে—the more, the merrier। স্বতরাং এ ব্যাপারটা বিশেষ আনন্দের কারণ হত, যদি প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে একটি বিশ্বম অর্থসমস্যা না থাকত।

কারণ গুলেই দেখতে পাই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় টাকা আর অভাবে নাকে কাঁচছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নেই, কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিকার স্কুলি রাজারাজ্যের দরবারে নিতা উপস্থিত করা হচ্ছে। এলাহাবাদ University তার খরচ কুলোতে পারে না; এবং আমার বিশ্বাস—অল্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সমবল।

বহুকাল পূর্বে জৈনক ইংরাজ educationist-এর বইয়ে পড়ি যে, প্রতি জাতি তার শিক্ষার coat according to cloth কাটতে বাধ্য। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর বা' গুণ থাক আর না থাক, এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ায় আছে জাতীয় ইকনমিক অবস্থা। অর্থাৎ আমাদের কাপড় কম, কিন্তু আমাদের মস্ত মস্ত coat কাটতে জরী হয়েছি। আমরা একবার ভেবেই দেখি যে, আমাদের জাতির পক্ষে এতটা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা কি দেশভক্ত ভোক্তা ব্রাহ্মণ হয়ে তুলতে চাই? এত ব্রাহ্মণের লোক যোগ্যে কে! আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অগাধ অবসর আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার যেমন অভাব নেই, যেমন আছে লোক-শিক্ষার। উচ্চ শিক্ষারও অবশ্য প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বহুলোকেই গুল নয়—সরস্বতী লোকেই গুল। কারণ উচ্চ শিক্ষার অর্থ 'মাই হোক তা' যে লোক-শিক্ষা নয়, তা' বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা Compulsory নয়, Freeও নয়।

(১৫)

উচ্চশিক্ষা যে বহু অর্থব্যয় করে অর্জন করতে হয়, সে বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত মাসের প্রবাসীতে তিনি এ বিষয়ে

যে ন্যতিক্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, সে প্রবন্ধ আমি সকলকে পাঠ করতে অনুরোধ করি।

আমি পূর্বে বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা অর্থের অভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন। অপর পক্ষে, এ শিক্ষা লাভ করতে বিভাগীদের অর্থায় আমাদের মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের কি বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, তার হিসেব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবে প্রতি ছাত্রকে মাসে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত শিক্ষালভের দণ্ড দিতে হয়। এ কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। পাঞ্জাবের প্রতি কলেজের রাঙ্কমুদার কলেজ? আমাদের দ্বারা ছিল যে, বাংলার কুলনার পাঞ্জাব দরিদ্র দেশ। কলেজের ছেলেদের এত টাকা লাগে কিসে?—শুনতে পাই, বিলেতি পোষাকে। বিলেতি শিক্ষা চর্চার অর্থ কি বিলেতি পোষাকের চর্চা!

বাঙালার অবশ্য বিজ্ঞাশিক্ষার দাম এর চাইতে ঢের কম। ছেলেদের মাসখরচা বোধহয় গড়পড়তা মাসিক পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এই পঞ্চাশ টাকাই আমরা মস্ত মস্ত coat কাটতে জরী হয়েছি। আমরা একবার ভেবেই দেখি যে, আমাদের জাতির পক্ষে এতটা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা কি দেশভক্ত ভোক্তা ব্রাহ্মণ হয়ে তুলতে চাই? এত ব্রাহ্মণের লোক যোগ্যে কে! আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অগাধ অবসর আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার যেমন অভাব নেই, যেমন আছে লোক-শিক্ষার। উচ্চ শিক্ষারও অবশ্য প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বহুলোকেই গুল নয়—সরস্বতী লোকেই গুল। কারণ উচ্চ শিক্ষার অর্থ 'মাই হোক তা' যে লোক-শিক্ষা নয়, তা' বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা Compulsory নয়, Freeও নয়।

(১৬)

বাঁরা বলেন যে, “অর্থনৈতিক ভাবন নিত্যাং”, তাদেরও জিজ্ঞাসা করি যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করে কি বাঙালী জাতি যথার্থ শিক্ষিত হচ্ছে? রায় মহাশয় বলেন যে, না। তার কথা তার মুখেই শোনা যাক—

“আমার এই বিজ্ঞান-মন্ডিরে যে-সমস্ত ছাত্র B. Sc. Honours লইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের সামান্য সামান্য বিষয়ের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি



ইহা বাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিক শিক্ষা যে এর থেকে দেখা যায় যে, কি-যে কি-বাইরে, কিরকম মেকী ও খুঁটা, তাহা উপরিগিহিত দৃষ্টান্তদ্বারা সর্বত্রই এ যুগের প্রধান সমতা হচ্ছে বর্তমান দৃষ্টির প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশজনের ভিতর নয়জন সমতা। আর বিদ্যান বুদ্ধিমান লোকদের চিত্ত যোগ্য হাঙ্গামাদি কোথায় বসিতে অক্ষম, এবং "পাঁখি" নূতন মালা রচিত মধুচক্র" কদাচিৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের বাহিরে যে কিছু শিখিতে হয়, ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থিগণ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। কোন রকমে নোট মুখস্থ করিয়া "তকমা" পাইলেই হইল। বিজ্ঞানিকা আবার কি?" (উদয়ন, আষাঢ়, ১০৪০)

অখচ Science College-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ণ কাঁড়ি।

ঐপ্রমথ চৌধুরী

### প্রবাসে বাদ্গলী ছাত্র

আমরা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম যে, কালীঘাট কোন কারখানায় Electrical Engineering বিশেষতঃ নিবাসী শ্রমহাদের বহু ও বেলতলা নিবাসী শ্রীকেশবচন্দ্র Bulbs তৈয়ারী শিক্ষা করিবেন, এবং আমাদের



শ্রীনিকহার দাস



শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ

ঘোষ নামক ছইজন বাঙ্গালী যুবক ইটালীতে Electrical Engineering শিখিতে গিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে, ইহার দুইজনে প্রথমতঃ স্থানীয় এক University-তে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবেন এবং পরে ঐ দেশের

দেশে স্বদেশী Bulb তৈয়ারী করিবার জন্ত এক বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিবেন। আমরা উক্ত যুবকদ্বয়ের সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি।

বিষয়	বিশদ-সূচী	পৃষ্ঠা
১। দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন (কবিতা)—শ্রীতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ	...	৪৮৫
২। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানিকা—আচার্য্য শ্রীপ্রমুদচন্দ্র রায়	...	৪৮৭
৩। স্বর্ণত স্বরী জগদানন্দের উদ্দেশে (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ	...	৪৯০
৪। শিশু-সাহিত্য—শ্রীশান্তা দেবী, বি-এ	...	৪৯১
৫। আবরণ (গল্প)—শ্রীরামগঙ্গা মুখোপাধ্যায়	...	৪৯৪
৬। জড়, জীব ও ধাতুপুস্তক—ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি	...	৫০১
৭। অক্ষয়দায় (উপন্যাস)—শ্রীশৈলজানক মুখোপাধ্যায়	...	৫০৭
৮। বঙ্গ-পরিচয়—বাবুলার তিনটি প্রাচীন মন্দির—শ্রীবল্লাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এসি	...	৫২৭
৯। তিথ্যাক পঞ্চক (কবিতা)—কলিঞ্জল	...	৫৩২
১০। মারাতী ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত হইতে শব্দ-গ্রহণ—শ্রীকালীনারায়ণ দীক্ষিত, এম-এ	...	৫৩৩
১১। কদমলতা (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া	...	৫৩৪
১২। সর্বাধী (উপন্যাস)—শ্রীমতী অম্বরুণা দেবী	...	৫৩৫
১৩। "চোক গেল" (কবিতা)—শ্রীভুবনধর রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল	...	৫৪১
১৪। জলদার গল্প (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	...	৫৪২
১৫। প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল	...	৫৪২
১৬। কথা-সাহিত্যের কথা—ডক্টর শ্রীদেবপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, এম-এ, ডি-লিট	...	৫৪৩
১৭। ক্ষমতার জয় (গল্প)—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া	...	৫৪৭
১৮। নূতন বই	...	৫৬০
১৯। আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা	...	৫৬৬
২০। বাঙালীর বিলোপ—ডক্টর শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি	...	৫৬৭
২১। শ্রাবণ-সন্ধ্যায়—শ্রীরামেন্দ্র দত্ত	...	৫৮৫
২২। বিজ্ঞান	...	৫৮৬
২৩। চক্রনেমি (গল্প)—শ্রীসতীপতি বিজ্ঞানচন্দ্র	...	৫৯০
২৪। গীত ও রূপ—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকর্ষ	...	৬০০
২৫। মাদুর্করী	...	৬০২
২৬। ঘরে-বাইরে—ঐপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এইচ-ল	...	৬০৩

### জি-বর্ণ চিত্র—

(১) সাধী —শ্রীহাসিরাশি দেবী

(২) কলিকাতার নৈশ শোভা—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

### ঘি-বর্ণ চিত্র—

(১) দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

### একবর্ণ চিত্র—

(১) এইবার মেসে দাও—! (বাস্ত চিত্র)

(২) এঃ! .....neck to neck! .....(ঐ)

(৩) জগদীশপুরের মন্দির ছইটা

(৪) শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির

(৫) শ্রীকেশবেশ্বরের বামদিকে পুরোহিত ও উভয়দিকে সেবাইত

(৬) শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দিরের পায়ে উৎকীর্ণ লিপি

(৭) ভবানীকেশ্বরের মন্দির

(৮) .....আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক.....

(৯) তুমি কে! এ চোখ তুমি কোথায় গেলে?

(১০) রূপকথা ব'লে রাজপুত্রের উত্তরীরে গায়ে পরাজিল জিরি কাঁছাল

(১১) দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহনের শব্দাঙ্গমন-পুস্ত



ভাল রেডিও কিনিতে হইলে  
অত্র দোকানে যাইবার আগে  
একবার আমাদের দোকানে আসুন।



গ্রামোফোন ও বাতায়নের  
ব্যবসারে আমাদের ৩৫  
বৎসরের সুনাম, রেডিও  
বিতরণেও অক্ষর আছে।  
প্রত্যেকটা রেডিও-সেট  
নিজ কারখানায় অভিজ্ঞ  
ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্রস্তুত।  
দামও কম।  
আজই তালিকা চাহিয়া  
পাঠান।

এন. বি. সেন এণ্ড. ব্রাদার্স

ফোন — ১১, চৌরঙ্গী

কলিকাতা, ৩০৪৫ (লিওনেস্ট্রের মোড়); কলিকাতা

Printing that pleases you !

" We specialise in  
ARTISTIC Printing

AT " Nothing is too small  
or too big for us

YOUR " Let us show you  
SERVICE some specimens of  
our work

" Ring up—  
Calcutta, 3601

THE CALCUTTA TRADING CO.,  
79-9, Lower Circular Road  
CALCUTTA

সর্বপ্রকার বং  
বানিস এনামেল  
ও ভুলি ইত্যাদি

জি.সি.লোহা  
১নং ধন্যতলা স্ট্রিট

PHONE: CAL 2380 GRAMS. GICILAW.

শৈলজানন্দের

নন্দিনী

বাংলাদেশের কথা ও বঙ্গীষনের অপূরণ কাহিনী!  
একবার পড়িলে সে অশ্রু-করণ স্মৃতি আপনায় মন হইতে  
চিরজীবনেও মুচিত্ব না।

দাম মাত্র দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০০/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, কিম্বা

প্রকাশক — ৬২, গ্রামসুন্দর স্ট্রিট, কলিকাতা

সুকবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
— কাল্য সঙ্গহান —

শ ত ন ব্রী

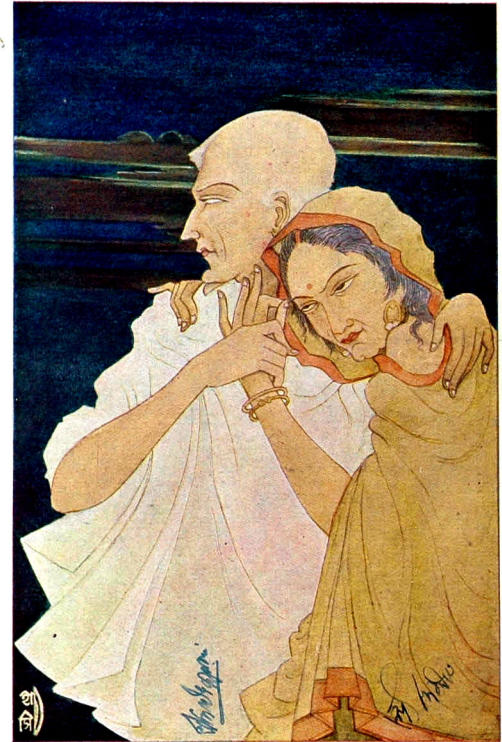
মাময়িক পত্র ও কাব্যরসিকগণের দ্বারা  
বহু প্রশংসিত।

মূল্য — ৩।০ মাড়ে তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান — গ্রন্থকার,

১০, চৌধুরী লেন, গ্রামবাজার, ও  
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

উদয়ন — ভাদ্র, ১৩৪০



মাণী

[শিল্পী — শিহাঙ্গিনী দেবীর দৌলত]



কলিকাতা লিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

উদয়ন - ভাদ্র, ১৩৪০



দেশপ্রিয় বর্তীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

জন্ম — ২২এ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ খুঁটাঙ্গ

মৃত্যু — ২২এ জুলাই, ১৯৩৩ খুঁটাঙ্গ



কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভাদ্র

১৩৪০



প্রথম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

## দেশপ্রিয় স্বতীন্দ্রমোহন

শ্রীস্বতীন্দ্রমোহন বাগচী

বিন্দুমাঝে সিঁদু মিলে,

কুঁদমাঝে রুদ্র দেয় সাড়া।

তোমার খণ্ডিত রূপ

দিল সেই সত্যের ইসারা

আজি বহুদিন পরে

আবার তন্দ্রিত বঙ্গমাঝে;

তাই আজি কোটি কণ্ঠে

তোমার নামের শব্দ বাজে,—

দিব্ হ'তে দিগন্তরে

পদ্মা হ'তে স্রুদ্র জাহ্নবী;

গ্রহণের দিনে যথা

হেরি' নভে রাহুগ্রস্ত রবি।



একাধারে ভীমকান্ত —

প্রদীপ্ত-উদার রূপজ্যোতি ।

ত্যাগের মন্দিরে নিত্য

সাধিয়াছ শক্তির আরতি ।

দেশের লালিত্ব মর্মে

ছিল তব অন্তরের বাসা,

দেশের বাঞ্ছিত ধর্মে

ছিল তব আর্তি ভালবাসা,—

মানেনা বা' কোনো বিষ

সবাসাটী অর্জুনসমান,

স্বর্গের সীমানা ভেদি'

করে যে-বা বীর্যের সন্ধান ।

অজ্বিতে চিন্তের মুক্তি

মৃত্যুরে করনি ভূমি ভয়,

নীলকণ্ঠ সাজি' তাই

আজিকে হয়েছ মৃত্যুঞ্জয় !

কি গান গাহিবে কবি,

ওগো বন্ধু, ওগো দেশপ্রিয়,

তোমার অভয়মস্ত্রে

লক্ষ কর্ণে দীক্ষা আজি দিও ।

কণ্ঠে মোর নাহি স্বর,

মুদ্র বাণী শোকে হ্রস্বকবাক্য;—

কত কথা আসে মনে —

কি হবে তা' ? মনেই সে থাকি ।

## বাবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইতি-পূর্বে “মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন” শীর্ষক দুইটা প্রবন্ধ নিয়াছি, ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু, আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপাতের উদ্ভবতা আমাদেরকে বাবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কতটা পিছাইয়া দিতেছে, তাহার আলোচনা করা হইতেছে এবং বাবসাটী হইয়াও যে আশ্চর্য্যের মধ্যে লেখাপড়া শেখা যায়, তাহাও দেখান যাইতেছে। মূল প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের মধ্যে সন্দেহ আছে; পরে তাহা দেখান হইবে।

যদি বিদ্যাশিক্ষার জন্ত প্রকৃত স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে অতি শৈশবাবস্থা হইতে বাবসায়ে শিক্ষানবিশী করিলেও বিদ্যার্জনের কোন বাধাঘাত ঘটে না। মনে করুন, একটা ছাত্রকে মাইনর বা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়াইয়া কোন বড় দোকানদার অথবা একজন বাবসা-দারের নিকট শিক্ষানবিশ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলেই যে সেই সময় হইতে তাহার বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, ইহা মনে করা ভুল। আমরা আশ্চর্য্যিত “সময়ের সম্ভাবনার ও অপব্যবহার” শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের সবিত্তার আলোচনা করিয়াছি। মনে করুন, আপনার ছেলে ১০১৪ বৎসর বয়সে কোন একটা বড় দোকানে প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ বেলা ১০টা হইতে ৫টা বা ৬টা পর্য্যন্ত তাহাকে হাঙ্গির থাকিতে হয়। আমি এই বুদ্ধবয়সেও প্রত্যয়ে প্রায় ৫টার পূর্বে শয্যাভাগ করি, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অনুন আধ-ঘণ্টা কাল সবিশেষ বেড়াইয়া থাকি; পরে সামান্য কিছু প্রাতঃভোজনের পর ৬টা-৬টা১০টার সময় হইতে অধ্যয়নে নিরত হই এবং ৮টা১০টার মধ্যেই যাহা কিছু গুরুতর বিষয়ের অধ্যয়ন, তাহা শেষ করি। ধরুন, ছেলের বয়স ১৪ বৎসর; স্বভাব্য তাহার অনুন ৮ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। সে যদি রাতি ৯টার শয়ন করে এবং ৫টার

সময় শয্যাভাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। সে ছেলে প্রত্যহ অন্ততঃ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পড়িতে পারে। যদি এই হিসাবে আশ্চর্য্যের পড়াশুনা করে, এবং কোন বিষয় দুজন্মে হইলে অপরের নিকট হইতে সাহায্য লয়, তাহা হইলে সে বৎসরের পর বৎসর এই প্রকারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে আপনার ছেলে একজনের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপকৃত হইল, এবং আপনি তাহাকে একখানি ছোট দোকান করিয়া দিলেন। সে দরকার হইলে ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোকানে রহিল। প্রায়ই দেখা যায় যে, বিপ্রহর হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত থরিকাখের সমাগম খুবই কম হয়। যদি বাজাতে সেরূপ পড়ার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে সে এই তিনঘণ্টা কাল বেশ পড়াশুনা করিয়া সময়ের সম্ভাবনার করিতে পারে। আসল কথা এই যে, বাবসায়ে চুকিলে যে লেখাপড়ার পথ রুদ্ধ হয়, ইহা অত্যন্ত ভুল ব্যাঘাৎ।

আমি অনেক স্থলে এন্ড্রু কারনেগির কথা বলিয়া থাকি। ব্যাংকালে তাঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের ও প্রতিভুল অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি সমস্ত দিনের গুরুতর পঠিত্রয়ের পর রাত্রিতে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সেকুপ্পারদের একখানি নাটকের অভিনয় দেখেন, এবং ইহা তাঁহার এত ক্ষুদ্রগ্রাহী হইয়াছিল যে, তিনি এই সময় হইতে মহাকবির নাট্যকাব্যী পড়িবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহাধিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার মত সঞ্চয় তাঁহার ছিল না। এমন সময় তিনি শুনিলেন যে, কোন সঞ্চয় প্রত্নিবণী তাঁহার পাঠাগারের পুস্তক সন্ধানার্থগকে



পড়িতে নিতে ইচ্ছুক। কারনেদী এই পুস্তকালয় হইতে সেকম্পীয়ারের নাটকালী সংগ্রহ করিয়া কেবল যে কর্তব্য করিলেন, তাহা নহে,—মজ্জাগত করিলেন। তাঁহার আশ্চর্যিতে দেখা যায় যে, তিনি প্রায়ই এই মহাচরিত্রের পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিণামে তিনি সাহিত্যিক হিসাবেও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি কেবল মার্কিন দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান লোককারখানার মালিক ও ধনকুবের বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন।

এইবার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর আশ্চর্যিত হইতে কিছু বলিব। ইহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চর্কির বাতি তৈয়ারী করিয়া কোন বকমে দিন গুজরান করিতেন। বেঞ্জামিনও বাল্যকালে তাঁহাকে এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। কিন্তু অবসর সময়ে আশ্চর্যের পড়াশুনা করিতে কখনও জট করিতেন না। পুস্তক কিনিবার সক্ষম ছিল না। ছই-একজন পুস্তক-বিক্রেতার সহিত ভাব করিয়া সম্ভার পর তাহাদের নিকট হইতে এক একখানি পুস্তক, পরদিন নোবান গুলিবার পূর্বেই প্রতাপিত হইবে এই সন্দেহ, ধার করিয়া আনিতেন। কাজেই তাঁহাকে বীরা জাগরণ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হইত। হিনী এখানে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, পরিণামে নিজে সুদায় হাপান করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বিখ্যাতগণের মোহ হইতে যদি কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলেও এই ভদ্মমা উপার্জন করিয়াও যথেষ্ট সময় থাকে। সে সময়টা যেকোন এক ব্যবসারে শিক্ষানবিশী করিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী-বিভাগে প্রায় ৪৫ মাস, কলেজে ৬ মাস, এবং পোট গ্রাডুয়েট ক্লাসে প্রায় ৭ মাস ছুটি থাকে। আমাদের মাস্ট্রিক পরীক্ষার্থীদের ১৫ই মার্চের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায় এবং আবার ১৫ই জুলাই-এর পূর্বে ক্লাস

খোলা হয় না। এই মহামালা সময় ছাত্রগণ দিবানিদ্রা, আড্ডা, খোন্স গল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে বুখাই নষ্ট করে। এই সম্পর্কে অত্যন্ত সাময়িক পত্রিকায়, ইহার সুবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাহারা জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যথা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড, ইটালীর সর্বমুখ্য কর্ত্তা মুসোলিনি, জার্মানীর ভাষাবিধাতা হিটলার ও সোভিয়েট রাশিয়ার ষ্টালিন প্রভৃতি অতি বীন অবস্থা হইতে কুসি-মজুরের কাজ করিয়া ও আর্থস্টেয়ার অধ্যয়ন করিয়া এই সকল উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। ক্রিয়ন কলেজও ইহাদের কাহারও বিখ্যাতগণের প্রবেশ করিবার স্বেযোগ হয় নাই।

আমাদের দেশেও এইরূপ যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতের অর্থনীতি, Exchange, Currency ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাহারা মাহুথ বলিয়া গণ্য তাহাদের মধ্যে শ্রীমন্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা, বাগদাচী হীরাচাঁদ, নারায়ণ দাস কল্যাণজীয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কেহই যে বিখ্যাতগণের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাহা আমার জানা নাই। অথচ ইহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিভা-বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তেমনই অর্থনীতির জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেও বিশেষ পারদর্শী। বাঙ্গলা দেশের মধ্যেও শ্রীমন্ত নলিনীরাওঁর সরকার, বিনি সমগ্র ভারতের ফেডারেটেড খোর অব কমন্স-এর সভাপতিত্ব করিতেছেন, তিনিও বিখ্যাতগণের প্রবেশ করেন নাই। অথচ তিনি অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বাবজী বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের সুখপাত্রব্রহ্মণ্য। গভর্নমেন্ট হইতে যখনই Tariff-জ্ঞত, Industry-প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়ক যে সব Commission নিযুক্ত হয়, তখন ইহাদেরই মধ্যে কেহ না কেহ নিৰ্পাতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পুঁথিগত পণ্ডিত অধ্যাপকের বড় একটা ডাক পড়ে না।

এই সব জ্ঞান উদাহরণ বিবার উদ্দেশ্য এই যে,

ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই যে 'আজম নিরেট' মূৰ্হ হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভুল ধারণ। বাহার শিবিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার পথ সদাই প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ করার মোহ এত অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে যে, জিজ্ঞাসিত করাই যেন জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহা হওঁতেই হইলে বোধহয় শতকরা ৯৫ জনও আর পুস্তকের ধার ধারেন না।

বাস্তবায়ী যুবকগণ কেন ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরাযুখ তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। প্রথমত, মা-বাপের উৎসাহে বিখ্যাতগণের ছাত্রধারী হওয়া চাই, তখন তাহার জীবনের ২০-২৫ বৎসর কাটা গিয়াছে, নূন কিছু শিবিবার আর উৎসাহ বা আগ্রহ নাই এবং পুঁথিগত বিজ্ঞান অভিমানে সে বিভোরা। আমি অনেকগুলি কম-কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সন্নিহিত। যদি কোন গ্রাডুয়েটকে কোন বিভাগে লওয়া যায় এবং তাহাকে বলা হয় যে, শিক্ষানবিশীকালে কিছুদিন শিক্ষা ভাতা লইয়া ইংলণ্ড ও মহিচ্ছতা সহকারে কার্য শিক্ষা কর এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিলে নিঁজির সোপানের জায় তোমাকে ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ৫-৭ দিন তিনি এই প্রকার সুখিয়া ফিরিয়া যান যে, একাজ তো আমার শেখা হইয়া গিয়াছে; এইবার নূতন কোন কাজ নিন, অথবা যে-বিভাগে আমি যোগাড় করিয়াছি, সেই বিভাগে মোটা বেতনে একটি চাকরী করিয়া দিন। বলা বাহুল্য যে, এই বিভাগে সম্যকভাবে কাজ শিখিতে হইলে তাহার অন্ততঃ ৪৫ বৎসর শিক্ষানবিশী করা আবশ্যিক। শুধু আমেরিকা ইংলণ্ড কেন, এদেশেও অনেকে একটি মশলায় দোকানে বাহুদ্বারা হইয়া বা সামান্য কোন কার্যে নিযুক্ত হইয়া পরে সেই ব্যবসারে অগ্নিদীপার হইয়াছেন বা অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই ব্যবসা স্বাধীনভাবে অলম্বন করিয়া প্রকৃত ধনোপার্জন করিয়াছেন। পরলোক-গত ভূপেন্দ্রনাথ বহু মশায় India Council-এ মেম্বর ছিলেন; একদিন তিনি

তাঁহার একজন সহযোগীকে (colleague) কোন

বাস্তবায়ী যুবককে Banking শিবিবার জন্য apprentice লইতে অনুরোধ করেন। India Council-এ অর্থনীতিজ্ঞ, বিশেষতঃ ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট, ছই একজন মেম্বর সন্দেহই থাকেন। এই যুবকটার সহিত কলিকাতার পর তিনি ভূপেনবাবুকে বলিলেন, বাহারা তাহার কি? যুবকটা জাঁকাল রকম উপাধিধারী এবং তার বয়সও ২১-২২ বৎসর। এরূপে আমাদের দেশে apprentice লওয়ার প্রথা নাই। আমাদের এখানে School final Certificate লইয়া ১০-১৫ বা বড় বেশী ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশার্থী কোন Bank-এ চুক্তিয়া দরকার মত বর দিও দেয়, পিওন হইয়া চিঠিপত্র বিলি করে এবং অবসর মত এক-একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট বসিয়া কাজ শিখিয়া থাকে; এই প্রকারে সে পরিষেবে উপযুক্ত হইলে ব্যাংকের এক বিভাগে অন্য বেতনে চুক্তিয়া ক্রমেদ্বারা লাভ করে, এবং ১৪-১৫ বছর পরে সেই বিভাগের কর্ত্তা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও এই কারণে বাহারা বংশোদ্ভূত ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন, যথা সাহা, ভিলি, গদ্বানিক, কপালি ইত্যাদি—তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত-সম্পত্তি এই প্রকার ৮-১০-১২ বছর বয়স হইতেই আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব ব্যবসারে অভিজ্ঞতা লাভ করে, আর মাড়োয়ারী বা ভাটসীয়াদের ত কথাই নাই।

কলেজ-শিক্ষিত যুবক কেন এত অপদার্থ হয়— তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। ইহাদের প্রথম হইতে লগা-চঙকা নম্বর দেখা যায়। অনেক সময় মৈতুক যবাসম্পর্ক লইয়া, কখনও-বা শক্তির ঘাড় ভাসিয়া, টাকা সংগ্রহ করে। ইহাদের ব্যবসা করা মানে, সহরের সর কাষায় আসে একটি আঙ্গি খোলা—সেখানে আবার চেয়ার-টেবিল সাজান চাই—বৈজ্ঞানিক পাণা ও বাতি ত বটেই, আবার সময় সময় মোটর পাড়িও থাকে। কিন্তু তিনি যে গোড়ায় গলদ করেন, তাহা তাঁহার মাথার প্রবেশ করে না। শুধু যুবকদিগকে সোঁ দিলে কি হইবে? তাহাদের অভিব্যক্তিগণও এবিধের সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বাহ



আড়ম্বরকে ইহার বাবদার অল্প বলিয়া মনে নিকট সেই জিনিষ বেচিত হয়, তাহার কোন খোঁজ করেন। শ্রীমানদের কোন অভিজ্ঞতা নাই-ই; স্ববরই রাখেন না; স্বতরাং, ব্যবসাক্ষেত্রে ইহার এবং পূর্বে বর্ণিত শিক্ষানবিশীর অভাবে কোথায় কতকগুলি লোকের ক্রীড়ার পুঞ্জি হইয়া পড়িয়া। \*  
কোন জিনিষ কি দরে কিনিতে হয় এবং কাহার

\* শ্রীমান্ অরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনূদিত

## স্বর্গত সুখী জগদানন্দের উদ্দেশে

### শ্রীকালিদাস নান্দ

দিলে আনন্দ বাঙালী জাতিরে জগতের কথা বলি,  
তাই বুঝি তব জগদানন্দ নাম;  
ছিলে সৃষ্টির গুঢ় রহস্য খুঁজিতে কোতুহলী,  
বিশ্ব তোমার ছিল রহস্যধাম।  
জটিল তথা নীরস সত্য তোমার লেখনী চুমি'  
ধরিয়াছে সব রসসাহিত্য-রূপ,  
শুধু আশ্রমগুরু নও, দেশে লোকগুরু ছিলে তুমি,  
বাণী-মন্দিরে তুমিই ছেলেছ দুপ।  
ক্ষুদ্র কীটের জীবনধর্ম খুঁজিছ অন্ধরূপে,  
ক্ষুদ্র ফুলের প্রাণের মর্মখানি,  
স্রষ্টা কোথায় বনের আড়ালে রচিছেন চুপে চুপে  
উঁকি দিয়ে তুমি তাহাও এসেছ জানি।  
নব তমসার আশ্রমে দিলে মধুক-তরুর ছায়  
রসের সঙ্গে সত্যের পরিণয়,  
করে বিজ্ঞান অর্থা প্রদান রসলক্ষ্মীর পায়,  
তোমার জীবনে পাই তার পরিচয়।  
প্রকৃতি-পুরীর কত যবনিকা ভেদিয়াছ অহরহ,  
তোমার জীবনে আজি যবনিকা-পাত,  
সকল তারকা গ্রহের বার্তা শুনায়ে, হে দূত, কহ  
কোন গ্রহে গেলে পাব তব সাক্ষাৎ? \*

\* স্বর্গস্থ সাহিত্য-সমসের দ্বারা অনুজ্ঞিত পোক-সত্তার পট

## শিশু-সাহিত্য

### শ্রীশান্ত দেবী

শৈশবে নানারকম বাংলা বই পড়িয়াছি। কোনটা কোন ভাল লাগিয়াছে এবং তাহার ভিতর এক একটি কেনে ভিন্নদিনের মত মনে আঁকা হইয়া গিয়াছে, তাহা তখন বুঝি নাই, এখন ভাবিয়া দেখিলে অনেকটা বৃষ্টিতে পায়। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে অতীতকে অতীতের চোখে দেখিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। স্বতরাং কেবলমাত্র নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের বিচার-শক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া শিশু-সাহিত্যের মাল-মশলা ভৈরবী করা যায় না। আমার অভিজ্ঞতাকে নূতন ও জীবন্ত করিয়া নূতন যুগের জীবন্ত শিশুর ভিতর দেখিতে হইবে। সে দেখা কেবলমাত্র চোখের দেখা নয়, শিশুর সহিত একাত্ম হইয়া তাহার খেলা, তাহার পড়া, তাহার কল্পনা, তাহার সঙ্গ-কল্পিত সাধী হইয়া তাহার মনোলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, তবে শিশুর প্রয়োজন, শিশুর আনন্দ-উৎস, এবং শিশুর জ্ঞান ও কল্পনা বিকাশের পথ আমরা বুঝিয়া পাইব। কিন্তু চোখের বিষয়, মাতা ও শিক্ষক, বাঁহারা শিশুকে এমন করিয়া দেখেন, তাঁহারা শিশু-সাহিত্য রচনা করেন কত; আবার বাঁহারা শিশু-সাহিত্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন, তাঁহারা শিশুর সহিত যোগ রাখেন না অধিকাংশ স্থলেই। তাহার ফলে অধিকাংশ শিশু-সাহিত্য, শিশুরও কাজে লাগে না, সাহিত্যেরও কাজে লাগে না।  
প্রধানতঃ, শিশু-সাহিত্যকে দুইটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আনন্দ-বিতরণ অর্থাৎ মনের উৎসব সৃষ্টির জন্ত, দ্বিতীয় জ্ঞান-বিতরণ অর্থাৎ চিন্তার প্রসারতা বৃদ্ধির জন্ত। কিন্তু কেবলমাত্র এই দুইটি কথা মনে রাখিয়াই অনেকে কাজে অগ্রসর হন। তাঁহারা কাহাকে আনন্দ এবং জ্ঞান দিতে আদিরাছেন, তাহা ভুলিয়া যান। শৈশব কালের

সীমা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার রূপ বিচিত্র। ভোরের আকাশের রং যেমন কখন কখন নূতন রূপ ধারণ করে, শিশুর মনও তেমনি বর্ষে বর্ষে নূতন আলোয় রঙীন হইয়া উঠে। শিশুদের বর্ণ-পরিচয়ের দিন হইতে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যদি একই মনোভাব লইয়া আমরা তাহাদের চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানদান করিতে বসি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যথা যায়। যে শিশুর বয়স যত কম, তাহার জগতের পরিধিও তত ছোট। সচরাচর দেখা যায়, শিশুরা সাত-আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও বস্তু ছাড়া আর কিছুতেই বিশেষ রস পায় না। সেইজন্য চিত্তবিনোদন গল্প তাঁহারা আনন্দ পায় না। রামায়ণের গল্পের রাম-সীতাকে যদি দেখিতেই না পাওয়া গেল, তবে অচেনা অজানা লোকের গল্প শুনিয়া লাভ কি? এই যে চিত্র, ইহা শুধু তুলির চিত্র হইলে হইবে না, গলাটও হইবে বাক্য দিয়া আঁকা ছবিই হইবে। তিন বৎসরের শিশুকে বদন—“অসোধ্যায় দশরথ নামে এক মত রাজা ছিলেন।” তাহার কিছুই আনন্দ হইবে না, যদি-না আপনি রাজার সোনার মুহূর্ত, মুক্তার মালা, হীরার হুল, জরির পোষাক, চোখের স্ফূর্ত্যের আগালোড়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা প্রকাণ্ড রাজা ও অসংখ্য প্রহা বসিলে ছয়-সাত বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত সহজে বুঝিবে না এবং বুঝিলেও তাহার কল্পনা খুব-কিছু খোরাক পাইবে না। চার বৎসরের শিশু হয়ত শুনিয়া খুঁচী হইবে যে, দশরথের দশখানা গাভী, দুইখানা বাড়ী, পচিশ জন চাকর ইত্যাদি ছিল। এইভাবে রাজ-প্রহা তাহাকে বুঝিতে হইবে। না হইলে, ছয় বৎসরের বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশুও স্বতরাষ্ট্র রাজার একশত ছেলে ছিল শুনিয়া প্রশ্ন করে—“এত ছেলেকে বাইতে দিত কিসে করিয়া? এত খালাত মাছদের থাকে না।” রাজা



নামক জীবটিকে সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া ভাবিতে শিশুরা সচরাচর শাত-ষাট বৎসর পর্যন্ত পারে না। হুতরাং তাহার যে অনেক অর্থ, এবং সেই অর্থের বিনিময়ে যে একশত ছেলের খালা-বাসন সবই কেনা যায় এবং সে অর্থ যে রাজা প্রজাদের কাজ করার বদলে পান, এই একটুকু কথা ছয়-দশ বৎসরের শিশুরকে হুস্পষ্ট দুটোয়ারে সাহায্যে বর্ণনা করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দশ বৎসরের বালককে একথা বলিতে গেলে সে আপনান্না বোধ করিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, শিশু-সাহিত্য দশক শিশু প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, যদি-না তাহার একটুকু বয়স অস্থান্যে নূনতর রকম চোরা হয়।

মা যদি তাহার সন্তানকে আগাশোড়া নিজের হাতে মনিষ্য করেন, তাহা হইলে যে বয়সের ছেলের সঙ্গে তিনি যেমন করিয়া যে বিষয়ে গল্প করেন, এবং তাহার নিজেদের মধ্যে যেমন করিয়া যাহা লইয়া খেলা করে, প্রধানতঃ সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই সেই বয়সের শিশুর সাহিত্য রচনার ভিত্তি গঠিতে হইবে। অবশ্য এই ভিত্তির উপর কল্পনা ও জ্ঞানের সৌধ অনেক নূনতর মাল-মশলা দিয়া গঠিতে হইবে, না হইলে শিশুর মনের বিকাশে সাহায্য করা হয় না।

চার, সাড়ে-চার বৎসর বয়সে অনেক শিশুই বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়ে। তাহাদের জ্ঞান-আজ্ঞা বহুলক্ষ্যবান্ধিত বই দেখা হয়। এই রকম একধাণা হইলে যদি ইচ্ছা দেখা যায়—“লেডলার দোকানের সামনে পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম বাসের টিকিট কিনিবার পয়সা নাই”, তাহা হইলে মনে হইবে লেখক অন্ততঃ ৮-৯ বৎসর বয়সের ছেলেকে গল্প বলিতেছেন। চার বৎসরের বাঙালী শিশু কয়জন লেডলার দোকান দেখিয়াছে, এবং কয়জনই-বা পকেটের পয়সার অভাব বুঝে? লিখিবার সময় আমরা এই কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই।

ছোট ছেলেরা অল্পপ্রাণ ও ছন্দ খুব ভালবাসে। তাহার জ্ঞান কবিতার প্রয়োজন আছে। সে কবিতা অর্থহীন আবদ-তাবল হয় নহিত নাই; কিন্তু তাহাতে

মস্ত মস্ত তত্ত্বকথা থাকিলেই বিপদ। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের “শিশু” আগাশোড়াই শিশু-সাহিত্যের দলে। বইখানি উজ্জ্বলের সাহিত্য—সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে অনেকাংশে শিশুরত্নের অধিকারী মায়ের অন্তর-রাজ্যের আলো-হারা ইতিহাস, শিশুর মাতারই স্বখ-পাঠ্য সাহিত্য, তাহা ভুলিয়া আমরা শিশুরের নির্দিষ্টতার সব কবিতা পড়াইতে বসি। দেখিতে পাই যেখানে—

“গুণী তোমার কিছু বোকে না মা।

গুণী তোমার ভারি ছেলোমায়া।”

কিংবা, “বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে!

কিছুই বোকা যায় না লেখেন কি যে।”

অথবা, “আমাকে মা শিখিয়ে দিবি, রাম-বারার গান, মাথার বেঁধে দিবি চুড়া হাতে ধরুক-বাণ!”

প্রভৃতি হুস্পষ্ট ছবি আঁকা আছে, সেখানে শিশুদের পড়িবার উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু যখন পড়াইতে বসা যায়—

“মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে

করুণ তারি পরাণ ঘেঁরে

মাধুরীরূপে মূরছি ছিল

কিহে কোনাে কথা,

থোকার গায়ে মিলিয়ে আছে যে কটি কোলতাল।”

তখন শিশুকের মুখে মন তাহাতে জুড়িয়া যায়, কিন্তু শিশু ছাত্র-ছাত্রী বলে—“আজকে বড় হাই উঠছে, খেলা করি গিয়ে।”

কিন্তু শিশুদের মাসিক পক্ষে দেখা যায়, এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কোটো কাহার জ্ঞান শিখিয়াছেন, তাহা কেহ ভাবে না।

অথচ আট-নয় বৎসরের শিশুরা যে সমস্ত কবিতার বাস্তবিক রস পায়, আজকাল তাহারই অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা শিশুকালে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রচিত কবিতা কুড়িয়া পড়িয়াছিলাম, আজও মনে আছে:—

“হৃৎপথ অথ ছা’টি করতেনিলেন জলপান,

এমন সময় এলেন তথায় বদ্ধ একজন লম্বাকান”

কিন্তু অনেক যুগধ করিয়া পড়া অল্পরকুমার দত্ত মহাশয়ের “বিভ্রা অম্বা ধন” আর ‘চাকপাঠ’ খুলিয়া পড়িয়া দেবিত্তেই, এক অক্ষরও কোনো দিন পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না।

এই ছন্দে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের কথাও কিছু আনিয়া পড়ে। আট-নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থায় বস্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিলে শিশুরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। কারণ ভাববাচক, গুণ-বাচক, কি তত্ত্ববলক জিনিষ বুঝিবার মত মন তখনও তাহাদের গঠিত হয় নাই। তাহার আশ্রয় আপন মনের ভিতর এমন কোনো হুতর পায় না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিভ্রা, সন্তোষ, আশ্চর্যপ্রদ, আশ্চর্য্যমণি, কৃতজ্ঞতা, পিতৃভক্তি ইত্যাদি বিষয় বুঝিবে। ‘চাকপাঠ’ খুলিয়াই আজ দেখিতেছি উক্ত প্রথম, দীপনক্ষিকা, জলন্ত, পুরুভূজ প্রভৃতি আজও অজ্ঞান। বিষয়গুলির গাভীর রূপ আছে বলিয়া তাহাদের কথা যাহা পড়িয়াছিলাম, অনেকটাই মনে আছে। কিন্তু সন্তোষ, আশ্চর্যপ্রদ, আশ্চর্য্যমণি ইত্যাদি লইয়া পরিণত বয়সের পূর্বে পড়াইয়া কেবল সময় নষ্টই হয়। বস্তু-বিষয়ে এই বয়সে তাহাদের যে উৎসাহ, সে উৎসাহকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগাইতে পারাই তখন প্রয়োজন।

শিশু-সাহিত্যের ভাষা, বিষয়, হুতর ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, সংক্ষেপে বলা শক্ত। কেবল একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। শিশুদের দুটি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার অত্যন্ত কঠিন সমালোচক। শিশু-সাহিত্য লেখকদের (এবং অন্ত লেখকদেরও) কোনো সন্দেহ নাই, হুতরাং তাহাদের ধাঁধার বাধা কিছু

ইছ। সেইরূপ ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিষয়টি সহজ হইয়াছে দেখিলেই তাহার শিশু-পাঠ্য হইল মনে করেন। একজন লেখক লিখিলেন “ধোপা”, আর একজন লিখিলেন “ধোবা”, একজন লিখিলেন “ছপ্তর বেলা”, একজন “ছদুর”, আর একজন “ছদুর বেলা।” শিশুরা বর্ণপরিচয়ের বিভ্রা লইয়াই ইহাদের ভুল ধরিতে বসে এবং শিকক খুব কড়া না হইলে, যত বিচিত্র ভাষা প্রত্যাহ করে, ক্রমে তত হতাশ হইয়া যখন যাহা পুঁদী লিখিতে থাকে। শিশু-সাহিত্য এবং স্কুল-পাঠ্য সাহিত্যের ভাষার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও ধারা থাকা প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে সে আপনার পথ বাছিয়া লইতে পারে, কিন্তু পথ-চালা শিবিবার সময় তাহাকে পঠি প্রতি পারে সীতাবন মড়াইয়া ও থানাখন ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়, তবে সে চিরকালের মত পথ না হইয়া যায় না। শিশু-সাহিত্যের তরুণ পথপ্রদর্শকেরা এইপন পোলক-ধাঁধার শৈশবে গুরিরাহিলেন বলিয়াই ভবিষ্যৎ-বংশীরদের পালাই এমন থানায় যখন ফেলিতেছেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়। হুতরাং আর দশ-বারো বৎসরে ভাষায় সম্পূর্ণ অরাজকতা ও বেচ্ছাগার আশিবার পূর্বে এই বেলা ইহার একটা রাজপথ ধাঁধা দেওয়া প্রয়োজন। কথা ভাষার অসংখ্যরূপ জিয়া ইত্যাদির জালে তাহাকে না জড়াইয়া বই-এর সহজ ভাষাই তাহার আশ্রয় হইলে ভাল হয়। শিশুদের সহিত তর্ক করিয়া দেখিয়াছি পাঁচ রকম কথা ভাষার চেয়ে একরকম পাঠ্য ও দেখা ভাষার প্রয়োজনীয়তা তাহার সহজে মানিয়া লয়। শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে ভাবিতে বসিলে মনে বহু চিন্তার উদয় হয়, তাহার ভিতর জড়াইয়া পড়ার আগে এইখানেই শেষ করা ভাল। \*

\* তালতাল সাহিত্য-সম্মেলনের “নবীন বিভাগ ও শিশু-সাহিত্য” শাখার অধিবেশনে পঠিত — শ্রীমতিসুহৃদার বে. জ্ঞানানন্দসিঁড়ির সম্ভাষণ।



সকলেই বলে যুগের সঙ্গার।

কোলাহল-কলরব নাই,—অশান্তি-অসন্তোষ ঘুমায়িত  
হইয়া উঠে না,—নিশ্চিন্তে, স্বশৃঙ্খলে চলে পাড়ার মধ্যে  
আদর্শ সঙ্গারটি।

বিখনাথ বি-এ পাশ করিয়া জেলা-স্কুলের মাষ্টার  
হইয়াছে। বেতন বাহা পায়—পতি-পত্নী ও ছোট  
সন্তানের স্ব-সন্তোষের কথা মিটাইয়াও সেভিস ব্যাচে  
মাসে মাসে কিছু জমা হয়। গৃহ-সংলগ্ন ছোট পুকুরে  
চারি মাছ জমিয়াছে প্রচুর; পোশালে গুট চারেক  
ছদ্মবতী গাভী এবং পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে নান্দিতং  
আমবাগানের একাংশে কলা-মুগার চাষও কিছু কিছু  
হইয়া থাকে। সর্বোপরি—রাস্তাঘাটে বিখ্যাত কতক  
ধানের জমি আছে। বৎসরান্তে খাজনা মিটাইয়া ধান  
বাহা ঘরে আসে, তাহাতে এই কয়টি প্রাণীর অন্যাহাসে  
চলিয়া যায়।

স্বলতা হুটীশিল ভালরূপই জানে। জেলার মধ্যে  
রক্তনেও কতক তাহার স্থানম প্রচুর এবং বিহ্বলী  
বলিষ্ঠও খ্যাতি আছে। নিতা বিপ্রহর বড়ীতে তাহার  
ছোটবাটো পাঠশালা বসে। প্রাথমিক শিক্ষা, হুটী-  
শিল, গান, গৃহকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সে বালিকাদের  
শিক্ষা দিবে। সকলেই স্বলতার আখ্যা—  
সকলেই তাহাকে ভালবাসে।

অজ্ঞাত মাষ্টারেরা বিখনাথকে হিসাব করিয়া বলেন,  
“সঙ্গারে এসে তুমিই মজাটা লুটলে, বিত্ত। আর  
আমাদের সঙ্গার, না কৰ্মভোগ। যেমন মেজাজ  
গৃহিণীর, তেমনই বেরোতা ছেলে-মেয়েগুলো, তেমন কি  
‘নেই’ ‘নেই’ রব। সেখানে, অত্যাচার, ভাঙন—মাঝে  
মাঝে ইচ্ছে হয়—সেকা প’রে একদিক পানে দৌড় দিই।”  
বিখনাথ হাসে, কিছুই বলে না। সকলে লক্ষ্য  
করেন,—পরিপূর্ণ হৃদয়ের হাসি।

কোথাও কলহ-বিবাদ হইলে লোক আসুল  
বাড়াইয়া নারিকেল গাছগালা বাড়ীটা দেখাইয়া  
বলে, “বা, দেখে আরগে ওখানে, সঙ্গার কাকে বলে।  
এ কেবল ভুতের বোকা বওয়া বই তো নয়।”

লোকে জানে সে কথা।

বিখনাথ কোন দিন অকারনে উজুসিত হইয়া হাসে  
না, কোন দিন কৌতুককর কথা কেহ তাহার মুখে  
কেনে নাই। চাপলা, অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা আচরণের  
জট বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার নিকট হইতে  
পায় নাই। বর্ষার ভরানদী যেমন সৌন্দর্য্যপিপাসু  
মনকে কুণ্ঠিত দেয়,—এ সঙ্গারের পানে চাহিলে তেমনই  
একটা পরিপূর্ণতার আভাস জাগে মনে। প্রাণীরা তার  
কণ্ঠের তুণ্ড,—মিতাচার হুচাক বসন এবং সংঘম—  
স্বন্দর রূপশ্রী। বিখনাথকে সকলে ভালবাসে, অন্তরে  
অন্তরে প্রস্রাব করে।

সে যখন নিশ্চেষ্ট হাসে, পাতলা চোঁট ছুঁনি ঈষৎ  
কাশিয়া উঠিয়া যে অপরূপ স্নেহময় বিকাশ করে, তাহা  
নাকি স্বর্ণের। স্বলতার হাসিও তার প্রতিচ্ছবি।  
যেখানে বিপদ—সেখানে বিখনাথের ওই স্বন্দর হাসিভরা  
মুখ ও স্বলতার সেবা-স্বকামল কর—বিপদের মনে  
আশার সঙ্গার করে। লোকের অভাবে বিখনাথের  
হাতবালাট বার বার উদ্ভূত হইয়া যায়, স্বামীর আদেশ  
না পাইলেও স্বলতা যথেষ্ট বরত করে।

বাহিরের ঘরে চারিটি আসমারি-ঠাসা বই।  
একবার সে-ঘরে গিয়া বসিলে বিখনাথ বিখকে জুসিয়া  
যায়। স্বলতা কৃত্তি চরণে আসিয়া কতবার ছুরের  
নিকট হইতে ফিরিয়া যায়। অলক্ষ্যে তন্ময় স্বামীর  
জ্ঞান-আধরণে কৃত্তিত্বা মুখখানি দেখিয়া খুসী মনেই  
হয়ত বা ধানিক ধাঁড়াইয়া থাকে। বেশী বিখপ হইলে  
চারি গোছাটা দেগিয়া তপসীর তপতা-ভঙ্গের চেষ্টা

করে। তাহাতেও সফল না হইলে নিকটে আসিয়া  
মুগ্ধবরে ডাকে। কখনও কখনও গা ঠেলিয়া না  
ডাকিলে বিখনাথের ধ্যানভঙ্গ হয় না।

চমকিত বিখনাথ স্বলতার কৃত্তি মুখের পানে  
চাহিয়া পরক্ষণেই খড়ির পানে চায়। পরে ব্যস্ততার  
সঙ্গে বলিয়া উঠে, “উঃ, রাত সে একটা বাজে।  
আমায় একতখ ডাকনি কেন, হু?”

স্বলতা হাসিয়া উত্তর দেয়, “তুমি যে বই প’ড়ছিলে।”  
তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া বিখনাথ বলে, “চল।”

আহার-পূর্ণ মটিলে রাস্তা বিখনাথের নয়ন ঘূমতাবে  
ভরিয়া আসে। স্বলতা আসিয়া আলো নিবাইয়া  
তাহার পাশে শুইয়া পড়ে। কোন কোন দিন বা  
রাস্তা স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে সেইখানেই  
মাথা রাখিয়া ঘুমায়।—হৃদয়ের ঘুম।

দিনের আলোকে ছ’ঘন্টারই কাছের যেন অস্ত থাকে  
না। ছেলে-পড়ানো লইয়া বিখনাথ নটা অবধি  
কাটাইয়া—দশটা বাজিতে কয়েক মিনিট থাকিতে  
পুকুরে ডুব দিয়া—বাইতে বসে। তারপর স্থল। শুধু  
আলুভাতে ভাত বা আদামিঙ ডাল দিয়া খাওয়া নয়।  
ভোরে উঠিয়া গৃহকর্ম সাহায্য স্বলতা উনানে আঁচে  
দেয়। ডাল, স্বস্ত, ভাড়া, ভালনা, চুর্কী এবং পুর্ল  
দিনের মাছ না থাকিলে হাত-জাল ফেলিয়া পুকুর হইতে  
টাটকা মাছ ধরিয়া খোল ও অঘর নৈ। রান্নিতে  
ছদের দুই পাতলা রাখে; নিজহাতে তৈয়ারী গাওয়া স্বী  
স্বামীর পাতে সে নিতা ঢালিয়া দেয়। এবং অপরাহ্নে  
স্থল হইতে ফিরিলে সেই ছদ্মগুয়া খোলটুকু দিয়া সে  
স্বন্দর সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পিপাসার্ত স্বামীর রাস্তা  
দূর করে।

মধ্যাহ্নে মেয়েস্থল বসে।

অপরাহ্নে স্বামীকে জলযোগ করাইয়া তাহার  
ছোট ঘরখানিতে বই, খাতা, দোয়াত, কলম, রাউন্ড  
প্রভৃতি গুছাইয়া রাখে। বিখনাথের দেখার অভাস  
আছে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে গিথিয়া চলে।  
সন্ধ্যার পূর্বে স্বলতা পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া তাহার স্বাথ্য

স্বখে সাবধান বগী প্রয়োগ করিয়া বিখনাথকে ভ্রমণে  
পাঠাইয়া দেয়। কোন দিন বা পুকুর পাড়ে, কোন  
দিন বা গ্রামের মাঠে পায়চারি করিয়া—বিখনাথ রান্নি  
চটায় ফিরিয়া আসে। ফিরিয়াই সেই ছোট ঘরের ছোট  
টেবিলপরে বই গুলিয়া বসে,—একবারে রান্নি গভীর।  
তারপর আহার, বিশ্রাম এবং নিদ্রা।

পরিপূর্ণ শান্তির এতটুকু ব্যাঘাত ঘটবে না।  
গ্রামে, স্থলে এবং সমাজে—বিখনাথের যথেষ্ট স্থানম।  
সে সঙ্গার-আশ্রমের একটা মহান আদর্শ।

সহসা অতিক্রম তৃতীয় শিক্ষক মহাপ্রাণ স্বর্গীয়  
হওয়ায় স্থল-কর্তৃপক্ষ গ্রামে উপস্থিত লোক না পাইয়া  
কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। তিন দিনের মধ্যে আবেদন-  
পত্র আসিল একশতেরও উপর। তার মধ্যে বাড়িয়া  
ই থাকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হইল, তিনি বয়সে  
সর্বাপেক্ষা তরুণ। তাহাকে দেখিয়া কর্তৃপক্ষ মনে  
মনে ঈর্ষা ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু অসংখ্য আবেদন-  
পত্রের মধ্যে ডিগ্রীর উত্তরাণ তাহারই ছিল বেশী।

লোকটি আসিলেন সঙ্গীক। বছর দুই হইল কলেজ  
ছাড়িয়াছেন এবং ইতিমধ্যে বিবাহও করিয়াছেন। রজনী  
সংসারে রজনী ক্ষুণ্ণ হইতে তিনি বাস করেন; রঙের আভাসে  
মুখখানি তাঁর সঙ্গী হস্তময়। মাষ্টারদের নীরস প্রাণীরা,  
ছাত্রদের বশ মানাইবার রূঢ় জুজুটি তাহার নাই।  
মাষ্টারেরা পরস্পর সম্মেলন প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—  
তারুণ্য ও হাসি লইয়া কি মাষ্টারী করা চলে?

সময় সময় তাহার ছোকার হাঙ্গিরে ‘ছায়াবাদ্যো’  
বলিয়া মুখ অহংবোধ করিতেও ছাড়িতেন না। সে  
অহংবোধের মত বানিক দানমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া  
এক সময় হাসিয়া উঠিয়া শিক্ষকদিগকে কহিত, “মাপ  
ক’রবেন, দাদা, ওটা আমার অভ্যাসের দোষ।”

বুড়া পণ্ডিত বাড় নাড়িয়া বলিতেন, “যত হাসি  
হেসো না, বাপু। কথায় বলে, ‘যত হাসি—তত কান্দা,’  
বলে সেজে রাম শর্মা।”



এত হাসি বিশ্বনাথের ও ভাল লাগিত না। তাহার মিতাচারের গতি ছাড়াইয়া, সখ্যমের তটরেখা প্রাণিয়া এ যেন এক ছুরীর বজা শাস্তি-তৃষ্ণির কটীর অভিধাপের মতই আসিয়া পড়িত। তারুণ্য ত এককালে-নকলেরই থাকে, তা' বলিয়া পুঞ্জীয়নের সন্ধান না দেখাইয়া দৃষ্ট বৌবনের উজ্জ্বল যখন তখন অসম্মানকর হাসি? হি। এ যে উজ্জ্বলতার অগ্রভূত। বেগম্ন পতন ইহারই পথ ধরিয়া মাহুকে অন্ধতমাপুরে টানিয়া লইয়া যায়।

মাঝে মাঝে বিশ্বনাথ গম্ভীর ভাবে তাহাকে ছুঁচাটি উপদেশ দিত, সে-ও একমনে শুনিত। কিন্তু কয়েকদণ্ড পরে তাহার ক্লাসের পাশ দিয়া বাইতে বাইতে উজ্জ্বল হারি কলরোল যখন বিশ্বনাথের কানে আসিয়া বাক্তিত এবং কৌতুহলবশে উকি মারিয়া সে ঘরের মাঠার ও ছাত্রের আমোদ-উল্লাস দেখিত, তখন তাহার নারা অস্তর কোভে, হ্রসবে ফাটিয়া পড়িতে চাহিত। হায় রে উপদেশ! এ কেবল বেনাবনে মুক্তা ছড়ান বৈ ত নয়। বিশ্বনাথ পায়ের গতি বাড়াইয়া প্রচণ্ড শব্দে বারান্দা মুখরিত করিয়া অপর ক্লাসে গিয়া চুকিত। পাশের ঘরের হাসিও সেই শব্দে থামিয়া বাইত।

সেদিন টিকিনের যতটা হেড, মাঠার নৃতন মাঠার হরেনকে ডাকিয়া বলিলেন, “হরেন বাবু, হাসি-ঠাটা-গুলো পড়বার সময় একটু কম করবেন। অল্প ক্লাসে পড়বার ক্ষতি হয়।” হরেন অপ্রতিভ হইয়া লঙ্ঘিতবরে বলিল, “কি জানেন, আমার বিশ্বাস-হাসি-আনন্দের মধ্যে দিয়ে যে-শিক্ষা দেওয়া যায়—”

হেড মাঠার চোখের চশমাটিকে নাকের উপর সুঁটিয়া মুখখানা অল্প কঁটকটাইয়া কহিলেন, “সে আপনাদের কলেশ-লাইকে চলে। বেত ওখানে অচল। কিন্তু এখানে—”

পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, “যা করুন—তাঁট আর নোনা আতার ডাল। এক একটা ছাত্র আত তৃত। জানেন ত, মারের চোটে—”

হরেন বিনীত হাতে উত্তর দিল, “আজ্ঞে জানি।

কিন্তু—ভূতের দৌরাখা বেড়েই যায়। ভূতের মাথায় মাহুকে ঠাই দিতে হ'লে বেতের চেয়ে মিষ্টি কথা বেশী উপকারী। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা—”

পণ্ডিত মহাশয় প্রবল হাতে সে-কথা উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, “তোমার আবার অভিজ্ঞতা! কাল-কের হেলে, কলেশী গন্ধ গা থেকে যায় নি এখনও! বলে, কত ছেলেকে বেতের চোটে মাহুগ কর'রে দিলাম! হ্যাঁ!—তারা কেউ জ্ঞহ, কেউ প্রোফেসর, কেউ আপিসের বড়বাবু, কেউ ব্যবসাদার।—হে—হে—”

হেড মাঠার নাকের মাঝখানে চশমাটি নামাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “বাই হোক, অল্প মাঠারের কাজে ব্যাখ্যাত দেবেন না। আপনার নীতি আপনি মেনে চলুন, আপত্তি নেই, কিন্তু অল্পকে বাঁচিয়ে।”

হরেন কুঁতব হয়ে বলিল, “তাই হবে।”

সে সমবেত মাঠারদের পানে চাহিয়া দেখিল, সকলেই এই শাসনে বেশ একটু উল্লসিত হইরাছেন, এ কেবল বিশ্বনাথ নিপীকার প্রশান্ত ভাবে একখানি বইয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ইহার ঠিক ছয় দিন পরে হরেনকে মানমুখে খুলে আসিবে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে অল্প একটু খোঁড়াইয়া চলিতেছিল এবং তাহার হাতে মাদা জাকড়া দিয়া ব্যাওঞ্জ বাঁধা। ভাবে বোধ হইল, হাতখানি আড়ষ্ট।

যদিও ছয় হাতখানির কাজ খুলে তাহাকে বেশী করিতে হয় না (অর্থাৎ ছাজ-কুলের মাথায় প্রবল বেগে বের-বারি বর্ষণ), তথাপি সেটার যরণা এতদূর অসুখ হইয়া উঠিয়াছিল যে, হাসিখে শুধু চেয়ারে বসিয়া পড়াইয়া যাওয়াও অসম্ভব।

সে তিন দিনের ছুটি চাহিল।

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি?”

হরেন লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “কেমন, বেছেলিচুন না—যত হাসি, তত কামা!”

হরেন হাসিয়া কেলিল। পণ্ডিত জুগুটি করিলেন।

হেড মাঠার বলিলেন, “আজ্ঞা ছুটি না-স্বয়ং দিলাম, কিন্তু ডাক্তারখানায় গিয়ে একটা লোশান দিয়ে জ্বাহন!” হরেন বলিল, “আইডিন দিয়েচি।”

হরেনের চেয়ে বছর দুইয়ের বড় সুরেশ্বর ঈশ্ব নিম্নথরে বলিল, “ব্যাপার কি?”

হরেন তেমনিই নিম্নথরে বলিল, “কাউকে ব'লো না যেন। কাল সামাজ্য একটা কথা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে হ'ল তর্ক। সেই কবে ফুলমথ্যার রক্তিতে কে কি ব'লেছিল—তারই বিস্তারিত বিবরণ। ওদের এতও মনে থাকে, ভাই! আমিই হয়ত ভুল ব'লেছিলাম,—এই হ'ল রাগ। তর্ক থেকে কলহ, তারপর—হুড়োহুড়ি, তারপর—” বলিয়া চুপ করিল।

পাশেই বইমুখে বিশ্বনাথ বসিয়া ছিল। হরেন কটাক্ষ-পাতে সেদিকে চাহিয়া দেখিল, সে নিপীকার—তন্নয়।

সে মুহূর্তেরে বলিল, “তারপর দিলে এক কামড় বসিয়ে।”

শিরিয়ার সুরেশ্বর বলিল, “কামড়ে দিলে? রাক্ষসী নাকি?”

হরেন জন্ত হইয়া কহিল, “চুপ! হাঁ, কামড়াতেই স্বর স্বর কর'রে রক্ত। রক্ত-না দেখে রাগ একবারে জল; মরে হাউ হাউ কর'রে কেঁদে। ব'ললাম, কীদ কেনে, একটু আইডিন আন, জাকড়া একখানা ক'সে বেঁধে দাও জায়গাটা—বাস, কাল আর কিছু থাকবে না। তাই ক'রলে; কিন্তু সারারাত গুলে না, ভাই। খালি কামা, খালি কামা! তারি ভালবাসে কিনা।”

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে কহিল, “বউ মাহুগ, কামড়াবে কি? হেসো না হরেন, এই বেলা থেকে না শোধরালে শেষে অহুতাপের ঠাই থাকবে না।”

হরেন বলিল, “কি ক'রব ভাই, ছেলোমাহুগ—একটু বেশী ঢকল।”

সুরেশ্বর কহিল, “হ'য়েচে! ভই ঢকলতাই হচ্ছে 'রট অফ জব'। শাসন কর, এই বেলা থেকে কড়া শাসন রাখ, নইলে হাত ছেড়ে মাথায় বাড়ি মারবে কোন্ দিন!”

হরেন হাসিয়া বলিল, “শাসন আমার আসে না, ভাই। আর তারই বা দোষ কি? হুড়োহুড়ি কর'তে আমিও যে ভাবাবি না, তা' নয়। শাসন মারবে হ'লে আগে আমার মনকে শাসন কর'তে হয়।”

সুরেশ্বর ইদিকে বিশ্বনাথকে দেখাইয়া কহিল, “দেখতো ত শুঁকে, এ জেলার মধ্যে অমন সুখী দম্পতি আর নেই। ওঁদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীটা যদি হ'রিন অধ্যয়ন কর—”

হরেন বলিল, “রকে কর ভাই,—অত গাষ্টাখা আমার দইবে না! ও-রকম শাস্তির চেয়ে এই অশান্তি শমুণ ভাল। এতে তবু জীবনের স্বাদ আছে। তোমার দীক্ষাও বোধ করি ওর কাছে? বয়সটাকে নিয়মের শেকলে বেঁধে কেমন কাটছে?”

সুরেশ্বর বলিল, “মন্দ কি। ভালই। তবে ওর মত সবটুকু যদি পালন কর'তে পারিত তাবনা কিসের? স্বী-ভাগ্য অনেকটা ভাল ব্যাভারে ওপর নির্ভর করে।”

হরেন উঠিয়া বলিল, “আজ আসি।”

সে চলিয়া গেলে ক্লাস বিবারণ থণ্টা পড়িল।

একে একে সকল মাঠারই উঠিল, বিশ্বনাথ উঠিল না। হেড মাঠার মিনিট দশেক তাহার খোলা বইয়ের পানে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলেন, বিশ্বনাথ পাভা উঠাইল না। নিঃশাস বন্ধ করিয়া একটা লাইনের উপর একাগ্র চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

উঠিয়া আসিয়া তিনি হেঁট হইয়া কহিলেন, “সাব-জেষ্ঠা গুব ইটোরেটি? বসি? কি বই? ইতিহাস?”

বিশ্বনাথ চমকিত হইয়া কহিল, “হাঁ। যণ্টা প'ড়ে গেছে?”

হেড মাঠার বাড় নাড়িজেই বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া—ক্রমপদে ক্লাসের অভিমুখে চলিয়া গেল।



কোথায় ছিল ইতিহাসের কাহিনী! হরেনের প্রতিটি মুহূর্তখা তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত তাহার অন্তরে আশিয়া বিধিতছিল। গভীর মনোভাবে সে মুখ তুলিতে পারে নাই, রূঢ় উপদেশ দিতেও বাধিতছিল।

মনটা বিকিপ্ত ছিল। ক্রাসে পড়াইতে গিয়া তুল করিল। অন্ধ কবাইতে গিয়া আগুয়জ্জবের দানিগাতা-অভিযানের কত ঘটনাই না বলিয়া চলিল।

চিকিৎসকের ঘণ্টায় বিশ্রাম-কক্ষে বসিতেই তিনিল,—

হরেনের কথা লইয়া সেখানে তুলনা আলোচনা চলিতেছে।

হরেন আসা অবধি এই মাস দুয়েরকের মধ্যে তাহার্য্য বামী-দী নিলিয়া যে-সব কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা নাকি সমাজ-পিত্তাচার-বহির্ভূত।

এখনক: লজ্জা উহাদের নাই বলিলেই চলে। ও-বাড়ির পাশ দিয়া যাইবার সময় সকলেই নির্গজ্জদের উচ্চহাসি, মুখের পদধনি ও চড়া কথা শুনিয়াছেন। সে-সব কথা নাকি শুনিবামাত্রই হ'কানে তুল গুলিতে হয়, মাথা লজ্জার ঘুগায় আপনা হইতেই ঠেট হইয়া যায়। বেহাচার একশেষ।

মাগের শব্দটিও বাধ যায় না। অথচ হরেনকে জিজ্ঞাসা করিলে বেশ সপ্রতিভভাবে হাসিমুখে উত্তর দেয়, "ও কিছু নয়, একটু ছেলোমাছখী হ'ছিল।"

বিখনাথ আসিতেই দুরেখর তাহার নিকট সরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, আশনি এর বা-হয় একটা উপায় করুন। হতভাগ্যর মুখে কীর্ত্তিকাহিনী যা' তনি, কোন দিন বেটোর হাতে পুন হ'য়ে না যায়। আর ও-রকম একটা মন example গ'য়ে থাকো ও তাঁকি নয়।"

বিখনাথ তাহার পানে চাহিয়া মুহ হাসিল।

দুরেখর বলিল, "হাসলে হবে না, কাল সকালেই ওকে ধ'রে নিয়ে যাব আপনার বাড়িতে। দেখুন, যদি আপনাদের দেখেও কিছু শোষণাতে পারে।"

বিখনাথ বলিল, "ও কথা শুনবে ব'লে বোধ হয় না।"

দুরেখর বলিল, "হুঁ, না। শুনেই আমরা ছাড়টি কিনা! গাঁয়ের মধ্যে এসব...না, না, ওকে শোষণাতে

আপনার হবেই। একদিন না হয়—রোজ সকালে-বিকালে—"

হাসিয়া বিখনাথ বলিল, "হবে, হবে, ব্যাভ কেন?"

দুরেখর বলিল, "ব্যাভ হই যাহে? আজ কামড়ান'র ইতিহাসটা শুনেচেন কি?"

বিখনাথ উঠিয়া বলিল, "থাক, কাল শুনবে"।  
বলিয়া ক্রাসের ঘণ্টা না পড়িতেই বাহির হইয়া গেল।

বিখনাথ বৈকালে জলযোগ করিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিল, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় স্নানতা আসিয়া কহিল, "ওঠ, বেড়িয়ে এস।"

বিখনাথ বলিল, "হুঁ, এই ছোয়ারটার এসে ব'সো, কথা আছে।"

সে বলিলে বিখনাথ বলিল, "হরেন আমাদের নতুন মাষ্টার—তাদের কথা শুনেচ কিছু?"

স্নানতা ঘাড় নাড়িলে বিখনাথ বলিল, "তার গাঁয়ের মধ্যে নাকি বাতা করচে। না লজ্জা, না আক্কেল—"

স্নানতা বিবিত্ত ভাবে কহিল, "কৈ, তা' ত তনি নি! আমি নিজের চক্ষে দেখে এসেছি, ভারি লজ্জা বো। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। আমরায় দিদি ব'গতে অজ্ঞান।"

বিখনাথ বলিল, "দখন তখন বেহাচার মত হাসিও ভাল নয়। পাড়ার সবাই শুনেচে ওরা মারামারি, গালাগালি করছে। এমন কি ঝোটি ত আজ হরেনের হাড়েই কামড়ে দিয়েছে।"

স্নানতা হাসিয়া ফেলিল।

জুটুটু করিয়া বিখনাথ বলিল, "হাসচো যে?"

মুহূর্তে হাসি ধামাইয়া স্নানতা বলিল, "ওদের ছেলোমাছখীর কথা শুনে। ছুটোই আস্ত পাগল! আমি বেড়াতে গিয়ে হ'পফের নাগিশের আর অন্ত থাকে না।"

চক্ষু বিপাকিত করিয়া বিখনাথ বলিল, "তবে?"

স্নানতা বলিল, "তবে কিছু নেই; যে বয়সে বা'। একটু হাসি-তামাসা, পুনহটি-গুগড়া, ও কি ধ'রবার মতো? হাসি-আচ্ছাদ্য করবার এই ত সময়।"

বিখনাথ চক্ষে জুটুটির ছায়া পড়িল। বিখনাথ বলিল, "অভ্যাস বড় খারাপ জিনিষ, হু। গোড়া থেকে গুলুগলুকে দমন না করলে সন্ধ্যার অশান্তি আসে।"

স্নানতার চক্ষুর দৃষ্টি অকস্মাৎ যেন নিবিয়া গেল। অশেষকর তরে হয়ত অশ্রু-আবেশে তাহা মুদিয়াও আসিল। অন্তরিক্তে মুখ কিরাইয়া সে মুহূর্তেই বলিল, "অভ্যাস খারাপ জিনিষ—সে আমি ভাল কর'রেই জানি। কিন্তু প্রকৃতিকে ঠেকিয়ে রাখতে থালি থালি যদি ঐ অন্তরে ব্যবহার করা যায় ত মনের মরণ আসতে দেবী হয় না। নাহুয়ের জীবনকে শুধু অভ্যাস—নিমেষ, নিমস, সংঘম এই সবের দড়াদড়ি দিয়ে ক'সে বাঁধলে মহুদয়ের আয়ু ক'দেখেই যে নিমেষের হ'য়ে যায়—এত বই প'ড়ে একখাটা আঙুও বুকলে না—এই আমার ভারি আশ্চর্য্য ঠেকে!"

বাক্যশেষে কষ্ট তাহার ভারী হইয়া পড় হইয়া গেল।

সে জুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তত্ত্বিত বিখনাথের চক্ষে সন্ধ্যার আকাশ যেন হলিয়া উঠিল। দ্রুগতে দ্রুগিতে বিশ বৎসর পূর্ব্বের অতীত আসিয়া কুটিত চরণে সন্মুখে দাঁড়াইল।

সবুজ ধরণীতে বসন্ত-সমারোহ। মধুর সমীরণে প্রচুর আনন্দ। জীবনের সে এক নবীন প্রজাতি।

কলেজের জীবন। নীতিশাস্ত্র, গীতা, বেদ প্রভৃতি পড়িয়া বিখনাথ জীবনের গতিক্ত হু-নিয়ন্ত্রিত করিবার জ্ঞাত্য বাক্ত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনকে শাস্ত্রিময় ও সংসারে আদর্শ স্থাপন করিতে সে অনাবশ্যক আড়ম্বর, আভিষা, বাহুল্য প্রভৃতিতে শাসনের নাপ-পাশে কড়া ভাবেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

সবুজ ধরণীর পানে চাহিয়া চানের আলোয় যৌবনময় হে তাহার সংঘম-ভঙ্গের প্রাণসে যে বিপুল উজ্জ্বলসেই না আকুলি-বিবুলি করিত। অমনই মনে পড়িত ভবিষ্যৎ মহুদয়ের আদর্শ। রক্তচক্ষু

লইয়া সেই সব নিখা তরঙ্গকে সবলে ভাঙ্গিয়া সে শাসন করিত।

তদন্ত ভাষিত, উজ্জ্বল কেনার মত দ্বন্দ্ব-ভট্টম্বে বিলীন হইয়া বাইত। কি এক অবসানে বিখনাথের সমগ্র অন্তর মুর্ছাহতের মত শব্দ, স্পর্শ, সঙ্গীতের অতীত হইয়া পড়িয়া রহিত।

তারপর জ্ঞাপিত অপূর্ণ আত্মস্থিতি।

এমনই দিনে—স্নানতা আসিয়া সন্মুখে দাঁড়াইল। বিখনাথ তরুণ নয়ন হইতে স্বপ্ন-ঘোর কাটায়া—সংঘম-সমাধিতে অন্তরের মাঝে কঠোর দৃষ্টিপাত করিল।

সেই অকরণ সংঘম-প্রহারে স্নানতার আয়ত নেড়ে অঙ্গবোধা দ্রুগিতে না দ্রুগিতে মিলাইয়া বাইত, পদ-পাদপূজার মত অপরোহি কাঁপিয়া থির হইত এবং ছুটি গণ্ডে রক্তগার দ্রুগিতার মুহূর্তে পাতুয়তার ভরিয়া আসিত। ক্রুর মাঝে বৃককাটা দীর্ঘখালে নারী-অন্তর তাহার কাঁপিয়া কাঁপিয়া যৌবনের আয়ুকে নিঃশেষ করিয়া লইত।

পাটাত বৎসরের অনাহত সংঘম—হাসি, উল্লাস ও বাক্যের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। পাটাত বৎসরের

শাশন বহের আবরণ চুর্ভেজ ও কঠিন হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ শাফিকামীর অন্তর আদর্শকে লোভ করিয়া জয়ের আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল—সুখ, ধন।

বিশ বৎসর পরে বিখনাথ আজ সজাই ধন।

জেলার মধ্যে তাহার আদর্শ দম্পতি, সংঘম ও নীতি শিখার একখানি জীবন্ত ইতিহাস।

স্নানতার দ্রুগন্ত যৌবন সংঘম-সমাধিতে হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছে। বিখনাথের শাশন জয়হু।

তাহাদের মুহূর্ত পর এই আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে বিখনাথ থির করিয়াছে, নদীর তীরে স্বস্তি-মন্দির তুলিবে। অর্থে সে পোষ্টিকিলের খাতার স্বস্তি-মন্দির রাখিতেছে; সংস্রুকে এক-সঙ্গে উপদেশও দিয়া বাইবে।

প্রতীচা-মোহনুৎ দেশবাসীর সংশিকার মালসে নদীর ধারে ঘুণ ঘুণ ধরিয়া ভারতের বিশপিককে দরং



করাইয়া দিবার জন্ত বিশ্বনাথের সমগ্র জীবনের এই বিপুল আয়োজন। আদর্শ তাহার স্থাপন করিবই — জীবনে এবং মরণেও।

তথাপি আজ সন্ধ্যার আকাশ স্থলতার একটি কথার আঘাতে বর্ণ হারাইয়া অন্ধকারে ডুব দিল কেন? তারায় তারায় স্নেহ স্থলতার গোপন অশ্রুর প্রতিবিম্ব—আকাশের সারা দেহে কানো মেঘের বিস্তৃত ছায়া!

বিশ বৎসর পূর্বের অতীত কি আজ ছলনার নব বেশ পরিধান করিয়া আদর্শ নরকে তুলাইতে আসিয়াছে? না—বিশ বৎসর পূর্বের অভিমানজুল্ক অস্তর গৃহ বেদনার জলতর। নয়ন দুটিতে দীর্ঘদিন-সঞ্চিত পরাজয়ের কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া সন্ধ্যাকোকে ভাবিয়া পড়িতে চাহিতেছে? বিশ্বনাথ ত জীবন চাহে নাই, সে চাহিয়াছিল আদর্শ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার দেখা গৌরব-মালার মত ছলিবে। বে জীবন মানব-মনের ক্লেশ-ভাঙি, খলন-বিচ্যুতি, অগৌরব-অন্যায়, অশান্তি-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া জীবন-দোলাকে প্রবলবেগে দোলাইয়া থাকে—সে জীবন নহে।

বাহিরের রাজি অন্ধকারে গভীর হইয়া উঠিতেছে। স্থলতার হৃদয় রক্তন শেষ হয় নাই। না, উপরত অশ্রু-ধোঁয়ার ছলনার মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ বৎসরের সঞ্চিত বেদনার মাঝে স্থলতা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে?

অভ্যাস যে বাধাপ একথা স্থলতা এই মাত্র বলিয়া গেল। কিন্তু কিসের সে ইঙ্গিত? বিশ বৎসর পূর্বেরকার জীবনের অনাগত উজ্জ্বল পদধ্বনি, না, আঞ্জিকার খাসকক কামনার মরণোন্মাদ? কি এ?

আদর্শ জীবন! চিতার উপর মঠ উঠিবে! মসারীরা সবিলয়ে চাহিয়া সজ্জিত প্রগতি দিয়া সে আদর্শের সন্ধান রাখিবে। হয়ত কোন অলেখকের উজ্জ্বলিত লেখনী এই পবিত্র জীবন-কাহিনী লিখিয়া সমাজকে, পর্যন্ত মঙ্গলময় নির্দেশ দিয়া প্লেসের মুখ হইতে বাজাইবে।

তথাপি স্বপ্নের সন্ধ্যা—একটি নির্দাৰ্শ দীর্ঘ নিখোলের মত বিশ্বনাথের চোখের সমুদ্র হইতে রাজির অন্ধমণ্ডে পলকে আত্মগোপন করিল।

নিম্না সে-রাজিতে বিশ্বনাথের চোখের পলক স্পন্দ করিল না।

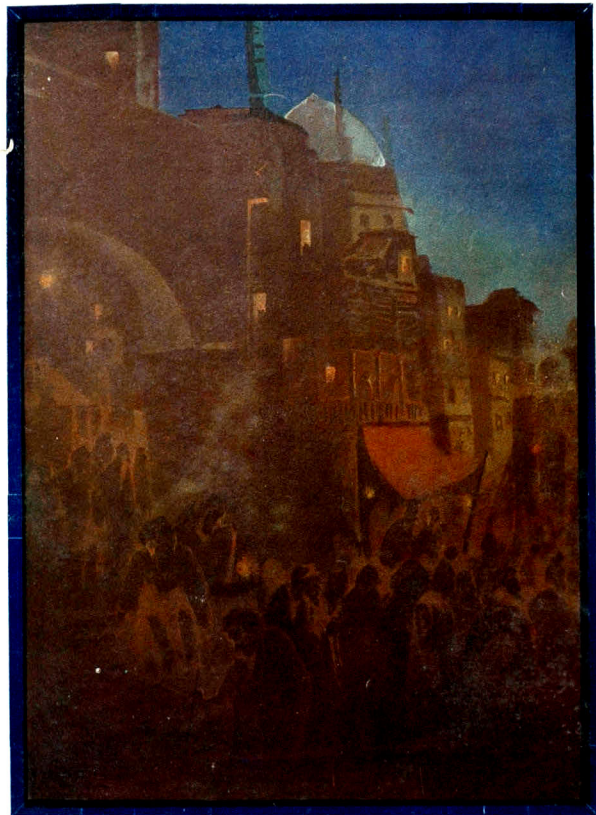
বাহিরের কোলাহলে—অতি প্রকৃষ্ণে বিশ্বনাথ শয্যা-তাগ করিল।

সে বাহিরে আসিতেই স্বপ্নের হরেনের ব্যাণ্ডেজ-বাধা হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “দেখেনে একবার কাণ্ডখানা? এই ওদের ভালবাসা! আপনি একটু উপদেশ দিন বাঁতে এ হতভাগার চোখ কেটে।”

লজ্জিত হরেনের অবনত মুখের পানে চাহিয়া বিশ্বনাথের কঠোর দৃষ্টি হুকোমল হইয়া উঠিল।

হরেনের হাতখানা ফুলিয়াছে। আত্মলের মূহু শিরণে ভিতরের যন্ত্রণার আভাসও সতর্ক চকুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে; দেহেই দেখ বিবর্ণ। তথাপি সমস্ত যন্ত্রণা জয় করিয়া প্রবীণ গৌরবে ও উল্লাসে ওই লজ্জনত চকু ছুটি কিসের পরিপূর্ণতার স্নেহ টুল করিতেছে। রাজির শিশির-সঞ্চিত কমলের উপর প্রথম প্রভাতের সন্দেশ স-গ্রেম দৃষ্টিপাত ঘন।

বিশনাথ অগ্রসর হইয়া হরেনের কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া পূর্ণ-চন্দ্রের হাসি হাসিয়া মধুর স্বরে বলিল, “সজ্জা কেন, ভাই? তোমাদের পূজার আয়োজন সার্থক। তোমরা যা পেয়েচ—প্রার্থনা করি, জীবনে সেই পাওয়াই পূর্তি লাভ করুক। ভগবানের দেওয়া স্থলত জন্ম—আলো, বাতাস ও প্রকৃতিকে চিনে তার মাঝেই যেন ঐশ্বর্যে কলরবে নিঃশব্দিত হইয়ে বায়, এর বড় প্রার্থনা তোমার এই দাদার আর নেই।”



কলিকাতার নৈশ শোভা



## জড়, জীব ও ধাতুপুরুষ

উক্তর শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এচ্-ডি

পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—অজীব ও জীব। অজীবকে জানিবার জ্ঞান যে সমস্ত শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাকে জড়বিজ্ঞান বলে। জড়ের নানা ধর্ম জানিবার জ্ঞান নানা পন্থা ও নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার প্রত্যেক পদ্ধতির অঙ্গস্বরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। Physics বা পদার্থবিজ্ঞান বলিয়া যে শাস্ত্রটি প্রচলিত আছে, তাহা জড়ের অল্প সমস্ত দিক বর্জন করিয়া কেবল তাহার দ্রব্যতা (mass) ও শক্তি (energy) এই উভয়ের আনোচনা লইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজীতে দ্রব্য বা mass-এর লক্ষণ বলা হইয়াছে, “mass is the quantity of matter contained in a body”, অর্থাৎ যে বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থসঞ্চয় আছে, তাহাকেই তাহার দ্রব্যতা বলে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, পদার্থসঞ্চয় অর্থ কি? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কোন নির্দিষ্ট আয়তনের (volume) মধ্যে যেখানে পরমাণুগুলির ঘনসন্নিবেশ যত বেশী এবং তাহাদের অন্তর্বর্তী অবকাশ যত কম, সেখানে সেই পরিমাণেই পদার্থ-প্রচয়ের আধিক্য। কিন্তু এই উত্তরই শেষ কথা নয়, কারণ বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যেও পদার্থ-প্রচয়ত তারতম্য আছে। কারণ পরমাণুগুলি proton ও electron-এ গঠিত—কাজেই যে পরমাণুতে যত অধিক পরিমাণে proton ও electron আছে ও নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে তাহাদের অন্তর্বর্তী অবকাশ যত কম, সেই পরমাণুতেই দ্রব্য বা পদার্থ-প্রচয় (mass) তত অধিক; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর পদার্থ-প্রচয় বা দ্রব্য সেই বস্তুর ঔপাদানিক এক বা বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সংজটক proton ও electron-এর সংখ্যা ও বাহন বা সংযোজন

সম্বন্ধ ও সেই বস্তুর বায়ুগুণির (molecules) মধ্যে পরমাণুগুলির বাহন বা সংযোজনসম্বন্ধ ও বায়ুগুণির মধ্যেও পরস্পরের বাহনসম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পদার্থ-প্রচয়-প্রণালী বুঝিবার চেষ্টার মধ্যে একটুও পদার্থ নাই, আছে কেবল সংখ্যা ও বাহনসম্বন্ধ। সংখ্যাও একরূপ সম্বন্ধেরই নামাস্তর, কারণ এক, দুই, তিন বা বহু পরস্পরসাপেক্ষ ব্যাসঙ্ঘাত-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। দুই তিন এর সহিত সম্পর্কে না বুঝিলে এককে বোঝা যায় না, এবং এককে না বুঝিলে দুই তিনকে বোঝা যায় না। পরস্পরসাপেক্ষ ও অজ্ঞোজ্ঞাত সম্বন্ধজ্ঞানের উপর সংখ্যাজ্ঞান নির্ভর করে, কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পদার্থ-প্রচয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে গেলে বাস্তবিক দৃশ্যমান ও স্পৃশ্যমান পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ-পরস্পরকে কোনও বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলের দৃষ্টিতে অহুধাবন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সম্বন্ধী বা বস্তু থাকে মৌল এবং সাক্ষাতিক ভাষায় কেবলমাত্র সম্বন্ধাত্মক রূপ বেজ আশ সম্বন্ধ হয় মুখ্য। তেমনি শক্তির দিক দিয়া অন্বেষণ করিতে গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির আশ্রয়কে পাওয়া দুইটি হইয়া উঠে। একই সত্তা কোনও সময় শক্তিরূপে এবং কোনও সময় বা শক্ত্যানুপ্রসঙ্গের উপর আপনাকে প্রকাশ করে এবং কোনও সময় বা উদ্ভাবনরূপেই আপনাকে প্রকাশ করে। কোনও শক্তিকে বুঝিতে হইলে যে ঘটনা-পরস্পরার মধ্যে সেই শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তাহা ছাড়া সেই শক্তির অল্প পরিচয় পাওয়া কঠিন। জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র যেদিকে অগ্রসরিত করিতেছে, তাহার অঙ্গস্বরূপ করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, বস্তুত্বরূপ শক্তিকে



বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। কারণ, কতকগুলি সম্বন্ধ-পরস্পরার ঘটন, বিঘটন বা অন্ত্য-ঘটন এইটাই আমাদের জ্ঞানের শেচনীভূত হয়। এই সম্বন্ধ-পরস্পরার ঘটন-বিঘটনের মূল কারণকে যে কোনও শক্তি আছে, ইহা কল্পনা করা কার্যোপযোগী নিছক কল্পনা মাত্র। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ এতদিন পর্যন্ত Physics বা পদার্থবিজ্ঞানের একটা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ শব্দের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব পদার্থ-প্রচুর ও স্বাপেক্ষ দূরত্বের ভারতম্য অনুসারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কেনন করিয়া পরস্পর অনসরণ দুইটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা কল্পনা করা কঠিন। কাজেই এই আকর্ষণের মূল শক্তিরূপী কোনও অনির্ভাষ্য পদার্থবিশেষকে বীকার করিতে হইত। আজ Einstein-এর অনেকসংখ্য বাদের আলোচনার দেখা বাইতেছে যে, মাধ্যাকর্ষণশক্তি কোনও স্বতন্ত্র শক্তিকে বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পদার্থ-প্রচুরের ভারতম্যাহসারে পার্শ্ববর্তী ব্যোমপ্রদেশে যে বিভিন্ন জাতীয় কূটজাত ও বিকিরণের সৃষ্টি হয়, বা যে নূতন সম্পর্কবিশেষের সৃষ্টি হয়, তাহারই সম্পর্কীভূত হয়। যখন কোনও বস্তুর কোনও বিশিষ্টজাতীয় ক্রমাবস্থা সম্পর্কধারার সৃষ্টি হয়, তাহাই স্থিতি-গতিজগৎ প্রতিভাত হইয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রকাশরূপে পরিণত হয়।

চৌম্বক আকর্ষণ বলের চুম্বক ও লৌহাবত্ববর্তী ক্ষেত্রের যে নানা সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, তাহারই ফলে লৌহ ও তৎপার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রের যে ধর্মপরিণাম ঘটে, চৌম্বকাকর্ষণ তাহারই নামান্তর মাত্র। পূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঈদার বলিয়া একটা সর্বব্যাপী পদার্থ বীকার করিতেন এবং ঈদার-তরঙ্গের সঞ্চারণকেই আলোককণি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এখন ঈদার সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ আসিয়াছে এবং ঈদারের সভা অনেকেরই এখন কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতেছেন। সেইজন্য হর্যামণ্ডল হইতে কোনও তরঙ্গ আসিয়া

আমাদের চক্ষুর সমুখীন হয়, আলোকের এই পরিচয় এখন ক্রমশঃ অগ্রগতি হইয়া আসিতেছে। হর্যামণ্ডলের কোনও বিশিষ্ট পরিণামের জন্ম তৎপার্শ্ববর্তী আকাশ-মণ্ডলের মধ্যে যে বিকোভের সঞ্চারণ হয়, সেই বিকোভের ফলে ক্রমধারায় ক্রমসংলগ্ন আকাশাবয়বের যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন যখন চক্ষুসংলগ্ন আকাশ-প্রদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, তখনই আলোককণি পেরিলাম বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এইরূপে Physics বা পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীর প্রতি অভিনিবেশ করিলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের মধ্যে দিক-কাল-যতিত যে যে নানা সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধগুলির মধ্যে কি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে, তাহারই অন্বেষণ এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

দিক-কালের মধ্যে প্রত্যেকনিষ্ঠ ও পরস্পরনিষ্ঠ যে সমস্ত ব্যাপক সম্বন্ধ-পরস্পরা সম্ভাব্যসম্বন্ধের মধ্যে দিয়া প্রকাশ বা অহসরণ করা যায় তাহারই অহুদাবন করা গণিতশাস্ত্রের কাজ। কোনও মূর্ত বা প্রাত্যক্ষিক বাস্তব (concrete) জিনিষ লইয়া গণিতশাস্ত্র আলোচনা করে না। বস্তুকে ছাড়িয়া দিক-কাল-যতিত কতকগুলি ব্যাপক সম্বন্ধের (universal) ধর্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে বলিয়াই গণিতশাস্ত্র বাস্তবতাবজ্জিত সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গণিতের জগৎ আমাদের আশ্রয় মাঠের জগৎ নহে। গণিতে বিন্দুর (point) লক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছে, “তাহাকেই বিন্দু বলা যায়, যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নাই।” রেখার লক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছে, “তাহাকেই রেখা বলা যায়, যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তৃতি নাই।”—এই বিন্দু ও রেখা আমরা কেহই প্রত্যক্ষ করি নাই। রেখার কোনও প্রাত্যক্ষিক সৃষ্টি নাই, অথচ এই রেখা বা দ্বিগুণ বস্তুর ধর্ম নিরূপণ করাই জ্যামিতির লক্ষ্য। এমন কোনও রেখা টানা যায় না, যাহার দৈর্ঘ্য আছে অথচ বিস্তৃতি নাই; কাজেই, জ্যামিতি যখন রেখার কথা বলে তখন কোনও দীর্ঘ বস্তুর দীর্ঘতমাত্রা আমাদের

কল্পনার বিষয়ীভূত হয়। বিন্দুর লক্ষণও দেখা যায় যে, কাল্পনিক অবস্থিতিনাক্ষকে দ্যোতনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই কাল্পনিক দৈর্ঘ্যের দ্বারা দিগ্বস্ত নানারূপে অবস্থিত হইতে পারে এবং বিভিন্ন কাল্পনিক দৈর্ঘ্যের পরস্পর সন্নিবেশে নানারূপ সম্বন্ধ প্রকটিত হইতে পারে। এই সমস্ত কাল্পনিক সম্বন্ধের ধর্ম ও পরস্পরশাস্ত্রের সম্পর্ক বিচারই জ্যামিতির উদ্দেশ্য। মূর্ত ও বাস্তব বস্তুর প্রাত্যক্ষিক ধর্ম লইয়া আলোচনা করে না বলিয়া গণিতশাস্ত্রকে বিকল্পমূলক শাস্ত্র (abstract science) বলা হইতে পারে। যাহার প্রত্যক্ষ ও মূর্ত স্বরূপ নাই, অথচ ভাষা ও সংকেতে ইঙ্গিতে যাহার স্বরূপ উৎপন্ন বা স্মৃতি হয়, তাহাকেই বলে বিকল্প। দিক-কালের স্বনিষ্ঠ ও পরস্পরনিষ্ঠ বহুজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট ও সার্বভৌম সম্বন্ধের স্বরূপ স্থাচার ইঙ্গিতে চিত্রপটে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই গণিতের কাজ। পদার্থবিজ্ঞান যেখানে তড়িৎশক্তি, আলোকশক্তি, চৌম্বকশক্তি, তাপশক্তি, অভিযাত শক্তি (mechanical force or force by impact) প্রভৃতি বিবিধ শক্তির ও পদার্থ-প্রচুরাঙ্ঘক জড়ত্ববোধের সহিত তাহাদের নানা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবিধ ব্যাপার সৃষ্টিত হয়, বা যে সমস্ত নূতন নূতন ধর্ম উৎপন্ন হয়, পারীক্ষিক (experimental methods) উপায়ে তাহা প্রত্যক্ষ করে, সেই হিসাবে বা সেই পরিমাপে তাহা দৃষ্ট শাস্ত্র (experimental science) ও গণিতশাস্ত্রের বহির্ভূত। জড়জগতের পরীক্ষাসিদ্ধ এই সমস্ত দৃষ্ট ব্যাপারের অন্তরালে তাহাদের কারণীভূত যে সমস্ত দিক-কাল সম্বন্ধ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেইগুলির আলোচনার দ্বারা যখন গণিতিক উপায়ে এই সমস্ত জগত্ব্যাপারের কারণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়, তখন সেই আলোচনা-পদ্ধতিক গণিতিক পদার্থ বিজ্ঞান (mathematical physics) বলা যায়। গণিতে যে সমস্ত দিক-কাল সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলিই মূল ব্যাপার-পরস্পরার মধ্যে ব্যবহার করিয়া

সেই সমস্ত ব্যাপার-পরস্পরার হেতুরূপে যে সেই সমস্ত গাণিতিক সভাগুলি বিরাজ করিতেছে, ইহা দেখানই গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের কাজ। সেই জন্ম গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিতে মূল দৃষ্টমাত্রা জড়বস্তুর স্থান নাই, জড়বস্তুর ও জড়পদ্ধতি হইতে পৃথকীভূত হইয়া তাহাদের যে ব্যাপক সম্বন্ধগুলি স্থাচার দ্বারা জোড়িত হইতে পারে, গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান তাহা লইয়াই ব্যস্ত। সেই জন্ম গণিত যেমন বিকল্পমূলক শাস্ত্র, গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানও সেইরূপ বিকল্পমূলক। গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ আমাদের দৃষ্ট জগৎ নহে, তাহা বিকল্পের জগৎ (the world of abstraction)। গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানে হইটী পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটা পারীক্ষিক উপায়ে দৃষ্ট হেতুর সহিত দৃষ্ট ফলের অনিন্দ্য-ভাব সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাহার অন্তরালে তাহার মেধ-দণ্ডস্বরূপ বা কাঠামস্বরূপ সন্মুক্তক ও নিয়ামক যে সমস্ত দিক-কাল সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার তথ্য উৎসারিত করা, সেই দিক-কাল সম্বন্ধের ভাষায় জগদব্যাপারের হেতু-ফল নির্ণয় করা এই পদ্ধতির উৎপন্ন। অপর পন্থায় গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান কতকগুলি দিক-কাল সম্বন্ধের বিচার করিয়া যখন কোনও নূতন সম্বন্ধের আবিষ্কার করে, তখন সেই আবিষ্কারের বলে তদনুযায়ী প্রাত্যক্ষিক দৃষ্ট ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করে, সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সহিত যদি দৃষ্ট ফল মেলে, তাহা হইলে সেই গাণিতিক সম্বন্ধের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। Einstein তাঁহার অনেকসংখ্য গাণিতিক উপায়ে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য যদি সত্য হয়, তবে হর্যামণ্ডলের সন্নিবর্ত-বর্তী নক্ষত্রংশি সরল না হইয়া বক্রীয়া হইবে। হর্যাপ্রদেশের সময় ফটো লইয়া দেখা গেল যে, হ্রিভিতে পরিস্ফুট নক্ষত্রংশি বক্রীয়া গিয়াছে। ডিভোগ্রি (De broglie) গাণিতিক উপায়ে যখন এই সমস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছিলেন যে, জগতের সমস্ত জড়বস্তুই হ্রিভাৎ-স্পন্দাঙ্ঘক (electrical) তখন একরূপ উৎসাহাশ্রয়



হইয়াছিলেন। পরে পারীক্ষিক উপায়ে তাঁহার কথা সপ্রমাণ হইয়াছিল।

জ্ঞানের সমস্ত বস্তুর দিক-কাল সত্ত্বতির (space-time-continuum) ঘূর্ণি বা উর্ধ্বপুঙ্খ হউক বা না হউক, কতকগুলি দিক-কাল সম্বন্ধের সংরচন-চক্র (system) যে, সমস্ত জড়পুঙ্খকার পঞ্জরীভূত সভ্য হইয়া রহিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। এই পঞ্জরীভূত সত্যের মধ্যে বহুই গভীরভাবে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব, তবুই সমস্ত জড়বস্তুর সর্বসাধারণ ও সার্বভৌম তথ্য-গুলি আমাদের নিকট ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। কিন্তু একটি জড়বস্তুর যে সমস্ত নানা ধর্ম আমরা নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি সেই সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ জাতীয় ঐন্দ্রিয়িক ধর্মগুলি এই সাধারণ ব্যাপক পঞ্জরীভূত দিক-কাল-ঘটিত সম্বন্ধসংরচন-চক্রের (system of relation) অন্তর্ভুক্ত করিয়া মুখিতে পারি না। বিভিন্ন জাতীয় মূল পরমাণুগুলির পরস্পর-সংস্পর্শে ও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপাদানীভূত মূল পরমাণুগুলির পরস্পর-বিচ্ছেদে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় ঐন্দ্রিয়িক ধর্ম উৎপন্ন হয় ও ব্যাপার সঞ্চিত হয়, তাহারই অস্বীকার ও বিচ্ছেদে এই যে নানা জাতীয় পারমাণবিক সংস্পর্শ ও বিচ্ছেদে এই যে নানা জাতীয় ধর্মের উৎপত্তি হয়, গাণিতিক বা গণিত-বৈজ্ঞানিক দিক-কাল সম্বন্ধের ভাষায় বা সম্বন্ধে সেইগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। রাসায়নিক সম্বোধে যখন দুইটি বা ততোধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটি ঘাণুক, অণুক বা চতুঃপুঙ্খ হয়, তখন সেই ঘাণুক, অণুক বা চতুঃপুঙ্খের (molecules) মতো বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুগুলির ক্রিয়াকর্ম সন্নিবেশ হয় বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্ম তারাক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে গাণিতিক রসায়ন (mathematical chemistry) বা পদার্থবিজ্ঞান-ঘটিত রসায়ন (physical chemistry) অনেক ইঙ্গিত দিতে পারে ও অনেক তথ্য আবিষ্কার করে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি proton ও electron-এর কি খেলা চলিতেছে,

দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও একটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হইয়া যে ঘাণুক হয়, তাহার মধ্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু দুইটির সহিত অক্সিজেন-পরমাণুর ক্রিয়াকর্ম সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য ও তাহাদের আকর্ষণক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্ম তারাক্রান্ত এবং তাহাদের ক্রিয়াকর্ম শিথিলতায় ঘাণুকের মধ্যে ক্রিয়াকর্ম পারমাণবিক বিশেষ হয়, গাণিতিক বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারিলে গাণিতিক বিজ্ঞানের সহিত রাসায়নিক নানা ধর্ম ও ব্যাপারের যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহা বোঝা যায়, কিন্তু এই সম্বন্ধ-বিজ্ঞানের দ্বারা বা রসায়নের গাণিতিক ভিত্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা (mathematical foundation of physics) রাসায়নিক নানা ধর্মের পরিচয় টানিয়া আনা যায় না। দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু, একটি গন্ধক ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণুর সন্নিবেশে একটি sulphuric acid-এর অণুক হয়। Sulphuric acid-এর অণুটির মধ্যে এই বিভিন্ন পরমাণুগুলির সমাবেশ-বৈচিত্র্য হইতে sulphuric acid-এর নানা ঐন্দ্রিয়িক ধর্ম, তাহার রস, তাহার আশ্বাদ, তাহার স্পর্শবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া কিছুতেই অহুমান করা যায় না। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু মিলিলে এমন কি ঘটে বাহাতে তাহা এমন শ্বেত ত্ত্ব বস্তু দেখায় এবং আমাদের পিপাসা হরণ করে, তাহা বলা যায় না। একটি সোলাপ ফুলের মধ্যে আণবিক সন্নিবেশের সমস্ত তথ্য জানিলেও, যে জ্ঞানের দ্বারা বর্ণ, গন্ধ, স্রব্যাম, কোমলতায়, সৌন্দর্য্যে তাহার যে সমস্ত মূর্ত ধর্ম পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তাহার কোনও পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। গাণিতিক বা পদার্থ-বৈজ্ঞানিক দিক-কাল-ঘটিত সম্বন্ধসংরচন-চক্র যে জাতীয় তত্ত্ব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক ধর্মগুলি তাহা হইতে একেবারে বিভিন্ন পর্থাণ্যের সত্য। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিকে আমরা কোনও রূপেই সংখ্যার ভাষায় বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারি না। অথচ, তাহারা যে ভ্রূবোর সহিত অখিত, তাহার অভ্যন্তরীণ সংস্থানের প্রকৃতি সংখ্যার ভাষায় প্রকাশযোগ্য, সেই

সংস্থানের পরিবর্তনের যে সমস্ত নূতন দিক-কাল সম্বন্ধের সঞ্জন হয়, তাহাও সংখ্যার ভাষায় প্রকাশযোগ্য। ইহাও আমরা জানি, সেই সমস্ত অমূর্ত সম্বন্ধের সমাজ পরিবর্তনে ও রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি মূর্ত ধর্মের অনেক পরিবর্তন ঘটে। অতএব অমূর্ত ধর্মের সহিত মূর্ত ধর্মের যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। অথচ অমূর্ত ও মূর্তের প্রভেদ অনেক এবং ছ'এর মধ্যেই যে গভীর ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। অমূর্ত হইতে মূর্তে আসিবার কোনও উপায়ই আমাদের জ্ঞান নাই। মূর্ত ধর্মগুলির মধ্যেও একটি হইতে অপরটির আসিবার কোনও উপায় নাই। রূপ হইতে রসে, বা রস হইতে রূপে পৌঁছিবার কোনও পথই আমাদের জ্ঞান নাই। তাহা হইলেই দেখা বাইতছে যে, কতকগুলি অমূর্ত সম্বন্ধের সংরচনে যে সংস্থান নির্মিত হইয়াছে, তাহারই জড়ব্রূবোর ভিত্তি। তাহার উপর অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ঐন্দ্রিয়িক মূর্ত ধর্ম আপন আপন স্বগত নিয়মে পরস্পর একীভূত হইয়া আত্মপরিচয় দিতেছে। ঐন্দ্রিয়িক মূর্ত ধর্মগুলির স্বার্থ স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা আমরা এ প্রকল্পে করিব না, তবে আমরা এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু মুখিতে পারা যায় যে, অমূর্ত ধর্মের সংস্থানের সহিত একার্থ-সম্বোধে সন্নিবিষ্ট হইয়া নানা পর্থাণ্যের মূর্ত ধর্ম আপন আপন নিয়মে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই একার্থ-সম্বোধের তাৎপর্থা এই যে, বিশেষ বিশেষ বিভাগের (যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি) বিশেষ বিশেষ আত্মনির্ভর সম্বন্ধ-পরম্পরার পৃথক পৃথক সংরচন থাকিলেও তাহার পরিপূর্ণতার সহিত এমন একটি সম্বোধনে বা সম্ভাব্যবর্তিতার আবদ্ধ থাকে যে, তাহাদের এই স্বনির্ভর ও স্বপৃথক মূর্ত ভ্রূবোর অথও ঐক্যটিকে বাহ্যত করে না। এই পরম্পরাহীনতার একটি তাৎপর্থা এই যে, একটি অপরটির অমূল্য প্রভু থাকে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক ধর্মপর্থাণ্যগুলি প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। অথচ তাহার পরস্পরের অবিরোধে এবং মূল দিক-কাল-ঘটিত সম্বন্ধ-চক্রের অবিরোধে ও অস্বাভাবিকতা একটি অথও মূর্ত ভ্রূবাকে আমাদের সমুখে পরিচিত করে। এই অস্বাভাবিকতা ও সহযোগিতাই বহু জেনসম্মতির মধ্যে কোনও বস্তুকে তাহার-স্বভাবের অভিন্ন ও অথও করিয়া রাখিয়াছে। কোনও বস্তুকে দেখিলে তাহাকে আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি ঐন্দ্রিয়িক ধর্মের সমষ্টি বলিয়া মনে করি না, কিংবা দিক-কাল সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংরচন মাত্র বলিয়াও মনে করি না, তাহাকে একটি অথও বস্তু বলিয়াই মনে করি। বস্তুর মূল কাঠামো বা সংস্থান তাহার অভ্যন্তরীণ দিক-কাল সম্বন্ধ সংরচন। তাহার সহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া নানা বিভিন্ন পর্থাণ্যের ঐন্দ্রিয়িক ধর্মপরম্পরার সহযোগে ও অবিরোধে প্রকাশিত হয়। চিনি দেখিতে সাধা, আধাবে মিষ্ট, উপাদানে কদম্বা, স্পর্শে কর্কশ; তাহার আণবিক সংস্পর্শ-বিচ্ছেদ ও অপর অভ্যন্তরস্থ সংরচনের মধ্যে অমূল্যকান করিলে আমরা আরও অনেক নূতন নূতন তথ্য উপনীত হইতে পারি। এই বিভিন্ন পর্থাণ্যের সত্যগুলির মধ্যে একই একটি পৃথক পৃথক ভাবে তাহার নিজ নিজ পরিচয় দেয়, অথচ তাহার একাধিকভাবে সম্বন্ধ একটি অথও বস্তুর ধর্মরূপে নিজেরের জ্ঞানায়। Berkeley যখন বলিয়াছিলেন যে, ঐন্দ্রিয়িক ধর্মগুলির যে পরস্পরের এবং তাহাদের মূল কাঠামোর সহিত একটি একাধিকভাবে লক্ষ্য সম্বন্ধে বন্ধন রহিয়াছে, তখন তিনি এই কথাটা অহুধাবন করেন নাই। Locke এবং বৈশেষিক যখন বলেন যে, গুণ ভ্রূব্যাশ্রিত, তখন ভ্রূবাকে গুণাপ্রদী ছাড়া আর কোনও লক্ষণ তাহার বর্ণিত পোয়েন নাই। ভ্রূবা বর্ণিত আমাদের বুদ্ধি যে, কতকগুলি ধর্মপরম্পরা একটি মূল সম্বন্ধ-চক্রের অধরে ও অস্বাভাবিকতা পরস্পর একাধীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই একাধীভূত সংরচন-পরম্পরার একো নামই ভ্রূবা। জড়ের আরম্ভ কেমন করিয়া, ইহা, তাহা বলাও যেমন কঠিন, প্রাণের আরম্ভ



কেন্দ্রন করিয়া হইল, তাহা বলাও তেমনি কঠিন। পূর্বেরই বলিয়াছি যে, নানা ধারার সম্বন্ধ-সম্বন্ধের (series of relations) সমাবেশে জড়ত্ববোধ পরিচয়। এই সম্বন্ধ-সম্বন্ধগুলি জড়ের আভ্যন্তরীণ নানা ব্যবস্থায় নানাবিধ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। জড়শক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার,—আভিযাতিক (molar), দ্যগুণক স্পন্দনাশ্বক (molecular) ও বৈদ্যুতিক (electrical); এই তিনটা শক্তির প্রত্যেকটা অপরটাকে পরিবর্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তাপশক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি করা যায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করা যায়, তেমনি আভিযাত-শক্তি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই মূল একই জড়শক্তি, আভিযাত-শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি স্পন্দনশক্তি রূপে এবং তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা শক্তিরূপে (যথা, রাসায়নিক, চৌম্বক ইত্যাদি) আত্ম-প্রকাশ করে। যখন বিভিন্ন প্রকারের জড়শক্তি কোনও একটি কেন্দ্রে সমাবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া ঘোম-ঘিয়েসের ফলে যেটুকু অবশেষ থাকে, তাহারই পরিচয় পাই। যেখানে ঘাত-প্রতিঘাত হয় না, সেখানে প্রত্যেকটা শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যখন স্বনির্দিষ্ট রেখায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহার কোনটাই অপরটার অপেক্ষা রাখে না, বা অপরটার পরিবর্তনে আপনাকে পরিবর্তিত করে না। কিন্তু, জড়শক্তিকে অবলম্বনীভূত করিয়া যখন প্রাণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আমরা একবারে একটি নতুন রাশি আসিয়া পড়ি। এই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। কোনও জড়বস্তুর সম্বন্ধ যেমন আমরা মনে করি যে, সেই বস্তুতে নানা গুণ ও ক্রিয়া ধর্মরূপে বা বিশেষীভূত হইয়া আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভাবপ্রকাশের প্রকাশীও অনেকটা তরুণ। ভাষা মাজেই কর্তা, ক্রিয়া, কর্তা ও ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বিশেষণ লইয়া গঠিত। এই ক্রিয়া, কর্তা ও বিশেষণগুলি নানা প্রকার পরস্পরা-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া কর্তার বিশেষ রূপ

প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন যে, কর্তা, কর্তৃ প্রভৃতি ইহারা সকলেই পরস্পরা-সম্বন্ধে কিম্বার বিশেষণ। যে মতেই গ্রহণ করা নাউক না কেন, দ্রব্যগুণ জাতীয় সম্বন্ধ বা, বিশেষ্য-বিশেষণ জাতীয় সম্বন্ধও তাই। কাজেই, আশ্রয়শ্রিত ভাব ছাড়া অজ্ঞ জাতীয় ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রাণ-পার্থ্যের মধ্যে যে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে একগুণ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব নির্ণয় করা যায় না। যে সমস্ত বিবিধ ব্যাপার-পরিণামের সংরচন-প্রক্রিয়ায় (organisation of relations) প্রাণ-পার্থ্যায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যস্থ কোনওটিকে কোনওটিকে আশ্রিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। এই নতুন পর্যায়ের তরুণ সেই জ্ঞ ভাষায় ফুটাইয়া তোলা দুর্কর। জড়ত্ববোধে প্রতিচ্ছবিত ও জড় জাতীয় ভাবছবিত মনকে আবিষ্ট না রাখিয়া মনের মধ্য হইতে একবারে একটি নতুন জাতীয় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে না পারিলে, প্রাণ-পার্থ্যায়ের লীলা কিছুতেই চিত্রপটে ফুট হইয়া উঠিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাণ-পার্থ্যায়ের তিনটা বিশেষ সভার প্রাণস্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে গেলে খাস-প্রশ্বাস, রস-সঞ্চয় ও পাকক্রিয়া এই তিনটা ব্যাপার বিভ্রামন রহিয়াছে। কিন্তু এতদ্বারা যেমন তিনটা দৃষ্টান্ত উপর সম্ভারিত, প্রাণ-প্রক্রিয়াও তেমনি এই তিনটা ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপার তিনটির যে কোনওটার অভাব হইলে প্রাণ-প্রক্রিয়া বিপন্ন হয়। কিন্তু, এই প্রক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট কার্য থাকিলেও তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কাজেই প্রাণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ যেন ত্রিখা বিভক্ত হইয়া এই তিনটা ব্যাপারের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণ-প্রক্রিয়া ছাড়া এই তিনটাকে কোনওটারই কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অথচ প্রাণ-প্রক্রিয়া আছে, কি এই তিনটা প্রক্রিয়া আছে, কি প্রাণ-প্রক্রিয়া অব্যবহী, ইহারা তাহার অব্যব, একগুণ কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত

হওয়া যায় না। বস্তুতঃ অব্যব-অব্যবহী সম্বন্ধ, বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ, আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ প্রভৃতি কোনও এক-মুখী সম্বন্ধের কথাই প্রাণ-প্রক্রিয়ার পৃথ্যালোচন-প্রশ্নে উঠিতে পারে না। খাদ্যাদি ব্যাপার প্রাণ-স্বরূপে আশ্রিত, একথা যেমন সত্য, প্রাণ-প্রক্রিয়াও ঐ ব্যাপারগুলির উপর আশ্রিত হইয়া আছে, ইহাও তেমনি সত্য। প্রাণ-প্রক্রিয়া মূল, না খাদ্যাদি প্রক্রিয়া মূল বা প্রথম, তাহা নির্ণয় করা যায় না। খাদ্যাদি প্রক্রিয়া ছাড়া স্বতন্ত্র কোনও প্রাণ-প্রক্রিয়াও আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। আবার খাদ্যাদি প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটীর সহিত অপরটার এমন একটি অঙ্গুষ্ঠসিক সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, তাহাদের একটার উৎকর্ষাপকর্ষে অপরটার উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভবীত হয়। খাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া যদি উত্তমরূপে চলে, তবে রস-সঞ্চালন বা পরিপাকাদি ব্যাপারও সুনিপন্ন হয়; আবার সঞ্চালনাদি কিম্বা যদি ভাল চলে, তবে খাসক্রিয়া ও পরিপাকক্রিয়া ভাল চলে। আবার পরিপাক ক্রিয়া ভাল চলিলে খাদ্যাদি প্রক্রিয়া ভাল চলে। তেমনি ইহাদের কোনও একটার কিছু দুর্বলতা হইলে অপরটাও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই যে পরস্পরপক্ষেপিতা, ইহা শুধু অবিরোধে প্রতি বা অস্বল্প অবস্থায় প্রতি নহে। সেই জ্ঞ ইহাদের সম্বন্ধকে একাধিভাব সম্বন্ধ বলা চলে না। ইহারা পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পরের মধ্যে পর্যাণ্ড একটা প্রাণব্যবহারকে সঞ্চালিত করিয়া থাকিবে। ইহারা যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আশ্রয়রূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া কাহাকেও পাইবার উপায় নাই। সেই জ্ঞ এই সম্বন্ধকে এক-কারিত্ব বা একাধিকারিত্ব সম্বন্ধ বলা বাইতে পারে।

আর এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রাণ-পার্থ্যায়ের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ অজ্ঞভাবে নির্দেশ করা বাইতে পারে, যথা স্বগৃহীত বর্জন (self-dissimilation), স্বস্থাপন (self-preservation)। অর্থাৎ গ্রহণ, বর্জন, গতি ও আত্মস্থাপন ক্রিয়া, স্বসৃষ্টি বা বংশবিস্তার ক্রিয়া (self-multiplication), বংশপরিণাম (self-development) এবং স্বনিয়ন্ত্রণ (self-regulation) অর্থাৎ

স্বশরীরীয় যন্ত্রক্রিয়া নিয়মন, পারিপার্শ্বিক বস্তুজাতের স্বাক্ষরূপে পরিবর্তন সাধন ও তদপেক্ষায় স্বকীয় পরিবর্তন সাধন এবং স্বকীয় বিবিধ বৈষম্য সম্পাদন ও বৈষম্য সামান্যসাধন (self-differentiation, self-adaptation, self-adjustment ইত্যাদি) প্রত্যেক প্রাণ-পার্থ্যায় পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ হইতে আপন সেধোযোগী বাহ্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লয় এবং তাহার দ্বারা আপন দেহ গঠন করিয়া তোলে। বৃদ্ধাদি চারিদিকের ক্ষয়, বাতাস, আলোক ও ভূমিরস হইতে আপন দেহের উপযোগী বাহ্য আপনিই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং সেই জ্ঞ প্রত্যেক প্রাণ-পার্থ্যায়ের প্রস্তুত বাহ্য (protein) অপব্যাপার পর্যায় হইতে বিভিন্ন। প্রত্যেক প্রাণ-পার্থ্যায়ের শরীরের মধ্যে এই যে বাহ্য-সংগ্রহণ ও শরীর-বিহারণের কিম্বা চলিতেছে, তাহাকে ইংরেজীতে বলে anabolism এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণগৃহীতের অপচয় ও বিহারণ ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাকে বলে katabolism। এই উভয় প্রক্রিয়া সমষ্ট্রে ও সামঞ্জস্যের নাম metabolism। সেখানে জীবন আছে, সেখানেই আমরা তাহার এই গ্রহণ-বিসরণশাসক ক্রিয়ার পরিচয় পাই। যে জৈব বায়ু বা proteid পদার্থের গ্রহণ-বিশরণ কিম্বার দ্বারা প্রাণ-পার্থ্যায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, সেই বায়ুটা প্রত্যেক প্রাণ-পার্থ্যায়েরই যৌগযোগী বাহ্য তিন ও ইতর ব্যবস্কর। খোড়ার রক্ত ওপাদানিক বস্তু হিম্যাকে পাণ্ডার রক্ত হইতে বিভিন্ন। এই ধাতুগত বৈষম্য পূর্ণবুদ্ধিই অনেক সময়ে দেখা যায় যে, একজনকে পক্ষে বাহ্য পুষ্টিকর, অপরকে পক্ষে তাহা বিষাক্ত। জীব-শরীরের মধ্যে সর্বদা যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিয়াছে, তেমনি তাহারই আত্মস্থাপক ভাবে বিহারণের কাঙ্ক্ষ ও চলিয়াছে। আবার বিহারণের আত্মস্থাপক ভাবে গ্রহণ চলিয়াছে। একটি নির্দিষ্ট কালের জ্ঞ এই গ্রহণ-বিসরণ ব্যাপারের এমন একটি ছন্দ আছে যে, সমস্ত আশ্রয়-নির্গম-গ্রহণ-বিসরণের মধ্য দিয়া একটি স্থায়ী প্রাণ-প্রবাহ আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত রাখে। একটি প্রকাণ্ড সূর্যের মধ্যে যেমন



নূতন জল আলে ও পুরাতন জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এই জলের আশ্বাশ-নির্গমের মধ্যে ঘৃণীতা আপনাকে অব্যাহত রাখে, প্রাণ ব্যাপারও তেমনি একটী নিষ্কিষ্ট কালের জ্ঞাত স্বভাব উপচরণচরের মধ্যে আপন প্রবাহকে অস্থির রাখে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়াও যদি এই গ্রহণ-বিশরণাশ্বক প্রাণ-ব্যাপার শুরু থাকে, তথাপি প্রাণ-প্রক্রিয়ার কোনও হানি হয় না। কোনও কোনও বীজ ৮৭ বৎসর পর্যন্ত পড়িয়া থাকিয়াও অস্থির হইতে দেখা গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যাপারময় না হইয়াও একটা অখণ্ড প্রাণন কেমন করিয়া সত্যীকৃত হইয়াও আশ্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহা মনীবিশেষেরও ক্ষমতা। প্রাণ-পর্যায় পারিপার্শ্বিক বহিঃস্থ হইতে শক্তি আহরণ করে, আশ্রিত শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখে, মিতব্যয়িতার সহিত খরচ করে ও অপর প্রাণ-পর্যায় সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সেই শক্তি সক্রামিত করে। "The animate system is aggressive on the energy available to it, spends it with economy and invests it with interest till death finally deprives it of all."

প্রাণ-পর্যায় যে কেবল বহিঃস্থ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া নানা ব্যাপার-পরম্পরা পরিবর্তনের মধ্যে নিজের কার্যোপযোগী বৈধ গঠন করিয়া তুলিয়া নানা ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চলে তাহা নহে, সে তার আপন সূক্ষ্ম প্রাণ-পর্যায় সৃষ্টি করিয়া ধারা-প্রবাহে নিরন্তর আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া রাখে। পারিপার্শ্বিক বাহিরের জগৎকে সে যেমন একদিকে আপন অস্থূল, আপন দেহাভ্যন্তরে পরিণত করিয়া তোলে, তেমনি পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সামঞ্জস্য চলিবার জ্ঞাত আপনাকে উদাহরণে পরিবর্তিত করিয়া তোলে। উপনিষদে আছে "তদনন্তং বহুতান্"। তাহার ঈক্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা তিনি আপনাকে বহুতা বিভক্ত করিয়া তুলিলেন। তেমনি দেখিতে পাই যে, একটা জীবকালের মধ্যে কি

অজ্ঞাত ঈক্ষণ-ক্রিয়ার ফলে তাহার অন্তর্গত কোমোজন্ম-

গুলির মধ্যে কি এক প্রক্রিয়া চলে, বাহার ফলে সেই জীবকোষটা আপনাকে বিধা বিভক্ত করিয়া স্বভাবভাবে হই পৃথক প্রাণ-প্রক্রিয়ার আশ্রয় করে। আবার বহুকোষী (multi-cellular) প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে, যদিও প্রত্যেকটা কোষের স্বতন্ত্র জীবন-প্রণালী চলিয়াছে, তথাপি অজ কোষের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব। একটা শিশনাশ গাছকে টুকরা করিয়া ফেলিলে, তাহাদের প্রত্যেকটা জীবকালের জীবনই অসম্ভব হয়, আবার একটা প্লঙ্ককে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেও প্রত্যেক চূর্ণ আপন জীবনশক্তির প্রভাবে আপনাকে বহুতা বিভক্ত করিয়া নিজের জীবনকে প্রকৃষ্টিত করিয়া তোলে।

ডাউউইনের জন্মবিকাশ মতের তাৎপর্য এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও আহাশ-সংস্থানের জ্ঞাত জীব-জগতে প্রাণি-পর্যায়ের পরস্পরের মধ্যে সর্দনা একটা ঘন্ড (struggle for existence) চলিয়াছে। সেই ঘন্ড ঘটনাক্রমে যে জীবের যে সুযোগটা আছে, সেইটাই তাহার সহায় হয় এবং বংশ-সম্ভতির মধ্যে বাহ্যদের সেই সুযোগটা থাকে বা অজ জাতীয় কোনও সুযোগ আশিয়া ছোটে, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া যায়। এমনি করিয়া দেখা যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী সুযোগ-সুবিধা লইয়া নানা প্রাণিসম্প্রদায় জন্মিয়াছে। বাহু জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রাণিসম্প্রদায় তাহার অস্থূল চণিতে পারে নাই, তাহারা ধ্বংস পাইয়াছে—আর তাহারা স্বকীয় সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে নিজেরের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহারা টিকিয়া গিয়াছে। এই যে অস্থূলজন্তের সূচনা এবং উপজন্তের স্থিতির একটা বাছাই (selection) চলিয়াছে, ইহাকে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)।

এই প্রাকৃতিক নির্বাচন একেবারে অসম্ভব হইত যদি, জীবিতেরা বাহ্যদের উৎপন্ন করে, তাহারা সকলেই মাতাপিতার সর্গণ অধরূপ হইত। জীবিতেরা

বাহ্যদের উৎপন্ন করে, তাহারা সকল সময়েই পিতা-মাতার কিঞ্চিৎ অধরূপ ও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। এই বৈষম্য উপাদানের নাম আকস্মিক বৈষম্য বা accidental variation। প্রতি বংশে নূতন নূতন বৈষম্য হয় বলিয়াই সেই বৈষম্যগুলির মধ্যে বেগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামের উপযোগী, তাহার একটা বাছাই হইতে পারে, এইরূপ একটি একটু বৈষম্যের মধ্যে বংশপরম্পরার বাছাই ও নূতন নূতন বৈষম্যের সৃষ্টি ও তাহাদের বাছাই চলিয়াছে এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই জগতের এই বহুতা বিভিন্ন জীববাহ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই ডার-উইনের মত। কিন্তু বরদে ডারউইনের এই মত মোটো-মুটোভাবে অনেক পরিমাণে সত্য, তথাপি কেবলমাত্র সামান্য সামান্য বৈষম্যের সঙ্ঘ হইতেই যে এত বিভিন্ন জীবপার্থ্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। Weismann বলেন যে, প্রত্যেক জীবের জীবনী মধ্যে ছুটী অংশ আছে। একটা দেহ-নির্মাণক অংশ, অপরাটা মূল বীজাংশ (germplasm)। মূল বীজাংশটা বংশাধিকারে অবিচ্ছিন্নভাবে সংক্রমিত হইতে থাকে। প্রত্যেক বংশের মধ্যবর্তী পুরুষাধিকারে প্রাপ্ত এই বীজাংশ পরবর্তীতে সংক্রমিত হইয়া তাহার বাহ্যদের আশ্রয় করে। এই মূল বীজ হইতে আরম্ভ জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপন দেহ আপনি নির্মাণ করিয়া লয়। কিন্তু এই ব্যাধাতেও এই অসংখ্য বিভিন্ন প্রাণ-পর্যায়ের উৎপত্তির কোনও সহজতর পাওয়া যায় না। অনেক বলেন যে, প্রত্যেক কোষের অন্তর্গত কোমোজোমগুলি যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব-শক্তি সমন্বিত। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন কোমোজোমগুলির বিভিন্ন রকম ঘটন-বিঘটনের উৎপত্তি হয়। এই ঘটন-বিঘটনের ফলে সেই কোমোজোমগুলির যে বিভিন্ন বিভাগ-পরম্পরা হয়, তাহারই ফলে নানা জীব-পর্যায়ের

উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন জীবকালের মধ্যে কোমোজোমগুলির নানাবিধ সংঘাতবিভ্যে দেখা যায়। কোমোজোমের এই সংঘাতবিভ্যে মানিতে গেলে আদিম জীবকালের বৈষম্য মানিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বিভিন্ন জাতীয় জীববাহ্যের সম্মিশ্রনের দ্বারা নানা বিভিন্ন জীব-পর্যায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ মতও গোড়া হইতেই একটু বৈষম্য না মানিলে বিভিন্ন জাতীয় জীবকালের শুল্কন ব্যাধা করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, একটা অখণ্ড প্রাণশক্তি নানাবিধ আবারণের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া সম্পূর্ণভাবে আশ্বপ্রকাশ করিতে পারে না। এই ব্যাধগুলির সহিত জীবশক্তির সর্গবাহী একটা ঘন্ড চলিয়াছে; সেই ঘন্ডের ফলে বিভিন্ন ব্যাধগুলি যেমন যেমন বিভিন্ন ভাবে অপসারিত হয়, এই সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণ-পর্যায় আশ্বপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোনও মতকেই হৃদঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। জীবতাবকে জীবশক্তি বলিয়া ব্যাধা করিলে এই কথাই মনে আসে যে, জীবশক্তিও বৃদ্ধি জড়শক্তির অধরূপ আর একটা মূঢ়শক্তি মাত্র। তাহাই যদি হইল, তবে সে শক্তি ত জড়শক্তিরই প্রকার বিশেষ হইল। কিন্তু জীবতাবের মধ্যে গ্রহণ, ধারণ, বর্জন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার-পরম্পরার সামঞ্জস্য ও ঐক্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কোনও জড়শক্তি তাহা সম্পাদন করিতে পারে না।

প্রত্যেক জীবতাবের মধ্যেই আমরা শক্তি দেখি, কিন্তু সেই শক্তি সেই জীবতাবের ফল, ফেঁদু নহে। আগে জীবতাব মানিলে তবে শক্তি সিদ্ধ হয়, শক্তির দ্বারা জীবতাবের উৎপত্তি হয় না। জীবের মধ্যে যত কিছু শক্তির পরিচয় আমরা পাই, সে সমস্ত জীবতাবের অন্তর্গত রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি-বিশেষের ফল মাত্র। জড়শক্তি ছাড়া জীবের কোনও স্বতন্ত্র শক্তি নাই। পারিপার্শ্বিক জড়বস্ত হইতে উদ্ভিদ আশ্রয় আহার সংগ্রহ করে, আর অজ্ঞাত প্রাণীরা সেই উদ্ভিদ হইতে কিবা অজ্ঞ প্রাণিধ্বং হইতে আপন







প্রতিভা তা হয়। আধান-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ উদ্বেগ স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণ; কিন্তু, তথাপি কোনও বিশেষ আধান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলেই যে সেই বস্তুটা সেই বিশিষ্ট জীবের স্বরক্ষণ বা বংশরক্ষণের প্রতিকূলে, তাহা বলা যায় না। ক্রম-পরিবর্তমান বিচিত্র অবস্থা-সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত বিশিষ্ট আধান-পদ্ধতিকে একটু একটু বদলাইতে চায়। এই বদলাইবার ক্ষমতাকেই স্বরক্ষণ ও বংশরক্ষণে ক্রমশঃ পটুতা জন্মে।

সেই *biological experience* বা জৈবসম্ভার বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই আধান-পদ্ধতিতেই ক্রমবিকাশের ধারায় সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে আধান-পদ্ধতির যে নূতন নূতন পথ্যানে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি চলিতে থাকে, তাহার দ্বারা বহির্জগতের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান ক্রমশঃ সম্ভব হইয়া উঠে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেমন দিক-কাল সত্যতির নানা সম্বন্ধ স্রচনচক্রে নানা বিশিষ্ট আধান-সংহতি হইয়া নানা জড়স্বাধ্যাক্ষক আধান-সংহতির উপর পদক্ষেপ করিয়া একাধিক বারই নূতন নূতন আধান-পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করিয়া নানা জীবরূপে আপনাকে পরিচিতি করিতেছে।

মহাব্যতের প্রায় সমস্ত প্রাণিগণই জীবনযাত্রা পথ্যালোচনায় করিলে দেখা যায় যে, জৈবব্যাপারের অধুরোধে ছাড়া পারিপার্শ্বিক বহির্জগতের সহিত তাহাদের আর কোনও জাতীয় সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। যখনই বহির্জগতের সহিত কোনও জৈবসংঘর্ষ ঘটে, এবং নূতন নূতন আপদ-বিপদ উপস্থিত হয়, তখনই আধান-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সঞ্চিত শক্তির ব্যবহারে জীবপুরুষেরা সেই বিপদ জ্ঞাপ হইতে জ্ঞাপ হইবার চেষ্টা করে, এবং যে উপারে জ্ঞাপ পাইল, সেই উপারের সহিত বিপদটা একটী অবিস্মৃত সম্বন্ধে তাহার আধান-পদ্ধতির মধ্যে সংহতি হইয়া যায়। শুধু বিপদ-অপদের বেলাই যে একথাটা ঘটে তাহা নয়, আহার-বিহার, স্বরক্ষণ-বংশরক্ষণ

প্রভৃতি সকল জৈবব্যাপারেরই অহুকূলে প্রতিকূলে বাহ্য জগতে বাহ্য কিছু ঘটে, সে সমস্তগুলি তাদৃশ জৈব-ব্যাপারের সহিত অবিস্মৃত সম্বন্ধে আধান-পদ্ধতির মধ্যে মুদ্রিত হইয়া যায়। তাহার ফলে যখনই জৈব-ব্যাপারের কোনও সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ণাভ্যন্তর অহুকূল ক্রিয়ার দিকে আধান-পদ্ধতি উৎসাহিত হইয়া উঠে এবং তাহার অঙ্গসংগণ করিয়া সেই জীবপুরুষটী বহির্জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। অনেক সময়ে বংশগত পূর্ণসঞ্চিত জৈব-সম্ভারের ফলে আধান-পদ্ধতি স্বভাবতঃ স্ব স্ব জীব-নোপযোগী উপায়-পরম্পরার মধ্যে প্রবর্তিত করে। এই জাতীয় সমস্ত ব্যবহারকেই আকৃতি বা *instinct* বলা যায়। কিন্তু এই সমস্ত আকৃতি ব্যবহারের বিশিষ্টতা এই যে, সেই সমস্ত জ্ঞাপোপায়, আহারোপায় বা রক্ষণোপায় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার-পরম্পরা জৈব সমজাটী উপস্থিত হইলেই আধান-পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়, অতঃপরে তাহাদের অস্তিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। উপায়গুলি সর্বদাই মূর্তরূপে জৈবসমজার সহিত অদ্বিত হইয়া থাকে, এবং কেবল-মাত্র জৈবসমজার নির্মাহকরূপে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ইতর প্রাণিদের মধ্যেও এই বহির্জগতের প্রতিফলন ও অহুকূল ক্রিয়ার অঙ্গসংগণ-পদ্ধতিটা যে জৈবসমজা ছাড়াও উপস্থিত হইতে পারে, তাহার একটা পুটনা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়; নানাবিধ গৃহপালিত জন্তকে যে মহত্যাচিতি নানাজপ কাণ্ড শিখাইতে পারা যায়, ইহা তাহার একটা দৃষ্টান্ত; কিন্তু মহত্যাচিতির মধ্যেই আমরা সর্ব-প্রথম বুদ্ধি ও জ্ঞানাত্মক একটা নূতন ভূমির বিকাশ দেখিতে পাই। এই বুদ্ধি-ভূমির স্থিতি ও সন্ধারণ-ভিত্তিরূপে আমরা যে একটা বিশেষ আধান-পদ্ধতি দেখিতে পাই, তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নহে। ইহার চৈতিক বৃত্তিতে (*psychological function*) বহির্জগতের নানাজাতীয় শক্তি ইন্দ্রিয়দ্বয়ের দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,

স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিরূপে চিত্ত-ভূমিতে আশঙ্কিত হয়। সেইগুলি আবার চৈতিক বৃত্তির গ্রহণ, সন্ধারণ, স্বরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তান্তরের দ্বারা স্বতঃ স্বতঃ ভাবে গৃহীত হইয়া ও পরস্পর একীভূত হইয়া বিভিন্ন মূর্ত বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ রাখিয়া যায়। প্রাথমিক দশায় এই বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ জীবপুরুষের উপযোগিতাতেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ চৈতিক আধান-পদ্ধতিতে বিভিন্ন বস্তুগুলির ও তাহার ব্যাপারগুলির যে বিভিন্ন বিভিন্ন সম্বন্ধ সঞ্চিত হয়, তাহার তাৎপর্য থাকে জৈবপ্রয়োজনসাধনের মধ্যে। কিন্তু, মহত্যাচিতির জীবের জগতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক যেমন জৈবপ্রয়োজনে-কেই কেন্দ্রীভূত করিয়া হইয়া থাকে, মহত্যাচিতির মধ্যে তাহা হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দিয়া অনবরত নানা বস্তু ও ব্যাপারের ছাপ আধান-পদ্ধতির ক্রিয়ার সর্বদা চিত্তের মধ্যে সংহিত হইতেছে, সেগুলি জৈব প্রয়োজনোপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাহাও, যতই বস্তুতে আকৃতি থাকে ততই এই জাতীয় নূতন উপলব্ধিগুলি একদিকে যেমন জ্ঞাত্যসারে হয়ত বা শৌণ জৈবপ্রয়োজনসিদ্ধির সহিত অদ্বিত হইতে থাকে, হয়ত বা উপলব্ধিগুলির কোনওটিকে মুখ্য করিয়া অপরগুলি তাহার সহিত যৌগভাবে জড়িত হইতে থাকে, তাহাদের কতকগুলি আবার সম্বন্ধ-সংস্থানের মধ্যে যান না পাইয়া কিছুকালের জ্ঞাত্য ভাঙ্গিয়া থাকিয়া আবার চিত্তভাত্তরে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতে থাকে। অপরদিকে তেমনি নানা রূপের, নানা মনের, নানা আকৃতির যে সমস্ত বিভিন্ন সন্নিবেশ চাখুয়া পৃথিবীর চারিদিক পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সেইগুলি চিত্তের জ্ঞাত্যসাধারে চৈতিক আধান-পদ্ধতিতে তাহার গভীর সংস্কার রাখিয়া যায়। ততইই দেখা যাইতেছে যে, মূর্ত বস্তুগুলি একদিকে জৈবপ্রয়োজনের সহিত অদ্বিত হইয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে সংহিত হয়, আবার যেগুলি জৈবপ্রয়োজনের সহিত সাক্ষ্য ভাবে অদ্বিত হয় না সেগুলিও হয়ত কোনও না কোনও রকমে যৌগভাবে অদ্বিত হয়, কিংবা

চিত্তের আধান-পদ্ধতি নিজের স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলির মধ্যে কোনওটাকে প্রধান করিয়া, অপর-গুলিকে শৌণ করিয়া, তাহাদের পরস্পরের নিজের ভাবে একটা তাৎপর্য সৃষ্টি করিয়া, সেগুলিকে সংহিত করিয়া রাখে। আবার আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, জগতে এই যে নানা প্রকারের রূপের খেলা চলিয়াছে, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, শৈল প্রভৃতির যে বিচিত্র অবয়ব-সরিরবয়ের কার্যকার্য, যে বিবিধ রেখার বিচিত্র বিভ্রাস্ত-পরম্পরা সর্বদা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দিয়া চিত্তের আধান-পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্ঠ হইতেছে, সে বস্তুগুলি ভূমিমা গলেও সেই বিভ্রাস্ত-বিশেষের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য আধান-পদ্ধতির মধ্যে তাহার গভীর সংস্কার রাখিয়া যায়। আমরা কোনও একটা স্বন্দর দৃশ্য দেখিলে সে দৃশ্যটী আমাদের চিত্তপটে আঁকা থাকিতে পারে, এবং কল্পনার ছবিতে অতঃপরে সেটাকে মনের সম্মুখে আনিতে পারি। কিন্তু এমনও ঘটে যে, সেই দৃশ্যটার কথা আমাদের কিছুই মনে নাই, কিন্তু যে রেখা ও অবয়ব-বিশেষের সমাহৃত-বস্তুত্ব (*symmetry*) বা বিচিত্র রঙ্গের খেলার দৃশ্যটাকে স্বন্দর করিয়াছিল, তাহার একটা যৌগ-সংস্কার চিত্তের অজ্ঞাতে অদ্বিত হইয়া থাকে। এমনি করিয়া প্রকৃতির সমস্ত বস্তুই সমাহৃতবস্তুত্ব ও স্বন্দরজনকতা যে একটা সম্বন্ধক-চারিদিকে রচিতি হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংস্কার সর্বদাই আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত ও আদিত হইতেছে। ইহা কোনও *abstraction* বা বিস্মাখ্যক বৃত্তি নহে, ইহা মূর্ত না হইয়াও একরূপ মূর্ত। অথচ কোনও বস্তু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নাই বলিয়া ইহা ব্যাপক (*universal*) চিত্তের আধান-পদ্ধতির সৌন্দর্যক ব্যাপার (*aesthetic activities*) বলিয়া একটা স্বতঃ ব্যাপার বা বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা এই সংস্কারগুলির সহিত যখন তাহার অঙ্গপাটী অঙ্গ উপলব্ধির নিমিত্ত ঘটে, তখন সেগুলিকে পূর্ণসঞ্চিতগুলির সহিত সম্পর্কীভূত করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার ফলে আনন্দ উদ্বেল হইয়া



উঠে। আবার এই রুতির দ্বারাই অন্তর্নিহিত এই সামন্তের সংসারগুলিকে আবার নতুন নতুন রূপে, শব্দে, রসে, রেশবা, স্বাদের প্রকাশ করিতে পারে। চিত্তহুমির আধান-পদ্ধতির আর একটা বিশেষ বৃত্তি এই যে, তাহার দ্বারা মৃত্ত বস্তুর বিবিধ ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্র পদার্থে সাধারণ মনের সম্মুখে বিস্তৃত করিতে পারে, এবং এই বিস্তৃত, বিচ্ছিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় মনো নানা প্রকারের সম্বন্ধজাল সংরচিত হইতে পারে। এই রুতিকের বিকল্পাঙ্ক বৃত্তি বা logical function বলা যাইতে পারে। চিত্তের অন্তর্নিহিত আধান-পদ্ধতি সর্বদা ধর্ম ও ধর্মীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা জাতীয় ধর্মের মধ্যে ও নানা জাতীয় ধর্মীর মধ্যে নানা রূপ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে। এই সম্বন্ধ সংরচনের একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আছে, তাহারই অঙ্গস্বরূপ করিয়া মানুষের চিত্তাপদ্ধতি নানাদিকে প্রাবর্তিত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

আবার এই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তহুমির মধ্যে অর্ধবোধ বা value sense নামে একটা নতুন পর্যায়ে প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকাশটা চৈতন্য আধান-পদ্ধতির বেন দ্বিচ্ছিন্ন স্বরূপ। চৈতন্য আধান-পদ্ধতি যে পরিমাণে জৈবপুরুষের প্রয়োজন সাধনে ব্যস্ত, তাহার দৃষ্টতে অর্ধবোধ কোন কার্যটি জৈবরুতির অঙ্গুল হইল বা হইল না, সেই দিকে অঙ্গুল নির্দেশ করিয়া সর্বদাই বেন মানুষের সকল জৈবকার্যকে শাসন করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই অঙ্গুলের তাল-মন্দ, উচিত-অসুচিত এই বোধের সৃষ্টি করিতেছে। আবার মানুষের চিত্ত জৈবপ্রয়োজনকে ছাড়িয়া তাহার নিজের মধ্যে অভাব সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া তোলে, কি পরিমাণে মানুষের কার্য তাহার অঙ্গুল বা প্রতিকূল হইল, এই অর্ধবোধই তাহার নতুন নতুন শাসনবাণী প্রচার করিয়া থাকে।

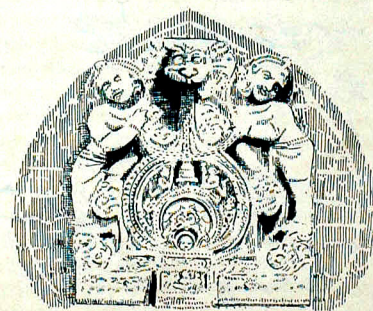
মানুষের চিত্তহুমির অন্তর্নিহিত আধান-পদ্ধতি যে সমস্ত বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা বিস্তৃত করা গেল,

সেইগুলি সংহত করিলে মানবীয় চিত্তহুমির নানা বিশিষ্টতার কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। মানুষের চিত্ত যে তাহার চিত্তা-পদ্ধতি, তাহার বিশেষ-শক্তি, তাহার অতীতগামী স্বতির দ্বারা জৈবসংস্থা উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব হইতেই মানুষকে জৈবপ্রয়োজনের প্রতিকূল পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া অঙ্গুল পথে চালিত করিতে পারে। এই জ্ঞান মহত্বের প্রাণী অপেক্ষা মানুষের পক্ষে জৈবপ্রয়োজন সাধন করা অনেক সহজ। প্রথম দশায় মানুষের চিত্তাশ্রম প্রায় সমগ্রই জীবপুরুষের বশবর্তিত্য নিয়োজিত হয়, কিন্তু মানুষের চিত্তার সামগ্ৰী, শক্তি ও বিষয় বই বাজিতে থাকে, ততই সেই চিত্তা-রাছের মধ্যে জীবপুরুষের প্রয়োজনাতিক্রম নতুন সামগ্র্য ও ঐক্যের সংরচন-চক্র গঠিত হইয়া থাকে। সর্বমানবের চিত্তা-পদ্ধতির মধ্যে একটা সামা থাকিলেও প্রত্যেক মানুষের চিত্তার গতি ও প্রকারের গোঁব-নুবা বিচারের নানাবিধ তাৎপর্য নির্ণয়ের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, সর্বজীবের জীবন-পদ্ধতিতে একটা সামা থাকিলেও প্রত্যেক জীবের যেমন বহির্বল্লকে স্বপ্রয়োজনের অঙ্গবর্তী করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী বা আধান-পদ্ধতি আছে, প্রত্যেক মানুষেরও তেমনি বহির্বল্লকে ও তাহারের বিবিধ ধর্মনিচয়কে নিজের চিত্তহুমির অন্তরঙ্গ করিবার একটা বিশেষ আধান-পদ্ধতি আছে। এই আধান-পদ্ধতির বিভিন্নতাতেই মত, চিত্তা, বাসনা প্রভৃতির এত বৈধম্য। জৈবপুরুষের বেলায় যেমন তাহার জৈব আধান-পদ্ধতির অঙ্গুলতায় ও প্রতিকূলতায় স্বহৃৎস্বের উত্তর, বৌদ্ধ পুরুষেরও (intellectual personality) তেমনই তাহার চিত্তার আধান-পদ্ধতির অঙ্গুলতায় ও প্রতিকূলতায় স্বহৃৎস্বের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ পুরুষের এই আধান-পদ্ধতিকে সেই জ্ঞান তাহার ধাতুপুরুষ (structural personality) বলা যাইতে পারে। এই ধাতুপুরুষকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই নানা ব্যাপারের কলে যে নানাবিধ জ্ঞান, চিত্তা, উপলব্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, রাগ, যেষ প্রভৃতি বিভিন্ন ভিন্ন পদার্থ (conscious state) প্রস্তুতভাক্ত স্বতি সংগার

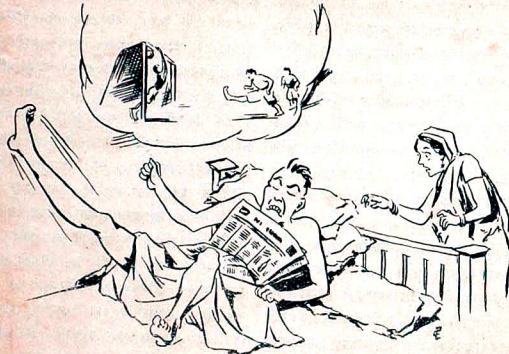
ও হৃৎসংসার সঞ্চিত ও পিত্তীকৃত হইয়া থাকে, সেই বোধ ঐক্যটিকে অঙ্গুলতায় বলা যাইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, জৈবপুরুষের উপর অবলম্বন করিয়া যে ধাতুপুরুষটি গড়িয়া উঠে, তাহারই ভিত্তিতে অঙ্গুলতায় পুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের সমগ্র মানুষের চিত্তটি গড়িয়া উঠে। জৈবপুরুষের আধান-পদ্ধতি বৈধম্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংযোগে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে, ধাতুপুরুষের আধান-পদ্ধতিও তেমনি অঙ্গুলতায় পুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের ব্যাপকতার সহিত ক্রমপরিবর্তিত হইতে থাকে। এবং এই জ্ঞান সে ধাতুপুরুষের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া আপন অর্ধবোধের অঙ্গুলতায় আপনাকে প্রবর্তিত করে। অর্ধবোধও তেমনি প্রথম দশায় জৈবপুরুষের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত থাকে, কিন্তু অঙ্গুলতায় পুরুষ ও বৌদ্ধপুরুষের ব্যাপ্তির ও বিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বৌদ্ধপুরুষের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রবর্তিত করে। জৈবপুরুষের মধ্যে যেমন একটা অংখ ও অবিক্ষেপ ঐক্য আছে, বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে সেদগ্ধ ঐক্য নাই কিন্তু ঐক্যের

প্রচেষ্টা আছে। বৌদ্ধপুরুষের মধ্যে নানা রুতির নানা দাবী এক সময়ে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রবল ও দুর্বল হইয়া উঠে। সেই প্রবল-দুর্বল রুতিনচয়ের পরস্পর যে পরিমাণ সামঞ্জস্য সঞ্চিত হইতে পারে, সেই পরিমাণেই বৌদ্ধপুরুষ জৈবপুরুষ হইতে মুক্তিলাভ করে। বৌদ্ধপুরুষের প্রক্রিয়া যে পর্যাণত না ধাতুপুরুষকে পরিবর্তিত করে, সে পর্যাণত এই ঐক্য-সম্পাদনের চেষ্টা রূপ। সেই জ্ঞান সমস্ত সাধন-পদ্ধতিরই চরম চেষ্টা এই বৌদ্ধপুরুষের ঐক্য সম্পাদনের অঙ্গুলতায় পরিবর্তিত করা। বৌদ্ধপুরুষের সমস্ত গুণ রহস্যই প্রায় এই ধাতুপুরুষের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতির যে গতিতে জড় হইতে জীব হইয়াছে এবং জীব হইতে বৌদ্ধপুরুষ উপর হইয়াছে, তাহার চরম আদর্শ বৌদ্ধপুরুষের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা। সেইজ্ঞান বৌদ্ধপুরুষের বিস্তারের দ্বারা ধাতুপুরুষকে স্পর্শ করাই আমাদের লক্ষ্য।

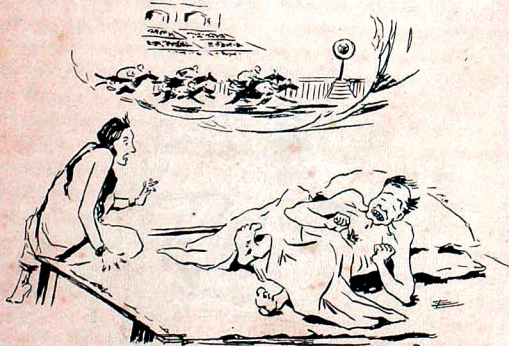
“ইহ চেদ্রাবৌদীং অং সত্যমিত্তি ন চেদ্রিবৌদীং মহতী বিনাটী।”







— এইবার! মেরে দাও —!



এঃ.....! neck to neck.....!

# বুদ্ধবলিদায় প্রাণলজ্জাৎ মুখোজাধ্যায়

(পূর্বাভূতি)

এক ঘরে ঘর করিতে গেলে এমন করিয়া বেশিদিন চলে না। হয় তাহাদের অন্তর চলিয়া যাইতে হয়, কিংবা আবার যেমন ছিল, তেমনি করিয়াই থাকিতে হয়।

মাসি রাগ করিয়া থাকিলে কি হইবে, দেখু তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। ছদিন যাইতে না যাইতেই রাগ-অভিমান তাহার সে একরকম জোর করিয়াই ভাঙ্গাইয়া দিল। মাসিরও তাহাতে যে বিশেষ-কিছু আপত্তি ছিল তাহা নয়, তবে সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'দেখলে বোমা, কা'র দোষ দেখলে ত' ? বীরেন যে আমায় সেদিন এমন ক'রে বললে, কিন্তু নিজের ছেলের দোষটি ত' কই একবারও ভেবে দেখলে না।'

নারায়ণী মুহ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাসি বলিল, 'না, হাসি নয় বোমা, আমি ত' বাছা একরকম জোর ক'রেই সেদিন ঘর থেকে ওকে বের ক'রে দিলাম, তুমিও রেষা-মেসো জোর ক'রেই ওকে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলে, কিন্তু আমার কি আর তারপর থেকে নীচে নামবার জো রইলো। যতবার নামতে যাই, দেখি না দড়ি ছেলে হাতে তিল নিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বলে, 'অস্থির করছে, ঘরে গুমোগুণে যাও, নেনমেছ কি তিল মেরে তোমার পা খোঁড়া ক'রে দেবো।' তারপর যেই একটু শব্দ হ'য়ে বলছি—'কেনরে, তুই আমায় তিল মারবার কে ? বেরো বলছি আমার সমুখ থেকে, আমার সঙ্গে কথা বলসুনি।' বাসু, যেই বলা আর বায় কোথা! তিলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রইলো দাঁড়িয়ে সেইখানে

মুখ ভারি ক'রে। ভুলেও আর মুখ ভুলে একবার তাকালে না। এমন ক'রে আর কতক্ষণ থাকি বল! কিন্তু এই আমি ব'লে রাখলাম বোমা, শেষ পর্যন্ত দোষ হবে আমার। ওর বাবা শেষে আমাকেই দোষী করবে।'

নারায়ণী বলিল, 'তার কথা ছেড়ে দিন না! ওর বাবার কথা আপনি ধরেন কেন?'

'তা ধরতে হয় বই-কি বাছা! ও ভেবেছে, বুঝি ভালবেসে বেসে ছেলেটার মাথা আমিই খেয়ে দিলাম, কিন্তু তা' যে নয়, সেকথা ত' ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

অর্থাৎ মাসি বলিতে চায় যে, দেখুকে সে ভালবাসে না বরং ঠিক তাহার উলটা;—দেখুই তাহাকে ছাড়িতে চায় না।

তা এই ভাবিয়াই মাসি যদি সন্তুষ্ট থাকে ত' থাক। নারায়ণী বলিল, 'সেকথা ওঁকে আমি বুঝিয়ে দেবো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মাসি বলিল, 'কিন্তু আর-একটা কথা বাছা তোমায় আমি বুঝিয়ে বলি। বীরেনকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো।'

কথাটা শুনিবার জন্ত নারায়ণী প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বলিল, 'বসুন।'

মাসি বলিল, 'তোমাদের ভাড়া দিয়ে আমি ভেবেছিলাম ওই টাকা দিয়ে আমি আমার খরচ চালাব। কিন্তু তা' বাছা আমার হ'ল না। তিন মাসের ভাড়া তোমাদের বাকি প'ড়ে গেল।'



নারায়ণী বলিল, 'সেজ্ঞে আপনি ভাববেন না মা, এমাসে সেই যে সেই থোকার নামে কি-সব করতে হ'ল কিনা...'

মাসি বলিল, 'কিন্তু তুমি জ্ঞান না বাছা, সে টাকা গুকে মাসে মাসে দিতে হবে। তাছাড়া বীরেনের আরও অনেক খরচ—'

মাসি বোধকরি তাহার মস্তপান ইত্যাদির কথাই বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কথাটা পালাটাইয়া লইয়া বলিল, 'সমসারী মানুষ, একসঙ্গে অন্তগুলো টাকা দিতে ও পারবে না মা, তাই বলছিলাম কি, আর-একখানা ঘর আমি ভাড়া বসাই।' তা'তে তোমাদের অস্থবিশে কিছুই হবে না মা, তেমন লোককে ভাড়া আমি দেবো না।'

নারায়ণী দেখিল, মাসির প্রস্তাবটা তেমন কিছু অঙ্গত নয়। তিনমাসের বাকি ভাড়া একসঙ্গে সেওয়া দূরের কথা, কখন যে দিতে পারিবে তাই বা কে জানে। হুতরাং সে যদি তাহাদের কোনোরকম অস্থবিশা না করিয়া আর একঘর ভাড়া বসায় ত' তাহাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। 'অত বাড়ীওয়ালা হইলে এতদিন তাহাদের সাধনার বাকি কিছু থাকিত না।'

নারায়ণী খানিক ভাবিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা আপনি আহম্ম না, গুকে আমি বৃশিবে বন্দু'। 'বৃশিবে ব'লো বাছা, শেষে যেন বীরেন আমার দোষী না করে।'

নারায়ণী হাসিল। বলিল, 'না, তা' করবে না। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি মা, আমরা আপনার এখান থেকে কিছুতেই উঠ ব'না।'

মাসিও তাহা চায় না। আসল ব্যাপারটা সে বড়ই গোপন করুক, সেবেকে ছাড়িয়া সে থাকিবেই বা কেমন করিয়া। নারায়ণী যদি না বলিত, মাসিকে হস্ত নিক্ষেপে সেকথা বলিতে হইত এবং শুধু এই জটাই বীরেনকে তাহার এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা।

নারায়ণীও যে সেকথা না বৃশিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু মুখ খুটিয়া তাহারও কিছু বলিবার উপায় নাই।

মাসি শেষ পর্যন্ত খুশিয়াই বলিল। বলিল, 'ভবে তোমাকে খুশেই বলি বাছা, বীরেন যদি মাসে মাসে দশটা করে টাকাও আমাকে দিতে পানত, তাহ'লে ভাড়টে আমি কখনও আনতাম না।'

স্বযোগ বৃশিয়া নারায়ণীও বলিয়া বলিল, 'সেকথা আপনি ঠিকই বলেছেন মা, ওঁর মাইনের টাকা কোনোনাম আমি চোখেও দেখতে পাই না।'

গত কয়েকদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া মেঘ উঠিতেছিল, খুব খানিকটা ঘনবটা করিয়া ঝড় উঠিয়া ধূলানালি উড়াইয়া খানিক পরেই আবার সব পরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। অথচ ঝটীর প্রয়োজন।

সারাদিন অসহ্য গরমের পর বৈকালে সেদিন মেঘ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। সেবু প্রত্যহ ঠিক এই সময়টায় কাহারও নিবেদ-বার না শুনিয়া ছাসে গিয়া পাড়ায়। ঝড় উঠিলেই আবার ছুটিয়া নীচে চলিয়া আসে। সেদিনও সে অমনি ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর মাসি সেই হুগুগে বাহিরে হইয়াছে। উপরের ঘর বন্ধ। নারায়ণী বলিল, 'ছাসে বাসনি দেবু, ঝড় উঠবে।'

দেবু সেকথা শুনিতেই পাইল না। কাজেই হাতের সেলাই দেখিয়া নারায়ণীকেও তাহার পিছুপিছু ছুটিতে হইল।

সহরের মাথার উপর পড়িমের আকাশ অন্ধকার করিয়া তখন মেঘ উঠিয়াছে। হার্দে ছাসে মেঘেরের শুকনো কাপড় তুলিবার তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কীকে স্বাঁকে পারয়া উড়িতেছে।

দেবুর পাশে নারায়ণীও গিয়া পাড়াইল। তখনও হৃৎগাত হই নাই, অথচ মনে হইতেছিল, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দুটোটা মন্দ লাগিতেছিল না।

এমন সময় নীচে সদর দরবার মনে হইল কে যেন

খুব জোরে জোরে কড়া নাড়িতেছে। নারায়ণী বলিল, 'চল দেখি—হয়ত মা এসেছেন।' মা'র নাম না করিলে দেবু সেখান হইতে নড়িত কি না সন্দেহ।

নারায়ণী দরজা খুলিয়া দিচ্ছেই দেখা গেল, মাসি একা নয়, তাহার সঙ্গে অপরিচিত একজন পুরুষ, একজন নারী—সত্তবত: স্বামী-স্ত্রী, আর একটি বহু-তিন-চারের ফুটুটে ছোট্ট মেয়ে এবং সকলের পশ্চাতে ছ'জন মুঠের মাথায় বাস্ত-বিহান।

বড় মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া মাসি ঘরে ঢুকিল। মুখিয়া সে প্রথমেই নারায়ণীর সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিল।—'এই যে মা, এদের আমি মতুন ভাড়টে নিয়ে এলাম।' রাধাপদের বাইরের সেই এটুকু ঘর-খানিতেই কোনরকমে ওরা মাথা ভ'জে প'ড়েছিল। নাও মা, ঘরঘরে সব দেখে শুনে নাও। এ বেশ হ'ল বাছা, তোমরাও ছ'টি সস্তী হ'লে, আর আমার ছেদেরও একটি সস্তী ছুটল।'

বলিতে বলিতে মাসি তাহাদের সঙ্গে লইয়া নারায়ণীর ঘরের পাশের ঘরখানি তাহাদের থাকিবার জন্য নিশ্চিত করিয়া দিল। মুঠেরা ঘরের মেঝের উপর জিম্ম-পজ নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাসি বলিল, 'নাও বাছা, সব গোছগাছ ক'রে নাও। কি নামট বুললে, ভুলে গেলাম, আমি কিন্তু নাম ধ'রেই ডাকব, মা।'

সলজ্ঞ সন্ধ্যাতে স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া মাথার বোমটাটা একটুখানি তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'বীণা।'

'আর তোমার মেয়ের নাম?'

মেয়েটি এতক্ষণ কাছেই পাড়াইয়া পাড়াইয়া নারায়ণীর মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। সেই কথাটার জবাব দিল। বলিল, 'আমার নাম—পিটু লী, আর আমার বাবার নাম—বন্দু বাবা।'

বাবা তাহার হেটমুখে বিহান-বিধা দড়িটা তখন খুলিতেছিল। বলিল, 'বল।'

কিন্তু বলিতে গিয়া মেয়েটা দেখিল নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই মাসি নারায়ণীর কাছে গিয়া চুপিচুপি তাহাকে কি যেন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পিটু লী তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'কই গো শুদ্ধ না যে? আমার বাবার নাম—সিরি মুক্ত মাথব ভট্টাচার্য। শুদ্ধল?'

মাথব হাসিয়া বলিল, 'ভারি পাকা মেয়ে।' মাসি বলিল, 'না বাবা, বেশ মেয়ে।' আহা! কেমন টুক টুক ক'রে কথা বলে, শুদ্ধলি! নারায়ণী, কি হৃদয় চেহারা দেখেছিল! এ বাবা বড় হ'লে তোমার খাদ্য মেয়ে হবে।'

সেকথা সত্য। মেয়েটার যেমন গায়ের রং, তেমনি হাত-পায়ের গড়ন, তেমনি মুখ, আর তেমনি লললে ছুটি চোখ। হঠাৎ দেখিলে ছ'দণ্ড তাকিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

মাথায় তাহার বাব'র করিয়া কাটা বেশমের মত একমাথা কৌকড়ানো নরম চুল। সেই চুলগুলি একবার হাত দিয়া নাড়িয়া নারায়ণী চুপিচুপি বলিল, 'এসো আমরা গল্প করিগে, তোমার মা ততক্ষণ জিনিদ-পাতা গুছিয়ে নিবু।'

বাড় নাড়িয়া পিটু লী বলিল, 'আমাকেও যে গুছাতে হবে। ওরা একা-একা পাহাৰে না ত'।' বীণার মুখের পানে তাকাইয়া নারায়ণী ঈষৎ হাসিল।

বীণা বলিল, 'তোমায় অত পাকামি করতে হবে না, উনি ডাকছেন, জুই বাও।'

'চল।' বলিয়া পিটু লী নারায়ণীর কাছে আসিয়া পাড়াইল।

বীণা বলিল, 'ছি, 'চল' বলে না, 'চলুন' বলতে হয়।'

মাসি বলিল, 'তা হোক বাছা, ছেলে মানুষ ত'। চল।' বলিয়া তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া সকলেই সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।



আপিস হইতে বীরেন বাড়ী ফিরিয়াই তনিল যে, তাহাদের বাড়ীতে নুতন ভাড়াটে আসিয়াছে। এবং আসিয়াছে বাহার, তাহারও ঠিক তাহাদেরই মত—স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে। তাহার। যে আসিবে, মাসি তাহা পূর্বেই বলিয়াছিল বটে, কিন্তু বীরেন সেকথা বিশ্বাস করে নাই। বাই হোক, ইহাতে তাহার বলিবার কিইবা আছে! দশট টাকা মাত্র ভাড়া দিয়া কলিকাতা সহরে একখানা ঘরও অনেক সময় পাওয়া যায় না, তাহার উপর ভাড়ার টাকা সে আশ্রিত-চার মাসের মধ্যে মাত্র একটি-বার দিয়াছে। সবই সে জানে, অসম্মত বা অজ্ঞার কিছুই নয়, তবু তাহার মনটা কেমন যেন এ সংবাদটা শুনিয়া অবশি বিশ্বস্ত হইয়াই রহিল।

হঠাৎ এক সময় নারায়ণকে কাছে পাইয়া বীরেন বলিল, 'কিন্তু দেখ, এতে অসুবিধা আমাদের একটি হবে বই-কি!'

নারায়ণ বলিল, 'কিসের অসুবিধে? কল-পায়-খানার? তা ওদের বেশি লোক ত' নয়।'

বীরেন কি বিনে ভাবিতেন, বলিল, 'না না, তা নয়। তবে কিনা—যেহ পর্যন্ত ভাড়াটে ও আনলে—আর-একটা; এঁা?'

নারায়ণ বলিল, 'তা'কে কি হয়েছে? আহুক না! একা-একা থাকতাম, এখন থেকে আমার একটি সঙ্গী হ'ল। বেশ মেয়েটি!'

বীরেন বলিল, 'এত ক'রে একটি কথা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'কি কথা?'

'মাগির টাকাকড়ি কিছু নেই। যা-কিছু ছিল, ছুরিয়ে গেছে। এখন এই বাড়ী ভাড়া দিয়েই থকে যেতে হবে।'

নারায়ণ সেকথা আর কোনও জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বীরেন বলিল, 'চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার কি মনে হয়?'

'আমায় কেন জিজ্ঞেস করছ, আমি ও-সব কিছু জানিনে বাপু।'

বীরেন বলিল, 'হ্যাঁ, তা' কেন জানবে? স্বামী-র সঙ্গে, খেতে খেতে মগছে, মদক না!—ওগো, তোমার ছেলের জন্মেই বলছি। কুট ক'রে এখন যদি মারে বাই ত' পথে বসবে।'

'তা জানি।' বলিয়া প্রগল্ভাকে বোধকরি এড়াইবার জড়ই নারায়ণ য়র হইতে বাহির হইয়া গেল।

বীণার স্বামীর বয়স বেশি নয়, বীরেনেরই সমবয়সী, দেখিতে স্নন্দর সুখন্দ, চমৎকার চেহারা। বীণা কিন্তু নারায়ণের চেয়ে কিছু ছোটাই হইবে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে সে শুধু নারায়ণকে কেন, বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই হার মানাইতে পারে। যেমন অঙ্গ-সৌন্দর্য্য তাহার, তেমনি গায়ের রং। কুটস্ত একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে তাহার মুখানির তুলনা করা যায় বটে, কিন্তু স্বামীর তিরস্কারে এমন স্নন্দর মুখও তাহার এক-একদিন রান হইয়া বাইতে নারায়ণ বচকে দেখিয়াছে। কেন যে তিরস্কার করে, কি যে তাহার অপরাধ, কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিবার জো নাই, বুঝিবার একটাও নারায়ণ কোনোরূপে করে নাই। তবে সেদিক দিয়া বীণাও বড় কম যায় না। সেও তাহার স্বামীকে এক-একদিন মিষ্টি মিষ্টি করিয়া অনেক কথাই শুনায়া দেয়। বিড় বিড় করিয়া কি যে শোনায কে জানে।

এক-একদিন ভাবে সে বীণাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার মনে-হয়, ইহা অজায়। তাই সে—হয় চুপ করিয়া থাকে, নয় অজ্ঞ কথা পাড়িয়া বসে। স্বামী-স্ত্রীর গণ্ডা-কাটি এমন সর্ব্বস্বই হয়, প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাদের এই ছুটি স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ এই যে, স্বামীটো যেমন রূপবান্, স্ত্রীটো তেমনি রূপবতী, বিস্ময় বিশ্বাসে ছ'কণ

দাঁড়াইয়া দেখিবার মত চেহারা। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোনও বিরোধ, কোনও অসামঞ্জস্য যে থাকিতে পারে, কাহারও মনে সেকথা সঙ্কেত বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই তাহাদের মধ্যে এতটুকু মনোমালিঞ্জ ও মনের মধ্যে একটা অহেতুক প্রশ্ন জাগিয়া তোলে। কেন? দ্বিগুণে বিরোধের বীজ যে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কি অবলম্বন করিয়াই বা তাহা বাঢ়িয়া আছে, জানিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক।—সুতরাং নারায়ণের দোষ নাই।

সেদিন দুপুরে বীরেন আপিসে গিয়াছে, মাথবের আপিস না থাকিলেও রোজই সে বাহির হয়। পিটু লী দেবকে বুজিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, 'সেবু!'

ঘরে নারায়ণী একা শুইয়া ছিল, ডাকিল, 'পিটু লী, শোন!'

পিটু লী তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'দেবকে বুজি!'

নারায়ণী হাত বাড়াইয়া পিটু লীকে ধরিয়া তাহার খাটের উপর তুলিয়া লইল। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যারে পিটু লী, তোর মার সঙ্গে তোর বাবা দিন-রাত কেন ঝগড়া করে বল দেখি?'

পিটু লী পাচা মেয়ে। সব কথাইই জবাব তাহার কাছে পাওয়া যায় বলিয়াই নারায়ণী তাহাকে এ প্রশ্ন করিয়া বলিল, নচেৎ ওইটুকু মেয়ের কাছে প্রশ্নটা যে শুধু অস্বস্তির নয়, জটিল, তাহা সে জানে।

পিটু লী একটা ঢোক গিলিয়া খুব একটা ভারি ক্রি মেয়ের মত গভীরভাবে কহিল, 'ঝগড়া? হাঁ, করে।'

বাবা সেদিন মাকে এমন মার ঘেরেছিল যে, মা একেবারে কেঁদে ফেলিয়াছিল, তা জানো?'

নারায়ণী বলিল, 'বল কি পিটু লী! কেঁদে ফেলিয়াছ?'

দাঁড়াইয়া দেখিবার মত চেহারা। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোনও বিরোধ, কোনও অসামঞ্জস্য যে থাকিতে পারে, কাহারও মনে সেকথা সঙ্কেত বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই তাহাদের মধ্যে এতটুকু মনোমালিঞ্জ ও মনের মধ্যে একটা অহেতুক প্রশ্ন জাগিয়া তোলে। কেন? দ্বিগুণে বিরোধের বীজ যে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কি অবলম্বন করিয়াই বা তাহা বাঢ়িয়া আছে, জানিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক।—সুতরাং নারায়ণের দোষ নাই।

সেদিন দুপুরে বীরেন আপিসে গিয়াছে, মাথবের আপিস না থাকিলেও রোজই সে বাহির হয়। পিটু লী দেবকে বুজিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, 'সেবু!'

পিটু লী তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'দেবকে বুজি!'

নারায়ণী হাত বাড়াইয়া পিটু লীকে ধরিয়া তাহার খাটের উপর তুলিয়া লইল। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যারে পিটু লী, তোর মার সঙ্গে তোর বাবা দিন-রাত কেন ঝগড়া করে বল দেখি?'

পিটু লী পাচা মেয়ে। সব কথাইই জবাব তাহার কাছে পাওয়া যায় বলিয়াই নারায়ণী তাহাকে এ প্রশ্ন করিয়া বলিল, নচেৎ ওইটুকু মেয়ের কাছে প্রশ্নটা যে শুধু অস্বস্তির নয়, জটিল, তাহা সে জানে।

পিটু লী একটা ঢোক গিলিয়া খুব একটা ভারি ক্রি মেয়ের মত গভীরভাবে কহিল, 'ঝগড়া? হাঁ, করে।'

বাবা সেদিন মাকে এমন মার ঘেরেছিল যে, মা একেবারে কেঁদে ফেলিয়াছিল, তা জানো?'

নারায়ণী বলিল, 'বল কি পিটু লী! কেঁদে ফেলিয়াছ?'

দাঁড়াইয়া দেখিবার মত চেহারা। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোনও বিরোধ, কোনও অসামঞ্জস্য যে থাকিতে পারে, কাহারও মনে সেকথা সঙ্কেত বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই তাহাদের মধ্যে এতটুকু মনোমালিঞ্জ ও মনের মধ্যে একটা অহেতুক প্রশ্ন জাগিয়া তোলে। কেন? দ্বিগুণে বিরোধের বীজ যে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কি অবলম্বন করিয়াই বা তাহা বাঢ়িয়া আছে, জানিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক।—সুতরাং নারায়ণের দোষ নাই।

সেদিন দুপুরে বীরেন আপিসে গিয়াছে, মাথবের আপিস না থাকিলেও রোজই সে বাহির হয়। পিটু লী দেবকে বুজিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, 'সেবু!'

পিটু লী তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'দেবকে বুজি!'

নারায়ণী হাত বাড়াইয়া পিটু লীকে ধরিয়া তাহার খাটের উপর তুলিয়া লইল। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যারে পিটু লী, তোর মার সঙ্গে তোর বাবা দিন-রাত কেন ঝগড়া করে বল দেখি?'



পিটুণী বলিল, 'বিয়ে যে আমি এখন করবই না। অনেক—অনেক বড় হয় তখন—তখন...'

নারায়ণী হাসিল। বলিল, 'হ্যাঁ, বড় হ'লেই বিয়ে দেবে। এখন নয়। দেবু কোথায় গেল রে?'

পিটুণী বলিল, 'আমরা কাণামাছি খেলছিলাম, খেলতে খেলতে কোথায় চ'লে গেল। ওপরে-মা'র কাছে গিয়েছে ঠিক। ডাকব?'

'হ্যাঁ, ডাকো ত' মা!'

পিটুণী খাট হইতে নামিয়া বোধকরি দেবুকে ডাকিবার জন্তই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বাঁপাপানি ঘরে ঢুকিল।—'দিদি, শুয়ে আছে!'

নারায়ণী উঠিয়া বলিল। বলিল, 'এসা ভাই, এসো। তোমার মেয়ের সঙ্গেই গল্প করছিলাম। আমাদের কি ঠিক হ'ল জানো ভাই, দেবুর সঙ্গে পিটুণীর বিয়ে দেবে।'

বাঁপা বলিল, 'বৌএর সঙ্গে বন্ধ বন্ধ ক'রে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বেই জীবন তোমার অতিবাহিত হ'য়ে যাবে, দিদি!'

নারায়ণী বলিল, 'বড় হ'লে স্বস্তি রকম হ'য়ে যাবে ভাই, তা'ছাড়া বন্ধ-বন্ধে ওদের মানাবে চমৎকার।'

তোমাদের ছটিতে যেমন মানিয়েছে, ঠিক তেমনি।'

বাঁপা তাহার চোঁট ছুঁইত ফঁহৎ কুঞ্চিত করিয়া লগজ একটুখানি হাসিল এবং তাহার সে হাসির মধ্যে প্রঞ্জর বেদনার একটি সুপ্রসিদ্ধ ইঙ্গিত যেন নারায়ণীর চোখের উপর স্পষ্ট ধরা পড়িয়া গেল।

পিটুণী বলিতেছিল, বাবা তাহার মাকে শুধু ভিন্নতার করে না, প্রহার করে এবং প্রহার করিয়া কাঁদাইয়া দেয়। নারায়ণী প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এখন তাহার মনে হইতে লাগিল, হইতেও পারে বা। কিন্তু কেন? যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী, তেমনি মেয়ে, — ঘরিতে গেলে একরকম স্বপ্নের সংসার, তবু তাহাদের এ গরমিল কেন, কে জানে।

নারায়ণী বলিল, 'কিন্তু ভাই পিটুণীকে আমি আমার বৌ করবই!'

বাঁপা বলিল, 'বেশ ত'। উনি কতাদায় থেকে বাচবেন তাহ'লে। বর পূজে বেড়াতে হবে না।'

পিটুণী তখন দেবুকে ডাকিতে গিয়াছে। বাঁপা পাড়াইয়া ছিল, নারায়ণী বলিল, 'বোসো!'

বাঁপা ভাল করিয়া খাটের উপর চাপিয়া বসিলে নারায়ণী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পিটুণী কি বলছিল ভাই জানো? বংশ ছিল, বাবার সঙ্গে মার খুব বগড়া হয়। হ্যাঁ ভাই, সত্যি?'

কথাটা সে তাহাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, মনে হইল যেন সে কিছুই জানে না।

বাঁপা বলিল, 'ভারি বদ্বারী মাছই ভাই! একটুকু এমিক-ওদিক হবার জো নেই। চাঁৎকার ক'রে ঘর ফাটিয়ে দেবে। এক-একদিন ত' মেয়েই বসে।'

নারায়ণীর স্বামীও তাহাকে কম ভিন্নতার করে না, গায়ে যে তাহার একেবারেই হাত তোলে নাই তাহাও নয়, কিন্তু কাহারও কাছে এমন করিয়া সেকথা সে বলিতে পারে না, গোপন করিতে পারিতেই যেন ঝাঁচে। বাঁপাও যে তাহার কাছে এমন করিয়া অস্বস্তিতে সেকথা স্বীকার করিবে, নারায়ণী তাহা ভাবে নাই। বলিল, 'কিন্তু তোমাদের ছ'লকে দেখে ভাই সেকথা মনে হয় না।'

বাঁপা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হয়?'

নারায়ণী বলিল, 'মনে হয় ছ'লনের ভারি ভাব। মেয়ে হিঁসে হয়।'

বাঁপাও আবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'ভাব নেই একথা তোমায় কে বলবে, দিদি?'

নারায়ণী একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। জোর করিয়া মুখে তাহার হাসি টানিয়া 'আমি' বলিল, 'না, তা বলিনি। ঝগড়া'টী কার না হয় ভাই! এই যে আমার বরটী.....উনিই বা কিসে কম? বহুনি ত' লেগেই আছে, তা' ছাড়া ছেলে না হওয়া পর্যন্ত কি মারটাই না খেয়েছি। ভাই ব'লে ভালবাসে না, একথা কি ভাই কেউ বলতে পারে জোর করে?'

কেন যেন একটা গম্ভীর ভঙ্গী করিয়া বাঁপা

বলিল, 'আড়ালে ধাঁড়িয়ে একদিন দেখো আমাদের ঝগড়া, তাহ'লেই বুঝতে পারবে, দিদি!'

এই বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নারায়ণীর হাতের চুড়ি কখনাছি ঘুরাইয়া দিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, 'আমাদের কি-রকম ঝগড়া হয় জানো, ভাই? ঠিক ছোট ছেলের মত।'

আমায় মায়েই আমিও দিই ওর হাতটা মুছে। শেষে ছ'লনেরই হাতাহাতি শুরু হ'য়ে যায়। কোনোদিন আমি জিতি, কোনোদিন সে জেতে।'

নারায়ণী হাসিতে লাগিল।—'খাঁ, বেশ মজা ত'। তাহ'লে তোমাদের খুব ভাব, না ভাই?'

বাঁপা বলিল, 'তা আর এ পোড়ার মুখে কেনম ক'রে বলি বল। তবে ওর জন্তে আমিও আমার দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, আর উনিও ওর বাড়ী-ঘর-পোয়ের অংশ, টাকা-কড়ির ভান, সবকিছু ছেড়েছড়ে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে পাগিয়ে এসেছেন, এইটুকু জানি।'

দেখু না—আমাদের ঘর-সংসারে জিনিষপত্রের কিছু নেই। দেখে বুঝতে পারছ না?'

'ও'—বলিয়া নারায়ণী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বলিল, 'জিনিষপত্রের কথা জিজ্ঞেস করব করব ভাবছিলাম ভাই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, লজ্জায় কিছু বলতে পারি নি।'

এই বলিয়া সে তাহার দুই অঙ্গুল দৃষ্টি বাঁপার মুখের উপর তেমনি স্থির নিবন্ধ করিয়াই রাখিল। ঝগড়াপূর্বে যাহাকে সে তাহার নিজের চেয়েও ছড়িগা ভাবিয়া মনে-মনে অহুকম্পা করিতেছিল, এখন পরে তাহাকেই আবার পরম সৌভাগ্যবতী ভাবিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহার মত স্বামী-সোহাগিনী পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে।

বিছাইয়া মাসি ভইয়া আছে, আর দেবু তাহার বাটের তলায় চুকিয়া শ্রিংএ কট কট করিয়া দম দিয়া জিনের মোটর পাড়ী চালাইতেছে, এমন সময় দরজা ঠেলিয়া পিটুণী ঘরে ঢুকিল। দেবুর অস্থবের আগে মাসি একদিন তাহাকে লইয়া মোটর-বাসে চড়িয়া কালীঘাট গিয়াছিল গল্পাধান করিতে; সেইদিন হইতে সেই যে সে বাসের বুলি শিখিয়া আসিয়াছে, আজও মোটর চালাইতে চালাইতে চাঁৎকার করিয়া করিয়া ঘুরাইয়া দিরাইয়া তাহাই সে বলিতেছিল—'শ্রামস্বাস্তার, বোঁবাস্তার, ধরম্ভাস্তার, কালীঘাট।' পিটুণীকে দেখিবারাত্র বলিয়া উঠিল, 'বীধুকে!'

পিটুণী কিঞ্চত আশিয়াছিল ভুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি দেবুর কাছে গিয়া বলিল, 'আমি ভাই কালীঘাট যাব। নিয়ে যাবি?'

দেবু বলিল, 'তুই আবার এখানে কি জন্তে এলি?'

এখানে আসিলেই পিটুণীকে এই কথা সে প্রায়ই বলে। কিন্তু পিটুণী সেকথা গ্রাহ্যই করে না। বলে, 'কালীঘাট আমাকে নিয়ে যাবি না দেবু?'

দেবু হাত পাতিয়া বলে, 'দে পয়সা।'

পিটুণী বলে, 'পয়সা কোথায় পাব ভাই? বাবা আশুক, তারপর দেখো।'

দেবু তখন তাহার পাড়ীতে আবার দম দিতে বসে, 'মা তরে তুই ওইখানে বোসগে যা, পাড়ীটা ওই-খানে লেগেই আবার এই দিকে পাঠিয়ে দিবি।'

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাদের খেলা চলিল। তাহার পর খেলিতে খেলিতে হঠাৎ নারায়ণীর কথা মনে পড়িতেই পিটুণী বলিল, 'তোকে ভাই তোর বোঁমা একবার ডাকছি।'

'ডাকুকো। আমি যাব না।'

পিটুণী বলিল, 'একটা ভারি মজার কথা বলব তোকে। শুনি?'

'বল না।'

'এখানে বলব না। তোর মা রয়েছে যে।'

'মা ত' ঘুমোচ্ছে।'

রৌদের স্বাক্ষর আসিতেছিল বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া উপরের ঘরে ঠাণ্ডা মেঝের উপর কাপড়



‘হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে! ঘুমোলে মাছের নাক ডাকে, তা’ জানিনা?’

মাসি কিন্তু ঘুমাইবার ভাগ করিয়া পড়িয়া ছিল নাক। দেবুর পাড়ী ঢালাইবার পোশামলে ঘুম তাহার নতাই আসে নাই।

পিটুলীর মজার কথাটা কি তাহাই শুনিবার জন্য মাসি আরও কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে পড়িয়া বসিল।

কিন্তু পিটুলী কিছুতেই তাহার সান্নাতে বসিল না।

মাসি তখন ইচ্ছা করিয়াই একবার পাশ ফিরিয়া উঠা করিয়া বেন-ঘুমের খোরেই বলিয়া উঠিল, ‘হ্যাঁ বাবা, তোরা একটু বাইরে খেলা করগে, যা। আমার ঘুমোতে দে।’

পিটুলী উঠিয়া পাড়াইল। বলিল, ‘যাবি?’  
দেবু বলিল, ‘চল।’

এই বলিয়া ছ’জনে তাহার ঘরের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিতেছিল। হঠাৎ একটা ধাপের উপর দেবুর হাতে ধরিয়া পিটুলী বলিল, ‘বোস! তাই এইখানে। সেই মজার কথাটা বলি।’

দেবু বলিল, পিটুলী বলিল এবং ছ’জনে তাহার পাশাপাশি বসিয়া ছ’জন ছ’জনের গলা জড়াইয়া ধরিল।

দেবু বলিল, ‘কি কথা দে?’

পিটুলী অস্থূলকণ্ঠে কহিল, ‘আমাদের ছ’জনের বিয়ে হবে। তুই হবি আমার বর, আর আমি হব ক’নে।’

দেবু বলিল, ‘হ্যাঁ, তুই ভারি ফাজিল হয়েছিস।’

এই বলিয়া সে তাহার হাতখানা পিটুলীর কাঁধ হইতে সরাইয়া লইল।

পিটুলী বলিল, ‘বেশ, তাহ’লে চল তোমার বোমার কাছে, শুনে চল।’

বলিয়া পিটুলীই আগে উঠিয়া পাড়াইল।

তাহার পর ছ’জনে যখন নারায়ণীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, কাহাকেও কোনও কথা আর কিছুদূর করিতে হইল না, বীণাই প্রথমে হাসিয়া হাসিয়া

তাহাদের দেখাইয়া দিয়া বলিল, ‘ওই ত’ তোমার বর-ক’নে এসেছে দিদি!’

দেবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া পিটুলী বলিল, ‘শুনলি?’

কিন্তু এদিকে একটা ভারি মজা হইল। পিটুলী তাহার কথা গিয়া শুনিয়া বশ করিতে পারে। অথচ দেবু চায় না যে, সে মাসির কাছে গিয়া যখন-তখন বসিয়া বসিয়া গল্প করে। তাই সে পিটুলীকে সিঁড়ির উপর উঠিতে দেখিলেই বলে, ‘না ভাই, চল আমরা নীচে খেলা করি।’

অথচ দেবুর সঙ্গে দিবারাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইলে পিটুলীর মা তাহাকে লোকজনের সান্নাতে কিছু বলে না, আড়ালে পাইলে কান চুটা কন্ কন্ করিয়া মলিয়া দিয়া বলে, ‘এখন থেকে ব্যাটা ছেলের সঙ্গে চক্ষিখ খট্টা খেলা কি না?’

পিটুলী তাই নীচে সহজে থাকিতেই চায় না, দেবুকে সঙ্গে লইয়া মাসির ঘরে গিয়া খেলা করিতে চায়। বলে, ‘না ভাই, নীচে খেলা করলে মা বকেবে।’

দেবু বলে, ‘হ্যাঁ তবে তোকে খেলা করতে হবে না, তুই দূর হ।’

পিটুলী তাহার মুখখানি ভারি করিয়া সঙ্গরণ দৃষ্টিতে দেবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকে। বলে, ‘তুমি তাহ’লে আমার সঙ্গে আড়ি করতে চাও তাই?’

দেবু বলে, ‘বাবো! আড়ি আবার করলাম কখন? ওপরে খেলা করলে মা বলে—মা’র ঘুম হয় না। আর না—নীচেই খেলা কর।’

কিন্তু সকাল বেলা—কেহ কখনও ঘুমায় না। পিটুলী বলে, ‘তোমার মা বুঝি এই সকাল বেলা ঘুমায়! এখন ত’ রাত্না করবার সময়।’

দেবু বলে, ‘বাবা, আস্থিক করবে দে!’

পিটুলী বলে, ‘আমি কিছুতেই গোলামাল করব না। এই তোমার মা ছুঁতে বসছি। তুমি দেখো।’

দেবু যখন কিছুতেই তাহাকে আর পাহিয়া জুটে না, তখন বাধ্য হইয়া বলে, ‘চল, কিন্তু মার সঙ্গে বেশি বক্ বক্ ক’রে বকিমনি যেন।’

পিটুলী খুশী হইয়া হাসিয়া বলে, ‘না ভাই, বকব না।’

তাহার পর বুড়ী মেয়ের মত আপন মনেই কতকি সব বলিতে বলিতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে থাকে। বলে, ‘কেন যে মরতে এত কথা বলি আমি! বাবারে বাবা! কথা না করে যে কিছুতেই থাকতে পারি নে। এইবার আমার মরণটা হ’লেই বাঁচি।’

কথাগুলো বোধকরি মাসি শুনিতে পাইল। বলিল, ‘কি মো মেয়ে, কি বলতে বলতে আসছে?’

পিটুলী বোধকরি লজ্জিত হইয়া একটুখানি হাসিল। হাসিলে তাহার সেই মূলের মত ছোট ছোট হৃদয়ও শুভ্র কয়েকটি দাঁত দেখা যায়, লালচে পালে ছোট ছোট দুইটি টোল পড়ে। হাসিলে তাহাকে আরও মূলের দেখায়। মাসি তাহার সেই মূলের মুখখানির পানে তাকাইয়া বলিল, ‘হাসলে যে?’

পিটুলী বলিল, ‘ও মা! হাসবারও জো নেই! বেশ গো বেশ, হাসব না। তুমি রাত্না করছ, কর। আমরা তোমার সঙ্গে একটা কথাও বদুব না। দেবু আমাকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছে।’

মাসি বলিল, ‘সে কি রে দেবু, কি শিখিয়ে দিয়েছিস?’

দেবু তখন ঘরের ভিতর গিয়া চুকিয়াছে। সেইখান হইতেই তাহার সাড়া পাওয়া গেল। বলিল, ‘বেং!’

বলিয়াই সে তাহার টিনের মোটর পাড়ী লইয়া ‘শ্রামবাজার, শ্রামবাজার’ বলিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিল। তাহার পর হঠাৎ একসময় ডাকিয়া বলিল, ‘পিটুলী, আর না!’

পিটুলী তখন মাসির সঙ্গে গল্প শুরু করিয়াছে। গল্প করিতে করিতে দেবুর ডাক শুনিয়া সে চকিত হইবার মত তাহার সেই কালো চুলে চোখ দুইটি

তুলিয়া একবার ঘরের দিকে, একবার মাসির দিকে তাকাইতে লাগিল। গল্প করিবে, না উঠিয়া যাইবে, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

মাসি বলিল, ‘তুইও এইখানে আর না বাবা, শুনে যা, পিটুলী ক্রমেন গপ্প বলছে। আর।’  
দেবু বলিল, ‘বল্কা।’

গল্পটা পিটুলী বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, মাসি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ‘তার পর কি হ’ল মা?’  
পিটুলী বলিল, ‘আমি বুঝি তোমার মা হই?’  
বাবা যে তোমার ঠাকুমা বলতে বললে গো!’

মাসি বলিল, ‘তা বলুক বাছা! আমার মা নেই, অনেক দিন ম’রে গেছে, তোমার মত একটা মা আমার চাই।’

পিটুলী বলিল, ‘দেবুর মা, আমার আমারও মা? দেবুর বোমা—ওই যে নীচে থাকে গো—ও কি বলছিল জানো দেবুর মা?’

‘কি বলছিল?’

পিটুলী হাসিয়া বলিল, ‘বলছিল—দেবু আমার বর হবে।’

প্রশ্নটা যে মাসিরও মনে জাগে নাই তাহা নয়, তবে সে মুখ ফুটিয়া সেকথা এখনও কাহাকেও বলে নাই। বলিল, ‘হ্যাঁ মা, আমারও তাই ইচ্ছে।’

পিটুলী বলিল, ‘এখন নয়। সে আমরা অনেক বড় হ’লে।’

মাসি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, ‘আচ্ছা, এইবার তুমি সেই কাহিনীট বল মা, আমি শুনি।’

পিটুলী বলিল, ‘কোনটা? সেই—এক যে ছিল শালিক পাখী, না এক’য়ে ছিল রাজার ছেলে?’

মাসি বলিল, ‘রাজার ছেলের কাহিনীটাই শুনি। শালিক পাখীর কাণ্ড শুনব।’

পিটুলী তখন রাজার ছেলের কাহিনী বলিতে শুরু করিল।—এক ব’য়ে ছিল রাজার ছেলে, যেমন গায়ের রং তার তেমনি চেহারা। মাথায় সোনাল



মুঠ, তার ওপর হীরে বসানো। রাজার ছেলের  
অভাব কিছুই নাই। হাতীশালে হাতী, খোড়াশালে  
খোড়া, রাজভাণ্ডারে হীরে-জহরত, মণি-মুক্তো, সোনা-  
রূপার ছড়াছড়ি। তবু রাজার ছেলের মনে স্বপ্ন  
নাই। দিনরাত শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবে। সবাই  
বলে, হা'গো, তোমার ভাবনা কিসের? ভাবছ  
কেন? ভাবছ কেন? রাজার ছেলে কিছুতেই  
আর বলে না। শেষে অনেক কষ্টে বললে—

পদ্মদীঘির ঘাটে গো,  
বসে সিঁড়ি পাটে গো

স্বপ্নদী এক কষ্টে

ভাবছি তারই কষ্টে।

ছট, ছট, ধ'রে আন, ধ'রে আন! রাজকজ্ঞেকে  
ধ'রে—আন! তপনি পদ্মদীঘিতে লোক ছুটল।  
ধানিক বাদে চৌদলে ঢড়িয়ে ধরে আনা হ'ল রাজ-  
কজ্ঞেকে। — না বাপু, তোমার ও তরকারিটা উনো  
থেকে নামাও আগে। ছাঁক ছৌক শব্দ হচ্ছে,  
ভূমি শুদ্ধ না কিছুই।

মাসি বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ শুদ্ধি, শুদ্ধি, খুব শুদ্ধি,  
ভূমি বল।'

পিটুদী বলিল, 'তুচ্ছ ত' কই 'হ' দিচ্ছ না যে?'  
শুনিতো শুনিতো শোভাকো ঘন ঘন 'হ' 'হ'  
বসিতো হু, তাহা না হইলে কাহিনী শোনা চলে  
না। মাসি হাসিয়া বলিল—

'নাও, এইবার থেকে 'হ' বস্খি, ভূমি বল।'

পিটুদী আবার আরম্ভ করিল।—'রাজকজ্ঞের  
কেমন তেহারা-জানো?—সাদা ধপু ধপু করছে  
গানের রং, মাথার একমাথা এমনি লম্বা লম্বা চুল।  
দেখতে ভারি সুন্দর।'

মাসি বলিল, 'হ'। ঠিক তোমার মত।'

'বেগু, আমার মতন কেন হবে, আমার চেয়েও  
সুন্দর। আমি বড় হ'লে যেমন হবে ঠিক তেমনি।'

মাসি বলিল, 'হ'। তারপর?'

'তারপর?' বলিয়া একটা চৌক সিঁড়ি

পিটুদী কি যেন বলিতে বাইতছিল, এমন সময়  
ঘরের দরজার কাছ হইতে একটা ঢিল আসিয়া  
পিটুদীর গায়ের উপর চিপু করিয়া লাগিল।  
চিলটা বড় ছিল না তাই রক্ষা, পিটুদীর তেমন  
লাগে নাই। তাকাইয়া দেখিল, সেবু তাহাকে ঢিল  
ছুড়িয়াছে। ব্যাপারটা মাসিও দেখিতে পাইয়াছিল।  
বলিল, 'ওকি রে সেবু, ছি, মারামারি করতে আছে!  
ওই ঢিল যদি ওর চোখে লাগত!—ভালই হ'ত,  
তোরাই বো কানা হ'ত আমাদের আর কি।'

সেকথাও জ্বাবে কোনও কথা না বলিয়া,  
দেখা গেল, সেবু তাহার টিনের মোটার গাড়ীট হাতে  
লগিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া ধীরে  
ধীরে নীচে নামিয়া বাইতছে।

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'চলে যাক্ষি? বে? ওর  
ও দেবু!'

দেবু মাড়া দিল না।

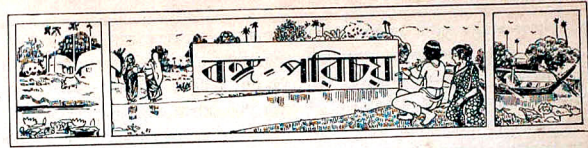
মাসি তাহার হাতের কাছে আর কাহাকেও না  
পাইয়া পিটুদীর দিকে তাকাইয়াই বলিল, 'দেখছি  
না, রাগ হ'য়ে গেল। ওই যে বলাম, কেন ঢিল  
ছুড়িল, বাবু, তাইতেই অভিমান হ'য়ে গেল। পরের  
ছেলে কিনা! ও মাছব করা না করা চুইই সমান।'

এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাসি আবার  
বলিল, 'সেই যে কথাই আছে না, পরের সোনা দিও  
না কানে, কেজ্জে মেবে হ্যাঁচ কা টানে। এও তাই।'  
উনান হইতে তরকারির কড়াইটা নামাইয়া

সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া মাসি চুপ করিয়া  
বসিয়া রহিল।

ইহার পর পিটুদীর রাজার ছেলের গল্পটা আর  
কিছুতেই জমিল না। বলিবার চেষ্টা সে যে করিল  
না, তাহা নয়। কিন্তু মাসিমার 'হ' বিবার অবসর  
তখন আর নাই। রায়ার জিনিসপত্রগুলো সরাইয়া  
রাখিয়া সে উটগা ধাঁড়াইল। বলিল, 'আজ থাক  
বাছা, গুপুপটা তোমার কাল জুবে।'

(জমশঃ)



## বঙ্গালার তিনটি প্রাচীন মন্দির

শ্রীবলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিশ পরগণার অত্যন্ত মহকুমা ডায়মণ্ডহারবারের  
অন্তর্গত মন্দিরবাজার নামক স্থানের পল্লীমধ্যে  
ত্রীকেশবেশ্বরের মন্দির বর্তমান।

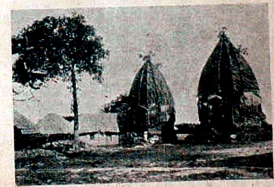
কলিকাতা হইতে তথ্যর বাইতে হইলেই ই, বি, আর  
সার্বার্ণ সেক্সনের বাকুইপুর-লক্ষীকান্তপুর শাখার  
গাড়ীতে উঠিয়া মধুবাগুর রোড নামক ষ্টেশনে নামিতে  
হয়। এখান হইতে প্রথমে বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে  
আসিয়া তথা হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে বাধান  
কাঁচা রাস্তা ধরিয়া আন্দাল ছয় মাইল গেলে  
ত্রীকেশবেশ্বরের মন্দিরে পৌছান যায়।

২৬এ আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, বুধবার (সন  
১৩৩৯ সাল) ভোর ৪০৮টার সময়ে আমরা কয়েক-  
জন সঙ্গী মিলিয়া ময়দা নামক গ্রাম হইতে যাত্রা  
করিলাম। মধুবাগুর রোড হইতে দুইটা ষ্টেশন আসে  
(অর্থাৎ কলিকাতার দিকে) বহু বোম্ব হাং ছয় মাইল  
দূর, আর বহু হইতে ময়দা আন্দাল দুই মাইল;  
সুতরাং এই আট মাইল পথ সকালে কোনও ট্রেন না  
থাকায় পদব্রজেই যাত্রা স্থির হইয়াছিল।

আমরা যখন বহুতে আসিয়া পৌছিলাম তখন  
পাচটা বাজিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ৪০৮টার  
সময়ে জয়নগর-মঞ্জিলপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া গেলাম এবং  
ছয়টার আগেই বিষ্ণুপুর শ্রাশানের বড় বড় বট, অশ্বখ  
গাছগুলি দেখিতে পাইলাম। বিষ্ণুপুরে আমরা আর  
একজন সঙ্গী পাইলাম।

আমরা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময়ে মাটির বাধান

রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের  
পথের বাম দিক দিয়া একটা বাল বরাবর আমাদের  
গন্তব্য স্থল ত্রীকেশবেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে।  
প্রায় ৪ মাইল যাত্রার পর দূর হইতে দুইটা মন্দিরের  
ছাড়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। আমাদের মধ্যে  
কেবল একজন গত বঙ্গের একবার মাত্র কয়েক  
জনের সঙ্গে লক্ষীকান্তপুর হইতে মাঠের রাস্তা ধরিয়া  
ত্রীকেশবেশ্বরে গিয়াছিল; কাজেই সে, মন্দিরের চূড়ার  
মত বাহা দেখা বাইতছিল তাহাই ত্রীকেশবেশ্বরের  
মন্দির কি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না।  
তবে জানাইল যে, সেখানে সে একটীমাত্র মন্দির  
দেখিয়াছিল। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে  
আমরা ধালের অপর পারে অবস্থিত মন্দির দুইটার  
নিকটবর্তী হইলাম। একটা বাঁশের গাঁকার সাহায্যে  
পার হইয়া মন্দিরের কাছে উপস্থিত হইলাম।



জয়নগর-মন্দির হইতে



জগদীশপুর হাউজীর হাটের একপার্শ্বে অবস্থিত এই ছইটা মন্দির। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে জগদীশপুর নিবাসী বর্জ্জ নতর পরিবারের হাউজী নারী জনৈকা মহিলা কয়েক বিধা জমীর সহিত এই মন্দির ছইটাতে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া কবিকাতা-হাট-খোলা নিবাসী দত্ত-পরিবারের গুরুকুল অধিরীতাণার ভট্টাচার্যগণকে দান করেন। এ পর্য্যন্ত ভাঁহারাই এই মন্দিরের অধিকারী আছেন এবং পূজার জ্ঞা হানীর কোন রাম্যকে মাসিক কিছু রুতি দিয়া থাকেন।

বহুদিনের পুরাতন মন্দির। কোনটারই দরজার চিহ্নমাত্র নাই। স্থানে স্থানে ইট, চূণ, সুরকী ইত্যাদি খসিয়া পড়িয়াছে। খুব শুল্ক বাঁধুনী। লম্বা লম্বা পালা টকটক লাল ইটে এমন স্তম্ভ দেওয়াল, বারান্দা, সিঁড়ি ইত্যাদি গাথা হইয়াছে যে, ছইটা ইটের মধ্যবর্তী চূণ, সুরকী প্রভৃতি মন্দিরেরই দরজার চৌকাঠের নীচের অংশটুকু কালো পাথরে তৈয়ারী বলিয়া আজও বর্তমান আছে, এবং তাহার উপরকার কাংকারাটুকুও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পশ্চিম দিকের মন্দিরের মেঝে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় রাসিকালে শিখাগণের সভাগৃহের অভাব মোচন করিতেছে। আরও বোধ হয় সভার কার্যকালে সভাগণ ভূমি আঁচড়াইয়া বাস্রাফোট করিয়া থাকেন, কারণ তাহার নির্দশন বর্তমান। মধ্যস্থলে প্রায় ছই হাত ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার পয়কাটা কালো পাথরের আঙ্গনের উপর আন্ধার আড়াই হাত উচ্চ কালো পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মেঝে না থাকায় আসনখানি পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল। অপর মন্দিরের মেঝে বোধ হয় কিছু দিন পূর্বে সিমেন্ট করা হইয়াছে। তাহাতেও ঠিক অধরূপ একটা শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দির ছইটার গঠন এবং শিবলিঙ্গ দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা একই সময়ে নির্মিত। বাঙ্গালার প্রাচীন স্থপতির বিশেষবর্ণন মন্দির ছইটার গম্বুজ কোণমূল

হইলেও তাহা একেবারে সমান ভাবে না উঠিয়া স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। ঝিলানের প্রত্যেক স্তরের ইট বাহিরের দিকে একটু প্রকাশ করিয়া রাখায় গম্বুজ ছইটা দেখিতে বেশ হইয়াছে। ছইটা মন্দির সর্বোৎকৃষ্ট এক রকমের হইলেও শিল্পী যে গম্বুজ ছইটা টিক এক আকারের করিতে পারে নাই, তাহা ছবি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। বাহিরের মন্দিরের চূড়া হইতে মোটা সোহার বাঙ্গালা চারিসংখ্যার মত কড়াযুক্ত একটা করিয়া শুল্ক, যেখানে দেওয়াল হইতে ঝিলান উঠিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত বুলিতেছে। এই এক-একটা কড়া এত বড় যে, তাহার ছইটা ছিদ্রে ছইটা হাত বেশ বাহার মত প্রবেশ করা হইতে পারা যায়। মন্দির ছইটার চূড়ায় একটা করিয়া নিমগাছ এবং কয়েকটা করিয়া আগাছা জন্মাইয়াছে।

মন্দিরের শুল্ক ছইটা মাটি পর্য্যন্ত স্থান ছিল, প্রকাশ এই যে, বজ্রাঘাতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। (এই কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। বজ্র কি ছইটাকেই ঠিক সমানায়ণে ঝিলানের মূলদেশ পর্য্যন্ত রাখিয়া বাকী-টুকু কাটিয়া ফেলি?) সম্ভার-কার্যের জ্ঞা ঐ শুল্ক ধরিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিতে হয়। মন্দির ছইটা ত্রীকোণবেদনের মন্দিরের বহুপূর্বে স্থাপিত, ইহাদের সম্ভারের জ্ঞা হানীর কেহ কেহ অধিকারীদের নিকট বাতায়ত করিতেছেন, জনিলাম। মন্দিরের পশ্চিম দিকে জগদীশপুর হাইস্কুলের লম্বা চালা-ঘর অবস্থিত, এবং তাহার পশ্চিমে কোঠা-ঘরের জ্ঞা ভিত্তি খনন করা হইয়াছে ও ভৎকার্যের জ্ঞা কিছু নূন ইট মন্দিরের সম্মুখে একত্র করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা পুনরায় অঙ্গুর হইলাম ও প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যেই ত্রীকোণবেদনের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

দেখিবার মত জিনিষ বটে। পল্লী-অঞ্চলে এক্সপ সুরং মন্দির দেখিবার করনাও করি নাই, কাজেই বিশ্বাসবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। গবে ৩ তারকেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছি কিন্তু তাহাও ইহা অপেক্ষা স্তম্ভায়ত বলিয়াই মনে হইল। মন্দিরের ভিতরের প্রকাঠ দেখ্যে

ও প্রবেশ আট হাত করিয়া হইবে; তাহার ভিতরদিকে প্রায় পাঁচ হাত প্রশস্ত বারান্দা এবং ভিতরদিকেই চারি



দীর্ঘবেদনের মন্দির

হাত আন্দাজ প্রশস্ত রোয়াক। এই রোয়াক পার্শ্ব জমী হইতে আন্দাজ তিন হাত উচ্চ। সাধারণ মন্দির হইতে ইহার বিশেষ এই যে, প্রধান গম্বুজটা কেবল মন্দির-প্রকাঠটার উপর না হইয়া ইহার ভিতরদিকের বারান্দা সমেত গৃহীত আনৃত করিয়াছে, আর ভিতরদিকের রোয়াক উন্মুক্ত আছে। (তারকেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ আছে, তবে তাহার সম্মুখেই কেবল আন্দাজ তিন হাত প্রশস্ত বারান্দা আছে, আর ছই দিকে বারান্দা নাই।) মন্দিরের পিছন দিকে বারান্দা বা রোয়াক নাই। মধ্যস্থিত গৃহের মেঝে শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত, মধ্যস্থলে উচ্চাসনে আন্দাজ ছই হাত উচ্চ রূক্ষপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ বর্তমান। দেওয়ালে একটা বৃহদায়তন ঘড়ি সময় নির্দেশ করিতেছিল। উপরে চম্পত্যপ আনৃত থাকায় গম্বুজের ভিতরের অংশ দেখিতে পাই নাই।

বারান্দার ও রোয়াকের মেঝে চূণ সুরকীর

concrete করা, তবে মন্দিরের ঘরের সম্মুখের অংশ-টুকু ভক্তগণ নিজেদের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয়া এক-একখানি খেত পাথরের টালি বসাইয়া দিয়াছে; তাহাতে প্রায় সমুদ্র। স্থান আনৃত হইয়া গিয়াছে। এখন অপরাপর ভক্তগণ বারান্দার স্থানাভাব বশত ঘরের পার্শ্বে অথবা রোয়াকের বসাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বারান্দার মোটা মোটা থাম ও গৃহের দেওয়ালের ব্যবধানে স্থলকোণাকৃতি ঝিলান আছে; ঝিলানগুলি বেশ নীচে অবস্থিত বলিয়া বেশ হইলেও লাফাইয়া হাত পাওয়া গেল না। এইগুলির উপরে ঠিক মধ্যস্থলে একটা করিয়া নাতিদুর্লভ দীর্ঘ ত্তত উঠিয়া গৃহ ও বারান্দার মধ্যবর্তী গম্বুজের অংশটুকু ধারণ করিয়া আছে। চমৎকার পরিকল্পনা!

বারান্দার ভিতরে এবং বাহিরে চূণকামের উপর নানা চিত্র ফোঁদিত আছে, উহার বেশীরা ভাগই নষ্ট হইয়া

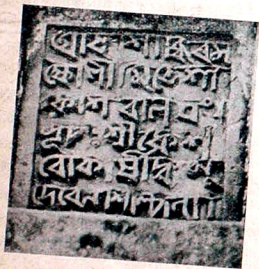


ত্রীকোণবেদনের বামদিক পুরোহিত ও উত্তর দিক দেবদেব

গিয়াছে। বাহিরের ইটগুলির কতক ফোঁদিত কাং-কার্যাবিশিষ্ট। বাহিরে, দেওয়ালের ছই পার্শ্বে মেঝে



হইতে প্রায় পাঁচ হাত উচ্চে দুইটা চালির উপরে এই একই শ্লোক পাজতোলা অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে :—  
“আকাশশিখরঃ কৌশলমিত্তে শাকে শিবালয়ঃ  
তুগাঃ শ্রীকেশবোকারীবাহুদেবেন শিখিনা।”



শ্রীকেশবদেবের মন্দিরের গাছে উৎকীর্ণ লিপি

আকাশ অর্থে শূন্য, অর্থাৎ সমুদ্র বা সাত, রস অর্থে ছয় এবং কৌশল অর্থে পৃথিবী বা এক বুঝাইলে “অজ্ঞাত বামা গতিঃ” হেতু ১৩৭১ হুয়, সূত্রান্ত ১৩৭০ শকাব্দে রাজা শ্রীকেশব রায় চৌধুরী বাহুদেব নামক শিল্পীর দ্বারা (বা পরিকল্পনায়) এই শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত লিপির স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা প্রথমে পড়িতে পারি নাই কিন্তু পুরোহিত মহাশয়ের যত্নে থাকায় তিনি আবিষ্কার করিয়া উনাইলেন। তিনি ‘অন্ধিকে’ ‘স্ববধি’ পড়িয়া তাহার অর্থ চারি সংখ্যা নির্দেশ পূর্বক ১৩৪৪ শকাব্দ বলেন। আমরা কিন্তু গুই পার্থের লিপিতেই ‘অন্ধি’ দেখিয়াছি। বাহাই হউক, প্রায় ছুইশত বর্ষের পুরাতন মন্দির, এরিষ্যে নিসন্দেহ হওয়া গেল। সেকালের শিল্পী বাহুদেব এই যত্নের গভীরমধ্যে যে চমৎকার পরিকল্পনা ও স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা—ইপাত ও concrete-এর যুগের লোকেরা—বিম্বদ্য-বিশ্ব না হইয়া পারি না।

মন্দিরের গম্বুজ দুই থাকে উঠিয়াছে, একটা বড় গম্বুজের উপর বেন আর একটা ছোট গম্বুজ রাখা হইয়াছে (অনেকটা তারকেশ্বরের মন্দিরেরই মত) উপরে তিনটা গৌড়শূলকুল কলস বর্তমান। তাহাদের চারিদিকে বৃন্দাকার বট, অশ্বথ, নিম প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ ও বন্যপতি সমৃদ্ধি হইয়া বেন একটা ‘নার্শারী’র আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। ছবিতে গাছগুলি ছোট দেখাইলেও (কারণ অনেকদূর হইতে চিত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে, আর মন্দিরও বেশ উচ্চ) বাস্তবিক পক্ষে ও-গুলি ছোট নহে। অনেক স্থানে ফাটলের মধ্য হইতে বৃক্ষাদির শিকড় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দেখিবার আরও অনেক কিছুই ছিল কিন্তু অনেক বেষা হইয়াছিল, রোঙ্গের তেজ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রান করিয়াও বিশেষ কষ্ট অল্পভব হইতে লাগিল। মন্দিরের পশ্চিম দিকে (অমুনা ভদ্র) সান বাধান বেশ বড় পুকুরি (তারকেশ্বরের বেলপুকুরের সমান) আছে।

রান ও প্রসাদ গ্রহণের পর কোটেঙুলি তোলা হইল। মন্দিরের রোয়াকের পর হইতেই চারিদিক ঘিরিয়া বাজারের চালাঘর এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, মন্দিরের ভাল রকম ছবি তোলা গেল না।

বেলা ২টার সময়ে আমরা ঘরে ঘরে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। মন্দির গাছের আড়ালে অল্প হইবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম এবং শ্রীকেশবদেবের উদ্দেশে প্রার্থিপাত পূর্ব্বে অগ্ন্যস্ত হইলাম। পথে জগদীশপুরের মন্দির দুইটাও পুনরায় দেখিয়া লইলাম। কিরিবার সময়ে আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল বলিয়া বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

শ্রীকেশবদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে একটা স্বন্দর কিংবদন্তী এদেশে শুনা যায়, তাহা বোধ হয় এখানে নিত্যত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বারভূইয়া রাজা শ্রীকেশব রায় চৌধুরীকে তদানীন্তন নবাব সরকার কর দিতে হইত। এক বৎসর শতহানি হইলে

প্রজাপণের নিকট রাজনা আদায় করিতে না পারায় অনেক টাকা কর সরকারে বাকী পড়িল। সূত্রান্তা তাঁহার তলব হইল এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজনা সমেত না বাইতে পারিলে পাটনা নামক স্থানে তাঁহাদের কুলবিগ্রহ শ্রীশ্রীপাটেশ্বরী ও শ্রীশ্রীশঙ্কর মন্দির মন্দির পাশে গোবধ পূর্ব্বে মন্দির কলুতি করিয়া অবমানিত করা হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। রাজা কেশব রায় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সূত্রান্ত এই সংবাদ পাইয়া অমনো-পায় হইয়া একদিন রাত্রিযোগে একা কী গঙ্গা গর্ভে জীবন বিসর্জন করিবার জন্ত ডায়মণ্ডহারবার অতি-মুখে চলিলেন। পথে জনৈক ভ্রাক্ষ তাঁহার সন্ধান শুনিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া গৃহে ফিরিতে বলিলেন এবং কোন বনমধ্যে এক শিবলিঙ্গ আছে, তাহা মন্দির নির্মাণ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন। রাজা ঋণ তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন যে, নবাব সরকারে তাঁহার ঋণ সন্ধান লাভ হইবে।

সন্দেহাকুলিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া রাজা স্থির করিলেন যে, আগে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক, তাহার পর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। বলা বাহুল্য, নবাব সরকার হইতে পাণ্ডা ও পাইক আসিলে সমস্তাভ্যুত্থানে রাজা গিয়া জানিলেন যে, তাঁহার নামে বাকী কর পূর্ব্বেই জমা হইয়া গিয়াছে; সূত্রান্ত ফিরিয়া আসিয়া

নির্দিষ্ট স্থানে অশ্রদ্ধান পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। এবং মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার নামায্যহারেই বিগ্রহের নাম শ্রীকেশবদেব হইল।

মন্দির নির্মাণকালে রাজা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতাহ ভাস্কর পাণ্ডাতে বিষ্ণুগুরে আসিয়া পদ্মাদান করিয়া বাইতেন। একদিন যানাহিক করিয়া কিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার নিম্নোক্ত চারিজন শিল্পীর

পরিবর্তে উপরে পাচজন মিস্ত্রী কাজ করিতেছে। কৰ্ম্মাধ্যক্ষকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে উপস্থিত সকলেই পঞ্চম মিস্ত্রীর অস্তিত্ব স্বীকার করিল। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া অহ-সন্ধানের জন্ত বাশের ভায়া বাহিয়া উপরে উঠিলেন এবং তথায় চারিজন বাতীত অপর কো নও মিস্ত্রী না দেখিতে পাইয়া নামিবার জন্ত সন্টে হইলেন, কিন্তু নীচের দিকে চাহিয়া কিছুতেই নাহিতে পারিলেন না। অনেক বেষা হইয়া

গেল। মিস্ত্রীগণ, কৰ্ম্মচারিবর্গ সকলেই পুনঃ পুনঃ উঠিয়া এবং নামিয়া নামিবার কৌশল দেখাইয়া দিলেও রাজা কিছুতেই নাহিতে না পারিয়া হতশ হইয়া পড়িলেন। কৰ্ম্মচারিগণ বাহ্যবাহার অকৃতকার্য হইয়া যখন ইতিকৃত্তব্য নিদ্রাঘর করিতেছিলেন, তখন সেইখানে উপস্থিত জনৈক বন্ধক বলিল যে, যদি কৰ্ম্মচারিগণ শেরশা করিতে পারেন ও তাঁহাকে অভয় দেন তবে সে এই সমস্তার



৩ তারকেশ্বরের মন্দির



মীমাংসা করিতে পারে। অতঃপর সকলের সম্মতি-  
ক্রমে রজক একবার নাচে পাড়াইয়া প্রকাশ্যে যেন  
ব্যাপারটা কি অসহন্য করিল, তারপর সকলকে  
ভনাইয়া রাধাকে সন্ধান করিয়া বলিল, “শালা  
কাপড় কাচিয়ে পয়সা দেবার নাম নেই, আবার  
উপরে উঠে চা ক’রছে দেখ! যদি না নামতে  
পারবি ত উঠেই কেন?” বলিয়া একটা কুৎসিত  
গালি দিল। একে হুঁখা মাথাই উঠিয়াছে, তাহার  
উপর একজন নিকট রজক কর্তৃক এইরূপে অভিহিত  
হইয়া অপমানে শিরার ফাট শোণিত ফুটাই উঠিল।

## তথ্যিক পঞ্চক

### কপিঞ্জল

১  
চড়াই বলে, ‘সব প্রগতির প্রতিবিম্বি রাখি দুটি  
আমরা করি ‘খাটে’র গাণি কেবল ‘খাটে’র সৃষ্টি।  
চতুর্দিকে প্রেমের প্রসার মাতোয়ারা দেশটা,  
উচিত বোদের আদর্শটা খাড়া করার চেষ্টা।  
বৌবন হার অশ্বহারা, জাগুছে পাশে মরণ  
কাছেই সৃষ্টির আনন্দকে করি আমরা বরণ।’

২  
হৃদ পাখী ভাবছে বসে, ‘রূপ নিয়ে কি করবো,  
কেবল ভাঙ্গা ভিটার বসে কতই বা আর চরবো।  
জল্লা নাহি, বেতার নাহি, সিনেমা, কি টকি—  
বটের গুটী নিয়ে কত খেলবো বসে ‘হকি’।  
রূপায় আমার জীবন গেল, হয়ে রইলাম বজ্র  
প্রাণ যে কাঁদে মাগে মাগে ‘হলিউডের জঙ্গ’।’

৩  
টাকসোপা কয়, ‘আছি নিয়ে টাকা এবং সোণ।  
দেশের লোকটা কাছেই করে নিতা আনাগোনা।  
কেহ বলে, খোলো একটা নুতন এরোজেন,  
কেহ বলে, সমযাবে লোকসানিটা কম।  
কিন্তু আমার পছন্দ ঠিক ছুটি সামগ্রী  
করপোরেশন ইলেকসন আর Film Industry।’

৪  
রাধা ক্রোড়ে অন্ধ হইয়া দৌছলামান একথাছি সামান্য  
দড়ি ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সেই  
অস্বাভ্য নানিতে দেখিয়া রজকপুত্র উজ্জ্বল পলায়ন  
করিল। কর্ণচারিপথকে তৎক্ষণাত্ তাহার শিরচ্ছেদ  
করিবার আজ্ঞা দিলে তাহার কৌশলে তাহাকে রক্ষা  
করিয়া ছায়ায় পড়ত পোড়িতে রূপাল রঞ্জিত করিলেন।  
রাসলমসে উপস্থিত হইলে তিনি জল-গ্রহণ করিলেন।  
বত্বিন পরে “রাস-রোহ” শাস্ত হইলে কর্ণচারিগণের  
নিকট আত্মসম্মতি সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া রাজা  
রজককে ১০০ বিঘা জমি দান করিয়া অভয় দিয়াছিলেন।

৩  
বক বলিছে, ‘কিসারীটা ব্যবসা নহে মন্দ,  
পিতৃ-পিতামহের পেশা ছাড়তেও হয় মন্দ।  
একযেয়েমি নয়তো ভাল, দেখছি রূপাল রঞ্জিত করিলে,  
কাজেই এলাম বিদেশ থেকে ‘ডাইব্লিং’ শিখে।  
তবু দেশে কাজ মেলে না, অবাক হলাম দানো,  
কেবল নিজের কামিজটিকেই রাখছি করে সানো।’

৪  
কাব্যে’টা বলে, ‘মহে এ দেশে মোর বাড়ী  
এসছিলাম উপকারটা করতে যদি পারি।  
দীর্ঘ দিবস কালা বেটে এই বুকেছি শেখ,  
এটা নেহাৎ অসভ্য ও কদাচারীর দেশ।  
চলে যাব Air Mail-এ, পেলাম একটা Call  
Miss Mayo-কে বলবো আমার অভিজ্ঞতার ফল।’

## মারাতী ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত হইতে শব্দ-গ্রহণ

### ক্রীকানিশারায়ণ দীক্ষিত, এম-এ

মারাতী ও বাংলা, উত্তর ভারতের দুইটা প্রধান  
ভাষা হইলেও, বাংলা ও হিন্দী অথবা হিন্দী ও  
মারাতী ভাষার মধ্যে বর্নিষ্ঠ সংঘর্ষ আছে, বাংলা  
ও মারাতী ভাষার সেরূপ নাই। হিন্দী ভাষার সহস্র  
ব্যবহার, মারাতী এবং হিন্দী ভাষার অল্পরূপ লিপি  
ও অল্পদৈর্ঘ্য-কালের সাহায্য, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশ  
বা ‘বৈকান’, wounded-এর প্রতিশব্দরূপে “লাহত”  
(কিন্তু killed = “হত”), illegal-এর প্রতিশব্দরূপে  
“অবৈধ”, selected-এর প্রতিশব্দরূপে “মেনোনীত”  
প্রভৃতি শব্দগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহৃত  
হইয়াছে। কিন্তু আবার এমন কতগুলি শব্দ  
আছে, যেগুলির সংক্ষেপ এ মন্তব্য খাটে না। যেমন,  
confused-এর সংস্কৃত পরিভাষা “সম্মত”, কিন্তু বাংলায়  
“সম্মত” সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।  
তেমনি without desire-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার  
না করিয়া “innocent” অর্থে “নিরাহ”, tremor বা  
movement-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া  
excitement অর্থে “চাক্ষু”, opposition-এর  
পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া competition অর্থে  
“প্রতিযোগিতা”, free from desire-এর পরিভাষারূপে  
ব্যবহার না করিয়া neutral অর্থে “নিরপেক্ষ” প্রভৃতি  
শব্দের ব্যবহারে মূল সংস্কৃত শব্দে তাই বা ছায়াপাত  
তরক হইতে (etymological sense) নিরর্থক মনে  
না হইলেও মারাতী ভাষায় দুর্য্যবোধক বলিয়া মনে  
হয়—যথা, abduction of woman বদলে “রমণী-হরণ”,  
labour বদলে “শ্রমজীবী”, dismissed বদলে “পদচ্যুত”,  
European বদলে “যেতাঙ্গ” প্রভৃতি। আবার কতক-  
গুলি শব্দের—যেমন, “অভিভাবক” (guardian অর্থে),  
“যোগদান” (help অর্থে), “নির্দান” (election

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কোন একটা বাংলা দৈনিকের এক  
সংখ্যা হইতে কতকগুলি উদাহরণ তুলিয়া দেখাইতেছি।  
কি বিপুল ধৈর্য সহকারে সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র মনন  
করিয়া, অপরূপ মনোবীর সহিত আহত শব্দগুলিকে বা-  
হার করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।  
যেমন, ইয়ারাণী afternoon-এর প্রতিশব্দরূপে “বিকান”  
বা “বৈকান”, wounded-এর প্রতিশব্দরূপে “লাহত”  
(কিন্তু killed = “হত”), illegal-এর প্রতিশব্দরূপে  
“অবৈধ”, selected-এর প্রতিশব্দরূপে “মেনোনীত”  
প্রভৃতি শব্দগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহৃত  
হইয়াছে। কিন্তু আবার এমন কতগুলি শব্দ  
আছে, যেগুলির সংক্ষেপ এ মন্তব্য খাটে না। যেমন,  
confused-এর সংস্কৃত পরিভাষা “সম্মত”, কিন্তু বাংলায়  
“সম্মত” সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।  
তেমনি without desire-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার  
না করিয়া “innocent” অর্থে “নিরাহ”, tremor বা  
movement-এর পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া  
excitement অর্থে “চাক্ষু”, opposition-এর  
পরিভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া competition অর্থে  
“প্রতিযোগিতা”, free from desire-এর পরিভাষারূপে  
ব্যবহার না করিয়া neutral অর্থে “নিরপেক্ষ” প্রভৃতি  
শব্দের ব্যবহারে মূল সংস্কৃত শব্দে তাই বা ছায়াপাত  
তরক হইতে (etymological sense) নিরর্থক মনে  
না হইলেও মারাতী ভাষায় দুর্য্যবোধক বলিয়া মনে  
হয়—যথা, abduction of woman বদলে “রমণী-হরণ”,  
labour বদলে “শ্রমজীবী”, dismissed বদলে “পদচ্যুত”,  
European বদলে “যেতাঙ্গ” প্রভৃতি। আবার কতক-  
গুলি শব্দের—যেমন, “অভিভাবক” (guardian অর্থে),  
“যোগদান” (help অর্থে), “নির্দান” (election



অর্থে), “নির্ধাপন” (extinction অর্থে) প্রকৃতির মূল সংস্কারের সহিত মিল নাই বলিলেও চলে। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ-গ্রহণ এবং আবৃত্তকাহুয়ারী তাহা কালে গালাইবার, ইন্দো-এরিয়ন্ ভাষাগুলির এই বে বোঁক্, ইহার কলে ভবিষ্যতে অধিকতর পোলমালের সৃষ্টি হইবে, বিশেষতঃ ‘টেকুনিকাল’ শব্দের ক্ষেত্রে। যদি এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার লেখকগণ মিলিত হইয়া

আলোচনার দ্বারা শব্দ-সৃষ্টির জ্ঞান একটী ‘কনভেনশন’ খাড়া করিয়া তাহা মানিয়া চলিতে প্রীকৃত না হন, তাহা হইলে এবিষয়ে কোন প্রকৃত উন্নতি হইবার আশা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া শব্দ-গ্রহণ যুগ্মপালীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট আমরা এটুকু আশা করিতে পারি না কি ?

## কলমীলতা

বন্দে আলী মিয়া

বাতাস লাগিয়া ছলে নিরবধি কলমীলতা  
ওরি বৃকে রয় মাটির বৃকের গোপন কথা।  
বিহানের রোদে টলমল করে বিলের পানি,  
তারি বৃকে ভাসে রূপে ভগ্নমণ্ড কলমীরাগি;  
খোকা খোকা লতা পাতা গুছিগুছি কাঞ্চল কালে,  
নীহার চুবানো রূপে যেন বিল করেছে আলো।  
ওরি কীকে কীকে টোপাপানি ভালে ব্যাঙের ছাত্ত,  
এই চোলে আর উজ্জাইতে নারে কলার নাও।  
কলমীর নামে পানিকোড় চলে, ডাহকী হাঁকে,  
সাব্বান চলে হেথায় হোথায় ‘কোয়াক’ ডাকে;—  
কলমীর বনে পথ খুঁজে কীদে বকের মেয়ে,  
ওরি সাদা রং মেয়ে মেয়ে যেন গিয়েছে ছেয়ে।

কলমীর মূল কুমারীরা যেন শূন্যে ভরা,  
চোখে চোখে গুর সোনালী স্বপন রূপ-পশরা;  
সেগুন্ডী রঙের কুড়কুড়ে যুখে ছ’খানি চৌঁট,  
বন মধু যেন ওই ঠায়ে আসি বেরছে জোটে।  
ছোটো আর বড়ো কলমীর কুঁড়ি যুথায় আজ,  
রোদে যেন পরে আলো ঝলমলা রূপালী সাজ।  
লুকোচুরি করে’ ডাকে চখাচবী কলমী বনে,  
রাতের ঝাঁথার নাচে ছলে ছলে ওদের সনে;  
পাতায় ফুলেতে গলাগলি করে কলমীলতা  
ইলসেগুড়িতে বৃকে জাপে গুর চঞ্চলতা।

ঈক্ষিয়া ঝাঁকিয়া চলে সমুখেতে কলমীভগা,  
ঘোড়ে তাহা’ পরে পোতা ছিলো হোথা জ্বিলের লগা।  
জলবোড়া সাপ কিল্বিল করে পাতার আড্ডে,  
জ্বিল বের করি মিটি মিটি চায় বিলের ধারে।  
কানাকুয়া পাখী পুত্ পুত্ করি দিচ্ছে ছুব,  
মাছ ধরে খায় কচু সীতারার লাকার খুব।  
কলমীরে ঘেরি কালো ঘন ছায়া পানি-কাঞ্চল,  
তারি তলে কাঁপে নীল আসমান অ-খই তল।  
বাতাসের সাথে জড়াজড়ি করে সকল দিন,  
পাতায় পাতায় উছলার তার মাটির গণ।  
লতা চলে দূরে এঁয়ে আর বেরে গুণার পানে,  
মাটির মেয়ের পানিতে দরদ কেন কে জানে ?

# সম্মতি

## স্বাধীন অল্পবৃদ্ধা দেবী

[ পূর্ণায়ত্ত্ব ]

( ৬ )

যে-বিধাতা স্বরঞ্জন ভাষ্যালিপির লেখক, তাঁহাকে একটু ‘ট্র্যাজেডির’ ভক্ত বলিয়াই বোধ হয়। নবীন-দৌরবে—সে-সময়ে লোক প্রিয়ার প্রেমের, প্রিয়ের মেহে আত্মনিমগ্ন করিয়া দিয়া পৃথিবীর মাটিতে সোনার স্বর্ণ গড়িয়া তোলে—ট্রিক সেই সময়ে তাঁহার কপালে ঘটয়াছিল বারে বারেই যম-দণ্ডের তাড়না। যখন সংসারের রণক্ষেত্রে উপযুগুপি শরক্ষেপ সহ্য করিয়াও পৃষ্ঠভঙ্গ না দিয়া যুদ্ধজর্জী বীরের মতই বিজয়মায়া স্বরূপ লাভ করিলেন এই সর্বাণিকে, তখন তাঁহার সকল জ্ঞান সার্থক মনে হইল! নিরালোক পৃথিবী সেন্নিন তাঁহার চোখে আলোকোৎসবে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু অল্পটের লিপিকার এইখানেই তাঁহাকে ছুঁই দিল না। সর্বাণি যখন শিশু, সে-সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহার জীবন-বহুরে বাহিরা-বাহির করা খেইটুকু যেন আবার কোথায় হারাইয়া গিয়া আর একবার সব বিস্মৃত করিয়া দিল।

কিন্তু স্বর্গগ্রহণের মত অ-সম্ভব আর বাহির আনিতো পারিল না। স্তুতিস্থান করিয়া অপত্য-সেহাঙ্কাজী পিতা তাঁহার সাধনা-সঙ্গ ফলস্বরূপ কল্যাণিক বৃকে চাপিয়া সকল অশান্তির জ্বালাকে প্রশমিত করিয়া জ্বলিলেন। মেয়ের নাম ছিল, মায়ের নামে ‘বিদ্যাংরখা’, বদলাইয়া সর্গমহী সর্গস্বধের সাথে আগনি পছন্দ করিয়া রাখিয়া দিলেন ‘সর্বাণি’। বড় হওয়ার পর ছোটবেলার একটা ছবি

বাতায় লেখা দেখিয়াই মেয়ে একদিন বলিল, ‘বাবা, ‘সর্বাণি’র চাইতে ‘বিদ্যাং’ নামে তো ভাল ছিল।’  
বাবা শুধু উত্তর করিলেন, ‘না, এই ভাল।’  
বাপের ও-নামে বিশেষ আপত্তি বৃদ্ধা মেয়ে আর কিছু বলিল না। একটা দিন সর্বাণি তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘মায়ের নাম ছিল নাকি ‘তড়ি’?’ ‘তড়িৎলব’ বেশ নাম, না বাবা?’  
বাপ মেয়ের দিকে এক লহমা দৃষ্টি স্থির রাখিয়া প্রক্টিপ্রণ করিলেন, ‘বাবা পড়ার শব্দকে তোমার বেশ মনে হয়? তা’ হলে এ-ও বেশ।’  
মেয়ে একবারে স্তব্ধ! সে দেখিয়াছে—মায়ের আলোচনা তার বাপের সঙ্গে চলি না। বাপ এমন একরকম আশ্রয় উপাশ হইয়া যান, যার পরে আর ও-কথা চালাইতে প্রবৃত্তিও থাকে না। সে বুদ্ধিমতী, মায়ের সম্বন্ধে নীরব হইয়া গেল।

স্বরঞ্জন ভাবিয়াছিলেন, আকাশে বৃষ্টি আর বাজ জমিয়া নাই, বতগুলি পড়ার তা’ পড়িয়া গিয়াছে। রাখিল করিয়াছিলেন, অনেকটা নিশ্চিন্ততা আসিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে-দিনের বর্ষশ্রান্ত মেঘভঙ্গকর নিনাদপূর্ণ প্রাবণের মঘনিশার তাঁহার মাথার উপর শতবজা নিক্ষিপ্ত হইল।

ভাষ্য-বিধাতা আর একবারের জ্ঞান তাঁহার দিকে চাহিয়া শ্বেবপূর্ণ উপহাসের অকরণ হাসি হাসিয়া লইলেন।



ক'নের আসনে ক'নে মিলিল না। যখন সারা বাড়ী ভর ভর করিয়া খুঁজিয়াও ক'নে পাওয়া গেল না, তখন মেয়ে-মহলে উঠিল কায়া, আর গুরু-মহলে বহিল দীর্ঘশ্বাস। স্বরঞ্জন — সেই শালগ্রাম-লাফাতে গররের কোড়-পরা সারা দিনের উপবাস এবং সারা সারাহাবিষি হুঙ্কারের রক্ত ও স্রিষ্ট স্বরঞ্জন — সেই রকমই শুদ্ধ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভাল-মন্দ কোন একটা শব্দই তাঁহার মূখ দিয়া বাহির হইতে কেহ শুনিল না।

আর তেমনি ভাবেই ছানুলা ভলার শিগার উপর বর দাঁড়াইয়া রহিল। বরযাত্রীসকল ভ্রমিত; বরকর্তা যত্নের পারিলেন আশ্রয়নে সেই বর্ষপোষুগ্ন মেঘমণ্ডিত, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রবনে গর্জনকারী গগনকে কপিত করিয়া তুলিলেন, প্রতিবাদ করিবার মত এ-পক্ষের কাহারও মুখে ভাবা ছিল না। বরযাত্রীদের আহার শেষ হইয়াছিল, মেঘ কিরিয়া আসিতেছে, বিদায় লইয়া যে বার বাড়ী করিতে চায়, আবশ্যকও বটে; কিন্তু বিশ্বদ্রাতিশয়ে সেকথা কাহারও মনে পড়িল না। বিবাহের পূর্বে মুহূর্তে ক'নে-চুরি, এরকম অপূর্ণ রহত তাহার ডিউকটিলের উপভোগেও স্বপ্ন পড়ে নাই।

ক'নে-খুঁজিয়া পাওয়ার সব আশাই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন সকাল হইতেও বড় বেশি ব্যাকি নাই। তখন পর্যন্তও টিক ভদ্রবাপর স্বরঞ্জনের কাছে আসিয়া, তাঁহার কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্বেরকার ভাবী বৈবাহিক প্রায় জলদগ্ধার নিঃস্বনে সমাবেশ সকল ব্যক্তিকেই গনিতে বাধা করিয়া কহিলেন,—

“ভগবান!” করেন, মাহুয়ের ভলার জুড়ে করেন। আপনার রক্তা যে আপনার পথে আপনি ম'রে দাঁড়িয়েছেন, এতে তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি; তা এখন আপনার কর্তব্য কি, সেটাও স্থির হয়ে থাক। সে-ময়ে পাওয়া গেলেও আমি আর তাঁকে পুঙ্খবুৎ ব'লে ঘরে নিতে পারব না। কেন, তা' আপনি বোধ হয় বুঝতেই পারছেন? তবে আপনার বাড়ীতে আপনার বড়ভ্রাতা ভায়ের

যে বিবাহবাণী মেয়েটা রয়েছে দেখলাম — খুব স্বন্দরী না হ'লেও চলনমই বটে, আর রূপে এবং বিজ্ঞায় আমার অশ্রদ্ধা ছ'রে গেছে — আপনার সম্মতি থাকলে উনি বোকাকে ঐ কস্তা দান করতে পারেন। উভর পক্ষের এতে কতকটা লজ্জারক্ষা হবে ব'লেই আমার হ'লে অল্পেরে সম্মত হওয়া, নতুবা যে-কবে এসব ঘটনা ঘটে, সে-ঘরে আমার সে জেবের বিয়ে দিই, সে-প্রস্তুতি আমার ছিল না।”

স্বরঞ্জন কলের পুতুলের মতই সম্মতি দান করিয়া সেজ ভাই-এর আকর্ষণে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন। সর্বাঙ্গীর গায়ের গহনাগুলি তার শোবার ঘরের খাটের উপর পাওয়া গিয়াছিল, মাথ তার লাল রঙের বেনারসী শাড়ীখানা অবধি, — যে-শাড়ী পরিয়া তাকে লক্ষ্যের মত দেখাইতেছে বলিয়া সেজ কাকীমাই কত সোহাগ জানাইয়াছিলেন। স্থলোচনাকে সে সবই পরান হইলে কের সর্বাঙ্গীর পরিত্যক্ত সেই পিড়ীর উপর তাকে বসান হইল, চুড়ীর পুঁতি কালে লইয়া মুখের ভিতর সে একটা আত স্থপারি পুরিল। কিছুক্ষণ আগে সে মৃদুনির জল কীরিয়াছে, চোখের জল তখনও শুকায় নাই, চোঁটের গোড়ায় একটুখানি হাসিও ফুটয়া উঠিল, ভাগ্যবিপর্যয় দেখিয়া।

বর-বরন হইয়াই গিয়াছিল, ক'নকে মাতপাক ঘুরাইয়া শুভচুটিটা করাইলোই চুকিয়া যায়, তার পর গোটা দুজার মল্ল বাঁ।

বর কই? বর কোথায়? এই তো কতক্ষণ সে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, বাড়ী ফেরা হইতে আর দেরী কিসের? এই তো সে তার নূতন বিবাহের খবর শুনিয়া অবতড় হৃদ্যন্ত বাপকেও ভরসা করিয়া বলিয়া বলিল, “না, বিয়ে আমি করব না।” বাপ বলিলেন, “তোমার মতামত আমি তো জানতে চাই নি।”

তারপর? সেল কোথায়? কেউ জানে না। মায় দরজার কাছে ভিড় করা বাজে গোেকরা শুদ্ধ না, বাজনদাররা তো সেই ক'নে-ক'নানর পরই নিয়ম হইয়া ঘুরাইয়া পড়িয়াছে। পক্ষের একপাশে ভাঁড়,

কলাপাতাও উচ্ছিন্নের স্তূপ জমা হইয়া আছে, হ'তিনতে কুকুর এই ভোরেই তার গোতে চুটিয়া আসিয়াছে। তারাজানে এখন ময়লা-কোলা পাড়া আসিয়া পৌঁছিয়ে। গদ্যদ্বাদনের বাড়ী টিপি-টিপি বৃষ্টিতেও পা টিপিয়া ছাঁতা মাথায় দিয়া চলিতেছিল। এই বাড়ীর পরের একটা বাড়ী বাদ দিয়া তার পরের বাড়ীটাকেও বিবাহ ছিল। এতক্ষণ সেখানকার বৈবাহিক ব্যাপার সমস্ত চুকিয়া গিয়া কোমোহল শান্ত হইয়াছে; বর-ক'নেকে লইয়া যারা বাসর জাগিতেছিল, তাদের মধ্যে একজনকার গান এ-বাড়ীর গণ্ডগোলের মধ্যেও একটু একটু শোনা যাতে লাগিল।

গারিকটা বোধ করি শ্রালিকা না হন, চান্দদিদি; কারণ, তিনি একটা চিরপ্রাচীন সেকলে গান গাহিতে ছিলেন; সর্বাটা বৃষ্টিতে পারা যায় না; হ'একটা কলিই ঘুরিয়া ঘিরিয়া কানে আসিতেছিল;—

“তোজ সখি! নিরুর মটবর আশ;—

মামিনী শেষ হ'লে সকলি নৈরাশ।

হুমহুম চন্দন, গন্ধ উপচার;

ভাসাবে দাও সখি! বকে ঘনদার—”

(৭)

উৎসবের ব্যতি সেই যে শ্রাবণের অমানিশার বাতাসের ছছকরে এবং বাতলের অশ্রুধারায় নিবিয়া গেল, বস্ত্রের মৃদামিনীর পুনঃ পুনঃ মাতারাতও আর তাহা জমিল না। জ্যোৎস্নার রূপালী আলো সারা ধরণীর বক্ষ প্রাণিত করিয়া সহস্র ধারার বহিরা গেল, চামেলী, চম্পক, মালতী, মল্লিকা, জুই, বেগী, শেফালিকা তাদের গন্ধে ভরা ফুলের ডালি মেসিয়া দিল, পাথে পাথে কতই মিলনের ধাঁধা বাজিয়া বাজিয়া শ্রান্ত হইয়া কিরিয়া গেল; যে শুভ অবসর সেদিনের মধ্যরাতে বার্থ হইয়াছে, আর তাহা কিরিয়া আসিল না। বা' সেল, লেহত তা' চিরদিনের মতই গেল। বা' বায়, তা' কি আর কিয়ে আসে? অতীত, হারান অতীত,

ঘরান অতীত চারিদিক দিয়া হাহাখবর বলিয়া ওঠে, —না, না, না, না।

সর্বাঙ্গিকে কিরিয়া পাওয়া কঠিন হয় নাই। কারণ সে হারায় নাই। তেভালার একটা চোরা কুহুরীতে একখানা ছেঁড়া গদীর পিছনে সে হাত-পা মুড়িয়া খনড় হইয়া পড়িয়া ছিল; একপ্রহর বেলা হইতেই ছেঁড়া গদীর তুলা মাথিয়া অল্পত মুড়িতে বাহির হইয়া আসিল। তখন পুগিসে খবর দেওয়া হইবে কি হইবে না, তাই লইয়া বাড়ীতে বিলক্ষণ দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। পাঁচ জনের পাঁচ কথায় গণ্ডগোল ভাল করিয়াই পাকিয়া উঠিয়াছে। সেজকাকা খুব কথিয়া কথিয়া চোখা চোখা বাক্যবলে বিরাত পোকের প্রকট মূর্তি স্বরঞ্জনকে প্রাণপাশে বিঁধিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন।

কিসের যে তাঁর এত গাজদাহ, ভাললগ্নে বুঝা না গেলেও নে-বজ্ঞটির একটু একটু অতিথিক্রিয়তা হারভায়ে প্রকাশ পাইতেছিল। আর সবার মনের মধ্যে গত সন্ধ্যার অতৃপ্তপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরা হইতে আর যে রকমই ভাব-বিপর্যয় ঘটতে থাকুক, এই চিরনিপিকারী এবং বলিতে গেলে একপ্রকার স্বপ্নে দ্রুপে নিক্কিয়ার স্বরঞ্জন বেচারার প্রতি প্রবল সহানুভূতি ব্যতীত বিবেকের লেশমাত্র ছিল না। বিশেষতঃ মেয়েমহলে; সেখানে সকলেই এই

একটা কথা বলিয়াই খেদ করিতেছিল যে, “বুড় বাপের কথাটা হতভাগী একবারের জুতে ভাবলে না? কি লজ্জাল মেয়ে গো!” এঁদের মধ্য হইতে কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, “দুঁতে কেলেত হয় এমন মেয়েকে!” আর একজন তাঁর কথার প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিয়া হাঁসার সঙ্কিত সায় দিলেন, “হ'ত যদি আমার মেয়ে, হেঁটে কাঁটা উপুরে কাঁটা গিরে পুঁতে বেলেতুম না। এতবড় আশ্পর্ক! মেয়েমহলের! দাঁড়িয়ে মূখ পোড়ালে গো!”

সর্বাঙ্গিকে আবিষ্কার করিয়া আনিল স্থলোচনাই। কি নাগিকি তা ভাবিয়া, অথবা কিছু না ভাবিয়াই সে গিয়াছিল তেভালার ছাদে। ছাদে গিয়াও যখন দেখিল নিস্তার নাই, পাশের বাড়ীর লোকেরা হাতের হাতের



আগিয়ার ফাঁকে ফাঁকে চোখ রাখিয়া উৎসুক দৃষ্টি দিয়া এ-বাড়ীর রহস্যময়দ্বন্দ্বের বিশেষ ভাবেই নিমূল্য রহিয়াছে, তখন সে তার অস্বাভাবিক একবার প্রাণ ভরিয়া উৎসাহিত করিয়া দিতে ছুটিয়া গিয়া চোরা কুঠুরীর দোর খুলিল; সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃৎচোখ দিয়া স্বপ্ন জল চোখের কোসেই আপনা হইতে ধামিয়া গিয়া গভীর বিশ্বসের স্তিরতমিগোতে তার সমস্ত বিশ্বাসকে সিদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। একটা অপরিমেয় হৃৎচোখের উদ্ভাত অধীর হইয়া উঠিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া সর্বাঙ্গীকে হুঁহাতে জড়াইয়া ধরিল,

“দিদি! দিদি! সর্বদিদি! তুমি এখানে!”

সর্বাঙ্গী তখন সারা দিন-রাত্রির অনিয়ম ও উত্তেজনার পর গভীর একটা অবসাদে যেন আলস্যের মতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন সেই বরের সঙ্গেই তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ফলশ্রুতি—মৃত্যু সর্বাঙ্গীকে বেন সে কঠিন নির্দিষ্ট হস্তে নাড়া দিয়া কঠোরকণ্ঠে জাকিয়া বলিতেছে, “এই গুঁট, মোয়ের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোবার জগ্গেই তোকে বিয়ে করে এনেছি নাকি?” শুনিয়া সর্বাঙ্গীর যেন সর্পশরীরে জালা ধরিয়াকে, সেও টিক তেমনি কঠিন মুখে তার শাসীর দিক মুখ কিয়াইয়া অতথানিই কঠোর স্বরে কোন কিছু বলিবার জন্ম যেমন মুখ খুলিয়াছে অমনই তার তন্ত্রস্তম্ভ কাননের কাছে বাজিয়া উঠিল, হতভাগ্য প্রত্যাব্যাত শাসীর কঠোর কণ্ঠের পরিবর্তে একটা আতঙ্ক-বাক্যের কোমল স্বর, “দিদি! দিদি! সর্বদিদি! তুমি এখানে!”

সর্বাঙ্গী ঘড়মুড় করিয়া উঠিয়া বলিল। এক মুহূর্তে তার সকল কথাই মনে পড়িয়া গেল। গত রাতের সেই উৎসবসমারোহ, সকাল হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত কতই না ছোটবড় নানাবিধ নিয়ম অস্টান, তাবরণ? সর্পশাস! সর্বাঙ্গী এ কি করিয়া বসিয়াছে? বিবাহ তো পড়েই হইল, হোক, কিন্তু তার বাপ? না জানি কি ঝড়ই তাঁর উপর দিয়া বহিয়া গেল! আছেন ত?

উঃ — সর্বাঙ্গী! কি সাম্যাতিক মেয়ে তুমি! যদি এক সঙ্গে এত বড় অপমান এবং আঘাত তাঁর সহ্য না হয়! থাকে? কেজাহতের মতই আত্মনাশ করিয়া উঠিয়া সর্বাঙ্গী মলোচনাকে জড়াইয়া ধরিল, “হুজি! আমার বাবা?”

হুলোচনা ততক্ষণে ঈদং সামলাইয়া লইয়াছিল। সর্বাঙ্গীকে আদিশেন আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সে তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গাছপরে বলিয়া উঠিল,— “বঁচে আছেন, কিন্তু তুমি এ কি করলে, দিদি?”

গতরাত্রে তার বাপের মৃত্যুর মত তার বিবাহ যে সর্বাঙ্গীর ভাবী বরের সহিত হইতে পারে নাই, এই মনে করিয়া এখন সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহা হইলে আজ এই সর্বাঙ্গীর সামনে সে মুখ দেখাইতে কেমন করিয়া?

বাপ যে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন, এইটুকু স্ববরই এখনকার পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইলেও “বঁচে আছেন” কথাটার মধ্য দিয়াই সর্বাঙ্গী যেন তাঁর বর্তমান অবস্থাটাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। “বঁচে আছেন!” টিক বলিয়াছে মলোচনা, রাজের সেই ঘটনার পরে ঐ কবাই-প্রকৃতি লোকটার হাতে তার অনলসহায় বাপকে একান্তভাবে ছাড়িয়া রাখিয়া সে যে নিতান্ত তাঁকর মতই লুকিয়া থাকিয়া তার পরে মত বড় একটা অত্যাচার-করিয়াছে, সে-কথা মনে করিয়া সর্বাঙ্গীর এখন মনও অন্তরঙ্গই তাকে যেন ঝিকার দিয়া ছি-ছি করিয়া উঠিল। একজন তার বাপের হৃদ্বাশ হইতে আর কিছুমানুষও যে বাকি নাই, সে-কথা এখানে বসিয়াও সে খুলিল। এর উপর গভীর হুঁচকিতা; আর সেটা যে কতখানি, সে-কথাই বা তার চাইতে কে বেশী জানে? সর্বাঙ্গী ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপদগুলো বিদেয় হয়েছে?” অমূল্য উত্তর পাইয়া মলোচনাকে টানিয়া বলিল, “চল হুজি! বাবার কাছে যাই!” সিঁড়িগুণ্ডা বাহিয়া সে যেন ঝড়ের বেগেই নামিয়া গেল। এই অসহায় আশীান অবসার মধ্যে স্বরঞ্জনর যে সহস্রহুতিকারী এ-বাড়ীতে একজনও

নাই, সে-কথাও সে জানিত, অথচ সর জানিয়া শুনিয়াও সে তাকে কার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে? “বাবা!” বলিয়া মেয়ে আসিয়া যখন স্বরঞ্জনের গলাটা হুঁহাতে জড়াইয়া ধরিল, স্বরঞ্জন তাকে একটা কথাও বলিতে পারিলেন না, শুধু নিজের গ্লান হুঁহাত দিয়া তার সেই হৃৎক বনয়নকে বাহ হুঁচকি গভীর বেগে জড়াইয়া ধরিলেন, আর তাঁর হৃৎচোখ দিয়া কীধ ছুঁটি জলের ধারা নামিয়া আসিল, তাহা তিনি গোপন পর্যন্ত করিলেন না; করিতে পারিলেনও না।

কিন্তু স্বরঞ্জন তাঁর হারানিখিকে কিরিয়া পাইয়াই

না হয় কৃতার্প হইয়া গিয়া তার কৃতকার্যের কোনই কৈকিন্ধ চাহিলেন না, বাটীর লোকেরও তো আর স্বরঞ্জনের মতন ফেপিয়া যায় নাই। তাঁরা এতবড় মেয়ের এই এতবড় বৈরাগিবি সহ্য করবেন কোন্‌ হিসাবে? এই যে কাণ্ডটা কাল ঘটিল, এর জন্ম তই কি সর্বাঙ্গী-স্বরঞ্জনের কলঙ্ক হইয়া; তাঁদের বাড়ীরও কি এতে নাম ধারাপ হইয়া গেল না? এর পর এ-বাড়ীর মেয়ে কেহ বিবাহ করিতে হাকী হইবে? ঘৃণতার কি একটা দীর্ঘা থাকিবে না? অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া সেজকাঁকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর চাহনি হইতে জন পর্যন্ত সমস্ত ভাবটা হইতেই তাঁর ভিতরকার যেন তারবের টিংকার করিয়া তাহাকে শাসন করিতে করিতে আসিল। তাঁর দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই স্বরঞ্জন যেন মজমে মেয়েকে নিজের কোলের কাছে ঈদং টানিয়া লইলেন, তাকে মসারের দুলল আঘাত হইতে ঢাকিয়া রাখিতেই তো চিরদিন চেষ্টা করিয়াছেন; আজও তাঁর গুঁই ভাবনাই সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

সেজকাঁকা কোন প্রকার হুঁচকিও দেখে নাই, সে

আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, “তুমি যা’ করলে, এর পরে কি আমরা আর ভরসায়ে মুখ দেখাতে পারব?” সর্বাঙ্গী এ-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়াই, হেঁটে হইয়া নিজের তলা দুইখায়া আলতা পরা পা-নামির মতের কাপা খুলিতে কানিল। তার তার দেখিয়া মনে হইল, কাপাঙা তার কানিলও যায় নাই।

সেজকাঁকা

সেজকাঁকা

সেজকাঁকা বলিয়া চলিলেন, “ভরসাকের ঘরে ভঁরে, লেখাপড়া শিখে, মাহুয় যে এমন হয়, এ তোমার এই কাণ্ড দেখবার আগে আমার স্বপ্নেও ধারণা ছিল না, সর্বাঙ্গী! সাধ করে কি লোকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাব না! খামকা একটা ভরসাকে এই যে তুমি অপমানটা করালে, মনে করেছ কি এর পর আর স্বপ্ন তোমার কেউ বিয়ে করবে চাইবে? শাদরবেও আর তোমার বিয়ে হয় না। দৌ’পড়া মেয়েকে কে ঝুঁট করে তুমি? ছি ছি ছি; কি কাজ তুমি করলে ভেবে দেখ দিকি?”

স্বরঞ্জন একটু যেন ব্যত হইয়া মড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, একবারের জন্ম কি যেন বলিলেন বলিয়াও মনে হইল, হাতখানা মেয়ের গায়ের উপর দুটসমস্ত হইল, সে-পশ্চৎ যেন নীরব ভাষায় অমরোপ করিয়া বলিল, রাগ করো না, লজ্জা আমার! সে যা’ বলে বসুকণে, আমি তো কিছু বলছি নে! সর্বাঙ্গী নীরব নমস্কে বধা-কাণ্ডেই নিরত রহিল। মুখা-ফুকার তার শরীর তখন যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল।

সেজকাঁকা তাহাকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিলেন, আসে পাশে বাড়ীর বেশির ভাগ লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁদের কুনাইয়া শুনিয়া বলিতে গািলেন, “আমাদের আজই চলে যেতে হবে, এর পর এ-বাড়ীর সমস্ত আমরা আর কোন মতেই রাখতে পারি নে, তা’ করলে মলোচনার বিয়ে দেওয়াই আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠবে। এই যে গল্পটা রটনা করা হচ্ছে, এ কি কেউই বিশ্বাস করবে? চোরা কুঠুরী নিশ্চয়ই খোঁজা হয়েছিল, পাশের বাড়ীর পাটিলে গুঁড় অসুখায়েই যে ওখানে ফিরে আসা যায়, কে না তা’ জানে? বিশেষ, ঘরে যখন ওরকম একটা ব্যাপার রয়েছে তখন—”।

স্বরঞ্জন অব্যক্ত কণ্ঠে আত্মনাশ করিয়া উঠিলেন, “অমূল্য!”

“তুমি চুপ করে থাক স্বরদা! তোমার যদি এতটা প্রশ্ন না থাকত, মতই হোক, এ-বাড়ীরও তো কিছু



রক্ত ওর গায়ে আছে, অতটা খেচ্ছাচারিণী হ'তে পারত না! তোমার কর্মস্থানে বা' ক'রতে হয় করুক, আমরা বলতে বাচ্চিনে কিন্তু সমাজের বুকের উপর ব'সে এই সব জঘন্ড কাণ্ড আমরা কখনই ক'রতে দিতে পারিনে, এতে আমাদের মাথা কাটা যায় না? আমি জানতে চাই, এর অর্থ কি? আমি জানতে চাই। অয়ে ছাড়ব না।—

সর্গাণী যেমন নতমুখে বসিয়া ছিল তেমনি নতমুখেই বসিয়া রহিল; কিন্তু তার সর্গশরীরে একটা ভীত চাক্ষুষ জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে কটন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা জানা গেল। আর একটুকণ সেইরূপ থাকিয়া বোধ করি অন্তর্নিগ্রহে জয়লাভ পূর্বক সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন তার পলকবহনর শিখ মুকশি প্রতিভাত ও দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,

“কেনিহ্ন যদি আমার বাণ চাইতেন বিতুম, কিন্তু তিনি জানেন, আমি তাঁর অপমান কিছুতেই সহ ক'রতে পারিনে; যারা তাঁকে অপমান ক'রে তাঁর মেয়েকে পশোর মত ঘাটাই ক'রতে খিা করে না, সে-বরকে আমি আমার জন্মের ঘর ক'রতে পারি নি ব'লে তিনি যে আমার ক্ষমা করবেন না, এ-বিধাস আমার মোটেই নেই। আর আপনারা, আমার সঙ্গ যদি অন্তরঙ্গ বিবাহাই হ'রে উঠে থাকে, বা' ভাল বোধ করেন করবেন; আমার কিছু বলবার নেই।”

এই বলিয়া সে কোন দিকে না চাহিয়াই সেই বিমদ্যাগত্যে প্রত্যাভূত বর্জিত জনতার মধ্য দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল, কাহারও প্রতি ক্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া শুধু বাপকে বলিয়া গেল, “কাপড় ছেড়ে আসছি বাবা, তোমায় নিয়ে একুণি কালাঁঘাটে পুঁজো দিতে বাব, শীগগির তৈরী হ'রে নাও।”

তাহাই হইল। বাপকে একজন হালদারের বাড়ী গচ্ছিত রাখিয়া পরের দিন সর্গাণী তাদের বাসা-বাড়ী উঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে কিরিয়া আসিল। সেবিল সেজকাকা সপরিবারে গতকন্ডই নিজের ঘরে রওনা হইয়া গিয়াছেন, আরও অনেককেই

চলিয়া গিয়াছেন। আজও আবার অনেক লোককেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাড়ী ফেরার জজ তল্লি ধাবিতেছেন। সর্গাণী আসিয়া সকলের পায়ের ধুলা লইল, আলমারি-ভরা শাড়ী বাহির করিয়া যথোপযোগ্য সকলকে বিলাইয়া দিল, পথ-ঘরটা মিষ্টির হাঁড়ি বা' কিছু পাওনা, তা' সে কাহারও বাকি রাখিল না। যারা চলিয়া গিয়াছেন, কারও পার্শ্বল কারও লোক মারফৎ তাঁহাদের প্রাণ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রয়েছে সে সেই হালদার-বাড়ীতেই কিরিয়া গেল। শিবের অকল পাথারে ভাসিয়া এই বাড়ীতেই পড়িয়া আছে, মণিকা তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে; সে শিবেরকেই বাড়ী আসপাশাইবার ভার দিয়া বলিয়া গেল, বাড়ীটা খালি হইলেই সে যেন সর্গাণীকে খবর দেয়, যতদূর একটা প্রাণীও এ-বাড়ীতে থাকিবে, তার বাপকে সে তাদের মধ্যে আসিতে দিতে পারিবে না। পরের বাড়ীতে যত কষ্টই তাঁর হোক, এদের ক্ষুরখার রদনার আঘাত তো সেখানে নাই।

এমন করিয়াই স্বরজনের বড় আদরের মেয়ের জীবন-আকাশটা কালো মেঘের ঘনঘটাৎ ঘোরালো হইয়া রহিল, সে-মেঘ আজও কাটে নাই।

ছেলেটার খবর আমরা কিছুই জানি না; শুধু কয়েকটা বিভ্রাণন সাপ্তাহিক ও দৈনিকে কিছুদিন ধরিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি (অবশ্য সেটা উহারই উদ্দেশ্য কি না তাও ঠিক জানি না)।

সেগুলি এইরূপ:—

—থোকা!

ফিরে এস, তোমার মা একান্ত কাতর। বিয়ের কথা আর বলব না।—তোমার বাবা।

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর! সপারের কত ভাঙ্গা-গড়া, কত উখান-পতনের ইতিহাস রচনা করিতে করিতে মহাকাশের বকে নিভাকালের চিরপ্রবাহিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরও তাহার মধ্যে মিশিয়া গেল। ভবিষ্যতের

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এর দান কতখানি, তার জীবন-ইতিহাসের আলোচনাতেই প্রমাণ পাইয়া থাকি, পরমাণু আমরা করিতে যাইব না, আমরা আমাদের পাঁচটা বৎসর খুব তুচ্ছ নয়!

(ক্রমশঃ)

## “চোক গেল”

শ্রীভুক্তস্বধর রায় চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল

মহাব্যোমে তারকার প্রতি রোমকূপে

জোঁরাব্রুপে

ছুটেছে পুলক-কম্পন,

নিদ্রাহুরা নিশীথিনী নেহারি স্বপন

ঘুমঘোরে উঠিছে চমকি।—

সহসা থমকি

দাঁড়াল ভূঙ্গশিখর উদ্ভে তুলি দণ্ডা,

হইয়ে উন্নমন।

উৎকর্গ রহিল চাহি আকাশের পানে।

সোপানে সোপানে

নামে যথা পল্লভ নৃপরের ধ্বনি

নভ হ'তে নিম্ন পথে নামিল তেমনি

চিহ্নস্তন করিয়া যুধর

দীর্ঘতর স্পষ্টতর এক কি যুধধর

“চোক—গেল!”

কে গো ভূমি যুগে যুগে জনমে জনমে

কি সাধনা মরমে মরমে

নিরাশ্রয় জাগরণে

সমপোপনে

সাধিয়াছ কত কাল ধরি,

তাই কি সহসা আচ্ছিন্ন নেত্রপথ ভরি

দেখা দিল চিরারাব্য সাধনার ধন

হরি প্রাণমন

দৃষ্ট তব খলসিয়া দরশনপক্ষে

উন্মাদিয়া পলকে পলকে

রূপশোভাে চিত্ত তব হে রূপ-পিয়াসী?

অসহ যে রূপোন্মাদ বিহ্বল-বিকারী

সম্মিলিতে নারি

সহসা কি চক্ষু ছুট পদপুটে বারি

ত্রীত কঠে তাই বার বার

তুলিলে চাঁচকার

“চোক—গেল!”

চিহ্ন-পট হ'তে তুলি চিত্রপটে লিখা

হেরি রূপ জল জল—হোমানল শিখা—

কবে কোন্ কনক-বরণী

দলিত-নবনী

আপনা আহুতি দিতে তোমারি মতন

সহসা মুদ্রিত রূপাঙ্ক নয়ন

এমনি কি উঠিল ডাকি

“চোক গেল” বলি? শোন্ পাখী!

সৌন্দর্যের রস-ধন সে চিত্রস্বন্দর

রূপের সমগ্র স্বধা অমৃতস্বর

ল'য়ে যদি এ মুহূর্তে ভাসে এ নয়নে,

কি ছার অন্ধতা? পারি বরিতে মরনে

আনন্দের অদ্বৈত বেদনে

বণ্ড বণ্ড করি মোরে বিলাইয়া দিতে।

ওই ভূবে গেল স্বর! মিলায় চকিতে

সে স্বভাৱ! ওরে পাখী! না মিলাতে রেখা

একবার প্রাণেখরে দেখা মোরে দেখা!



## জন্মসার গল্প

## আহমেদুল্লাহ রায়

মিনতির সঙ্গে সিঁতেশের আশাপ অনেক দিনের। ভোমার না-কেরা পর্য্যন্ত আমাদের মনে থেকে বিবাহও প্রায় ঠিক হ'য়েই ছিল। হঠাৎ এমন সময় মিনতির বাপের খেয়ালে সখন্দ ভেঙে গেল। আর তারপর এক সপ্তাহও পার হ'লো না, সিঁতেশ কালাপানি পেরুবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললে। 'পাসপোর্ট' নিলে, কবে কোন্ জাহাজে যাবে তা ঠিক করলে, এমন কি 'রুক কোম্পানী'র মারফৎ টিকিট কেনাও তার হ'য়ে গেল।

বন্ধু-মহলে সিঁতেশ চিরদিন খেয়ালী ব'লেই পরিচিত। তাই অকস্মাৎ তার ইউরোপে পাড়ি জমাবার কারণ নিয়ে কেউ মাথা বামাগে না। শুধু তার জন কয়েক বন্ধু ও বান্দবী মিলে আয়োজন করলে তাকে যটা ক'রে বিদায় দেওয়ার জন্ত একটা ছোট-খাটো রকমের জন্মসার। জন্মা হয়তো ভালো ভাবেই উঠের যেতো। কিন্তু সকলে এসে জমতে না-জমতেই বাইরে প্রকৃতির মুখে ঘনিজে এলো। জন্মসারের কালো ছায়া। বাতাস পেঁজা ফুলের মতো মেঘগুলোকে আকাশময় ছুঁড়ে ফেলতে শুরু ক'রে দিলে, ঝড়ের ঝাপটায় বৃষ্টির ধারাগুলো সোজা নেমে আসতে আসতে বুপাক খেয়ে দূরে দূরে ছটকে পড়তে লাগল। কড়-কড় ক'রে ডাল্ল বাজ, হুপাতের দুরিতে আকাশের বৃক বিদীর্ণ ক'রে চমকালো। বিছাং, তারপর একটা ঘন কুয়াশার আচ্ছন্নর আড়ালে ঢাকা প'ড়ে পৃথিবীর দূরে-কাছে সব একাকার হ'য়ে গেল।

জন্মা জন্ম না। তাই যে গুটীসাতক বন্ধু-বান্দবী এসে প'ড়েছিলেন, তাঁরা ধ'রে পড়লেন সিঁতেশকে একটা গল্প বলবার জন্ত। বন্ধু-মহলে সিঁতেশের গল্প বলবার খ্যাতি ছিল। তাই অমলেশ বললে—এমন গল্প বলা চাই সিঁতেশ যে, এই আজকের দিনটো বেন

ভোমার না-কেরা পর্য্যন্ত আমাদের মনে থেকে যায়।

নমিতা বললে—তাই ব'লে কিন্তু ক্রমায়েসি গল্পও আমার চাইনে।

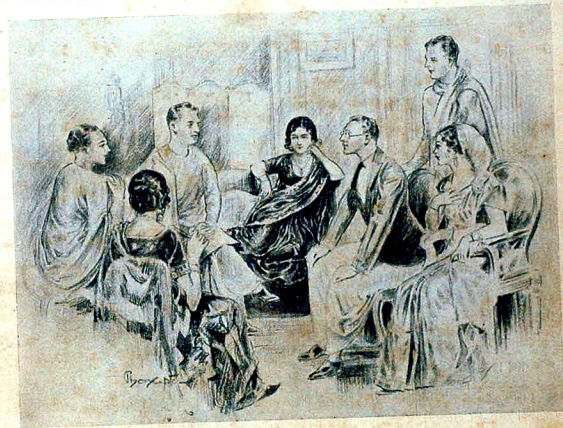
সিঁতেশ বললে—গল্প যদি শুনতেই চাও তবে বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক এবং তার ভাষা হ'বে কাব্যের। আকাশে যখন মেঘের নাদল বাজতে থাকে, এবং অপর্যায়ের পায়ে যখন নাচনার মাঝখানে তাল কেটে যায়, আর তার ফলে স্থলি হয় বিছাতের, তখন যারা সাদা গল্প বলতে চায়, তারা ভুল করে। কারণ, সাদা গল্পের বা' প্লট এবং ভাষা, বর্ধার আবহাওয়া ও আওয়াজ—কারো সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই। তাই তো বর্ধার গিলে কাব্য লিখতে ব'সে কালিদাসকে স্থলি করতে হ'য়েছিল মন্দাকিনী ছন্দ—যার গর্জন মেঘের মতো এবং চলন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ভোমার যদি রাঙ্গি থাক তো বোলা, আমি আরম্ভ করি।

বন্ধু এবং বান্দবীরা সমস্তের চাঁৎকার ক'রে উঠে বললে—বেশ—বেশ তাই করো। ভোমার রূপকের রূপটাই আজকের এই জন্মসারের রজনীতে না হয় আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠুক।

সিঁতেশ শুরু করলে—

অপর্যায়ের মেঘে—তাই সারা দেহে জড়িয়ে ছিল তার জ্যোৎস্নার মতো রূপের দীপ্তি। তার চলাগ, তার ধামা, তার হাসিছে, তার ইশিতে এই আশোর দীপ্তি ঝ'রে পড়ত। কিন্তু রূপের চেয়েও হৃদয়ের ছিল

তার কথা। সে যখন কথা বলত, মনে হ'তো— আকাশের কোলে বজ্র হাঁকে, বিজলী চম্কার। বীণাপাণির হাতের বীণাটাই যুদ্ধি কে বাজিয়ে চলেছে। বাতাসের পায়ে সেখানে বাজে ঝড়ের নুপুর। মর্ত্তের কথা নানা ডাল-পল্লবে জড়িয়ে কোঁচুল মিলে নাম দিলে তার 'রূপকথা'।



..... আজকের গল্প হ'বে আমার রূপক .....

স্বর্ণেও মর্ত্তের মাহুকে নিয়ে আলোচনা চলে। দেবতার। বলতেন—মর্ত্তলোকের মাহুকের মায়া বড় বেশী। তারা ভাষোবাসার কাঁদে জড়িয়ে পড়ে, আর বেরিয়ে আসতে পারে না, আর তারই ফলে তারা ছঃখ পায়। তাদের ভিতর দেবতার মতো বড় মনও আছে, আবার দেবতার মতো বিজী খারাপ লোকেরও অভাব নেই। মর্ত্তে আলোর পরেই আসে নিকর-কালো অন্ধকার, সে অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারে না। কিন্তু তাদের যুদ্ধি খুব প্রখর। তাই আগুন থেকে আলো বা'র ক'রে নিয়ে তারা তাদের অন্ধকারের ছঃখ দূর করতে চায়। মেঘে সেখানে

একদিন মর্ত্তলোকে বেড়িয়ে আসে। দেবতাদের ইচ্ছা মানেনই তা' পূর্ণ করা। তাই হাওয়ার ভর ক'রে আকাশের দরবার পাড়ি জমাবার জন্ত সে তার পাখা মেলে দিলে।

সরীরা ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় চ'লেছ? সে বললে—মর্ত্তলোকে।

বিস্মিত হ'য়ে তারা বললে—মর্ত্তলোকে! কিন্তু সেখানে যে মায়ার কাদ পাতা আছে। কাউকে যদি ভালোবেসে কোলো, তবে তো আর স্বর্ণে ফিরে আসতে পারবে না।

সে বললে—ভালো হয়তো বাস্বে না, কিন্তু যদি



বেসেই ফেলি হারিয়ে-বাওয়া এই সখীটির কথা তোমরা মাঝে মাঝে মনে করো। আর যদি তারও বেশী দরদ হয়, মর্জো গিয়ে না-হয় এক আশ দিন আমার খোঁজ নিয়ে এসো।

তারা বললে—কিন্তু খুঁজে পেলোও তো কিরিয়ে আনতে পারব না। মর্জোর মায়া-জালে বাধা পড়লে ফেরবার কেবল একটি মাত্র পথই আছে—যার ভালোবাসায় পড়া যায় সেই যদি কখনো বিরক্ত হয়ে বসে—ভূমি যাও। কিন্তু সোভী মর্জোর মাহুত অপরীক একবার হাতে পেলো কখনো কি বলতে পারবে—যাও, তোমাকে আর চাই নে।

কিন্তু সখীদের মানা মেয়েটির মনে পৌঁছালো না। আকাশের একটা ঝঁসে-পড়া তারার মতো বাতাসের পাখারের ভিতর তার দেহটাকে সে এলিয়ে দিলে।

পাহাড়ের কোল বেঁসে স্বর্ণধার জল ঝরে চলেছে। তার চলার গতিতে বাজছে নুপুরের ধ্বনির মতো মিঠে স্বরের আলাপ। তাঁরে বন—পাতার কাঁকে কাঁকে তার ফুটে আছে অজস্র ফুল—কোনোটার রং আকাশের নীলের মতো নীল, কোনোটা বা আবার একেবারে টাটকা ব্রহ্মের ধারার মতো লাল। যাদের রূপ নেই, গন্ধের আমেজে তারা ভরে তুলেছে বনের বুকের বাতাসটাকে। পাহাড়ের বুকে আছে ডেপড়া স্বর্ণধার জলের বিস্মৃতিতে ভোঁরের স্বর্গের আলো রামধনুকের রং-এর তুলি বুনিয়ে দিয়েছে।

জায়গাটা দেখে স্বর্গের মেয়ের মনও মুগ্ধ হয়ে পেল। ধীরে ধীরে পিঠের উপর থেকে জানা ছ'খানা পুঁনে বেধে, একখানা পাখরের উপরে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল মর্ত্যলোকের এই অপকল্প সৌন্দর্য।

কতকণ যে সে এই ভাবে বসে ছিল তার টিক নেই, হঠাৎ পিঠের উপরে একটা মৃদু স্পর্শ পেরে

রূপকথা চমকে উঠে পিছনের দিকে ফিরে তাকাতেই ছুটো বড় বড় চোখের সঙ্গে তার চোখ মিলে গেল। অত স্থল্লর চোখ দেবতাদের ভিতরও কখনো তার চোখে পড়ে নি। দীর্ঘ ঋতু একখানি দেহের প্রান্ত ঘিরে' স্বর রৌদ্রের দীপ্তির মতো একটা দীপ্তি। আর সেই দীপ্তিকে যিহ্নতার ও কোমলতার ভরে তুলে' জেগে আছে ছুটি চোখ, যেন ছুটি অপকল্প নীল পর।

রূপকথা মুগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—ভূমি কে? এ চোখ, ভূমি কোথায় পেলো?—কোথায় পেলো তার এই দীপ্তি, আর সে দীপ্তির এই কোমলতা?

আশ্চর্য উত্তর দিলে—আমি মর্ত্যলোকের রাজপুত্র। মর্জোর হাধারা মেয়ে আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু কাউকে ভালোবাসি নি। হঠাৎ তোমার উপরে চোখ পড়তেই বুকে জেগেছে আমার ভালোবাসার আলো, আর সেই আলোই ঝরে পড়ছে আমার চোখের ভিতর দিয়ে। এ আলো তো আমার নয়—এ আলো আমার ভালোবাসার। ভূমি আমার ঘরে চলে।

রাজপুত্রের কথা শুনেই স্বর্গের মেয়ের বুকেটা জ্বলে উঠল, সে দোলা সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের আঘাতে যে দোলা কাগে, তারই মতো। মনের দিকে তাকিয়েই সে বুখতে পারলে এই দোলায় ভরা বুখানা তার একটা আশ্রয় চাইছে। ভয়ে ভয়ে সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাইলে। তারপর আস্তে আস্তে একটা সোহাগিত্রি নিঃশ্বাস ফেলে বুখানা তার নৈমে এলো বুঝাঙ্কের দৃঢ় প্রশস্ত স্থগটিত বুকের উপরে।

স্বর্গের মেয়ে বললে—মর্জোর রাজপুত্র, ঘরে তো আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ, কিন্তু সেখানে কি আমাকে ধরে রাখতে পারবে?

রাজপুত্র বললেন—কেন পারব না? কোথায় আমার দীনতা আছে বলে তোমার মনে হয়?

রূপকথা বললে—আমরা স্বর্গের মেয়ে, অবলোকার



ভূমি কে? এ চোখ, ভূমি কোথায় পেলো?...



আখাত সহিতে পারি নে। কিন্তু তোমরা মর্ত্যের লোক। শুনেছি—তোমাদের মোহ হুঁদুওই মিলিয়ে যায়। হুতো একদিন আমার উপর থেকেও তোমার মোহ মিলিয়ে যাবে। সেদিন কি করে আমাকে স্বর্গে রাখবে?

রাজপুত্র বললেন—মর্ত্যের মাহুকে না-হয় একবার পরীক্ষা করেই দেখো। যা শোনো যার তার সব কথা সত্য হয় না। একথা তোমরা যদি না জানো, আমরা যারা মর্ত্যের লোক তাদের বেশ ভালো করেই জানা আছে।

দিন আসে দিন চলে যায়। মর্ত্যপুরের রাজপুত্র আর স্বর্গলোকের রূপকথা—হুঁজনার মিলে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলে। রাজপুত্র রাজ-কাজে যান, রূপকথা তাঁকে বাধা দেয় না। সে তখন ব'লে ব'লে ছবি আঁকে।—কত রকমের ছবি, অশ্বারীদেবীর নাকের ছবি, স্বর্গের দেবতাদের মুখের ছবি, যে ফুল ইন্দ্রধরুর রকেও হার মানায় সেই পারিজাত ফুলের ছবি।

কাজ শেষ করে রাজপুত্র কিংবদন্তি আসেন—গল্পে ও গানে, হাসিতে ও কৌতুকে তাঁদের আসরে আবার ভিন্ন রকমের স্বর্গ জ'মে ওঠে। রাজপুত্র লেখেন কবিতা, তাঁর কাছে ব'লে রূপকথা বাজায় বাঁশী। বাঁশীর সেই স্বরে রাজপুত্রের মন নিজের ছন্দের কথা ফুলে যায়। রূপকথার সেই স্বরটাকেই তিনি তখন ছন্দের ভিতরে ধরে চোটা করেন। এমনি করে রূপকথা ফুলে গেল তার স্বর্গের স্থিতি। মর্ত্যের মাহুকের সম্পর্কে এসে সে একেবারে মর্ত্যের মেয়ে হয়ে পড়ল।

কিন্তু রূপকথা তুললেও তার স্বর্গের সখীরা তার কথা ভুলতে পারলে না। মিটি কথা শুনেই রূপকথার কথা তাদের মনে পড়ে, মিটি স্বর্গ এসে

কানে বাজলেই তাদের মন আনন্দান করে ওঠে রূপকথার জন্ত। একদিন ছদ্মবিন করে অনেকগুলি দিন কালের বেতোতে মিলিয়ে গেল। জন্মে তার কিংবদন্তি আসা সম্বন্ধে তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং সে যে মর্ত্যের মানবের প্রেমে প'ড়েছে সে সম্বন্ধে কারো আর কোনো সন্দেহ রইল না।

এইবার তাদের সভা বলল কি করে সখীকে নিরিয়ে আনা যার তারি পরামর্শের জন্ত। একজন বললে—স্বর্গের ঐক্সজানিককে ডেকে পাঠাও, সে যাক তার কাছে। ঘূমের ভিতর দিয়ে লিখে রেখে আহুক সে রূপকথার মনে এমন হৃন্দর করে স্বর্গের ছবি যে, ঘুম ভাঙলেই স্বর্গে কিংবদন্তি আসার জন্ত তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

স্বর্গের বাড়করকে ডাকা হলো। রূপকথার কাছে বেয়ে লিখে এলো সে তার মনের পাতায় স্বর্গের ছবি। রূপকথার হৃদয়ও ব্যাকুল হয়ে উঠল স্বর্গের জন্ত। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই সে দেখলে—জ্যোৎস্বার আলোকে তার পাশেই রাজপুত্রের মুখখানা বেন পদের মতো হয়ে ফুটে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপ্নও স্বপ্নের মাঝেই মিলিয়ে গেল।

এ উপায় ব্যর্থ হ'তে দেখে আবার বলল সখীদের সভা। এবার একজন বললে—আকাশের গা থেকে খানিকটা নীল মেঘের কাগজ তুলে নাও, তারপর বিছাতের আলো দিয়ে সেই কাগজের উপরে তার কাছে লিখে পাঠাও চিঠি। সে চিঠির ভাষা হবে রুটির ধারার মতো করুণ। তাতে লেখা থাকবে—আমরা তোমার বিরহ আর সব কবুতে পারছি নে। তুমি শীগগির কিংবদন্তি এসো আমাদের কাছে।

চিঠি লেখা হলো। কালো মেঘের উপরে বিছাতের হরপ লেখা। সে চিঠি একদিন জলে উঠল রূপকথার চোখের সামনে। সখীদের বৃকর ব্যাধা রুটি-ধারার ভিতর দিয়ে জল হয়ে স্বর্গে পড়ল

স্বর্গের মতো। কিন্তু তখন রাজপুত্র শুনাচ্ছিলেন রাজপুত্র রাজ-কাজে গেছেন। রূপকথা ব'লে তাঁর রূপকথাকে তাঁর কবিতা। তার স্বর্গ মেঘের মতোই উত্তরীর গায়ে পরাঙ্খিল শোনা ও রূপার তারি গাট, বিছাতের মতোই আলামর, অঙ্গর মতোই করুণ। স্বতরাং তাঁর কবিতার স্বর্গ এবং সখীদের পদের স্বর্গ একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। রূপকথা ভাবলে—রাজপুত্রের কবিতাই বৃষ্টি বিছাতের লেখা

রাজপুত্র রাজ-কাজে গেছেন। রূপকথা ব'লে তাঁর রূপকথাকে তাঁর কবিতা। তার স্বর্গ মেঘের মতোই উত্তরীর গায়ে পরাঙ্খিল শোনা ও রূপার তারি গাট, বিছাতের মতোই আলামর, অঙ্গর মতোই করুণ। স্বতরাং তাঁর কবিতার স্বর্গ এবং সখীদের পদের স্বর্গ একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। রূপকথা ভাবলে—রাজপুত্রের কবিতাই বৃষ্টি বিছাতের লেখা



রূপকথা ব'লে রাজপুত্রের উত্তরীর গায়ে পরাঙ্খিল জরির আঁচলা

হ'য়ে জেগে উঠেছে আকাশের মেঘে, রুটি-ধারা হ'য়ে স্বর্গে পড়েছে ধরণীর বুকে। স্বতরাং সখীদের এ চোটাও সফল হলো না।

আবার স্বর্গে সভা বলল রূপকথার সখীদের। এবার তারা ঠিক করলে—তারা নিজেরাই যাবে সখীকে আহুদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্ত।

মতো শিউরে উঠল। রূপকথা তাদের মহাসমাদরে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল স্বর্গের সমস্ত কথা। কে কেমন আছে, স্বরা মন্দারের উপরে ব'লে এখনো তাদের জটনা চলে কি না, স্বর-সভাতলে উর্ধ্বশির নুতো নতুন কি কি ধাঁচ এসে যুক্ত হয়েছে—এমনি ধরনের সব প্রশ্ন।



একটু একটি ক'রে সব খবর তার কাছে পরিবেশন করে তারা বললে— কিন্তু স্বর্ণের সব চেয়ে বড় খবর কি জানিনু? তোমার বিরহে অকালে পারিজাতের দল ক'রে পড়তে শুরু ক'রেছে। অতএব মর্ন্তোর মায়া কাটিয়ে কিরে' চলুই আবার আমাদের মাথখানে।

রূপকথা বললে— কিন্তু রাজপুত্রকে কেনে' তো আমি যেতে পারব না। ও তাহ'লে তো বাচবে না। স্বর্গীদের একজন বললে— না বাঁচুক তাকে তোমার কি? কত তারার আলো অন্ধকারে নিবে' যায়, পারিজাতে কত কুঁড়ি ফোঁইবার আগেই ক'রে পড়ে। তাতে কি স্বর্ণে কারো চোখে কেউ কখনো অশ্রু দেখেছে? রাজকুমার না বাঁচে তো না বাঁচুক। তুই আমাদের ভিতরে কিরে' চল।

জলভরা কালো ছ'টো চোখ, তুনে' রূপকথা বললে— নথী, তোরা কিরে' যা। মাহুনের ভালোবাসার স্বর্ণের দেব-কন্যায়ও যদি একবার আপনাকে হারিয়ে ফেল, স্বর্ণের উপরেও তাদের আর কোনো রকমের মোহ থাকে না।

রূপকথার অশ্রু-নথীরা ব্যর্থকাম হয়ে কিরে' গেল। মর্ন্তোর মায়ায় গণ্ডির ভিতর থেকে তারা তাকে বাইরের মুক্তাক্ষরে টেনে আনতে পারলে না।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ব'লে আছেন তাঁর সিংহাসনের উপরে। মাথার উপরে জ্বলছে জ্যোত্স্নালোকের চক্ষুতাপ। পারিজাতের বন থেকে গন্ধ এনে তাকে হাওয়া করছে বহন পবন। তারার মণিহার জ্বলছে তাঁর গলায়। নিশ্চিন্ত মনে তিনি উপভোগ করছিলেন বিশ্রামের আনন্দ। এমন সময় রূপকথার নথীরা এসে প্রণাম ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।

তারা বললে— দেবরাজ, মর্ন্তোর মানব দেবতাদের শ্রদ্ধার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ইন্দ্রের হাজার চোখ, দিয়ে বিপদ ঠিকরে পড়তে

লাগল। তিনি বললেন— সে কি কথা? মাহুয কি ক'রে দেবতাদের শ্রদ্ধার কারণ হ'বে? তারা তো চিরনিরীহ— চিরহর্ষল। তারা তো দেবতাদেরই পূজা করে।

নথীরা বললে— এই মাহুযের ভালোবাসায় পড়তে শুরু ক'রেছেন স্বর্ণের দেবকন্যারা। স্বতরাং স্বর্ণ ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছেন তারা মর্ন্তালোককে। এ ব্যাপার যদি এই রকম ভাবে চলতে থাকে, স্বর্ণ নারী-শূন্য হওয়াও অসম্ভব নয়।

—কিন্তু এরকমের কোনো কথা তো আমি শুনি নি।

—তবু একবার ভিতরে এতটুকু অতৃষ্ণি নেই, দেবরাজ। আপনি রূপকথাকে জানেন না। স্বর্ণে তার চেয়ে রূপদী ছ'টা'রজন থাকলেও, কথায় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর একজনও নেই। মর্ন্তালোককে বেড়াতে বেয়ে এই রূপকথাই প'ড়েছে মর্ন্তা-পুত্রের রাজপুত্রের ভালোবাসায়। স্বতরাং মর্ন্তোই সে তার ভেরা বেঁধে ফেলেছে, স্বর্ণে তার আর কিরে' আসা হয় নি।

—তোমরা তাকে কিরিয়ে আনবার চেষ্টা করো নি কেন?

—ক'রেছিলাম, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। মাহুযের প্রণমে যদি কোনো দেব-কন্যা পড়তে, তবে মাহুয বতরণ বেছায় তাকে মুক্তি না দেয়, ততক্ষণ তো তার মুক্তি নেই।

ইন্দ্র হেসে বললেন— মাহুযের ইচ্ছা! কতটুকুই বা তার জ্ঞান, আর কি-ই বা তার দাম! সঙ্গে সঙ্গেই একটি দেবকন্যাকে ডেকে তিনি বললেন— এই মূর্খকে তুমি মর্ন্তালোককে গমন করো। সেখানে মর্ন্তালোকের রাজপুত্রকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে— রূপকথার বিনিময়ে কি সে চায়। কুবেরের ভাগ্যের মতো অক্ষরন্ত ঐর্ষ্যা, দেবতাদের বোনের মতো অজ্ঞান বোঁবন, নদীর ধারার মতো ভোগের অজপ উপাদান— যা' সে চায় তাই দিয়ে

স্বর্ণের মেয়ে রূপকথাকে আবার এই স্বর্ণের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে।

দেবদূত মর্ন্তো এসে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন—দেবরাজ তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছেন, তুমি বর যাচ'ণা করো।

রাজপুত্র বললেন—দেবরাজের প্রসন্নতা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অকস্মাৎ এ অল্পহের কারণ কি?

দেবদূত বললেন—স্বর্ণের মেয়েকে তুমি তোমার ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছ, তাকে মুক্তি দাও। স্বর্থ-প্রাচ্ছনা, জীবন-বোঁবন, ধন-রত্ন যা' তুমি চাইবে, দেবতার বরে কোনো জিনিসেরই তোমার অভাব থাকবে না।

রাজপুত্র হেসে বললেন—আপনার রাজাকে বলবেন—রূপকথার কাছে স্বর্ণের রাজার সিংহাসনও মর্ন্তোর রাজপুত্র তুচ্ছ ব'লে মনে করে।

উত্তর শুনে' দেবদূত হতাশ হ'য়ে কিরে' গেলেন।

মর্ন্তোর রাজপুত্রের জবাব ইন্দ্রকে জানানো হ'লো। ক্রোধে তাঁর হাজারটা চোখ, বেন আঙনের শিখার মতো জ্বলতে লাগল। আর সেই ক্রোধের হেঁচোচ লাগতেই হাতের বজটাও তাঁর গুণ্ড গর্জনে ছুঁড়ার ক'রে উঠল। কিন্তু ক্রোধ সত্ত্বেও ক'রে তিনি নিজে চললেন এবার রূপকথাকে উদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে মর্ন্তালোকের রাজপুত্রের কাছে।

ইন্দ্র বললেন—রাজপুত্র, রূপকথা আমার স্বর্ণের অলঙ্কার। তুমি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও, বিনিময়ে তুমি যা' চাইবে আমি তাই তোমাকে দান করব।

রাজপুত্র বললেন—দেবরাজ, স্বর্ণ আপনাদের অক্ষরন্ত ঐর্ষ্যের ভাগ্যর। একটি তারা যদি সেখান থেকে

ব'লে পড়ে, ক্ষতি-হুজি তাতে বিশেষ কিছুই তার হ'বে না। কিন্তু আমার মাটির নুক খুব বেশী অলঙ্কার নেই। পথ ভুলে' স্বর্ণের একটা জ্যোতিষ্ক যদি এখানে ব'লে প'ড়েই থাকে, আমার এত সখ্য নেই যে, আমি তাকে আবার হেলায় হারিয়ে ফেলব।

ইন্দ্র বললেন—আমার অহুচরেরা এনিয়ার সর্ব-শ্রেষ্ঠ হস্তরীকে খুঁজে' এনে তোমাকে দান করবে— তোমাকে বিবাহ ক'রে তুমি সুখী হ'বে। রূপকথাকে তুমি পরিত্যাগ করো।

রাজপুত্র বললেন—দেবরাজ, আপনাদের স্বর্ণে প্রেম দৃষ্টিকের খোলা মাত্র। কিন্তু আমার এই মাটির পৃথিবীতে ভালোবাসা জীবনের চেয়েও বড় জিনিস। ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের সঙ্গিনী বদলায়, কিন্তু আমরা থাকে একবার সঙ্গিনী রূপে বরণ ক'রে নিই, সেই হ'য়ে গুটে আমাদের সারা জীবনের সখী। স্বতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। তবে যদি রূপকথা আমাকে তাগ ক'রে বেছায় আপনাদের সঙ্গে যেতে চায়, আমি তাকেও বাধা দান করব না। কারণ, থাকে ভালো-বাসা যার তার উপরে জোর চলে না। আর সেই জড়ই, তাকে যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হয়, আমার অহুমতির চাইতে আপনি বরং তারই মত-জিজ্ঞাসা করুন।

রাজপুত্রের কথায় ইন্দ্রের মন থুথী হ'য়ে উঠল। হাজার চোখ, তুনে' তিনি তাকালেন রূপকথার দিকে। স্বর্ণের স্বথের সোয়াদ যে একবার পেয়েছে, মর্ন্তোর মাটির উপরে যে তার কোনো মোহ থাকতে পারে, এ ধারণাও আসে নি কখনো তাঁর মনে। তাই তিনি বললেন—রূপকথা, তোমার বিরহ স্বর্ণের নুকও বেদনার স্রষ্ট ক'রেছে, স্বর্ণের রাজাকেও তা' টেনে এনেছে মর্ন্তালোককে। স্বতরাং তুমি আর দেবী ক'রো না, যেখানে তোমার মর্ত্যাকারের স্থান, সেই দেবতাদের ভিতরে কিরে' চলো।

একটু রান হেসে রূপকথা বললে—দেবরাজ, আমাকে মার্জনা করুন।



বিষয়ে ইন্ডের মন ভ'রে উঠল। শুদ্ধকর্তে তিনি বললেন—তুমি স্বর্ণে কিরে' যেতে অস্বীকার করছ, রূপকথা? স্বর্ণের স্বপ্ন, স্বর্ণের আনন্দ—তার কি কোনো দামই নেই তোমার কাছে?

—দাম আছে মহারাজ, দাম আছে। স্বর্ণের স্বপ্নের পশ্চৎ এখনো আমার শিরার মাঝে হিল্লোলিত হ'য়ে ওঠে, বিগত দিনের আনন্দের আবেশ এখনো মোহ জাগায় আমার মনে। তবু এই মর্ত্যলোক ছেড়ে আমার বাবার উপায় নেই।

জিজ্ঞাসু চোখগুলো তুলে' ইন্ড আবার তার মুখের উপরে স্থাপন করলেন। রূপকথা বললে—স্বর্ণের স্বপ্ন অম্ল, তা' ভোগ করবার উপায়েরও অন্ত নেই। বত ভোগ করা বায়, শ্রান্তিও কখনো আসে না। স্বর্ণের কল্যাণ মর্ত্যের স্বপ্ন অত্যন্ত পরিসীম। ইন্ড-ধর্মের মতো হাজারো বর্ষের বিশাল তার ভিত্তর খুঁজে' পাওয়া যায় না। ভোগের ভিত্তর দিয়ে শ্রান্তিও অতি সহজে এসে পড়ে। তবু আমার বাবার উপায় নেই।

—তবু তোমার বাবার উপায় নেই?

—না দেবরাজ, তবু আমার বাবার উপায় নেই। কারণ, আমার নিজের স্বপ্নের চেয়ে আমার কাছে আঙ্গ-চের বড় হ'য়ে উঠেছে আমার বাবার স্বপ্ন—রাঙ্গপুত্রের স্বপ্ন। আমি গেলে জীবন তাঁর ভ'রে উঠবে হৃৎকের কালো মেঘে। কোথাও তার এতটুকু আনন্দ থাকবে না। আলো হ'য়ে উঠবে তাঁর কাছে মৃত্যুর মতো কালো। তাঁর সে বাবা আমি কি ক'রে সহ্য করব?

—তুমি বা' বলছ সে তো মাহুদের কথা, রূপকথা—দেবতাদের কথা নয়। আসক্তি আর মোহ নেই ব'লেই তো দেবতার দেবতা। এ আসক্তি—এ মোহ কি—কি জাগল তোমার বৃক্, এত বড় অধঃপতন কি ক'রে সম্ভব হ'লো তোমার মনের?

হেসে রূপকথা উত্তর দিলে—আপনার স্বর্ণ শেখায় দেবরাজ, কেবল নিজেই ভালাবাসবার কৌশল। কিন্তু মর্ত্য শেখায় পরের ভালাবাসার ভিত্তরে আপনাকে

বিলিয়ে দেওয়ার বিশ্বাস। তাই তো বাবা তার নিতা সঙ্গী। বাবা যে স্বপ্নের চেয়ে হৃৎকর হয়, মর্ত্যের মাটি আমাকে সে কথা শিখিয়ে দিয়েছে। দেবরাজ, আপনি কিরে' যান।

রোষে অপমানে ইন্ডের হাজারটা চোখ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের বস্ত্রেও জাগল অসহিষ্ণুতার গর্জন। বস্ত্রের গর্জনের মতোই গম্ভীর কন্ঠে তিনি বললেন—স্বর্ণের রাজা তাঁর বিদ্রোহী প্রজাকে কখনো ক্ষমা করেন না। রূপকথা, তুমি তোমার অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করো।

তারপর তিনি তাঁর সঙ্গের অহুতরকে ডেকে বললেন—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, তেপান্তরের মাঠের শেষে, পাতাল-পুত্রীর ভিত্তর ময়দানব যে অন্ধকারের প্রাসাদ গ'ড়ে তুলেছে, সেই অন্ধকারে নির্দ্বাণিত ক'রে এসো এই রূপকথাকে। রূপ আর যৌনর ওর দেহের তট ছাপিয়ে এমন ভাবেই ছেঁগে রইবে—কেবল সে দেহের ভিত্তর থাকবে না প্রাণ। রূপের মন-কাঠি ছুঁইয়ে তুমি গুকে সেইখানেই মৃত্যুর দোলায় হুলিয়ে রেখে আসবে—তবে তাঁর গাশে সোনার একখানা জীবন-কাঠিও রেখে এসো। একদিন ও স্বর্ণের আনন্দ ছিল, সেই কথা মনে ক'রেই ওর মৃত্তির পথ আমি চিরদিনের জড় রুদ্ধ ক'রে দিতে চাই নে। এই রাঙ্গপুত্র—যে গুকে স্বর্ণ-ভ্রষ্ট ক'রেছে সে যদি কখনো সেই পাতালপুত্রীর সন্ধান পায়, আর ঐ সোনার কাঠি ওর দেহে ছুঁইয়ে দিতে পারে, তবেই ও কিরে' পারে ওর প্রাণ। যে মাহুদের প্রেমে ও স্বর্ণ তুলেছে, সেই মাহুদের দিক দিয়ে এবার তার প্রেমের দূততার পরীক্ষা হোক।

ব'লেই ইন্ড অস্থূল হ'য়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার দেহটাও বাতাসের ভিত্তরে মিলিয়ে গেল।

বজ্রাতের মতো রাঙ্গপুত্র সেই নির্জন স্রবের ভিত্তর বহুদূর গুকে হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর

যখন তাঁর চেতনা ফিরে' এলো, একটা বাপ্তরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি নিজের মনেই বললেন—স্বর্ণের রাজা, তোমার শ্রান্তি কঠোর, সে শ্রান্তির ভিত্তরে শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু জ্বলের নির্দেশ নেই। তবু তোমার দণ্ডই আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। কারণ, তোমার অজ্ঞাতসারেই তুমি মাহুতকে দিয়ে গেলে অমর হ'বার পথের সন্ধান। তোমারা দেবতার হুধা পান ক'রে মৃত্যুকে জয় ক'রেছ, মাহুত অমরতা লাভ করবে জ্বলের বিধ নিঃশেষে পান ক'রে। দেবতার চেয়ে বড় হ'বে মাহুদের গৌরব।

রাজার স্বপ্ন, ভোগের আনন্দ, বিলাসের স্পৃহা সমস্তই পিছনে প'ড়ে রইল। সেই মুহূর্তেই রাঙ্গপুত্র তাঁর নিরুদ্ধি প্রিয়ার সন্ধান পথের প্রান্তে নেমে পড়লেন।

সিতেশ্বর কঠর একদণ্ড চলছিল তাঁর শ্রোতের মতো কৃতকটা একটানা ভাবে। গম্ভীরা শেষ হ'য়ে আসতেই তার স্বরটাও একবারে থাকে নেমে গেল। কিন্তু সে শুধু হ'ক মুহূর্তের জড়। তার পরেই নেতিয়ে-পড়া মনকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন ক'রে তুলে' সে আবার বললে—

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, তেপান্তরের মাঠের শেষে, কোথায় কোন্ পাতাল-পুত্রীর অন্ধকারে ইন্ডদেবের অহুতর রূপকথাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন। মর্ত্য-দেশের রাঙ্গপুত্র আলো তার সন্ধান পান নি। তাঁর মোড়া 'তাই ছুটে' চলেছে স্বভাৱে বাতাসের ভিত্তর দিয়ে, বন-পথের মাথান দিয়ে, পাহাড় ভিত্তরে, মরুভূমি পেরিয়ে। দিনের হুঁচি তাঁর মাথার উপরে অগ্নি জ্বলে, রাতের অন্ধকার এসে পথ রেখে ক'রে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। তবু তাঁর শ্রান্তি নেই, চলায় তাঁর বিরাম নেই। কে জানে এ-চলা কখনো তাঁর শেষ হ'বে কি না।

অকস্মাৎ একটা দম্কা হাওয়া লাগলে দীর্ঘনিশ্বাস প্রথমে যেমন ধরু ধরু ক'রে কেঁপে ওঠে, তার পরেই নির্ভে' বায়, সিতেশ্বরের কঠরও তেমনি একবার কেঁপে উঠে' পর মুহূর্তই থেমে গেল। কিন্তু কঠর হাওয়াও তার স্বপ্নের রেখা যেন স্রবের ভিত্তরে ভাবের উপরে তার স্পর্শ যেন ছুঁ টেনে টেনে খেলিয়ে বেড়াতে শুরু ক'রে দিলে।.....

সে স্বপ্নে সমস্ত স্রবের ভিত্তর চারিয়ে গেল একটা মুহূর্তের ভাব—একটা স্বপ্নের আবেশ। এই স্বপ্নের স্রব যখন কাটল তখন মেঘের মসী-চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে' জ্যোৎস্নার হাত-খারা লুকিয়ে পড়ছে আকাশের নীলের উপরে, জলে-তেজা ধরিত্রীর বুকের উপরে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে বিহ্বল হোলে তাকিয়ে রকথা বললে—আকাশের কোলে ইন্ডের যে রোহ-বলি জ্বলে ওঠে, সে তো দু'দণ্ডই মিলিয়ে যায়। রূপকথার উপরে ইন্ডের যে রোহ তাও কি অমনি ক'রে মিলিয়ে যেতে পারে না, সিতেশ্বর।

পরেশ বললে—স্বীকার করছি সিতেশ্বর, তোমার শক্তি আছে। নইলে এত বড় একটা পুরানো পটা গুল দিয়ে, আর কেউ এতগুলো লোককে এমন ভাবে, একদণ্ড ময়দুদ ক'রে রাখতে পারত না। আঙ্গ যে তোমার গল্প শুনেছে, সেই বৃত্তে পায়গে—ভাষাটা গল্পের কত বড় জিনিষ। এই ভাষার ইন্ডজাল দিয়ে ভিখারীর মেয়েকেও রাজরাজী সামান্য অমরতর নর।

অনিলা বললে—তা' নয় পরেশ বাবু, তা' নয়। আপনাদের আমার মধ্যে যে চিত্রতনের রূপকথা ও রাঙ্গপুত্র লুকিয়ে আছে, সিতেশ্বর বা' তাঁর গল্পের ভিত্তর দিয়ে রূপ দিয়েছেন সেই রাঙ্গপুত্র ও রূপকথাকেই। তাই তো তাদের কথা আমরা জ্বতে পারছি নে, তাদের মোহ ছড়িয়ে গেছে আমাদের রক্তের সঙ্গে একবারে আমাদের মনের মাথান।

সিতেশ্বর গল্প নিয়ে এর পর তার বহু-বাহুবীরের ভিত্তর রীতিমত তর্কের জাল বোনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।



কিন্তু সিতেশ আর একটা কথাও বললে না। তার মুখের উপরে ফুটে উঠল শুধু রহস্যময় একটা হাসির দীপ্তি। আশ্চর্যে আশ্চর্য খোলা দরজার ভিতর দিয়ে সে এসে বাইরে দাঁড়ালো। লম্বা প্রকাণ্ড বারান্দা—বাড়ীটার এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে থামের আড়ালে অন্ধকারের ভিতর ছায়ার সঙ্গে মিশে' দাঁড়িয়ে ছিল একটি নারী-মূর্তি। এগিয়ে এসে একবার তার কব্জের কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সিতেশ ডাকলে—মিনতি!

স্বপ্নের মাঝখানে হঠাৎ কেউ এসে ধাক্কা দিলে মাহবুবেমন ছাঁৎ ক'রে জেগে ওঠে, তেমনি ভাবে চমকে উঠে' মিনতি চাইলে সিতেশের মুখের দিকে। তারপর

তার কব্জের উপরে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে সে বললে—আমি জানি সিতেশ, তাই নিঃসংশয়ে তোমাকে বলছি—ঋণকথাও তোমার রাজপুত্রের জন্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে। যুগ তার যত ভীষণই হোক না কেন, স্বপ্নের দেবতা তাকে যত বড় প্রলোভনই দেখান না কেন, সে কখনো তার প্রেমের স্বর্ণ হ'তে ভুলে হ'বে না।

তার কণ্ঠস্বর অশ্রুর ভারে ভিজে' ভারি হ'য়ে থেমে গেল।

অশ্রু-ভেজা তার সেই চোখের পাতার উপরে উজ্জ্বল বেগমনি চোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে সিতেশ বললে—জানি, মিনতি, সে কথা আমিও জানি।

## প্রিয়া

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল

যে দিন তোমারে ভাল বাসিয়াছি প্রথম দৃষ্টপাতে,  
সেই দিনই তব মৃৎমা মিলেছে নিখিল সৃষ্টি সাথে।  
ঢেরে রই হবে স্থান প্রান্তরে অঞ্চল পড়ে মনে,  
দখিনা মলয় তন্ত্র-পরিমল আনে ফুলবাস সনে।  
পদপাশে মনে প'ড়ে যায় আকৃত সে ছুটি ঋষি,  
ইন্দ্র আনন স্রির অনিন্দেয়ে চাঁদপানে চেয়ে থাকি।  
গোলাপ দলের অরুণ মাধুরী স্বরায় বিরাধর,  
বিরহবেদনে ভুলে অকারণে ব্যাকুলিয়া অন্তর।

চাঁদিনী রাতের লাবণিখারায় তোমার মাধুরী গলে,  
কলজটিনীর চলতরঙ্গে যৌবন উজ্জ্বলে।  
বরষা দিনের নিকষ-নীরদ স্রারয় সে কালো কেশ,  
হেমোর গন্ধে ভেসে আসে তব বেগীর সুরভি রেশ।  
কাজল মেঘের বুক চিরে অই চপলা খেলায়ে যায়,  
তাহাতে তোমার অ'বি-তারকার চকিত চমক ভায়।  
বেগেছে আমার বিধের সনে তোমার মোহন কায়,  
জ্বর-মুক্তরে বরতন্ত্র তব ফেলেছে মেঘের ছায়।

## কথা-সাহিত্যের কথা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট

বাঙলা দেশে যতগুলি মাসিক ও সাময়িক সাহিত্য-পত্র আছে, তাহার রকম বারো জানা যে শুধু উপজ্ঞাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাজারে বিকাশ—এ কথা বলিলে বোধ হয় অতুলিত করা হইবে না। যত উচ্চ ধরনের পত্র-পত্রিকাই হোক না কেন, কেবলমাত্র আলোচনা-মূলক প্রবন্ধাদির দ্বারা উহাকে টিকাইয়া রাখা শক্ত। গল্প, উপজ্ঞাস ত চাই-ই, তাহা ছাড়া রঙিন ছবিও হই একখানা থাকি চাই, এবং ঐ ছবির বিষয়-বস্তুও একটু চিত্তগ্রাহী হওয়া প্রয়োজন। গল্পই হোক, আর চিত্রই হোক—উহাকে পাঠকের চিত্তগ্রাহী করিবার জন্ত দে-রসটিকে খুব বেশী পরিমাণে পরিবেশন করিতে হয়—সেটা “মধুর” বা “কান্ত”-রস; অর্থাৎ সাদা কথায়, যে-মাসিকে প্রেমের গল্প ও যুবতী নারীর বিভিন্ন অবস্থার রসাল ছবি যত বেশী থাকে, তার কাঁচিতি যে সেই অল্পপাতে কিছু বেশী হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাজারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অবস্থা লক্ষ্য করিলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বিষয়-বস্তুর নির্দোষ সন্দাপকগণ সাধারণতঃ গুরুপত্রীর বা গবেষণামূলক জটিল প্রবন্ধকে, এবং কেহ কেহ বা কোনো খ্যাতনামা কবির কবিতাকে প্রথম স্থান প্রদান করেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই প্রবন্ধগুলি পঠি' করিয়া থাকেন। গল্প, উপজ্ঞাস পড়া শেখ হইয়া গেলে নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্তই চারিজন কোনো রূপে নাক মুখ ঝাঁটরা ছই একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনেকে শুধু উহার উপর একবার চোখ বুলিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হন। কবিতার দশাও প্রায় এইরূপ; তবে প্রবন্ধাদি অপেক্ষা ইহার পাঠক-সংখ্যা কিছু বেশী বলিয়াই মনে হয়। কারণ,

কৈশোর ও যৌবনের দিক্‌দৃশ্যে মাহবুব মাহবুবেই মনে কিঞ্চিৎ কাব্যরসের সঞ্চার হয় এবং তাহারই ফলে গল্প-কলেজের তরুণ-তরুণী মহলে কবিতার কথকতা সমাদর দেখা যায়। অধিকাংশ মাসিকের কবিতা-গুলি প্রকাশিত হয় পাদপুস্তকের জন্ত। স্বতন্ত্র ভাবে বণ্ড-কবিতাগুলির মূল্য বড়ই কম; মাসিকের পাঠক-পাঠিকারা কবিতাগুলিকে বেন কতকটা “কাউ” স্বরূপ লাভ করেন।

সকলের চেয়ে গল্প ও উপজ্ঞাসের চাহিদাই বে বেশী, তাহা সাময়িক সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক মাহুবেই বেশ ভাল ভাবে জানেন। তাই দেখিতে পাই, গল্প বা উপজ্ঞাস লিখিয়া ধাঁহারা কিছু দশরাই হইয়াছেন, পুরাতন বা নূতন সকল মাসিক পত্রেরই তাহারা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ান। তাহারা যে রবাহৃত এমন কথা বলিতেছি না,—অনেকেই সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া নব পত্র-পত্রিকায় যোগদান করেন এবং কেহ কেহ সাহিত্যিকের “কৌলীজ মর্যাদাও” প্রাপ্ত হন।

ইহার ফলে কি হইতেছে? নিতা অমৃত-পানেও মাহুবেই অকৃত জন্মে। বাঙলা সাহিত্যে ধাঁহারা গল্প বা উপজ্ঞাস লিখিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই মুল্লিময়। এই মুল্লিময় কথাসাহিত্যিকগণ মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের তাগাদা মিটাইবার জন্ত যে “করমামেসি সাহিত্য” সৃষ্টি করিতেছেন তাহা নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহা পাঠে রস-পিপাস পাঠকের ঘৈরাচ্যুতি ও অকৃতি জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে।

প্রতিভার স্বতন্ত্র-বর্ণ-বশতঃ রস-সৃষ্টি এক বস্তু, আর চাহিদা মিটাইবার জন্ত সাহিত্য-সৃষ্টি অপর বস্তু। এই দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাহা



ছাড়া এক এক জন লেখকের প্রতিভার বিকাশের এক একটা সময় আসে। সে সময়ে অস্বপ্নের প্রেরণায় তিনি যাহা লিখেন, তাহা হয়রা উঠে বর্ষাবধি অনবদ্য—তাই বলিয়া “কালন্দ মল্লোর” বিনিময়ে তাঁহার প্রতিভাকে বাটাইয়া লইলেই যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে তিনি সক্ষম হইবেন, এ কথা সব সময়ে খাটে না।

উপজাস বা গল্পের বাঁহারা অক্লান্ত পাঠক, তাঁহাদের মখেও আজ একটা অমুযোগ স্তম্ভা বাইতেছে যে, বাঙলার কথা-সাহিত্য ক্রমেই বৈচিত্র্যহীন হইয়া নীরস ও অন্তর্ভিক হইয়া পড়িতেছে। একই মাসে একজন ব্যাখ্যান লেখকের দ্ব্যত তিনটা লেখা তিনটি সাহিত্য-পত্র প্রকাশিত হইল। কিন্তু পড়িয়া দেখা গেল যে, এই তিনটা গল্পের মধ্যে বিভ্রততা বড় কম। রচনা-ভঙ্গীর কথা অবশ্য ধরা যায় না; কারণ, কেহই নিজের লেখার “টাইম” মিনিটে মিনিটে বদলাইতে পারে না। কিন্তু সকল গল্পেরই বিষয়-বস্তু যদি এক হয়রা পড়ে, আখ্যান-ভাগে যদি বৈচিত্র্য কিছুমান না থাকে—তবে একটা গল্প না লিখিয়া তিনটা গল্প লেখার সার্কতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাঙলার পাঠক-পাঠিকাগণের গল্প-পাঠের রাঙ্কী কুশা মিটাইবার জন্য লেখকের এই কল্প-প্রয়াস—সম্পাদকগণের তাগাদা মিটানো তথা লেখকের “পকেট পুস্তক” ও নাম-প্রকাশের উদগ্র আগ্রহই এই আশ্ববন্ধনার প্রধান কারণ।

তু ধ্রু, কোনো লেখক-বিশেষের লেখার মধ্যেই এই একঘেরেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে; বাঙলার কথা-সাহিত্যে গল্প-বঙ্গারীয়া নথ্যা অস্বস্ত জগতগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যে গল্পই পড়ুন, সবাইর ঐ এক স্বর—মৌলিকতার অভাব প্রায় সর্বত্র। এক সময় ছিল যখন বাঙলার কবিগণ গজলিকা প্রবাহের মত পরম্পরের পুঙ্খগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন—নূতন পথে পদার্পণ করিবার সাহস

তাঁহাদের ছিল না, নূতন বিষয়ের কল্পনা ছিলও তাঁহাদের পক্ষে যেন অসম্ভবীয় অপরাধ করা। যে-কোনো প্রাচীন কাব্যের পাভা খুলুন, দেখিবেন সেই একই ধাঁচ—সেই গণেশ-বন্দনা, হর্ষা-বন্দনা, সর্বদেব-দেবীর বন্দনা, সেই গীতরচনার জজ সেবতা কর্তৃক বঙ্গদেশ প্রদান ইত্যাদি, ইত্যাদি। “কাহ্ন ছাড়া গীত নাই”—ইহাই ছিল এক সময় বাঙলার প্রবাদ-বাক্য। আজ কিন্তু শতাব্দীর সভ্যতার যুগে—মাধুসের নব জাগরণের দিনে বাঙলার কথা-সাহিত্য যদি সেই প্রাচীন যুগের জায় বৈচিত্র্যহীন ও সংকীর্ণ হইয়া উঠে—সে যদি মাধুসের বৃহত্তর জীবনের নব নব ভাবধারার সহিত একাধ্ব না হইতে পারে, তবে কি করিয়া বলা যায় যে, এই সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হইয়া উঠিতেছে?

আধুনিক কথা-সাহিত্য সধক্ষে আমাদের এই pessimism দেখিয়া অনেকে দ্ব্যত বিস্তিত হইবেন। কিন্তু বিশ্বাসের কিছু ইহাতে নাই। বাঙলার সাময়িক সাহিত্য-পত্রগুলির প্রকাশিত যে-কোনো এক মাসের উপজাস ও গল্পগুলির একটা বিশ্লেষণাত্মক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখুন, উহাদের আখ্যানভাগ (Subject-matter) কী! দেখিবেন, অধিকাংশ গল্পই প্রেমের গল্প। “ভালবাসাবাদি” ছাড়া বাঙলার জীবনে আর যে কোনো কিছু আছে, তাহা এই সকল গল্প পড়িয়া মনেও করিতে পারিবেন না। এই তথ্য-স্বত্বিত প্রেমের গল্পের অধিকাংশই আবার বিকৃত-কবিত পরিচায়ক। স্ত্রীত্বের বা moral teaching-এর কথা আমরা বলিতেছি না, রস-সাহিত্যের উদ্দেশ্য স্বনীতি-প্রচার না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু “স্বকচিত্র” দাবী ভ্রমসমাজে সকলেই করিতে পারে। কেবল-মাত্র তাবের বলিয়া নহে, ভাবার ভাবতা পর্য্যন্ত আধুনিক (বিশেষতঃ অতি-আধুনিকতার গৌরব-প্রয়াসী) সাহিত্যিকগণের লেখার মধ্যে সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। যুবক-যুবতীগণের মধ্যে এক দ্বিবার আশঙ্ক-লিপ্সা বা বোন-আকর্ষণ ছাড়া আর যে কোনো

সহজ ও স্বাভাবিক সধক্ষ থাকিতে পারে, তাহা অতি-আধুনিকগণের লেখা পড়িয়া মনে করা শক্ত। বাস্তবতার দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর গল্প-লেখক যে সকল মন-গড়া ও নোংরা জিনিসের আমদানী শুরু করিয়া দিয়াছেন, উহার মধ্যে বাস্তবতা ত একরূপ নাই বলিলেই চলে, রস যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ভাড়ির পক্ষে-বাওড়া অন্ন রস, ভ্রম-সমাজের অয়েস। Continental Literature-এর সঙ্গে বাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, এই অতি-আধুনিক-গণের বাস্তবতার উৎস কোথায়। এদেশের মাটিতে বা’ জন্মায় না—এদেশের জল-বায়ুর পক্ষে বা’ স্বাভাবিক,—সেই বিদেশী ঘটনার উপর কিছু রত্ চল, করিয়া, তাহার সাম্প্রদায়িক বদলাইয়া,—এক দল কথা-সাহিত্যিক উহাকে এদেশের বাস্তব জিজ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রেমের গল্পের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে এখন ছুটী,—এক, বাগিচাধের নয়া উপনিবেশ, আর সহরের ভিতর ও বাঁহাদের নোংরা বস্তী। অথচ এই ছুই-এরই সঙ্গে গল্প-লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় কর্তৃত্ব থাকে, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

“প্রেম করা” ছাড়া বাঙলার তরুণ-তরুণীর জীবনে আরও যে বহু গুরুতর সমতা আছে, সে প্রেমের জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রনীতিই সব চেয়ে বড় সমতা নহে। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজই এদেশে চিরদিন প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। বাঙলার সমাজে আজ যে অসংখ্য সমতা আশ্ব-প্রকাশ করিয়াছে, তাহার পরিচয়, তাহার বন্ধন ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত বাঙলার কথা-সাহিত্যের মধ্যে কোথায়?

মেসু ও হোচেলবাসী স্ত্রীমের শিক্ষিত তরুণ ছাড়া বাঙলাদেশে আরও অসংখ্য তরুণ আছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন, হুপ, আশা ও আনন্দের বাণী কথা-সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠে কই? নিতান্তই ইহা-একজন মনো-লেখক-লেখিকা ছাড়া, বাঙলার পল্লীর পরিচয় আধুনিকগণের কল্পনের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়? বাঁটা সহর

দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আর বাঙলার কথা-সাহিত্যে দেখুন; ইলা সেন অরুণ রায়ের সঙ্গে Flirt করিতেছেন, কিন্তু বিবাহ শেখটার দ্ব্যত করিয়া বসিলেন এক ছদ্মছাড়া, বাউফলে বিমল গুপ্তকে; হুলি কল-তলায় জল আনিতে গিয়া হীকর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল, তাই নিশা ফুলির স্বামী বিহারী আর হীকরে দারুণ মাথা-কাটাকাটা, শেখটার হুলি দ্ব্যত পাশের ঘরের “দরদী” মোটর-ড্রাইভার বন্ধুর সঙ্গে একেবারে সেগুড়াহুলি বা কাঁকিনাডার গিয়া উঠিল;—বাঁটা প্রেমের জয়-জয়কার দেখাইয়া তরুণ-গল্প-লেখক আশ্ব-প্রসাদে আশ্বহারা হইয়া উঠিলেন।

আধুনিকতার বিরোধী আমরা নহি। বাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে আমরাও বলি না। স্বতীতের পামাণ-সূত্রে সঙ্গে পদব্রজে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আমরাও চাহি না—জানি তাহাতে চলার শক্তি চিরদিনের মত কল্প হইয়া বাইবে। কিন্তু আধুনিকতা ও বাস্তবতার নামে এই “এক-ইয়েমি” ও “ইতারামি”—সাহিত্যাদ্বারা বাঙলার নিকট ক্রমেই অসহ হইয়া উঠিতেছে। কথা-সাহিত্যের

মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করা আমাদের মধ্যে গল্প-লেখক নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি; আর, একঘেরে জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রনীতিই সব চেয়ে বড় সমতা নহে। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজই এদেশে চিরদিন প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে।



বলিত মেনে দেশে একমাত্র কলিকাতা, আর বড় জোর ঢাকা পর্যন্ত ব্যতী—যে দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোক পল্লীবাসী—সেই দেশের কথা-সাহিত্যে পল্লীবাসীদের যদি পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে সেই সাহিত্যকে দেশের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক “বিরুদ্ধি” (outgrowth) ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাচ্ছে পারে না।

কিন্তু এইরূপ হইবার কারণ কি? দেশের অন্তরের সন্ধিত সাহিত্যের এই যোগ-হৃত ছিন্ন হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়—সাহিত্যিকগণের অন্তর্ভুক্তির অভাব। রস-সৃষ্টির আদি বস্তু হ’ল দৃষ্টি। “শ্রষ্টা” হইতে হইলে আগে “জ্ঞাপ্তা” হইবার প্রয়োজন। সৃষ্টি মাত্রেই আদিনি রহস্তের মূল এইখানে। শাস্ত্রকার বলেন যে, জগৎ-সৃষ্টির আগে ভগবান্ প্রথমে দৃষ্টিপাত (ঈশ্বৰ) করিয়াছিলেন। দৃষ্টি হইতে স্বজন-বাসনার উদ্ভব হয়, এবং তার পরে হয় সৃষ্টি বা বিকাশ। কিন্তু সে সকল তথ্যোক্তার হান ইহা নহে।

মোটের উপর বলা যায়, আধুনিকগণের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রভাব এত বেশী যে, বাঙালর পল্লীবাসিন সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি নিতান্ত ধূপ। তাই তাঁহাদের লেখার মধ্যে পল্লীর প্রকৃত রূপের সন্ধান আমরা পাই না—এবং বাহা পাই তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। বর্ণনা দরদী শিল্পী ব্যতীত বাঙালর প্রাণের কথা আর কাহারও হৃদয়ের মুখে ফুটনা উঠা সম্ভব নহে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কলেবর বেরূপ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, —নব নব ভাব ও আন্দোলনের ফলে কথা-সাহিত্যের উপাদানও সেইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অসহযোগ আন্দোলন ও অপসৃতা বর্জনে আশ্রয় করিয়া

বহু উপজাতি ও গল্প রচিত হইয়াছে; —ইউরোপের কথা-সাহিত্যে বিগত মহাদশকের বাহা অবদান তাহার মূল্য বড় অল্প নহে। এইরূপে নিত্য নব নব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমান বাঙালর সমগ্রতা বড় অল্প নহে,—বাঙালর সমাজের সঙ্গে বাহাদের পরিচয় আছে, তাঁহার জ্ঞানে আজ সেখানে কি বিপ্লবের ঢেউ উঠিয়াছে। জাতি-উপজাতি মাত্রেই আজ সামাজিক উন্নয়নের জন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে,—শিক্ষালাভের জ্ঞান এক তাঁর আকাঙ্ক্ষা। আজ সর্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে—বাণিক্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত আজ সকলেই তৎপর। আর্থিক সমগ্রতাও সর্বত্র প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে,—পল্লীসমগ্রতার সমন্বয়প্রণার প্রবর্তন, রূপক ও রাস্তার অবস্থার উন্নয়ন, কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, মারী-হরণের প্রতিকার, বেকার-সমগ্রতার সমাধান, শারীরিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি অসংখ্য কর্তব্য-তালিকা আজ বাঙালী জাতির সম্মুখে রহিয়াছে। বাঙালর কথা-সাহিত্য যদি এই সকল বস্তুকে অন্তরে দূরে পরিহার করিয়া শুধু মান, অভিমান, অহুসার, প্রায়, বিরহ, মিলন এবং দৈহিক সন্তোষের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে,—তবে উহার স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যাবে এবং উহাতে বিরাট বাপের উদ্ভব হইয়া বাঙালর তরুণ-কলীপের প্রাণ-পদার্থকে ক্রমশঃ স্তব্ধ করিয়া ফেলিবে। কথা-সাহিত্যের এই একদেশদর্শিতা, এই অস্বাভাবিকতা, এই সঙ্গীর্ণতা,—জাতির সঘল স্বাধা-মনের পরিচায়ক নহে। অতি-আধুনিকতার অসার মোহে আধিষ্ট হইয়া কোন ফল নাই; আধুনিক যুগের চিন্তাধারা যদি কথা-সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পায়, তবে উহার আধুনিকতার গর্ব নিতান্ত নিম্নল।

আমাদের করার শবে ছোট ছেলের নিম্নভঙ্গ

(১)

মাখ মাখ। কদিন আকাশ মেঘলা হইয়া আছে। হুই এক পশলা গুলিও হইয়াছে। মানভূমের প্রচণ্ড পাহাড়ে শীত অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

রাতি তখন একটা। বিছানার গেল গুড়ি দিয়া আরামে শুইয়া আছি। সমস্ত দিন সরকারী হাস-পাতালের হাড়ভাঙা বাটুনির পর, অবসাদস্রাজ সেহটা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। গভীর আরামদায়ক তন্দ্রা ধীরে ধীরে জমিয়া আসিতেছে।

সহসা সদর ছুরের কড়া নড়িয়া উঠিল। হেড্ কম্পাউন্ডার চন্দ্রনাথের স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, “বাবু, ডাক্তার বাবু, শীগগির উঠুন।” স্বরধ্বনি তন্দ্রাট একলাফে,—বোধকরি সাধুভাষায় বাহাকে বলে স্বর্গারোহণ, তাই করিলেন। ডাক্তারের কক্ষমারিকে মনে মনে বিহার দিয়া অতি দ্রুত বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। জানালা খুলিয়া বলিলাম “কিহে, কি বসব?”

রাত্রা হইতে চন্দ্রনাথ উবিধ কণ্ঠে বলিল, “হাস-পাতালে একটা সাংঘাতিক জ্ব-মি কেস এসেছে। টু ক’রে আহ্নন।” জ্ব-মি কেসের অবস্থা যতই সাংঘাতিক হউক, নিষেধ অবস্থা ভাবিয়া বড় কম ছাৎ হইল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, “ইহাই চিকিৎসক-জীবনের রত!”

আমাদের করার শবে ছোট ছেলের নিম্নভঙ্গ হইল। সে সাহসানিক হুরে কাদা জুড়িল। স্বভাবের দীর্ঘ ও গুম ভাঙিয়া গেল। আমি জামাজুতা পরিত্যাগ দেখিয়া দ্বিগ্ন বলিলেন, “কি হ’য়েছে?”

## ক্ষমতার জয়

প্রীতৈলবালা বোঝায়া

উত্তর দিলাম, “হাসপাতাল যাচ্ছি। একটা জ্ব-মি কেস এসেছে।”

দ্রী বিরক্ত হইয়া আমার গৃহীত রত শব্দে এমন একটা শ্রুতিকটু বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন, বাহা শুনিতে পাওয়া কোন চিকিৎসকের পক্ষে শ্রুতি-স্বশব্দক নয়। ইচ্ছা হইল, খুব একটা কড়া জবাব দিই। কিন্তু সেই দ্রুপের রাতে বাহিরে জ্ব-মি রোগী ফেলিয়া যের দ্রীর সঙ্গে বাজে কথার পাঁচ লড়িয়া কুকণ্ঠের বাধানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে হাসাহাস প্রকাশ করিলে ছেলেকে মনে সব কয়টির গুম ভাঙিবে, এবং তখনই চ্যা-ভ্যা চীৎকার উপলব্ধের আশঙ্কা যথেষ্ট।

পায়ের মোটা কোট চড়াইয়া, জুতার ফিতা বাঁধিয়া ঠ্যাংখিমকোপ্ লইয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিলাম। বাহিরে চন্দ্রনাথ লণ্ঠন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া উত্তেজনা-রক্ত মুখে বলিল, “টাউন্সহোড কোলিয়ারীর ছোট ম্যানেজার অটলবারু পায়ের কে তাঁর মেয়েছে। ডান পায়ের ডিমটা একে-ফেঁড় ওকে-ফেঁড় হ’য়ে তীর বিধে র’য়েছে। এখনি অপারেশন করতে হবে।”

কোলিয়ারীর শ্রমিকদের মধ্যে “পায়ের জোর” নামক ঔজ্জ্বল্যের বড়াই নিতান্ত ছোটখাট বাপার নয়। কাজেই সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, নানাবিধ কুৎসিত উত্তেজনা-মূলক কাণ্ডের নিতানৈমিত্তিক এমন গর্লের বিঘ্ন যে, শুধু পুরুষেরা নয়, উহাদের স্ত্রী, কস্তা, মা, ভগিনীরাও তাহাতে মহোৎসাহে যোগদান করে। কোন কারণে এই দ্বর্ষ “মালকাটা” সম্প্রদায়ের বিরোধ-দৃষ্টিতে পড়িলে, শুধু কোলিয়ারী সম্প্রদায় বাবু নহেন,—সাহেব স্বভাবাও মধ্যে মধ্যে উত্তম-মধ্যম লাভ করেন। স্বভাবা



ইহাদের সংস্কারবন্ত্রী একজন পদম্ বাঙালী ভদ্র-সন্তানের বা পাবনিক হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

বোম্বের অবস্থা সম্বন্ধে ছই একটা কথা মিজাসা করিয়া বলিলাম, “বে তীর মেরেছে, সে কি ধরা পড়েছে?”

সেই ক্রুকা দ্বান্দী তিথির অন্ধকারমধ্যে এদিক ওদিক তাকাইয়া, চন্দ্রনাথ স্তম্ভশ্চ চুপি চুপি বলিল, “না। কিন্তু এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে। মনে হয়, অটলবাবু কি-একটা কথা চেপে নিচ্ছেন।”

অকাল স্থপিত্ত একে মাথা ধরিয়া গিয়াছিল, তার উপর চন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ‘রহস্য’র গন্ধ মা মনসার উল্লেখে উৎসেহ ধুনার ঘোঁয়ার মত তুল্লিলাত্ব বোধ হইল। রাগ করিয়া বলিলাম, “তোমার নবেলিয়ানা রাখ বাপু! এর মধ্যে রহস্য আবার কি থাকবে? ভয়লোক চেপেই বা মেনেন কি? হয়ত স্থপিত্তগোনে, নয়ত মজুরীকাটা; — রাগের মাথায় তারাই কেউ হুমকি করে থাকবে। কোলিয়ারীতে এসব ত প্রায়ই হচ্ছে।” কথা কহিতে কহিতে আমরা হাঁসপাতালে পৌঁছিলাম।

(২)

অটলবাবু হুমকি হুপুপ পূর্ববয়স্ক বুবা। অল্পদিন হইল তিনি চাঁদজোড় কোলিয়ারীর দ্বিতীয় মালেক্কার হইয়াছেন। লোকটি বুদ্ধিমান্ এবং কার্যকুশল। কথা-বাড়ী, আচার-ব্যবহারে অতি ভদ্র। কয়েক মাস পূর্বে তাঁহাদের কোলিয়ারীতে একটা প্রকাণ্ড কয়লার চাপ খসিয়া গেল কয়েক ফুট হতাত হইল। সেই দৃষ্টান্ত ব্যাপদেশে তাঁহার সহিত আমার বনিষ্ট পরিচয় ঘটে। লোকটির মধ্যে সত্যনিষ্ঠা এবং জ্ঞানপরায়ণতার জোর ঘটনাক্ষেত্রে বিশেষরূপে দেখিয়াছিলাম বলিয়া, মনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাবৎ বৃত্তি জাগিয়া ছিল। সেই ভদ্রস্বভাবটির আভ্র গুপ্তশত্রুহস্তে নিবান্দন দেখিয়া প্রাণে বেদনা বোধ হইল।

অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই হুমকি মুখ উৎকট যন্ত্রণায় নীল হইয়া গিয়াছে। অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে তিনি নিশ্চন্দ্রে তাঁর যন্ত্রণা সহ করিতেছেন বটে, কিন্তু অবশ্য ক্রমে অসহ্যভাবিক ভাবে সর্গস্বের পেশী বার বার স্ফোট-বিস্ফোট হইয়া উঠিতেছে। চোখের প্রান্ত বাহিয়া নিশ্চন্দ্রে অশ্রু গড়াইতেছে। রক্ত কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।

কত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অনেকগুণা শিরা ও পেশী ভেদ করিয়া তীরটা পায়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। সহকারীদের ইঙ্গিত করিলাম, “দুসর অঙ্গোপচারের আয়োজন কর।”

ক্রোড়াক্রম করিয়া অনেকখানি মাংস কাটিয়া তীরটা বাহির করিলাম।

ধীরে ধীরে ক্রোড়াক্রমের নেশা কাটিয়া আসিতে লাগিল। বাৎশক্তি সচেতন হইয়া আসিল। বিবল দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া অটলবাবু যন্ত্রণা-পীড়িত শ্বাসে নেশার ঘোঁকে অশ্রুত কণ্ঠে নিম্ন মনে বলিতে থাকিলেন, “তিনি নি কি? তিনিজি। কিন্তু এ দুর্দৃষ্টি ত তার চিরদিন! এ ইতারামির কথা লোকের কাছে প্রকাশ করব কি করে? বাৎসের কলম যে! ওঃ জগদীশ্বর, ওকে হৃদয়্য থেকে বাচাও!”

এ কি অসঙ্গ প্রণালি? চিত্তিত হইলাম। তীরটা বিবাক্ত ছিল কি না, সন্দেহ হইতে লাগিল।

সময়ে তাঁহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রাণপণ সতর্কতায় সম্যোগযোগী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতে মন দিলাম।

পরে প্রণাম হইল, বেশী না হইলেও তীরটা বিবাক্ত ছিল। শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান্ বুবার দেহ, তাই রক্ষা; চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিসের কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

কয়েকদিন হাঁসপাতালে রাখিয়া সঙ্কটজনক অবস্থাত কাটাওয়া দিবা তাঁহাকে নিজাঙ্গরে পাঠান

হইল। আমি ও চন্দ্রনাথ প্রথমে নিয়মিত রূপে প্রতিদিন গিয়া কত-পরিচর্যা করিয়া আসিতাম। পরে চন্দ্রনাথ একা বাইত। প্রায় দেড় মাস ভূগিয়া ভয়লোক আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহত পা-খানি চিরদিনের জন্ত একটু বন্ধ হইয়া রহিল। ইহার মধ্যে যথার্থীতি পুলিশ হাঙ্গামা হইল; কিন্তু মূল অপরাধী ধরা পড়িল না।

শোনা গেল, অটলবাবুর অবহেলাপূর্ণ জবাব-বলিতে মোকদ্দমা পণ্ড হইয়াছে। তিনি না-কি বলিয়াছেন যে, ছোট সাংঘের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি রাগে একা বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন অন্ধকারে কোথা হইতে হঠাৎ একটা তীর আসিয়া তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়। তাঁহার অন্তর্দান তুমিরা হুতারা আলো লইয়া ছুটিয়া আসে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া যায়। কে কোথা হইতে তীর ছুড়িয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার শর কেহ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি কাহাকেও সন্দেহ করিতে অনিচ্ছুক।

অটলবাবু ব্রহ্ম হইবার পর কিসের জ্ঞানি না, পুলিশ মহাশয় হইল। আর কোন পোলনাগর অন্তরালে তাহার সঙ্গী-সাথীদের কাছে ওই ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ভ্রমাক অদৃষ্টি হইয়া উঠিত। চাণা গলায় জুড় গর্জনে বলিত, “অটলবাবু কাপুস্বরের মত ভয়ে ছেড়ে দিলেন, এটা নেহাৎ অজ্ঞান হ’ল। এ লোক পড়ে মার পাবে না ত বাঁবে কে? হ’ত আমাদের মরমনসি জেলা, তা’ হ’লে—”

তাহা হইলে বীরদর্পণ সে যে-কাণ্ড করিত, সেটা জ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠার ওজন ঠিক রাখিয়া পাকা ক্রিয়োত্তীর্ণ কার্য্য হইত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সরকারী শাসন-বিভাগের কঠোর কানে সে আফগানের সংবাদ পৌঁছিলে, হত তঁহার

মৌজাদার কার্য্যবিধি আইনের কোন এক বিশেষ ধারা চন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যের উপর জারি করিতেন। সরকারী হাঁসপাতালের ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের আইন-জ্ঞানের অভাব, কাজেই তাহার বিনা বিধায় চন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করিত। তাহাদের মধ্যে কে কবে কোথায় কিরূপে অন্তিকারী শত্রু-নির্ঘাতনে সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে, তাহার বিবরণ সোৎসাহে বর্ণনা করিত।

পাশের ঘরে নিরীহ চিকিৎসক আমি, অবকাশ-কালে চুকট টানিতে টানিতে নীরবে তাহাদের আলোচনা শুনিতাম। বৃষ্টিতাম, আহত অটলবাবুকে ড্রেস করিতে গিয়া, তাঁহার আততায়ী সন্দেহ চন্দ্রনাথ বেলগে হউক অনেক কিছু গুপ্ত সংবাদ শুনিয়াছে। হয়ত সে সংবাদগুলার কোন ভিত্তি নাই, হয়ত বা আছে। কিন্তু অটলবাবু যখন বেজ্ঞার আততায়ীকে নিরস্ত্রদানে ইচ্ছুক, তখন চন্দ্রনাথের অনবিকার-চর্চা কেন?

কিন্তু অটলবাবু ভয়লোকটির উদ্দেশ্য ঠিক বৃষ্টিতে পারি না। মনে সন্দেহ জাগে। ক্রোড়াক্রমের নেশায় তাঁহাকে যে প্রণাপ পড়িতে শুনিরাইল, তাহা মনে পড়ে, — আর মনে পড়ে যখন বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে বাইতাম তখনকার কথা! গুপ্ত-যাতকের কথা উঠিলেই তিনি মূৰ্ছ ফিরাইল। দেয়ালের দিকে অজমনর ভাবে চাহিয়া থাকিতেন। দেখিতাম দেয়ালের পায়ে স্ক্রেনে ঝাঁপানে কাপটে বোনা ছোট একটু কবিতা টাঙানো রহিয়াছে:—

“যে পারে অপসরে আছাড়ি ফেলিতে সে ত বলবান্ নয়।  
অপকারী জনে, যে পারে কমিতে তার কমতার জয়।”

প্রতিমধুর নীতি-কথা। কিন্তু প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অপকারীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা, বাস্তব ক্ষেত্রে কয়জনের দেখিয়াছি, মনে পড়ে না। ভয়লোক কি এতই সেন্টিমেন্টাল? হুতরাং সন্দেহ শুধু সন্দেহ মাজেই রহিয়া গেল।



(৩)

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার ঠিক তেমনি মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাজি। রাজের আহার সারিয়া সবেমাত্র উঠিয়াছি, এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, “চাঁদকোড় কোলিয়ারী থেকে ডাক এসেছে।”

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম মোটর লইয়া স্বয়ং অটল বাবু উপস্থিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে গভীর বিবাদের ছায়া।

প্রশ্ন করিলাম, “কার অস্থব্ধ? আপনার বাড়ীতে না কি?”

তিনি উত্তর দিলেন, “আমার বাড়ীর কাছেই। আমি এক জাতি-ভাই কোলিয়ারীতে চাকরি করেন, তাঁরই অস্থব্ধ।”

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি কিছুদিন হইতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক এক বয়সে চিকিৎসক বদ্ধ সে-ব্যাপি কিছুই নয় করিয়া উড়াইয়া দিয়া অবহেলাভরে যথেষ্ট চিকিৎসা করিতেছিলেন। সম্ভ্রতি তার উপর নিউমোনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তাও চিকিৎসক-প্রবরের বিজ্ঞতার প্রদর্শন! অবহেলিত হইয়াছে। এখন রোগীর সংজ্ঞালোপ হইয়াছে, অবস্থা সঙ্গীন।

অক্লিষ্টেণে গ্যাস প্রয়োগের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া আসিবার জ্ঞাত চন্দ্রনাথের নিকট চাকর পাঠাইলাম। ভ্রাম্যকোড়া পরিয়া নিজে অবিলম্বে প্রেরিত হইয়া আসিলাম। চন্দ্রনাথ ভাতাভাতি সমস্ত জিনিস বহিয়া আনিয়া শোকারের পাশে বলিল, “নবোদয়ান! এবং গৌরাঙ্গুমির দোহ বতই থাক, কাজের সময় চন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটপটে হ’সিয়ার বলিয়া এসব ক্ষেত্রে আমি সকলের আগে তাকে সঙ্গী নির্ধারিত করিতাম।

সমস্ত জিনিসপত্র ঠিক লগুয়া হইয়াছে কি না, তার হিসাব পরীক্ষা শেষ হইলে চন্দ্রনাথ বলিল, “কার অস্থব্ধ, মশাই?”

মান মুখে অটলবাবু বলিলেন, “আমার এক ভাইয়ের।”

আর কথাবার্তা হইল না। মোটর সম্বন্ধে ধাবিত হইল। চুকট বরাইয়া রোগীর সম্বন্ধে অটলবাবুকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। শুনিলাম রোগী তাঁহার সমবয়স্ক, গুরু শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই কোলিয়ারীতে কুলী-সংগ্রাহকের কার্য্য করিতেছিলেন, কাজটা অটলবাবুর অগ্রগৃহেই ছুটিয়াছিল। গৃহের বিষয়, লোকটির বিদ্যাবৃত্তি ছিল কম, এবং প্রবৃত্তি ছিল অতি হীন। কুসংসর্গে মিশিয়া কুপ্রবৃত্তির দাস্য করিয়া, কুসংসিত ব্যাপির বিবে শরীর জঙ্ঘর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লোকটির সম্ভ্রান্তাদি কয়েকটি হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃত্বক পান্যবাপির ফলে তাহার অকালে মারা গিয়াছে। এখন সৎগারে আছে তাঁহার শুণু চিরকথা স্ত্রী, এবং হতভাগিনী মাতা।

নীচেরে চুকট টানিতে লাগিলাম। ভগবানের রাজ্যে পাশাপাছটান করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও পরিচায় পাঠিত দেখিলাম না। কলমে পড়িবার সময় স্বাধীনচিত্ততা প্রমাণের জ্ঞাত নাস্তিকবাদ কপ্‌চাইতাম। কৃষ্ণকীর আফগানের তাল চুকিয়া কুসংসিতবান সব উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন দেখিয়া এবং ঠেকিয়া দিনে দিনে জ্ঞানলাভ করিতেছি।

যথাস্থানে গিয়া গাড়ী ধামিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম।

সামনে একটা বাড়ীর দ্বারের কাছে কতকগুলো কুসি-মুছুর শেগীর লোক বসিয়া, রাতার পাশে ঝড়ুটা জড় করিয়া আগুন জালিয়া তাপ লইতেছিল। তাহার্য্য শব্দবাস্তে উঠিয়া অটলবাবুকে নমস্কার করিয়া।

অটলবাবু তাহাদের বলিলেন, “বাড়ীর ভিতর খবর দাও। ডাক্তার এসেছেন। এখন অবস্থা কেমন?”

তাঁহারা বাহা উত্তর দিল তার সার মর্ম্ম এই,— রোগীর অবস্থা এখন সেই রকমই। তবে চোখে আরও বোলা পড়িয়াছে। জিহ্বা আরও এড়াইয়া গিয়াছে, প্রলাপিত হোঁর আরও বাড়িয়াছে।

বুঝিলাম,—অবস্থা সেই রকম নয়। রকম আরও খারাপ।

চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া সহসা চমকিয়া উঠিলাম! ইহার হইল কি? উদ্বেগ-বিবর্ণ মুখে, প্রথর চকল দুটিতে সে বার বার সেই বাড়ীর দ্বারের দিকে এবং অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিতেছে কেন?

জিজ্ঞাস্য দুটিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। চন্দ্রনাথ ঢোক শিলিয়া বলিল, “এ বাড়ীতে কার অস্থব্ধ?”

অটলবাবু বলিলেন “আমার এক জাতি-ভাইয়ের।” রক্তধাসে চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল, “বিনি কুসিদের রিকুটার বাবু?” অটলবাবু বলিলেন, “হাঁ।”

চন্দ্রনাথ গুপ্তিতভাবে পাড়াইল। অজকিতে তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া প্রচণ্ড ধমকের সহিত নির্গত হইল, “ও!”

ভিতর হইতে লোক আসিয়া ডাকিল, “আমর!” হতবুদ্ধি চন্দ্রনাথের পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, “চল হে!”

(৪)

ভিতরে গিয়া শয্যাগায়িত সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চমৎকার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ! আক্ষেপ হইল,—সদাচারে জীবন যাপন করিলে এই স্বন্দর বাহ্যপূর্ণ দেহের অধিকারী নিঃসন্দেহে দীর্ঘজীবী হইতেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দেহের সব যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। জীবনী শক্তি তখন নিশেষপ্রায়। সময় থাকিতে স্ত্রিকিৎসা ও স্ননিয়ম-পালন হইলে, হয়ত কিছু করা যাইত, কিন্তু এখন আর কিছু করিবার সময় নাই। রোগীর বৃদ্ধা জননী কাদিয়া বলিলেন যে, রোগীর বদ্ধ ডাক্তারটি অতিশয় বিজ্ঞ। তিনি চিরকাল ইহাঙ্গের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে কত রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন। রোগীর এবারের অস্থব্ধেও বরাবর বলিয়াছেন, “কোন ভয় নেই, এ রোগ কিছুই না।” রোগীও তাই বুঝিয়া আর কোন চিকিৎসককে ডাকিতে সেন নাই। যথেষ্টচারা রোগীর কর্তৃত্বই সকলে শিরোবার্ধা করিয়া চলিয়াছেন। আজ

অচৈতন্য রোগীর আর কোন কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া, তিনি ও তাঁহার পুত্রব্যক্ত কান্নাকাটি করিয়া অটলবাবুকে সংবাদ দিয়াছেন। অটলবাবু তৎক্ষণাত আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়াই আমাদের আনিত গিয়াছিলেন। এখন আমার ব্যর্থ—

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিলাম। কোন আশা-ভরবার কথা বলিয়া মিথ্যা সাধনা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। চন্দ্রনাথ অক্লিষ্টেণে গ্যাস প্রয়োগের যথপাতি গুছাইতে গুছাইতে ক্ষুব্ধবরে বলিল, “রোগীর যথেষ্টচাচারে পৃষ্ঠপোষক কোলিয়ারীর সেই কুলি-হস্তারক বিজ্ঞ চিকিৎসকটি এ সময় সেলেন কোথায়?” একজন উত্তর দিল— “বারো ক্রোশ দূরে একটা ফলারের নিম্নগ্রন আছে, সেইখানে ছুটোছেন।”

কোলিয়ারীর একজন চাপরাশী রসিকতা করিয়া আর একজন চাপরাশীর উদ্দেশে অকুটবরে বলিল— “পুতির নিম্নগ্রন থাকলে বামন আঠারো ক্রোশ ছুট দিতেন।”

চন্দ্রনাথ গভীরতর ক্ষোভের সহিত বলিল, “দেব-বিধে তত্ত্বি রাখবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সব রাক্ষসদের রক্তম সন্মম দেখে দৃষ্টিভার পড়েছি, মশাই। আমার ক্ষীণজীবী ভক্তির পরমায়ু মুক্তি আর টেকে না।”

মনে মনে বলিলাম,— দেবারোপেণ বুঝা। অকাল-মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পক্ষে মাছুরের নিচ্ছের দুর্ভাগ্যই যথেষ্ট। সে দুর্ভাগ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার লোক তাহার্য্য নিজেরাই খুঁজিয়া লয়। সে চিকিৎসকটি নিমিত্তের হেতু মাত্র।

বার্ধ জ্ঞানিও শেষ চেষ্টা যথাসাধ্য করিলাম। কিন্তু সব বুঝা। গভীর রাত্রে রোগীর মৃত্যু হইল।

শুনিলাম সংস্কার করিবার লোক পাঠাও যাইতেছে না। হিসাব করিয়া দেখা গেল, অটলবাবুর জ্ঞানক ও অটলবাবু ছাড়া মৃতের স্বজাতি কাহ্নহ-সন্তান আমি ও চন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত আছি। চিকিৎসকের সজ্জা ছাড়িয়া অগত্যা শবধাহকের বেশ



বহিলাম। মৃতের শোকাতী মাতা ও পত্নীর কাছে অটলবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে রাখিয়া আমরা শেষ রাজে শব লইয়া শশানে চলিলাম। সঙ্গে আলো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া জনকয়েক কুলি ও চাপরাশী চলিল।

শশান অনেক দূরে। মৃতের শোকাহতা স্ত্রীকে দেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। অটলবাবুই শেষের মৃত্যুকিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

চিতা সাজাইয়া শব চিতার তুলিয়া দেওয়া হইল। রান্ধন ময় পড়াইতে লাগিলেন। অটলবাবু অধি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ময় আবৃত্তি করিতে থাকিলেন।

গভীর মর্শ্বাব্যাহার তাহার কণ্ঠস্থর তখন কাপিতেছিল। মনে হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠাতা সেই মঙ্গল-প্রার্থনা, বেনে মূর্ত্ত সজীব হইয়া দ্রুত চঞ্চল অমিথুৎ উজ্জল দশি বিকীর্ণ করিতেছে।

মনে মনে আমিও শ্রীভগবানের চরণে পরলোক-গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিলাম।

শিখন ফিরিয়া দেখি, — আমাদের ময়মনসিংগের দ্বর্ধ্ব-প্রতাপ, নিকিয় তাড়পরাণ চন্দ্রনাথ, দীনবন্ধী কাঞ্চলের মত নাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বিস্মল দৃষ্টিতে অমিকস্তার মুখপানে চাহিয়া, অবিরল-ধানে অকবর্ণ করিতেছে!

কিনে সে ভাব-প্রবণ যুবা। তবু একটা আশা করি নাই। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

অমিহান করা হইল। চিতা জলিয়া উঠিল; অটলবাবু বধ চরণে বোঁড়াইতে বোঁড়াইতে আসিয়া শ্রান্তভাবে চন্দ্রনাথের পাশে বসিলেন। ব্যাঘাত কর্তে ডাকিলেন, “চন্দ্রবাবু!”

চন্দ্রনাথ সাক্ষ ময়নে তাহার হুঁহাত চাপিয়া ধরিল। অবোণভরে বলিল — “আপনার বোঁড়া পাশে তাঁর শক্ততার চিহ্ন চিরদিনের মত রইল। আপনি যদি

সেদিন ছাড়ের মধ্যাধি রক্ষার জন্ত অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিলেন, তা’ হ’লে হয়ত তাঁর পাপের ভার লুপ্ত হ’য়ে যেত। হয়ত তাঁর এমন ভাবে ভরাচুবি হ’ত না। ঈশ্বর জানেন! অত্যাচারীর হৃদযা আপনি সেদিন খেজার খোপান করেছিলেন ব’লে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভীষ, কাপুরুষ! মৃত আমি! সেদিন অত্যাচারের অত্যাচারে ভয়ানক অসহিষ্ণু হ’য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি, ক্ষমার অত্যাচার তার চেয়ে শতগুন ভয়ানক! এ বেনে সহ করা যায় না।”

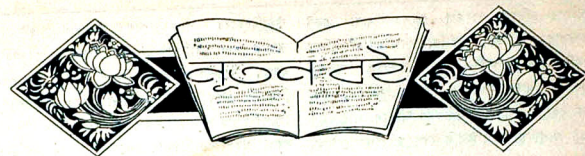
নিম্নাঙ্গ কেলিয়া অটলবাবু বেদনাক্রিষ্ট হয়ে বলিলেন, “মাঝে মাঝেই অনেক ভুল করে থাকে! ‘নির্বোধের ভুলের জন্ত ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য।’

বাস, আর কিছু নয়! শুভিত হইয়া একবার সেই শশানের অশ্রু চিতার দিকে — একবার অটলবাবুর খজ চরণের দিকে চাহিলাম। এতদিনের পর চন্দ্রনাথের কথিত সেই ‘রহস্য’ আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার বোধ হইল! জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, কেন, কিসের জন্ত এ অত্যাচার? পাপে বুদ্ধিহীন, কে-বু-হুঁচি এই হতভাগাকে আজ নিজের অকাল মৃত্যু নিয়মের বাধা করিয়াছে, সেই কুহুড়িই একদিন পরশ্রীকাতর হইয়া, হিংস উদানদায় নিরীহ জাতি-ভ্রাতার মৃত্যু ঘটাইতে উজ্জত হইয়াছিল! অগদীশ্বর নিরপরাধকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরাধী, — যত যোগনেই অপরাধ করুক, তাহার বিচারে পরিণাম পাইল না! আশ্চর্য্য তাহার বিধান।

অটলবাবুর ক্ষমাহৃদয়ের বেদনাত্মক মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিনের পর আজ সেই কার্পেতে বোনা কবিতার শেষ ছত্র হুঁহাত মনে পড়িল —

‘অপকারী জনে, যে পারে ক্ষমিতে

তার ক্ষমতার জয়!’



[‘উদয়ন’ সমালোচনার জন্ত গ্রন্থকারগণ অগ্রগ্রহ করিগা তাহাদের পুস্তক দুইখনি করিয়া পাঠাইবেন]

### ইতালিতে বারকয়েক

—অধ্যাপক শ্রীমুখ বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান — দিটা লাইব্রেরী, ৪৪ কৈলাস বহু ষ্ট্রট, কলিকাতা ও ২৬ বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা। কলিকাতা ‘কান্তিক প্রেস’-এ মুদ্রিত; ১৯৩২। পৃঃ ২৮৪, কাগজের বাঁধাই, মূল্য ১৪০।

এই পুস্তক শ্রীমুখ সরকার মহাশয়ের বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রসূত “বর্তমান জগৎ” গ্রন্থমালায় দ্বাদশ খণ্ড—প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই বই লইয়া ইংল্যান্ড, চতুঃসংস্ক পৃষ্ঠাময় “বর্তমান জগৎ” সম্পূর্ণ হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালী সরকার মহাশয়ের লেখার সহিত সুপরিচিত। ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, শিল্প-সাহিত্য ও অর্থনীতি—এককথা, সমগ্র “মানব-বর্ধ-তত্ত্ব”, সরকার মহাশয়ের আলোচ্য। এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা—এই চারি মহাদেশে অজ্ঞিত দীর্ঘ চতুঃসংস্কর্ষণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কালে তিনি মাতৃভাষার সেবা করিতে কখনও বিরত হন নাই। সমগ্র বর্তমান জগৎ বিশেষ প্রশ্রয়িত সহকারে দেখিয়া আসিয়া তিনি নবীন ভারতকে উৎসাহিত করিতেছেন, “মা-ভাতা-বাগি প্রচার করিতেছেন—বাহিরের জগৎ দৃষ্টে নিজ জ্ঞান-মোচর ও কচি মত তিনি স্বজাতিকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা। তাহার এই চেষ্টার একটা ফল—এই বিশেষ-দর্শন বিষয়ক পুস্তকমালা। এই চেষ্টা ব্যপদেশে সরকার মহাশয় নিজে কি কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, সে কথা নিজ পুস্তকে তিনি অহুস্মিত রাখেন না—এ বিষয়ে তাহার অনাবশ্যক ও অহুস্মিত কৃষ্ণর অভাব তাহার

অহুস্মিত সারলেরই পরিচায়ক; সরকার মহাশয়ের আশা ও আশঙ্কা এবং উদ্দেশ্য ও উত্তমের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকবর্গ যে তাহার লেখার সমাক্ রস-গ্রহণে সহায়তা প্রাপ্ত হন, একথা বলিতে পারা যায়। “পান চিবাংইতে চিবাংইতে এই বইয়ের মারফৎ” সাধারণ অজ্ঞ ইটালি দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু বখর পাইবেন, একথা বলা বাহুল্য। বহু ভাষায় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনা করা সম্ভবে, সরকার মহাশয়ের লিখন-ভঙ্গীতে যে নিরুপট সারল্য পাওয়া যায় এবং বাখার্থের সম্বন্ধে অবহিত হইবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহা তাহার রচনারীতির অন্ততম বৈশিষ্ট্য। ভাষার প্রগতি সম্বন্ধে সরকার মহাশয় যে একটা সূত্র সর্বল আদর্শ নিজ, সমুদ্রে স্থাপিত করিয়াছেন, তদনুসারে তাহার রচনা-শৈলীও তিনি গড়িয়া লইয়াছেন, এবং বিশেষ উৎসাহ সহকারে, তাহার নিজের কথায়, “জোর দানো” তিনি এই ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যের দরদারে, তাহার ভাষার, এই রচনা-শৈলীকে একটা “নয়া চিহ্ন”। সকলে হয় তো এই চিহ্নটাকে পছন্দ করিবেন না, কিন্তু ইহা যে একটা সচেত ও লা-পরওয়া মনের সৃষ্টি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। “বর্তমান জগৎ”-এর অজ্ঞাত যে সমস্ত খণ্ড তিনি গিরিয়াছেন, সেগুলির ভাষা এতীও বহুগোষ্ঠীতে বসিয়া গর করিবার মত হাজা। চক্ষু দেখা। চক্ষী হাজা হইলেও ইহাতে ভারী ও সারবানু কথা অনেক আছে। মোটের উপরে, এই বইয়ের মারফৎ



বাহিরের জুনিয়ার হাওয়া বেশের মধ্যে একটু বহাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং এই বই পড়িয়া মানসিক স্ফুটিকারী বাঙ্গালী পাঠক উপকৃত হইবেন। আধুনিক জগতে ইটালির স্থান কি, নানা দিক হইতে এ বিষয়ে পাঠকগণ অভাস পাইবেন। একটু বাগদাড়া ভাবে ইটালি দেশ ও দেশের লোকের সম্বন্ধে নানা কথা বলা হইলেও বিস্তর গুটীনাট্য তথ্য ভরপুর হওয়ার দরুন বইখানি স্বপাঠ্য ও উপভোগ্য। আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক পাঠ্যপাঠ্যে ও পুস্তকসংগ্রহে বইখানি স্থান পাইবে।

শ্রীমূর্ত্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসের কথা—শ্রীশচীন সেন প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদ সরকার। দাম একটাকা চারি আনা; বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রট, কলিকাতা।

বিলাত-প্রভাণ্ড অর্থাৎ ইহার পূর্বে সে দেশ সম্বন্ধে ছোট-বড় অনেক বই লিখিয়া নানা বিভিন্ন সমাচার দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। শচীন সেন মহাশয় তাঁহার 'প্রবাসের কথা'র পূর্বে লেখকগণের মত তথাকার দর্শনীয় বস্তু বা অবিদ্যাসীদগণের আমোদ-উন্মত্তের বিস্তৃত বর্ণনা দেন নাই। তাঁহার পুস্তক অজ হিসাবে মূল্যবান। ইহা হইতে আমরা পাইব—ইউরোপীয় মহাসমুদ্রের কলি এ দেশে রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক ও অজ্ঞাত বিষয়ে যে বিবরণ ও পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহার আধুনিকতম পরিচয়। জগৎপরি প্রাক্কন্দশী বিচক্ষণ লেখক কর্তৃক 'গোল টেবিলের' দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত মহাশয় গান্ধী ও অজ্ঞাত ভারতীয় প্রতিনিধিগণের কার্যকলাপের নিরূপণ সমালোচনা। তাহা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। একটা অধ্যায়ে প্রতীচ্য জিহ্বারের ক্রমিক পরিণতি, আর রবীন্দ্রনাথের উপর তাহার প্রভাবের বিস্তৃত চিত্র-

কলাবিদগণের পক্ষে বেশ উপভোগ্য হইবে। তাহার পর, অর্থসঙ্কটে পতিত ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা, 'স্বদেশীয়ানা'-প্রচলন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে ব্যবসাধারদিগের বিবেচনাপূর্ণ প্রোপ্রাগাণ্ডার কথা এই সকল ও অজ্ঞাত নানা বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সুক্ষিপূর্ণ আলোচনা হইতে সহজেই পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, এই বইখানি আকারে ক্ষুদ্র (পরিমিতি সম্মত ৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) হইলেও ভাষা ইংহা নিতান্ত লঘু নয়। ইহার উপর আবার তাহার গুরুত্ব বাড়াইয়াছে তাহার প্রধান বিচার্য বিষয়। কারণ এই শ্রেণীর অজ্ঞাত গ্রন্থের মত এখানিও মুখ্যতঃ বিলাতের সহিত ভারতের তুলনামূলক সমালোচনা—উভয়ের জাতীয় চরিত্রবাচ্য মতিপতি লইয়া।

অবশ্যই বলিতে হইবে—সেই তুলনার লেখকের অভিমত অমূল্যের ভারত বড় কিছু প্রাণবোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার স্বজাতি-প্রীতি সম্বন্ধে সন্দেহান ইহার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বরং মনে হয়, পূর্ণগৌরবের স্মৃতিমাত্র লইয়া অটল জাভো আচ্ছন্ন ভারত মুসুপ্রের অবস্থার 'সভা' জগতের পদতলে পড়িয়া থাকে—এই লজ্জায় লেখক ব্যথিত। তাই সেই বাধার তাকনে তিনি চাছেন—ভারত বাঁচিয়া উঠুক, কিন্তু যদি তাহাকে বাঁচিতে হয়, তাহাকে বাঁচিতে হইবে মানুষের মত—অর্থাৎ ইউরোপীয় মানুষের মত। তাহাকে তাহার স্থিতিশীলতা বর্জন করিতে হইবে, গতিশীল হইতে হইবে অর্থাৎ কিনা ইউরোপীয়ের সহিত তালে তালে পা কেলিয়া চলিতে হইবে। কেননা স্থিতিশীলতা জীবনমূর্ত্তের লক্ষণ। গতিই প্রাণের নিদর্শন।

ইহার উত্তরে প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্যাখ্যই তাই নাকি? স্থিতিশীল পাদপ স্থল দান করিয়া জীব পোষক করে। তাহার সেই সভা কি সভা সভাই প্রশ্নহীন? অপর পক্ষে গতির চরিত্রিত পরিণতি একবারে কি কল্পনাতীত? ফলকথা প্রতীচ্যের প্রগতি এখনও

কালের পরীক্ষা-সাপেক্ষ; বিশেষতঃ তাহার গন্তব্য অজ্ঞাপি অনিশ্চিত। এমন প্রকৃতির বিদ্যানে অভিব্যক্তি ক্ষয়েরই ভয়সিদ্ধ। এমন অবস্থায় গার্হস্থ্য জীবন ব্যাপারে প্রতীচ্যের যে নম্র বিভঙ্গ সুখি লেখক নিজেই উন্মোচিত করিয়াছেন, ভারত যদি তাহা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া প্রতীচ্যের অস্থায়ী হইতে বিমুগ্ধ হয়, তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায়? ভোর করিয়া তাহাকে সেই পক্ষে চলিত করিলে তাহার মদ্যতি হইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু লেখকের অর্থের বিপরীত ভাবে।

এইটুকু সন্দেহ দ্বারা লেখকের সহিত মূল বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য প্রকটিত হইলেও আমরা তাঁহার দার্শনিকোক্তি পূর্ণাবেক্ষণ ও বিচার-পদ্ধতি প্রশংসনীয় মনে করি এবং এই স্থগিত হইয়াছে বর্তমান ব্যবহারিক জীবন পাঠকগণ প্রতীচ্য সমাজের বর্তমান ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন ও তাহাতে উপকৃত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

হুনে হুনে ছই চারিট ছাপার ভুল চোখে পড়িলেও পুস্তকখানির মূল্য ও তাহার বাহু সৌভাগ্য প্রীতিকর।

বীকন

Butenshon (Andrea) : The Life of a Moghul Princess, Jahannara Begam, daughter of Shah Jahan. With an introduction by Laurence Binyon. London : G. Routledge & Sons Ltd. 1931. 10s-6d.

সম্রাট-নন্দিনী জাহান্নারা বেগমের আত্মচরিতের আকারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সম্রাট শাহ-জাহানের রাজত্বকালের শেষভাগে সমগ্র ভারতের উপর দিয়া বিপ্লবের যে প্রলয়-স্রোতটি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস-রূপ-পিণ্ডায় পাঠকগণ তাহা এই পুস্তকপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-ব্যঙ্গ-স্বপ্নের তালে তালে গহভর করিবেন। অসহায় জাহান্নারা চক্ষুর সম্মুখে প্রিয়তম পিতাকে ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়াছে; প্রিয় ভ্রাতা দাওয়াগীরের নিহত;

হৃদয় দূরদেশে পলায়িত এবং অতি অসহায় ও দুর্গত ভাবে মৃত্যু-কবলিত, সুবাদেও জ্যোতের পদাঙ্কহারা—এ মর্মান্বন দৃষ্ট জাহান্নারা দীর্ঘায়ী দেখিয়াছে কিন্তু কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। বন্দিনী রাজনৈশ্বারী দ্বন্দ্বের পোশন কথা, প্রণয়ের বাণী, সহনশীলতার দ্বন্দ্বের পোশন কথা, প্রণয়ের বাণী, সহনশীলতার পূর্ণা দীপ্তি—সমস্তই গ্রন্থকর্তা অতি নিপুণ ভাবে চুটাইয়াছেন। শক্তিময়ী লেখিকার লিখনভঙ্গী অতি চমৎকার, তাঁহার ভাষা বেশ স্বপাঠ্য; পুস্তকখানিতে যে কল্পখানি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহাতে পাঠক মোগল যুগের চিত্রাঙ্গন-পদ্ধতির নমুনা পাইবেন।

Turberville (A.S.) : The Spanish Inquisition. London. Butterworth. 2s-6d. 1932.

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ফার্দিনান্দ ও ইজাবেলা প্রবর্তিত Spanish Inquisition-এর স্বরূপাত হইতে ১৮৬৯ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কাথলিক মতের বিরুদ্ধাচরণের সহিত 'খ্যাতি' উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক, প্রকৃতি কাহিনী পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে পরম্পর-বৈত্যা পোনে বর্তমান ছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকখানিতে বিবৃত করা হইয়াছে।

Saintsbury (Ethel Bruce) : A Calendar of the Court Minutes, etc. of the East India Company. 1671-1673. With an introduction and notes by W. T. Otteville, etc. Oxford : Clarendon Press, 1932. 18s.

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনাও যখন ইংল্যান্ড বণিক-বিশ্বের মনে আসে নাই সেই সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যাবলীর বিবরণ জানিতে হইলে এ পুস্তকখানি সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে। ঐতিহাসিকগণের পক্ষে পুস্তকখানি মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এস, কুমার



## আলোকচিত্র - প্রতিযোগিতা

‘উদয়ন’র কর্তৃপক্ষ আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতার জন্ম যে আটটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে যোগদানের জন্ম ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু শিল্পী তাহাদের চিত্র পাঠাইয়াছিলেন। গত ১৮ই জুলাই তারিখে ‘উদয়ন’ কার্যালয়ে ‘কৌতুক-কোম্পানী’র মিঃ এন্স কটন, ক্যাপ্টেন এন্স কে বহু, এম-বি, আই-এম-এস ও উদয়ন-সম্পাদক — এই তিন জনকে লইয়া গঠিত একটি সমিতিতে উক্ত চিত্র-গুলি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার সময় বিষয়-নির্বাচনের মৌলিকতা, চিত্র-গ্রহণের কৌশল, ‘প্রিন্টের উৎকর্ষ এবং সাধারণ সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। যে আটখানি চিত্র পুরস্কার লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আশ্বিন-সংখ্যা ‘উদয়ন’ সেগুলি মুদ্রিত হইবে। নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল—

- ১। “কুহুম-চয়ন” (প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)  
শিল্পী — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বহু
- ২। “আলো ও ছায়া” (দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)  
শিল্পী — শ্রীশিবপ্রসাদ বহু
- ৩। “বিশ্রাম” (তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)  
শিল্পী — শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

নিম্নলিখিত পাঁচখানি চিত্রের জন্ম consolation prize দেওয়া হইবে—

- ১। “বীশরী”\* শিল্পী — শ্রীহৃদয়নাথ মিত্র
- ২। “মুকু” „ — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ৩। “শিল্পী” „ — শ্রীজজকিশোর সিংহ
- ৪। “অরুণোদয়ে” „ — শ্রী এন্স, সেনগুপ্ত
- ৫। “ভারী-খুন্দী” „ — শ্রীহুনীলকুমার বহু

\* শিল্পী এই চিত্রখানি প্রতিযোগিতার জন্ম প্রথমে খুব ছোট আকারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কলে ইহার ব্যক্তি পরিমাণে সৌন্দর্যহানি হয় ও ইহা পরীক্ষার সময় উপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পরে তিনি এখানির রোমাইড এনুলাফ-মেট করিয়া যখন পাঠান, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ইহা আরও উচ্চতর সন্মান লাভ করিতে পারিত।—উদয়ন-সম্পাদক

## বাঙালীর বিলোপ

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বাংলার অবনতির কারণ অনুধাবন

কীর্তিনাশা গঙ্গা নদী ছয় শতাব্দী বরিয়া  
পূর্বপানিনি

‘উদয়ন’র সম্পাদক মহাশয় আমাকে বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়া অমৃৎহীত করিয়াছেন। অনেক কারণে বাঙালী জাতির ও সমাজের অস্তিরে ঘোর পরিবর্তন অবশ্যস্বার্থী। একমুখ পূর্ণে রূপভিত কর্ণে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘স্বদেশবাস্তব হিন্দুজাতি’ সংক্ষেপে আলোচনার হচনা করিয়া দেশময় আন্দোলন আনিয়াছিলেন। ‘অমৃতবাজার’, ‘সঙ্গীত’, ‘উপাসনা’, ‘গৃহস্থ’ প্রভৃতি পত্রিকা বহুবৎসর এই আন্দোলন সজীব রাখিয়াছিল। বাংলা দেশের নানা প্রকার সমাজ-সম্প্রদায় ও অমৃত জাতিগণের মধ্যে শিক্ষার আন্দোলন তখন হইতে শুরু হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে নৈশ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ও লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে নানা উত্তাপ-অমৃতান তখন হইতেই বাংলায় দেখা গিয়াছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি মানুষের শর্য ও সূত্রক বাণী শুনে নাই। এই যুগে বাংলাদেশ ছুঁড়িয়া ব্যাধি, দৈত্য ও অবনতির জরঘোষণা অতি নিদ্রমভাবে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিচলিত করিতেছে। বাঙালী জাতির অধ্যবসায়ের কারণ ম্যালেরিয়া অথবা জল-প্রাধান, বাংলাদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের অ-বাঙালীর প্রতিষ্ঠা বা বাঙালীর শ্রমকাতরতা ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার, বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানের প্রভাব অথবা বিপ্লববাদের আবির্ভাব, এই প্রকার নির্দেশে ঐ সমগ্রাটিকে অব্যাহার করা হয়। কোন জাতির চর্চদ্বার কারণ এত সংক্ষেপে নির্ণয় করা যায় না। কোন একক কারণ একমুখ ঘোর অবনতিরও হচনা করে না। ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে বাংলার অধ্যবসায়ের কারণ অনুধাবন করিতে হইবে।

বাংলার সভ্যতা নদী-মাতৃক। রোমীয়গণ প্রাচীন বাংলাকে গঙ্গারাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন। গঙ্গা নদী বাংলাদেশকে গড়িয়াছে ও ভাঙিয়াছে, আবার গড়িয়াছে ও নতন করিয়া ভাঙিয়াছে। নদীর ‘ব’-প্রদেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বেই এই উত্থান-পতন। জল ও স্থলভূমির বিপ্লব বাংলার সভ্যতার মানচিত্রকে বহুবাহু নতন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে। যুগে যুগে এই বিপ্লব গঙ্গামাতার প্রসাদ ও অভিষাগের সাক্ষ্য দেয়।

একদা গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ মেদিনীপুর অঞ্চলকে ছী ও সম্পদ দান করিত। সে এক হাজার বৎসরেরও পূর্বের কথা। তখন তাম্রলিপ্তি প্রাচ্য ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন ফা-হিয়েন ঐ বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত তাম্রলিপ্তির পৌরব অটুট ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সমগ্রাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সমগ্রাণ বাংলায় শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া রোম ও পশ্চিম এশিয়ায় খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু বৌদ্ধ শতাব্দী হইতে সরস্বতী নদীর পতিতাস লক্ষিত হয় এবং তাহার ফলেই সমগ্রাণের কীর্তিনাশ। যে বন্দর ইন্দো ও প্রদেশ ১৭ বর্গ মাইল ছিল, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাহাকে ভান ডেন ব্রুক (Van Den Broucke) একটি নগণ্য গ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই ভাগিরথী নদীরও দ্রববাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাতার্নিয়া (Tavernier) লিখিয়াছিলেন যে, বার্বিয়া (Bernier) গঙ্গাপথে



আসিতে আসিতে রাজমহলের নিকট অবতরণ করিতে বাক্য হইয়াছিল। ভাগীরথীর মুখে পন্ডার চর নৌকার গতি বোধ করিয়াছিল। তিনি কাশিমবাজারে বাইতছিলেন। কাশিমবাজার তখন একটা প্রধান সহর; অনেক ইরান, ফরাসী, ওলন্দাজ ও আরমেনিয়ান বণিক সেখানে বাস করিত।

বাংলার বন্দরগুলির ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখ অন্যত্র। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুগে যুগে তাম্রলিপি, সপ্তগ্রাম, স্বৰ্ণগ্রাম, বংশোদ্র, চট্টগ্রাম, বাকসী প্রভৃতি বাংলার সামুদ্রিক সম্পদ ও প্রভাবের সাক্ষী। 'ব'-প্রদেশে নদী কত জনপদকে লোক-বহুল ও সম্পদশালী করিয়াছে, আবার জনহীন, শ্রীহীন, বিপ্লবিত করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যখন গঙ্গা নদী ভাগীরথীর প্রবাহ ত্যাগ করিয়া পূর্ণিামিনী হইল, তখন হইতে পরম্পর জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও গড়াই নদী পূর্ণশতাব্দীর রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর মত ধন-বাহিনী হইল। কিন্তু তবুও সমস্ত শাখাকে নদীকণ ভাবে ত্যাগ করিতে করিতে, কত শত নগরকে সম্পন্নহীন করিতে করিতে, গঙ্গার অনিবার্য গতি ক্রমাগত নিকট উদার অঙ্গুলসে পূর্ণিামুখ-মোহনার অভিমুখে।

বাঙালীর কল্পনায় ভাগ্যলক্ষ্মী চক্ৰা, ক্ষিপ্ৰপতি। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর সিন্দুররেখা প্রভাতবৃত্তের নির্ধন ক্রিয়। নবরাজ তাহার কপোলদেশে রঞ্জিত করে, যখন তিনি রানাকে সিক্তবসনে তালীবনশোভিত সমুদ্র-উপকূলে উঠিয়া দাঁড়ান। মেদিনীপুর হইতে নোয়াখালি, সাগর হইতে শনকীপের অনেক বাধান, তবুও সেন-নদীগুলি বহু শতাব্দী পূর্বে তাম্রলিপি ও সপ্তগ্রাম অঞ্চলের ত্রিভুজের কারণ ছিল, তাহারাই নতুন করিয়া চট্টগ্রাম উপকূলে বাংলার বালাকিকরণ-প্রভা ভাগ্যলক্ষ্মীর চরণ বন্দনা করিতেছে। মেঘনার উপকূলে বাংলার লক্ষ্মী তাহার স্বর্ণ-সিংহাসন

বসাইতেছেন, পশ্চিমে অলক্ষ্মী ও মৃত্যুর করাল ছায়া দিগন্ত-প্রসারিত।

### গঙ্গার পূর্ণিযাত্রার কারণ

গঙ্গার এই পূর্ণ-অভিযানের কারণই বা কি? নদী-মাতৃক দেশে লোকসংখ্যা অতি সঘন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সমগ্র সমতল ভূমিতে লোক ও কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাহুগ কুঠার ও লাঙ্গল লইয়া পরস্পরের সাহচর্যে আক্রমণ করে। অরণ্য ভূমিমাংস হইতে থাকে, গোজাতি ও কৃষি গিরিলজ্জন করে। নদীর শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি-স্থলে এই যুগপদপদ্য দখল অরণ্যচ্ছেদন ও কল্যাণলগ্নের পাশ মাহুগের আগামী-বশকে ভোগ করিতে হয়। গিরির সাহচর্যে মাটির অবিরাম ক্ষয় হইতে থাকে। বনভূমি বৃষ্টি-বারা বহু করিবার আর সুযোগ পায় না, হুতরায় মরতম বৃষ্টিপাতের পরেই আসে নদীর বিপুল বজা। পল্লভের সাহচর্যের সমস্ত মাটি ধুইয়া পুঁছিয়া সেই বজা ক্রমাগত ঐ পলি ঢালে, নদীর গর্ভে। তাহার ফলে হয় নদীগুলির গতিহ্রাস, অবরোধ বা গতি-পরিবর্তন। নদী-তটের ছই দিকের দেশ নদীর জল ও পলি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ অশুভের হইতে থাকে। নদীগুলিও বায়ুপ্রাপ্ত হইয়া মজিয়া গিয়া ক্রমশঃ কচু ও আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নদী যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন দেশের জল-সরবরাহের ব্যত্যয় ঘটে। ফলে—ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, মাহুগের বায়ুহানি, লোক-সংখ্যার হ্রাস এবং জঙ্গলের পুরাতন অধিকার জাগন।

বরেন্দ্রভূমি ও রাঢ় বহুযুগ পূর্বে জনপদ ও লোকবহুল হইয়াছিল। তাহার ফলে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের গিরিপ্রদেশে অরণ্যবিশা-শাও বহুপূর্বেই হ্রিতি হইয়াছিল।

পল্লভায়ে ও পরস্পরের সাহচর্যে অরণ্য-

বিনাশের ফল বহুদেশ ভোগ করিয়াছে। চীনদেশে হোয়াংহো নদী এই কারণে এত ভীষণ বজা বৎসর বৎসর আনে যে, চীনারা ঐ নদীর নাম দিয়াছে 'চীনের অভিশাপ'। বহুশতাব্দী ধরিয়া বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের অরণ্য-চ্ছেদনের ফলে, দামোদর ও তিত্তা নদী তাহারিগের গতি পরিবর্তন করিয়াছিল প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে। সে সময়কার কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা তদানীন্তন রাষ্ট্রিক খবরা অপেক্ষাও দুরলব। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যখন দামোদর নদ কাটোয়ার সমদল ত্যাগ করিয়া পশ্চিমমুখী হইল, তখন হইতে বাংলাদেশের একটি পুরাতন সভ্যতা ও সম্পদের ক্ষেত্রের অধঃপতন স্থানিতি নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৬৪ হইতে ১৭৭৫ সালের মধ্যে পদ্মা নদীও ফরিদপুর ও বাথরগঞ্জের ভিতর দিয়া বাদীন প্রবাহ ত্যাগ করিয়া অজ প্রবাহ খরিল এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিত্তা নদীও 'ফুলচুরি' ঘাটে একপুঞ্জের সহিত মিলিত হইল। এই নদী-পরিবর্তনের ফলাফল সমগ্র বাংলাদেশ এখন ভোগ করিতেছে। একদিকে দামোদরের বিপথগমন ও মধ্যাংলার শাহানদীগুলির গতিবোধ যেমন সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যাংলার অধঃপাত, লোকহানি ও কৃষির অবনতির কারণ হইয়াছে, অপর দিকে নতুন যমুনা নদীর অবধা বিপুল প্রবাহ দিকে দিকে নতুন লোকবহুল জনপদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতি নদীর গতিপরিবর্তন করাটাই ক্ষান্ত হন নাই। প্রকৃতি মাহুগকে অজ্ঞভাবেও শাস্তি দিতেছেন। তিত্তা, আদেহী ও যমুনা, অজ্ঞ ও মূঢ়াঙ্গী, স্ববর্ণরেখা ও দামোদরের ভীষণ বজা—বাঙ্গালীর পূর্ণশত-বৎসরের অপরিণামদর্শিতাকে এখনও নিদারণ বিজ্ঞপ করিতেছে।

নদীর গতিহ্রাস ও পরিবর্তন হেতু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে কৃষি ও লোকসংখ্যার হ্রাস

গত চারি শতাব্দী ধরিয়া অরণ্য-চ্ছেদন, নদীর

গতিহ্রাস ও সমতল ভূমির ধীরে ধীরে অবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিম ও মধ্য বাংলার সমতল ভূমি এখন নদীগুলির জলরেখা অপেক্ষা উচ্চে। উত্তর বঙ্গেও নদী-প্রকৃতির এই অনিবার্য বিপর্যয় স্রুত চলিয়াছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সব অঞ্চলেই নদ-নদীর বিনাশের নানা ক্রম বা পর্যায় লক্ষিত হয়। কোথাও নদী আগাছায় ভরা, মনে হয় না সেখানে জল; কোথাও স্থানে স্থানে ঈষৎ প্রোত বা আবর্ত পুরাতন প্রবাহের নির্দেশ করে। কোথাও বা নদীর শুষ্ক গর্ভে কয়েক পুরুষ ধরিয়া চাষ-বাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শুধু গ্রামের নাম হয়ত প্রাচীন নদী-পথের সন্ধান দেয়। নদী-পরিভ্রান্ত প্রত্যেক অঞ্চলেই শ্রীহই জঙ্গলে ভরিয়া উঠে, এবং সেখানে জঙ্গল গ্রামের ভিত্তিকে আক্রমণ করে, সেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রবেশ করিয়া গ্রাম উজাড় করিয়া দেয়। 'ব'-প্রদেশের অনিবার্য বিপর্যয়ের ফলে মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ নদীগুলি কীণতোয়া, কল্যাণলার, সমগ্র দেশের জল-সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত, এবং অসংখ্য ম্যালেরিয়া-জট খাল, বিল, জলা, জঙ্গলের উভয় পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের বাঙালী বিপ্লবী প্রকৃতি ও শ্রীহীন কল্যাণিনী নদীর সহিত সংগ্রামে পরাজ। এ সংগ্রামে ভবিষ্যতে তাহার জয়ের আশাও কম।

জলপ্লাবনের দ্বারা ম্যালেরিয়ার নিবারণ ও কৃষির পুনরুদ্ধার

বিহার প্রদেশে গঙ্গা নদীতে ষাধ ষাধিয়া প্রকট প্রাকৃতিক সরোবর তৈরী করিয়া, জেলায় জেলায় খাল কাটিয়া বর্ষার নতুন জল মরা গাড়ে বৎসর বৎসর না চালিলে কৃষি 'ব'-প্রদেশের স্বয়ং অবশ্যজ্ঞাবী।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে, সেখানে যত মরা



নদীর কঙ্কালবশেষ বহু শ্রোতহীন বিল ও খাল রূপে দেখা যায়, এবং গ্রামে গ্রামে দেখানো যত পঙ্কিল জলাশয় আছে, সেখানে ভরানদী হইতে নৃতন জল আনিয়া তাহাবিগ্গকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাণিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে জমিও পলিমাটি পাইয়া উর্দ্ধর হইবে। খাল, বিল, জলাশয়ের পক্ষেছায়া হইয়া মৎস্যের চাষ বাড়িবে, ও মশক-কুলও বিনষ্ট হইবে। চারিদিকে এখন কৃষির যে অবনতি ও দৈন্ত দেখা গিয়াছে, তাহার এবং নদীর বস্তারও প্রতিরোধ হইবে। যদি এই প্রকার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে বাংলার পূর্গবিভাগ কমিটি (১৯৩০) সপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে—মধ্য ও পশ্চিম দেশ অতিরিক্ত জল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে, নিম্নদেশে।

শুষ্ক জলাপ্রবনের দ্বারা একই সঙ্গে ইতালী ও পাশ্চাত্যেই কৃষির উন্নতি ও ম্যালেরিয়া নিবারণ সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। পঞ্জাবের পূর্গবিভাগ ঐ প্রদেশের জলপথ রক্ষা ও সম্ভারকরে বিপুল অর্থব্যয় করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশের নদীদিগের অর্থবল নাই। জলপ্রাবনের সঙ্গে এক একটা জেলার ম্যালেরিয়া-বিষ-জঙ্ঘরিত অংশের মত লোককে কুইনাইন ও প্রাগমোনি দ্বারা শোথন করিয়া লইতে হইবে। তখন মশককুল ও বিল গ্রহণ ও উৎপীড়ণ করিয়া ম্যালেরিয়া বহন ও বিস্তার করিতে পারিবে না। একই সঙ্গে কৃষির উপযোগী সাময়িক, নিয়ন্ত্রিত প্রাবন (bonification), জলাভূমির সংস্কার, মশককুলের বিরুদ্ধে অভিযান ও মাছের বেহের বিল নিষেধ না করিলে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা নাই। জলসরবরাহের হ্রদ্যবস্থা হইলে, এবং শিকা ও মাধার বাহ্যোয়ত্তির ফলে দৈহিক রক্ষণশীলতা বাড়িলে, মশকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর ফল পাওয়া যায়,—ইহাই ইতালীর অভিজ্ঞতা।

রেলপথ ও সেতুর দ্বারা নদীর গতিরোধ হেতু কৃষি ও বাসস্থানের অবনতি

আমরা দেখিলাম, মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অধোগতি প্রধান কারণ নদনদীর গতিহ্রাস ও গতি-পরিবর্তন। 'ব'-প্রদেশে সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। মাধব গিরি-প্রদেশের জঙ্গল কাটিয়া, পর্বতের সাহস্রেশের সবুজ আচ্ছাদন কাড়িয়া লইয়া আপনার বাসস্থান গড়ে, কৃষিবিস্তার করে, অথবা বনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করে। বিবর পর্বতগার লজ্জায় রক্তিম হইয়া বঙ্গের বঙ্গের বর্ধগমে বিপুল বজাতে দিক্ দিক্ ভাসাইয়া দিয়া প্রতিশোধ লয়। যখন সমস্তভূমি জলে জলমান হয়, তখনই নদী নিরুত্থিতে নৃতন পথ খুঁজে। নীমাহীন প্রাবনের মধ্যে এইরূপেই দামোদর, তিতা, যমুনা ও পদ্মা আপনাদিগের নৃতন প্রবাহ অহুসন্ধান করিয়া লইয়াছিল। মাধবও নদীতটে বীধ বাধিয়া, বড় রাস্তা, রেলপথ ও ব্রেজসেতু নির্মাণ করিয়া জলপ্রবাহ রোধ করিয়াছে। তখন নদীগুলি শ্রোতহীন ও পঙ্কিল হইয়া ম্যালেরিয়া মহামারী আনিয়া দেয়, অজ নীরজল বর্ধগমে অস্বাভাবিক শীত হয় এবং বহা আরও বোঝে গর্জিয়া উঠে; মাধব প্রদেশের শাস্তি-দানকে এইরূপে আরও নিশ্চয় করিয়া তুলে।

যেখানে মরানদী সমতলভূমিকে তাহার আশীর্বাদী লাল জল দান করিতে পায় না, সেখানে মাটি হয় অহুর্ধর ও অতিশুষ্ক এবং একই সঙ্গে কৃষির অবনতি, গোজাতির ও মাছের বাহ্যের অংশপতন ঘটে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতি  
জাতির কৃষ্টি-বিকাশের অন্তরায়

পূর্ব-কালে ঐ প্রদেশে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গ। যুগে যুগে তাঙ্গাশিখি, মহাবান, বর্মদান, কোটীর্ষ, বিজয়নগর, ছুরিশ্রেষ্ঠ, কর্ণধর্য, পৌড়, ও নবধীপ বাংলার গৌরবের উত্তরাধিকারী। উনবিংশ

শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-নীক্ষার ফলে যে নৃতন কৃষ্টি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে অশিক্ষিতের জীবনের ও সমাজের আদান-প্রদান নাই। আর ঐ উনবিংশ শতাব্দীতেই মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতি। ইহার ফলে আমাদের নৃতন সভ্যতা হইয়াছে অনেকাংশে নব-নাগরিক। সাহিত্যে, চিত্রায় ও রাজনীতিতে আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীভূত (bourgeois) কৃষিমতার প্রভাব দেখিতে পাই; ইহার কারণের সঙ্গে জাতির সভ্যতার অব্যবহৃত মুড় ও নুক বিরাট ক্লবক সমাজের ভাব-বিনিময় ঘটে নাই।

বাতবিক পক্ষে বঙ্গের ২/৩ অংশে পল্লীসভ্যতার মানি ও বিলোপ বাঙালী জাতির পক্ষে শুধু যে তাহার বর্তমান শেটিনী বৈধিক অবস্থার সাক্ষ্য দেয় তাহা নহে, ইহা এখন তাহার কৃষ্টির পরম অন্তরায় হইয়াছে। পক্ষান্তরে নৈট্রায় পল্লীগ্রামের পুনরুদ্ধার ও বহু গ্রামের স্বয়ং-শক্তির জাগরণ ও স্থগিলন না হইলে, আমরা এক অলীক প্রজাতন্ত্রের মরীচিকার মিছা পুরিব। জনসাধারণ আপনাদিগের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারের পূর্ণ ভ্রমোৎসাহ লাভ করিবে না।

কলিকাতা নগরী এখন একটা বিরাটকার অট্টোপাসের মত অলম্ব্য শুঁড় বিস্তার করিয়া চারিদিকে পল্লীসমাজকে শোষণ ও রিক্ত করিতেছে, ধ্বংসের ত্বপের মধ্যে তাহার শোণমালা উঠিতেছে আকাশের স্পর্শ করিবার স্পর্শা। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের কৃষি ও শিল্প-সম্পদের ভাঙ্গামা রক্ষা করা অসম্ভব হইত না যদি মানভূম অঞ্চল, যেখানে খনিজ পদার্থ সমূহ একটা নৃতন বহিষ্কৃত শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে কাড়িয়া লইয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা না হইত। বঙ্গ-বিভাগ এখনও রদ হয় নাই। এই অঞ্চলে অনেক বাঙালী-ভাষী ও অনেক বাঙালী আছে,—তাহারা এখন বাংলার বাহিরে। ঐ প্রদেশে হইতে নানা আনিম জাতিও আসিয়া পশ্চিম বঙ্গে চাষ-আবাদ করিতেছে। অনেকগুলি বাঙালী জনপদ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, অনেক কারখানায় এবং বহুনিতেও বাঙালীর হুপ্রজিতি।

এই অঞ্চল বাংলাকে প্রত্যাশ করিলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অবনতি ও শিক্ষিত ভ্রমলোকশ্রেণীর বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যার কিছু প্রতিকার হইত। পল্লীগ্রামের সম্পদ ও বাসস্থানি শুধু যে ভ্রমলোক-শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ তাহা নহে, ইহা বাংলার সম্বল ও সাধারণ লৌকিক সভ্যতার মানিরও প্রধান কারণ।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি কিন্তু ত্রীহীন, বিধ্বস্ত নয়। সেখানকার সমৃদ্ধির পরিচয় আমরা কেবলমাত্র কয়েকটি বড় সহর ও জনপদেই পাই না। পশ্চিম বঙ্গের মত পূর্ববঙ্গে নগর ও গ্রামের প্রতিকূলতা দেখা যায় না। সেখানকার শাখা ও সম্পদ, সমাজবল ও লৌকিক সভ্যতা, লোকসংখ্যা সকল জনপদগুলিতে কম-বেশী ভাগ করিয়া লইয়াছে।

বাংলার লোক ও সম্পদবৃদ্ধির কেন্দ্র  
পূর্ব অঞ্চলে অপসারিত

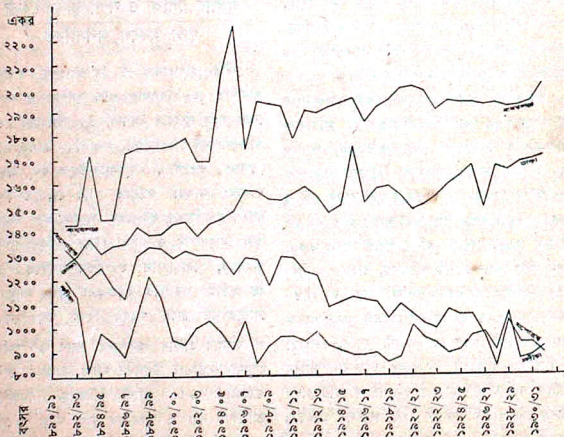
নদীর প্রবাহরোধ ও 'ব'-প্রদেশের স্বাভাবিক অধোগতি হেতু বাংলার কৃষি, বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্র আশ পূর্ববঙ্গে অপসারিত। পূর্ববঙ্গের সভ্যতা-অভি-অনুশ্রুতি মূলমাত্রী সভ্যতা। রাঙ্গা, ফি- (বোড়শ শতাব্দী), গুণাসাতে-উন-তারিখ প্রভৃতির বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে, বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও পূর্ববঙ্গের অনেক অংশ জনবিরল ছিল। মাদ্যবাদ ও খলিকাতারবনে দাঁকিল যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালি ও পশ্চিম বঙ্গবর্গজ) তখন বজ হস্তীর অত্যাচার হইত এবং প্রধান নগর (?) সোনারগুয়ে রাজ্যে বাবের বিঘ্ন ভর ছিল।

বাংলার প্রাচীন জনপদের ক্ষয় ও অর্ধাচীন মূলমাত্রী-সভ্যতার উদ্ভবের সহিত বাংলার ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় মধ্য ও পূর্ববঙ্গের কৃষি, বাণিজ্য ও লোক-সংখ্যার বিপরীত গতি বুঝা যাইবে।



কৃষিক্ষেত্র ব. প্রদেশের প্রমা	১৯২৪ সালের কৃষিত্ত্ব (একর) দুইটি	১৯৩১ সালের কৃষিত্ত্ব (একর) দুইটি	কৃষিত্ত্বের হার-গুণিত (শতকরা)	মালগেরিয়ার পরিমাণ (শতকরা)	গোলাপখার হার-গুণিত (শতকরা)
বৃন্দাবন	১,২৪৪,০০০	১৪২,১০০	-৪০	৫০.৪	+০.৭
নদীয়া	১০,৪০০	১১০,২০০	-৭	৫৩.৭	-৮.১
মুর্শিদাবাদ	১,১০৫,০০০	১৪৫,০০০	-১৪	৪১.৭	+২২.১
বশাহর	১,০০০,০০০	৮৭,০০০	-৫১	৪৩.২	-৭.২
জগদী	৫৪১,৪০০	২১০,১০০	-৪৫	৪৬.৬	+৬.২
বাক্সি 'ব'-প্রদেশের জেলা					
ঢাকা	১,৫৮৬,১৬৬	১,৭৫০,০০০	+৫৭	১.৭	+২৮.৬
মৈমনসিংহ	০,৫৭৬,৮০০	০,৬৭৪,০০০	+১৬	১১.০	+২৮.৬
ফরিদপুর	১,২৫০,৮০০	১,৪৭৫,০০০	+১০	২৮.৬	+২১.৮
বাংলাদেশ	১,৫৮৬,৮০০	২,০৫৫,০০০	+২১	৫.০	+২৭.১
ব্রিটান	১,০১০,০০০	১,৪৭২,৮০০	+১১	৭.২	+৩৭.৭
মোহনাবাদ	৪২১,৮৭৭	১১২,২০০	+১০২	১.০	+৪২.৬

কৃষিত্ত্ব ভূমির পরিমাণ (০০০ একর) — (১নং চিত্র)



নিম্নে প্রদত্ত ১নং চিত্রে বাখরগঞ্জ ও ঢাকার অবাধ কৃষির প্রসার এবং বশাহর ও নদীয়ার কৃষির কমশ: বিলোপ স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। আর ২নং চিত্রে এই চারটি জেলার গত ৫২ বৎসরে লোকসংখ্যার (প্রতি বর্গ মাইল) বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হইবে। কৃষির সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে বশাহর ও নদীয়ার লোকসংখ্যা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ছুইটি মানচিত্রে বাংলার বিভিন্ন মা-ভিত্তিসম গত ৩০ বৎসরের লোকসংখ্যার প্রগতি ও অপ্রগতি (৩নং চিত্র) ও মালগেরিয়ার প্রকাশের পরিমাণ (৪নং চিত্র) নির্দেশিত হইয়াছে।

মরানাদী ও ক্ষয়িফু প্রদেশ বনাম

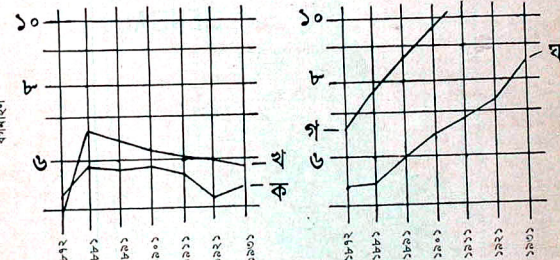
জীবন্ত নদী ও বাক্সি প্রদেশ

মধ্যবঙ্গে মরানাদীর সংখ্যা সর্বাধিক অধিক।

এই অঞ্চলে সর্বাধিক কৃষির অবনতি, লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করে। আমন ধান ও সুপারি বাগানের হ্রাস ও মালগেরিয়ার প্রাচুর্য হ্রাস। পূর্ববঙ্গে সম্পদে বাখরগঞ্জের অনেক এলাকার ১৫০০ হইতে নদীগুলি অবাধ ও খরবোতা; সেখানে বীধ, রাস্তা ১৭০০ গোক প্রতি বর্গ মাইলে পালিত হয়। বাখর-ও রেলপথের সংখ্যা কম। পূর্ণ অঞ্চলে গত গঞ্জের ফল ও শাক-সব্জীর বাগানের পরিমাণও

২নং চিত্র

১৮৭২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত গত ৫৯ বৎসরের (ক) নদীয়া, (খ) বশাহর, (গ) ঢাকা ও (ঘ) বাখরগঞ্জ জেলার লোকসংখ্যা (প্রতি বর্গ মাইল) বৃদ্ধি ও হ্রাসের পরিমাণ



উদাহ—প্রতি বর্গ মাইল লোকসংখ্যার মাপ প্রতি বর্ষ ১০০। ঢাকা ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে প্রতি বর্ষ ১০০০

তিনটি আদম-সম্মারীতেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের সকল জেলাতেই কৃষির বিপুল প্রসার এবং অবিকাশ সাব-ভিত্তিসনই মালগেরিয়ার-মুক্ত।

বাখরগঞ্জের এক অংশের জলপথের মানচিত্র (৫নং চিত্র) হইতে কৃষির সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ বুঝা হইবে। জলপ্রবাহ হেতু আমন ধান এখানকার প্রধান ফসল। সমগ্র কৃষিত্ত্ব ভূমির শতকরা ৮৫ ভাগ বাখরগঞ্জে আমন ধানের পরিমাণ। নিম্নমিত বহা সমস্ত দেশকে প্রাবিত করিয়া দেহ, নিগদিগত প্রসারিত

সবুজ আমন ধান বস্তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষা বড়াই কৃষির সহায়। যে জলপথ-গুলি কৃষির অবলম্বন, তাহারাই আবার বর্ষার পর যখন জলপ্রবাহ বিপরীত দিকে বহিত থাকে, তখন সমগ্র অঞ্চলে জনিকাশ ও আবর্জনা-পরিষ্কারের

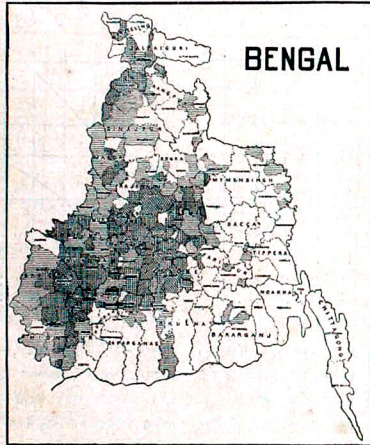
পূর্ণ অঞ্চল বাক্সি, কিন্তু হিন্দু এখানে ক্ষয়িফু

আমরা দেখিলাম, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে লোকসংখ্যার অবনতি ও পূর্ববঙ্গে কৃষি ও লোকসংখ্যার বিস্তার বাংলার আধুনিক ইতিহাসের সর্বাধিক প্রমাণ তথ্য। আর একটি প্রধান তথ্য এই যে, পূর্ববঙ্গের যেসব জেলায় কৃষি ও সম্পদ বাড়িতেছে, সেখানে মুসলমানের



মধ্যা হিন্দুর অপেক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। অপর দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্যবঙ্গের অবিকাংশ জেলায় হিন্দু হাটয়া বাইতেছে, কিন্তু মুসলমান সেই শূন্যস্থান দ্রুত অবিকার করিয়া লইতেছে।

বাংলার বিভিন্ন মা-ভিভিসনে গত ৩০ বৎসরের লোকসংখ্যার প্রগতি ও অধোগতির পরিমাণ—(৩নং চিত্র)



বিভাগ	১৮৭১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ক্ষয়প্রাপ্ত ব-প্রদেশ	১৮৭১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বর্ধমান	৮০৮	১২১	১২০	১৮০	১৮৬
মুর্শিদাবাদ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
নদীয়া	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বঙ্গোড়	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বঙ্গোড়	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বায়পুর্ন	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
ফরিদপুর	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
ঢাকা	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০

বিভাগ	১৮৭১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বায়পুর্ন	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
ফরিদপুর	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
ঢাকা	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০
বৈদ্যনাথ	৪১৬	৪৮০	৪১৬	৪৮০	৪৮০

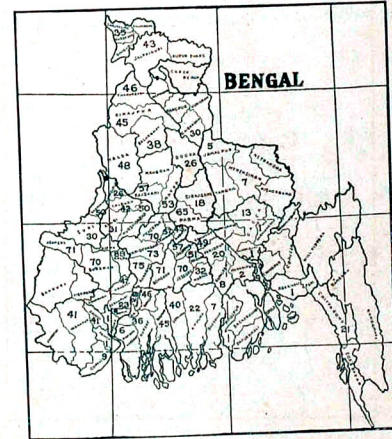
\* গত ৩০ বৎসরের মোট বর্ধমানের লোকসংখ্যার পরিমাণ  
+ গত ৩০ বৎসরের মোট বর্ধমানের লোকসংখ্যার পরিমাণ  
\$ গত ৩০ বৎসরের মোট বর্ধমানের লোকসংখ্যার পরিমাণ



মুসলমান বৃদ্ধির কারণ, পশ্চিম অঞ্চল ক্ষয়িত্ব  
কিন্তু মুসলমান এখানেও বৃদ্ধি

উল্লিখিত তালিকা হইতে বেশ বৃদ্ধি বাইবে যে, মুসলমানের আহার্য অধিকতর পুষ্টিকর। মুসলমানেরা বাংলার যে অঞ্চল আচ্ছাদিত সম্পদ ও সভ্যতার

বাংলার বিভিন্ন মা-ভিভিসনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের পরিমাণ—(৪নং চিত্র)



উত্তরাধিকারী, সেখানে শুধু যে মুসলমানের মাধ্যমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নয়, হিন্দুর মাধ্যমেও বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত 'ব'-প্রদেশে, যেখানে লোকসংখ্যার সাধারণ অবনতি, সেখানেও হিন্দুর মাধ্যমে কমেতেছে, কিন্তু মুসলমানের মাধ্যমে বৃদ্ধিতেছে।

অবিকাংশ মুসলমান বাংলার নিম্নতর জাতি সমূহ হইতে উদ্ভূত। নিম্নজাতি সমূহ

ভূমি ক্রমি ও বাসোপযোগী করিয়া লয়। নতুন জনপদ অধিকতর স্বাধীন। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় যেসব অংশে মুসলমানের প্রাধান্য, সেখানকার নতুন জনপদগুলি ম্যালেরিয়া-পীড়িত নয়। হিন্দুর অধ্যুষিত পুরাতন জনপদসমূহ এখন বন-জঙ্গলাকারী। সেখানে না আছে স্বাস্থ্য, না আছে জীবনের ক্ষতি, এবং দারিদ্র্য ও অসভ্যতা প্রাধান্য-শক্তির হানি করিতেছে।

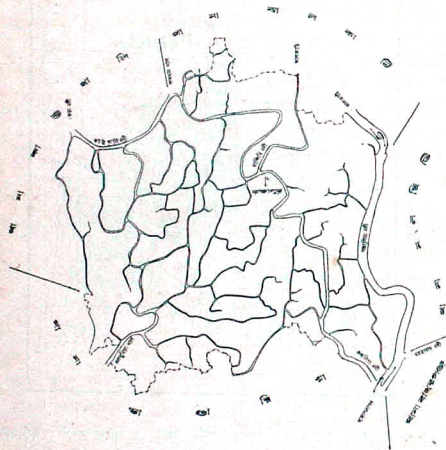


## বিবাহের বিধি-নিষেধ

## হিন্দু জাতি ক্ষয়ের প্রধান কারণ

সামাজিক কুপ্রথাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের প্রধানতম কারণ। একে সংখ্যা-হিসাবে স্ত্রীজাতি কম, তাহার উপর বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবার বিবাহ দিলে জাতি এক্ষণ্য-সভার মাপকাঠিতে মাথোই বহুবিবাহ খুব প্রচলিত, বিশেষতঃ পুন্স-অঞ্চলে।

বাখরগঞ্জের এক অংশের জলপথের মানচিত্র—(৫নং চিত্র)



নিরন্তরে নামিয়া যায়। এই সকল নানা বিধি-নিষেধের জন্ত উচ্চ ও অর্ধ-উচ্চ হিন্দু জাতিগুলির প্রজনন আজ বাধাপ্রাপ্ত।

অপর দিকে মুসলমান উচ্চ ও নীচ জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধর্ম ও সমাজে সমান অধিকার পায়। বিবাহের রীতিতে তাহার বিধি-নিষেধ কম।

বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ অচ্ছদান তাহার যেমন প্রজননের সহায়, তেমনি তাহার নৃজন ও এমন কি স্বদূর নদীসৈকত ও বিশদসকুল জলাভূমিতে রুহি ও বসবাস বিস্তারের অবলম্বন হইয়াছে। কি পুন্স, কি স্ত্রী, যে কেহ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, তাহাতে সামাজিক নিষেধ নাই। সব শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বহুবিবাহ খুব প্রচলিত, বিশেষতঃ পুন্স-অঞ্চলে।

আইন-অঙ্গুসারে মুসলমানের চারিটি বিবাহ হইতে পারে। নিজের কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত সে অনেক সময় অতগুলি বিবাহ করে এবং তাহার পরিবার-পোষিও প্রকাণ্ড হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের গত অর্ধশতাব্দীতে বৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ে দেখাও হইল।

## অনুমত হিন্দুজাতির বৃদ্ধি

১৮৮১	১৯০১	শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ
হিন্দু	১৮০ লক্ষ	২২২ লক্ষ
মুসলমান	১৮০ " ২৭৮ "	৫১
প্রতি হাজার		
হিন্দু	১৮৮১	১৯০১
হিন্দু	৫০০	৪৬০
মুসলমান	৫০০	৪৫০

গত অর্ধশতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি; অর্ধশতাব্দী পরে দুই সম্প্রদায়ের সংখ্যা-নির্দেশ

সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১৮৮১ সালে হাজারকরা ৫০০ হইতে বাড়িয়া ১৯০১ সালে হাজার-করা ৫৪০ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমানের প্রবল প্রতিপত্তি। হাজারকরা ৬৪৫ হইতে সেখানে গত ২০ বৎসরে বাড়িয়া ৭১০ জন হইয়াছে। যে কোন দেশে অধিবাসিগণের লোকসংখ্যার এরূপ ত্বরন্বতা উপস্থিত হইলে একটা সামাজিক বিপ্লব ও সভ্যতার বোর পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী।

এরূপ নির্দেশ করা যায় যে, আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে পূর্ববঙ্গে প্রতি দশজন লোকের মধ্যে ৮ জন মুসলমান, ও বাকী ২ জন হিন্দুর মধ্যে একজন নমঃশূন্য দেখা দিবে। সমগ্র বঙ্গদেশে ৫০ বৎসর পরে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন উচ্চজাতির হিন্দু, ৬ জন মুসলমান এবং আর তিন জনের মধ্যে একজন মাঃহিদ্দ, একজন নমঃশূন্য ও একজন রাজবংশী অথবা একজন অপর কোন জাতি পাওয়া যাইবে।

এখনই ত নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, জিপুরা, পাবনা, বগুড়া, রাঙ্গুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে দশ জন লোকের মধ্যে ৭ জন মুসলমান, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে প্রায় অর্ধেক হিন্দু নমঃশূন্য-জাতীয়।

বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় অল্পমত শ্রেণীর সংখ্যা সমগ্র হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষা বেশী। সমগ্র বাংলায় অল্পমত শ্রেণীর সংখ্যা, সমগ্র হিন্দুর হাজারকরা তিনশত। ক্রমোন্নতিশীল পূর্ববঙ্গের অনেক জেলায় অবনত হিন্দুজাতিগুলির সংখ্যা খুব বেশী। এই সকল জেলায় ইহার ভবিষ্যতে সংখ্যার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হিন্দুসমাজ কঠোর অপমানিত এই সকল শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি বাংলার সামাজিক শান্তি ও সভ্যতার উপর কম প্রভাব বিস্তার করিবে না। যতদিন তাহারা অনাদর ও অবহেলায় পড়ি পার হইতে পারিবে না, ততদিনই তাহাদিগের ক্ষোভ, দুঃখ ও অবমাননা হিন্দুসমাজের লজ্জা, দুঃখ ও দৈর্জ্ঞের কারণ থাকিবে।

সমগ্র হিন্দুর সংখ্যায় প্রতি হাজারে অল্পমত শ্রেণীর সংখ্যা

• বর্ধমান	৫০৬
• গুলনা	৬৪৪
২৪ পরগণা	৪৭৭
• যশোহর	৫২৭
বাঁকুড়া	৪৪০
• বীরভূম	৫৭০

পূর্ববঙ্গ	
• বাখরগঞ্জ	৫২৪
ঢাকা	৪১৮
মৈমনসিংহ	৪০৮
• ফরিদপুর	৬০২
জিপুরা	২২৩

তারকা-চিহ্নিত জেলাগুলিতে অল্পমত হিন্দুশ্রেণীর সংখ্যা সমগ্র হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষাও বেশী।

অনুমত হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষার অভাব উজ্জ্বিত তালিকাগুলির আসল মর্ম্ম বুঝা যাইবে







নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটিতে উক্ত ও অল্পকি হিন্দু জাতির ও মূলমানবের মধ্যে জাতিগত সংখ্যার বৈলক্ষ্য্য প্রদর্শিত হইল।

প্রতি হাজার পুরুষের অল্পপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	অল্পপাতে বিধবার সংখ্যা
সাঁওতাল	১৮৪
কোচ	১৪২
বাইরি	১০১
ডোম	১৬৫
নমসূদ	১৬৪
মূলমান	১৫৮
মাহিষ	১৫২
সাধা	১৫০
বৈজ্ঞ	১২২
কায়স্থ	১০১
ব্রাহ্মণ	৮৪৭

সেখানে চারিদিকেই নিমগ্ন সুবার পাশপাশের সুযোগ রহিয়াছে, অথচ তাহার সামাজিকতার কোন বাধা ও নিষেধ নাই। বিবাহের জ্ঞাত অমর্যদ বানিকাকেও সে গ্রহণ করে। তাহাও বংশবৃদ্ধির অন্তরায়। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও পণপ্রথা বাস্তবিক পক্ষে অল্পকি হিন্দু-জাতির মধ্যে পাশাচ্য, বন্ধ্যাহ ও ক্রমহতাকে কম প্রশ্রয় দেয় নাই। সব দিক হইতেই জাতিগতের পথ উন্মুক্ত। তাহা ছাড়া বিবাহের পণ্ডি সঙ্গীত হওয়াতে ও বহুবিবাহের প্রচলনে পুরুষের মধ্যেও অবিবাহিতেরও সংখ্যার অল্পপাত মূলমানব অপেক্ষা অধিক।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নির্দিষ্টমতে মূলমানবদের মধ্যে প্রত্যেক বয়সে বিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিক ও বিধবার সংখ্যা কম। বিবাহের গতির সঙ্গীর্ণতা যেহেতু অল্পকি-বিবাহের দ্বায়ে লোকবৃদ্ধির ক্ষতি এবং কয়েক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশে ও শাখায় গুণকণ্ডও দেখা গিয়াছে।

### উচ্চজাতির আত্মজাত

উচ্চজাতির মধ্যে বিবাহ সঙ্গীর্ণ রাঢ়, বালেশ্বর, বৈদিক, ও অজ্ঞাত নানা প্রকার বিভাগ বর্জন অত্যাবশ্যক। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও অতি প্রচলিত। এক্ষত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশজন বিধবা, কিন্তু মূলমানবের মধ্যে মাত্র ১৪ জন। উচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে বৈজ্ঞগণ সংখ্যার সঙ্গীর্ণপেকা কম। স্ত্রুতরা তাহাদের মধ্যে বিবাহের পাশাপাশি বিচারের সঙ্গীর্ণতা সঙ্গীর্ণপেকা অধিক অনিষ্ট-প্রদ।

### প্রাচীন এথেনীয়গণ ও বাঙালীর ধর্মসংস্কার

#### তুলনা

যেভাবে বাংলার উচ্চজাতিগুলি এই যুগে প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত সংগ্রামে হাটয়া গিয়াছে, যেভাবে তাহাদের আদিম বাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহারা যেভাবে দারিদ্র্য ও ব্যাধির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে, তাহাতে নির্দেশ করা যায় যে, সমাজ-সংস্কারের একটা চরম চেষ্টা না করিলে তাহাদের ধর্মসংস্কার

অবশ্রম্যবা। পুরাতন এথেনীয়দিগের সহিত তাহাদিগকে অনেক বিদেশী পণ্ডিত তুলনা করিয়াছেন। এথেনীয়গণ তাহাদের শেখ দাখার ম্যালেগিয়ার দ্বারা জঙ্ঘরিত হইয়াছিল এবং দামশ্রেণী ও রোমক বর্ষরগণ দেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া তাহাদিগের আচার, নিয়ম ও সভ্যতার ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। তাহাদিগেরই মত বাংলায় হইয়া, অসম্ভা বিধিনিষেধের দ্বারা শতভা বৃত্তিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া, দারিদ্র্য ও অসম্ভবতার উপায় উদ্ভাবনে পরাত হইয়া, মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে, যখন চারিদিকে অল্পকি হিন্দু ও অশিক্ষিত মূলমানব নৃতন সম্পদ ও রাষ্ট্রবলে বলীয়ান হইয়া তাহাদিগের পুনর্ভাবন অধিকার করারও করিতে থাকিবে। এই ভাষণ অসমান সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় বাহাদিগের বীর্ঘ্য ও জীবনী শক্তি কম, শিশু ও শোভনতার কৃত্রিম বর্ধ তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

সংখ্যায় বাহারা অধিক, কার্যিক প্রশ্রম ও শিল্প-কৌশলে বাহারা ধরীয়ান, রাষ্ট্রবলে বাহারা বলীয়ান ও আত্মসম্মতি, তাহারা ইহাদিগের মৃত্যুর জ্ঞাত অল্পপাচনা করিবে না, ইহুই বা তাহারা বংশপরম্পরা দ্বায়ে বাংলায় সমস্ত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী। ইহারা তাহাদিগেরই বংশধর বাহারা বাংলাদেশে ইহুইতে সমগ্র প্রাচীন প্রশ্রমের বৈদ্যবর্ধ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, বাহারা নব্য জায় ও বিভিন্ন মরমিমা সাধনের অগ্রদূত, বাহাদিগের বিশিষ্টবৈদ্যবর্ধ বিখ্যতিস্তার একটি সঙ্গীর্ণশ্রেণী গৌরব এবং বাহারা এই আধুনিক কালেও ভারতের নবজাতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গুরু ও নাযকের স্থান পাইয়াছিলেন।

শিক্ষাসংস্কার এবং ভদ্রলোকের ভূমিকর্ষণ

### ও কার্যিক প্রশ্রম স্বীকার

তাই বলিয়াছি, উচ্চজাতির সমাজ-সংস্কার বাংলায় কৃষ্ণর দ্বারা রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। নৃতন রাষ্ট্র-

বিভাগে জমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন অচিরেই পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। যে কোন কৃষিপ্রধান, লোকবল দেশে এক অবস কণ্ঠবিমুখ শ্রেণী শুধু স্বধাবিকারের অল্পহাতে চিকিয়া থাকিতে পারে না। ইতিপূর্বেই বাংলার যেসব জেলায় মূলমানব বা নমসূদ্রের প্রাচীন্ত, ক্রমকশ্রেণী নির্ভীক ও শীড়ন-অসহিষ্ণু, সেখানে জমিদার ও জমিদারের আনগাশ্রেণীর সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে।

শতকরা জমিদার ও আমলার সংখ্যা  
অল্পপাতে কৃষকের সংখ্যা

রংপুর	৩২৬৫
দিনাজপুর	২২৬৮
খিরা	২১১৪
ঢাকা	১১৪৬
নোয়াখালি	১৫৪৪
বশোর	১১৪
বর্ধমান	১০০
বাঁকুড়া	৪১৯

বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় নিরীহ প্রজার শোচ অনেক আমলা। জমিদার গ্রাম জাগ করিয়া তাহাদিগেরই উপর খাজনা আদায়ের ভার দিয়া নিকর। এই সব জেলায় কৃষিকার্যেও আদিম মৃত্যু, সাঁওতাল জাতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অল্পকি দেশবাসীর বাসস্থান হইতে আদিম জাতির বাহুল্য চাফাসে একটা বড় ক্রমস্তর আসিবে। কিন্তু সঙ্গীর্ণপেকা বড় ক্রমস্তর আসিবে তুমির স্বধাবিকার বিঘ্নে। ভাগ-বিসি, জোৎস্নের রেহান ও ভোগদাম এবং ভূমির লোভনে বিঘ্নে সঙ্গীর্ণপ্রথমেই সংস্কার অতি প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী বিনা প্রশ্রমে, বিনা মূলধনে, বিনা তত্ত্বাবধানে, জোৎস্না ভোগ করিতেছে ভাগ্যচ্যেয় আশ্রয়ে। তাহাদিগকে অল্পকরণ করিয়া মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের জোৎস্নার ক্রমক ও অমবিমুখ, ভদ্রলোক সাক্ষিয়ানে। তিনিও জমি বিলি করেন, মজুর লাগান, ভাগে ফসল ভোগ করেন। পূর্বে অল্পকি ভূমিরে অংশীকরণও



জমির ব্যবস্থায় কম অস্থিবিধা আনে নাই। ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ভূমিকর্ষণের দাবির নিবিড় ভাবে জড়িত। এ-দাবির বাংলায় ভঙ্গলোকশ্রেণী গ্রহণ করে নাই। বাংলার ভবিষ্যৎ আইন-কাহনে এ-দাবির স্বীকার না করিলে বৈশেষী এখন ভূমাস্বিকারী, তাহারিগকে ধীরে ধীরে অথবা জনসমাজ-শাসিত আইন-বজ্ঞার এক কোণে বিনষ্ট হইতে হইবে। সমাজ-সঙ্কলিত না হইলে মাঠের কাজে, কারখানায়, লোকানে, আড়তে ভঙ্গলোকশ্রেণী হাট্টা হইবে। কলিকাতা প্রকৃতি নগরে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়ার আধিপত্যের বশ্ণ ভঙ্গলোকের পরিশ্রমকাতরতা। তাই কলিকাতা নগরীর বিরাট সম্পদ বিদেশীরাই করায়ত্ত। নব-নাগরিক সভ্যতা বিদেশীর রোশনাই,—“পর দীপমালা নগরে নগরে, ভূমি যে তিমিরে ভূমি যে তিমিরে”। মূলকথা এই যে, যে কারিক পরিশ্রম এতদিন বাঙালী ভঙ্গলোক অভ্যস্তোচিত জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, বর্ধমান বিপ-বিভাগ্যের শিক্ষার নিরর্থকতা ও বিফলতার যুগে তাহাকেই জীবনরক্ষার একমাত্র সহায় ও সখল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

### রাজনীতি নহে, মানবিকতাই হরিজন- আন্দোলনের মূলশক্তি

শু শু নিচ্ছে ঘরে, পরিবারে ও পোষিত সঙ্কতি হইলে চলিবে না। উচ্চভাতির সহিত প্রতিবেশী অগ্রস্ব-ভাতি ও মুসলমানের সহিত সামাজিক আদান-প্রদান, আচার-নিয়মেরও আনুল পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। সংগ্রহা গান্ধী প্রবর্তিত হরিজন-আন্দোলন, বাহার জ্ঞত তিনি জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছেন, রাষ্ট্রিক স্তুবিধা-অস্থবিধার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া যদি সভ্যসভাই উন্নততর নীতি ও মানবিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাজনীতির গতি অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে, তবেই রক্ষা। যেসব ভাতি এখন অস্পৃশ্য বহিয়াছে, যেমন ভোম, হাড়ি, কেওড়া, লালবেণী, বেথর, ভূঁইমাগী

চামার প্রকৃতি, তাহারিগকে বাসগৃহের অন্তরে এবং মনিরাভাত্তরে প্রবেশের অধিকার দান, তাহারিগের মধ্যে বাংলাদেশ জুড়িয়া একটা পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন, সকল অহুত ও পতিত ভাতির পাড়ায় পাড়ায়, যেখানে ভঙ্গলোক প্রবেশ করিলে জাতিহত্যার ভয়, সেখানে তাহারাই পরিচালিত নৈম-বিভাগ্য স্থাপন, দেশ জুড়িয়া মস্তপান নিবাণ, সার্বজনীন পূজা, সার্বজনীন জ্বাচরণ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মারফতে তাহারিগের সংস্কার, অখাণ্ড নিবাণ, পূজা ও দীপা-দান,—এই সকল উদ্দেশ্যে বাংলার উচ্চজাতিগণকে সকল কপটতা ত্যাগ করিয়া গভীর আত্মরিকতা ও বিশ্বাসের সহিত যুগ্ম, মুক, অশুচি নারায়ণের নামে কাছে নামিতে হইবে।

বাংলাদেশে বহুশতাব্দী ধরিয়া পার্শ্বতা, বাবাবর ও নীচ অনার্যভাতির শিক্ষা ও সংস্কারের ভার লইয়াছে। কত অনার্যশ্রেণী ব্রহ্মণ সভ্যতাকে আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াও হিন্দুসমাজের অস্থভূক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসও এই সংস্কারের ইতিহাস। হিন্দুর সামাজিক স্তর-বিভাগের উচ্চ-নীচতা এই ধীর সংস্কার-পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় নির্দেশ করে। দেশে বহন স্বাধীনতা হারাইল, তখন হইতেই এই সহজ শিক্ষা ও সংস্কার-কার্য বাধা পাইল। তখন হইতেই যত প্রকার অস্বাভাবিক স্পৃষ্টাঙ্গুত বিচারের ঘটনা। নূতন শিক্ষা ও প্রজ্ঞাতন্ত্রের দিনে হিন্দু-সভ্যতার এই প্রচ্ছন্ন প্রচারকর্মের পুনঃ কাগ্রত করিয়া দেশময় যে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অহুত বা পতিত ভাতি আছে, তাহারিগকে সমাজের কোড়ে টানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রিক নির্দোষ-প্রণালী যে নূতন ব্যবধান সৃষ্টি করিচ্ছে, তাহা উদারতর নীতি ও সমাজ-বিভাগ মুক্কারে উড়াইয়া দিবে।

হিন্দু-বর্ণ ও মুসলমানের বর্ণ, উচ্চ-অহুত ও পতিত ভাতির সামাজিক বিচ্ছেদকে প্রশ্রয় না দিয়া সমগ্র বাংলাদেশে এমন একটা শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আনিতে হইবে যাহাতে মুসলমান, মাহিহ,

রাজবংশী ও নমঃশূদ্র বাংলার কঠিক নীচের দিকে না টানিয়া বহু তাহা যুগ্মপরাপরাঙ্কিত প্রণতির পুষ্টি-সাধন করিতে পারে। হিন্দুভাতির মধ্যে নিরশ্বেরী উদয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রদান ও উচ্চ-নীচ ভাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন ও বিবাহের গভীর বিচার, সর্গপকার কারিক শ্রম ও শিলাহীনলনে অস্পৃষ্টতা বর্জন ও আশ্বিনয়োগ দূরদৃষ্টিতে দেখিলে শুধু হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় নয়, সমগ্র বাঙ্গালী ভাতির আত্মরক্ষার হুনিশিত পথ।

### হিন্দু-মুসলমানের একই মাটি ও জল

বাংলার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে মুসলমানের প্রাধান্যকে ভয় করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক বৈষম্যকে বাড়াইতে দেওয়া বাঙালীর আত্মরক্ষার পথ। রাজ-নীতিজ্ঞের দূরদর্শিতায় দেশবন্ধু ভিত্তরজন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ছয় শতাব্দীর নদীপথের গতি ও অযোগ্যিতা বাঙালী রাষ্ট্রিক নিয়ম-কাহনের দ্বারা কি করিয়া লজ্জন বা রোধ করিবে? বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের জ্ঞ প্রস্তুত হওয়া বিবেচনার কাজ। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সামাজিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা, মহরম অথবা জম্মাঠিনী পার্শ্বে পরস্পরে যোগদান করিয়া, মুসলমানের সভ্যগীর ও হিন্দুর বুড়ী মনসা ও শীতলার পূজা পরস্পরে অগ্রহস্ত করিয়া, এমন কি নামকরণে হিন্দু-মুসলমান এখা একতরফে গ্রহণ করিয়া ছই সম্প্রদায়ের সংজ্ঞ, আত্মরিক মিলন আনিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ছই-ই এক মাটি ও জলে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। বিপ-প্রকৃতি সমান হুয়ে তাহারিগকে রক্ষাবরণ করিয়াছে। ইতিহাস সমান ওদাদীসে তাহারিগকে জয়ে উৎসূহ ও পরাক্রমে ভ্রমোত্তম করিয়াছে। ভবিষ্যৎও নিরপেক্ষভাবে তাহারিগকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দিবে। মন ও শরীরের গঠন হিাবে মুসলমান ও হিন্দুর কোন পার্থক্যই নাই, কাণ অহুত হিন্দুভাতি সমুদায় হইতেই বৈশী ভাগ

মুসলমান ধর্মাত্তর গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিভাগ হইতে পৃথক হইয়াছে। এই কারণে যাহাতে রাষ্ট্রিক প্রতি-যোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের বিরোধ না বাড়ায়, তাহার জ্ঞত পার্থাগ্যসন্ধিহে মোলা বা পণ্ডিতের হুয়ে সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার ভার না দিয়া বিভাগের বিভাগের একটা উদার সার্বজনীন ধর্মবুদ্ধির অস্পৃষ্টলন করিতে হইবে। বিচ্ছার সময় মুসলমান প্রবীণ হিন্দুর চরণগুলি লইবে, ঈদের সময় হিন্দু মুসলমানের পার্শ্বে যোগদান করিয়া সকলকে প্রীতি-আশ্রিত করিবে। পরস্পরের আদব-কায়দা, বিবিনেধে পালন শুধু শিষ্টাচার-সম্মত নয়, ধর্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ না ঘুচাইতে পারিলে, পূর্ণবঙ্গ এবং মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বিংশ শতাব্দীতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার যৌর অন্তরায় হইবে। অতদিকে যে অহুত মুসলমান ও অবনত হিন্দুশ্রেণী সমুদায় বাংলায় ভিত্তা ও মানন, কুষ্টি ও আচারকে অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহারিগের সংস্কার ও উন্নতিসাধন শুধু হিন্দু বা মুসলমান সমাজের নহে, সমগ্র বাংলার গুরু দায়িত্ব।

### বাঙালী যুগনির্দেশিত, নূতন অবদানের অগ্রদূত

পলি-পড়া উর্দুর, তরল ভূমিতে বাঙালী জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালীর সভ্যতা সর্গাপেক্ষা পরিবর্তনশীল। বাংলার পূর্ক-ইতিহাসের সাক্ষী ইষ্টক-নির্মিত মন্দির, প্রাদান কত উঠিয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে, পলি-পড়া ভূমিতে অথবা নদীগর্ভে তাহার চিহ্নমাত্রের নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইসকল বাংলার সভ্যতাও অচল অটল নহে, গঙ্গার ঢেউয়ের মত তাহা নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যুগে যুগে চিন্তার নূতন ধারা, ধর্মের নূতন আদর্শ, শিরকলার নূতন রীতি, সমাজের নূতন নিয়ম ও বিভাগ গ্রহণ করিয়া বাঙালী চিরকালই ভারতের সভ্যতার পথ নির্দেশ করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায়



হুগ্রপ্রবাহ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর দান ও অবদানের কথা কোন বাঙালীর অবসিত আছে? বাঙালীর কি উচ্চ, কি নীচ জাতির রক্তে যে বিভিন্ন অর্গা-অনার্যের রক্তসংশ্রিত ঘটনাছে, তাহাও বাঙালীর ঐশি ও বিপ্লববাদের সহায়। এমন মিশ্রিত জাতি ভারতবর্ষে আর কোথায়? ছই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙালী ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যার বৌদ্ধভাব সঙ্গ্রহগ্রন্থ গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নতুন পথে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাঙালীর সার্বজনীন সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্ম উজ্জনীচ হিন্দুজাতি এবং হিন্দু-মুসলমানকে একস্থানে বাঁধিয়া নতুন সাম্যমূলক সমাজ-বিভাসের সূচনা করিয়াছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় শাক্ত ও ব্রহ্মী, তপনিনিগদিক ও ঈশাহী মায়ন মন্দিরকে বিখণ্ডিত করে এক নতুন সার্বজনীন ধর্মসাধনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, যাহা জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। রামমোহনের ধর্ম ও জাতি মিলনের বিরাট কল্পনার তুলনায় বর্তমান ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা কত হীন, কত জঘন্য, কত অ-বাঙালী! বাংলার বাহা লৌকিক ধর্মসাধন, বাহার গুরু শত শত আউল-বাউল আজও রক্তচক্ষুর ঘরে ঘরে গুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও যে মাহুগকে পরম পুঙ্খ বা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—“সবার উপরে মাহুগ বড়, তাহার উপরে নাই।” বিয়ের কোন ধর্মে মরমীর অমন রহতময় আত্মবিধানের সাংস দেখা যায় নাই। বাঙালীর ভবিষ্যতের সমতা এই একই প্রকার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও সমাজ-গঠনের সমতা। বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক হুবিধা-অসুবিধায় বিভূত না হইয়া, স্বল্প সময়ের ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্ব বিপণ্যিত না হইয়া, বাঙালী যদি হিরিচিহ্নিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আপনাদি ব্রহ্মপুণ্ডরীকায় সাধনের গুরু দায়িত্ব বরণ করিতে পারে, তবেই হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, উচ্চ ও নীচ জাতি মিলিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ও “নিভুই নব”।\*

বহু পূর্ববঙ্গের সম্মিলনে এমন একটি সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে, বাহাতে হুয়ত সৌভাগ্য-সমগ্র কলিকাতার ন্যায়িক সভ্যতার ওজ্জ্বল্য ও চটকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু বাহা শ্রম, সাহস ও হুত-কৌশলের সাহায্যে অধিকতর সতেজ, লোকগুড়ির সাহায্যে অধিকতর বলীয়ান এবং নতুন মৈত্রী স্থাপনের সাহায্যে অধিকতর গরীবানু হইবে, সন্দেহ নাই।

### বাঙালীর মানবিকতা

বাঙালীর এই নতুন নিমিষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি চাই। নতুন বাংলাদেশ ও নতুন বাঙালী সভ্যতা গড়িবার যুগে বাঙালী যদি অরুদর্শী হইয়া সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বড় করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার শতযুগের সাধনা বার্থ হইবে এবং এই শতাব্দীর অবদানের পূর্বেই হুজলা, হুফলা, শত-শামলা বাংলা ভূমিতে বাঙালীজাতি শিক্ষার ও দীক্ষার সব রকমে অ-বাঙালী হইবে। বাংলার আগামী যুগ সমাজ-সংস্কৃতির যুগ। জাতি, রুপ্তি ও ধর্ম সম্বন্ধের সূচনা না হইলে, একটা ব্যাপকতার জাতীয়তার অভাবে বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলন পদে পদে বার্থ ও বিপণ্যিত হইবে। এমন কি রাষ্ট্রই তখন সমাজের শান্তি ও সাধনার যোগে পরিপুষ্ট হইবে। অল্পমাত্রের সংখ্যা ও কর্মপরায়ণতা এবং উজ্জ্বলতর বুদ্ধি ও সামাজিকতার একযোগে চাই। তাহা যদি সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার ফলে না আসে, তবে আমাদিগকে কবীর, রামানন্দ ও চৈতন্যের অন্দোহনের মত কোন ভবিষ্যৎ অশ্রুশীলনের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির অভিশাপকে ভ্রমশূন্য না করিয়া আমরা অন্তরের সম্পদে মহত্তর বাঙালী সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে পারিব নতুন নবীত্বের, নতুন স্রষ্ট্রের মোহানায়। বাংলা দেশ ও তাহার দেবতা, ছই-ই যে জাতি মিলিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ও “নিভুই নব”।\*

\*উদয়ন-কাব্যাবলীর আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভ্যপতিত্ব সাহিত্য-সভায় লেখক কর্তৃক পাঠিত—উঃ, ১৮।

## শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

### শ্রীরামেন্দু দত্ত

ভুবনে ভিলায়ে শ্রাবণের বারি অবিরল ধারে বরিধায়,  
বধু, যুগ তোলা, শুধন বোলা, হুঠা কি আজি সন্ধ্যা যায় ?

প্রথম বেদিন ঘুঁকি-মাগতীর সৌভতে,  
ছদ্ম-মাগকে উঠিলে ফুটিয়া পোরবে,  
সে দিনে! এমন ধারার প্রাবন নামিল শ্রাবণ-নভাগার  
আজি সে আবার কত দিন পরে কিরিয়। এল এ বহুধার !

আজি স্বর স্বর করে বারি-ধারা মাঠে ধরণী, অধরে—  
তড়িতলোকের চকিত চমকে কে ও বেশ-বেশ সঘরে ?

বধু, বধু, হেরে মেঘের কানন কুঞ্জে  
তারি রূপরশি উথলে ঘুরার গুঞ্জে,  
রক্ত-বিবশ এমেছে বরষা বিধুরা ধরার অন্তরে,  
মেঘের মৃদতে দেল সেগে আজি আমাদের। জ্বদর সন্তরে !

গিয়াছে শরৎ, হেমন্ত, শীত, এল বসন্ত কাঙ্ক্ষনে,—  
বৈশাখে এল রক্ত তপন-রৌজ-রূপের জাল বনে !

মড় শত্রু ধরি' নব নব সাঙ্গে সন্ধ্যার !  
গেহ-মাগকে নিতা উঠেছে মুজরি !  
আজিকে আবার এসো বরিধার মল্ল জীবন-সিকনে,  
এসো কেতকীর কদম যুগীর মধু-মাগতীর ফুলবনে ॥

ওই শুন আজি বাজিছে গগনে মেঘের গভীর গুরু গান,  
হের ওই আজি নয়ন শরন আবির্ভাব আশ্রয়ান !  
স্বর স্বর ধারা কি কথা কিহিছে অবিরল—  
ঘরের ছায়েই ইঙ্গিত করে কালো জল !

এসো প্রিয়া মোর, এসো আনন্দে শ্রাবণ-ছন্দে গাহো গান,  
কানায় কানায় ভরিয়া উঠুক নিদ্রা-ভূমি মন-প্রাণ !





প্রশ্ন  
(১)

ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটান  
ভারতবর্ষের অন্তর্গত কি না?

(২)

হিন্দুসমাজে অশুভতার উৎপত্তি হ'ল কিরূপে?  
এর ঐতিহাসিক কারণ কি? জাতিভেদের সঙ্গে  
অশুভতার কোনো সম্পর্ক নেই কি? অশুভতা  
ভিরোহিত হ'লে জাতিভেদও কি ভিরোহিত হবে  
না? জাতিভেদ বলতে কি বোঝায়?

ত্রিপ্রবোধচন্দ্র সেন

(৩)

বাবা, কাকা, মামা, খুজী, পিলী প্রভৃতি যে সমস্ত  
স্বজন-বাচক শব্দ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে,  
সেগুলি কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই শব্দগুলি কোন্  
ভাষার অন্তর্গত এবং কোন্ সময় হইতে এগুলি  
প্রচলিত আছে?

শ্রীকৃষ্ণচিরা দেবী

(৪)

বাংলা দেশে কত সংখ্যক বাংলা, ইংরেজী ও  
অন্য ভাষার পত্রিকা আছে? মাসিক, বাৎসরিক,  
ত্রৈমাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক  
কত কত সংখ্যক ক'রে আছে? এবং প্রত্যেক

পত্রিকার নাম, ঠিকানা ও সম্পাদকের নাম কি?  
প্রত্যেক পত্রিকার বাৎসরিক মুলাই বা কত?

স্বামী বিমলানন্দ

(৫)

শ্রামানন্দ ঠাকুর কে? তিনি কোন্ সময়ের লোক?  
তাহার কোন জীবনচরিত আছে কি না? যদি  
থাকে, কোথায় পাওয়া যায় এবং কত দাম?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল

উত্তর

(১)

শ্রাবণ-সংখ্যা "উদয়ন"র প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ"র মূণ্ডার "আর্থিক  
উন্নতি" পত্রে বৈষ্ণব পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে  
তাহাই নিয়ে প্রদত্ত হইল—

Value — মূল্য

Surplus — উদ্বৃত্ত

Surplus Value — উদ্বৃত্ত-মূল্য

Relative Surplus Value — আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য

Absolute Surplus Value — নিরপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ

(২)

শ্রাবণ-সংখ্যা "উদয়ন"র দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—

স্বর্গীয় রামশরণ পাল মহাশয়ই কর্তৃত্বা সম্পাদকের

প্রবর্তক। এই সম্পাদ্য বিধায় করেন যে, কর্ত্তা এক,  
এবং যিনি সেই কর্ত্তাকে ভজনা করেন, তিনিই কর্ত্তা-  
ভজা। কথিত আছে, মহাত্মা আউলটাদের নিকট  
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই সম্পাদ্য গঠন  
করেন।

ইহাদের দ্বিষ্টস্থান ঘোষপাড়ায়। ইহার পাল  
উপাধিবাহী এবং সপ্লেপ-বংশীয়। ইহাদের বহু  
ব্রাহ্মণ-শিখা আছেন। ঘোষপাড়ায় ইহাদের স্থায়ী  
বাসস্থান। ঠাকুরদালান-সমর্থিত সুবৃহৎ বিত্তল আটালিকা।  
এই বাড়ীকে লোকে ঠাকুর-বাড়ী বলে, এবং ইহাটিকে  
গুরু-গোষ্ঠী বা গুরু-বংশ বলে। ইহাদের উপনয়ন-  
সম্বারের শিখা, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল, সকল জাতির  
মধ্যেই আছে। ইহার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত  
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ

(৩)

শ্রাবণ-সংখ্যা "উদয়ন"র চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—

নাম

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির ঔরসে এবং অম্বর-  
রাজ বৃষপার্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাদেবীর গর্ভে জন্ম, অম্বর  
এবং পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই  
পিতার সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং তাহার বংশ কোঁরব,  
পাঞ্চাল এবং ভারত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিস্তার  
করিয়া আর্গাবর্তের "মধ্যদেশে" (প্রধানতঃ পশ্চিমে  
সরস্বতীর তীর হইতে পূর্বদিকে বর্মনার তীর পর্যন্ত  
বিস্তৃত ভূভাগে) রাজ্য করিতে থাকেন। পুরু  
জ্যায়ান্ন রাজ্য অম্বর বংশধরগণ প্রাচ্যের পূর্বদিকবর্তী  
স্থানের অধিরাজ্য হইয়াছিলেন। অম্বর বংশ পুরু  
অনন্তর রাজ্য হস্তগার 'বলি' নামক এক সর্বমুখ  
পুত্র জন্মে এবং তাহার রাজধানী গঙ্গানদীর তীরবর্তী  
(আধুনিক ভাগলপুর নামে পরিচিত?) কোনও  
স্থানে ছিল। সেই বলি মহারাজের (প্রজাদের  
গোষ্ঠ অম্বররাজ বলির নহে) মহিষী সুদেহা দেবীর  
গর্ভে এবং অস্ত্রিা কবির পৌত্র দীর্ঘতম সোতম  
কবির স্পর্শের প্রভাবে অম্বর, বঙ্গ, কলিঙ্গ, হুজ এবং  
পুণ্ড্র নামক অতি তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মে এবং  
উত্তরকালে তাহাদের নামে যথাক্রমে অম্বর, বঙ্গ,  
কলিঙ্গ, হুজ এবং পুণ্ড্র পাটল দেশের নামকরণ  
হয়। ভারতখণ্ডের আধুনিক মানচিত্রে অম্বরদেশের

গুরু-বংশীয়েরা সদাচারী এবং মস্ত, মাগ ও  
মাদক-দ্রব্যাদি সেবন করেন না। গুরুগণ ধর্ম্মোচ্যনা  
করেন এবং শুচি ভাবেই জীবন যাপন করেন।  
ঠাকুর-বাড়ীর সরিকটব 'হিমসাগর' নামক পুষ্করিণীতে  
ধানান্তে তাহার শিষ্যবর্গকে দীক্ষাদান করেন।  
সেই সময়ে (১) জীবিত কায়িক পাপ, (২) চতুর্ষিধ  
বাঘের পাপ ও (৩) জীবিত মানসিক পাপ হইতে  
নিজেকে অতি সাবধানে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া  
তাঁহারা শিষ্যবর্গকে সদাচারী ও সংযমী হইতে অহুতা  
করেন। কথিত আছে, "সংযমী না হইলে কর্ত্তাভজা  
হওয়া যায় না।"

রামশরণ পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অতিশয়  
পতিভক্ত, ধর্ম্মশীলা ও নিষ্ঠাবর্তী রমণী ছিলেন।  
শিষ্যগণ তাঁহাকে "সতীমা" বলিতেন, এবং তাঁহারই  
নামাহুগারে ঘোষপাড়াকে লোকে অস্তাবধি "সতীমার  
স্থান" বলিয়া থাকে। রামশরণের তিরোভাবের পর  
সতীমা একা গদিত্তে বসিতেন, এবং শিষ্যগণকে  
যথোপযুক্ত উপদেশাদি প্রদান করিতেন।

ইহাদের লক্ষণিক শিখা আছেন। দোলাবার



অবস্থান ভাগলপুর বিভাগে, বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সী এবং ঢাকা বিভাগে, কলিকতার উত্তর সরকার এবং দক্ষিণ ওড়িশায়, স্বজের রাজ্যদেশ এবং পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গে, (মতান্তরে দক্ষিণ-কোশল বা ছত্রিশগড় বিভাগে) নির্দেশ করা যাইতে পারে। মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪ তম অধ্যায় (বোধ্যাই) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৭-১৮শ অধ্যায়, ক্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ৯ম স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায় (বোধ্যাই), মৎসপুরাণের ৪৮শ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ ৯৯ অধ্যায় (বঙ্গবাসী) এবং অজ্ঞাত পুরাণেও উক্ত নামকরণ পাওয়া যাইবে। হরিবংশে (ক্রমবশতঃ?) এই বংশকে পুন্ড্র বংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলির অঙ্গবদ্বাদি পঞ্চ পুত্রকে ‘ক্ষেত্রজ’ পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে (হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, ৩১শ অধ্যায়)।

### প্রাচীনত্ব

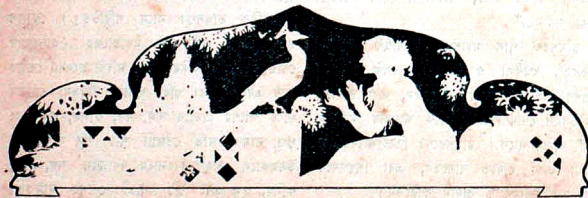
এই অঙ্গবদ্বাদি দেশ যে কত প্রাচীন, তাহা ঠিক বলিবার উপায় নাই; কিন্তু, ‘বহু প্রাচীন’ বলা যাইতে পারে। দীর্ঘতম ঋষি স্বয়ং এবং তাঁহার কাকীবানু প্রভৃতি পুত্র বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। অঙ্গরাজের

অন্তন পঞ্চম পুত্রের সোমপাদ দশরথ নামক অঙ্গরাজ অযোধ্যার রাজা (শ্রীরামচন্দ্রের পিতা) দশরথের সমনাম্য মিত্র এবং সমসাময়িক ছিলেন। সেই সোমপাদের অন্তন জ্যোত্স্ন বা চতুর্দশ পুত্রকে মহারাজ অমিরথের জন্ম হয় এবং তিনিই মহাভারত-যুদ্ধের মহাবীর কর্ণের পালক-পিতা ছিলেন। অঙ্গ-বদ্বাদি হইতে কর্ণ প্রায় বংশিত পুত্রের অবন্তন। হিন্দুসম্মতে ৩১১১ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটয়া-ছিল এবং অবিকাংশ ইউরোপীয় মতে উহা খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দের ঘটনা,—কিন্তু কেহই ঐ যুদ্ধকে খৃষ্টপূর্ব একসহস্রাব্দের অপেক্ষা নূতনতর বলিতে পারেন নাই।

### রামায়ণ এবং মহাভারতে উল্লেখ

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ডের ১০ম সর্গে (বঙ্গবাসী) এবং মহাভারতের আদিপর্বের ১০৪, ১৮৬ অধ্যায়। সভাপর্বের ৪, ১৪, ৩০, ৩৪ অধ্যায়ে, বনপর্বের ৫১ অধ্যায়ে, ভীষ্মপর্বের ৯ম অধ্যায়ে এবং আরও নানা স্থানে, বহু মহাপুরাণগ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে।

### ক্রীমখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ



## চক্রশেমি

### ক্রীসতীপতি বিজ্ঞানভূষণ

(১)

আজ আমার সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে—যেদিন বাবা-মা-পরিবারে তাবনা হইতে নিজেকে নিশ্চল করিয়া একটা স্থির নিবাসে কেলিয়াছিলাম। তারপর মাস দুই যে কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা এতদিন পরে ঠিক বলিতে পারি না; তবে যেদিন চাহিয়া দেখিবার মত মনের অবস্থা কিরিয়া পাইলাম, তখন দেখিলাম, আমার বলিতে কিছুই নাই—নাই বাব্বের ঢাকা, নাই সোকান, নাই শ্রীর গাভরা গহনা; মাথা শুষ্কিয়া থাকিবার বাস্তবানুগ নাই, এমন কি, এমন একটু জমীও নাই—যেখানে নিরুপদ্রবে বসিয়া পদধিবারে অন্যহারে মরিতে পারি।

কিন্তু কিছুই না থাকিলেও এমন একটা জিনিষ আছে, বাহাকে ‘নাই’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সেটাকে ধরস করিতে হইলে নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে হয়; বিশেষ স্টো যদি মাত্র নিজেরই হয়, তাহা হইলেও নাহয় উপেক্ষা করা চলে; কারণ, সে-উপেক্ষার বাহা অবশ্রুতাবী হল, তাহাই ছিল তখন আমার একমাত্র কাম্য। কিন্তু শ্রী—বিশেষ ছেলেরের সখেদে ‘ত’ সে-বাবুতা চলে না; তাহারের উদরে কিছু মিটেই হইবে—তা সে চুরি করিয়াই হউক, আর ডাকাতি করিয়াই হউক। তাই কাহাকেও মূর খোঁচাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও বাহির হইতে হইল।

যখন ‘হুসময় ছিল, তখন অনেককেই অনেক কিছু দিয়াছি; হুতরাং তাহারাও যে আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে, সে-ধির নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে-প্রত্যাশকার গ্রহণ না করাই উচিত; তাই যে-সকল বন্ধ-বান্ধবের সঙ্গে ঢাকা-কলিকতার সম্পর্ক করি নাই, তাহাদেরই একজনের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যে আমার সব-রকমের

বন্ধই উপস্থিত থাকিতে পারে, তাহা পূর্বে ভাবি নাই। বাহির হইতে আমার নাম-সম্প্রদায় একটা কথা কানে বাইতেই চাহিয়া দেখি, আমার সব-শ্রেণীর বন্ধই সেখানে উপস্থিত। তাহারা যে আমাকে দেখিয়া কেলিয়াছে, তাহা তাহাদের হঠাৎ নীরবতাই আমাকে বুঝাইয়া দিল; কিন্তু তখন আর ফেরা চলে না, কাজেই ধীরে ধীরে চুকিয়া পড়িয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

বন্ধর দল মহাসম্মানের আমার সন্মুখীন করিল—ঠিক যেন আমি সেই পূর্বের বতীশই আছি। আমারও মনে হইল, হয় ‘ত’ বা আমি সেই বকমই আছি। চা আদিল, সকলের সঙ্গে আমিও এক পেয়লা পাইলাম। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ আলোচনা চলিল; কিন্তু আমার সখকে একটা কথাও নয়—যেন আমার কিছুই হয় নাই।

এই বৈঠকখানার অবিকারী বন্ধুর নাম ধীরেন; তাহার কাছেই আমি আনিয়াছি; কিন্তু কোন কথা বলিবার সুযোগ ঘটতেছে না; সবাই গল্পে মগ্ন—উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না; তবে মহা-প্রশ্নেরও যখন নির্দিষ্ট সীমা আছে, তখন এই গল্পেরও যে সীমা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি! কিন্তু সে-সীমা যখন আদিল, তখন বিগ্রহের অতীত—স্মার তাড়নায় ছেলে-মেয়েদের যে কি অবস্থা হইতেছে, তাহা কল্পনা করিয়া আমার অন্তরা আশিহরিয়া উঠিতেছে।

সকলে উঠিয়া পড়িল। আমি উঠিলাম না দেখিয়া তাহারা বলিল, “এদে, বাবে না!”

“তোমরা এগোও, আমি ধীরেনের সঙ্গে একটা কথা বলে খাচ্ছি।” তাহারা “ও” বলিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের “ও” কথাটা আমার কানে যেন বিদ্ধপের মত শুনাইল, কিন্তু সেটা বোধহয় আমার



ক্রম! ধীরেনও উঠিয়া পাড়াইয়াছিল; সে সেই অবস্থাতেই হাই তুলিয়া রিটে ওয়ারের দিকে চোক ফুলাইয়া বলিল, “কি বলবে বল হে শীর্ণগিরি। বেলা হয়ে গেছে, পোষাওটা বোধহয় জুড়িয়ে গেল।”

এতক্ষণ জুড়ায় নাই, এখন জুড়াইল! তাহার ভঙ্গী দেখিয়া অতিবড় নিলক্ষেত্রও বোধহয় কোনো কিছু বলিতে প্রস্তুতি হয় না; কিন্তু আমি নাকি নিরুপায়, তাই কোনো মতে বলিয়া কেলিলাম, “ভাই, মোটা কতক টাকা দিতে পার, — আমি শীর্ণগিরিই দিয়ে দেবো।”

“টাকা! বলে, টাকার জন্তে সকালবেলা ত্রিমতীর সঙ্গে একটা বচসাই হয়ে গেল। কথটা কি জানো—”

জানিবার কিছুমাত্র প্রস্তুতি বা স্কৌহল্য ছিল না; কিন্তু গরজ বড় বালাই, তাই জিজ্ঞাস্য নেড়ে তাহার দিকে চাহিলাম।

সে বলিয়া বাইতে লাগিল, “ব্যাপারটা হয়েছে এই, ত্রিমতীর সহকের মেয়ের বিয়ে পরত। তাঁর ইচ্ছে, একছড়া নেকলেশ আর বেনারসী শাড়ী একনামা দেন—প্রায় তিনশো বানির বাজা। প্রতিবার করাতেই নারীর বা’ শ্রেষ্ঠ অন্ন—তাই বর্ণা। শেষে আড়াইশো টাকা গুণে দিয়ে তবেই মিলন। নইলে ছুটির দিনটা মাটি হয়েছিল আর কি!”

“তা’ কি করবে বল, সন্ধ্যারে থাকতে হ’লে ও সব ত’ আছেই। আমি ত’ শো-টো চাইনে, মার মোটা পায়েক।”

“তবে আর তোকে বলবুম কি, কাল বাজার করব, এমন একটি পরমাণু নেই—তার গুণের ত্রিমতীর এখনো পঞ্চাশের দাবী। নইলে তুই এসেছিস,— এই সামান্য ব্যাপার—সে কি আর বলতে হয়। দেখ, তুই এক কাজ কর।”

আশ্রিত মুখে ধীরেনের দিকে চাহিলাম। সে বলিল, “দেখ, তুই একবার হরির কাছে যা, সে একশু দেবে। আমার থাকলে কি আর

‘না’ বলবুম। আচ্ছা ভাই, চলবুম, বড় বেলা হয়ে গেল।”

উদ্দেশ-স্বভা বর্ণন করিয়া ধীরেন অন্যের প্রবেশ করিল।

( ২ )

সেই ধীরেন! আমরা ছেলেবেলায় একই স্থলে একই রাশে পড়িতাম; কাপড়জামা একই রকমের না হইলে কেহই পরিচিন্ত না। যাহা খাওয়া আগে হইত, সেই আসিয়া অপরের বাজিতে উপস্থিত হইত, তারপর একজ স্থল-খাওয়া। সর্বদশই একরূপ অবস্থান, মাত্র রাত্রিতে আমরা গৃহক হইতাম; তবে মধ্যে মধ্যে একরূপ রাত্রিবাসও যে না খটিত, তাহাও নহে। একবার আমরা দুইজনে ছ’ বেঘিতে গিয়াছিলাম; কয়জন দর্শক নিজের মতো তর্ক করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তোমরা কি দুই ভাই?” আমাদের বেশের সাবুঞ্জই যে এই তর্কের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ধীরেন! সে আত্ম অরানবদনে পোলাও জুড়াইয়া বাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—একবার জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকও বোধ করিল না যে, পাচ টাকার এত কি রকমার!

এখন উপায়? উপায় আর কি, পিণ্ডল-কাঁসার বাসন এখনও যা’ অবশিষ্ট আছে, তাহাই বিক্রয় কর। অস্থতাপ হইল, কেন ভগবান এই বুদ্ধিটুকু পূর্বে দেন নাই, তাহা হইলে এতবেলা পর্য্যন্ত ছেলেরা অন্যাহারে থাকিত না। আর এত বড় অন্তর্গতনা ভোগ করিতে হইত না। এখন ত’ তাহায়েই হুঁচকার দিন চলিবে, না-হয় কালাপাতেই বাইবে, তবু ত’ তাহার। বাইরা বাঁচিবে। কিন্তু তারপর? তারপর ভগবান আছেন।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি, রাত্তার সাফাৎ পশুপত্তির সঙ্গে। সে জ্ঞাতিতে স্বজ্বর, ছেলেবেলায় এক রাশে পড়িয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল,

“কোথায় যাওয়া হইছিল?” ছেলেবেলায় আমরা পরস্পর ‘তুই-তোকারি’ করিয়া কথা কহিতাম, কিশোর বয়সে আমরা সেই ‘তুই-ই’ বলিতাম, কিন্তু পশুপত্তি বলিত ‘তুমি’; এখন যৌবনে আমরা বলি ‘তুমি’, সে দরিয়াছে প্রথম পুরুষ। না বলিতে পারে ‘তুমি’, আর না বলিতে পারে ‘আপনি’, কাজেই তাহাকে এই পথ ধরিতে হইয়াছে। পশুপত্তি ছাপাখানার চাকরি করে, রোজ নগদ পায় পাঁচ পিকা, তাহাতেই কোনো রকমে চলে। আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিলাম, “একবার ধীরেনের বাড়ী।”

পশুপত্তি বলিল, “সেখানকার খবর ভাল ত?” সেখানকার অর্থে যে ধীরেনের বাড়ী—তাহা বৃষ্টিতে কষ্ট হইল না, তাই বলিলাম, “হাঁ, ভাল।” “এতরকম শুকনো দেখাচ্ছে যে, বাড়ীর খবর সব ভাল?”

“হ্যাঁ” বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম; কেন না, আমার কণ্ঠস্বর আমার কানেই যেন বড় করুণ শুনাইতেছিল।

পশুপত্তি কিন্তু সঙ্গ ছাড়িল না, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে কি একটা কথা যেন বলিতে চায়, তাহার ভাব দেখিয়া আমি বলিলাম, “তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?”

সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হাঁ।” তখন আমার মানসিক অবস্থা যে কি, তাহা বোধহয় না বলিলেও চলে, তার উপর রাত্তার এ আবার কি উৎপাত! একটু কক্ষস্থরে বলিলাম, “কি বলবে, টপটপ বল, আমি একটু ব্যস্ত আছি।” সে সঙ্কুচিত হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, “এই পাচটা টাকা—”

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; কিন্তু পরক্ষণেই আমার দুই চোখ ছাপাইয়া বে গুলটা বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে ধীরেনের ব্যবহারের মালিঙ্গ যেন নিশ্চয় হইয়া উঠিয়া গেল। আমি সেই

বালাকালের মতই পশুপত্তিকে দুই হাতে জুড়াইয়া ধরিলাম। প্রকৃতিত্ব হইয়া—আমার অভাবের কথা সে জানিল কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই—সে একটা শুভদিন দেখাইবার জন্ত আমার বাড়ীতে বাদ, সেখানে সে আমার ক্ষুধিত পুত্রের জন্মনের সাধ্যময় আমার দ্বার মুখে শুনিতে পায় যে, আমি টাকার জন্ত ধীরেনের কাছে আসিয়াছি; সে ঠিক জানিত যে, ধীরেন টাকা দিবে না; কেন না, সে ধীরেনের কাছে ছই এক দিন পূর্বে সে সমালোচনা শুনিয়াছে, তাহাতে এছাড়া আর কিছু মনে হওয়া সম্ভব নহে। তাই সে পাচটা টাকা লইয়াই ধীরেনের বৈঠকখানার পাশেই অপেক্ষা করিতেছিল, সকল কথাবাড়ীই সে শুনিয়াছে। সন্ধ্যারের সন্ধ্যা পশ্চিমা দিয়া আসিয়া আমার সমুখে পাড়াইয়াছে।

আমি ধরা-পলায় বলিলাম, “তোর চলবে কি?” তার অবস্থা জানিতাম বলিয়াই এই প্রশ্ন।

সে বলিল, “কাল সাড়ে সাত টাকা পেয়েছি, দেড় টাকা খরচ হ’লে পেতে, হাতে আছে এক টাকা, তাতেই ছ’এক দিন চলে যাবে। আমাদের নতুন ম্যানেজার যিনি হয়েছেন, তিনি খুব ভাল লোক, দরকার হ’লে সন্ধ্যারের মধ্যেও কিছু দেন।”

বলিয়া আমাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবদর না দিয়া পশুপত্তি সরিয়া পড়িল। মনে হইল, কোথায় উক্ত শিক্তি ধীরেন, আর কোথায় অশিক্তি পশুপত্তি! শিক্ষার মাপকাঠি সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিল।

( ৩ )

পরদিন এক রকমে কাটা গেল। ভাষিয়াছিলাম, দুই টাকা রাখিয়া পশুপত্তিকে তিন টাকা ফিরাইয়া দিব; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা বলিয়া উঠিল না। কেন বলিয়া উঠিল না, তাহা আমার মত অবস্থার না পড়িলে কেহ বৃষ্টিতে পারিবে না।

পূর্বে ভাষিয়াছিলাম, যে-সব বন্ধ-বান্ধবের সঙ্গে



অর্থের সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না; কিন্তু সে-ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি না। একে একে সকলের কাছেই চাহিলাম; এমন কি অসময়ে তাহাদের যে সাহায্য করিয়াছিলাম, সে-কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে ক্রটি করিলাম না। সকলেই সম্মত হইয়াছিলেন, চুপ্ প্রকাশ—অস্বাভিত উপদেশ দিতেও ভুল করিব না; কিন্তু আসল কথাই কেহই কান দিল না, অজ্ঞাত সকলেরই প্রায় এক—সেই মালী, “আহা-হা, হুই একদিন আগে বলতে হয় ভাই, তা’ হ’লে মুমিকে না দিয়েও সিভাম।” কেহ বা বলিল, “বলতে ভাই, লজ্জার মাথা কাটা যাচ্ছে, হাতে একটি পয়সাও নেই—নইলে তুমি এসেছ” ইত্যাদি। কেহ বলিল, “একটু আগে যদি আসতে তা’ হ’লে যে ক’রে হোক কিছু দিতাম, আমার অবস্থা জান ত’।” একটি বন্ধু আকগান ব্যাক অর্থাৎ কাবুলীওয়ালার দেখাইয়া দিতে ইতস্তত করিল না। অথচ আশ্চর্য্য এই, যিনি এই উপদেশ-স্রাব বটম করিলেন, একদিন তিনিই কাবুলীওয়ালার যে কি চাচ্ছিল তাহা হাতে হাতে মালুম করিয়াছিলেন; শেষ বেরিন বাজারের মধ্যে হাত হইতে গামছা ছিনাইয়া লইয়া কাবুলীওয়ালার তাহার কণ্ঠশোভা বন্ধন করিয়াছিল, সেদিন এই আমিই তাহাকে ঐ ক্রীতিসম্পন্ন হইতে রক্ষা করি।

বন্ধুর প্রতি সেইদিন বিরক্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে একদিন তাহার সেই পরামর্শই গ্রহণ করিতে হইল—এক কাবুলীওয়ালার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার লইলাম, অর্থাৎ এক মাসের স্বদ ৪ টাকা এবং ‘সিবিই’ স্বরূপ ৩ টাকা, একুনে ১ টাকা বাদ দিয়া ৪০ টাকা লইলাম। টাকা লইবার সময় ভাগিলাম, আমি ত’ ব্যবসায়ের মানুষ, এই টাকাটা বাটাইয়া যে কোন রকমে হুইক নিশ্চয়ই কিছু আয় করিতে পারিব—চেষ্টাও যে করি নাই, তাহাও নয়। কিন্তু সব চেটাই বার্থ হইয়া গেল। লাভের মধ্যে কিছুদিন নিবি-বাসে সঙ্গার চলিল এবং কাবুলীওয়ালার স্বদ বাড়িল।

সকলে কাবুলীওয়ালার নিন্দা করে; আমি যে তাদের প্রশংসা করি, তাহা নহে; কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, যখন ‘আখীর-স্বজন’, স্বদ-বান্দর—কাহারও কাছে টাকা পাওয়া যায় না—বা কেহ কোনরূপ সাহায্য করে না, অথচ টাকার জ্ঞান শিখারায় হইতে হয়, তখন কাবুলীওয়ালার সত্য বন্ধ আর কেহ নাই। যে কেহ ভাবিলে যে, এই লোকটী কাবুলীর কাছে বেনা করিয়াছে, সেই দগার নাসিকা সূক্ষ্মিত করিলে; কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলে না যে, কত নিরুপায় হইয়া সে এই লজ্জাকর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি প্রতি মাসে নিরমিত সময়ে একবার তাহাদের হাতে হাত দেওয়া যায় অর্থাৎ যখন সময়ে স্বদ দিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে যে তোমাকে চিনে, এমন ভাবও তাহার আভারে ইহিতে উপলব্ধি হইবে না।

আমার পূজাপাদ মালুম মহাশয় ধনবান। তিনি ধনবান হইবার পূর্বে আমাদের সহিত তাহার কি সম্পর্ক ছিল, সে-কথা বলিবার আবশ্যক নাই—তুলিয়া লাভও নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি তাহার কাছে একশত টাকা চাই—দানস্বরূপ নহে, ধার চাই। আমার জীবনে তাহার কাছে কিছু চাওয়া এই এখন এবং তাহার পক্ষে এই সামান্য টাকাটা দেওয়াও কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। তাহার নিকট হইতে যেদিন সর্বদা পাইলাম, তাহার টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে না, সেই দৈন্য জগতের উপর দগার কাবুলীর শরণাপন্ন হই।

এই কাবুলীর সেনা পরিপোষ্য করিয়া দেন, এক উদারচরিত্র মহাপুরুষ। তাহার কথন মনে হইতই শির আপনা হইতেই নত হইয়া যায়। ব্যবসায়-বহেই ইহার সহিত পূর্বে পরিচয় ছিল; তিনি জানিতে পারিয়াই তাহার এক কণ্ঠস্বরী দ্বারা কাবুলীকে ডাকাইয়া স্বদ সমেত টাকাটা পরিপোষ্য করিয়া আমার—কেবল আমার কেন—আমার প্রী-পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন আমি

সে-ধন পরিপোষ্য করিতে পারি, কিন্তু ধন ত’ শুধু ঐ সামান্য টাকাতাই নয়, কৃতজ্ঞতার ধন শোধ করিব কি উপায়ে?

কাবুলীওয়ালার সেনা শোধ হইল বটে, কিন্তু আমার কোনো উপায় দেখিলাম না। এদিকে বাড়ীটি যিনি নীলামে কিনিয়াছিলেন, তিনি নোটাশ দিয়াছেন; হুতরাং এইবার প্রকাশ্যে রাজপন ছাড়া পাড়াইবার আর স্থান নাই।

(৪)

আখীর, পরিচিত,—সকলের কাছেই আমি টাকার চেষ্টা করিয়াছি। কেবল একটি মাত্র আখীর ছিল, যাহাকে টাকার কথা বলি নাই। এইজন্যই কেনন একটি দরল্লাত দেখা দিত; মনে হইত, এও যদি ‘না’ বলে ত’ সমস্ত পৃথিবীর উপর বিধি হইয়া পড়িবে, কেন না, তাহাকে ভালোবাসি—ছেট ভায়ের মতই ভালোবাসি। ভাবিতাম, তার কাছে ত’ কিছুই গোপন নাই—সে ত’ সবই জানে, যদি কর্তব্য মনে করে ত’ উপায়চক্র হইয়াই সাহায্য করিবে। সাহায্য যে সে করে নাই তাহা নহে, তবে নগদ টাকার সাহায্য, সে করে নাই বা করা আবশ্যক বোধ করে নাই—আমিও কখনো তাহার কাছে চাহি নাই।

ধনবানের সকলের চাইতে শক্ত তাহার—বাহার। গরীব হইয়াও ধনবান আখীরের সম্বন্ধে সর্বদা চলা-দেফা করে। প্রাণ ধরিয়া তাহাদের না করিতে পারা যায় সাহায্য—না করিতে পারা যায় প্রথমমুখে সম্ভাব্য। সকল মানুষের বিবেক বলিয়া একটি পদার্থ আছে, তাহাকে কৈশিক্য না দিয়া উপায় নাই; না দিলে তাহার তড়না অনিবার্য্য। চোর, ডাকাত, পুনীও বিবেকের কাছে সাহায্য পাঠে। এই সব ধর্মীদের মনোভাব এই যে, গরীব আখীরের দূর হইতেই আখীরতা করুক; কেন না, নিকটে আসিলেই বিবেকের তাড়নায় অন্ধ হইতে হয়। এই অবস্থা-বিপর্য্যে আর একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

যে, যে-সব গরীব বন্ধুবান্ধব পূর্বে আমাকে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইত, তাহাদের মধ্যে ভাগ্যরূপে বাহার্য্য দনী হইয়াছে, তাহার আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হয়, অন্ততঃ প্রীতিলাভ যে করে না, তাহা তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়।

আমার বেশ মনে আছে, এই সময় এক অতি নিকট আখীরের কভার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া ট্যানি করিয়া সঙ্গীক তাহার বাড়িতে গাই; পরের পয়সায় ট্যানি চড়িবার লোভে ইহা করি নাই, করিয়াছিলাম—আমার প্রীকে ‘প্রী-আচার’ করিতে হইবে বলিয়া অস্বস্তি হইয়াছিল, অথচ নানা চেষ্টায় লৌকিকতার টাকা সঙ্গ্রহ করিতে বিবাহের লগ্ন নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। সেই আখীরটি ধারদেশে পাড়াইয়া নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ট্যানি হইতে নামিতেন—নামিচ্ছেই প্রথমমুখে অভ্যর্থনার ধুম কি! আর আমাকে সঙ্গীক ট্যানি হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার মুখভাব যে-আকার ধারণ করিল, তাহাকে প্রায় ত’ বলাই যায় না, অপূর্ণ বলিলেও ভুল হয় না। ভাবিলাম, কি বোঝানিই করিয়াছি! দেখানে ইটিয়া—না হয় রিয়া করিয়া আসা উচিত ছিল, সেইখানে ট্যানি! ইচ্ছা হইলে, ভাড়াটা দিলেই দিয়া ফেলি; কিন্তু সকলের সম্বন্ধে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করিয়া নিরন্ত হইলাম। ভাড়া তিনি অস্বস্তি দিলেন, কিন্তু কি অপ্রসঙ্গিক!

সেদিন পুরাতন কাগজপত্র খাটিতে একখানি হ্যাণ্ডনোট আমার চোখে পড়িল—উহা আমাকেই দেওয়া হইয়াছে। হ্যাণ্ডনোট আসিল কোথা হইতে? আমি ত’ যাহাকে টাকা দিয়াছি, তখনই মনে মনে দান হিসাবেই দিয়াছি, ফেরত পাইবার প্রত্যাশা কখনও করি নাই; অবশ্য যে দিয়াছে তাহা যে লই নাই, তাহাও নহে; তবে স্ব স্ব কখনও এক পরস্পর লই নাই। তাই এই হ্যাণ্ডনোট দেখিয়া বস্তুতে পারিলাম না, কি করিয়া এটা সম্ভব



হইল। তারিখ দেবীয়া বুলিলাম, ইহা এখনও তামারি হয় নাই—প্রায় এক মাস সময় আছে। লোকটাও পরিচিত। পার্থক্যী গ্রামের। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, ঠিক হইয়াছে, লোকটাকে যখন টাকা দিই, তখন সে বোর করিয়া হ্যাণ্ডনোটখানা গছাইয়া দিয়াছিল। ভাবিলাম, ইহা ভদ্রবানের দান।

তখনও না-কি আমার মাহুয় চিনিতে বাকি ছিল, তাই ভাবিলাম, বোর করিয়া যে হ্যাণ্ডনোট দিয়ায়া দেয়, সে যে টাকা দিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কাজেই বিরাট আশা লইয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। প্রথমে হ্যাণ্ডনোটের কথা না বলিয়া শুধু টাকাই চাহিলাম। সে 'ত' আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "আমি! টাকা দার করেছি তোমার কাছে!"

স্বস্তিত হইলাম। বলিলাম, "হ্যাণ্ডনোট আছে।" লোকটা হাসিয়া বলিল, "ধাকতে পারে, কিন্তু তামারি হ'লে গেছে।"

"না, এখনও এক মাস সময় আছে।" বিজপের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "ও-সব ধারাবাহী আমার কাছে চলবে না, দ'রে পড়।"

রাগ হইল। যদি সে এসময়েও বলিত, "আমার সামর্থ্য নাই, দিতে পারিব না", তাহা হইলে বোধ হয় এক-অবস্থাতেও আমি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়িয়া দেলিয়া চলিয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু তখন না-কি আত্মজন্দের ব্যবহারে আমার অন্তর অলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহার এই নির্লজ্জ ব্যবহার সহ্য হইল না। বলিলাম, "দেখ বিজেন, যদি স-মানে টাকা না দাও, তা' হ'লে স্থির জেনো, নালিশ ক'রে টাকা আদায় করব।"

বিজেন ছুই পাটা দস্ত বিকসিত করিয়া বলিল, "নালিশ ত' খেবর কথায় হয় না—এই চাই।" বলিয়া ছুইটা আসনের এক বকম ভঙ্গী দেখাইল।

"নিজে না পারি কাবলীওয়ালকে হ্যাণ্ডনোটখানা বেচব—প্রদে আসলে প্রায় সত্তর টাকা হয়ছে,

যেহলে অস্তুত ত্রিশটে টাকাও ত' পাবে। তোমাকে জন্ম করবই, এটা তুমি জেনে রাখো।"

বিজেনের স্বর বদলাইয়া গেল। মিনতির স্বরে বলিল, "তা পাঠান বেটাকে যে টাকাটা না খাইয়ে আমাকে দাও না কেন। আমিই না-হয় ঐ টাকাটা ধারখোর ক'রে যেনন ক'রে পারি দোবো 'খন।"

"এ-কথা এখন আর যাতে না, আগে বলো চল।"

ছুই হাত কলগাইতে কলগাইতে সে বলিল, "ভাই, ছাপোষা মাহুয়, একটু দয়া কর। নেই ব'লেই না এসব কথা বলছিলুম।"

দয়া হইল। বলিলাম, "বেশ, তাই নিয়ে এস।"

"একনি পয়সা পাবে। এক মাস সময় দাও।"

"ও-সব চালাকি চলবে না। আজ না দিতে পার, কাল দিতেই হবে। না দাও—আমাকে ব্যাং হ'লেই অপরকে বেচতে হবে।"

একটু ভাবিয়া বিজেন বলিল, "বেশ, তাই দেবো—তুমি এখন সময় দেবেই না।"

"কাল সকালে আসব" বলিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিলাম।

সে-রাতিটা উপবাসে কাটিল, কেবল গৃহিণী ছেলেনের কি উপায়ে খাওয়াইয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তিনদিন পরে বাড়ী ছাড়িতে হইবে, কোথায় যে আশ্রয় পাইব, তাহা অন্তর্ভাগ্যমীই জানেন। অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিছুতেই একটা চাকরী জুটাইতে পারি নাই। ক্রমেই জীবনে বিকার জন্মাইতেছে। যত পরিচিত লোককে জানি—বেশ নিম্নপু ভাবে ভাবিয়া দেখিলাম, আমার মত হুজুয়া দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের ভিতর যে হুজু-নাই—তাহা নহে; কিন্তু আমার মত! নিজের অক্ষমতার নিজের উপর নিজেরই দ্বন্দ্ব হইতেছিল, অপরদের যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া শিবিরিয়া উঠিলাম। স্থির করিলাম, এ হুজু-জীবনের ভার নানাইব।

( ৫ )

পরদিন সকালেই বিজেনের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। অনেক ক্ষণভ্রমতির পর যখন গ্রিন টাকার পরিবর্তে পিচিন টাকা মাজ হাতে পাইলাম, তখন মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিমাকাশে সবেমাত্র দ্বৈলিত আরম্ভ করিয়াছেন। একজন টাকা আদায়ের ব্যাপারেই মন নিবিষ্ট ছিল, কাজেই বাড়ীর কথা আর সেখানে স্থান পায় নাই; টাকা হাতে পাইতেই মন বাড়ীর জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাড়াহুড়ি আর সেখানে স্থান পায় নাই; তখন জুয়ায় তৃষ্ণায় হুজু-বনায় মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, এই স্বপ্নময় তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়, বৃষ্টি বা ধারণা করাও কঠিন।

বাঝার হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পা নিচেই মাথোটা বেনে গুরিয়া উঠিল, সমুদ্রের এক গাছতলায় হাতের পুটুলি পাশে রাখিয়া বসিয়া পড়িলাম। তৃষ্ণায় কষ্ট ও ক্লান্ত। সমুদ্রে ডাব-সরবতের দোকান, একবার মনে হইল, একটা ডাব কিনিয়া খাই, কিন্তু তখনই অসুস্থ পুস্তক-স্তার অন্যদারিষ্টে মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাব খাইবার প্রবৃত্তি কোথায় যে আত্মপোষন করিল, তাহার আর সন্ধান হইল না। তারপরই মনে হইল, এভাবে ত' বেশী দিন চলিতে পারব না। ইহার পর কি হইবে? চকুর উপর কি দ্বী-পুস্তক অন্যদারের গাছতলায় মরিতে দেখিব! ভাবানু! তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, বোধহয় আমার পাগেই তাহার কষ্ট পাইতেছে। আমার অবর্তমানে অন্যথা বলিয়া লোকের তাহাদের দয়া করিতে পারে। ঠিকই ত! আমি স্নহ স্নহ লাল হইব, আমাকে লোকের দয়া করিবে কেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে কষ্টব্য স্থির হইয়া গেল। বাজারের দোকান-বিশেষ হইতে একটা বস্ত্র কিনিয়া পকেটে ফেলিয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে আসিতে দেখিয়া গৃহিণী হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমার হাত হইতে বাজারটা চাহিল। গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলাম, "খুব বুক খরচ ক'রো।"

লাগিলেন। আমি বলিলাম, "তুমি আর ব'লে না।" রাত্রি চাপা—বাজার এনেছি, চালাও এনে দিচ্ছি।

"এ রপ্তো তোমাকে আর বেতে হবে না। এ বেলায় মত রাত্রি হ'লে গেছে।"

কি করিয়া যে রক্তন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভাবিলাম, ভদ্রবানু! এ-ও অশ্রুতে লিখিয়াছিল! আমি জীবিত থাকিবেই! ভিক্ষা! ও! আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এ অবস্থায় আর ধান ক'রো না, একটু মিহরি ভিজিয়ে রেখেছি, নিয়ে আসি।"

এই হুগো। তাই বলিলাম, "আর এখানে কেন, তুমি ভাত বাড় পে, সেখানে ব'লেই খাব'খন।"

"তবে তাই এস", বলিয়া গৃহিণী উঠিতে উত্তর হইতেই আমি তাহার বা-হাতখানা চাপিয়া ধরিলাম। তাহার মূখের দিকে চাহিতেই আমার ছুই চোখ ছাপাইয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গৃহিণী কণ্ঠকণ্ঠে বলিলেন, "ও কি, দুঃখ কিসের! মাহুয়ের সবদিন সন্মান যায় না। এতদিন স্বপ্নভোগ করেছি; আজ না-হয় একটু কষ্টভোগ করছি। তা' ব'লে ত' চিরদিনই এমন যাবে না। ছিঃ, তুমি এমন মন খারাপ ক'রো না।"

আমি জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "আমার হাতে প'ড়ে তুমি কত কষ্টই পেলে—"

"ও আবার কি কথা। কষ্ট আর পেণুম কোথা! মগদোরে থাকতে হ'লে এরকম হয়। নাও ওঠো।"

বাজার-খরচ বলে নোটো টাকায় বাহা ছিল, তাহা গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলাম, "খুব বুক খরচ ক'রো।"

তিনি হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "পাছা পাছা, এখন ত' তুমি এস।"

গৃহিণী টাকা কয়টা আঁচলে বাঁধিতে চালায় গেলেন। গতিশীল গৃহিণীর দিকে চাহিয়া আমার আমার ছুই চকু আলা করিয়া উঠিল। মনে লইয়া পাশে রাখিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে পড়িল—সদাভ্যন্তরীণ, সমবেদনায় ভরা, মৃদুভিত্তি



করুণা—এই দীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া আমি পরলোকের যাত্রী হইতেছি, এ-বাধা তাহার হুক যে কত বাধিত, সহ্য করিতে পারিবে? কি না, এই ভাবনা আমাকে আমার সম্বন্ধ হইতে টলাইয়া নিল। এই স্বপ্নের পৃথিবী—এর মোহও আমাকে পাইয়া বসিল। কেন—মরিব কেন! হুখ ত' অনেককি ভোগ করে, সেই দুঃখের ভয়ে যে আত্মহত্যা করে, সে ত' কাপুক্ষণ! কাপুক্ষণ? হাঁ, কাপুক্ষণ বইকি! এ যে সঙ্গার-সুন্দর ভয়ে পলায়ন! না, না, না—এ-কাপুক্ষণতাকে আমি আশ্রয় করিতে পারিব না, তা অশুভ্র হই-যটুক। এ আমি কি ভাবিতেছি—এ যে ভাবপ্রবণতা! বাতব জগৎ তাহার কর্তৃত্ব বরন ব্যালান করিয়া রহিয়াছে, তাহার হুকুরে উদ্ধারের পথ নাই। হুইনি পেরে মহাজন বধন আমারই চক্রের সমুখে দ্রী-পুঙ্খের হাত ধরিয়া গাছতলায় দাঁড় করাইয়া দিবে—হুগুর তায় চোখে দেখা ছাড়া আর কিছুই করিবার সামর্থ্য আমার নাই, তখন?

সমস্ত বিধা মুহূর্তকো কৈশোর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। আমি পৃষ্ঠকট হইতে আকিঙের ডেলাটি বাহির করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাছিলাম। তারপর মনে মনে ভাবনার নাম দ্বন্দ্ব করিয়া ডেলাটি গালে দিবার পূর্বেই কে আমার উত্তর হাত চাপিয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিতেই আমার দ্রী যে বিবর্ণ মুখ চোখে পড়িল, এতদিন পরেও তাহা মনে হইলে আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুলতায় একবারে মুগ্ধভাওয়া পড়ে।

“আমার এ সর্লশান করছিলে—তুমি!”

বলিতে বলিতে গৃহিণী ছিন্নমূল বৃক্ষের তায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আকিঙের ডেলাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছাঁই হাত দিয়া ঠাণ্ডাকে ধরিয়া তুলিলাম। কিন্তু মুখ দিয়া আমার একটা কথাও বাহির হইল না।

গৃহিণী অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “কেন তুমি এ সর্লশান করতে বসেছিলে? দুঃখের আশা কি তুমি একলাই সহ্য করছ? আমি কি

অভাবের জন্তে কোনোদিন তোমাকে উত্তাক্ত করে তুলেছি—কোনো অভিযোগ করেছি? সমস্ত দিন অনাধারের পরও বধন রাত্রির ছেলে-মেয়ে নিয়ে গুয়ে থাকি, তখনও যে তোমার দিকে চেয়ে আমার মনে হয়, বৃষ্টি রাঙ্করাণীও এত স্থখী নয়।

বলিতে বলিতে গৃহিণীর কণ্ঠের প্রবল অশ্রু-গোতে রক্ত হইয়া গেল। তাই ত'। এ আমি কি করিতে বসিয়াছিলাম। শুধু নিজের একটা কালমিক শাখির জন্ত এই অসহায় দ্রীলোক আর শিশুদের দুঃখের সাগরে ভাসাইতে বসিয়াছিলাম। আমি মাথা নিচু করিয়া বহিলাম, গৃহিণীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহসও হইল না। অপরাধ যে কত গুরু, তাহা বৃষ্টিতে ত' বাকি ছিল না।

আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী আত্মবশের বলিয়া উঠিলেন, “গুণো, তুমি কথা বলছ না যে! এখনও কি তোমার মনে এি পাগ খেয়াল রয়েছে?”

লক্ষ্মীমিশ্রিত হাত করিয়া বলিলাম, “না না, বড় ভুল করেছিলাম, আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল।”

আমার মুখে হাত দেখিয়া বোধহয় গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর আমার জামাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় তেল মাখাইতে মাখাইতে বলিলেন, “বড়াকতক ঠাণ্ডা জল মাখার ঢেলে দি, নইলে মাথা ঠাণ্ডা হবে না দেখছি।”

হাসিয়া বলিলাম, “তুমি তেল মাখাচ্ছ, আমি কিন্তু বী মাখবার চেষ্টার হিঙ্গম।”

“মাথাকে বললেই মাথা হয় না গো। মাথার সিঁদুর নিয়ে মরব, এ আমার স্কন্ধীর দল; সে ত' তুমি জান। নইলে ঠিক সময়েই বা আমি এসে পড়ব কেন।”

“আচ্ছা, দেখা বাবে, কেনমন—”  
গৃহিণী তেল-লোবড়া ছাড়া দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। “এ—হে-হে! মুখটা যে তেল জুড়তে গেল।”

“বেশ হয়েছে। এখন এস, বড়াকতক ঠাণ্ডা জল মাখার ঢেলে দি।”

“ভয় নেই, আমি গড়া থেকে ঘান করে আসি।”  
গৃহিণী শুনিমেন না, ভোর করিয়া বাটাতৈই বহতে ঘান করাইয়া গেলেন।

( ৬ )

আহারান্তে শয়ন করিয়া মাধ্যাহ্নে ঘটনাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিতেছিলাম। কিন্তু ভাবনার সকল শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক গৃহত্যাগেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল। এই গৃহ ছাড়িতে হইবে—যে-গৃহে জন্মিয়াছি, বাংলার অনাবিল আনন্দধারা, কৈশোরের স্বপ্নস্বপ্ন, যৌবনের উচ্ছাসাভিলাষ যে-গৃহের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, যে-গৃহে পূর্ণপুষ্পবয়সের শেষ নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, যে-গৃহে মাশা-পিতামহীপণের পরবর্ত্তে পবিত্র, যে-গৃহে বংশের আশা পূরণের জন্মস্থান—সেই গৃহ ছাড়িয়া বাইতে হইবে, কিন্তু কোথায়, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, অথচ বাইতেই হইবে। একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস বৃক্ষনামকে মুগ্ধভাওয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া শয্যায় বসিয়া বলিলেন, “দুঃখবোলা যে কাণ্ড করলে, একটা ভাল খবর যে তোমাকে বলব, তার অবসরও রইল না।”

“কি খবর?”

আমার মাথার চুলে হস্ত-চালনা করিতে করিতে গৃহিণী বলিলেন, “আজ ঠৈল এসেছিল।”

“পৈলটকে?”

“হ্যাঁ, তোমার কিছুই মনে থাকে না; তোমার কাছে কতবার তার নাম করেছে—সেই যে গো ছেলেবেলায় বাব সঙ্গে আমার গুঁব ভাব ছিল—যার সঙ্গে সেই পাভাতে পারি নি ব'লে হুখ করত?”  
এখন মনে পড়িল। বিবাহিত জীবনের প্রথমে এই শৈলর কথাই ছিল গৃহিণীর বড়-প্রিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে কাদের বাড়ী এসেছে?”

“তার বিয়ে হয়েছে যে এখানে।”

“কৈ, এতদিন ত' শুনি নি।”

“হামিই কি জানতুম, আমিও বউ মাছব, সে-ও তাই; তার গুণের তারা হ'ল সদগোপ, আমার তাক্ষণ, কোথায় নেমস্তরতেও যে দেখা হবে, তারও উপায় নেই।”

“কাদের বাড়ী বিয়ে হয়েছে?”

“হরেন বোধের সঙ্গে।”

নামটা কানে বাইতেই সর্লশা বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। এই হরেন বোধই বাড়ীটা কিনিয়াছে—বেতিয়া টাকা দিবারও অবসর দেয় নাই। আর সে-দিনও আর কিছুদিন সময় চাহিয়াছিলাম—দেয় নাই। আচ্ছা দীকে পাঠাইয়াছে পোয়েন্দা করিয়া—আমাদের গৃহ-ত্যাগের উত্তোষ-আয়োজন দেখিতে। রাগে সর্লশা জলিয়া উঠিল। বলিলাম, “আমরা যাবার উত্তোষ করছি কি না, তাই দেখে গেল বোধ হয়।”

কণ্ঠস্থের অন্তরের ভাব চাপা ছিল না, তাই গৃহিণী বলিলেন, “তুমি রাগ করছ কেন? সবটা শোন আসো।”

“হরেন বোধের বড়ো বয়সের স্ত্রী পোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল, তার আর শুনব কি?”

“তুমি আগে থাকতে তাকে সোন্দক ঠাওরান্না কেন?”

গৃহিণীর কণ্ঠস্থের বাধা ফুটাই উঠিল। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হইলাম, বলিলাম, “কেন এসেছিল?”

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, “সে শুনেছে, কোন্ তাক্ষণের বাড়ী তার স্বামী বেচে-কিনে নিয়ে তাকে তুলে দেবে। হরেন তাকে কোনো কথাই বলে নি। শুনে অবধি ভয়ে সে কাঁটা হয়ে যাচ্ছিল। তার একটা ছেলে হয়েছে—সেই ছেলে-অন্ত প্রাণ। সে বাবুনের ভিটে বেচা শুনে অবধি তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে হুখা শুনিতে দেয়। দ্বিতীয় পুঙ্খের আত্মের স্ত্রী—ভয়ে হরেন কথাটি কয় নি। তার পর সে নিজে এখানে এসেছিল।”

আমি উত্তরক দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তারপর?”



“তারপর সে এখানে এসে আমাকে দেখে অবাক। আমারই বাড়ী তাইই স্বামী কিনে আমাদের উচ্ছেদ করছে, সে ত’ লজ্জায় ম’রে গেল। আমার পা খ’রে সে কি করা! তাকে অনেক মিষ্টি কথা বলে ঠাণ্ডা করলাম। ছেলোদের কথা দেখে তার বুকেরে বাকী হইল না যে, তারা খিদের জ্বরে কাঁদছে। সে তখন তার ঝিকে দিয়ে সব আনিবে দিলে— আমি বারণ করেছিলাম, সে কোনো কথাই তুলে না—কাঁদতে লাগল। তাই বাধ্য হ’য়েই নিতে হ’ল। এটা কি অজ্ঞার হয়েছে?”

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, “অজ্ঞায় না হ’লেও উচিত হয়েছে কি না, বলা যায় না।”

“দেখ, তার দোর কি? সে ত’ কিছু অজ্ঞার করে নি।”

“তা’ অবজ্ঞা করে নি। যাব, তার পর?”

“তারপর সে বললে, কেমন ক’রে তোমাদের বাড়ী থেকে সে ভাড়া, তা’ দেখব। তুমি ভাই, নিশ্চিন্ত থাক।— ব’লে সে চ’লে গেল। থবরটা কি ভাল নয়?”

“হয়ত ভাল” বলিয়া আমি চুপ করিলাম।

“তুমি এমন মন-মরা হ’য়ে থেক না। তুমি কখনো কারো অনিষ্ট কর নি। ভগবান কখনই আমাদের একবারে মারবেন না।”

( ৭ )

আজ গৃহস্তাপ্য করিতে হইবে, এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু গৃহিণীর কথামত কোন উত্তরাগই করি নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, শৈল সব ব্যবস্থাই ঠিক করিয়াছে। নাতা টাকাটা ধীরে স্বহস্তে দিলেই চলিবে—না দিলেও কোন গোল হইবে না; কিন্তু আমি ইহা নির্ভরযোগ্য মনে না করিলেও গৃহ-স্তাপ্যেরও কোন উত্তরাগ করি নাই।

বেলা বারোটো। সকালে বাহির হইয়াছিলাম। এইমাত্র আসিয়া আহারে বসিয়াছি, এমন সময় বহি-বাটতে ভূপুঙ্খ করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। এ

বাঙ্গলা বে কিসের, তাহা বুঝিতে মুহূর্ত্তমান বিলম্ব হইল না। আমি তাড়াতাড়ি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইতেছি, গৃহিণী সবলে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “তুমি যদি এই মুখের ভাত ফেলে ওঠ, তা’ হ’লে আমি এখন তোমার পায়ে মাথা বুঁজে রক্তপাশা হব।”

তখন আমার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু গৃহিণীর কাতর মুখ আমাকে নিতান্ত বাধিত করিয়া তুলিল। তাঁহার কতখানি আশা যে ঐ এক ঢোলের শব্দ চুর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া আমার গৃহত্যাগের যাতনাও বৃদ্ধি অনেক লঘু বলিয়া মনে হইল। আমি জান হাজে বলিলাম, “এখন যদি না উঠি ত’ এ প্রোথাও বেটোরা যখন হাত খ’রে তুলবে, সেটা কি ভাল হবে?”

“তুলে অমন দিলেই হ’ল। তুমি বাও।”

বাও বলিলেই ত’ বাওয়া যায় না, কোনো মতে দুই-চারি গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেই একটা কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি কানে আসিল—“বাড়ী আছে ন মাহাই?” এই কর্কশ আওয়াজ ঐ জীববিশেষ হাড়া বোধহয় আর কাহারও কণ্ঠ দিয়া বিবর্ণিত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাকে উত্তর দিতে হইল না—সদলবলে হরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, “আগনি যদি নোটাশ মত কাজ করতেন, তা’ হ’লে আমাকে এ-হাঙ্গামা পোয়াতে হ’ত না।”

ইহা অবজ্ঞা আমাকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম, “একটা ভুল হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত ত’ করতে হবে। বেশ, তুমি এক খণ্টা সময় দাও, আমি বাড়ী খালি ক’রে দিচ্ছি।”

নীলস কণ্ঠ হরেন বলিল, “সে হবে না, সময় আমি ছ’ মিনিটও দিতে পারব না।”

মিনতির স্বরে বলিলাম, “দেখ হরেন, আমার স্ত্রী কাল থেকে খান নি, তাঁর খাওয়া হ’লেই আমরা চ’লে যাই।”

বিকৃত স্বরে হরেন জবাব দিল “আমার স্ত্রী কাল থেকে খান নি! তবে ত’ গোকুলপুরী আধার হ’য়ে গেল। ওরকম চা দেখে দেখে—”

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল— বাহির হইতে পারিল না। ভূত দেখিলে মানুষের মুখের অবস্থা যে রকম হয়, হরেনের মুখের অবস্থা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যাহাকে দেখিয়া তাহার এই ভাব, সে তাহার স্বিকৃতি পক্ষের স্ত্রী শৈল— সর্বাঙ্গদ্বারা হুঁদিত—কোলে একটি ছটপুট প্রদান শিত। তাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল।

“বলি, চুপ করলে যে? কি বলছিলে, বল না।”

স্ত্রী কণ্ঠের এই ধ্বনি হরেনকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে সদলবলে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

মহারাজীর মত আদেশশব্দক স্বরে শৈল বলিল, “দাঁড়াও। এই এদের দলিল, এতে না-দাবী লিখে দাও।”

হরেন নীরব।

“বাঁকি হ’রে গেল নাকি? দাও সই।”

এবার হরেনের বাক্যফুটিল হইল। কোনো মতে বলিল, “এ তুমি—কি বলছ?”

“নিখোবাদী! সেদিন আমাকে কি বলেছিলে, মনে নেই?”

হাসিবার চেষ্টায় মুখ্যনাকে বিকৃত করিয়া হরেন বলিল, “কি বলতে কি বলেছি, তা’ কি আমার মনে আছে ছাই।”

“বেশ, মনে না থাকে, নেই থাক। এখন এটোতে সই কর দেখি। মনে করছে, এখন পালিয়ে গিয়ে এর পর বা’ করবার তাই করবে; তা’ হবে না, মনে রেখো, আমি সেই শৈল। কর সই।”

হরেনের পাত্তবর্ণের মুখ দিয়া বাহির হইল, “তুমি কি পাগল হয়েছে—এত টাকা।”

“ওধু এই দলিলে সই নয়, আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। উনি পাত্তেন শোধ দেবেন, না পাত্তেন—কোন দাবী থাকবে না।”

হরেন গুপ্তিতর মত দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

স্ত্রীকণ্ঠে শৈল বলিল, “তুমি দেবে না? দেখ, সর্গনাশ ক’রো না—ব্রাহ্মণের ‘মজি’ কুড়িয়া না। তোমার টাকা ভোগ করবে কে? এই ছেলে ত’ এ-পাণে এ-ছেলে একটি বিনও বাঁচবে না।” বলিতে বলিতে প্রবল অশ্রুর উজ্জ্বলে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

হরেনের মুখে কথা নাই।

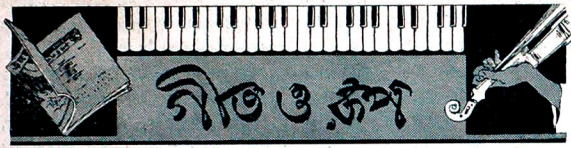
শৈল দৃঢ়ব্রতের বলিল, “বেশ, এ-পাণের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব।” বলিয়াই সে তাহার ছেলেকে আমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। আমি সম্মুখে তাহাকে কোঁলে তুলিয়া লইলাম। তারপর সে আমার পায়ের কাছে হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া তাহার সর্বাঙ্গের অলঙ্কারগুলি বুঝিয়া শু পীকৃত করিল। তারপর হাতজোড় করিয়া আমাকে বলিল, “দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, আমার এই গয়নাগুলো বেচে গুণ দেনা শোধ কর। বাকি টাকায়া ব্যবসা ক’রে পরে আমার এই গয়না কিরিয়ে দিও, আর এই সঙ্গে তোমার এই-ছোট বোনের ভায়ও তুমি নাও। আর আমি গুণ বাড়ী ফিরে যাব না।” উজ্জ্বলিত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিয়া সে আমার পায়ের উপর দুটাইয়া পড়িল।

আমার ঝঙ্কণ্ট দিয়া মাত্র বাহির হইল, “বোন!”

বেগতিক দেখিয়া হরেন শৈলবালার কথামত বাড়ী ত’ কিরাইয়া লইল, অধিকন্তু পাঁচ হাজার টাকা দিতেও বিস্মিত করিল না।

চক্রবেশির ক্রম-স্বাভাবিক নীচে পড়িয়াছিলাম, আজ আবার আমি উপরে। হরেনের টাকা শোধ করিয়াছি; কিন্তু শৈলবালার স্বপ্ন?





## গান

দেশসিদ্ধ মিশ্র—তেতালী

আষাঢ়ের ধারাজল ছন্দে

কে গো এলে—কে গো এলে

অস্তর ভরিল আনন্দে

কে গো এলে—কে গো এলে।

বাদল-নুপুর পরি' পায়ে

কেতকী সুবাস মাঝি' গারে

শনু শনু পুরবাই বায়ে

কে গো এলে—কে গো এলে।

তোমার কাজল মেঘ-ভূলে

আমার পরাণ মন ভূলে।

কর্মে করম-দুল ছায়ায়

শাবী-শাখে ঝুলনা ঝুলায়ে

ভ্রাম অঙ্কন চোখে ব্লায়ে

কে গো এলে—কে গো এলে ॥

কথা, স্বর ও বরসিপি—

শ্রীনিধিচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

ধারী

১ ২ ৩ ৪

II { [রা রা] সা সা রা রা পা পা পা-মা পা -১ -১ -১ -১ } I

(গা ধা পা -১ মজা -১ -১ -১ রা সা নুসা -রজা রা -১ -১ -১) I

কে গো এ . . . লে . . . কে গো এ . . . লে . . .

[রা]

{ মা-ধা ধা ধা ধা গা সী সী ধসী-ধা পা -১ -পা-মা-গা -১ } I

অ . . . স্ব র ত রি ল, আ ন . . . দে . . .

সা সা নুসা-রা রা -১ -১ -১ গা ধা পা -১ মজা -১ -১ -১ } II

কে গো এ . . . লে . . . কে গো এ . . . লে . . .

অস্তর

II { [রা রা] না না না না -১ না সী ধনা স'রা স'না সী -১ -১ -১ -১ } I

বা দ ল নু পু র প রি' পা . . . রে . . .

পা সী সী সী সী -১ সী রা নসী-রা রা -১ -১ -১ -১ } I

কে ত কী হু বা স মা থি' গা . . . রে . . .

সী -১ সী -১ সী সী গা ধা পা -১ -১ -১ -১ } I

শ নু শ নু পু র বা ই বা . . . রে . . .

সা সা নুসা-রা রা -১ -১ -১ গা ধা পা -১ মজা -১ -১ -১ } II

কে গো এ . . . লে . . . কে গো এ . . . লে . . .

সঙ্কারী

II { সা সা সা সা সা সা সা রা নুসা-রা রা -১ -১ -১ -১ } I

তো মা র কা জ ল মে ঘ চু . . . লে . . .

(মা মা পা পা পা পা ধা পা) মা-পা পা -১ -১ -১ -১ } I

আ মা র প রা গ ম ন হু . . . লে . . .

গা গা দা দা পা পা দ্বা পা দ্বাপা-গদা পা -১ -১ -১ -১ } II

আ মা র প রা গ ম ন হু . . . লে . . .

আভোগ

II { [রা -১] না না না -১ না-সী সী রা সী -১ -১ -১ -১ } I

ক . . . কে ক দ ম হ ল হু লে . . .

পা সী সী সী সী সী সী-রা না স'রা রা -১ -১ -১ -১ } I

শা কী শা থে হু ল না . . . হু লা . . .

সী -১ সী -১ সী সী গা ধা পা ধা পা -১ -১ -১ -১ } I

জা ম অ . . . জ ন . . . চো থে . . .

সা সা নুসা-রা রা -১ -১ -১ গা ধা পা -১ মজা -১ -১ -১ } II

কে গো এ . . . লে . . . কে গো এ . . . লে . . .





## সাহিত্য—

সাহিত্যের মাত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
(পরিচয়—শ্রাবণ, ১৩৪০)

মাধু ও চলিত ভাষা—শ্রীরাজশেখর বসু  
কয়েকখানি পুরাতন বাংলা নাটক—  
শ্রীজগদ্বন্ধু দাশ-গুপ্ত  
(প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৪০)

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ—  
শ্রীজগদ্বন্ধু সেন  
(ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪০)

আধুনিক সাহিত্য—শ্রীআশীষ গুপ্ত  
(বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৪০)

বাংলা সাহিত্যে গদ্য-বিশিষ্ট গুণ—  
শ্রীমুকুন্দর সেন (বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
নিভা ও সাহিত্য—শ্রীসত্যজ্যোতী দাস  
(বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ, ১৩৪০)

বাংলা সামাজিক উপজাতির উপক্রমিকা—  
—নন্দা ও বাসুদেব—  
শ্রীনিরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীজগদ্বন্ধু দাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড—  
শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টাচার্যী  
(বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ, ১৩৪০)

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—  
শ্রীজগদ্বন্ধু বিজ্ঞানচন্দ্র  
(মাসিক বহুমতী—আষাঢ়, ১৩৪০)

শরৎচন্দ্রের নব-জন্ম—মুক্তাবর রহমান খাঁ  
(মাসিক মোহাম্মদী—শ্রাবণ, ১৩৪০)

## সাহিত্য সংক্ষেপে নানা কথা—

মোতাহের হোসেন চৌধুরী  
(বুলবুল—বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৪০)\*  
প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও  
বৈশিষ্ট্য—আবদুল করিম  
(বুলবুল—বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৪০)

## ইতিহাস—

পালবংশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়—  
শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়  
(ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
পেশোয়ার রাজবংশের অবদান—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত  
(বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
রাহুল খাঁ—সাদত আলী আখন্দ  
(বুলবুল—বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৪০)  
চন্দ্র ও বংশবংশীয় রাজগণ এবং ফরিদপুর জেলা—  
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য (বারমাণ্ডী—চৈত্র, ১৩৩৯)

## দর্শন—

নির্মাণের অমূল্যবর্তন—  
শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত  
(পরিচয়—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
ঈশ্বর শব্দার্থাচার্য্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ—  
শ্রীঅমূল্যকুমার নায়ক  
(ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
আত্মসত্যবাক্য—স্বামী অজ্ঞানানন্দ  
(অমৃত—শ্রাবণ, ১৩৪০)  
জীবন ও দর্শন—  
আবুল মনসুর আহমদ  
(মাসিক মোহাম্মদী—শ্রাবণ, ১৩৪০)



## (১)

আমরা উকিলই হই, ডাক্তারই হই, বণিকই হই, সাহিত্যিকই হই,—আমরা কেউই পলিটিক্স সংক্ষেপে উল্লাসীন নই। এর কারণ, এগুণে আমাদের মনকে বিষয়-বিশেষে গতিবদ্ধ করা অসম্ভব। আমরা যে-কোন বিষয়ের ব্যবসা কিংবা চক্কা করিলে কেন, একমাত্র সেই বিষয়ে মনকে আবদ্ধ রাখা অসাধ্য; কারণ, মানুষের সমগ্র মনটি তার ব্যবহারিক মনের চাইতে বেশ বড়। ধন, আমি যদি কবি হই, ত আমার সমগ্র মনটি ফুল ও চন্দ্রালোক দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারতুম না। মনের অনেক অংশ পতিত থাকত, যাতে চারপাশের ঘটনা, আর চারপাশের কথাবার্তা উড়ে এসে ছুড়ে বসত। আমরা কল্পনার রাজ্যে গলার পাত্রে পারিলে, আর পলিটিক্সের বিষয় হইলে জাতীয় স্বপ্নের পাত্রে বিষয়; হস্তাং পলিটিক্স সংক্ষেপে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আলগা থাকতে পারিলে।

## (২)

শুধু একালে নয়, কোনকালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স এড়িয়ে যেতে পারেননি। ভারতবর্ষের হিন্দুগণে কালিদাসের মত আর দ্বিতীয় কবি জন্মায় নি,—অবশ্য ব্যাস-স্মার্ত্তিকের বাদ দিয়ে। তবুও কালিদাস এতটা political-minded ছিলেন যে, তাঁর 'রঘুবংশ' থেকে একটা সোটা রাজধর্ম উদ্ধার করা যায়। অস্ত্রত: নবীন পতিতের দল কালিদাসের কাব্য থেকে তাঁর পলিটিক্যাল আদর্শ উদ্ধার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, কালিদাসের সেকালে পলিটিক্স, আমাদের একেলে পলিটিক্স নয়, এবং তাঁর

অনেক মতামত শুনে আমরা অবাক হই যে; কারণ, সেকালের সামাজিক অবস্থা একালের সামাজিক অবস্থা নয়। কলে, সেকালের সামাজিক মন একালের সামাজিক মনও নয়।

## (৩)

আমি কালিদাসের কতকগুলি কথা, তাঁর পলিটিক্যাল মতামতের নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের মন তাঁর কথায় পুরো সায় দিতে পারে না। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দিলীপের গুণবর্ণনাযে বলেছেন যে,—  
“রেখামাত্রশপি ক্ষুদ্রাদামনোর্বন্ধনঃ পরম।  
ন ব্যতীযুঃ প্রজাতন্ত নিয়ন্ত্রণেমিত্ত্বয়ঃ।  
(রঘুবংশ, ১সর্গ—১৭ শ্লোক)

অন্ত বাঙলা,—  
“সারথীচালিত রথের চক্রে যেমন পূর্ণবর্তী রথের বর্ষা অর্থাৎ দাগ হইতে একটুও এদিকে ওদিকে যায় না, সেইরূপ তাঁহার প্রজাগণও জীবন শাসন-প্রভাবে মন্থর সময় হইতে প্রচলিত চিরাচারিত আচারপদ্ধতি হইতে বিমুখ্যাত বিচলিত হইত না।” (রাজেন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্র কৃত অম্বদান)।

মাৎস্যকে রেলের গাড়ীর মত বাঁধাগে চলতে রাজা বাধ্য করবেন, একথা শুনে আমরা চমকে উঠি। এখন জিজ্ঞাস্য করি, যে যুগে কি হরিজন-সমাজ উঠতে পারত?

তিনি অতিথি নামক আর একটি রাজার বিষয় বলেছেন যে,



“কার্য্য কেবলা নীতি: শৌখ্যং খাপদচেষ্টেতম।

অত: সন্ধিং সমতাভ্যামুভায়ামধিবেদ সঃ ॥

(রঘুবংশ, ১৭ সর্গ—৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ “একমাত্র নীতি অহমরণ করা কাপুরুষতা; আর একমাত্র শৌখ্যের দ্বারা শাসন করা পতুধতা; একমাত্র বলের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যে পতুধ, একথা মহাত্মা গান্ধীও সর্লান্তঃকরণে গ্রাহ্য করবেন; কিন্তু কেবল নীতির উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যে “কাতর্ঘ্য”, একথা এগুণে কোন সদগুণ লোক গ্রাহ্য করবে কি?

তারপর বিদ্যাপক্ষে নিম্ন লিপ্যটীচূড়ামণি রাজা অধিরথের বিষয় তিনি বলেছেন যে, প্রজারা তাঁর দর্শন প্রার্থনা করলে তিনি

“তৎস্বাক্ষরবিবরাণলগ্নি কেবলেন চরণেন কল্পিতম।”

(রঘুবংশ, ১৯ সর্গ—৭ শ্লোক)

অর্থাৎ তিনি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে পা সুলিয়ে দিতেন, এবং প্রজারা তাঁর ঐচরণখানি দর্শন করেই কৃতার্থ হ’ত। রাজভক্তির এমন হাতকর ট্যাগেডিকালিদাসের দ্বায় মহামনীষীর চোখে এড়িয়ে যাতনি। একথা শুনে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

(৪)

এখানে কালিদাসের কথা তুলুস, সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার বিত্তে দেখাবার জন্মে নয়, কিন্তু শুধু এই বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্মে যে, কালিদাসের মত মহাকবিও পলিটিসের পাশ কাটরে বেতে পারেন নি। রাজা-রাজভার ideal ছবি আঁকতে হ’লে, দেকালের রাজত্বের ideal সম্বন্ধে নীরব থাকা অসম্ভব।

কালিদাসের কথা অবশ্য আমাদের ঘরের কথা, অর্থাৎ এই ঘরের—যে ঘর আমাদের আর নেই, আর কেমন কিংবো আসবে না। ইংরেজী ভাষায় বলে,—history repeats itself; কপাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ history শব্দের অর্থই হচ্ছে তাই,

যার আর পুনরাবৃত্তি নেই। ইতিহাস মাজেই পরিবর্তনের ইতিহাস; সে পরিবর্তনে মানবমনাজের উজ্জ্বলি হোক, আর অধোগতিই হোক।

হুতরাং কালিদাসের ideal এগুণে গ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে আমি যদি কালিদাসের যুগে জন্মাতুম, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর রাজনীতি, আদর্শ রাজনীতি ব’লে গ্রাহ্য করতুম। রবীন্দ্রনাথ যাকে “কালান্তর” বলেন, তার ফলে নতুন সমতার সৃষ্টি হয়, এবং তার সমাধানের জন্ম নতুন ideal-এর জন্ম হয়। দেশের সঙ্গে দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে কালিদাসের প্রভেদ তার চাইতেও বেশি স্পষ্ট। হুতরাং সংস্কৃত-সাহিত্যের “রাজনীতির” অর্থ আর বাঙলা “রাজনীতির” অর্থ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি যখন বলেছি যে, কালিদাসও politics-এর বিষয় কবিত্ব করেছেন, তখন একথাও বলা দরকার যে, তাঁর পলিটিস্ আর বর্তমানের পলিটিস্ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর থেকে এই অনুমান করা যায় যে, সংস্কৃত যুগের পলিটিসের এগুণে কোনও পার্থক্য নেই। চাণক্য এগুণে আমাদের পলিটিকাল গুরু হ’তে পারেন না।

(৫)

এখন ঘরের কথায় কিংবা আসা যাক। বর্তমানে বাঙালী যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এদের মধ্যে কেউ যে পলিটিস্ সম্বন্ধে উদাসীন মন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বিশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্কিমের “আনন্দমঠ” যে, দেশের যুগেকের মন উত্তেজিত ও চঞ্চল করে তুলেছিল, সে কথা কি আর বলবার প্রয়োজন আছে? আজ অবশ্য আমরা “আনন্দমঠের” মাথা কাটিয়েছি, কারণ আজকের দিনে বাঙালী নিরানন্দ-পুরী হ’য়ে উঠেছে। তারপর, বাঙালীর পলিটিসের রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। এদের হ’জ্বনের কেউ অবশ্য পলিটিসিয়ান নয়, কারণ শাসনঘরের সেরামতের কাছে এরা কেউ হাত লগান নি। এরা যা’

বদলাতে চেয়েছেন, তা’ হচ্ছে স্বজাতির মন। সাহিত্যের কারবারই হচ্ছে মাজের মন নিয়ে।

অপরপক্ষে আমাদের মত যুগ-সাহিত্যিকদের মন, চারপাশের প্রত্যক্ষ reality-র বহু পরিমাণে অধীন; কারণ, আমাদের কল্পনার পৌড় খুব লম্বা নয়। আর এ-reality, লোকে যাকে বলে পলিটিস্, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। বিশেষত, বর্তমান যুগে political mind হচ্ছে সাধারণ লোকের mind-এর একটা অঙ্গ। কারণ, এই পলিটিসের ভিতর দর্শনের কথাও আছে, অর্থের কথাও আছে। আমার বিশ্বাস, এগুণের পলিটিসের মোটা কথা হচ্ছে economics। আর অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক জ্বলি ঘটিত। হুতরাং আমরা সাহিত্যিকেরাও পলিটিসের মতিগতি সম্বন্ধে ছুঁচার কথা বলতে বাধ্য, —পলিটিসিয়ানরা আমাদের পক্ষে এ আলোচনা যাইই অনবিদ্যারচর্চা মনে করুন না কেন।

(৬)

এমন সাহিত্যিকের কৈকিৎ হেড়ে তব্যাকথিত চারপাশের reality-তে কিংবা আসা যাক। আমি অনুমান করেছিলাম যে, বিশেষতের ইকনমিক কনকাবেস্, বার্থ হবে। ইতিমধ্যে হয়েছে তাই। প্রতি দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জাতীয় বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টাই করেছে; কারণ, পৃথিবীর বর্তমান ইকনমিক দৃষ্টি হ’তে উদ্ধারের কোনও পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। অপরপক্ষে যুদ্ধ পরিণামে এক পক্ষের হার হয়, অপর পক্ষের জিত হয়। কিন্তু ইকনমিক যুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে এই যে, এর ফলে সকল পক্ষেরই একসঙ্গে হার হয়। আর এই হারের অজ্ঞাত ফল হচ্ছে পৃথিবীর ইকনমিক অধঃপতন। ইকনমিক যুদ্ধ বন্ধ হ’লেই যে কল-কারখানা সব আবার পুরো দমে চলবে, কুলি-মজুরেরা সব বাটতে আয়ত্ত করবে, আর পৃথিবী ক্ষের ঘনঘাড়ে পূর্ণ হ’তে উঠবে, এমন কোনও কথা নেই।

এ experiment-এর ফল কি হবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে; অবশ্য যদি পৃথিবীর প্রবলপরজ্ঞাত জাতিরা এ experiment করতে রাজি হন। কিন্তু যেখানে মনের ও মতের মিল নেই, সেখানে সে experiment করার সম্ভাবনাও নেই।

আমরা দুই থেকে রপ্তারের যুগে যে ববর পাই, তাতে মনে হয়, ইকনমিক্ শায়ে যাকে বলে stability of money, তারই বাবস্থা করবার জন্ম এক-কনকাবেস্, বদেছিল। জটনক ইংরেজ ইকনমিষ্ট, কিছুদিন পূর্ণে লিখেছেন যে, —“Commercial crises are not due to prices going up and then down: but on the contrary, the movement of prices is the result of the crises.” এ শব্দগুণ বদী সত্য হয়, তাহলে crises-এর চিকিৎসা না করে, তার একটি উপ-সর্গের চিকিৎসার চেষ্টা যে বার্থ হবে, সে ত ধরা কথা।

(৭)

এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে আমাদের কি দরকার? এর চেয়ে আমাদের ঘরের কথা নিয়েই নাজাড়া করা ভাল। কিন্তু ছুঁখের বিষয় আমাদের ঘরের কথাও তেমন স্পষ্ট নয়।

সেদিনকার পুণা কনকাবেস্ কি হ’ল, তা’ কি কেউ বলতে পারেন? কংগ্রেসের বড় গুর্ভারা civil disobedience তাগ করলেন, না জ্বিয়ে রাখলেন?

মহাত্মা গান্ধীর জটনক মহাক্ষমী ডাক্তার বলেছেন যে, মহাত্মা তাঁদের জন্ম যে বাবস্থা করেছেন, তা’ হচ্ছে “the same old prescription”—চমৎকার রসিকতা। কিন্তু এই রসিকতাই কি সত্য কথা? মহাত্মা বলেন, না। আসল প্রস্তাব তিনি বড়গাটের কাছে করতেন, বড়গাট বদী তাঁকে দর্শন দিতেন। সে প্রস্তাব যে কি, সে কথা তিনি বলতে পারেন না, কারণ উভয় পক্ষের কথাবার্তার ফলে সে প্রস্তাব মূর্তমান হ’ত। তবে এই পর্থাৎ বোঝা যায় যে, প্রস্তাবটি শান্তির প্রস্তাবই হ’ত।



বা' হয়নি, তা' নিয়ে লড়াই করা যুগ। এখন কংগ্রেস কোন পথে চলেবে, তা' কি কেউ বলতে পারে? কর্তারাই যখন মনস্থির করতে পারছেন না, তখন অন্তরে পক্ষে তা' অহমান করা অসম্ভব। স্বতরাং সে যুগ চোঁটা করব না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতে যে কংগ্রেস চালিত হবে, এমন ত মনে হয় না। যদি না মহাত্মা আবার কোনও নতুন কথা উদ্ভাবন করেন, যাতে দেশের লোক চক্কল হ'য়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন একজন mystery-man; স্বতরাং তাঁর কার্য-কলাপের গতিবিধি নজিরের সাহায্যে অহমান করা যায় না।

(৮)

মহাত্মা গান্ধী এতদিন ভারতবর্ষের পলিটিকাল ক্ষেত্রে ছিলেন এক, এখন তিনি শূন্য হ'য়ে বাবার পথে দাঁড়িয়েছেন। অস্বস্তি তিনি যে একেবারে সর্পেসলী ধাক্কাবেন না, তার নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এখন মহাত্মা গান্ধী যদি স'রে ডাঙান, কিংবা আর পাঁচজনকে মিলে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর পরিভ্রমণ পূর্বে যে অপূর্ণ কেউ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শুনতে পাই, কংগ্রেসের দলে ছোট ছোট বড় dictator আছেন। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই যে একমাত্র dictator হ'য়ে উঠবেন, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ, এরা সকলে এতদিন মহাত্মা গান্ধীর চতুর্দলেই চলে আসছেন।

পাঁচজনকে মিলে কাউন্সিলও dictator বানাতে পারে না। লোকে dictator হয় নিজগুণে। মহাত্মার আমি সম্মতি নই, এবং একদিনের জন্তও যে ইহা এই এর কারণ, তাঁর মনের অর্থ আমি কদিনকালেও অনুসরণ করতে পারিনি—না ধর্ম সংকে, না পলিটিং সংকে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, তাঁর তুল্য চরিত্রবল আজকালকার অজ কোনও leader-এর নেই। এই চরিত্রবল যে কত বড় শক্তি, তা' মহাত্মা আমাদের চোখে আবুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে,

অপরে কি বলে, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না; কিন্তু কে বলে, তার উপরই তার মূল্য নির্ভর করে।

(৯)

আর এক কথা; কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানও এর পর নবরূপ ধারণ করবে। নামের সঙ্গে রূপের যে কোনও নিত্যসঙ্গ নেই, একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম নামটা বহুকাল থেকে চলে আসছে, অথচ এই ধর্ম যে কালে কালে ও দেশে দেশে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, তা' ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সকলেই প্রত্যক করতে পারবেন। আর ইংরেজী democracy শব্দের প্রাচীন গ্রীসে যে অর্থ ছিল, বর্তমান ইউরোপে কি সেই অর্থ আছে? এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বস্তু চলে গেলেও তার নাম থাকে। স্বতরাং এ প্রতিষ্ঠান নব-কলেবর গ্রহণ করলেও, তার পুরোনো নাম সম্ভবতঃ বজায় থাকবে।

ভারতবর্ষের সমাজন সমাজ হচ্ছে, বহুকে এক করবার সমাজ। পুরাকালে এসমাজ ধর্ম ও আচার-গতই ছিল। এগুণে পলিটিংয়ে সেই সমাজই আবার নতুন আকার ধারণ করেছে। কি ধর্ম, কি পলিটিংয়ের সকল প্রতিষ্ঠানের মর্মকথা এই। যুগে যুগে লোকের অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়। ফলে, যুগে যুগে সমাজের মীমাংসার নতুন উপায়ও উদ্ভাবিত হয়। স্বতরাং কংগ্রেসের যে নতুন চেহারা হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কিরূপ হবে, তা' বলা কঠিন। যুগে যুগে মাহাত্মের মনে নতুন আশা ও ভয়ের স্রষ্টি হয়, এবং ওই আশা ও ভয়ই আমাদের কন্দলীখন নিয়ন্ত্রিত করে। উভয়ের মধ্যে কত প্রবল হ'লে, সমাজ পিছু হটে; আর আশা প্রবল হ'লে, সমাজ এগিয়ে যায়।

(১০)

এই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গা-গড়ার মুখে যে বাঙলা তার বাতলা লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলার নতুন পলিটিকাল-পার্টি যে কি রূপ

ধারণ করবে, তা' জানি নে; কিন্তু যে রূপই ধারণ করুক, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যদি অসময়ে ইহলোক ত্যাগ না করতেন, তা' সম্ভবতঃ তিনি এই নতুন পার্টির নায়ক হ'তে পারতেন।

মাগুয়ে নতুন অবস্থার উপযোগী নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরোনোর জের টানতে বাধা হয়। স্বতরাং আগামী পলিটিকাল-পার্টিতে পুরোনো পলিটিকাল-পার্টির কড়া-বান্ধিদেরও স্থান থাকবে।

যতীন্দ্রমোহনের পলিটিকাল কার্যকলাপ সখকে আমার কিছু বলবার অবিকার নেই। কারণ আমি তাঁর পলিটিকাল-পার্টির দলভুক্ত ছিলাম না। তবে তিনি যে কতদূর দেশপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন, আজকের সকলেই তা' জানেন। দেশবন্ধু ভিক্রমদাস দাস, তাঁর মৃত্যুর চার-পাচদিন

যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সব চাইতে উপযোগী; কারণ, তিনি উক্ত সভায় মনের কথা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করতে পারতেন, অপর পক্ষের প্রস্তাব হাত-হাত জবাব দিতে পারতেন, অপরের মূল্যের খণ্ডন করতে পারতেন। এদেশের শাসনব্যবস্থা যে নতুন ক'রে গড়া হচ্ছে, তার ফলে এদেশের নবযুগের পলিটিং প্রধানতঃ কাউন্সিল-গত পলিটিং হবে, এবং যতীন্দ্রমোহন বেঁচে থাকলে যে সে পলিটিংয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, এই আমার বিশ্বাস।

(১১)

এই অবসরে আমি যতীন্দ্রমোহনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সঙ্গে আমি বহুকাল হ'তে স্থপরিচিত। সম্ভবতঃ তিনি যখন ব্যারিষ্টার হ'য়ে বিলেত থেকে ফিরে আসেন, সেই সময়েই প্রথমে আমি তাঁর



দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের শবাস্থান-নগর

পূর্বে দাখিলিলে আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। এর একটি কারণ, তাঁর পরিবারের সহকর্মীদের মধ্যে কাউন্সিলের মেম্বর হিসেবে সঙ্গে আমাদের পরিবারের পূর্ণপরিচয় ছিল।



পলিটিক্সের বাইরেও মানুষের একটি সামাজিক দিক আছে। সেই সামাজিক লোক হিসেবে বীজ্ঞ-মোহন ছিলেন আমার নিকট সুপরিচিত। আর এই সামাজিক বীজ্ঞমোহন ছিলেন অতিশয় ভদ্র, মিঠাভাষী, ধীরপ্রকৃতির লোক। সামাজিক হিসেবে তাঁর একটি মহাপুণ্ড্র এই ছিল যে, তিনি তাঁর পলিটিক্যাল মতামত আলাদার গ্রন্থ করতে বলেন নি। এমন কি, সে-বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কখনও আলোচনাও করেন নি। তিনি আমাদের মাথা হিসেবেই দেখতেন, political animal হিসেবে নয়।

অবশ্য বীজ্ঞমোহনের বঙ্গবাহিতার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না, স্বতরাং তাঁর সঙ্গে আমার কখনো 'সাহিত্যিক আলোচনাও হয় নি। পলিটিক্স, ধর্ম ও সাহিত্য সংক্রমে আমাদের নানা মত আছে, তাই এইরূপ আলোচনার ফল পরস্পরের ভিতর মতভেদের সৃষ্টি হয়। বীজ্ঞমোহনের সঙ্গে তাঁর এই মৌনতার ফলে আমার কখনও কোনও মতামতের সংঘর্ষ ঘটে নি।

ফলে, তাঁর সামাজিক ব্যবহার ও কথাবার্তা আমার কাছে চিরকালই প্রিয় ছিল। বীজ্ঞমোহনের মনের এই সহজ উদারতা সত্য মানবের একটি মহাশক্তি।

( ১২ )

বাঙালা বধন তার আর্থিক স্বাভাব্য লাভ করবে, তখন কে বাঙালার রাষ্ট্রনায়ক হবে, তা' বলা অন্তর্ভুক্ত—এই হচ্ছে আমার মত।

কিন্তু এই হচ্ছে আর একটি কথা বলতে চাই। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে দেশের একমাত্র আধুনায়ক করা, এ যুগের লোকের পক্ষে বাস্তবিক নয়। Hero-worship-এর মূল চ'লে গিয়েছে; বিশেষতঃ রাষ্ট্রনায়কির ক্ষেত্রে। কারণ, মতামত সংক্ষেপে পরম্পরোপেক্ষী হওয়া এ যুগে আমাদের মনের ধর্ম নয়; অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে hero হ'য়ে ওঁ'বাবার সুযোগও এ যুগে কম।

এ বিষয়ে অপরিসীম কল্যাণী দার্শনিক Bergson-এর মত নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।—

“আধুনিক ইউরোপের মহাভাষিতার ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় যে, এ যুগে ইউরোপে মহা বৈজ্ঞানিক, মহা আর্টিস্ট, মহা বোকা প্রভৃতি ভয়ংকর হয়েছেন, কিন্তু ক'জন মহা রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন?”

এর কারণ নাকি—

“মানুষের মতিগতি ক্ষুদ্র সমাজতন্ত্র হবার পক্ষেই প্রকৃত। কিন্তু একটি মহাদেশের এমন কেউ মহানায়ক

হ'তে পারেন না, যিনি বহুসংখ্যায়ের মনঃপুত ভাবে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। উপরন্তু, একটি মহাদেশ শাসন করার উপযোগী কোনরূপ শিক্ষাও নেই, দীক্ষাও নেই। স্বতরাং এ আর্ট কোনরূপ শিক্ষার ফলে আয়ত্ত করা যায় না।”

সম্ভবতঃ Bergson-এর মত সত্য।

চুপেথের বিষয় আমরা দোঁটানার মধ্যে পড়েছি। এক্ষণিকে আমরা ইউরোপের নব ডিমোক্র্যাটিক ভাবের অধীন, অপর পক্ষে আমাদের ন্যাতন মহাপুণ্ড্র-পুঞ্জারও মায়া কাটতে পারি নি।

বাঙালা যে পলিটিক্যাল জগতে তার স্বাভাব্য লাভ করবে, এ সংবাদ আমার কাছে শুভ সংবাদ। কারণ, এ অবস্থার আমাদের দৃষ্টি বাঙালার মাটি, বাঙালার জলের উপর পড়তে বাধ্য। এবং এই নব-পুষ্টির প্রসঙ্গে দেশের reality-র সংক্ষেপে আমাদের চোখ অনেকটা খুলে যাবে, ও তখন আমাদের অজ্ঞা অবিবেচন পক্ষে আমরা বেশি সজ্ঞান হব।

বাঙালীর শিলা, বাঙালীর স্বাস্থ্য, বাঙালীর মন, বাঙালীর প্রাণ তখন আমাদের শিলা ভাবনার বিষয় হবে। বাঙালীর বর্তমান শিক্ষা যে জাতির জ্ঞানসমূহের অঙ্কুর নয়,—এমন কথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে বলেছেন, এবং বাঙালা ভাষার প্রতি অরজ্ঞা নাকি এ শিক্ষার বার্ষিকার অঙ্গতম কারণ। বাঙালা ভাষা যে কেন বাঙালীর মনোভাবের বাহন হ'য়ে উঠতে পারছে না, সে বিষয়ে আজ বাগ্‌বিস্তার করার ন, কেননা সে বিষয়ে অনেক বলবার কথা আছে। বাঙালা কতক পরিমাণে তার পলিটিক্যাল স্বাভাব্য লাভ করলে, বাঙালীর দৃষ্টি দেশের ইকমনিয় অর্থব্যবহার উপর পড়তে বাধ্য, তার ফলে কত মানিক কত লজ্জা হয়, সে জ্ঞানও আমরা লাভ করব। এবং এ জ্ঞানের পিছু পিছু সঙ্গত কর্মও আসবে।

এইমাত্র সংবাদ পেলেই যে, আমাদের ঘরের একটি ছেলের টাইফয়েড রোগে অকালমৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনার এক মুহূর্তে বাইরের সঙ্গে মনের সংকলন যোগস্বত্ব ছিন্ন হ'য়ে গেল। এখন মনকে বা' অভিকৃত করেছে, তা' হচ্ছে একমাত্র পারিবারিক দুঃখনি। স্বতরাং আজ এখানেই থামি। Bergson-বা' বলেছেন, সে কথা ঠিক। প্রকৃতি আমাদের মন এমন ভাবে পড়েছে যে, তা' পরিবার নামক অতি ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই মূলতঃ আবদ্ধ।

ত্রিপ্রমথ চৌধুরী

কলিকাতা গিটেস ম্যাগাজিন সাহিত্যিক  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০১

নিবন্ধ - স্মৃতি

১। শরৎ-বন্দন।	...	...	৩০৮
২। গুণেশ্বর দেবতা—রাঙ্গুর ভট্টর শ্রীবিনয়তথ্য ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি	...	...	৩০৯
৩। গাণ ও বাজপাণী (গল্প)—শ্রীমৌলেনাথ ঠাকুর	...	...	৩১০
৪। বাঙ্গা-বাগিচা ও অঙ্গ-মত্তার বাঙ্গালী পরাঙ্গ—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	...	...	৩১১
৫। আকাজ্ঞা (কবিতা)—শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক, বি-এ	...	...	৩১২
৬। হাজার-তুলা বাঙালী জাতি—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ	...	...	৩১৩
৭। “হিমাশ্রিত পূর্ণিমা” পরিকল্পনা—শ্রীশ্রীমতীকান্ত সেন	...	...	৩১৪
৮। দ্বিজেন্দ্রবালের প্রবৃত্তি ছন্দ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ	...	...	৩১৫
৯। যুগেরপক্ষি স্বরূপ ও দ্বিজেন্দ্রবাল—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	...	৩১৬
১০। কুন্দের মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা	...	...	৩১৭
১১। পাণ্ডে চার আনা (কবিতা)—কবিশেষের শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ	...	...	৩১৮
১২। রাঙ্গেল (গল্প)—শ্রীমৌলেনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল	...	...	৩১৯
১৩। ভিক্ষু—ভট্টর শ্রীশ্রীভিক্রম চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট	...	...	৩২০
১৪। কিশোর শরৎ (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী	...	...	৩২১
১৫। শ্রীশ্রীগোবিন্দ পট্টচার—কুমারী ছায়া দেবী	...	...	৩২২
১৬। প্রাচীন কলিকাতা—কবিত্বপ্ত শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, কবাবার, উত্তরসাগর, বি-এ	...	...	৩২৩
১৭। অদ্বুত (কবিতা)—শ্রীবীজ্ঞনাথ ঠাকুর	...	...	৩২৪
১৮। বৈজ্ঞানিক মণীষ মিত্রের (গল্প)—শ্রীকল্যাণদাস মুখোপাধ্যায়	...	...	৩২৫
১৯। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস	...	...	৩২৬
২০। গান—শ্রীশ্রী পাল	...	...	৩২৭
২১। সর্দাগি (উপন্যাস)—শ্রীমতী অমরুণা দেবী	...	...	৩২৮
২২। বঙ্গ-পরিচয়—বাঙ্গালার দেব মন্দির—শ্রীশ্রীলীলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম-এ	...	...	৩২৯
২৩। গীত ও রূপ—কথা—শ্রীমতী অমরুণা দেবী	...	...	৩৩০
স্মরণ—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৩৩১
স্বপ্নগিণি—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	...	...	৩৩২
২৪। নবকিশোরের পরিচয় (গল্প)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, এম-এ	...	...	৩৩৩
২৫। চিরদিনের দাণী (কবিতা)—শ্রীমহেশচন্দ্র রায়	...	...	৩৩৪
২৬। অরুণোদয় (উপন্যাস)—শ্রীশ্রীলজ্জানন মুখোপাধ্যায়	...	...	৩৩৫
২৭। প্রথম যৌতুক (কবিতা)—শ্রীপার্বতীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩৩৬
২৮। আঁধারে আলো (গল্প)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	...	৩৩৭
২৯। অতীত (কবিতা)—শ্রীকেশবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৩৩৮
৩০। নৃতন বই	...	...	৩৩৯
৩১। বিদ্যারঞ্জন (কবিতা)—শ্রীমতীমোহন বাগচী, বি-এ	...	...	৩৪০
৩২। ঘরে-বাইরে—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, বার-এটল	...	...	৩৪১
৩৩। সামরিকী	...	...	৩৪২



দশীচি — শ্রীঅশ্বিনীকুমার ব্রায়

- (১) কুসুম-চয়ন — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু
- (২) আলো ও ছায়া — শ্রীশিবপ্রসাদ বসু
- (৩) শ্রীশরণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- (৪) বিশ্রাম — শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

... विज्ञापन-पृ: २८  
... ३ पृ: ४६  
... ७०८ क  
... ७७४

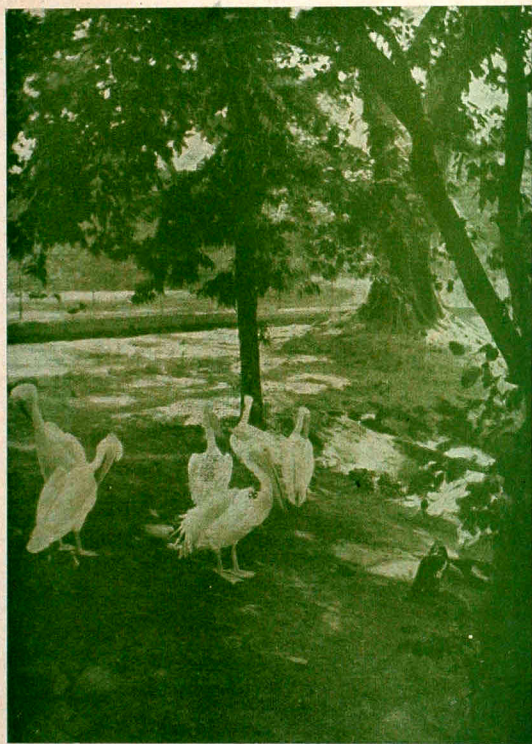
- (১) "হিন্দুরি স্বর্গভূমি" - নেপাল-উপত্যকা
- (২) রাজাধিরাজের প্রাসাদ (যাদুনিক)
- (৩) পশুপত্তিনাথের মন্দিরের পথে
- (৪) "নরসিং বাজা"
- (৫) মহাভূ-মন্দির - পাটন
- (৬) টুপিখেল ময়দানে কুচকাওয়াজ
- (৭) কাঠমাণ্ডুতে রথযাত্রা - কাঠমাণ্ডুর জন
- (৮) "এক মায়ীমা - বয়স!"
- (৯) "ওবির কিং আমায় এক সেট গড়িয়া গ

- (৯) এবার কিছু আমরা এক সোঁড় ভড়াইয়া দখনা ...
- (১০) ... এই 'তার'খানা পিয়ন হুলে আমরা দিয়ে গিয়েছিল ...
- (১১) ...
- (১২) ভুবনেশ্বরের মন্দির ...
- (১৩) মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত বৃদ্ধমুহুরিত অঙ্কিত মন্দিরের প্রতিকৃতি ...
- (১৪) পোগানের খিটসাখানা মন্দির ...
- (১৫) পোগানের হুলেমানী মন্দির ...
- (১৬) পোগানের আনল মন্দির ...
- (১৭) রাজাবাড়ীর মঠ ...
- (১৮) লোনারঙ্গের মঠ ...
- (১৯) কেণ্ডারের মঠ ...
- (২০) ইছাই বাঘের দেউল ...
- (২১) অীমান বিহিরকুয়ার চৌধুরী ...

***	907
***	987
***	982
***	989
***	988
***	984
***	986
***	989
***	900
***	979
***	971
***	971
***	971
***	971
***	92
***	92
***	92
***	92
***	92



উদয়ন — আশ্বিন, ১৩৪০

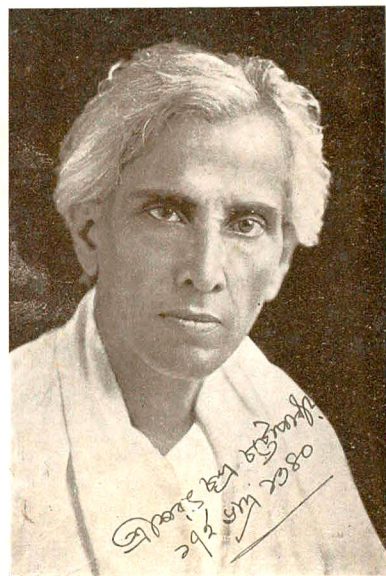


বিশ্রাম

শিল্পী — শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

[ 'উদয়নে'র আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ]

উদয়ন — আশ্বিন, ১৩৪০



শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



## উদয়ন-কার্যালয়ে

বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎ চন্দ্রের

অষ্টপঞ্চাশৎ জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত

## সাদর-অভিনন্দন

সে আজ কতদিনের কথা, যেদিন সম্পূর্ণ অপরিচিত তুমি, আমাদের এই চিরন্তন ধরণীর জল-বায়ু, আলো-ছায়া, মেঘ-রোদ, তরু-লতা, ফুল-ফল, আর নর-নারীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে শিখেছিলে ! তোমার সহানুভূতির স্নেহ-শীতল স্পর্শে তুমি আজ তাদের সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছ। হে বাঙলার অনুপম চারু-শিল্পী, তোমার অপূর্ব তুলির লেখায় যে অপরূপ সৌন্দর্যের আলোকপাত হ'য়েছে, তা'র স্নিগ্ধ ধারায় স্নান ক'রে তা'রা ধ্যাত হ'য়েছে। হেয়, নগণ্য, ঘৃণিতের বন্দনার জন্ত পূজার যে বরণডালা তুমি ভারে ভারে সজ্জিত ক'রে রেখেছ, তা'র বিনিময়ে নিঃস্ব আমাদের প্রতিদানের কিছুই নাই ; তবুও দীন দরিদ্র আমাদের একান্ত ইচ্ছা, তোমার অষ্টপঞ্চাশৎ জন্ম-তিথির শুভ-বাসরে, তোমার বিরাট জয়ের বন্দনা গান করি। আমরা জানি, আমাদের ক্রটি-বহুল সামান্য এ অনুষ্ঠান, তোমার অপরিদীপ্য দানের একান্ত অনুপযুক্ত ; তবুও কেন জানি না, কোন্ অজানা কারণে, শুধু মনে আসে, আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর পূজার অর্ঘ্য বোধ হয় তুমি নিতান্ত অবহেলা-ভরে প্রত্যাখ্যান করবে না।

হে ভাবী বঙ্গ-সমাজের নবীন গুরু, প্রভূষের শক্ততার মত তুমি শারদীয় ভাদ্রের শেষ দিবসের উদয়াচলে দেখা দিয়েছ ; কোথায় তোমার অন্তাচল, তা' কেহ জানে না। তবুও অপরিমান ভাস্করের



জ্যোতিতে তোমার অন্তঃকালের পথ আলোকিত হয়ে উঠছে। বহু—বহু অতীতের কথা;—গাস্ফুডের ঝঙ্কারবুকে অশ্রুশীলা, অপরূপ, বণিক-ছহিতা তাঁর মহান জয়যাত্রার পথে যাত্রা করেছিল এই দিনে; এই স্মরণীয় দিনে তোমারও পথযাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা কামনা করি—সেই বিজয়িনী মহীয়সী মহিলার মত, তুমিও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিজয়ের পরিপূর্ণ গৌরবে মগ্নিত হয়ে ওঠ।

হে রূপদক্ষ শ্রুতি, বাঙলার জীবন-কাহিনীর স্তরে স্তরে যে অপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন, বেদনা, অনুভূতি, স্মৃতি ও শান্তি মধুময় করে রেখে গেলে, তোমার অনতিরিপ্ত লেখনীমুখে যে অপরূপ বাঙ্গলা আর জীবন-বিলেবণ আমাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায় পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা' অনন্তকাল ধরে নিখিল বঙ্গের মনোহরণ করুক।

আজিকার এই উৎসব-বাসরে সম্মিলিত বাঙলার সাহিত্য-সেবিগণের সহিত আমাদেরও মিলিত প্রার্থনা,—তুমি দীর্ঘ—দীর্ঘ জীবন লাভ করে, আমাদের উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা বাণীকে গৌরবের জয়মালো বিভূষিত কর—মহিমার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোল।

আজিকার 'উদয়নের' হে মহনীয়, বরণীয় অতিথি, তোমার অতুলনীয় প্রতিভার পদপ্রান্তে আমরা অন্ধাভরে মাথা নত করে দিলাম। ইতি—

৩১-এ ভাদ্র,

১৩৪০

তোমার গুণ-মুগ্ধ

উদয়নের কর্মসান্নিহিত

কলিকাতা লিটন ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
গবেষণা কেন্দ্র  
শ্রীমদ্রামানন্দ শেখর কলকাতা-৭০০০৫৮

আশ্বিন

১৩৪০



প্রাণেন্দ্র দেবতা

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি

ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে অনেককাল হইতে অনেক বৈদিক ঋষিরা পৌত্তলিক ছিলেন; কেহ বলেন, তাহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, তাহারা স্বর্গ-প্রবেশের উপাসনা করিতেন, কখনও মেঘ ও বৃষ্টি, কখনও নদ ও নদী এবং কখনও বা গাছপালাও উপাসনা করিতেন। আবার অনেকে বলেন, এইরূপ উপাসনা পুরাতনকালে সকল সভ্য বর্ষের জাতিদের মধ্যে বর্তমান ছিল, এবং এখনও কোল, ভীল, বীণ্ডালদের মধ্যে এবং আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পুরাতন বৈদিক ঋষিরাও অনেকটা সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের ধর্মকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা "হিনোথিস্ম" (Henotheism) নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা যখন ঐহাকে পূজা করিতেন, ঐহার উদ্দেশে যত্ন লিখিতেন, তখন তাহাকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া ভূজিতেন, এবং অজ্ঞ সমস্ত দেবতাকে একেবারে ছোট করিয়া দিতেন। আবার অজ্ঞ একটিকেও যখন ধরিতেন, তখন বাকী সকলগুলিকেই তাহার ছোট করিয়া দিতেন। অর্থাৎ বেদের ধর্ম একপ্রকার খোদামোদবাদে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই

বেদের এই সনাতন খোদামোদবাদ হইতেই ভারত-বর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা খোদামোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা হইবারই কথা!

এখন দেখা যাক, কথাটা কতদূর সত্য। ঋগ্বেদ কোন্ কালে লেখা হইয়াছিল, তাহারই ঠিক নাই। পশ্চিম ভারতের মনেন্ধো রড্জো হইতে প্রাপ্ত পুরাতন প্রত্নতত্ত্ব হইতে অহমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের সভ্যতা সিন্ধুদেশের প্রাচীন সভ্যতা হইতেও কিঞ্চিৎ পুরাতন। তাহা হইলেই ঋগ্বেদকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসরের পরে আর আনা যায় না। তাহাই যদি হয়, এখন আমরা ঋগ্বেদের অর্থ বাহা করিতেছি, তাহাই ঠিক, না সামান্য-চার্যা চতুর্দশ শতাব্দীতে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক? সামান্যচার্যা যদি ঋগ্বেদের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি জায়গায় জায়গায় পাঁচ ছটি অর্থ দেন কেন? একটি ঋকের অর্থ একটিই হইবে, সামান্যচার্যা একেবারে পাঁচ ছটি অর্থ দিয়া, দোকান মাছাইয়া দেন কেন? তাহা হইলেই বেশ বৃষ্টি পেল, ঋগ্বেদের এখনও অর্থই ঠিক হয় নাই, এবং বহু পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারেন নাই। তাই আজ আমাদের ধারণা, বেদে কিছুই নাই, ও কতগুলো বাজে কবিতা আর গান।



তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্রের সাহায্য লইয়া ঋগ্বেদের কতকগুলি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, এবং এইরূপ তুলনামূলক পদ্ধতিতে শব্দের অর্থ করা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি সামান্য শব্দের অর্থ জানিয়া কি করিয়া এই বৃহৎকালের ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ অর্থ করা সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার উপর আবার যে গ্রীক, লাতিন, অবশেষে ইতালি ভাষা ও সাহিত্যের মারক্‌স্‌ ঋগ্বেদের শব্দের অর্থ করা হইতেছে, তাহাদের প্রাচীনতম সাহিত্য কি ঋগ্বেদিক কালের সমসাময়িক? গ্রীক ও লাতিনের সর্লপোকা পুরাতন সাহিত্যও ঋগ্বেদের কয়েক সহস্র বৎসর পুরে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সে কেন্দ্রে গ্রীক, লাতিন, অবশেষে ইতালি সাহিত্য হইতে আজকাল সে অর্থ করা হইতেছে, তাহাই যে ঋগ্বেদের সময়কাল শব্দের অর্থ, তাহা কি করিয়া অমুমান করা বাইতে পারে? কারণ, ভাষা কখনও এক থাকে না, ভাষা সময় হিসাবে এবং স্থান হিসাবে প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হইতেছে। সঙ্কট হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অকলশ, অকলশ হইতে প্রাদেশিক বর্তমান ভাষা সকল এই পরিবর্তনবাদকেই সমর্থন করিয়া থাকে। কাজেই তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্রের মারক্‌স্‌ ঋগ্বেদের মত প্রকাণ্ড সাহিত্যের কথামাত্রও বুঝা যায় না।

অতএব এইরূপ আংশিক ভাবে বিবেচিত হইই চারিটি তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের সত্যতা সন্দেহ, ঋগ্বেদের অসত্য ও বর্ধিত। সন্দেহ যে সকল অল্পত মত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আর একটা কথা। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট বেদ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসত্যতা ও বর্ধিততারই একটা নিদর্শন। কারণ সে যুগে অসত্যতা ও বর্ধিততা ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না, এবং বেদেই যে এই অসত্য জাতি আপনাদের

মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, এই কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতে বেদের স্থানান সকলের চেয়ে বড়, — ছায়, বেদান্তেরও অতঃস্থ স্থানান নাই। তাহা ছাড়া, 'হিন্দু' বলিতে গেলেই বুদ্ধিতে হয়, বাঁহারা বেদে বিশ্বাস করেন। বেদের সোহাই না দিলে ভারতে কোন শাস্ত্র স্থানান পাইত না, এবং সে শাস্ত্রকে কেহ মানিত না। বেদের ভিতর বাহ্যতে কোমরূপ তুলনামূলক প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য নানারূপ পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতেই পদপাঠ, শব্দপাঠ, ছটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদির প্রক্রিয়া হইয়াছে। এখনও ভারতের নানানস্থানে ছটাপাঠ ও ঘনপাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই বহু সহস্র বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের সর্লপোকা পুরাতন ও অতুলনীয় এই জাতীয় সম্পদ আশ্রিত তাহার আলি সুরূপ রক্ষা করিয়া আছে। যদি বেদে মাত্র বর্ধিততারই অভিভাব্যি হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য এত বহুকালব্যাপী চেষ্টাই বা কেন, আর কোন নূতন শাস্ত্র লিখিতে গেলে বেদের সোহাই দেওয়াই বা কেন?

তাহার কারণ, ভারতে বেদের মান সর্লপোকা বেশী। বেদই সর্লপোকার আকর, বেদই সর্লপোকার আধার, বেদই সকল রসের উৎস। বেদকে বলে অপোকাগুরু; তাহার অর্থ ইহা নহে যে, পুঙ্খ মুখা তৈয়ারী করে নাই। উহার অর্থ এই যে, উহা মানবের ক্ষমতার অতীত। যদি মানবেই করিয়া থাকেন ত তিনি অসামান্য, তিনি ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন। বেদশব্দ বিবধাতু হইতে সিন্ধ হইয়াছে। বিবধাতুর অর্থ 'জানা' তাই বেদ বলিতে জানের ভাণ্ডার বুঝায়। সব চাইতে বেশী জ্ঞানার দরকার বয়জ্ঞিয়া, যে বয়জের জন্য বেদী দরকার হয় না, পুরোহিত ঋগ্বেদের প্রয়োজন হয় না, দি, ঘর, চক, পুরোহিতের দরকার হয় না। সে যজ্ঞ এই বিরাটু সৃষ্টিজ, বাহ্যতে এই অল্পত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই লীলার

প্রকৃত জ্ঞানই মানবের বাহ্যিক জ্ঞান, এই জ্ঞানেরই অপর জ্ঞান আত্মজ্ঞান, আর এই জ্ঞানের উদয় হইলেই প্রকৃত মোক্ষলাভ করা যায়। এই জ্ঞানকেই ইন্দ্রের শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছে। যতদিন সৃষ্টি বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই জ্ঞান মানবের কাম্য থাকিবে, এবং অজ্ঞাত সকল প্রকার জ্ঞানের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে। বেদে এই বিরাটু সৃষ্টি-রহস্যের যার গুলিয়া দিয়াছে, আত্মজ্ঞান লাভ করিবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছে, তাই আমাদের দেশে বেদের এত স্থান।

এই বৈদিক সৃষ্টিরাজ্যে সর্লপশক্তিমান সূর্য্যনারায়ণ একমাত্র কর্তা; তিনি একটি সংবৎসরে উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের ত্রিবি বপন করিয়া যাইতেছেন। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। তিনি সর্লপাণী, তিনি সর্লপশক্তিমান পরমেশ্বর ও ব্রহ্ম, সৃষ্টিজের বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সৃষ্টিজের আপনাকে বহুবা বিভক্ত করিয়াছেন, এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা প্রবর্তন করিয়াছেন। বেদের জ্ঞান, সর্লপালা শব্দের জ্ঞান, সর্লপালা বিজ্ঞানের জ্ঞান, তাই বেদ হইতে সর্লপালায়ের উদয়, এবং বেদে সর্লপালায়ের উৎসরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। আমাদের কাছে বেদ বর্ধিততার অস্বাভাবিক নহে, সর্লপালা সত্যতার অভিভাব্যি, যে সত্যতা আর কখনও আসিবে না, সেই সত্যতার অভিভাব্যি।

বলিতেছিলাম, বেদের অর্থ জানা সহজ নহে, সায়নারাচার্য্য কণ্ঠমীমামসক ছিলেন, তিনিও বেদকে কণ্ঠমীমামসার চমকার ভিতর মিলাই দেখিয়াছেন, কাজেই বেদে জ্ঞান বড় পান নাই, কেবল কণ্ঠই দেখিয়াছেন। তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্র প্রায় অন্ধ, তাহার মনে চক্ষু ফুটিতেনি। ভাষাশাস্ত্রের ভিতর দিয়া বেদকে দেখিলে জ্ঞান হইবে না, অজ্ঞানেই আত্মম্ব থাকিতে হইবে। বেদের জ্ঞান বাহ্যতে সমাক্ষ প্রচার এবং সমাক্ষ বোধনাম্ব হয়, তাহা সকলেই কামনা করেন সত্য, ইহাতে শুধু বৈদিক দেবতা সন্দেহ হইই চারিটি

কথা বলিব। বিলাতী পণ্ডিতেরা বৈদিক দেবতা সন্দেহ বাহা বলিয়াছেন, তাহা যে শেষ কথা নয়, তাহাই ইহাওয়ার জন্য এতবড় ভূমিকা দিতে এবং এতগুলি অবাস্তব কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

বৈদিক দেবতা সন্দেহে সৃষ্টিবস্তুর বিবেচনা করিতে গেলে একদিন বৃহৎকাল প্রবোধ আবশ্যক হয়, কারণ, এই বিবরণ বেদেরই মত গহন এবং বেদেরই মত একটি সমুদ্রবিশেষ। কাজেই ছুই একটি সামান্য তথ্য বাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিব, মনন করিয়াছি। সকলেই জ্ঞানেন, প্রত্যেক বেদের ছোট করিয়া 'অক্ষ' আছে। এই ছোট অক্ষকেই বোধশব্দ বলা হইয়া থাকে। বেদ বুদ্ধিতে হইলে এই ছয় সন্দেহই সাহায্য লইতে হয়। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সাহায্যে বেদের শব্দ সন্দেহ জ্ঞান হয়, এবং ইহারই সাহায্যে সায়নারাচার্য্য ও আধুনিক পণ্ডিতেরা বেশী করিয়া এহাণ করিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রও বেদের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে হয়। বেদের অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায্য অতি অল্পই আজ পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে। বৈদ্যজ্যোতিষের পুঁথকে জ্যোতিষের উপকারিতা সন্দেহে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় —

যথা শিবা ময়ুরাখাং নাগানাং মথ্যো যথা।

তথ্যবৈদ্যশাস্ত্রাখাং জ্যোতিষঃ সূর্য্যনি হিতম্।

"ময়ুরের শিবা যেমন তাহার মাথায় থাকে, নাগের মনি যেমন তাহার মাথায় থাকে, সেইরূপ বৈদ্যশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষের স্থান সকলের শীর্ষে।"

আবার এক জায়গায় বলে "জ্যোতিষামরনং চক্ষুঃ" অর্থাৎ বেদের চক্ষুই জ্যোতিষ, অথবা বেদ দেখিতে গেলে জ্যোতিষ মিলাই তাহা দেখিতে হয়; এবং এই সকল কথার সারসভা একই চেষ্টা করিলেই বুদ্ধিতে পারা যায়। আর কোন কথা ধরা থাক বা না থাক, বেদের দেবতা বুদ্ধিতে হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য লইতেই হইবে।

বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে, যথা প্রজাপতি,



ঋতা, অহির্ঘৃণা, অজৈকপাদ, যম, অশ্বিনী ইত্যাদি।  
ইহার কারণ, কাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ, ইহাদের  
কাৰ্য্য কি ইত্যাদি কোন প্রশ্নের ভাল উত্তর পাওয়া  
যায় না। কিন্তু বৈদ্যজ্যোতিষে এ বিষয়ে একটি  
বেশ ভাল স্রোত আছে। এটি বড় দরকারী স্রোত,  
তাই উহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

অগ্নিঃ প্রজাপতিঃ সোমো রুদ্রোহিত্রির্বৃষপতিঃ।  
সর্পশ্চ পিতৃশ্চৈব ভগশ্চৈবায়মাপি চ।  
সবিতা ঋতঃপথ বায়শ্চৈবায়মাপি মিত্র এব চ।  
ইন্দ্রো নিম্ণ ত্রিরাশো বৈ বিধেদেবাত্তথৈব চ।  
বিষ্ণুর্বসবো বরুণোহজ্জেকপাত্তথৈব চ।  
অহির্ঘৃণাশ্চ পুণ্য অশ্বিনী যম এব চ।

উপরোক্ত স্রোতে কয়েকটি দেবতার নাম দেওয়া  
হইয়াছে। এই দেবতাগুলিকে বৈদ্যজ্যোতিষে  
নক্ষত্রদেবতা বলা হইয়াছে। ইহাদের ভিতর সবিতা  
সূর্য্যের নাম, বিষ্ণু সূর্য্যের নাম, অর্য্যমা ও ভগ সূর্য্যের  
নাম। কাজেই এইগুলি সবই যে সূর্য্যের নাম, সে বিষয়ে  
সন্দেহ করিবার কোন হুঁকিমুক্ত কারণ দেখিতে  
পাওয়া যায় না। এইগুলিকে আবার যখন নক্ষত্র-  
দেবতা বলা হইয়াছে এবং যখন সাতাশটির বেশী নাম  
পাওয়া যাইতেছে না, তখন স্বতাই মনে হয় যে, সূর্য্য  
যখন ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তখন তাহার  
একরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। কাজেই বলা  
যায়, এই সকল দেবতা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহেন,  
এবং সূর্য্য আপনাকে গুণকর্ম্মভেদে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন  
দেবতারূপে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সাতাশ নক্ষত্রে  
এইরূপে আপনাকে ভাগ করা “একং সমিপ্রা বহবা বদন্তি”  
এই সনাতন বৈদিক মতরই পোষকতা করিয়া থাকে।

কোন নক্ষত্রে অশ্বিনান করিলে সর্পশক্তিমান সূর্য্য-  
দেবের কি নাম হইয়া থাকে এবং তাহার গুণ ও কর্ম্ম  
কিরূপ ভেদ হইয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যসূত্রের  
পুস্তক তৈত্তিরীয় ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই  
পুস্তক হইতে প্রাপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিত কোঠকে দেওয়া  
হইল।

সংখ্যা	দেবতা	নক্ষত্র
১	অগ্নি	কৃত্তিকা
২	প্রজাপতি	রোহিণী
৩	সোম	মৃগশিরা
৪	রুদ্র	আর্দ্রা
৫	অহিত্রি	পুনর্ভু
৬	বৃষপতি	পুণ্ডা (ভিত্তা)
৭	সর্পশ	অশ্লেষা (আশ্রেষা)
৮	পিতৃশ	মঘা
৯	ভগ	পূর্বা ফল্গুনী
১০	অর্য্যমা	উত্তরা ফল্গুনী
১১	সবিতা	হস্তা
১২	ঋতা	চিরা
১৩	বায়ু	স্বাতী (নিষ্টা)
১৪	ইন্দ্রাযী	বিশাখা
১৫	মিত্র	অনুরাধা
১৬	ইন্দ্র	জ্যেষ্ঠা
১৭	নিম্ণ ত্রি	মুলা
১৮	আপঃ	পূর্বাষাঢ়া
১৯	বিধেদেবাঃ	উত্তরাষাঢ়া
২০	বিষ্ণু	শ্রবণা (শ্রোণা)
২১	বহুশ	ধনিষ্ঠা (প্রথিতা)
২২	বহুশ	শতভিষা
২৩	অজৈকপাদ	পূর্বাভাদ্রপদা (প্রোতপদা)
২৪	অহির্ঘৃণা	উত্তরাভাদ্রপদা (প্রোতপদা)
২৫	পুণ্য	রেবতী
২৬	অশ্বিনীদ্বয়	অশ্বিনী
২৭	যম	ভরণী

যখনই ঋগ্বেদে ইহাদের মধ্যে কোন একটি দেবতার  
নাম করা হইবে, তখনই স্মৃতিতে হইবে যে, যে দেবতার  
নাম করা হইয়াছে, তাহারই নক্ষত্রের কথা বলা  
হইতেছে। অর্থাৎ সেই নক্ষত্রে অবস্থানকালে সূর্য্য কি  
কি করিয়া থাকেন, এবং তাহার গুণ ও কর্ম্ম কিরূপ  
ভেদ হইয়া থাকে, তাহারই বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ঋগ্বেদের দেবতা স্মৃতিতে হইলে প্রথমে এই নক্ষত্রের  
সহিত সূর্য্যের কি সম্বন্ধ তাহা সম্যক বোধগম্য হওয়া  
চাই। যথা, পূর্বা নামে অনেকগুলি নক্ষত্র আছে।  
পুণ্য বলিতে গেলেই ইহা জানা দরকার যে, উহা রেবতী  
নক্ষত্রাবলি সহিত সূর্য্যের নাম। রেবতী নক্ষত্রে অবস্থান-  
কালে সূর্য্য সকলের—পশু, পক্ষী, মানব ও উদ্ভিদ  
জাতের—পোষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং সেইজ  
তাহার নাম পুণ্য অর্থাৎ পুষ্টিকর্ত্তা দেওয়া হয়। পুণ্য  
‘পু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং এই ধাতুর অর্থ  
পোষণ করা।

তাহার পর আবার দেখা দরকার, যে কান্ত্রিভূতে  
এই ২৭টি নক্ষত্র থাকে, তাহা আবার ২২টি রাশিতে  
বিভক্ত। সূর্য্যের এক একটি রাশিভোগকালকে এক  
একটি সৌর মাস বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই  
সৌর মাস দ্বাদশটি, ইহাতেও সূর্য্যের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়,  
এবং তাহার গুণ ও কর্ম্ম ভেদে হইয়া থাকে। প্রত্যেক  
রাশিতে আবার সওয়া ছুইটি নক্ষত্র অবস্থান করে।  
যথা—

রাশি	নক্ষত্র
১ মেঘ	অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা
২ যুব	কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা
৩ মধুন	মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ভু
৪ কামিন	পুনর্ভু, পুণ্ডা, অশ্লেষা
৫ সিংহ	মঘা, পূর্বাফল্গুনী, উত্তরাফল্গুনী
৬ কচ্ছা	উত্তরাফল্গুনী, হস্তা, চিরা
৭ জ্যেষ্ঠা	চিরা, স্বাতী, বিশাখা
৮ চরিত্রিক	বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা
৯ ধরু	মুলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া
১০ মকর	উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা
১১ কুম্ভ	ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বাভাদ্রপদা
১২ মীন	পূর্বাভাদ্রপদা, উত্তরাভাদ্রপদা, রেবতী

ঋগ্বেদে যখনই কোন দেবতার নাম করে, তখনই  
সূর্য্যের একটি বিশেষ নক্ষত্রে অবস্থান নির্দেশ করে,  
এবং সেই নক্ষত্র যে রাশিতে অবস্থিত, সেই রাশিও

নির্দেশ করে। যখন, যদি যমদেবতার নাম ঋগ্বেদে  
করা হয়, তাহা হইলে স্মৃতিতে হইবে, তিনি ভরণী  
নক্ষত্রের দেবতা, এবং ভরণী নক্ষত্র মেঘরাশিতে  
অবস্থান করায় যমদেবে উক্ত রাশিও নির্দিষ্ট হইবে।  
তাহা হইলেই দেখা যায়, ঋগ্বেদের প্রত্যেক দেবতার  
সহিত নক্ষত্র ও রাশির প্রত্যেক ও পারোক্ষভাবে  
সম্বন্ধ রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী সূত্রের অনেক আখ্যান ঋগ্বেদের হস্ত হইতে  
লওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি  
জ্যোতিষ ব্যতিরেকে এখন হোয়ালিরূপে প্রচলিত  
হইয়াছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, যেমন  
মহাদেবের মাথার জটা হইতে গঙ্গার অবতরণ-কাহিনী।  
ইহা কি করিয়া হইতে পারে? এইরূপ অদ্ভুত গল্প  
বলিবার কারণ কি? যদি জ্যোতিষের ভিতর দিয়া  
দেখা যায়, তাহা হইলে পাঠকস্বর্গ দেখিবেন, এইরূপ  
বর্ণনার অতিরঞ্জন বা হোয়ালি কিছুই নাই। মহাদেব  
বা শিব ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্রের নাম। রুদ্র বলিতে  
যে দেবতা অতিরিক্ত অশ্রবণ করেন, অথবা অতিমাত্রায়  
চিৎকার করেন। রুদ্র আশ্রানক্ষত্রের দেবতা, আবার  
আশ্রানক্ষত্র মিনুরাশিতে অবস্থিত। সূর্য্য যখন  
আর্দ্রা থাকেন, সেটা আষাঢ় মাস, সে সময় বৃষ্টিও হয়,  
মেঘও প্রচুর গর্জন করিয়া থাকে, কাজেই সূর্য্য তখন  
রুদ্র হন, খুব ক্রোদে অর্থাৎ ব্যর্থ করেন গঙ্গা বা  
টোঁচনা বা গর্জন করিয়া থাকেন। ছাত্রাণ্ড বা  
আকাশগঙ্গা এই মিনুরাশির ভিতর দিয়া গিয়াছে।  
এই জিনিষটি বুঝাইবার জ্ঞান আখ্যানটি রচিত হইয়াছে।  
এই আখ্যানটির মূল কথা এই যে, রুদ্রের মাথা হইতে  
গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে। কোনকালেই সাদা রঙের  
পদ্ম নামক দেবতার জটা হইতে আমাদের গঙ্গা বা  
ভাগীরথী অবতরণ করেন নাই। বাঁহাদের সে মাথার  
আছে, সেটা তাহাদের একটা মন্ত জল।

সূর্য্যের আখ্যানটিও ঠিক এই শ্রেণীর। পুরাণে  
বলে যথা ঋতর কচ্ছা, জ্যেষ্ঠা, প্রভা বা সরগুহে বিবাহ  
করিয়াছিলেন। প্রভার গর্ভে মনু, কাম ও যমী-নামক



হই পুত্র ও এক কন্ডার জন্ম হয়। কিন্তু সরগুা সূর্যের তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তরকুরুতে পলাইয়া যান এবং তথায় ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। হাইবার সময় পতির সেবার জন্ত আপনাদেব শরীর হইতে নিজেই মত দেখিতে একটি ছায়ারূপ উৎপন্ন করিয়া সূর্যের নিকট রাখিয়া যান। ছায়ার গর্ভে শনি, সার্বর্ণি ময়ূ ও তপতীর জন্ম হয়। এক সময়ে ছায়া যমের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর শাপ দেন। ইহাতে যম ও সূর্য্য দুইজনেই, ছায়া যে যমের মাতা নহে, তাহা জানিতে পারেন। সূর্য্যদেব, অতঃপর ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, প্রভা উত্তরকুরুতে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন, এবং সেইজন্য তিনিও অথের রূপ ধরিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এবং সেই ঘোটকীর গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই অশ্বরূপে জন্মগ্রহণ করিল, এবং তাহারা হই অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রেবন্ত নামে পরিচিত হইল।

যদি ঋগ্বেদে এই বিষয় অসুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঋগ্বেদের দুইটি ঋকের উপর নির্ভর করিয়া এই আখ্যানটি রচিত হইয়াছে। সেই দুইটি ঋক্ নাটক দেওয়া হইল এবং তাহাদের তর্জমাও দেওয়া হইল।

১। ঋগ্বেদে বহুতরু কুমারীতীর বিবাহ ভুবনঃ সমেতি।  
যমন্ত মাতা পর্ব্বমুখা মহোজায়া বিবস্বতো ননাম ॥  
“ঋগ্বেদে তাহার কস্তাকে বিবাহ দিতেছেন, সেইজন্য সমস্ত জগতের জীব একত্র হইয়াছেন। যমের মাতা ও মহান সূর্য্যের পত্নী পরিণয় করিবার সময় আপনাকে লুকাইয়া কেগিলেন।”

২। “আপাঙ্করমুতাং মন্তোভাঃ কুরী সর্বানমদগ্নবিস্বপতে।  
উত্বেশ্বানবভরন্তদাসীদজ্জহাৎ বা মিশুনা সরগুাঃ ॥  
“দেবতার মন্ত্রাদিগের নিকট হইতে অমৃত গোপন করিয়া তাহার (ঋগ্বেদের হুহিতার) ঋকিম প্রতিকৃতি (সূর্য্যদেবকে) দান করিলেন। আবার সরগুা অশ্বিনীদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের জন্মদান

করিলেন, এবং আরও দুইজনের (যম ও যমীর) জন্ম দিলেন।”

ঋক্ দুইটির দেবতা ঋগ্বেদে, তিনি চিত্রা নক্ষত্রের দেবতা। তিনিই বিধকন্ডা বলিয়া খ্যাত, তিনি স্বর্ণের স্থপতি, তাঁহার কান্ড সকল জিনিষে রূপ দেওয়া। তিনি না থাকিলে কোন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কস্তা প্রভা, অর্থাৎ যে প্রভা সূর্য্যকে রূপ দিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার রশ্মি। আবার প্রভারই আর এক নাম সরগুা অর্থাৎ যিনি অশ্বগমন করেন। সূর্য্য যেখানেই যান, প্রভা বা সূর্য্যের রশ্মি সেই সেই স্থলেই বিরাজমান থাকে বলিয়া প্রভার আর এক নাম সরগুা। দক্ষিণাঙ্গে সূর্য্যের তেজঃ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং যখন সূর্য্য চিত্রা নক্ষত্রের নিকটবর্তী হন অর্থাৎ খত্তরবাড়ী আসেন, তখন দিন অত্যন্ত ছোট হইয়া থাকে এবং রাজির অন্ধকার বাড়িতে থাকে। এই জিনিষটি বুঝাইবার জন্ত প্রভার উত্তরকুরুতে পলায়ন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তারপর সূর্য্য ছায়ার সহিত থাকিতে থাকিতে যখন মকররাশিতে আসেন, তখন তাঁহার তিনটি পুত্রকস্তা ছায়ার গর্ভে উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে শনি এক, এই শনি সেইজন্য মকররাশির অধিপতি বলিয়া পরিচিত।

মকরসংক্রান্তি হইতেই উত্তরায়ণের আরম্ভ, অর্থাৎ এই সময় হইতেই দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং অন্ধকার কম হইতে থাকে। ঋগ্বেদে জ্ঞানকেই আলোক ও অন্ধকারকেই অজ্ঞানতা বলিয়া মানিয়াছে। এতদিন অন্ধকার ছিল বলিয়া সূর্য্য অজ্ঞান ছিলেন, এবং সেইজন্য ছায়াকে প্রভারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে অন্ধকার যখন কাটিয়া গেল, তখন ছায়া যে প্রভা নহে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার বোঝ লইতে লাগিলেন। পরে জানিলেন, প্রভা উত্তরকুরুতে অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরায়ণের পথে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। কাজেই সূর্য্যও ঘোড়ার রূপ ধরিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে

লাগিলেন। মেঘরাশিতে অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের জন্ম হইল বলিয়া তাঁহাদের উক্ত নক্ষত্রের অধিপতি করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রভা আপনাদেব পূর্ণরূপ ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, এবং শ্রীষ্ট পরবর্তী নক্ষত্র ভ্রমণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় প্রভার গর্ভে যম, যমী ও ময়ূর জন্ম হইল, এবং যমকে উক্ত ভ্রমণী নক্ষত্রের অধিপতি করিয়া দিয়া তিনি আগাইয়া গেলেন।

পরে আবার সেইরূপ ঋগ্বেদ, মাত্তা ও ছায়ার লীলা বৎসর বৎসর এইভাবে চলিতে লাগিল।

সূর্য্যদেব ঘোড়ার রূপ লইলেন কেন, এ বিষয়ের একটা উত্তর দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন, ঘোড়ার গর্ভ সম্পূর্ণ হইতে পুরা বারমাস লাগিয়া থাকে। এবং সূর্য্যেরও সমস্ত জন্মস্থিতি একবার ঘুরিতে বারমাস লাগিয়া থাকে বলিয়া সূর্য্যকে ঋগ্বেদের অনেকস্থলে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, ঋগ্বেদে কার্য্য ও দরকার, দেশে সেরূপ চর্চা নাই। ইহা বড়ই কারণভাব বুঝাইবার জন্ত পিতা-পুত্র, খত্তর-মামাই

ইত্যাদির সম্বন্ধ করনা করা হইয়াছে। যেমন চিত্রায় সূর্য্যের নাম ঋগ্বেদে, আবার সূর্য্যের আখ্যানে ঋগ্বেদে সূর্য্যের খত্তর হইতেছেন। একস্থলে সূর্য্য রূপ দিতেছেন, আর একস্থলে সূর্য্য পতির কার্য্য করিতেছেন। ঋগ্বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন।

পরিশেষে বল্লেখ্য এই যে, ভবিষ্যতে ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে কি ভাবে গবেষণা করিলে সত্য নিষ্কাক্ষিত হইতে পারে, তাহারই একটা দিক্ এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয় অতীত গহন, এবং এইভাবে প্রত্যেকে ঋকের মর্ম্ম-গ্রহণ করা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। ঋগ্বেদের হুহিতা হইবে, তাহারা যদি এই বিষয়ে আরও গবেষণা করেন, তাহা হইলে শ্রম পার্থক্য জ্ঞান করিব। আর একটি কথা এই যে, বেদ আমাদের অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, এবং এ সম্বন্ধে বেরূপ চর্চা হওয়া দরকার, দেশে সেরূপ চর্চা নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।





## সাপ ও বাজপাখী

(কথিত হইতে)

লেখক—মাসিম গর্কি

অনুবাদক—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাপ পাহাড়ের উপরে বেয়ে উঠে ন্যাংসতে পাহাড়ের পথে কুণ্ডলী পাকিয়ে সমুদ্রের দিকে ভাকিয়ে পড়ে ছিলো। উর্ধ্বে সূর্য্য অগ্নিহো, আর তারই উত্তাপে ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিলো পাহাড়। নীচে সমুদ্র পাথরের উপর আছড়ে পড়ছিলো। আর পাহাড়ের সেই অন্ধকার পথে হুড়ির বাজনা বাজিয়ে, জল ছিটিয়ে একটা পাহাড়ে নদী সমুদ্রের সঙ্গেই মিলিত হ'তে দৌড়ছিলো। ফেনার আবৃত হ'য়ে গর্জন করতে করতে সে পাহাড়কে চিরে ফেলে সমুদ্রের উপর পড়ছিলো। হঠাৎ সেই পথে, যেখানে সাপ শুয়ে ছিলো, সেখানে আকাশ থেকে বাজপাখী নেমে এলো। তার বুকে আঘাত পেলে, তার ডানা রক্তজ। হঠাৎ একটা চীংকার ক'রে সে মাটির উপর এসে পড়লো, আর নিম্নল জোরে সেই কঠিন পাহাড়কে তার বুক দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। সাপ তার পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলো কিন্তু সে শীংগিরই বৃত্তে পারলো যে, পাখীর আবু আর মাক্র কয়েক মুহূর্তের জন্তে। তখন সে আহত পাখীর কাছে একটু একটু ক'রে এগিয়ে গিয়ে তার চোখের কাছে হিহুহি শব্দ ক'রে বললো, “কি, তুমি মরতে বসেছো নাকি?”

“হ্যাঁ, আমি মরছি”—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাজপাখী বললো, “আমার জীবন অসীম হৃৎকের জীবন ছিল। আনন্দ কি তা' আমি জানি। আমি বরাবর সাহসের সঙ্গে হুজ ক'রে এসেছি। আকাশ আমি দেখেছি, তুমি কখনো আকাশকে অত কাছ থেকে দেখতে পাবে না,—হায়, বেচারী তুমি।”

সাপ পাখীর বোকাগিরি দেখে মনে মনে হেসে উত্তর দিলো, “আকাশ? আকাশ তো শুধু কীকা

জারখা, সেখানে আমি কেমন ক'রে যাবো? আমার পক্ষে এই জারখাই সব চেয়ে স্বন্দর, কেমন তপ্ত আর ন্যাংসতে।”

সে মনে মনে ভাবলো যে, আকাশে উড়ি আর মাটিতে গড়িয়ে চলি—শেষ একই। সব মাটিতে মিশবে, ধুলিতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই সাহসী বাজপাখী হঠাৎ তার ডানা ঝাপটে মাটি থেকে একটু উঠে পথের চারিদিকে চেয়ে দেখলো। দূর বর্ণের পাথরের মধ্য দিয়ে জল চলেছে। বাহু-শূল সেই অন্ধকার পাহাড়ের পথ করা-পাতার গড়ে ভরপুর ছিলো। বাজপাখী তার সব শক্তি দিয়ে ব্যাখ্য চীংকার ক'রে উঠলো, “হায়, যদি আমি আর একবার আকাশে উড়তে পারতুম, তাহলে আমি আমার শত্রুকে আমার বুকের ক্ষতের উপর চেপে ধরতুম, সে আমার রক্তে হাঁপিয়ে উঠতো। ওঃ! হৃৎকের আনন্দ।”

সাপ ভাবতে লাগলো, যখন পাখী এমন ক'রে কাংরাচ্ছে হয়তো বা তাহলে আকাশে বাস করা সত্যিই খুব আনন্দের। সে পাখীর কাছে প্রণব করলো, “পাহাড়ের কোণে গিয়ে নীচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়। হয়তো তোমার ডানা তোমাকে একটু উঁচুতে তুলবে। তার ফলে তুমি তোমার আকাশে আরো কিছুক্ষণ বাঁচতে পারবে।”

বাজপাখী কেঁপে উঠলো, আর চীংকার ক'রে আপ্তে আপ্তে পাহাড়ের ধারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার পা পিছল পাথরের উপর বার বার সঁদে বাঁছিলো। সে তার ডানা মেলে ধ'রে তার ক্ষত বুকের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীংকার



দর্পীচি



করলো। তার চোখ ছুটি জলতে লাগলো, সে নীচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাখরের মত বেগে সে নীচের দিকে পড়তে লাগলো। তার ডানা খেলো ভেঙ্গে, তার পালক খেলো ধঁসে। নদীর ঢেউ তাকে ধঁরে নিলো, তার রক্ত ধুয়ে দিলো। তার স্কট কেনা দিয়ে বেঁধে দিয়ে তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ক্ষেঁড়ে চললো। সমুদ্রের ঢেউ বিপন্ন বিলাপের স্বরে তীরের উপর আহুড়ে পড়ছিলো। সমুদ্রের উপর পাখীর মৃতসদৃশ দেখা গেলো না।

সেই শ্যাংসেতে পাহাড়ের পথে শুয়ে শুয়ে বহুকণ সাপ পাখীর মৃত্যুর কথা, আকাশের প্রতি পাখীর গভীর অহরাণের কথা ভাবছিলো। সে সেই দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলো—সে-দূর অনন্তকাল ধঁরে চোখকে আনন্দের স্বপ্ন দিয়ে আদর করে। কি দেখেছিলো এই বাজপাখী অতল সীমাহীন এই মরু-ভূমিতে? কেন এই বাজপাখী, আর বাজপাখীর মত অস্ত্রেরা, তাদের এই আকাশের প্রতি ভালবাসা ধারা আর মৃত্যু ধারা অস্ত্রের এত বিচলিত করে? তারা কি দেখে, কি পায় সেখানে? যদি আমি অল্পক্ষণের জন্তেও আকাশে উড়তে পারতুম তাহ'লে আমিও জানতে পারতুম। সাপ তার ভাবনা অহরায়ী কাজ করলো। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে লাফ দিলো। সাপ হৃদ্যালোকে সব ক্ষিতের মত জলতে লাগলো।

সে মাটিতে গড়িয়ে চলবার জন্তে জন্মেছে, সে আকাশে উড়তে পারে না। সাপ সেটা ভুলে গিয়েছিলো, তাই সে পাখরের উপর পড়ে গেলো। কিন্তু তার ফলে সে মরলো না, সে শুধু হাসলো। ওং, তাহ'লে আকাশে ওড়ার সমস্ত আনন্দ এতই? আনন্দ হচ্ছে প'ড়ে বাওয়ায়! বোকা পাখী ও এই পাখীর মত বোকা অস্ত্রেরা, তারা পৃথিবীকে জানে না, তারা পৃথিবীকে চায় না। তারা বেগে আকাশে ধায়, আর আকাশের মরুভূমিতে প্রাণ

বোজে। সেখানে শুধু মৃত্যু। সেখানে আলো আছে প্রচুর, কিন্তু সেখানে কোন খাদ নেই প্রাণীর প্রাণধারণের জন্তে। কেন তবে এই গর্গ তাদের, যারা উড়তে পারে? কেন এই বিদ্রূপ তাদের 'পরে, যারা উড়তে পারে না? এই গর্গ আর বিদ্রূপ হচ্ছে, শুধু তাদের ইচ্ছার পাগলামিকে ঢাকবার জন্তে, তাদের অর্থহীন অস্তিত্বকে গোপন করার জন্তে। বোকা পাখী, তাদের কথা আর আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমি নিজেই জানি। আমি আকাশ দেখছি, আমি আকাশে উড়েছি, আমি আকাশকে মেপেছি। আমি জানি প'ড়ে বাওয়া কি। আমি মরিনি, শুধু আমি নিজের উপর আরো বেশী বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। যারা পৃথিবীকে ভালবাসতে পারে না, তারা প্রবঞ্চকদের সঙ্গে থাকুক। আমি তাদের আত্মানে আর বিশ্বাস রাখবো না। আমি পৃথিবীর সৃষ্টি, আমি পৃথিবীর সঙ্গে থাকবো। সাপ কুণ্ডলী পাকলো আপনায় সবচেয়ে আপনি গর্গ অহতব ক'রে।

সমুদ্র আলোতে ঝলমল করছিলো। ঢেউগুলি তীরের উপর সজোরে আঘাত করছিলো। সিংহের গর্জনে এই সাহসী বাজপাখীর গান ধনিত হচ্ছিলো। পাহাড় আর আকাশ এই ভয়ঙ্কর গানের স্বরে কাঁপছিলো।

সাহসীদের পাগলামির উদ্দেশে আমরা গান গাই। সাহসীদের পাগলামি জীবনের জ্ঞান। হে সাহসী বাজপাখী! শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে তুমি রক্ত ক্ষয় ক'রে মরেছো; কিন্তু সময় আসবে যখন তোমার তপ্ত রক্তের কোঁটা আগুনের শিখার মত জীবনের অন্ধকারে জ্বলে উঠবে, আর অনেক সাহসী প্রাণকে প্রজ্বলিত করবে আলো আর স্তম্ভিত পাগল তুষার।

তুমি মরেছো, হাং নেই। সাহসীদের গানে ভূমি চিরকাল জীবন্ত উদাহরণ হ'য়ে থাকবে—আলো আর স্তম্ভিত দিকে নির্ভর আত্মানন্দরূপ।

বীরদের পাগলামির উদ্দেশে আমরা গান গাই।



## ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অন্ন-সমগ্রায় বাঙ্গালীর পরাজয়

আচার্য্য ত্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

চৌক-পনর বৎসর বয়সে মাড়োয়ারী ছেলে ব্যবসায় পাকা হইয়া উঠে এবং বাঙ্গারের মাড়ী-নগরের সন্ধান রাখে; ব্যবসা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে লোকচরিত্রও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে। তাই কাহারও সহিত ছই একদিন কারবার করিলেই সে বুঝিতে পারে যে, তাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দেওয়া স্বস্ত কি না। ফলে, সে সহজে কাহারও নিকট প্রভাবিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন। "There is no royal road to learning." ব্যবসা-ক্ষেত্রেও ইহা সত্য—এখানেও কাকি চলে না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী যুবক কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ব্যবসা কাঁদিয়া বসে এবং প্রভাবিত হয়। প্রথম হইতেই খরিদার আসিয়া প্রশ্নোত্তর দেখায়, এবং বলে—“মহাশয়, জিনিষ ধার দিন, মাসকাবারে মাছিনা পাইলেই টাকা শোধ করিয়া দিব”। এমন কি বেশী মুনাফা দিয়াও ক্রয় করিতে তাহার কড়ী করে না। এই প্রকার প্রশ্নোত্তর পড়িয়া যুবক দোকানদার ধার দিতে থাকে। কাজেই ক্রমাগত অনেক টাকাও বাকি পড়িতে থাকে এবং পরিশেষে সে দোকান ভুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মাড়োয়ারীকে এ প্রকারে ঠকান যায় না; কারণ, সে পূর্বে হইতেই পাকা হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে এবং মাল ছাড়িলেও পাওনাদারের দোর চাপিয়া বসে—তাহার হাত এড়ান সম্ভব নয়।

অনেক বাঙ্গালী যুবক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, ব্যবসা করিব, মূলশন কোথায়?” অভিজ্ঞতালাভই মূলধনের প্রধান অঙ্গ—তদপেক্ষাও বেশী প্রয়োজন বিশ্বাস-অর্জন। এবিষয়ে মাড়োয়ারীপণ অপারহীন। ইহার ব্যবসা-উপলক্ষে

মহাজনের নিকট টাকা বা মাল ধার লইলে তাহা নিরূপিত ক্রিতি-মত শোধ করিবেনই—কোন প্রকারেই ক্রিতি খেলাপ করিবেন না। পুর্বেই বলিয়াছি যে, একজন মাড়োয়ারী সত্য সত্যই “নোট কথল” সদল করিয়া ব্যবসায় হুগুপাত করে এবং পৃষ্ঠদেশে মাল লইয়া ফেরী করিয়া বেড়ায়। মধ্যাহ্নকালে কোন যুক্তজলে সন্নিবিষ্ট বিশ্রাম করিয়া এবং ‘ছাত্ত’ বায়া উত্তরপূর্বে করিয়া পুনরায় ফেরী করিতে বাহির হয়। কিন্তু আমাদের কোন যুবক ৫০-৭০ পাচশত টাকা ধার করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও শেষে দেখা যায় যে, সে আসল তালিয়া কিছুদিন পরে গা-ঢাকা দিয়াছে। তাহার যদি এক মোট কাপড় বড়বাঙ্গার হইতে মধ্যস্থলের কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিতে হয়, তবে ইহাতে তাহার কি প্রকার বায় হয়, তাহার একটা আভাস দিতেছি। আমাদের যুবকগণ পৃষ্ঠদেশে একমণ বোকা বহন করিতে অপারগ—পারিলেও লজ্জায় তাহা করিতে কদাচ রাষ্ট্রী নন। প্রথমতঃ, রিক্সা করিয়া বড়বাঙ্গার হইতে শিয়ালদহে গেসেনে মাল পৌছাইতে অন্তর ১০-১৫ আনা লাগে, তাহার পর সেখান হইতে মাল গলগল করিয়া নিম্নের টিকিটিনিয়া গন্তব্য ঠেগেনে অবতরণ করে। সেখান হইতে ঈমারে মাল লইতে হইলে পুনরায় ঈমার ভাড়া, মুটে ভাড়া ইত্যাদি, অতিক্রম ঈমার-বাট হইতে গন্তব্য প্রানে পৌছাইতে আরও কিছু বায় হইয়া থাকে। এই ভাবে মাল আসে—কিন্তু ঈমানুশগণ আবার মাড়োয়ারীদের জায় ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই; স্বতরাং একখানি দোকানও ভাড়া করিতে হয়। দোকান হইলেই ঘোষার, টেবিল প্রভৃতি সরঞ্জামও চাই—এবং একা দোকান চালায় অসম্ভব; কাজেই একজন সহকারী, অন্ততঃ একটা ভৃত্যেরও প্রয়োজন হয়। এই প্রকারে তাহার অনেক খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

হুতরায় গুচরা বিক্রয় করিতে হইলে তাহার জোড়া প্রতি অন্তর ১০ ছই আনা বেশী না হইলে চলে না। তাহার প্রতিদ্বন্দী মাড়োয়ারী অন্যায়সে ১০ চারি পয়সা বেশীতে মাল ছাড়িতে পারে, কাজেই সে প্রতিযোগিতায় আটখা উঠিতে পারে না। এই প্রকার সখের ব্যবসা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই আমাদের যুবকগণ ধারে মাল লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেও দিন দিন মূলধন ধোয়াইয়া ফেলেন এবং মহাজনের টাকা শোধ দিতে না পারিয়া ‘গুনমুখিক’ হইয়া আইন পড়িতে আসেন, অথবা কেরানিসিয়ার খোঁজে বাহির হন।

আমি অনেক ভ্রমলোক এবং ব্যবসায়ের নিকট গিয়াছি যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে ধারে মাল দেওয়া বিপজ্জনক, দিলে টাকার মায়্যা টাকা করিয়া দিতে হইবে। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, “Don't treat money matters with levity, money is character.” একথা অত্যন্ত সত্য। আমার আশ্চর্যের বিষয়ে সবিতার আলোচনা করিয়াছি। মাছুয়ের চরিত্রগত পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত অর্থের ব্যবহার করিলে। বাঙ্গালী যুবকের ব্যবসায় পরাজয়ের কারণ তাহার সত্যতার অভাব। আমার জনৈক ভূতপূর্ব ছাত্র (M. Sc.) একটা কলেজের অধ্যাপক। তিনি কিছুদিন ছুটি লইয়া জার্মানী হইতে ব্যবহারিক রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন এবং এখানে একটা ছোট-খাটো tannery এবং তৎসংগত জুতার দোকান খুলিয়াছেন। কাজকর্ম এক রকম ভালই চলিতেছিল, কিন্তু তিনি সেদিন আমার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, “আমার সর্বনাশ হইয়াছে! সমস্ত দিন আমাকে কলেজে থাকিতে হয়, কাজেই সহকারীরাগে ছই তিন জন আত্মীয় যুবককে ব্যবসায়ে প্ররোচন করি এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। তাহারা আমার মাংস হাত বুলাইয়া অনেক টাকা আশ্রম্য করিয়া পলাইয়াছে।” কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শত্রুপ্রতিষ্ঠা অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন

যে, তাহার এক পুত্র M. B. পাশ করিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে একটা ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন। একজন বেকার যুবক প্রায়ই তাহার নিকট নিজ ছরবহার বিষয় জানাইত; একদিন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, আমি একটা সুবিধা করিয়া দিতেছি। আমার ছেলের ডাক্তার-খানায় অনেক প্রকার প্রসাধন-দ্রব্য সর্বদাই থাকে; এ অঞ্চলে বহু ভ্রমলোকের বসতি হইতেছে, অথচ এ সব জিনিসের দোকান বড় একটা নাই। আমি তোমাকে ডাক্তারখানা হইতে ১০-১৫ মশ পনর টাকার জিনিষ লইয়া দিতেছি—তুমি সেগুলি যুগ্ম-বাড়ীতে ফেরী করিয়া টাকা ফেরৎ দিলে পুনরায় মাল পাইবে। এই প্রকারে বাহা লাভ হইবে তাহাতে আপাততঃ তোমার চলিয়া যাইবে।” যুবকটা বলিল, “মহাশয়, আমি ভয়সন্তান, এই সকল মাল ঝুড়িতে করিয়া বহিলে বড় খারাপ দেখায়।” হৃৎকোপে ভরিয়া লইলে ভ্রমতার উপর আঘাত হইবে না বুঝিয়া তাহাকে একটা ছোট-খাটো হুটকেশও দেওয়া হইল; কিন্তু যুবকটা মাল সর্বমত হুটকেশও লইয়া সেই যে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের এইরূপ অসত্যতার প্রমাণ আরও অনেক দেওয়া হইতে পারে। জাশানাল টানারীর ম্যানেজার শ্রীমুদ্র বি, এম, দাস আমাকে একটা বিবরণ দিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলেন যে, গত কয় বৎসর তাহাকে প্রায় এক কোটি টাকার লেন-দেন করিতে হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পশ্চিমা মুসলমান ও জাঠদের সহিত। সামান্য কিছু লেন-দেন বাঙ্গালীর সহিতও হইয়াছে। হুতরের বিষয়, বাঙ্গালীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার সময় প্রায় প্রত্যেক বারই তাহাকে মাংস-মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছে, অথচ পশ্চিমাদের জ্ঞত একবারও তাহাকে আদালতে বাইতে হয় নাই।

উপরিবর্ণিত ঘটনাগুলি হইতে বেশ বোকা বায়, বাঙ্গালী কেন ব্যবসায় সাফলা লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ, তাহার উপলব্ধ শিক্ষানবিশী হয় না,



সেই জন্ত সব দিকেই তার গলদ থাকে ; দ্বিতীয়ত, একটু ধাক্কা খাইলেই সে অবসন্ন হয়। পড়ে এবং হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া আবার কেরাণীগিরি খোজে বাহির হয় । মাজোরারী প্রকৃতি ব্যবসাদারগণ কি ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়। ইহার দুই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পশ্চাদ্গমন হয় না এবং সহজেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে ; কারণ, পোড়া হইতে ইহাদের চাল-চলন অতিশয় সাদাসিদা— দুই আনা হইতে চারি আনার মধ্যেই ইহার দিন মাপন করিতে পারে । অধিকন্তু, ইহাদের সত্যতা প্রকাশনীয়— ইহার কখনও কিত্তি খেলাপ করে না, তাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহাজন ইহারিগকে ধারে মাল ছাড়িয়া দেয় এবং উৎসাহও দিয়া থাকে । আমি জানি, অনেক ব্যবসায়ীর কিত্তি কাল-বৈশাখীর ঝড়ে মারা গিয়াছে । আমাদের দেশে এ সব কারবারে বীমাপ্রথা না থাকায় মালিক হস্তসম্পদ হয়। ছিন্নবর্ণের কলিকাতায় মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি “কুছ পরওয়া নেই” বলিয়া পুনরায় তাহাকে মাল দিতে আরম্ভ করিলেন ।

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন

আজ বাঙ্গালী দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে । এ ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে যে কি দাঁড়াইবে, ধারণা করা যায় না । বেকার-সমস্তা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং অনেকে অন্ত্যাত্মে— নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় মান-সম্মত বজায় রাখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিতেছে । এসকল দেখিয়া স্ত্রীয়াও আবার সেই একই জীবন-ব্যায় বাঙ্গালী জাতি গা চলিয়া দিয়া চলিয়াছে । দেশ হইতে কোটা কোটা টাকা বিদেশীরা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও নাই—ঐ বুঝা ভিত্তীর মোহে দাবিত হইয়া ভবিষ্যৎ যে কিরূপ অন্ধকার, তাহা এখনও বুঝি না ।

আমি নিজে বাঙ্গালী—তাই বাঙ্গালী জাতিকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি । যে সমস্ত কারণে বাঙ্গালী জাতি এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে অসমস্তার সমাধানে অপারগ হইয়া সকল ক্ষেত্রে হইতে দিন দিন বিতাড়িত হইতেছে, তাহা ভ্রম ভ্রম করিয়া, চোখে আব্দুল দিয়া দেখাইতেছি । যাহাতে ‘মা-লক্ষী’দের নিকট আমার বার্তা পৌছায়, তাহাই জন্ত বাঙ্গালী মালিক পত্রিকাগুলিতে আমার প্রবন্ধ গুলি নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিতেছি ।



শ্রীকুমারগুন মল্লিক, বি-এ

( ১ )

ওরে আমার শীর্ণদেহ

জীর্ণপাখা পাখি রে !

আজও দেখি নীলাকাশের

পানেই যে তোর আঁখি রে ।

সহবে কি তোর পরাণখানি,

বিদ্রুতের ওই চকমকানি,

আঁধারকরা বজ্রা ঝড়ে

কাঁপুছে শাখা শাখী রে,

তবু দেখি নীলাকাশের

পানেই যে তোর আঁখি রে ।

( ২ )

ভালো কি তোর লাগছে না রে

এমন শ্যামল বীথিকা,

এত ফুলের মধুর হাসি

গন্ধ আলো গীতিকা ।

ভালবাসার সোঁপার বাঁচা,

শান্তি এবং স্বপ্নে বাঁচা,—

অন্তবহীন অকূল আকাশ

করছে ভাকাভাকি রে ।

( ৩ )

বুঝেছি তোর কিসের লাগি

ভগ্ন হৃদয় মাতিছে,

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষী তুই

গরুড় পাখীর জ্ঞাতি যে ।

পিয়সী তুই অমৃতের,

আছে তোরে স্বর্ণ ঘিরি,

ভুলিস না তুই যতই তোরে

বক্ষে চেপে রাখি রে ।

ওরে আমার শীর্ণদেহ

জীর্ণপাখা পাখি রে ।



## হাজার-ভুজা বাঙালী জাতি \*

## অবিনয়কুমার সরকার

তালতলা বলিলে প্রথমেই মনে আসে একটা তাল গাছ আর তার তলায় একটা পুরু। সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখিতে পাই, একটা তাল টিপু করিয়া ভাঙায় অথবা ছপু করিয়া ছলে পড়িতেছে। হয়ত কলিকাতার এই অঞ্চলে কোনো দিন গড়া গড়া পুরুর ছিল, আর তার পাড়ে ছিল ডজন ডজন তাল গাছ। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ছিল। আর অল্প মাঝে মাঝে বধা সময়ে তালও টিপু করিয়া পুরুরের কিনারায় বা ছপু করিয়া ছলে পড়িত।

একালের তালতলা বলিলে পুলিশের লোকে হয়ত দেখাইবে অমুক রাস্তা, অমুক রাস্তা ইত্যাদি রাস্তার ভিতরকার নিষ্টিত করা একটা জনপদ। আবার গোটা আন্ডারের লোককে যদি জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে হয়ত দেখিব আর-কোনো প্রকার চৌহদ্দি। তালতলায় বাহারা লাইব্রেরী কামে করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সীমানাগুলি হয়ত এই দুই প্রকারের কোনোটাই নয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক তালতলায় রকমারি ব্যাখ্যা, রকমারি সীমানা, বিভিন্ন গণ্য, বিভিন্ন চৌহদ্দি হওয়া সম্ভব।

## লোকসাহিত্য

কাজেই গণসাহিত্য কি এই সংক্ষেপেও হরেক রকম সীমানা-নির্দেশ চলিতে পারে। গণসাহিত্যের এক সোজা ব্যাখ্যা স্পষ্টচলিত আছে। সেই ব্যাখ্যা দেখিতে পাই—বেশ স্পষ্ট ভাবে—জাৰ্ণাণ দার্শনিক হার্ভারের সাহিত্য-সাধনায়। জনসাধারণ যে-সকল কিছা-কাহিনীতে আনন্দ পায়, সেই সবই হইল “লোকসাহিত্য”। এই লোকসাহিত্যের দিকে নজর

না ফেলিলে জনগণের আত্মা, ‘জাতীয় চেতনা ইত্যাদি আবিষ্কার করা অসম্ভব। অতএব সাধারণে প্রচলিত গল্প-গুজব, গান, আখ্যায়িকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার দিকে আন্দোলন চালানো কর্তব্য। এইরূপ মত প্রচার করিয়া হার্ভার গোটে-মুগের জাৰ্ণাণ-সমাজে “জাতীয়তা” ভিত্তি কামে করিয়া গিয়াছেন। জাৰ্ণাণের গ্রিম ভাইয়েরা এই ধরণের লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে প্রসিদ্ধ। বিলাতী ম্যাক্সার্ন জার্মানির প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিকে ইংরেজ সাহিত্যসেবকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। তাহা ছাড়া হুইস-করাটী সাহিত্যবীর রুসো সেকালের ইয়োরোপে লোকসাহিত্যের রস বাটসা গিয়াছেন। সেক্ষয়জন লোকের নাম করা হইল তাঁহার্য সকলেই “রোমান্টিক” অর্থাৎ ভাব-নিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয় বোঝানো যেখানে রোমান্টিক ভাবুকতার আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে, সেই সকল স্থানে লোকসাহিত্যের ইচ্ছা দেখা গিয়াছে।

আমাদের বাঙলা দেশেও লোকসাহিত্য-সংগ্রহের খোয়াল লাগবিহারী সে হইতে যেনোশচর সেন পর্যন্ত বজায় আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভাওে এই খোয়াল সম্ভবতঃ গবেষণার সামগ্রীও বটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেজাজও এই দিকে বেশিভেছে। প্রাচীন ভারতও এইরূপ সংগ্রহের খোয়াল ছিল। কেন না “কবী-সরিংসাগর” একধাণ। সংগ্রহেরই বিম্বকোষ।

## নৃত্য

গণসাহিত্য বলিলে আর এক প্রকার সাহিত্যও বুঝা চলিতে পারে। দেশের আপামর জনসাধারণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার বিষয়ক রচনা এই

সাহিত্যের অন্তর্গত। পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া উৎসব-আমোদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ছত্রিশ জাতির বরকদা, দেবদেবী, পুষ্পা-পার্পণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই সবকে আখিক বা কুটুবিষয়ক নৃত্যের (আখ-পাঞ্জির) অন্তর্গত করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভিতর করাসী বোকা, ইংরেজ ফ্রেন্সার, জাৰ্ণাণ কুটু ইত্যাদি লেখকেরা এই সাহিত্যের নানা বিভাগে স্পষ্টগিদ্ধ।

বাঙলা দেশেও কিছু কিছু কাজ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের নানা শাখা-প্রশাখার নাম আবার উল্লেখযোগ্য। ত্রিগুণ শরৎকুমার রায়, ত্রিগুণ হরিদাস পাণ্ডিত, ত্রিগুণ বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি গবেষকেরা আখিক নৃত্যের এখার-ওখরে চলাকেরা করিয়াছেন।

## জীবনের সাড়া ও রস-বৈচিত্র্য

আমার নিকট গণসাহিত্য একমাত্র লোক-সাহিত্যও নয়, আবার একমাত্র নৃত্যের অন্তর্গত জাত-পাত বিষয়ক বা লোকচাচার বিষয়ক সাহিত্যও নয়। গণসাহিত্য জিনিষটাকে আরও বেশী ব্যাপক ভাবে সম্বন্ধিত আনি অত্যাণ্ড। সাহিত্যের আলল কথা হইল জীবন। জীবনের সকল প্রকার প্পন্দনই সাহিত্যের নবরস বা নল্লই রস বা ময় লাগ রসের কোনো না কোনোটা জোগাইয়া থাকে। যেখানে যেখানে জীবনের খেলা দেখিতেছি, সেই ঝানেই কিছু-না-কিছু রস চুম্বাইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ সেই-ঝানেই কিছু-না-কিছু সাহিত্যের রসদ আছে।

জীবনের পরিচয় পাই কর্মে। কর্মযোগ ছাড়া জীবন থাকিতেই পারে না। চিরাৎ একপ্রকার কর্মই বটে। যেখানে-যেখানে কিছু-না-কিছু কাজ চলিতেছে সেইখানেই দেখিতে পাই জীবনের সাড়া। মাথুকে প্রত্যাঙ্কণে বত ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, তত ক্ষেত্রেই জীবনের প্পন্দন অল্পতব-করিতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু-না-কিছু রসও চাষিতে পারি।

অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে জীবন আর জীবনের সঙ্গে সাহিত্য চোপের দিনরাত জটলা করিয়া রহিয়াছে। এই সৃষ্টি-জীবন-রসের চাকার হাত পড়িয়া মাজই সাহিত্যের কোআরাও দশল করা হইল।

## সৃষ্টি-কাণ্ডের বিপ্লব

গণসাহিত্যের বেপারীকে তাই কেবল সৃষ্টিশক্তি আর সৃষ্টিকার্যের খতিয়ান করিতে হইবে। কিন্তু গণটা কি? কেহ বলে গণীব লোক, কেহ বলে নির্ঘাতিত নয়নারী, কেহ বলে অশুভ জাতি। গণ বলিলে আমি বৃষ্টি সব লোক, গোটা দেশ, সমগ্র বাঙালী জাতি। পণ্ডিতকে পণ্ডিত, মুখুকে মুখু, বড়লোককে বড়লোক, ছোটলোককে ছোটলোক,—কেহই গণ-চৌহদ্দির বহির্ভূত নয়। দেশের সব লোক বাহা-কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহার সব-কিছুই গণসাহিত্যের রস জোগাইতেছে। এই সৃষ্টি-কাণ্ডে আমি দেখিতেছি বাঙালী জাতির বিপ্লব। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক-সব-কিছুই বঙ্গীয় গণসাহিত্যের বাস্তব ভিত্তি। কাজেই মানুষ লোকসাহিত্য আর নৃত্যের রীতিনীতি-সাহিত্যও এই বিপুল সৃষ্টিকার্য বিষয়ক বিখ্যাকারের ভিতর আসিয়া পড়িতে বাধ্য।

লোকেরা সৃষ্টিকার্য চুড়ে নামভাণ্ড। লোকের দাড়ী বা টিকির ভিতর। আমি সৃষ্টিকার্য চুড়ি মিল্লীর ঝাঝার আগায় আর কুমোরের চাকার কাদায়। ঢেঁকিতে ধান কুটিতে কুটিতে পল্লীনারী সৃষ্টির আনন্দ চাষিতেছে, আবার একগোরে কুটির-পিল্লী হাতের জোরে ছোট বয়ের ডাঁটা ঘুরাইতে ঘুরাইতেও ধান-ভান্ডার সৃষ্টি-স্বপ্ন উপভোগ করিতেছে। নৌকার মাঝি লোকে লোকে যোগাযোগ সৃষ্টি করিতেছে, আবার পাটের চাষও পল্লীত্রি গড়িয়া তুলিতেছে। রসের মজুর, খাদের কুলী, বর্ধিঙ্গাণ্ডার্যের কেরাণী, বামা-বাসদার দালাল—সকলের কাজেই সৃষ্টিশক্তি মুক্তি পাইতেছে।

কথাটা স্পষ্টাঙ্গাণ্ড গুথিয়া রাখা ভাল। বিজ্ঞান-

\* তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক প্রস্তুত সাহিত্য-সংস্করণের পণ্যসাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ, ১০ই এপ্রিল ১৯১০, কলিকাতা।—অবিনয়কুমার দে, অধ্যাপক। সর্বিভিন্ন সম্পাদক।



সেবকের শাবরেট্টী তুচ্ছ করিবার দরকার নাই। আকাশচর্যীর যত্নপ্রয়োগ উপেক্ষা করিবার কথা বলিতেছি না। দার্শনিকের তত্ত্ববিশেষণও সৃষ্টি-কার্য সম্বন্ধে নাই। আর কবি, চিত্রকর ও সঙ্গীতের ওহাষ ইত্যাদিও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়। কিন্তু সৃষ্টিকার্যের পরিধি আরও বিস্তৃত। কোনো প্রতিক্রিয়ার, গবেষণায়, মিউজিয়াম, লাইব্রেরীতে, টোলে বা শাশ্বতী সৃষ্টিকার্য আসিয়া পথ ভুলিয়া যায় নাই। সৃষ্টিকার্যের স্রোত বহিতেছে দেশ ছড়িয়া অনন্ত পথে। পল্লী-কুটিরের হৈসেল-ঘরেও সৃষ্টিকার্য দেখিতেছি, আর যত-সেবারমতের কারখানায়ও সৃষ্টিকার্য দেখিতেছি। গম্ভীর বোলবাহী গানেও সৃষ্টিকার্য মামুদ হয়। আবার রাসবেস্ত্রে নাচেও সৃষ্টিকার্য পরিচ্ছন্ন।

### শক্তিদ্বয়ের আদমহুমারি

জগতের শক্তির পুঙ্খ-নারী মাজই গম্ভীর-হিসাবে "পূজাহান"। বাঙালী জাতির যাহারা গাহিতে পারে, নাচিতে পারে, গাহাইতে পারে, নাচাইতে পারে, তাহারা সকলেই গম্ভীর-হিসাবে "লেন্দামে" তাঁই পাইবার ব্যোপ। বাঙালার যে সকল নরনারী সৃষ্টিতে ও হাদাইতেছে, স্বপ্ন দেখিতেছে ও দেখাইতেছে, — গম্ভীর উদ্যোগ হিসাবে তাহারা প্রত্যেকেই বঙ্গবীর। যে সকল বাঙালী মাথার জোরে "হী"কে "না"য়ে পরিণত করিতেছে, অথবা "না"কে "হী"য়ে ঠেলিয়া তুলিতেছে, যে সকল বাঙালী হাতের জোরে পুরুদের "সোদ" উঠাইতেছে, নর্দমা সাক করিতেছে, বনজল সোপাট করিয়া পল্লী কায়ম করিতেছে, চরের খোলা মাঠে চাষ বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী বাসনা-বাগিছার জোরে পল্লীকে শহরে পরিণত করিতেছে, শহরের সঙ্গে শহরের বোণাযোগ কায়ম করিতেছে; যে সকল বাঙালী কপ-কৌশলের জোরে অজাত-কুলঙ্গী নর-নারীকে নামজাদা নরনারীর আসনে বসাইতেছে;

যে সকল বাঙালী আত্মত্যাগের জোরে, পুণ্ড্রসৈন্যের জোরে, গলাবাক্সির জোরে, লেখালেখির জোরে অথবা পাণ্ডিত্য-গবেষণার জোরে যুবক-বাঙালকে বড় বড় আন্তর্জাতিক ইন্স-পাইবার ব্যোপ করিয়া তুলিতেছে, তাহারা সকলেই বাঙালী জাতির মহা-পুঙ্খ হিসাবে গম্ভীর-হিসাবে নায়ক-নারিকা। গম্ভীর-সেবকের চোখে একমাত্র ঈশ্বর ব্যক্তি হইল ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, গঠনক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিবাহী চিন্তাবীর ও কর্মবীর। গম্ভীর-সেবকের চোখে একমাত্র ঈশ্বর বস্তু হইল সৃষ্টিশক্তি, প্রকৃতিকে উড়াইয়া পাটাঁইয়া, ছনিকাকে ভাঙিয়া চুরিয়া, ভুলকে টানিয়া ছিঁড়িয়া নতুন করিয়া রূপ দিবার ক্ষমতা।

### ডানপিটের বীরত্ব

এই ধরনের শক্তির ও ঈশ্বর নরনারী অস্ত্রাভ্যাসের মত বাঙলা দেশেও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চোখের ঠুলি গুলিয়া বাঙালার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, নৌকার বাটে, জল-মাঠে, পাহাড়ে উপত্যকায় ঘুরা আবশ্যক। দেখিতে পাইব যে, অনেক লোক 'অংখা ছংকট সহিয়া' দিনের পর দিন আবাদ করিতেছে, মাছ ধরিতেছে, মৎস্যের চালাইতেছে। কে তাহাদিগকে সাহায্য করিল, কে তাহাদিগকে বাধা দিল, সে সব দিকে তাহাদের জ্ঞাপন নাই। সাহায্য পাইলে তাহারা তাহার সমর্থতার করিতে পশ্চাদপদ নয়। বাধা পাইলেও তাহারা বিচলিত হয় না। ধাক্কা খাইয়া, মার খাইয়া, কেল মারিয়াও তাহারা হাল ছাড়িতেছে না। পল্লী-মেডলদের বোদল, পাড়াপড়শীদের হিসা-গণনা তাহাদের নিতাসহচর। তাহারা ছেলো আঁচাইলে তাহাদের বন্ধুবান্ধবের চোখ টাটাইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা স্টান বুক খাড়া রাখিয়া নিম্ন নীচ কর্তব্য পালন করিয়া চলিতেছে। বোদকে বোদ, ঝুঁকে ঝুঁকি, রসকে রস, কথকে কথ, বিজয়কে বিজয়, পরাজয়কে পরাজয় তাহারা সবই সমানভাবে

বরণত করিতে অভ্যস্ত। তাহারা পাঁচ বা খাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বা না ইউক, তিন বা লাগাইতে তাহারা স্বপুট।

এই ধরনের ডানপিটে লোক বাঙালী জাতির এখানে-ওখানে-সেখানে ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রেই নজরে পড়ে। ডানপিটেওলা না থাকিলে ছনিয়া পিচিয়া বাইত। ডানপিটে না থাকিলে বাঙলা দেশও পটিয়া বাইত। বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের আসল বন্যাদ হইল ডানপিটের কর্ম-কাণ্ড। ডানপিটোদের সৃষ্টিশক্তি জগতের সর্বত্র মানব জাতির জীবনলীলা বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালী জাতির ডানপিটোওলাকে চুঁড়িয়া বাহির করা, ডানপিটোদের বীরত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে সন্ধান থাকা, ডানপিটোদের কৃত্তিক সমূহের যথোচিত সম্বন্ধনা করা গম্ভীর-প্রধান সন্ধান।

একজন ডানপিটের বীরত্ব এইক্ষেত্রে উল্লেখ করিতেছি। সে সমসাময়িক, ব্যাক-প্রবর্তক ও বীমা-প্রবর্তক, বাবলা-ধুরন্ধর অধিকাচরণ উকিল। যুবক-বাঙলা তাহার কর্মদক্ষতার নিকট বেশ-কিছু দ্বন্দ্বী। বসন্তে ১৯০৫ সনের পরবর্তী যুবক-বাঙলার ইতিহাস প্রকাশান্তরে বাঙালী ডানপিটোদেরই জীবন-বৃত্তান্ত।

### ভবঘুরার দিগ্‌বিজয়

জগৎসৃষ্টি আর জগৎরুদ্ধির কাজে প্রায়-এক প্রকার নরনারী ডানপিটোদের মতই পূজ্যযোগ্য। তাহারা চলিদ-বটো টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও আটক থাকে না। তাহারা পল্লীতে চুঁড়িতেছে ভরতী-করকারীর স্নেহ, শহরে চুঁড়িতেছে ছপ বেজিয়ার স্নেহ। তাহারা গাঁ ছাফিয়া আসিয়া বসিতেছে চরে, আবার চর ভাঙিতে না ভাঙিতেই কুঁড়েয় ঢালা মাথায় করিয়া ফের গিয়া বসিতেছে গায়ে। তাহারা শহরে থাকিলে কখনো চুঁকিতেছে আমলাদী-গুণানির কর্মক্ষেত্রে, কখনো চুঁকিতেছে

রেলকর্মচারীদের আফিসে, কখনো চুঁকিতেছে শেয়ার-বাজারের দালাল-পাড়ার, আবার কখনো চুঁকিতেছে চায়ের কানিসে। মারিতেছে তাহারা আড়ডা, চুঁড়িতেছে তাহারা কিকির। লোকে বলে তাদেরকে 'ভাণাবণ্ড', আমি বলি 'ভবঘুরে'। "ভোজনং বজ্র ভয় শরনং হইমন্দিরে।"

ছনিয়া বাড়িয়া চলিতেছে ভবঘুরাদের টো টো করায় জোরে। "গৃহে চ মধু বিন্দত কিমর্থং পরজ্ঞ রঞ্জে?" যবে মধু পাওয়া গেলে পরজ্ঞে বাইবার দরকার নাই। কিন্তু যবে যে মধু মিলে না! চাই সেজন্ত মধু-ভিখ্যান। বনজলকে যে ভবঘুরার খিকির করে নাই, সে ছনিয়ার কোথাও আজ পর্যন্ত উদ্ভিবিজ্ঞায় জগতের জ্ঞান বাড়াইতে পারে নাই, জীবজন্তু-বিজ্ঞায়ও উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই। পাহাড়ে-পল্লীতে যে মাথার ঘাম পায়ে কেলিয়া উঠরাই-চড়াইয়ের সঙ্গে কখনো কোথাও খাড়ুর-রয়ের বনি কায়ম করে নাই, সে কখনো কোথাও খাড়ুর-রয়ের বনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যে বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টাটা কোম্পানীর ইম্পাট-কারখানা দেশের স্বরং বদলাইয়া দিতেছে, তাহার পরজ্ঞতে আছে একজন জ্বরদন্ত ভবঘুরার পল্লী-পরিজ্ঞতা। তাহার নাম বাঙালী-সমাজে অজানা নয়। তিনি আশ্রয় বাঁচিয়া আছেন। নাম তাঁহার প্রমথবাণ বহু। থাকেন রাঁচিতে। তিনি নৌনে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-উপত্যকায় টো টো করিয়া না ঘুরিলে টাটার জন্ত শোহার বনি আবিষ্কৃত হইত না। বনসম্পদ বাড়াইতে চাও, অথচ উইয়া থাকিলে সর্বদা নিজ কোটারে, তাহা সম্ভব নয়। তোমার ছহারে আসিয়া দেশের লোক, ছনিয়ার লোক তোমাকে বাধা করিয়া দিয়া বাইবে, তাহা কিশ্নু কালে ঘটতে পারে না। বিজা বাড়াইতে চাও, "হাও সিন্ধুনীকে ভুধরশিখরে।" মত প্রচার করিতে চাও, "হাও সিন্ধুনীকে ভুধরশিখরে।" দেশের ইজ্ঞে বাড়াইতে চাও, "হাও সিন্ধুনীকে ভুধরশিখরে।" চাই পর্যটন,



চাই মোলাকাং, চাই তর্কপ্রপঞ্চ, চাই বাহ্যমুখ্য, চাই হাতাহাতি, চাই পাঞ্জা-কবাকবি,—বর্ণপন্নীতে, ভারতে, এশিয়ায়, ইয়োরোপেরিকায়, আফ্রিকায়, ওশিয়ানিয়ায়। কতকগুলো “বাপুকা বেটা” বাঙালী ভবঘুরার নদী-নাটরান্দে, সাগর-ভিড়ান্দে, হুনিয়ার-পরিভ্রমার দৌলতে বাঙালী জাতির বিজ্ঞা বাড়িয়াছে, অর্থ বাড়িয়াছে, আশা বাড়িয়াছে, রাষ্ট্রিক শক্তি বাড়িয়াছে। চাই আরও ভবঘুরা এবং ভবঘুরার দিগ্বিজয়, চাই ভবঘুরাদেরকি চুড়িয়া বাহির করিবার বাহ্যতা, চাই ভবঘুরাদেরকি ইচ্ছা দিবার প্রবৃত্তি। গণসাহিত্যের আসরে আসল অহুষ্ঠান ভবঘুরা-পূজা।

### ত্যাগের ভবিষ্যনিষ্ঠা

আর এক প্রকার শক্তির নরনারী জগতের চৌহদ্দি বাড়িয়া দিতেছে। তাহারা মামুলি মতে সায় দেয় না। লোকজনের পছন্দ-সই কথা বলিয়া বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। সার্বজনিক লোকপ্রিয় মতগুলিকে তাহারা অতি-চৌধা মত বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। দশ, বিশ, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কোনো-একটা কথা অনবরত প্রচারিত হইতে গুলিতে, তাহা কালে রামা-জামা-ইসলাম-ই-খাবজের বোধগম্য হয়। অর্থ্যাৎ মালাটা পুরানো, অতি-বাসি, একঘেয়ে আর ভেঁতো না হইয়া গেলে বারইয়ারি-তাসার আসরে তাহা বরদাস্ত হয় না। কিন্তু, এই সব পড়া ও বাসি মতামতের প্রচারক বাহারা হয়, তাহারা হুনিয়ার নতুন দাগ রাখিতে অসমর্থ। বারইয়ারিভলার সর্বজনপ্রিয় দর্শন বা বিজ্ঞানগুণা জগৎকে বাড়িয়াই ভুলিতে পারে না।

শক্তির নরনারী এই বারইয়ারিভলার হাততালি আর খবরের কাগজের লোকপ্রিয়তা অথবা নিজ গোষ্ঠীর ভিতরকার সাধুবা-ইচ্ছা করিবার দিকে প্রলুব্ধ হয় না। মাথা তাহাদের সজাগ। সসারার পক্ষে চলিতেছে, লোকেরা বাহা চাহিতেছে, জনসাধারণ বাহাকে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দেশের পক্ষে মঙ্গল-

জনক বিবেচনা করিতেছে, হয়ত সেই সব জিনিষে বাস্তবিক পক্ষে উন্নতির যন্ত্রপাতি নাই। লোকেরা আজও বাহা চাহিতে শিখে নাই, জনসাধারণ আজও যে সকল কর্ম-প্রণালী ও চিন্তাপ্রণালীকে বাহা দিতেছে, দেশের লোকেরা আজও যে সব জিনিষ পদমূল্যিত করিতে অগ্রসর, হয়ত সেই সকল অহুষ্ঠান-প্রকৃতিতেই হুনিয়ার কল্যাণ অবস্থান। এইরূপ চিন্তা করিতে বাহারা অভ্যস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নিন্দা-গঞ্জন সহিতে হুপুটি, এই ধরণের চিন্তা প্রচার আর তত্পরযোগী কর্মব্যবহার ফলে বাহারা বারইয়ারিভলার খোলা আসরে দাঁড়াইয়া সমবেত নরনারীর জুতা বাইতেও ডরায় না, তাহারা ই জগৎবুদ্ধির দর্শনবীর।

এই সকল জুতা-পেটাকরা, সার্বজনিক মতামতকে কলা দেখাইবার ক্ষমতাওয়াল, বেয়াজা রকমের তাজা তাজা চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক লোকগুণাকে এক কথায় আমি বলি ত্যাগদূ। এই সকল ত্যাগদূ নিজ মাথায় সকল প্রকার কুসং-নিন্দা বহিয়া সমাজ-রাষ্ট্র-মন্দির-পরিবারের জন্ত নতুন নতুন পথ খুলিয়া ধরিতে পারদর্শী। তাহারা সোজা পথের পথিক নর। ত্যাগদূয়ের চিন্তাপ্রণালী পক্ষে-বোপক্ষে চলে, কাজেই সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এই সব অ-লোকপ্রিয় আর অ-সোজা চিন্তার ফলেই যখনসময়ে এক পল্লীমোড়ের ঠাইয়ে আদিরা বাড়া হইতছে আর এক পল্লীমোড়ল, কোনো প্রতিষ্ঠান উপিয়া দিতেছে, আর অ-জ্ঞ-অ-জ্ঞ প্রকৃতিদের দিগ্বিজয় চলিতেছে। ত্যাগদূরা ভবিষ্যপথী, বিপ্লবপ্রবর্তক সমাজ-বীর। এই সকল বীরদের মহৎ গণসাহিত্যের আসরে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি। সকল প্রকারে ত্যাগদূ-সম্বন্ধীয় আঙুয়ান ওয়া বাঙালী গণসবকদের পক্ষে অজ্ঞাত সম্ভাষণ।

বাঙালী-সমাজে ত্যাগদূ হুপরিচিত জীব। এই বৎসর এক ভীষণের ত্যাগদূ-চূড়ামণির শতবাদীকী অহুষ্ঠিত হইতেছে। ত্যাগদূ-পুণ্য বাঙালী পণ্ডাংগদ-

নয়। ভবিষ্যনিষ্ঠ, আর সমসাময়িক সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত, সেই বঙ্গবীর আজ জগৎপ্রসিদ্ধ। “নরীন এশিয়ার জন্মদাতা জন্মেছিল বাঙ্গালায়, হুনিয়ার লোকে জানে তাহা রামমোহন রায়।” আর এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ত্যাগদূদের দিগ্বিজয় দেখিতেছি প্রত্যেক পাঁচ-সাত বৎসর পর-পর।

### “আদিম” জীবী

যে সকল শক্তির দৌলতে বাঙালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর “আদিম” নরনারীর শক্তি অজ্ঞাতম। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির ইয়ারা একটা বড় ভুজ। ভাষা-পিঠে-ভবঘুরা-ত্যাগদূ হিসাবে ইয়ারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাক-শুণ্যভিতে ইয়ারা আজও বেশী নয় বটে, কিন্তু ইয়ারের শক্তি না পাইলে বাঙালার নরনারী আজ অনেক বিষয়েই বাটো ও চুর্লল থাকিতে বাধ্য। আদিমেরা কেহ বা চাকুমা নামে পরিচিত, কেহ বা গারো নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই সকল নাম-ওয়ালা নরনারীর কারের কথা বেশ কিছু জানেন। কুকী, কাহাড়ী ইত্যাদি আদিমদের কাজকর্মও ঐ সকল অঞ্লে সুবিদিত। এই ধরণের মোটা জিশেক জাত আদিম নরনারীর অন্তর্গত। ইহারের কেহ বা মুগা আর এতি রেশমের কাজে ওস্তাদ, কেহ বা নৌকার মাঝিরির করে। চাম-আবানে হাত অনেকেরই। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা মুগা, ওরীও আর শাঁওতালদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আর অনভিজ্ঞ নন। বিশেষ ভাবে শাঁওতালরা ত এক প্রকার দিগ্বিজয়ী চলাইতেছে। আঠার লাখ আদিমদের ভিতর শাঁওতালরা একাই প্রায় লাখ আঠেক।

মুগা, ওরীও আর শাঁওতাল এই তিন জাতকে পশ্চিম বঙ্গের মুগা “জিবীর” বিবেচনা করা আমার দৃষ্ট। ইয়ারা গুণভিতে প্রায় সাড়ে এগার লাখ। বছর চল্লিশেক আগেও এই জিবীরেরা প্রায় নগণ্য ছিল। তখনকার দিনে নাক শুণ্যে এই তিন জাত দাঁড়াইত

মায় সাড়ে তিন লাখের কোঠার। আজ উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি হইতে ব্রহ্ম করিলে নিজাপুর, মালদহ বীরভূম, বর্ধমান ও ঝাড়ুড়ার পথে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে ছাটয়া আসিলে দেখিতে পাই সর্বত্রই মুগা, ওরীও, শাঁওতাল অথবা শাঁওতাল, ওরীও, মুগার ক্ষেত-ঝামার, আর ইহারের সঙ্গে তথাকথিত বাঙালীদের হাটে-বাজারে সেন-সেন। মুগা, ওরীও, শাঁওতাল মেয়েরা বাঙালীর ঘরে চাকরাণী হয়, আর ঘটনাচক্রে গড়া গড়া বাঙালীর ছেলে প্রসবও করে। হানে হানে শাঁওতাল-শিত আর শাঁওতাল-বাঙালীর দো-দাঁশলা শিত বাঙালীদের পাঠশালায় পড়িতেও যায়।

আর একটা মজার কথা,—একালের মুগাদের ভিতর শতকরা ষাট জনই হিন্দু। ওরীওদের ভিতরও হিন্দুর পরিমাণ একরূপ। আর শাঁওতালদের সমাজে হিন্দুর সংখ্যা আধা-আধির কিছু বেশী। বছর দশেক আগেও অহুপাতগুলা ছিল অজ্ঞপ্ত। তখনকার দিনে আদিম জাতির আদিম ধর্মই মুগা, ওরীও, শাঁওতালদের প্রধান ধর্ম ছিল। আদিমেরা এক হিসাবে বাঙালী হিন্দুসমাজে দখল করিয়া বসিতেছে বটে, কিন্তু অপর দিকে বাঙালীর হিন্দুধর্মও আদিম সমাজে দিগ্বিজয় চলাইতেছে। হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয় ভারতীয় ইতিহাসের এক অতি সনাতন কথা। একালে “হিন্দুশিশন” কর্তৃক অহুষ্ঠিত প্রচার-কার্য্য সেই সনাতন দিগ্বিজয়ের দ্বারা ই খানিকটা বাড়িয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ কি চাম-আবাদ, কি যান-বাহন, কি কুটির-শিল্প, কি শহর-পল্লীতে সওয়া-বিনিময়, কি গৃহস্থালীর কাজকর্ম, কি রীতিনীতির পুনর্গঠন—সকল তরক হইতেই বাঙালী-আদিম অথবা আদিম-বাঙালীতে সন্নিবেশনের ফলে একটা তাজা বাঙালার উদ্ভব হইতেছে।

### মুগা-ওরীও-শাঁওতালদের

#### “বাঙালী-করণ”

আদিমগুণাকে বাঙালী বণিতে আজও আমরা



অভ্যন্তর নই। ইহা আমাদের একটা অদ্বতা ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, বর্জমান বিভাগে শতকরা সাত জনই আদিম, আর রাজস্বাধী বিভাগে ছয় জন। কোনো কোনো জেলার অবশ্য অল্পপাতটা আরও উঁচু। জলপাইগুড়ি জেলার শতকরা পনের জনেরও বেশী এইরূপ। বাঁকুড়া জেলার অবস্থাপ্রায় তেঁতুল। ইহার বাঙালী ভাষায় কথা কহিতেছে। অপর দিকে ইহাদের জেলার সরস শব্দে বাঙালী ভাষাও বানিচুটা বাড়িয়া বাইতেছে। বাঙালী কার্যবায় কাপড় পরাও ইহাদের দৃষ্ট। বাজার-হাটে লেন-দেন, বাটো-মাটো লেন-দেন, ঘরকন্নার লেন-দেন আর ধর্মকর্মে লেন-দেন — এই সকল লেন-দেন বাহ্যের সঙ্গে আমাদের অহরহ চলিতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞানী সমষ্টিয়া রাখা অসমীয়ায় অববিবেচনা বা প্রকৃতিবচনার কাজ। অধিকন্তু রক্ত-সমিশ্রণও আছে।

আর একটা কথা এইখানে তুলিলে চলিবে না। ১৮৯১ সনে বাঙালী বামুন-কার্যে-বৈতের সংখ্যা ছিল সাড়ে বাইশ লাখের কিছু বেশী। ১৯০১ সনে এই সংখ্যা উঠিয়াছে একত্রিশ লাখের কিছু বেশী পর্যন্ত। অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী হিন্দু ১০০ হইতে ১০৭ পর্যন্ত উঠিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই চল্লিশ বৎসরে পশ্চিম-বঙ্গের আদিম জীবীর উঠিয়াছে ১০০ হইতে ৩৩৯ পর্যন্ত। যে মুগে বামুন-কার্যে-বৈত বাড়িল দেড়গুণেরও কম, সে মুগে এই আদিমজালা বাড়িল সওয়া তিন গুণের কাছাকাছি। বাড়তির হারটা দেখিলে হয়ত আশ্চর্য করা চলে যে, কালে আদিম জীবীরদের বংশধরই বাঙালী জাতির মাতঙ্গরহানীয় হইয়া পড়িলে।

তাহাদিগকে “বর্জ্যশ্রম” ব্যবস্থা মাকিক কোন কোন জাতের সোকা বলা হইবে, তাহা এখনই বলনা করিয়া দেবার প্রয়োজন নাই। এমন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর বাঙালী জাতিভঙ্গের আকার-প্রকার অনেক কিছু বদলাইবার কথা। কিন্তু

আদিমেরা ভবিষ্যতের বাঙালী সমাজের যে এক প্রধান বিনিয়াদ হইতে বাধ্য, তাহা আজই বেশ স্থাপিত। এইরূপ বৃদ্ধিমা কাজে নামিলেই যুবক-বাঙালার গণ-সেবকগণ আর গণ-সাহিত্যসেবীরা পাক। পথে চলিতে পারিবেন। আদিমদের সৃষ্টিকার্য অথবা বাঙালী-আদিম সম্মিশ্রণ-প্রসূত নরনারীর সৃষ্টিকার্য সবই খাটি বাঙালী “কৃষ্টি”র অন্তর্গত, — এই কথাটা আমাদের লিখিয়ে-পড়িয়ে মোকেরা আর রাষ্ট্রিক জননায়ক এবং সমাজ গবেষক ও অর্থশাস্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যত শীঘ্র রপ্ত করিতে পারেন, ততই আমরা গণ-ধর্মীকরণে, বহুসেবকরূপে উঠাইয়া উঠিতে পারিব।

### কার্যে-বামুন-বৈতের হাড়-মাশ

দেখিতেছি যে, পরন্তু বাহারা বোল আন আদিম ছিল, কাল তাহার ছিল রক্ত-সমিশ্রণের ফলে দো-খাঁশলা যাহোক-কিছু। আজ আবার তাহারাই হিন্দুধর্মের সমাজন প্রসার-নীতির প্রভাবে হিন্দু, যত বা “অশুভ” হিন্দু। কিন্তু কাল তাহার চাঘের কাজ করিতে করিতে, মাকি-মিস্ত্রীর কাজ করিতে করিতে, গণ্ডা গণ্ডা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-সমাজের কোনো-একটীর অন্তর্গত। পরন্তু আবার তাহাদেরই দাস, রায়, গুপ্ত, সিংহ ইত্যাদি উপাধির-ছোরে বৈজ্ঞ, বৈজ্ঞ, কাষ্য, দ্বিজির এবং এমন কি পতিত ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইবার কথা। এই যদি বর্তমানে সমাজগঠনের ধারা হয়, আদিম হইতে কার্যে-বামুন-বৈত পর্যন্ত, — তাহা হইলে কিছু পেছন হাটীয়া বৎসর “শ” দেবে-ক-হুসে-পাতেক উজাইতে পারিলে কি দেখিতে পাওয়া উচিত? আজকালকার ধারা কার্যে-বামুন-বৈত, তখনকার দিনে তাহাদের অনেকে “আদিম” — মুগা, ওরাও, শীতকালদের মাসতুত ভাই বোহ হয় ছিলেন। অথবা হইত বা তাহাদের ঘোঁষাঘোঁষি ঘরকন্নাওয়া কোনো কোনো দো-খাঁশলা নরনারী হিসাবে একালের উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুদের প্রপিতামহের প্রপিতামহের

জীবনযৌবা চালাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই সকল কথা হয়ত বা প্রীতিকর নয়। কিন্তু বাঙাল দেশে বাহার গণ-সাহিত্যের চর্চায় আশ্রয়ন হইতেছেন, তাহাদিগকে নিম্নমতাবে বাঙালী নরনারীর হাড়মাশের কোটীটা, আর তাহাদের কার্যশক্তির গোড়ার কথাটা পাকড়াও করিবার দিকে অবসার হইতে হইবে। সেকালের আদিমদের ভিতর যে-সকল ডানপিটে-ভবঘুরে-তান্দড়েরা নিম্নবিষয় চালাইয়াছে, তাহাদের রক্তমাশের কিম্বদন্তি দেখিতেছি একালের কার্যে-বামুন-বৈতের জীবন-পন্দনে।

বাঙালী সমাজে আদিমদের প্রথম দান হাড়-মাশ। দ্বিতীয় দান তাহাদের হাত-পা’র জোর। ক্ষেতের কাজ আর খনির কাজ, দরিয়ার কাজ আর বন-জঙ্গলের কাজ ইত্যাদি খাওয়া-পরা-সম্পর্কিত অনেক-কিছুই তাহাদের নিকট হইতে বাঙালীর পাইয়াছে ও পাইতেছে। আদিমদের বোল-চাল ও ছুচাটো বা দশ-বিশ গুণা বঙ্গভাষার চুকিয়াছে ও চুকিতেছে। আর হিন্দু-সেবকবীর গৃহস্থালীতে আদিমদের দেব-দেবী, সংখার, লোকচাঁচর ইত্যাদিও নিশাথে ঘর করিয়া বসিয়াছে আর বসিতেছে। মাদ্রাসার আমলে আর তাহার পরবর্তী যুগের কোনো কালেই আদিম-বাঙালীতে সাহচর্য ও পারস্পরিক আদান-প্রদান নৃপ হয় নাই। সহবাস আর সহযোগিতা চিরকালই ছিল; আজও আছে। বিখ্যাত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বর্তমান যুগের বঙ্গসমাজেও এই সম্মিশ্রণের স্রোতই জরত ও প্রবল বেগে বহিতেছে।

বাঙালার নরনারীর রক্তমাশ মজবুৎ হইতেছে। বাঙালী জাতি বাড়িয়া চলিতেছে। নয়া বাঙালার গণ-সেবকেরা আশ্রয় হইল। আগামী পাঁচ-সাত-দশ বৎসরের ভিতরই যদি ম্যাট্রিক পাশ-করা মুগা, ওরাও বা শাঁওতাল কলিকাতার রেস্তোরাঁতে বসিয়া চা খাইতে স্বরূক করে, অথবা রাইচাঁপ বিক্রিতে কোনো কোনো করে বসিয়া কেরানীগিরিতে গয়না রোজগার করিতে থাকে, তাহা হইলে যুবক-বাঙালার স্বদেশসেবকগণের

পক্ষে বিচলিত হইবার কারণ নাই। তাহার বাঙালী জাতিরই “কৃষ্টি” বাড়াইবার নতুন যন্ত্রকরণ কাছ করিবে। “বাঙালী-করণ” যে-দে প্রাণালীতে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, সেই সকল প্রাণালীতেই আজও চোখের সামনেই চলিতেছে। “বাঙালী-কর্ত” আদিম নরনারীর সংখ্যা বাড়িলে বাঙালী সমাজের সীমানাই বাড়িবে।

### পতিত-জাতির বঙ্গ-সেবা

বাঙালী জাতিতে যে সকল নরনারী গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাদের ভিতর “পতিত” জাতিভঙ্গা অজ্ঞতম। পতিতরা দলে খুব পুর। গুণ-ভিত্তি হইয়া চুরাণী লাখ, অর্থাৎ হিন্দু-সম্মান-সমর্পিত গোটা বাঙালী জাতির ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি একমাত্র হিন্দু-বাঙালীর নাক গুলিতে হুক করি, তাহা হইলে শতকরা প্রায় আটত্রিশ জনই পতিত শ্রেণীর লোক।

এই পতিতজাতির সৃষ্টশক্তি জবর। ইহাদের ভিতরকার ডানপিটে-ভবঘুরে-তান্দড়েরা বেশ করিৎ-চলে। আদিমকে বয়কট করিলে বাঙালীর যেমন চলে না, পতিতজাতির সঙ্গে অসহযোগ কার্যে হইলেও সেক্ষেপ বাঙালীর চলিতে পারে না। পতিতরা ফেলিবার লোক নয়। নাম করিলেই যে-কোনো মাতঙ্গরহানীয় লোক বুঝিলে যে, পতিত বাদ দিলে বাঙালীর একটা বড় গোড়াই কাটা হইয়া যায়। জেল-কৈবর্ত, কলু, তেলি, ঝালো-ঝালো ইত্যাদি শ্রেণীর লোক প্রায় বার লাখ। বাঙালার সম্পদ গড়িয়া তুলিবার কাজে এই সকল পতিতের কৃতিত্ব হ্রাসিত। সাড়ে এগার লাখ আদিমের ভিতর দশ লাখ হইতেছে হিন্দু। ইহার সর্বদেই পতিত। আগেই বুঝিয়াছি যে, আদিমজালা বাঙালী জাতির আভা পলি বিশেষ। নমঃশ্রমের কর্তব্যমতা ও কৃতিত্ব সফল অজ বাঙালী পূর্ববঙ্গে অন্ততঃ এক-জনও আছে কিনা সন্দেহ। নমঃশ্রমেরা গুণ-ভিত্তি



বিশ্ব লাভেরও বেশী। এই জাতি “অশুশ্রুত”। এইরূপই অশুশ্রুত বাগ্দি, পোদ, মুচি, বাউরি, খোবি ইত্যাদি। অশুশ্রুততার আকার-প্রকার রকমারি বলা বাহুল্য। কিন্তু নমঃশূদ্র সমেত ইহারা প্রায় সাতার লাখ নরনারী। বাঙালী জাতির চাষ-আবাদ, বাঙালী জাতির বাহুল্য, বাঙালী জাতির বর-দুয়ার, বাঙালী জাতির জল-বাখিলা সবই অনেকাংশে এই সাতার লাখের হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে গড়া। অপর দিকে ভোম, হাঁড়ী, স্নেহর, ধাপড়, বাড়দুয়ার ইত্যাদি শ্রেণীর লাখ পাঁচেক নরনারীকে হাজার-কুজা বাঙালী জাতির অস্ত্রম-বিপুল ভূরূপে সংহন্য না করিলে গোঁরা-চুঁমি আর মগজবীতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

আসল কথা, পুরা-অশুশ্রুত, আধা-অশুশ্রুত, সিকি-অশুশ্রুত, নিম্ন-অশুশ্রুত, মন্দির-প্রবেশে অসম্মানিত, জল-চলার বহিহৃত ইত্যাদি পতিত শ্রেণীর সকল হিন্দুই আর্থিক বাঙালার নিরেট বনিয়াদ। বাঙালীর জীবন-বস্তা, বাঙালীর কুষ্টি, বাঙালার নরনারীর আর্থিক বিকাশ, বাঙালার সভ্যতা-ভাবতা — সব-কিছুর সঙ্গেই এই পতিত জাতির হাত, পা, মাথা আর মনয় মূহুর্তিত। অশুশ্রুতগণার স্পর্শহীন হইবামাত্র বাঙালী জাতি পৃথক প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। গণসাহিত্যের গবেষণা হিসাবে ইহারা বাঙালী জীবনের স্পন্দন চূড়িতছেন, তাঁহারিগকে এই সকল পতিত জাতির কৃতিত্ব ও সৃষ্টিশক্তি ইচ্ছা সহজে সন্ধান হইতে হইবে। বাঙালী-সভ্যতার পতিত জাতিগণার দান অসীম।

### আইনের ফলে পতিতের উদ্ধৃদ্ধা

পতিত জাতিগণার এক অংশ অবশ্য পূর্বে বিবৃত আদিম জাতিসমূহ। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত আদিমেরা সমগ্র পতিত সমাজের প্রায় আট ভাগের এক ভাগ। অশিশিষ্ট অংশ নমঃশূদ্র ইত্যাদির মত নানা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত। এই সব জাতি ও উপজাতির কেহ বা আত্মজ্ঞান বৈশ্বতর দাবী করিতেছে, কেহ বা ক্ষত্রিয়ের ইচ্ছা চাহিতেছে, আর কেহ বা বেমানস

কথাই বনিয়া বাইতেছে। কিন্তু মামুলি হিন্দু সমাজের বিদানে ইহারা সকলশেই অতি-নিম্ন শ্রেণীর লোক—এক কথায় পতিত। আত্মজ্ঞানকার মিঠা নাম “হরিজন”।

ইহাদের পতিত নাম আর কতদিন থাকিবে, বলা কঠিন। তবে পতিত-পারন সরকারী আইন-কানুনের বিদানে, — ইহারা “বামুন-কারেখ-বেঙ” অথবা “বৈষ্ণব-ক্ষত্রিয়” ইত্যাদির পদ না পাইয়াও তাহাদের রাষ্ট্রিক ইচ্ছা পাইতে চলিল। এমন কি পতিতদের পেছনে পেছন না ছুটিলে কারেখ-বামুন-বেঙেরা হরত রাষ্ট্রীয় জীবননীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ বাঙালী জাতিতে আগামী ভবিষ্যতে যাহারা গরিয়া ভুলিবে তাহাদের ভিতর পতিতরা জবরদস্ত শক্তি। এই শক্তিকে অস্বীকার করা অথবা এই শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ বা নিরপেক্ষ থাকা চরম আত্মদুকির পরিচয় হইবে। কাজেই গণজীবনের পুষ্কারিরা পতিত-পুষ্কার উত্তীর্ণ-পড়িয়া লাগুন। পতিত-শক্তির যথোচিত সংহন্যার সময় আসিয়াছে। সরকারী আইন-কানুনের পায়রা পড়িয়া এইবার হিন্দু-সমাজ সভ্য সভ্য-সম্মান হইতে চলিল।

পতিতরা বাস্তবিক পক্ষে কাহারাই? বাঙালী সমাজের গোড়ার কথা আদিম জাতি। এই আদিম নরনারীরা ধাপে ধাপে উত্তীর্ণাচ্ছে। অসংখ্য রীতি-সমিশ্রণের ফলে, অসংখ্য ব্রহ্ম-সমিশ্রণের ফলে আদিমগণার “বাঙালী-করা” মাথিত হইয়াছে। অবগাণীকে বাঙালীতে রূপান্তরিত করিবার যতগুণা এগাণী ও কর্ণকোশল আছে, তাহার ভিতর আদিম-গুণার পক্ষে পতিত জাতির অবস্থা পর্য্যন্ত উঠা অজ্ঞতম। হিন্দু-সমাজের সর্গনিয়ন্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে আদিম নরনারীর অনেক দিন লাগিয়াছে। নমঃশূদ্রের ভিতর, ডোমের ভিতর, ডোমের ভিতর, হাড়ীর ভিতর এই কেমিকি উদ্ভাবনই কোনো কোনো ধাপ দেখিতে পাইতেছি। বাঙালী জাতির “কুষ্টি” লইয়া যাহারা গৌরব করেন, তাহাদের পক্ষে আদিম জাতির

উন্নতি ও বাড়তি দেখিয়া বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবিহীন হওয়া উচিত। এই উন্নতি ও বাড়তিরই অজ্ঞতম প্রতিমূর্তি হইতেছে পতিতদের উজ্জায়া। মামুলি হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থায় এই উজ্জায়া ঘটে শতাব্দীতে বোধ হয় আধ ইঞ্চি! কিন্তু পতিত-পারন আইনকানুনের জোরে এই উজ্জায়া রাতারাতি শতগুণ বাড়িয়া বাইতে বাধ্য। পতিত নরনারীর জীবন-বুদ্ধিতে বাঙালীর কুষ্টি যারপরনাই শক্তিশাল্য করিবে, আর দিকে দিকে বাড়িতে থাকিবে। বাড়বার গণ-সেবকের পক্ষে আজ এক নতুন চক্রের বৃহত্তর বস্তুর অভ্যুত্থান দেখিয়া জয়ধ্বনি করা কর্তব্য। পতিতদের ডানপিটা-ভবনুরা-ত্যাগভেরাও আশস্ত হউন।

### নিরক্ষরের ছুনিয়া

বাঙালী জাতির কৃত্তীয় শ্রষ্টা হইতেছে নিরক্ষর নরনারী। নিরক্ষরদের শক্তিবোধ, কর্মক্ষমতা আর কৃতিত্ব গণ্যশ্রী মাত্রের পক্ষে সবিশেষ প্রদীপনযোগ্য। প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল যে, বাঙালী জাতির পাঁচ কোটি দশ লাখের ভিতর চুয়াত্তর লাখ মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে। অর্থাৎ একশ’ নরনারীর ভিতর ৮৯ জনই নিরক্ষর। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, উচ্চ জাতের হিন্দুরা বুদ্ধি সবাই লিখিতে পড়িতে পারে। এই ধারণা ঠিক নয়। এই হিসাবে বৈষ্ণবরা সবলে সেরা। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজেও ছেলে-বুড়া আর স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে গুলিগে দেখা যায়, শতকরা ৬৩.৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে। অর্থাৎ বৈষ্ণবের তিন ভাগের একভাগ নিরক্ষর। তাহার পর ঠাই বামুনদের। এই সমাজে অর্ধেকের বেশী নিরক্ষর। আঁক কয়লা বাহির করিলে দেখি যে, শতকরা ৫৫.৫ জন বামুন লিখিতে পড়িতে পারে না। আর কারেখ-দের অবস্থা বামুনের চেয়েও নীচে — অবশ্য অল্প নীচে। এই সমাজে শতকরা ৬০ জন নিরক্ষর। অজ্ঞতা সংখ্যা-বড় হিন্দু জাতিগণার ভিতর মাহিঙ্গ সমাজে

শতকরা ৭১.৬ জন, আর নমঃশূদ্র সমাজে শতকরা ৯১.৮ জন নিরক্ষর।

মুসলমানদের ভিতর যাহারা সৈয়দ “জাতের” লোক তাহাদের অবস্থা নমঃশূদ্র আর মাহিঙ্গদের চেয়ে উন্নত। সৈয়দের ভিতর শতকরা ২৭.৩ জন লিখিতে পড়িতে পারে অর্থাৎ ৭২.৭ জন নিরক্ষর। আর “গুনিম” (জোলাহা) মুসলমানদের অবস্থা নমঃশূদ্রদের সমান। এই সমাজে শতকরা ৯১.১ জন নিরক্ষর।

ছুনিয়ার অজ্ঞতা দেশেও নিরক্ষর আছে। ভারতের অজ্ঞতা আছেই, এমন কি ইয়োরোমেরিকায়ও আছে। নিরক্ষর জাতের অবস্থা নিম্নরূপ —

১। বিহার ও উড়িষ্যা নিরক্ষর শতকরা	৯৪.৮ জন
২। যুক্তপ্রদেশে	৯৪.৬ „
৩। পাঞ্জাবে	৯৪.১ „
৪। মধ্যপ্রদেশে	৯৪.০ „
৫। আসামে	৯৩.৯ „
৬। মাদ্রাজে	৮৯.২ „
৭। বাঙলায়	৮৯.০ „
৮। ব্রহ্মদেশে	৬৩.২ „

গোটা-ভারত একত্র করিলে শতকরা ৯০.৬ জন নিরক্ষর পাঁচায়। ভারতবাসীর ভিতর অধিকাংশ জাতই বাঙালীর চেয়ে জাত-হিসাবে বেশী নিরক্ষর। তবে জগতের অজ্ঞ কোথাও,—তীন ইত্যাদি এশিয়ার অজ্ঞতা দেশ এবং আফ্রিকার মুরুকুণ্ডা বাসে—বাঙালীর চেয়ে বেশী নিরক্ষর জাত নাই। ভারতের বহিহৃত নিরক্ষর ছুনিয়ার মাপ নিম্নরূপ —

১। ইজিপ্টে নিরক্ষর শতকরা	৮৫.৭ জন (আফ্রিকা)
২। পর্তুগালে	৬৫.২ „ (ইয়োরাপ)
৩। মেক্সিকোয়	৬৪.৯ „ (আমেরিকা)
৪। সোভিয়েট রুশিয়ায়	৪৮.৭ „ (ইয়োরেসিয়া)
৫। গ্রীসে	৪৩.৩ „ (ইয়োরাপ)
৬। পেনে	৪০.০ „
৭। বুগেরিয়ায়	৩৯.৭ „



৮।	পোন্ডাণ্ডে	শতকরা ৩২.৭ জন (ইয়োরোপ)
৯।	লিথুয়ানিয়ার	৩২.৭ " "
১০।	ইতালিতে	২৬.৮ " "
১১।	লার্ভিভিয়ার	১৮.৮ " "
১২।	হাঙ্গারিতে	১৩.০ " "
১৩।	এথেনিয়ার	১০.৮ " "
১৪।	বেলজিয়ামে	৭.৩ " "
১৫।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে	৬.০ " (আমেরিকা)
১৬।	ফ্রান্সে	৫.৯ " (ইয়োরোপ)
১৭।	কানাডায়	৫.১ " (আমেরিকা)
১৮।	অস্ট্রেলিয়ায়	১.৭ " (ওশিয়ানিয়া)

দেখা যাইতেছে যে, নিরক্ষরতা ভারতবাসীরই একচেটিয়া নয়। বাঙালীরা এই সংক্ষেপে গ্রন্থিয়ার একমাত্র পানী ভাত নয়।

### কর্মক্ষমতায় নিরক্ষরের গৌরব

যাহা হউক, নিরক্ষরগুলাকে সঠা বলিলে সোকেস মনে খটকা লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু খটকা লাগাটা লিথিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর অজ্ঞত মুখখুঁসি বিবেশ। একটু চোখ খুলিয়া দেখিলেই নিরক্ষর নরনারীর স্বপ্নশক্তি সন্দেশে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ থাকে না। আবহমান কাল ধরিয়া নিরক্ষররা গ্রন্থিয়া গড়িয়া আসিতেছে। আজও জগতের সর্বত্র যেখানে-সেখানে নিরক্ষর নরনারী বৈশী-বৈশী অথবা অন্ন-বিস্তর দেখা যায়, সেই সকল জনপদে নিরক্ষরের হাত, পা, মাথা, কণ্ঠ দেশকে দেশ, জাতিকে জাতি গড়িয়া তুলিতেছে। ডানপিটো-ভবঘুরো-ভ্যান্ডাড শ্রেণীর নরনারী নিরক্ষর গ্রন্থিয়ার বিস্তর।

বাঙালী জাতির শতকরা ৮৯ জনের ভিতর চাষী আছে, মজুর আছে। তাহাদের কেহ বা মিস্ত্রী, কেহ বা মাশ্টি, কেহ বা তাঁতী, কেহ বা জোলাহা। গন্ধর্ব্বকণ্ঠ, স্বরধ্বনি, সাহা, তিলি ইত্যাদি বৈশ্যারীর জ্ঞাতও নিরক্ষরদের দলে আছে। এই দলে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। আদিমদের অনেকে ত

নিরক্ষর বটেই, পতিতদের অবস্থা আদিমদেরই কাছাকাছি। অজ্ঞে পরে কা কথা, মায় বৈভব, বামন আর কারেখরাও নিরক্ষর সমাজের বেশ-কিছু হিত্য দখল করিয়া আছে। অর্থাৎ বাঙালী জাতির আর্থিক, সামাজিক, আর্থিক বা রাষ্ট্রিক সকল কাজেই নিরক্ষরেরা কিছু-না-কিছু ইন্ধন জ্বোগাইতেছে। পাঁচ-কোটি দশ লাখ সোকেসের শক্তি-সামর্থ্য বা অশক্তি-অসামর্থ্য, তাহাদের কাঁপ্তি-অকঁপ্তি, জয়-পরাজয় সবই নিরক্ষরদের হাড়-মাংস, মাথার জোর আর হ্রিয়ার জোরের উপর নির্ভর করে। একমাত্র লিথিয়ে-পড়িয়ে চ্যুস্তর লাখ নরনারীর দৌলতে বাঙালী জাতির ধনসম্পদ গড়িয়া উঠিতেছে না, বিন্ন-সর্দাত-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না, স্বরাজ-স্বাধীনতার আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে না।

লিথিতে-পড়িতে না জানিলে অনেক বিষয়ে মাথদেয় অসুবিধা হয়, একখাটা ঠিক। কিন্তু লিথিতে-পড়িতে না জানিলে নরনারী যে একদম আনাড়ি, আহাযুক বা মুখু থাকে একখাটা পুরা-পুরি অটিক। নিরক্ষর নরনারীকে অশিক্ষিত দৃষ্টিয়া রাখা লিথিয়ে-পড়িয়ে লোকগুলায় একটা জবর আহাযুকি। আর ইহা দান্তিকতা ত বটেই।

### কর্ম-কাণ্ডের শিক্ষালয়

লিথিয়ে-পড়িয়েরা চালায় কলম, নিরক্ষরেরা চালায় লাঙ্গল, কুলো, হাপর, জাঁতা। লিথিয়ে-পড়িয়েরা আদালতে উকিলী করে, নিরক্ষরেরা হাটে-বাজারে সওদা কেনা-বেচা করে। লিথিয়ে-পড়িয়েরা নাড়ী টিপিয়া গুণ্ডু দেয়, নিরক্ষরেরা কালামাটি বিয়া মাহুয় গড়ে, জানোয়ার গড়ে, ঘর-বাড়ী গড়ে। কলম চালাইতে, আদালতে গলা-বাঁজি করিতে, নাড়ী টিপিতে মগজের খাঁ খরচ হয়, বুদ্ধি আবহক হয়। কিন্তু লাঙ্গল চালাইতে, বাজার-হাটে কেনা-বেচা করিতে, ঘরবাড়ী তৈয়ারী

বা মোরামত করিতে, মাছ ধরিতে আর নৌকা বাহিতেও মগজের খাঁ লাগে মন নয়, বুদ্ধির দরকার হয় বেশ। লিথিয়ে-পড়িয়েরাই কোনো দেশে কোনো সমাজে একমাত্র শিক্ষিত নয়। নিরক্ষরেরাও শিক্ষিত বটে। হাতে পায়ে কাজ করিতে করিতে যে সব চাষী, মিস্ত্রী, মাশ্টি, বরামি, জেলে, বেগারী গড়িয়া উঠে তাহারা এই সকল কর্মকাণ্ডের বিভাগয়েই চুস্তা শিকার অধিকারী হয়। অবশ্য শিক্ষিতে পড়িতে পারে না,—এই একটা অসুবিধা থাকিয়া যায় সন্দেহ নাই।

খাদের কাজে লাগিয়া থাকিতে থাকিতে আদিম, পতিত ও অজ্ঞাত নিরক্ষরেরা কর্মক্ষম ওস্তাদরূপে নতুন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। আর রেলের কুলী, পাট-কলের কুলী, চা-বাগানের মজুর, ইম্পাত-লোহার কারখানার মজুর ইত্যাদি নরনারী নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের হাতপার চোর ত বাড়িতেছেই, মাথার জোরও বাড়িতেছে। সম্ভবত ভাবে কাজ করিবার শক্তি বাড়িতেছে, সমন-নিষ্ঠা বাড়িতেছে। এই সকল নতুন সদগুণ বা স্বনীতি নিরক্ষরদের চরিত্রে দেখা দিতেছে। তাহার উপর আছে নিরক্ষরদের উচা, গাম, আমোদ, আছাদ হানি-ঠাটা-রসিকতার উৎস। আদিমদের, পতিতদের এবং অজ্ঞাত নিরক্ষরদের সামাজিক উৎসবগুলা তাহাদের চরিত্র-বিকাশের পক্ষে, তাহাদের মাথা পাকাইয়া তুলিবার পক্ষে, তাহারিগকে শিক্ষিত করিবার পক্ষে যারপনয়ই মূল্যবান। অধিকন্তু এই সকল নাচ-গানের শিল্প-কলা বিষয়ক ইজ্ঞত আছে। রসিক হিসাবে নিরক্ষরেরা লিথিয়ে-পড়িয়েদের চেয়ে বাটো নয়।

নিরক্ষরদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে যাহারা অবজ্ঞা করিয়া চলেন, তাঁহারা গণশক্তির বিশাল কর্মক্ষেত্রটাকে তুলিয়া দহিয়েছেন। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির সজীকরণে নিরক্ষরেরা সর্ব্বথা গণসেবকদের "গুণা-হান"। দেশের লোককে লেখাপড়া শিখাইবার

প্রয়োজন নাই, একপ বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে যে, লেখাপড়া না জানা সমস্ত বাঙালী জাতির ভিতর যে সকল লাখ লাখ কর্মবীর, স্বপ্নশক্তিসম্পন্ন, চরিত্রবান নরনারী আছে, তাহাদের জীবনকে উপেক্ষা করিয়া বাধ্য। যুবক-বাঙালার গণসেবকগণ নিরক্ষরকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। নিরক্ষর-ডানপিটো-ভবঘুরো-ভ্যান্ডাডদের সঙ্গে লিথিয়ে-পড়িয়েরা দহনম-মহরম চালাইবার ব্যবস্থা করুন।

### বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার-প্রকার

বস্তুতঃ স্টপশক্তি, কর্মক্ষমতাই, গঠন-মূলক কার্যা ইত্যাদি সংক্ষেপে সাধারণতঃ সোকেসের ধারণা। কিছু অম্পষ্ট। ইঙ্গল-কলেজগুলার বাহিরে মাহুয়ের মাথা যে বিকাশ লাভ করিতেছে, সেই দিকে চোখ অনেক সময়েই পড়ে না। এমন কি যে সকল ছাত্রছাত্রী পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে যায়, তাহাদের অনেকেরই অধিকাংশ জীবন পাঠশালায় বহিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলার সাহায্যে গড়িয়া উঠে। খরবের কাগজ হইতে, ভাসানিসিতি হইতে, মার্কজনিক গ্রন্থশালা হইতে ভগ্ন-ভরঞ্জীরা যে সকল ভাঙ্গা খরব বা ভাঙ্গা উৎপ্রেরণ লাভ করে ঠিক সেই ধরণের খরব বা উৎপ্রেরণ তাহারা ইঙ্গল-কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রায়ই বোধ হয় পায় না। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের ভিতর যুবক-বাঙালার মহলে বেশ-বেশ কবি, শিল্পী, গায়ক, লেখক, গবেষক ইত্যাদি স্বরীর উত্তর হইয়াছে তাহাদের পেটের কথা বাহির হইয়া পড়িলে হয়ত কোনো পিন দেখা যাইবে যে, তাঁহারা বি-এ, এম-এ গাশের জোরে অথবা মাষ্টারদের নিকট হইতে বৈশী কিছু পাইয়াছেন কি না নহেহ। অর্থাৎ ইঙ্গল-কলেজ-বিদ্যাবিশারদের বাহিরেও একটা বেশ বড় গোছের বিদ্যাবিশারদ সর্দারী কাজ করিতেছে। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির স্টপশক্তি ও জরীপ করিবার সময় সেই বেনামী



বিখ্যাতগণের ছাত্রছাত্রীগুলার আদমমুমারী করা আবশ্যক। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা, সভা-সমিতি, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে যে সকল বোক মঙ্গল তাহার বাঙালী জাতিকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। এই জ্ঞ ইঙ্গুল-কলেজের কেল-হুগো বোকেরাও বাঙলা দেশের নানা কর্ণক্ষেত্রে বেশ হুনাম করিতে পারিয়াছে। ডানপিটো-ভবঘুরো-ভাণ্ডারেরা বেনামী বিখ্যাতগণেরই ডিগ্রী-পাণ্ডা বোক।

বাঙলা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে গবেষণার যারা বাহারা নতুন কিছু দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন তাহাদের অনেকেই বিখ্যাতগণের দেওয়া বিজ্ঞার উপর নির্ভর করেন নাই। শ্রুতুল-বিজ্ঞানময় মজুমদার নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞার বাঙালী জাতির অজ্ঞাত পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তিনি দেশ-বিদেশের কোনো ইঙ্গুলে লেখাপড়ার ফলে এই সকল বিজ্ঞার দিকে মেজাজ খেলাইতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি কোনো-না-কোনো বেনামী বিখ্যাতগণের পড়ুয়া বোক। আমাদের রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী বাঙলা দেশে যে সকল বিজ্ঞার জ্ঞান অমরতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল বিজ্ঞা তিনি ইঙ্গুল-কলেজে পড়েন নাই। অধিকন্তু তাহাকে ইঙ্গুল-কলেজে অজ্ঞাত বিজ্ঞার তৈয়ারি করিয়াই ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইত।

বাঙলা দেশে আজকাল হাজার-বারশ' লাইব্রেরী আছে। ইহাদের অনেকগুলাই হয়ত নামমাত্র প্রকাশ্য। বোধ হয় প্রত্যেকটা গোটা শ' কের হুগো পুস্তির সংগ্রহাদয় ছাড়া বেশী কিছু নাই। কিন্তু তবুও জ্ঞানীরা বাহা উচিত বে, লাইব্রেরীগুলার আবহাওয়া না থাকিলে এই পচিশ-ছাপ্রিশ বৎসর-ব্যাপী বদেশী আন্দোলন চলিতে পারিত না, বাঙালী সমাজে নতুন নতুন কর্ণের প্রতিষ্ঠান ও চিন্তার স্রবোৎস্র হইত না। বেকার-সমস্তার সমাধানের জ্ঞান তাহা যে গিথিয়ে-পড়িয়ে বোকেরা মাথা দিতেছে, তাহার জ্ঞানও লাইব্রেরীর বই আর খবরের কাগজ অনেক অংশে দায়ী। এই সঙ্গে সংবাদপত্র আর সাময়িক

সাহিত্যের ক্ষণেও হাতে হাতে ধরা পড়িতেছে। খবরের কাগজগুলো না থাকিলে বুক-বাঙলার মাথাও বাড়িত না, জ্ঞানও বাড়িত না।

### রেডিও ও সিনেমা

এই ধরনের বেনামী বিখ্যাতগণের ভিতর আজকালকার দিনে রেডিও আর সিনেমা দুইটা বড় প্রতিষ্ঠান। রেডিওর খবর, বক্তৃতা, জ্ঞানসা, গানবাধনা ইত্যাদি শুনিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য বোক মানুষ হইতেছে। আমাদের বাঙলা দেশেও রেডিও প্রধানতঃ কলিকাতায়, আর কিছু-কিছু মফস্বলে অনেক ছেলে-পুটো জী-পুথককে মাথায় করিয়া তুলিতেছে। রেডিওর কাটতি বাঙলা দেশে শ্রীষ্টই জ্ঞেয় জ্ঞেয় বাড়িতে থাকিবে। তাহাতে বাঙালী জাতির মাথা আর্থিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষেত্রে, এক কথায় জীবনের সকল বিভাগেই বাড়িয়া চলিবে। বেতার-প্রতিষ্ঠানের আওতা যে সকল নরনারী আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের অনেকেই নতুন নতুন ডানপিটো, নতুন নতুন ভাবধারা, আর নতুন নতুন ত্যাগভ ভাবে বাঙালী জাতির শ্রীর দল বাড়াইয়া তুলিতেছে। বাহারা নিরক্ষর তাহারা ত রেডিওর দৌলতে অনেক-কিছু শিখিতেছে। বাহারা শিখিয়ে-পড়িয়ে তাহারাও "পুনঃশিক্ষিত" হইতেছে। চাই দেশের সর্বত্র রেডিওর ব্যবস্থা। জ্ঞানবিজ্ঞানকে সার্বজনিক করিয়া তুলিবার এক প্রধান যত্নই এখানে রেডিও। এই ব্যবসায় বুক-বাঙলার লাগিয়া যাওয়া আবশ্যক।

সিনেমাওলা থিয়েটারের মাসতুত ভাই বিশেষ। তবে সিনেমায় দেশ-বিদেশের নরনারীকে জ্ঞানভাবে চোখে দেখা যায় বলিয়া অনেক জিনিষ বোধ হয় বেশী চিত্তাকর্ষক হয়। আর কথা শুনেই ঢকী বা রূপবাহীর মারফৎ। অজ্ঞাত দেশের মত বাঙালী দেশেও সিনেমার প্রভাবে বাঙালীর চিন্তা ও কর্ণশক্তি

বাড়িয়া গিয়াছে। গণশক্তির খতিয়ান করিতে বসিলে সিনেমায় শিক্ষিত বাঙালী নরনারীর নাক শুনিয়া দেখা আবশ্যক হইবে।

অজ্ঞাত দেশের মত আমাদের দেশেও সিনেমার ছবিতে-পথে হয়ত হেলেসেমেদের মেজাজ কিছু-কিছু বিগড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছ-চার-দশ গণ্য বোকের দৃষ্টিতে দেশেও বোকের দৃষ্টি হয় নাই। নয়া বাঙলার কবিরা, নাট্যকারেরা, উপন্যাসিকেরা, গল্পলেখকেরা সিনেমার রূপবাহীতে অনেক নতুন নতুন কল্পনার হদিশ পাইয়াছে। দেশোত্তরিত অনেক ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্ণ-কৌশলও সিনেমা হইতে বুক-বাঙলার মগজ প্রবেশ করিয়াছে। অজ্ঞাত দেশের মত সিনেমায় বাহা কিছু দোষ বা কু আছে তাহাও "নিমজ্জতীন্দো: কিরণেবিধা:"। কাজেই বাদরামিগুণকে বইয়া অতি-বেশী বাটা-বাটি না করাই ভাল। অধিকন্তু সিনেমায়ও সংস্কার সাধন করা খুবই সম্ভব। শিল্পবাগীজ বিষয়ক আর শিক্ষা-দীক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয়ের কাজে বাঙালীর মাথা খেলানো আবশ্যক।

### প্রৌঢ়দের পুনঃশিক্ষা

নিরক্ষরদের নাচগানের কথা বলিয়াছি। বক্তৃতঃ গিথিয়ে-পড়িয়েদের বোলাও এই ধরনের উৎসব জীবন-বুদ্ধির সহায়ক। বাজা, কথকতা, কীর্তন, মেলা ইত্যাদি ব্যবস্থায় বেনামী বিখ্যাতগণের কৃত্তবই দেখিতে হইবে। মালোদিয়া-বাস্তব-কলোয়ার বিকল্পে লড়াই বিবরক বক্তৃতা, বাহা-প্রদর্শনী, শিত-প্রদর্শনী, ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা, সস্তর-প্রতিযোগিতা, ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অশ্রুতানুগাও বাঙালী জাতিকে নানাদিকে কৃত্ত করা তুলিতেছে। ইয়োরামেরিকায় সোভিয়েট রুশিয়া হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্রই বেনামী বিখ্যাতগণের অন্তর্গত এই বড় প্রতিষ্ঠান আজকাল যারপরনাই দৌর-শীল। নতুন গুণ্ডাও পুনরায় গুণ্ডা পিটিয়া মাথায়

করিবার জ্ঞান এই সকল দেশে "আডাল্ট এডুকেশন" বা প্রৌঢ়-শিক্ষার ব্যবস্থা জোরের সহিত চলিতেছে। এই সব ব্যবস্থার আসল বয়স হইতেছে বেতার, সিনেমা, সংঘদান, পণ্ডিট, গ্রন্থালা, বক্তৃতা ইত্যাদি।

### জমিদার মহলে প্রৌঢ়-শিক্ষা

এইরূপ রকমারি বেনামী বিখ্যাতগণের সাহায্যে বাঙালী জমিদারদের সমাজে "প্রৌঢ়-শিক্ষা" কার্যে পরিবার দিন আসিয়াছে। জমিদার-সমাজের ভিতর একটা গভীর নৈরাশ্র বোধ বাইতেছে। তাহাদের সাহায্যে বাঙলার নরনারী যে অসংখ্য দিকে লাভবান হইয়াছেন এই কথা জ্ঞানসাধনার মনে আনে না। এমন কি জমিদারেরাও সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই বৎসর জিশেক ধরিয়া বুক-বাঙলা বদেশী আন্দোলনের জ্ঞান বিশেষে বাইতেছে, শহরে-পল্লীতে কারখানা কার্যে করিতেছে, শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, ব্যাক চালাইতেছে, বীমাব্যবহার ত্রুটি হইতেছে তাহার প্রত্যেক অশ্রুতান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জমিদারদের "রুবিরা" সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে স্রজ্জিত। জমিদারেরা বাঙালী জাতিকে শিক্ষা-নিষ্ঠ, যত্ন-নিষ্ঠ ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠ রূপে গড়িয়া তুলিতে বেশ-কিছু সাহায্য করিয়াছে। এই কথাটার ইচ্ছা দিতে না শিখিলে বুক-বাঙলার আগামী ভবিষ্যৎ স্বপ্নে চলিতে পারে না। এই কথাটার মর্ম বৃদ্ধিতে পারিলেই জমিদারেরাও বঙ্গসমাজে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস হইতে পারিবে।

বঙ্গসমাজকে ভিতর নতুন শাসন-প্রণালী কার্যে হইতে চলিল। তাহার আওতা যে ধরনের হিন্দু-মুসলমান, কর্ণজাতা-কর্ণপ্রবীতা, হিন্দু-পতিত, জমিদার-প্রজা, "পুঞ্জিপতি"-চাষী ইত্যাদি সমস্তা উৎপত্তি হইবার কথা, সেই সকল সমস্তা সমাধানের সময় জমিদারদের অতীত ও বর্তমান কৃতিত্বের কথা অনেক কাজ লাগিবে। মুসলমানেরা, পতিতরা, প্রজারা,



চাষীরা, কর্ত্ত্ব-প্রাধিকার। সকলেই জমিদারের আধুনিক শিক্ষা-নিষ্ঠা, বাণিজ্য-নিষ্ঠা আর পুষ্টি-নিষ্ঠার কিছু কিছু লাভবান হইয়াছে ও হইতেছে,—এই জানটা সাধারণতঃ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। জমিদার-মহলেও এই জান প্রচারের জন্ত পুণঃ-শিক্ষা প্রবর্তন করা কর্তব্য। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় যেসব জমিদার-সভা কয়েম হইয়াছে, তাহার উত্তাপে জমিদারগণকে নতুন শাসন-ব্যবস্থা মার্কিন, নতুন রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজ্যনৈতিক কর্ত্ত্বকৌশলে পাকাইয়া তোলা দরকার।

### চাষী-সমাজের লোকমত গঠন

অজ্ঞাত সম্ভ্রান্তদের ভিতরও পুণঃ-শিক্ষার অথবা প্রৌঢ়-শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। ইকুলের মারফৎ শিক্ষা প্রচলনের জন্ত বসিয়া থাকিলে চাষী-মহলে বিজ্ঞা প্রচারিত হইতে এক শতাব্দী লাগিবে। আগেই বসিয়াছি চাষীরা নিরক্ষর বটে কিন্তু তাহারা অশিক্ষিত নহ। চাষী-সমাজে মাথার জোর, চরিত্রের জোর, কর্মদক্ষতার জোর বেশ স্বপুষ্ট। তবে অর্থাভাবে তাহাদের ভিতর লেখাপড়ার ব্যবস্থা সুপ্রচলিত করা দুঃসার-সম্পন্ন ব্যপসরের কাজ নয়। একজ ইকুল-পাঠালা দুই চারশ' বত কয়েম হয় ততই ভাল। কিন্তু একমাত্র তাহার ভরসা বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। চাষীদের জন্ত চাই রেডিও-সিনেমা, বক্তৃতা-প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদির সাহায্যে স্বাস্থ্য-প্রচার, শিল্প-প্রচার, “লোকমত”-গঠন। বরতঃ জমিদারদের জন্ত যে ধরনের প্রৌঢ়-শিক্ষা বা পুণঃ-শিক্ষা আবশ্যক, চাষীদের জন্তও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই আবশ্যক। প্রত্যেকের জন্তই চাই হরেক রকম বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবহার।

প্রজা-সমিতি, কিষাণ-সমিতি ইত্যাদি সম্ভের মারফৎ পল্লীবাসীর জ্ঞান বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। রপ্তানিবিক্রির দিকে চাষীদের খেয়াল জাগিলে ভাল। শহর-পল্লীতে শিল্প গড়িয়া উঠিলেও

চাষীদের উপকার। এই সব সম্ভবন্ধ কিষাণগণ নিজ নিজ আর্থিক উন্নতির নতুন হৃদয় পাইতেছে। তাহাদের জীবনের সঙ্গে বাঙালী স্মিথিয়ে-পাড়রের আর্থিক যোগাযোগ কয়েম হওয়া দরকার। তাহার এক বড় উপায় বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়। গণসাহিত্যের সেবকেরা কিষাণ-সমিতির দিকে নজর ফেলুন।

### মজুর ও কারিগরদের যন্ত্র-নিষ্ঠা

মজুর-সমাজেও বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অস্থান আবশ্যক। যন্ত্রনিষ্ঠার মজুরেরাই বাঙালী জাতির আসল প্রতিনিধি। নতুন নতুন কলকজার কথা, নতুন নতুন আধিকারের কথা, নতুন নতুন মজুর-ব্যবস্থার কথা, নতুন নতুন মজুর-সঙ্ঘের কথা মজুরদেরকে জানাইবার জন্ত চাই রেডিও আর সিনেমা। যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিতরণের জন্ত এই সবের বহুল সম্ভাবহার আবশ্যক।

তাহা ছাড়া মধ্যস্থলের পল্লীতে পল্লীতে যে সকল কীসারি, তাঁতী, মিঠী ইত্যাদি কারিগর কুটির-শিল্পে মোতায়েন আছে তাহাদিগকে “বানিক্য-নতুন” ধরনের যন্ত্রের কাজে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্তও চাই বেনামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। জার্মান-বিশ্বাভী-মার্কিন সমাজের অতুল এঞ্জিনিয়ারিং-প্রস্তুত জটিল ও দামী যন্ত্রপাতি আমাদের মানুষি কুটির-শিল্পীদের কাজে আসিবে না। এই সব কারিগর যুগযুগান্তর ধরিয়া অতি-আদমি চরের কলকজার ব্যবহারে অভ্যস্ত — এই সকল কলকজার “টিক পরবর্তী” অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত তাহার চেয়ে বেশী-কিছু করিতে গেলেই আধাশিক্ষিত করিয়া বসা হইবে। যন্ত্রপাতির এই সকল “পরবর্তী” ধাপ” সম্বন্ধে কারিগরদিগকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্ত চাই মেলা, সংগ্রহালয়, বক্তৃতা, রেডিও ও সিনেমা ইত্যাদির সম্ভাবহার। অবাস্তব ভাবে বসিয়া রাখিতেছি যে, যন্ত্রপাতির উৎ, তার চেয়ে উচ্চ আর সব চেয়ে উচ্চ ধাপগুলার সঙ্গে মোশাকাত

চালানো বাঙালী এঞ্জিনিয়ার আর বড় বড় কারখানার কর্মকর্তাদের পক্ষে অচ্যুত নয়।

### পুনর্গঠনের অ, আ, ক, খ

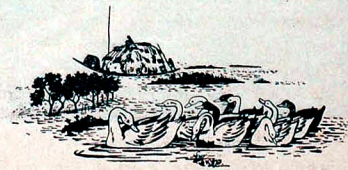
আসল কথা, জমিদার-মহলে, চাষী-মহলে, মজুর-মহলে, কুটির-শিল্পী-মহলে, ডানপিটে, ভবঘুরে আর তাঁদড় শ্রেণীর কর্মচারী ও চিন্তাবীর চুঁতার জন এখনই কাজে বাহাল আছে। সর্বত্রই পুনর্গঠনের অ, আ, ক, খ, স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। তাহার পথপ্রদর্শকের মত এই সকল সমাজে নতুন নতুন দখল বাটিয়া চলিয়াছে। তাহার না থাকিলে বাঙালী জাতির দুর্দশা আরও বেশী হইত-সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল ডানপিটে-ভবঘুরে-তাঁদড়ের কুতি আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা করা দরকার। গণসাহিত্যের গবেষক ও প্রচারকেরা বাঙালী জাতির বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভিতরকার নতুন নতুন কর্মপ্রবর্তক ও চিন্তাপ্রবর্তকের জীবন আলোচনা করিতে অগ্রসর হউন।

### গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিশ্বরূপ

এই যে এত অসংখ্য পথে অসংখ্য রূপে ডানপিটে-ভবঘুরে-তাঁদড়েরা বাঙালী-জীবনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে তাহার কাব্য চাই, নাট্য চাই, গল্প চাই,

উপন্যাস চাই। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির সৃষ্টি-বিশ্বকোষ আকারে-প্রকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিশ্বকোষ সম্বন্ধে চিত্রকরেরা তুলির সম্ভাবহার করুন, স্থপতিরা হাতুড়ি-বাটালি ধরুন। নৃত্য-সেবকেরা, অর্থশাস্ত্রীরা, সমাজ-তত্ত্বসেবীরাও এই বিশাল জীবনস্রোতের সঙ্গে মগজের সহযোগ চালাইতে বিশেষ রূপে ত্রস্তব্ধ হউন। আর যুবক-বাঙালার স্বদেশসেবক-গণ আদম-পতিত-নিরক্ষর বাঙালীর মহত্ত্ব ও বীরত্বের যথোচিত কদর করিতে অভ্যস্ত হউন। অপর দিকে রাষ্ট্রিকেরাও এই সকল কোটি কোটি লোকের জীবন-বুদ্ধি জরীপ করাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী শাসন-বিভাগের তত্ত্বির একটা হাথী “জাত-পাত” বিশ্বক দপ্তর কয়েম করিবার জন্ত আদেশাদান শুরু করুন।

বাঙালী জাতি সকল তরফ হইতে গণ-পুঞ্জায় উদ্ভূত হউক। গণসাহিত্যের চর্চা বস্তুনিষ্ঠভাবে ও ব্যাপকরূপে বাঙালার মাটিতে শিকড় গাড়িতে থাকুক। গণ-শক্তি ও গণসাহিত্যের বিশ্বরূপ দেখি। যুবক-বাঙালার নরনারী মনজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতিকে আদম-পতিত-হিংস্র-মূল্যমান মা বলিয়া ডাকিতে শিখিবে। তাহার পর বাঙালার দেখা দিবে রূহন্তর বন্দে মাতরম্-মন্ত্রের স্রষ্টা, মহা-বন্দের বিরাট ণবি।





প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে মহামানবের আদর্শ দীক্ষিত—  
তার জন্মভূমি এশিয়ার প্রিয়তম রাজ্য। শুধু ভগবান  
গৌতম বুদ্ধের মাতৃভূমি ব'লে নয়—দেবলোকের প্রিয়  
বিহারস্থল ব'লে হিমালয়ের বক্ষে পদচিহ্নের মত  
শোভিত নেপালকে বর্ণরাজ্যের পথ বণা হ'য়ে থাকে।  
বিখ্যাত পণ্ডিত সিলভা লেভির মতে ‘নেপাল’  
শব্দের মানে হচ্ছে—“The land leading to  
Paradise”। বীদের এই দিবা উপত্যকা পরিভ্রমণের  
স্বযোগ হয়েছে তার! অস্বভব করেছেন—এই জায়গাটি

বন্ধের যদি নির্দোষের অবসর হ'ত তবে এই যেখ-  
নাকের কাছেই অমলা পড়ত।  
পরিভ্রমণের পক্ষে এখানে নেপাল তীর্থভূমি।  
পৈরিক-পরা সন্ন্যাসীরা নেপালের শৈব মন্দিরের আশে-  
পাশে কদম্বের অশ্বত্থের মত যোরা-কোরা করেন। সারা-  
দিন হস্তনির্মিত পুঁথি পড়ে পুঁথিকোরা রাস্তা হ'ন না।  
শৈব, শাক্ত-তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব ভক্তগণের জয়ধ্বনিতে  
দেবমন্দিরের সংখ্যা প্রায় হাজারের উপর—কারও



“হিমালয় স্বর্গভূমি”—নেপাল উপত্যকা

হলোকে ও ছালোকের মিলন-ভূমি। কবি-বর্ণিত মতে তিন হাজার! বাতরিক ও উপত্যকা দেবভূমি—  
অলকাকে ইহা সৌন্দর্য্যে পরাভিত করে এবং বিরহী ভাববিলাস ও সৌন্দর্য্য-সঞ্চয়ে এদেশ ভরপুর।

নেপাল ভারতের অংশীভূত দেশীয় রাজ্য। সম্ভ্রতি  
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নেপালের  
স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। বিগত মহামুদ্র নেপাল  
ইংরাজ-রাজকে হুঁ লক্ষ লোকের সাহায্য দান  
করেছিল—সে মহামুদ্রবতা ইংরাজ ভোলে নি।  
নেপাল-রাজ্য ইংরাজ-রাজের পরম মিত্রসান্ন্যায়।  
British Legation এখানে একটা দেখবার  
জিনিষ। হিমালয়ের এ উপত্যকার সমস্ত বায়ব্যা ও  
বিধান অভিব্যবধে পরিপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতার  
নহ উপকরণে এদেশ ভারতসমূহ নয়—এদেশে যেতে  
বাণীয়া শকটের সাহায্য পাওয়া যায় না; সিংলা,  
দাখিলিও বা ‘ভুট্টার’ নকল আবহাওয়ার স্পর্শ এখানে  
মনকে জীর্ণ ক'রে তোলে না। প্রকৃতির অসংগত  
সৌন্দর্য্য এখানে অটুট আছে; অজ্ঞানতী হিমশূঙ্গের  
গুহ্যবেতনী নিবিড় অরণ্যানীর অসীম আশ্রয়, ধ্বনিমুখরা  
আকাশ-পদার অশ্রুত প্রপাত—গিরিনদীর উজ্জ্বল  
লাজ দিগন্তের কোড়ে যে অপূর্ণ চিত্রসম্পদ রচনা  
করে, অজন্তার বৈচিত্র্য তার কাছে কত সামান্য!  
ইংরাজ-রাজ্য ও নেপাল-রাজ্যের সঙ্গমস্থলে একটি  
সীমানা দেখা আছে। সেখান থেকে নেপাল  
গভর্ণমেন্টের ট্যেপ ব্লক হয়েছে। দীরগক্ষে গিয়ে ‘pass  
port’-এর জন্ত চেষ্টা করত হয়। উপত্যকার সঙ্গে  
এ জায়গাটি ‘ট্রেসিফানে’ যুক্ত—কাঠমাণ্ডু হ'তে  
তবু না এলে pass port পাওয়া যায় না।  
আমলেকগঞ্জ পৌঁছে ট্যেপের রাস্তা শেষ হ'ল। এখান  
থেকে নেপালের বিখ্যাত ‘Terai’ ব্লক হয়। মোটের  
বাস্ গভীর জঙ্গল ভেদ ক'রে অগ্রসর হয়—চারিদিকে  
দৃষ্ট অতি চমৎকার—কোথাও চড়াই, কোথাও  
উঁচরাই—এমনি ক'রে স্বপ্নের মত হুরিয়ে গেল  
রূপকথার রাস্তা! সন্ধ্যা এসে পৌছলুম ভীমফেনী।  
একটা bungalow-তে আশ্রয় নেওয়া গেল। জায়গাটি  
সার্বকন্যামা, চারিদিকে ভীমকার পাাহাড়ে বেষ্টিত। এখান  
থেকেই ‘হিমালয় দেবভূমি’ বাগ্যার পথ ব্লক হয়!  
পার্বত্য জাতিদের সাহায্য ছাড়া আর অগ্রসর

হওয়া যায় না। হিমালয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবার সেন  
চারিদিকে বাগ্যার পথ ব্লক ক'রে নেপালের  
উপত্যকাকে রক্ষা করছে। স্বয়ং শব্দর যেন এই  
হিন্দু-শিবিরের সামনে ত্রিশূল হতে দণ্ডায়মান! মাথা  
নত ক'রে বাহকদের সাহায্যে ‘ভূমি’ চড়ে অগ্রসর  
হ'তে হ'ল শিক্তর মত;—একবারে হাজার ফিট উঠে  
চারিদিকে দেখতে বাগ্য হ'লুম। দেখলুম কুরালা ঢাকা  
—হুড়ঙে বনিক! দৃষ্টি ব্লক করছে! চারিদিকের  
বিশালত্বের কোড়ে যেন একটা আশ্রয় আকর্ষণ আরম্ভ  
করলে। সে অবস্থার বোধকন্যামা মুখিল—কলকাতার  
ট্রান্স-বাসুপুর্ণী কুদ কলরব বা হৃদয়করোজ্জ্বল হৃদয়াদি  
কণকণের জন্ত একটা তুচ্ছ পরিহাস ব'লে মনে হ'ল।  
হুঁ একটা ধাম্ভার জায়া আছে। সেখানে  
ছাড়পত্রের পরীক্ষা হয়। পরিশেষে একটা ট্যেপে  
সমস্ত ‘লগেজ’ গুলে দেখা হয়। শুদ্ধ-বিশ্বাসের লোকে  
ট্রান্স-যোগ্য জিনিষের মাত্রা সত্যাপ্ত ও আদার প্রপাত।  
নেপাল গভর্ণমেন্টের এ'তে বেশ কিছু লাভ হয়। এমনি  
ক'রে নানা জায়গা ঘুরে ফিরে অবশেষে চম্পারির  
চূড়ায় উপস্থিত হ'লুম। অনির্গতনীর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এ  
জায়গাটি—বতব্দর দেখা যায় হিমালয়ের শৃঙ্গ  
উভয়ের মত চ'লে গেছে। মনে হয়, হঠাৎ পাহাড়গুলি  
যেন তরল হ'য়ে প্রকাণ্ড তরঙ্গশ্রেণী স্বজন ক'রে  
দূরদিগন্তে ছুটে চলেছে। শিবতাপের হৃদ যেন শরীরী  
হ'য়ে তুমাকে পরিবাস্ত করছে। চারিদিকে কোন  
বিস্কৃতা নেই—প্রচুর রূপকথার পাহাড় ঢাকা—  
এই নিস্তরকারে কানে পৌছল জঙ্গলভায়ে আরণ্য  
পাখীর কাকলি। এমন মিষ্টি আওয়াজ কখনও শুনিমি!  
—কত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত পাখী দেখতে পেলুম বলা  
দুসসাধ্য। এরূপ নির্জন রাজ্যে এমন চমৎকার ধ্বনি-  
লালিতা সমজ্বাদের অভাবে বার্ষ হ'য়ে বাজিল। বলা  
হাওয়া পার্বত্য পাখীর কুঞ্জে একটা বিশিষ্ট মাধুর্য্য  
আছে বা সমস্ত ভূমির পাখীর থাকে না। আঙাজ  
বখন দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তখন পাখীগুলির বর্ণ-  
গৌরবও যেন সে নিবিড় পার্বত্য-স্থলে একটা মায়া



খেলা খেলছিল। লাল-নাগের সমঝ, সবুজ-হৃদয়ের মিলন, বেগুনী, ধূসর ও নেবুর রঙের সম্মিলিত যেন শাখীগুলি মন হরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কাঠমাণ্ডু সহরে পৌছলুম রাতিরে। বৈজ্ঞানিক আলোকচিত্র রাস্তাঘাট দেখে অবাক হয়ে পেলুম। বেশ প্রকাণ্ড সমতল রাস্তা — ছমিকি প্রচুর বিপণি ও গৃহসমুহ — হিমাচলের শৃঙ্গে কেউ আশা করতে পারে না। সকাল হ'লে এই পরীরাজ্য সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হ'ল। কথিত আছে, হিমাদ্রির বকে নিহিত এই উপত্যকাটি এক সময় একটা বিরাট হ্রদ ছিল। স্বরস্তুদের এই উপত্যকাটি সৃষ্টি করেন। তাকে একটা অধিশিখার আকারে জলের উপর ভাসতে দেখা যায়। মঞ্জুশ্রী একথা শুনে তাকে দেখতে আসেন। কিছুকাল পরে স্বরস্তু একটা জায়গায় ধামলেন — সেটা মঞ্জুশ্রীর নিকট একটা ইস্তিত ব'লে মনে হয়। তৎক্ষণাৎ মঞ্জুশ্রী তরবারি দ্বারা সেখানকার পাহাড় ছিন্ন করে জল নির্গমনের পথ করে দিলেন। ক্রমশঃ সমস্ত জলই বেরিয়ে গেল — এবার হ্রদটি বাসোপযোগী হ'ল। নেপালের এই অলৌকিক সৃষ্টি-কথা সর্বত্র প্রচলিত আছে।

নেপাল-উপত্যকা পনের মাইল দীর্ঘ। উপত্যকার চারিদিক পর্বতে বেষ্টিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতগুলি যেন শাসীরূপে এই দেবভূমির চারিদিকে দণ্ডায়মান। এগুলির উচ্চতা প্রায় ২৬,০০০ ফুটের ফিট হ'তে ২৯,০০০ ফিট পর্যন্ত। নন্দাদেবী (উচ্চতা ২৫,৪৪৫ ফিট) নেপালের পশ্চিমে, ধবলগিরি (উচ্চতা ২৬, ১৫৫ ফিট) হ'ল মাইল পূর্বে, পৌসাইহান (উচ্চতা ২৬,০১০ ফিট) ধবলগিরির ১৮০ মাইল পূর্বে, কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪০ ফিট) পৌসাইহানের ১৩০ মাইল পূর্বে প্রংরীর মত শুভ ভূসামগ্ধিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা' ছাড়া পৌরীশরর শৃঙ্গও আছে। নেপালের উপত্যকা হ'তে চারিদিক দেখে মনে হয় এখানে যেন বিশ্বের একটা প্রকাণ্ড দরবার চলছে। চারিদিক হ'তে যেন শুভকেশ

ধ্বারা নিরীক্ষণ করছেন — আকাশে ও ভূতলে যেন একটা সামাজিকতা — একটা বিরাট আলিঙ্গন চলছে। দিনের পর দিন মানবের অন্তর এই ভূমার সম্পর্ক দেখে কতর্ভা হুচ্ছে। একটা বিরাট স্পর্শ পাওয়া যায় এখানে, যুগ হ'তে যুগান্তরে।

এই স্পর্শ যে সার্থক হয়েছে তা' উপত্যকা পরিক্রমা হ'তে উপলব্ধি হয়। হ্র'এক দিনে এই তীর্থ-পরিক্রমা শেষ হয় না। তা'ও বিশিষ্ট অম্মতি ও স্বেচ্ছা না হ'লে সম্ভব হয় না। এদেশে বিদেশী লোকের চলাফেরা সহজসাধ্য নয়। ইউরোপীয়গণের পক্ষে মন্দিরাদিতে প্রবেশ সম্ভব নয় — ভারতীয়দিগের পক্ষেও স্বচ্ছন্দ গতি সম্ভব নয়। কিন্তু তীর্থস্থান ব'লে ক্রমশঃ এদেশ স্থপরি-চিত হ'য়ে পড়ছে। আগন্তকের পক্ষে বাধা কাটান হ্রাসাধ্য — এবং যাকিছু আছে তার সন্ধান পাওয়া মুশিল।

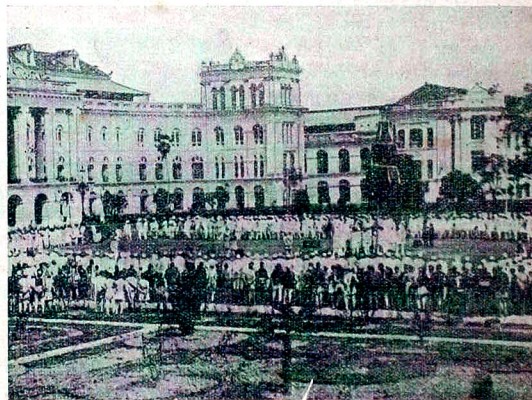
এ সময় করানী পণ্ডিত সিলতা। সেতি নেপালে উপস্থিত হন। তাঁরই আহুকুল্যে নেপালের মহারাজের সহিত পরিচয়ের সুযোগ হ'ল এবং সেখানকার বিখ্যাত লাইব্রেরীর সহজ প্রবেশাধিকার পেলাম। এই গ্রন্থাগারে প্রায় ৬০,০০০ হস্তলিখিত পুঁথি আছে এবং ভারতবর্ষে এমন কি এশিয়ায় এটি অস্বাভাবিক গ্রন্থ-সংগ্রহ।

উপত্যকাটিতে বিশিষ্টভাবে দ্রষ্টব্য হচ্ছে তিনটি নগর — ললিতপত্তন, কাঠমাণ্ডু ও ভাটগাঁও। তা' ছাড়াও চারিদিকে বহু মন্দির ও ক্ষুদ্র সহর আছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে সর্বত্র যাতায়াত রাস্তা আছে — এসব রাস্তা ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে কোন ইউরোপীয় পর্যটক বলেছেন — “Her lowest pass is higher than the highest mountain of Europe.” নেপালের অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদই এরকম তুলনা-হীন। ৩০,০০০ ফিট উর্দ্ধে ত্রিশূল নদী প্রবাহিত — পৌসাইহান পর্বতই এ নদীর উৎপত্তিস্থান। ১৪০০০ ফিট উর্দ্ধে পৌসাইহানের হ্রদ আছে, দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় হ্রদটির নাম হচ্ছে নীলকন্ঠ হ্রদ। কথিত আছে মহাদেব বিব পান করে ঠাণ্ডা হওয়ায় ভজ বরফের পাহাড়ে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন।

তাতে করে জল নির্গত হ'য়ে হ্রদের সৃষ্টি হয় — তিনি সে জল পান করেন এবং সে হ্রদে শায়িত অবস্থার থাকেন।

কাঠমাণ্ডু অতি মনোহর জায়গা। বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদী সহরটিকে বেঁধে ক'রে আছে। একটা লোহসেতু দ্বারা বাগমতী নদী পার হওয়া

স্বল্প অনেক মন্দির ও অট্টালিকা দেখতে পাওয়া যায়। ভাটগাঁওয়ের প্রাচীন নৃপতি ভূপতিমন্দের প্রাসাদ একটা দর্শনীয় বস্তু। আধুনিককালে কটির বিপর্যয় হ'য়ে গেছে — নূতন অট্টালিকাগুলি ইউরোপীয় ফ্যাসানে তৈরী হচ্ছে।



রাজাঘিরাঙ্গের প্রাসাদ (আধুনিক)

যায়। সহরটিতে প্রায় লক্ষ লোকের বাস। একটা আশ্চর্য ইতিহাস না জানলে এই উপত্যকার প্রকাণ্ড বাজার আছে — প্রচুর ফল পাওয়া যায় — কিন্তু সে সব যে খুব উচ্চশ্রেণীর তা' মনে হয় না। এখানে খুব উচ্চতা, চালি, যি ইত্যাদি পাওয়া যায় — শালগম, বাট, কড়াইগুটি প্রভৃতি বেশ সস্তা। নেপালের কারিগরদের তৈয়ারী অনেক শিল্পব্যাদিতেও বাজার পূর্ণ থাকে। নেপালের “থুকুরী” খুব বিখ্যাত — এক রকমের কাপড় নেপালে তৈরী হয় — যা' নেপাল গার্মেন্ট বাবদার করেন। ঘরে ঘরে চরকা থাকলেও কলের কাপড় খুব চলে। প্রাচীন স্থাপত্যকলার নির্দশন

একটা আশ্চর্য ইতিহাস না জানলে এই উপত্যকার বিশিষ্টতা ধরব্বম হবে না। পর্যটকদের নিকট এই ইতিহাসের ছবি বারবার চোখে পড়ে। নেপালের বাস্তবিক শাসনকর্তা King বা ‘মহারাজ নরেন — নেপাল শাসন করেন প্রধান মন্ত্রী মহারাজ বা Maharaja Prime Minister : King-এর কোন ক্ষমতাই নেই — তিনি একটা পেলন মাত্র ভোগ করেন। সমস্ত ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হস্তে কেন্দ্রীভূত; তাঁর অম্মতি ছাড়া কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। প্রধান মন্ত্রী-বংশের আদিপুরুষ ছিলেন মহারাজ



জঙ্গল বাহাদুর রাণা। তিনি সপ্তম এডওয়ার্ডকে নেপালে শিকার উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন। সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে ইমারাজরাজ ও নেপালের বৃদ্ধ দূত করেন। মহারাজ জঙ্গল বাহাদুর অসামান্য পুঙ্খ ছিলেন—তিনি তাঁর সমামরিক রাজা, মহারাজ, রাজগুরু প্রভৃতি সকলের ক্ষমতা নিজের কবলে আনয়ন করেন। তাঁর বংশধরেরা সেই অধিকার এখনও ভোগ করছেন। নেপালের পর্যটক স্বভাবতই মহারাজের অটালিকা দেখতে এখন আকৃষ্ট হয়। রাজপ্রাসাদকে ‘দরবার’ বলা হয়। বদিও রাজাধিরাজ ‘King’ নামে পরিচিত তবুও তাঁর দরবারে বিশেষ কোন আড়ম্বর বা যাতায়াতের ঘনঘটা নেই। প্রধান মহারাজের দরবারই অহরহ জীবন্ত সমারোহে জাগ্রত। রাণা-বংশের প্রত্যেককেই প্রতিদিন তাঁর দরবারে যেতে হয়—দরবার হতে প্রত্যেককে আদেশ প্রদেয়। রাণা-বংশের প্রত্যেককেই প্রতিদিন তাঁর দরবারে যেতে হয়—দরবার হতে প্রত্যেককে আদেশ প্রদেয়। রাণা-বংশের প্রত্যেককেই প্রতিদিন তাঁর দরবারে যেতে হয়—দরবার হতে প্রত্যেককে আদেশ প্রদেয়। রাণা-বংশের প্রত্যেককেই প্রতিদিন তাঁর দরবারে যেতে হয়—দরবার হতে প্রত্যেককে আদেশ প্রদেয়।

মুগ্ধ করে দেন। এসমত দেবতার মূর্তি ও মন্দিরশিল্প অতি বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ—কোনটি বা জগতে অদ্বিতীয়। চমুনারায়ণের মন্দির জাপানের Horyuji-র মন্দির হ’লেও অধিক খ্যাতি লাভ করেছে।

হিন্দু মন্দিরের ভিতর পশুপতিনাথের মন্দিরই বেশী প্রসিদ্ধ। প্রাচীন এ মন্দিরটি দেখতে যাই—



পশুপতিনাথের মন্দিরের পথে

সেদিন একটা বিশিষ্ট শুভদিন ছিল। একটা প্রাঙ্গণের মাঝখানে এই মন্দিরটি অবস্থিত—সামনে একটা প্রকাণ্ড বৃক্কের মূর্তি স্থাপিত—মহাদেবের মন্দিরের বৌদ্ধাচার্য নানা মূর্তিবিচিত্র। প্রাঙ্গণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্তি ইত্যতঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। পূজারী ব্রাহ্মণেরা গোহিত ও খেত বসনে ভূষিত ছিল। মনে হচ্ছিল, ওরা যেন নাটকের অভিনেতা—আর আমরা দর্শক। এ মন্দিরের অনতিদূরেই গুহাখরীর সুবিখ্যাত মন্দির। বাগুর পথে বাদকের উৎপাত আছে—হঠাৎ উত্তর-পশ্চিমের তীর্থ-পরিভ্রমার কথা মনে পড়ে। মন্দিরের সামনে অসংখ্য লোকের ভিড় দেখতে পাওয়া গেল। এ মন্দিরে মূর্তি নেই, অন্তঃসলিলা একটা সরণা হ’লে অবিরল মে জলধারা নির্গত হয় তাই নমস্ত হ’য়ে থাকে। কিন্তু দূরেই বাগমতী নদী। বাগুর

সময় একটা কঙ্কালের নক্সা আঁকা দ্বারা দেখে বিস্মিত হ’লুম। সেদিন বিশিষ্টভাবে শুভ ব’লে দেখতে পেলাম বাগমতী নদীর বাটে অধিরাজের (H. M. The King) পরিবারের জ্ঞাত তীব্র খাটান হয়েছে। অনেক রাজকীয় ভূতা চারদিকে ছুটোছুটি করছে। বলা বাহুল্য শৈব মন্দির ছাড়া নারায়ণের অনেক মন্দিরও নেপালে বিখ্যাত।

কাঠমান্ডু সহরের মাঝমাঝটাতে মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাজাধিরাজ বা মহারাজমহী এ মন্দিরের গামনে দিয়ে বাগুর সময় মটরগাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী গামিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণত হন। মহাকালের মন্দির বিশেষভাবে ভক্তদের আকৃষ্ট করে। সন্ধ্যার সময় অনেক পূজককে দেবতা প্রদক্ষিণ করতে দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাল মন্দিরে দ্বারপালের মূর্তি অপূর্ণ শ্রীসম্পদ—ভারতীয় মূর্তিশিল্পের তা’ অতি উচ্চ পরিকল্পনার বস্তু। অতিমুগ্ধ, মৃদুমালা, কঙ্কাল-বগু প্রভৃতি ভূষণ অতি চমৎকার এবং সমস্ত নির্মাণকৌশল শিল্পকীর্তির শ্রেষ্ঠ নমুনা।

কাঠমান্ডু বাজারের অনতিদূরে বসন্তপুণ্ডে কাগলভরবের মূর্তি সকল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ মূর্তিটি সপক্ষে নানা কিংবদন্তী শোনা যায়। এক বিরাট কল্পনাতে এ মূর্তি জাগ্রত ক’রে তোলে। কিছুদূরে হরপাখরীর মন্দির। খুব নিকটেই একটা নারায়ণ-মন্দিরের সামনে চমৎকার গরুড়মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে। এ মূর্তিও একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

কাঠমান্ডু অপেক্ষা প্রাচীন নগর ‘পাটন’ বা ললিতপত্তনে নানা মন্দির ও মূর্তিশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। একদিন যখন পাটন দেখতে বেরিয়েছি, সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে চমকিত করে তুলল; দেখলুম এক দীর্ঘ শোভামালা চলছে; তার মাঝখানে নৃসিংহদেবের মূর্ত্যসমূহ একটা স্তম্ভজিত লোককে ঘিরে যেন পোষাক পরা দ্রুত ছেলে অগ্রসর হচ্ছে।

পাটনের মহাবুদ্ধ-মন্দির এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

প্রায় শতাধিক বৎসরে এ মন্দিরটি তৈরী হয়। নয় হাজার বুদ্ধমূর্তি এ মন্দিরে আছে—সম্প্রতি মন্দিরটি জীর্ণ হ’য়ে যাচ্ছে মনে হয়। Oldfield এ মন্দিরটি সপক্ষে বলেন—“The most elaborately carved



‘দরদিহ ব্যাংক’

temple to be found in the valley of Nepal.” কথিত আছে রাজা অভয় ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি তৈরী করেন। উচ্চতার ইহা ৭৫ ফিট—আমরা অতি কষ্টে ভিতরে যাই, কারণ চারদিকে প্রাঙ্গণ নেই বললেই চলে। এ মন্দির চারতলা—প্রথম তলে শাক্য-সিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় তলে অমিতাভ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। বসন্ত: শাক্যসিংহকে কেশরীভূত ক’রে নেপালের প্রধান দেবতারা এ মন্দিরে স্থান পেয়েছেন।

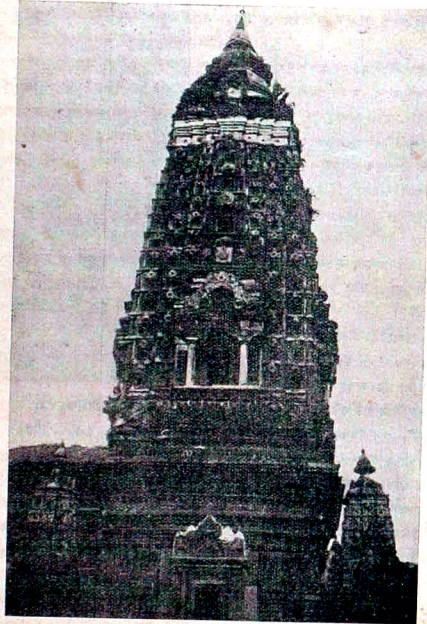
পাটনের হিন্দু-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কৃষ্ণমন্দির। অতি স্নগ্ধ ও সুগঠিত এই মন্দিরটি পাটনের দরবার চকে প্রতিষ্ঠিত—সামনে অতি নিখুঁত ভাবে তৈরী একটা গরুড়মূর্তি আছে। একটা বৃক্কের মূর্তি এই অঞ্চলে

নেপালে নানা বিচিত্র হিন্দুদেবতা দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দেবতার ভিতর পঞ্চভক্ত সকলের পরিচিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতা সকল পর্যটককে



সরীষেপা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন স্থগিত কাজ ভারতের কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। জীবন সৃষ্টি হ্রাশ। এই চক্রে ভীমমন্দির দেখেও ভাটগাঁও কাঠমাহু হ'তে প্রায় আট মাইল দূরে। তাক লেগে পেল। পঞ্চপাণ্ডবদের অনেকেরই এ নগরটি না দেখলে উপত্যকা ভ্রমণ বার্থ হয়। দেবতার মর্দ হ'তে নাম কাটা গেছে। কিন্তু যাওয়া অসম্ভব হুহু — ভগবানের রূপায় উপস্থিত হ'য়ে ভীম

যে শৈলশিখরে এরকমভাবে আশ্রয় পাচ্বে ন তা' কখনও মনে হয়নি। আমি ধৌ কি ক চিত্রকলায় ভীমের এমনি চমৎকার চিত্র পেয়েছি যা' ব্যাঙ্গ্যার দিক থেকে Hercules বা Laocoon সৃষ্টিকে পরাজিত করতে পারে। অজ্ঞ শিল্পী প্রাণের টানে এক অসৌন্দর্য্য ভীমের সৃষ্টি করেছে যা' মহাভারত-কার দেখতে



মহাবুদ্ধমন্দির — পটিম

গেলে পুঙ্কিত হতেন। পাটনের মজিন্দানাথের মন্দিরও চেয়ে আছেন। এখানকার স্বর্ণবার বা Golden gate অতি স্থপতিত। কাঠের একগু চমৎকার খোদাই

কাজ ভারতের কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ভাটগাঁও কাঠমাহু হ'তে প্রায় আট মাইল দূরে। এ নগরটি না দেখলে উপত্যকা ভ্রমণ বার্থ হয়। যাওয়া অসম্ভব হুহু — ভগবানের রূপায় উপস্থিত হ'য়ে যা' দেখতে পেলুম তার তুলনা পাওয়া সুরিল। ভাটগাঁওয়ের দরবার, প্রাচীন রাজ-অট্টালিকা ও মন্দিরশ্রেণী এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। মধ্যভাগে মূপতি ভূপতিমন্দির স্বর্ণপত্রমণ্ডিত সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। অতি উচ্চ পদ্মস্তম্ভের উপরে সৃষ্টিটি আদীন। এখনও মনে হয় মনে রাজা ভূপতিমন্দির নির্মের অট্টালিকা ও মন্দির প্রভৃতির দিকে

জগতের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। বহু ইউরোপীয় দেখে

বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন। অতি সামান্য পরিময়ের ভিতর নানা বিচিত্র দেবদেবীর মূর্তি স্ফোদিত করা হয়েছে।

ভাটগাঁও দরবারের মন্দিরশিল্পের বৈচিত্র্যও বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। প্যামোডা রীতির সহিত আরও অজ্ঞাত রীতির একটা পরিপাটি মিল করা হয়েছে। এখানকার অট্টালিকায় কাঠের যে খোদাই কাজ আছে তা' নেপাল-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নমুনা। ভাটগাঁও দরবার অতিক্রম করে আরও বহু মন্দির প্রদক্ষিণের জন্ম অগ্রসর হওয়া গেল। দত্তারয়ের মন্দির, গণেশমন্দির, দ্রুগামন্দির, বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি বহু দেবতার মূর্তি দেখে মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। প্রাচীন

মন্দির ছাড়তে ছাড়তে আঁধার হ'য়ে এল — হিমালয়ের নিবিড় ছায়ায় উপত্যকার ছবি মুছে গেল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে যখন বাজী পৌছান গেল, তখন দেখা গেল চাঁদ উঠেছে — চাঁদের আলোতে চারিদিক ব্যাপ্ত হয়েছে — স্নহুর হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চূড়াগুলি তরল রূপের মত জলচ্ছ। এমনি করে পৃথিবীর সম্ভার মান হ'য়ে আকাশের গৌরব উজাসিত হ'ল। গন্ধর্ব্বলোকের দরবারে তখন যেন নহবত বাজনা শুরু হ'ল এবং গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গই একমাত্র সত্যবত্ত ব'লে প্রতীতি হ'ল।

প্রত্যেক দিনই সকাল বেলায় প্রধান দৃষ্টি হচ্ছে টুর্গিখেল সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। টুর্গিখেল নেপালের ঐতিহাসিক ময়দান; অনেক নাটকীয় ব্যাপার



টুর্গিখেল ময়দানে কুচকাওয়াজ

সময় ব'লে এবং ড্রেনের সুবিধিত বন্দোবস্ত নেই ব'লে সর্বত্রই একটা বিভীষিকার ছায়া আমাদের বেঁটন ক'রে ছিল — কিন্তু হঠাৎ মাঝখানটা প্রচুর সৃষ্টিপাত হওয়াতে পূর্ণদ্যট অনেকটা নৈসর্গিক বিধানে মার্জিত হ'য়ে গেল। ভাটগাঁও থেকে যখন প্রথম দিন ঘিরে এলুম তখন সন্ধ্যা হয়েছে। কিছু দূর এসে মটরখানা বন্ধ হ'য়ে যায় — তাকে Start করা দ্রুত হ'য়ে পড়েছিল। অনেক কষ্টে মটর পাড়া সম্ভাবিত করা গেল। নচেৎ পথের মাথো কি দশা হ'ত বলা যায় না — ছ'লাত মাইলের ভিতর আর কোন আশ্রয় ছিল না।

টুর্গিখেলের বৃক্কের উপর হ'য়ে গেছে। মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর রাণা এই প্রাঙ্গণে বহুবার সৈন্য সমবেত ক'রে সীম ক্ষমতা অটুট রেখেছিলেন। নেপাল-রাজ্যের সবচেয়ে প্রিয় খেয়াল হচ্ছে সৈন্য তৈরী করা। প্রত্যাহ অসংখ্য নৃতন সৈন্যকে শিক্ষাদান করা হয় — পুরান regimentsগুলিকেও উপস্থিত হ'তে হয়। একজন জাফানের হাতে explosive department। পোনা যায় নেপালের প্রয়োজনীয় রখসজ্জার নেপালেই প্রস্তুত করা হয়। এখানকার সব চেয়ে সেরা সন্ধান হচ্ছে Military বা যুদ্ধসজ্জা। যারা কোন



Officer নয় তাদের মূল্যই নেই। শুধু ধনী এই মন্দিরের পূজা তিব্বতীয় সমাজের দ্বারা সম্পন্ন হ'লে এখানে সমান পাওয়া যায় না। মন্ত্রী-মহারাজের ছেলেরের অনেকেই 'General' বা সেনাপতি—'কিংডমের (King) ছেলেরা রাজকীয় অধিকারের (royal blood বলে) সকলেই General বা সেনাপতি। একজন Lt. General, Major General, Commanding Colonel প্রভৃতি রাষ্ট্রপাতিতে সকলেই নিজেদের মর্যাদা স্থচিত করেন। মহারাজের জন্মদিন কিংবা কোন বিশিষ্ট দিনে সকলেই জমকাল পোষাক প'রে নানা রকমের মুকুটে শিরোশোভা বৃদ্ধি ক'রে দরবারে উপস্থিত হন। উপত্যকার একটা বিজয়-মহোৎসবের দিন আছে। সেদিন একটা বিবৃত শোভাযাত্রা বের হয়। এই দিনই পুখুরাধ পোখা জাতির পক্ষে উপত্যকা বিজয় করেন। প্রতিবৎসর এ ব্যাপারের সাধনসংরক্ষে বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসব হ'য়ে থাকে।

নেপালের অভ্যন্তর উৎসবও প্রচুর। রথযাত্রার একটা বিশেষ আড়ম্বর এদেশে দেখতে পাওয়া যায়। মজ্জিমনাথের রথযাত্রা একটা বিরাট ব্যাপার—এই উৎসবের স্থান ও কেন্দ্র হচ্ছে প্যাটন সহর। কাঠমাণ্ডুতেও রথযাত্রা আছে।

দেবদেবী ছাড়া এখানে ভূতপ্রেতদের পূজার ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। তিব্বতের মূল্য ব'লে এখানে প্রেতের কল্পনা একটা জাগ্রত ব্যাপার। প্রেতকে বাড়ীর সামনেই প্রেতের উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্ত একটা দোহাশানান দীপবন্ত থাকে।

বলা প্রয়োজন নেপালে তান্ত্রিক আচার্যদের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতাবাদের একটা বিরাট জগৎদেবের নমুনা সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। স্বরূপনাথের মন্দির প্রধানকার আর একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। এই মন্দিরটির স্বর্ণশিখর উপত্যকার বহুদূর হ'তে দেখতে পাওয়া যায়। একটা সমুদ্র পাাহাড়ের উপর অবস্থিত ব'লে ইহার একটা অপূর্ণ আকর্ষণ আছে।

এই মন্দিরের পূজা তিব্বতীয় সমাজের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই মন্দিরেই আদিবুদ্ধ কল্পনার একটা দীর্ঘস্থান। বলা প্রয়োজন আদিবুদ্ধ কল্পনা মহাযান বৌদ্ধমতের প্রাণধর। মন্দিরের দীর্ঘভাগে দু'টি



কাঠমাণ্ডুতে রথযাত্রা—কাঠমাণ্ডুর জনতা

প্রকাণ্ড চোখ আঁকা আছে—মনে হয় যেন সে চোখের অঙ্গাঙ্গী দৃষ্টি অসীম দিগন্তে প্রসারিত হ'য়ে আছে। আদিবুদ্ধ কল্পনার বুদ্ধকে অনেকটা ভগবান স্থানীয় (theistic) করা হয়েছে। তাঁর ধ্যানের দ্বারা তিনি পাটাতন ধানী বুদ্ধ সৃষ্টি করেন—বৈদ্যোদ্যান, অশোক, রত্নসম্বত, অমোঘসিদ্ধি ও অমিতাভ। কেউ কেউ বজ্র-সম্বতের আর একটা বুদ্ধও কল্পনা করেন। এই পঞ্চবুদ্ধের প্রত্যেকটি বস্তু রূপ ও চিহ্নাদিতে ভূষিত। বৈবর্তচক্রে যেতবর্ণে আঁকা হয়—তিনি সিংহের উপর উপবিষ্ট। তাঁর চূড়ায় চক্রচিহ্ন—তাঁর লক্ষণ হচ্ছে ধর্মচক্রমুদ্রা। তিনি বিভিন্ন দ্যোতক। অশোক "অপের" দ্যোতক—তাঁর বর্ণ হচ্ছে নীল—তিনি পূর্ণ-দিকে চেয়ে উপবিষ্ট—তাঁর মুদ্রা হচ্ছে ভূমি-স্পর্শমুদ্রা, বাহন হস্তী এবং চূড়ায় বজ্রচিহ্ন আছে। রত্নসম্বত

পীতবর্ণ—বরদামুদ্রারূপে, অথবাগরি আদীন, চূড়ায় ইহার নীচেই একটা ধর্মধাতুগল আছে দেখতে পাওয়া যায়। ইহা মজ্জী বোধিসত্ত্বের সহিত যুক্ত। রাজা প্রতাপমল্লের একটা তাম্র আছাদান দেখতে পাওয়া যায়—তাতে ২২২টি দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। চক্রাকার ধর্মাবিশুদ্ধি নির্ণয় ক'রে এসব সজ্জিত হয়েছে। বৈদিকের বার ভাগে বিভক্ত ক'রে তিব্বতীয় বার মাসের দ্যোতক বারটি মূর্তি আছে—তাতে ঘোড়া, ভেড়া, বাঘ, হাঁস, কুকুর, বাঘ, ধরপোশ, সাপ ইত্যাদির চোরাহা আছে। এরকম একটা উপলক্ষ্য ক'রে প্রাণিগণ্যক আঁকতে বা ক্ষোদিত করুতে বস্ত্তী শ্রদ্ধার তার ভাগে—শুধু স্থলের জিহ্বা-বিভাগ তা' কিছুতেই হয় না।

এ সমস্ত প্রাণিগণ্য এবং বেবেজগতের বিরাট স্মৃতিসমুহ দেখে মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে পেল! যাত্রীদের অশান্ত ভগ্ন-পুঙ্খ, নিষ্ঠা ও মন্ত্রপাতি প্রভৃতি যেন একটা দিব্যজগতের মারিক ব্যবস্থা হ'লে মনে পড়ে। ধর্মপ্রাণ ভারত সব জায়গায় সাধনাবলে অপরাধের শক্তি সংগ্রহ করেছে, তাই এখনও হিমাদ্রি-বক্ষে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

পরিগ্রাহকের পক্ষে নানা জায়গায় লোকব্যবস্থা ও সমাজধর্ম যেমন মূল্যবান তেমনি নৃ-পরিচরও লোকজনীয় ব্যাপার। এই উপত্যকার 'এসিয়া'র একটা মার্গভৌমিক মিলন সম্পাদিত হয়েছে। একদিকে চীন ও তিব্বত—অন্যদিকে ভারতবর্ষের ভাষাভাষীদের এই বৈষম্যপ্রভাব এখানে স্পষ্ট। কোন ইউরোপীয় পর্যটকই অঞ্চল দেখে বলেন যে, এদেশে ভারতীয় চেহারা এই দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুত: তা' ঠিক নয়—পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় জাতির সহিত অমিশ্রিত মনেই নেই; কিন্তু পশ্চিমে মঙ্গোলীয় প্রভাবের কণাভাঙ দেখতে পাওয়া যায় না।

নেপালের রাজবংশ আর্ঘ্যজাতি (Indo-Aryan) হ'তে উদ্ভূত—বস্তুত: রাজপুত জাতির একটা শাখা এখানে ক্রমশ: আধিপত্য লাভ করে। তিব্বতি বংশই—জাঙ্গ, ঠাকুর ও ক্ষেত্রী বংশ—উচ্চশ্রেণীর সকলেই এই বংশের লোক। মঙ্গোলীয়দের ভিতর এই

বস্তুত: মন্দিরেই এ সমস্ত দেবতার প্রত্যাক ছায়া পাওয়া যায়। এ মন্দিরের চারিদিকে বহু ধর্মচক্র (prayer wheel) আছে। এগুলি আবর্তন করলে জন্মজন্মান্তরের কণ্ঠ-বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যায়। মন্দিরটির সামনেই একটা প্রকাণ্ড বজ্রমূর্তি আছে।



ভাগটি প্রচলিত—(১) জ্ঞান, (২) বাস্ (ঠাকুরি বংশ এ বিভাগের অন্তর্গত), (৩) মগর ও (৪) গুরুজ। খান্, মগর ও গুরুজরাই যোদ্ধা। বাস্‌ই হচ্ছে সত্যিকার ক্ষত্রিয় বংশ।

এই উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে নেওয়ার (Newar) বলা হয়। নেওয়ারেরা অতি হনুগুণ শিল্পী, হাতের কাঁখে তাঁদের দক্ষতা অপরোক্ষ। ভাষ্য ও স্বাভাৱ-শিল্পের সমস্ত নমুনাই তাদের তৈরী। আর্গারদের বায়বীয় (abstract) ভাবসম্পন্ন এবং ভূরেখীয় হস্তনির্মিতের যুগ্মনিশান হয়েছে 'নেওয়ার'-শিল্পে।

উপত্যকার অধিকাংশ গৃহের বহির্ভাগ হনুগুণ চিত্রকলায় বিভূষিত। এসব চিত্র অনেকটা Fresco স্থানীয় এবং অতি দক্ষতার সহিত আঁকা। অতি কঠিন পঞ্চবৃক্ষসুঁঁ ও বহুশীর্ষ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। একটা নিবিড় তক্ত ও খন্দ্রদান এমনভাবে লোকগণের আত্মপ্রকাশ করে ধস্ত হয়েছে।

এ উপত্যকার এখনও প্রাচীন চিত্রকলার সাধকদের পাওয়া যায়। তাদের কাজকর্ম প্রায় কিছুই নেই। কলকাতার আটকুন-কোরং ইউরোপীয় চিত্রখণ্ডের এভিই সম্ভ্রতি সকলের আসক্তি বেশী। এক চিত্রকরের বাজীতে উপস্থিত হয়ে ভারী আরাম পাওয়া গেল। সোকটা প্রাচীন হয়েছে—এখনও সেকসেলে আদর্শের স্বরিত প্রতি তার স্কা আছে। একটা সূর্য বাড়ীর জিন্সে সে উপবিষ্ট ছিল। চারিদিকে বদবার কয়েকটা অসহ্য আদান—কয়েকটা রঙের আধার চারিদিকে ছড়ান ছিল। আমি দেখবু একটা পুঁথির পাতাগুলির মাঝ-ঝানটর যে সব খালি জায়গা আছে তাই সে ছবিতো পূরণ করে দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পাবু্যম এটা একটা যোগাতির রচিত কোণী। পুঁথির আকারে লিখিত, ভিতরে এগারটির চিত্র দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। ভারী আরাম বোধ হ'ল। এ বেনে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে একটা জীবন্ত সংস্পর্শ।

এ উপত্যকার নব্য অট্টালিকাগুলির নাম উল্লেখ করাও প্রয়োজন। মহারাজের প্রাসাদ হাড়া 'দিরোজের

(King) প্রাসাদও উল্লেখযোগ্য। মহারাজ-মহারা নিজেদের অট্টালিকাতেই দরবার করে থাকেন। মহারাজ চন্দ্রসময়ের সিংহদরবারে নিজেই কাজকর্ম নির্বাহ করতেন—বর্তমান মহারাজ সার যুগসময়ের জগবাহাদুর রাণা দুলচোকে তাঁর নিজের অট্টালিকাতে রাজকাব্য পরিচালনা করছেন। টুপিখেনের সামনে Military Hospital একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ; তারই উপর এক আচ্ছাদ্য Bronze-এর মূর্তি আছে একটি গুণ্ডা সৈনিকের। মহাযুদ্ধে যে সব সৈনিক প্রেরিত হয়েছিল তাদেরই দৃষ্টান্তরূপে আধুনিক সৈনিকের পরিচ্ছদে এই মূর্তিটি পরিকল্পিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এ মূর্তিটো নেপালের ভাষ্করের তৈরী এবং এটা তৈরী দুরা হয়েছে প্রাচ্য প্রণালীতে—ইউরোপীয় নয়। একদিকে এই ভারতীয় ভাষ্কর্যের নমুনা, অন্যদিকে টুপিখেনের চারিদিকে বিলাত হ'তে আমদানী প্রস্তর-নির্মিত অতীত মহারাজদের মূর্তিসমূহ—এই বিপরীত প্রবাহ প্রাচ্য-চিত্তের একটা আন্তর সংগ্রামের প্রতিকৃতি হয়েছে।

এ উপত্যকার ফুলের ভারী আসর—যেখানে-যেখানে গোলাপ ফুলের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় গোলাপ পাওয়া যায় সামান্য মূল্যে। রথযাত্রার সময় প্রচুর দুল পাওয়া যায়—নেপালের অধিবাসীরা ফুলের ভক্ত। বিশিষ্ট পূজার দিন হাড়াও প্রতিদিন সকাল বেলা ফুলের হুড়ি হাজির নিয়ে মেয়েদের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখা যায়। সকালবেলাই হুড়িটি বাজে ও ভজনগানে মন্দিরগুলি ধ্বনিত হয় এবং অল্প লোক সমাগমে জীবন্ত হ'য়ে উঠে।

কোন ইউরোপীয় দর্শক তাই বলেছেন, উপত্যকার জীবনযাত্রা ভাষ্করের অষ্টম শতাব্দীর একটা নিরুত্তর ছবি পাওয়া যায়। বাস্তবিকই তাই; এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভক্তগণের যে পরম জীবিত লক্ষ্য করা যায় তা' কল্পনাতীত। হিন্দুরা বৌদ্ধ মন্দিরে অর্ঘ্য অর্পণ করছে—বৌদ্ধেরা হিন্দুমন্দিরে সমবেত হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তের একটা পরম উদাহরণ হ'লনা করে।

## ত্রিভুজদেশের সন্ন্যাস্ত হিন্দ

ত্রিভুজদেশের সন্ন্যাস্ত হিন্দ

প্রতিভাশ্রমেণু

ছন্দ-বিচারের শেষ আদালত হচ্ছে কান, অবগত trained কান। আমার কানে মনে হয় স্বররূপের শেষ সীমা চতুঃস্বরপরেই। কিন্তু কানের রাস যুক্তি-হীন নয়। সন্ধান করলে ওই রাসের মধ্যেও যুক্তি গুঁথে পাওয়া যায়। তাই ছন্দ-শাস্ত্রের উদয়। যদি তা' না হ'তো, অর্থাৎ যদি কানের দোহাই দিলেই তার উপর কথা না চলত, তাহ'লে ছন্দ-বিচারের বালাই থাকত না এবং কাব্য-জগতে রীতিমত একটা কানের রায়কেও আমি যুক্তির সাহায্যে explain করতে বাধ্য। আমি যথাসাধ্য তা' বোঝাতে চেষ্টা করছি।

আপনি যাকে বলতে চান ষট্‌স্বরপল্লিক, আমি টেকনিক্যাল আলোচনার তাকে ভেঙে ৪+২ করতে চাই। তার ছট্‌ কারণ—একটি সাধারণ ও একটি বিশেষ। আগে সাধারণ কারণটির কথাই বলছি। মাতাভূত, স্বরভূত ও যৌগিক—এই তিন প্রকার ছন্দেই কবি অনেক সময়ই 'ঈধং-বতি'-কে লুপ্ত করতে পারেন; ঈধং-বতি লুপ্ত হ'লে ছট্‌ পদের মধ্যে কোনো ছন্দ থাকে না ব'লে পদটি ছট্‌ ছোড়া সেগে গিয়ে একটি বৃত্তপদের স্থলি হয়। সাধারণত অর্দ্ধবতি লোপ করা হয় না। এ তথ্যটি বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রের একটি বড় তথ্য। এই ঈধং-বতি-লোপের খারা ছন্দে বেশ একটু বৈচিত্র্যও দেখা দেয়।

দৃষ্টান্ত ত্রিভি—

কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে;

নৃত্যের বেশা তার গুন্তে দেয়ালে।

আমি মনে মনে ভাবি, তিস্তা তো নাই,

কলিকাতা যাক নাকো সোষা বোঝাই।

দিলি লাহোরে যাক, যাক না আগরা,  
মাথায় পাগড়ি দেবো, পায়েতে নাগরা।

কিনারা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে,  
ইংরেজ হবে সেব বুট-ফাটি-কোটে।

কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এই  
সেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

—রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (বিতীয় ভাগ)।

এট হচ্ছে মাত্রাত্তর পয়ার অর্থাৎ চাতুর্মাত্রিক চৌপদিক (অপূর্ণ)। প্রতিপদের চার মাত্রা। কিন্তু সর্বত্র পদের পরবর্তী ঈধং-বতি নেই, অনেক স্থলেই লুপ্ত হয়েছে। "চলার খেয়ালে", "গুন্তে দেয়ালে"—এখানে একটি পূর্ণপদ ও একটি অর্দ্ধপদের মধ্যবর্তী ঈধং-বতি লুপ্ত হ'য়ে একেকটা বৃত্তপদ তৈরী হয়েছে। "কিসের শব্দে ঘুম" এখানে ছট্‌ পূর্ণপদের মধ্যবর্তী ঈধং-বতি লুপ্ত হ'য়ে একটি বৃত্তপদ উৎপন্ন হয়েছে। প্রথম-বিত্তীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ পদের মধ্যবর্তী ঈধং-বতিটুকু এভাবে বিলুপ্ত করার অধিকার কবির কাছে। শুধু তাই নয়; লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ওই ঈধং-বতি-বিলোপের দ্বারা ধ্বনিত-তরঙ্গ একটু বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠেছে। কবি যদি ইচ্ছে করেন, তবে সমগ্র কবিতাতেই এভাবে ঈধং-বতি বিলুপ্ত করে ছন্দের ধ্বনিকে অভিন্ন করে তুলতে পারেন। উক্ত দৃষ্টান্তটিকেই ছট্‌ পংক্তি আছে যাতে ঈধং-বতি-কে সর্বত্রই বিলুপ্ত করা হয়েছে। যথা—

দিলি লাহোরে যাক, যাক না আগরা

মাথায় পাগড়ি দেবো, পায়েতে নাগরা।

এই ছট্‌ পংক্তির ধ্বনি কি অত পংক্তিগুলো থেকে একটু বিভিন্ন রকমের নয়? আরেকটি দৃষ্টান্ত—

অজনা নদীতীরে চন্দ্রনী গাঁয়ে

পোড়ো মন্দিরখানা গাছের বাঁয়ে



জীর্ণ ফাল্গুন-ধরা,—এক কোণে তারি  
অন্ধ নিরেতে বাসা কুজবিহারী।

—রবীন্দ্রনাথ, ঐ।

এখানেও প্রতিপক্ষের চার মাত্র। প্রথম ও তৃতীয় পক্ষের পর ঈশ্বং-যতি। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের প্রথম ঈশ্বং-যতি এবং চতুর্থ পক্ষের 'ছটি ঈশ্বং-যতি'ই বিলুপ্ত হয়েছে। "এক কোণে তারি" না লিখে যদি লেখা যায় "কোণেতে তাহারি" তাহ'লে শেষ পঙ্কতি-ছটি সম্পূর্ণ রূপেই ঈশ্বং-যতীনা হ'য়ে যাবে। এভাবে ঈশ্বং-যতি লুপ্ত ক'রে অনায়াসেই আট মাত্রার ষপ্পদিক পদ বা ছয় মাত্রার সপ্ত-পদিক পদ রচনা করা যায়। কিন্তু সাধারণত' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যবর্তী অর্ধযতিটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ওই ছটি পদকে একটি যুক্তপদিক পদে পরিণত করা হয় না। বাহ্যিক, আমরা দেখবুম যে, প্রথম ও তৃতীয় পক্ষের পরবর্তী ঈশ্বং-যতিটিকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে অনায়াসেই প্রতি পঙ্কতিতে আট ও ছয় মাত্রার ছটি যুক্তপদিক পদ রচনা করা যায় এবং তাতে ছন্দের ধ্বনিত্যে বেশ একটু অভিনবতা আনা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এটিই সমগ্র কবিতার সর্বত্রই কিংবা অধিকাংশ স্থলেই এভাবে ঈশ্বং-যতি লুপ্ত ক'রে যুক্তপদ রচনা করা যায়, তাহ'লে এ ছন্দকে একটি নোতুন ছন্দ ব'লে অভিহিত করা সম্ভব হবে কি না। অর্থাৎ ঐ ছন্দকে আধুনিক ছন্দ বলব, না চাতুর্যমূলিক ছন্দই বলব? অর্থাৎ

অজনা। নদীতীরে। চন্দনী। গাঁয়ে  
এটিকে চার মাত্রার ছন্দ ব'লে অভিহিত ক'রে  
অন্ধ নিরেতে বাসা। কুজবিহারী

কিংবা "মাথার পাগড়ি দেবো।। পরায়েতে নাগুরা", এটিকে আট মাত্রার ছন্দ বলা সম্ভব কি? আমি বলি এই ছটো দৃষ্টান্তের ছন্দই চাতুর্যমূলিক। দ্বিতীয়-টিতে ঈশ্বং-যতি উঠিয়ে দিয়ে একটু অভিনবতা আনা হয়েছে। কিন্তু আসলে জটিল চাতুর্যমূলিকই বটে এবং

সেজ্জাই চার মাত্রার ছন্দে অনায়াসেই আট মাত্রার  
যুক্তপদিক চালিয়ে দেওয়া যায়। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) আজি কি তোমার। মধুর ব্রতি।  
হেরিছ শারদ। প্রভাতে,  
হে মাত বধ। জামল অধ।  
খালিছে অমল। শোভাতে।  
(২) ঐ আসে ঐ। অতি ভৈরব। হস্তধে  
জলসিক্ত। ক্রিস্তোসারত। রভলে  
ঘন গোরাবে। নবযৌবনা। বরল  
জামপত্নী। সরসা।

এই ছটি দৃষ্টান্তই বাস্তবিক ছন্দে রচিত। কিন্তু তাদের ধ্বনির মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রথম দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পদার্থেই অর্থাৎ প্রতি তিনমাত্রার পর একটি ছন্দের অস্তিত্ব অস্বত্ব করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে পর্যায়ে অর্থাৎ তিনমাত্রার পর ছন্দ নেই এবং অনেক স্থলে ওই রকম কোনো ছন্দ স্থাপন করা সম্ভবই নয়। বাস্তবিক ছন্দে এই ভাবে পর্যায়ে অস্তিত্ব ছন্দের অস্তিত্ব বা অভাবের দ্বারা ধ্বনিত্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। কিন্তু তথাপি উভয়ই ছন্দ বাস্তবিক। কখনও একটিকে বৈশ্বাত্মিক ও অপরটিকে বাস্তবিক বলব না।

এবার যৌগিক ছন্দের বিচার করা যাক। যৌগিক ছন্দেই ঈশ্বং-যতি-বিলোপ এবং তজ্জাত যুক্তপদিক পদের প্রয়োগের দ্বারা ধ্বনি-বৈচিত্র্য বহনভাবে সৃষ্টি করা হ'য়ে থাকে। দৃষ্টান্ত—

তরঙ্গিত। মহাপ্রসঙ্গ। মগ্নশান্ত। কুজধ্বরে। মত  
পড়েছিল। পদপ্রান্তে। উজ্জ্বলিত। ভূষা লক্ষ। শত  
করি' অব-। নত।

এট হচ্ছে চার বাটির যৌগিক ছন্দ। প্রতিপক্ষে চার বাটি এবং প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষের পরে ঈশ্বং-যতি। দ্বিতীয় পক্ষের পরে অর্ধযতি। কিন্তু, নূপুর গুঞ্জরি' বাও। আনুল-অঙ্কনা।  
বিদ্যৎ-চঞ্চলা।

এখানে প্রথম ও তৃতীয় পক্ষের পরবর্তী ঈশ্বং-যতি লুপ্ত হ'য়ে ছটি যুক্তপক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টান্তটিতে ছন্দের চাল হচ্ছে চার বাটির; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ছন্দের চাল আট বাটির। কিন্তু তা' সত্ত্বেও উভয়টিকেই আমি চাতুর্যমূলিক যৌগিক ছন্দই বলব; শুধু দ্বিতীয়টিতে যতিগত বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিকে আট বাটির যৌগিক ছন্দ বসতে চাইলে। আপনিও আশা করি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত।

এবার স্বরস্বতের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কিন্তু স্বরস্বতে এই রকম ঈশ্বং-যতি-লোপ এবং যুক্তপক্ষের দৃষ্টান্ত বিরল। কারণ স্বরস্বতছন্দে সর্বত্রই যতিগুলো অতি স্পষ্ট থাকে। ঈশ্বং-যতির ছেদগুলোও ক্ষীণ নয়। তাই ঈশ্বং-যতিগুলোকেও সহজে বিলুপ্ত করা যায় না। তথাপি এমন দৃষ্টান্ত যে একবারেই নেই তা' নয়। যথা—

(১) মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে স্ততে  
ঘরের আকাশ প্রতিফলন হানুতে যেন বেদনা-  
বিদ্রাভে।

—রবীন্দ্রনাথ, নিরুতি, পলাতক।

(২) ঠাকুর! ঠাকুর! চাঁচাচাঁচা পাঁচা! কুকুর  
ভিতর মুচড়ে গুটে,  
গায় কাঁটা ছায়া, ভীমকে আজি পাঠিয়েছি  
রাখসের কোটে।

বলাই, বাবাই, কি ছাই ভাবি, ডেকেছে  
কুন্তরী তাকে,

নিতা ভয়ে ছায় যে অভয় বিপদের তার দেবতা  
রাখে।

ভীম গিয়েছে তার কাছে আজ আপনি দিতে  
প্রাণের দেয়;

আমার ছেলে, বীর সে, ছুঁতে পারবে না  
কোশাণ্ড কেহ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, ভীম-জননী, বেলা শেষের গান।

(৩) হেমন্তে, নিতম্ব শিথিল শান্ত হৃদয় বেলা,  
বকুল তলার বাসের উপর, একান্ত একলা  
ইতালি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, যুগান্তিক, পাশেবা।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অলমবিভিন্নতায়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-তিনটিতে নিম্নেরেই স্থানগুলিতে ঈশ্বং-যতি লুপ্ত হ'য়ে ছই ছই পক্ষে কোড়া লেগে গেছে অর্থাৎ যুক্তপক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তাতে যে ধ্বনিত্য একটু বৈচিত্র্য এসেছে সে-বিষয়ে সকলের কানই লক্ষ্য দেবে। তাই ব'লে ওই স্থান-গুলিতে নোতুন ছন্দ হয়েছে, একথা বলা চলে না। এমন কি, কোনো কবিতার সর্বত্রই কিংবা প্রায় সর্বত্রও যদি এভাবে ঈশ্বং-যতি লোপ ক'রে যুক্ত পক্ষের কদম বা চাল আনা যায় তাহ'লেও বলব ছন্দ চতুঃস্বর-পদিকই আছে, শুধু ঈশ্বং-যতি-লোপের দ্বারা একটু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

নদীর ঘাটের। কাছে  
নৌকো বাঁধা। আছে,  
নাইতে বধন। যাই, দেখি সে  
জলের ডেউয়ে। নাচে।  
আজ গিয়ে সেই। বাসে  
দেখি দূরের। পাসে  
মাথ-নদীতে। নৌকো, কোথায়  
চলে ভাঁটার। টানে।

—রবীন্দ্রনাথ, সহস্র পাঠ, প্রথম ভাগ।

এখানে ছটি শোকবন্ধেই (stanza-ছেই) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্কতিতে ছটি ক'রে সিলেবল আছে এবং চার সিলেবল-এর পর ঈশ্বং-যতি। যদি ওই ঈশ্বং-যতিগুলোকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে ওই পঙ্কতিগুলোকে পূর্ণের দৃষ্টান্তগুলোর মতো একেকটি যুক্তপক্ষে পরিণত করা যায় তাহ'লে যতি-লোপসহেই একটু নূতনত্ব দেখা দেবে বটে, কিন্তু তখন কি এই ছন্দটিকে একটি নূতন ছন্দ বলব? অর্থাৎ ওই ঈশ্বং-যতি লোপের দ্বারা কি এই চতুঃস্বরপদিক ছন্দটি



ঘটবরপর্ষিক হ'য়ে যাবে? পূর্বে মাত্রাত্ত ও যৌগিক ছন্দের যুক্তপর্ষিকতার যে দৃষ্টান্ত বিদ্যেহিত তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলতে হবে, উপরের দৃষ্টান্তটিতে ঈষৎ-বতি লুপ্ত হ'য়ে গেলেও ছন্দ চতুষ্রব-পর্ষিকই থাকবে, ঘটবরপর্ষিক হবে না। আর সেই জন্তই,

পোলাও তোমার কাছে  
নয়ক তেমন যায়,  
যেমন এই শাকার  
আমার কাছে স্থখ।

—যিজ্ঞেঙ্গলাল, রাজা, আলোখ্য।

এই ছন্দটিকেও চতুষ্রবপর্ষিকই বলব, ঘটবরপর্ষিক বলব না। এর প্রতিপত্তিতেই চার স্বরের পর ঈষৎ-বতি থাকার কথা, কিন্তু তৃতীয় পঙ্ক্তিতে ওই ঈষৎ-বতি পৃষ্ঠতই লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'ছ'তে। পারবে না কে। শাগ্গ কেহ', এইখানে 'কে'-র পরে ঈষৎ-বতি দিলে একটি অস্বাভাবিক লাগে, তেমনি 'যেমন এই শ। কার' এখানেও 'শা'-রের পর ঈষৎ-বতিও তেমনি অস্বাভাবিক লাগে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও উভয়ই ছন্দকে চতুষ্রবপর্ষিকই বলতে হবে। আরও একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উপরের দৃষ্টান্তটিতে তৃতীয় পঙ্ক্তির ঈষৎ-বতিও পৃষ্ঠতই লুপ্ত বটে, কিন্তু অল্প পঙ্ক্তিগুলির ঈষৎ-বতি ওভাবে পৃষ্ঠত বিলুপ্ত নয়। অথচ ইচ্ছা করলে সব পঙ্ক্তির ঈষৎ-বতি-গুলিকেই প্রায় বিলুপ্ত করেও আবৃত্তি করা যায় এবং সেভাবে আবৃত্তি করলে যিজ্ঞেঙ্গলালের অভিপ্রায়। 'প্রায়' বলনুম এই জ্ঞা যে, ঈষৎ-বতির প্রতিকল্পিতাম লক্ষ্য না রেখে আবৃত্তি করলেও হয়তো চার স্বরের পরে অল্পক্ষেপে একটু হের খেতে যায়। বাহোঙ্ক, এই দৃষ্টান্তটির ঈষৎ-বতিগুলিকে অগ্রাহ্য করে আবৃত্তি করলে ছন্দটা হ'য়ে উঠবে যুক্তপর্ষিক এবং তাতে একপঙ্ক্তার ধ্বনিগত অভিব্যক্তাও অস্বত্ব থাকে। কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত মাত্রাত্ত ও যৌগিক ছন্দের নজিরে এটিকে ঘটবরপর্ষিক না বলে চতুষ্রব

পর্ষিকেরই প্রকারভেদমাত্র বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে করি। সব ছন্দেই কিছু না কিছু variation আনতে পারা যায়। কিন্তু variation-এর দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, নতুনত্ব সৃষ্টি হয় না। নতুন ছন্দ সৃষ্টি করতে হ'লে নতুন principle চাই। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটিতে ঈষৎ-বতি-লোপের দ্বারা বৈচিত্র্য হয়েছে, আমি এটুকু বলতে চাই। কিন্তু ঘটবরপর্ষিক ছন্দ হয়েছে, আমি একথা বলতে চাইনে। জয়দেবের "পলিতলবললতা" ইত্যাদি রচনাটিতে অনেক স্থলেই ঈষৎ-বতি (এবং অর্ধবতিও) বিলুপ্ত হয়েছে। তাতে ছন্দের একঘেয়েজ দূর হ'য়ে বৈচিত্র্য এসেছে; নতুন ছন্দ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের "মরি মরি অনন্ড দেবতা" প্রেরিত্তিতেও ঠিক ঐরূপ বতি-লোপের দৃষ্টান্ত পাই।

পূর্বেই বলেছি, আপনাতর কবিত ঘটবরপর্ষিক ছন্দকে ভেঙ্গে আমি যে ৪+২ করতে চাই তার পক্ষে সাধারণ ও বিশেষ হ্রস্বম যুক্তিই আছে। সাধারণ যুক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করনুম। এবার বিশেষ যুক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। যিজ্ঞেঙ্গলালের "আলোখ্য" (এবং সন্ধ্যাত কাব্যেরও) ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে সরস্বত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই একটি syllabic রূপ দিতে। আমার মনে হয়, এই তথ্যটি ভালো ক'রে উপলব্ধি না করলে তাঁর "আলোখ্য" গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটিই ধরা পড়বে না। বাহোঙ্ক, এই জ্ঞাই দেখতে পাই তাঁর এই syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত সরস্বত ছন্দের বতিস্থান ও পদসমাবেশ-বিধি বস্কিত হয়নি। এমন কি, তাঁর এই syllabic ছন্দে সরস্বত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার তেজু এই যে, তিনি শোক-সাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছন্দ প্রভৃতির সরস্বত তালটিকেই অভিজাত সাহিত্যে স্থান দিতে চাননি। তিনি কাব্যসাধিত্যে প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর

সেজ্ঞেই তাঁর এই অভিনব syllabic ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই বতিস্থান ও পদসমাবেশ-বিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সুর, তাল ও ধ্বনি-পাণ্ডীয়া ফুটে উঠেছে। অথচ ছন্দটা syllabic বলে তাতে যৌগিক ছন্দে হ্রস্বপা একটা অভিনব ধ্বনি-বৈচিত্র্যও দেখা যায়। এগুলো ওবিধের বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর এই অভিনব ছন্দে সরস্বত ও যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে যৌগিক ছন্দের ধ্বন-বিশিষ্ট অঙ্গ শৈথিল্য নেই; কারণ, এই ছন্দের প্রায় সর্বত্রই (এমন কি শব্দের অন্তরেও) যুগ্মধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণকে পরিহার করা হয়েছে। অথচ তাতে সরস্বত ছন্দের নৃত্য-পরায়ণতাও নেই; কারণ, তাতে যখন যখন বতিস্থাপনের প্রথাকে বর্জন করে বহুস্থলেই যুক্তপর্ষের ব্যবহার করা হয়েছে। এ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব syllabic ছন্দে সরস্বতের চটুগতা ও যৌগিকের অঙ্গ একটানা সুর বস্কিত হ'য়ে একটি অভিনব পৌরুষশক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি iambic ছন্দের কবিতায়। আর, দ্বিজেন্দ্রলালের এই syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত সরস্বত enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। বাংলার syllabic ছন্দে প্রবহমান কবিতা রচনা শক্তিমাত্ কবির আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় আছে। বাহোঙ্ক, এবার উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত নিয়ে আমার বক্তব্যটিকে বিশদ করছি।—

(১) নিম্নায় প্রচারিত উক্ত অসীম স্থনীল নভগলের  
মানচিত্রে, একা,  
পড়তেছিলাম গ্রন্থ-তারানীহারিক-ধ্বমকতুর  
গীলাময়ী লেখা।

—বিপলীয়া (২), আলোখ্য।

(২) নিম্নেখ অমাব্য রাহি; শুয়ে আছি উন্মত্তে  
হাতে মাথা রাহি;

বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে; জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে  
আমিই একাকী।

শুভ্র রাহির অন্ধকারে জলধ নক্ষত্রপুঞ্জ

চেয়ে দেখি দূরে;

তাবি এত মহাঘোষিত কি মহৎ উদ্দেশ্যে উড়ে  
মহাশূভে দূরে।

—সত্যব্রত, আলোখ্য।

বর্ণা বাহুল্য এই দৃষ্টান্ত-ছটি syllabic ছন্দে রচিত। অথচ আমাদের বহু-পরিচিত সরস্বতের তালে বা ভঙ্গীতে পড়তে গেলে মনে হবে এই পঙ্ক্তি-কটি এক-বারেই অগাধ। কিন্তু ৮+৮+৮ ব্যতির যৌগিক ছন্দের ভঙ্গীতে পড়লেই এ ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্য্য অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটে উঠবে। এটা syllabic ছন্দ, অথচ তাতে যখন যখন ঈষৎ-বতি নেই। এখানে সর্বত্রই যুক্তপর্ষের চাল যৌগিকের মতো। তাই এখানে সরস্বতের চটুগতা নৃত্য-পারায়ণতার অভাব। এখানে ধ্বনির পাণ্ডীয়া যৌগিকের মতো; তার কারণ যুক্তপর্ষের ব্যবহার। অথচ এখানে যৌগিকের একটানা অঙ্গ সুর নেই; তার কারণ যুগ্মধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণের অভাব। যদি দেখা হ'তো "নিম্নেখ জ্বাধার রাহি" তাহ'লেই 'মো' এবং 'শার'-কে টেনে প'ড়ে বিস্কিট উচ্চারণ করতে হ'তো এবং তাতে ধ্বনিও একটু শিথিল হ'তো। এই দৃষ্টান্ত-ছটির যথার্থ ধ্বনি-সাধন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "শিখ-তরঙ্গ" (মানসী) এবং "বর্ষশেষ" (কল্পনা) কবিতার সঙ্গে। এই ছটি কবিতার সঙ্গে এই দৃষ্টান্ত-ছটির ধ্বনিগত সাধন ও পার্থক্য বোঝান তা এই কবিতাগুলি পর পর আবৃত্তি করলেই অনায়াসে ধরা পড়বে। এখানে আর বেশি বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ঠিক প্রচলিত সরস্বত রচনা না করে যৌগিককেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন তার নিদর্শন রয়েছে "মানচিত্র" এবং "ধ্বমকতুর" এই ছটি কবিতা। কারণ ছন্দ syllabic হ'লেও এখানে "মান" এবং "ধ্ব"-কে যৌগিকের কাব্যদায় টেনে পড়তে হচ্ছে। অবশ্য "ধ্ব"-এর মতক অকার্য উচ্চারণও করা যায়।



আমি এক প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে বৈগিকের ছন্দোবদ্ধকেই syllabic রূপ দিত চেয়েছিলেন। তার নিদর্শন আছে 'ছবি ও গান'-এ। এখানে লেখকের পুনরুক্তি করতে চাইলে (পঞ্চপুণ্ড, ১৩০৮, মাঘ জ্যৈষ্ঠ)। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও স্বরবৃত্ত ছন্দে রীতিমত যুক্তপদ গাণাত্যে চেষ্টা করেননি। সত্যাত্মনাথ কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন, খুব বেশি নয়। কিন্তু 'বিজ্ঞানশাস্ত্র'ই পুরোপুরি বৈগিকের ভঙ্গীতে যুক্তপদের ব্যবহার করেছেন syllabic ছন্দে। অবশ্য তিনি যে বিযুক্তপদিক স্বরবৃত্ত রচনা করেননি, তা নয়। তাঁর রচনায় স্বরবৃত্তের যুক্তপদিক ও বিযুক্তপদিক এই দুই রূপেরই প্রচুর নিদর্শন আছে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গভীরা তামসী রাত্রি ; বিধগগণ ঘুমিয়ে গেছে ;

আকাশ জুড়ে চতুর্দিকে ঘিরে আছে মেঘে ; ইত্যাদি।

—সিরাঙ্কউদোলা, আলেখ্য।

এটিও চতুঃস্বরপদিক স্বরবৃত্তের ভঙ্গীতে রচিত নয় ; c + c + c + c + u unit-এর বৈগিক ছন্দের ভঙ্গীতেই রচিত। তিনি প্রতিপদে আট 'অক্ষরের' পরিবর্তে আট সিলেবল ব্যবহার করেছেন—বৈগিকের সঙ্গে এ ছন্দের এই মাত্র পার্থক্য। এই জন্মই তিনি এই syllabic ছন্দেও অক্ষরোচ্চৈঃ "গভীরা তামসী-রাত্রি"-র মতো যুক্তপদের ব্যবহার করতে পেরেছেন। আট unit-এর দীর্ঘ ত্রিপদী বা দীর্ঘ চৌপদীকে যেমন তিনি syllabic রূপ দিয়েছেন, u unit-এর গদ্য ত্রিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদিকেও তেমনি তিনি syllabic আকার দিয়েছেন। যথা—

(১) চান্দটি বাসে হাসে  
শান্ত নীলাকাশে ;  
জানি না কোন প্রাণে  
রয়েছে সেখানে,  
এ ডাক শুনেও বসি'  
কঠিন শব্দ-শব্দী।

—নৃতন মাতা, আলেখ্য।

(২) বাজ মুহু বাঁধা ॥ ডাইনের তাল কাওনি  
সারসে তুপানী। রাগিণী ;  
সঙ্গে নৃত্যগীতে, ॥ কটাক্কে, হাসিতে,  
কে তুমি গো হত-। তালিণী।

—নর্তকী, ঐ।

(৩) নাইক তাতে ছন্দ, ॥ অপ্রাঙ্গণের গদ্য,  
তোমার এ কর্তব্য। নিষ্ঠাতে ;  
নাইক তাতে হয় ত ॥ মা মা বুলি বেনী,  
ভাই ভাই শব্দ প্রতি। পৃষ্ঠাতে।

—ভক্ত, ঐ।

(৪) বাজ পোলাও তুমি ? ॥ বাও না ; পোলাও খেয়ে  
আমার চেয়ে তোমার ॥ বাণেশিক কবিতা ;  
পোলাও তোমার কাছে ॥ নয়ক তেমন স্বাক্ষ,  
যেমন এই শাকার ॥ আমার কাছে হুখ।

—রাঙ্গা, ঐ।

অতি অল্পেইই বাঁধা যায় যে, এগুলি প্রচলিত চতুঃস্বরপদিক স্বরবৃত্তের কার্যদায় রচিত নয় এবং প্রায় সর্বত্রই চার স্বরের পরবর্তী ঈং-বর্তিত লুপ্ত হ'য়ে বৈগিকের কার্যদায় যুক্তপদের উৎপত্তি হয়েছে। তাই আমি এগুলিকে যুক্তপদিক স্বরবৃত্তই বলতে চাই। আশনি এগুলিকে ইটুস্বরপদিক ব'লে অভিহিত করতে চান এবং আপনার মতে ছয় স্বরই স্বরবৃত্তপদের দীর্ঘতম সীমা। কিন্তু 'শান্ত নীলাকাশে', 'কটাক্কে হাসিতে', 'তোমার এ কর্তব্য', 'যেমন এই শাকার' প্রভৃতিকে যদি ছয় স্বরের এককটি পদ ব'লে ধরতে হয়, তাহলে ("ছুতে) পারবে না কেশাধ কেশ", "জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ", "গভীরা তামসী রাত্রি" প্রভৃতিকেও এককটি আট স্বরের পদ ব'লে স্বীকার করতে হবে এবং ছয় স্বর নয়, আট স্বরই স্বরবৃত্তের পদের দীর্ঘতম রূপ ব'লে মানতে হবে। কিন্তু যেহেতু "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি", "বৌবন-বেদনা-রসে" প্রভৃতিকে আট বাটির বৈগিক পদ না ব'লে চার বাটির যুক্তপদ ব'লেই অভিহিত করা সম্ভব মনে করি এবং যেহেতু "নীল কলবের", "মাথায় পাগড়ি দেব", "অন্ধ নিম্নেতে বাসা"

প্রভৃতিকে আট মাত্রার মাত্রিক পদ না ব'লে চারমাত্রিক পদেরই যুক্তরূপ বলাই উচিত মনে করি, সেজন্যই "জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ", "কি মহৎ উদ্দেশ্যে উঠে" প্রভৃতিকেও আটস্বরের পদ না ব'লে চতুঃস্বরেরই যুক্তরূপ বলা সমীচীন মনে হয়। তদ্রূপ "(রেখেছ বাঙালী করে) মাধব করনি" কিংবা "(কাদের কশোলাতলে) শুভসম্বলন"-কে ছয় বাটির পদ না ব'লে ৪+২ বাটির যুক্তপদই বলব ; "(নিম্নে যমুনা বহে)-বহু শীতল" কিংবা "(অন্ধ নিম্নেতে বাসা) তুচ্ছ বিহারী"-কেও ছয় মাত্রার পদ না ব'লে ৪+২ মাত্রার যুক্তপদই বলব এবং এ এক কারণেই "তোমার এ কর্তব্য" কিংবা "যেমন এই শাকার"-কে ছয় স্বরের পদ না ব'লে ৪+২ স্বরের যুক্তপদ বলাই অধিকতর সম্ভব নয় কি ?

আশা করি আমার কথা আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।

ভবদীয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

পুনশ্চ

প্রিয়বরেষু

বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে আমার রচনাটির উপর আপনি যে মন্তব্য করেছেন তা পড়ে আমার কয়েকটি কথা মনে হ'লো। এই প্রবোধে তা আপনাকে জানাচ্ছি। প্রথমেই বলা দরকার যে, আলোখোর ছন্দের নজিরে আপনি ছয় স্বরকেই স্বরবৃত্তের রূপ পদের উচ্চতম সীমা ব'লে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার পদ্ধতিতে বিচার করলে দেখা যাবে, আলোখোর ছন্দের নজিরেই আট স্বরকে স্বরবৃত্ত পদের শেষ সীমা ব'লে মানতে হয়— ছয় স্বরকে নয়। অর্থাৎ ঐটুস্বরপদিক স্বরবৃত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঐটুস্বরপদিক ছন্দও স্বীকার করতে হয়। মূলপদেই এবিধের সংশ্লিষ্ট আলোচনা করছি।

"ঐটুস্বরপদিক" স্বরবৃত্ত সম্বন্ধে আপনি বা' লিখেছেন তা থেকে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি "বাচ্ছ পোলাও তুমি" ইত্যাদি রচনাটিকে আপনি অবিকল আমার মতোই আয়ত্তি করেন ; আমাদের উভয়ের আয়ত্তি-ভঙ্গীর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু বিশ্লেষণ ও নামকরণের মধ্যে। তাও খুব বেশি নয়। বিশ্লেষণেও অনেক বিষয়েই আমি বা' বলতে চাই তার সঙ্গে আপনার বক্তব্যের খুব পার্থক্য দেখবো না। তবু যেন কোথাও একটু খটকা র'য়ে গেছে। তা ঠিক স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারিনি। তাই আপনার কয়েকটি উক্তি উল্লেখ ক'রে সে-সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে যাব।

"বিজ্ঞানশাস্ত্রের এ ধরনের ছন্দ চার ও দুইয়ের কদমে আসে। রচিত নয়"—এ কথাই তো আমি বলেছি মূলপদে। তিনি সাবেক আমলের স্বতন্ত্র-পদিক "অক্ষরবৃত্ত" অর্থাৎ বৈগিকের ছাঁচেই এই নোতুন ধরনের syllabic বা স্বরবৃত্ত ছন্দকে ঢালাই করেছেন। কাজেই এ ছন্দের বিভাগগুলির মধ্যে কোথাও কোনো ঈং-বর্তিত অস্তিত্ব না মেনে একক টানে একক বিভাগ আয়ত্তি ক'রে যাওয়াই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অভিজ্ঞা। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনার মতভেদ আছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু বিশ্লেষণের বেলায় আমি প্রতি বিভাগে চার স্বরের পরে একটি ক'রে বিলুপ্ত বা উচ্ছিন্ন ঈং-বর্তিত অস্তিত্ব স্বীকার ক'রি। আর আপনি প্রতি বিভাগে তিন স্বরের পরেই এককটি উচ্ছিন্ন ঈং-বর্তিত স্বীকার করতে চান। "এদের কদম জিনেরই", "এ ক্ষেত্রে আমার কানে তো ঈং-বর্তিতা পড়ে তৃতীয় স্বরেরই পরে—চতুর্থ স্বরের পরে নয়", আপনার এই উক্তি সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারছি। আমার কান কিছুতেই তৃতীয় স্বরের পরে কোনো যতি বা ছেদের অস্তিত্ব মানতে রাজি হচ্ছে না। এখানে তর্ক চলে না। তর্কের সর্বত্রই অব্যাহতি ; কিন্তু ব্যক্তিগত অম্বুভূতির ক্ষেত্রে তার প্রবেশ নিষেধ। আর এক্ষেত্রে



ঈশ্ব-বতি বিষয়ে আপনার ও আমার মধ্যে শ্রুতি-অহুত্বিত পার্থক্যই দেখতে পাছি।

আপনি দিচ্ছেন, “স্বরূতের পর্বে ছয় স্বর যে একটানা পড়া যায়, এটা স্বীকার করতে আপনার একজ্ঞিত বা শ্রুতিভেদ কোনো অনিচ্ছা আছে”। এরকম সন্দেহ আপনার হয়েছে। এবিষয়ে আমার স্পষ্ট উত্তর এই যে, আমার তেমন কোনো অনিচ্ছাই নেই এবং একথাটা বোঝাবার জটিল মূল পদ্ধতির অবতারণা করেছিলাম। শুধু ছয় স্বর কেন, স্বরূতের পর্বে আট স্বরও একটানা পড়া যায়—একথাও আমি বলেছি। যুক্তপর্লের মানেই হচ্ছে এই যে, ছোট পর্লকে বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত্ব না করে একটানা আয়ত্ত্ব করতে হবে। চার-ছয় বা চার-চার স্বরের যুক্তপর্লের কথা বহন বলি, বহন আমি এই বোঝাতে চাই যে, ওদব ক্ষেত্রে ছয় স্বর বা আট স্বর একটানা আয়ত্ত্ব করতে হবে; এই ছয় বা আট স্বরের আয়ত্ত্বিতে কোনো ছেদ থাকবে না। “যেমন এই শাকার”, এই লাইনটিকে আমি একটি যুক্তপর্ল বলেছি। তার মানে হচ্ছে এই যে, এই ছোট স্বরকে একটানা পড়তে হবে; এর মধ্যে কোথাও কোনো দাঁক থাকবে না। কারণ “শা”-এর পরে যে ঈশ্ব-বতিটি প্রকাশিত, সেটি এখানে বিলুপ্ত বা উচ্চ হয়েছে। অর্থাৎ আয়ত্ত্বের সময় “শা”-এর পরে কোনো দাঁক বা ছেদ অহুত্ব হতে না। তেমনি “হেমন্তে নিতুল মিষ্ট”, “কি দহন্ত উদ্ভেদে উচ্চ”, “নিশায় প্রসারিত উচ্চ” প্রভৃতিকেও চার-চার বা আট স্বরের যুক্তপর্ল বলতে চাই। তার মানে এই যে, এখানে আটটি স্বরকেই একটানা পড়তে হবে; চার স্বরের পর্ল যে ঈশ্ব-বতিটি থাকতে পারত তা’ এখানে লুপ্ত বা উচ্চ হয়েছে এবং আয়ত্ত্বের সময় ওই ঈশ্ব-বতিটি অহুত্ব হতে না। যৌগিক ছন্দের যুক্তপর্লে ছয় বা আট বাট, মাত্রারূতের যুক্তপর্লে ছয় বা আট মাত্রা এবং স্বর-রূতের যুক্তপর্লে ছয় বা আট স্বর একটানা পড়া যায় অনায়াসেই। কিন্তু তা’ বলে ওই যুক্তপর্লগুলিকে

মৌলিক পর্ল হিসেবে গণ্য করে ছন্দ বিশ্লেষণ করা চলে না। এই আমার বক্তব্য। তাই “যেমন এই শাকার”-কে আমি ষট্‌স্বরপর্লিক না বলে চতুঃস্বর-পর্লিকেরই যুক্তরূপ বলতে চাই। তেমনি “নিশায় প্রসারিত উচ্চ” এইটেও আমার মতে চতুঃস্বর-পর্লেরই যুক্তরূপ, ষট্‌স্বরপর্লিক নয়।

“খাজ পোলাও তুমি” প্রভৃতিকে আপনি একাধিক স্থলে ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূতের স্বররূত প্রতিরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একথাটি খুব স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হয় না। “বিজ্ঞেশলালের ষট্‌স্বরপর্লিক ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু “খাজ পোলাও” ইত্যাদিকে তিনি ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূতের হাতে চালাই করেননি। তৎকালীন হিসেবে ষট্‌স্বরপর্লিকের সঙ্গে এর সাম্য দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সেটি হচ্ছে বাহ্যিক। ধ্বনির দিক থেকে ষট্‌স্বরপর্লিকের সঙ্গে কোনো সাম্য নেই। আলোচ্যের স্বররূত মাত্রারূতের ধ্বনি মোটেই মিলাবে না, মিলাবে যৌগিক ছন্দের ধ্বনি। বিজ্ঞেশলাল নিজেও তুমিকার বলেছেন, আলোচ্যের ছন্দ তিনি “অক্ষর হিসাবে” রচনা করেননি, কয়েকনে সিলেবল হিসাবে। তার মানে এই যে, তিনি ভারতজন্মের প্রাবর্তিত অর্থাৎ মাবেক আমাদের “অক্ষররূত” ছন্দকেই syllabic রূপ দিয়েছেন; মাত্রারূতকে syllabic রূপ নেননি। তাই তাঁর এই নোমুদ্র ধরনের syllabic বা স্বররূত ছন্দে অক্ষররূত অর্থাৎ যৌগিকেরই ধ্বনিসাম্যতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং “খাজ পোলাও” প্রভৃতির ছন্দকে “ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূতের স্বররূত প্রতিরূপ বা counter-part” না বলে মাবেক কালের যক্ষস্বরপর্লিক “অক্ষররূতের” স্বররূত প্রতিরূপ বলাই অধিকতর সমীচীন মনে করি। আপনিও একথা স্বীকার করেছেন দেখে হুহু হুহু। আপনি পড়ের শেষ দিকে লিখেছেন, “বিজ্ঞেশলালের syllabic ছন্দে “অক্ষররূতের আমোজ এসে গেছে”, ও ছন্দ হচ্ছে “মাবেক আমাদের অক্ষররূত ছন্দেরই স্বররূত তর্জমা”।

আপনার এই উক্তি স্বরূতের মধ্যে আমার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়ে স্বভাবতই সঙ্গত হয়েছি। আসল কথা এই যে, আলোচ্যের যুগের যক্ষস্বরপর্লিক অক্ষর-রূতকেই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন মাত্রিক রূপ, আর বিজ্ঞেশলাল দিয়েছেন syllabic রূপ। তাতে একজন স্পষ্ট করেছেন ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূত ছন্দ, আরেক জন স্পষ্ট করেছেন যুক্তপর্লিক স্বররূত ছন্দ।

এখানে প্রথমক্রমে আরেকটি বিষয় সম্বন্ধে একটু মাত্রা কথা বলতে চাই। আপনি ছয় unit-ওলা পর্লের যে-কোনো ছন্দের কদমকে “তিনের কদম” বলে ধরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেন (সুতরাত সঙ্গীতের নজিরে), তাই তিনি ছয় unit-ওলা সব ছন্দকেই “একদম” ছন্দ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু আলোচ্যের যুগের যক্ষস্বরপর্লিক “অক্ষররূত” (যথা “প্রভু বৃদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি” ইত্যাদি) কিংবা আয়ত্ত্বিক যুগের ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূত ছন্দের আসল তালটা তিনের কদমেই চলে কি না, হুবহুই আমার কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু এখানে সে-বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা সম্ভব নয়। ওবিষয়ে যথার্থোপায়ে আলোচনা করতে গেলে একটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখতে হয়। এখানে শুধু এইটুকু বলেই স্পষ্ট করব কালের ষট্‌স্বরপর্লিক “অক্ষররূত” কিংবা ষট্‌স্বরপর্লিক কালের ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূত ছন্দের তালের বা কদমের আসল রূপটি আবিষ্কার করতে হলে বাংলা ছন্দের সমগ্র ইতিহাসটিকেই নিমুণভাবে আলোচনা করতে হবে।

এবার আপনার রচিত দৃষ্টান্ত-ছটি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করছি। “ছন্দ-বিশ্বাসে মাক মাথা সেনু কবি” ইত্যাদিকে ছই ভাবে আয়ত্ত্ব করা যায়, তাই বিশ্লেষণও করা যায় দুই রকমে। যথা—

(১) ছন্দ-বিশ্বাস। বাদে

মাক মাথা সেনু। কবি!

এই ভাবে কেউ। ধরে

নেয় কিছু টা। ক’রে?

এ হ’লে ষট্‌স্বরপর্লিক মাত্রারূত হিসেবে বিশ্লেষণ। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ” (সম্বলপত্র, ১৩২৪, জৈষ্ঠ), “অমর মাহাশ” (বনবাণী, পৃ: ১২৩, পাদটীকা) এবং “সহজ পাঠ” (প্রথম ভাগ, পৃ: ৪০) দ্রষ্টব্য। আর উক্ত পংক্তিগুলিকে নিম্নোক্তরূপেও আয়ত্ত্বি এবং বিশ্লেষণ করা যায়। যথা—

(২) ছন্দ বি। সবাধে। মাক মাথা। সেনু কবি।  
এই ভাবে। কেউ ধ’রে। নেয় কিছু। টা ক’রে?  
এ হ’লে চতুঃস্বরপর্লিক মাত্রারূত হিসেবে বিশ্লেষণ। প্রতিপর্লে আট মাত্রা না ধ’রে চার মাত্রা ধরিয়েছি। এ বিষয়ে কিছু নজিরও আছে আমার। যথা—  
হিঙ্গা কি সংসারে চারু কালই থাকবে রে  
ধাক্বে কি সঙ্গাম!

জন্তরে হীন তবে জ্ঞান ক’রে কেনু পোনে  
দাও তাকে ধর্ম্ম!

—সত্যেন্দ্রনাথ, ছন্দ-স্বরস্বতী, ভারতী,  
১৩২৫, বৈশাখ, পৃ: ২০।

এই দুইটি দৃষ্টান্তের ধ্বনি অবিকল এক। প্রতিপর্লে চার মাত্রা, তিন স্বর এবং প্রথম স্বরটি গুরু অর্থাৎ ষিমাত্রিক। তফাত শুধু এই যে, একটিকে আট পর্ল, একটিকে ছয় পর্ল এবং শেষ পর্লের শেষ ষট্‌স্বরপর্লিক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, মাত্রেশ্রুতির দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির ছন্দকে বলেছেন “ষট্‌পর্লিকা”, ষিমাত্রিকা বলেননি। এই নজিরে আমিও আপনার রচিত দৃষ্টান্তটির প্রতিপংক্তিতে চার পর্ল ধরতে চাই, ছই পর্ল নয়। সুতরাং প্রতিপর্লে ছয় স্বর থাকার প্রমাণ হ’লে না। আপনিও সে-কথা স্বীকার করেছেন।

এবার আপনার “ছন্দ-বিশ্বাসে মাক মাথা সেনু কবি” ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বলছি। আপনি নিজেই বলেছেন এটি হুমায়ূন হুসাইন। কিন্তু কেন? কারণ, প্রথমত এখানে আপনি “সঙ্গম ভাবে” স্বরমাত্রিকতাকে বর্জন করতে চেষ্টা করেছেন, দ্বিতীয়ত আপনি ঐটিতে বিজ্ঞেশলালের জায় যৌগিকের ধ্বনি আনবার চেষ্টা করেননি, তৃতীয়ত এখানে প্রতিবিভাগে চতুর্থ স্বরের পরে



ঈশ্ব-বতির ক্ষেত্রে কোন ক'ক না রাখার চেষ্টা করেছেন। যাহোক, আমি কিন্তু এটিকে মূল-পর্যায়িক স্বরবৃত্তই বলব, যদি কিছু বলতেই হয়। অর্থাৎ এটি ৪+২ স্বরেরই ছন্দ, তবে চতুর্থ স্বরের পরবর্ত্তী ঈশ্ব-বতিটি লুপ্ত বা উচ্চ হ'য়ে যাওয়াতে একটানা স্রাব্তি করতে হবে; একেবারে বিভাগের মধ্যে কোথাও ক্ষণিকের স্তব্ধও ধামুত হবে না। কিন্তু তা হ'লেও ভালো শোনাবে না। কারণ, আপনি সঙ্গায় তাই সর্বস্বই তিন স্বরের পরে একটি ক'রে ঈশ্ব-বতির স্থান করতে চেষ্টা করেছেন। তাতে ঈশ্ব-বতির স্থান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মাজিক গুণন অসমান হ'য়ে পড়েছে; কোথাও হয়েছে তিন মাত্রা (ব্যা—‘ও কবি’ ‘কি ধ'রে’), আবার অল্প হয়েছে পাঁচ মাত্রা (ব্যা—‘রাখলে যায়’, ‘কর্ণ হায়’।) ওই মাজিক গুণনের অসমানতাকেই এটির স্বশ্রাব্যতার অভাবের প্রধান কারণ বলতে হবে। এই অসমানতাকে দূর করসেই কবিতাটি স্বশ্রাব্য হবে। একাজ করা যায় দুই উপায়ে। প্রথমত' আপনার প্রথম দৃষ্টান্তটির মতো এটিকে ত্রিশ্ব-চতুর্মাত্রাপর্যায়িক স্বর-মাজিকে পরিণত ক'রে। দ্বিতীয়ত' নিম্নোক্তরূপে এটিকে বিত্ত্ব-চতুর্মাত্রাপর্যায়িক মাত্রায়ুতে পরিণত ক'রে। বর্ষা—

ছন্দ-বিচারে ছাই সাক্ মাথা ওগো কবি!  
এই ভাবে ধ'রে কিগো যায় কিছু নেওড়া হে?  
তোমার নিভুল ছাঁট কান হায় নর নবী,  
মন খুলে রেখে যার কান খুলে দেওয়া যে।  
আপনার দৃষ্টান্তে সেনস্ব হানে ঈশ্ব-বতি আছে,  
এখানেও অবিকল সেই হানেই ঈশ্ব-বতি রাখা হয়েছে;

কিন্তু তিন স্বরের পরে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে অল্পত্ব করার মতো ঈশ্ব-বতি রেখে বিত্ত্ব (অর্থাৎ স্বরমাজিক না ক'রে) এবং স্বশ্রাব্য যটুস্বরপর্যায়িক স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা সম্ভব নয় ব'লেই আমার মনে হয়। কবিতা আমার কথা অপ্রমাণিত করলে আমিও স্থবী হব, বাংলার ছন্দসম্পদও বাড়বে। সত্যজন্যে ত্রিশ্ব-বর্যায়িক ছন্দ রচনা করেছেন, যটুস্বরপর্যায়িক ছন্দ রচনা করেননি।

পরিশেষে একথা বলা দরকার যে, বিজ্ঞেন্দ্রলালের ‘আলেখ্য’ কাব্যের স্বরবৃত্ত বা syllabic ছন্দের বর্ষায় স্বরূপটি সম্বন্ধে আমার মতটি আপনার মনে খেপেছে হেঁদে আনন্দিত হয়েছি। আলেখ্যের ছন্দ যে পূর্ণ-বিভাগ, আত্মভিত্তিক, ধ্বনিযাত্রী ইত্যাদি বিষয়ে যৌগিক ছন্দের সমত্বর্ষী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘যৌগিক স্বরবৃত্ত’ নামটা পছন্দ হয় না। কারণ ‘যৌগিক’ বলতে ধ্বনির সংমিশ্রিত ও বিশ্লিষ্ট রূপের সংযোগ বোঝায় আমার সম্মত মতে। কিন্তু স্বরবৃত্তে তো গুরুত্ব সম্যোগপাশন ও ছন্দের প্রকৃতিগত বিধানের বিরোধী। তাই ‘যৌগিক’ এবং ‘স্বরবৃত্ত’ এই পদ্যপূর্ণ বিরুদ্ধত্বীয় শব্দ-জুটির আগে ‘যৌগিক স্বরবৃত্ত’ নামকরণ করতে খটকা লাগে। যাহোক, লগতে নামের মূল্য বাড়ই যেক, নামের চেয়ে স্বরূপের মূল্য বেশি এবং আলেখ্যের ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মতসাম্য হয়েছে। অতএব আপনাকে আমার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন ক'রে পত্রখানি শেষ করছি।

ভবদীয়

প্রদোষচন্দ্র সেন

## মতি-অনুপবিতিক অনুরক্ত ও বিজ্ঞেন্দ্রলাল

প্রীতিভাষ্যে

প্রীতিভাষ্যে

আপনার প্রবন্ধটি আমাকে আপো পাঠিয়েছেন বলে বিশেষ ধন্যবাদ। কারণ, এতে ক'রে উত্তর আমার অন্তর যাকিছু বলবার আছে, ঐ সঙ্গে একত্রেই ‘উদয়ন’ ছাপবার স্বযোগ পাওয়া গেল। এরকম আলোচনার সত্যিই লাভ আছে। বিশেষ এই ক্ষেত্রে যে, স্বরবৃত্তের পক্ষে উক্তিত্ব বরংসংখ্যা যে হয় হ'তে পারে, এ-আলোচনা প্রতিচ্ছন্দ্যের কাছেই ভিত্তাকর্ষক হবে।

প্রথমেই ব'লে রাখি, বিজ্ঞেন্দ্রলালের আলেখ্যের যৌগিক-স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে আপনার কথাগুলি প'ড়ে আমি অত্যন্ত পুষ্কিত হ'য়েছি। আপনার এ-বিশ্লেষণ প্রতিচ্ছন্দ্যেরই পড়া কর্তব্য—শুধু পৌরুষদীপ্ত কবি বিজ্ঞেন্দ্রলালের অসামান্য ছন্দপ্রতিভা সম্বন্ধে নোতুন আলো মিলবে ব'লে নয়, এ-থেকে বাংলা স্বরবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক নোতুন জ্ঞান মিলবে ব'লেও বাটে। আমি নিজের সম্বন্ধে একথা অন্ততঃ অকপটেই বলতে পারি যে, বিজ্ঞেন্দ্রলালের আলেখ্যের যৌগিক-স্বরবৃত্ত ছন্দের অসামান্য দার্ঢ়—*austrity*—ও পৌরুষ আমাকে বরাবর চমৎকৃত করলেও তাঁর এ-ছন্দের শক্তিমত্তার গোড়াকার কারণটা আমি আপনার মতন ধরতে পারিনি। এজ্ঞে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময়ে শুধু আর এইটুকু বলব যে, ছান্দসিক হিসেবে আপনার গভীর অন্তর্ভুক্তি আছে ব'লে আমার প্রশ্ন থেকেই যে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, ‘আজ তা’ বহুমূল হ'য়ে গেল। ধারা বলেন, আপনি গুণতেই জানেন গুণতে নয়, তাঁদের কথায় আর কান দেবার প্রয়োজন দেখিনে। এ-বিষয়ে পণ্ডিত ভাভাওয়ের সঙ্গে আপনার তুলনা ক'রে আমি একটুও বাড়াবাড়ি করিনি। রাগ গুলেই তাঁর বিশ্লেষক মনে তাঁর অন্তর্ভুক্তি যেমন রাগ-বিশোধের

ছক কাটতে শুরু করে, কবিতা পড়লেই আপনার অন্তর্ভুক্তি তেমনই আপনার মনের তরীতে তার গুচ্ছতম ছন্দোদ্ধাপিত বাজিয়ে পরিকার গুণতে পায়। এ-স্বত্ব প্রাতিভা (intuitive) সম্পদ, গাণিতিক (mathematical) নৈপুণ্য নয়। যাক, আমার শুধু দুইটুকু মাত্র কথা বলবার আছে, সেগুলি মূলতঃ আমি পোঁপ মনে করি, তা' হ'লেও খুলে বলা ভালো,—যেহেতু এখানে একটু মতভেদ হ'চ্ছে বইকি।

আপনার প্রধান যুক্তি এই যে, বিজ্ঞেন্দ্রলালের “আলেখ্য”

বাছ পোলাও তুমি  
আমার চেয়ে তোমার  
পোলাও তোমার কাছে  
যেমন এই শাকার

খাও না পোলাও খেয়ে  
বাজেনিক ফুবা  
নরক তেমন বাহু  
আমার কাছে স্থা

ধরণের পঞ্জিগুণিকে চার ও দুই স্বর অন্তর “বাছ পোলাও। তুমি ॥ খাও না পোলাও। খেয়ে ॥” ভাবে ঈশ্ব-বতি দিয়ে পূর্ণভাগ করা কর্তব্য। ঈশ্ব-বতি, বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে যে ছন্দের বৈজ্ঞান্য আনা যায় মূলত, নোতুন ছন্দ সৃষ্টি করা যায় না—আপনার এ মূল নীতিটি আমি মানি। কিন্তু আমার অন্তর্ভুক্তি বলে, বিজ্ঞেন্দ্রলালের এ-ধরণের ছন্দ চার ও দুইয়ের কদমে আসে রচিত নয়—এদের কদম তিনেরই। এ হচ্ছে ঠিক ব্যাকরণিক মাত্রায়ুতে স্বরবৃত্ত প্রতিক্রম বা counter-part : অর্থাৎ ব্যাকরণিক মাত্রায়ুতে মাত্রার ভাষণের স্বর বাসালেই এই ছন্দ পড়ে ওঠে। বর্ষা, যদি লিখি :

বাছ পোলাও  
মোর চেয়ে তব  
তব রসনে সে  
যথা শাকার

খাও না তা খেয়ে  
বাজেনিক ফুবা  
নহে তত বাহু  
মোর কাছে স্থা

তাহ'লে একটা আর একটার সেনি প্রতিরূপ হবে।



যেমন মাত্ৰান্ত পথার যৌগিক পথারের প্রতিরূপ।  
দৃষ্টান্ত: যেমন মাত্ৰান্ত পথারের লাইন  
নূপুর গুঞ্জরীয়া | আলো-চকলা | হচ্ছে  
নূপুর গুঞ্জরী 'বাও | বিদ্যা-চকলা | এই  
যৌগিক পথারের লাইনের প্রতিরূপ।

আপনি ঠিকই লিখেছেন—এবার বিচারে শেষ  
আদালত কান বা অস্ত্রশক্তি। কিন্তু মুখিল এই যে,  
আমার একধার স্বপক্ষেও আমার শেষ নঞ্জির বা  
রেকারী হচ্ছে আমার ঐ অস্ত্রশক্তি। সে আমাকে  
বলছে যে, “যেমন এই শা। কার। আমার  
কাছে। সুখা।” এভাবে বিশ্লেষণে বিচ্ছেদলাপের ঐ  
ধরণের লাইনগুলির স্বার্থ ছন্দোপেক্ষ বা কদম পড়ে  
না। কেন পড়ে না, বোঝাতে এছন্দের ছুঁই  
একটি লাইন উদ্ধৃত করতে চাই তাঁর “আলোখা”  
থেকে—কেন না তাতে বোঝা যাবে যে, এছন্দ  
তিনের কদমই তিনি রচনা করেছিলেন ও তিনের  
পাষ্ট বা উহ যৌগিকই আদ্যন্ত পঠনীয়। অতভাবে  
বলতে গেলে বলা যায় যে, বিচ্ছেদলাপের এ  
ছন্দ হচ্ছে অবিকল যথাক্রমগণিক মাত্ৰান্তান্তেরই মতন,  
কেবল মাত্ৰান্তান্তে ব্যক্তি (unit) হচ্ছে মাত্রা (mora),  
এছন্দ (বিচ্ছেদলাপের “নর্তুকী”, “রাঙ্গা” ও “নেতা”  
কবিতায়) ব্যক্তি হচ্ছে স্বর (syllable);—ছোট মাত্র  
দৃষ্টান্ত নিম্নে যথেষ্ট হবে তাঁর “নর্তুকী” কবিতাটি  
থেকে—

(১) যুদ্ধ-জ্যোতি বতি | ঝাড়ে ঝাড়ে অলে

প্রশুত সে নাট্য | মন্দিরে

(২) ভালোবাসা চাহে | ভালোবাসা আর |

কামী চাহে শুধু | কামিনী

(১)-এ দেখা যায় যে, বিভাজ্য লাইনটি বাদ দিলে  
প্রথমটিকে বিকৃত মাত্ৰান্ত ক’রে পড়া যায়—“যুদ্ধ”  
ও “জ্যোতি”কে আলাদা ক’রে পড়লে। (২)-এ  
একথা আরও স্পষ্ট। ও বহুই মাত্ৰান্তান্ত। অথচ  
স্বরান্তে এরকম পাঁচটা লাইনও তিনি দিয়েছেন।  
কিন্তু কেন দিলেন অন্ততঃ ছন্দ হ’য়ে? এই জন্তে

যে, এটা কানে একটু খাণাপ লাগে না। লাগুবার  
কথাও নয় যে। কারণ, গুণের কদম অবিকল  
এক। তবু যে আপনি কেন এছন্দকে ভেঙে  
চার-দুয়ের কদমে ভাগ করতে চান, তার কোনো  
সমর্থই আমি খুঁজে পাইনে—এই ছাড়া। যে স্বরান্তের  
পার্শ্ব ছয় বরকে একটানা পড়া যায়, এটা স্বীকার  
করতে আপনার প্রকৃতিগত বা শ্রুতিগত কোনো অসুবিধা  
আছে। এ-অসুবিধার কথা আমি সন্দেহ করছি  
আপনি এই কথা লিখেছেন ব’লে যে, “শা-র  
পর ঈং-যতিটি আপনার “অস্বাভাবিক” লাগে—  
“যেমন এই শাকরা” লাইনটি পড়বার সময়ে। কিন্তু  
একথা আপনার চেয়ে কেউ বেশি জানে না যে, কানের  
অনেক অংশই প্রথমটির শোর ক’রে অস্বীকার  
করতে হয়—কলে যত্নে কানেরই নেতৃত্ব দেনা-  
বৈচিত্র্যজ্ঞান জন্মায় ব’লে। অতএব খণ্ডনের বেলায়  
একথা বিশেষ ক’রেই ষাটে, যেমন রবীন্দ্রনাথের  
“মরি মরি ঐ | নন্দ দেব | তা” ও “পথিক বধু |  
চরণে গণ | তা” ধরণের লাইনে। কান একটু  
শিক্ষিত হ’লেই এসব রস পায় কিন্তু এশব্দটি  
না নিলে পড়তেই পারে না। \* এর কথা আপনাকে  
বলা মানে নিতীকাসুলে বন্ধনা নিয়ে যাওয়া—অথবা  
গ্রামা ভাষায়: কামার-বাড়ী ছুঁচ বেচেতে যাওয়া।  
তবু যে একথা বললাম, সে শুধু এই জন্তে যে আপনি  
“শা”-স্বের পর ঈং-যতি দিতেই হবে একথা ইঙ্গিত  
করেছেন। কারণ, আপনি বলছেন: “পোলাও  
তোমার কাছে.....” ধরণের পঞ্জিক্তির “ঈং-  
যতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে আয়ত্ত্ব করলেও

\* একই স্বরান্তের দৃষ্টান্ত বেই, অতএব গুণন সম্পর্কে। ছোট  
লাইনের ক্ষম এই ভাবে এস দেবিন  
লোকে নিম্ন: শ্রুত শ্রাব | সেম গা নিহু | মন যে খণ | সে  
মুগর মনু | রিসে না রহি | বিকসে বনু | রসে যে গীরা | সে  
এখানে প্রশ্ন ও তৃতীয় পরস্পর শেষে অতএব গুণন হইতে। প্রথমটির  
একটি অস্বাভাবিক পাশে, কিন্তু এখানেই বৈষম্যবিক্ত পরিভাষার  
“আতি”তে বহু শব্দর রস আসে নাকি? হস্তাঃ অস্বাভাবিকতার  
গুণি প্রমাণ। নয়।

হয়ত চার স্বরের পরে অলক্ষ্যে একটু ছেদ থেকে  
যায়।” অনেক ঈং-যতি সম্বন্ধেই একথা ষাটে সন্দেহ  
নেই, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার কানে তো ঈং-  
যতিটা পড়ে তৃতীয় স্বরেরই পরে—চতুর্থ স্বরের পরে  
নয়। কাজেই চারের পরে ঈং-যতির আভাস  
পেতেই হবে, এমন কোনো বাধাব্যবহা মানি নী  
ক’রে বলুন দেখি?

শেষতঃ আপনাকে একটি কথার সামান্য প্রতিবাদ  
করার চেষ্টা ক’রে এ-চিঠির সমাপ্তি টানি।

আপনি লিখেছেন, “পোলাও তোমার কাছে.....”  
লাইনগুলির “তৃতীয় পঞ্জির ঈং-যতিটি স্পষ্টই লুপ্ত  
বটে, কিন্তু অল্প পঞ্জিগুলির ঈং-যতি ওভাবে স্পষ্ট  
বিশুণ নয়। অতঃ ইচ্ছা করলে সব পঞ্জির ঈং-  
যতিগুলিকেই প্রায় বিসৃপ্ত ক’রেও আয়ত্ত্ব করা  
যায়।” ওথেকে আপনি সিদ্ধান্ত করছেন যে, এ-পঞ্জি-  
গুলির প্রত্যেকটিতেই চার স্বরের পরে একটি ক’রে  
ঈং-যতির প্রকাশ। কানের পক্ষে স্বাভাবিক।  
আমার কিন্তু মনে হয়, এ-প্রকাশ পাওয়া থেকে না  
রাখলে—অর্থাৎ স্বরান্তের পরে উচ্চতন স্বরসংখ্যার  
সীমা সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা না গড়ে মনটাকে  
থোলা রাখলে এমন কথা মনেই আসে না। হয়েছে  
কি, সম্ভবতঃ আপনার মনে স্বরান্তের পরে উচ্চতন  
স্বরসংখ্যা চার এই ধারণা “আ প্রায়ের” দৃঢ়বদ্ধ—তাই  
এই প্রকাশ। আপনার কানে ভ্রমগেছে, এবং যদি  
কোনো ভালো ছন্দজ্ঞ আপে থেকে মনে গেঁথে না  
রানেন যে, স্বরান্তের পরে ছয় স্বরে একটানা ছন্দ  
রচনা অসম্ভব, তাহলে তাঁর কানে এ প্রকাশ  
জায়বেই না। কাজেই তখন তিনি এছন্দকে চার-  
দুয়ের কদমে না প’ড়ে অতি সহজে তিনের (তিন  
সিলেবলের) কদমেই প’ড়ে রানেন—যেমন যথাক্রম  
পথিক মাত্ৰান্তান্তের পঞ্জিক্তি প’ড়ে প্রমাণ করা  
মাত্রার কদম। একশতাটা পূরণপূরি প্রমাণ তিন

চিঠি—কারণ, তরু বনন হ’ল হেড়ে হুস্মে কোঠার  
পিয়ে পৌছয় তখন কোনো বিসম্বাদেই চরম নিশ্চিতি

সহজলভা হয় না। তবু চেষ্টা করব আমার  
বক্তব্যটিকে প্রতিপন্ন করতে—দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রথমে  
স্বরমাত্রিক ছন্দে দৃষ্টান্ত নিই, কারণ এর ষৌকি বেশি  
প্রকট—

ছন্দ বিসম্বাদে	সাক্ষ্য মাথা সেনু কবি।
এই ভাবে কেউ খ’রে	নেয় কিছু টুট ক’রে?
মন খোলা রাখপি	নাই রাখা হার, ভবী
ভুলবে কি গুণিতে?	পরেতে ছয় স্বরে?

এখানে আমি প্রতিপক্ষে আট মাত্রা ও ছয় স্বর  
গুলি। তবে আপনি হয়ত বলবেন, একে আশা-আশি  
ভাগ ক’রে চার মাত্রা ও তিন স্বর গোণাই উচিত  
এই ভাবে “ছন্দ বি। সম্বাদে। সাক্ষ্য মাথা। সেনু কবি”  
ইত্যাশি। কারণ আট মাত্রার পরে মানতে আপনার  
আপত্তি আছে যে। কাজেই ঠিক প্রমাণ হ’ল না।  
তবু যে এ দৃষ্টান্ত বিলাস সে শুধু দেখাতে যে, কোনো  
পক্ষে ছয় স্বর হুস্মেও ছন্দ চমৎকার সাবলীল থাকে—  
আচ্ছা একে এখন নিজলা স্বরান্তে ঢালাই করা যাক—

ছন্দ বিতর্কে ছাই	সাক্ষ্য মাথা ও কবি।
এই ভাবে কি খ’রে	যা কিছু নেওয়া হে?
তোমার নিভুল ছুটি	কর্ণ হায় নয় নবী,
মনু খুলে রাখলে যায়	কান খুলে দেওয়া হে?

ক্ষেত্রে আপনার পরিতাপ মানতে হ’লে এই  
ভাবে ছেদ টানতে হবে:

ছন্দ বিতর্কে ছাই। তোমার নিভুল। ছুটি।  
মনু খুলে রাখ। লে যায়। যার কিছু নেওয়া হে।  
কান খুলে দেওয়া হে।

কাজেই সেসময় চারটে লাইনের মধ্যেই পাচটি  
স্থলে বোঝা। অতএব খণ্ডন করতে হ’ল। কিন্তু  
শুধু অতএব খণ্ডন ব’লেই—আমার আপত্তি নয়।  
আমার প্রধান আপত্তি এই জন্তে যে, এভাবে—চার-  
দুয়ের কদমে—এছন্দকে পড়লে এর স্বরপট ও রসটি  
বোঝাই যায় না—স্বর-সম্পত্তির দিক দিয়ে এ-ও  
স্বরমাত্রিকটির মতন তিন স্বরেরই কদমে রচিত ব’লে।



আমি মানি আমার শেষের দৃষ্টান্তটির ছন্দ খুব সুশ্রাব্য নয়; তার কারণ, এতে আমি অত্যন্ত সজ্ঞা ভাবে স্বরমাত্রিককে ও মাত্রাবৃত্তকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা পেয়েছি—অনেকটা extreme point এ যাবার জল্পেই। কিন্তু এছন্দকে যিৎস্রলঙ্গল সহজেই সাবলীল করেছেন জিনের মুতাগতি দিয়ে। দ্রষ্টব্য এই যে, তাতে অনেক স্থলেই আগেকার যুগের জিনের কদম অক্ষরবৃত্তের আমেজ এসে গেছে যথা : (ভক্ত কবিতা) ক্ষিত্ত কবিরাজ আঙ্ক বিনা অগ্রহাস্য বিনা ছন্দের কোনো। হারিয়ে যে কাব্য করেছ। রচনা নাহি তা। সমগ্র এ বঙ্গ। নাহিতাঃ হেমচন্দ্রের “কহিল কৃতান্ত। ভাকি অহুচরে”..... “হিরণ্যম্যোতি। বার” ধরণের পাক্তির সঙ্গে এর ক্বিত্যর লাইনের তুলনা করলেই একথা প্রতীয়মান হবে। হেমচন্দ্রের ও জিনের ছন্দের সঙ্গে যিৎস্রলঙ্গলের জিনের ছন্দের তফাৎ এই যে, হেমচন্দ্রের ব্যাটী (unit) ছিল হরফ (রবীন্দ্রনাথ একথা শুনে ফের রাগ করবেন জানি—তবুও একথা সত্য যে, সে-আমলে এসব জিনের ছন্দ হরফ-ব্যাটী ছিল ব’লেই লোকে এছন্দের ভারী চাল বরদাস্ত করত) যেখানে যিৎস্রলঙ্গলের ব্যাটী হচ্ছে স্বর বা সিলেবল—“কিন্ত কবিরাজ” ও “বিনা

ছন্দের কোনো” পক্ষী ছুটির দিকে তাকালেই একথা বোঝা যাবে। স্বতরাং আমার প্রতিপাত্য এই যে, এছন্দ হচ্ছে সাবেক আমলের জিনের কদমে রচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই স্বরবৃত্ত তর্জমা অথবা এ-আমলের ঋতাজপনিক মাত্রাবৃত্তের স্বরবৃত্ত প্রতিরূপ। এক কথায় জিনের কদমই এর চাল, ঈদংবৃত্ত প্রকৃতির বিচার এতে প্রাসঙ্গিকই নয়—অব্যস্ত।

তবে বলেছি এ গৌণ বিচার। তবু এ-তর্ক ভুলেছেন ব’লেই যাহোক ছুটো কথা শুঁড়িয়ে বলার চেষ্টা পেলাম। হস্ত মতে মিলবে না। না মিলুক। তবু আপনি ছান্দসিক হিসেবে আমাদের কাছে চিরদিনই নমস্ত থাকবেন বিশেষ ভাবে যৌগিক ছন্দের গণনা-পদ্ধতি, সত্যেন্দ্রনাথের পরমাত্রিক ছন্দের তফাৎ ও যিৎস্রলঙ্গলের যৌগিকী-স্বরবৃত্ত ছন্দের রহস্তটি বুঝিয়ে দেবার জল্পে। একাজ এক আপনিই করতে পারতেন। নেপোলিয়ন বলতেন না—Generals are born, not made? Generals কথাটির জায়গায় prosodists কথাটি বসিয়ে দিতে চাই আমি।

ইতি—

গুণধ্বজ

শ্রীদিলীপকুমার রায়



## ভূদেব মুনোপাশ্র্যাক্ষের তাৎপ্রকাশিত রচনা

### শিষ্টাচার\*

বিস্ত বহুবর্ষ্য: কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।

এতানি মাজ্জহানানি গরীয়ে বধ্যহন্তরম্॥

মহ ২য় অধ্যায়—১৩৬ শ্লোক।

বিদ্যা, কর্ম, বসস, বংশ, ধন অল্পদ্বারে সন্ধান ও সমাদরের ন্যূনাদিকা হইয়া থাকে, যথাযোগ্য সমাদরের সহিত অভ্যর্থনাদিই শিষ্টাচারের প্রধান অঙ্গ।

শিষ্টাচার ক্রীপুরুষভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ক্রীলোক, ভক্তিজাজনই ইউন, সমানার্বাই ইউন, আর বেধোপদই ইউন তাঁহার মূহতা ও অসহায়ত্বের কথা মনে থাকায় সমাবশ্য পুরুষ হইতে তাঁহার প্রতি আচারের প্রভেদ ঘটয়া উঠে।

### শিষ্টাচার প্রদর্শনের বিশিষ্ট পাত্র

- (১) দেববৎ পূজনীয় বা পরম পূজনীয়বর্ণ—
- (২) সামাজ্যতঃ পূজনীয়বর্ণ—
- (৩) মাতৃবর্ণ—
- (৪) সমকক্ষবর্ণ—
- (৫) বেধোপদবর্ণ—
- (৬) অগ্রগৃহাঙ্কাজীবর্ণ—(দয়ার পাত্র)
- (৭) অজ্ঞাতকুলীন অতিথি ও বাচকবর্ণ  
(ওদাত্তান্তের পাত্র)
- (৮) প্রতিবেশীবর্ণ—(উপকার পাত্র)

সামান্যবৃত্ত:

\* পারিবারিক, আচার ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রকৃতির জায় একখানি শিষ্টাচার প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা। ভূদেব বাবুর চিত্রে উদিত হইয়াছিল; এ সম্বন্ধে কতকগুলি ‘নোট’ মাত্র তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কয়েকটি অবশ্যই প্রবন্ধের খন্ডা অবশ্যই উৎসবের সজ্জা পাইয়াছি। উৎসবের পাঠকবর্ণ সেই সর্ববিদ্যেশ্বরী মহাত্মার হস্তা দৃষ্ট এ সামাজ্য ‘নোট’গুলির জিন্মা দ্বিগুণ দেখিতে পাইবেন, তাহার হুইটী নির্বন, পতিগরী ও পিতাপুত্রের সম্বন্ধের অর্থাৎ নিখিষ্ট রহিয়াছে।

সম্পাদক—উদয়ন

১। পরম পূজনীয়বর্ণ—

পুরুষগণ—পিতা, পিতামহ, মাতামহ, আচার্য্য,

লীলাঙ্ক প্রভৃতি।

ক্রীপণ—মাতা, পিতামহী, মাতামহী, আচার্য্যা ও

গুরুপত্নী প্রভৃতি।

২। পূজনীয়বর্ণ—

পুরুষগণ—পিতৃব্য, মাকুল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বস্তর

ইত্যাদি স্বজন, স্বদেশীয় বিদেশীয় ভ্রাতৃশ্ব-

পতিভ, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী লোক, বোণী,

সন্ন্যাসী, পিতৃদিগর সখা প্রভৃতি।

ক্রীপণ—পিতৃব্যপত্নী, মাকুলদা, পিতৃহৃদা, অগ্রজ-

পত্নী, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রভৃতি।

৩। মাতৃবর্ণ—

পুরুষগণ—রাষ্ট্রা, রাজপুরুষ, ভূমাদিকারী, স্বদেশীয়

ও বিদেশীয় ধন্ত..... (লোকায় কাটা)

ক্রীপণ—রাজমহিষী প্রভৃতি.....

৪। সমকক্ষবর্ণ—

পুরুষগণ—সমবয়স্ক ভ্রাতা, সহাধ্যায়ী, সহকর্মী,

সমবয়স্কী, সমবয়স্ক শ্রমিক ও তাদৃশ

জাতি ইত্যাদি—

ক্রীপণ—অশ্বলে ক্রীকে ধরা মাইতে পারে না,

কারণ তাঁহার প্রতি আচার নির্দেশ করা

অসম্ভব। তিনি সমকক্ষ, বেধোপদ, আশ্রিতা

এবং আশ্রয়প্রার্থী। ফলতঃ সামাজ্যতঃ

সম্বন্ধে ও বয়সে সমাবশ্য ক্রীপণই ইহার

অন্তর্ভুক্ত।

৫। বেধোপদবর্ণ—

পুরুষগণ—গুরু, ভ্রাতৃপুত্র, ছাত্র, শিষ্য প্রভৃতি

এবং সখ্য, বিদ্যা ও বনাদিতে বিশেষ শ্রেষ্ঠ

না হইলে বয়ঃকনিষ্ঠ সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত।



দ্রীণ — কড়া, কনিষ্ঠা ভগিনী, কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবৎ,  
ভ্রাতৃপুত্রী, ভাগিনেরী, গুরুবৎ, প্রতিবেশী-  
দিশের কড়াগি—

৬। অমুগ্রহাকাজী ও আশ্রিতবর্ণ—

পুরুষগণ — এজা, ভূতা, রজত, নাপিত, গোপ,  
ভৈলিক, মালিক প্রভৃতি যাহারা গৃহস্থের  
নিজা ব্যবহার্য্য ব্যবাদি নিয়মিত রূপে দান  
করে।

দ্রীণ — দানী প্রভৃতি—

৭। অতিথি ও যাতকবর্ণ—

স্বদেশীয় বিদেশীয়ভেদে পূর্ন্যাবস্থাজেদে যাতক-  
দিশের প্রতি আচার বিভিন্ন। দ্রীপুরুষভেদেও  
যে বিভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য।

৮। প্রতিবেশীবর্ণ—

ধন, বিজ্ঞা, বয়স, বংশ, নৈকট্য প্রভৃতি  
বিবেচনায় আচারও বিভিন্ন হয়।  
রাজ্যকে মাজবর্ণের অন্তর্গত বিবেচনা করা হইল,  
কিন্তু পূর্বকালে এদেশে রাজা দেববৎ পূজনীয় ছিলেন।  
পিতা পুত্র প্রভৃতির শিষ্টাচার বিধ বিবেচনা  
কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে মাত্র। গৃহের অভ্যন্তরে ইহারা  
পরস্পরের আশ্রিত আশ্রয়ণীয় মিত্র এবং সং-  
পরমর্শদাতা—

(অদম্যপ)

মূলতঃ শিষ্টাচার শব্দের অর্থ অতি দূরগামী; শিষ্ট-  
শব্দে বশিষ্ঠ প্রভৃতি যে সমুদ্রি এবং তথাবিধ ব্যক্তিগণ  
পৃথিবীর প্রথমকালেও অবশিষ্ট থাকিবেন বলিয়া উক্ত  
হইয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝায়; স্বতরাং প্রকৃত প্রভাবে  
আত্মশ মহাত্মবনিসের আচারকে শিষ্টাচার বলিতে হয়।  
তাহা হইলেও শ্রুতি স্মৃতি বিহিত সমুদ্র শাস্ত্রাচারও

ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। এই সমুদ্র শিষ্টাচার  
শব্দের শাস্ত্রীয় মূখ্যার্থ ভাগ করিয়া ইহার উল্লিখিত  
লোকপ্রসিদ্ধ গোবর্ধাই লওয়া হইয়াছে। স্বপরিণামে  
শাস্ত্রাদিতেও শিষ্টাচার শব্দের এই গোবর্ধাই গ্রহীত  
হইয়াছে। নিম্নোক্ত মহাভারতীয় লোক শিষ্টের লক্ষণ  
বলা হইয়াছে—

ন পাবিপাদচপলো নাজচপলো মুনিঃ—  
ন বাসচপলঃ ইতি শিষ্টস্ত লক্ষণম্ ॥

(ভূদেববাবুর একখানি পত্র)

২৬শে ফেব্রু-  
নারী

পোবিন্!—

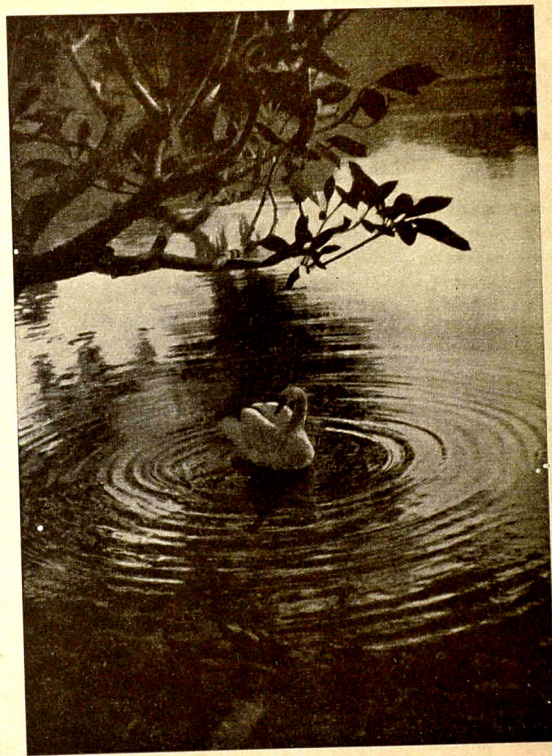
কল্য বৈকালে এমন একটি কাজ করিয়াছিলাম  
যাহা ইহজন্মের মধ্যে কখন করা হয় নাই।—ঘোড়া  
চড়িয়াছিলাম—পড়িয়া যাই নাই!—প্রথমে শরীর এবং  
মাথা একবার কেমন কেমন করিয়াছিল, ছাপাখানায়  
ধাড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ হৃদয় উপস্থিত হইলে ঠিক  
ঐরূপ হয়! কিন্তু ঐ ভাব শীঘ্রই মারিা গেল এবং যদিও  
আগনে জ্বোর পাইলাম না, তথাপি বোধ হইল যেন  
ঘোড়া দৌড়িলেও পড়িয়া যাইব না। কিন্তু লাগামটা  
এক হাতে ধরিতে পারি নাই—যে পর্য্যন্ত তাহা না  
শিথিতেছি সে পর্য্যন্ত শান্ত ভাবেই থাকিব।—বলিও  
শরীর ভাল না থাকিলে বুড়া বয়সে ঘোড়া চড়িবার ইচ্ছা  
হইতে পারে না।

তত্ভাষী

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

০ দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দসেব মুখোপাধ্যায়

উদয়ন — আশ্বিন, ১৩৪০



আলো ও ছায়া

শিল্পী — শ্রীশিবসদাশ বহু

[ 'উদয়ন'র আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ]



## সাড়ে চার আনা

শ্রীকালিদাস রায়

চলে কান্দালিনী নারী শিরে বহি পশরার ভার  
ছেটখাট পণ্যে ভরা, বোমটায় ঢাকা মুখ তার ;  
আগে আগে চলিয়াছে—হাতে ক'টি কাচের গেলাস—  
দশ বছরের মেয়ে শুধু মুখ ছিন্ন তার বাস,—  
চাঁৎকারিয়া চলিয়াছে—সাড়ে চার আনা, সাড়ে চার—  
প্রতি বাড়ীটির পানে ফুকরিয়া উঠে একবার ।  
ভিক্ষারে দিকার দিয়া সপোরবে উঠে অই বাগী  
দুধারের গৃহে গৃহে লজ্জা পায় দাসত্বের ধানি ।

একি স্বর ! একি স্বর ! আছে ধ্বনি নাই তায় মন  
বারবার যন্ত্র হ'তে নিগলিত গীতের মতন,  
চকিত শঙ্কিত তবু । সারা পল্লী কাঁপায় তা ছুটে,  
কণ্ঠ পেয়ে সারা পথ ব্যাধায় ফুকরি যেন উঠে  
তার বহুদিনকার ভুলে-বাওয়া ফিরে-পাওয়া স্বরে,  
সায়াক্ষের রাস্তা বায়ে কেঁপে কেঁপে সে স্বর বিহরে ।  
খুলে যায় দুই পাশে গৃহে গৃহে দ্বার বাতায়ন,  
নয়নে উৎস্রক করে, স্বরমুগ্ধ বিস্মিত শ্রবণ  
শুনি সে অপূর্ব গীতি । মোর চিত্তে চিন্তা করে ভিড়  
অজানা অস্বস্তি বোর প্রাণ মোর করিল অস্থির ।  
বাঁধা বুলি পেয়ে যায় শূন্যদৃষ্টি অগ্নমনা মেয়ে  
প্রাণের নিভৃত ব্যথা কণ্ঠপথে ফাঁকটুকু পেয়ে  
উজ্জ্বল উদ্বেল হয়—পরিণত করে হাহাকারে  
পথ-বেসতির সেই সাধারণ অভ্যস্ত চাঁৎকারে ।



পিতৃবীনতার ব্যথা,—অশরণা মায়ের বেদনা,  
দারুণ ভটরজ্বালা, রোগশোক, লাঞ্ছনা, গল্পনা,  
প্রবলের উৎপীড়ন,—মনে হলো আরও কত ব্যথা  
দিয়াছে ও কতবারে তীক্ষ্ণ হ্র, কারুণ্যঘনতা।  
একটু মমতা যেন ভিক্রা মাগে ও হ্র করণ।  
অন্ধ ভিত্তারী গান এর চেয়ে নয় নিদারুণ।  
ভাবিলাম কিনি কিছু,—বুঝিলাম ক্ষীণতর হ্রের  
পথে নামি,—হুইজনে চলে গেছে দূরে—বহু দূরে।

এমনি করিয়া কত করুণাখী হৃদয়-দুয়ারে  
করাঘাত করি যায় নিরাশায় ফিরে বারে বারে।  
আমরা তন্ময় থাকি, ব্যথিতের কাতর ক্রন্দনে  
মাধুর্যের আবিষ্কারে, সূক্ষ্ম দ্রুততত্ত্ব বিশ্লেষণে।



জীবনটাকে মুক্ত জানিয়া শুধু লজ্জাই চণিয়াছি!  
দারিদ্র্য, ভীষণ দারিদ্র্য—অভাব আর অহুবেগ! এ-  
সবের সঙ্গে মাহুকে এত লড়াও লজ্জিতে হয়! পদে-পদে  
পরাজয়, তবু জীবন স্বরিয়া পড়ে না—ইহার চেয়ে  
বিস্বয়ের ব্যাপার ছুনিয়ায় আর কি আছে?

ছেলেবেলা হইতে মনে কেবলি 'উচ্চ-আশা-তর'  
রোপণ করিয়া আসিতেছি! দিকে দিকে যে আনন্দ,  
ঐশ্বর্যের যে প্রাচুর্য ... তার একটি কথা আজও  
আয়ত্ত করিতে পারিলাম না! তবু এ-লড়াইর যেমন  
বিরাম নাই, আশার বিদ্যুৎও তেমনি সে-অভাবের  
কালো মেঘ চিরিয়া আজও চমক দিতে ছাড়ে না!

শিখি, শুধু শিখি—গল্প আর উপভাস। লোক  
বলে, লেখাটা আমার আসে ভালো। কল্পনার ভূমিতে  
যে-সব নর-নারীর ছবি আঁকি, বাস্তবের সঙ্গে তাদের  
মিল তেমন না থাকুক, সে-ছবি লোকের ভালো লাগে!  
কিন্তু ঐ পরিচয়টুকু ... এ ভালো লাগাইবার ক্ষমতা  
খাটিয়া যে সারা হইতেছে, কি করিয়া তার দিন  
চলে, সেদিকে কেহ কিরিয়া চায় না—এমনি সকলে  
উদাসীন!

ভাঙ্গা স্নায়ুসেতে দেশ। সেই মেশের একটা ঘরে  
পড়িয়া আছি। ভাড়া কখনো দিই, কখনো দিতে  
পারি না। যখন দিতে পারি না, তখন ভাড়া খাই!  
ভাড়া বাইয়া কাগজের বাড়িল গুলিয়া বসি,—বসিয়া  
আট-দশ-বারো-বোল পুঠা ভরিয়া করিয়া গল্প শিখি,  
শিখিয়া মালিক পত্রের দ্বারস্থ হই। আমার লেখার  
এতি তাদের মাথা আছে, বিরাম নাই—জানি।  
যেহেতু পাঁচজন পাঠক আমার লেখা চায়! কিন্তু  
কাগজওয়ালা গম্ভীর মুখে বলে,—আবার গল্প!  
কাগজে আশা কৈ?

আমার বুক ধক্ক করিয়া ওঠে। কাগজে একটু  
ভায়া করিয়া না দিলে আমার মাথা ওজিবার

## নাৎকল

### ক্রীসারীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আশ্রয়টুকু যে খসিয়া যায়! মিনতিতে কণ্ঠ ভরিয়া  
মুহুরে বলি—যা হয়, দেবেন। একটা লিখেছিলাম ...

কাগজওয়ালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে!  
দীর্ঘ-শ্বাসের বোঝার আমার বুক ভরিয়া ওঠে।  
নিরুপায় আত্মের কণ্ঠে বলি—নেহাও ফিরে বাবা?  
আমার বড় অভাব!

কাগজওয়ালায় মুখের পানে তাকাই। মুখ তার  
আরো গম্ভীর! টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া গুলিয়া গুলিয়া  
সাতটা না আটটা টাকা জুলিয়া আরো গম্ভীর মুখে  
সে বলে—গল্পটা রেখে তরে এই নিয়ে যান!

হায়রে, পুরা দশটা টাকাও নয়! কিন্তু উপায় কি?  
সেই সাত-আট টাকাই লক্ষ টাকার মত বড় রকমের  
বাঁখিয়া মেশে ফিরি। টাকা তিনেক কাছে রাখিয়া  
পাঁচটা টাকা বাড়ীওয়ালাকে ফেলিয়া দিই, কাতর  
মুখে বলি—এই পাঁচ টাকা রাখো, তাই! তারপর  
এবার যে উপভাসখানা দেঁদেটি ... 'শ'খানেক টাকা  
কপি-রাইটের দ্বিত পাবোই, আশা আছে!

সেই আশা! ছুরাশার পাহাড়ে চড়িয়া আবার  
শেষে নিরাশার গল্লরে গড়াইয়া পড়ি!

চৈত্র মাসের দিকে আর পূজার মরওমে ছুঁচার  
টাকা হাতে আসিয়া ঠেকে। কাগজ-কাগজে তখন  
যেন বাচ-বেলায় বাড়ি! দিকে-দিকে মহৎ ব্যক্তি  
থাকে! বাঁধা রোশুনাইয়ের ব্যবস্থা! 'দীর্ঘতাতা ভূজাতা'  
রব! উহারই মধ্যে পাঁচ-সাতখানা কাগজে তখন  
একটু চড়া-দরে গল্প বিকায়!

সম্ভ্রান্ত হুঁ-একজন নতুন প্রকাশক উপভাসের দ্বিত  
আসিয়া তাগিদ দেয়। এ-পথে তারা নতুন পথিক,  
একেবারে আমাদের মারিবার চেষ্টা করে না; কাজেই  
যাহাতে বাঁচি, বাঁচিয়া শতা নামে তাদের ছুঁচারিখানা  
নভেল জোগাইতে পারি, সেদিকে লক্ষ্য আছে!



বিনয়-বচন ও পরমা তারা দেয়! 'দে-সব কাগজ' বা বইগুলি বাজী-ঘর বানাইয়াছে, বুকো তারা পাঠাচ্ছেদের মত মস্ত পামর লইয়া বসিয়া আছে—গলে না, টলে না! তাদের রক্ত-মাস বেচিয়া পরমা করিতেছে, তারা বাঁচিবে কি বাইরা, সৈনিক লক্ষ্য নাই—যেন পাখ্য-সেউলের দেবতা! পায় মাথা কুটিয়া মরিলেও এক ডিল বিভ্রিত হয় না! তাদের চোখের সামনে নিভা কত নব-নব লোক আসিচ্ছে, বাইরে—সেই সৈনিক নব্বুর গিতে গেলে তাদের বাবসা চলে না!

এক-একবার মনে হয়, হাওয়ার পাঠক-পাঠিকাদের ডাকিয়া বলি,—বরি কেহ তোমাদের আনন্দ দিয়া থাকে, বা আনন্দ দিবার ভ্রত লইয়া থাকে তো সে এই আমরা, আমরা! .... তোমরা জানো না, ভালো বাঁধাই, ভালো ছাপা ঐ বইগুলির পাতার-পাতার আমাদের প্রাণের কতখানি আমরা ঢালিয়া দিই! না বাইরা, না পরিয়া, পাণ্ডনারদের লাঞ্ছনা, প্রকাশকের দারুণ অবহেলা সহিয়া যে-প্রাণ প্রতিক্ষেপ ছিঁড়িয়া বাইতেছে, সেই প্রাণকেই কোনেমেতে গুছাইয়া তুলিয়া বইয়ের পাতায় ধরিয়া দিই! আমাদের প্রাণ বেচিয়া দোস্তার উপর উঠারা ভেতলা বাজী তুলিতেছে, আর আমাদের বাজীগুলি স্নায়ুসম্মত মেশের ভাপুনা অঙ্ককার ঘর হইতে বাড় ধরিয়া দিনে তেত্রিশবার আমাদের পথে বাহির করিয়া দিবার জ্ঞ হওয়ার ছাটিতেছে!—ইহার প্রতিকার তোমরা করিবে না? যাহাতে এই সব 'শাইলকের' হাত হইতে আমরা নিস্তার পাই!

কিন্তু কথা কখন! বুধা এ আন্দোল! পাঠক-পাঠিকারা বইয়ের সন্ধান রাখে! সে-বই যে লেখে, তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? এত সন্ধান রাখিতে গেলে চলে না—জীবন বড় ক্ষুদ্র, ক্লমিক, অবসর বড় অল্প! .... থাকিয়া থাকিয়া মন যেন আক্রোশে জ্বলিতে থাকে! যদি সে-উপায় থাকিত! হয়তো বিরাট অগ্নি-নাগে জ্বলিয়া 'বিশ্ববিদ্যার' মত গ্রন্থটিকে দগ্ধ করিয়া হাইয়ের নীচে ঢালা বিতাম! তার এক বেদ-দগ্ধ জন্মের মত ঢাকা পড়িয়া যাইত!

আবার সেই পুঙ্খার মরত্তম! ছুঁচাটিটা গল্প লিখিতে পারিলে হাতে কিছু পয়সা আসিবে—সে পয়সার চৈত্র মাস পর্যন্ত মোটা অভাবগুণা .... ঘরে আম-কাঠের ছোট তক্তাপোষে বসিয়া গল্প লিখিতেছি। কামরার অপর সাথী যামিনী ইনসিগুরেন্স অফিসের কেরানী। সন্ধ্যার একটা টিউনির জোপাড় করিয়াছে—সেই টিউনি-চাকরি রাখিতে গিয়াছে! এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এক প্রৌঢ় ভক্তলোক। তাঁর গায়ে গরদের কোট, হাতে মোটা লাঠি। মাথার চুল সাধা। চেহারাখানি বেশ বয়সিয়া পোছেব।

তখন সন্ধ্যা স্নেহ-হয়। আমার তক্তাপোষের পাশে ছোট জানলা। সেই জানলা দিয়া আলোর যে রশ্মিটুকু তখনো ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই আলোর লেখা চলিতেছিল। অভ্যাস! আঁধারের জীব—আঁধারেও কলম চলে! আলোর জ্ঞ পয়সা লাগে। সে-পয়সা কে দিবে? কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সপ্তম দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিলাম। নূতন কোনো পাঠ্যপাঠ্য না কি? প্রাণে আশার স্বল্পক...

ভক্তলোক কহিলেন—এই বাজীই তো "আরাম-নিবাস" মেশ-৫২ নম্বর বাজী?

কহিলাম—হ্যাঁ। বহুন।

ভক্তলোক চাখিবারে চাহিলেন,—এইটেই না দোস্তার পটম-কিম্বদের ঘর?

কহিলাম—হ্যাঁ।

ভক্তলোক কহিলেন—এই ঘরেই আমাদের অনাদি থাকে?

অনাদি! কি জানি, কি মনে হইল, খালি তক্তাপোষের পানে তাকাইয়া কহিলাম—হ্যাঁ।

ভক্তলোক কহিলেন—আমি তার শব্দর।

কহিলাম—ও।

ভক্তলোক কহিলেন—অনাদি তো বই লিখেই চালাচ্ছে। 'অজ' কোন চাকরি-বাকরি করে না?

চুপ করিয়া পরিচিত রাষ্ট্রাটুহর উপর চোখ বুলাইয়া

লইলাম! অনাদি? লেখক অনাদি? ও! বুঝিলাম, ইনি অনাদি চাটুয্যের কথা বলিতেছেন!

টিক—এই মেশের এই কামরাত্তই তিনি থাকিতেন। হঠাৎ তাঁর উপভাসগুলার কাঁটটি বাড়িয়া বাগ্গার অবস্থা কিরিয়াছে .... তাই কোথায় আলো! এক-তলা একটা বাসা লইয়াছেন!

ভক্তলোক ক্ষণক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশাস ফেলিয়া কহিলেন—সে-স্ট্রীলোকটা এখনো সঙ্গে আছে?

রক্ত নিশাসে বসিয়া রহিলাম! স্ট্রীলোক? ভক্তলোক আবার একটা নিশাস ফেলিলেন, কহিলেন—রাফেল! অথক কি তার অতাব ছিল? কিছু না! শব্দর-বাড়ীতে বাবুর পোখালো না! জনৈতি, স্ট্রীলোকটা তারই কোন আত্মীরে বিধবা স্ট্রী! অল্প বয়সে বিধবা হয়—তারপর শব্দর-বাড়ীতে নানা অত্যাচার—বাবাজীর মমতা হ'লো—তাকে আশ্রয় দিলেন। তারপর থেকেই...

ভক্তলোক খামিলেন; পরে নিশাস ফেলিয়া কহিলেন,—মেয়েটা আমার ভারী দুঃখ পাচ্ছে! রাফেল এত বই লেখে,—আমি পড়িনি—তবে জনৈতি, মন্দ লেখে না! সে-সব লেখার নারীর বাখায় ভারী দরদ জানায়! অথক নিজের স্ট্রী, বাখার পানে চাইতে জানে না! রাফেল! তা, মেয়ে আমার বুঝ ভালো, সেই স্বামীর ধ্যানে তন্ময়! ওর লেখা বইগুলো পরমা দিয়ে কেনে! একখানা নয়—ত্রিশ-চরিত্রখানা করে! কিনে জানাওনা যে বেথানে আছে, তাদের বিলায়। স্বামীর ব্যাতি রটবার জ্ঞ! কহিলাম,—বুঝিবে-স্বাক্ষরে তাই তাকে

আমি হইলাম,—বুঝিবে-স্বাক্ষরে তাই তাকে বাজী নিয়ে যাবেন বুঝি?

ভক্তলোক কহিলেন—না! সে-স্ট্রীলোকটাকে সে ছাড়তে পারবে না—স্পষ্ট বলচে! একটু লক্ষ্য হ'লো না! লিখেছিল—তার স্ট্রীর চেয়ে সে কোন্ অংশে নীচু নয়। বখন তাকে আশ্রয় দিচ্ছে, তখন ছাড়তে

পারবে না! সে তার জীবনের আশা, উৎসাহ, কল্পনার উৎস ... এমনি নানা কথা ... রাফেল!

আমার বুক কাঁপিতেছিল। পাশের তক্তাপোষে থাকে যামিনী—অনাদি বাবু নয় ... যদি আসে? ধরা পড়িয়া যাইব!

তবু লেখক অনাদির জীবনের এই রহস্যটুকুই অপূর্ণ। ইহা হইতে বেশ একটা গল্প বানানো যায়! সে-গল্প লিখিলে পকেট ছ'পয়সা আসিবে। অনাদি, সেই নাম-না-জানা বিধবা নারী এবং এই শব্দর, আর গৃহকোণ-বাসিনী অনাদির বেদনাতী পত্নী! শব্দরবার কোঁহুল বাড়িয়া চলিয়াছিল। কহিলাম—তা, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা ...?

বাধা দিয়া ভক্তলোক কহিলেন—ঐ মেয়ের জ্ঞ! আমার ঐ এক মেয়ে। চার-পাঁচটি গিয়ে এই একটিতে ঠেকেতে! তা মেয়েকে দেখলে কে বলবে, তার বুক এত বাধা! না আমার হানি-সুখই আছে! ... পুছো আসতে, কদিন খ'রে মেয়ে বায়না নিয়েচে—তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাবা, তিনি বড় দুঃখে আছেন! তার উপর আমার হান্সামা এই, সে-স্ট্রীলোকটার একটা ছেলে হয়েছে। তারা এখনো নিশ্চয় থাকে না! তোমরা থাকতে দিতে রাজি হবে কেন?

আমি কহিলাম—না, তারা আলো থাকে।

এখানে তাদের আনন্দও না কখনো! ভক্তলোক কহিলেন,—হঁ! কাণ্ডজ্ঞানটুকু একদম লোপ পায়নি! তা কি করবে, মেয়ের কথায় আসতে হ'লো! এখানে আমার আসা পোষার না বাপ! তার সঙ্গে দেখা হ'লো না, ভালই হ'লো! হুঁদিনি আগে আসতে-আসতে পিছিয়ে গেছি! তাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে কতখানি দুঃসাধ্য, বোঝো তো!

কহিলাম—বুঝি বৈ কি।

—তা...যামিনী ভক্তলোক পকেট হইতে বড় একটা 'পাশ' বাহির করিয়া তাহার মন হইতে একতাক্তা নাট তুলিয়া কহিলেন—একশো টাকা আছে। মেয়ের ইচ্ছা ... তাই দিয়ে বাচ্ছি! তুমিই রাখো।



সে এলে তাকে মিলে। যদি কিজ্জাসা করে, ব'লো, তার এক ভক্ত পাঠক প্রণামী দিয়ে গেছে!... মেয়ে এই কথাই বলতে বলতে!... আর যদি অভাবে পড়তে, তুমি যুঁজতে পারো, আমাকে জানিয়ে— আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবে। মেয়ে বলে, সে রাঙ্ক-এখনি ভোগ করচে, আর তার স্বামী...

ভুল্লোকের পর গাঢ় হইয়া আসিল। কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া তিনি কহিলেন—এমন জ্বর দাম বৃদ্ধো না! নেহাৎ রাঙ্কেল!... হ্যাঁ, আমার নামটা লিখে রাখো বাপু। চক্ষুকাণ্ড বন্দোপাধ্যায়, ৩৭ নম্বর বলজুর রোড, মাণিকতলা। ঠিক ঐ মাণিকতলার পোলের কাছে... চুপি চুপি বেয়ো।

টাকাটা ট্যাঁকে শুভ্রিয়া তাকাতাড়ি ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। কহিলাম,—ঠিকানা ঠিক খুঁজে বার করবে'ন!

তবু হইতেছিল—টিউশনি সারিয়া যামিনী যদি আসিয়া পড়ে?

ভুল্লোক কহিলেন—অন্যদির কাছে আমার নাম ক'রো না...! বাবুর আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে... মহাপুরুষ কি না! মহৎ কর্তব্য সাধন করছেন! স্বামী, শব্দর—সে-কর্তব্যের পথে তারা মহা ব্যথা!...তা হ'লে চলনুম। সে বাসার নেই, ভালোই হয়েছে। আমার ভাবনা ছিল...ব'লো—একজন পাঠক দিয়ে গেছে! না, না, ব'লো—পাঠিকা! নারীর উপর তাঁর ভারী সন্ধান, ভারী দরদ—টাকাটা তা হ'লে শিরোধার্য করতে তাঁর বাধেন না! শব্দর দিয়ে গেছে শুনলে হয়তো স্পর্শ করতে যুগা হবে!... রাঙ্কেল!

ভুল্লোক কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিদায় লইলেন। নীচেয় সরর অবধি তাঁর সঙ্গে গিয়া সন্ধান-প্রদর্শনে ক্রটি রাখিলাম না। পথে মোটর ছিল। তিনি মোটরে চড়িলে মোটর ছাড়িয়া দিল। আমিও নিখাস ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিলাম।

অন্ধকার বেশ বনাইয়া আসিয়াছে! নোটের

তাড়া বাহির করিয়া গুলিলাম... একশো টাকা...নগদ একশো!

একসঙ্গে একগুলা টাকা ঢকে কখনো দেখি নাই! ইহ-জন্মে হয়তো দেখিব না! বুকের মধ্যে যা' হইতেছিল—অনাদি চাটুযো, সেই নাম-না-জানা বিধবা নারী, অনাদির পরী!

মাথাকে মনে মনে নতি জানাইলাম।—ক'রো, এমনি করিয়াই নিজের কর্তব্য তুমি সাধন ক'রো! আর তুমি ঈশ্বর চক্ষুকাণ্ড বন্দোপাধ্যায়, বাঁচিয়া থাকো, রক্ত, দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল! তোমার মেয়ের আত্মার বাবিতে এমনি করিয়া অভাবগ্রস্ত জামাতাকে অর্থ-দানে...

বাবিরে জুতার শব্দ! নোটগুলা কাগজের তলায় চাপিয়া রাখিলাম। যামিনী ঘরে প্রবেশ করিল।... কহিল—অন্ধকারে ব'সে লিখচে?

কহিলাম—হ্যাঁ!...

—সে কি হে?

কহিলাম,—অন্ধকারে লেখকদের চোখ জলে!

—না জলে! তুস্ত-বিষয়-বর্তমানের এত গভীর তবু তারা কি ক'রে পেতো?

যামিনী হাসিল।...

রাতি প্রায় সাড়ে আটটা। গল্প লেখা হয় নাই, হইবে না! বেজস্ত লেখা—টাকা...তারা ভো পকেটে! যামিনী রুটান মানিয়া চলে; আহা! হিচকিইয়া অকিসের একতাড়া কাগজ পাড়িয়া বসিল। আমার মনের সামনে আলো-করা এক বিজিৎ পুরীর ছবি জাগিতেছিল—উৎসবে-আনন্দে সে পুরী অলঙ্কৃত করিতেছে!

ডাকিলাম—যামিনী...

—কেন?

—চলো, বায়োবোপো বাই—নর তো খিজেটারে।

চাঙোয়ার খাঙাবো...

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে যামিনী আমার পানে চাহিল।

আমি নোটের তাড়া দেখাইলাম,—কহিলাম—

দেখচো, একশো টাকা! লেখা প'ড়ে এক ভক্ত পাঠিকা পাঠিয়েছেন—প্রণামী!

যামিনীর হুই চোখ বিস্ময়িত! সে কহিল—ঐ 'দিব্যদ্রাতি গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি'র লোক দিয়ে গেল বৃষ্টি?

—না, না! আমার পরে তাঁর স্বামী! আনন্দের দারুণ মত্ততা! কহিলাম—ভক্ত পাঠিকার প্রণামী!—প্রণামী!

—হ্যাঁ। আমার জন্ম নয়! অনাদি চাটুযোর জন্ম। অনাদি চাটুযো... সে রাঙ্কেল স্বীকে তাগ ক'রে এক বিধবাকে নিয়ে অর্ধ-প্রণয়-মত্ত হ'য়ে আছে... আর তার সাক্ষী স্বামী! স্বামীর হৃৎ-অভাব যুগোবার জন্ম এ-টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ তার অসংঘর্ষে ইচ্ছা!... হায়রে, আমরা...? বাড়িতে বিধবা মা... ছোট অসহায় ভাই-বোন! তাদের অন্ন দেবার চেষ্টায় পাগল হ'য়ে বেড়াছি! এ-টাকা অনাদি চাটুযোকে আমি দেবো না। কেন দেবো? সে তো কোনো

হৃৎ-জানায়নি! এই অনাদি চাটুযো কেমন লোক, জানি না—তবে তার স্বামী? দেবী! এই দেবীর প্রসাদ আমিই গ্রহণ করবো। আমার বিপর সঙ্গার—নারিকাদের কথা শুধু কল্পনার জাগে—জীবনে কোনো নারিকা পেলুম না—পাবার নয়!—শুধু এ-টাকা কেন? অভাব হ'লে চক্ষুকাণ্ড বাবুর কাছে বাবো। অজ্ঞার? কিসের অজ্ঞার? এই চক্ষুকাণ্ড তার রাঙ্কেল জামাইয়ের অভাব না থাকলেও এত টাকা তাকে দিতে আসে, সে না চাইতে...! আর আমি? শুধু ঐ নিষ্ঠুর প্রকাশক আর কাগজওয়ালাদের জুতোয় ঠোকোর বাবো? তারা ঠকাচ্ছে—তা জেনেও অভাবে জর্জরিত থাকবো? না... যামিনী কহিল—কিন্তু...

—কিসের কিন্তু! কিন্তু নয়! এসো তুমি আমার সঙ্গে—চাঙোয়ার। তার পর এপ্পায়ার। আমোদ করতে চাই আমি... জয়ের আনন্দ! না, কোনো কথা শুনবো না। এসো, এসো তুমি!





## শ্রীহীনীতুম্বার চট্টোপাধ্যায়

বহু তিনক পূর্বে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার সোভাণ্য আমার ঘটয়াছিল। ৩০শ্রাব্দে দ্রুতিতে দুইজন বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হই। পথে কোকনাডা (কাকনাড) হইয়া মাদ্রাজ পহঁছাই। মাদ্রাজে এক গুজরাটী পণ্ডের প্রস্তুত বর্ণশালায় আমরা কয় দিন কাটাই, মাদ্রাজের দ্রব্য হানগুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া লই। তার পরে আমরা আরও দক্ষিণে ভ্রাবিড় বা তামিল দেশের বড় বড় তাঁর দেখিয়া রেলের লাইনে গেজে সেই কয়টা দেখিতে বাহির হই। কতক পথ মোটর-বাসে করিয়া বাই, কিন্তু আমাদের ভ্রমণ বেশীর ভাগই রেলের হয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্বত্র গিয়াছি—নানা কারণে কোনও অসুবিধা অনুভব করি নাই, তৃতীয় শ্রেণীতেও বাতীর অভাব ছিল; রাজ্যে গুমাইয়া যাইবার ব্যাঘাতও হয় নাই। এইরূপে প্রায় মাস খানেক ধরিয়া কাঞ্চীপুর, পল্লিভাণ্ড, মহাবলিপুর, পণ্ডিচেরী, চিদম্বরম, তাম্বোর, ত্রুবকোণম, মিচিনোপলি, মধুরা, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, জিব্রল্টর, কলকাতারী, এর্লুগুম, জিচ্চ ও উটাকামণ্ড—এই হানগুলি দেখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

বাংলাদেশে হইতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিমেরই টান অনুভব করিয়া থাকি, উত্তর-ভাটত তাহার সমগ্র প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি লইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের আকর্ষণ করিয়া থাকে। উত্তর-ভারতের যত তাঁর, যত প্রাচীন নগরী, রাজপুত ও মুসলমান যুগের যত কীর্তিকলাপ—এগুলির সঙ্গে আমরা যেন এক অশ্রুৎ যোগ অনুভব করি। কান্ধী, গয়া, অমোঘা, বিখ্যাতল, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, লখনৌ, আগরা, দিল্লী, জহপুর্; আবার হিমালয়ের পাদদেশে ও কোড়ামণ্ডো হরিদ্বার, লছমন্দোলা,

কোরান-বন্দরী, পণ্ডপতিনাথ। পাঞ্জাব ও রাজপুতানা, নেপাল ও কাশ্মীর, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এগুলি তো উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই অঙ্গরূপ। বাঙ্গালী যেন ঐ সব দেশে যাইবার জন্ত বুঝাইয়া থাকে; শিকিতি বা অশিকিতি, ধনী বা নিধন, সব শ্রেণীর বাঙ্গালীর কাছে তাঁর বা ভ্রমণ এই ছই উপলক্ষ লইয়া পশ্চিমের আশ্বান সর্বত্র আসিতেছে, বাঙ্গালীও বর্ধাশক্তি তাহার সাড়া দিতেছে। কিন্তু দক্ষিণদেশে তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক সম্পৎ, তাহার বিরাট মন্দিরাবলী এবং দেশের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ভুলত ভক্তি ও ভাবভক্তি লইয়া বিরাজমান। আমরা যেন সৌন্দর্যে নান্দীর টান অনুভব করি না। আমরা সাধারণতঃ ও দেবদর্শন উভয় উদ্দেশ্য লইয়া পুরীনাথ পর্যন্ত যাই বটে, কিন্তু তাহার দক্ষিণে বড় একটা যাইতে চাহি না। কোনও রকমে কতিং সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গিয়া, একটা বড় তাঁর দেখিয়া বা ছুইয়া আসিয়াছি বলিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বপ্রদ লাভ করি। কিন্তু খুঁটিনাটির সঙ্গে, অন্তরের আনন্দের সঙ্গে সবটাই উপভোগ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ-দর্শন যেন আমাদের ধাতো স্নেহে না।

আমরা তিনজন কিন্তু দক্ষিণদেশে অনেক কিছু পাইবার জন্ত গিয়াছিলাম,—দক্ষিণের ইতিহাস ও কীর্তিকাহিনী, সাহিত্য ও শিল্প—এগুলির সহিত আংশিক পরিচয় স্থাপন করিয়াই গিয়াছিলাম, দক্ষিণদেশ যেমনটা আছে তেমনটাই গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম; সেই জন্ত আমাদের ভ্রমণ যতদূর সার্থক হওয়া সম্ভব ততদূর সার্থক হইয়াছিল। আমরা আমাদের ভ্রমণটি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছিলাম। দক্ষিণের বিরাট প্রাণের সাড়া আমরা যেন পাইয়াছিলাম—কেবল দেশের

বিরাট মন্দিরগুলির মধ্যে নহে, রাস্তার ভাঁড়ের মধ্যে, সভাপতিমিত্তে ও পানের জলস্রাব, হোটেলের, ট্রেনের, স্টামের, সোকার হাটে সর্বত্র আমরা প্রাচীন ও আধুনিক ভ্রাবিড় জীবনের স্পন্দন যেন কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের সমীক্ষা ও রসোপভোগ অনেকখানি অসুখ্য থাকিত, যদি এই ভাবে ভ্রাবিড়দেশ-দর্শন আমাদের না ঘটিত। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণটিকে সমাধা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমাদের মনে হইল, ভারতের সনাতন আদ্যার এক অতি মনোহর ও বিশিষ্ট প্রকাশ আমাদের চক্ষের সামনে উপভাটিত হইয়া গেল। আমাদের মনে হইল, দক্ষিণভারত না দেখিয়া আসিলে আমাদের এই বিরাট দেশের সঙ্গে পরিচয় নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকে। ভ্রাবিড়দেশে এই ভ্রমণের স্মৃতি চিরকাল আমাদের চিত্তে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, এই স্মৃতি আমাদের মনকে অসুখ্য ভাবভক্তির দ্বারা সরস ও উন্নত করিয়া রাখিবে, —এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণ-দেশের জন্ত মনকে মোহাবিষ্ট ও আকুল করিবে।

সমস্ত ভ্রমণকাহিনী এখন দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিতে বসিব না। কি ভাবে আমরা চমিয়াছি কিরিয়াছি, ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধা কি ছিল, কি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কোথায় বা দক্ষিণের চিত্রস্তম প্রাণের পরিচয় পাইয়াছি—এসব কথা লইয়া দীর্ঘাবাহিক রূপে বলা চলে। কিন্তু সে কাজে এখন হাত দিব না। আমি আজ কেবল দক্ষিণভ্রমণ-কালে আমাদের চোখের সামনে দেশের জীবনপ্রবাহের মধ্যে উপলব্ধি একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিব। তাহা হইতে একটুকু দিয়া দক্ষিণের প্রাণের একটুকু পরিচয় মিলিবে।

ট্রেনে করিয়া চিদম্বরম হইতে তাম্বোর যাইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, আসাম-বেঙ্গল লাইনের মত ছোট লাইন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হইবে। গাড়ীতে ভীড় মন্দ নহে। সাধারণ লোকের ভীড়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রেণীর লোক

বেশী। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ট্রেন আসিতেছে, গাড়ী ছই চারি মিনিট থানিতেছে, লোক নামিতেছে উঠিতেছে। আমরা তিনজনই ছইটা জানালার ধারে বসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। সহযোগীরা মাঝে মাঝে কোচগুলির বসবাসী হইয়া আমাদের বাঙ্গালী চেহারার প্রতি তাকায়, কেহ কেহ ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে ছই একটা কথা কহিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করে। হিন্দী-জানা লোক নিতান্তই বিরল। চুপুপের গরমে আমাদের বাক্স বড়ই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল, আমরা আমাদের লক্ষ্যগুলির আশার টাইম-টেবল মিলাইয়া কেবল ট্রেনে থাটিতেছি, কখন তাড়াতাড়ি পহঁছিব। এমন সময়ে মাঝে কি একটা ট্রেনে আমাদের কামরা হইতে লোক নামিল, ও কতগুলি নূতন লোক উঠিল। যে বাহার হান করিয়া লইয়া বসিল—সেই লোক ও হুলুদে রসের গাড়ী-পরা, মাথা-খোলা, গায়ে হলুদ-মাখা, নাকে নাকছাঁবি তামিল ব্রাহ্মণসমূহ; সেই লোকের আকারে কাড় পড়া, হুহাতে সোনার বাল, মাথায় উড়ে-খোঁপা, কানে হীরার কানফুল, কল্লভংগ, গায়ে গায়ে জরীর পাড় চাদর মূল্যবান চেট্টা, সেই হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, বালি গা, মাথায় লাল কাপড়ের পাগড়ী; হাতে কুপ্তা, তামিল পল্লীবাণী। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন দেখিলাম একটা লোক জায়গা বুঝিয়া না লইয়া বা বসিবার চেষ্টা না করিয়া, কামরার দরজার সামনে যেখানে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই একটা বস্তুটা জুড়িয়া দিল। লোকটার চেহারায় হঠাৎ দৃষ্টিতে লক্ষণীয় কিছু ছিল না। বেঁটেগাটে, মাছটো, পরশের মতো খুঁটি লম্বীর ধরনে কাছা না দিয়া কেমনে জড়ানো, কাঁখে একখানা জরীপাড় চাদর, মাথার অর্ধেক অংশ কামানো, দাড়ীদৌক তিনচার দিন কামানো হয় নাই, কপালে বিভুক্তি, ছই কানে ছইটা বড় হীরার কানফুল জুলুজুল করিতেছে, গলায় একখানা সোনার হুণ, ছই হাতে সোনার নিচেটা বাল্য ছাচি; বালি পা, গায়ের রঙ বেশ কালো। বড় বড় সংস্কৃত



শবে ভরা। খুব মিষ্টগন্ধীর ধরণের তামিলে বেশ টানিয়া টানিয়া তাহার বজ্রবা বনিয়া বাইতেছে, যেন স্রব করিয়া কিছু পাঠ করিতেছে। এই চারটা সঙ্গত কথা কানে লাগিল—“দানম্—পুণ্যকর্ম্মং (মু দিয়া শ্রমটাকে তামিল করিয়া লওয়া হয়)”—দ্বন্দ্ব-রূপা—সেবপুজনম্—ধর্ম্মার্থকামমোটশব্দ” ইত্যাদি কথা যেন কানে লাগিল। ইহার বল্গতা শুনিয়া ভাল করিয়া ইহার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিলাম। লোকটার হাতে একটি জারমান-সিলভারের তৈয়ারী খট রহিয়াছে; খটটার গায়ে প্রচুর সিন্ধু কুহুম ও চন্দন লেপা, গরম ফুলের মালা ছড়ানো, এবং খটের একটি চাকনী আছে, সেটা খটের গায়ে সজে তালা দিয়া আঁটা। বজ্রতা শুনিয়া মনে হইল, লোকটা ভিক্ষা চাহিতেছে, সেবেসবার জন্ত ভিক্ষা বা চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। লোকটার রঙ কালো ও কাঁধে পইতা নাই, তাই বুঝা গেল যে, সে ব্রাহ্মণ নহে; কিন্তু প্রকৃতই সে কোন ট্রেনের কামরায় কামরায় ভিক্ষার জন্ত ঘুরিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। খানিকক্ষণ বজ্রতা দিবার পরে, আমাদের অহমানকে সত্য প্রমাণিত করিয়া সে হাতুনিধ্বিত খটটা ট্রেনের যাত্রীদের সামনে ধরিতে ধরিতে গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অঙ্গ প্রান্ত পর্যন্ত বাইবার জন্ত অগ্রসর হইল। করিডর-পাড়ী ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইল। যতক্ষণ সে বজ্রতা দিতেছিল, লক্ষ্য করিলাম, জতক্ষণ যাত্রীরা একই শ্রদ্ধানিশ্চিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বজ্রতা সমাপনান্তে পাজ লইয়া একে একে উপবিষ্ট যাত্রীদের সমক্ষে আগাইয়া দিতে লাগিল। বাহার সামনে আসিল, পুঙ্খ বা স্ত্রী নির্ধিংশে যে সে একটা কি ছইটা পয়সা কিংবা একটা আনী লইয়া চাকরীর মাধ্যম একটী ছেঁবা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া খটে কেগিয়া দিতে লাগিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিতেছিলাম, এবং তিনজনে বাঙ্গালী-হুলত অঙ্গদ্বার ভাবে বলাবলি করিতেছিলাম—“এই মন্দিরের বেশে সেখানে বজ্রতা বিরাট বিরাট মন্দির আর

মন্দিরের সেবার জন্ত তার উপযুক্ত জমীদারী আর অঙ্গ বন্দোবস্তের ছড়াছড়ি, সেখানে ঠাকুরপুত্রার খরকের জন্ত গরীব যাত্রীদের উপর এই ট্যাঙ্গ বসানো কেন বাবা”—ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ট্রেনের কতকগুলি যাত্রীর দান লইয়া খটহস্তে সে আমাদের সামনে উপস্থিত। পয়সা পড়িলে সে একটা আশীর্বাদনের মত তামিল বাক্য স্রব করিয়া বলিতেছে, কেহ কিছু না দিলেও সেরূপ অঙ্গ বাক্য বলিয়া প্রশান্তমুখে অঙ্গর বাইতেছে। আমাদের সামনে আসিতে হইল; আমরা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলাম, কিছু হইবে না—আমাদের মুখে যেন লেখা ছিল—“মাক করে বাবা।” বিস্ময় না করিয়া পাজ লইয়া অঙ্গ যাত্রীদের সামনে গিয়া খাড়া হইল।

ট্রেনে আমাদের পিছনকার বেরকে একটি তামিল সহযাত্রী ছিল। লোকটার সঙ্গে ছই একটি কথা হইয়াছিল, হিন্দীতে। অতি সাধারণ মাহুর সে। আমরা কি করি সে দেখিতেছিল। আমাদের মধ্যে বোধ হয় অশ্রদ্ধার ভাবটা একটু ফুটাই উঠিয়াছিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া বলিল—“মহারাজ, ইয়ে আদমী ক্যা বোলা আপ সমজা নেই?” আমি বলিলাম,—“নেহি। উ কোন্‌ হৈ? পূজাকে গুয়াতে ভীষ মাস্তা হৈ? ব্রাহ্মণ তো নেহি?” লোকটা বলিল—“নেহি মহারাজ, নেহি। উও এক বড়ডা চোট হৈ। তীন চার জগৎ নে উস্কা তীন চার গাদী হৈ। বহৎ রূপেয়া হৈ। কই লাখ রূপেয়া খরচ করকে এক মন্দির বনোয়েয়া। সব রূপেয়া আপ হী আপ দেখা। পর ভিইয়া (ভিক্ষা) কে ওয়াতে নিক্শা হৈ। সব আদমীয়ে এক পয়সা দো পয়সা লেগা, কলস ভরতী হো জায়গা, তব রূপেয়া পুরা করকে মন্দির বনায়গা। সব লোগকে দান ওর মদন সে মন্দিরক কাম পুরা করেগা। পুণ্য কামমে সব্‌ক সর্বক বনায়গা। ঐসা করুনা বহৎ আচ্ছা হৈ, ইদীসে সব কোই তেতা হৈ।”

ব্যাপারটা বুঝিলাম, চোখের সামনেকার পরদা এই ব্যাপারটির পিছনে যে কতখানি বিনয় ও দীনতাবোধ আছে, দেশের ও দেশের প্রতি কতটা সন্মাননা ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইল, এবং সর্বোপরি ইহাতে নিম্ন উপাত্তের প্রতি কতটা ভক্তিবোধ আছে, তাহা ভাবিয়া আমাদের চোখে জল আসিল। আমরা উঠিয়া গিয়া আমাদের যৎ-কিঞ্চিৎ ছই এক আনা দান সমাধানে পাত্রে মখে দিয়া আসিলাম, নিজেদের খুশ মনে করিলাম। হৃদয়ের অজ্ঞাতসারে এই কাজের সার্থকতার জন্ত এক প্রাণনা আমরা মনের গভীর অন্ততল হইতে জাগিয়া উঠিল, এবং এক অব্যক্ত আনন্দতা আসিয়া আমার প্রাণকে পূর্ণ করিল। মনে মনে আমি শব্দ-নারায়ণকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার পতাকা-বাহী ভূতা চোটিটকেও প্রণাম করিলাম। ইতিমধ্যে পরের ট্রেন আসিয়া গেল। আমাদের চোট পাড়ী হইতে নামিয়া গেলাম।





সোণালী রোদের চিকণ বাঁশিট নদীর কিনারে বাজে ।  
ওগো হৃন্দর ! কিশোর দেবতা ! এলে এ কি রাজসাজে ।  
ক্ষান্ত বরষা সরসা ধরার নবীন সবুজ বাস—  
ঝলকি' তুলেছে রঙীন আলোকে নিখিল নীলাকাশ ।  
কালো জলদের আর্দ্র বেদনা ধুমায়িত শোকভার  
ঝরিয়া পড়েনা ক্ষণে ক্ষণে আজ অঝোর ধারায় আর ।  
গগনে গগনে শুভ্রশিখিরে উৎসব সারাবেলা,  
কুন্দধবল মেঘশিশুদল দিগন্তে করে গেলা ।  
পুলকে উলসি' উঠেছে সরসী কমলের রূপরাগে,—  
হংসমিথুন-ভানাবিধুনে আগমনী কার জাগে ।  
উথলিত তনু উতলা নদীর শ্রামভীরে শ্রামাবাস,  
চুলায় চামর চপল পুলকে লীলাচকল কাশ ।  
কুবেরপুরীর কে গো হৃন্দরী কনক অঁচল পেতে  
সোণার অঙ্গ দিয়েছে এলায়ে সোণালী ধানের ক্ষেতে ।  
শিউলি এঁকেছে খেত আলিপনা সবুজ অঙিনাতেল,  
মল্লিকা দেছে মুকুতার হার কিশোর অতিথিগলে ।  
শেম কেতকীর স্বরভিবিধুর নুতন শিশির মাথা  
বিমল উষসি উত্তরী তার অরুণ কিরণ আঁকা ।  
দিয়াছে শুক্লানিশীথিনী তারে চন্দ্রতিলক ভালে ;  
রঙীন গোধূলি ভাণ্ডার খুলি অমৃত বর্ষজালে  
রচিয়া দিয়াছে তরুণ ছুপের রতন-সিংহাসন ।  
সহসা গভীর গরজনে নভ ঘোষে রাজ-আগমন ॥



দুর্গাপূজা বাঙালীর বিশেষত্ব । ভারতবর্ষে আর  
কোথাও এভাবে শরৎকালে মূর্তিপূজা নাই । অজ্ঞ  
দেবতার মূর্তি ঘোষাঘোষে বা মন্দিরে আছে । এভাবে মূর্তি  
গঠন করিয়া এত জাঁকজমক করিয়া প্রতিমাপূজা  
করা অজ কোন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না ।  
বর্তমান দুর্গা প্রতিমা বাঙালীর নিজস্ব । ইহার আদি  
উৎপত্তি যথায় হউক না কেন, বাঙালী নিজ ভক্তি  
ও রসজ্ঞান দ্বারা ইহার মাতৃদ, মধুরত্ব ও শিল্পজ্ঞানের  
চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে । ভাবের ও রসের রাজ্যে  
দুর্গা প্রতিমার একটা বিশেষ মূল্য আছে । ইহা  
বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়াছে ।  
দুর্গাপূজা হইল নবপঞ্জিকার পূজা । দুর্গা  
প্রতিমা হইল রূপক ; আসল পূজা হইল নবপঞ্জিকার  
পূজা । এই শরৎকালে ভারতবর্ষময় সকল সম্প্রদায়  
নবরাত্রের উৎসব করিয়া থাকে । প্রত্যেক প্রদেশের  
দশকর্মান্বিত হিন্দু মাত্রেই গৃহে আশ্বিনের শুক্লা  
প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত এই নয় রাত্রির জন্ত  
চণ্ডিকার ঘট হাণ্ডিত হয় ; বরে দেবীর পূজা হয়, এবং  
মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর পাঠ হয়ইয়া থাকে । বৎসরে নবরাত্রের  
উৎসব দুই বার হয় ; বসন্তকালে ও শরৎকালে  
অর্থাৎ বাসন্তীপূজা ও শারদীয়াপূজার সময় । হিন্দু  
গৃহস্থের বিশ্বাস যে, নবরাত্রের সময় গৃহে চণ্ডীপাঠ  
না হইলে অমঙ্গল ঘটবে । চণ্ডীমূর্তি বহু স্থানে আছে  
কিন্তু ভুবনেশ্বরে যে রূপ চণ্ডীমূর্তি আছে সে রূপ চণ্ডী-  
মূর্তি ভারতবর্ষে অজ কোন স্থানে নাই । ইহা দেখিবার  
ও শিখিবার মূর্তি । একাধারে রবমূর্তি ও অন্তরা-  
মূর্তি কেমন করিয়া পাথরে মূর্তি করিয়া তুলিতে হয়,  
তাহা হিন্দুজাতি স্থাপতি ও হৃন্দর ভাবে ভুবনেশ্বরের  
চণ্ডীমূর্তিতে দেখাইয়া দিয়াছে । চণ্ডীমূর্তির সহিত  
বর্তমান দুর্গামূর্তির ভাবরাজ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে ।  
নবরাত্র পালন ও নবপঞ্জিকা পূজা অনেক প্রদেশে  
হইয়া থাকে । শরৎকালে নবপঞ্জিকা পূজা করা সহজ ।  
কারণ, এসময় নবপঞ্জিকার সমস্ত গাছ প্রচুর  
পরিমাণে পাওয়া যায় । নয়টি গাছের নাম হইল  
নবপঞ্জিকা । কলা গাছ, শুভ্রি কদর গাছ, হুন্দর  
গাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলেদর ডাল, দাড়িম গাছ,  
অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ—  
ইহাই হইল নবপঞ্জিকার গাছ । ইহাকেই চলিত  
কথায় 'কলা বৌ' বলে । অনেকের ধারণা 'কলা বৌ'  
গণেশের স্ত্রী ; কিন্তু তাহা নহে । স্ত্রী হইলে বাসে  
বসিত ; ইহা দক্ষিণে থাকে । 'কলা বৌ'ই হইল  
নবপঞ্জিকা । ইহার স্বতন্ত্র পূজা-পদ্ধতি আছে ।  
প্রথমে নবপঞ্জিকার স্থান ও পূজা হইবে ; তৎপরে  
প্রতিমা পূজা । প্রত্যেক দিন নবপঞ্জিকার স্বতন্ত্র  
পূজা হইবে ; বিশুদ্ধন ও স্বতন্ত্র ভাবে হইবে ।  
আমাদের পূর্বপুরুষগণ সাধনবলে অদ্বৈত করিয়াছিলেন  
যে, প্রত্যেক গাছের ভিতর দেবতা বা প্রাণ-  
শক্তি বর্তমান আছে, তাই তাহার গাছকে 'ভক্তি  
সহকারে পূজা করিতেন । অজ জাতির লোকের ধারণা,  
হিন্দুরা গাছ পূজা করে, কিন্তু আসলে তাহা নয় ;  
গাছের ভিতর যে দেবতা বা প্রাণের দর্শন পাইয়াছে,  
তাহাকেই তাহার পূজা করে । সেজ্ঞ নবপঞ্জিকার  
অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর উল্লেখ দেখা যায় । এই নয়টি  
দেবীর নাম হইল, যথা,— ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা,  
কার্তিকী, শিবা, রক্তমতি, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও  
লক্ষ্মী । রক্তের রঙের সহিত দেবীর রঙের সাদৃশ্য স্বতন্ত্র  
সম্ভব হয় বলিতে হইয়া থাকে । এইখানে একটি কথা  
দেবতা চামুণ্ডার পূজা ; এ পূজায় অজ কোন দেবতার  
স্থান নাই । বসন্তকালে নবপঞ্জিকা পূজা হওয়া কঠিন ।



কারণ, এ সময় নবপঞ্জিকার অনেক গাছই পাওয়া যায় না। সেজন্য অভাবে অল্প ব্যবস্থা আছে। বাঁহারা বাসন্তী পূজা করেন তাঁহারায়ে জানেন, নবপঞ্জিকা সংগ্রহ করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়।

ভাবে দিক্, রসের দিক্ ছুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। সমাজের সকলকে লইয়া সম্মিলিত ভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিমার সৃষ্টি। ভাবের ও রসের দিক্ দিয়া এবং তৎসঙ্গে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া বর্তমান দ্রুপা প্রতিমা দর্শন করিয়া মনোমধ্যে বাহা উদয় হইয়াছে তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিতেছি।

বালাকাল হইতে ভগ্নিয়া আসিছে, শরৎকালে যে দ্রুপাসংসব হয়, তাহা আসল দ্রুপাসংসব নয়; এ পূজা অসালে শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন। আসল দ্রুপাসংসব হইল বাসন্তী পূজা। কিন্তু বাসন্তী পূজায় তেমন জাঁকজমক হয় না; দেশমধ্যে একটা গভীর সাড়া পড়ে না; সাধারণের মনোমধ্যে তেমন কিছু একটা ভাবের উদয় হয় না। পক্ষান্তরে শরৎকালের দ্রুপা পূজায় বাঙালী জাতি মাত্ৰা উঠে। শরৎকালের দ্রুপাসংসব হইল বাঙালী জাতির আনন্দবিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এমন ভাবে অল্প কোন পূজায় বাঙালী জাতি আনন্দে বিভোর হয় না। এই দ্রুপা প্রতিমার পশ্চাতে বাঙালী জাতির অনেক কিছু জড়ান মাথান আছে। এতবৎ জাঁকাল কাণ্ড ভারতবর্ষের ভিতর আর কোন প্রদেশে আছে কি না বলিতে পারি না। এত অর্থব্যয়, এমন গ্রামে গ্রামে গীতভাড়া ভূজাংক\* রব, এমন ধনী-দরিদ্র-নিম্নশ্রেণে সকলের নববয়স গ্রহণের ব্যবস্থা বাঙালী জাতির আর কোন উৎসবে নাই। হানে হানে ক্রুদ্ধেরা এই সময় হইতে ফসলী বৎসর গণনা করে।

শারদীয়া আগমনীর সঙ্গীত বাঙালী জাতির অপূর্ণ দান। ইহা ভাবের ও রসের দিক্ দিয়া মধুর রস-বস্ত সৃজন করিয়াছে। শরতের প্রভাতকালে বাঙালী জাতি বনন কান পাতিয়া আগমনীর গান শোনে তখন সে সমস্ত তুলিয়া যায়; তাহার জয়স্বিত

বেধ-হিংসা কে যেন অজ্ঞাতে কাড়িয়া লইয়া যায়। এ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বাঙালীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; গান শুনিতে শুনিতে সে যেন নৃতন জগতে ভাসিয়া যায়—আপনাকে আপনি জুবিয়া যায়। পূর্ণের শরৎকালের আগমনীর স্বাকর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া সমস্ত সমাজকে, সমস্ত দেশকে দুই-মাস এক ভাবে ভাবুক, এক রসে রসিক করিয়া রাখিত। সেদিন আত্ম আর নাই। সে প্রাণ-মাতান, মন-মাতান আগমনীর গায়ক আর নাই। আগমনীর সঙ্গীতের মধ্যে বাঙালী জাতির গার্হস্থ্য-জীবনের একটা অতি সুন্দর মধুর ছবি ফুটান আছে; মি-জামাইয়ের আদর, কন্ডার বাপের বাড়ীর প্রতি মমতাবোধ, মাগের কন্ডার প্রতি প্রবল স্নেহ—বাঙালীর বাঙালীষের ইহাই বিশিষ্টতা। বাঙালীর দ্রুপাসংসব হইল বাঙালী জাতির গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতিমূর্তি। অল্প প্রদেশে এ ভাব ছুটাইবার শক্তি ও সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আগমনীর সঙ্গীত যেমন তাহাও লিখিত হইয়াছে, বিজয়ার সঙ্গীতও তেমনি ভাবে সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তুলনায় অতি অল্প। ইহার কারণ মানবজীবন মিলনের পক্ষপাতী, বিচ্ছেদের নহে। মিলনই মাহাত্ম্যে শক্তি, সম্পদ ও আনন্দ দান করে।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের সময় শরৎকালে দ্রুপাসংসব করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিকর রামায়ণে রাবণবধের পূর্ণের দ্রুপাপূজার কোন উল্লেখ নাই; তুলসীদাসে নাই, রামায়ণে নাই—আছে কেবল একমাত্র কৃত্তিবাসে।\*

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঐতিহাসিক মূল্য বঙ্গসাম্রাজ্য। রঘুনন্দন দ্রুপাসংসবের অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে যে ধরনের দ্রুপাসংসব চলিতেছে, তাহা বোধ হয় রঘুনন্দনের সময় হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূর্তিপূজার প্রচলন

\* যুব বাবাকি রামায়ণে না থাকিলেও কংকনাদি প্রাচীন পুরাণে শাক্তী দ্রুপাপূজার উল্লেখ আছে।—উঃ সঃ

যখন সর্বদেশে নাই, তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই মূর্তিপূজার প্রচলন প্রথম কিরূপে দেখা দিল ?

ঐত্ৰীমার্কণ্ডের চর্চাতে দেখিতে পাই, মেঘস্ব নৃষির কথা শুনিয়া হুরথ রাজা মাটির মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতে আশ্রয় করেন। এখানে আছে হুরথ রাজা মাটির ঠাণ্ডুর গড়িয়া নদীর চড়াই তিন বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। হুরথ রাজা তিন দিন পূজা করিয়া চতুর্থ দিবসে বিসর্জন দিয়াছিলেন; এবং সেই নিয়ম আশ্রয় বাঙাল-দেশে চলিতেছে। কিন্তু হুরথ রাজা যে কি মূর্তি পূজা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে জানা যায় না। সে মূর্তি কিজ্জা, কি চতুর্ভুজা, কি অষ্টভুজা, কি দশ-ভুজা তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। সে মূর্তির সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তিক, গণেশ থাকিত কি না, তাহাও আমরা জানি না। তবে পুরাণে এই স্থানে প্রথম মূর্তিপূজার কথা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে আত্ম নানাহানে বনন কার্য চলিতেছে। এই সমস্ত বনন কার্যের দ্বারা ভারতের তথাকথিত প্রাচীন ঐতিহাস অনেক অদল-বদল হইয়া গেল। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বনন কার্যদ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বারা বদলাইয়া গেল। বনন কার্য অনেক লুপ্ত মূর্তি উদ্ধার করিয়াছে। এই সমস্ত লুপ্ত মূর্তি পূর্ণ-বেশন করিলে দ্রুপামূর্তি সম্বন্ধে নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। জগতে প্রাচীনকাল হইতে দেবীমূর্তি পূজা চলিয়া আসিতেছে। সর্বদেশে ইহার প্রচলন ছিল। অজ্ঞাত দেশেও দ্রুপামূর্তির মত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রথম বিদ্যুত দ্রুপামূর্তি এলাহাবাদের সন্নিকট 'ভিতা' গ্রামে মাটির তলা হইতে পাওয়া যায়। তাহার পর আর একটি চতুর্ভুজা মূর্তি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, শুষ্কসাম্রাজ্যের সময় মহিষমর্দিনী মূর্তি পূজার প্রথম প্রচলন হয় এবং উক্ত দ্রুপামূর্তিও শুষ্কসাম্রাজ্যের সময় গঠিত হয়।

## দ্রুপা প্রতিমা

দ্রুপা প্রতিমার বহু পরিবর্তন হইয়াছে এবং বর্ত-মানেও হইতেছে। এক সিংহবাহিনী মূর্তিই কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বদা যায় না। প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই দেবী ও মহিষমার। দেবী বিদ্যুত এবং কোন পাখীর বা বাহন নাই। দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই দেবী চতুর্ভুজা এবং সঙ্গে কোন বাহন বা পাখীর নাই। তাহার পর সিংহ বাহন আসিল এবং সে বাহনেরও রূপ বদলাইয়া গেল। প্রথমে সে সিংহের ঘাড় ছিল গুব লম্বা, মৃৎখানা কতকটা ঘোড়ার মত, কতকটা মকরের মত, শালা, রেগাণ্ড ও লম্বা। বর্তমানে সেই স্থান আফ্রিকার সিংহ অধিকার করিয়াছে। দ্রুপা প্রতিমার পার্শ্বচর কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আসিল, তাহার ইতিহাস আশ্রয় অজ্ঞাত। বাঙালদেশে দ্রুপা প্রতিমা বহু প্রকৃতির হয় এবং দেবীর গায়ের রঙেরও নাম উল্লেখ করা হইতে পারে। সিংহবাহিনী মূর্তি অষ্টাদশভুজা পর্য্যন্ত আছে। বাঙাল দেশে দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা হয়।

কৃত্তিবাসর রাজ্যেও শরৎকালে দেবীপূজা হয়। ইহা দীর্ঘাঙ্কিত মহিষমর্দিনী দেবী; পার্শ্বচর কেহ নাই। গায়ের রঙ যোর লাগল। এই প্রতিমা প্রত্যেক দিন বড়য় গৃহে পূজিতা হন এবং ইহার বিসর্জন পুরোহিত ব্যতীত অল্প কেহ দেখিতে পান না। ইহার নিকট মহিষ, শূকর, পায়াবত ও ছাগ প্রভৃতি বলিগান হয়। পূর্ণের কলিকাতা সহরের ভিতর এবং পাখ'বন্দী গ্রামসমূহে দীর্ঘাঙ্কিত দেবীপূজার প্রচলন ছিল। এক্ষণে সেই সমস্ত পূজা লোপ পাইতেছে। চলিত কথায় ইহাদের "রাক্ষণী পূজা" বলে। সন্তের ভিতর দীর্ঘাঙ্কিত মূর্তি আশ্রয় মেসার দেখাইয়া থাকে। আমার মনে হয়, নানা সম্ভ্রামায়ের প্রতিষ্ঠাধিতা হইতে ইহার উচ্চতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ইহাতে বিশেষ আনন্দ অহুতব করে।



### দুর্গা প্রতিমায় বজ্র-কটি পদ্ধতি

বর্তমান দুর্গা প্রতিমার ভিতর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কোন শিল্পী ইহার প্রথম সৃষ্টিকর্তা, তাহা আশে ও অজ্ঞাত। বাঙাল দেশের দুর্গা প্রতিমার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই নিয়ে প্রদান করিলাম। যে সমস্ত প্রাচীন দুর্গামূর্তি বা মহিষমর্দিনী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ভিতর কাণ্ড ও “বজ্র-কটি” (ইংরেজীতে বাহাকে Three-block-system বলে তাহা) ছিল না। বাঙাল দেশের দুর্গামূর্তির ভিতর “বজ্র-কটি” পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। “বজ্র-কটি” বা Three-block-system হইল পায়ের নিম্ন হইতে কটদেশ পর্য্যন্ত, কটদেশ হইতে ঘাড় বা গ্রীবা পর্য্যন্ত এবং গ্রীবা হইতে মস্তক বাকিয়া মূর্তির সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। বাঙাল দেশের দেবমূর্তিসমূহের ভিতর কেবলমাত্র ঐক্লব ও দুর্গামূর্তিতে এই পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞাত মূর্তির ভিতর এ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় না। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি মূর্তির ভিতর এ পদ্ধতি নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই বজ্র-কটি পদ্ধতি আসিল কোথা হইতে? সাধারণের ভিতর রসের দ্বারা ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে “বাহা”র সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় যখন “বাহা”র ভিতর দিবা তাহাদের সম্ভাবন জনসাধারণের ভিতর প্রচারপ্রয়াসী হইয়াছিল, তখন এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়। “বাহা” করিতে হইলে নৃত্যের প্রয়োজন হয়। নৃত্য করিতে হইলে গাভ্র নান্যভাবে বজ্র করিতে হয়। এখন, বজ্র বা যশোধারাকে নৃত্যের দ্বারা দেখাইতে হইলে বজ্র-কটি হইতে হইবে। বজ্র-মূর্তিতে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব বাম পার্শ্বে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র-কটি পদ্ধতিতে রহিয়াছেন। এই সময়কার মূর্তিগুলি দেখিলে মনে হয় দেশমধ্যে সেই সময় বজ্র-কটি চেষ্টে উদ্ভূত ছিল কিন্তু দেশ নর্ত্তকীর চণ্ড

দেবতাদিগের ভিতর বহল না। ইহা অল্পদিন চলিয়াছিল যাত্রা; উত্তর ভারতবর্ষে চলিল না। অপর্য্যায়ের সৃষ্টি করিতে হইলে বজ্র-কটি করিতে হয়। বাঙাল দেশে দুর্গা দক্ষিণ দিকে ও ঐক্লব বাম দিকে বজ্রভাবে রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঠ-কারের মূর্তি। যদি ঠ-কারের মূর্তি হয়, তাহা হইলে জানিতে ইচ্ছা করে, ইহা কোন অঙ্গুরের ঠ? ১

### নেত্র

দুর্গামূর্তির “দেবনেত্র” হইবে। দুর্গাদেবী হইলেন ত্রিময়না। নেত্র তিন প্রকার—দেবনেত্র, শিবনেত্র ও নরনেত্র। দেবনেত্রের ভাব হইবে—প্রাপ্তপের যে কোন স্থান হইতে দর্শক প্রতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে প্রতিমা বা দেবীমূর্তি তাহার প্রতি সুরঙ্গম বদনে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইহা মূর্তিতে ফোটান বড়ই কষ্টকর। সাধারণ শিল্পী অপারগ হইয়া থাকেন। পটে বা কাগজের উপরে করা সহজ। শিবনেত্র হইবে দেবনেত্রের বিপরীত। দেবনেত্রের ভাব হইল সাধককে স্থল হইতে হৃদয়ে লইয়া পাওয়া। শিবনেত্রের ভাব হইল হৃদয় হইতে হৃদয়ের আনা, — মনে ব্যুত্থান হইতে সমাধিতে আনিতেছে। নরনেত্রের দৃষ্টি হইবে এক দিকে। বাঙাল দেশে সাধারণতঃ “পদপদ্যপ-নেত্রম্” প্রচলিত। দক্ষিণ দেশে “মীনাক্ষী”। ইহা হইল চুইট মস্তক পরশ্পরে ঠাই দার হইতে সরিকট হইতেছে।

### কিরীট

শায়ে দেখিতে পাই, দেবমূর্তি বা দেবীমূর্তির মস্তকে কিরীট হইবে। পূর্বে আর্থেরা কিরীট ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বের কিরীটই বর্তমানে বিবাহের তোলাপের পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন চিত্রকলাতে কিরীটশোভিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীট-পরিহিতা মূর্তি দেখিতে অতীত স্বন্দর হয়। ইতিহাসের সহিত চিত্রকলার বন্নি সঙ্গ। ঐতিহাসিক চিত্র বা মূর্তি অঙ্কিত করিতে হইলে শিল্পীর

ইতিহাস-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ তৎকালীন পোষাক-পরিচ্ছদে অনেক ক্রটি আসিয়া যাইবে। মূর্তি দেখিয়া তৎকালীন জাতির কৃষ্টির পরিচয় অনেক কিছু পাওয়া যায়। ইহার একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী আছে। দুর্গাপূজা হইল সকা পূজা। দুর্গা প্রতিমা হইল Cosmic Energy বা বিশ্ব-ব্যাপী শক্তির প্রতীক। প্রাচীন দুর্গা প্রতিমা কিরীটপরিহিতা। বাঙাল দেশের দুর্গা প্রতিমায় কিরীটের পরিবর্তে “মুরজাহানী-তাজ” ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্থ দেবদেবীর ভিতর বিজাতীয় ঢং-এর এই প্রথম প্রচলন। দুর্গামূর্তি হইতে “মুরজাহানী-তাজ” মত শীঘ্র বিদ্রুত হয় ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। উত্তর ভারতবর্ষে সমস্ত প্রতীমা পূর্ব্বমুখী অর্থাৎ উত্তরাধ ও দক্ষিণাধ উভয় বিন্দুযোগে করা। মধ্য হইতে দেখা টানিলে যে স্থান হয় তথ্য বিগ্রহের বেদীর স্থান হইবে। উদ্দেশ্য পূর্ব্বদিক হইতে তদ্রূপ অরুণ উদ্ভিত হইলে প্রভাৎ বেদী স্পর্শ করিবে। কিন্তু বাঙালদেশে দক্ষিণ বা পশ্চিম-মুখী করিয়া বিগ্রহ গঠন করিতে হয়। ইহার কারণ কি? পুরীর বিমলা পূর্ব্ব-মুখী, কানীর অরপূর্ণার মন্দির পশ্চিম-মুখী কিন্তু বাঙালীর কভা রাণী ভবানীর প্রাতিষ্ঠিত কানীর দুর্গা-বাড়ীর দুর্গা দক্ষিণ-মুখী।

### সরস্বতী ও লক্ষ্মী মূর্তি

সরস্বতী প্রাচীন দেবী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধ নানা মূনির নানা মত আছে। ম্যাক্সমুলার বলেন, বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীরে নানা যোগযজ্ঞ হইত এবং সেই নদীর নাম হইতেই দেবীর নাম সরস্বতী হইয়াছে। মহাভারতে বনপার্শ্বে দেখিতে পাই, সরস্বতী দেবী মর্য্যদি ভার্য্যকে বলিতেছেন, “আমি পরাপর-বিভাজ্যপা দেবী, বিপ্রাধিপের সৎসারবিবার্ণ্য অধিহোজাদি সংকর্ষ হইতে আবির্ভূতা হইয়া তোমার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রজ্ঞা সহকারে স্বার্থ অর্থ সমুদয় প্রকাশ করিলাম।” বৈদিক দেবদেবীর আবির্ভাবস্থল হইল যজ্ঞ। হোমের

অমির নাম হইল “জাতবেদম্” অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই জ্ঞানযুক্ত। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্থ দেবদেবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কতকগুলি প্রাচীন, এবং ভারতবর্ষীয় প্রাকৃতিক দৃষ্টি হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে; ইহার সংখ্যার অল্প ছিল। কতকগুলি বৈদেশিক যাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধেই মূর্তিতে পাওয়া যায়। কালক্রমে বৈদিক দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কতকগুলির নামও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সরস্বতীর বহু মূর্তি আছে। সরস্বতীর বাহন হইল হংস। কেন সরস্বতীর বাহন হংস হইল এবং বাহন পদ্ধতি কবে হইতে বিশেষ ভাবে এদেশে প্রচলিত হইল, তাহার ঐতিহাসিক গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন। এই স্থানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। দুর্গাপূজার মধ্যে দুর্গা ও লক্ষ্মীকে “সর্বললিতাভূতিং” মত উচ্চারণ করি কিন্তু সরস্বতীকে “সর্বললিতাভূতিং” বলি না। অথচ মূর্তি আশাদ-বর্তক অগলার দ্বারা শোভিত হয়। আমার মনে হয়, মস্তক হইতে যে পদ্ধতিতে মূর্তি কল্পনা করা হয় তাহার পরিবর্তন অল্পবিস্তর প্রয়োজন। কারণ মস্তকের সহিত মূর্তির সামঞ্জস্য রাখা বিশেষ কঠিন। সরস্বতী মূর্তি কল্পনা হইল সর্ব শ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মীও প্রাচীন বৈদিক দেবী বলিয়া আর্থ শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে, প্রাচীনকালে লক্ষ্মী শব্দ সৌভাগ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে লক্ষ্মী হইলেন অমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেজ্ঞা ধান পাকিলে যেমন রঙ হয় সেইরূপ লক্ষ্মীর গায়ের রঙ হইবে। ইহার বাহন পেচক। গ্ৰীক ও রোমানদের ভিতরও ইহার পূজা প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ একই মূর্তির ভিতর লক্ষ্মী-সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

### কাঞ্চিক

কাঞ্চিক হইলেন দেবসেনাপতি। কিন্তু বর্তমান দুর্গা প্রতিমায় ইহার মূর্তি দেখিলে মনে হয় শাস্ত্র,



শিষ্ট, নম, মধুর, টেরিকাতা, তাৎপর্য গোপালতা। ইহা আধ্যাত্মবোধের দেবসেনাপতি নহে; ইহা হইল অধঃপতিত পরাধীন জাতির যেকোনওদীন যুবকদের প্রতিমূর্তি। কার্তিকের বাহন হইল ময়ূর। রশ্মিভিত্তির ভিতর ভাববিপর্যয় ঘটিল কেমন করিয়া, অমনি জাতিয়া পাই না। ভাব অস্থায়ী জাগ্রতমন হই; বীরজাতি সৃষ্টি করিতে হইলে বীরত্বের প্রয়োজন। শক্তিমান জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে বীর্যবান নর-নারী প্রয়োজন। শাস্ত্রে একগুণ কার্তিক-মূর্তির কল্পনা কোথাও খুঁজিয়া পাই না। মহাভারতে বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি কার্তিকের জন্মহত্যার বলিয়াছেন। তথায় দেখিতে পাই, মনুজ্যোতিষা বাহা দেবী অম্বিয়ার সহধর্মিণীর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অগ্নির নিকট বাইয়া বলেন, “আমার নাম শিবা, আমি কামশরে সাতিশর কাতর হইয়া তোমার নিকট আশ্রয়ন করিয়াছি। আমার কামনা পরিপূর্ণ কর; নতুবা আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।” তখন ছতানন হর্ষাভিনয় সহকারে খ্রিষ্টি-প্রকৃষ্ণমূর্তি বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। বাহার গর্ভে ও অগ্নির ওরলে কার্তিকের জন্ম হয়; † সেজন্য কার্তিকের গায়ের রঙ হইবে অমিষং, বর্ডমান হলুদ বর্ণ নয়। এইখানে দেখিতে পাই, প্রজাপতির কথা দেবসেনাকে কার্তিক বিবাহ করিলেন এবং মন্ত্রবোতা বৃহস্পতি জপ ও হোম-ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। কার্তিক হইলেন মহাবীর, দেবসেনাপতি; ইচ্ছা স্বয়ং তাঁহার ভয়ে ভীত। বনমুখি-বাহিনী মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তির সহিত “বানু কার্তিক” দেখি, তখন বৃত্তিতে গারি না, কেমন করিয়া ও ভাববিপর্যয় ঘটিল। দুর্গামূর্তি হইল রশ্মিমূর্তি; শরশাল করিবার জন্ত ইহার জন্ম। দুর্গাৎসব সামরিক পূজা,—রণভাটীর পূজা। এ পূজায় ভূমী, ভেরী,

শব্দানসহ কাড়া, নাগরা, ঢাক, ঢোল বাজিবে; সমরসম্মোহনযোগী বাজভাণ্ড বাজিবে; কিন্তু কখনই পূজাগৃহে বংশীরব হইবে না; কারণ, তাহা হইলে রস-বিপর্যয় ঘটবে। রণভাটীর সহিত দেবসেনাপতির পূজা করাই প্রশস্ত। মূর্তির সহিত জাতির যনিষ্ট সম্বন্ধ। মূর্তির ভিতর জাতির কল্চার (culture) পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্তিকে বরণ করিয়া জাতি গঠিত হয়, সবল ও সচ্ছন্দ হয়। বর্তমান কার্তিকের রূপকল্পনার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কার্তিকের মূর্তি হওয়া উচিত দেবসেনাপতির উপরুল। মুখের ভাব হইবে মহাকোবী অথচ আশ্রিতের প্রতি মহাদয়ালু। সর্ববিষয়ী বীরত্বের দাঁড়াইয়া থাকিবে—সেনা সমস্ত শত্রুকে তুচ্ছমান করিতেছে। গায়ের রঙ হইবে অমিষং; মৃতক জীবন করিবে। কপাট-বক্ষে বর্ষা আজাহলুধিত; বীরপতি বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ কটি পর্যন্ত; সি-গ্রন্থি দুই ভাগ। হস্তে গোধা অন্তর্ভুক্ত; অন্ত্রটির অগ্রভাগ খোলা থাকিবে। কটিদেশে—কটিবন্দন। হস্তে—সায়রক ও শরাসন। পৃষ্ঠে—শরপূর্ণ স্থীর। গায়ে অলংকার থাকিবে। ইহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে ও ভাবের সহিত পারস্পর্য্য থাকিবে।

### গণেশ

গণেশমূর্তি বর্তমান হিন্দুজাতির নিকট পরম পবিত্র। সর্বকর্মের পূর্বে সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম উচ্চারণ করিবে। গণেশের নামে সকল সুখপ্রাপ্ত্যনা। সর্বপ্রাণে গণেশবন্দনা চাই। গণেশের বহু নাম প্রচলিত আছে। তারতবর্ষের ভিতর গণেশমূর্তিও বহু প্রকৃতির। পুনা ও গুয়াই নামক স্থানে গণেশ-মন্দির বৃহৎ। এইখানে গণেশের প্রকাণ্ড মূর্তি আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে গণেশকে বিদ্যরাজরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে; কোথাও বা ইহার নাম বিনাশক। বৌদ্ধ গ্রন্থে গণপতি রক্তবর্ণ, ইহার ১২ হাত ও মুখিক বাহন। গণেশ শিবের অর্ধবিশিষ্ট। ভারতবর্ষের বাহিরেও

গণেশপূজা আছে। বতগুণি গণেশমূর্তি আছে তন্মধ্যে উচ্ছিন্ন-গণেশের অল্প দেবীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীমূর্তির নাম বিদ্যেশ্বরী। বিদ্যেশ্বরী সর্বাভরণহৃদিতা, নন্দা, বিদুজা। গণেশ চতুর্ভুজ।

আধ্যাত্মবাদীদের ভিতর গণেশমূর্তি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়াছে। গণেশ আধ্যাত্মবোতা কি না অনেকের সন্দেহ করেন। তাঁহাদের ধারণা, বৈদিক গণপতি ও পরবর্তী কালের গণেশ একই দেবতা নহে। ইহা নইয়া অনেক আন্দোচনা হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই, “গণেশ” নামটি মহাভারতের আদিপর্বেই প্রথম দেখা যায় ও বহু প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত হওয়ায় গণেশকে আধুনিক বা অন্যান্য দেবতা বলা অসম্ভব। মাহিভা হস্তিমুণ্ডধারী গণেশের কথা প্রথম ‘কামবর্ষ’তে পাওয়া যায় এবং ‘মালতীমাধবে’ গণেশের পূজাপদ্ধতিলাভ দেখিতে পাই।

### অশ্বর

চতীতে যেরূপ অশ্ববরের বর্ণনা আছে আমরা প্রতিমায় সেরূপ অশ্বরমূর্তি গঠন করি না। আমরা অশ্বরকে একটা villain বা পান্ডবগুণে তৈয়ারী করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা দুষ্টগণ। অশ্বর বা ঘি, মহাদেবো! ছিল, সন্দেহ কেহ তাহাকে রণে জয় করিতে পারিত না। সেবতার তাহার ভয়ে কাঁপিতেন। দেবীও তাহাকে সহজে হত্যা করিতে পারেন নাই। সেজন্য অশ্ববরের মূর্তি বিয়ের মত হওয়া উচিত। অশ্বর যে দেখিতে কুৎসিত ছিল, এ কথা কোন্ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? প্রাগৈত জাতি শিল্প সচল হওয়া উচিত। শাস্ত্রমত ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, ইতিহাসের ভাব অনুসৃত রাখিয়া, রস-শৌলশ্যের নিকৃৎ নিম্ন উচ্চতরের দুর্গাপ্রতিমা সৃষ্টি করা যাইতে পারে— তাহাতে ধর্মের ত্রীভুক্তি হইবে। বর্তমান শিক্তি বাঙালী শিল্পীদের ইহা বিশেষভাবে অধ্যয়ন বা ধ্যান করা উচিত।

### চালচ্চিত্র

চালচ্চিত্র বা স্বর্য্যমুখচ্চিত্র উদ্দেশ্য অনেকই জানেন না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেবী বা দেবতার পূজাতে একটি করিয়া স্বর্য্যমুখচ্চিত্র দিবার নিয়ম আছে। ইহার কারণ কি? সাধারণ শিল্পীর ধারণা, ইহা back-ground। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। সাধক-জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাঁহাদের সেই হইতে মাঝে মাঝে এক প্রকার স্ফোতি: নির্গত হয়। উচ্চতরের সাধক যখন খুব উদ্রভাবস্থায় বিচরণ করেন, অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় সমাধিগ্ন হন, তখন তাঁহার দেহ হইতে এক প্রকার স্ফোতি: নির্গত হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে গোলা হইয়া আবেরণভাবে থাকে। সাধারণ ভাবে বিচরণ করিলে এ স্ফোতি: নির্গত হয় না; কেবল উচ্চতরে থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয়। ইংরাজীতে ইহাকে halo বলে। সর্বদেশের সর্বজাতি ইহা নিরীদ্রপ করিয়াছে। সেইজন্য দেবতা বা মাহাপুরুষদের প্রতি-মূর্তি বা চিত্র অঙ্কন করিতে হইলে এই halo পশ্চাৎ-ভাগে দেখাইতে হয়; নচেৎ মূর্তি বা চিত্র দৃষ্টিগত হইবে। সাধারণ ব্যক্তির পশ্চাৎভাগে ইহা দিবার নিয়ম নাই, কারণ তাহাদের দেহ হইতে halo বাহির হয় না। সর্বদেশের শিল্পী এই নিয়ম মানিতেন না। এই স্ফোতিটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিমার পশ্চাৎভাগে স্বর্য্যমুখচ্চিত্র দেওয়া হয়। সমস্ত দেবতার স্ফোতি: একসঙ্গে দেখাইতে হয় বলিয়া চালচ্চিত্র মাণ-সই বড় করিতে হয় এবং ইহার ভিতরে শিবদুর্গার লীলা সচরাচর দেখান হয়।

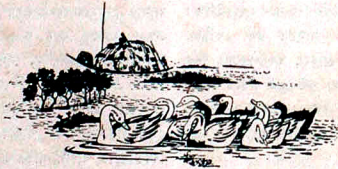
বর্তমান দুর্গা প্রতিমা দর্শন ও বিশ্লেষণ করিয়া আমার মনোমধ্যে যেরূপ ধারণা হইয়াছে তাহাই আমি এখানে মনোমতে বিবৃত করিয়াছি। সাধারণ মাহাত্ম বা হিন্দুমাছ বড়ই রমণশীল, সেজন্য তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রথম একটু কটমট টেকিবে, কিন্তু ২৪ বৎসর একগুণভাবে প্রতিমা পূজা হইলে জনসাধারণ অত্যন্ত হইয়া যাইবে—আনন্দ পাইবে। দুর্গা প্রতিমা হইল বিগত যুগের বাঙালীজাতির কল্যাজনের প্রেরণ পরিচয়।

† পুরাণে উল্লেখ আছে, কার্তিক শিবের অ্যোনিজ পুত্র। ইহার অর্থবোধে অতি উপলব্ধি হইলেন মার। কাশ্মির-ও এই বর্ণনাই কু্যাসম্ভব বিবাহে—উ: স:



রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া, ভাব, রস ও কল্পনার দিক দিয়া অপরূপ সৃষ্টি স্বজন করিয়াছে। যে সমস্ত শক্তির সাহায্যে মসার-জীবন, এই পার্থিব জীবন স্বপ্নময়, মশোময় ও আনন্দময় হয় সেই সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া বাঙালীজাতি শরৎকালে দুর্গা প্রতিমা অর্চনা করে। পাটট শক্তির সমাবেশে একটি যুদ্ধ জয়ী হওয়া যায়। যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্যই মহিষ-মর্দিনীর সৃষ্টি। ইহা হইল বিজ্ঞা, অস্ত্র, ঐথরিক শক্তি, উপযুক্ত সেনাপতি ও সিদ্ধির জন্য দেবতাদিগের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা। ঐথরিক শক্তি বা আত্মা শক্তির রূপক হইল—দুর্গা; বিজ্ঞা ও বুদ্ধির হইল—সরস্বতী; অস্ত্রের হইল—লক্ষ্মী; উপযুক্ত সেনাপতির হইল—কার্তিক, এবং সিদ্ধির হইল—পশেণ। যুদ্ধ গমনের পূর্বে প্রাচীন বাঙালীজাতি এই পঞ্চশক্তির সৃষ্টি গড়িয়া শরৎকালে উপাসনা করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এ প্রকার সৃষ্টিপূজা বাঙালার বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্তমান বাঙালার প্রচলিত দুর্গোৎসব পার্বেশ-জীবনের সকাম পূজা—সাধকের পূজা নয়। সাধক পূজা-অর্চনা করিবেন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত; মসার-জীবন স্বপ্নময়, মশোময় করিবার জন্য নয়। সাধকের পূজা বস্ত্র। রাধাবদেব পার্থিব মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈদিক যুগে বাগবজ্র হইত। সে বাগবজ্রের এ দেশে আর প্রচলন নাই; সে বাগবজ্র করিতে হইলে বিত্তর অর্থব্যয় প্রয়োজন। প্রকৃত বৈদিক বাগবজ্র বর্তমান বাঙালার বহুদিন লোপ পাইয়াছে। প্রবাদ আছে,



কলিযুগে দুর্গোৎসবই হইল একমাত্র যজ্ঞ। সাধারণ গৃহস্থ দুর্গোৎসব করিতে পারে না; কারণ, বিপুল অর্থের এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন। বাস্তবিক মথার দুর্গোৎসব একটি বিরল যজ্ঞ। এত জিনিষের প্রয়োজন হয় যে, সাধারণ ব্যক্তি তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। ধনী ব্যক্তি বাতীত এ পূজা করা বড়ই কষ্টকর। গৃহী নিজ মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য শরৎকালে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব করে। সেই জন্য তন্ত্র প্রতিমার সম্মুখে নতজাহা হইয়া প্রার্থনা জানায়—  
মহুকেটভবিষ্যংসি বিধাতুবরদে নমঃ।

রূপং দেহি জঘ্নং দেহি মশো দেহি বিঘো জহি।  
ভাৰ্গ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবুদ্ধমাহুবিধীম্।  
রূপং দেহি জঘ্নং দেহি মশো দেহি বিঘো জহি। ইত্যাদি।  
ইহাই হইল গৃহীর দেবীর সম্মুখে সকাম প্রার্থনা। সাধকের “ভাৰ্গ্যাং মনোরমাং” প্রয়োজন হয় না। সাধক সম্পূর্ণরূপে নিজকে আত্মা শক্তির হস্তে অর্পণ করেন, নিজের বলিয়া কিছু রাখেন না। আহুত, আজ এই শারদীয়া পূজার প্রাকালে গৃহী ও সাধক সকলে মিলিয়া জগন্নাথের ত্রিচরণকমলে প্রণাম করি—

সর্বমঙ্গলমদ্যো শিবে সর্বার্যাদিধিকে।  
শরণো জ্যকে পৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে॥  
শক্তিহিবিদ্যাপানং শক্তিভূতে সনাতনি।  
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে।  
শরণাপাতনীদগ্ধপরিগ্রাণপরায়েণ।  
সর্গত্যাগিরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে।

## প্রাচীন কলিকাতা

(বাগবাঝার ইতিহাস)

কবিভূষণ ত্রিপুরচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ

(পূর্বায়ত্তি)

### ১০। বাগবাঝার খাল

ইহাকে পূর্বে Circular Canal বলা হইত। পরে ইহার নাম হইল The Circular and Eastern Canal। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে ‘বাগবাঝার খাল’ বলে। বাগবাঝার খাল হুগলী নদী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জল বাহির ও প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নদীর দিকে দুইটা Lock-gate ছিল। এই খাল বারাকপুর-রোড ও দমদমা-রোড অতিক্রম করিয়া Circular Road-এর পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে। যখন খাল কাটা হইয়াছিল, তখন এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, এই খাল বরাবর ৮০ ফুট চওড়া ও অন্ততঃ ৬ ফুট গভীর থাকিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই খাল কাটিতে আরম্ভ করা হয় এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাটা শেষ হয়। খাল কাটিতে ১৪,৪৩,৪৭৭ টাকা খরচ হইয়াছিল।

বাগবাঝার খালের উপর ৭টা পোল আছে।

ইহাদের বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল—

(১) Chitpore Bridge।—সাধারণতঃ লোকে ইহাকে ‘বাগবাঝার পোল’ বলে। Captain John Thomson এই খালের স্রষ্টা ছিলেন। তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে Chitpore Bridge নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণে ৩৯,০৪৮ টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহার Span ২৯ ফুট এবং Road-way ২২ ফুট চওড়া। এই ব্রিজের নিয়ে একটা Lock-gate আছে। ইহা দ্বারা নৌকা সকল যাতায়াত করিবার সুবিধা পায়। এই Lock-gate ৬০ ফুট দীর্ঘ এবং ২৪ ফুট প্রশস্ত।

James Prinsep সাহেব ১৮২৯ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪ বৎসর এই Lock-gate নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণে ৬১,০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

(২) Barrackpore Bridge।—ইহাকে লোকে সাধারণতঃ Shambazar Bridge বলিয়া থাকে। James Prinsep সাহেব ইহা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহা নির্মাণ করিতে ২০,৫২৯ টাকা খরচ হয়। ইহার Span ১০০ ফুট এবং পরিসর ৩০ ফুট।

(৩) Dum Dum Bridge।—ইহাকে লোকে Belgachia Bridge বলে। James Prinsep ও Captain Thomson ২০,৫২৯ টাকা খরচ করিয়া ইহা নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ২৩ ফুট।

(৪) Ultadangi Bridge।—Captain Prinsep ২২,০০০ টাকা খরচ করিয়া এই ব্রিজ নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০১০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৫) Manicktala Bridge।—Captain Thomas Prinsep ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৫,৫৭৬ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৬) Narikeldanga Bridge।—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে Captain Thomas Prinsep ১১,১২৫ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজ নির্মাণ করেন। ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

(৭) Baitakkhana or Beliaghata



Bridge \* ১-১৮০৫ খৃষ্টাব্দে James Prinsep সাহেব ১৫,৪০৫ টাকা ব্যয়ে এই ব্রিজ নির্মাণ করেন, ইহার Span ১০০ ফুট ও Road-way ১৮ ফুট।

### ১১। সার্বণ্য-বেড়ে

বাগবাাজার-নিবাসী অনেকই জানেন না যে, বাগবাাজারের অন্তর্গত কোন্ হানকে 'সার্বণ্য-বেড়ে' বলে। বর্তমান কপি-বাগানের উত্তর-পূর্ব দিকে গোপাল-মন্দিরের সেনে একটি বিগ্রহ আছে। সেখানে ইনি প্রতিষ্ঠিত, সেই হানের নাম 'বাবা ঠাকুরের তলা'। এই বিগ্রহ অতি প্রাচীন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্বে কলিকাতা, বেহালা-বিজ্ঞার স্বপ্রদত্ত সার্বণ্য-ঐশ্বরী মহাপ্রসিদ্ধের জমিদারী ছিল। উত্তর-দিকে এই হান পর্যন্ত তাহারিগের জমিদারীর সীমা ছিল। এই হানটুকুর নাম 'সার্বণ্য-বেড়ে' হয়আছে।

### ১২। বাগবাাজারে নবাব আলীবর্দি খাঁ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র †

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবন এবং পিতামহের অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈদ্যের দাতা রাজা রামকৃষ্ণ এই তিনজন নির্ভীক রাজকন্য নবাব-সরকারে জমা দিতে না পারায় তাঁহাদের ২০ লক্ষ টাকা দেনা হয়। ইহার মধ্যে তদীয় পিতামহ রামজীবন ও পিতা রঘুবান ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দেনা থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী নবাবই এই ১০ লক্ষ টাকার দায়ী হন। এতযাতীত নবাব আলীবর্দি খাঁ, নজদা

\* W. H. Carey's The Good Old Days of John Company, vol. II.

র কৃষ্ণপত্র-রাষ্ট্রাচারি দেওয়ান পর্যন্ত পৃথকিত কারিকচন্দ্রের দায় বংশের 'কিতাব-বশালী-গিরত' নামক একখানি উপাধের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাগবাাজারে 'আলীবর্দি খাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র' নামক অনেক কথা ইহাতে লিখিত আছে। — লেখক

বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকার দাবী করেন। এই নজদাওয়ার টাকা দিতে না পারায় আলীবর্দি খাঁ তাঁহাকে মুরশিদাবাদে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। মহারাজের জমিদারী বর্গীকরণ-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিত হওয়াতে প্রজাগণের এত দুর্গতি হইয়াছিল যে, তাহার মহারাজকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। মহারাজ নজর-বন্দী অবস্থায় ধীরে প্রধান কর্মচারীগণকে ডাকাইয়া সেনা-পরিষাদের পরামর্শ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কোন সম্ভাব্যজনক পরামর্শ প্রদান করিতে পারিলেন না। রঘুনন্দন মিত্র (সর্বাধিকারী) মহারাজের একজন সামান্য কর্মচারী হইয়াও তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! যদি কিছুদিনের জন্ত আপনার অবসার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি মহারাজকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।' ইহা বলিয়া তিনি যে উপায়ে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। বিচক্ষণ মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনন্দনকে দেওয়ানী-পদ প্রদান ও ধীরে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার পুত্র, জামাতা ও ভাগিনেরগণ জমিদারীর অনেকাংশ ইজারা লইয়া শ্রেষ্ঠতম কল প্রদান করিতেন। দেওয়ানগণ তাঁহাদের উপর বিশেষ ক্ষমতা ও আর্থিক প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহাদের নিকটে অনেক টাকা খাজনা বাবী পড়িয়াছিল। রঘুনন্দন মিত্র, অনেক কৌশলে তাঁহাদের উপর মহারাজ-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রকাশ-পূর্বক অঙ্গদিনের মধ্যেই অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ও তাহা নবাব-সরকারে জমা দিয়া এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া কলকাতা-রাজবাড়ীতে প্রজাগণ হইলেন। রঘুনন্দনের মরে ও বুদ্ধি-কৌশলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নজর-বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনই কিছুদিন পরে আলীবর্দি খাঁর দেওয়ান রাজা

মাণিকচাঁদের \* বিঘ্ন বিরাগ-ভাজন হন, এবং তাঁহারই আদেশে কানামের গোশার সমুখে ঠাড়াইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নজদাওয়ার টাকা দিয়া নবাবের নজর-বন্দী হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতামহ ও পিতার দেয় রাজস্ব ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা মাত্র পরিশোধ করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকার জন্ত কৃষ্ণচন্দ্রই দায়ী ছিলেন। এই টাকা দিতে না পারায় আরও একবার আলীবর্দি খাঁ তাঁহাকে মুরশিদাবাদে নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবাব, মহারাজের গুণে পীড়িত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ সম্ভালাসে নবাব তাঁহার সহিত শাসনালাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ সকল উদ্ভূত-ভাবে অধ্যয়ন করিয়া ও তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। কিছুদিন পরে কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র পাইবার জন্ত কৃষ্ণচন্দ্র, নবাবের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

এই সময়ে নবাব জলপথে কলিকাতার দিকে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহারাজ ও তাঁহার অল্পমুখী হইবার প্রার্থনা করায় নবাব আলোচন-সম্বন্ধে তাঁহাকে সত্বে মাইতে অস্থমতি প্রদান করিলেন। সন্নিগণ ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া নবাব

\* এই রাজা মাণিকচাঁদ কে, তাহাও বলা উচিত। অনেক মনে করিয়া থাকেন, ইনি বিদ্যুতধী, কিন্তু তাহা নয়। ইহার পুত্র নাম, — মাণিকচাঁদ বহু। ভবানীপুরে 'বলরাম বোসের বাট পুর্ব নাম, — মাণিকচাঁদ বহু। ভবানীপুরে 'বলরাম বোসের বাট পুর্ব' ও 'বলরাম বোসের ঘাই লেন' এই দুইটি রাজ্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা মাণিকচাঁদ এই বলরাম বহুর পিতা। তিনি অশ্বমতা বর্ধমান-মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তৎপরে তিনি আলীবর্দি খাঁর সরকারে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত ও মিরাক-উদ্দৌলার সময়ে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইবই অক্ষপণ-হত্যার অভিযাত্রক। যখন মাণিকচাঁদ ঢাকার শাসন-কর্তা ছিলেন, তখন তিনি তাকে আক্রান্ত হন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তখন বলরাম বহুর বয়স ৪ বছর মাত্র। বলরাম বহু পলাশীর যুদ্ধের এক বছর পরে অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জয়প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

মহা-সমারোহে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্রবীযাত পলাশী-ক্ষেত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। নবাবের বহুরা ও নৌকা-গুলি পলাশীর নিকটে আসিলে মহারাজ কহিলেন, 'দুর্দখ্যাবতিয়া! আমার পলাশী পরগণার অবস্থা একবার দখা করিয়া দেখুন। কোন হান জনশূন্য, কোন হান জলপূর্ণ এবং কোন হান অশ্রুর্ধর। ইহা হইতে রাজস্বের উপভুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা হুদায়া।' ক্রমে ক্রমে নবাবের বহুরা ও নৌকাগুলি নবাবপের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাজ কহিলেন, 'জাঁহাপনা! আমার জমিদারীর মধ্যে নবাবী সর্ব-প্রধান। ইহার ভিতরে একখানিও পাকা বাড়ী নাই। কয়েকখানি মাত্র তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। আমি কিঞ্চিৎ চূর্ণাগ, এই গ্রামখানিই তাঁহার পরিচর দিতেছে।' নবাব ইহা শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে নবাবের বহুরা ও নৌকাগুলি কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে কলিকাতা একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। ইহার কেবল উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে বাগবাাজার কয়েকটা লোকের বসতি ছিল, এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ-রূপে বাদা-বনে সমাচ্ছন্ন থাকিত। গঙ্গার ধারে বাগবাাজারের অশ্বা দেখাইয়া ইহার পূর্ব দিকের অবস্থা কিঞ্চিৎ, তাহা দেখাইবার জন্ত মহারাজ নবাবকে বিনীত-ভাবে পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিতে লাগিলেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা উল্লেখন করিতে না পারিয়া কিছুর গিয়া দেখিলেন চতুর্দিকে অরণ্য। এই সময়ে নবাবের অঙ্গুরগণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'এখানে ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণের বিঘ্ন ভয় আছে।' ইহা শুনিয়া নবাব কিরিয়া রাইবার অস্থমতি দিতেছেন, এমন সময় মহারাজ কহিলেন, 'জাঁহাপনা! যদি অহরোধ করিয়া এতদূর আসিলেন, তবে কৃপা করিয়া আরও একটু চন্দন।' তখন মহাশয় ও সঙ্গের আলীবর্দি খাঁ কহিলেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র! আর আধিক দূর বাইবার প্রয়োজন নাই। অস্ত্র তোমাকে পৈতৃক দায় হইতে



মুক্ত করিয়া দিলাম।" মহারাজ ও তাঁহাকে অধ্যক্ষ  
ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যাগত  
হইলেন। নদীয়া জেলায় উক্ত টাকার দায় রাজাদের  
'বিশ লাখী দায়' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

### ১৩। বাগবাঙ্গারে ওয়ারেন হেস্টিংসের খুশর-বাড়ী

প্রাচীন পুস্তক ও সরকারী কাগজ-পত্র দেখিতে  
পাওয়া যায় যে, বাগবাঙ্গার-মুন্সেফের পূর্বেই আট ঘর  
সাহেব বাগবাঙ্গারে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস  
করিতেন। ইহাদের মধ্যে দুই জনের নাম পাওয়া  
যায়,—একজন ক্যাপ্টেন চার্লস পেরিন (Captain  
Charles Perrin) ও আর এক জন কর্নেল  
সি-এফ. স্কট (Colonel Caroline Frederick  
Scott)। অবশিষ্ট ৬ জনের নাম পাওয়া যায় না।  
উক্ত স্কট সাহেব ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর এজিনিয়ার  
ছিলেন। ইহার একটা কভা ছিলেন। ইহার নাম মেয়ী  
(Mary)। এই মেয়ীর সহিত ক্যাপ্টেন ডুগাল্ড  
ক্যাম্পবেলের (Captain Dugald Campbell-এর)  
বিবাহ হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর  
ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেলের মৃত্যু হয়। সিরাজ-উদ্দৌলা  
কিনীত্ব বার কলিকাতা আক্রমণ করিলে কলিকাতার  
সাহেব ও বিবিগণ কলতায় একত্রে জাহাজে গিয়া  
আশ্রয় লন। ওয়ারেন হেস্টিংস তৎকালে মুর্শিদাবাদ  
হইতে চুনারে প্রহান করেন; কিন্তু সে স্থান হইতে  
গঙ্গার উপর দিয়া নৌকা-যোগে কলতায় আসিয়া  
উক্ত জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।



জাহাজেই তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে মেয়ীকে  
দর্শন করেন। দর্শন করিবামাত্র মেয়ীর মুষ্টিখানি  
হেস্টিংসের হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। তৎকালে  
হেস্টিংসের মাসিক বেতন ৩০০ টাকার অধিক ছিল  
না, বরং 'অল্প ইহাবারই সম্ভাবনা' \*। হেস্টিংস  
স্কট সাহেবকে সম্মত করিয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে  
বিবাহ করেন। তখন স্কট সাহেব বাগবাঙ্গারে বাস  
করিতেন। হেস্টিংসও মেয়ীকে লইয়া মধ্যে মধ্যে  
তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন।

### ১৪। বাগবাঙ্গারে ৬ বুড়ী শিব ঠাকুর

সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর  
উত্তর-পূর্ব-কোণে একটা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।  
ইহার গঠন-প্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটগুলি দেখিলে  
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা অতি প্রাচীন।  
ইহার মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ আছে। ইহা জগদরাম  
হালদার কর্তৃক স্থাপিত। (ক্রমশঃ)

\* তৎকালে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কন্সটাবল অতি  
অল্পই বেতন পাইতেন। তবে নানাবিধ ব্যবসায় করিয়া তাঁহারা  
অনেক টাকা উপার্জন করিতেন। জং সাহেব লিখিয়াছেন,—  
"The salaries appear very small. We find in  
1764 Warren Hastings, as Member of Council,  
had not more than Rs. 300/- per month, and yet  
lived well in a luxurious state of society, but  
money was then five times the value of what it  
is now, and Members of Government, up to the  
President himself, were allowed to trade; even  
chaplains and doctors had a share in the salt  
trade." Long's Selections from Unpublished Records  
of Government. Introduction, P. XXVII

## অদ্ভুত

দ্বৈতত্বদ্বন্দ্বত্ব

বাদ্শার মুখখানা\* গুরুতর গম্ভীর

মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে,  
কহিলা বাদ্শা-বীর যতগুলো দস্তী

দস্ত মুছিব টেঁচে পুঁচে।

উঁচু মাথা হোলো হেঁট, খালি হোলো ভরা পেট

শপাশপু পিটে পড়ে বেত।

কভু ফাঁসি কভু জেল, কভু শূল কভু শেল,

কভু ফ্রোক দেয় ভরা ফেত।

মহিষী বলেন তবে দস্ত বাদ্শা না বে

কী দেখে হাসিব তবে প্রভু,

বাদ্শা শুনিয়া কহে, কিছুই যদি না রহে

হাসিবার আমি রব তবু।

কুজো তিনকড়ি ঘোরে

পাড়া চারিদিককার,

দক্ষায় ঘরে ফেরে

নিয়ে স্কলি ভিকার।

বলে সিধু গড়গড়ি

রাগে দাঁত কড়মড়ি

ভিখ্ মেগে ফেরো, মনে

হয় না কি ধিকার?

স্কলি নিজে নিয়ে বলে

"এ বেতন শিক্ষার।"



কনে দেখা হ'য়ে গেছে নাম তার চন্দনা ;  
 তোমাতে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না ।  
 লোকে বলে খিটখিটে মেজাজটা নয় মিটে,  
 দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা ।  
 কুঁজো হোক, কালো হোক, কালো না অন্ধ না ॥

বাংলা দেশের মানুষ হ'য়ে ছুটিতে বাও চিত্তোরে,  
 কাঁচড়াপাড়ার জল-হাওয়াটা লাগল এতই তিতোরে ।  
 মরিস্ ভয়ে ঘরের প্রিয়ার, পালাস্ ভয়ে ম্যালেরিয়ার,  
 হায়রে ভীৰু রাজপুতনার ভূত পেয়েছে কী তোরে ?  
 লড়াই ভালো বাসিস্, সে তো আছেই ঘরের ভিতরে ॥

বেদনায় সারা মন কর্তেছে টনটন,  
 শ্রালী কথা বলল না, সেই বৈরাগ্যে ।  
 ম'রে গেলে ট্রাস্টেরা ক'রে দিক্ বর্টন,  
 বিবয় আশয় যত, সব কিছু যাক্ গে ॥  
 উনেদারী পথে আঁহা ছিল বাঁহা সঙ্গী—  
 কোথা সে শ্রামবাজার কোথা চৌরঙ্গী—  
 সেই ছেঁড়া ছাতা, চোরে নেয় নাই ভাগ্যে—  
 আর আছে ভাঙা ঐ হারিকেন লঠন  
 বিশ্বের কাজে তারা লাগে যদি লাগ্গে ॥

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,  
 স্নান মুখখানি কাঁচনিক,  
 আলুখালু ভাষা ভাব এলোমেলো  
 ছন্দটা নির্বোধনিক ।  
 পাঠকেরা বলে এ তো নয় সোজা,  
 বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা,  
 কবি বলে “তার কারণ আমার  
 কবিতার ছাঁদ আধুনিক ॥”

বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি  
 রোগা ফণী আর মোটা পক্ষিতে,  
 মণিকর্ণিকা ঘাটে ঠকাঠিক  
 যেন বাঁশে আর সরু কক্ষিতে ।  
 ছ'জনেই জানে না এ বউ কার,  
 মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার,  
 পক্ষি চৈচায় শুধু হাউ হাউ  
 “ওরে ফণী পার্বিনে বক্ষিতে ।”  
 বউ বলে “বুঝে নিই দাউ দাউ  
 মোর তরে জ্বলে ঐ কোন চিত্তে ॥”

পেন্সিল টেনেছিলু হুণ্ডায় সাতদিন,  
 রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন ।  
 কাগজ হয়েছে সাদা,  
 সংশোধনের বাঁধা  
 ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন ;  
 কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন ॥



সদিকে সোজাহুজি সর্দি বলেই বুঝি  
 যেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।  
 ডাক্তার দেয় শিব টাকা নিয়ে পঁইত্রিশ  
 ইনসুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।  
 ভাবনায় গেল ঘুম ওয়ুয়ের লাগে ধুম  
 শঙ্কা লাগাল পারিভাসিকে।  
 আমি পুরাতন পাপী, hanging শুনেই কাঁপি,  
 ডরিনাকে। সাদাসিধে কাঁসিকে।  
 শূন্য তবিল যবে বলে “পাঁচনেই হবে”  
 চেতাইল এ ভারতবাসীকে।  
 নাস'কে ঠেকিয়ে দূরে যাই বিক্রমপুরে  
 সহায় মিলিল খাঁছ মাসিকে ॥

নিজের হাতে উপার্জন

সাবনা নেই সহিষ্ণুতার।  
 পরের কাছে হাত পেতে খাই  
 বাছাড়রি তারি গুঁতার।  
 রূপণ দাতার অম-পাকে  
 ডাল যদি বা কমতি থাকে  
 গাল-মিশোনো গিলি তো ভাত

না হয় তাতে নেইকো হু-তার।  
 নিজের জুতার পাতা না পাই  
 স্বাদ পাওয়া যায় পরের জুতার ॥

## বৈজ্ঞানিক মণীশ নিক্তির

শ্রীতুলসীদাস মুখোপাধ্যায়

জ্যোতমপুরের জমিদার মহেশ নিক্তিরের ছেলে  
 বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মণীশ নিক্তিরের বড় ভুলো স্বভাব।  
 মস্ত বড় বিধান বটে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়  
 তার ব্যুৎপত্তিও প্রচুর — কিন্তু, তার কথা শুনে মনে  
 হয়, তার আশ-পাশে মসারো কি ঘটছে না ঘটছে,  
 সে তার কথা শব্দ রাখেন না। রাতদিন সে তার  
 ল্যাবরেটরীতে টেষ্ট-টিউব, খাতা, বই, নানারকম  
 জানোয়ারের হাড়, নানারকম পাছপালা নিজেই  
 প'ড়ে থাকে।

তাই মহেশ নিক্তির যখন মারা গেলেন, তাঁর  
 বৈমাত্রেয় তাই মহাশয়ের নিক্তির—স্তর সখদী কলকাতার  
 ধুরন্ধর ‘আডভোকেট ধুর্জটি ধরের পরামর্শে মণীশের  
 জমিদারীর ভাল ভাল কতকগুলো তালুকের দাবী ক’রে  
 এক মামলা জুড়ে দিলেন। ধুর্জটি ধর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ  
 জ্ঞান — গলায় ভদ্রীপতিকে বলেছিলেন, “এতবড়  
 সম্পত্তি, এতবড় হাবার হাতে থাকে একটা  
 ‘ক্রাইম’।” কিন্তু মহেশ বাবুর এতদীর্ঘ জীবনে মাজাল  
 হাইকোর্টের ব্যস্ত-মুখ। তিনি কোমরে চাদর এঁটে,  
 রূপাল চশমা নেটে, তাঁনের প্রাণীরের মত মণীশকে  
 আডাল ক’রে দাঁড়ানেন। কাজেই চলল মামলা, এবং  
 চলেও আসছে নিক্তিরবাবো আজ দশ বছর। মণীশের  
 চেঁকে চেঁড়া মারা ছাড়া আর বড় বিশেষ কিছু দেখতে  
 হয় না।

শেদিনও নিত্যকার মত মণীশ তার ল্যাবরে-  
 টরীতে চুকেছে, এবং নিত্যকার মত মাঝে মাঝে  
 ‘সিপ্‌সেরিয়া’, ‘এন্টারোকাইলাইট’ প্রভৃতি দুষ্প্রাণ্য গাছ-  
 গাছড়ার জুরোধী নাম ক’রে হুজুর ছাড়ছে। এমন  
 সময় নিত্যকার মত তার ভৃত্য বেণা তিনটার  
 সময় তার খাবার দিতে যবে চুকল। মণীশ  
 তখন টেবলের ওপর মাথা ঝুঁকে কি একটা

লিখছিল, মাথা তুলে হঠাৎ চাকরকে জিজ্ঞাসা করল,  
 “তুমি কে?”

“আজ্ঞে, আমি রাম।”  
 “ও, আচ্ছা দাঁড়াও।” তারপর আপন মনে  
 বকতে লাগল, “রাম — ত্রোতা যুগ — সেটা কি  
 ‘অ্যান্টিভাইনুভিয়ানে’র যুগ? না, তার পরের?”  
 তারপর কস ক’রে চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা—  
 সহদেব! তখন জঙ্গলে ‘আনোনা পোরোমোলা’  
 পাওয়া যেত?”

চাকর বেচারী আজ বার বছর চাকরী করছে,  
 কিন্তু এমন বিপদে কখন পড়েনি। মণীশ এই  
 স্থবীর্ণ বার বছরের মধ্যে কোন দিন ভুলেও তার  
 সঙ্গে কথা বলেছে কিনা, তাই তার সম্বন্ধে। সে  
 বিবম ভড়কে গিয়ে বলল, “আজ্ঞে, আমার নাম  
 রাম।”

মণীশের আর সাড়া নেই, মাথা খাতার ওপর  
 হুকুঁকে পড়েছে, ‘পার্কার’ ছুটেছে বেন পাক্সাব-মেল।  
 চাকর নিশ্চয়ই খাবার নামিয়ে রেখে পা টিপে টিপে  
 এগিয়ে দরজা পর্যন্ত বেই এসেছে, অমনি মণীশের  
 মাথা আবার উঠল, “ও-বাড়ীর কাকীমাকে জেঁকে  
 দাও ত।”

ও-বাড়ীর কাকীমা! বাবু বলে কি। রামের মাথা  
 আবার ঘুগিয়ে গেল।

আজ দশ বছর মামলা চলছে, আর এই দীর্ঘ  
 দশ বছর—কথা ত দুইরো থাক—ওদের সঙ্গে যখন দেখা-  
 দেবিও বন্ধ। রাম ভাবল—জনতে সে ভুল করেছে।  
 একটু স’রে এসে জিজ্ঞাসার করে বলল, “আজ্ঞে?”

মণীশ তখন বিড় বিড় করছিল, ‘সেপিডেনড্রোন’  
 ‘সেপিডেনড্রোন’! রাম সদুখে এসে দাঁড়াল। মণীশ  
 তখন চমকে উঠে আড়ানোড়া ভেঁকে বলল, “এ—



দশরথ—ও-বাড়ীর কাকীমা!—ব'লে আবার মাথা নীচু করল।

চাকর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল, এবং বাইরে এসেই ভূতা-মহলে সপর্ণের জানিয়ে দিল যে, বাবু তার সঙ্গে আজ অনেক গল্প করেছেন। বাবু একটু পাগলা গোছের বটে, তবে হ্যাঁ, লোক মন্দ নয়। এখন তার অনেক কাজ, ও-বাড়ীর গিড়ীকে ভেঁকে দিতে হবে। জগদী দরকার—বাবুর হুকুম।

সরযু বখন শুনলেন, মণীশ তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, মহাদেব বাবুকে ডেকে তিনি বললেন, “কুন্ডু পা—তোমাদের মৌনী মনির আজ হঠাৎ টনক নড়ে উঠেছে।”

মহাদেব বাবু বললেন, “কার?”  
“ঐ তোমাদের পাগলার গো—কি খেয়াল চেপেছে, আমাকে ডাকছে।”

মণীশকে এর অশ্রদ্ধা ক'রেই নাম দিয়েছেন ‘পাগলা’, আর ক'রে নয়। মহাদেব বাবু ক্র-কুঁচকে বললেন, “কেন?” গিড়ী বললেন, “কি জানি—রাম বোটা ত এই ব'লে গেল। ওর সঙ্গে নাকি—”

মহাদেব বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, “নিজে ত আসতে পারত; ও! আবার চাকর পাঠিয়ে নবাবী করা হয়েছে।”

সরযুর কিত্ত অত্যন্ত কৌতুহল হয়েছিল। বললেন, “বাই না—দেখেই আসি না। এতদিন পরে ডাকছে বখন। আর দেখ, ওর বোধ হয় ইচ্ছে নয়—তুমি জানতে পার যে, ও আমার ডাকছে। তাই চুপি চুপি চাকর পাঠিয়েছে। কি বল, বাবু?”

মহাদেব বাবু দাবা খেলতে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে বললেন, “হাৰে যাও, তবে একটু শাবানস হ'য়ে থেকো। কিছু শুকুতে বললে শুক না। কিছু যদি চাওতে বলে, যেন দেখ না। ওর ঘরের কল্যাণগুলো দেখে আবার যেন ‘হাটের রোগ ক'রে ব'সে না।

ভালয় ভালয় শীগুগির কিরে এস।” ব'লে তিনি বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ালেন।

সরযু বখন মণীশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তখন সে কতকগুলো হরিণ-জাতীয় জীবের মাথা নিয়ে কি যেন দেখছিল, আর পেন্সিল দিয়ে নোট লিখছিল।

“এঃ মাগো! যেন গো-ভাগাড়; মরণ আর কি! বলি কি বলছি?” ব'লে তিনি মণীশের দিকে এগিয়ে এলেন।

মণীশ মুখ তুলে বলল, “আউ—কে?”  
সরযু ভাবলেন, দশ বছর দেখিনি, হয়ত বা চিনতে পারছে না। বললেন, “আমি—আমি—তোর কাকীমা।”

মণীশ তখন খাতায় কি একটা আঁকছিল—বলল, “হ্যাঁ—কতদিনের?”

সরযু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, “কি কতদিনের?”  
মণীশ ব'লে উঠল, “এই—ই অক!” আর একটু হ'লেই একটা হরিণের মাথা—বা! হয়ত মণীশের কাছে অতি সুগামান—টেবুল থেকে প'ড়ে বেত। সে সেটা যত ক'রে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, “একি মামীমা—বহন!”

“মামীমা! মামীমা কে তোরা? আমি, আমি তোরা ছোটকাকী!”  
“আই নী! কাকীমা! আচ্ছা কাকীমা! কাকাবাবু আজ ক' বছর হ'ল আপনাকে বিয়ে করেছেন?”  
“এই জিজ্ঞাসা করতে ডান্ডি নাকি দশ বছর পরে?” সরযু গরম হ'য়ে উঠছিলেন—অসুখ স্তরে বললেন, “পোড়ার বাদর।”

মণীশ আপন মনে তখন গবেষণা করছে, “আমার বয়স হ'ল এই বরিশ, আমার আগের কাকীমাটি মারা বান আমার জন্মবার ন' বছর আগে—আর কাকাবাবু—মা বলতেছেন—বড় মারা যাবার এক মাস বাদেই আর একটা বিয়ে ক'রে আসেন।” তারপর সরযু দিকে তাকিয়ে বলল, “উঃ! আপনি আমার

অনেক দিনের কাকীমা দেখছি! চল্লিশ বছরেরও ওপর—বহুৎ আচ্ছা কাকীমা!”

সরযু এবার স্পষ্টই রেসে গেলেন, বললেন, “তোরা এই পাগলামী শোনাতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলি নাকি? এই অবলায় আমার ব'সে ব'সে পাগলামী শোনার সময় নেই। কি দরকার, বলি ত শীগুগির ব'ল।”

সরযু এবার বৈজ্ঞানিক বাধ ভেঙ্গে গেল। বললেন, “আমি চললাম।—হুতাগা!”

মণীশ বলল, “উহুহু, যাবেন না, যাবেন না। আমি আপনাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই—চল্লিশ বছর একটানা কাকীমাপিরা করা—এ একটা রেকর্ড—।”

সরযু চ'লে যাচ্ছিলেন, কিরে ধাঁড়ালেন, “কী।



‘একি মামীমা—বহন!’

মুহু হাসিতে মণীশের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; বলল, “আমিও তাই ভাবি। সময় নেই—দিনগুলো এত ছোট।

আচ্ছা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের দিনগুলো এর চেয়ে নিশ্চয় বড় ছিল, না? নতুন যে যুগে ‘মার্ভেলডোমের’ মত ক'রে বলল, “বহন! আমার মামলা করছি, না? কিন্তু কি বা হচ্ছে এই মামলা-মকদ্দমা ক'রে? কি বা হবে



এসব বিষয়-আশর? কি বলেন—আঁ' ব'লে সরযুর দিকে চাইল। সরযু চুপ করে পাড়িয়ে রইলেন, ভাবতে নামলেন, আবার না-আনি কি একটা ব'লে বসবে, তারি বুঝি পায়তারা ভাঙছে। মণীশ বলল, "এই ছ'টো দলিল। এই—এইটোতে আমি মণীশ মিত্তির—আমার যাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি, টাকাকড়ি ইত্যাদি সব—এই এক ল্যাবরেটরীর জিনিষ-পত্রের বাদে"—ব'লে হাত দিয়ে ঘরের চারিদিক দেখাল—"এই আপনি সরযু মিত্তির—এই আপনাকে দান করলাম। এই—এই আমার সই, আর আজকের তারিখ; আর এই দলিলটার"—ব'লে আর একটা কাগজ নিয়ে বলল, "এতে আপনি সরযু মিত্তির এই আমাকে—এই মণীশ মিত্তিরকে—আপনার স্বাবর-অস্বাবর মায় টাকাকড়ি সমেত সব দান করলেন। এই—এই খানটোতে সই করুন।"

সরযু মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেন। এ নিশ্চয় এই মামলার এক প্যাচ।

বললেন—"তার মানে?"

মণীশ হেসে বলল, "তার মানে এই যে, আমার বিষয়-সম্পত্তি, যার জন্তে আপনারা—আপনি আর কাকাবাবু—আমার সঙ্গে লড়াই করছেন, তা' আমি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই, আর তার পরিবর্তে আপনার নিজস্ব নামে বা' সামান্য কিছু আছে, ধরুন না যেমন কলকাতার ঐ বাড়ীখানা, আমি নিতে চাই। আমি বুঝতে পারছি, আমার আর এসব বিষয় রাখার হায়ারাম পুড়িয়ে উঠবে না। আমি তাই দেশ ছেড়ে কলকাতায় যেতে চাই। কি, আপনার বিবাস হ'ল না? এ দলিল কিছ পাকা। আমি নিজে কলকাতায় সরেনবাবুর কাছ থেকে করিয়ে এনেছি, সন্দেহ করবেন না। সন্দেহ করবার কোন কারণই নেই এতে। এই নিন কলম, হা এই—এই খানটোতে একটা সই—"

সরযু কচি পুঁকী নন। ব'সেছিলেন, উঠে পাড়ালেন, বললেন, "এত বড় একটা কাজ। আজ্ঞা দেখি শুঁকে

জিজ্ঞাসা করে?" কিন্তু বাড়ী গেলেন ঝড়ের মত। যদি দলিলগুলো ঠিক হয়। উঃ, লাখ টাকার সম্পত্তি!

মণীশ তখন তার ঘরে শীশ দিতে দিতে পায়তারা করছিল। বাড়ী গিয়েই সরযু মহাদেব বাবুকে তলব করলেন। মহাদেব বাবু আসতেই সরযু মণীশের বিষয় বদলাবদলীর কথা বললেন। মহাদেব বাবু হাকিয়ে উঠলেন, "বল কী! এ যদি সত্যি হয়, তবে যে রাজা হয়ে যাব। তোমার নিজের বলতে আছে কি? ঐ কলকাতার বাড়ীখানা, আর খান কতক গরন। না, আমি এখনই মোক্তার বিজয় বাবুকে নিয়ে আসছি, আজই সই করে ফেল, গর মনকে বদলাবার সময় সেগুণা হবে না। বন্ধ পাগল কিনা!"

সন্ধ্যার মধ্যেই মহাদেব বাবু সেখানকার সবচেয়ে বড় মোক্তার বিজয় বাবুকে নিয়ে গিল্লীসমেত মণীশের বাড়ী হানা দিলেন। বিজয় বাবু বহুক্ষণ দলিল ছাটি পরীক্ষা করে রায় দিলেন, "না, ঠিকই আছে, সই করতে পারেন।"

মণীশের নিম্ন-চিত্তার জন্ত তাঁর ছং হ'ল।

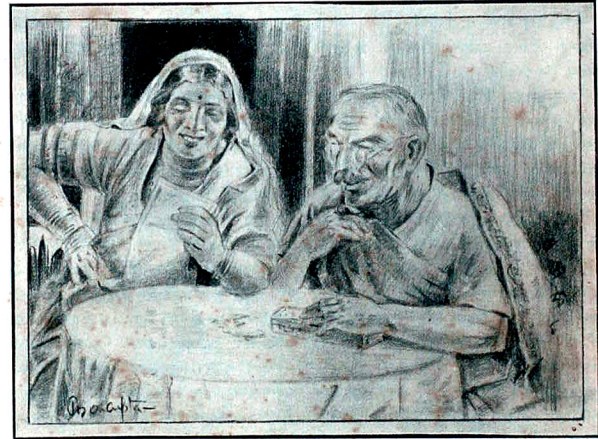
সুবিধা পেলে হয়ত উপদেশও দিতেন—কিন্তু মহাদেব বাবু, দলিল যদি সত্যি হয়, পাঁচশ' টাকা কি কবুল করেছেন। সই হয়ে গেল; বিজয় বাবু সাক্ষী হিসেবে সই করলেন। সরযু আনন্দে কি করবেন, ঠিক করলে না পেরে বাড়ী গিয়েই ভাই ধুর্জট ধরকে চিঠি লিখতে বসলেন। মামলা-মকদ্দমার শাণি—লাখটাকার সম্পত্তি লাভ! কম আনন্দের কথা!

সে-রাত্রে কুর্ভা-গিল্লীর ভাল করে ঘুম হ'ল না। সকাল হ'তেই মণীশের সেগুণা দলিলখানা নিয়ে ছ'জনে যুথোমুখি হয়ে ব'লে আছেন। গিল্লী দলিল-খানাতে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "এবার কিন্তু আমায় একসেট জড়োয়া গরন' করে সেগুণা চাই—হ'।" জড়োয়া গরন পুরার শাখ তাঁর বয়স পঞ্চাশেছিল হ'লেও সেটেনি।

কুর্ভা একবার দলিলখানা নেড়ে চেড়ে বললেন,

"পাড়াও পো—আগে একখানা মোটর কিনি।" জরুরী 'তার' করেছি—যার আজ রবিবার হয়ে গেল—হেটে হেটে আইন-আদালত করে তাঁর হাটুতে পাগনি তোমরা?"

জ'জনেই প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "না!"



‘এবার কিন্তু আমায় এক সেট জড়োয়া গরন' করে সেগুণা চাই’

এমন সময় ধুর্জট বাবু এসে হাজির। কুর্ভা চমকে উঠে বললেন, "কি ব্যাপার! হঠাৎ যে?"

গিল্লী হেসে বললেন, "তুমি—এরি মধ্যে?" রাতের চিঠি যে সকালেই কলকাতায় পৌছয় না, তা' তিনি জানতেন।

ধুর্জট বাবু একখানা চেয়ারে ব'লে পড়লেন। বললেন, "আমার 'তার' পাগনি তোমরা?"

জ'জনেই সমস্তর ব'লে উঠলেন, "কিসের 'তার'?"

ধুর্জট বাবু ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, "সে কি? আমি যে বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় তোমাদের

ধুর্জট বাবু বললেন, "তবে? 'তার' খানা কি হারিয়ে গেল?"

কুর্ভা বললেন, "চুলায় যাক তোমার 'তার'! তুমি যখন সশরীরে ভালয় ভালয় এসে পড়েছ—তখন আর 'তার' 'তার' করে মাথা ঘামাতে হবে না। এদিকে কাল কি কাণ্ড হ'য়ে গেল জান? মণীশ আর মকদ্দমা করবে না! আমার বোধ হয়, সরেন বাবুর সঙ্গে গর কোনরূপ ঝগড়া হ'য়ে থাকবে। আর তা' ছাড়া—তুমি যে ঐ নতুন ব্যারিষ্টারটা—কি যে নাম ছাই—ঐ চারু চাটুয়াকে লাগিয়ে দিয়েছ, তা'তেই বোধ হয় খাবড়ে গিয়ে এই কাজটা করে ফেললে!"



ধৃষ্টি বাবু চক্কল হয়ে বললেন, “কি কাজ?”

মহাদেব বাবু বললেন, “মণীশ তার সমস্ত বিষয় সব্বকে দান করে দিয়েছে”, এবং বিজয়োৎসব-কণ্ঠে বললেন, “এই দেখে তার দলিল!”

ধৃষ্টি বাবু দলিলটি দেখলেন— “ভাল ক’রেই দেখলেন—তারপর বললেন, “হোকবার শুধু-ও এ যোগ্য হ’ল কেন?”

সরসু বললেন, “মাথায় ওর বরাবর কেমন একটু যেন ছিট আছে বাপু। আমার বললে, ‘কাকীমা, তোমার বা’ কিছু আছে আমার দাও, আর আমারটা তুমি নাও।’ আমার কিন্তু মাটে ইচ্ছে ছিল না, তা শুঁরা ধরলেন—কাজেই—”

ধৃষ্টি বাবু মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, “আর নিলে একটা দলিলে সেই ক’রে তোমার বখা-সর্ব্ব্ব থাকে?” তাঁর মুখ এক নিমেষেই কালি মেয়ে গেল; বললেন, “এ করেছ কি তোমরা! আমি একটা শজ মামলা নিয়ে বিরত হ’য়ে পড়েছিলাম ব’লে আসতে পারলাম না, আর ইতিমধ্যে তোমরা এত কাণ্ড ক’রে ব’লে আছ!”

মহাদেব বাবু মনে করলেন, ধৃষ্টি বাবু তাঁকে পরিচয়ের নামে খেলো ক’রে দিচ্ছে। সরাসরি বললেন, “কোন? অভিযাতি কি করা হয়েছে? দলিলটা দ্বন্দ্ব মত পাকা!”

ধৃষ্টি বাবু বললেন, “দলিলটা যে পাকা, সে-বিষয়ে বিদ্‌মাজ সন্দেহ নেই। আর তাই আচ্ছাদ্যসা কিন্তু তোমরা রাষ্ট্রার সম্পত্তি পেয়ে হারালে। সরসুর নামে ভাবীর যে চুক্তিখানা কেনা হয়েছিল—সেখানা পণ্ডি লাখ টাকার বাজী জিতেছে—আর তাই বৃহৎপতির বিন শবর পেয়ে আমি তোমাদের ‘তার’ ক্রেতাইলাম। এখন ব্যাপার দেখে বুখি—সে ‘তার’ ঐ ছৌড়াটার হাতে গিয়ে পড়েছে। ছৌড়াটাকে হারা মনে করেছিলাম—এখন দেখছি—একটি মিটনিটে শরত।”

তার কথা শেষ হবার আগেই মহাদেব বাবু

হাউ-হাউ ক’রে কেঁদে উঠলেন—সরসু সজ্জাহারা!

ধৃষ্টি বাবু বললেন, “এখন এমন ভড়কে গেলে চলবে না। আগে চল, পোষ্ট অফিসে—‘তার’টা এসেছিল কিনা, খোঁজ করা যাক। আর যদি এসে ওর কবলে প’ড়েই থাকে, তা’ হ’লে যে দলিলটা ওর কাছে আছে, সেটা উদ্ধারের একটা চেষ্টা ক’রে দেখা যাক।”

মহাদেব বাবু কানতে কানতে ধরা-গলায় বললেন, “তা’ যদি পার দাদা।—” তারপর চোখ মুহূর্তে মুহূর্তে ধৃষ্টি বাবুর সঙ্গে চললেন পোষ্ট অফিস। সরসু ব’লে ব’লে হাঁক পাড়তে লাগলেন, “হস্তের ধন নিষি—নিপাত যা! নিপাত যা!”

পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে ‘তার’ আসে না, সেটা একটা ‘ড্র্যাং-অফিস’; ‘তার’ আসে বড় পোষ্ট অফিসে—সেখান থেকে দশ মাইল দূর। তবে বৃহৎপতির বিন একজন পিয়ন একটা ‘তার’ নিয়ে এসেছিল বটে, এবং পোষ্টমাস্টার প্রথমে ওপর মি: এম, মিজ লেখা থাকার জ্ঞত সেটা মণীশকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কারণ, এ অঞ্চলে মণীশের নানা দেশ থেকে যত ‘তার’ বা চিঠি আসে, অজ কারও তত আসে না।

হতাশ হ’য়ে শালা-ভদ্রীপতি সেখান থেকে ফিরে এলেন। বাড়ী এসে ধৃষ্টি বাবুর পরামর্শ মত সরসু আর ধৃষ্টি বাবু চললেন মণীশের বাড়ী—উদ্দেশ্য, মণীশকে ভোগা-দিয়ে দলিলটা হাত ক’রে নেওয়া। কাজটা যে সহজ হবে না, এতক্ষণে সেটা সবাই বুঝছেন। তবু—‘যেয়ে ক্রতে যদি নিশাতি’—ইছাদি।

সরসু ধৃষ্টি বাবুকে বাইরে রেখে নিজে প্রথমে চুকলেন মণীশের ল্যাবরেটরীতে—কি জানি যদি তাঁর মানী ভাইকে কিছু অপমান ক’রে বসে। মণীশ তখন একটা প্রকাণ্ড সাপের কয়লা নিয়ে পরীক্ষা করছিল। সরসুকে চুকতে দেখেই ব’লে উঠল, “অ্যাপ—না—‘খ্যানাকোতা’? ‘বোয়া’ রাসের যে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই—এই যে দিদি-না—বসুন।”

সরসু চৌঁট উঠে অশ্লষ্ট স্বরে বললেন, “মরণ আর কি!” শ্লষ্ট স্বরে বললেন, “বাবা মল্প। আমার দাদা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছেন।” ভাবলেন ‘বাবা’ ‘বাহা’ ব’লে মনটা ভিজিয়ে রাখতে বোমটা কি। মণীশ তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে সাপের দাঁত শুখাচ্ছে—বলল, “আচ্ছা—সেতে পারেন।” সরসুও যেন স্তনতে পাননি—বললেন, “ডেকে দেব?” মণীশ মাথা তুলল, “কে? কি চানু এখানে?” “সরসু একটু যেন দ’মে গেলেন—বললেন, “আমার দাদা এসেছেন।”

মণীশ বলল, “কই—দেখতে পাচ্ছিনে আমি।” সরসু তাতাভাতি ডাকতে গেলেন। মণীশ আবার নিজের কাজে জুবে গেল।

ধৃষ্টি বাবু যখন এসে ল্যাবরেটরীতে চুকলেন, মণীশ তখন একটা মগ্ন হাড়ের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ধৃষ্টি বাবু চুকতেই—“এই যে খ্যোঁখানদা—” ত্রিক সময়ে এসে পড়েছেন—“ব’লে হাড়টা হাতে ক’রে সোজা হ’য়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর যেন কোন বিভ্রাটের বিজ্ঞান-রাসে বস্তু তা দিচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, “এই যে লখা মোটা লাঠির মত হাড়ের টুকরোটা আপনারা দেখছেন, এটাকে বলে—‘চিবিয়া’। এটা কোন জন্তুর পায়ের হাড়। এই-হাড়ের টুকরোটি দেখতে বদিত সামান্য—তবু এ মহামূল্যবান বস্তু। এটা এখন পাওয়া যায় রেজিস্টার একটা পক্ষতগুহার। সুঁড়িয়ার সাহেবের মতে এটা একটা ‘মেগাথেরিয়াম’ের চিবিয়া। কিন্তু আমার—”

ধৃষ্টি বাবু এগিয়ে এসে বললেন, “মণীশ! তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।”

মণীশ যেন বগে উঠে যাচ্ছিল, দাঁ ক’রে পৃথিবীতে প’ড় গেল। চমকে উঠে সরসুকে দেখিয়ে বলল, “তবে যে মাসীমা বললেন, আপনি লগুন জু থেকে আসছেন! আপনি জানতে চান—”

ধৃষ্টি বাবু দাঁত দিয়ে চৌঁট কামড়ে ধ’রে বললেন, “হী, হী সে ঠিক। সে পরে হবে ব’ন।

এখন, কাল রাতে যে দলিলটা (সরসুকে দেখিয়ে) ইনি গই করেছেন না, সেটা আমি একবার দেখতে চাই।”

মণীশ বিস্মিত কণ্ঠে বলল, “রাতে—দলিল—আপনার ইনি দেখেছেন—কই সে রকম কোন প্ল্যানট ত—”

ধৃষ্টি বাবু একটু রেগে উঠেছিলেন, “খ’কালো গলায় বললেন, “প্ল্যানট নয়—প্ল্যানট নয়—কাগজ।”

মণীশ বলল, “ওঃ! কাগজ। তা’ কাগজ সব্বদে আমি বিশেষ কিছু জানিনে—অবশ্য যে সব বাস থেকে কাগজ তৈরী হয় তা’ কতক কতক আমি দাঁড়ী করেছি। তবে ঐ যে বললেন, দলিল-কাগজ—ও যে কি বস্তু—তা’ আমার এই এত বই রয়েছে, আপনার বিশ্বাস না হয়, খুঁজে দেখতে পারেন, কোথাও এক লাইনও লেখা নেই। আচ্ছা তা’ হ’লে—” সে হাত ছাটি ভেঁড় ক’রে কপালে ঠেকাল।

ধৃষ্টি বাবুর ধৈর্য-ভ্রুতি ঘটল—বললেন, “দলিল কি, জান না? নেকামি পেয়েছ? ষাউগুলা।”

মণীশ বিশেষ লজ্জিত হ’য়ে ব’লে উঠল, “ছি ছি, এ আপনি কি করলেন, এই হাজার হাজার বছরকার ‘দলিল’দের মধ্যে ষাউগু। আপনার আমার ল্যাবরেটরীর ডিরিগ্‌নি নষ্ট করলেন যে। আপনার রেখি-একটুতেই মাথা গরম হ’য়ে গুটে। এক কাজ করবেন, রোজ মাথায় ‘অ্যাপেড পারফলিয়াটা’ ব্যবহার করবেন। দেখবেন বিশেষ—”

ধৃষ্টি বাবু আর স্তনলেন না—রেগে বের হ’য়ে গেলেন।

সরসু দেখলেন, আর কোন আশা নেই; তাই বাবার সময় কান-কান স্বরে চাঁৎকার ক’রে ব’লে উঠলেন, “হে ভগবান! হে মা কালী! এই হতভাগ্যর হাড়গুলো যেন ওর ঐ অ্যাড-প্যাড-ভাডার মত মননভর হ’য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।”

মণীশ গভীর হ’য়ে ডাকল, “কাকীমা!”



সরযু চ'লে যাক্খিলেন, থমকে দাঁড়ালেন। হয়ত গিয়েছিল। আমারও কাকের কুঠাতে মনে ছিল না।  
তার একটু আশা হ'ল—যদি দলিলাটা ফিরিয়ে দেয়। এটা ক্যাকাবাবুকে দেবেন।”



“.....এই ‘তার’ বানা পিয়ন ভুলে আমার দিয়ে গিয়েছিল.....”

—বললেন, “কি?”

সরযু সেই পচিশ লাখ টাকা পাওয়ার খবর-আনা মণিষ পকেট হাতড়ে একখানা কাগজের ‘তার’ বানা পায়। দলে বর থেকে বের হ’য়ে ক’রে বলল, “এই ‘তার’ বানা পিয়ন ভুলে আমার দিয়ে গেলেন।”



## রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

ঐশ্বর্যবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস

(১)

ছোটগল্প আরতনে ছোট। কাজেই তাহাতে স্থলীয় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বা বহু ঘটনার সমাবেশের স্থান নাই। অথচ গল্প-উদ্ভাসের প্রাণ হইতেছে তাহার উপাখ্যান, তাহাতে ছুই একটি ঘটনা থাকি চাই-ই। গভীর ও ব্যাপক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের স্থান নাই বলিয়া যে ক্ষুদ্র ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ছোটগল্প গড়িয়া উঠে, তাহাকে গুণ বোধী মুখ্য করিতে হয়। ‘লিরিক’ কবিতা যেমন একটি ভারকে আশ্রয় করে, ছোটগল্প তেমন একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে। তাহার মধ্যেই যে যেমন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যে সব গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ঘটনার বর্ণনা নহে, সেই সব গল্পেও একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করা হইয়া থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘স্বতা’। মুক্ প্রকৃতির সঙ্গে মুক বাগিকার আন্তরিক সংযোগ এই গল্পের উপজীব্য; কিন্তু তবুও এমনভাবে গল্পটি লিখিত হইয়াছে যেমন প্রভার বিবাহ ও তাহার বার্তার বর্ণনা করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া ছোট-গল্পের উপসংহারে একটি climax ও anti-climax থাকে। পূর্ণবর্তী সমস্ত ঘটনাকে এইরূপভাবে সাজান হয়-যেমন তাহার। একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের উপকরণ মাত্র; অথচ উপসংহারটি যদি সেই পূর্ণবর্তী ঘটনার শেষ সিদ্ধান্তমাত্র হয়, তবে তাহা জ্ঞানিতির প্রতিজ্ঞার মত সহজ ও সরল হইয়া দাঁড়ায়। তাহার মধ্যে বিস্ময়-কর কিছুই থাকে না। তাই ছোটগল্পের উপসংহারে খানিকটা অপ্রত্যাশিত অংশ থাকে। আমাদের মনে হয় পারিপার্শ্বিক আবহেটনের পরিণতি অন্ততাবে হইতে পারিত, কিন্তু কোন চক্কর চক্রে ঘড়ির কাঁটা অন্যদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আমরা প্রশস্ত হইতে পারিলাম, কিন্তু হই নাই। উদাহরণস্বরূপ

রবীন্দ্রনাথের ‘সমস্ত পূর্ণ’ গল্পটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ‘অছিমাদি ও তাহার মাতার’ প্রতি জমিদার কলমোপালা যে রূপা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কলমোপালা স্বভাবতঃ দূরাপরবশ ও দাম্পিক; কাজেই এই অসুখস্বপ্ন অতিরিক্ত হইলেও অস্বাভাবিক মনে হয় নাই। তাহার পর জমিদারপুত্রের সঙ্গে তাহাদের যে বিরোধ চলিতে লাগিল, তাহার ফলে অছিমের সর্বনাশ সাধনই সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। হঠাৎ কলমোপালা আসিয়া কি কথা বলিলেন, তাহাতে শুধু রামলাচেনের সমস্তাই সমাধান হইল না, অছিম ও বিপিনকিশোরের শত্রুতারও শেষ হইল। বাহার সঙ্গে বিপিনকিশোর এতদিন শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে, সে হইল তাহার ভাই। এই পরিসমাপ্তির জন্য কেহই প্রশস্ত ছিল না; অথচ এই কথাটা জ্ঞানিয়া লইলে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি স্থান সংযোগ দেখা যাইবে।

এই প্রকারের গল্পের একটি দোষও আছে—ইহা অনেকটা ডিটেক্টিভ গল্পের মত। সমস্ত পূর্ণগল্প-মধ্যেই ইহার কৌশল নিহিত থাকে; কোন একটি অজ্ঞাত সত্যের উদ্ধার অথবা কোন একটি অসুস্থ ঘটনার অবতারণা—ইহাতেই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে চরিত্রজিহ্বের, মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধানের সম্ভাবনা কম। পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক মোপাসাঁ এই কটকটক অতিক্রম করিয়াছেন তাহার Irony-র সাহায্যে। তিনি দেখাইয়াছেন, আমরা বুদ্ধি দিয়া যে সত্যতা গড়িয়া তুলিয়াছি, অথবা নীতি ও বিচারশক্তির সাহায্যে যাহা স্থির করি, আমাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সর্বদাই তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই। আমাদের



বাহিরে যে শক্তি আছে, তাহার রশ্মিও আমরা সংরক্ষণ করিতে পারি না। আমরা যেমনটি চাই, ঠিক তেমনটি পাই না। গণিকার মধ্যে মহনীর বৃত্তি দেখিতে পাই, আবার সত্যীসাক্ষীর মধ্যেও গণিকার প্রকৃতি লুক্কায়িত থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে প্রকৃতির, ব্যক্তির সঙ্গে বৈশিষ্ট্যের লুক্কায়িত খেলা মোশাশীর গল্পের প্রধান গুণ।

বিজ্ঞপ ও শ্রেণের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার চরম সৃষ্টি হয়না। তাহার রচনায হাজারসের অবতারণা করা না হয়ইহাচ্ছে এমন নয়, এবং শেষ বয়সের ছোটগল্পে অনেক জিনিসের উপর তিনি বাস করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞপ ও ব্যঙ্গ তাহার রচনার প্রধান উপাদান নহে। তাহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ঘটনার পরিণতি সাধনে বা শ্রেণীবিজ্ঞপে নহে। তিনি কবি। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে তিনি মানবজন্মের গভীরতম অমুহুরিত জাগাইয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উন্মোচিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবয় সামান্য হইলেও তাহার মধ্যে অবিচলিত হইয়াছে মানবজন্মের গোপনতম কাহিনী, তাহার চিরন্তন সমতা। অবিকার্য গল্পে তিনি একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপজীব্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ গল্পে ঘটনাকে পোশ করিয়া ঘটনার অন্তরঙ্গবাহী

রহস্তের অবিচলিতকে মুখ্য করা হয়ইহাচ্ছে। "স্বপ্নিত পাশাণ" প্রভৃতি গল্পে কোন বিশেষ ঘটনার পরিণতি নাই; উপজ্ঞাপিকা ও উপসংহারে তেমন কোন পার্থক্য নাই। আবার যেখানে ব্যঙ্গবিজ্ঞপের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও ব্যঙ্গবিজ্ঞপের অতীত মানব-জন্মের স্বয়ংসংবেদনাবোধই মুখ্য হয়ইহাচ্ছে। "তাগ" গল্পে প্যারীশরীর হেমন্তের দৃষ্টিয়া লইয়া কৌতুক করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যঙ্গবিজ্ঞপকে অতিক্রম করিয়াছে কুহুম ও হেমন্তের দেবোহত প্রণয়, বাহার গল্প কুহুম তাহার জীবন বিপ্লবের বিতে চাহিয়াছে এবং হেমন্ত সর্বত্র তাগ করিয়াছে। "দাসীরা" গল্পে স্থলিয়ার প্রতিহিংসা বেতাবে ব্যর্থ হইল তাহা অশ্রুতের নিদ্রার

পরিহাস বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ ঐ গল্পের শেষ কথা নহে। কবির কল্পনা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে প্রেম ও প্রতিহিংসার মধুর সম্মিলনে। 'বিচারক' গল্পে অল্প মোহিতমোহনের শুচিতার উপরে প্রেম করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে কদর্য জীবনের অপরাধের শেষ শাস্তি অল্প দিকোত্তমোহন বিধান করিলেন তাহার একটি মহনীর মোহও আছে, এবং কবির কাছে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য জিনিস। বারবনিতা ক্ষীরোদার অন্তরালে হেমশরী তাহার প্রথম প্রণয়ের দেবতার বৃত্তি লইয়া সন্মোহনে আত্মরক্ষা করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাহাই মুখ্য জিনিস। তাই কদর্য বর্তমানের অন্তরালে লুপ্ত অতীতের স্মৃতিতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনি মানবজীবনের ক্ষুদ্র স্বপ্নাঙ্ক, আশা-আশঙ্কার মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি অনন্তের সন্ধানী ও বিপুল স্বপ্নের পরিয়াসী, তিনি বেদনাবোধনিম্ন স্বর্ণ হইতে সহস্র অপূর্ণতায ভরা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া তিনি অকানা অকোনার আরাধনা করিয়াছেন। এই কারণে 'লিরিকের' মত ছোটগল্পের আটের সঙ্গে তাহার প্রতিভার একটা স্বাভাবিক সঙ্গিত আছে। ছোটগল্পের বিবয় সামান্য, তাহা সামান্যতঃ কাহারও চোখেই পড়ে না। এগানের পোষ্টমাঠার কি করিয়া রাখিয়া খাইল, ইতুলের ছোট ছেলেকে অভ্যাচারী পণ্ডিত মহামুখ কি নাম ধরিয়া ডাকিলেন, ইহা লইয়া কাহারও মাথাব্যথা নাই। অথচ এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার চতুর্দিকে জন্মের যে প্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার উৎপত্তিস্থান আমাদের অজ্ঞাত। তাহার বৎস অপ্রতিহত, তাহার সংযোগ বিরাট বিপুলের সঙ্গে। 'একরাতি' গল্পটির সঙ্গে অর্জুণ এলিট রচিত *The Mill on the Floss* নামক উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের সাদৃশ্য আছে। Tom Tulliver ও তাহার ভগিনী Maggie'র কঠোর বিচ্ছেদ হইয়া 'আগাছে'; ভাতা-

ভগিনী লণ্ডনের ছই প্রান্তে চলিয়া গিয়াছিল। এক রাত্রিতে প্রবল ঝড় ও বজ্রাঘ তাহার। একত্র হইল; পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, ভাতাভগিনীর মৃতদেহ নিবিড় বাহ্যশাশে আবদ্ধ। ভগিনীর বিবাহ ও প্রণয় লইয়া যে বিরোধ শুরু হইয়াছিল, মৃত্যুর ফলে তাহার অবসান হইল। অর্জুণ এলিটের উপন্যাসে আর কিছুই নাই; তিনি গল্পের উপসংহার করিতে বাস্তব হইয়াছিলেন, তাহা স্বাক্ষররূপে সম্পন্ন করিলেন। ভাতাভগিনী একত্র পরম মেহে লাগিত পাণিত দুইয়াছিল, আবার একসঙ্গে মৃত্যুর আহ্বান প্রবণ করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পের স্বর অল্প রকমের। স্বরবাহার সঙ্গে ইতুলের সেকোও মাঠারের প্রণয়নিবেদন হইল না, তাহার পরস্পরের সঙ্গে কথা মাত্র বলিল না। কিন্তু সেই ঝড়জল ঘূর্ণ্যগণের রাত্রিতে রাত্রির সীমাহীন অন্ধকার ও বজ্রার অশ্রুত উদ্ভটতার মধ্যে সেকোও মাঠার মহাশয় তাহার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ও তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ রহস্ত মৃত্যুর মুখে পাড়াইল। জীবনমূল্যে তাহার সেই সমগ্রগুণে পাড়াইয়া সে দেখিল তাহার চিরপরিচিত অথচ চিকিৎসার জ্ঞান অপ্রাপ্যিয়া স্বরবাহাকে। নৈনদিন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার মধ্যে স্বরবাহা অনধিগম্য ছিল, সেই দিন বিশ্বপ্রকৃতির অশ্রুত বিপুলতার অংশ হইয়া স্বরবাহা তাহার কাছে উপস্থিত হইল। সে তাহার সঙ্গে কথা বলিল না, বিশ্বপ্রকৃতির মতই রহস্যময়ী হইয়া রহিল কিন্তু মাঠারের জীবনে স্বপ্নকালের মধ্যে অনন্ত রাত্রির উদয় হইল।

মানবের সীমাবদ্ধ জীবনে-বিপুলের আশার পাওয়া যায় প্রকৃতির সম্পূর্ণ আশ্রয়। প্রকৃতিতে আমরা সেবি, তাহাকে আমরা স্পর্শ করি, তাহার গন্ধ আমরা পাই, কিন্তু তাহার স্বরূপটি আমরা ঠিক বুঝি না, তাহার বহুত্ব আমরা ঠিক উদ্ঘাটিত করিতে পারি না, তাহার অসীমতার আমরা অভিজ্ঞ হই। বুদ্ধির দ্বারা বাহ্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে পারি না, কবি কল্পনা দিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা

স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি আমাদের জীবন-নাট্যের পিছনের দিকের বনিকী; আমাদের অভিনয়ের নীরব সাক্ষী। সে যে শুধু সাক্ষী থাকিরাই নিরন্তর থাকে, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের জন্মের সংযোগ আছে, তাহার ও আমাদের কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রিয়বালা ও শনিবৃষ্ণের মধ্যে মেঘের যে আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহার লুক্কায়িত সুরোহ সাক্ষী রহিয়াছে মেঘ ও বোঁদেরের কবীর লুক্কায়িত। ইহাদের জন্মের আনাগোনার সঙ্গে মেঘ ও বোঁদেরের ছায়ালোকের যে শুধু সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নহে; উভট দেববাহত মানবজন্মের মেঘের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ ক্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। আমরা দাসিয়ার স্পর্শে আশ্রয় যে বিপুল স্বপ্ন ও শান্তির আশ্রয় পাইয়াছিল তাহার প্রধান উপকরণ আত্মকানের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত শোভা, উহা তাহাদের মর্মে মর্মে মিশিয়া গিয়াছিল। "গতিত অতীতিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে ক্রিচ্ছদ্রিণ গাছেরে সেরূপ প্রকৃতির গোপন আকর্ষণে সৌন্দর্যতার মানব-নির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার। হইয়া আসে।" স্থলিয়ার দুর্দমনীয় জিহ্বাসারুতি এখানে প্রগম্ভী হইয়া দাসীরা তাহার কাছে উপস্থিত হইল। সে ও প্রকৃতি-সমাজের উচ্ছ্বাস ছেলে। আত্মকানরাষ্ট্রে প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মানবজীবনের এই অন্তরঙ্গ সংযোগ আছে বলিয়া এখানে প্রতিহিংসা প্রেমমিলনে বিগীন হইয়া গিয়াছে।

'হেমন্তী' গল্পেও দেখিতে পাই হেমন্তী ক্ষুদ্রপরিধার সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাহার সংযোগ ছিল উদ্ভুক্ত উপার প্রকৃতির সঙ্গে। হিমালয়ের বিরাট উদ্ভুক্ততা গিরিনন্দিনীর চরিত্রে মিশিয়া গিয়াছিল; সংসারের ক্ষুদ্রতা ও পঙ্কিলতা হইতে সে বহুদূরে সরিয়া রহিয়াছিল। 'নৈনাপাওনা'র নিরুপমার সঙ্গে হেমন্তীর অবস্থাপাত সাদৃশ্য আছে; উভয় গল্পের আখ্যানভাগেও



একই কথা বলা হয়। কিন্তু 'স্ট্রাটের দিক দিয়া পূর্বদিকের সীমা' নাই; আর এই পার্বত্যের মূল রহিয়াছে হৈমন্তীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গিরিনন্দিনীর চরিত্র প্রকৃতির উদার উল্লুতা আছে। সমসারের স্ত্রীত্যাচারে ও অবহেলায় তাহার মুহূর্ত্ত হয়। কিন্তু এই স্ত্রীত্যাচারই তাহার জীবনের শেষ কথা নহে। সে যে সোকে বাস করিতে, আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা সেখানে প্রবেশ করিতেই পারে না। কিন্তু নির্মল সত্য এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন গভীর, শুভ ও সরল হয়। উদ্ভিগ্ন। তাহার চরিত্রে আকাশের বিস্তার ছিল, নির্মল আকাশের সঙ্গেই তা ছিল তাহার অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ লইয়া বসন্তের গিথিত হয়। তাহা যে 'অতিথি' গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সংগ্রহ আছে কিন্তু স্পর্শক নাই। যে শক্তির প্রকাশে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য পাই সেই শক্তির প্রকাশেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি। মানুষ আকাশ-আলোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, কিন্তু তাহার উপর আধা রাখিতে পারে না। কারণ, মানুষকে সংহার করিবার দুর্মনীর শক্তিও তা উহার মধ্যেই নিহিত আছে। প্রকৃতি যদি আমাদের সঙ্গে কোনো স্পর্শকে আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহার অন্তঃ-উল্লুততার শেষ হইত। প্রকৃতির এই চিরচঞ্চল নির্লিপ্ততাকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়াছেন তারাপদর চরিত্রে। তারাপদ বহু জায়গায় বহু আবেগের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সকলের প্রেম সে আশ্রয় করিয়াছে, এই সমসারের পঙ্খিল জ্বলন্ত উপর দিয়া সে ভঙ্গপদ রাজহংসের মত সীতার দিয়া বেড়াইত; নিত্য সচলা প্রকৃতির মত সে সর্বদাই নিশ্চিন্ত উপাশীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির সম্মোহিত শক্তি তাহার ছিল, তাহাকে না জালবাসিত এমন লোক নাই, অথচ প্রকৃতির মতই সে ছিল নির্লিপ্ত ও রহস্যময়। তাহার সঙ্গে মতিবাবুর কড়া চারুশীল এবং 'আপদ' গল্পের নীলকান্তর তুলনা হইতে পারে। চারুশীল এবং

পাণিতা; কিন্তু সমসারের ক্ষীণ গতি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহার খেলাধুলির কোন স্থিতি ছিল না; কিন্তু সেই হ্রদে তাহার অস্থিরতার মধ্যে তারাপদর নির্লিপ্ততা নাই। তাহার মন ক্রোধ ও ঈর্ষার পরিপূর্ণ; সে বাসে বালিকা হইলেও তারাপদর প্রতি তাহার আগন্তিক শেষ নাই। নীলকান্তর সহিত তারাপদর অবস্থার সাদৃশ্য আছে; উভয়েই বাহার দলের ছেলে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্যের সীমা নাই। নীলকান্তর চরিত্রে আকাশের বিস্তার নাই, প্রকৃতির রহস্ত ও অনাসক্ত উদ্যোগ নাই। তারাপদ সবাইকে ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার বিরাট নির্লিপ্ততা নাই। নীলকান্ত একান্তই ক্রিয়ামগ্ন। ক্রিয়ের মেহের দাস; সে স্ত্রীপার পাজ। সে তখনই ক্রিয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে যখন সে দেখিয়াছে কিরণ তাহাকে ত্যাগ করিত উভয় হইয়াছে, তাহার মনের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, হয়ত তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। এই ছুটি বাগলেকর চরিত্রের বিস্তৃত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া উক্তর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"তারাপদর উদার হৃদয়ে ঈর্ষা, অভিমান প্রকৃতির শেষমাত্রা নাই—প্রকৃতিমাত্রার স্তম্ভপাত লালিত, তাহার অশ্রু-করণে সর্বদীপতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকান্ত ক্রিয়ের মেহের ভাগ লইয়া সূতীশের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছে, ও চৌর্য্যরূপে ধৈর্য পূর্ণাঙ্ক নাহিয়াছে।"

প্রকৃতি রহস্যময়ী; কিন্তু প্রকৃতি আমাদের অতি পরিচিত। তাই তাহার সবটুকু রস আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। প্রতিমূহুর্ত্তে তাহার রূপ আমরা দেখিতেছি, তাহার শব্দ আমরা শুনিতেছি, তাহার গন্ধ আমরা আশ্বাস করিতেছি; লোকের সঙ্গে কথা বলিয়া তাহার রহস্যের নিরসন করিতেছি। তাই মনে হয়, সে বৃষ্টি আমাদের একান্ত নিমগ্ন। প্রকৃতির যে অপকল্প মানুষী, তাহা যে অপসীমার রহস্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার 'অতিথি'র মধ্যে একটা সংহত স্বাভাবিকতা আছে। 'স্বভা' ও 'পৃথিবী' গল্পে তিনি ছুটি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহাদের অহতবের শক্তি আছে, কিন্তু একটি অধ বিকল হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির অনেক রূপই তাহাদের পক্ষে অহতবের সাপেক্ষ, কিন্তু সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাই বাহা কিছু তাহার জ্ঞানে, তাহার মধ্যে বানিকটা, অজ্ঞান, বানিকটা অচেতন রহস্ত থাকিয়া যায়। কাজেই প্রকৃতির পরিপূর্ণ মানুষীর সমান শুধু তাহারাও পাইতে পারে। কুমুর চোখের দৃষ্টি বহু হইয়া গেল, তাহার যৌবনের প্রথম প্রাণস্পন্দ। সে জন্মকাল নহে; একদিন ছিল যখন প্রকৃতির দুঃখসৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল। নবযৌবনের দাম্পত্যরস পান করিতে করিতে সে তাহার চক্ষুর হারাইল; আর ইহার গজ দায়ী হইল স্বয়ং তাহার স্বামী। তাহার চক্ষুহীনতা শুধু ট্যাঞ্জিডি নহে, ইহার মধ্যে রহিল রোমান্সের অপকল্প মানুষী। তাই অন্ধ হইয়া সে তাহার স্বামীকে বৈধী করিয়া ঝাঁপড়াইয়া ধলিল, আর তাহার চারিদিকের বিরাট পৃথিবীকে আরও বৈধী করিয়া অহতব করিতে চেষ্টা করিত লাগিল, তখন সে তাহার একমাত্র সহচরী রহিল পত্নীপ্রকৃতি, বাহার রূপ সে দেখিতে পাইত না, কিন্তু বাহার শ্রী সে অহতব করিত। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিতে হইবে। সমসারের নানা কুটিলতার আমাদের কৈশোরের সমস্ত মহতী প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, বাহাদের সংস্পর্শে আমরা আমাদের সকল আদর্শ গুণ হইয়া যাই—ইহা প্রত্যেকের জীবনে প্রতিদিন লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু যে অন্ধ হইয়া সমসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অল্প প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়াছে তাহার জীবনে এই বর্ধকতা আসে নাই। কুমু ও তাহার স্বামী একই সঙ্গে একই আশ্রয়ে জীবন যাপন করিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘন হইল। কুমু নিজেই বলিয়াছে,

"স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে দেখার যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি আমি যেখানে, তিনি সেখানে নাই;—আমি অন্ধ; সমসারের আলোকবর্জিত মস্তুর-প্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন তেজ, অনুর ভক্তি, অন্ধ ও বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার দেহবলির জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করণ্ডে যে শেকালিকার অর্খদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকাই নাই,—আর আমার স্বামী এই ছায়া-শীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সমসার-মক্কুমির মধ্যে কোথায় অন্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি বাহা বিশ্বাস করি; বাহাকে ধর্ম বলি, বাহাকে সকল স্বপ্নসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিক্রম হইতে হাসিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা একই পথে বাত্মা আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহার পর কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই।"

বাণীকর্ষ'র বোবা মেয়ে স্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল তাহারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের ভাবের সঙ্গে তাহার সংগ্রহ নাই, কাজেই প্রকৃতির ভাষা তাহার কাছে খুব স্পষ্ট হইয়াছিল; সে কথা বলিতে পারিত না, হয়ত কথা বুঝিতেও পারিত না, কিন্তু পাখীর গান, নদীর কলধ্বনি, তরুর মর্ম্মর—ইহাদের ভাষা তাহার জানা ছিল, আর ভাষাহীন প্রাণি-জগতের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। তাহার প্রধান সহচরী ছিল তাহার ছুটি গাভী। তাহাদের নিঃশব্দ বেদনা সে বুঝিত, তাহার কথাহীন স্নেহমুহূর্ত্ত তাহার। অস্তুরে গ্রহণ করিত। ইহা ছাড়া ছাগল, বিভালশাবক প্রকৃতির সঙ্গেও তাহার আন্তরিক সংস্পর্শ ছিল। ভাষা পাইয়া মানুষ যে জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভাষা হারাইয়া স্বভা সে জগৎকে আপনায়



করিয়া লইল। যে রহস্য আমরা জানি না, তাহার খনিরকটা তাহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। এই ভাষাহীন ভগতে বাহাদের বাস তাহাদের বেদনা-ব্যাধি, কাহারও অপেক্ষা কম নহে, এবং যে মানবজাতি স্বেচ্ছাদিগকে ভোগের সামগ্রীমাত্র মনে করে, তাহাদের সমস্ত কষ্টের কারণে বীরণ করিয়া এই বেদনামোহে আপনাকে চিকিত্ত করিয়া দেয়। “অনবিকার প্রবেশ” গল্পে দেখিতে পাই জয়কালী নিষ্ঠা ও গুরুঘাতিত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি। রমণীজনেচিত কমনিয়গতির কোন পরিচয় তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই; তাঁহার নিজের পালিত ভাইগো তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সামান্য অপরাধ করায় জয়কালী তাহার উপর কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। কিন্তু ভীত শূন্যশিত যখন সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অন্তর্গত করিল, তখন তাঁহার সমস্ত কষ্টের তাৎপর্য মথিত করিয়া নারীর স্বাভাবিক কল্পনা জাগিয়া উঠিল। তিনি আশ্রয় প্রার্থনা শূন্যশিতবকের দীনভিক্ষা ভুলিলেন। নিষ্ঠার দ্বারা, স্বার্থের দ্বারা আমরা যে কঠিন সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি মুক প্রকৃতির কাতর আত্মানেই ত তাহাকে দীর্ঘ করিয়া বেহ ও দয়ার স্বরূপা উভিত হইবে।

প্রকৃতিকে দেখিতে মুক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহারও কথা কহিবার শক্তি আছে। এই পর্য্যন্ত যে সকল গল্পের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃতি অনেক সময় আমাদের হৃদয়গতের কথাতে মুখের হইয়া উঠিতে পারে। যে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, সে কথা যে নিশ্চয় বহন করিতেছে এবং কোন কোন সময়ে তাহার শুদ্ধতা ভাঙিয়া সেই বিদ্যুত কাহিনী উপনীত হইতে থাকে। ঘাট ও রাজপথকে আমরা নিজীব বলিয়া মনে করি, তাহারা মানব-ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পলেখকের জীবন আত্মকথারোহে ইহাদের মুক মুখে ভরা দিয়া। কুসুমের যে বেদনা কেহ ব্যক্তিতে পারে নাই, গঙ্গার

ঘাট তাহা অশ্রুভব করিয়াছে, তাহার যে আত্মোৎসর্গ যোকচক্ষুর অন্তরালে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে তাহা দেখিয়াছে, তাহার বিদ্যুত কাহিনী সে প্রকাশ করিয়াছে। অথচ এই সব গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ অনেকটা আত্মগা রকমের। প্রকৃতি ভাষা বাহিয়াছে, কিন্তু মানবজীবনের অশ্রুতলে সে প্রবেশ করিতে পার নাই। তাহার ভাষা তাহার নিজের ভাষা, মাছের হৃদয়গতের প্রতিফলনকে সে ব্যক্ত করিতে পারে নাই, বিখপ্রকৃতির সঙ্গে মাছের জীবনের এই অন্তরঙ্গত সংযোগ দেখিতে পাই “নিশীথে”, “স্বুতিত পাখাণ” প্রভৃতি গল্পে। “নিশীথে” গল্পটিতে দেখিতে পাই যে, দক্ষিণাচরণ বাবু প্রবেশ দ্বী জেছায় মুখ্যাক বরণ করিয়া তাঁহার স্বামীর স্বিতীয়বার বিবাহের পথ স্ব্যম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে যে “ও কে, ও কে, ও কে গো” এই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া রছিল এবং অন্ধকার রাত্রির নিতুদ্বতা মথিত করিয়া “ও কে, ও কে, ও কে গো” — এই ধ্বনি মথিত হইয়া উঠিত। গঙ্গার পারে ক্রুপাক্ষের পীতবর্ণ ভাগ্যভাগিনের নীচে কীক পাখীর পাখার শব্দে, জ্যোৎস্নাশ্রাবিত নির্জন বালুচরের জলচর পক্ষীর ডাকে এই বাণী ধ্বনিত হইতে থাকিত — “ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!” অতিপ্রাকৃত লইয়া বহু গল্প-উপজান-কারা রচিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ লেখক এইরূপভাবে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা করেন যে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন প্রাকৃত সত্তা। কিন্তু ইহাতে অতিপ্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। Macbeth-এর ডাইনীদ্বী, বা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাশ্বা, কোলরিজের প্রাচীন নাবিক — ইহারা রূপবিশিষ্ট জীব; ইহাদের অলৌকিকতা স্বত্ত্বও ইহাদিগকে আকারবান প্রাণী বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প “নিশীথে”, “স্বুতিত পাখাণ” প্রভৃতিতে অতিপ্রাকৃতের দেহহীন অলৌকিকতা রক্ষিত হইয়াছে। “ও কে, ও কে গো” এই ধ্বনিটি একটি

অলঙ্কিত রূপধীন ক্ষমিতার। তমসাচ্ছন্ন বা জ্যোৎস্না-লৌকিত নিমগ্নতার মধ্যে ইহা মিশিয়া গিয়াছে; ইহার প্রাণ নাই, ইহার কোন বিশিষ্ট রূপ নাই। মনে হয় পাখীর সঞ্চরণে, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে ইহা বলীল হইয়া রহিয়াছে। দিনের আলোকে এই মোহ কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার টিকনা থাকে না। রাত্রিতে যে মল্লভূত হইয়া থাকিত, দিনের আলোকে সে নিজেই লজ্জিত বোধ করিত, সমস্ত জিনিসটা তাহার কাছে অলীক বলিয়া মনে হইত।

আমাদের জীবনের কথা শুধু যে প্রকৃতির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহা নহে, মাছের নিজের গড়া-অবেষ্টনে, পাখাণ-গৃহেও তাহা ক্ষোদিত হইয়া থাকে। পরীক্ষামূলক মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সচেতন অবস্থায় যে সমস্ত মনোবৃত্তি অচিরত্যাগ থাকে, তাহারা সংজ্ঞাহীন কর্ত্তে অথবা স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। কবি দেখাইয়াছেন যে অচিরত্যাগ প্রবৃত্তি প্রকৃতিতে ও পাখাণ-গৃহে ক্ষোদিত হইয়া আত্মরক্ষা করে, তাহার অশ্রুত সম্মোহিনী শক্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং রাত্রির শুদ্ধতার ইহা রূপধারণ করে। সেই রূপ সম্পূর্ণভাবে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু তাহা চল, নিত্যজিহ্বাসক্ত। শুধু যে ব্যক্তিগত বাসনাই মূর্ত হইয়া উঠে তাহা নহে, শুধু অতীতের শুদ্ধিত কাহিনীও সচেতন হইয়া উঠে। “স্বুতিত পাখাণ” গল্পে রবীন্দ্রনাথ অতীতের বিদ্যুত বেনারায় যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার একটি অপরূপ মাথুর্য আছে। দিনের অবসানে তাহার এক অশরীরী সম্মোহিনী শক্তি সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহার প্রভাবও ঠিক সেই অশ্রুভব করে রাত্রির মর্ম্মকথা যে জানে, যে তখনকার অভিনয়ের নটা। রাত্রিতে বাহারা তাহার কাক আসে তাহাদের আগমন ও বাবহারে একটা নিম্নর বিশিষ্টতা দেখা যায়। তাহারা সঞ্চরণশীল অথচ তাহাদের কোন বিশেষ রূপ নাই। তাহারা চলে ক্রতপদে, কিন্তু তাহারা সেহীন; তাহারা উচ্চ-কলহাতে ছুটাছুটি করিয়া চলে, অথচ সেই গতি

শব্দহীন। তাহাদের রাক্ষো সব কিছুই অশ্রুভব করা যায়, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না, সাধা-দ্বোহা যায় না। রবীন্দ্রনাথের “রব” কাব্যে প্রাচীন ভারতের পূর্বজননের যে প্রথম প্রাণকে দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে এই মায়াময়ীদের সা-আছে। ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি, কিন্তু আমরা “সে তাহা ভুলিয়া গেছি।” যখন তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ জমিয়া উঠে, অশ্রুত দৃতি দৃশ্যপথে আসে, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার সময় আসে তখনই প্রভাতের আলোকে মোহ ভাঙিয়া যায়, ভোর হইয়া আসে। প্রভাতের আলোকে সেই মোহ কোথায় উড়িয়া যায়। তাহারা মায়াবী, শুধু ধ্বনিকের জগত তাহাদের ছায়া গড়ে, সেই ছায়াও অশ্রুভব করা যায়, ভাল করিয়া দেখা যায় না।

“নিশীথে” ও “স্বুতিত পাখাণ” গল্পে অতিপ্রাকৃতের যে চিত্র দেওয়া আছে, তাহাতে অতিপ্রাকৃতের অলৌকিকতা বজায় রাখা হইয়াছে, অথচ মানব-জীবনের নিগূঢ়তম বেদনাও তাহার মধ্যে মূখর হইয়া রহিয়াছে। উত্তর ত্রিমূল ত্রিমূখ্যার বন্দোপাখ্যার কোলরিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় করিতে বাইয়া অস্বাভাব প্রেতের রাক্ষো যায় নাই; আশ্চর্য্য কুহকবলে অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আচ্ছাদন করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়িয়া এক দণ্ডও অঙ্গুর হইতে নাই।” দিনের আলোকে এই সম্মোহন থাকে না, ট্রেন ধরিবার অবকাশে এই সব গল্প বলা হয়। যে ব্যক্তি রাত্রিতে এই মোহিনীর মায়াভালে আবদ্ধ হয় সে দিবালোকে লজ্জিত হয়। আর যে সকল কথা অতিপ্রাকৃতের রাক্ষো গিয়াছে, তাহাও নিত্যশ্রুতের কথা। বাদশার অন্তঃপুরের অশান্ত আশা, অশ্রুত কামনা—ইহাতে অলৌকিক কিছুই নাই; দক্ষিণা-বহুর প্রথমা দ্বী যে মনোরমাকে দেখিয়া “ও কে,



ও কে গো" বলিয়া টাংকার করিয়া উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে, তাহাতে অসন্তুষ্টও কিছু নাই। যে ভাবে এই অকৃত্রিম রাসনা ও বেদনাবিধুর ধ্বনি আবেষ্টনের মধ্যে গুপ্তিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। "কঙ্কাল" গল্পটিকে দেখিতে পাই বীহাঙ্কে লইয়া ডাক্তাররা অস্থিবিজ্ঞা শিখিতেছে তাহার চারিদিকে একটি প্রাণবান আত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহার অমূল্যবের শক্তি আছে, সে মানুষের মত গল্প করিতে ভালবাসে। সে প্রশ্নের মধ্যে ছ হ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু মানবজীবনের প্রকৃত্বের কথা তাহার মনে আছে। পূর্ণাঙ্গ বৎসর পূর্বে লালসার যে উদ্ভাদনায় সে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহার দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়া গেলেও সেই উদ্ভাদনা নিশ্চয় হইয়া যায় নাই। তাহার দেহ নাই; কিন্তু দেহীর মত অকৃত্রিম আছে।

"মণিহার্য" গল্পও অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করা হইয়াছে। যদিও গল্প হিসাবে ইহা "জুড়িত পাখাণ" ও "নিশীথে" অপেক্ষা নিকট, তবু ইহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের গল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান রহিয়াছে। এই গল্পের মধ্যে অনেকটা অংশ যে অবিখ্যাত তাহা গল্পের শেষ ভাগে ঘটিত হইয়াছে। তারপর ফণিভূষণের অভিজ্ঞতাও রাগিতই হইয়াছে, দিনে নহে। যে স্বপ্ন আদিয়া তাহাকে অতিভূত করিয়াছিল, তাহা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি শোকাবহ রহস্যময় ঘটনার প্রতিফলন মাত্র। এই ঘটনার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে, কারণ মণিমালিকার যে কি গতি হইয়াছিল, তাহা রহস্তে আবৃত রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই রহস্তের সন্ধানও পাই ফণিভূষণের বদ্বন্দ্য অভিজ্ঞতার মধ্যাই। তাহা দেখিয়া মনে হয়, হয়ত মণিমালিকাকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল, অথবা অধ্বনন ও মণি বে নৌকা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল ফণিভূষণের অভিজ্ঞতার বোধ হয় তাহার প্রতিফলন হইয়াছিল। অবশ্য এই রহস্তের সন্ধান এই গল্পে পাওয়া যায় না; এই প্রকারের রচনার

প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে সজ্ঞত পাওয়া যায়; কিন্তু স্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফণিভূষণ শুধু অলঙ্কারশিক্ত ধ্বনি শুনিতে পাইত; তা'র পর একদিন এক সালঙ্কারা কঙ্কালমুক্তি দেখিতে পাইল যে তাহাকে অতলম্পর্শ স্থিরির মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই গল্প "নিশীথে" ও "জুড়িত পাখাণ" অপেক্ষা নিকট। প্রথমতঃ, বাহার অলৌকিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, সে গল্পের বক্তা নহে। তাহার নিজস্ব অমূল্যবের তীব্রতা ইহাতে নাই; গল্পটিকে সেকেওলাও। তাহার দিনের দৃষ্টি ও রাত্রির অমূল্যবের মধ্যে যে কত বড় প্রভেদ থাকিত, তাহা আমরা তাহার নিজের মুখ হইতে শুনিতে পাইলাম না। দ্বিতীয়তঃ, "জুড়িত পাখাণ" ও "নিশীথে" গল্পে বাহার অলৌকিকের সংস্পর্শ আসিয়াছে, তাহার্য। চেননা হারায় নাই; অজ্ঞ সকল বিষয়ের সংস্পর্কে তাহাদের বাস্তবাহুতি অটুট রহিয়াছে; শুধু একটি বিষয়ে তাহাদের অলৌকিক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কিন্তু ফণিভূষণের অভিজ্ঞতা শুধু স্বপ্ন মাত্র। ফণিভূষণ ব্রহ্মচলিতবৎ নদীর মধ্যে গিয়া আত্মসমর্পণ করিল, শুধু মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্ত সে জাগরণের প্রান্তে আসিয়াছিল। ইহা ফণিভূষণের একটা ব্যাঘাতিজ হইতে পারে; ইহার সঙ্গে অলৌকিকের কোন সংস্পর্শ না-ও থাকিতে পারে। তারপর, গল্পে দেখিতে পাই "ফণিভূষণ মুহূর্ত্ত মাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলম্পর্শ স্থিরির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।" কিন্তু তাহার পরই দেখি গল্পের প্রোতা স্বপ্ন ত্রীকণিভূষণ সাহা। ইহাতে গল্পটির, অন্ততঃ গল্পের শেষের দিকের সত্যতা সন্দেহ সন্দেহ উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা বাস্তব ও অবাস্তব, নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, স্বপ্ন ও জাগরণের ছায়ালোকের লীলাভূমি। কিন্তু এই গল্পে বাস্তব বুদ্ধির আলোকে অবাস্তবের ছায়া অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গল্পের মধ্যে আরও একটি অসঙ্গতি আছে। গল্পটি বিনি বলিয়াছেন, তিনি এই গল্পে কতটা বিশ্বাস

করেন, ঠিক বলা যায় না। তাঁহাকে কোলরিঞ্জের তথা নব্যকালের প্রেমের সমালোচনা করিতে বাইরা, প্রাচীন নাবিকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু অথচ তাহার কোন আবশ্যক ছিল না। কবি এই সঁচ তাঁহার মনে বিশ্বাসের সেই গভীরতা নাই, তাঁহার সমালোচনা তাঁহার মুখ দিয়া করাইয়াছেন গল্পটিকে বর্ণনায় সেই তীব্রতা, সেই অনিবার্য গতি নাই। একটা বাস্তব আবেষ্টনের মধ্যে আনিবার জন্ত কিন্তু তিনি অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন ফণিভূষণের ইহাতে গল্পটির মহিমা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

## গান

### শ্রীশান্তি পাল

কেমনে যাব সই

কদম তলে ?

"ও পাথে যেও নাক"

নন্দী বলে।

বঁধুর বঁশীধানি

পরান নিল টানি,

দেহেরে বরে রাখি

কিসের ছলে ?

কেমনে যাব সই

কদম তলে ?

ব্যাকুল বেণু বাজে

প্রভাতী হুরে,

আমারে নিয়ে যায়

হৃদর পুরে।

কাটিয়া সব বাধা

বাহিরে যাবে রাখা

ঢাকিয়া যত কাঁদা

খাঁচল তলে।

কেমনে যাব সই,

কদম তলে ?





# প্রসূতি

## শ্রীমতী অনুকম্পা দেবী

(পূর্ণাহরণ)

(৮)

রেল-সাইনটা ছায়াছয় পথের একটা সরল রেখার মত বহুবর্ন হইতে দূরান্তরাবধি চলিয়া গিয়াছে; অতি-ভোজনে সুপরিপুষ্ট একটা অতিকায় অজগরের মতই সে যেন হৃৎকাজেচ্ছল শীত-মধ্যাহ্নে নিশেপে পড়িয়া পড়িয়া রৌদ্র সেবন করিতেছে। স্বন্দর জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাহাকে বাড়ীর ছাদ হইতে দেখিতে দেখিতে কতদিন সর্গাণীর মনে হইয়াছে যে, সার্কলাইটের ঐ সহসা সহস্রজটায় বিচ্ছুরিত আলো যেন ঐ বিশ্রামশীল অজগরটার মাথার মণি-দীপ, আর ঐ যে ট্রেনের তীর তীক্ষ্ণ অঙ্গ অর্ধানার, উহা যেন ঐ বিরাট অজগরেরই রোহ-গর্জনা। শুদ্ধ প্রকৃতির হৃদয় শুদ্ধতাকে সে যেন কাটিয়া চিরিয়া বিঁধিয়া দিল। দূর হইতে মেল, প্যালেম্বার, নানা আকারের এবং প্রকারের ট্রেনগুলিকে যেন স্পষ্ট দেখা যায়; এক-একটা কামরার এক-আধটা মাহুর থাকে; বেশীর ভাগ কামরায় যে আগা-গোড়া ঠাসা থাকে, সে সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়ে-গাড়ীতে মেয়েরা কি কি রঙের শাড়ী পরিয়া বসিয়া আছে, ক'জন মেয়ে, তা-ও তাহাদের পশ্চিম পারের সর্ব বারান্দায় দাঁড়াইলে গুণ্টি করা চলে; কিন্তু সর্গাণীর নোনা-কোলা আর কেই বা এ-পথ দিয়া কোথায় যাইবে; তবে বহির্বি বা যায়, তাহাদের চেনা যাইত না। তথাপি

সর্গাণীর মনের ভিতর যেন কিসের একটা খুব অস্পষ্ট ছায়া ভাগা-ভাগা হইয়া উঠে; কিরূপে যেন একটুখানি কীণ আশা, যেন ঈহৎ একটু অকারণ আকাঙ্ক্ষা; অহেতুকী প্রতীক্ষা, না জানি ঠিক কি—তবু কি-ই যেন একটা মনের কোণে জাগিয়া থাকে। ট্রেন যখন-তখনই যায়, যখন-তখনই আসে, দিনে রাত্রে ক'বার তার হিসাব নাই, তবু যথেষ্ট বার; সকল সময়ই শিশুর মত কোতুলন লইয়া যে সর্গাণী ট্রেন দেখিতে দৌড়ায়, তা' নিশ্চয়ই না। কিন্তু দূর হইতে দূর-ভেঙে, তীক্ষ্ণ সুরে ট্রেনের বাঁশি বাজিয়া উঠিলেই তার বুকের ভিতরে ধক্ক করা একটা ধাক্কা পড়ে। সেই পথচলার সাদেতিক বাঁশি যেন কোন সন্তকের গোপন বাণী উজ্জ্বল করিতে করিতে দূর হইতে কাছে আসে, আবার কাছ হইতে দূর জেমনই দূরাগতের মিলাইয়া যায়। সর্গাণী হয়ত তাহার হাতের কাজ লইয়া তাহাতেই ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু মন যেন তার তমস্কর হইয়া ঐ দূরের এবং অদূরের বাঁশি শোনে। চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিড় করা মুখগুলির মাঝখানে যেন কোন একখানি তার পরিচিত মুখ, এইক্ষণে তার অসুখের সুযোগ লইয়া অপহৃত হইয়া গেল, এমনি ধরনের, একটা স্বপ্ন স্মৃতি তার সেই কল্পতপ্তরতার মধ্য দিয়াও মনের ভিতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে

থাকে। অথচ তাহার আছেই বা কে! আর তাহাদের এই লাইন ধরিয়া ওলিক পানে যাইবেই বা কে? মুক্তি নিজেই সেকথা বলে, কিন্তু মন মনে না, জানিয়া শুনিয়াও যদি সে নিজের সঙ্গে ছলনা করে, করুক; কে তার কি করিবে?

মণিকার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। শিববরকেও আর দেখে নাই। আর সেই ছোট্ট ছেলেরা? কি ভালই না তাহাকে সর্গাণী বাসিত! সে না জানি কত বড়টা হইয়াছে? নিশ্চয় মাথায় বেশ লম্বা, পড়ানোও কিছু কিছু করিতেছে। কে পড়ায়? শিববর অথবা মণিকা। মাঝে মাঝে চিঠি আসে, মণিকা লেখে, সে-ও উত্তর দেয়, খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর, তাহাও তখনই সম্ভব। মণিকার সেখানেই আছে। সেই ছোট্ট বাড়ীটার। সর্গাণীর সেওয়া সেই বিদ্যোনিয়া লতাটা তাদের সামনের বারান্দার বাপ-রার চাদের উপর সেই রকম লতাইয়া আছে তো? চৈত্র মাসের উত্তল হাওয়া গায়ে লাগিয়া তাদের মুহূর্ত্ত শরীরের পরতে পরতে নুতন পাতার শুকনুগুলি তেমনি ম্যাজিক-শক্তির বিকাশ দেখাইয়া কি নবীন জামলিয়ার চিহ্ন হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে? বৈশাখের প্রারম্ভাবি তাহাদের ফুলের শুকনুগুলি স্মৃতিস্তর তোড়ার মতই জমকিয়া থাকে। আর শীতের তোড়া পর্যন্ত এই ফুলের তোড়াবান্দার তা শেষ হয় না।

শিববর কি আর কোন মেয়ে কিংবা ছেলেকে প্রাইভেট টিউশনীতে ওরই মত বেহ করিয়া সংকত কাব্য ব্যাকরণ পড়ান? মণিকা কি তাহাকে জুলিয়া গিয়াছে? এই সব কথা। সর্গাণীর নিজের কথা একটুও না।

চুপ করিয়া বসিয়া হয়ত কোলের উপর একটা সেলাই লইয়া রেশমী হুতার কৌড়ের পর কৌড় তুলিতে তুলিতে এই সব কথাই সে ভাবিতে থাকে। সব সময় তা-ও হয় না। অবসরকালে যখন কাজকর্ম ভাল লাগে না, তখন বারান্দা একটা বেতের

মোড়ার বসিয়া অথবা ছাদের একটা আলিঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া চিন্তা করা পুস্তকের মত নিষ্পন্দ ঘোষ মেলিয়া রাখিয়া সে এই সকল এবং আরও অনেক কথাই মনে মনে ভাবে। পিছন সিঁক্কার বীশবন হাওয়ার নড়িয়া চড়িয়া পাতার পাতার সরসু শব্দ, শব্দ শব্দ তোলে, ফলভারগোববে পৌরবাধিত সমুদ্রতীর নারিকেল বৃক্ষাবলী মোন হইয়া তাহার দিকে প্রবাহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। অনিবিড়শাষ চম্পক বৃক্ষটির ওপাশ দিয়া হয়ত বা কোন্ সময় আচমকা-ঠটা গুরু সন্ধ্যার নির্মল টাঁদ তাঁর হৃদয় শূন্যের পরিহাস-প্রজ্ঞর উজ্জল দৃষ্টি মেলিয়া উহার ধান-শিমিত শূন্যের দিকে চাহিয়া দেখেন, অকস্মাত জাগিয়া ওঠা কোন্ একটা গৃহ-প্রত্যাশী শখচিলের কর্কশ শব্দে চকিত হইয়া সর্গাণীর যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়। শ্রাবণ-সন্ধ্যার রিম্‌রিম্‌ শ্বিন্‌শ্বিন্‌ বর্ণের ধারা কব্রিয়া পড়ে, গুরু গুরু মেঘের ডাকে পুরাতন অট্টালিকার বর-খার, জানালা, সাদি, দেওয়ালে দাঁড় করান বড় বড় তৈলচিত্র, বৃহদায়তন আয়না, আলমারী সমস্ত শব্দ শব্দ শব্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, লিঙ্গলিঙ্গ বিভ্রাতের গেলিগান রসনা আকাশের গায়ে পাপ খেলানোর চটে থাকিয়া থাকিয়া খেলা করিতে থাকে।

সর্গাণীর এমনই আর এক সন্ধ্যার কথা মনে জাগে। সেদিনও এই রকম শ্রাবণ-বায়ুর মধ্যে জগতের সমুদ্র শব্দলহরী বিলয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল; বিভ্রাতের দীপ্ত শিখার সর্গাণীর মনের মধ্যে কিন্তু একটা আলো-অঁধারের খেলা চলিয়াছিল। আশ্চর্য্যের মত এমন নির্মিকার নীরুদ্ধ ধূসরতায় তাঁ ভরা থাকে নাই।

যে কাজটা সে সেদিন করিয়া বসিয়াছে, তার জন্ত তার মনে কি কিছুমাত্র অসুখতাপ জাগে নাই? কই? মনে হয় না। তার কার্য্যক্ষে তার কাঁকারা, কাকীরা, আত্মীয়-বন্ধন সকলেই তো তাদের বিরোধী। তার সদ বাজীর অঙ্গ মেয়েদের পক্ষে অপকারী হইবে, এই অজুহাতেই তার শ্রেষ্ঠ কাকা অত তাড়াতাড়ি তাহদের দেশে ফেরার আসেই



এখানকার বাব উঠাইয়া দিরাছেন। বৈশী ভাগ  
আখ্যায় এখানীর সমগ্র ছাড়িয়াছেন। শুধু নিত্য  
গরীব যারা, তারা পড়ে আসবেন জানাইয়া মনি-  
অর্ডরে টাকাটা লয়; বাড়ীতে আসিতে ভরসা  
কর না। সর্বাঙ্গির এতেও মনে খুব বৈশী ফোঁত হয়  
না, কিন্তু সে বেশ বৃষ্টিতে পারে, তার বাবার হয়।  
আপনার ভ্রমদের তিনি অস্তর হইতেই বেশ একটু শেখ  
করিতেন। সবার চাইতেই তিনি ব্যসে বড়; তাই  
সবার সঙ্গেই তিনি নিজেকে যেন একটা দারিদ্রের পদে  
আচ্ছাদিত করিয়াছেন। আচ্ছ এত সহসা সেটাকে ছিঁড়িয়া  
কলিতে হইল বসিয়া মুকে একটু বাবা বাজিল। আর  
তার চাইতেও বড়গুণ অধিক আহত হইয়াছিলেন,  
সর্বাঙ্গির প্রতি এই মিথ্যা অপবাদে! জানিয়া ভনিয়া  
তার অনভিজ্ঞ জীবনের মাতিমান খুঁটগাটকে আপনার  
লোক হইয়াও বাবা কমা করিতে পারে না, উপরন্তু থগা  
দেবার, পঙ্কাজ করে, তাদের না করা যায় থগা, না  
করা যায় কমা! নিছক ছেলেশ্রমী বসিয়া তিরস্কার  
বত সূচী করিতে পার, কিন্তু তাগ করিতে চাও কিসের  
অহঙ্কারে! সত্যই তো কোন পাগ সে করে নাই।

স্বরজন একেবারে যেন ভিতরে বাহিরে আহত  
হইয়াছিলেন। সেই নির্মম আঘাত তাঁর হোঁচকার যেন  
একবিধে অকরণ চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। কথা  
তিনি কোন দিনই বোঁধী করিতে পারেন না, এখন আর  
মৌনী হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষোভাত্ত মুখ শুভ দীর্ঘ  
শূন্যম্বলে সমাচ্ছন্ন—সর্বাঙ্গি হাঁহাতে প্রথমে আশ্রিত  
করিলে স্বরজন বসিয়াছিলেন, “বসকালে নাদা  
দাড়ীতে বেশ দেখায় রে!” মাঝপোষাক বসুপরাণান্তি  
সাদাসিধা, তা-ও সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গির তদাকার না থাকিলে  
সে সবও বোধ করি এমন পরিচ্ছন্ন থাকিত না!

মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনচারে পড়িয়া পড়িয়া কি যেন  
মহাশয় নাকি করেন। কেহ আসিতেছে দেখিলেই  
উৎসাহিত দীর্ঘশ্বাস চিত্তহলে গোপন করিয়া যান, আর  
ব্রহ্ম একটু সজ্জিত হইয়া থাকেন। তা-ও গুণমণের  
বত কিছু বিশৃঙ্খলা, সমস্তই এই একটা আঙ্গীক করিয়া

সবের চাপা দিয়া রাখিতে চান, অথচ সব চাইতে  
অধিক বিপত্তি রূপে প্রকাশ যে তাইই কাছে হইয়া  
বসিয়া আছে সেখান। তাঁর হৃৎ থাকে না।

সর্বাঙ্গি তার কৃতকার্যের জন্ত অল্পতরু হয় নাই;  
কিন্তু তার বাপের জন্ত সে সমস্ত হইয়াছিল। অত  
তাড়াহুড়ি এ বিবাহে সম্মতি দান করাই তাহার  
ভুল হইয়াছিল, সেই কথাটা তারিয়াই তাহাকে অল্পতরু  
করিতে হইত। কোথায় সে ভাবিল, ওকালত তাড়া-  
হুড়ি চুকাইয়া লইলে তার বাপ অনেকখানি নিশ্চিন্ত  
হইতে পারিবেন, আরাম পাইবেন, তাই না সে এমন  
করিয়া এক কথায় ওদের বাড়ী বিবাহ করিতে  
সম্মত হইয়াছিল! ভুল! ভুল! নিত্যন্ত নির্লোপের মতই  
একটা মন্ত বড় ভুল করা হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কি  
ভাগ্য যে তার, সেই মূর্ত্তার চরম ফল ফলিতে  
পার নাই! বিবাহটা যদি হইয়াই যাইত? ভাবিতেও  
গায়ে কাঁটা দেয়। ঐ রকম হীন বাদের আচার,  
হাদের হাতের মুঠায় গিয়া পড়িলে কত নির্ঘাতনই  
হয়ত তাদের সহিতে হইত। না! বাবা অনর্থক  
দুঃখ পাইতেছেন, দুঃখ পাইবার মত কিছুই ঘটে  
নাই!

একদিন সে কথাটা প্রকাশ করিয়াই বলিল। চৈত-  
নস্ফায় আধখানা চাঁদ উঠিয়াছে, গভীর নীল মখমলের  
চাঁদোয়ার মতই তাহা কোমল ও উজ্জল দেখাইয়াছে।  
নক্ষত্রগুলা যেন এক-একটা স্তবির হালি  
গাথা বা চক্চকে স্বর্ধামণি ফুল। দক্ষিণ দ্বারের  
বারান্দায় ঘোর পাতিয়া বাপের আরাম-চৌকির  
কাছেই সর্বাঙ্গি বসিয়াছিল। স্বরজনের ঈষৎ একটা  
দীর্ঘ নিঃশ্বাস অকপাৎ পতিত হইতেই সে হঠাৎ ঈষৎ  
অসহিষ্ণু হইয়া বসিয়া উঠিল,—

“বাবা, তুমি সব সময় অত দুঃখ কর কেন বলত? এমন কি হয়েছে যার জন্তে দিনরাত খঁবে তোমার  
মনে দুঃখ নেই?”

কথাটা বলিয়াই সে উৎস্রাস্ত-মুখে বাপের  
মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এ প্রশ্ন সে আজ

আকস্মিক করে নাই, করিবে বলিয়া ভেবী হইয়াই  
করিয়াছে।

কিন্তু স্বরজনের দিক দিয়া তাহার বিপরীত।  
এপার্থ্য তাদের প্রধান চিন্তনীয় ব্যাপারটা লইয়া  
তাদের ভিতর স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা খুব কমেই  
হইয়াছে। তাই আঁজিকার এই কটিন প্রবেশ  
আকস্মিকতার সহস্রাই তাহাকে ঈষৎ বিপর্যয়  
কুলিল। উত্তর দর দেওয়া চলে কি না, জানি না,  
অন্ততঃ স্বরজনের পক্ষে তা দেওয়া কটিন। এর  
বার্ধা উত্তর সর্বাঙ্গির পক্ষেও হয়ত একটু কঠোর  
হইয়া পড়িবে, স্বরজনের পক্ষে তাহা হুস্মায়া।  
ঈষৎ আহত, ঈষৎ বিরত, ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে একটু-  
খানি মান হাপি হানিয়ার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,  
“না, দুঃখ আর করি কই! দুঃখ তো  
করি না।” বলিতে বলিতেই হৃদযোজ্জ্বল বিবাহ-  
বাগ্পে কঠোর একটুখানি ধরাধরা হইয়া আসিল,  
উল্লসপ্রায় দীর্ঘশ্বাসটাকে সত্তর্পণে একটু-  
খানি দিয়া চৌকির একটা কোণায় একটু-  
খানি হানিকর যেন কাঁপাইয়া বড় করিয়া তুলিতে চাহিলেন, কিন্তু  
অন্তঃসারশূল বৃদ্ধদের মতই তাহা যেন মুহূর্ত্তেই শূন্যতার  
মধ্যে নিলানিয়া গেল।

“কর না? চুপটা করে তবে কি-ই বা এত বলে  
বলে তার বল তো? চোখাটা কি রকম হয়েছে  
হৃদযবের অলান দিয়ে একবার দাঁড়িয়ে দেখ তো!”

“আর একবার সেই রকম অর্ধব্যাক্ত অসুট  
হাসি হাসিয়া পিতা সময়ে মেয়ের উৎকণ্ঠা-শঙ্কিত  
মুখের পানে চাহিয়া লইয়া সমস্ত-বিস্ময় ফল্যাবশেষে  
সত্তর্পণে চৌকিয়া রাখিয়াই উত্তর করিলেন,—

“জান তো মা, আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে,  
‘বৃদ্ধতাবিস্তামধ’, আর বুটিন গল্ফমেন্ট এই যে  
পেন্সনের ব্যবস্থা করেছে, এ-ও কি বুঝা।”

সর্বাঙ্গি স্বভাব দিয়া উঠিল, “না বাবা! তা বলে  
তুমি এত কিছু বুঝা হওনি। পকার বছর বয়সে ওরা  
পেন্সন দিয়ে চুকিয়ে দেবে বলে কি ওটা বুঝাবয়েস

বলতে হবে? আমাদের দেশের নিয়মে ছেখাটিতে মধ্য-  
জীবন, তারপর থেকে বৃদ্ধ।”

স্বরজন এবার সভ্য-সভাই হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন,  
“তাহলে মা, এদেশে আর কাউকে বুড়া হতে হবে না,  
ছেখটির পর আর ক’জন এমুগে বেঁচে থাকে? আর  
জাতির গড়-পড়তায় তেইখ বসার পরামর্শ—”

সর্বাঙ্গি ঈষৎ চিন্তিত হইয়া কি ভাবিল, একটা  
নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “সে কথা ঠিকই, বুড়া এদেশে  
আর নতুন করে হতে হয় না,—অবশরও হয় না;  
আবশ্রকও নেই,—এদেশের ছেলে মেয়েরা বুড়া হয়েই  
জন্মায়।”

তারপর সহসা সজ্জিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহমিত  
মুখে বলিয়া উঠিল, “না বাবা! তা বলে তুমি এইটেকেই  
বড় রকম একটা নজীর বলে ধরে নিও না  
যেন, বোহাই তোমার।”

স্বরজন একটা স্থলীর্ণ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ঈষৎ  
হাস্তমুখে মেয়ের মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।  
মুখে কথা বোঝাইল না।

সর্বাঙ্গি বলিতে লাগিল, “গাহেবরা বাহারকার নিরম  
খুব নিয়মিত ভাবে পালন করে, ওদের জাতের  
লোকেরা তোমার বয়সেও রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে,  
সাইকেল চালায়। আবার আমাদের দেশের সেকলে  
লোকেরাও খুব স্বহা আর দীর্ঘজীবী হ’তেন। এখনও  
দেখতে পাই, ভাষ্মপ-পতিত প্রেমীর আর খুব নিয়ম-  
চালিত্তি বিশ্বাসের ভেতর অকেইই সত্তর পেরিয়েও  
বিনা-চশমায় লেখা-পড়া করেন, নিজেই রাতে আশ  
চিরিয়ে খান। শুধু এই মাঝের বয়সী থেকে কমবয়সী  
মেয়েপুরুষবাই এদেশে ইতোনতই গুজোভ হ’তে বসেছে।  
না বাবা, তোমায় আমি তাদের দলে পড়তে দেব না,  
তোমায় শরীর ভাল রাখতে হবে, অনেকদিন বাঁচতে  
হবে।”

স্বরজনের চৌকির কোলে ঈষৎ একটুখানি হাসি  
উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি এশান্ত স্তব্ধ  
কহিলেন, “তুমি তো আমার শরীরের জন্তে কম চেষ্টা



করচো না মা। এত যত্নে যদি শরীর ভাল না থাকে, তাইলে নিতাই তার বেইমানী। তারপর চকিতের মধ্যেই তাঁর হাসি মিলাইয়া গেল, অকস্মাৎ ভাসিয়া আসে এক টুকরা কালো মেঘের মতই একটা হুহুহু হুহু-পাখীরা তাঁর মুখের উপর দিয়া এক মুহূর্তে খেলা করিয়া চলিয়া গেল। তাহারই ভিতরকার সজ্জিত ঈষৎ একটু অশ-অর্জিতা যেন বাধা মানিল না। সচেষ্ট ঐশ্বর্য্যের ধাঁধ ভাসিয়াও একটু হুইয়া পড়িল। কহিলেন—

“বাচতেই হবে, মরণ যদি নেহাৎ না মানে, কে মানাবে? আপনা হ’তে মরবার কথা আমি তো ভাবতেই পারিনে, যত অশঙ্কনই হোক, জানি আমার বাঁচতেই হবে।”

ইহার পর আর এ আলোচনা করা চলে না, করিতে গেলে যেখানে গিয়া পৌছিতে হইবে, সর্গাঙ্গী সর্গাঙ্গরগণেই সেখানেকে পরিহার করিয়া চলিতে চায়। তার বাপকে যে কেন তাঁর অত্যন্ত অনিচ্ছুক বাধিত চিত্ত হইয়াও দীর্ঘ দিন জীবিত থাকার অভিলাষ বহন করিতে হইবে, সে কথাটা তো আর তার কাছে

উজ্জ্বল নয়; আর সেটা তাকে আর কেহ তৈরী করিয়াও দেয় নাই, নিজের ইচ্ছায় এ সমস্তার সৃষ্টি সে তো নিজেই করিয়াছে; ইহার জন্ত দায়ী যদি কেহ জগতে থাকে, তবে সে নিজেই। অতএব এ আলোচনা থামাইয়া দেওয়াই মঙ্গল। অগ্রদূত কৃত্তিম হাসি হাসিয়া বলে,—“হবেই তো। একশো বছরের কম নয়। দেখো, তার আগে আমি কখনই তোমায় সেতে বের না।”

এই বলিতে বলিতেই সে নিত্য ব্যস্ততার গহিতে কি বেন কি একটা মত বড় দরকারী কাজের খাতিরেই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। চলিয়া গেল বলিয়াই জানিতে পারিল না, তার ঐ কথাটিতেই তার বাপের বিশাল ছটা চোখ এক মুহূর্তে অশ্রুপূর্ণে ভরিয়া উঠিল। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, সেই অশ-উৎস হইতে দুইটি ক্ষীণ ধারাও হয়ত বা আচম্বিতে নামিয়া পড়িল। গুরুব হইলেও স্বরঞ্জন মাহুষ। গুরুব মাহুষ বলিয়াই কি ভগবান তাঁহাকে পায়াল দিয়া তৈরী করিয়াছেন?

(ক্রমশঃ)



## বাক্সালান দেন মন্দির

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম-এ

বর্তমান রাজশাহী সহরের সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেওগাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের সংলগ্ন বিরাট একটি দীঘিকে এখনও লোকে বলে ‘পহুমগরের দীঘি’। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে মেটেকাক্ নামে একজন ইংরেজ দেখিলেন, দীঘির পাড়ে অলংঘ্য ইটপাটকেল ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একখানা পাথরও আছে, তাহার গায়ে অনেক লেখা। মেটেকাক্ মাহেব অনেক বহু করিয়া পাথরের গায়ের লেখাগুলি পড়িলেন। ঐ লেখা পড়িয়া জানা গেল, সেন বংশের আদি রাজা বিজয় সেন এই দীঘি কাটাইয়া তাহার পাড়ে প্রকাণ্ড এক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবের নাম ছিল ‘প্রহ্লাদেশ্বর শিব’। তাই লোকে আজিও দীঘিটিকে পহুমগরের দীঘি বলে। ঐ পাথরবানার গায়ে স্মরণিত সত্ত্বত লোকে বিজয় সেন পর্য্যন্ত সেন বংশের রাজ্যগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে, দীঘি কাটাইবার কথা আছে। যেই দেবতার স্ত্রী-ভাগা এমনি যে, মার অর্দ্ধেকখানি স্ত্রী তাহার কপালে জুটয়াছিল (অর্ধনারীধর শিব) সেই দেবতার জন্ত রাজা একশত দেবদাসীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন— এই কথাও এই লিপিতে আছে। বিখ্যাত কবি উমাপতিধর এই শ্লোকগুলির রচয়িতা। জয়দেব গীতগোবিনদের ভূমিকায় বলিয়া গিয়াছেন, লতার মত বাক্যজাল বিস্তার করিতে উমাপতিধরের জুড়ি ছিল

না। কাজেই কবির রচনা কেমন জাঁকাল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কবি খুব খটা করিয়াই প্রহ্লাদেশ্বর শিবের মন্দিরটির বর্ণনা করিয়াছেন। মন্দিরটি প্রকাণ্ডকার। ইহার শাখাসকল নিকসমূহকে অধিকার করিয়াছে। ইহার ভিত্তিগুলি এবং কাণ্ড মহাবোমকে অধিকার করিয়াছে। হুগা এতদিন উদয়গিরি-শিবের হইতে ভোরে রওনা হইরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর অস্তগিরি-শিবের বিশ্রাম করিবার স্থান পাইত। কিন্তু এই মন্দিরের শিবর এত উচ্চ হইয়াছিল যে, এখন মধ্যাহ্নকালেও ইহার উপর সূর্য্যের বিশ্রাম করিবার একটা স্থান মিশিল। ব্রহ্মাও এতদিন নিরালাষ হইরা আঁকুনে স্থগিতোচ্ছিল। কখন ভাসিয়া পড়ে, তাহার কিছুই ঠিক ছিল না। বিজয় সেন এই মন্দির তুলিয়া এমন একটি স্তম্ভ গড়িলেন, যাহাতে ভর করিয়া জিলোক রক্ষা পাইল।

কিন্তু জিলোকের অবলম্বন-স্তম্ভ এই বিশাল মন্দিরটির আজ দুই চারিখান ইটপাটকেল ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাক্সালা দেশে এই রকম শত শত মন্দির ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাক্সালা দেশের জলবায়ু এমনি প্রভাব যে, সারা বাক্সালা দেশে এমন একটি মন্দির বা শৌখণ্ড খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহা প্রাক-মুসলমান যুগের বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ যুগের মন্দিরগুলি এমনি নিম্নেই বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ আমাদের



প্রতিবেশী প্রদেশ উড়িষ্যা প্রাক-মুসলমান যুগের মন্দিরের ছড়াছড়ি। ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশেও এই যুগের মন্দিরের অভাব নাই।

ভাগ্যই প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার ফলে লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ পাথরের দেশ নহে, কালামাটির দেশ। পাক। গাঁতুনি প্রধান অবলম্বন, এখানে মাটি পুড়িয়া যে



চুবদলের মন্দির

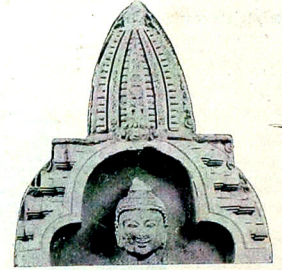
বাঙ্গালার মন্দিরগুলি কি সবই বিজেতার। ইট হর, তাহাই। ইট-চূণ-সুরকীতে যে দালান বা মন্দির ভাসিয়াছে? কিছু সত্তবত: ভাসিয়াছে, কিন্তু বেশীর প্রস্তত হয় তাহার গায়ে অথবের চারা জমান অনিবার্য।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারীর বংশ গরিব হইয়া পড়িলে মন্দিরের আর তেমন ব্যয় থাকে না। ফলে দেখিতে দেখিতে মন্দিরের গায়ে অথব গাছ জমিয়া বাড়িয়া উঠে এবং একদিন ভয়ঙ্কর ঝড়ে গাছ উপড়াইয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের গতিরোধকারী মন্দিরও ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

তবে কি প্রাক-মুসলমান যুগে বাঙ্গালা দেশের মন্দিরের কি আকৃতি ছিল, জানিবার কোন উপায় নাই? সৌভাগ্যক্রমে একটি খুর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং অতি ক্ষীণ হস্ত ধরিয়া প্রাক-মুসলমান যুগের বঙ্গীয় মন্দির-স্থাপত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি। কৌতুহলী পাঠক মদীয় "Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca museum" নামক পুস্তকের সুবন্ধের ৮ম অধ্যায়—"An idea of the temples that were erected over these images" পড়িয়া দেখিতে পারেন। ১৩৩৬ সনের শ্রাবণ-সংখ্যা "পদ্মপুষ্প" পত্রিকা এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিল। এই স্থানে অতি সংক্ষেপে প্রাক-মুসলমান যুগের বঙ্গীয় মন্দির-স্থাপত্যের স্বরূপ এবং কিরূপে তাহা নির্ণীত হইল, তাহা কিরিয়া বলা আবশ্যক।

পূর্ণ ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য, মুসলমান এই দেশে আসিবার পূর্বে কি রকম ছিল জানিতে ইচ্ছা হইলে, উড়িষ্যার মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তথায় দেখা যায় যে, প্রধানত: দুই ছন্দে মন্দিরগুলি নির্মিত হইত। দেবতা যেই মন্দিরে থাকিতেন, তাহা হইত দীর্ঘাকৃতি। উহাদের মাথায় থাকিত প্রকাণ্ড একটি আমলক শিলা। উহা যেন মন্দিরের মণ্ড। মাঠের মাথার নীচে যেমন স্বক, আমলক শিলার নীচে মন্দিরেরও তেমনি, আমলক হইতে অপেক্ষাকৃত সর, স্বকজ বা বাড়-কড়া। এক সোছা দড়িক মাথা রাখিয়া ছাড়িয়া দিলে যেমন

তাহা দ্রবং, দ্বীত হইয়া শুদ্ধাকারে লগা হইয়া সুলিয়া পড়ে—এই দেউলের আকৃতিও তাহাই। আমলক ও



মহাকালা গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিতে অঙ্কিত মন্দিরের প্রতিকৃতি যাড়ের নীচেই তাহার গণ্ডি বা শরীর। এই শরীরের নীচে পীঠ বা বেদী। এই দীর্ঘাকৃতি তরঙ্গবৎ পঙ্করময় দেউলগুলির নাম রেখ দেউল। রেখ দেউলের সমূহে দেব-দর্শনার্থিগণের আগ্রহের ভজ



গোবিন্দের খিটমাবাণ মন্দির

বে দেউল নির্মিত হইত তাহাকে বলিত ভয় দেউল, পীঠ দেউল বা শিড়া দেউল। সাধারণত: ইহাকে

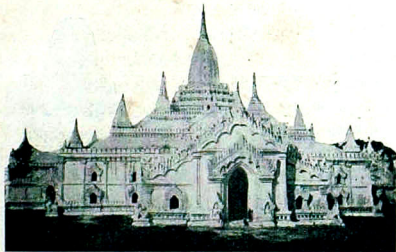


জগন্মোহন বলা হইয়া থাকে। এই দেউলের ছাত উপর মন্দিরের যে প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমব্রশায়মান করেকটি ধাপ, পিঁচ বা পিঁচা দ্বারা তাহাতে এক নূতন ধরণের মন্দিরের পরিচয় পাওয়া গঠিত হয়। ৭১৬ পৃষ্ঠায় উড়িষ্যার রেখ ও পিঁচা যায়। দুইটন্ত স্বরূপ ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় দেউলের ছবি দেওয়া গেল। মহাকাশী গ্রামে প্রাপ্ত ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি খানা (৭১৭ পৃষ্ঠা)



পেথান্দারি স্থলেনানী মন্দির

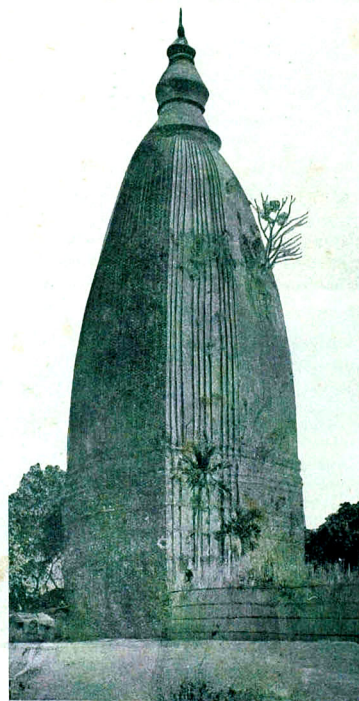
উড়িষ্যার মন্দিরগুলি প্রধানতঃ এই দুই শৈলীতেই দেখাইতেছি। দেখা বাইরে যে, বুদ্ধদেবের মাথার (ছন্দ, — Style) তৈয়ারী হইত। বাঙ্গালা দেশে উপর একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি আছে। উহার



পেথান্দারি আনন্দ মন্দির

ইটের তৈয়ারী রেখ দেউলের অনেক নমুনা দেখিতে ছাতের দিকটায় চারিটি ক্রমব্রশায়মান ধাপ, উপরের পদস্তরী দ্বারা, ভিন্ন দেউলের উদাহরণ কম। বাঙ্গালা ধাপের মধ্য হইতে ঠিক রেখ দেউলের অঙ্কুরিত দেখে প্রাপ্ত কয়েকখানা পাথরের মূর্তিতে, মূল মূর্তির একটি শিখর উঠিয়া গিয়াছে। মন্দির নির্মাণে এই

শৈলীর ব্যবহারের উদাহরণ উড়িষ্যায় কোথাও নাই। দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মদেশের পেগানে এ বেন ভদ্র ও রেখ দেউলের এক অপূর্ণ সমিশ্রণ। এই ছন্দের মন্দিরের অভাব নাই। পেগানের বিখ্যাত



রাজাবাহাল মন্দির

এই ছন্দের কোন মন্দির আজ বাঙ্গালা দেশে 'আনন্দ মন্দির' এই ছন্দে তৈয়ারী। পেগানে আরও



বহু মন্দির আছে যাহা এই ছন্দে তৈয়ারী, উগ্রাদের  
কষ্টে কখনার ছবিও দেওয়া হইল। (৭১৭-১৮ পৃঃ)  
মন্দির উপরের মন্দিরের নম্রার সহিত পেগানের

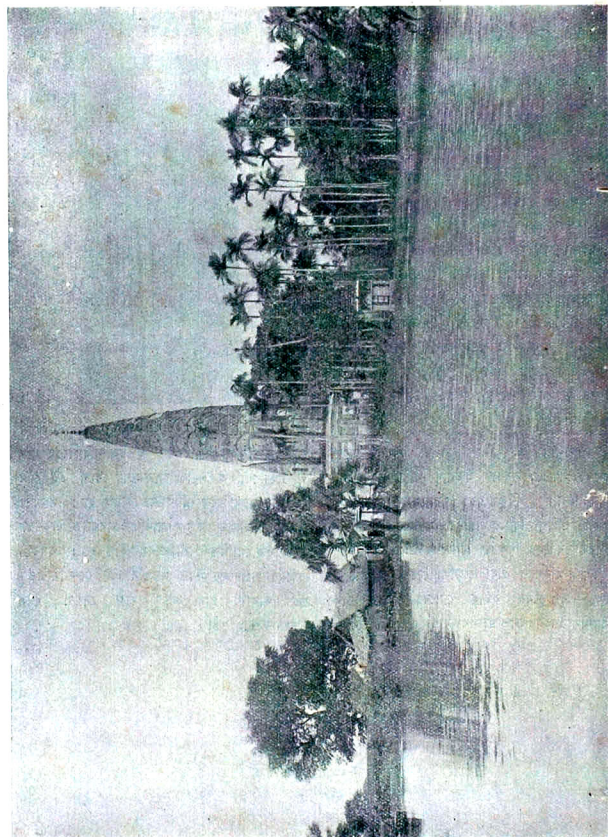
বাইতেছিল না। বহু গণ্ডিত এই বিষয়ে বহুবিধ কল্পনার  
অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের মন্দিরে এই  
নমুনা মন্দিরের নম্রা পাইয়া এখন জোর করিয়াই



মোনারস্বরের মন্দির

মন্দিরগুলির এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া একটু বড়  
সমস্তার সমাধান নিদিয়াছে। পেগানের এই মন্দিরগুলির  
শৈলীর উৎপত্তি কোথায়, তাহা এ যাবৎ খুঁজিয়া পাওয়া

বলা যায়, ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব স্থাপত্য-শৈলী, ক্রমশঃ  
উপনিবেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্য করিলে  
দেখা যাইবে, বড়বড়ের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির এবং



পেগানের মন্দির



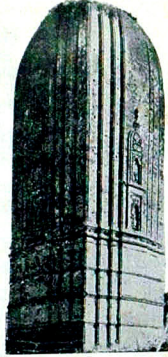
এক্সার ভাটের বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দিরও এই একই ছন্দে জৈমিনী। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, বাঙ্গালার নিজস্ব এই স্থাপত্য ছন্দ একাদেশে এবং বীপময় ভারতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

মাত্র কয়েকখান। পাথরের স্তম্ভের মাথায় অরিত মন্দিরের নক্সা এত বড় একটা আবিষ্কারের ভিত্তি হওয়ার অনেকেই হয়ত এতদিন ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। এই ছন্দে রচিত একটা মন্দিরও যে বাঙ্গালা দেশে এতদিন পাওয়া যায় নাই, তাহাতেও সন্দেহ বন্ধিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু পাহাড়পুরের হুগ্রাটীন মন্দির আবিষ্কৃত হইয়া সেই সন্দেহের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পেপানের মন্দিরগুলি বেই ছন্দে রচিত, উহাদের ভিত্তির নক্সা যেই প্রকারের, পাহাড়পুরের মন্দিরের ছন্দ ও ভিত্তি-নক্সাও অবিকল সেই প্রকারের। এবং পেপানের মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর, পাহাড়পুরের মন্দির উহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ চারিশত বৎসরের পুরাতন।

বাঙ্গালার এই নিজস্ব স্থাপত্য শৈলীই ক্রমশঃ একরকম, পঞ্চরকম, নবরকম ইত্যাদি মন্দিরের জন্মান করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দির, হুগলী গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের মন্দির ইত্যাদি এই পরবর্তী কালের একরকম মন্দিরের উদাহরণ।

বেধ মন্দিরের প্রথা বাঙ্গালা দেশে খুবই প্রচলিত ছিল—বীরভূমের ইছাই ঘোষের দেউল, ঢাকা বিক্রমপুরের বিখ্যাত রাজাবাড়ীর মঠ (৭১৯ পৃষ্ঠা)—

(কয়েক বৎসর পূর্বে পদ্মানদীর গর্ভে পতিত), ২৪ পরগণায় জটীর দেউল ইত্যাদি বাঙ্গালার ইষ্টকময় বেধ



ইছাই ঘোষের দেউল

দেউলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইয়েরজ অবিকারের সঙ্গে পাশ্চাত্য পৌখিক শৈলীর আক্রমণের ফলে এই বেধ দেউলের রচনা ছন্দে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক স্থানিষ্ঠিত বিখ্যাত একুশরত মঠেই এই পৌখিক শৈলী প্রথম গৃহীত হয়। পরবর্তী কালের পূর্ববঙ্গের সমস্ত মঠগুলি এই ছন্দে নির্মিত। দুই খাবার ছবি এই সঙ্গে দেওয়া গেল।



ভৈরবী—তেতাল

কহা কহা চোড়তহি ভাই  
চৌড়হু সব দিশি পেরন ন জাই।  
জ্বর ত্রিাসল পিয়াস ন মিটল  
বিগ্রাকুল চিত্ত ভেল দরশন চাই।  
সোজন বিন সহি চিত্ত বৈরজ নহি  
আঁখি বরখত রহি।  
কহা তাকা পাই, পুন হেরব তাহে  
নহি পতিয়াই ॥

কথা—শ্রীমতী অরুণা দেবী

হর—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

অস্বারী

১ ২ ৩  
গা সা জা মা গা -১ পা পা জ্ঞমা জ্ঞা জা মা জ্ঞা -১ সা -১  
ক হা ক হা চৌ ° ড ত হি ° ° ° তা ° ই °

১ ২ ৩  
গা সা জা মা পা দা গা সা পদা গা দা পা মা জা ঝ সা  
চৌ ° ড হু স ব দি শি পে ° ° খ ন ন জা ° ই ॥

অস্তুরা

১ ২ ৩  
জা মা দা গা সা -১ সা সা সা সস্বা জ্ঞা স্বা সা গা দা পা  
জ দ য় তি যা ° স ল পি যা ° ° স ন মি ট ল

১ ২ ৩  
জা -১ পা পা দা গা দা পা জ্ঞা মা জ্ঞা মা জ্ঞা জ্ঞা স্বা সা  
ব্যা ° কু ল চি ত ভে ল দ ব শ ন চা ° ° ° ই ॥



সঙ্গারী

১ ২ ৩ ৪  
 গা -১ সা স্বা জ্ঞা জ্ঞা মা মা জ্ঞা মা জ্ঞমা জ্ঞমা জ্ঞা স্বা সা সা  
 সা • জ ন বি ন স হি চি ত থৈ • • র জ ন হি I

১ ২ ৩ ৪  
 সা দা দা -১ পা দা পা পা জ্ঞা পা দা গা জ্ঞমা জ্ঞমা -১ সা  
 স্বা • বি • ব র খ ত র হি • • • • • তা • • ই I

আভোগ

১ ২ ৩ ৪  
 দা মা দা গা সা -১ -১ -১ গা সা গসা স্বা সা গা দা পা  
 ক হা তা কো পা • • • ই পু ন রে • • র ব তা হে I

১ ২ ৩  
 মঞ্জা রজ্ঞা পা -১ দা পা মঞ্জা রজ্ঞা মপা দপা মঞ্জা মপা দপা মঞ্জা স্বা  
 ন • • হি • প তি রা • • • • • ই • • • • • II



## নবকিশোরের পরিচয়

শ্রীযুক্তদেব বসু

(১)

নবকিশোর হঠাৎ আবিষ্কার করলো, এবং আবিষ্কার করে ব্যথিত হলো, যে তার কোনো পরিচয় নেই। এটা এমন কোনো অভাব নয়, যা নিয়ে আমরা সাধারণত মন-খারাপ করে থাকি : কিন্তু নবকিশোরের আর সবই ছিলো, এবং কোনো-একটা অভাব নাকি মাহুষের দরকার—বাঁচবার পক্ষে। আমরা চাই, তাই আমরা বাঁচি।

নবকিশোরকে আমি সেদিনও দেখছি, হাফ-প্যান্টের উপর গলা-বন্ধ কোট চড়িয়ে বই-খাতা বগলে করে ইষ্টুলে যাচ্ছে। সে-সময়ে ও যদি এক-বেলা সিনেমা দেখতে পেতো—আর ইন্টারভ্যু থেকে পেতো এক পাকুর আইস-ক্রীম—তা হ'লে ও মনে মনে বলতো : হেভনু ! মানে, এর বেশি আর জীবনে কী থাকতে পারে। এবং নানা ছলছুতো করে মার কাছ থেকে সিনেমা আর আইস-ক্রীমের পয়সা আদায় করা ছিলো তার জীবনের সাধনা। ভুলোঙলো যদি একটু স্বচ্ছ হ'য়ে পড়তো, তা'তেও এসে যেতো না, কেননা তাদের পয়সার অভাব ছিলো না, আর বিধবা মা তার একমাত্র ছেলেকে অন্ধের মত ভালোবাসতেন। তার বাবার মৃত্যু হয়, যখন সে খুব ছোট। এই ঘটনা নিয়ে আশাহতরূপ কণ্ঠ-রঙ্গ ছোটোতে পারলুম না : কেননা, বাপ যখন রেখে যান ব্যাকের খাতার লগ্না অঙ্ক, কল্‌কাতায় বাড়ি, আর দেশে জমিদারি ... মানে, এমন অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়, যখন পিতৃহীন গুয়াটা দস্তরমত ভাগ্যের ব্যাপার। বিধাতা যাকে দেনু তাকে সবই দেনু : নবকিশোর স্বাধীন না হ'লে তাকে আমরা এমন সম্পূর্ণ করে পেতুম না।

যা বৃদ্ধিলুম, সিনেমা আর আইস-ক্রীম আর চকোলেটের লজ্জা নবকিশোরকে কখনো ভাবতে হয় নি। ছেলবেলা থেকেই পৃথিবীকে সে স্বর্ণ বলে ভাবতে শিখেছিলো। ব্যক্তি ত তার রাজ্য : তাকে নিয়েই, বলতে গেলে, তাদের বাড়ি। তার শুধু এক ছোট বোন ছিলো, চম্পা তার নাম। এখনো বৃদ্ধিতে পারছি নে, এ গল্পে সে কোনো কাজে লাগবে কিনা, তবু এখানেই উল্লেখ করে রাখলুম।

সম্প্রতি নবকিশোরের বয়স উনিশ হয়েছে, সে বি-এ পড়ছে ঝটিশে। আমার চোখের উপর সে ধাঁধা করে যে-রকম বেড়ে উঠেছে—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। লাইয়ের পাংখা, সবুজ ডগা রোজ একটু একটু করে সামনের দিকে এগোয়—বেড়া পার হ'য়ে ওঠে গিয়ে ঘরের চালে, যেন আঙুল বাড়িয়ে ক'কে ধরতে চায়। সেই অদ্ভুত শক্তি, সেই তনীর প্রাণ নবকিশোরকে ঠেলা দিচ্ছে ভিতর থেকে : সে বাড়বেই, সে ছুটে উঠবেই, সে হবেই—কী হবে, তা'তে এসে যায় না, সে যে হ'য়ে উঠছে, 'টোটেই মস্ত কথা। কলুর মত সে ছুটে উঠছে, হর্যাক সে শুয়ে নিয়েছে সমস্ত শরীর দিয়ে। তার উজ্জ হাসিতে, তার ক্রান্ত চলায়, এলোমেলো কথা বলায়, তার সব পাগলামিতে, ছেলোমানিষে' উপচে পড়ছে প্রাণ, নতুন যৌবন। আশ্চর্য্য !—সেই নবকিশোর, ছোট ছেলে, এই সেদিনও একা কোনো চায়ের দোকানে চুকলে দোকানি আগে জিজ্ঞেস করে নিতো, সঙ্গে পয়সা আছে কিনা—সে আজকে একটা শক্তি, একটা দীপ্তি, সে আজ একজন। সে যে একজন, এই চেতনা তার মনে নেবার মত। বাড়তে-বাড়তে সে পাঁচ ফুট মশ ইঞ্চিতে ঢেকেছে : এখানেই যে থামবে, তা জ্ঞোর করে' বলা যায় না। মানান-







কাছে বর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশের ভূটি অল্প রকম। স্বাধীনসীমাকে আমরা ঠিক প্রকারে চোখে দেখতে পারিনি; স্বাধী হওয়া, আমাদের মনে কোনো-না-কোনো ভাবে শোষী হওয়া। গ্রন্থকে আমরা পুঙ্খ করি; গ্রন্থী হওয়া, দরিদ্র হওয়া, রূপ হওয়া, এই সবই হচ্ছে পুণ্য, এই আমাদের মনের ভাব। আমরা গ্রন্থের কাড়াল; তাই বোব হয় বিধাতা এত গ্রন্থ আমাদের কপালে মিথিছিলেন। কান্নার ন্যাংদর্পেত বাহাওয়াতেই আমরা সব চেয়ে ভালো থাকি; মনের মাগেরি। থেকে কোনোদিন মুক্ত হ'লেই বোব হয় আমরা মরে' যাবে।

নবকিশোরের, দেখা যাচ্ছে, কোনো অভাব নেই—এক, সে নিজেরই বা আবিষ্কার করেছে, একটা পরিচয়ের অভাব আছে। একটা পরিচয়; এমন-কোনো জিনিস যা তাকে প্রকাশ করবে, বা'র ভিতর দিয়ে নিজেকে সে দিতে পারবে, দেখতে পারবে, বা'র আলোর সোকে তা'কে টনিবে। বেশ তো ছিলো সে এতদিন; বা'কিছু তা'র ভাবনা শরতে ময়ের ছায়ার মত লুপ্ত আর ধ্বংসী; কখনো মনে হয়নি সে যা, তা থেকে অন্তরকম কিছু উঠে ভালো হ'তো। কিন্তু আত্ম বে সে হঠাৎ দিতে পেলো তা'র এই অভাব—তা'র কারণ মঞ্জরী নামের এক মেয়ে।

দলের মেয়েদের মধ্যে মঞ্জরী বয়সে সব চেয়ে ছোট—তা'র মানে নবকিশোরের সে সময়কার, কি বৈতুক ছোট, তা ধরবার মধ্যে নয়। তা'র চোখের তারা নিবিড় কালো, আরো বেশি কালো তা'র চুল। সে কেনম দেখতে, তা'র আমি ঠিক বলতে পারিবে না, মেয়েদের রূপ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি নে।

প্রথম বৈদিন তা'দের দেখা হয়, এই মেয়েটির মুখে উজ্জ্বল স্তনে নবকিশোরের বকের মধ্যে মনে হচ্ছে উঠলো সোনার বকী। তার মনে সেইভাবে বিকশের সোনালি আলো কান্ডের খেলনার মত উজ্জ্বল পড়লো টুকরা-টুকরা হ'য়ে। পরিচয় হ'লো।

নবকিশোর বললে, 'চমৎকার বিকশ'। মঞ্জরী বললে, 'কালকের ঘরে আজ ঠাণ্ডা।'

আরওটা আশাহরুপ নয়। কিন্তু ভালোবাসার জন্ত যেসব সোকে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে, তারাও পরস্পরকে প্রথম সেকথা বলেছিলো, তা' — ভাগিন্দু তা আমরা জানিমে।

আগে-আগে জন্মে' উঠলো আলাপ। তারপর যা হ'তে পারে, তাই হ'লো।

এমন সময় একদিন, মঞ্জরীর ভালোবাসার গভীর চোখ বধন পড়তে এসে তা'র মুখে, হঠাৎ সে যেন লাক দিয়ে জেগে উঠলো। হঠাৎ সে নিজের মনে বললে: তাইতো! আমি কী? আমি যে কিছুই নই! কিছুই নই। কিস কী আমি না-হ'তে পারি? সন্ধ্যা-সন্ধ্যা তার' মনে হ'লো, 'মঞ্জরীর জন্ত, মঞ্জরীর ভালোবাসায় কী না আমি হ'তে পারি!'

পুরাণে দেখতে পাই, পুরুষ প্রকাশ সভায় শক্তির কোনো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'য়ে তবে লাভ করে স্ত্রীকে। তার মানে এই, পুরুষ বধন কোনো নারীকে ভালোবাসে তা'র মধ্যে সঞ্চারিত হয় ধানিকটা বাঙুতি উদ্ভাব, ধানিকটা ত্রেজ, যেটাকে কোনো-এক রাস্তায় নির্গত করে' দিতে না-পারলে সে বাঁচো না। পরীক্ষাটা শক্তির নয়, প্রেমের। কারণ, প্রেমই হচ্ছে স্ত্রীলাভ করবার একমাত্র যোগ্যতা।

পুরুষ বধন ভালোবাসে, সে বলে তা'র প্রিয়াকে: 'তোমার জন্ত চাঁদ কেড়ে আনবো আকাশ থেকে, তোমার গলায় পরিয়ে দেবো তারার দেয়াল' বলে। লোকেরা এ-সব কথা উড়িয়ে দেয় 'কবিত্ব বলে', কিন্তু সেটাই যে তা'র অন্তরের সত্য। কিছু এসে যায় না, চাঁদ আর তারারা যে তা'র নাগালের বাইরে; সে যে চাঁদ, আকাশের চাঁদ আর তারা তা'র প্রিয়াকে খুঁসি করবার জন্ত, এটাই হচ্ছে আসল কথা। তা'র মনে যে ছুটেছে 'অসম্ভবের পিছনে, এটাই তার প্রেমের বাঙুতি ক্ষমতার পরিচয়। সে তখন নিজের মনে কেবলি বলছে: 'কী করতে পারি

আমি এর জন্তে, কী করে' বোঝাতে পারি, কত আমি ভালোবাসি একে, কোন্ ভীষণ গ্রন্থ নিতে পারি বুক ভরে', পাঁড়তে পারি কোন্ জলন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি।

নারীর ভালোবাসা পুরুষের মনে একটা পরিপূর্ণতা—তা'রো বেশি, একটা উপপ্লাবন: তা'কে ধরে' রাখা যায় না; তা' উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ছসাহসে, ভীষণ, দুঃখ সত্ত্বে নবকিশোরের মনের মধ্যে হঠাৎ তোল-পাড় করে' জেগে উঠলো কথা: 'মঞ্জরী, আমাকে শুধু বলে' দাও, কী করতে হবে; বাঘের নখ হিনিয়ে আনবো তোমার জন্তে, লাক দিয়ে পড়বো পাহাড় থেকে, স্বপ্নে দেবো সমুদ্রে; তোমার জন্তে আমি হবো এমন যে, আমি পথ দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলবে 'ঐ যে' তুমি শুধু একবার বলো।' তাদের রূপে পড়লো না 'কো ভাইনিও, একটা লাইন আটকে গিয়েছিলো নবকিশোরের মনে: 'Merely an earth's to cleave, a sea's to part!' তুমি কী চাও বলো, শুধু একটা পৃথিবীতে ছি'ড়তে হবে, একটা সমুদ্রই তো ছি'ড়কি করতে হবে। কিন্তু এমনি তা'র কপাল মঞ্জরী কিছুই চায় না, কোনো দরকারই তা'র নেই। সে মঞ্জরীর জন্ত কিছুই করতে পারে না; মঞ্জরী তা'কে কোনো বুঝিয়ে দেবে না তা'র পায়ের নীচে তা'র প্রাণ বিছিয়ে দেবার। কী অন্তার! মঞ্জরী কোনো বিপদে পড়বে না যে সে ঠিকার করবে; তার প্রতি কেউ কোনো অন্তর করবে না যে সে নেবে প্রতিশোধ। কিছু দাও, তোমার জন্তে কিছু কর'তে দাও আমাকে, তা' না হ'লে আর বে বাঁচো নে।

একদিন নবকিশোর জিজ্ঞেস করলে মঞ্জরীকে: 'আচ্ছা, আমি কী হ'লে তুমি খুশি হও?'

'কী হ'লে—মানে?' মঞ্জরী প্রথমটায় বুঝতে পারলে না।

'মানে—লোকে তো কত রকমের কাজ করে—এমন কোনো কাজ, ধরো, যা খুব মস্ত—তুমি কি চাও

না আমি সে-রকম কিছু—' মনের ভাব প্রকাশ করতে নবকিশোরের বিস্তর বেগ পেতে হ'লো।

মঞ্জরীর চোখে হাসির ঝলসানি খেলো 'কিশোর', মুহূর্তের সে বললে, 'তুমি যা, তাই যে সব চেয়ে ভালো। তুমি তুমি বল'লেই তো তোমাকে ভালোবাসি।'

নবকিশোর অস্থিরভাবে তার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে আরম্ভ করলে, 'আচ্ছা, ধরো আমি যদি—'

'কিন্তু, কিশোর' মঞ্জরী বাধা দিয়ে বললে, 'তোমার কিছু হওয়াই যে আমি চাইনে। কিছু হওয়া মানেই অজ-কিছু হওয়া। আমি চাই তুমি তুমিই থাকো।'

'আমি যদি', নবকিশোর প্রাণপণে তার চুলগুলো টানতে লাগলো, 'আমি যদি উঠতে পারি হিমালয়ের চূড়ায়, তুমি খুশি হও না?'

মঞ্জরী গভীরভাবে বললে 'সে দেখা যাবে পরে ভেবে, সম্ভবিত তোমার চুলগুলো, এসো, ঠিক করে দিই। ইল, কী ছিরি করেছে চুলের।'

নবকিশোর তখনকার মত চূপ ক'রে গেলো, কিন্তু তা'র মনের ছটকটানি শান্ত হ'লো না। কিছু তাকে করছেই হবে, কিছু তাকে হ'তেই হবে। এমন মঞ্জরীকে আর কিছু বলবে না: হঠাৎ একদিন দেবে তাকে লাগিয়ে। হিমালয়ের চূড়ায় চড়া নিয়ে 'সে ধানিকন্ধ গভীর জয়না করলে। দেখা গেলো, তাতে প্র্যাটিক্যাল অস্বহিবে অনেক। তার চেয়ে বরং...বরং—হঠাৎ যেন আকাশ থেকে দেববাণী হ'লো—তা'র চেয়ে সে বরং দেখে না কেন? কী লিখবে? যা তা'র খুশি, যা' মনে আসে, সে-সব ছাপাবে মাগিকপড়ে। সেই মুহূর্তে দেখাটা তার কাছে হিমালয় জয় করা কি বাঘের নখ উপড়ে আনবার চাইতে কোনোরকমেই ছোট কাজ মনে হ'লো না। বরং অনেক বড় কাজ, সত্যি বলতে মাহুঘের সব চেয়ে বড় কাজ। সে তা'র দলের মধ্যে একথা অনেকবার উচ্চারিত হ'তে শুনেছে যে মাহুঘের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তা'র আঁট। আর দেখাটা অবিশিষ্ট একটা



আট। সে একজন আর্টিস্ট হ'তে যাচ্ছে, একথা ভাবতে তার শরীর রোমাঙ্কিত হ'য়ে উঠলো।

২

হুতরাং স্থির হ'লো, নবকিশোর সাহিত্যিক হবে : আর বাংলাদেশে সাহিত্যিক হবার মত সোজা কিছুই নয়, যদি শুধু যথেষ্ট ডাকটিকিট খরচ করবার মত পয়সা থাকে। আপনি একটা কবিতা লিখলেন—সেটা জানবেন কোনো-না-কোনো মাসিক পড়ে ছাপা হবেই, যদি পাদপুরণে ছাপবার আদায় ছোট হ'য়ে থাকে। গল্প ছাপানো তার চেয়েও সোজা (কারণ বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম লোক গল্প লেখে), যদি তার জন্ম পয়সা না নেন। আর প্রবন্ধ তো পাঠালেই ছাপা হবে—ইংরিজি আর সংস্কৃত থেকে লিখা-লিখা কোটেশন থাকলেই হ'লো। আর ভ্রমণ-কাহিনী তো বে-কোনো সম্পাদক লুফে নেবেন, যদি মনে থাকে ছবি। নবকিশোর প্রথমে কয়েকটি কবিতা লিখলো, সেগুলো ছাপা হ'লো দশ হাজারের উপরে কাটতি, এমন সব মাসিক পড়ে। তার পরে গল্প : গল্প লেখবার আধুনিক ধরণের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো—এক ভীষণরকম আধুনিক, হলবে মলাটের কৌশল কাগজে বেরলো তার গল্প। তারপর শুভল গুপ্তের কাব্য-বিজ্ঞান, ম্যাথু আর্নল্ড আর ল্যালে অ্যাবারক্রিফি যেটো সে মাঝে 'কাব্য ও জীবন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ। সেটা দেশবিখ্যাত এক সাপ্তাহিকের সম্পাদক (প্রবাদ, তিনি ভয়ানক কড়া সমালোচক, তাঁকে বা যারেল করলে, তা হচ্ছে আবাবক্রিফি নাম, বা তিনি আগে কখনো পোনেন নি) সাহসে গ্রহণ করলেন। ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার কথা নবকিশোরের মনে হ'লো না : কারণ সে জানতো না যে, ভ্রমণ না করেও ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যায়। মোট কথা, প্রেক্ষে-না-প্রেক্ষে তার নাম পড়লো ছড়িয়ে, হ'লো জায়ায় তাঁকে নিয়ে কথা উঠতে লাগলো : বোঝা

পেলো, অল্পদিনের মধ্যেই সে হ'য়ে উঠবে দশরমত একজন 'খ্যাতনামা লেখক', নতুন-কোনো কাগজ বেরোলে লেখকবর্গের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হবে যার নাম। দলের মধ্যে সে ছোটখাটো একটি সিংহ হ'য়ে উঠলো—একটু পোষা, একটু বেশিরকম আত্মসচেতন সিংহ, যদিও। এভাবেই তার জুটলো একটা পরিচয়।

কিন্তু এতেই তৃপ্ত হ'য়ে সে চূপ করে পেলো না। কারণ লেখা এমন একটা ব্যাপার, যা ভালো করে আরস্ত করতেই যা-একটু সময় নেয়, কিন্তু একবার আরস্ত করে' ফেললে আর সহজে থামানো যায় না। বাংলাদেশ মাসিকপত্রের সেই ত্রুটিই চলেই, অজ্ঞাত

বেমন আশা করা গিয়েছিলো, মজরী অতিথিত হ'লো : এতটা নবকিশোর নিজেও আশা করে নি। যা কিছু সে লিখতো, তাই পড়ে মজরী উঠতো উজ্জ্বল হ'য়ে : 'বাম, কী চমৎকার লিখেছো—লাতলি, লাতলি।' এমন মুহুরের মিষ্টি করে' বলতো ও-কথাটা, এমন স্বন্দর ভঙ্গিতে তার 'টোট হুট মুহুরের জন্ম পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হ'য়ে বেন অনিচ্ছাসহ্যে দৈর্ঘ্য খুলে যেতো যে নবকিশোর মুহুরেতে তাকিয়ে থাকতো সেদিকে, তুলে যেতো কি নিয়ে হাঁফালো কথা।

একদিন হয়তো এক গল্প বেরিয়েছে, মজরী ছ' হাতের মূর্তির ভিতর তার হাত টেনে নিয়ে বললে, 'হুট, এত ভালো তুমি লিখতে পারো, আমাকেও কি সে-কথা আগে বলতে হয় না?'

নবকিশোরের মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। তার একবার মনে হ'লো, বলে, 'তা কি আমি নিজেই কিছুদিন আগে জানতুম।' কিন্তু ও-কথা বলা ঠিক মানানসই হবে কি না, বৃথতে না পেরে চূপ করে' রইলো। মনে-মনে বলল : 'বেন বলতে চাইলেই তুমি দিতে।'

'বলো', মজরী তার হাতের উপর একটু চাপ দিলে, 'কী করে' পারো তুমি এমন ডিভাইন সব জিনিস লিখতে।'

এইবার নবকিশোর মুখ তুলে' মজরীর দিকে তাকিয়ে মুচুকি হাসলো, বেন বলতে চায়, 'কেমন! তখন তো আমার কথা পাঠাই মাথো নি।' মুখে বললে, 'তুমি যে খুঁসি হও পড়ে', তারই জন্মে আমি খুঁসি।'

'ও-কথা বলো না। তুমি যেখানে লেখক, সেখানে আমি তোমার অনেক পাঠকের একজনমাত্র—তা ছাড়া আর কী? আমার একবার খুঁসি হওয়া নিয়ে তুমি কী করবে—তোমার লেখা সকলের।'

'কিন্তু আমি তোমার, তোমার। তোমারই জন্মে আমার সব লেখা।'

মজরী তার ছ'হাতের মধ্যে নবকিশোরের একহাত টেনে নিয়ে একটু চাপ দিলে। 'এইবার একটা কবিতা পড়ে' শোনো না।'

'কোনটা?'

'যেটা তোমার খুঁসি। যেটা তোমার ভালো লাগে।'

'আমার একটাও ভালো লাগে না।'

'কোনো জিনিস লিখে কে করে সম্পূর্ণ খুঁসি হ'তে পেরেছে?'

'আচ্ছা, গতিহী কি ওগুলো এমন-কিছু ভালো?'

মজরী অভিমানের স্বরে বলে, 'আচ্ছা, থাক তা হ'লে—না পড়লো।'

'করে না পড়েছি, মজ?'

'আমি বলবামাত্র পড়বে না কেন?'

'—কী-এক মেরে!—আচ্ছা', নবকিশোর হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর জড়ো করা কাগজের স্তূপ থেকে একটা বেছে নিলে, 'শোনো তবে।'

'ভীষণভাবে শুদ্ধি।'

হু'একবার গলা-বাঁকারি দিয়ে নবকিশোর একটু ধপা গলায় পড়তে আরস্ত করলো। মাঝে মাঝে বেন চোখ তুলে, তাকায় সামনের দেয়ালের দিকে।

দৈবাহ হু' একবার মজরীর সঙ্গে সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে যায়, মজরী উজ্জল হেসে তাঁকে উৎসাহ দেয়।

দোজাই প্রায় এইরকমের কথাবার্তা হয় হু'জনে।

জন্মে এমন হ'লো যে, পেগোতাই হ'য়ে উঠলো অসল; যার উপলক্ষে, যার জন্মে পেগা, সেটা এলো যান হ'য়ে, সরে' যেতে লাগলো দূরে। নবকিশোরের পেগা তাদের হু'জনের মাঝখানে একটা আকর্ষক জীর আলোর মত—যা'তে পরম্পরের মুখ আর ভালো করে' দেখা যাচ্ছে না। নবকিশোর অবিশ্রিত তা লক্ষ্য করলে না : আর মজরী গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

৩

নবকিশোর বললে, 'মজরী, তুমি সাহিত্য বোঝো আশ্চর্যরকম ভালো।' আন্তরিক বিবাস থেকেই বললে কথাটা : মজরীর মুখের কথা শুনে এক-এক সময় তার সত্যি মনে হ'তো যে পড়াশুনো যদিও সে খুব বেশি করে নি, তার সহজ রসজ্ঞান অত্যন্ত প্রবীণ। (কিন্তু-কিন্তু আপটন সিন্ধুজোর আর আইডেন বুনিন পড়বার পর দলের লোকদেরকে তার মনে হ'তে আরস্ত হ'য়েছিলো অর্ধ-শিক্ষিত শোহের।)

মজরী বললে, 'বেশ কথা।' ভালো জিনিস যদি ভালোবাসতেও না পারি, তা'কেই তো বলে শোড়া-কপাল।'

'চাইলেই কি আর ভালোবাঁয়া যায়। তার জন্মেও যে বিশেষ-একটা ক্ষমতার দরকার।'

'জানি নে। আমার তো মনে হয়, সেটাই সব চেয়ে সহজ।'

'তোমার পক্ষে, মজরী, তোমার পক্ষে। তুমি অসাধারণ।' নবকিশোরের আত্মগুণ্ডো অধিহতায়ে সঞ্চারিত হ'তে লাগলো তার চুলের মধ্যে। 'আচ্ছা', একটু চূপ করে' থেকে সে বললে, 'তুমি মাঝে-মাঝে একটু-আখুট লেখবার চেষ্টা করলেই তো পারো।'

'পাগল।' মজরী হেসে উঠলো।

'কেন? পাগল কেন? আমার তো মনে হয়, তুমি বেশ ভালোই লিখতে পারবে।'

'তোমার লেখাই তো আমাদের হু'জনের।'



‘এইবার তুমি ঠিক বাঙালী মেয়ের মত কথা বললে।’

‘কিন্তু আমি যে বাঙালী মেয়েই, কিশোর।’

‘না, শোনো’, নবকিশোরের এককণ্ঠ স্বরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, এইবার স্থল করে বসে পড়লো আসন গিঁড়ি হ’য়ে কাগজের উপর, মঞ্জরীর পায়ের কাছে, ‘শোনো, একটা গল্প কি-কিছু তুমি লিখেই জাচ্ছে না—একটা। আমার কথায়। ছাপাবার জন্তে তোমার ভাবতে হবে না—আমি পাঠিয়ে দেবো কোনো কাগজে।’

‘সত্যি?’ নরম দৃষ্টিতে নবকিশোরের মুখের উপর ফুঁকে পড়ে মঞ্জরী বললে, ‘বলো কী। আমার লেখা ছাপবে কেউ!’

কথার বাঁকা হাঁদা লক্ষ্য করবার অবস্থা তখন নবকিশোরের নয়। ‘ছাপবে না কেন?’ প্রচণ্ড উৎসাহে সে বলতে লাগলো, ‘আমার সঙ্গে ওদের জানাশোনা আছে, আমি বললেই ছাপবে। তা ছাড়া’, নবকিশোর তাড়াতাড়ি নিজেদের গুণের নিয়ে, ‘তোমার লেখাও অবিশ্রি ছাপবার মতই হবে। আমি একটু খেবে-টেকে দেবো—কোনো ভাবনা নেই তোমার।’

মঞ্জরী হুদ্ব বাঁকিয়ে বললে, ‘তা হ’লে তো কিছু লিখতেই হয়, বেবুছি। এমন স্বযোগ কি ছাড়া যারি।’

নবকিশোর একবারে ভেসে গেলো উৎসাহে। ‘হ্যা, লেখো’, কী করে সে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো, ‘আমি ঠিক জানি, তোমার লেখা অনেকের চাইতেই ভালো হবে। তাহাে একবার, তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে—কী ভীষণ মজা—’

‘আন্তে, আন্তে, মঞ্জরী চোখ দিয়ে ভ্রাম্যমান নবকিশোরকে অস্বরণ করে’ বললে, ‘সে-সব ভাববার ঢের সময় পড়ে’ আছে এখনো।’

এক পর থেকে নবকিশোর কেড়ে নিলে মঞ্জরীর মনের শান্তি। ‘বেহা হ’লেই, ‘আরম্ভ করোতো?’ ‘বা:

কবে আর লিখবে।’ ‘বলো, আজই বসবে লিখতে।’ যেচারা মঞ্জরী—তা’র মনে জমা হ’য়ে রয়েছে কত কথা, যা শুধু অন্তরদুকেই বলা যায়—ফুরসতই পায় না সে-সব বলবার। না, এ আর বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না—মনে-মনে সে বললে।

নারী বাক্য ভালোবেসেছে, তাকে খুঁসি করবার জন্ম করেছে নানারকম কঠিন কাজ—আর এ তো সামান্য গল্প লেখা।

শেষটায় মঞ্জরী একদিন বললে, ‘লিখেছি।’

নবকিশোর লাফিয়ে উঠলো। ‘কই, রেবি।’

কী লিখেছে? কবে লিখেছে? প্রশ্নগুলো টাল মাটলাতে না পেয়ে একটার খাড়ে আর-একটা বেরিয়ে এলো।

‘গল্প লিখেছি একটা। এই নাও।’ বললে মঞ্জরী একটা ছবির বইয়ের ভিতর থেকে বার করে’ দিলে একতাক কাগজ।

সেটা নিয়ে নবকিশোর বসলো একটা চেয়ারে, পড়ে’ মেতে লাগলো রকুথাসে, শুরু হ’য়ে। মঞ্জরী ততক্ষণ একটু ঘুরে সে’ শাড়ির আঁলটা বার-বার জড়তে লাগলো আর খুলতে লাগলো।

এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করে’ নবকিশোর পকেট থেকে রুমাল বার করে’ মুখ মুছলো। তারপর মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘বেশ হয়েছে! দেখলো—আমি তো আগেই বুঝছিলাম! বেশ হয়েছে। তবে ভাঙটা হু’ এক জায়গায় একটু কাঁচা—তা ঠিক হ’য়ে বাবে আপনাই।’ তারপর একটু থেমে বললে, ‘লিখতে-লিখতে ভাবা আসে।’

যেমন, অবিশ্রি নবকিশোরের ‘নিজের বেলায় এসেছিলো।’ আজকাল অনেক জায়গাতেই সে প্রশংসা শুনেছে তার ভাষার। এক-কথা বিখ্যাস করবার তার খেটে কারণ আছে যে ভাঙটা তার আসে। সে যখন বলে, ‘লিখতে-লিখতে ভাবা আসে’ তখন সে কী বলছে, তা ভালো করে’ জেনে-তেনেই বলে।

মঞ্জরী কোনো কথা বললে না; চুপ করে’ তাকিয়ে রইলো মেশের দিকে।

নবকিশোর লেখাটার এক জায়গায় আবার চোখ বুলিয়ে বললে, ‘হুদ্ব! মঞ্জরী, এবার আমার পালা অবাক হবার।’

মঞ্জরী বললে, ‘দিদি কাল এক হুঁড়ি আঙুর পাঠিয়েছেন। তোমার জন্তে নিয়ে আসছি করে’কটা।’ বললে উঠে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

পরদিনই নবকিশোর ‘জিন্দোতা’ কাগজে পাঠিয়ে দিলে মঞ্জরীর গল্প: সঙ্গে তার নিজেরও একটা গল্প দিয়ে’ দিলে—মঞ্জরীরই ভালোর জন্তে। আর-কিছুর জন্তে না হোক—তার লেখার সঙ্গে-সঙ্গে হয়-তো মঞ্জরীরটাও চল’ বেতে পারে।

বধ্যাশয়ে জ্বাব এলো সম্পাদকের:

‘সবিনয় নিবেদন, আপনাদর প্রেরিত হুঁটি লেখাই আমরা পেয়েছি।

ঐগুলা মঞ্জরী দেবার গল্পটির জন্ম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লেখাটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে—নামেরে সম্বোধনই দিচ্ছি। আপনাদর হাতে যদি তা’র অন্ত-কোনো গল্প থাকে, দয়া করে’ পাঠালে বাধিত হবো।

নমস্কার ইতি।’

৪

ডয়িংকমের পোকার অনেককণ ঘরে’ খামকা শুয়ে শুয়ে মঞ্জরী ভাবছিলো যে দিনগুলো হঠাৎ এতই গধা হ’য়ে গেলো যে বিকেলের চায়ের সময় আর আসতেই চায় না? ভাবতে-ভাবতে তার চোখ জড়িয়ে আসছিলো, এমন সময় দরজায়—গুঁটগুঁ।

ধড়মড় করে’ মঞ্জরী উঠে বসলো। বললে ‘এসো।’ নবকিশোর ঘরে ঢুকে কোনো ভূমিকা না করে’ পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে’ ছুঁড়ে ফেললে মঞ্জরীর কোলের উপর; বললে, ‘পড়ো।’

মঞ্জরী পড়লো। পড়ে’ মুখ তুলে তাকালো নবকিশোরের দিকে।

নবকিশোরে বলে বললে, ‘আর কী! হ’য়ে গেলো

তোমার।’ অথচ তখন তো আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলো।’

নবকিশোরের কণ্ঠস্বরেই কিছু ছিলো, মঞ্জরীর বা’তে চমক লাগলো। সে ভালো করে’ তাকালে তার’ মুখে; আর-একবার পড়ে’ দেখলে চিঠিটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, ‘হুঁটা গল্পের কথা লিখছে—আর-একটা তোমার বৃষ্টি?’

নবকিশোর ঢোঁক গিলে বললে, ‘হ্যা, আমিও একটা পাঠিয়েছিলাম সঙ্গে।’

মঞ্জরীর চোখ-মুখ হেসে উঠলো, ‘ও, তাই। তাই আমার এত বাতির।’

সে-কথা বিখ্যাস করবার জন্তে নবকিশোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ‘আমরা বা বিখ্যাস করতে ভালোবাসি, মুখে তা’রই প্রতিবাদ করতে ভালোবাসি। তাই সে বললে, ‘তা কেন?’ এমনিও তো তোমারটা বেশ ভালোই হ’য়েছিলো।’

‘হাই হ’য়েছিলো। যে-লেখা সত্যি ভালো, তা’র মধ্যে কি কোনো সম্পাদক এমন করে’ বলে? সেটাকে এমনিতেই মেনে নেয়—যেমন, জাখো, তোমার গল্প সম্বন্ধে সম্পাদক চুপ। তোমার গল্পের মুখ ফুটে প্রশংসা করলেই যে তাকে খাটো করা হ’তো। আর আমার লেখা কিনা কাঁচা, বোঝাই যায় যে আমায়ি হাত—তাই আমাকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছে হু’লাইন।’

‘ভারি তো সে বোঝে লেখার ভালোমন্দর। সকলেই জানে যে ‘জিন্দোতা’র সম্পাদক একটা ইজিট।’

‘আমিও, মঞ্জরী তাড়াতাড়ি বললে, ‘আমিও ভাই অবাক হুঁজিলাম ভেবে, আমার লেখা কী করে’ এ’রা পছন্দ করলেন।’

‘কী করে’ আবার! বেবেছে মেয়ের নাম, আর কি কোনো কথা আছে!’ এক অসাবধান মুহুর্তে নবকিশোর তুলে’ গেলো, এ’র আগে যা-কিছু সে বলেছিলো।

একটু সময়, মঞ্জরী ভীতদৃষ্টিতে দেখে নিলে



নবকিশোরের মূৰ; তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে, 'বাস্তবিক, তোমরা পুঙ্খবদা! যে সব বাপাণ্ডাই মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত, বেন তাঁরা শিশু—এটা সম্ভবমত ব্যাখ্যাননা।'

চাটী অনেকটা চুপচাপ পোছের হ'লো; মজরী অনেকবার চেষ্টা করলে কথার সুর ধরিয়ে দিতে, কিন্তু একটু দূর এগিয়েই তাঁ' কী-রকম বেন হারিয়ে গেলো; সোত বইলো না।

চায়ের পরে মজরী বললে, 'আজ বৃষ্টি জল-শো হচ্ছে গল্‌স্টন পার্কে। বাবে, কিশোর, সেবতে?'

নবকিশোর বাড়ি নেড়ে বললে, 'কী হবে ওখানে গিয়ে?'

'তুমি কুকুর ভালোবাসো না?'

'কুকুর আমি হুঁচকে দেখতে পারি নে।'

মজরী দীর্ঘাশ ফেলো বললে, 'থাক তা' হ'লে।' একটু পরে আবার বললে, 'তবে চলো মানসীকে এবার দেখে আসি। কালকে ও টেলিফোন করে' বসছিলো—'

'মানসী কে?'

'মানসী—আমাদের মান সী—'

'ও, হাঁ! নবকিশোর অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়লো, 'অনেকদিন মানসীকে দেখি নে। কেমন আছে ও?'

'চলো না ওর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'আর-একদিন। আজ থাক। আজ ইচ্ছে করছে না।'

মজরী আর-একবার দীর্ঘাশ ফেললে, মজরী হ'য়ে বললে, 'তুমিই বলো, তা' হ'লে, কী করবে। শেষ পর্যন্ত কী সিনেমাতেই বাবে?'

একটু উন্মুখ করে' নবকিশোর বললে, 'আমার শরীরটা আজ ভালো লাগছে না।'

'কী হয়েছে? মজরীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট আশঙ্কা হুটে উঠলো।

'মাথাটা ভয়ানক ধরেছে, বলে' মনে হচ্ছে।'

'ও-ভিকলো! এনে দেবো? না, গাড়ি নিয়ে খানিকটা বেড়াবো ময়দানে? কী বলো?'

'আমার মনে হচ্ছে, কী-কণ্ঠস্বর নবকিশোর বললে, 'বাড়ি গিয়ে চুপচাপ একটু শুয়ে থাকলেই ছেড়ে যাবে।'

তা'ই করো, তা' হ'লে, তা'ই করো। এতুনি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। মাথা-ধরা থেকে সাংঘাতিক সব অস্থির হ'তে পারে—একে অবহেলা করা কোনোরকমেই উচিত নয়।'

নবকিশোর টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। আর মজরীর মনের উপর নামলো একটা ছায়া।

৫

জিং-জিং — টেলিফোন বেজে উঠলো।

চম্পা—এতক্ষণে ঘা-হোক, আমরা তা'কে কাছে লাগতে পারবুম— চম্পা ঘরের মেঝের মাহুর বিছিয়ে সোতার নিয়ে টুটাং করছিলো, বসে' উঠলো, 'ইস, আলো!'

টেলিফোন বললে, 'জিং-জিং-জিং।'

'আসছি রে বাপু, আসছি।' সোতার রেখে দিয়ে চম্পা উঠে দাঁড়ালো। দাদাকে সন্দের আসেই বাড়ি কিরতে দেখে— আর তাও ওরকম মূখের ছিরি করে'—সে টেলিফোন বাজবার একরকম অপেক্ষা করে'ই ছিলো। 'ও যদি মজরী না হয়, তা হ'লে পাচ মিনিট পরেই মজরী ডাকবে, নিঃস্বের মনে সে বললে। চম্পা এবার যোলোয় পড়েছে, এবং সে বুদ্ধিহস্তি রাখে

'কী খবর, মজরী?'

'কী করে' বৃষ্টি?'

'এই তো মজা। কী খবর, বলো।'

'কেমন আছিস তুই?'

'এই জট্টে?'

'জাব' চম্পা, অল্প বয়েসে তুই বড় বেশি কাজি হ'য়ে উঠেছিস।'

'থাক' তবে কাজলেনি। তুমি যা শুনে চাও, বলছি। দাদা বাড়ি কিরতেই তাঁর ঘরে ঢুকে ডিংশং হ'য়ে শুয়ে পড়েছেন।'

'তবে পড়েছে—সত্যি?'

'অহমানে বলছি। বলো তো দেখে আসতে পারি।'

'গল্‌সী, তুই একবার ওকে ডেকে দে না।'

'তা দিছি; কিন্তু কী হয়েছে, তা আগে বলো।'

'ওকে বল' যে, ভয়ানক দরকারী একটা কথা আছে।'

'তা তো বুঝেই পারছি। স্বগভাটা কী নিয়ে, জানতে পারি নে?'

'না; বড় বড় বেড়েছিস তুই।'

'তানা—না—' চম্পা টেলিফোনের চোঙের ভিতর একটুখানি শুণ্ণ করে' উঠলো।

'শোন্ কথা। ওকে একটু বল না—'

'এই যাচ্ছি। আমাকে একটা কমিশন দেয়া উচিত তোমাদের। এখন তো বলবেই, হ্যাঁ, দেবো, কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন—'

তারের ওপার থেকে একটা অধৈর্যহৃত শব্দ এলো।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি। আলা হয়েছে তোমাদের নিয়ে। ধরে' থেকে একটুখানি।' নবকিশোরের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চম্পা বললে, 'টেলিফোনে মজরী।' নবকিশোর একটা চোয়ারে বসে' ছিলো; বসে'ই রইলো নিশ্চল।

চম্পা আবার বললে, 'দাদা, টেলিফোনে মজরী তোমাকে ডাকছে।'

নবকিশোর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো; বললে, 'যাচ্ছি, তুই যা।'

চম্পা চলে' গেলো ছাতে; পড়ে' রইলো তাঁর সোতার। আগেই বলেছি, চম্পার বুদ্ধিহস্তি ছিলো।

'হঠাৎ?'

'তোমার মাথা-ধরা কেমন আছে?'

'যদ্' খাওয়াপ হ'তে হয়।'

'ভয়ঙ্কর ঝুজিত তোমায় বিরক্ত করছি বলে'। কিন্তু, একটা কথা তোমাকে বলা নিতান্ত দরকার; বলি-বলি করে'ও তখন বলে' উঠতে পারি নি।'

'কী কথা, বলো।'

'জানো, তোমার কাছে আমার একটা কন্‌ফেশন করবার আছে।'

'কন্‌ফেশন?'

'আমি ভয়ানক একটা অস্তায় করে' ফেলেছি, তোমাকে বলবো তা'। কিন্তু আগে তুমি বলো, আমার উপর রাগ করবে না, ক্ষমা করবে আমাকে?'

'তুমি কী বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একটা বিনী প্রতারণা করেছি।'

'আরো বেশি শুণিয়ে যাচ্ছে।'

'বলছি: কিন্তু—তুমি রাগ করবে না তো? তোমাকে খুসি করবার জট্টেই আমি ও-কাজ করেছিলাম।'

'বলোই না কী।'

'শোনো: আমি তোমাকে যে-গভাটা দিয়েছিলাম, সেটা আমার লেখা নয়।'

'তা'র মানে? ওটা কা'র লেখা তা হ'লে?'

'হাজেন্দ্রহন্দর চট্টোপাধ্যায়ের।'

'সে আবার কে?'

'জানি নে। অনেক পুরোনো সব মানিকপুর যে'টে তা'কে পেয়েছিলাম।'

'তা' হ'লে তুমি—'

'হ্যাঁ, পণ্ডিত বছর আগেকার একখণ্ড 'নবভারত' থেকে—আমি শুধু নিঃস্বের হাতে টুকে নিয়েছিলাম, তুমি অত করে' বলেছিলে বলেই, তোমাকে খুসি করবার জট্টেই—কী করবো বলো, গল্প লেখা কী আমার কাজ! ভেবেছিলাম কী আর হবে, কেউ



তো আর সত্যি-সত্যি ছাপুতে' বাচ্ছে না—হু'দিন পরে হিঁড়ে ছুঁড়ে ফেল দেবো। মাঝখান থেকে তোমার যদি একটু ভালো লাগে—মন কী? কিন্তু এখন ভালো বিপদেই পড়া গেছে। তুমি তোমার সম্পাদককে একটু বলে' দিবে, ও-গল্প যেন না ছাপে। কালই—বুঝলে? এরকম হবে জানলে কি আমি স্বখনো—'

নবকিশোর এতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে শুনিছিলো; হঠাৎ প্রায় চাঁৎকার করে' বলে' উঠলো 'আমি আনুছি, এতুনি আনুছি।'

বলেই খটাং করে' টেলিফোন রেখে দিয়ে ছুড়ু-ছুড়ু করে' নিড়ি দিয়ে নেমে মূহুর্তের মধ্যে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ছাত্তের কানিশে ভর দিয়ে চম্পা দেখলে, তা'র দাদা 'শ'ই-শ'ই করে' পা ফেলে চলে' বাচ্ছে। মনে-মনে সে হাসলো; গুনগুন করলে একটুখানি—চম্পার সঙ্গে এই-ই আমাদের শেষ দেখা।

৬

পরিকার আকাশে মত একটা রূপের ডিমের মত একাদশীর চাঁদ: মঞ্জরীর বাগানে আলো আর ছাত্তার খেলা। নবকিশোরকে আসতে দেখে মঞ্জরী ঘাসের উত্তর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলো।

'কী, তোমার কথা-ধরা ছাড়লো।

'সব ছেড়ে গেছে, বকেতে পারো।'

হু'জনে রু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো; কোনো কথা বলল না। মঞ্জরীর হাতের কাছে ছিলো একটা বেলফুলের গাছ; নীচু হ'য়ে তা'র একটা পাতা তুলে এনে সে সেটাকে হিঁড়তে লাগলো 'কুচি-কুচি করে'।

ধানিক পরে নবকিশোর বললে, 'মঞ্জরী, কেন তুমি আমাকে ও-মিথোটা বলতে গেলে?'

'কেননা আমি জানতুম যে, তুমি বুঝতে পারবে ওটা মিথ্যে। আর কী উপায় ছিলো তোমাকে জানাবার? তারপর আমার ধানিকক্ষণ চুপচাপ। আকাশ ফেটে পড়ছে চাঁদের রূপালি আভাষ। হু'জনে পায়চারি করতে লাগলো বাগান ভরে', এলোমেলো। তারপর হঠাৎ নবকিশোর খেমে গেলো।

'কী?'

'মঞ্জরী, আমি মনে-মনে একটা সত্ত্ব করছি, তোমাকে বলি।'

মঞ্জরীর কালো চোখে প্রশ্ন স্বপ্নে' উঠলো।

'লোহা আমি ছেড়ে দেবো।'

একটু চুপ করে' থেকে মঞ্জরী বললে, 'ভালোই করবে। ও-সব ব্যাপারে আমাদের কী কাজ?'

'আমি যা কিছু করতে চেয়েছিলুম তা' তো তোমারই জন্ত, তোমারই জন্ত। কিন্তু সেই কাজের নীচে তুমি বাচ্ছিলে চাপা পড়ে'। আর এমন কোনো ভিনিস যদি থাকে, যাতে সত্যি-সত্যি কিছু এসে যায়—সে তো তুমি, তুমি।'

মূহুর্তের জন্ত মঞ্জরীর চোখ উঠলো ছলছল করে'; সে অত্যন্তিক মুখ কিরিয়ে নিলে।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না।

তুমি বলি লেখো, তা হ'লেই ভালো হয় সব চেয়ে।

তুমি যে সত্যি—লিখতে পারো।'

মঞ্জরী নবকিশোরের দিকে তুললো তা'র গভীর কালো চোখ, এইমাত্র ছলছলিয়ে উঠে যা' আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। বললে, 'ধাক্কা, কাজ নেই আমাদের ও-সব। আমরা কেন চাইবো কোন চিন্তা, যা দিয়ে লোক আমাদের ডিনে? তুমি যে তুমি, আর আমি যে আমি, এই ঢের। তুমি আর আমি যে আছি, এই সব চেয়ে বড় কথা। তুমি আর আমি আছি—অন্ত-কেউ লিপুৎ আমাদের গর।'

## ত্রিদিবনের সাথী

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

নদীর বুকে তরি আমার ধরল যখন পাড়ি,  
আকাশ তখন নীল ছিল গো রৌদ্র ছিল ভারি।  
বাতাস লেগে বুক-ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাল,  
স্রোতের ধারা বুকেতেছিল ফাঁকা ফোঁসার জাল।  
শঙ্কাবিহীন মাঝি ব'সে ছিলাম নায়ের মাথে,  
হৃদয়-ভরা গর্ব ছিল শক্তি ছিল হাতে।

হঠাৎ ঝড়ো কোণের দিকে একটু হ'লো মোঘ,  
নদীর বুকে হাওয়ায় একটু বেড়ে উঠল বেগ।  
বাদামখানি সেই বাতাসে উঠল আরো ফুলি',  
উচ্চ হ'য়ে উঠল আরো চুচ্চ লহরগুলি।  
স্বপ্নে ছিলাম মগ্ন হ'য়ে—পারের দিকে রোখ,  
কাল ব'শেখার ঝড়ের পানে তাই পড়িনি চোখ।

কাল ব'শেখার রুদ্ধ দোলা—হঠাৎ দেখি চেয়ে  
নটরাজের প্রলয় নাচে আকাশ গেছে ছেয়ে।  
ধুমকেতুরি পুচ্ছ নেড়ে আসছে নেমে ঝড়,  
মেঘের মাদল বাজিয়ে হাঁকে ছরস্তু অশ্বর।  
পাহাড় গ'ড়ে টেউয়ের পাখার উচ্চ ফিকে ফিকে,  
ধূ ধূ ধূ অথই বারি গর্জে চতুর্দিকে।



ছিন্ন আমার পালের দড়ি, চূর্ণ আমার হাল,  
তরি আমার ঘুরছে যেন অশান্ত মাতাল।  
কানের কাছে কে যায় গেয়ে ঘুম-পাড়ানোর গান,  
মুচ্ছা-ঘেরা তন্দ্রা তলে এলিয়ে পড়ে প্রাণ।  
চেউয়ের কোলে দেখছি আমার শয্যা আছে পাঁতা,  
মাথার পরে হাসছে হাসি নির্গম বিধাতা।

ওরে আমার ভান্সা তরি, চির দিনের সাথী,  
হৃথের দিনে আমার সাথেই গোঙালি দিন-রাত।  
হৃথের দিনে চোখে কেন জগাও ভয়ের রেখা,  
এক বুকেতেই তোমার আমার স্থান যে আছে লেখা।  
হৃদয় ভরা থন্-থরানি থামা রে তোর থামা,  
আমার বোঝা নাম্বে যেথায়, তোরও বোঝা নামা।



# বুদ্ধবোধ

## শ্রীশৈলজালাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ণাহরতি)

কিন্তু কাল পর্যাণ্ত অপেক্ষা করা পিষ্টলীর স্বভাব নয়। দুপুরে বাওয়া-দাওয়ার পরেই সে উপরে উঠিয়া গেল। ভাবিয়াছিল, দেবু হয়ত উপরেই আছে, কিন্তু গিয়া দেখিল, দেবু নাই, মেকের উপর অজবিন যেমন শুইয়া থাকে সেমিসেও মাসি ঠিক তেমনি করিয়াই একা শুইয়া আছে।

পিষ্টলী ঘরে ঢুকিতেই মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবু কোথায়?'

বাড় নাড়িয়া পিষ্টলী বলিল, 'জানি না তা।'

অর-কিছু না বলিয়া মাসি চুপ করিয়া রহিল।

পিষ্টলী ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল। ভাবিয়াছিল, সকালের অর্ধসমাপ্ত কাহিনীটা সে তাহাকে শেষ করিতে বলিবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও দেখিল যখন মাসি তাহাকে কোনও কথাই বলে না, তখন সে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'বুমায়ে নাকি?'

মাসি বলিল, 'না।'

পিষ্টলী বলিল, 'সেই যে সেই রাজার ছেলে তারপরে কি করলে বল দেখি?'

মাসি বলিল, 'কি করলে তা' ত জানিনে, মা।'

'আধখানা কাহিনী শুনতে নেই। সবটা শুনলে কি হয় জানো তা?'

'কি হয়?'

পিষ্টলী বলিল, 'একটা চোখ কানা হ'য়ে যায়, আর একটা পায়ে পোদ হয়।'

মাসি হাসিয়া বলিল, 'এতও তুই জানিস্ মা! এত কথা তুই শিখিলি কোথায়, পিষ্টলী?'

পিষ্টলী বলিল, 'আমাদের ও-পাড়ার—সেই বেথান থেকে আমার উঠে এলাম গো,—সেইখানকার সেই পাকলকে জানো তা?'

কে তাহার পাকলকে জানে। মাসি তবু হাসিয়া বলিল, 'বুঝ জানি।'

হাত নাড়িয়া চোখ বুঝিয়া পিষ্টলী বলিল, 'সেই পাকলের কাছে শিখেছি। তুমি শিখবে?'

মাসি আবার হাসিল। বলিল, 'না মা, আমার আর এ-বয়েসে কিছু শিখে কাজ নেই। তুমি শিখলেই চলবে।'

এই বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাসি বলিল, 'দেবুকে ডেকে আনো ত মা।'

পিষ্টলী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিন্তু তুমি যেন বুমিয়ে পড়ো না। এসে আমি কাহিনীটা বলব, তোমায় শুনতে হবে।'

বলিয়া পিষ্টলী নাচে নারিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'ও গো ও দেবুর মা, দেবু তোমার এলো না বাপু।'

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললে?'

'তার বৌমার কাছে গুয়ে রইলো। বললে, 'আমি যাব না'।..

মাসি মাত্র 'হ' বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।



পিটুলী আবার ধীরে-ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'না, আশ্রু পে।'

মাসি তবু কোনও কথা বলিল না। মুখ ভারি করিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। রাজার ছেলের গল্পটাও বোধ হয় তাহার মনোবাহার ইচ্ছা নাই।

পিটুলী বলিল, 'তুমি ঘুমাবে, না দেবু মা? পায়ে তোমার হাত বুসিয়ে দেবো?'

মাসি বলিল, 'না মা, তুমি এখন যাও। আবার সেই বিকেলে এসো।'

পিটুলী কিন্তু তখন তাহার পায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাসি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানিতে পারে নাই। ঘুম ভাঙিতেই দেখিল, তাহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে পায়ে উপর তাহার সেই কচি হাতখানি রাখিয়া পিটুলীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

হা ভগবান! তাহার বৃদ্ধ বক্ষিত মাতৃদয় ইহাদের ভালবাসিয়া একটুখানি শান্তিলাভ করে, অথচ বুঝি ভালবাসা। পর কখনও আপন হয় না। তবু সে ভালবাসিতে চায়। পিটুলীর হাতখানি তাহার পা হইতে ধীরে-ধীরে সরাইয়া দিয়া মাসি উঠিয়া পাড়াইল, কিন্তু বাটের উপর হইতে দেবুর ছোট বালিশট আনিয়া পিটুলীর মাথার নীচে ধরিয়া দিতেই সে জাগিয়া উঠিল। খড়ম্ভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

মাসি বলিল, 'বেশ ত। ঘুমোও তুমি। উঠছো কেন?'

পিটুলী বলিল, 'না, আজ চললাম। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমি গল্পাচান করতে যাব। নিয়ে যাবে ত?'

মাসি বলিল, 'না মা, ওই একজনকে নিয়ে গিয়ে

এক ফাসাদে পড়েছিলাম, আবার ভোমার নিয়ে গিয়ে আবার বিপদ কেন? তোমার মাকে বারাকে একবার জিগ্যাসা করো।'

'বেশ!' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া পিটুলী চলিয়া গেল।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। মাসি এই সময় একবার ঘরে ঝাঁটা দিয়া ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়, তাহার পর বেড়াইতে বাহির হয়। কিন্তু সেদিন তাহার কি যে হইল কে জানে, ঝাঁটা দইয়া ঘর পরিষ্কার করিতে তাহার আর মন সরিল না, ঘর-দোর তেমন অপরিচ্ছন্ন হইয়াই রহিল, বারান্দার রেলিং-এর গায়ে ভর দিয়া পাড়াইয়া পাড়াইয়া ভনিতো লাগিল—নীচের ঘরে দেবু বোধ হয় তাহার মার সঙ্গে গল্প করিতেছে। ছেলেটাকে অনেকক্ষণ দেখে নাই, একবার ইচ্ছা করিল তাহাকে ডাকে, কিন্তু না ডাকিতে আপনা হইতেই যে আসিয়া পাঁড়ায়, বারংবার ডাকা সহ্যও আল সে একসময়ের জ্ঞানও আসিল না—ইহারই দ্রুত অন্তিমানে 'হু' চোখ তরিয়া তাহার জল আসিল।

দেবু যে কেন এরকম করিল, কেন যে সে মাসির কাছে গেল না, মাসি তাহার হেঁচুটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাহার মা-বাপের উপরেই দোষটা চাপাইয়া দিল। ভাবিল বুঝি আর-একটা ভাড়াটে আমার জ্ঞান রাখা করিয়া তাহার বাবা হয়ত তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু আসলে তাহা সত্য নয়। ধীরে-ধীরে নিষেধ করে নাই, নারায়ণীও নিষেধ করে নাই। দেবুর ধারণা—তাহার একাধিপত্যে বাধা পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম পিটুলীকে সে সহজে উপরে উঠিতে দিত না, মাসির সঙ্গে গল্প করিলেই টানিয়া সে তাহাকে অস্তর লইয়া যাইত, কিন্তু শেখ শেখ যখন দেখিল পিটুলীই জ্বরী হইয়াছে, মাসি তাহাকে অনেক সময়

নিজে ডাকিয়া কাছে বসায়, বসাইয়া গল্প বলিতে বলে, যখন-তখন যার তার কাছে তার প্রশংসা করিতে থাকে তখন আর সে রাগ না করিয়া পারে নাই, অভিমান করিয়া নিজেই সরিয়া পাড়াইয়াছে।

পরদিন সকালে গল্পার ঘাইবার জ্ঞান মাসি নীচে নামিয়া আসিতেই পিটুলী ধরিয়া বলিল—সে তাহার সঙ্গে যাইবে।

মাসি বলিল, 'না মা, চল তোর বাপ-মাকে আগে জিগ্যাসা করে আসি।'

মাধব তখন বসিয়া বসিয়া চা খাইতেছে, আর বীণা বোধ করি ঘরের কাছকন্ঠ লইয়া ব্যস্ত। মাসি দরজার কাছে গিয়া পাড়াইতেই হাসিতে হাসিতে বীণা তাহার মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া বলিল, 'আমুন মা, আমুন—ভেতরে আমুন।'

মাসি বলিল, 'না মা, ভেতরে যাব না। আমি গল্পা নাইতে যাক্ছি, মেয়ে তোমার ধরে বসেছে, আমার সঙ্গে যাবে।' নিয়ে যাব কিনা, তাই জিগ্যাসা করতে এলাম।

মাধব বলিল, 'যাক্ না। তার আবার জিগ্যাসা করবেন কি?'

বীণা বলিল, 'আপনি ছেলেপুলে বড় ভালবাসেন, না মা?'

মাসি তাহার ঠোঁটের কঁাকে হান একটুখানি হাসিল মাত্র।

চা খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া মাধব একবার টুট করিয়া তাহার স্ত্রীর দিকে আর একবার মাসির দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু বঁকে বঁকে জীবন ও আপনার অস্তিত্ব করে দেবে মা।'

মাসি বলিল, 'না বাছা, ও তোমার বেশ ভাল মেয়ে। আমার তাঁ বাবা বড় ভাল লাগে।'

মাধব আর-একবার তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইল। চোখে চোখে দেখা হইতেই বীণা হাসিয়া বলিল, 'তা' বেশ ত, ওকে আপনি রাখুন তা হ'লে আপনার কাছে।'

মাধব বলিল, 'আপনার কাজকর্ম করে দেবে, সেবারে করবে, ভালই ত।'

মাসি হাসিয়া বলিল, 'মেয়ে বলেই তাই দিতে চাচ্ছ বাবা, কতাদায় থেকে বাঁচবে তা হ'লে, কিন্তু ছেলে হ'লে দিতে চাইতে না।'

এই বলিয়া আঙুল পাড়াইয়া মাসি একবার গনিকের নারায়ণীর ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'ওই জাখো না বাবা! ছেলেটা আমার কাছে থাকতে ভালবাসে, তাও মিনে দশবার করে বারণ করে দেওয়া হয়।'

মাধব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীণা বলিল, 'না মা, বারণ আমরা করব না।'

মাসির এদিকে দেবী হইয়া যাইতেছিল। নতই বেলা বাড়তে রৌদ্রের তেজ ততই বেশি হয়, তাহার উপর ছোট ওই মেয়েটাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে আসিবার সময় হয়ত একটা রিক্শা ভাড়া করিতে হইবে।

মাসি বলিল, 'আমার আর পাড়াবার অবসর নেই মা, আমি চললাম।'

বলিয়া সে পিটুলীর হাতে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া দেখিল, নারায়ণীর ঘরের দরজায় পাড়াইয়া দেবু তাহাদের দিকে একদমে তাকাইয়া আছে। মাসি বেশ জোরে জোরেই বোধকরি তাহার বাবা-মাকে ডানাইয়া ডানাইয়াই বলিল, 'তোমাকে ত আর নিয়ে যাবার জো নেই বাবা, নইলে যেমন হ'ত, হ'জ্জেন একটা রিক্শা গাড়ী করে যেতে আর আসতে। তা' অমন করে চোখ ছল্-ছল্ করে পাড়িয়ে দেখলে আর কি হবে বল।'

বলিতে বলিতে পিটুলীকে লইয়া মাসি যেই পিছন ফিরাইয়াছে, দেবু একবারে রাসিয়া আঙুন হইয়া গিয়া কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া এদিক গনিকের কাছাকাছি লাগিল। দেখিল বাবা তাহার চা খাইয়া থাণি পেয়ালাটা দরজার চৌকাঠের কাছে



নামাইয়া রাখিয়াছে। সেই পেয়ালাটা সে তুলিয়া লইয়া পিট্টলীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু মজা হইল এই যে, পেয়ালাটা পিট্টলীর গায়ে না লাগিয়া লাগিল গিয়া মাসির মাথায়। পেয়ালাটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং যন্ত্রণার অস্থির হইয়া মাসি তৎক্ষণাৎ কিরিয়া আসিয়া দেবুকে টপু করিয়া ধরিয়া ফেলিল। হাতটা ছাড়াইবার জন্য দেবু প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রাগে অকস্মাৎ দুগ্ধে মাসির পা হইতে মাথা পর্গাত তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সজ্বারে দেবুর কান মলিয়া দিয়া মাথায় ঠাস্ ঠাস্ করিয়া ছই চড় মারিয়া মাসি চাঁৎকার করিয়া উঠিল, 'কে তোকে এসব শেখালে বল বুদ্ধি, নইলে তোর মা বাবা আমি কারও কথা শুনব না, মেয়ে তোকে আমি খুন ক'রে ফেলব।'

দেবুও চাঁৎকার করিয়া কানিতে মুক করিল, মাসিও চাঁৎকার করিতে লাগিল, এবং ইহাদের এই কোলাহল শুনিয়া নারায়ণী ছুটয়া আসিল, বীরেন আসিল, ওদিক হইতে বীণা ও মাধব দরজার আসিয়া দাঁড়াইল, এবং এই সবেদ মাঝখানে পিট্টলী একেবারে অবাক হইয়া গিয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেইই জ্ঞানিল যে, দেবু মাসির মাথায় ঢায়ে পেয়ালা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া—

বীরেন বলিল, 'আপনার বয়স হ'য়েছে, আপনার কি গুকে অমন ক'রে মারা উচিত?'

কথাটা শুনিয়া মাসি লজ্জায় বেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। যে ছেলেকে সে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে, যে তাহার প্রাণাপেক্ষাও বেশি, কি দুঃখে সে যে আজ তাহার গায়ে হাত তুলিয়াছে, সে কথা জানেন একমাত্র তাহার অন্তর্যামী। এই লইয়া আজ যে তাকে এমন কথা শুনিতে হইবে, তাহা সে কল্পনাতীত করিতে পারে নাই। কথাটার জবাব দিতে গিয়া স্রসির ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল, চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। জবাব তাহার আর দেওয়া হইল না, তৎক্ষণাৎ পিনন কিরিয়া পিট্টলীর হাতে ধরিয়া সে যেমন যাইতেছিল আবার তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল। পশ্চাতে কনিল, বীরেন তখনও বলিতেছে,—'তোমার ভালবাসা আমি জানিনে বাবা? খুব জানি। দেবু দেবু—দেবু আমার প্রাণ, দেবু আমার সব—কিন্তু ওই মুখেই যা। তারপর যেই আর একজনকে পাওয়া আর বাস্, বাস্। বাড়ীটা দেবুর নামে লিখে দেবার বেলা বাবা—ছ—হ—হ।'

এই বলিয়াই সে মুখ তুলিয়া হাসিতে গিয়া দেখিল, ওদিকে পিট্টলীর বাবা ও মা দাঁড়াইয়া আছে। বুদ্ধিল, আর একজনের কথাটা ইহাদের মন্থমে উল্লেখ করা উচিত হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তাহাদের তনাইয়া তনাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, 'মেয়ে ছেড়ে নিজে বটে ওর হাতে, দাও, আমিও অনেক দিয়েছি, কিন্তু এখন বুঝে না বাবা, বুঝে ওর পর।—আর, যে আশায় নিজে, সে-গুড়ে বাসি! বাড়ী ও জীবন থাকতে কাউকে দেবে না, এই আমি বলে রাখলাম।' বলিয়া সে এক অস্তুত ভঙ্গীতে মাধব ভট্টাচার্যের মূখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

বাহিরে দরজার কাছে একটুখানি আঁচলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাসি সবই শুনিল। বড় দুঃখে অত্যন্ত রান হাসি হাসিয়া আবার পিট্টলীকে চলিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল 'চলু।'

পলিটা পার হইয়া গিয়া বড় রাস্তার এক পাশ বেঁসিয়া গাড়ী খোড়া বাঁচাইয়া দুজনেই চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যে পিট্টলী এত কথা বলে, সে-ও আজ কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। মাসি আপন মনেই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিল—নিজে সাধ করিয়া কেনই-বা সে এ আপন ঘরে ভাকিয়া আনিয়াছে! বৃত শীঘ্র পাবে ইহাদের সে বিদায় করিয়া দিবে। (ক্রমান্বয়ে)

## প্রথম যৌতুক

### শ্রীশাখিন্দ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়র অ'খিতে নাহি ঘুম, ঘুম নাই আমারও অ'খিতে, অতশ্রিত পৌর্যাদী—জাগিতেছে তারকামণ্ডল, স্বপ্নের অক্ষট বাধা পারি না যে হৃদয়ে রাখিতে এমন রাত্রির মাঝে জোৎস্নার জোয়ারে অশ্রুজল।

অশ্রুজল ওর চোখে,—বিস্মল কে করিয়াছে ওকে? কুঠায় ফুটে না মুখ, হেনাগড়ে বায় উত্তরাল, ঘুমের ঢুলুনি আসে, ঘুম যে আসে না তবু চোখে বাহুর শিখানি তার ক্লাস্ত দেহে লাগিতেছে দোল।

শিখিল কবরী হ'তে খসি' গেছে করবীকুম্ভম, অশ্রুতে ধুইয়া গেছে কখন যে অ'খির কাজল, মুছে গেছে অঙ্গুরাগ অমরাগ-আবীর-কুম্ভম কখন নামিয়া এল জানি না ত এমন বাদল।

বাদল নামিয়া এল নয়নের পাতায় পাতায়, মুখে হাসি চোখে জল—প্রিয়র এ বিষম কৌতুক,— দু'হাতে টানিয়া বৃকে অ'কিঞ্চু গভীর মমতায় আরক্ত আননে তার প্রণয়ের প্রথম যৌতুক।





মধুসূদন দাস নবীনের বাড়ীর সম্মুখে পাঁচাইয়া টাকার করিবেছিল—যদি আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে টাকা সব না মিটাইয়া দেওয়া হয়, সে নিশ্চয়ই নালিশ করিবে। এবার আর মুখের কথা নয়, মধুসূদন দাস এবার দেখাইয়া দিবে তাহার ক্ষমতা আছে কি না।

নবীন কিন্তু একটা উত্তরও দিল না, চূপচাপ ঘরের মধ্যে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, আর ভেজানো দরজার এতটুকু ফাঁক দিয়া উঠানের বেড়ার বাহিরে মধুসূদন দাসের লাকালাকি শোঁতেছিল। কে যেন কহাকে কি বলিতেছে, মধুসূদন যেন নবীনকে কিছুই বলিতেছে না, এমনই নিশ্চিন্ত তাহার ভাবটা।

অনেকক্ষণ টাংকার করিয়া, অনেকটা লাকালাকি করিয়া হঠাৎ মধুসূদনের মনে হইয়া গেল হয়ত নবীন বাড়িতে নাই, মিথ্যাই সে এত টাংকার করিয়া লাকাইয়া মরিতেছে।

ঘরের পানে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল দরজাটা ভেজানো মাজ, ভিতরে কিছু না দেখা গেলেও মাছফটা যে কাছাকাছিই কোথাও আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

মধুসূদন দরজা ঠেলিয়া একবারে উঠানে গিয়া পাঁচাইল, সামান্যসামনি কথাগুলি না বলিলে যেন শাস্তি পাওয়া যায় না।

যতক্ষণ দূরে ছিল নবীন নিশ্চিন্ত ছিল এবং তাহার তামাক খাওয়ারও বিরাম ছিল না; একেবারে উঠানে আসিয়া পাঁচানোতে বাধা হইয়াই নবীনকে তামাক টানা বন্ধ করিতে হইল। মধুসূদন তাহাকে সম্মুখে চায়, অথচ তাহার সম্মুখে বাইতে নবীনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মধুসূদন ভাকিতে লাগিল—

—“নবীন! বাড়ী আছে, একবার এরিকে এসো—কথা আছে।”

নবীন নীরব—যেন বাড়ীতেই নাই।

মধুসূদন আর গল্প করিতে পারিল না।

অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, “টাকা নেওয়ার বেলায় মনে ছিল না যে, টাকা দিতে হবে? আজ তিনটা বছর হ’য়ে গেছে, আসল টাকা দেওয়ার নাম নেই, স্বপ্ন দেওয়ার কথা ছিল মাসে মাসে; তাও নেই। বিয়ে করা কেন এদের লোকের, গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত। দেখি—সাত দিনের মধ্যে যদি স্বপ্ন সমেত টাকা না মিটিয়ে পাই, তোমার বউকে খ’রে রাস্তায় বের করব, তবে আমার নাম মধুসূদন দাস। এ আর কাউকে পাওনি যে, বাহুতি-মিনতি করলেই ছেড়ে দেবে।”

স্ত্রী টানিয়া বাহির করবার কথা—ও বর হইতে অত্যাগ নিন্দ্য এ সব শুনিতেছে; আর তাহার স্বামীকে কত ছোটলোক মনে করিয়া দ্বিধার দিতেছে।

পুরুষের এইবারই আঘাত লাগিল, তাই পুরুষ-সিংহ গজিয়া উঠিয়া হাঁকা ফেলিয়া ভেজানো দরজা সহজেই পুগিয়া হুস্কার ছাড়িয়া বাহির হইল—

“বলি কি হয়েছে দাসের পো, এত গজানি—এত টাংকার কেন? একশ’টা টাকা ধার নিয়েছি, স্বপ্ন না হয় তার পোটা জিশেক—না হয় পোটা পকাশকেই হোক। কেলে দেব তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন টাকা—একেবারেই মিটিয়ে দেব। এই সামান্য টাকার জন্তে নিতি নিতি বাড়ী ব’য়ে ঝগড়া করতে এসো—আমার পরিবারকে রাস্তায় টেনে বার করতে চাও, একটু লজ্জা করে না এদের কথা বলতে?”

মধুসূদন তাহার প্রচণ্ড সূঁচি দেখিয়া সভাই থতমত খাইয়া গেল, একটু ধামিয়া বলিল, “বলছো তো টাকা দেবে—দিল্ছ কই?”

নবীন তাহাকে নরম হইতে দেখিয়া খুশী হইল,

কিন্তু মুখে তর্জন গর্জন করিতে ছাড়িল না, বলিল, বিশ্বাস করজমান-কুল সব যায়, বাধা হ’য়ে বিয়ে করতেই হ’ল।”

আসল কথাটা জানিত মধুসূদন। তাহার মামার বাড়ী ছিল ন’পাড়ায়, এবং সে বাল্যকাল সেখানেই কাটাঁয়াছে। তাহার পর এখানে আসিয়া বাস করিলেও মাঝে মাঝে আসল সেখানে গিয়া থাকে।

অভ্যার মামেরই দোষ; বেশী টাকা লইয়া সে জামাতার বরসের পানে তাকায় নাই। মধুসূদনের সঙ্গে একদিন অভ্যার বিবাহের কথা হইয়াছিল; নবীন কিছু বদী না বাইত, এবং মধুসূদন বাহা দিবে বলিয়াছিল তাহার চেয়ে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশী না বিত, তাহা হইলে মধুসূদনের সহিতই অভ্যার বিবাহ হইয়া বাইত।

মধুসূদন এসব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে অভ্যার মামের সহিত কথাবার্তা ঠিক করিয়া বিবাহের আয়োজন ঠিক করিতে বাড়ী আসিয়াছিল, সেই ফাঁকে নবীন দাস যে এত কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আজ যদি মধুসূদন কেবল সেই কোমরের বর্শেই নবীনের উপর কোর জুলুম করিয়া তিন বৎসর পূর্বে ধার দেওয়া একশত টাকা স্বপ্নে আসলে সাতদিনের মধ্যে আদায় করিতে চায়, তাহার জন্ত তাঁহাকে বোর দেওয়া চলে। না।

নবীনেরই বা কি আকল! আজ বাদে কাল সে ডিঙার জুঁবে, সন্দেরের হিঙ্গাব-নিকাল করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, —এখন কি আর তাহার বিবাহ করিবার সময়? এই যে মেয়েটাকে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কি ওটুকু ভাবিয়াছে?

অভ্যার মামেরই বা কি বুদ্ধি! কতকগুলো টাকা পাইয়াই সে জুলিয়া গেল, —মেয়ের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে কোথায় পাঁচাইবে, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে—তাঁহাও সে একবার ভাবিল না? এই যে নবীন দাস, উহার আছে কি? জমিদারের কাছারীতে কাম নয়।

তামাক টানিতে টানিতে নবীন দাস লোকের কথার উত্তরে বলিল, “কি আর করি বল, রেখলুম



শেয়ারার কাজ করে, তাও এতদিন কাজ যাওয়ার কথা, অনেক করিয়া কানিয়া কাটিয়া নায়েবের হাতে পায়ে ধরিয়া সে আজও কাজে লাগিয়া আছে।

আজ মধুসূদনই তাহাকে ঘরছাড়া করিতে পারে, উহারের স্বামী-স্ত্রীকে পাশে বাহির করিয়া দিতে পারে।

মধুসূদনের নিকট হইতেই টাকা ধার করিয়া সে যে মধুসূদনেরই বাপু-দত্তা বধূকে বিবাহ করিয়া আনিবে, তাহা তো সে জানে নাই। আজও সেদিনের কথা ভাবিয়া মধুসূদনের সর্দাঙ্গ কণ্টকিত হয়। উঠে।

মধুসূদন ক্রোধে ফুলিতে থাকে — এক এক সময় মনে হয়, এই মুহূর্তেই সে নবীন দাস ও তাহার স্ত্রীকে সেনার জন্ত টানিয়া বাহির করিয়া দেয়।

লোকে মধুসূদনের বিবাহের জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছে, মধুসূদনের দ্বিদি অনেক অহম্বর বিনয় করিয়াছে, হাসিমুখে মধুসূদন বলিয়াছে, “রোস না, বিয়ে তো আর পাগিয়ে যাচ্ছে না, যখন গুলি তখনই বিয়ে করে ফেলব — তাতে আর কি?”

( ৩ )

টাকার চেষ্টায় হই এক জায়গায় নবীন দাস গুরিল, কিন্তু অত টাকা সে পাইবে কোথায়, কে অত টাকা দিবে?”

বাড়ী ফিরিয়া বারাগায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে বলিল, “চুলায় বাক্ সব, দেখি না সত্যি সে কি করতে পারে? সত্যি কি আর বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারবে? আসল কথা, যত গল্পায় তত বর্ধায় না। গর প্রকৃতিই ওই রকম — ওকে আমি বেশ চিনি। লোকটা মুখে ওই রকম করে, লাক্যার কাঁপায়, আসলে গর মনটা কিন্তু তারি নয়।”

অভয়া ভিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু সত্যিই যদি সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আমাদের বের করে দেয়?”

নবীন হাসিমুখে বলিল, “না, না,—ও ওই রকম

বলে, কাজে কিছুই করতে পারে না। আমার প্রায়ই শিলিয়ে যায় — এবার টাকা নাগাইছে হবে, না দিলে সে একটা কাণ্ড করে বসবেই। কিন্তু সে শাসনো ওই পূর্ণায়। আমি গুকে বেশ জানি, এতটুকু বেলা থেকে ওকে দেখে আসছি তো।”

অভয়া বলিল, “অত টাকা নিয়েছিল কেন?”

নবীন বলিল, “তোমার মাকে দিতে গেল, নইলে কি তোমার পেতুম? আগে মধু’র সঙ্গেই তো তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ই আমি গিয়ে পড়লুম, নইলে—”

অভয়ার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, “বাক্ পে, ও সব কথা থাক।”

নবীন হাসিয়া বলিল, “থাকবে কেন? ওর রাগই হয়েছে সেই জন্তে — তা’ আমি বুঝি। সত্যি মেজবউ, আমি কিন্তু এক একবার ভাবি — যদি আমি তোমার বিয়ে না করতুম, মধু’র সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ’ত, তুমিও হুখে থাকতে পারতে। ওর চার-পাঁচটা ধানের সোলা, বাগান, পুকুর, জমাজমি,—ও একটা মত পেরোত, আর আমার কিছুই নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বা’ নিয়ে আসি — তাতে পেট ভরে হুবেলা খাওয়া পূর্ণায় চলে না। সত্যিই আজ যদি আমার কিছু হয়, কাল যে তোমার কি হবে, মেজবউ—”

অভয়া স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল — “বলছি ও সব কথা মনে ভেব না, তা নয়, ওই সব কথাই শুধু বলবে।”

মুখ ছাড়াইয়া লইয়া নবীন একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সত্যিকে কেউ কোনদিন চেপে রাখতে পেরেছে, মেজবউ? আজ বলছি বাটে, মধু আমার কিছুই করতে পারবে না, তবু সত্যি যদি সে কিছু করে, আমার তো তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাধা হ’লেই রাত্তার গিয়ে দাঁড়াতে হবে।”

অভয়া চুপ করিয়া রহিল।

মধু’র কি সত্যিই এমন নিষ্ঠুর হইতে পারিবে, তাহাদের ঘরছাড়া করিতে পারিবে?

একদিনের কথা মনে পড়ে।

মধু তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিত। মা মধু’র সঙ্গেই কন্ডার বিবাহ দিবে ঠিক করিয়াছিল। বেচারী মধু তাহাকে কত জিনিসই না দিয়াছিল! কাপড়, জামা, শাঁখার চুড়ি, এমন কি তাহার কানে আজও যে পাখর-বাসনো ফুল হ’লানা রহিয়াছে — এ হ’লানাও মধু’র দেওয়া।

একদিন মধু বলিয়াছিল — যদি অভয়াকে সে বিবাহ করিতে না পায় — আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। অভয়া অতটা লম্বা কথা বলিতে পারে নাই, তবে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, সে-ও মধুকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। মধু তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু অভয়া?

অভয়া অন্তমনস্ক হইয়া কোন দিকে তাকাইয়া থাকে করে মনে? বুদ্ধ নবীন তামাক টানিতে টানিতে অনর্গল কত কথা বলিয়া যায়, মুখের তাহার বিরাম নাই।

মাঝে মাঝে অভয়া বিরক্ত হইয়া উঠে — তখনই মনে হয়, আশা বেচারী, জপতে উহার আর কেহই নাই। অভয়ার জজই আজ তাহাকে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হইতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, নবীনের কাছে আলজ নাই। আজ যদি তাহার পৈতৃক ভিত্তিখানি গুটিয়া যায়, সেও কি অভয়ার জজই নয়? অভয়ার নারীভিত্ত অকস্মাৎ মমতায় ভরিয়া উঠে, সে মন হইতে সমস্ত কথা মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীর প্রতি অভ্যস্ত মনোবোধ দেয়।

( ৪ )

বিবর্ষ মুখে সেদিন বাড়ী ফিরিয়া নবীন বলিল, “শুনছো অভয়া, কালই আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে।” অভয়া ভাতের ঘেনে সরাইতেছিল, ভিজ্ঞাসা করিল, “কালই—মানে?”

নবীন তামাক সাজিতে বসিয়াছিল, বলিল, “মধু কিছুতেই ছাড়লে না, সে নান্দিশ করেছে, কাল পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়ার দিন, যদি কাল বাড়ী না ছেড়ে দিই,—পরও গুয়া জোর করে এসে বাড়ী দখল করবে।”

অভয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল,— নবীন পরকণ্ঠেই হাসিল, বলিল, “বাক্ পে, বাড়ী যদি যায় বাবেই, তাতে আর কি? না হয় গাছ-তলাতেই থাকব — ভিক্ষে করে খাব, সেরকম করেও তো কত লোকের দিন কাটে, অভয়া।”

বাধাভরা কণ্ঠে অভয়া বলিল, “কাটবে না কেন, দিন সবারই কাটে, সবারই কাটবে। আমার কন্ডার জন্তে আমি তো এতটুকু ভাবিনে, ভাবছি তোমার জন্তে।”

নবীন যেন আকাশ হইতে পড়িল, “আমার জন্তে —? কেন, আমার জন্তে ভাববার মত কি হ’ল?”

অভয়া খানিক নির্নিমেষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখে অকস্মাৎ খানিকটা জল আসিয়া পড়িল, সে অজদিকে মুখ ফিরাইল।

আজ তিন বৎসর সে এই লোকটিকে দেখিয়া আসিতেছে, কোন দিন ইহার মুখে হাসি ছাড়া দেখিতে পায় নাই। যত ভুঞ্জে, বেদনা, কষ্টই আসুক না, সে হাসিমুখে সব বরণ করিয়া লইয়াছে, কোন দিন এতটুকু অসন্তোষ দেখায় নাই। আজ যে ভিত্তি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, গাছতলায় দাঁড়াইতে হইবে, তাহাতেও এ মুখের হাসি তো কই মিলাইল না।

সমস্ত অস্থিরতা সেই লোকটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, যে এই চিরশান্ত লোকটিকে উত্তাক করিয়া তুলিতে চায়, একেবারে বাড়ীছাড়া করিতে চায়।

আজ এই প্রথম সে অস্থির করিল — সে তাহার







আগে অবশ্য বুঝি নি। আমি-বে কতবারি অজ্ঞার কাল করেছি, তা' বুঝে সভাই আমার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। আজ যদি এ বিয়ে করিয়ে দেওয়া যেত, আমি নিশ্চয়ই দিতুম।"

আবার খানিক সে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "প্রতিশোধ সে নিতে চায় আমারই উপর দিয়ে, আমি তাই বলছি মেঘবউ, আমি কাল চ'লে যাই, তুমি একা এখানে থাকলে সে কখনই তোমার বের ক'রে দিতে পারবে না। আমার সঙ্গে কোথাও যাবে—কোথায় যাবে—কেবল কষ্টই পাবে।"

অভয়া হুসিয়া হুসিয়া কানিতোছিল,—আন্তরিক্তে বলিল, "আমি তোমার ছেড়ে কোথাও যাব না, কোথাও যাব না। তুমি সেখানে যাবে, যত কষ্টই হোক, আমি সেখানে যাব।"

মধুসূদন যেমন চোরের মত আসিয়াছিল, তেমনই চোরের মত আশে আশে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল।

( ৭ )

পরদিন দুপুরের পর—  
একথানা গরুর গাড়ী বাহিরে সরু পথটার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নবীন দাস উঠানে পেয়ারা গাছটার তলায় হ'কা টানিতেছে, তামাকের সরঞ্জামগুলি তাহার সামনে পুঁটিরি বা পাড়িয়া আছে।

অভয়া ঘরের ভিতর হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি যাচা কিছু ছিল সব বারান্দায় বান্ধিয় করিয়া দিতেছে, পাড়োয়ান সেগুলি বিক্রয় পাড়ীতে লইয়া বাইতেছে।

হেরে ধীরে মধু আসিয়া দাঁড়াইল।

"চলল নাকি, নবীনদা?"

নবীন হাসিমুখে উত্তর দিল, "না। গিয়ে আর ক'রছি কি বল, থাকতে তো আর দিলে না।"

অভয়া কি একটা কথা বলিতে আসিতেছিল,

মধুসূদনকে দেখিয়াই তাহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। সে কিরিয়। বাইতেছিল।

মধুসূদন ডাকিল, "এদিকে এসো, অভয়া! কখাটা কেবল নবীনদার সামনে বসলেই তো চলবে না; তুমি যখন ওর স্বহৃদয়ের সমানোশতাগিনী, তখন তোমারও সে কথা শোনা দরকার।"

অভয়া ফিরিল না, কিংবা দাঁড়াল।

পাওঁট হইতে একথানা কাগজ বাহির করিয়া নবীন দাসের হাতে দিয়া মধুসূদন বলিল, "আমি আজই রাতে আমার দিলিকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি কিনা, সেই জল্পে সকলেই সহরে গিয়ে এসব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলে

এইমাত্র কিরে আসছি। তোমরা এখন যাচ্ছ শুনে স্নানাহার পর্যাণ্ত করিনি, তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। এখানা একবার পড়ে দেখ, তারপর হা'য় করো। তুমিও এদিকে এসো, অভয়া, শুনে যাও সবগুণ।"

চমৎকৃত হইয়া নবীন বলিল "এ কিসের কাগজ?"

মধুসূদন বলিল, "প'ড়েই দেখ না কেন?"

দড়িবাধা জীর্ণ চশমানানা চোখে আঁটিতে আঁটিতে নবীন দাস বলিল, "কিসের যে এ কাগজ, তা' তো বুঝতে পারছিনে মধু, যাই হোক—যেয়ো না, একটু দাঁড়াও।"

ততক্ষণে মধু দরজা পার হইয়াছে, সেখান হইতেই বলিয়া গেল, "আমার থাকার আর দরকার নেই, নবীনদা, এখনকার যা' তোমরাই ঠিক করবে। মোট এই কথা ব'লে যাচ্ছি—আমি এই রাতেই চ'লে যাব, তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাস কর।"

অভয়া কিরিয়। দেখিল—মধুসূদন পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল।

উত্তেজিত নবীন দাস ডাকিল, "দেখে যাও নো, মধুর কাঁটি শোন। সে সব দান ক'রে দিয়ে গেল, আমাদের আর এবাড়ী ছাড়তে হবে না।"

মহানন্দে বুদ্ধ নবীন দাস বৃষ্টি নাচিয়াই ফেলল।

অভয়া বিস্ময়ে বলিল, "বুঝতে পারছেন না।"

নবীন দাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,

"কখাটা বুঝতে পারলে না? মধু জানিয়েছে, সে তোমাদা করেছিল, দেখতে চেয়েছিল ভিটে ছাড়বার নামে আমরা কি করি। সে আজই সহরে গিয়ে এই রেজেষ্ট্রী ক'রে এনেছে—এই বাড়ী, এর চারদিককার খানিকটা জমি-জমা, সব সে আমাদের দান ক'রে দিলে, তা' ছাড়া বন্দোবস্ত করেছে, তার আর থেকে তুমি মাসে মাসে দশখাটা ক'রে পাবে।"

অভয়া হঠাৎ কিরিয়। দাঁড়াইল,—

"ভালো কথা, আমাদের দুঃখ তা' হ'লে ঘুচলো—"

সে পাড়োয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে ও সব নাবিয়ে রেখে যা বাবা, তুই যে এতটা কষ্ট করেছিস তার জজ বং হ'চার আনা ধ'রে নিস।"

নবীন হ'কাটা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তুমি গুণ্ডলা নামিয়ে ঘরে তোল, আমি বয়স মধুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। আজ রাতেই সে চ'লে যাবে বললে, এই বেলা ভিন্ন আর হয়ত দেখাই হবে না। এতটা বে করলে, তার জন্তে একটু বলা কওয়া—"

বাধা দিয়া কঠিন স্বরেই অভয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। যে লোক এমন নির্দয় ব্যবহার করতে পারে, তার ঐকটু দয়ার জ্ঞান খবদা জানাতে যেতে হবে না।"

নবীন বেন আকাশ হইতে পড়িল—

"তুমি বলছ কি অভয়া? সে বেচোরা কতকালের জন্তে যাচ্ছে—হয়ত যখন ফিরবে—"

অভয়া কঠিন মুখে বলিল, "ধাক্কা, অতটা বাড়ী-বাড়ির দরকার দেখছি নে।"

হিয়ার পর আনন্দের আভিনয়ো নবীন দাস যতবার কথা বলিতে গেল, ততবারই অভয়ার কাছে বন্দক বাইল।

দৃষ্ট তাহার ক্ষণ হইয়া আসিয়াছে, সাংসারিক বুদ্ধিও নাকি তাহার বড় কম—সেই জন্মই সে অভয়ার গম্ভীর অথচ বিমর্ষ মুখানা দেখিতে পাইল না, তাহার আর্দ্র কণ্ঠের গুনিরাও কিছু বৃষ্টিতে পারিল না।

মধুসূদন যে তাহাকে তাহার ভিত্তি ফিরাইয়া দিয়া গেল—এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান ছিল না।

( ৮ )

রাত্রি বারটার মেল—

মধুসূদন ঠেসনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাশিতে তাহারের একথানা বাড়ী ছিল, এ পর্যন্ত সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া ছিল। গত মাস হইতে ভাড়াটিয়া উঠিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কাল রাতেই সে প্রস্তাব করিয়াছিল, আজই সে কাশী যাইবে, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিবে।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার, অসংখ্য নক্ষত্র ঝিক্‌ঝিক্‌ করিয়া জলিতেছিল। সেই পরিষ্কার নীলকাশের পানে তাকাইয়া মধুসূদন ভাবিতেছিল—পিছনে কে-দেশ ফেলিয়া চলিল তাহারই কথা।

দিদি জিজ্ঞাসা করিল, "আবার হুমাস পাবেই তো কিরব, মধু?"

মধুসূদন একটু হাসিয়া বলিল, "কি দরকার আর কিরে আসবার, দিদি? বাবা বিশ্বনাথের পায়ে কত লোকই আশ্রয় পাচ্ছে, আমরাও ছই তাই-বোনে সেখানে আশ্রয় পাব, আর এ সংসারে কিরবার কি দরকার?"

দিদি এ মন্তব্যের কথা আগে জানে নাই, জানিলে হয়ত কাশী-নাজার আয়োজন হইত না। তাই আশ্চর্য হইয়া গিয়া বলিল, "ওমা, তুই বলাচ্ছ কিরে, দেশে আর কিরবিনে না কি?"

মধুসূদন বলিল, "দেশে আমাদের তো কেউই নেই দিদি।"

দিদি আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কেউ নেই সত্যি—দেশ তো আছে।"

মধুসূদন গম্ভীর মুখে বলিল, "দেশের টান আমার কেটে গেছে দিদি, সেই জন্তেই আমি যাচ্ছি।"



এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক কথার স্বেচ্ছা—যদি প্রাণী জাগিয়া ছিল। সে কান পাতিয়া জমিল, মেল  
মেহাংই দরকার পড়ে, নাহয় একবার আসা যাবে। আসিল এবং ছাড়িয়াও গেল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দিদি মুখ ফিরাইল। বাগিসের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া অতি গোপনে  
সেদিন রাত্রি বারটার মেল যখন ছাড়িয়া গেল, সে কতখানি চোখের জল ফেলিল, তাহা জানেন  
তখন গ্রামবাসী নিদ্রামগ্ন। কেবল একটা গৃহে একটা একমাত্র অন্তর্যামী!

### অতীত \*

#### ত্রিবেদীরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাগ্যে অতীত কয় না কথা তাই না আছি বেঁচে,  
নইলে টিকি চাণাড় দেবে পুরোদমে কেঁচে।  
হাঁটুর ওপর হাফ-প্যান্ট পরে পুরুতের ছেলে—  
উরুতের রং দেখাবে না ঘণ্টা নাড়া ফেলে।  
দাঁতনেতেই সাড়ে দশটা—চাকরির দপা রপা,  
হরি-মটর মেরে চলবে কোসে মালা জপা।

থাকের কলম ধরে কবি লিখবে মনসার ভাসান,  
বাহবা দেবে পণ্ডিতেরা,—গ'লে যাবে পাখান।  
অশ্রুমা আর মথার চৈলয় দেশ-ভ্রমণ ছেড়ে  
পা গুটিয়ে আরামেতে ব'সে থাকবেন বেড়ে।  
টিকি রেখে ককী নিয়ে খোল বাজাবে তরুণ,  
হরিনামে ভক্তের চোখে ভর করবেন বরুণ।

‘চরনিকার’ সোহাগ যাবে, অটল হবে পঞ্জিকা,  
শিব-ভাণ্ডব স্বরূপ হবে সস্তা পেয়ে গঞ্জিকা!  
অতীতকে আর এতো ক'রে কেন সাদাসাদি?  
চায়ের দফা গয়া হ'লে—মরবে আদা-আদি।  
গত জন্মের প্রিয়ার পশ্চৎ কয়ে উঠবে কথা,  
কারুর হাতে ঝাড়ু কারুর বুকফাটা ব্যথা!

বেঁচে আছি পাণ্ডাদার সব ম'রে গেছে শুনে,—  
হেঁকে বলবে—দাওতো বাবু হুদ শুদ্ধ গুণে।  
চপ, ডিম্ব নবীর কুঞ্জে চলাছে যখন প্রেমে,  
ছি ছি ক'রে উঠবে বিমান,—উঠতে হবে যেমে।  
জিত উপড়ে তুখানল আর শুলের হবে ব্যবস্থা,—  
কে জানে ভাই পরগণা খেতে বলবেন ক'বস্তা!

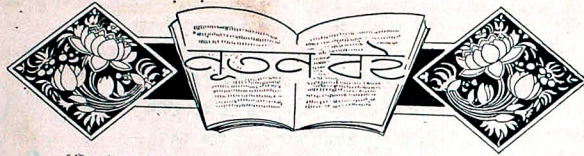
রান্নাঘরে খোড়ের ঘণ্টা রাঁধবেন বসে গিমি,  
‘রিচ্-ডায়েটে’র মধ্যে কেবল রবে ‘কাঁচা-শিমী’।  
রবিবাবু রক্ষা করুন, থাকুন নীরব অতীত,  
ডেকে আর আনবেন না unwelcome অতিথি।  
নামাবলি উঠবে অপ্রে; ‘টেলার-শপ’ বন্ধ,  
Rare হবে এত মাধবের পলাতুর গন্ধ।

উকোর শব্দে গুলজার হবে হুঁকোপটি,  
তাল ঠুকে আসর মেবে তালতলার চাট।  
খাটি অবিশিষ্ট আবার হ'য়ে উঠবে জাটটি,  
গঙ্গালাভের তরে রবেন নিমতলার ঘাটটি।  
ছত্রিশ জাত তুলবে প্রবল ছত্রিশ রাগিণী,  
সামবেদকার সামলাতে না পারবে নাগিণী।

বাতাসা বানাবে শুখন নবীনাদি যৌদক,  
করাত নিয়ে হাজির হবেন আবার ‘শিশুবোধক’।  
রক্ষা করুন—কাজ নেই আর অতীতের ডাকি,  
যখন যেমন রাখেন কর্তা তাই মেনেই থাকি।

\* রস-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ত্রিবেদীরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কবিতাটি  
পাইয়াছি। ‘উদয়ন’র পাঠকবর্গকে ইহা উপহার দিলাম—উঃ সঃ।





[ 'উপদেব' সমালোচনার জন্ত প্রকাশকণ অমূল্যে করিয়া তাঁহারে পুস্তক ছইখানি করিয়া পাঠাইবেন ]

স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ—ঐজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সম্পাদিত—মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি মাননীয় বিচারপতি স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষের জীবনচরিত। লেখক পুস্তকখানি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাজবর রাজা স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। স্তর চন্দ্রমাধব ও স্তর মন্মথনাথের ফটো দুইটিও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। গ্রন্থকার চন্দ্রমাধবের সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত অতি পুথ্যপুথ্যরূপে আলোচনা করিয়াছেন; এতৎপ্রসঙ্গে অনেক পুরাতন ঘটনার ইহাতে সন্নিবেশ হইয়াছে। সেই দিক দিয়া পুস্তকখানির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। ১৮৭১ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব যে বাঙলা দেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হয় নাই, ভারতীয়দের সহিত তৎকালীন হিন্দী-ভাষী সাহেবদের আচার-ব্যবহার, বহুদিনের যে হিন্দু-কলোজে চন্দ্রমাধবের সাধার্য ছিলেন এবং বহুদিনের ও বহুদিনের বহু মহাশয়ই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ উপাধিধারী, স্বনামখ্যাত রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি বি-কে মল্লিক মহাশয় যে হিন্দু-কলোজে আইন-শ্রেণীতে চন্দ্রমাধবের ছাত্র ছিলেন, ১৮৬২ খৃঃ অঃ ১লা জুলাই যে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শতাব্দী পণ্ডিত মহাশয় যে ইহার প্রথম দেবী বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন প্রভৃতি ঘটনার উপর ইহা আলোচনা করিতেছে। এই গ্রন্থে তৎকালীন প্রতিভাশালী পুরুষগণের মধ্যে বারিকানাথ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐনান

দাস, রমেশচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরও পরিচয় উল্লিখিত আছে। স্মৃতিবল্লা চন্দ্রমাধবের নির্ভীক উক্তি ও চরিত্র-বিশ্লেষণও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

গঙ্গের মায়াপুরী—ঐহেমেন্দ্র লাল রায় প্রণীত, "দেব-সাহিত্য রচনার" কর্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র সংস্করণ—দাম মাত্র এক টাকা।

"মায়াপুরী"তে মোট আটটি গল্প আছে। এই আটটি গল্পের সাহায্যে হেমেন্দ্রলাল এক "মায়াপুরী" সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্যেও হেমেন্দ্রলালের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। হেমেন্দ্রলালের সুবল কল্পনা, হৃদয়পূর্ণ রচনাশক্তি ও সহায়ত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিতান্তই তাঁহার লিখন। হেমেন্দ্রলালের গল্প বলিবার ভঙ্গি অপূর্ণ। ছেলে-মেয়েদের মনও তিনি আকর্ষণ করিতে জানেন, কারণ তাঁহার মত দরদর নিয়া আর কেহ শিশু-সাহিত্যে রচনা হইয়াছেন বলিয়া জানি না। লেখকের অন্তরের দরদর স্পন্দই গল্পগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তাঁহার "মায়াপুরী" রূপে ও মায়ায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। এ পুরীতে বেশ-শিশু প্রবেশ করিবে সেই শিশুর মনই সেখানে আটক পড়িয়া যাইবে—তাঁহারই আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে, এড়াইয়া চলিয়া আসিতে পারিবে না। স্বকবি হেমেন্দ্রলাল এই

"মায়াপুরী" রচনার ছেলেমেয়েদের কাছে গল্পের বাহুরূপে দেখা দিয়াছেন।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর বহু চিত্রে বইখানা শোভিত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, নির্ভুল, অপরূপ। পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭৫। এত বড়—এত সুন্দর এবং এমন সচিত্র সংস্করণের দাম যে মাত্র এক টাকা, সেজন্ত প্রকাশককে ধন্যবাদ।

শ্রীশচীন সেন

বড়-অবতার—ঐনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

একখানি নাতিদীর্ঘ নক্সা—ছয় কর্ণার মধ্যে ছয়টি চিত্র সম্বলিত, ছয় অক্ষরের শিরোনামাবলু, ছয়টি হাতরস-বহুল গল্পের সমষ্টি। সর্গদিক দিয়া বড়-অবতার সর্বস্বাধীন হৃদয়ের হইয়া উঠিয়াছে। নিছক হাতরসের অবতারণা করাই যদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে নিসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "বিষম প্রদেহী" আর "গোড়ার গলদ" নামক দুইটি গল্প হাতরসের অন্তরালে চিত্তরাস প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পুস্তকের আবৃত্তি করিয়াছেন স্বনামখ্যাত শিল্পী ঐন্দ্রজ্যোতীকুমার সেন মহাশয়। কাজে কাজেই

বিষম-বস্ত্র ও চিত্র-শোভা উভয়ই সমানভাবে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

Savarkar (V. D.): Hindu-Pad-Pad-shahi, or a Review of the Hindu Empire of Maharashtra. Madras; B. G. Paul & Co., 1925. Rs. 3/-.

মহারাত্রী-সাম্রাজ্যের উত্থান, সমৃদ্ধি ও পতনের ইতিহাস। ষটনাবলী অতি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিবরণ সাধারণ পাঠকেরও মনোরঞ্জন করিতে পারে।

Underwood (Eric G.): A Short History of French Painting. London, Oxford University Press, 1931. 8s-6d.

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ফরাসী চিত্র-শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিকে সহজবোধ্য করিবার জন্ত ইহাতে বর্ণাশাখা technical word বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফরাসী চিত্র-শিল্প কিসের প্রতীক, শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের বৈশিষ্ট্য কি, এবং বিভিন্ন অঙ্গ-পদ্ধতির লক্ষ্যই বা কি—এ সকল বিষয়েরও আলোচনা আছে। এস, কুমার





## বিদায়-সংকলন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ

তোমার ধর্ম তোমার কর্ম—তুমিই তা' ভালো বোঝ',  
আমার চিন্তা জানিতেও নাহি চায়;  
আমি ভাবি—শুধু কি করিয়া তুমি মুক্তির পথ খোঁজ',  
প্রাণের সত্য কীদে যবে বেদনায়।

ভগবান বল', পরকাল বল', যা বল'—রীতি বা নীতি,  
শিখিয়াছ যাহা এই মানুষের ঘরে;  
কোন ভগবান দিবে সম্মান, মনে যার নাই শ্রীতি,  
কোথায় ধর্ম প্রেমছাড়া নাম ধরে?

ভাবিতেছ মনে, কথার বীধনে বুঝি-বা ফিরা'তে চাই,—  
এ কেবল তারি মুক্তির কৌশল!  
যে প্রেম মরেছে, বাক্যের ফুঁয়ে উড়াইয়া তারি ছাই,  
দেখিবারে চাই—কোথায় চোখের জল।

নহে গো বন্ধু, বিদায়ের ক্ষণে লজ্জা দিও না আর,  
আমার নহেক, তোমারই সে অপমান,  
বিকৃত বলি' যে প্রেমের তুমি খুঁজিতেছ প্রতীকার—  
লাঞ্ছিত তাহে তোমারই সে ভগবান।

দেখেছ তাহারে—চিনেছ তাহারে—শুনেছ কি তার বাণী,—  
মনের নয়নে ঈর্ষ্যাকূট দেখেছ তারি?  
পাকের মাঝে ফুটেছে পদ্ম, তাই বুঝি তারি গানি,  
মিথ্যা তাহার সৌরভে অধিকার।

মানুষের মনে দেখনি তাহারে, দেখেছ নয়ন ভরি'  
মন্দিরমাঝে দুয়ারের অবকাশে,  
শব্দে তাহার শুনেছ শব্দ ছুটি হাত জোড় করি',  
অঙ্গগন্ধ পেয়েছ কি ধূপবাসে?

সত্য শূন্যানে দেখিয়াছ শিব ভৈরবী-পদতলে,  
মিথ্যা শূন্যানে দেখেছ কি জীবদল—  
মুগ্ধ মায়ায় ক্ষুধা পরাণ বুঝি বিধাদের ছলে  
চাঁৎকার করি' ফাটায় আকাশতল।

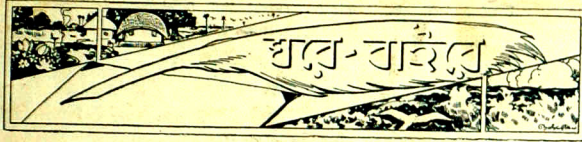
জ্ঞানীর ধর্ম জ্ঞানীতেই বুঝে, আমি অজ্ঞান অতি,  
চোখে দেখি যাহা, অন্তরে যাহা বুঝি,  
তারেই বুকের সত্য জানিয়া মিলাই মনের গতি,  
জীবন ভরিয়া বুঝি আর তাই খুঁজি।

তোমার শাস্ত্রে মিথ্যা সে সব, মানুষের নাহি ঠাই,  
মানব-অভীত মন যাহা, তারই পূজা।  
ছুটি বাছ কৈদে ছুটি পায়ের ধরে, তার বেশী সেধা নাই,  
কোথায় সেধায় জিনিসদ্বীপ দশভুজা?

সেই ভালো প্রিয়, তোমার ধর্ম থাকুক তোমার মনে,  
আমার মর্ম আমার বুকেই থাকুক,  
মিথ্যা বাক্য মিথ্যা সে শুধু আজি এ বিদায়-ক্ষণে,  
মুগ্ধ প্রণয় থাকুক শোক-নির্বাক।

ফিরে' লও তব পত্রের রাশি,—শীতের শিশির মাথা—  
শীর্ণ শাখার স্থলিত আবর্জনা;  
প্রেম-লেখা যত, অর্থবিহীন কীটের চিহ্ন আকা;—  
এ বিদায়-বাণী ক'রো শুধু মার্জনা।





(১)

আমি ইতিপূর্বে "উদয়নে" যেসব ঘরে-বাইরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সেসব প্রধানতঃ দেশী পলিটিম্ ও বিলেতি ইকনমিস্টের কথা; যদিচ আমি পলিটিসিয়ানও নই, ইকনমিষ্টও নই। আমি যদি কিছু হই ত—সাহিত্যিক; অর্থাৎ সেই জাতের লেখক, যাকে অল্প কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। দেশ-বিদেশের পলিটিম্ ও ইকনমিক্ সম্বন্ধে এ যুগের লোক সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারেন না; কেননা, এক জাতির মনের সঙ্গে অপর সব জাতির মনের যোগ আজ ঘটেছে। এর ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা' বলা কঠিন। অবশ্য পৃথিবীর কোন কোন জাতি অপর দেশ থেকে নূতন idea-র আমদানী বন্ধ করতে চান। কেবল যে বিদেশী মালের আমদানীর পথে সেসব জাতি প্রাচীর তুলে দিচ্ছেন, তাই নয়; নূতন মতও বরকট করছেন।

সেদিন Julian Huxley-র একখানা বইয়ে পড়লাম যে, রুশিয়াতে এখন Wells-এর Outlines of History নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রবেশ নিয়ে। Julian Huxley বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনিও idea-র এইরূপ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী নন। তাঁর কথা এই—

"One wonders sometimes just what would happen if young Communism were suddenly subjected to all the blasts of doctrines current in other countries. Perhaps freedom of ideas is confusing after all."

তা' হতে পারে; কিন্তু আমরা পলিটিম্ ও ইকনমিক্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় মতামত, "কুছ্ নেহি ত খোড়া খোড়া" শুনেই বাধা।

(২)

এখন এই দেশ-বিদেশের কথা, আমাদের এক কান দিয়ে ঢুক আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় না। মাছকে কথা কয়, অপরের মনকে স্পর্শ করবার জ্ঞান। সেই জ্ঞানই অপরের কথা আমাদের মনকে শুধু ছোঁয় না, নাড়াও দেয়; আর সে মনকে অহবিস্তর ব্যস্তও করে। এই কারণে আমি পলিটিম্ ও ইকনমিক্ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ না হলেও, ওসব বিষয়ে টীকাটিপ্পনি কাটবার অধিকার আমার আছে। স্বতরাং দেশ-বিদেশের পলিটিকাল ও ইকনমিকাল হান্স-চাল সম্বন্ধে ছ'চারটি উপর-চাল দিতেও কুণ্ঠিত হইনি।

আমি যা' পূর্বে বলেছি, তার একটিগুণ আশার কথা নয়; প্রায় সবই আশঙ্কার কথা। তাই এই পূজার সময় সে বিষয়ে নীরব থাকব মনে করেছি। এ সময়টা দেশে আনন্দের সময়, স্বতরাং যে কথা শুনে লোক নিরানন্দ হতে পারে, কথা এখন না বলাই শ্রেয়। শুধু তাই নয়, একটি দিন মাছদের মন বর্তমানের বন্ধন কাটিয়ে আমাদের অতীতে হাওয়া বদলাতে যায়—যে অতীতে মাছদের জীবন একটা গুরুত্বের ছিলনা বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞার পরেই আমরা আবার সকলেই মনে ও প্রাণে বর্তমানে ফিরে আসব, আর অগ্নয়মতা, বরসমতা, ব্রাহ্মসমতা, হরিজন-সমতা নিয়ে মাথা